রচনাঞ্জলি

স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার্থীদের জন্য

বাঙ্‌লা প্রথম পত্রের (পাঠসংকলনের) ব্যাকরণ, দ্বিতীয় পত্রের জন্য নির্ধারিত ব্যাকরণ, ব্যাকরণ-রচনা সহায়িকা, সকল উপপাঠ্য গ্রন্থ হইতে ভাবসম্প্রসারণ, সার-সংক্ষেপ ভাবার্থ রচনা, বাঙ্‌লা কাব্যের কাহিনী, প্রবন্ধ-রচনা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় সম্বলিত

অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
কলিকাতা ॥ পাটনা ॥ এলাহাবাদ

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড
১, শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬

বিক্রয়কেন্দ্র ঃ—
২১১/১ বিধান সরনি, কলিকাতা- ৬

শাখা ঃ—
এলাহাবাদ—৪৪, জনস্টনগঞ্জ, এলাহাবাদ -৩
পাটনা—অশোক রাজপথ, পাটনা—৪

প্রথম সংস্করণ—জানুয়ারী, ১৯৬০

মূল্য—সাত টাকা মাত্র

প্রকাশক ঃ—
বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
জানকীনাথ বসু

মুদ্রাকর ঃ—
শ্রীপ্রভাতচ[illegible]
লোক-সে[illegible]
৮৬-এ, [illegible]
কলিক[illegible]

এই পুস্তকের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

১। এই গ্রন্থে পাঠ-সংকলনের **ব্যাকরণ** বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

২। এই গ্রন্থে **বাঙ্‌লা** দ্বিতীয়পত্রের জন্য নির্ধারিত তিনখানি উপপাঠ্য গ্রন্থ হইতে অনেকগুলি পঙ্‌ক্তি ও অনুচ্ছেদের ভাবসম্প্রসারণ, সার সংক্ষেপ ও ভাবার্থ রচনার নিদর্শন দেওয়া হইযাছে। **ইহার** জন্য অপব কোন **সাহায্য পুস্তকের প্রয়োজন হইবে না।**

৩। বাঙ্‌লা দ্বিতীয়পত্রের **ব্যাকরণ** সম্পূর্ণরূপে পাঠক্রম অনুযায়ী লিখিত হইয়াছে। **এই বিষয়ের জন্য অপর কোন পুস্তক পাঠের প্রয়োজন হইবে না।**

৪। **বাঙ্‌লা কাব্যের কাহিনী** (Stories from Bengali Literature) **সম্পূর্ণ**-রূপে সিলেবাস অনুযায়ী লিখিত এবং নির্ভরযোগ্য।

৫। বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের উপর ১২২টি প্রবন্ধ রচনার নমুনা ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

৬। এই পুস্তকে আলোচিত বিষয়সমূহ সাধারণ ও মেধাবী সকল প্রকার ছাত্রছাত্রীব উপযোগী। **শিক্ষার্থীদের সময় ও সামর্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পুস্তকটি রচিত হইয়াছে।**

৭। **স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার বাঙ্‌লা প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রের জন্য এই পুস্তক সর্বতোভাবে উপযোগী।**

REVISED SYLLABUS IN BENGALI—First Language

Notification No. Syl/1/62 dated 30. 3. 62.

Class IX & X

(For the School Final Examination, 1965 onwards)

A. Paper 1—100 Marks

Selected texts in Prose and Verse :—

(1) Questions on the subject-matter of texts for detailed study—	
(a) Prose Text	—50 marks
(b) Poetry Text	—35 ,,
(2) Questions on Composition and Grammar arising out of detailed study of the prescribed text.	—15 marks
	100 ,,

[All the pieces from Pathsamkalan except বসন্তের কোকিল, তো কাহিনী ও ভাগ্যবিচার are to be read.]

B. Paper II—100 Marks

(1) Grammar and Composition (excluding Rhetoric)	—30 marks
(2) Essay writing	—20 ,,
(3) Stories from Bengali Literature	—20 ,,
(4) Substance, Pre´cis and/or Amplification of extracts from a number of specified books of Prose and Verse for non-detailed study.	—30 ,,
	100 ,,

The following topics are to be studied under the item 'Stories from Bengali Literature' :—

1. Krittibaser Atmakahini—(Krittibaser Ramayana)
2. Ratnakar Dasyur Upakhyan— —do—

3. Labkuser Kahini —do—
4. Shyen-Kapoter Upakhyan—(Kasiramdaser Mahabharata)
5. Bhagirather Ganga Anayan— —do—
6. Ekalabyer Upakhyan — —do—
7. Srikrishner Balyaleela — (Vaisnab Sahitya)
8. Sri Chaitanyer Jiban Kahini— (Charit Sahitya & Vaishnab Sahitya)
9. Raghunathdaser Charit Kahini—(Charit Sahitya)
10. Behular Kahini — (Manasamangal)
11. Mukundaramer Jiban Kahini— (Mukundaramer Chandimangal)
12. Kalketur Upakhyan — (Chandimangal)
13. Dhanapatir Upakhyan — —do—
14. Lausener Upakhyan — (Dharmamangal)
15. Shiber krishikaryer Upakhyan—(Shibayan)
16. Vyaskashir Upakhyan —(Annadamangal)
17. Umar Agamani and Vijaya —(Agamani—Vijaya Sangit)

The following books will be prescribed as text for non-detailed study :—

১। কুরুপাণ্ডব (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
২। রামায়ণী কথা (দীনেশচন্দ্র সেন)
৩। কবিতা-সংকলন (বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত)

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

১৯৬৩ সালে রচনাঞ্জলির চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে উহা নিঃশেষিত হয়। এই সংস্করণের ব্যাপক পরিবর্তন পরিবর্ধন সাধন করিয়া পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বাংলা প্রথমপত্রের ব্যাকরণ ও দ্বিতীয়পত্রের যাবতীয় বিষয় অব করিয়া রচনাঞ্জলি রচিত হইয়াছে।

যথাসম্ভব অল্পকথায় পাঠক্রমে নির্ধারিত ব্যাকরণের আলোচনা করিয়াছি। পাঠসংকল ব্যাকরণ হইতেছে দ্বিতীয় পত্রের মূল ব্যাকরণের ব্যবহারিক অংশ। দ্বিতীয় খণ্ডে প্রথ পত্রের ব্যাকরণের (পাঠসংকলনের) যাবতীয় বিষয় ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। এই অংশে অনেক নতুন বিষয় সংযোজন করা হইয়াছে।

তৃতীয় খণ্ডে নির্বাচিত তিনটি উপপাঠ্য গ্রন্থ হইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠিন পঙ্‌ক্তি ও অনুচ্ছেদ নির্বাচন করিয়া ভাবসম্প্রসারণ, ভাবার্থ, সারসংক্ষেপ প্রভৃতি রচনার বহুসংখ্যক নমুনা দেওয়া হইয়াছে। বর্তমান সংস্করণে ভাবসম্প্রসারণ রচনার অতিরিক্ত কতকগুলি নমুনা দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় পত্রের জন্য Stories from Bengali Literature বা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য হইতে মোট সতেরটি উপাখ্যান নির্বাচিত হইয়াছে। এই উপাখ্যানগুলি পৃথক গ্রন্থাকারে প্রকাশ না করিয়া বর্তমান গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ড হিসাবে প্রকাশ করা হইল। প্রত্যেক উপাখ্যানই বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। উপাখ্যানগুলি মূল রচনার সাহায্যে লিখিত সিলেবাসের নির্দেশ অনুসারে মূল উপাখ্যান হইতে বহু সংখ্যক উদ্ধৃতিদ্বারা গল্পগুলি লেখা হইয়াছে। প্রত্যেক গল্প আরম্ভ হইবার পূর্বে ঐ গল্পের রচয়িতা ও তাঁহার মূল রচনার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ইহাছাড়া সূচনাতেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও দেওয়া হইয়াছে। এই অংশ ছোট হরফে মুদ্রিত, পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নহে। ইহা উৎসাহী ছাত্রছাত্রীরা পাঠ করিতে পারেন।

ছাত্রছাত্রীদের সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আলোচিত বিষয়গুলি এখানে পরিবেশিত হইয়াছে। ফলে সাধারণ, অধিকতর মেধাবী এবং উচ্চস্তরের বিদ্যার্থীদিগের মধ্যে সকলেই এই পুস্তক পাঠে উপকৃত হইবেন। প্রয়োজন অনুসারে সকলেই ইহা হইতে জ্ঞাতব্য বিষয় আহরণ করিতে পারিবেন।

এই পুস্তক রচনায় বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপকরূপে, প্রধান পরীক্ষক ও সহকারী পরীক্ষক এবং প্রশ্নরচয়িতা হিসাবে বাঙ্‌লাদেশে, বঙ্গের বাহিরে বা বহির্ভারতে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছি, সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

ইহাদ্বারা বিদ্যার্থিগণ উপকৃত হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

কলিকাতা
ভবানীপুর
২০।৫।৬৫

শ্রীসুরেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের স্কুল ফাইনাল পরিক্ষার্থী নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীগণের জন্য লিখিত 'রচনাঞ্জলি' প্রকাশলাভ করিল। ইহা প্রধানতঃ ব্যাকরণ ও প্রবন্ধ-রচনা পুস্তক। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় নির্ধারিত বাঙ্‌লা দ্বিতীয় পত্রের সম্পূর্ণ পাঠক্রম অনুসারে ইহা রচিত হইয়াছে। এই পত্রের ব্যাকরণ, ভাবসম্প্রসারণ, ভাবার্থ, সারসংক্ষেপ ও প্রবন্ধ-রচনা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের পূর্ণ আলোচনা বর্তমান পুস্তকে স্থান পাইয়াছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সপ্তমশ্রেণী হইতে দশমশ্রেণীর পাঠ্য ব্যাকরণ, প্রবন্ধ-রচনা প্রভৃতি বিষয়ের উপর একক পুস্তক রচনা করিবার যে রীতি প্রচলিত আছে উহাদ্বারা স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না।

সপ্তম ও অষ্টমশ্রেণীর পাঠ্যবিষয় নবম ও দশমশ্রেণী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। সুতরাং এই চারশ্রেণীর বিষয় মাত্র একখানি পুস্তকে পরিবেশন করা পরিক্ষার্থীদের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। এই কারণে প্রচলিত রীতি এখানে ত্যাগ করা হইল।

বর্তমান পাঠক্রমে ব্যাকরণ ও রচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। যুগের ব্যাকরণের আলোচনা প্রণালী পরিবর্তিত হইয়াছে—ক্রমবর্ধমান বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রবন্ধ-রচনার ক্ষেত্রও ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হইতেছে। এই কারণে বিদ্যার্থিগণের প্রয়োজনের অনুরূপ পুস্তক রচনা অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। তাই এইরূপ পুস্তক রচনায় প্রয়াসী হইয়াছি।

ভাষার গতি প্রকৃতি, বিশিষ্ট বাগ্‌ভঙ্গি লক্ষ্য না করিলে যেমন সাহিত্যের রসাস্বাদন করা চলে না, তেমনি বিশুদ্ধ রীতিতে মনের ভাব প্রকাশ করাও সম্ভবপর হয় না। তাই প্রচুর উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাকরণের সহিত সাহিত্যের যোগসূত্র স্থাপন করিতে যত্নবান হইয়াছি—নীরস সূত্রজালে ব্যাকরণকে আবদ্ধ করিয়া রাখি নাই।

একালে মানুষের মন বাহিরের আঘাত-সংঘাতে নানাভাবে আলোড়িত হইতেছে। তাই প্রবন্ধও নানা প্রকারের হওয়া স্বাভাবিক। ছাত্রছাত্রীগণকে সাহায্য করিবার জন্য এই পুস্তকে আদর্শ হিসাবে বিভিন্ন প্রকারের ১১৪টি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত করিয়াছি।

এই পুস্তকে **ভাবার্থ**, **ভাবসম্প্রসারণ** প্রভৃতি রচনার আদর্শ ও উহাদের সহিত যথেষ্ট-সংখ্যক **অনুশীলনী** প্রদান করিয়া ছাত্রছাত্রীগণকে সাহায্য করিতে কোন ত্রুটি করি নাই।

এই পুস্তক সহৃদয় শিক্ষক মহোদয়গণ ও ছাত্রছাত্রীগণের নিকট সমাদর লাভ করিলে আমার শ্রম ও বিগত ত্রিশ বৎসরের শিক্ষাদান কার্যের অভিজ্ঞতাকে সার্থক জ্ঞান করিব।

পরিশেষে, বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টরদ্বয় শ্রীজানকীনাথ বসু ও শ্রীগণেশচন্দ্র বসু তাঁহাদের স্বাভাবিক সৌজন্য ও কর্মতৎপরতার সহিত এই পুস্তকের দ্রুত প্রকাশন বিষয়ে যে সক্রিয় সহযোগিতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারতী মহাবিদ্যালয়
(College of Indology)
বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়
১৮ই পৌষ ১৩৬৭ সাল

শ্রীসুরেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড : ব্যাকরণ

পঞ্চম খণ্ড : প্রবন্ধ-রচনা

বিষয় | পৃষ্ঠা

প্রথম খণ্ড

ব্যাকরণ

SYLLABUS

ক। ভূমিকা-প্রকরণ—বাংলা ভাষা—সাধু ও চলিত ভাষা।

খ। বর্ণ ও ধ্বনি-প্রকরণ—

(১) বর্ণের শ্রেণীবিভাগ ঃ বাংলা স্বর-ব্যঞ্জনের ও যুক্তাক্ষরের উচ্চারণবৈশিষ্ট্য একই বর্ণের বিভিন্ন ধ্বনি, বিভিন্ন বর্ণের একই ধ্বনি, ধ্বনি বিলোপ ইত্যাদি। (২) সন্ধি ঃ বাংলা ভাষার সন্ধির বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃত সন্ধির সঙ্গে পার্থক্য ঃ স্বর, ব্যঞ্জন ও বিসর্গ সন্ধির পূর্ণ আলোচনা। (৩) ণত্ব-বিধান ও ষত্ব-বিধান।

গ। পদ-প্রকরণ—(১) পদের প্রকারভেদ ঃ বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয়। (২) বিশেষ্যের শ্রেণীবিভাগ। (৩) লিঙ্গ ঃ স্ত্রী-প্রত্যয় (সংস্কৃত ও বাংলা), লিঙ্গ পরিবর্তন। (৪) বচন। (৫) পুরুষ। (৬) কারক ও তাহার বিভক্তি ঃ অনুসর্গ ঃ কারক বিভক্তি ও অন্য প্রকার বিভক্তি। (৭) বিশেষণের শ্রেণীবিভাগ ঃ সংখ্যা ও পূরণবাচক বিশেষণ। —বিশেষণের তারতম্য। (৮) ক্রিয়াপদ ঃ ধাতু ও প্রত্যয়—মৌলিক ধাতু, প্রয়োজক ধাতু, ধ্বন্যাত্মক ধাতু, নাম ধাতু, সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া, সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া, মৌলিক ক্রিয়া ও যৌগিক ক্রিয়া, ক্রিয়ার কাল, ক্রিয়ারূপ। (৯) অব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ ও বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ। (১০) সমাস ঃ (আলোচনায় একশেষ দ্বন্দ্ব, অবিগ্রহ সমাস, ও অস্বপদবিগ্রহ সমাস, প্রাদি সমাস, কু-তৎপুরুষ, সুপ্‌সুপা সমাস (বর্জনীয়)।

ঘ। শব্দ-প্রকরণ—(১) শব্দ ও পদের পার্থক্য। (২) বাংলা শব্দসম্ভার ঃ তৎসম ও তদ্ভব, অর্ধতৎসম, দেশী ও বিদেশী শব্দ ঃ ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও শব্দদ্বৈত। (৩) কৃৎ-প্রত্যয় ঃ—সংস্কৃত কৃৎ—তব্য, অনীয়, যৎ, শতৃ, শানচ্, ক্ত, ক্তি, ণক; তৃচ্। অন—বিবিধ বাচ্যে ঃ ইষ্ণু; ক্বিপ্; আলু ইত্যাদি প্রধান প্রধান প্রত্যয় ও অ-প্রত্যয় (অচ্, অণ্, অপ্, অস্, ক, কঙ্, খঙ্, খচ্, খল্, ঘশ্, ঘঞ্, ট, ড, শ, ইত্যাদি সংস্কৃত প্রত্যয়গুলির অ ছাড়া বাকি অংশ হইতে ইৎ যায়, অতএব বাংলায় শুধু অ-প্রত্যয় বলিলেই চলিবে)ঃ

বাংলা কৃৎ—অন, অন্ত, আ, আনো, না, আনি, ই; উ; তি; উয়া; ইয়া ইত্যাদি।

(৪) তদ্ধিত প্রত্যয় ঃ—সংস্কৃত—অ(ষ্ণ), ই(ষ্ণি), য(ষ্ণ্য), এয়(ষ্ণেয়), ঈ(ষ্ণীয়), ঈন, ইক, ইত, ইল, ইন্, বিন্, ঈয়স, ইষ্ঠ, তর, তম, ময়, মতুপ্, তন, তা, ত্ব, ইমন্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান প্রত্যয়।

বাংলা-তদ্ধিত--ই, ঈ, ইয়া, উয়া, আ, আই, আনি, আলো; আনা; পনা; আলি; গিরি; আরি (রী), দার, ইয়াল, ওয়ালা ইত্যাদি প্রধান প্রধান প্রত্যয়।

(৫) নির্দেশক - উহার বিপরীতার্থক প্রত্যয়।

(৬) উপসর্গ—অর্থ পরিবর্তন ও নূতন শব্দ গঠন (বিস্তারিত আলোচনা)।

ঙ। বাক্য-প্রকরণ—বাক্যের প্রকার ভেদ ঃ সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্য। বাক্যান্তরীকরণ—বিভিন্ন ধরনের বাক্য (অস্ত্যর্থক, নাস্ত্যর্থক, নির্দেশক, প্রশ্নবোধক ইত্যাদি) ও তাহাদের রূপান্তর সাধন।

বাচ্য ঃ বাচ্য পরিবর্তন।

শব্দ ও বাক্যাংশের বিশেষ অর্থে প্রয়োগ ঃ প্রবচনমূলক বাক্য ও বাগ্‌ধারা।

ভূমিকা

[১] ভাষা ও ব্যাকরণ

মানুষ বাগ্‌যন্ত্রদ্বারা উচ্চারিত ধ্বনির সাহায্যে তাহার হৃদয়ের ভাবকে প্রকাশ করে। এইরূপ এক বা একাধিক ধ্বনির সহায়তায় **শব্দ গঠিত হয়।** কোন বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত শব্দের দ্বারা গঠিত বাক্যের সমবায়ে **ভাষা সৃষ্ট হয়।**

ব্যাকরণের কাজ হইতেছে ভাষাকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার অশুদ্ধ রূপ হইতে শুদ্ধ রূপটিকে বাছিয়া বাহির করা ("সাধ্বসাধু-প্রবিভাগঃ")। বৈয়াকরণ ভাষাকে সৃষ্টি করেন না—ভাষার স্রষ্টা জনসমাজ। **ভাষার শুদ্ধতাবিচারে বৈয়াকরণকে নির্ভর করিতে হয় শিষ্ট-প্রয়োগের উপর।** শিক্ষিত এবং মার্জিতরুচি ব্যক্তিই শিষ্ট। শিষ্টগণের ভাষাপ্রয়োগ আদর্শ প্রয়োগ বলিয়া গৃহীত হয়। কিন্তু ভাষা পরিবর্তনের নিয়ামক হইতেছে বিশাল জনসমাজ। ভাষার উপর জনসমাজের অবাধ কর্তৃত্ব বিদ্যমান। তাই ভাষা **মানুষের জীবনে সতত ব্যবহারের ফলে নিয়ত পরিবর্তনশীল।**

ব্যাকরণও ভাষা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। জনসাধারণ তাহাদের দৈনন্দিন জীবনে যে ভাষা ব্যবহার করে—শিক্ষিত জনগণের ভাষা উহার নিকটবর্তী হইলেও উহা হইতে তাহা অনেক পরিমার্জিত। ভাষায় যখন সাহিত্য সৃষ্ট হইতে থাকে তখন তাহার রূপ হয় আরো পরিমার্জিত। এইরূপে **প্রত্যেক সম্পন্ন ভাষার দুইটি রূপ দেখা যায়**—একটি হইতেছে তাহার **সাহিত্যিক রূপ**, অপরটি **কথ্য রূপ।**

কালক্রমে আবার যখন কথ্য ভাষায় সাহিত্য রচিত হইতে থাকে, তখন **কথ্য ভাষাও পরিমার্জিত রূপ ধারণ করে। বাঙ্‌লা ভাষারও এইরূপ** দুইটি প্রকারভেদ সাহিত্যে ব্যবহৃত হইতেছে—একটি **সাধুভাষা**, অপরটি **চলিত ভাষা।**

[২] সাধুভাষা ও চলিত ভাষা

সাধারণ গদ্যে ব্যবহৃত বাঙ্‌লা ভাষাকে **সাধুভাষা বলা হয়।** রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্য রচনা বাঙ্‌লা সাধুভাষার নিদর্শন।

ভাগীরথীতীরের কলিকাতা অঞ্চলের **শিক্ষিত** জনগণের কথ্য ভাষায় **চলতি ভাষার (চলিত ভাষা)** রূপ দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ ও 'বীরবলে'র (প্রমথ চৌধুরী) অনবদ্য রচনায় ইহার অপরিমিত শক্তি উপলব্ধি করা যায়।

'**সাধুভাষা** সমগ্র বাঙ্‌লার সাধারণ সম্পত্তি—**ইহা কোন স্থানবিশেষ বা সমাজবিশেষে প্রচলিত উপভাষা নহে।** এই ভাষাকে অবলম্বন করিয়াই দেশের লেখাপড়ার কাজ চলিয়াছে। জনগণ সর্বত্র ইহার চর্চায় মনোনিবেশ করিয়াছে বলিয়া ইহার প্রয়োগ তেমন কষ্টসাধ্য নহে। **এই সাধুভাষা বহু পূর্বেকার পশ্চিমবঙ্গের কথ্য ভাষার আধারের উপর প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব-**বঙ্গের কথ্য ভাষার রূপের বৈশিষ্ট্যের ছাপও ইহার উপর পড়িয়াছে। **সাধুভাষায় পূর্ব-**বঙ্গের দ্বিতীয়া চতুর্থী বিভক্তির— **"রে"** অতীত **কালের ক্রিয়া বিভক্তি—'ইলাম' (সামান্য অতীতে)—ঘটমান কালে 'ইতেছে',—'ইতেছিল'** লক্ষণীয়। **'তৎসম' (সংস্কৃত)—শব্দের প্রয়োগের বাহুল্যে ইহার গাম্ভীর্য এবং আভিজাত্য সৃষ্ট হইয়াছে।।**

চলিত ভাষা কলিকাতা অঞ্চলের ভাগীরথীতীরবর্তী শিক্ষিত জনগণের মৌখিক ভাষার সাহিত্যিক রূপ। ইহা এই অঞ্চলের সাধারণ লোকের মৌখিক ভাষার অত্যন্ত নিকটবর্তী। প্রাদেশিক তদ্ভব শব্দের প্রয়োগ, অভিনব বাগ্‌ভঙ্গী, স্বচ্ছন্দগতিই ইহার জীবনশক্তির পরিচায়ক। এ ভাষাও শিক্ষাসাপেক্ষ—কারণ ইহার গঠনরীতি, উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য, শব্দ-প্রয়োগ বাঙ্‌লার সকল অঞ্চলের লোকের নিকট পরিজ্ঞাত নহে। সাহিত্যিক প্রয়োগে, কথোপকথনে সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ বর্জনীয়।

(১) সাধু ভাষা ও (২) চলিত ভাষার নিদর্শন

(১) 'দুই দিকে উচ্চ পর্বত শ্রেণী, বহুদূর প্রসারিত সেই পর্বতের পাদমূল হইতে উত্তুঙ্গ ভৃগুদেশ পর্যন্ত অগণ্য উন্নত বৃক্ষ নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে। শিখরতুষার নিঃসৃত জলধারা বঙ্কিমগতিতে নিম্নস্থ উপত্যকায় পতিত হইতেছে। সম্মুখে নন্দাদেবী ও ত্রিশূল এখন আর স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। মধ্যে ঘন কুজ্‌ঝটিকা; এই যবনিকা অতিক্রম করিলেই দৃষ্টি অবারিত হইবে। সাধুভাষা—"ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে" পৃঃ ৭৯—(আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু)।

(২) সে উত্তর করলে, 'হুজুর, জানতুম ছোকরাবয়সে। তার পর আজ বিশ-পঁচিশ বছর লাঠিও ধরি নি লকরিও ধরি নি, সড়কিও ধরি নি, তা ছাড়া আর একটা কথা আছে। এদের কাছে আমি ঠাকুরের সমুখে দিব্যি করেছি যে, আমি আর লাঠি-সড়কি ছোঁব না। সে কথা ভাঙি কি করে? হুজুরের হুকুম হলে আমি না বলতে পারিনে, তবে—হুজুর যদি আমার কথাটা শোনেন তবে হুজুর আমাকে আর এ আদেশ করবেন না।' চলিত ভাষা—("মন্ত্রশক্তি" পৃঃ ১১৪—প্রমথ চৌধুরী—'বীরবল')।

আলোচনা– প্রথম উদাহরণে (১) অধিকাংশ শব্দই তৎসম (সংস্কৃতের সমান—সংস্কৃত ও বাঙ্‌লাতে সমভাবে প্রযুক্ত হয়), (২) ক্রিয়াপদগুলির পূর্ণরূপ ইহাতে রহিয়াছে **'করিতেছে', 'হইতেছে', 'যাইতেছে' 'হইবে'**—(চলিত ভাষার যথাক্রমে—'করছে', 'হচ্ছে', 'যাচ্ছে, যাবে)।

(৩) অসমাপিকা ক্রিয়া ['করিলেই'] পূর্ণরূপে ব্যবহৃত।

দ্বিতীয় উদাহরণে (১) **তৎসম শব্দের সংখ্যা খুবই কম যথা—'উত্তর', 'পর—কথা', 'আদেশ'**। (২) সমাপিকা ক্রিয়াপদগুলির রূপ এখানে সংক্ষিপ্ত যথা—করলে (=করিল), **'করেছি'** (=করিয়াছি,), জানতুম (=জানিতাম), ছোঁব না (ছুঁইব না), করবেন (=করিবেন)।

(৩) **অসমাপিকা ক্রিয়াও** সংক্ষিপ্তরূপে ব্যবহৃত—কি **'করে'** (=**কি করিয়া**) 'হলে' (=হইলে) বলতে (=বলিতে)।

(৪) এখানে তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের অপেক্ষাকৃত অধিক প্রয়োগ হয়। হুকুম, হুজুর (ফারসী), কাছে (তদ্ভব), আজ (তদ্ভব), লাঠি (তদ্ভব), বছর (তদ্ভব), সমুখে (অর্ধতৎসম), ভাঙি (তদ্ভব) ইত্যাদি।

[৩] বাঙ্‌লা ব্যাকরণ

বাঙ্‌লা ব্যাকরণ–এই দুই ভাষারই ব্যাকরণ। **বাঙ্‌লা তৎসম শব্দের গঠন সংস্কৃত ব্যাকরণ-অনুসারে হয়, চলিত ভাষার শব্দ** সাধনের জন্য খাঁটি বাঙ্‌লা ব্যাকরণের নিজস্ব **রীতি অবলম্বন করিতে হয়।** বাঙ্‌লা ভাষা অবশ্য সংস্কৃত ভাষা নহে। বাঙ্‌লা ব্যাকরণও

সংস্কৃত ব্যাকরণ নহে। বাঙ্‌লা ব্যাকরণ চলিবে তাহার প্রয়োজনের অনুরূপ রীতিতে। প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার আলোচনায় আমরা যে মনীষার পরিচয় পাই তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের শব্দশাস্ত্রামোদী পাণ্ডিতগণকেও বিস্মিত করে। বাঙ্‌লা ব্যাকরণের আলোচনায় প্রাচীন ভারতীয় শাব্দিকগণের বহু যুগের গবেষণার ফল উপেক্ষণীয় বস্তু নহে। তাহাদ্বারা এ বিষয়ে পরম উপকার সাধিত হইবে।

বাঙ্‌লা আধুনিক ভাষা। আমরা ভারতের প্রাচীন শব্দশাস্ত্রে আধুনিক ভাষাবিচারের কোন পদ্ধতিলাভের আশা করিতে পারি না। তাই বাঙ্‌লাভাষাবিচারে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শাব্দিকগণের পদ্ধতির অনুসরণ প্রয়োজনীয়। তাহা না হইলে এ বিষয়ে আলোচনা অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

বাঙ্‌লা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন পর্তুগীজ পাদ্রি মনো-এল্‌-দা আস্‌সুম্প্‌সাম (১৭৩৪ খৃঃ)। এই পুস্তক রোমান অক্ষরে (লিসবননগরে) মুদ্রিত হয়। তারপর ইংরেজ পণ্ডিত হালহেড্‌ ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ইংরেজী ভাষায় বাঙ্‌লা ব্যাকরণ লেখেন (ইহা অবশ্য সাধু বাঙ্‌লা ভাষার ব্যাকরণ)। অতঃপর রাজা রামমোহন রায় ইংরেজী ভাষায় আধুনিক ধরনের ব্যাকরণ রচনা করেন (১৮২৬ খৃঃ)। ইহার বাংলা অনুবাদও হইয়াছিল।

রাজা রামমোহনেব পর নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ, আচার্য যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি, রামেন্দ্রসুন্দব ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতগণ বাঙ্‌লা ভাষার ব্যাকরণ লিখিযা মাতৃভাষা চর্চার পথ সুগম করিয়াছেন।

[৪] ব্যাকরণের কয়েকটি সংজ্ঞা

আগম—শব্দের কোন অংশের কোনরূপ লোপ সাধন না করিয়া বর্ণের (আগন্তুক) উপস্থিতির নাম **আগম (বর্ণাগম)**—যথা স্পর্ধা>আস্পর্ধা (এখানে শব্দের আদিতে একটি অতিরিক্ত আ-কার আসিয়াছে—ইহাকে আগম বলে) ইস্কুল, অকুমারী [অর্থ কুমারী]।

'হংস' শব্দ 'হস্‌' ধাতু হইতে আসিয়াছে, ইহাতে অনুনাসিক 'ং' আগম হইয়াছে।

'কৃত্য'—কৃ+য (ক্যপ্‌ প্রত্যয়)—এখানে ধাতুর ঋকারের পরে একটি অতিরিক্ত 'ত্‌' (কৃ ত্‌ য) আসিয়াছে।

ইৎ—ব্যাকরণে ব্যবহৃত কতকগুলি সাংকেতিক বর্ণকে **'ইৎ'** বলে। এই সাংকেতিক বর্ণগুলি কোন কোনও সময়ে শুধু উচ্চারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ইহারা ব্যাকরণের বিশেষ বিশেষ কার্য সূচিত করে। যেমন—ব্যঞ্জন বর্ণমালায় **ক খ গ ঘ** প্রভৃতি বর্ণের অন্তে—'অ'-কার যোগ করা আছে। প্রকৃতপক্ষে ব্যাকরণের কার্যের জন্য **'ক'** বলিলে "ক্‌"-কে বুঝিতে হইবে। অন্ত্য 'অ'-কার উচ্চারণের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা **'ইৎ'** বর্ণ, ইহার লোপ হইবে।

[স্বরবর্ণ বর্গের তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চমবর্ণ কিংবা য র ল ব হ পরে থাকিলে পদের অন্তেস্থিত **বর্গের প্রথম** বর্ণস্থানে তৃতীয় বর্ণ হয় (সন্ধিসূত্র)—এখানে প্রথম বর্ণ **ক চ ট ত প নহে—প্রথম বর্ণ** হইতেছে ক্‌ চ্‌ ট্‌ ত্‌ প্‌। সুতরাং সন্ধিতে **বাক্‌+ঈশ= বাগীশ (বাক+ঈশ নহে)।**

√পচ্‌+ঘঞ্‌ (ভাববাচ্যে)=পাক, **'ঘঞ্‌'** প্রত্যয়ের **ঘ্‌** এবং **ঞ্‌** দুইটি **ইৎবর্ণ**। প্রত্যয়টির

শব্দে 'অ'-কার থাকিবে, ঘ্ ও ঞ্ লোপ পাইবে। ঘ-কারের প্রয়োজন—'চ'কার ও 'জ'কার স্থানে ক্ এবং গ্ হইবার সূচনা দেওয়া। সুতরাং পচ্ ধাতুর চ্ স্থানে 'ক্' হইল। ঞ্ 'ইত্'—বর্ণের প্রয়োজন ধাতুর অন্ত্যস্বর এবং উপধা অকারের বৃদ্ধি হইবে—সুতরাং পচ্ ধাতুর অ স্থানে 'আ'=পাক]

[৫] বাঙ্‌লা শব্দসম্ভার

বাঙ্‌লা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দসমূহকে প্রধানতঃ চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে:—(১) তৎসম, (২) তদ্ভব, (৩) দেশী, (৪) বিদেশী।

(১) তৎসম শব্দ:—সংস্কৃত ভাষার যে সকল শব্দ অপরিবর্তিতরূপে বাঙ্‌লা ভাষায় ব্যবহৃত হয় তাহাদিগকে **তৎসম** শব্দ বলে। তৎসম শব্দের অবান্তর ভেদ হইতেছে অর্ধতৎসম। বাঙ্‌লায় ব্যবহৃত প্রায় অর্ধেক শব্দ তৎসম শব্দ:—হস্ত, পদ, গাত্র, কর্ণ, চক্ষু, বক্ষ মস্তক, আকাশ, বায়ু, জল, অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, নদী, কূপ, পুষ্করিণী, অন্ন, বস্ত্র, শয়ন, ভোজন, দর্শন, গমন, শিক্ষা, দীক্ষা, মন্ত্রী, পূজা, অর্চনা, সেবা, দৈবাৎ, অগত্যা, শ্রীচরণেষু, তথাস্তু, তৎক্ষণাৎ ইত্যাদি।

অর্ধতৎসম (ভগ্নতৎসম):—যে সকল **সংস্কৃত শব্দ বাঙ্‌লা ভাষায় উচ্চারণে সামান্য বিকৃত** (পরিবর্তিত) হয় তাহাদিগকে **অর্ধতৎসম** শব্দ বলে:—গিন্নী (গৃহিণী), ছেরাদ্দ (শ্রাদ্ধ), কেষ্ট (কৃষ্ণ), বিষ্টু (বিষ্ণু), পুত্তুর (পুত্র রাজ-পুত্তুর), রতন (রত্ন), মুকতি (কবিতায়), ভকতি (কবিতায়), শকতি (কবিতায়), বিয়াকুল (কবিতায়-গদ্যে ব্যাকুল), ছুরিত্তির (শ্রোত্রিয়), মিত্তির (মিত্র), মহেন্দির (মহেন্দ্র), মোচ্ছব (মহোৎসব), কুচ্ছিত (কুৎসিত), ঘেন্না (ঘৃণা), বদ্দি (বৈদ্য), পথ্যি (পথ্য), পুরুত (পুরোহিত) মন্তর তন্তর (মন্ত্রতন্ত্র—"মন্ত্রশক্তি" -বীরবল), ছুঁচি-(বাই), কইন্যা কইনো (=কন্যা), আবাগী (অভাগিনী) সুমুখে (=সম্মুখে)—["অভাগীর স্বর্গ"], চন্নামেত্তো=চরণামৃত, আদিখ্যেতা, নেমতন্ন, গেরস্ত, নিশ্চিন্দি, ব্যাঙ্গমা, কোবরেজ (কবিরাজ), পেবথম (প্রথম) পিরিতি (প্রীতি), উচ্ছুগ্গো (=উৎসর্গ), সোয়াস্তি, সোয়াদ, সোয়ামি।

(২) তদ্ভব শব্দ:—প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার (বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতভাষা বা বৈদিক যুগের কথ্য ভাষা) বিকারজাত প্রাকৃত (এবং পালি) ও অপভ্রংশের মধ্য দিয়া নানা প্রকারে পরিবর্তিত হইয়া যে সকল শব্দ **খাঁটি বাঙ্‌লা ভাষায় পরিণত হইয়াছে** তাহাদিগকে **তদ্ভব শব্দ** বলে। এই সকল শব্দকে (তদ্ভব) **প্রাকৃতজ** শব্দও বলা হয়। কারণ এই প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন শব্দগুলি বাঙ্‌লা শব্দে পরিণত হইয়াছে। ইহারাই খাঁটি বাঙ্‌লা শব্দ।

এই শব্দগুলির সংখ্যা বাঙ্‌লায় সবচেয়ে বেশি:—হাত (সংস্কৃত হস্ত), পা, পাখি, আঁখি, মা, ভাত, মুঠা, মাছ, দৈ, নুন, তেল, জেলে, ঘর, মাঝ (মধ্যে), বাঁশ, দিঘি, বাত, বাঘ; হাঁস, মাটি, শুক (তারা), চাঁদ, দেউল (দেবকুল), আধ (অর্ধ), সাঁঝ, গাঁট, পাঁক, সাঁতার, দেউঁরি, কোঠা, পাঁথা, ঠাঁই, পরখ, গাঁট, পড়া, বাজ, ভিখারী, সোজা কামার, কুমার (কুম্ভকার), চাঁদোয়া, কাঁথা, ছাউনি, বিজলী, ভাই, বোন, ঝি, জামাই, বিয়া, বামুন, মিঠা, সোনা।

দেশী শব্দ:—এই সকল শব্দ আর্যজাতি ভারতে আসিবার পূর্বে এখানকার অনার্য

জনগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই শব্দগুলি অল্পমাত্রায় সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশ করিয়াছিল। আধুনিক ভারতীয় ভাষায় ইহাদের বহুল প্রয়োগ আছে। এই শব্দগুলি অব্যুৎপন্ন শব্দ (ইহাদের প্রকৃতি প্রত্যয় নির্দেশ করা চলে না) :—মীন, ঘোটক, তাম্বুল, চাঙ্গা, ঢেঁকি, ঢোল, ঢেউ, ঝিঙ্গা, ঝোল, ঘোমটা, পেট, আড্ডা, ডাব, নিঝুম, ডিঙা, ডিঙি, ছোকা, ডাঙ্গা, ডোবা (ক্ষুদ্র জলাশয়), ঝাড়া, বোঝাই, সড়কি, বৈচি (বঁইচি), আমানি ('ফুল্লরার বারমাস্যা'), ঢিঁব ('ফরিয়াদ'), 'গোলা' (ধান্যাদি রাখিবার মরাই—কিন্তু (কামানের 'গোলা' (সংস্কৃতমূলক) ('ফরিয়াদ') ছাঁচ (শুভ উৎসব—বলেন্দ্রনাথ), বঁটি, খোকা, খুকি, কামড়।

বিদেশী শব্দ :—ভারতবর্ষের সহিত অন্য দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের জন্য বহু বিদেশী শব্দ ভারতীয় ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। বাঙ্‌লা ভাষায় আরবী, ফারসী, ওলন্দাজ, ফরাসী, পোর্তুগীজ, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষার বহু শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে।

গ্রীক শব্দ :—দাম, কোণ সুড়ঙ্গ।

আরবী—হুকা, কেতাব, খাসা, সৌখিন (সৌখীন), দফা, কাগজ (চীন কায়গদ্ হইতে), কায়দা, দাবি, বহব মেরামত, ফলাও সহি, সপিনা, কৈফিয়ত, তালেবর খোলসা, হিম্মৎ, ইমারত, মজদুর, তলব, মজুরি।

ফারসী—আবাদ বাগান, দরিয়া কিনারা (কেনারা), মোজা, মুচি, বস্তা খুশী, কলম, বেশি, অছিলা (ছল, ছুতা) খুন, খাস্তা, জমিদারি, ফরমাইস, নকলনবীশ, কলম, ফরিয়াদ, বেহায়া, শরিক বেশি, আওয়াজ, বেয়াদবি, তোতা, সিন্দুক, বালাখানা, খরচ, শিরোপা।

পোর্তুগীজ—তামাক, আনারস, পীপা, বালতি, কামরা, কেরানী, জানালা, মিস্ত্রি, সাবান, সায়া, বোতাম, নিলাম, তোয়ালে, পেঁপে, সাবু, পাঁউরুটি, গীর্জা, বারান্দা, আলমারি, বেহালা, চাবি, গামলা, পেরেক।

ফরাসী—কুপন, কার্তুজ, কাফে, দিনেমার।

ইংরেজী—আপিস, লাট, হাসপাতাল, সান্ত্রী, সেমিজ, গেলাস, টেবিল, চেয়ার, স্কুল, কলেজ, রেল, স্টীমার, মোটর, থিয়েটার, জেল, নিব, শার্ট, লণ্ঠন, নম্বর, মাষ্টার, পাস, ফেল, বক্স, পুলিশ, সিল্ক, কলেবা, ট্রাম, টেলিগ্রাফ, মাইল, মিনিট, লিষ্টি, গিনি, আপিল, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, লাইব্রেরী, ববাব, হেডমাষ্টাব, টব, ব্যাগ, পাউডার, ডজন।

তুর্কি—বারুদ, বেগম, বোচকা, বাবুর্চি, কাবু, কোর্মা, বাহাদুর, বিবি, লাশ, উর্দু।

অনুশীলনী

১। সাধু ও চলিত ভাষার প্রভেদ দেখাও।

২। 'তদ্ভব' 'তৎসম' ও 'অর্ধতৎসম' 'ভগ্নতৎসম' (উঃ মাধ্য ১৯৬০) দেশী শব্দ (১৯৬৩) কাহাকে বলে? উদাহরণসহ পরিস্ফুট কর।

৩। বাঙ্‌লা ভাষার বিভিন্ন উপাদানগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে তৎসমশব্দগুলির পরিবর্তে তদ্ভব বা দেশী বা বিদেশী শব্দ লিখ, আর তদ্ভব, দেশী বা বিদেশী শব্দের পরিবর্তে তৎসম শব্দ লিখ :—

নম্বর, মাষ্টার, পাস, সিল্ক, হাসপাতাল, গামলা, কলম, কেতাব, ডোবা, ডিঙি, ভিখারী, পাখা, মাটি, বাজ, শ্রবণ, হরণ, সোজা, মিঠা, দন্ধ, ফরিয়াদ, ঢিবি, কৃশানু, শৈথিল্য, শ্রম,

অনুগ্রহ, আহার্য, বাঘছাল, গোঁয়ার, তলব, খোঁচা, তোতা, মেরামত, খবরদাবি, গীর্জা, জানালা, কামরা, আবাদ, গামছা, কার্য, নিকুঞ্জ, প্রসূন, প্রান্তর।

৫। নিম্নলিখিত শব্দগুলির শ্রেণী নির্দেশ করঃ—মুকুতা, কেষ্ট, জীবন, গামলা, মণ্ড, সাস্ত্রী, হিম্মৎ, তুফান, নির্ঘোষ, নীল, ঠাঁই, হাত, কাজ, বেয়াকুব, বাঘ, রোগা, গেলাস, লাট, ঝোল, ঝিঙগা, কুচ্ছিত।

৬। প্রাকৃতজ শব্দ কাহাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

৭। উদাহরণসহ তৎসম ও তদ্ভব শব্দের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও। (১৯৬০—কম)

প্রথম পর্ব

বর্ণ ও ধ্বনি প্রকরণ

প্রথম অধ্যায়

বর্ণ

মানুষের ভাষায কতকগুলি সার্থক শব্দ থাকে—ভাষায় নিরর্থক শব্দের কোন স্থান নাই। শব্দেব উচ্চারণদ্বাবাই মনুষ্য সমাজ প্রধানতঃ পরস্পরের মধ্যে ভাবেব আদান-প্রদান করিয়া থাকে।

শব্দ উচ্চারিত হইলেই ধ্বনিরূপে তাহার প্রকাশ হয়। এক-একটি শব্দে এক বা একাধিক ধ্বনি থাকিতে পাবে আমি' শব্দে 'আ-ম্-ই'—এই তিনটি ধ্বনি আছে। সুতরাং ধ্বনি হইতেছে শব্দের অবয়ব বা অংশবিশেষ। 'এ তুফান ভারি' (নজরুল)—একটিমাত্র ধ্বনিতে গঠিত শব্দ ('এ') 'তুফান' শব্দে (ত্-উ-ফ্+আ+ন্) পাঁচটি ধ্বনি। ধ্বনিকে কতকগুলি সাংকেতিক চিহ্নদ্বারা প্রকাশ করা যায়। এই সকল সাংকেতিক চিহ্নকে বর্ণ (letter) বলা হয়।

'ক' বলিলে যে ধ্বনি শোনা যায় তাহার প্রতীক হইতেছে 'ক'—এই বর্ণ। **ধ্বনি লোকের মুখে মুখে চলে আর লেখায় বর্ণ ব্যবহার করিতে হয়।** ব্যাকরণশাস্ত্রে বর্ণ বুঝাইতে—'কার' প্রত্যয়েব ব্যবহার হয়। 'ক'-কার বলিলে ক-বর্ণকে বুঝায় [কার শব্দের অর্থ 'কবা'—'উচ্চারণ' করা] অ-কাব হইতে 'হ' পর্যন্ত বর্ণরাশিকে **বর্ণমালা** (alphabet) বলা হয। বর্ণমালাকে **'লিপি'**ও বলা হইযা থাকে।

[অশোক রাজার সময়কার 'ব্রাহ্মী' লিপি হইতে ক্রমবিকাশের ফলে বর্তমান বঙ্গলিপির উৎপত্তি হইয়াছে। বঙ্গলিপি সংস্কৃত ভাষার লিপিকে প্রধানতঃ গ্রহণ করিয়াছে। সংস্কৃত লিপি সংস্কৃত ভাষার সকল ধ্বনির প্রতীক হইলেও বাঙ্‌লা ভাষার সর্বপ্রকার ধ্বনির ইহা প্রকাশক নহে। যেমন 'এ' বর্ণ ইহার উচ্চারণ সংস্কৃত ভাষায় কেবল একটি নির্দিষ্ট 'এ' ধ্বনির জ্ঞাপক, কিন্তু বাঙ্‌লায় ইহা দুইটি ধ্বনির জ্ঞাপক যথা—(১) 'এ' ভেদ, ভেক, (২) এ্যা এক (এ্যাক)]

[১] বর্ণের শ্রেণীবিভাগ

স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ

সমগ্র বর্ণমালা স্বর ও ব্যঞ্জন ভেদে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত।

যে ধ্বনি অপর ধ্বনির সাহায্য ব্যতিরেকে নিজে পূর্ণরূপে উচ্চারিত হয় তাহাকে

স্বরধ্বনি বলে। স্বরধ্বনির প্রতীক চিহ্নকে **স্বরবর্ণ** বলা হয় [স্বর কথার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ স্ব (স্বয়ং)+রাজ্ (রাজতে শোভা পায়)+ড (প্রত্যয়)]। বর্ণের আর এক নাম **'অক্ষর'**।

যে ধ্বনি অপর ধ্বনির সাহায্য ব্যতিরেকে পূর্ণরূপে **উচ্চারিত হইতে পারে না** তাহাকে **ব্যঞ্জন** ধ্বনি বলে। **ব্যঞ্জন** ধ্বনির প্রতীক বা চিহ্নকে **ব্যঞ্জনবর্ণ** বলা হয়। স্বরবর্ণের সাহায্যে ব্যঞ্জন বর্ণ উচ্চারিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করে—যেমন (ক-সর্বস্ব-ক্) 'অ'কারের (অন্তে অবস্থিত) সাহায্য ছাড়া স্পষ্ট উচ্চারিত হয় না, [এই দিক দিয়া বিচার করিলে ব্যঞ্জন হইতেছে দুর্বল বর্ণ। স্বর হইতেছে তাহার শক্তি]

[**টিপ্পনী** ঃ—অ, আ, ই—প্রভৃতি স্বরধ্বনির উচ্চারণকালে **নিশ্বাস বায়ু** মুখের অভ্যন্তরে **কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় না**। আর ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণকালে শ্বাসবায়ু পূর্ণ বা **আংশিক বাধা-প্রাপ্ত** হইয়া পরে প্রকাশ লাভ করে। ইহাই স্বর-ব্যঞ্জনের মূলতঃ প্রভেদের কারণ]

[২] অক্ষর

বর্ণের অপর নাম অক্ষর—ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। অক্ষর শব্দের আরো একটি অর্থ আছে। **কোন শব্দের উচ্চারণের সময় উহার যতটা অংশ একসঙ্গে উচ্চারণ করা যায়** ততটা অংশকে **অক্ষর** (syllable) বলে।

'মতি'—ইহাতে দুইটি অক্ষর আছে ম-তি। 'সন্তান' ইহাতেও দুইটি অক্ষর আছে—সন-তান্। (বাঙ্‌লা উচ্চারণের রীতিতে) ব্যঞ্জন ধ্বনির সহিত যুক্ত না হইয়াও একটি স্বরধ্বনিতে একটি অক্ষর হইতে পারে। এ, ও প্রভৃতি স্বরধ্বনিগুলি ইহার উদাহরণ। "এ-কথা জানিতে তুমি ভারত ঈশ্বর সাজাহান", এখানে 'এ' শব্দটি একাক্ষর।

[৩] স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত (হলন্ত) অক্ষর

অক্ষর দুইপ্রকার—**স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত। যে অক্ষরের শেষে** ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে তাহাকে ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর বলে। যথাঃ—**ভাত, হাত, চাল, কাল।** 'ভাত' শব্দের অন্ত্য **'অ'**কার উচ্চারিত হয় না (ভাত=ভাত্) সুতরাং 'ভা' ব্যঞ্জনান্ত (হলন্ত) অক্ষর (closed) যে **অক্ষরের** অন্তে স্বরবর্ণ উচ্চারিত হয় তাহাকে স্বরান্ত অক্ষর বলে যথাঃ—'ভাতা', 'হাতা', 'চালা', 'কালা'—'ভাতা' শব্দের 'তা'-এর অন্ত্য আকার উচ্চারিত হয়, সুতরাং ইহা স্বরান্ত **অক্ষর** (open syllable)।

[৪] বাঙ্‌লা বর্ণমালা

স্বরবর্ণ—(সংস্কৃত বর্ণমালা অনুসারে) বাঙ্‌লাতে গৃহীত—**অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ এ ঐ ও ঔ।**

হ্রস্বস্বর ঃ—অ ই উ ঋ ঌ—এই পাঁচটিকে হ্রস্বস্বর বলা হয়। আ, ঈ, ঊ, ৠ—ইত্যাদিকে **দীর্ঘস্বর** বলা হয়। হ্রস্বস্বর উচ্চারণ করিতে যতটা সময় লাগে, দীর্ঘস্বরের উচ্চারণে তাহার দ্বিগুণ সময় লাগে। [কিন্তু বাঙ্‌লার স্বাভাবিক উচ্চারণে এ নিয়ম খাটে না। যথাস্থানে ইহা আলোচিত হইবে]

ব্যঞ্জনবর্ণ **ঃ—ক খ গ ঘ ঙ,** (ক'বর্গ), **চ ছ জ ঝ ঞ** (চ'বর্গ), **ট ঠ ড ঢ ণ** (ট'বর্গ), **ত থ দ ধ ন** (ত'বর্গ), **প ফ ব ভ ম** (প'বর্গ), **য র ল ব, শ ষ স হ,** [ড় ঢ়, ং ঃ ँ চন্দ্রবিন্দু]

[৫] স্বরবর্ণের শ্রেণীবিভাগ

বাঙ্‌লা বর্ণমালায় গৃহীত তেরটি স্বরধ্বনির কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। সাধু ও চলিত বাঙ্‌লা উচ্চারণে—ভাগীরথী তীরের (কলিকাতা অঞ্চলের) শিষ্ট ভাষায় মাত্র সাতটি মূল স্বরধ্বনি লক্ষিত হয়। এই ধ্বনিগুলিকে আর বিশ্লেষণ করা চলে না—এই জন্য ইহারা (অ, আ, ই, উ, এ, অ্যা ও) মৌলিক স্বরধ্বনি।

এই মূল ধ্বনিগুলির সহিত অন্য স্বরধ্বনি মিলিত হইয়া সন্ধ্যক্ষর সৃষ্ট হয় এবং অন্য স্বর যোগেও মিশ্র বা যৌগিক স্বরের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

যথা ঐ=(ওই) ঔ=(ওউ)। চলিত ভাষায় ২৫টি যৌগিক (মিশ্র) স্বরধ্বনি আছে যথা ঃ—ইও ইয়ে, কেয়া, খেয়া, কেউ, এও=(যেও) ইত্যাদি।

উচ্চারণের স্থান অনুসারে (সংস্কৃত ব্যাকরণের মতে) স্বরবর্ণ সাত ভাগে বিভক্ত ঃ—কণ্ঠ্য, তালব্য, মূর্ধন্য, দন্ত্য, ওষ্ঠ্য, কণ্ঠতালব্য এবং কণ্ঠৌষ্ঠ্য।

কণ্ঠস্বর—অ, আ, তালব্য—ই, ঈ, মূর্ধন্য—ঋ, ৠ, দন্ত্য—ঌ, ওষ্ঠ্য—উ, ঊ, কণ্ঠতালব্য—এ, ঐ, কণ্ঠৌষ্ঠ্য—ও, ঔ।

[৬] জিহ্বার অবস্থান অনুসারে স্বরধ্বনি বিভাগ

জিহ্বার অবস্থান অনুসারে স্বরধ্বনিকে (ক) সম্মুখস্বর (খ) পশ্চাৎস্বররূপে দুইভাগে বিভক্ত করা হয় ঃ—(ক) ই এ অ্যা—এই তিনস্বরের উচ্চারণে জিহ্বা দাঁতের দিকে বিস্তারিত হয়—এইজন্য ইহারা সম্মুখস্বর। এই শ্রেণীতে একরকমের 'আ' ধ্বনি পড়ে। (খ) আ অ ও উ—এই কয়টিস্বরের উচ্চারণে জিহ্বা পশ্চাদ্‌ভাগে আকৃষ্ট হয় বলিয়া ইহারা পশ্চাৎস্বর।

[৭] অনুনাসিক ও নিরনুনাসিক স্বর

সাধারণ উচ্চারণ স্থানের সহিত নাসিকার সাহায্যে উচ্চার্যমাণ স্বরধ্বনিকে অনুনাসিক স্বরধ্বনি বলে। ঁ চিহ্নদ্বারা অনুনাসিক স্বর জ্ঞাপিত হইয়া থাকে, যথা ঃ—আঁ, হাঁ, হাঁস কাঁদা, পাঁক, বাঁশ, আঁখি, ফাঁদ, চাঁদ ইত্যাদি। নাসিক্য ধ্বনি ছাড়া শুদ্ধ উচ্চারিত হইলে স্বরবর্ণকে নিরনুনাসিক স্বর বলে। যেমন হাস, কাদা, পাক ইত্যাদি [নিরনুনাসিক হাস=হাসি, কাদা=কর্দম পাক বন্ধন করা]

[৮] মাত্রা

একটি হ্রস্ব স্বর উচ্চারণ করিতে যতটা সময় লাগে দীর্ঘস্বরে তাহার দ্বিগুণ সময় লাগে। হ্রস্ব স্বরের উচ্চারণের কালকে একমাত্রা বলা হয়। দীর্ঘস্বর দ্বি-মাত্রাবিশিষ্ট। যথা ঃ—'কি' এবং 'কী'—'কি' শব্দের 'ই'কার হ্রস্ব অর্থাৎ একমাত্রা বিশিষ্ট—'কী' শব্দে 'ঈ'কার দ্বি-মাত্রা বিশিষ্ট।

হ্রস্বস্বরের উচ্চারণের তিনগুণ সময় যেখানে লাগে সেখানে প্লুতস্বর হয়। প্লুতস্বরে তিনমাত্রা থাকে। দূর হইতে ডাকা, গান ও কান্নাতে প্লুত স্বরের ব্যবহার হয়। "ওরেরে আয় লয়ে তামাকু পান" (গানভঙ্গ—রবীন্দ্রনাথ) "দুর্গমগিরি, দুস্তর পারাবার, হে" (নজরুল ইসলাম)।

[৯] প্রস্বর (Stress Accent) [বল, শ্বাসাঘাত, স্বরাঘাত]

কোন ভাষায় উচ্চারণকালে কোন পদের বিশেষ অক্ষরের নিশ্বাসবায়ু অধিকতর বেগে প্রবাহিত হয়। ইহার ফলে সেই অক্ষরটির উপর প্রাধান্য আরোপিত হয়। এইরূপ উচ্চারণ প্রাধান্যের নাম **প্রস্বর।**

যাও, যাও। প্রথম 'যাও' পদে 'আও' এর উপর কোন ঝোঁক দেওয়া হয় না—কিন্তু, পরের আও পদে উহা দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় 'যাও'—পদে অর্থের বৈশিষ্ট্য সূচিত হইতেছে—যাও অবশ্যই যাইতে হইবে।

অনুশীলনী

(১) স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের পার্থক্য দেখাও। (২) যৌগিক স্বরধ্বনি কাহাকে বলে ? উদাহরণ দাও। (৩) অনুনাসিক স্বরধ্বনি কাহাকে বলে ?

দ্বিতীয় অধ্যায়

উচ্চারণ তত্ত্ব

[১] স্বরবর্ণের উচ্চারণ

অ - বাঙলায় অকারের দুইরকম উচ্চারণ আছেঃ—(১) সাধারণ বা স্বাভাবিক (২) বিকৃত বা 'ও'-কারের মতো উচ্চারণ।

(১) কথা বলা, চলা, করা, মরা প্রভৃতি শব্দের আদ্য অকারে অ বর্ণের সাধারণ উচ্চারণ পাওয়া যায়।

(২) (ক) শব্দের আদিভূত 'অ'-কারের পরে যদি 'ই', উ, য-ফলা অথবা জ্ঞ, ক্ষ থাকে, তবে অকার 'ও'-কারের মতো উচ্চারিত হয়। হরি (হোরি), করি (কোরি), বলি (বোলি), পশু (পোশু), বসু (বোসু), মণি (মোণি), ফণি (ফোণি), সত্য (সোত্তো), বক্ষ (বোক্খো), পক্ষ (পোক্খো), করুক (কোরুক), যজ্ঞ (জোগ্গোঁ), লক্ষণ (লোক্খন), (খ) **শব্দের আদিতে অবস্থিত নিষেধার্থক** অকারের উচ্চারণ 'ও'-কারের মতো হয় না—যথা অনাবিল, অমৃত, অনিত্য, অনুচিত অবন্ধু অমিত্র ইত্যাদি। (গ) **ব্যক্তির নাম বাচক শব্দের আদিতে** নিষেধার্থক অকারের উচ্চারণ 'ও কারের মতো হয়—**অক্ষয়** (ওক্খয়) বাবুর **অক্ষয়** (অক্খয়) স্বর্গলাভ হইয়াছে। অবিনাশ (ওবিনাশ) বাবুর কীর্তি অবিনাশ (=অ বিনাশ) হইয়া থাকুক।

(ঘ) কয়েকটি নকারান্ত বা ণকারান্ত শব্দের আদ্য 'অকার'—ওকারের মতো উচ্চারিত হয়—ধন, জন, মন (মোন) বন (বোন), পণ (পোন—সংখ্যার্থক)। কিন্তু 'রণ', 'গণ', শব্দের বেলায় অকারের উচ্চারণ স্বাভাবিক। "জনগণমন অধিনায়ক" (উচ্চারণ লক্ষ্য কর)।

অন্ত্য অকারের উচ্চারণ—(১)অন্ত্য 'অ'কার কোথাও অনুচ্চারিত (২) কোন স্থানে উচ্চারিত (৩) কোন স্থানে বা 'ও'কারের মতো উচ্চারিত হয়।

(১) অনুচ্চারিত অন্ত্য অকার [ধ্বনি বিলোপ]

(ক) আধুনিক বাঙলা ভাষায় শব্দের অন্তে 'অ'-কার ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত থাকিলেও অনেক স্থলে উচ্চারিত হয় না। যথা—হাত (হাত্), কাল (কাল্), দাঁত (দাঁত্), তিলক, রাম (রাম্), আম (আম্), জন্ম, কাঁঠাল, ভাল্লুক, চন্দন, জল, ফল, বল ইত্যাদি।

(খ)-ত এবং -ইত প্রত্যয়ান্ত শব্দ বিশেষ্যরূপে প্রযুক্ত হইলে অন্ত্য অকারের উচ্চারণ হয় না—যথা গীত (গীত=গান 'গাইতাম গীত (=গীত্) শুনি কোকিলের ধ্বনি' (মাইকেল) মত (=মত্), বিহিত্ (=বিধান), পালিত (=পালিত্ পদবিবিশেষ), পণ্ডিত্ (বিশেষ্য ও বিশেষণ)।

(গ) -তর, -তম প্রত্যয়ান্ত কয়েকটি শব্দের অন্ত্য অকার উচ্চারিত হয় নাঃ—

উত্তম (=উত্তম্), উত্তর (উত্তর্), প্রিয়তম (হে প্রিয়তম্), ব্যাকুলতর (ব্যাকুলতর্)।

(ঘ) তৎসম বহু শব্দের অন্ত্য অকার উচ্চারিত হয় না ঃ—শয়ন, ভোজন, গমন, অসুর, সুর, মস্তক, পুস্তক ইত্যাদি।

অন্ত্য অকারের উচ্চারণ (তৎসম পদে)

(ক) অন্ত্য অক্ষর সংযুক্ত বর্ণ হইলে 'অ'-কার উচ্চারিত হয়ঃ—বক্ত, মূর্খ, ভক্ত, চন্দ্র, মন্দ্র, নম্র, কম্র ইত্যাদি। (খ) ই কার ও এ কারের পর য় থাকিলে অ কারের উচ্চারণ হয়ঃ—প্রিয়, শ্রেয়ঃ, প্রেয়, পেয়। (গ) -ত এবং -ত প্রত্যয়ান্ত শব্দ বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইলে অন্ত্য 'অ'-কার উচ্চারিত হয়ঃ—দণ্ডিত, খণ্ডিত, পুলকিত, কুসুমিত, বিকশিত, অনুদিত, চকিত, মূঢ়, দৃঢ়।

আ (ক) সংস্কৃত ভাষায় আ'-কার দীর্ঘ হইলেও বাঙ্‌লায় হ্রস্ব, দীর্ঘ—দুই রকমে উচ্চারিত হয়। ব্যঞ্জনান্ত 'আ'কার দীর্ঘ যথা—ভাত (ভাত্), হাত (হাত্), পাত (পাত্), কিন্তু স্বরান্ত আ-কার হ্রস্ব—যথা পাতা, কাটা, মালা, বালা, হাতা, কাঁসি, মাসি ইত্যাদি। (খ) আর এক রকমের আ-কার আছে যাহার উচ্চারণ অনেকটা ই-কার যোগে যেরূপ হয়—আজ, কাল ইত্যাদি।

ই ঈ—বাঙ্‌লায় ইহারা হ্রস্বরূপে উচ্চারিত হয়—নীরার, নিবার [উচ্চারণে কোন ভেদ নাই] হীরক, হিরণ্য [কিন্তু হলন্ত (ব্যঞ্জনান্ত) শব্দের পূর্বে থাকিলে উভয়েরই দীর্ঘ উচ্চারণ হয়—যেমন নীপ (নীপ্), দীপ (প্)। বিটপ (হ্রস্ব) কিন্তু বিট্ (দীর্ঘ)

উ ঊ—উচ্চারণ একই প্রকার। ব্যঞ্জনান্ত হইলে উভয়েই দীর্ঘ হয়—রূপা (হ্রস্ব) রূপ্ (দীর্ঘ)।

ঋ ৠ—বাঙ্‌লায় ইহাদের উচ্চারণ 'রি'। তৎসম শব্দ লিখিতে ইহাদের ব্যবহার হয়ঃ—ঋণ, কৃপণ, পিতৃ, মাতৃ, ঋষি, মসৃণ ইত্যাদি।

ঌ—বাঙ্‌লায় এই ধ্বনি নাই [সংস্কৃত ভাষায় 'কৢপ্ত' শব্দে আছে]

সন্ধ্যক্ষর—এ—বাঙ্‌লায় ইহার দুই প্রকার উচ্চারণ হয়ঃ—(১) সাধারণ, (২) বিকৃত উচ্চারণ। (১) মেষ, বেশ, কেশ, দেশ, বিশেষ প্রভৃতি শব্দে প্রকৃত উচ্চারণ রক্ষিত হইয়াছে। (২) বিকৃত উচ্চারণ 'অ্যা'—এক, [অ্যা—কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় এক (eka) গেল, ফেল, ('গেল কাল ফেল জাল'), দেখ (দ্যাখ্, দ্যাখো), খেট (খ্যাট) [ভোজন পরিহাসে] [সংস্কৃত ভাষায় 'এ'কার সন্ধ্যক্ষর (dipthong) এ=অ+ই দ্রুত উচ্চারণে একার হয়]

ঐ—বাঙ্‌লা উচ্চারণ 'ওই' [সংস্কৃত উচ্চারণ 'আই, আ+ই দ্রুত উচ্চারণে ঐকার হয়] ইহাও সন্ধ্যক্ষর।

ও—'[illegible] ভাগ' 'রোগ' এই সকল শব্দে অবস্থিত 'ও' ধ্বনির মতো উচ্চারণ হয়।

বাঙলা ভাষায় 'ও'কার হ্রস্ব ও দীর্ঘরূপে উচ্চারিত হয় যথা চোর (দীর্ঘ) চোরা (হ্রস্ব), কোল (দীর্ঘ) কোলা (হ্রস্ব) [কোলা ব্যাঙ]

ঔ—ইহা যৌগিক স্বরধ্বনি উচ্চারণ ও+উ যথা মৌলি 'মোউলি), সৌরভ (সোউরভ) মৌমাছি (মৌউমাছি)।

[২] ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ

(ক) বাঙলা বর্ণমালায় 'ক' হইতে 'ম' পর্যন্ত পঁচিশটি বর্ণকে **স্পর্শবর্ণ** (stops) বলে। ইহাদের উচ্চারণকালে জিহ্বার বিশেষ বিশেষ অংশ কণ্ঠ, তালু, ওষ্ঠ প্রভৃতি স্থান স্পর্শ করে।

ক-বর্গের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ। এইজন্য ক বর্গীয় বর্ণ **কণ্ঠ্যবর্ণ**। চ বর্গের উচ্চারণ স্থান তালু। অতএব চ বর্গ তালব্য বর্ণ। ট বর্গ মূর্ধন্য বর্ণ, ত বর্গ দন্ত্য বর্ণ। প বর্গ ওষ্ঠ্য বর্ণ।

কবর্গঃ—**ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্**—ক বর্গের এই পাঁচটি বর্গের উচ্চারণকালে জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগ কণ্ঠের (গলার) নিকটে তালুর নরম অংশকে স্পর্শ করে—এই কারণে ইহাদিগকে কণ্ঠ্য বর্ণ বলা হয়।

চ **বর্গ**ঃ—**চ্ ছ্ জ্ ঝ্ ঞ্**—চবর্গের পাঁচটি বর্ণের উচ্চারণকালে জিহ্বার মধ্যভাগ তালুর কঠিন ভাগ স্পর্শ করে বলিয়া ইহারা **তালব্যবর্ণ**।

টবর্গঃ—**ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ ণ্**—এই পাঁচটি বর্ণ উচ্চারণ করিতে জিহ্বার অগ্রভাগ উল্টাইয়া তালুর মধ্যভাগ বা মূর্ধা স্পর্শ করিতে হয়।—এই জন্য ইহাদের নাম **মূর্ধন্য বর্ণ**।

তবর্গঃ—ত্ থ্ দ্ ধ্ ন—ত বর্গের এই পাচটি বর্ণ উচ্চারণ করিবার সময় জিহ্বার অগ্রভাগ উপরের পাটির দাঁতের নীচের অংশকে স্পর্শ করে, সুতরাং ইহাদের নাম দন্ত্যবর্ণ।

পবর্গঃ—প্ **ফ্** ব্ **ভ্ ম্**—প বর্গের এই বর্ণগুলির উচ্চারণের সময় উপর ও নীচের ওষ্ঠ ও অধরের স্পর্শ হয়—এইজন্য ইহাদের নাম **ওষ্ঠ্যবর্ণ**।

প্রত্যেক বর্গের অন্তিম বর্ণ যথা—ঙ্, ঞ্, ণ, ন্, ম্ হইতেছে **অনুনাসিক বর্ণ**। এই সকল বর্ণের উচ্চারণ কালে দুইটি ওষ্ঠের স্পর্শ হেতু মুখ গহ্বরের বায়ু তাহার গতিপথ বন্ধ হওয়ায় নাসিকা দিয়া বহির্গত হয়। **মুখ ও নাসিকার সহযোগে ইহারা উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহাদের নাম অনুনাসিক বর্ণ**।

(খ) বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ যথা খ্ ছ্ ঠ্ থ্ ফ্ (দ্বিতীয়), **ঘ্ ঝ্ ঢ্ ধ্ ভ্** (চতুর্থ)—ইহাদিগকে মহাপ্রাণ (Aspirate) ধ্বনি বলা হয়, কারণ ইহাদের উচ্চারণ, 'প্রাণ' **বা 'হ'-জাতীয় ধ্বনির** সাহায্যে হইয়া থাকে। ক্+হ-খ, গ্+হ=ঘ, চ্+হ—ছ ইত্যাদি।

আর বর্গের প্রথম (ক্ চ্ ট্ ত্ প্) এবং তৃতীয় (গ্ জ্ ড্ দ্ ব্) এবং পঞ্চম বর্ণের উচ্চারণে এই প্রাণের দরকার হয় না, ইহারা ক্ষীণ শ্বাস যোগে উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহাদের নাম **"অল্পপ্রাণ"** (Unaspirated) বর্ণ।

বর্গের তৃতীয় (গ্ জ্, ড্ দ্, ব্) এবং চতুর্থ (ঘ্ ঝ্ ঢ্ ধ্ ভ্) বর্ণের উচ্চারণ ঘোষ বা গাম্ভীর্যপূর্ণ। ইহাদের উচ্চারণে ঘোষতন্ত্রীর (Vocal chords) কম্পন হয়। এই কারণে ইহাদিগকে ঘোষবর্ণ (Voiced Sounds) বলা হয়।

বর্গের প্রথম (ক্ চ্ ট্ ত্ প্) এবং দ্বিতীয় বর্ণ (খ্ ছ্ ঠ্ থ্ ফ্)—ইহাদের উচ্চারণ গাম্ভীর্যবিহীন। ইহারা অঘোষ (Unvoiced Sounds) বর্ণ।

য্ র্ ল্ ব্ঃ—ইহাদিগকে **অন্তঃস্থ বর্ণ** বলে। স্পর্শবর্ণ ও উষ্মবর্ণের মধ্যবর্তী বলিয়া ইহাদের নাম **অন্তঃস্থ বর্ণ**।

য-বাঙ্‌লায় সাধারণতঃ ইহার উচ্চারণ "জ"। যজমান (জজমান) সংস্কৃতে উচ্চারণ 'ইঅ' (দ্রুত)। বাঙ্‌লায় এইরূপ উচ্চারণ লিখিতে 'য' বর্ণের নীচে বিন্দু যুক্ত হয় য়। ইহা পদের মধ্যে ও অন্তে বসে। যথা—সময়, প্রলয়, আয়ত্ত, অয়ন। অন্তস্থ 'ব' ও বর্গীয় ব-এর উচ্চারণে বাঙ্‌লায় ভেদ নাই। [সংস্কৃতের উচ্চারণ ব=উ+অ তাড়াতাড়ি একসঙ্গে উচ্চারণ করিলে অন্তস্থ 'ব' হয়]

র=র কারের উচ্চারণ বাঙ্‌লায় দন্তমূলীয়। ইহার উচ্চারণ কালে জিহ্বার অগ্রভাগ কম্পমান ও দন্তমূলে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া থাকে [রকার কম্পন জনিত বর্ণ]

ল্—লকারের উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ দন্তমূলে সংলগ্ন করিয়া জিহ্বার দুই পাশ দিয়া বায়ুকে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে লকারকে এই কারণে **পার্শ্বিক বর্ণ** বলা হয় [লকার দন্ত্য ও পার্শ্বিক বর্ণ]

শ্, ষ্, স্, হ্ঃ—এই চারিটি বর্ণকে 'উষ্ম' (উষ্মন্) বর্ণ বলে। ইহাদের মধ্যে শ্ তালব্য বর্ণ, ষ্ মূর্ধন্য, স্ দন্ত্যবর্ণ এবং হ্ কণ্ঠবর্ণ। [বাঙলার উষ্ম বা উষ্মা– গরমের ভাব বা তাপ অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন সংস্কৃতে, উষ্মন্ শব্দের অর্থ 'শ্বাস'। ইহারা শ্বাসের আশ্রয়ে উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহাদিগকে **'উষ্ম'** বা শ্বাসাশ্রয়ী বর্ণ বলে। ভাষাতত্ত্বে ইহাদের নাম 'Spirant.' যতক্ষণ শ্বাস থাকে ক্রমাগত ইহাদের উচ্চারণ করিতে পারা যায়। স্ স্ স, ষ্ ষ্, হ্ হ্ হ্। [তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, শকার তালব্য এবং উষ্মবর্ণ, ষকার মূর্ধন্য এবং উষ্মবর্ণ, সকার দন্ত্য এবং উষ্মবর্ণ, হকার কণ্ঠ্য এবং উষ্মবর্ণ]

ক্ষ=ক+ষ (সংস্কৃত উচ্চারণ)। ইহা বাঙ্‌লায় খ এবং ক্‌খ-এর মতো উচ্চারিত হয়। ক্ষুদ—(খুদ), ক্ষুদ্র—('খুদ্র'), কিন্তু অক্ষয় (অক্‌খয়)।

শ্ ষ্ স্—ইহাদের উচ্চারণ একই প্রকার। তালব্য শ্ কারের সহিত ইহাদের উচ্চারণে কোন প্রভেদ নাই [**বিভিন্ন বর্ণের এক ধ্বনি**] সতীশ (শতীশ), সুরেন্দ্র (শুরেন্দ্র), সত্য (শোত্তো), হর্ষ (হর্শো)। কিন্তু ষাঁড় শব্দের 'ষ'কার সংস্কৃতের মত মূর্ধন্য বর্ণ।

ড় ঢ়—বাঙ্‌লা ভাষার শব্দের আদিতে ড বা ঢ'কার প্রযুক্ত হইতে পারে যথা—ডালিম, ডঙ্কা, ডাক, ডাণ্ডা, ঢেঁকি, ঢিলা, ঢেউ ইত্যাদি। পদমধ্যে বা পদান্তে অনেক স্থলে ড় ঢ় প্রযুক্ত হয়, যথা—বিড়াল, দাঁড়, বেড়ি, আষাঢ়, দৃঢ়। [সংস্কৃত ভাষায় এবং প্রাচীন বাঙ্‌লা ভাষায় শুধু ড এবং ঢ এর প্রয়োগ আছে]

অনুস্বার (ং)—ভারতের অতি প্রাচীন বৈয়াকরণগণ অনুস্বারকে স্বর অথবা ব্যঞ্জন দুই শ্রেণীর মধ্যেই ফেলিয়াছেন। ইহা স্বরবর্ণকে আশ্রয় করিয়া উচ্চারিত হয়। বাঙ্‌লায় অনুস্বারের উচ্চারণ 'ঙ'-এর উচ্চারণের মতো। যথা—রং=রঙ্, টং=টঙ্, ভড়ং=ভড়ঙ্, ফড়িং=ফড়িঙ্, রাং=রাঙ্, বাংলা=বাঙ্‌লা।

বিসর্গ (ঃ)—বিসর্গ কথার অর্থ 'ছাড়া' (ত্যাগ করা), নিশ্বাস ছাড়া—যেমন অনেকটা 'হ'কারের উচ্চারণে পাওয়া যায়।

বিসর্গ ধ্বনি অঘোষ ধ্বনি—হ'কার ঘোষ ধ্বনি। বাঙলায় বিসর্গ স্থানে পরবর্তী বর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ পাওয়া যায়। যাদঃ পতি (=যাদপ্পতি), মনঃ সংযোগ (মনোস্‌সংযোগ)। বিস্ময়বাচক শব্দে বাঙলায় বিসর্গের উচ্চারণ লক্ষ্য করা যায়—আঃ, উঃ ইত্যাদি।

বর্গের পঞ্চমবর্ণ ঃ—ঙ্‌ ঞ্‌ ণ্‌ ন্‌ ম্‌।

ঙ্‌—কণ্ঠ্য অনুনাসিক বর্ণ।

ঞ্‌—ইহার নাম ইঁঅ। এই বর্ণের একক প্রয়োগ নাই। সংযুক্ত বর্ণে ইহাকে পাওয়া যায়। বর্গীয় জ ছাড়া চ'বর্গের অন্য বর্ণের সহিত ইহার ব্যবহারে উচ্চারণ হয় 'ন্‌', যথা—বঞ্চনা (বন্‌চনা), লাঞ্ছনা (লান্‌ছনা) 'জ'-এর সহিত 'ঞ' থাকিলে উচ্চারণ হয় [জ্ঞ=গ্‌গ্যঁ] যাচ্‌ঞা—যাচ্‌না, জ্ঞান (গ্যঁ) কিন্তু বিজ্ঞ (বিগ্‌গঁ)।

ন্‌ ণ্‌—বাঙলায় দুই ন'কারের উচ্চারণে কোন ভেদ নাই। তৎসম শব্দ লিখিতে ট'বর্গের সহিত যুক্ত ন'কার 'ণ'কার রূপে লিখিত হইয়া থাকে যথা—কণ্টক, বণ্টন।

ম—প'বর্গের অন্তিম বর্ণ ওষ্ঠ্য অনুনাসিক। ম'কার স্থানবিশেষে অনুস্বার [ং] হয়, প'বর্গের সহিত যোগে ম'কার ম'কার থাকে। ত'বর্গের সহিত যোগে দন্ত্যনকার হয়। কম্প, ঝম্প, দম্ভ। বশংবদ (বশম্‌+বদ) [এখানকার 'ব'কার অন্তস্থ: ইহা বর্গীয় ব হইলে ম্‌ স্থানে অনুস্বার না হইয়া ব হইত] শান্ত (শাম্‌+ত=শান্‌ত), ক-বর্গের সহিত ম'কার থাকিলে ম'কার 'ঙ্‌' হয়। হুঙ্কার ('হুংকার' ও লেখা হয়)।

স, শ ঃ—দন্ত্য স-কার ত-বর্গে যুক্ত হইলে দন্ত্য উচ্চারণই হয়—অস্ত, সমস্ত, অস্তে, স্নান। ঋ-কার যুক্ত 'স'-কার ও 'শ'-কার দন্ত্যরূপে উচ্চারিত হয়—অনুসৃত, শৃগাল, সৃজন (বাঙলায়), শৃঙ্গ।

য-ফলা—ব্যঞ্জনের পর য-ফলা থাকিলে **পূর্ববর্তী ব্যঞ্জন ধ্বনির দ্বিত্বভাব হয়** এবং ঐ ব্যঞ্জনের পূর্বে অ-বর্ণ থাকিলে ও-কাররূপে উচ্চারিত হয়। যথা—সত্য (শোৎতো), শিষ্য (শিশ্‌শো), প্রকাশ্য (প্রকাশ্‌শো)।

ব-ফলাযোগে দ্বিত্বউচ্চারণ—অশ্ব (অশ্‌শ) সত্ত্ব (সত্তর) অন্বয় (অন্নয়) হ্রস্ব (হ্রুশ্‌শো) বিশ্ব (বিশ্‌শো)।

[৩] সংযুক্ত বর্ণ

একাধিক ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরবিরহিত হইয়া অবস্থান করিলে তাহাকে **সংযোগ** বা **সংযুক্ত** ব্যঞ্জনবর্ণ বলে। বাঙলা ভাষায় যুক্ত করিয়া উহাদিগকে একত্র লেখা হইয়া থাকে। যথা—দন্ত—এখানে দ'য়ের অন্ত্য অকারের পর 'ন্‌' এবং ত্‌-এর মধ্যে কোন স্বর নাই—সুতরাং ন্‌ এবং ত্‌ একত্র লেখা হইয়াছে। মিষ্ট, কষ্ট, (ক ষ্‌ ট্‌ অ) রক্ত (ক্‌ ত্‌)। বাঙলায় কতকগুলি সংযুক্ত বর্ণে যুক্ত বর্ণগুলিকে চিনিতে পারা যায়। আর কতকগুলিতে চেনা যায় না, কারণ তাহাদের রূপ পরিবর্তন হইয়া থাকে।

কান্ত, কুক্কুর—এখানে যুক্ত বর্ণগুলি স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু 'রক্ত', 'সত্য'—শব্দ দুইটিতে ক্‌ এবং য্‌ চিনিতে কষ্ট হয়।

'য'-কার সংযুক্ত বর্ণে ্য (যফলা হয়)—সত্য, হাস্য।

'র'—ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হইলে রকার 'ৃ' (রফলা) হয়। রকার যুক্ত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়—তাম্র (=তাম্ম্র), নম্র (নম্ম্র)। ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে র্ থাকিলে উহা রেফ্ (র্) হইয়া পরবর্ণের মস্তকে যায়—যথা দেবর্ষি, পর্বত (পর্বত), কর্কশ (কর্কশ)।

ধ্বনির পরিবর্তন—পদ্ম (পদ্দ), আত্মা (আত্তা), মহাত্মা (মহাত্তা)।

জ্ঞ—ইহা শব্দের অন্তে থাকিলে 'গগ' যথা যজ্ঞ (জোগ্গ), প্রথমে থাকিলে গ্য'. জ্ঞান (গ্যাঁন), জ্ঞাতি (গ্যাঁতি)।

হ্ল—পূর্বে 'ল'কারের পরে 'হ'কাব উচ্চারিত হয়—আহ্লাদ (আল্হাদ)। ইহা অবশ্য স্থিতি পরিবৃত্তি (Metathesis)

হ্ন='ন্হ্', যথা আহ্নিক (আন্হিক)। হ্ম্ (ইহাব উচ্চারণ)—'ম্হ্' যথা ব্রহ্ম (ব্রম্হ)।

[৪] ধ্বনিলোপ

(ক) ব-ফলা—বাঙ্লায় ব-ফলার উচ্চারণ হয় না যথা—ধ্বনি (ধনি), দ্বার (দার), কিন্তু দুয়ার (দুআর) শব্দে অন্তস্থ 'ব'-এর উচ্চারণের সন্ধান পাওয়া যায়। (খ) বাঙ্লা অন্ত্য—'অ'কার (অনুচ্চারিত)। (১) আধুনিক বাঙ্লায় শব্দ বা পদের অন্তস্থিত অ-কারের প্রায়ই উচ্চারণ হয় না। এই অ-কার ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত সংলগ্ন করিয়া তাহারই অঙ্গরূপে লিখিত হয়। যথা—হাত (উচ্চারণ) হাত্ (হা-ত-অ নহে) ধান (ধান্), চাল (চাল্), বালক (বালক্) ইত্যাদি [ইহা ধ্বনি লোপের মধ্যে পড়ে]

[৫] ধ্বনি পরিবর্তন

প্রত্যেক ভাষার নিজ নিজ বিশেষ উচ্চারণরীতি আছে। এই সব রীতির মূলে উচ্চারণের যে প্রয়াস উপস্থিত হয় তাহাকে হাল্কা করিবার একটা চেষ্টা রহিয়াছে। তৎসম শব্দই হউক বা দেশী-বিদেশী শব্দই হউক, বক্তা সব সময়ই তাহাকে অনায়াসে বা আরামের সহিত উচ্চারণ করিতে চাহে। এইজন্য কতকগুলি বিশেষ ধ্বনি-পরিবর্তনের রীতি গড়িয়া উঠে। ভাষাতাত্ত্বিকগণ এই সকল পরিবর্তনকে কতকগুলি নিয়মের মধ্যে ফেলিয়াছেন। উহাদের নাম ঃ—

(১) **স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ** (Anaptyxis)—উচ্চারণের সুবিধার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে স্বরধ্বনি প্রবেশ করাইয়া দেওয়ার নাম **স্বরভক্তি**। **কবিতার ভাষায়** এবং চলতি **বা কথোপকথনের ভাষায় ইহার বহুল প্রয়োগ দেখা যায়ঃ**—শক্তি শকতি (শ্—অ—ক্—ত্—ই=এখানে 'ক'কারের পর 'অ'কার বসান হইয়াছে)। ভক্তি—ভকতি, রত্ন—রতন, প্রসাদ—পরসাদ, ধৈর্য—ধৈরজ, মূর্তি—মুরতি, জন্ম—জনম, কর্ম—করম, গর্ব—গরব, মুক্তি—মুকতি, মুক্তা—মুকুতা, প্রাণ—পরাণ, প্রভাত—পরভাত, স্নান—সিনান, হর্ষ—হরিষ, দর্শন—দরশন, ছেরাদ্দ, গেরাম, শোলোক, স্পর্শ—পরশ, মন্তর তন্তর (মন্ত্র তন্ত্র), ফ্লুট—ফলুট, বরুষ, তৃপ্ত—তিরপিত।

(২) **স্বর-সঙ্গতি** (Vowel Harmony)ঃ—চলিত ভাষায় (এবং কখনও কখনও সাধু ভাষায়) পরবর্তী বা পূর্ববর্তী স্বরের প্রভাবে যে ধ্বনি পরিবর্তন হয় তাহাকে **স্বর-সঙ্গতি**

বলে। দেশী>দিশি, বিলাতি>বিলিতি, মিছা>মিছে, হাঁরা>হাঁরে, চিঁড়া>চিঁড়ে, কিরা>কিরে, বস্>বোস্, ইচ্ছা>ইচ্ছে।

(৩) **অপিনিহিতি**—কোন শব্দে 'ই' বা 'উ' ধ্বনি থাকিলে পূর্ব হইতে তাহাকে উচ্চারণ করিবার প্রবণতাকে **অপিনিহিতি** বলে—অপিনিহিতিতে পরবর্তী স্বরের মতো আর একটি স্বরের আগম হয়। যথা চারি>চাইর (পূর্ববঙ্গে), আজি>আইজ, কালি>কাইল, হারি>হাইর, করিয়া>কইর্যা, সাধু>সাউধ।

(৪) **অভিশ্রুতি**—পশ্চিমবাংলার ভাষায় অপিনিহিতির ই কার বা উ কার পূর্ববর্তী স্বরের সহিত মিলিত হইয়া সন্ধ্যাক্ষরে পরিণত হয়। ইহাকে **অভিশ্রুতি** (Umlaut) বলা হয়। আইল>এলো, সাধু>সাইধ>সেধ, সাধু>সাউধ>সেধ, মধু+আ>**মউধুআ** >মধো, হরিয়া>হইর্যা>হ'রে, রাজুয়া>রাউজা>রেজো ইত্যাদি।

(৫) **য় শ্রুতি এবং অন্তস্থ ব শ্রুতি** :—দ্রুত উচ্চারণের ফলে এক স্বরধ্বনি অপর স্বরধ্বনিতে যাইবার সময় একটি 'য়' বা ব (উ+অ=ও) ধ্বনির উপর দিয়া যায়। এই অন্তর্বর্তী 'য়'-ধ্বনি, ও ব-ধ্বনিকে য় শ্রুতি এবং **ব শ্রুতি** (Wউঅ) বলে। কে এলো দ্রুত উচ্চারণ করিলে হয় 'কেয়েলো', ঝি-এর>ঝিয়ের, মোয়া (মোবা (Wa) খাওয়া, যাওয়া ইত্যাদি।

(৬) **স্থিতি—পরিবৃত্তি (বর্ণবিপর্যয়, আদ্যন্তব্যাপত্তি)** Metathesis) :—শব্দস্থিত বর্ণের স্থান পরিবর্তনকে **'স্থিতিপরিবৃত্তি'** বলে। বারাণসী>বানারসী (বেনারসী), বাক্স>বাস্‌ক, টেক্স>টেস্‌ক, আলনা>আনলা, চোর>রচো, বাতাস>বাসাত।

(৭) **আদি (স্বর) লোপ** (Apheresis) :—শব্দের আদিস্থিত স্বর লোপকে আদিলোপ বলে :—অতসী>তিসি, উদুম্বর>ডুমুর, অপিধান>পিধান (বাংলায় √পিন্ধ ধাতু 'পরা' অর্থে)।

(৮) **স্বরাগম** (পূর্বাগম) উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের আদিতে স্বরাগম (Prothesis) হয়। স্পর্ধা>আস্পর্ধা, স্কুল>ইস্কুল, কুমারী>অকুমারী, স্ত্রী>ইস্ত্রি, স্পষ্ট>অস্পষ্ট।

(৯) **বর্ণলোপ** (Haplology):—সমজাতীয় বর্ণ পাশাপাশি থাকিলে একটির লোপ হয় :—পটল লতা>পলতা, কাজল লতা>কাজলতা, দিদি>দি (ছোড়দি, ঠানদি) [ইংরেজীতে Krishnanagar, Krishnagar], পাদ+উদক=পাদোদক>পাদোক।

(১০) **সমীকরণ** (সমীভবন) (Assimilation) :—দুইটি সন্নিহিত ধ্বনির একীভাবের নাম সমীকরণ বা সমীভবন। ইহাতে (১) পরবর্তী ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনির প্রভাবে **পূর্ববর্তী রূপ প্রাপ্ত** হইয়া সমতা লাভ করে অথবা (২) পূর্ববর্তী ধ্বনি পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে **পররূপ** প্রাপ্ত হয়। (৩) অথবা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ধ্বনির **পরস্পরের প্রভাবে পরিবর্তিত** হইয়া সমতালাভ করে। (১) রাজ্+নী=রাজ্ঞী (পূর্ব চ বর্গের প্রভাবে পরবর্তী ন স্থানে চ বর্গের ঞ্) প্র-বিষ্ (√বিশ্)+ত=প্রবিষ্ট (পূর্ব ষকারের প্রভাবে পরবর্তী ত্ স্থানে ট)। (২) রাধ্+না=রান্না, মৃৎ+ময়=মৃণ্ময়, কর্তা (কর্+তা)=কত্তা (কত্‌তা)। (৩) দেব+অনুগমন >দেবানুগমন (পরস্পরের প্রভাবে দীর্ঘত্ব) [ব্যাকরণের সন্ধি ও সমীকরণ]।

(১১) **ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্বভাব** :—অর্থের পার্থক্যের জন্য অনেক সময়ে ব্যঞ্জনধ্বনির দ্বিত্ব হয়। প্রকৃতপক্ষে এরূপ স্থলে ব্যঞ্জনধ্বনিটি অধিক সময় ধরিয়া উচ্চারিত হয় :—

যথা ছোট>ছোট্ট (আদরার্থে), মালা (ফুলের মালা), মাল্লা (নৌকার মাঝি), কাচা—কাচ্চা (পরিমাণ বিশেষ [চাদর-চাদ্দর—এখানে অর্থের পরিবর্তন হয় না, হিন্দীতে এবং পূর্ব-বঙ্গের স্থানে স্থানে এইরূপ দ্বিত্বযুক্ত উচ্চারণ হয় তুঃ পাতল (পাতলা) পাত্তল, থাপড় থাপ্পড় [বিরক্তিতে], একেবারে>এক্কেবারে, জলে জলময়>জলে জলম্ময়।

(১২) পদমধ্যবর্তী র-কার ও হ-কার লোপ—বাঙ্লা ভাষায় তৎসম ও বিদেশী শব্দ উচ্চারণের সময় অনেক সময় র-কার ও হ-কার বিলুপ্ত হয়ঃ—ধর্ম>ধম্ম, কর্ম>কম্ম, ধর্তব্য>ধত্তব্য, [চলিত বাঙ্লায়ও এরূপ পরিবর্তন হয়] মারলে>মাল্লে, কব্‌লুম>কল্লুম, ফলাহার>ফলার, চাহে>চায়, কহে>কয়, শাহ্>শা (শাহা), নাহিতে>নাইতে (স্নান করিতে)।

(১৩) ঘোষীভবন—উচ্চারণের সুবিধার জন্য কখন কখন অঘোষধ্বনিকে ঘোষধ্বনিতে পরিণত করা হয়—যেমন কাক>কাগ, বক>বগ, ঠক>ঠগ মকর>মগর, শাক>শাগ

(১৪) মহাপ্রাণিতকরণ—অনেক সময় অল্পপ্রাণ বর্ণের সহিত মহাপ্রাণধ্বনি (হ্ জাতীয়) যুক্ত করা হয়—পাশ>ফাঁস, কীল>খিল।

(১৫) গুণ—অ, এ, ও এই তিন স্বরকে গুণস্বর বলে। স্থানবিশেষে ই ঈ স্থানে এ, উ ঊ স্থানে ও, ঋ ৠ স্থানে অর্ হওয়াকে গুণ বলে। √ক্ষি+অ=ক্ষে+অ-ক্ষয় (সন্ধিতে), √লী+অ=লে+অ=লয়। দেব+ঋষি=দেবর্ষি (ঋ স্থানে অর), মহা+ইন্দ্র মহেন্দ্র (আ+ই মিলিয়া একগুণ 'এ'-কার আদেশ হইয়াছে)।

(১৬) বৃদ্ধিঃ—আ, ঐ, ঔ এই তিন স্বরকে **বৃদ্ধিস্বর** বলে। বৃদ্ধি হয় বলিলে বুঝিতে হইবে ই ঈ স্থানে ঐ, উ ঊ স্থানে ঔ, ঋ ৠ স্থানে আ (র্) হয় এবং অ-কার স্থানে আ হয়। পচ্+ঘঞ্ (অ)-পাক (পচ্ ধাতুর অ-কার স্থানে 'আ' হইয়াছে—প্রত্যয়ের ঘ লোপ হইয়াছে বলিয়া 'চ'-স্থানে ক্ হইয়াছে) সুমিত্রা+ফি (ইঞ্) অপত্যার্থে—সুমিত্রা শব্দের আদিস্বরের বৃদ্ধি হওয়ায় 'ঔ'-কার হইয়া 'সৌমিত্রি' হইয়াছে। এইরূপ 'দাশরথি'।

(১৭) সম্প্রসারণঃ—য ব ল ব (অন্তস্থ বর্ণ) স্থানে যথাক্রমে ই ঋ ৯ উ হওয়ার নাম সম্প্রসারণ। পরোক্ত বর্ণগুলিকে **সম্প্রসারণ স্বর** বলে√ব্যধ্+ক্ত=(বিধ্+ত=সন্ধিতে বিদ্ধ—ব্যধ্ ধাতুর 'য'কার স্থানে 'ই'-কাররূপে সম্প্রসারণ হইয়াছে। √যজ্+ক্ত=ইষ্ট (√যজ্ ধাতুর 'য'-কার স্থানে সম্প্রসারণ 'ই' হইয়াছে। স্বপ্+ক্ত=সুপ্ত ('ব'-স্থানে 'উ'>বু> বচ্+ক্ত=উক্ত।

অনুশীলনী

১। বিভিন্ন বর্ণের উচ্চারণে একধ্বনির এবং একবর্ণের উচ্চারণে বিভিন্ন ধ্বনির উদাহরণ দাও। (২) উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করঃ—'এ'-কারের উচ্চারণ, অনুনাসিক বর্ণ, যৌগিক স্বরধ্বনি, বিপ্রকর্ষ, স্থিতিপরিবৃত্তি, বর্ণাগম (উঃ মঃ ১৯৬০), আ-কারের দীর্ঘ উচ্চারণ (উঃ মঃ ১৯৬০), অন্তঃস্থ বর্ণ (উঃ মঃ ১৯৬০ কম), ঘোষবর্ণ, উচ্চারিত অন্ত্য অ-কার। (৩) নিম্নলিখিত সংজ্ঞাগুলির উদাহরণসহ পার্থক্য প্রদর্শন করঃ—ধ্বনি, বর্ণ, অল্পপ্রাণ বর্ণ, মহাপ্রাণ বর্ণ, (১৯৬৩), হ্রস্বস্বর, প্লুতস্বর, স্বরান্ত অক্ষর, ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর। (৪) বিভিন্ন প্রকারের বর্ণের উচ্চারণে ধ্বনিলোপের উদাহরণ দাও।

তৃতীয় অধ্যায়

সন্ধি

দুইটি বর্ণ পরস্পর অত্যন্ত সন্নিহিত হইলে যদি তাহারা একসঙ্গে উচ্চারিত হয় (সমকালতা থাকে) তবে যে ধ্বনি পরিবর্তন উপস্থিত হয় তাহাকে **সন্ধি** বলে। যথা—দেব+আলয় =দেবালয়। জ্ঞান+উদয়=জ্ঞানোদয়। মুনি+ইন্দ্র=মুনীন্দ্র।

দুইটি স্বরধ্বনি নিকটবর্তী হইলেও যদি পৃথক পৃথক উচ্চারিত হয় (কাল-ব্যবধান থাকে) তবে সেখানে সন্ধি হয় না। যথা—**অনুমতি-অনুসারে, স্ত্রী-আচার, বাউল, কাউর** (চর্মরোগ), আউল, **আইবড়** (-বুড়)। ইহাকে **"বিবৃত্তি"** (Hiatus) বলে।

[১] বাঙ্‌লা ভাষার সন্ধির বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃত সন্ধির সঙ্গে পার্থক্য

সংস্কৃত ভাষায় পদমধ্যে, (পদের বিভিন্ন অংশের সহিত) সমাসে, ধাতু ও উপসর্গের মধ্যে নিত্য সন্ধি হয়। **এই নিয়ম বাঙ্‌লা ভাষায় তৎসম শব্দের উপর** বলবৎ আছে।

সংস্কৃত ভাষার বাক্যগত এক পদের সহিত অন্য পদের সন্ধি বক্তার ইচ্ছা-অনুসারে হইতে পারে। কিন্তু **বাঙ্‌লা ভাষার বাক্যগত পদে সন্ধি করিবার কোন নিয়ম নাই—সন্ধি করা চলে না।** যথা- (সংস্কৃত ভাষায়) 'বক্তা আগচ্ছতি' (বক্তা আসে)। ইহাকে 'বক্তাগচ্ছতি' লেখা চলে। কিন্তু বাঙ্‌লায় **'বক্তা আসে' ইহাকে 'বক্তাসে' লেখা চলে না।** কিন্তু তাই বলিয়া **খাঁটি বাঙ্‌লা** বাক্যে সন্ধি নাই এ কথাও বলা চলে না। **সন্ধিজ পরিবর্তন তাহাতে আছে—কিন্তু লেখা হয় না।** উচ্চারণের সময় উহা অনেক জায়গায় ধরা পড়ে। **ইহাকে শুধু 'সমীকরণ' বলা উচিত নহে—কারণ ব্যাকরণের সন্ধিও সমীকরণ। বাঙ্‌লা সন্ধি—পাঁচ+সের=পাঁশসের, বড+ঠাকুর=বট্‌ঠাকুর,** ছোট+দা=ছোড়্‌দা, মেঘ+করেছে=মেক্‌ কোরেছে, এক+**জন** (এক্‌ঝন—রাজসাহী অঞ্চলে), **হাত+ধরা=হাদ্‌ধরা, কর্‌+তা=কত্তা, ধর্‌+ম=ধম্ম।**

বাঙ্‌লা ব্যঞ্জনসন্ধিতে সাধারণতঃ পরবর্তী ব্যঞ্জনের প্রভাবে পূর্ববর্তী ব্যঞ্জন ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। **পূর্বোক্ত** উদাহরণে 'কত্তা' ('কর্‌+তা') শব্দের পরবর্তী ত্‌ কারের **প্রভাবে** পূর্ববর্তী 'র'-কার **স্থানে** 'ত্‌' হইয়াছে। **এই প্রক্রিয়া-কে 'প্রত্যাবর্ত সমীকরণ'** বলা **হয়।** আর্‌ না কালী=**'আন্নাকালী'** (মেয়ের নাম)। রাঁধ্‌+না=রান্না। **যা** ইচ্ছে তাই=**যাচ্ছেতাই।**

পদে সন্ধি—নে+অন=(নী ধাতু হইতে (গুণাদেশে) 'নে'+অন (প্রত্যয)=নয়ন, শে+অন= শয়ন, পো+ইত্র=পবিত্র (এখানে সন্ধি না করিলে পদের গঠনই সম্ভবপর নহে)।

বাঙ্‌লাতেও এরূপ হয়। যথা—সুতা+আলি=সুতালি (সুতার মত, 'সুতালি চাঁদ'—মোহিতলাল মজুমদার)। সোনা+আলি=**সোনালি,** ঠাকুর+আলি=ঠাকুরালি ("আমরা"—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)।

ধাতু ও উপসর্গ—প্রতি+ঈক্ষা=প্রতীক্ষা, প্র+ই+ক্ত (ত)=**প্রেত।**

সমাসে সন্ধি—দেব+আলয় (দেবের আলয়)=**দেবালয়, রাজর্ষি।** এই সব স্থলে সন্ধি **অনিবার্য। তবে সমাসে যেখানে সন্ধি করিলে উচ্চারণে উদ্বেগ জন্মে সেরূপ স্থলে বাঙ্‌লায় সন্ধি করা সমীচীন নহে।** যথা—স্ত্রী+আচার=(স্ত্র্যাচার), অনুমতি+অনুসারে (অনুমত্যনু-

সারে), আমা+অপেক্ষা=(আমাপেক্ষা ইত্যাদি স্থলে সন্ধি না করিয়া যেরূপ আছে সেই-রূপেই লিখিতে হইবে। প্রীতি+উপহার=প্রীতি-উপহার, "ভবন-শিখিরা প্রীতি-উপহার আনিবে নৃত্যরূপে" (যামিনীকান্ত শর্মা)—মেঘদূত, দৃষ্টি আকর্ষণ, জলছবি (জলচ্ছবি অচল)।

[২] স্বরসন্ধি

১। অ+অ=আ—বিম্ব+অধর=বিম্বাধর। হোম+অনল=হোমানল। নব+অন্ন=নবান্ন। অ+আ=আ—স্নান+আগার=স্নানাগার। কুশ+আসন=কুশাসন। বিবেক+আনন্দ=বিবেকানন্দ। কর+আঘাত=করাঘাত। আ+অ=আ—ক্ষুধা+অনল=ক্ষুধানল। আ+আ=আ—তৃষা+আতুর=তৃষাতুর। মহা+আশয়=মহাশয়।

২। ই+ই=ঈ—রবি+ইন্দ্র=রবীন্দ্র "অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার"। অতি+ইত=অতীত। ই+ঈ=ঈ—ক্ষিতীশ। পরি+ঈক্ষা=পরীক্ষা। ঈ+ই=ঈ—সুধী+ইন্দ্র=সুধীন্দ্র। ঈ+ঈ=ঈ—সতী+ঈশ=সতীশ।

৩। উ+উ=ঊ—কটু+উক্তি=কটূক্তি। উ+ঊ=ঊ—লঘু+ঊর্মি=লঘূর্মি। ঊ+উ=ঊ—বধূ+উৎসব=বধূৎসব। ঊ+ঊ=ঊ— ভূ+ঊর্ধ্ব=ভূর্ধ্ব।

৪। অ+ই=এ—নর+ইন্দ্র=নরেন্দ্র। অ+ঈ=এ—মালব+ঈশ্বর=মালবেশ্বর। আ+ঈ=এ—মহা+ইন্দ্র=মহেন্দ্র। যথা+ইষ্ট=যথেষ্ট। আ+ঈ=এ—মহা+ঈশ্বর=মহেশ্বর। রাজ্য+ঈশ্বর=রাজ্যেশ্বর।

৫। অ+উ=ও—চন্দ্র+উদয=চন্দ্রোদয। জল+উচ্ছ্বাস=জলোচ্ছ্বাস। হিত+উপদেশ=হিতোপদেশ। পাদ+উদক=পাদোদক। অ+ঊ=ও—চল+ঊর্মি=চলোর্মি। আ+উ=ও—মহা+উচ্চ=মহোচ্চ। 'বসি মহারাজ মহেন্দ্র রায মহোচ্চ গিরি-শিখরের প্রায়।'—রবীন্দ্রনাথ। আ+ঊ=ও—গঙ্গা+ঊর্মি=গঙ্গোর্মি।

৬। অ+এ=ঐ—জন+এক=জনৈক। বাঙলায় বার+এক=বারেক। "বারেক তোমার দুয়ারে দাঁড়ায়ে"—রবীন্দ্রনাথ। তিল+এক=তিলেক, ক্ষণ+এক=ক্ষণেক, আধ+এক=আধেক। [এ সব স্থলে অন্ত্য অকার অনুচ্চারিত—তাই পরবর্তী স্বর অকারের স্থান গ্রহণ করিয়াছে।] আ+ঐ=ঐ—মহা+ঐশ্বর্য=মহৈশ্বর্য।

৭। অ+ও=ঔ—বিম্ব+ওষ্ঠ=বিম্বৌষ্ঠ (বিম্বোষ্ঠ)। আ+ও=ঔ—মহা+ওষধি=মহৌষধি। অ+ঔ=ঔ—চিত্ত+ঔদার্য=চিত্তৌদার্য। আ+ঔ=ঔ—মহা+ঔৎসুক্য=মহৌৎসুক্য।

৮। অ+ঋ=অর্—রাজ+ঋষি=রাজর্ষি। দেব+ঋষি=দেবর্ষি। আ+ঋ=অর্—মহা+ঋষি=মহর্ষি। উত্তম+ঋণ=উত্তমর্ণ। কিন্তু দশ+ঋণ=দশার্ণ, "কোথায় দশার্ণ গ্রাম রয়েছে লুকায়ে"—রবীন্দ্রনাথ। ক্ষুধা+ঋত=ক্ষুধার্ত, শীত+ঋত=শীতার্ত, তৃষ্ণা+ঋত=তৃষ্ণার্ত।

৯। ই (ঈ) উ (ঊ) ঋ-কারের পর ইহারা ছাড়া অন্য স্বরবর্ণ থাকিলে ইহাদের স্থানে যথাক্রমে য্ ব্ র্ হয়। অতি+আচার=অত্যাচার। যদি+অপি=যদ্যপি। প্রতি+এক=প্রত্যেক। নদী+অম্বু=নদ্যম্বু। অভি+উদয়=অভ্যুদয়। অনু+এষণ=অন্বেষণ। বধূ+আগমন=বধ্বাগমন। পিতৃ+আলয়=পিত্রালয়। মনু+অন্তর=মন্বন্তর। সু+অচ্ছ=স্বচ্ছ। সু+আগত=স্বাগত। পশু+অধম=পশ্বধম। প্রতি+ঊষ=প্রত্যূষ। সু+অস্তি=স্বস্তি। অনু+অয়=অন্বয়। পিতৃ+অনুমতি=পিত্রনুমতি।

১০। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে এ স্থানে অয়্, ও স্থানে অব্, ঐ স্থানে আয়্, ঔ স্থানে আব্ হয়। নে+অন (প্রত্যয়)=নয়ন। শে+অন (প্রত্যয়)=শয়ন। ভো+অন (প্রত্যয়)= ভবন। পো+অন (প্রত্যয়)=পবন। গো+এষণা=গবেষণা। নৌ+ইক (প্রত্যয়)=নাবিক। ভৌ+উক=ভাবুক। শ্রো+অন=শ্রবণ। নৈ+অক=নায়ক। গৈ+অক=গায়ক।

[৩] সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত স্বরসন্ধি

গো+অক্ষ=গবাক্ষ (জানালা)। ('গগনগবাক্ষ যেন চকিতে খুলিয়া—' —পলাশীর যুদ্ধ), কুল+অটা=কুলটা, ('শতধিক্ তোরে নিলাজ কুলটা ভূমি' —'দুইবিঘা জমি'), মনস্+ঈষা= মনীষা, স্ব+ঈর=স্বৈর ('স্বৈরাচার'), স্ব+ঈরিণী=স্বৈরিণী, স্বৈরাচারিণী, সীমন্+অন্ত= সীমন্ত (সীঁথি—'সীমন্তে সিন্দুর বিন্দু'—মধুসূদন), কিন্তু সীমান্ত (দেশের প্রান্ত), সীমান্তরক্ষী সৈন্যদল, মার্ত+অণ্ড=মার্তণ্ড। সার+অঙ্গ=সারঙ্গ। প্র+ঊঢ়=প্রৌঢ়। অক্ষ+ঊহিনী=অক্ষৌহিণী। গো+ইন্দ্র=গবেন্দ্র।

শুদ্ধ+ওদন=শুদ্ধোদন। বিম্ব+ওষ্ঠ=বিম্বোষ্ঠ কিন্তু **নিপাতনে বিম্বোষ্ঠ।** ব্যাকরণ-শাস্ত্রের সাধারণ নিয়ম বা বিশেষ নিয়মের ব্যতিক্রমে যেখানে সন্ধি হয় সেখানে **সন্ধি নিপাতনে সিদ্ধ** হইয়াছে বা নিপাতনে সন্ধি হইয়াছে মনে করিতে হইবে। ভাষার প্রয়োজনের জনাই এইরূপ প্রয়োগ স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। পূর্বোক্ত উদাহরণগুলির সূত্র সংস্কৃত ব্যাকরণে পাওয়া যায়—বাঙ্লা ব্যাকরণে বিশেষ সূত্র নাই বলিয়া উহারা নিপাতনে সিদ্ধ (শুদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত) হইয়াছে। নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জন সন্ধির উদাহরণ ২২ পৃঃ [৬] অনুচ্ছেদে দেওয়া হইল। [নিপাতন সিদ্ধ প্রয়োগগুলি ব্যাকরণই গ্রহণ করিয়া থাকে।]

কেবল সন্ধি প্রকরণ নহে ব্যাকরণের সর্বত্র এইরূপ নিপাতন সিদ্ধ প্রয়োগ স্বীকার করা হয়। [নিপাতনের বিভিন্ন নাম ব্যাকরণে দেখা যায়—**নিপাতন, নিপাত, প্রতিকণ্ঠ,** ব্যাকরণ বহির্ভূত নিয়ম, **ব্যত্যয়**]

[৪] ব্যঞ্জন সন্ধি

১। স্বরবর্ণ বর্গের তৃতীয় চতুর্থ, পঞ্চমবর্ণ কিংবা য র ল ব হ পরে থাকিলে পদের অন্তে স্থিত বর্গের প্রথম বর্ণ (ক্, চ্, ট্, ত্, প্) স্থানে সেই বর্গের তৃতীয় বর্ণ (গ্, জ্, ড্, দ্, ব্) হয়। উৎ+ভব=উদ্ভব। বাক্+ঈশ=বাগীশ। জগৎ+ঈশ=জগদীশ। জগৎ+দল=জগদ্দল। উৎ+ঘাটন=উদ্ঘাটন। উৎ+যম=উদ্যম। দিক্+অন্ত=দিগন্ত। ণিচ্+অন্ত=ণিজন্ত। ষট্+আনন=ষড়ানন। ষট্+যন্ত্র=ষড়যন্ত্র। যৎ+রূপ=যদ্রূপ। প্রাক্+বিশ্ববিদ্যালয়=প্রাগ্বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাক্+রবীন্দ্র=প্রাগ্রবীন্দ্র। দিক্+জয়ী =দিগ্জয়ী। প্রাক্+উক্ত=প্রাগুক্ত। পদের অন্তে উক্ত বর্ণগুলি না থাকিলে এই সূত্রের প্রয়োগ হয় না যথা যাচ্+অক=যাচক (যাজক নহে), পত্+অঙ্গ=পতঙ্গ (পদঙ্গ নহে)। কিন্তু মৃৎ+অঙ্গ=মৃদঙ্গ [ত্-কার পদের অন্তে স্থিত হওয়াতে ত্ স্থানে দ্ হইয়াছে]।

২। চ ও ছ পরে থাকিলে ত্ ও দ্ স্থানে চ্ হয়, জ পরে থাকিলে জ্ হয়। শরৎ+ চন্দ্র=শরচ্চন্দ্র। সৎ+চিৎ+আনন্দ=সচ্চিদানন্দ। সৎ+চরিত্র=সচ্চরিত্র। সৎ+জন=সজ্জন। বিদ্বৎ+জন=বিদ্বজ্জন। বিপদ্+জনক=বিপজ্জনক। উৎ+জ্বল=উজ্জ্বল। উৎ+জীবন=

উজ্জীবন। জগৎ+জন=জগজ্জন। উৎ+জ্বল=উজ্জ্বল। মহৎ+ছায়া=মহচ্ছায়া। যাবৎ+জীবন=যাবজ্জীবন। সৎ+জন=সজ্জন। তদ্+জন্য=তজ্জন্য। তদ্+জাত=তজ্জাত।

৩। ল পরে থাকিলে ত্ ও দ্ স্থানে ল্ হয়ঃ—বিদ্যুৎ+লীলা=বিদ্যুল্লীলা। তদ্+লয়=তল্লয়। উৎ+লিখিত=উল্লিখিত। মৎ+লিখিত=মল্লিখিত। তৎ+লীন=তল্লীন। উৎ+লেখ=উল্লেখ।

৪। শ পরে থাকিলে ত্ ও দ্ স্থানে চ্ এবং শ্-কার স্থানে ছ হয়ঃ উৎ+শ্বাস=উচ্ছ্বাস। উৎ+শ্বসিত=উচ্ছ্বসিত। চলৎ+শক্তি=চলচ্ছক্তি। উৎ+শৃঙ্খল=উচ্ছৃঙ্খল।

৫। অনুনাসিক বর্ণ পরে থাকিলে (অনুনাসিক বর্ণ=ঙ্, ঞ্, ণ, ন্, ম্) স্পর্শবর্ণ স্থানে বিকল্প অনুনাসিক বর্ণ (সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ) হয়ঃ—দিক্+নিরূপণ=দিঙ্নিরূপণ। দিক্+মণ্ডল=দিঙ্মণ্ডল। পক্ষে দিগ্নিরূপণ, দিগ্মণ্ডল। উৎ+নাসিক=উন্নাসিক। জগৎ+নাথ=জগন্নাথ। (জগদ্নাথ শুদ্ধ হইলেও কেহ লেখে না)। উৎ+মোচন=উন্মোচন। উৎ+নীত=উন্নীত। উৎ+মুক্ত=উন্মুক্ত।

৬। প্রত্যয়ের অনুনাসিক বর্ণ পরে থাকিলে স্পর্শবর্ণ স্থানে নিত্য সেই বর্গের অনুনাসিক বর্ণ হয়ঃ—মৃৎ+ময়=মৃন্ময় (মৃদ্ময় নহে) (পদের অন্তঃস্থিত বলিয়া মৃৎ পদের ঋ-কারের পর ত্ স্থানে দন্ত্য ন্ কার মূর্ধন্য ণ-কার হইবে না)। শরৎ+ময়ী=শরন্ময়ী (রবীন্দ্রনাথ)। কিঞ্চিৎ+মাত্র=কিঞ্চিন্মাত্র। চিৎ+মাত্র=চিন্মাত্র। তৎ+মাত্র=তন্মাত্র মাত্র প্রত্যয়ও হয় সমাসের অন্তে 'মাত্রা' স্থানে হ্রস্ব হইয়াও মাত্র হয়। বাক্+ময়=বাঙ্ময়। চিৎ+ময়ী=চিন্ময়ী।

৭। চ বর্গের পর ন থাকিলে ন্ স্থানে ঞ্ হয়ঃ—যাচ্+না=যাচ্ঞা। রাজ্+নী=রাজ্ঞী। যজ্+ন=যজ্ঞ। কিন্তু ছ্ স্থানে তালব্য শ কার হইলে 'ন'-কার পরিবর্তিত হয় না—√প্রচ্ছ্+ন=প্রশ্+ন=প্রশ্ন।

৮। ত্ বা দ্-কারের পর ট বা ঠ থাকিলে ত্ ও দ স্থানে ট্ হয়ঃ—তৎ+টীকা=তট্টীকা। বৃহৎ+টঙ্ক=বৃহট্টঙ্ক। বৃহৎ+ঠক্কুর=বৃহট্ঠক্কুর।

৯। ড বা ঢ পরে থাকিলে ত্ ও দ স্থানে ড্ হয়ঃ—উৎ+ডীন=উড্ডীন। উৎ+ডয়ন=উড্ডয়ন। বৃহৎ+ডঙ্কা=বৃহড্ডঙ্কা। বৃহৎ+ডমরু=বৃহড্ডমরু। বৃহৎ+ঢক্কা=বৃহড্ঢক্কা।

১০। বর্গের প্রথম অথবা দ্বিতীয় বর্ণ কিংবা স পরে থাকিলে বর্গের তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্ণ স্থানে সেই বর্গের প্রথম বর্ণ হয়ঃ—তদ্+পর=তৎপর। তদ্+সৎ=তৎসৎ। ক্ষুধ্+পিপাসা=ক্ষুৎপিপাসা।

১১। মূর্ধন্য ষ্ কারের পর ত-বর্গ ট-বর্গে পরিণত হয়ঃ—আকৃষ্+ত=আকৃষ্ট। পৃষ্+ত (ক্ত)=পৃষ্ট। ষষ্+থ=ষষ্ঠ। আ+বিষ্ (বিশ্ ধাতু হইতে)+ত (ক্ত)=আবিষ্ট।

১২। ছ-কার পরে থাকিলে স্বরান্ত শব্দের উত্তর চ্-কার আগম হয়। চ্ এবং ছ মিলিয়া যুক্তাক্ষর 'চ্ছ' হয়। বি+ছেদ=বিচ্ছেদ। আ+ছন্ন=আচ্ছন্ন। প্র+ছন্ন=প্রচ্ছন্ন। পরি+ছদ=পরিচ্ছদ। পুণ্য+ছটা=পুণ্যচ্ছটা। বি+ছিন্ন=বিচ্ছিন্ন। পরশু+ছিন্ন=পরশুচ্ছিন্ন। আ+ছাদিয়া=আচ্ছাদিয়া।

১৩। 'উৎ' উপসর্গের পর স্থা ও স্তন্ভ্ ধাতুর—স-কারের লোপ হয়ঃ—উৎ+স্থান=উত্থান, উৎ+স্থাপন=উত্থাপন, উৎ+স্তম্ভ=উত্তম্ভ।

১৪। ত্-কার বা দ্-কারের পরে হ থাকিলে ত্ স্থানে দ্ এবং হ স্থানে ধ্ হয়। উৎ+হার=উদ্ধার। তৎ+হিত=তদ্ধিত, উৎ+হত=উদ্ধত। উৎ+হৃত=উদ্ধৃত। পদ্+হতি=পদ্ধতি।

১৫। স্পর্শ বর্ণ পরে থাকিলে অপদান্ত ম্-কার স্থানে, পরবর্তী বর্ণ যে বর্গে অবস্থিত সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয় অথবা অনুস্বারও হইয়া থাকে। সম্+গীত=সঙ্গীত। সম্+ঘাত=সংঘাত, সঙ্ঘাত। বসুম্+ধরা বসুন্ধরা (প্রচলিত বানান)। সম্+মান=সম্মান।

১৬। অন্তঃস্থ বা উষ্মবর্ণ পরে থাকিলে অপদান্ত ম্ স্থানে অনুস্বার হয়ঃ—সম্+লগ্ন=সংলগ্ন। সম্+যত=সংযত। সম্+শ্লিষ্ট=সংশ্লিষ্ট। সম্+হার=সংহার। কিন্তু সম্+রাজ্ (ট্)=সম্রাট্ (অনুস্বার হইবে না)।

১৭। অলংকৃত করা অর্থে সম্, পরি, উপ—উপসর্গের পর √কৃ ধাতুর প্রয়োগ হইলে উহার পূর্বে 'স্'-কার আগম হয়। সম্+কার=সংস্কার (যথা কেশ সংস্কার—কেশকে সাজান শোভিত করা), সম্+কৃত=সংস্কৃত [পরিশোভিত বা পরিমার্জিত ভাষা—সংস্কৃতি-সম্পন্ন (cultured) লোকের ভাষা—প্রকৃতি-প্রত্যয় সংযুক্ত ভাষা]।

[৫] বিসর্গ সন্ধি

বিসর্গ দুই প্রকারঃ—(১) র কার (র্) হইতে উৎপন্ন (২) স-কার (স্) হইতে উৎপন্ন। সন্ধিতে ইহাদের বিভিন্ন প্রকারের পরিবর্তন হইয়া থাকে। অন্তঃ, প্রাতঃ, পুনঃ, নিঃ দুঃ, স্বঃ প্রভৃতি র-জাত বিসর্গ। তপঃ, মনঃ, পয়ঃ, জ্যোতিঃ, শিরঃ, মেদঃ, বয়ঃ, বক্ষঃ, সদ্যঃ, স্রোতঃ, ইহারা স-জাত বিসর্গ। অহঃ (অহন্ শব্দ) স্থানবিশেষে র-জাত বিসর্গের মত কাজ করে, অন্যত্র স-জাত বিসর্গের তুল্য আচরণ করিয়া থাকে।

১। অকারের পরস্থিত স-জাত বিসর্গ, অকার কিংবা বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ এবং য, র, ল, ব, হ, পরে থাকিলে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অকারের সহিত মিলিয়া ও-কার হয়। অকারের পরস্থিত বিসর্গের পর উল্লিখিত ব্যঞ্জন বর্ণ ছাড়া অন্য ব্যঞ্জন থাকিলে বিসর্গের পরিবর্তন হয় না।

মনঃ+গত=মনোগত। পয়ঃ+ধর=পয়োধর। পয়ঃ+ধি=পয়োধি। নভঃ+অনিল=নভোনিল, পুরঃ+হিত=পুরোহিত। সরঃ+বর=সরোবর। তপঃ+বন=তপোবন। শিরঃ+ভাগ=শিরোভাগ। পুরঃ+ভাগ=পুরোভাগ। যৎপরঃ+নাস্তি=যৎপরোনাস্তি। মনঃ+ভাব=মনোভাব। সদ্যঃ+জাত=সদ্যোজাত। ('অতিদূর সদ্যোজাত আদি-মধুমাসে'—রবীন্দ্রনাথ)। শিরঃ+রত্ন=শিরোরত্ন। কিন্তু শিরঃ+শোভা=শিরঃশোভা। বক্ষঃ (স্)+স্থল=বক্ষঃস্থল (এখানে বিকল্পে বক্ষস্থল হয়)। বয়ঃ+সন্ধি=বয়ঃসন্ধি। সদ্যঃ+মৃত=সদ্যোমৃত।

২। স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম বর্ণ কিংবা য র ল ব হ পরে থাকিলে অ আ ভিন্ন অন্য স্বরের পরবর্তী বিসর্গ স্থানে র্ হয়। চতুঃ+দোলা=চতুর্দোলা। জ্যোতিঃ+লিঙ্গ=জ্যোতির্লিঙ্গ। আশীঃ+বাদ=আশীর্বাদ।

৩। স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ পঞ্চমবর্ণ কিংবা য, র, ল, ব, হ, পরে থাকিলে

র-জাত বিসর্গের স্থানে র-কার হয় অন্তঃ+আত্মা=অন্তরাত্মা। পুনঃ+জন্ম=পুনর্জন্ম। স্বঃ+লোক=স্বর্লোক। প্রাতঃ+ভ্রমণ=প্রাতর্ভ্রমণ। প্রাতঃ+আশ=প্রাতরাশ (breakfast)। পুনঃ+যাত্রা=পুনর্যাত্রা (উল্টোরথ)। নিঃ+গত=নির্গত। অন্তঃ+দেশীয়=অন্তর্দেশীয়, অন্তঃ+জাতীয়=অন্তর্জাতীয় (international), নিঃ+জন=নির্জন ("পুরী হতে দূরে গ্রামে নির্জনে"—রবীন্দ্রনাথ)। পুনঃ+উদ্ধার=পুনরুদ্ধার। দুঃ+বার=দুর্বার।

৪। স্-জাত বিসর্গের পর অকার ভিন্ন স্বরবর্ণ থাকিলে বিসর্গের লোপ হয়। অতঃ+এব=অতএব। শিরঃ+উপরি=শিরউপরি (এই সব স-জাত শব্দকে অনেক সময় অকারান্ত ধরিয়া সন্ধির সাধারণ নিয়ম প্রয়োগ করা হয়)। ("শিরোপরি শোভে শিখি চাঁদ কি ছাঁদে" —অনন্ত দাস), 'বক্ষ-পরে'—রবীন্দ্রনাথ। [কিন্তু 'বক্ষোমাঝে'—রবীন্দ্রনাথ]

৫। র-কার পরে থাকিলে বিসর্গজাত র-কারের লোপ হয় এবং পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হয়। নিঃ+রব=নির্+রব=নীরব। নিঃ+রোগ=নির্+রোগ=নীরোগ। চক্ষুঃ+রোগ=চক্ষুর্+রোগ=চক্ষূরোগ। নিঃ+রক্ত=নীরক্ত।

৬। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে অহ (ন্) শব্দের পর র-কার বা বিসর্গ র-কার হয়।

অহঃ+অহ=অহরহ ("অহরহ শুনি তব"—রবীন্দ্রনাথ), কিন্তু পতি প্রভৃতি শব্দ পরে থাকিলে বিকল্পে র-কার হয়—অহঃ+পতি=অহর্পতি, অহস্পতি। কিন্তু অহঃ+গণ=অহর্গণ। রাত্রি শব্দ পরে থাকিলে, ও-কার হয়—অহোরাত্র।

৭। ক-কার খ-কার, প ও ফ পরে থাকিলে অ, আ ভিন্ন স্বরের পরস্থিত বিসর্গ স্থানে ষ্ হয় এবং অকার কিংবা আকারের পরবর্তী বিসর্গস্থানে স্ হয়। বাস্তোঃ+পতি=বাস্তোষ্পতি। গীঃ+পতি=গীষ্পতি। নিঃ+পাপ=নিষ্পাপ। নিঃ+প্রদীপ=নিষ্প্রদীপ, (blackout)। নিঃ+পক্ষ=নিষ্পক্ষ। নিঃ+কারণ=নিষ্কারণ। আবিঃ+কার=আবিষ্কার। দুঃ+কৃতি=দুষ্কৃতি, নিঃ+ফল=নিষ্ফল। ভাঃ+কর=ভাস্কর। নমঃ+কার=নমস্কার। নভঃ+প্রয়াণ=নভস্প্রয়াণ।

৮। বিসর্গের পর ত কিংবা থ থাকিলে বিসর্গ স্থানে স্, ট কিংবা ঠ থাকিলে ষ্, চ কিংবা ছ থাকিলে শ্ হয়। নভঃ+তল=নভস্তল। মনঃ+তত্ত্ব=মনস্তত্ত্ব। শিরঃ+ছেদ=শিরশ্ছেদ। মনঃ+চক্ষে=মনশ্চক্ষে। ("মনশ্চক্ষে হেরি ভারত প্রাচীন"—রবীন্দ্রনাথ)। ধনুঃ+টংকার=ধনুষ্টংকার।

[৬] সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত ব্যঞ্জন সন্ধি

হরি+চন্দ্র=হরিশ্চন্দ্র। বৃহৎ (বাক্য)+পতি=বৃহস্পতি। তৎ+কর=তস্কর। (তৎ=তাহা যাহা মুখে আনা যায় না—এরূপ কর্ম যে করে), বন+পতি=বনস্পতি, আ+চর্য=আশ্চর্য। দিব্+লোক=দ্যুলোক ("সরল শিশুর তরল কণ্ঠ......উঠিল দ্যুলোক পানে"—কবিশেখর কালিদাস রায়—গাথাঞ্জলি)। বিশ্ব+মিত্র=বিশ্বামিত্র (ঋষির নাম), তাহা না হইলে 'বিশ্বমিত্র' (বিশ্বের বন্ধু)। গো+পদ=গোষ্পদ, ('গোষ্পদে বিম্বিত যথা অনন্ত আকাশ'—মানববন্দনা), আ+পদ=আস্পদ। প্রায়+চিত্ত=প্রায়শ্চিত্ত। পর+পরা=পরম্পরা। পতৎ+অঞ্জলি=পতঞ্জলি। ষষ্+দশ=ষোড়শ (ষষ্ঠদশ নহে)। সম্+কার=সংস্কার। সম্+কৃতি=সংস্কৃতি।

[৭] সন্ধি সম্বন্ধে বিশেষ দ্রষ্টব্য

সাধারণতঃ সংস্কৃত শব্দের সহিত বাঙ্‌লায় ব্যবহৃত অসংস্কৃত শব্দের সন্ধি হয় না। কিন্তু সাধু বাঙ্‌লা বাক্যের অনুকরণে ভাষার আভিজাত্য রক্ষা করিবার জন্য বিদেশী শব্দের সহিত সমাসে সন্ধির উদাহরণ পাওয়া যায়। যথা—দিল্লী+ঈশ্বর=দিল্লীশ্বর। বৃটেন+ঈশ্বরী=বৃটেনেশ্বরী। আইন+অনুসারে=আইনানুসারে। ঢাকেশ্বরী, আপিলেশ্বরী, (ঢাকার বিখ্যাত কালী মূর্তি), রামদুলালেশ্বর (কাশীধামে প্রতিষ্ঠিত শিব) হিসাবাদি, গ্যাসালোক। এরূপ স্থলে সন্ধি না করিয়া ড্যাস চিহ্নদ্বারা সমাস সূচিত করিলে অর্থবোধের সুবিধা হয়। হিসাব-আদি, গ্যাস-আলোক, আইন-অনুসারে।

বক্ষোমাঝে, 'মনোমাঝে'—সংস্কৃতের অনুকরণে প্রাকৃত শব্দের সহিত সন্ধি হইয়াছে। 'মনান্তর' শব্দের বাঙ্‌লা শুদ্ধরূপ "মনস্তর" লিখিলে (মন্‌+অন্তর) ভাল হয়। জগদ্বন্ধু, জগন্মোহন, জ্যোতিরীশ প্রভৃতির বিকৃতরূপ বাঙ্‌লায় পাওয়া যায়—জগবন্ধু, জগমোহন, জ্যোতীশ। [এ সকল প্রয়োগ অশুদ্ধ হইলেও লোকের নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়]।

তৎসম (সংস্কৃত) সমস্তপদের অংশবিশেষে অনেক সময়ে অর্থের প্রাধান্য, ছন্দের অনুরোধ বা লালিত্যের জন্য সন্ধি পরিত্যাগ করিতে হয়। গদ্যেরও ছন্দ আছে। সুতরাং সেখানেও মাধুর্যের জন্য সন্ধি করা হয় না। 'কনক আসনে দশানন বলী' (মেঘনাদ বধ), 'কনক-উদয়াচলে দিনমণি'। 'প্রসন্ন মুখছবি', 'ঘন অন্ধকার বনবীথি', 'মঞ্জরিত ইন্দুমল্লী-বল্লরী বিতানে' (রবীন্দ্রনাথ)। সু+উচ্চ=সু-উচ্চ (শরচ্চন্দ্র)।

[৮] বাঙ্‌লা সন্ধি

খাঁটি বাঙ্‌লা শব্দের মধ্যবর্তী সন্ধিতে বহু স্থলে তৎসম শব্দের সন্ধির নিয়ম (=সংস্কৃত সন্ধির নিয়ম) অনুসৃত হইয়া থাকে।

১। অ+আ, আ+অ বা আ=আ। ঠাকুর+আলি=ঠাকুরালি। দুষ্ট+আমি=দুষ্টামি। নষ্ট+আমি=নষ্টামি। মিতা+আলি=মিতালি। বঙ্গ+আল=বঙ্গাল। সুতা+আলি=সুতালি (সুতার মতো)। গাভুর+আলি=গাভুরালি (প্রাচীন বাঙ্‌লায়)।

২। অ+এ=এ। শত+এক=শতেক। তিল+এক=তিলেক। বার+এক=বারেক। আধ+এক=আধেক (অর্ধেক) এত+এক=এতেক (কবিতায়)। যত+এক=যতেক (কবিতায়)। রাম+এর=রামের। বাপ+এর=বাপের। হাড়+এর=হাড়ের। দশ+এক=দশেক।

৩। বহু স্থলে সন্ধিতে পরবর্তী স্বর লুপ্ত হয়ঃ—যা+ইচ্ছে তাই=যাচ্ছেতাই। মুনি+এর=মুনির।

৪। অনেক জায়গায় চবর্গ পরে থাকিলে পূর্ববর্তী স্বর লুপ্ত হয় এবং চবর্গের দ্বিত্ব হয়ঃ—জুয়া চোর=জোচ্চোর। কহিছে =ক'চ্ছে। গোটা দুই চার=গোটা দুচ্চার।

৫। সমাসবদ্ধ পদে অনেক সময় পূর্ব পদের স্বরের লোপ হয়ঃ—ঘোড়া (র)+দৌড়=ঘোড়্‌দৌড়। ঘোড়(র)+সওয়ার=ঘোড়্‌সওয়ার। কাঁচা+কলা=কাঁচ্‌কলা। কাল্‌সাপ, কাল্‌শিরা ইত্যাদি।

৬। বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ পরে থাকিলে দ্রুত উচ্চারণে বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয়বর্ণ পরবর্তী তৃতীয় চতুর্থ বর্ণের মতো শুনা যায়ঃ—শাক (+এর)+ঘণ্ট=শাগ্‌ঘণ্ট। ডাক+ঘর=

ডাগ্‌ঘর। মাঠ(=মাঠা)+ঘোল=মাড্‌ঘোল। হাত+ধরা=হাদ্ধরা। পাঁচ+জন=পাঁজ্জন। ধুপ্‌+দেওয়া=ধুব্‌দেওয়া।

৭। বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ পরে থাকিলে পূর্ববর্তী তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ স্থানে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ হয়ঃ—মেঘ+করেছে=মেক্‌ করেছে। বড়+ঠাকুর=বট্‌ঠাকুর। বাজ+পড়ে=বাচ্‌পড়ে। ভাঁজ+কর=ভাঁচ্‌কর।

৮। চকারের পর শ ষ ও স থাকিলে চ স্থানে শ্‌ হয়। পাঁচ+সের পাঁশ্‌সের। পাঁচ+শিকা=পাঁশ্‌শিকা।

৯। রকারের (র্‌) পর ব্যঞ্জনবর্ণ থাকিলে 'র'কার পরবর্তী ব্যঞ্জনে পরিণত হয়। স্বর্‌গ (স্বর্গ)—সগ্গ (শগ্‌গ)। চিঁড়ের+চাক=চিঁড়েচ্চাক। কর্‌+না=কন্না (উদাহরণ 'ঘর-কন্না')। চরণামৃত=চন্নামেত্তো। চার+টি=চাট্টি। ব্যাটার ছেলে=বেটাচ্ছেলে।

[উপরের উদাহরণগুলির সন্ধি কথিত ভাষার দ্রুত উচ্চারণের সময় লক্ষ্য করা হয়—কিন্তু সাহিত্যে লেখা হয় না]

অনুশীলনী

(১)। সংস্কৃত ও বাঙ্‌লা সন্ধির পার্থক্য প্রদর্শন কর। (২)। সন্ধি বিশ্লেষণ করঃ-শরদভ্রচ্ছায়া (উঃ মাঃ (১৯৬১) চতুরঙ্গ, উড্ডীন, সংস্কার, হিতৈষী, গবাক্ষ, নীরব, দ্যুলোক, পদ্ধতি, প্রৌঢ়, সীমন্ত, পতঞ্জলি বিচ্ছেদ, চলচ্ছক্তি, যাবজ্জীবন প্রাতরাশ, দশার্ণ, উচ্ছ্বাস, তস্কর, বৃহস্পতি, ছোড়্‌দা, বট্‌ঠাকুর, পাঁশ্‌শের, জগদ্দল, সদ্যোজাত, সংস্কৃতি, গবেষণা নাবিক, তৃষাতুর, পয়োধি অভ্যুদয়, শীতার্ত প্রত্যাবর্তন নির্বোধ, মনোভাব, ব্যভিচার, নীরক্ত স্বাগত, নাবোঢ়া, অন্ত্যেষ্টি শুদ্ধোদন যৎপরোনাস্তি রাজর্ষি (উ মা)। (৩)। সন্ধিতে ভুল থাকিলে সংশোধন করঃ—সৎভাব জগবন্ধু, দুরাবস্থা জ্যোতীন্দ্র, ভূম্যাধিকারী, নিরব, বয়বৃদ্ধ, পশ্বাধম, চলৎশক্তি, উচ্ছাস, বিপৎজাল, পর্যাটন সদ্যজাত, মনরথ, ততধিক, মনান্তর, কিম্বা, বাক্‌রোধ, স্রোতোপথ, প্রত্যাখ্যান, তড়িৎগমনা, সন্ন্যাসিনী বাক্‌যুদ্ধ, সদ্যপ্রজ্বলিত প্রত্যশা, নিরস। এতদ্‌সত্ত্বেও (উ ম ১৯৬৩) (৪)। সন্ধিদ্বারা যুক্ত করঃ—অক্ষ+ঊহিনী, সু+আগত, দুঃ+অবস্থা, নভঃ+মণ্ডল, দিক্‌+অন্ত, প্রীতি+উপহার (বাঙ্‌লা ও সংস্কৃত), অনুমতি+অনুসারে, ভূমি+অধিকারী বিম্ব+ওষ্ঠ, পিতৃ+আলয়, স্ব+ঈরিণী, কুল+অটা, মনস্‌+ঈষা, বাক্‌+নিষ্পত্তি, স্বমহিম+ছায়া, পরি+ছন্ন, উৎ+স্থাপন, শিবঃ+ভাগ নভঃ+অনিল, প্রাতঃ+আশ চক্ষুঃ+রোগ, নিঃ+প্রদীপ, মনঃ+তত্ত্ব, জ্যোতিঃ+ঈশ, বিদ্যুৎ+লীলা, ইন্দ্রধনু+ছটা, জল+ছবি (বাঙ্‌লা সন্ধি), ধূপ+ছায়া (বাঙ্‌লা সন্ধি), স্ত্রী+আচার (বাঙ্‌লা সন্ধি), মুখ+ছবি (বাঙ্‌লা সন্ধি), মনঃ+কষ্ট, শিরঃ+উপরি, মনঃ+তুষ্টি, তরু+ছায়া, মরু+উদ্যান,তড়িৎ+আলোক। (৫)। বাঙ্‌লা সন্ধির নিজস্ব কোন নিয়ম আছে কি? উদাহরণ-সহ সংক্ষেপে আলোচনা কর। (৬)। দুইটি স্বর সন্ধিহীন অবস্থায় এক পদে বা সমাসে, পাশাপাশি বসিলে তাহাকে কি বলে? উদাহরণ দাও।

চতুর্থ অধ্যায়

ণত্ব বিধান ও ষত্ব বিধান

[১] ণত্ব বিধান

বাঙ্‌লা ভাষায় 'ন' এবং 'ণ'-এর উচ্চারণে কোন ভেদ নাই। সুতরাং তদ্ভব ও বিদেশী, দেশী শব্দে একমাত্র 'ন' লিখিলেই চলে। রানী কান সোনা, রামায়ন কোরান, গ্রীন, করোনার,

পুরানো, হারান, করেন। বাঙলাতে তৎসম (সংস্কৃত) শব্দের বানানের জন্য ণত্ব বিধি জানা প্রয়োজন।

১। ঋ, র ও ষ-কারের পর এক পদস্থিত ন-কার স্থানে মূর্ধন্য 'ণ'কার হয়।

ঋণ, তৃণ, স্মরণ, করণ, ভূষণ, বিষ্ণু, চূর্ণ, পূর্ণ। ভিন্ন পদ হইলে হয় না। যথা—হরিনাম, দুর্নাম, ত্রিনয়না, বারিনিধি ইত্যাদি। এখানে একাধিক পদ মিলিয়া সমস্ত পদ হইয়াছে।

২। স্বরবর্ণ, ক বর্গ, প বর্গ, য ব হ ব্যবধান থাকিলেও ঋ র ষ-কারের পর দন্ত্য 'ন' কার মূর্ধন্য 'ণ' কার হয়। যথা—হরিণ, আক্রমণ, রুক্মিণী, ম্রিয়মাণ, সমর্পণ। ইহা ছাড়া অন্য বর্ণ ব্যবধান থাকিলে দন্ত্য 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয় না। যথা—দর্শন, প্রার্থনা, রচনা, রোদন, রসনা, কীর্তন, অর্চনা, বর্ণনা, বর্ধন, মর্দন, মূর্ধন্য।

৩। পদের অন্তস্থিত ন্ কার মূর্ধন্য 'ণ' কার হয় না ঃ—মৃন্ময়, (মৃন্ময়—শব্দে 'মৃৎ'কে পদরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে), শ্রীমান্, ব্রহ্মন্।

৪। ট বর্গের সহিত 'ণ' কার ব্যবহৃত হয় ঃ—কণ্টক, বণ্টন, ষণ্ডা, গুণ্ডা, ভণ্ড, ভাণ্ড, বৈকুণ্ঠ, লুণ্ঠন, অবগুণ্ঠন, চণ্ড, খণ্ড, দণ্ড।

৫। উপসর্গের 'র' কারের পরবর্তী কতকগুলি ধাতুর 'ন' কার মূর্ধন্য 'ণ' হয়। প্রণয় প্রণীত, প্রণাম, প্রণতি, প্রণাশ, প্রহণন, প্রাণ, পরায়ণ।

৬। প্র, পরি প্রভৃতি উপসর্গের পর 'নি' উপসর্গ থাকিলে 'ন' কার মূর্ধন্য 'ণ' হয় ঃ—প্রণিপাত, প্রণিধান।

৭। কতকগুলি শব্দে, 'ণ' কার স্বাভাবিক ঃ—বীণা, বেণু, বাণ, কল্যাণ, লাবণ্য, পুণ্য, পাণি, নিপুণ, গণ, বণিক্, চিক্কণ, গুণ, চাণক্য, পণ, কঙ্কণ, কণিকা, লবণ, নিক্কণ।

সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ রীতি অনুসারে এই উদাহরণগুলির ণত্ব স্বাভাবিক। ইহার কোন কারণ নির্দেশ করা চলে না। ইহাদিগের বানান কোন রকম পরিবর্তন না করিয়া যেরূপ আছে সেই রূপেই বাঙলায় লেখা হইয়া থাকে।

ইহা ছাড়া ণত্ববিধান প্রকরণের 'ন'-কার স্থানে 'ণ' কারের ব্যবস্থা নৈমিত্তিক (প্রভাবিত)। কোন বিশেষ বিশেষ বর্ণের পূর্বে অবস্থান-বশতঃ (যথা ঋ র ষ কারের পর একপদে ন কার স্থানে 'ণ' হয়) ঐ সকল নকারের পূর্ববর্তী ঋ র ষ-কে নিমিত্ত বলা হয়।

৮। আম্রবণ, শরবণ, ইক্ষুবণ প্রভৃতিতে 'বন' শব্দের 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয়।

৯। নারায়ণ, পরায়ণ, উত্তরায়ণ, রামায়ণ শব্দের অন্তিম 'ন' কার মূর্ধন্য ণ কার হয়।

[২] ষত্ব বিধান

১। অ আ ভিন্ন স্বরবর্ণের এবং ক-কার ও র-কারের পরবর্তী প্রত্যয়ের এবং আদেশের দন্ত্য স-কার স্থানে মূর্ধন্য ষ-কার হয়। কল্যাণীয়েষু, বুভুক্ষিত, (ক্ ষ্), সুষুপ্ত (আদেশের স-কার—বিকারপ্রাপ্ত স), মুমূর্ষু, মুমুক্ষু, (ক্ ষ্ উ)। অকারের পর 'সুচরিতাসু' ও 'কল্যাণীয়াসু' প্রভৃতিতে ষ-কার হয় নাই।

২। অ আ ভিন্ন উপসর্গস্থিত স্বরের পরবর্তী কতকগুলি ধাতুর স-কার 'ষ' হইয়া

থাকে। অভিষেক (অভি+সিচ্ ধাতু), নিষেধ, প্রতিষেধ, অনুষ্ঠান, নিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠা, দুর্বিষহ, বিষাদ, বিষয়, নিষেবণ, পরিবেষিত।

৩। সমস্ত পদেও সাধারণ নিয়ম অনুসারে ষত্ব হইয়া থাকে:—যুধিষ্ঠির (যুধি+স্থির), মাতৃষ্বসা, গোষ্ঠ, সুষমা।

৪। সাৎ প্রত্যয়ের স-কার ষ হয় না,—ভূমিসাৎ, অগ্নিসাৎ।

৫। বাঙ্‌লা তৎসম শব্দে (সংস্কৃত শব্দে) অনেক স্থলে স্বাভাবিক ষ-কার রহিয়াছে:—ঔষধ, কোষ, পুরুষ, প্রদোষ, পাষাণ, নিকষ, মহিষ, পোষণ, বাষ্প, সর্ষপ, পাষণ্ড, আষাঢ়, অভিলাষ। এই ষত্বের কোন কারণ নির্দেশ করা চলে না।

৬। সংস্কৃত বানানের অনুকরণে খাঁটি বাঙ্‌লা শব্দেও ষত্ব বিধির প্রয়োগ দেখা যায়:—ষাঠ (ষষ্ঠী), পোষা, আঁষ (আমিষ), সর্ষে।

৭। বিদেশী শব্দেও সংস্কৃত বানানের রীতি গ্রহণ করা হইয়াছে। এসব স্থলে উচ্চারণ অনুসারে স বা শ লেখা উচিত—মুষলমান (মুসলমান লেখা উচিত)। ষ্টেসন (স্টেশন লেখা উচিত), জিনিষ (জিনিস), ষ্ট্যাম্প (স্ট্যাম্প), তক্তপোষ (তক্তপোশ), বালাপোষ (বালাপোশ), পাপোষ (পাপোশ)।

অনুশীলনী

১। উদাহরণ-সহ ণত্ব, ষত্ব বিধানের প্রধান সূত্র নির্দেশ কর। (উঃ মা, ১৯৬৩) ২। শুদ্ধ করিয়া লিখ:—মৃণ্ময়, রুক্মিনী, সমর্পন, অর্পনা, মাতৃস্বসা, সর্সপতৈল, (হিমালয়ের) তুসাররাশি, পরিনাম, হরিণাম, দুর্ণাম, করেণ, বাস্পীয় শকট, ঔসধ, পাসান, সুসমা, লবন, নিক্কন, কঙ্কন, নারায়ন। ৩। ণত্ব বিধিব বা ষত্ব বিধির প্রয়োগ বুঝাইয়া দাও:—ম্রিয়মাণ, কণ্টক, কীর্তন, দুর্নাম, করকমলেষু, সুচরিতাসু, বুভুক্ষা, ভূমিসাৎ, পরিবেষিত, (১৯৬০ উঃ মাঃ)। ৪। ব্যাখ্যা কর:—স্বাভাবিক ষত্ব (উঃ মাঃ ১৯৬৩) নৈমিত্তিক ণত্ব। ৫। তদ্ভব ও বিদেশী শব্দের বানানে কি ণত্ব বিধান ও ষত্ব বিধান মানা হয়? (উঃ মা ১৯৬৩)

দ্বিতীয় পর্ব

পদ প্রকরণ

প্রথম অধ্যায়

পদ ও পদের বিভাগ

ভাষা অর্থবিশিষ্ট বহু বাক্যের সমষ্টি। প্রত্যেক বাক্য আবার পরস্পর সম্বন্ধ-বিশিষ্ট পদ লইয়া গঠিত। শব্দের উত্তর বিভক্তি যোগে পদ হয়। শব্দগুলি, ধাতুর সহিত অথবা অন্য শব্দের সহিত প্রত্যয় যোগে গঠিত হয়। ধাতুগুলি ক্রিয়াবাচক শব্দ। ধাতুর উত্তর ক্রিয়া-বিভক্তি যোগে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। √কর্ ধাতুর উত্তর ক্রিয়াবিভক্তি—এ-যোগে 'করে' ক্রিয়াপদ গঠিত হইয়াছে। অনেক স্থলে শব্দের মূল যে ধাতু তাহা বাহির করা যায় না।

'সুদক্ষ সবল কৃষকেরা প্রতিদিন খেতে তাহাদের নিয়মিত কাজ করে।' ইহা একটি সার্থক বহুপদের সমষ্টি বাক্যবিশেষ। 'কৃষক' শব্দের উত্তর 'রা' বিভক্তি যোগ করায় 'কৃষকেরা'

একটি পদে পরিণত হইয়াছে। এটি **বিশেষ্য** পদ কেননা ইহা কোন বিশেষ জাতি বা শ্রেণীর নাম। 'সবল সুস্থ' পদ দুইটি 'কৃষকেরা'-পদের **বিশেষণ**—তাহার গুণ প্রকাশ করিতেছে। বাঙ্‌লায় বিশেষণে বিভক্তি থাকে না—না থাকিলেও উহা পদ, উহা বিশেষ্য ও সর্বনামকে বিশেষিত করে। [ক্রিয়াকে বিশেষিত করিলে অবশ্য অনেক যায়গায় বিশেষণের সহিত বিভক্তি যুক্ত হয়। 'সে বলে ভাল, চলে ধীরে'—'ধীরে'তে বিভক্তি আছে 'ভাল'তে বিভক্তি নাই]। 'প্রতি' দিনের 'প্রতি' **শব্দ অব্যয়**—ইহা সর্বত্র একই প্রকার থাকিবে—বিভক্তি অনুসারে ইহার কোন পরিবর্তন নাই। 'প্রতিদিন' 'করে'—ক্রিয়ার বিশেষণ। 'তাহাদের' পদ **সর্বনাম**—কেননা বিশেষ্যপদ 'কৃষকেরা' পদের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন 'দের' রহিয়াছে। 'নিয়মিত' বিশেষণ, 'কাজ' বিশেষ্য পদ—**ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য**, কর্মকারকের দ্বিতীয়া বিভক্তি লুপ্ত। 'করে' ক্রিয়াপদ। 'কর্' ধাতু হইতে উৎপন্ন।—'এ' বিভক্তি যোগে 'করে রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে পদ পাঁচ প্রকারঃ—**বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া।**

পদসমূহের বিশেষ্যাদি পাঁচ প্রকারে **বিভাগ** বিজ্ঞানসম্মত নহে। যে কোন শব্দকে বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম প্রভৃতি বলা চলে না—বাক্যে তাহাব স্থান ও অর্থ অনুসারে উহা নির্ণীত হইবে। তাই ভাবতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাচীন বৈযাকরণ (পাণিনি) পদকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন—সুবন্ত ও তিঙন্ত। বাঙ্‌লায 'তিনি মৌনাবলম্বন করিলেন'—এখানে মৌন বিশেষ্য।

কিন্তু "হের মৌন নভস্তল, মৌন জলস্থল" (ববীন্দ্রনাথ)—এখানে মৌন **বিশেষণ**। "ধনবান্ লোকেরই ধনে মমতা হয়" এখানে ধনবান্ বিশেষণ, কিন্তু 'খরচ না করিলে, ধনবানের ধনের কোন মূল্য নাই।'—এই বাক্যে 'ধনবান্' বিশেষ্য পদ।

সর্বনাম যেমন বিশেষ্যের পরিবর্তে বসে তেমনই স্থানবিশেষে বিশেষ্যও সর্বনামের কাজ করে। 'সে রসে বঞ্চিত **দাস গোবিন্দ**'—এখানে 'দাস গোবিন্দ' "আমি" কথার পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। সর্বনামের অব্যয়রূপে ব্যবহার এই পুস্তকে অন্যত্র দেখান হইয়াছে। বিশেষ্য পদের ক্রিযারূপে ব্যবহার—দান হইতে 'দানিলা' (দান করিলেন—কবিতায়)।

[ক] বিশেষ্য (নাম পদ)

কোন শব্দ উচ্চারণ করিলে যাহাদ্বারা কোন দ্রব্যের আকৃতি মনে ভাসিয়া উঠে এইরূপ জাতি, ব্যক্তি, দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়াবাচক শব্দকে নাম বা **বিশেষ্য** পদ বলে। সুতরাং বিশেষ্য পদ জাতি, ব্যক্তি, গুণ ও ক্রিয়া প্রভৃতির নাম।

বিশেষ্য পাঁচ প্রকারঃ—(১) ব্যক্তিবাচক (সংজ্ঞাবাচক), (২) জাতিবাচক ও সমষ্টিবাচক, (৩) বস্তুবাচক, (৪) গুণবাচক, (৫) ক্রিয়াবাচক বা কর্মবাচক। (১) বিশেষ্য যখন কোন বিশেষ বস্তু, স্থান, ব্যক্তি প্রভৃতিকে বুঝায় তখন উহা ব্যক্তিবাচক বা সংজ্ঞাবাচক হয়ঃ—রবীন্দ্রনাথ, বারাণসী, গঙ্গা, যমুনা, প্রেসিডেন্সী কলেজ, হিমালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বাঙ্‌লা ভাষা। (২) (ক) বিশেষ্যপদ যখন এক জাতীয় বহু বস্তুকে বুঝায় তখন উহাকে 'জাতিবাচক' বিশেষ্য বলেঃ—পুরুষ, স্ত্রী, গৃহ, কারখানা, বিদ্যালয়, আর্য, অনার্য, হিন্দু, গ্রীক। (খ) সমষ্টিবোধক শব্দের নাম "সমষ্টিবাচক বিশেষ্য"ঃ—জনতা (জনদিগের সমূহ),

বন্যা (বন=জলের সমূহ, জলোচ্ছ্বাস বা জলপ্লাবন) (কর্মি-) সংঘ, (জন-) সমাজ। (৩) যে সব বস্তু সংখ্যাদ্বারা নির্দেশ করা সম্ভবপর নহে—যাহাদিগের ওজন পরিমাণ দ্বারা বুঝাইতে পারা যায় সেই সব বস্তুর নামকে বস্তুবাচক বিশেষ্য বলে:—ঘি, ধান, চাল, চিনি, তেল। যখন ইহাদিগকে সংখ্যাদ্বারা প্রকাশ করা সম্ভবপর হইবে তখন ইহারা জাতিবাচক বিশেষ্য হইবে। গাছের ঘি, গাওয়া ঘি,—ভয়সা ঘি, এই তিন রকম ঘি বাজারে উঠিয়াছে। (৪) গুণ-বাচক বিশেষ্য কোন গুণ বা ভাবের নামকে বুঝায়:—উদারতা, গৌরব, সৌভাগ্য দৈন্য, বিদ্যা, জ্ঞান, কল্পনা, প্রেম, ভালবাসা, স্নেহ, লাবণ্য। (৫) কৃৎ-প্রত্যয় দ্বারা গঠিত, কার্যের নাম বোধক শব্দকে **ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য** বলে:—দান, গমন, ভোজন, চিন্তন, চড়া, উঠা, বেড়ান, খেলা, খাওয়া ইত্যাদি।

[খ] বিশেষণ

যে পদ বিশেষ্যপদের, ক্রিয়ার বা বিশেষণের দোষ, গুণ, সংখ্যা, অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে বিশিষ্টতা প্রকাশ করে তাহাকে **বিশেষণ** বলে। যথা:—শীতল বাতাস, ঠান্ডা জল, গরম ভাত, খুব খারাপ লোক, অত্যন্ত দুষ্ট, নির্দয় আঘাত, তুচ্ছ আচার, চারের পৃষ্ঠা, দুর্বার স্রোত, ধীরে বাতাস বহে। অসমাপিকা ক্রিয়াও ক্রিয়ার বিশেষণরূপে কার্য করিয়া থাকে—'তাঁটনী হইয়া যাইব বহিয়া', 'গান গেয়ে নদীয়ার পথে পথে যায়'।

[১] বিশেষণের শ্রেণীবিভাগ

বিভিন্নপ্রকার পদের বিশেষক হিসাবে বিশেষণ-কে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:—(১) বিশেষ্য বিশেষণ (নামপদ বিশেষণ) (২) বিশেষণীয় বিশেষণ (৩) ক্রিয়া বিশেষণ।

(১) **বিশেষ্যের** দোষ গুণ প্রকাশ করিলে বিশেষণকে বিশেষ্য বিশেষণ বলে (ইহাকে নাম পদ বিশেষণ বলা যাইতে পারে):—শীতল বাতাস, স্বচ্ছ সলিল, গভীর বন। বিশেষণ সর্বনামকেও বিশেষিত করিতে পারে। যথা—**সেই** আমি আজও আছি। কাঁচা আমি আর পাকা আমি মূলতঃ একই।

(২) যে বিশেষণ অপর বিশেষণের দোষ গুণ অবস্থা প্রকাশ করে তাহাকে **বিশেষণীয় বিশেষণ** বলে:—নেহাৎ ভাল মানুষ, অত্যন্ত চালাক ভাবি দুষ্ট।

(৩) যে বিশেষণ ক্রিয়ার দোষ গুণ প্রকার প্রভৃতিকে প্রকাশিত করে তাহাকে **ক্রিয়া বিশেষণ** বলে:—(ক) **ধীরে** বাতাস বহিতেছে। (খ) '**ত্বরায়** আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি' (ভারতচন্দ্র)। (গ) 'এসো এসো **ত্বরা**' (ভাবতভীর্থ)। (ঘ) "**গুরু** গরজায় বাজ" (কান্ডারী হুঁশিয়ার)। [ক্রিয়া-বিশেষণের বিভক্তি—(ক) ও (খ) উদাহরণে—তৃতীয়া (-এ, -য়)—(গ) ও (ঘ) উদাহরণে ক্রিয়া বিশেষণের শূন্য বিভক্তি হইয়াছে]

অর্থানুসারে বিশেষণের বিভাগ

(ক) গুণবাচক (বিশেষণ):—লাল ফুল, নীল যমুনা, মন্দগতি ছন্দ, গৈরিয়াবসনা সন্ধ্যা, মেঠো হাওয়া, ধার্মিক লোক, ত্রস্ত চকিত মৃগদল, হিল্লোলিত তরঙ্গ। (খ) উপাদান বাচক—চিন্ময়ী বাণী (ঐকতান), (চালুসেরে বাঁধা দিনু) মাটিয়া পাথরা কবিকঙ্কণ) (গ) সংখ্যা ও পরিমাণ বাচক:—অযুত কোরক, চার পাগল, এক কাঠি, দুই বিঘা জমি, পাঁচসের

চাউল। (ঘ) পূরণার্থক—অষ্টম বর্ষ, তৃতীয় শ্রেণী, পয়লা তারিখ। (ঙ) সর্বনামবিশেষণ (সর্বনামীয় বিশেষণ)—কোন্ সাগর, কি কথা, সে দেশ, উভয় লোক, পূর্ব দিক্, যে লোক, আপন জন, সর্বজন।

গঠনানুসারে বিশেষণের বিভাগ

(১) **একপদাত্মক বিশেষণ**—পূর্বোক্ত (ক) হইতে (ঙ) পর্যন্ত, উদাহরণগুলিতে সমাসবদ্ধ পদছাড়া সকল বিশেষণই একপদাত্মক যথা—লাল, নীল, ধার্মিক, চিন্ময়ী, মাটিয়া ইত্যাদি। (২) **সমস্ত পদ বিশেষণ**—গেরুয়াবসনা (সন্ধ্যা), 'ত্রস্তচকিত (মৃগদল)', নন্দী জপমালা ধৃত (প্রান্তর), কোলভরা (কনক ধান্য), নীল-অঞ্জন গিরি নিভ (কান্না) (কালবৈশাখী)। (৩) **বাক্যাত্মক বিশেষণ**—যারপরনাই পাজী, খানিকটা পাশ করা ডাক্তার, সব পেয়েছির আসর, নাই মামা, সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীর। (৪) **ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত বিশেষণ**—বইখানার চারের পৃষ্ঠা খোল, লোকটা **একের নম্বর পাজি**, **গুণের** ভাই (=গুণবান্ ভাই) আমার সবই পারে! স্নেহের মিনতি গুঞ্জরি উঠিল ধ্বনি পল্লব মর্মরে (রবীন্দ্রনাথ), **বাহিরের** প্রবীণতা (=বাহ্য প্রবীণতা) (—স্বাদেশিকতা)। (৫) **শব্দদ্বৈতঘটিত বিশেষণ**—"সুধারুচি মুচমুচি লুচি" (ভারতচন্দ্র) "শান্তিপুর ডুবুডুবু', মারমার বাণী (ফরিয়াদ)। (৬) **শব্দদ্বৈতঘটিত ক্রিয়াবিশেষণ**—অসি বাজে ঝন্‌ঝন্, দমকে দামিনী বারে বার (কৃষ্ণা রজনী), 'লয়ে রশারশি করে কষাকষি'। (৭) **খণ্ডবাক্যাত্মক বিশেষণ**—বাল্যকালের সুন্দর দিনগুলি যাহাদের স্মৃতি আজিও হৃদয়ে গাঁথা আছে তাহারা আর কখনও ফিরিবে না।

অবস্থানানুসারে বিশেষণের ভেদ

প্রত্যেক বাক্যের দুইটি প্রধান অংশ থাকে—**উদ্দেশ্য ও বিধেয়**। (১) **উদ্দেশ্যাংশে বিশেষণ** কর্তার পূর্বে বসে:—ভাল ছেলে ভাল কাজ করে। (২) **বিধেয় বিশেষণ**—যে বিশেষণ বাক্যের বিধেয়াংশে ব্যবহৃত হইয়া কর্তাকে বিশেষিত করে তাহাকে **বিধেয় বিশেষণ বলে**—রাজা দীনের **শরণ**, লোকটি ভাল, হে **কাশি**! কবীশদলে তুমি **পুণ্যবান্**। [অর্থের সম্পূর্ণতার জন্য বিধেয়-বিশেষণ প্রয়োজনীয়—'রাজা দীনের' কি? উত্তর শরণ—এখানে 'শরণ' পদ প্রয়োগ না করিলে অর্থ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে]।

বিশেষণের পদান্তরে প্রয়োগ:—(১) ভাল ছেলে ভাল কাজ করে। (বিশেষণ) (২) তোমার **ভাল** নিয়ে তুমি থাক। (বিশেষ্য) (৩) গায়ক গান গায় **ভাল**। (ক্রিয়াবিশেষণ) (৪) **ভাল**! আমি তো তোমায় একথা বলিনি। ভাল, তাই হবে। (অনন্বয়ী অব্যয়) (৫) **ভালয়-ভালয়** ছেলে এ যাত্রা রক্ষা পেলে হয়; (শব্দদ্বৈত ক্রিয়াবিশেষণ)। (৬) মহাপুরুষেরা শত্রুকেও **ভালবাসেন**। (সংযুক্ত ক্রিয়া) (৭) **ভাল মানুষের** মেয়ে! তোমাকে এ বাড়িতে অনেক কষ্ট পেতে হয়। (ভাল মানুষের=অমুকের—অনির্দিষ্টনামা ব্যক্তির—**সর্বনামস্থানীয় বিশেষণ**) [বিশেষণের লিঙ্গবিচার এই পর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য]।

[২] বিশেষণের তারতম্য

কোন এক বস্তু বা ব্যক্তি হইতে অপর বস্তুর উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝাইতে বিশেষণের অর্থের তারতম্য হয়। এই তারতম্য নানাভাবে প্রকাশ করা যায়:—

(১) যাহার সহিত তুলনা দেওয়া হয় এরূপ পদের উত্তর পঞ্চমী বিভক্তি প্রয়োগ করিয়া

বিশেষণ পদটিকে অবিকৃত রাখিয়া ইহা করা যাইতে পারেঃ—**হরি অপেক্ষা রাম** বয়সে বড়। **তোমার চেয়ে** বড়র কাছে যাব। [সংস্কৃত ভাষায় বিশেষণ, তর, তম, প্রত্যয় বা ঈযস্ ইষ্ঠযুক্ত হইয়া সর্বত্র ব্যবহৃত হয়]।

(২) দুইয়ের মধ্যে তুলনায় বৈশিষ্ট্য দেখাইতে অধিক, একটু অল্প প্রভৃতি শব্দ বিশেষণের পূর্বে বসে। ছেলে দুইটির মধ্যে রাম একটু বড়।

(৩) সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে একটি বস্তুকে অপবের সহিত তুলনা করিতে 'তর' ও 'ঈয়স্' এবং বহুর মধ্যে সজাতীয় একটিকে তুলনায সর্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে 'তম' ও 'ইষ্ঠ' প্রত্যয বাঙলাতে ব্যবহৃত হয়ঃ—

সকল কবির মধ্যে কালিদাস শ্রেষ্ঠ(ইষ্ঠ)। রাম অপেক্ষা শ্যাম কৃশতর। বামবাবুব তিন ছেলের মধ্যে প্রদীপ কনিষ্ঠ। সীতা ও সাবিত্রীব মধ্যে ত্যাগে কে **গরীয়সী** তাহা লইযা আলোচনা চলিতে পারে। সত্যকথা বলায় সত্যকামকে দ্বিজোত্তম বলা যায (উত্তম=উৎ+তম)।

দুইয়ের মধ্যে তুলনা দেখাইতে অনেক সময় ষষ্ঠী বিভক্তি ব্যবহৃত হয়ঃ—'বয়সে **বাপের বড়**' (ভাবতচন্দ্র)। 'আমাদেব এই সাধনা **শব-সাধনার** বাড়া' (আমরা)। বহুর মধ্যে তুলনায '**মধ্য**' শব্দেব সহিত ষষ্ঠী বিভক্তির প্রযোগ হইয়া থাকে—কবিগণেব মধ্যে কালিদাস শ্রেষ্ঠ।

[গ] সর্বনাম

বিশেষ্যেব পবিবর্তে ব্যবহৃত পদের নাম সর্বনামঃ—'আমি' 'তুমি', 'যে', 'সে', 'তাহা', 'তাঁহাবা' প্রভৃতি। বন্ধুব বাড়ি গিযা শুনিলাম **সে** কোথায গিযাছে কেহ বলিতে পারে না। বক্তা ব্যক্তিব পবিবর্তে ব্যবহৃত সর্বনাম **উত্তম পুরুষ** যথা—আমি **আমরা**। যাহাকে কিছু বলা হয তদ্বাচক সর্বনাম **মধ্যম পুরুষ**, যথা—**তুমি, তোমরা, তোরা, তুই**। যাহার সম্বন্ধে কিছু বলা হয, সেই ব্যক্তিব প্রকাশক সর্বনাম **প্রথম পুরুষ**, যথা—**সে, তিনি, তাহা, তাহারা**।

সর্বনামের শ্রেণী-বিভাগ

(১) **ব্যক্তিবাচক**ঃ—আমি, তুমি, সে, তিনি আপনি তুই। (২) **নির্দেশবাচক সর্বনাম**—এ, ঐ, সে, এই। (ক) **সন্নিকৃষ্ট সর্বনাম**—এ (জগৎ), ইহা, ইনি। (খ) **পরোক্ষ সর্বনাম**—ওই, উহা, উনি। (৩) **সংযোগবাচক**—সে, যে তিনি তাহা (সম্বন্ধবাচক)। (৪) **সর্বাত্মক**—সব, সকল। (৫) **প্রশ্নবাচক**—কি কয, কই, কোন। (৬) **অনিশ্চযার্থক**—কে, কেউ, কেহ কেহ, কোন-কোন। (৭) **ব্যতিহার সর্বনাম**—আপনা-আপনি। (৮) **আত্মার্থক সর্বনাম**—আপনি, নিজ।

সর্বনামীয-বিশেষণ

আমি তুমি ছাড়া আব সকল পকাব সর্বনাম বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইতে পাবে। এ টাকা আমি নেব না। আপন সুখে আপনি নাচ **রে**। সর্বনাম বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইলে উহাকে সর্বনামীয় বিশেষণ বলে।

শ্যামলা গাই!—কোন্ **শ্যামলা**? কোন কোন কলেজে খুব বেশি ছাত্র পড়ে।

ব্যক্তিবাচক সর্বনাম

সর্বনাম শব্দের রূপ

'আমি' (উত্তম পুরুষ)

	একবচন	বহুবচন
কর্তৃকারক (প্রথমা)	আমি, মুই (গ্রাম্য ভাষায়)	আমরা, মোরা (কবিতায়)
কর্মকারক (দ্বিতীয়া)	আমাকে, আমায়, মোরে আমারে মোকে	আমাদিগকে, আমাদেরকে
করণকারক (তৃতীয়া)	আমাদ্বারা, আমার দ্বারা, আমাকে দিয়া, আমায় দিয়া	আমাদিগদ্বারা, আমাদিগ কর্তৃক, আমাদের দিয়া, আমাদের দ্বারা
সম্প্রদান (চতুর্থী)	আমাকে, আমায়, মোরে, আমারে মোকে	আমাদিগকে আমাদেরকে
অপাদান (পঞ্চমী)	আমা হইতে, আমা হ'তে, আমা থেকে, আমার থেকে	আমাদিগহইতে, আমাদিগের নিকট হইতে, আমাদিগের কাছ থেকে, আমাদের হ'তে
সম্বন্ধপদ (ষষ্ঠী)	আমার, মোর (কবিতায) মম (তৎসম পদ)	আমাদিগেব, আমাদেব, আমা-সবাকার (কবিতায), মোদের (কবিতায)
অধিকরণ (সপ্তমী)	আমাতে, আমায়, মোতে (কবিতায)	আমাদিগেতে, আমাদের মধ্যে, আমাদের মাঝে

'তুমি' (মধ্যমপুরুষ)

	একবচন	বহুবচন
কর্তা (১মা)	তুমি, তুই	তোমবা, তোরা
কর্ম (২য়া)	তোমাকে, তোকে, তোরে	তোমাদিগকে, তোদের
করণ (৩য়া)	তোমাদ্বাবা তোমা কর্তৃক, তোরদ্বাবা. তোকে দিযে	তোমাদিগের দ্বারা তোমাদেব দ্বারা তোদের দ্বারা তোদের দিযে
সম্প্রদান (৪র্থী)	তোমাকে, তোকে, তোরে তোরে	তোমাদিগকে তোদের
অপাদান (৫মী)	তোমা হইতে, তোর হইতে, তোর থেকে	তোমাদিগ হইতে তোমাদেব হইতে তোদেব হইতে
সম্বন্ধ পদ (৬ষ্ঠী)	তোমার তোর	তোমাদের, তোদের তোমাদিগের
অধিকরণ (৭মী)	তোমায়, তোমাতে, তোতে	তোমাদিগেতে তোদের মধ্যে

সে, তাহা (প্রথম পুরুষ)

	একবচন	বহুবচন
কর্তা (১মা)	সে, তিনি, তাহা	তাহারা, তাঁহারা, তাঁরা, তারা
কর্ম (২য়া)	তাহাকে, তাকে, তাঁকে	তাহাদিগকে তাদিগকে তাঁহাদিগকে
করণ (৩য়া)	তাহার দ্বারা তাঁহার দ্বারা তার দ্বারা তাঁর দ্বারা তাহা কর্তৃক তাহাকে দিয়া তাঁহাকে দিয়া	তাহাদের দ্বারা তাঁদের দ্বারা, তাঁহাদের দ্বারা (দিয়া) (তৎকর্তৃক) তাঁহাদিগকর্তৃক তাহাদিগকর্তৃক
সম্প্রদান (৪র্থী)	দ্বিতীয়ার ন্যায়	দ্বিতীয়ার ন্যায়
অপাদান (৫মী)	তাহা তাঁহা তাহার } —হইতে, থেকে	তাহাদের— তাঁহাদের— তাহাদিগ— হইতে বা থেকে
সম্বন্ধ পদ (ষষ্ঠী)	তাহার তাঁহার তার তাঁর	তাহাদের তাঁহাদের তাদের তাঁদের
অধিকরণ পদ (৭মী)	তাহাতে, তাতে তাঁতে, তাঁহাতে	তাহাদিগেতে তাঁহাদিগেতে

(৬) অব্যয়

তিন লিঙ্গ, বিভক্তি ও বচনে যে পদের কোন পরিবর্তন হয় না তাহাকে অব্যয় পদ বলে। অব্যয়ের উত্তর বিভক্তির বা স্ত্রীপ্রত্যয়ের লোপ হয়। অপি, তথা, যথা, না ও, এবং, কিন্তু, বরং, প্রতি, অনু, অদ্য, সদ্যঃ, যদি, অথচ, [স্বর্ (স্বর্গ), দিবা (সংস্কৃত ভাষায় অব্যয়, বাঙ্‌লায় বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। "অন্ধের দিবারাত্রি সমান"]

প্রকৃত অব্যয় বাক্যগত উক্তি এবং বাক্যস্থ শব্দগুলির দেশ কাল পাত্র বিষয়ে পরস্পর সম্বন্ধ প্রকটিত করে। 'সীতার প্রতি রামের প্রেম সর্বজনবিদিত।' সীতার সহিত রামের প্রেমের সম্বন্ধ 'প্রতি'—অব্যয় দ্বারা প্রকটিত হইয়াছে।

[চ] অব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ ও বিভিন্নার্থে প্রয়োগ

অব্যয় প্রধানতঃ দুই প্রকারঃ—(১) সংযোগবাচক বা সম্বন্ধবাচক (conjunctions) (২) মনোভাববাচক (Interjection)।

(১) **সংযোগবাচক**—এবং, আর, ও প্রভৃতি শব্দ পদ ও বাক্যকে যুক্ত করে। 'রাম এবং শ্যাম প্রত্যহ এখানে আসে'। 'সে এখানে আসে আর ঘুমায়'—এখানে 'আর' পদ দুইটি বাক্যকে যুক্ত করিতেছে—যথা 'সে আসে', 'সে ঘুমায়'। এবং তথা 'যদি' 'তবু' প্রভৃতি দুইটি বাক্যকে সংযুক্ত করে। 'যদি সে এখানে আসে, আমি নিশ্চয়ই তাহার বাড়িতে যাইব।'

বিয়োজক অব্যয়—বিয়োজক অব্যয় দুইটি বাক্যের মধ্যে একটিকে অপর হইতে পৃথক্ করে—সুতরাং ইহারাও সম্বন্ধসূচক অব্যয়। 'আপনি চলুন'—না না সে হবে না।' অথবা, কিংবা।

প্রতিষেধার্থক—কিন্তু, পরন্তু, তথাপি। 'সে আসিবে, কিন্তু আমার যাওয়া সম্ভবপর হইবে না।' বরং, অপিচ, অধিকন্তু, এদিকে, তবু, তথাপি।

কারণ বাচক—কারণ, যেহেতু। "কাল স্কুলে যাওয়া হয়ে উঠবে না কারণ বাড়িতে বিশেষ কাজ আছে।" "যেহেতু শহরে পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হয় নাই—বর্তমান শান্তিরক্ষার ব্যবস্থাই চালু থাকিবে।" যে কারণ, বলিয়া।

সিদ্ধান্তমূলক- এই হেতু, তাই। 'বসন্তের প্রকোপ এখানে বাড়িতেছে, তাই টিকা দেওয়া বন্ধ করা চলে না।'

প্রশ্নবোধক- কি? বটে হাঁ? হ্যা। 'আমার ঘরে মেয়ে দিলে কিছুই চাই না'—হ্যাঁ তাই কি? 'আমি এ বিপদে আপনার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত'—বটে?

উপমার্থক—মতন, মতো, যেমন, যথা। 'ভূতের মতন চেহারা যেমন' (রবীন্দ্রনাথ)। ন্যায়, যথা, তথা।

ক্রিয়া বিশেষণবাচক—সদ্যঃ, আপাততঃ, পুনঃপুনঃ, হঠাৎ, দৈবাৎ।

ব্যতিরেকাত্মক—নতুবা, না-হইলে, নৈলে।

অবস্থাত্মক (=এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইলে)—যদি না হয়, যদি, যদিবা, হইলে পরে।

অবধারণার্থক—বটে, (এই লোক এখানকার বটে) না—তুমি না এই কথাই বলেছ! (=তুমিইএই কথা বলেছ)।

(২) **মনোভাববাচক অব্যয়** (Interjections)

আনন্দ, বিস্ময়, ক্ষোভ, ঘৃণা, আহ্বান প্রভৃতি মনোভাব প্রকাশ করিবার জন্য কতকগুলি অব্যয় পদের ব্যবহার হইয়া থাকে—ইহাদিগকে **মনোভাববাচক** অব্যয় বলা হয়। **(অনন্বয়ী অব্যয়)**।

আনন্দ (হর্ষ) দ্যোতক:—বাঃ, বাহবা, ধন্য, চমৎকার, বলিহারি, বেশ বেশ! সাবাশ, আহা, মরিমরি!

সহানুভূতিসূচক—'আহাহা' কর কি নন্দলাল।

সম্মতিজ্ঞাপক—যে আজ্ঞে, তা বটে। আচ্ছা। হ্যাঁ, হুঁ, যা বলেন। আজ্ঞে হাঁ। তাতো বটেই!

অসম্মতিসূচক—না না না। হ'তে পারে না। তা হবে না! মোটেই না, কক্‌খনো না। একদম না।

অবজ্ঞা বা ঘৃণা দ্যোতক—রাম রাম, দুত্তোর, কি মুস্কিল, কি জ্বালা, মাগো, ছি ছি, ধেৎ, চোপরাও। (বিদ্রূপার্থক) ভ্যালারে নন্দলাল।

ভয় বা মানসিক দুঃখসূচক—ওরে মারে গেলুম রে! হায় হায়! হায় কি হোল! এ্যাঁ! আহাহা!

বিস্ময় প্রকাশক—ওমা বলে কি! তাই নাকি! আঁ! তাই তো! হরি হরি!

করুণাসূচক—আহাহা! বাপধন আমার! হায় হায়!

সম্বোধনসূচক—এ, এই, ওহে, ওগো, লো, আলো! তু তু, ও বাছা। আয় আয় (টিয়ে)। হ্যাঁগা।

অনুশীলনী

১। পদ কয় প্রকার এবং কি কি?

২। **উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর**—

(ক) নাম পদ, (খ) বাক্যাত্মক বিশেষণ, (গ) প্রতিষেধার্থক অব্যয়, (ঘ) পূরণবাচক বিশেষণ (১৯৬৩), সর্বনামীয় বিশেষণ (১৯৬৩), অনন্বয়ী অব্যয়।

৩। শব্দ ও ধাতু কি করিয়া পদে পরিণত হয়? (উঃ মাঃ ১৯৬৩)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

লিঙ্গ ও বচন

[১] লিঙ্গ

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক এই তিন শ্রেণীর জীব বা বস্তু আছে। ভাষাগত শব্দগুলিকেও (ব্যাকরণের বিশেষ বিশেষ কার্যের জন্য) এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। পুরুষবাচক শব্দ পুংলিঙ্গ, স্ত্রীবাচক স্ত্রীলিঙ্গ, আর যাহাদ্বারা স্ত্রী পুরুষ কিছুই বুঝা যায় না এরূপ শব্দের ক্লীবলিঙ্গ বা নপুংসক লিঙ্গ হয়। পুংলিঙ্গ নর, স্ত্রীলিঙ্গ নারী। নপুংসক লিঙ্গ—জল, পাহাড়, ধন, বন প্রভৃতি। বাঙ্‌লা ভাষায় এইরূপ লিঙ্গ বিচার করা হয়।

সংস্কৃত ভাষায় লিঙ্গ আভিধানিক—ইহা শব্দের সংস্কারমাত্র, অনেক ক্ষেত্রেই স্ত্রী পুরুষ বা ক্লীবের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। স্ত্রী বুঝাইতে দার শব্দ পুংলিঙ্গ, ভার্যা স্ত্রীলিঙ্গ, কলত্র ক্লীবলিঙ্গ।

বাঙ্‌লা ভাষায় তিন প্রকার লিঙ্গই স্বীকৃত হয়। সংস্কৃত ভাষায় কতকগুলি প্রত্যয় দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ নির্দিষ্ট হয়—যথা বালক (পুংলিঙ্গ), বালিকা (স্ত্রীলিঙ্গ—আ প্রত্যয় দ্বারা)। সংস্কৃতে লিঙ্গসূচক প্রত্যয় দ্বারা বিশেষ্যের লিঙ্গ অনুসারে বিশেষণেরও পরিবর্তন হয়। সভা (স্ত্রীলিঙ্গ)—বড় সভা বুঝাইতে মহতী সভা বলা হয়। বাঙ্‌লা সাধু ভাষায় বহুস্থলে সংস্কৃতের অনুসরণে বিশেষণের লিঙ্গ পরিবর্তন হয়। চলিত বাঙ্‌লা ভাষায় অধিকাংশ স্থলে এরূপ বিশেষণের পরিবর্তন ঘটে না—যথা সুন্দর ফুল, সুন্দর ছেলে, সুন্দর মেয়ে, বোকা ছেলে, বোকা মেয়ে।

সংস্কৃতের অনুকরণে বাঙ্‌লায় বিশেষতঃ সাধুরীতিতে বিশেষণের লিঙ্গ পরিবর্তন

হয়। যথা 'সুন্দরী অরণ্যভূমি' (বিদায় অভিশাপ—রবীন্দ্রনাথ), 'মিথ্যাময়ী ইতিবৃত্ত-কথা'," 'চিরকল্যাণময়ী' (জননী), কিন্তু 'তুমি ধন্য' (ধন্যা নহে)। 'শুভ্রতুষার কিরীটিনী' (অয়ি ভুবন মনোমোহিনী কবিতাতে)। 'যামিনী জোছনা মত্তা" (রবীন্দ্রনাথ, সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণে)। 'পরাহরণী বাদলরাগিণী' (রবীন্দ্রনাথ), 'উন্মাদিনী যামিনী' (মোহিতলাল মজুমদার)। [প্রাচীন বাঙ্লায়—'বরণে উজলী কনক বউলী'—'ব্রাহ্মণেরি নারী'। আধুনিক বাঙ্লায়ও এরূপ কদাচিৎ দেখা যায়, যথা—'আমি বসন্তেরি ফুলপরী।'] 'রোরুদ্যমানা জননী' (সিরাজদৌলা), 'উপলসংঘর্ষণনাদিনী (নদী), (বঙ্কিম), 'শ্বেত সৈকত পুলিনমধ্য-বাহিনী নীলসলিলা যমুনা' (বঙ্কিম—রাজসিংহ), 'মাধবিকা হোক সুরভি সোহাগে মধুপের মনোহরা' (রবীন্দ্রনাথ), 'রশ্মিরসে ডুবুডুবু বন, আবির্ভূতা বনে বনদেবী' (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)। কোন কোন স্থানে চলিত ভাষার নিয়মে সাধু ভাষায়ও স্ত্রীপ্রত্যয়ের যোগ হয় না। যথা—'স্তব্ধ বসুন্ধরা শুনি বেদগান' (হেমচন্দ্র), 'ব্যাকুল বসুন্ধরা সাজেরে' (রবীন্দ্রনাথ), প্রমোদক্লান্ত শতসখী' (রবীন্দ্রনাথ)। 'অগাধ জলের' মতো অগাধ বিদ্যা (অগাধা বিদ্যা' কেহ বলে না) চলে। 'মূল্যবতী কথা' কেহ বলে না 'মূল্যবান্ কথা'র প্রয়োগ হয়। হিন্দী ভাষার প্রয়োগের মত বাঙলায় কেহ 'মহতী ব্যক্তি' লেখে না। 'মহৎ ব্যক্তি বা মহান্ ব্যক্তি লেখা হয়।

[২] **লিঙ্গ পরিবর্তন** (স্ত্রী প্রত্যয় যোগে)

তৎসম শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তন কতকগুলি প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এই প্রত্যয়গুলিকে স্ত্রীপ্রত্যয় বলে। এই সকল প্রত্যয়ের প্রযোগ সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে সম্পন্ন হয়।

১। **আ**—অজাদি এবং অকারান্ত শব্দের উত্তর **আ** প্রত্যয় যোগে স্ত্রীলিঙ্গ নির্দিষ্ট হয়—অজ—অজা। কোকিল—কোকিলা। অশ্ব—অশ্বা। মূর্খ—মূর্খা। সূর্য—সূর্যা, সূরী। শিষ্য—শিষ্যা। তনয়—তনয়া। নিরপরাধ—নিরপরাধা। নন্দন—নন্দনা, (নন্দিন্ হইতে নন্দিনী)। অরুণ—অরুণা। নবীন—নবীনা। পণ্ডিত—পণ্ডিতা (বাঙ্লায় এবং কাশ্মীরে পণ্ডিতানী)। চটক—চটকা, (চড়ুই), চটিকা [বাংলায় 'চটকিনী'] ছাত্র—ছাত্রা [বাংলায় ছাত্রী]। কুটিল—কুটিলা। সেবক—সেবকা (বাংলায় সেবিকা)। কৃশ—কৃশা। উপাধ্যায়—উপাধ্যায়া (যিনি নিজে পড়ান)। বলাক—বলাকা, বলাকিনী (প্রাচীন বাঙ্লায়)। প্রথম—প্রথমা।

২। **আনী**—কতকগুলি বিশেষ শব্দের উত্তর আনী—প্রত্যয় হয়।

ইন্দ্র—ইন্দ্রাণী। ভব—ভবানী। শিব—শিবা (শিবানী)। ব্রহ্ম—ব্রহ্মাণী। বরুণ—বরুণানী (বাঙ্লায় মধুসূদন দত্তের প্রয়োগে 'বারুণী')। সর্ব—সর্বাণী (দুর্গা)। মাতুল—মাতুলানী। উপাধ্যায়—উপাধ্যায়া, (যিনি নিজে পড়ান) উপাধ্যায়ী—উপাধ্যাযানী (উপাধ্যায়ের পত্নী)। আচার্য—আচার্যা (যিনি স্বয়ং অধ্যাপনা করেন) আচার্যাণী (আচার্যের পত্নী)। ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়া, ক্ষত্রিয়াণী (ক্ষত্রিয় জাতীয়া স্ত্রীলোক) ক্ষত্রিয়ী (ক্ষত্রিয়ের পত্নী)।

৩। 'অক'—প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ—'আ' প্রত্যয় যোগে স্ত্রীলিঙ্গে—ইকা হয়। কারক—কারিকা। লেখক—লেখিকা। গায়ক—গায়িকা। নায়ক—নায়িকা (মধুসূদন দত্তের প্রয়োগ

"নায়কী")। অধ্যাপক—অধ্যাপিকা। শিক্ষক—শিক্ষিকা। পাচক—পাচিকা। পাঠক—পাঠিকা। তারক—তারিকা (রক্ষাকর্ত্রী, তারকা (জ্যোতিষ্ক পদার্থ) বালক—বালিকা।

৪। জাতিবাচক শব্দের উত্তর—ঈ প্রত্যয় হয়। ব্রাহ্মণ- ব্রাহ্মণী। [শূদ্র—শূদ্রা (শূদ্র-জাতীয়া স্ত্রী) শূদ্রী—শূদ্রের স্ত্রী]। ব্যাঘ্র—ব্যাঘ্রী। হরিণ—হরিণী। সিংহ—সিংহী। বিহগ—বিহগী। বিহঙ্গ—বিহঙ্গী (বাংলায় বিহঙ্গিনী)। কুরঙ্গ—কুরঙ্গী (বাংলায় কুরঙ্গিণী)। মানুষ—মানুষী। যক্ষ—যক্ষী (বাংলায় যক্ষিণী)। রাক্ষস—রাক্ষসী। কিন্নর—কিন্নরী। দেব—দেবী, (দেবিনী—কাশীরাম দাস)। মানব—মানবী। ছাগ—ছাগী। মহিষ—মহিষী। কপোত—কপোতী। গোপ—গোপী (বাংলায় 'গোপিনী')। ময়ূর—ময়ূরী। হংস—হংসী (প্রাচীন বাংলায় 'হংসিনী')। বিড়াল—বিড়ালী। শূকর—শূকরী। ঘোটক—ঘোটকী। পিশাচ—পিশাচী। মৎস্য—মৎসী।

৫। —অণ্ (ষ্ণ) -এয় (ঢেয়) -'ট'-ইত্,—ইক (ষ্ণিক) প্রভৃতি, প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর ঈ প্রত্যয় হয়। বৈষ্ণব—বৈষ্ণবী। সারমেয়—সারমেয়ী। ভাগিনেয়—ভাগিনেয়ী। বৈধ—বৈধী। রজক—রজকী (বাংলায় রজকিনী)। হৈম—হৈমী। ভৌম—ভৌমী। নদ (ট্)—নদী। অনুচর—অনুচরী। সহচর—সহচরী। সুখকর—সুখকরী। অর্থকর—অর্থকরী। কিংকর—কিংকরী। প্রলয়ঙ্কর—প্রলয়ঙ্করী। ভয়ঙ্কর—ভয়ঙ্করী। মধুকর—মধুকরী।

৬। —ময়ট্, ম প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে—ঈ—প্রত্যয় হয়। মৃন্ময়—মৃন্ময়ী। চিন্ময়—চিন্ময়ী। হিরণ্ময়—হিরণ্ময়ী। প্রভাময়—প্রভাময়ী। দশম—দশমী। একাদশ—একাদশী। ষোড়শ—ষোড়শী। মাদৃশ—মাদৃশী। তাদৃশ—তাদৃশী। ঈদৃশ—ঈদৃশী। পঞ্চম—পঞ্চমী। ষষ্ঠ—ষষ্ঠী। সপ্তম—সপ্তমী।

৭। প্রথম বয়স-বাচক শব্দের উত্তর ঈ হয়ঃ—কুমার—কুমারী। কিশোর—কিশোরী।

৮। —ইন্—বিন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয়। ধনী (ধনিন্)—ধনিনী। মানী—মানিনী। গুণী—গুণিনী। হস্তী—হস্তিনী। বিদেশী—বিদেশিনী। বিজয়ী—বিজয়িনী। মালী—মালিনী। সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসিনী। বিলাসী—বিলাসিনী। যশস্বী—যশস্বিনী। সাক্ষী—সাক্ষিণী। তেজস্বী—তেজস্বিনী। ওজস্বী—ওজস্বিনী। উদাসী—উদাসিনী। প্রার্থী—প্রার্থিনী। মেধাবী—মেধাবিনী। শিখী—শিখিনী। করী—করিণী। পদ্ম—পদ্মিনী। কুমুদ—কুমুদিনী।

৯। —তৃ প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর —ঈ হয় (তৃ+ঈ=ত্রী) দাতা (দাতৃ)—দাত্রী। ধাতা—ধাত্রী। কর্তা—কর্ত্রী। পাতা (পালনকর্তা)—পাত্রী। জনয়িতা—জনয়িত্রী। ক্রেতা—ক্রেত্রী। শ্রোতা—শ্রোত্রী। প্রণেতা—প্রণেত্রী।

১০। —অৎ (শতৃ প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে—ঈ হয়। সৎ (√অস্+শতৃ)—সতী। মহৎ—মহতী। সুদন্ত—সুদন্তী ('সুদৎ'—হইতে কোন বিশেষ বয়স বুঝাইতে সুদতী)। যুবৎ—যুবতী, (যুবন্+তি=যুবতি)।

১১। —বৎ, মত্—ঈয়স—প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর—ঈ হয়। জ্ঞানবান্ (জ্ঞানবৎ)—জ্ঞানবতী। শ্রীমান্ (শ্রীমৎ)—শ্রীমতী। বেণুমান্—বেণুমতী (নদীর নাম)। মহীয়ান্ (মহীয়স্)—মহীয়সী। শ্রেয়ান্ (শ্রেয়স্)—শ্রেয়সী। ভূয়ান্ (ভূয়স্)—ভূয়সী (প্রশংসা

শব্দের বিশেষণ)। রূপবান্—রূপবতী। ভগবান্—ভগবতী। প্রেয়ান্ (প্রেয়স্)—প্রেয়সী।

১২। —অন্ ভাগান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে—ঈ হয়। রাজা (ন্)—রাজ্ঞী (বাংলায় রানী), অজ্ঞাতনামা (—নামন্)—অজ্ঞাতনাম্নী। পতি—পত্নী [পতি শব্দের অন্তে 'ন্'—যুক্ত হইবার পর—ঈ হয়]

১৩। বহুব্রীহি সমাসের অন্তে—অঙ্গ (=শরীরের অংশবিশেষ) বাচক শব্দ থাকিলে —স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে—ঈ হয়। পক্ষে—'আ' হয়। সুকেশ—সুকেশা, সুকেশী (বাংলায় 'সুকেশিনী'- যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়), চন্দ্রমুখ—চন্দ্রমুখা, চন্দ্রমুখী। পদ্মমুখ—পদ্মমুখী। ম্লানমুখ—ম্লানমুখী (—'শেফালিকা'—নজরুল), শশিবদনা, ত্রিনয়না, সুনয়নী।

১৪। 'শ্বশুর' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'শ্বশ্রূ', সখা শব্দের সখী হয়।

১৫। বিদ্বান্—বিদুষী (বিদ্বস্ শব্দের উত্তর ঈ), যুবন্ শব্দের উত্তর—তি হয়—'যুবতি'।

(১) বাঙলায় স্ত্রীলিঙ্গ নির্দেশ

(১) পৃথক্ শব্দ দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গ নির্দিষ্ট হয় (খাঁটি বাংলা শব্দ ভাই—বোন, ভগিনী (ভাইয়ের পত্নী 'ভাজ' বড় ভাইয়ের স্ত্রী—বৌদিদি, বধূঠাকুরানী), বেটা—বেটী, বউ। ভাসুর —বড়জা। দেবর—ছোটজা। দাদা—দিদি (দাদার স্ত্রী 'বৌদিদি'—বৌঠাকুরানী)। ষাঁড়—গাই, গাভী। এ'ড়ে—বক্না। দাদামহাশয়—দিদিমা (সংক্ষেপে 'দিদ্‌মা')। ঠাকুরদাদা—ঠাকুরমা, ঠাকুমা (সংক্ষেপে), ঠানদিদি। শ্বশুর—শাশুড়ী। রাজা—রানী। জামাই—মেয়ে। বাবা—মা।

(২) তৎসম শব্দ (সংস্কৃত শব্দ)

(২) পিতা—মাতা। জনক—জননী ('জনন'—শব্দ হইতে 'জননী' হইয়াছে—কিন্তু বাঙলায় উহার প্রয়োগ না থাকায়—জনকের সমার্থক স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ—'জননী' করা হইয়াছে)। স্বামী—স্ত্রী, পত্নী, ভার্যা ইত্যাদি। পুত্র—কন্যা (স্ত্রীলিঙ্গে 'পুত্রী'ও হয়)। কর্তা—গিন্নি। বিপত্নীক—বিধবা। ভূত—পেত্নী, প্রেতিনী। শুক—সারি, সারিকা।

(৩) বিদেশী শব্দ

বাদশা, বাদশাহ—বেগম (তুর্কি 'বেগ' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে বেগম)। নবাব—বেগম। সাহেব—বিবি, মেম, মেমসাহেব। লর্ড—লেডি। লাট—লাটপত্নী। চাকর—চাকরানী, ঝি, ঝী। বান্দা—বাঁদী। গোলাম—বাঁদী। নওশাহ (বিবাহের বর), দুলা—নশা (পূর্ববঙ্গের স্থানবিশেষে)। দুলা—দুলহিন (হিন্দী)। খানসামা—আয়া (ইউরোপীয় সাহেবের বাড়ির চাকরানী)।

(৪) স্ত্রী বা পুরুষবাচক শব্দদ্বারা উভয়লিঙ্গ শব্দের নির্দেশ

গোসাঁই—মা গোসাঁই। ছেলে—বেটাছেলে—মেয়েছেলে। কবি—কবয়িত্রী, মহিলা কবি, স্ত্রী-কবি। প্রতিনিধি—মহিলা প্রতিনিধি। যাত্রী—যাত্রিণী, মেয়ে যাত্রী, মহিলা যাত্রী। গোরু—ষাঁড়গোরু, গাইগোরু। মহিষ—মহিষী, মাদী মহিষ। বাছুর—(এ'ড়ে বাছুর)—নই বাছুর, বকনা বাছুর। গুরু—গুরুমা। মর্দ—মেয়েমর্দ।

(৫) প্রত্যয়যোগে লিঙ্গান্তর—ঈ প্রত্যয়যোগে

চকা (চক্রবাক)—চকী। ডাহুক—ডাহুকী। বামুন—বামনী (বামুন মা, বামুন গিন্নি,

বামুন ঠাকরুণ)। কৃষাণ—কৃষাণী। ঘোড়া—ঘুড়ী। কাকা—কাকী। মামা—মামী। জেঠা—জেঠী, (জেঠাই) জেঠাইমা। ছোড়া—ছুঁড়ী। বন্ধু—বান্ধবী। পাগল—পাগলা, পাগলী, পাগলিনী। রাজা—রানী। মহারাজা—মহারানী [-মহারাজী, মহারাজ্ঞীও শুদ্ধ]।

(৬) —আই, —আনী, —আইন্, —নী, —ইনি, —ইনী, —উনি, —ইন্-যোগে

জেঠা—জেঠাই। ওস্তাদ—ওস্তাদনী। ঠাকুর—ঠাকুরানী। চাকর—চাকরানী। মেথর—মেথরানী। ময়রা—ময়রানী। পুরুৎ—পুরুৎনী। বাঘ—বাঘিনী। গয়লা—গয়লানী। কাঙাল—কাঙালিনী। মজুর—মজুরানী। মিতা—মিতিন। বেহাই—বেহাইন, বেয়ান। নাতি—নাতনি, নাতিনী। কাটুয়া—কাটুনি। ননদ—ননদী, ননদিনী। নাগ—নাগী, নাগিনী।

খাঁটি বাঙ্‌লায় সাধারণতঃ বহুব্রীহি সমাসের অন্তে অংগবাচক শব্দের উত্তর স্ত্রীলিংগে —ঈ হয়। চিরুনদাঁতী, ইঁদুরদাঁতী, খাঁদানাকী, ভেড়ানাকী, (ভ্যাডানাকী), থ্যাবড়ানাকী, পোড়াবমুখী, চুলোমুখী, কালামুখী, পাটাবুকী।

দ্রষ্টব্য :—রূপসী, সজনী, ধনী, সতিন শব্দের পুংলিংগ রূপ নাই। বিধবা শব্দেরও পুংলিংগ রূপ নাই, তবে 'বিপত্নীক' শব্দ দ্বারা লিংগান্তরের বোধ হয়। পতি—(স্ত্রীলিংগে) পত্নী, ধর্মের জন্য পত্নী, 'ধর্মপত্নী'—পুংলিংগে 'ধর্মপতি' হয় না। তবে ধর্মপতি শব্দের অর্থ ধর্মের পালক। [আইনবিভাগের কর্তা—বিচারক]

[৩] বচন

যাহা দ্বারা কোন বস্তু বা ব্যক্তির সংখ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে তাহাকে বচন বলে। বাঙ্‌লা ভাষায় একবচন ও বহুবচন আছে (সংস্কৃতের মত দ্বিবচন নাই)। একটি বস্তু বা এক ব্যক্তি বুঝাইতে একবচন, একাধিক বস্তু ও ব্যক্তির অর্থে বহুবচন হয়।

বাঙ্‌লাতে একবচনের জন্য বিভক্তির প্রয়োগ হয় না, বহুবচন বুঝাইতে (১) রা, এরা, দিগ, দিগের, দের গুলি, গুলা প্রভৃতি প্রত্যয় এবং (২) সব, গণ, বর্গ, কুল, নিচয়, মালা, আবলী প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা—মানুষ (একবচন), মানুষেরা, মানুষদের। মানুষদিগের, পাতিহাঁসগুলি, শিয়ালগুলো, নক্ষত্রনিচয়, তারকাবলী, হংসমালা, বন্ধুবর্গ, অলিকুল, বনরাজি, নক্ষত্রপুঞ্জ, দ্বীপপুঞ্জ, জটাকলাপ, জটাজাল। (৩) শব্দের পূর্বে একাধিক সংখ্যা বোধক কোন শব্দ থাকিলে বহুবচনের অর্থ প্রতীত হয়, কিন্তু উহার পর বহুবচনসূচক কোন বিভক্তি বসে না। তিনজন মানুষ (কিন্তু মানুষেরা), অযুত তারকা। অপ্রাণিবাচক শব্দের উত্তর 'এরা' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় না। গাছ শব্দ বহুবচনে গাছগুলি (গাছেরা নহে)।

(৪) বিশেষ্য বা বিশেষণের দ্বিরুক্তি দ্বারাও বহুবচনের অর্থ প্রকাশ করা হইয়া থাকে। যথা—'বনে বনে উড়ে তোমার রঙীন বসন প্রান্ত'। 'বনদেবীর দ্বারে দ্বারে শুনি গভীর শঙ্খধ্বনি' (রবীন্দ্রনাথ)।

(৫) বিশেষণের দ্বিরুক্তি—বড় বড় বানর, 'ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার করিবে'।

[বিশেষ্য, সর্বনাম, এবং ক্রিয়াপদের বচন আছে। বিশেষণ ও অব্যয়ের বচনসূচক কোন বিভক্তি নাই]।

অনুশীলনী

১। লিঙ্গ পরিবর্তন কর :—বিদ্বান্, আচার্য, মাতুল, কবি, চাকর, ভাগ্যবান্, [illegible]

সই, পণ্ডিত, গয়লা, যাত্রী, বৎস, বিধবা, দেবর, পুরুষ, পেত্নী, খানসামা, সাহেব, পাগল, নাতিন, অজ, শিব, রুদ্র, হিম, ওজস্বী, মনস্বী, তপস্বী, মহীয়ান্, কর্তা, দাতা, হেমাঙ্গ, সুকেশ, গোঁসাই, মর্দ, নই-বাছুর, পাচক, সম্পাদক, মৎস্য, বন্ধু, বর্ষীয়ান্।

২। বাঙ্লা শব্দের পুংলিঙ্গ হইতে স্ত্রীলিঙ্গ পরিবর্তনের যে কোনও পাঁচটি নিয়মের উদাহরণ সহ উল্লেখ কর (উ, মা, ১৯৬০ কম,)।

তৃতীয় অধ্যায়

কারক ও তাহার বিভক্তি

বিশেষ্য বা তৎস্থানীয় পদে সংখ্যা, কারক অথবা অন্য-প্রকার সম্বন্ধবোধক প্রত্যয়কে **বিভক্তি** বলে। 'বালকেরা' (বাড়ি যায়) বলিলে একাধিক বালকের সংখ্যা বুঝায় এবং পদ-রূপে যখন বাক্যে ব্যবহৃত হয় তখন উহা ক্রিয়ার কর্তা হইয়া থাকে। অতএব 'বালক' পদের সহিত যুক্ত—'রা' প্রত্যয় সংখ্যা ও কারকের বোধক। 'রামের পুত্র' বলিলে রাম পদের উত্তর—'র' বিভক্তি রাম নামক একজন লোককে বুঝায় এবং 'পুত্র' পদের সহিত রাম পদের সম্বন্ধ নির্দেশ করে।

ক্রিয়াপদের সহিত বিশেষ্যপদ বা বিশেষ্যপদ স্থানীয় পদের **সাক্ষাৎ** সম্বন্ধকে **কারক** বলে। কারক **হইতেছে, ক্রিয়ার সাধক।** যেখানে উহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকে না পরম্পরা সম্বন্ধ থাকে সেখানে কারক হয় না। **ছয় প্রকারের বেশি কারক স্বীকার করা হয় না।**

'রামের পুত্র বাড়ি যায়'। এখানে পুত্র 'যায়' পদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত কেননা ইহা 'যায়' ক্রিয়ার কর্তা। কিন্তু 'রামের' পদ ক্রিয়ার (যায়) সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যুক্ত নহে। এই ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত পদটি পুত্রের সহিত যুক্ত—এখানে র বিভক্তি রামের সহিত পুত্রের সম্বন্ধ নির্দেশ করিতেছে, সুতরাং 'রামের' পদটিতে কোন কারক নাই—উহা কারক বিভক্তি নহে, **উহা সম্বন্ধ বিভক্তি। প্রাচীন মতে সম্বন্ধ কারক নহে।** আধুনিক মতে (পাশ্চাত্য মতে) সম্বন্ধকে **কারক** (genitive) বলা হয়। মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য যাহাকে ডাকা হয় ঐরূপ বিশেষ্য পদ বাক্যের প্রথমে ব্যবহৃত হইলে তাহাকে **সম্বোধন পদ** বলে। সম্বোধন কারক নহে—ইহাই প্রাচীন মত। আধুনিক মতে ইহা **সম্বোধন কারক** (vocative case) 'হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ'—(রবীন্দ্রনাথ)। সম্বোধনের পূর্বে সম্বোধনসূচক পদের ব্যবহার হয়। যথা—অহে, হে, অয়ি, ওগো ইত্যাদি। 'হে মাতঃ বঙ্গ' (রবীন্দ্রনাথ)। কোন কোন স্থলে এরূপ সম্বোধনসূচক অব্যয়পদের ব্যবহার হয় না। যথা—'ভাঙ্গা দেউলের দেবতা' (রবীন্দ্রনাথ)।

কারক ছয় প্রকারঃ—কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ [আধুনিক মতে আরো দুইটি বেশি, সম্বন্ধ কারক (genitive) ও সম্বোধন কারক (vocative) মিলিয়া মোট আটটি]

[ক] কর্তৃকারক

ক্রিয়া সম্পাদন বিষয়ে যাহার প্রাধান্য রহিয়াছে তাহাকে **কর্তৃকারক** বলা হয়। কর্তা ক্রিয়া সম্পাদন বিষয়ে অপরের অধীন নহে। কর্তা কার্য সম্পাদনে অপরের সাহায্য লইয়া থাকে—তাহারাও ক্রিয়ার সহিত সংযুক্ত, অতএব কর্ম-প্রভৃতিও কারক। 'রামবাবু বাগানে

নিজের হাত দিয়া গাছ হইতে ফল পাড়িয়া ছোট ছোট ছেলেকে দেন।' এখানে 'রামবাবু' কর্তা, কেননা, 'দেন' ক্রিয়া তিনিই সম্পন্ন করেন। 'ফল' কর্মকারক। 'পাড়িয়া' ক্রিয়ার কর্ম। যাহা করা যায় তাহাই কর্ম। ক্রিয়া দ্বারা কর্তা যাহাকে ব্যাপ্ত বা সম্বন্ধ করিতে বিশেষভাবে ইচ্ছা করে তাহাই কর্ম এখানে কি পাড়া হয় কথার উত্তরে আমরা পাই 'ফল'। ফল কর্ম। কর্তা যাহাকে কার্যসাধন ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সাহায্যকারী মনে করেন তাহাই করণ কারক। কর্তা এখানে 'হাতদিয়া' পদকে 'পাড়া' ক্রিয়ার প্রকৃষ্ট উপকারক বা সাহায্যকারী মনে করেন। যাহাকে দান বা যাহার উদ্দেশ্যে ক্রিয়া-সম্পাদন করা হয় তাহা সম্প্রদান। 'ছেলেকে' পদ 'দেন' ক্রিয়ার সম্প্রদান। যাহা হইতে বিশ্লেষ, ভীত, গৃহীত চলিত হয় তাহাকে অপাদান বলে। গাছ হইতে পদ অপাদান কারক—কেননা গাছ হইতে ফলের বিশ্লেষ এখানে বুঝায়।

ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ কারক বলে। ফলপাড়া ও উহা বিতরণ করারূপ কার্যের আধার বাগান। আধার শব্দের অর্থ 'পাত্র'—যাহাতে কোন বস্তু থাকে।

কর্তা কার্য সম্পন্ন করে সুতরাং কাজ তাহাতেই থাকে—আর কর্মেতে থাকে ক্রিয়ার ফল। সুতরাং কর্তা কর্ম ছাড়া যাহা অসাক্ষাদ্ভাবে ক্রিয়াকে ধারণ করে তাহাই অধিকরণ—অর্থাৎ ক্রিয়াটি তাহার মধ্যে সম্পন্ন হয়।

[খ] কর্তৃকারকের বিভক্তি ও তাহার অর্থ

কর্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি হয়। কর্তৃকারকের বিভক্তির রূপ (১) শূন্য বিভক্তিঃ—যথা—জল পড়ে, পাতা নড়ে। (২) এ, তে, এতে, য়ে, য়। কর্তা যেখানে নির্দিষ্ট নয় সেখানে ইহারা ব্যবহৃত হয়ঃ—চোরে চুরি করে। পাগলে কিনা বলে। মানুষে ঘাস কাটে। গোরুতে ঘাস খায়। বুলবুলিতে ধান খায়। ঘোড়ায় গাড়ি টানে। টাকায় কাজ করে। "মানুষেই টাকা (রোজগার) করে, টাকায় মানুষ করে না।" (পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়)। কৃপণের টাকার ষোল আনাই খায় বারভূতে। পণ্ডিতে শাস্ত্র পড়ে।

ক্রিয়ার ব্যতিহার অথবা সংযোগ অর্থে দুই কর্তার প্রয়োগে—'এ' বিভক্তিঃ—আরে ঝিএ ঝাড়িতে ঝগড়া করে। (ব্যতিহার—বিনিময়), পণ্ডিতে পণ্ডিতে তর্ক করিতেছে তুমি আমি কি বাকি! মায়ে পোয়ে একসঙ্গে ভাত খায়, গুরুশিষ্যে কথা বলে, দশে মিলে করি কাজ।

কর্তৃকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি—"আমাকে বাড়ি যাইতে হইবে" (- আমি অবশ্যই বাড়ি যাইব)। যাহাকে দিয়া কোন কাজ করান হয় সে প্রযোজ্য কর্তা—যে অন্যকে কাজে প্রবর্তিত করে সে প্রযোজক কর্তা। প্রযোজক কর্তায় প্রথমা বিভক্তি এবং প্রযোজ্য কর্তায় দ্বিতীয়া (কে) এবং তৃতীয়া বিভক্তি দুইই দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—পণ্ডিত মহাশয় ছাত্রকে ব্যাকরণ পড়ান। পণ্ডিত মহাশয় প্রযোজক কর্তা—ছাত্র প্রযোজ্য কর্তা। গোরু দিয়া খেত চাষ করান হয়। মালীকে দিয়া বাবু বাগানের আম পাঠাইলেন (তৃতীয়া বিভক্তি)।

কর্মবাচ্যের কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হয়। এই কর্তাকে অনুক্ত কর্তা বলা হয়। অনুক্ত কর্তা ব্যাকরণ শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ—ইহার সহিত কর্তার উল্লেখ থাকা না থাকার কোন সম্পর্ক নাই। ইহা বাক্যে অনুল্লিখিত কর্তা নহে। রাম আমাকে দেখে (কর্তৃবাচ্য)—এখানে রাম কর্তা—"দেখে" ক্রিয়ার উক্ত কর্তা—কেননা 'দেখে'র—'এ' প্রত্যয় কর্তাকে বলিয়া দিতেছে।

কিন্তু **রাম কর্তৃক আমি দৃষ্ট হই**—এখানে 'দৃষ্ট হই' ক্রিয়া কর্মকে নির্দেশ করিতেছে (আমি=কর্ম)—কর্তা এখানে অনুক্ত বা অনির্দিষ্ট (ক্রিয়াপদদ্বারা)। সুতরাং **কর্মবাচ্যের কর্তা অনুক্ত কর্তা।**

কর্ম ও ভাববাচ্যের কর্তায় কখনও কখনও **ষষ্ঠী** হয়ঃ—**বঙ্কিমচন্দ্রের** রচিত (=বঙ্কিম-চন্দ্র কর্তৃক অনুক্ত কর্তায় ষষ্ঠী) **আমার** যাওয়া হবে না (ভাববাচ্যের কর্তায় ষষ্ঠী) **তোমারি** দেওয়া প্রাণে তোমারি দেয়া দুখ (অনুক্ত কর্তায় ষষ্ঠী) **মহাশয়ের** থাকা হয় কোথায়? (ভাব-বাচ্যের কর্তায় ষষ্ঠী—অনুক্ত কর্তায় ষষ্ঠী)।

কর্তায় পঞ্চমীঃ—**আমা** হতে হেন কার্য হবে না সাধন। বধূ হতে বংশের স্থাপন হবে (কবি গুণাকর)।

বিভিন্ন প্রকারের কর্তা

(১) কর্তৃবাচ্যের কর্তা—জল পড়ে পাতা নড়ে। **(২) কর্মবাচ্যের কর্তা—(অনুক্ত কর্তা)** (তৃতীয়া বা স্থলবিশেষে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ হয়) (ক) **রাম কর্তৃক** চন্দ্র দৃষ্ট হয়। (খ) এ ছবি আমার দেখা আছে। (৩) **কর্ম কর্তৃবাচ্যের কর্তা**—গরু গরজায় **বাজ**। **বইখানি** বাজারে ভাল কাটে। (৪) **প্রযোজক কর্তা বা হেতুকর্তা**—অপরকে কর্মের প্রেরণা দিলে বা অপরকে দিয়া কার্য করাইলে—প্রেরণাদানকারীকে প্রযোজক **কর্তা** বলে—**শিক্ষক মহাশয়** ছাত্রটিকে দিয়া অঙ্ক কষান। **(৫) প্রযোজ্য কর্তা**—কর্তা (প্রযোজক কর্তা) যাহাকে কার্যে প্রবর্তিত করে বা যাহাকে দিয়া কাজ করায় সে প্রযোজ্য কর্তা—শিক্ষক মহাশয় **ছাত্রটিকে** দিয়া অঙ্ক কষান। মাতা শিশুটিকে খাওয়ান [প্রযোজ্য কর্তায় দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া বিভক্তি হয়]

[গ] **কর্মকারক**

কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। দ্বিতীয়া বিভক্তির চিহ্নঃ—(১) বিভক্তিহীন **দ্বিতীয়া** (২)—'**কে**' (নির্দিষ্ট বিষয়ের সহিত ব্যবহৃত হয়) (৩)—রে, —এরে (পদ্যে ও উচ্চ শ্রেণীর গদ্যে—কথ্য ভাষাতেও দেখা যায়) (৪) এ, যে, য। **(১) বিভক্তিহীন কর্ম**—ঘোড়ায় ঘাস **খায়**। আমি সূর্য দেখি। (২) নির্দিষ্ট কর্ম—আমি সূর্যকে দেখি (সূর্য ছাড়া আর **কিছু** দেখি না)। **রামকে** মারে কে? (৩) -রে বিভক্তি "ঈশ্বরীরে ডাকি কহে **ঈশ্বরী পাটনী**"। 'কুঞ্জে কুঞ্জে করিছে সন্ধান হৃদয়সাথীরে' (রবীন্দ্রনাথ)। (৪) 'বৃথা গঞ্জ **দশাননে!** তুমি বিধুমুখী' (মধুসূদন)। (৫) কর্মকারকে ষষ্ঠীও হয়ঃ—রূপোকা'কা **আমাদের** চোখ রাঙাবে। **আমাদের** কে দেখবে।

সম-ধাতুজ কর্ম (cognate object)—বাঙ্‌লা ভাষায় অকর্মক ক্রিয়ার সম-ধাতুজ কৃদন্ত পদ, সেই ক্রিয়ার কর্মরূপে অনেকস্থলে ব্যবহৃত হয়ঃ—এবারকার কলেরায় লোকটা খুব **বাঁচা** বাঁচিয়াছে। পালিত ছেলেটি চলিয়া গেলে সরলা কি **কান্নাটাই** না কাঁদিয়াছে। পুরান পাওনাটার কথা শুনিয়া বাবু একটু কাষ্ঠ হাসি হাসিলেন। 'তার পানে হায় **শেষ** চাওয়া চায়।' (রবীন্দ্রনাথ) "প্রলয় নাচন নাচলে যখন"। **সকর্মক ক্রিয়ায় ও গৌণকর্মরূপে** এরূপ প্রয়োগ পাওয়া যায়। পুলিসে ছেলেটাকে **কি মারই** না মারিয়াছে। **পরের** বাড়ির নিমন্ত্রণে লোকটা অনেক **খাওয়া** খেল। ব্যাটা হাড়ে হাড়ে **পাজী**। আমায় কি **ঠকানটাই** না ঠকিয়েছে। **পরের উপর** খুব চাল চেলেছ বাবা।

[ঘ] মুখ্যকর্ম ও গৌণকর্ম

কোন কোন ক্রিয়ার দুইটি কর্ম থাকে। ইহাদের মধ্যে একটি মুখ্যকর্ম অপরটি গৌণ-কর্ম। যাহার ব্যবহার ব্যতীত বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয় না তাহা **মুখ্যকর্ম**। তাহার সহায়ক কর্মকে **গৌণকর্ম** বলে। 'পিতা রামকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।' 'পিতা কি জিজ্ঞাসা করিলেন?' ইহাই সর্বপ্রথম বাক্যের অর্থের পূর্ণতার জন্য মনে জাগে। উত্তর—"(এই) কথা"। তাহার পরে 'কাহাকে' এই প্রশ্ন মনে জাগে। উত্তর 'রামকে'। 'কথা' **মুখ্যকর্ম**, রামকে **গৌণকর্ম**।

[ঙ] করণ কারক

করণকারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। করণ কারকের বিভক্তিঃ—(১) তে, এতে,—এ, য়। (২) বিভক্তিস্থানীয় শব্দ -দিয়া, -দ্বারা, -হইতে, -কর্তৃক। কর্তা যাহা দ্বারা ক্রিয়া সম্পাদন করেন তাহা করণ—সুতরাং কার্যের সাধন (instrument) করণ। যথা—আমরা চোখে দেখি কানে শুনি। 'নব মালতীর কচিদলগুলি কাটে আনমনে দশনে।' (রবীন্দ্রনাথ)। কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিতে হইবে। 'সোজা আঙুলে ঘি উঠে না।' টাকাতে (টাকায়) সব কিছু হয়। 'ঝি জব্দ শিলে' (প্রবাদ)। হালে (=হাল দ্বারা) পানি পাওয়া যাচ্ছে না, এ কলমে বেশ লেখা যায়।

হেতু অর্থে করণ বিভক্তি (তৃতীয়া)ঃ—অসুখের চেয়ে **ভয়ে** লোক মরে বেশি। অনেক **দুঃখে** সংসার ছেড়েছি। তোমাব **সুখে** আমি সুখী, তিনি **পীড়ায়** কাতব। ব্যায়ামে **স্বাস্থ্য** ভাল হয়।

উপলক্ষণে করণবিভক্তিঃ—"দুঃখের বেশে তোমারই রণতূর্য বাজে।" লোকটি **জাতিতে ব্রাহ্মণ**। "বেটা নামে ভদ্র কিন্তু কাজে নিশ্চযই মঙ্গলবার।"—হরিশ্চন্দ্র, (অমৃতলাল বসু) [যাহাদ্বারা বস্তুর পরিচয় হয তাহাকে উপলক্ষণ বলে] বামুন চেনা যায **পৈতায়**। তা'র **আঠারমাসে** বছর। **আলুভাতে** ভাত।

লুপ্ত করণ বিভক্তি (শূন্য করণ বিভক্তি)ঃ—প্রহারার্থক ও ক্রীড়ার্থক ধাতুর করণকারক-সূচক তৃতীয়া বিভক্তির লোপ হয়। উহার আকৃতি বিভক্তি শূন্য কর্মের মত হয়। 'ঢিলটি মারলেই পাটকেলটি খেতে হয়।' (ঢিল মারা=ঢিল দ্বারা মারা) লাঠি মারিয়া মূর্খকে বুঝাইতে হয়, সে **তাস** খেলে (তাস দ্বারা), **ফুটবল** খেলে, **রঙ্** খেলে, **লাঠি** খেলে। [কিন্তু '**হোলি** খেলে'=হোলিতে (বসন্তোৎসব) খেলে—**লুপ্ত সপ্তমী বিভক্তি** কালাধিকরণে]

করণার্থে—পঞ্চমী (হইতে, হতে) '**এ ঘটনা হইতে** অনুমান করা যাইতে পারে যে তাহার **স্বভাবের পরিবর্তন হইয়াছে।**'

করণার্থে ষষ্ঠী—হাতের আগুন (হস্তদ্বারা প্রদত্ত)—(অভাগীর স্বর্গ) তুঃ লাঠির ঘা।

[চ] সম্প্রদান কারক বিভক্তি

যাহাকে দান করা যায়, যাহার উদ্দেশে, যাহার জন্য কর্ম সম্পন্ন হয় তাহাকে সম্প্রদান বলে। [কেহ কেহ বলেন স্বত্বত্যাগ করিলে সম্প্রদান হয়। ইহা অবশ্য সর্বস্বীকার্য মত নহে। স্বত্ব ত্যাগ হউক আর নাই হউক ব্যাকরণ শাস্ত্রে দানের পাত্র সম্প্রদান হইবে। 'রাজা দুষ্মন্ত সারথিকে যুদ্ধের সাজসজ্জা সমর্পণ করিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।']

সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তি হয়।

সম্প্রদানের বিভক্তিঃ—কে, রে, এ। বাঙ্‌লায় ইহারা অবশ্য কর্মকারকেরও বিভক্তি। বিভক্তি এক হইলেও কর্ম ও সম্প্রদানের অর্থের ভেদ হেতু সম্প্রদানের পৃথক্ কারকস্বরূপে স্বীকার করিবার যুক্তি অবহেলা করা চলে না। সম্প্রদানের প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ (interest) বস্তুতঃ যাহার উদ্দেশে 'কর্ম'কে অর্পণ করা যায় তাহাকে সম্প্রদান বলে। অতএব কর্ম আর সম্প্রদান এক নহে।

উদাহরণঃ—অন্ধজনে দৃষ্টি দেহ। **দীনজনে** অন্নদান কর। **'দেশ বিদেশে** বিতরিছ অন্ন'—(রবীন্দ্রনাথ)। **দেবতাকে** পুষ্পাঞ্জলি দাও। 'যাঁর বরে তনু পেয়েছে অতনু তাঁহারে নমস্কার'—(সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)। ভীতকে অভয়দান কর। শিষ্যকে গুরু মন্ত্র দিলেন। 'পত্র দিল পাঠান **কেসরখাঁরে** কেতুন হতে ভুনাগরাজার রানী' (রবীন্দ্রনাথ)। প্রভু **যক্ষকে** শাপ দিলেন। **মৃতজনে** দেহ প্রাণ।

নিমিত্তার্থে চতুর্থী বিভক্তি হয়ঃ—'কিসের কারণে এসেছে রাঘব।' (মেঘনাদ-বধ)। বেলা যে পড়ে এল **জলকে** চল (রবীন্দ্রনাথ)।' ঘরকে যাব (বাঙ্‌লা উপভাষা বিশেষ)।

[ছ] অপাদান কারক বিভক্তি

যাহা হইতে **বিশ্লেষ** হয় এইরূপ বিশ্লেষ বা বিভাগের অবধিভূত পদার্থকে (limit of separation) অপাদান বলে। অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। অপাদান বিভক্তিঃ— **হইতে, হতে, থেকে, অপেক্ষা, চেয়ে, চাইতে।**

যাহা হইতে উৎপন্ন, ভীত, বিরত, শ্রুত, রক্ষিত হয় তাহাও অপাদান কারক। গাছ হইতে ফল পড়ে। তিল হইতে তৈল হয়। গঙ্গা হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সিংহ হইতে সকলেই ভীত হয়। তাহার নিকট হইতে এই কথা শুনিয়াছি। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর সে পণ্ডশ্রম হইতে বিরত হইল। আমা অপেক্ষা সে বড়। আমার চাইতে সে লেখে ভাল। 'ছেলেবেলায় আমরা অনেকেই পাঠশালা পলায়ন করেছি।' (শূন্য বিভক্তি= **পঞ্চমীর চিহ্ন 'হইতে' এখানে বিলুপ্ত)** অথবা পঞ্চমীতৎপুরুষ সমাসও ধরা যাইতে পারে। স্কুল পালিয়ে যাওয়া (লুপ্ত বা শূন্য পঞ্চমী)।

অপাদানে তৃতীয়া বিভক্তিঃ—চোরেব **মুখ দিয়া** কখনও সত্যকথা বাহির হয় না (=মুখ হইতে)। "তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল" ('অভাগীর স্বর্গ' চোখ দিয়া=চোখ হইতে)। **অপাদানে সপ্তমী**—বিবাদে ক্ষান্ত হও। **"জীবনাশে** সতত বিরত সখি রাঘবেন্দ্র-বলী" (মাইকেল)। কলহে বিরত হও। **সাদা মেঘে** বৃষ্টি হয় না (=মেঘ হইতে)। চোখে (=চোখ হইতে) ধারা বয়। **তিলে** তেল হয় (=তিল হইতে)। বিপদে মোরে রক্ষা কর'=বিপদ হইতে)। শুনি টঙ্কার তাহার **পিনাকে।**

[জ] অধিকরণ কারক বিভক্তি

ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ কারক বলে। অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়। অধিকরণ বিভক্তিঃ—এ (য়ে)—**য়, তে, এতে, ষষ্ঠ্যন্তপদের সহিত কাছে, নিকটে, মাঝে, উপরে।**

ঐকদেশিক অধিকরণঃ—লোকটি কলিকাতায় থাকে (কলিকাতার এক অংশে)।

অভিব্যাপকঃ—তিলে তৈল আছে (সর্বত্র ব্যাপ্ত)। দুধে মাখন আছে। দুষ্ট লোকের সর্বাঙ্গে বিষ থাকে।

বৈষয়িক অধিকরণঃ—তাহার **জ্ঞানে** যথেষ্ট নিষ্ঠা ছিল। ছেলের মন **পড়ায়** নাই।

ঔপশ্লেষিক (সামীপ্যাদি **সম্বন্ধ-দ্যোতক**)ঃ—'চরকার দৌলতে আমার দুয়ারে বাঁধা **হাতী**' (দরজার নিকট স্থানে)। অফিসের **ফটকে** সহস্র উমেদারের ভিড় জমিয়াছে। গঙ্গায় ঘোষ-পল্লী অবস্থিত (গঙ্গাসমীপে)। জলের **কলে** ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বাসা (=কলের নিকট) রহিয়াছে। 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।' (রবীন্দ্রনাথ)। মকর সংক্রান্তিতে **গঙ্গাসাগরে** মেলা বসে।

কালাধিকরণঃ—'**একদা ফাগুনে সন্ধ্যাসময়ে** সূর্য নিতেছে ছুটি।' (রবীন্দ্রনাথ)। '**এমন দিনে** তারে বলা যায়' (রবীন্দ্রনাথ)।

বিভক্তি শূন্য অধিকরণঃ—আমি কাল **কাশী** যাব। 'নাইবা গেলাম বিলাত'। রাম বাড়ি (বাড়িতে) গেল। **বাড়ি বাড়ি** ঘুরে বেড়াচ্ছে। **সকালবেলা** সূয উঠে। '**শ্রীবৃন্দাবন** বারেক আসিব ফিরি (=বৃন্দাবনে) (ফিরি=বেড়াইয়া)।

'**সেদিন নদীর নিকষে অরুণ** আঁকিল প্রথম সোনার লেখা।' (রবীন্দ্রনাথ)

'আমি **কাল বাড়ি** যাব। **রবিবার** বাড়ি হইতে ফিরিব। সে **গঙ্গা** নাইতে গেল (গঙ্গা নাইতে=গঙ্গায় নাইতে)। 'আমার বাড়ি বালী' (শিশু শিক্ষা) (বালী-বালীতে)।

অধিকরণে পঞ্চমী বিভক্তিঃ—অমল রাস্তা হইতে বন্ধুকে ডাকিল (=রাস্তায় দাঁড়াইয়া, অসমাপিকা ক্রিয়ার অপ্রয়োগে 'দূর হতে শুনি মহাসাগরের গান।'

[ঝ] সম্বন্ধ পদ

সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। ক্রিয়ার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই বলিয়া সম্বন্ধের **ষষ্ঠী বিভক্তি** কারক-বিভক্তি রূপে গণ্য হয না। [সংস্কৃত ভাষায় কখনও ক্রিয়ার সহিত **যুক্ত করিয়া** সম্বন্ধমাত্র দেখাইবাব জন্য ষষ্ঠী বিভক্তি ব্যবহৃত হইযা থাকে।] পাশ্চাত্ত্য ব্যাকরণে **ষষ্ঠী** বিভক্ত্যন্ত পদকে 'সম্বন্ধ কারক' (genitive case) **বলে**।

ষষ্ঠী বিভক্তিঃ—র, এর (-য়ের),—কার-কের।

ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থ—সংস্কৃত ভাষায় সম্বন্ধ-ষষ্ঠীর প্রায় এক শত অর্থ স্বীকার করা হয়। বাঙ্‌লা ভাষাতেও বহু বিভিন্ন অর্থে ষষ্ঠীর প্রযোগ হয। **ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত পদ পরবর্তী বিশেষ্যকে সাধারণতঃ বিশেষিত করিয়া থাকে।**

কর্তৃসম্বন্ধে—'আমাব তালে তোমার নাচে মিলিল রিনিঝিনি' (রবীন্দ্রনাথ)। 'প্রভাত পাখীর আনন্দগান' (রবীন্দ্রনাথ)। 'পাণ্ডু আকাশে খণ্ড চন্দ্র **হিমানীর** গ্লানি মাখা।' (রবীন্দ্রনাথ) 'মায়ের দেওযা মোটা কাপড়'। '**জীবন মৃত্যুর** ওঠা পড়া' (শা-জাহান)। **বঙ্কিমচন্দ্রের** রচিত (আনন্দমঠ), **মানুষের** গড়া দুর্ভিক্ষ [কর্তায় ষষ্ঠী]।

কর্মসম্বন্ধে—'**কবির** সম্বর্ধনা', রাজার সম্মান, **গুণীর** আদর, মায়ের সেবা, পাটের কেনা-বেচা, জিনিসের চাহিদা [**কর্মে ষষ্ঠী**] শৌর্যের পরিচয়, জাতির ত্রাণ। তোমার অসম্মান।

করণসম্বন্ধে—চোখের দেখা, **ফুলের** ঘায়ে মূর্চ্ছা যায়। লাঠির চোট, ভালবাসার অত্যাচার, তাঁতের তৈরি কাপড়।

অপাদান-সম্বন্ধে—বাঘের ভয় (=বাঘ হইতে ভয়, বাঘের নিজের যখন ভয় হয় তখন উহা কর্তৃসম্বন্ধ), চোরের ভয়, বাটপাড়ের ভয়, **কলিকাতার** দক্ষিণে [(১) কলিকাতা হইতে দক্ষিণে—শহরের বাহিরে (২) কলিকাতা শহরের দক্ষিণাংশে—অবয়ব—অবয়বী ভাব সম্বন্ধে ষষ্ঠী), খ্যাতির বিড়ম্বনা (খ্যাতি হইতে উৎপন্ন বিড়ম্বনা)]

নিমিত্তসম্বন্ধে—খাবার জল, স্নানের তেল, বসার পিঁড়ি, বিয়ের বাঁশী, বাসের ঘর, ঘোড়ার ঘাস, রান্নার চুলা, বিয়ের কনে, বরণের ধুতি। 'তুলিল **পূজার ফুল** কন্যা চন্দ্রাবতী।' (মৈমনসিংহ গীতিকা)। '**পূজার ফুল** তুলিতে চাহি তোমার ফুলবনে (রবীন্দ্রনাথ)।' 'আনরে ভোলা-জপের মালা, ভাসি গঙ্গানীরে' (রাজা রামকৃষ্ণ)। পারের কড়ি, 'পানখাবার টাকা' (প্রাচীন ভারতবর্ষে 'ফুলের দাম'=ঘুষ, উৎকোচ)।

অধিকরণ সম্বন্ধে—গভীর **জলের** মাছ, চায়ের কাপ, ঘরের ছেলে, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান, বনের হরিণ, খাঁচার পাখী, দলের সর্দার (অথবা নির্ধার সম্বন্ধ), জলের কেটলি, পালের গোদা, পাড়ার মোড়ল, গ্রামের পুরুত।

সংযোগ সম্বন্ধে—রেলগাড়ির ইঞ্জিন, গঙ্গার তীর, কানের গয়না, হাতের ময়লা, হাতের লাঠি, গায়ের চাদর।

স্বামিত্ব সম্বন্ধে—রামের বাড়ি, হরির চাকর, ধনীর টাকা, গরিবের খুদকুঁড়া, বাপের বাড়ি।

উপাদান সম্বন্ধে (প্রকৃতি বিকৃতি সম্বন্ধে)—সোনার গহনা, বালির বাঁধ, লোহার শিকল, ক্ষীরের ল্যাংচা (লম্বাকৃতি পান্তুয়া বিশেষ), শঙ্খের কুন্ডল, 'ফুলের কঙ্কণ' (রবীন্দ্রনাথ), 'রক্তের অক্ষর' ('বিসর্জন'), মাটির প্রদীপ, পিতলের পিলসুজ, 'তালপাতার সেপাই', সোনার গাধা' (মুখ্যার্থ, গৌণার্থে অপদার্থ লোক)। 'জলের তিলক' (কাশীরামদাস) পাথরের বাটি।

বিশেষণ সম্বন্ধে—লোকটা **একের** নম্বর পাজী, 'দুরের বাদ্য' (কান্তি ঘোষ), '**হাঁড়ীর** হাল' (গিরিশচন্দ্র-'জনা'), চারের পৃষ্ঠা, '**গুণের** ভাই' 'বসন্তের মাধবীমঞ্জরী' (রবীন্দ্রনাথ), '**দক্ষিণের** বাতায়নতলে,' সোনার চাঁদ, প্রেমের ঠাকুর, 'স্নেহের মিনতি' (রবীন্দ্রনাথ) হীরার আঙ্‌টি (=হীরক খচিত) শীতের গঙ্গা।

অবয়ব—অবয়বি-ভাব সম্বন্ধে—'তোরণের শ্বেতস্তম্ভ,' 'পদ্মের মৃণাল,' খাটের পায়া, জামার হাতা, পদ্মের পাঁপড়ি। "ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি।" (রবীন্দ্রনাথ)' [পার্বতীর—কর্তৃসম্বন্ধে ষষ্ঠী] **জ্ঞানসাগরের** শুধু এক অঞ্জলি।

জন্যজনক সম্বন্ধ—হরির ছেলে, বাঁশীর সুর, মৃদঙ্গের বোল (এগুলি অপাদান সম্বন্ধেও হইতে পারে), ঢাকের বাদ্য, ফুলের ফসল।

অভেদ সম্বন্ধ—নদীর জল, গঙ্গার জল, প্রেমের নিগড়, জীবনের দীপ, শোকের আগুন, 'আগুনের পরশমণি,' 'আলোকের ঝরণাধারা,' 'দীঘির মুকুরে হেরে মুখ রাত **চাঁদের প্রদীপ** জ্বালি।' (জসিমুদ্দিন) 'সুরের আগুন' (রবীন্দ্রনাথ)। - অবজ্ঞার তাপ।

সমবায় সম্বন্ধে—'তনুর তনিমা' ('উর্বশী'), বাঘের চামড়া, 'চামেলির লাবণ্য বিলাস' (শাজাহান), গায়ের রঙ্‌।

নিবৃত্তি নিবর্তনীয় সম্বন্ধ—ক্ষুধার অন্ন, আঁধারের আলো (অন্ধকার নিবৃত্তিকারক আলো), শীতের কাঁথা, অম্বের নড়ি, জ্বরের বড়ি, শিবরাত্রির সলতে (শিবচতুর্দশী রাত্রির

গাঢ় অন্ধকার নিবৃত্তির একমাত্র উপায়), পিপাসার জল (মুখ্যার্থে) 'শুষ্কপ্রায়-কলুষিত পিপাসার জল।' (রবীন্দ্রনাথ)।

দুই বা বহুর মধ্যে তুলনায়—'আমাদের এই সাধনা শবসাধনার বাড়া (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)। 'বয়সে বাপের বড়।' 'তার বেশি।'

[ঞ] অনুসর্গ

বাঙ্‌লা ভাষায় স্বাধীন সত্তাবিশিষ্ট এমন কতকগুলি শব্দ আছে যাহারা বিশেষ্য পদের পরে ব্যবহৃত হইয়া কারক সৃষ্টি করিয়া থাকে। এইরূপ শব্দকে **অনুসর্গ** বলা হয়। [সংস্কৃত ব্যাকরণে **কর্মপ্রবচনীয়ের** স্বাধীন সত্তা স্বীকৃত হয় না—সুতরাং কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা এখানে ব্যবহার করা সমীচীন নহে।] ইহারা শব্দের কোন বিকৃতি সাধন না করিয়া পরে অথবা শব্দের উত্তর বিশেষ বিভক্তির পরে বসে।

কারক বিভক্তির পরিবর্তে ব্যবহৃত অনুসর্গ

করণে—**দিয়া, দ্বারা, কর্তৃক,** ধনদিয়া বা ধনদ্বারা, রামকে দিয়া. রামকর্তৃক। সম্প্রদানে—জন্য, তরে, লাগিয়া, কারণ, হেতু।

অপাদানে—হইতে, থেকে, কাছ থেকে (থাকিয়া), নিকট থেকে, নিকট হইতে।

অধিকরণে—কাছে, নিকটে, মধ্যে। 'তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলাম শুধু লজ্জা।' (রবীন্দ্রনাথ)। 'কাছে এসো' (স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত), **'কাছে** এলে যবে হেরি অভিনব। (স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত—অনুসর্গ নহে)। 'উল্লিখিত অনুসর্গ ব্যতীত বাঙ্‌লায় সাধু ভাষায় এবং চলিত ভাষায় আরো কতকগুলি **অনুসর্গ** বা **উপপদ** রহিয়াছে। ইহাদের যোগে ষষ্ঠী বিভক্তির উৎপত্তি হয়—কোন কোন স্থলে শূন্য বিভক্তিও হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে আবার ইহারা সম্প্রদানের (চতুর্থী) অর্থও প্রকাশ করিয়া থাকে।

'আগে'—পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীর আগে আহার করে না। বিয়েব আগে গায়েহলুদ হয়।

'পাছে'—পিছে 'যেথা চলিয়াছ সেথা পিছে পিছে, স্তব গান তব আপনি ধ্বনিছে।'—রবীন্দ্রনাথ।

'উপরে'—'সবার উপরে মানুষ সত্য'। 'উপর'—'বসন্ত যায় চোখের উপর দিয়া।' রবীন্দ্রনাথ।

ছাড়া (শূন্য বিভক্তি প্রয়োগ)—কানু ছাড়া কীর্তন নাই। এমন সৃষ্টি ছাড়া কথা কেউ কখনও শোনেনি।

তরে (কবিতায়)—'তেমনি করে তোমার তরে জীবনধারা বয়ে যায়।' (রবীন্দ্রনাথ)

নীচে (নিচে)—আলোর নিচেই অন্ধকার। পানে—'মুখের পানে রব চেয়ে।' (রবীন্দ্রনাথ) 'আমা পানে', 'তোমা পানে' (বিভক্তি শূন্য ব্যবহার)। সমভিব্যাহারে—বাল্মীকি সীতার সমভিব্যাহারে আসিলেন।

কাছে—'তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন। (শূন্য বিভক্তি)

বিনা—রাম বিনা আর গতি নাই। প্রেমবিনা শান্তি নাই।

বাহির—জগতের ভিতরেও তিনি বাহিরেও তিনি।

সঙ্গে—দুর্ভিক্ষের সঙ্গে আসে মহামারী। 'রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে'। প্রতি—তোমার প্রতি রাজার আদেশ মনে রাখিও।

বদলে—'হরিণ বদলে পাইনু পুরাণ খোসলা।' (ফুল্লরার বারমাস্যা)

বিহনে (শূন্য বিভক্তি)—'উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ।' (কবিতায়)।

সনে (সঙ্গে)—'তার সনে তোর কিনা চলে কোনটা বা না হয়।' (মুকুন্দ দাস)

মতো—তাহার মতো বোকা আর কেহ নাই।

মাঝে, মাঝারে—'বুকের মাঝে কয় সে কথা।' (রবীন্দ্রনাথ)। জন্য, কারণ, নিমিত্ত—(সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তি)। তাহার জন্য তোমার এত মাথা ব্যথা কেন হে।

নাম—অনুবীক্ষণ নামে একটি যন্ত্র আছে (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী)। বিভক্তি শূন্য প্রথমা 'নাম'—এই অনুসর্গযোগে—**সিংহল নামে** রেখে গেছে নিজ শৌর্যের পরিচয়। ('আমরা')

উপপদ বিভক্তি

ক্রিযার সহিত বিশেষ্য বা তৎস্থানীয় পদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকিলে কারক হয়। বিভিন্ন কারক-বিভক্তিব উদাহরণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে।

কাবকজনিত যে বিভক্তি তাহাকে **কারক-বিভক্তি** বলে। অনুসর্গ বা অন্য উপপদ যোগে যে বিভক্তি হয তাহাকে **উপপদ বিভক্তি** বলে।

—ধিক শব্দযোগে দ্বিতীয়া (—কে এ)—'ধিক্ আজি দেত্য নামে' (বৃত্রসংহার)।

অনুসর্গ যোগে বিভক্তির উদাহরণও পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া **বিশেষ বিশেষ শব্দ যোগে** বা **বিশেষ বিশেষ অর্থে** বিভক্তি হইযা থাকে, তাহার উদাহরণ নিম্নে দেওয়া **হইল**ঃ

প্রয়োজনার্থক শব্দ যোগে তৃতীয়াঃ—আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কি **দরকার**। **সে কথায়** কাজ কি। **'নীলাম্বরে** কিবা কাজ' (রবীন্দ্রনাথ)। কহিলেন গুরু **'অর্থে নাহি** প্রয়োজন।' (রঘুবংশ—নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর)।

প্রয়োজনার্থক শব্দের প্রয়োগ না থাকিলেও উক্ত অর্থে তৃতীয়াঃ—খেলায় কে হারে কে জিতে **তাতে** তোমার কিহে বাপু! (কি=কি দরকার)।

সহার্থক শব্দের যোগে বা তাহার অপ্রয়োগে সহার্থ বুঝাইতে এ, য়, তে **বিভক্তি** (তৃতীয়া) হয়ঃ—**'তোমায় আমায়** মিল হয়েছে কোন যুগে এইখানে' (রবীন্দ্রনাথ)। (**সহার্থক** পদের **অপ্রয়োগ**) বড় **গাছে** নৌকা বাঁধা। রাজায় রাজায় যুদ্ধ। কাশীতে ষাঁড়ে ষাঁড়ে **লড়াই হয়।**

ব্যাপ্তি-অর্থে (শূন্য দ্বিতীয়া বিভক্তি)—বাজে কাজে **সারাদিন** কাটাইয়াছি। **আজ** তিনদিন বৃষ্টি চলিয়াছে। **(তৃতীয়া অপবর্গে)**—কার্য সমাপ্তি ও ফলপ্রাপ্তিকে **অপবর্গ** বলে। তিন **দিনে** তিন মাসের পথ অতিক্রম করিবার ব্যবস্থা আছে। **ক্রিয়া-বিশেষণে**ঃ—(তৃতীয়া 'এ', **বিভক্তি**) বাতাস ধীরে বহে।

হেতু-অর্থে—শোকে দুঃখে ভদ্রলোক **জর্জরিত** (হেতু অর্থে তৃতীয়া)। **তিনি পীড়ায়** কাতর। 'বনমর্মরে ত্রস্ত চকিত মৃগদল' (কুমুদরঞ্জন মল্লিক)।

দিগ্‌বাচক শব্দ যোগে পঞ্চমী—কলিকাতা হইতে দক্ষিণে।

কিসে..

রচনা।

দূর শব্দের যোগে পঞ্চমী—'সেই গান ভেসে আসে দূর হ'তে দূরে' (রবীন্দ্রনাথ)।

'পল্লী হতে দূরে গ্রামে নির্জনে'—(রবীন্দ্রনাথ)।

ভিন্নার্থক শব্দযোগে পঞ্চমী—হরি হর হইতে ভিন্ন নহেন। **নির্ধারণে ষষ্ঠী**—কবিকুলের মণি। **নির্ধারণে সপ্তমী**—দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। [জাতিগুণ ক্রিয়াদ্বারা-সমুদায় হইতে এককে পৃথক্ করার নাম নির্ধারণ—অনেকের মধ্যে এককে বাছিয়া বাহির করা।]

কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান এবং অধিকরণ এই ছয়টি কারকের কথা বলা হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য মতে সম্বন্ধে ষষ্ঠী ও সম্বোধনও কারক-মধ্যে গণ্য হয়।

শব্দরূপ

বিভিন্ন কারকে এবং বিভক্তিযোগে বিশেষ্য ও সর্বনাম শব্দের যে সকল পরিবর্তন হইয়া থাকে তাহা শব্দরূপে প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

বিভক্তির আকৃতি

	একবচন	বহুবচন
কর্তৃকারক	শূন্য বিভক্তি,	রা (এরা)
(প্রথমা বিভক্তি)	এ, —এ-তে	গুলা, গুলি
		গুলায়, গুলাতে
কর্মকারক	শূন্য বিভক্তি,	—দিগকে
(দ্বিতীয়া)	—কে, —রে,	—দিগে (মৌখিক ভাষায়)
	—এরে (কবিতায়)	—দের
	—এ	—দেরকে
		—গুলিকে
		—গুলারে
করণকারক	—এ, —তে	—দিগদ্বারা
(তৃতীয়া)	—দিয়া, দ্বারা	—দিগের দ্বারা,
	কর্তৃক	—দের দ্বারা
		—গুলিদ্বারা
সম্প্রদান কারক	—কে —রে —এ,	—দিগকে
(চতুর্থী)	এরে,	—দেরকে
		—গুলিকে
		—গুলারে
অপাদান	—হইতে —হতে	—দিগ হইতে
(পঞ্চমী)	—থেকে, —এর থেকে	—গুলি হইতে
	—এর কাছ হইতে	—গুলা হইতে
		—গুলো হতে
		—গুলো থেকে
সম্বন্ধ পদ	—এর	দিগের, দের
		গুলির, গুলার
অধিকরণ কারক	—এ, এতে	দিগেতে, দিগতে
	—এর কাছে	গুলোতে
	—য়	দিগের মধ্যে

	একবচন	বহুবচন
সম্বোধন পদ	শূন্য বিভক্তি	রা এরা, গুলো

বালক শব্দের রূপ

কর্তৃকারক (প্রথমা)	বালক	বালকেরা, বালকগুলো
কর্মকারক (দ্বিতীয়া)	বালক, বালকে, বালককে	বালকদিগকে বালকগুলিকে, বালকদিগকে বালকগুলাকে
করণকারক (তৃতীয়া)	বালকদ্বারা, বালকের দ্বারা বালককে দিয়া	বালক দিগদ্বারা বালকদিগের দ্বারা বালকগুলিকে দিয়া বালকগুলোকে দিয়া
সম্প্রদান কারক	বালকে বালককে	বালকদিগকে বালকগুলিকে বালকগুলোকে
অপাদান (পঞ্চমী)	বালক হইতে বালক থেকে	বালকদিগ হইতে বালকগুলি হইতে বালকগুলা হইতে
সম্বন্ধ পদ	বালকের	বালকদের বালকদিগের বালকগুলার বালকগুলির
অধিকরণ কারক (সপ্তমী)	বালকে বালকেতে	বালকদিগেতে বালকগুলিতে বালকগুলোতে
সম্বোধন পদ	হে বালক	হে বালকেরা ওরে বালকগুলো

অনুশীলনী

১। (ক) 'কারক-বিভক্তি'—আর 'অন্যপ্রকার বিভক্তি' বলিতে কি বুঝায়, উদাহরণসহ [illegible]

২। বিভক্তিশূন্য প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া এবং সপ্তমীর উদাহরণ দাও।

৩। সম্বন্ধ ও সম্বোধনকে কারক বলা চলে কি? যদি তাহা না চলে তবে উহার কারণ প্রদর্শন কর। (উঃ মাঃ ১৯৬১)

৪। নিম্নলিখিত বাক্যাংশগুলিতে ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থ নির্দেশ কর:—

ফুলের ঘা, খাবার জল, গুণীর আদর, ফুলের ফসল, হাতের লাঠি সোনার চাঁদ, চারের পৃষ্ঠা, বাঁশীর সুর, আগুনের পরশমণি, প্রেমের নিগড়, তনুর তনিমা, আঁধারের আলো, শিবরাত্রির সল্তে, খাটের পায়া, জ্ঞানসাগরের অঞ্জলি।

৫। স্থূলাক্ষর পদগুলিতে কারণ প্রদর্শনপূর্বক বিভক্তি নির্ণয় কর:—

(১) (বেলা যে পড়ে এলো) **জলকে** চল। (২) সে রোজ **গঙ্গা** নাইতে (যায়)। (৩) (রাম) **তাস** খেলে। (উঃ মঃ ১৯৬০) (৪) **কত ধানে** কত চাল তা' জান না বাপু! (৫) কিসের **কারণে** এসেছ রাঘব! (৬) 'দুঃখের **বেশে** তোমারই **রণতূর্য** বাজে।' (৭) 'দুঃখের

বরষায় চোক্ষের জল যেই নামল।' (৮) 'বামুন চেনা যায় পৈতায়।' (৯) তাঁহাকে নমস্কার। (১০) বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে (উঃ মঃ ১৯৬০)। (১১) তিনি পীড়ায় কাতর (উঃ মঃ ১৯৬০)। (১২) গুরুশিষ্যে কথা বলে। (১৩) অণুবীক্ষণ নামে একটি যন্ত্র আছে। (১৪) সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্যের পরিচয়। (১৫) গ্রামে লোকে এক মনে পূজয়ে দেবতাগণে খড়্গে ছাগে কাটে লোকহিতে। (১৬) হাসিয়া উঠিল অট্টহাস্য। (১৭) তোতে আমাতে পঞ্চম গাই।

উত্তর (১৫)ঃ– গ্রামে—অধিকরণে সপ্তমী এ বিভক্তি। লোকে—কর্তৃকারকে প্রথমা 'এ' বিভক্তি। একমনে--ক্রিয়া-বিশেষণে তৃতীয়া 'এ' বিভক্তি। দেবতাগণে—কবিতায় কর্ম-কারকে দ্বিতীয়া 'এ' বিভক্তি। খড়্গে—করণকারকে তৃতীয়া 'এ' বিভক্তি। ছাগে– কর্মকারকে কবিতায় দ্বিতীয়া এ' বিভক্তি। লোকহিতে–নিমিত্তার্থে চতুর্থী 'এ' বিভক্তি।

[দ্রষ্টব্য– উক্ত উদাহরণগুলিতে 'এ' বিভক্তি সম্প্রদান ও অপাদানের অর্থ ছাড়া অন্য সকল কারকের অর্থ প্রকাশ করিতেছে। সম্প্রদানের উদাহরণ—মূর্খ ছেলেকে কিছু না দিয়ে বরং টাকাটা জলে (=জলকে) দাও। অপাদান–'এ' কি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে! (=মুখ হইতে)]

৬। অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তির উদাহরণ দাও ও ব্যাখ্যা কর।

৭। অধিকরণ কারকে প্রযুক্ত বিভিন্ন বিভক্তিগুলির উল্লেখ কর।

৮। উদাহরণসহ বিভিন্ন অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ দেখাও।

৯। অপেক্ষার্থে ষষ্ঠীর উদাহরণ দাও।

১০। এমন একটি বাক্য রচনা কর যাহাতে সমস্ত কারক প্রয়োগ করা হইয়াছে। রচিত বাক্যে কোন্ কারকে কোন্ বিভক্তি হইয়াছে দেখাইয়া দাও। (উঃ মাঃ ১৯৬১)

১১। উপসর্গ ও অনুসর্গের পার্থক্য বুঝাও। (উঃ মাঃ ১৯৬০ কম)

১২। একটি বাক্য রচনা করিয়া নিম্নলিখিত কারকসমূহে —এ' বিভক্তির ব্যবহার দেখাইয়া দাও—কর্তৃকারক, কর্মকারক, করণকারক, অপাদান কারক, অধিকরণ কারক। (উঃ মাঃ ১৯৬০ কম)

চতুর্থ অধ্যায়

ক্রিয়াপদ

বাক্যকে বিশ্লেষণ করিলে তাহার প্রধান দুইটি অংশ পাওয়া যায়। একটির নাম উদ্দেশ্য অপরটির নাম বিধেয়। যাহার সম্বন্ধে কিছু বলা হয় তাহা উদ্দেশ্য। আর যাহা বলা হয় তাহা বিধেয়। 'রাম বাড়ি যায়'—এখানে রামের সম্বন্ধে বাড়ি যাওয়ার কথা বলা হইতেছে। সুতরাং 'রাম' উদ্দেশ্য। 'বাড়ি যায়' বিধেয়। উদ্দেশ্যাংশে বিশেষ্যের প্রাধান্য, বিধেয়াংশে ক্রিয়া পদের প্রাধান্য। শুধু বিধেয়াংশে নহে, সমগ্র বাক্যে ক্রিয়াই প্রধান। ক্রিয়া ছাড়া কোন বাক্য হয় না। যেখানে ক্রিয়ার উল্লেখ নাই সেখানে ক্রিয়া উহ্য আছে মনে করিতে হইবে। এখানে 'যায়' ক্রিয়াপদের মূলে 'যা' ধাতু রহিয়াছে। 'যা' ধাতুর অর্থ গমন বা যাওয়া। ক্রিয়াবাচক 'খা' 'খা' (খাওয়া), ('থাক' 'থাকা') প্রভৃতি ধাতু। যাহা কোন শব্দ বা ক্রিয়াপদের মূল তাহাকে ধাতু বলে। ধাতুর উত্তর প্রত্যয় যোগে (বিভক্তি যোগে) ক্রিয়াপদ গঠিত হয় এবং কৃৎপ্রত্যয়ের যোগে কৃদন্ত শব্দের গঠন হয়। কোন শব্দের বা পদের দুই অংশ থাকে (১) প্রকৃতি ও (২) প্রত্যয়। শব্দের বা পদের যে অংশ প্রথমে বসে তাহাকে প্রকৃতি বলে, তাহার উত্তর যাহা

অবস্থান করে তাহাকে বলে প্রত্যয়। ['যা' 'খা' প্রভৃতি ক্রিয়াবাচক শব্দকে ধাতু বলে। ধাতুর অর্থকে ক্রিয়া বলে। 'যা' একটি ধাতু, ইহার অর্থ যাওয়া—সুতরাং যাওয়া ক্রিয়া।]

প্রকৃতি দুই প্রকার ধাতু ও প্রাতিপদিক। ধাতুর কথা পূর্বে বলা হইয়াছে।

ধাতু, পদ এবং প্রত্যয় ছাড়া অর্থবিশিষ্ট শব্দকে প্রাতিপদিক বলে। যথা 'মনুষ্য' একটি প্রাতিপদিক, ইহার উত্তর 'রা' প্রত্যয় (বিভক্তি) যোগ করিলে 'মনুষ্যেরা'—পদরূপে পরিণত হয়। ইহা বিশেষ্য পদ। এখানে মনুষ্য (প্রকৃতি—প্রাতিপদিক)+রা (প্রত্যয় বা বিভক্তি)। 'যায়' পদে 'যা' (ধাতু—প্রকৃতি)+য় (প্রত্যয় বা বিভক্তি='যায়' ক্রিয়াপদ। মনুষ্যেরা' যায়=ইহা একটি পূর্ণ বাক্য। ধাতুর উত্তর বিভক্তি যোগে ক্রিয়াপদ হয়। ধাতুর উত্তর কৃৎ-প্রত্যয় যোগ করিলে উহা কৃদন্ত প্রাতিপদিক হয়। যথা 'যা' (ধাতু)+ওয়া (প্রত্যয়)= যাওয়া। ইহাকে বিভক্তি যোগে পদে পরিণত করা যায়।

স্কুলে যাওয়ার সময় বসে আছ কেন? যাওয়া+র বিভক্তি যোগে 'যাওয়ার' ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদ।

[১] ধাতু

শব্দের অর্থবিচারের দৃষ্টিতে যাহা শব্দের মূল—যাহার আর বিশ্লেষণ চলে না তাহাকে ধাতু বলে। অধিকাংশ শব্দই কোন না কোন ধাতু হইতে উৎপন্ন।

গঠন-অনুসারে বাঙ্‌লা ভাষার ধাতুগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়ঃ—

(১) মৌলিক ধাতু বা সিদ্ধ ধাতু, (২) সাধিত, (৩) সংযোগাত্মক ধাতু।

(১) **মৌলিক ধাতুঃ**—যে সব ধাতুর কোন বিশ্লেষণ চলে না সেই সব ধাতুকে মৌলিক ধাতু বলে। এই মৌলিক ধাতুগুলির কতক (ক) সংস্কৃত বা তৎসম ধাতু, (খ) তদ্‌ভব বা প্রাকৃতজ ধাতু। (ক) উদাহরণ—লিখ্, দহ্, গর্জ, চল্, দুহ্, খেল্, যা। (খ) উদাহরণ—কর্, খা, নাহ্, কহ্, পর্, পড়্, ভর্, গড়্, বল্, মল্, জান্, ধা, দে, কিন্ ইত্যাদি।

(২) **সাধিত ধাতুঃ**—এক বা একাধিক প্রত্যয়ান্ত ধাতু বা নামপদকে প্রত্যয় যোগে ধাতুতে পরিণত করা হইলে তাহাকে **সাধিত ধাতু** বলা হয়।

সাধিত ধাতু পাঁচ প্রকারের। যথা (ক) ণিজন্ত বা প্রেরণার্থক ধাতু (বা 'কারিত')।

মূল ধাতুতে—আ বা-ওয়া প্রত্যয় যোগ করিয়া প্রেরণার্থক ধাতু গঠিত হয়ঃ

আমি করি (কর+ই) আমাকে দিয়া তিনি করান (কর্+আ)।

এখানে 'করা' ধাতু প্রেরণার্থক। খায়—প্রেরণার্থক খাওয়ায় (খা+ওয়া)। চরে—প্রেরণার্থক চরায় (চর্+আ+য)। দেয়—প্রেরণার্থক দেওয়ায় (দে+ওয়া+য়)। বহে—প্রেরণার্থক বহায় (বহ্+আ+য়)।

(খ) কর্মবাচ্যের—আ প্রত্যয়যুক্ত ধাতু যথা শোনে—শুনায় (শোনায়), 'ছোট ছেলের মুখে এ কথা বিশ্রী শোনায়'। দেখ্ ধাতু+আ (কর্মবাচ্য) দেখায়, 'কাজটা ভাল দেখায় না'।

(গ) **নাম ধাতুঃ—নাম শব্দ বা বিশেষ্য পদ অথবা বিশেষণ পদের উত্তর—আ প্রত্যয় যোগ করিয়া নাম ধাতু গঠিত হয়ঃ**— (১) সংস্কৃত বা তৎসম নামধাতু—শ্যাম+য (ক্যঙ্) শ্যামায়মান বনভূমি, ঘন+ (ক্যঙ্) সন্ধ্যার ঘনায়মান ছায়া। ফেন+(ক্যঙ্) 'ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান।' (নজরুল)।

(২) **বাঙ্‌লা নামধাতু ঃ**—ফেন+আ+ইয়া=ফেনাইয়া। ঘন+আ=ঘনায়। লাঠি+আ=লাঠা+য়=লাঠায়। জুতো+আ+য়=জুতায়। ধমক+আ=ধমকা =ধমকায়। বিষ+আ=বিষা+য়=বিষায়। রঙ্‌+আ=রঙা+য়=রঙায়। কাম+আ=কামা+য়=কামায়। কোদাল+আ=কোদালা+য়=কোদালায়। ঠক+আ=ঠকা+য়=ঠকায়।

(গলাধঃকরণ অর্থে) পান+আ=পানা+য়=পানায় (পূর্ববঙ্গে 'দোহায়' অর্থে পান করায়)। এইরূপ চড়ায়, ঠকায় ইত্যাদি। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়াছে, ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে।

(ঘ) **ধ্বন্যাত্মক ধাতু ঃ**—ফুঁক্‌, ধুক্‌, হাঁফ। লোকটি হাঁফাচ্ছে, "লোকটার খাবার অভাব, তবু বিড়ি 'ফুঁকছে'।

(ঙ) **অজ্ঞাত-মূল ধাতু ঃ**—গজা, গুটা, জুড়া, লেলা ইত্যাদি। আগে বুদ্ধি ছিল না, এখন ছেলেটার বুদ্ধি গজাচ্ছে। তার ফাঁকি ধরা পড়েছে এখন পাততাড়ি গুটাতে হবে।

'গুটায়ে সোনার পাল সুদূরে নীরবে' (রবীন্দ্রনাথ)। 'খোকা ঘুমাল পাড়া জুড়ল।' আজকালকার দিনে ভিক্ষুকের উপর অনেকে কুকুর **লেলায়।**

(৩) **সংযোগাত্মক ধাতু ঃ**—বাঙ্‌লা সাধু ভাষায় সংযোগাত্মক ধাতুর বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। বিশেষ্য বিশেষণ অথবা ধ্বন্যাত্মক শব্দের সহিত সহায়ক হ্‌, কর্‌, দে খা, পড়্‌ প্রভৃতি কতকগুলি ধাতু যুক্ত করিয়া সংযোগাত্মক ধাতু গঠিত হইয়া থাকে। যথা—**প্রণাম+কর্‌**=প্রণাম কর্‌ ধাতু। 'কুণ্ঠিত সেই বঙ্গের বধূ হে কবি তোমারে প্রণাম করে।' (সত্যেন্দ্র দত্ত) 'তোমায় করি গো নমস্কার' (রবীন্দ্রনাথ)। **জিজ্ঞাসা+কর্‌**=জিজ্ঞাসা কর্‌ ধাতু। তোমাকে খোলাখুলিভাবে জিজ্ঞাসা করি তুমি দেশের কি কি অপকার করিয়াছ? **শান্ত+হ্‌**=শান্ত হ্‌ ধাতু। 'শান্ত হও ওরে মন নত কর শির।' (রবীন্দ্রনাথ)। আছাড়+খা=আছাড়খা—হাঁটিতে শিখিতে গিয়া সকলেই আছাড় খায়। শির্‌+শির্‌+কর্‌=শির্‌ শির্‌ কর্‌ ধাতু। শরীর শির্‌ শির্‌ করিতেছে। গা ছম ছম করে।

[২] সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া

প্রত্যেক ধাতুর দুইটি সাধারণ অর্থ আছে।—একটি তাহার ব্যাপার অপরটি ফল।

যথা হাস্‌ ধাতু (সংস্কৃতে হস্‌ ধাতু) 'রাম হাসে' এখানে, হাসিতে গেলে যে ক্রিয়া বা প্রচেষ্টা চলে তাহার নাম ব্যাপার (activity) এবং অঙ্গ সঞ্চালনের একটা ফলও (result) আছে। যখন ফল ও ব্যাপার কর্তাকে আশ্রয় করে তখন ধাতু হয় **অকর্মক।** আর **ফল** অন্য যাহাকে আশ্রয় করে তাহা হয় কর্ম। কর্ম যাহার থাকে এইরূপ ক্রিয়াকে **সকর্মক** ক্রিয়া বলা হয়। 'রাম লাঠি দিয়া সাপ মারে'—মারা ক্রিয়ার চেষ্টা (effort) রামেতে আছে। কিন্তু চেষ্টার প্রভাব পড়ে 'সাপের' উপর। চেষ্টার প্রভাবের নামই ফল। সুতরাং 'সাপ' 'মারে' এই ক্রিয়ার কর্ম।

সকর্মক ক্রিয়ার একাধিক কর্ম থাকিতে পারে। তাহার একটিকে বলা হয় মুখ্য কর্ম, অপরটি গৌণ কর্ম। ইহাদের উদাহরণ কারক প্রকরণে দেওয়া হইয়াছে।

অকর্মক ক্রিয়া—বসা, শোয়া, জাগা, মরা, বাঁচা, ঘুমান, হাসা, কাঁদা, চলা, থাকা, লড়া, লাওয়া, ফেরা ইত্যাদি।

সকর্মক ক্রিয়া—করা, ধরা, মারা, ছাড়া, নাড়া, (প্রযোজক ক্রিয়া, পড়া (পাঠ করা), কেনা, বেচা, ছোড়া, দেখা, শোনা, বলা, মলা ইত্যাদি।

যে সকর্মক ক্রিয়ার একাধিক কর্ম থাকে এইরূপ ক্রিয়াকে **দ্বিকর্মক** ক্রিয়া বলে। এই কর্মগুলির মধ্যে একটি **মুখ্য কর্ম** অপরটি **গৌণ কর্ম**—যথা শিক্ষক মহাশয় ছাত্রকে প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তর মুখ্য কর্ম ছাত্র গৌণ কর্ম।

কতকগুলি অকর্মক ক্রিয়ার সহিত সমধাতুজ কর্ম ব্যবহার করিলে অকর্মক ক্রিয়াও সকর্মক হয়—এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া লোকগুলি কি **হাসাই** না হাসিল। ছেলের জন্য মা কি **কান্নাটাই** না কাঁদিলেন। হাসিয়া উঠিল অট্টহাস্য।

[৩] সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া

যে ক্রিয়া কোন বাক্যের অর্থকে সম্পূর্ণ করে তাহাকে **সমাপিকা ক্রিয়া** বলে; আর যে ক্রিয়া তাহা করে না তাহা **অসমাপিকা ক্রিয়া**।

'রাম বাড়ি যায়'—এখানে 'যায়' ক্রিয়া-দ্বারা বাক্যের অর্থ পরিসমাপ্ত হইয়াছে; অর্থ পরিসমাপ্তি বিষয়ে অন্য কোন ক্রিয়ার অপেক্ষায় নাই। সুতরাং যায় ইহা সমাপিকা ক্রিয়া। 'রাম বাড়ি যাইয়া'—এখানে 'যাইয়া' ক্রিয়া দ্বারা বাক্যটির অর্থ সম্পূর্ণ হইল না—ইহা অন্য আর একটি ক্রিয়ার অপেক্ষা রাখে। বাড়ি যাইয়া কি করিল? এই প্রশ্ন আসে। বাক্য পূর্ণ করিতে হইলে 'ঘুমাইল' ক্রিয়াপদ যোগ করিতে হয়। 'রাম বাড়ি যাইয়া ঘুমাইল'—ইহা পূর্ণ বাক্য।

অসমাপিকা ক্রিয়া

ধাতুর উত্তব **-ইয়া, -ইলে** যোগে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়।

দুইটি ক্রিয়ার যখন একই কর্তা হয় তখন পূর্বকালবোধক ক্রিয়া বাচক ধাতুর উত্তর-ইয়া প্রত্যয় হয়। 'ইয়া' প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া কর্তাকে প্রকাশ করে। 'ভদ্রলোক বাড়ি আসিয়া **ছেলেকে** দেখিলেন।' এখানে 'আসিয়া' পদটি কর্তাকে আশ্রয় করিতেছে। বাক্যের কর্তা 'ভদ্রলোক' পদ, এই ক্রিয়া (আসিলেন) ও 'দেখিলেন' ক্রিয়ার কর্তা।

কিন্তু 'আমি জ্বর হইয়া কষ্ট পাইতেছি'—বাক্য শুদ্ধ নহে, কেননা 'হইয়া' ক্রিয়ার কর্তা জ্বর 'কষ্ট পাইতেছি' ক্রিয়ার কর্তা 'আমি' পদ। আমি জ্বরে কষ্ট পাইতেছি—শুদ্ধরূপ।

-ইলে প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তার সহিত পরবর্তী ক্রিয়ার কর্তৃত্ব সম্বন্ধ থাকে না। যথা—'জঙ্গলে তাহাকে বাঘে খাইলেও খাইবে সাপে কামড়াইলেও কামড়াইবে। 'ভালয় ভালয় ছেলে বাড়ি ফিরিলে মায়ের হৃদয় শান্ত হইতে পারে'।

কবিতায় কখন কখন -ইয়া প্রত্যয়ের 'য়া' অংশের লোপের পর-ই থাকে। জিনি (জিনিয়া জয় করিয়া), করি (করিয়া), ধরি (ধরিয়া), সাজি (সাজিয়া), জাগি (জাগিয়া) ইত্যাদি। ওগো পুরোবাসি কে রয়েছ জাগি' (শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা)। (গদ্যে চলিবে না)।

'জাগিয়া' পদও হয়—'গুরুর মন্ত্রে জাগিয়া উঠেছে শিখ।' (রবীন্দ্রনাথ) গদ্যে-পদ্যে সংক্ষিপ্তরূপ—'জেগে'—পুষ্পে কীটসম হেথা তৃষ্ণা জেগে রয়।' (বিদায় অভিশাপ), 'তমাল জিনি' বরণ তব' (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)। সংক্ষিপ্তরূপ—'জিনে'—'সিংহগড় মোরে জিনে দিতে

হবে।' (সিংহগড়)। 'দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।' (কাশীরাম দাস।) (গদ্যে এরূপ প্রয়োগ করা চলিবে না)।

-ইয়া প্রত্যয়ান্ত পদ কখন কখনও কর্তা বা ক্রিয়াকে বিশেষিত করিয়া থাকে:— ('ধ্রুব') কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে।' (বিসর্জন)।

'তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া
নব নব দেশে বারতা লইয়া
হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া
গাহিয়া গাহিয়া গান।' (রবীন্দ্রনাথ)

নিমিত্তার্থক অসমাপিকা ক্রিয়া (Gerundial Infinitive) ধাতুর উত্তর -ইতে প্রত্যয় যোগ করিয়া নিমিত্তার্থক অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়। বাঙলার বধূ জল আনিতে ঘাটে যায়। ধান ভানিতে শিবের গীত। -ইতে প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া আবশ্যকতা, ইচ্ছা আদেশ আরম্ভ প্রভৃতি বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে:—তোমাকে আজই যাইতে হইবে। খোকার আজ স্কুলে যাইতে মোটেই ইচ্ছা নাই। সে অনেকক্ষণ বোবার ভান করিয়া থাকিবার পর বেশ কথা কহিতে লাগিল।

ক্রিয়া-বাচক বিশেষণ

ধাতুর উত্তর—ইতে প্রত্যয় যোগ করিয়া ক্রিয়াবাচক বিশেষণ গঠিত হয়: -রাম চলিতে চলিতে রাজবাড়ি উপস্থিত হইল। তাহাকে কেহ কখনও অদৃষ্টের দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখে নাই।

ক্রিয়া-বাচক বিশেষণের ভাবে প্রয়োগ

যখন—ইতে প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া-বাচক বিশেষণ পদকে মূল বাক্য হইতে পৃথকরূপে ব্যবহৃত দেখান হয় তখন ঐরূপ বিশেষণের ভাবে প্রয়োগ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট বিশেষ্য পদ প্রথমা, দ্বিতীয়া, চতুর্থী বা ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত হইয়া থাকে:—বাপ থাকতে সংসারের চিন্তা কে করে। 'কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।' (রবীন্দ্রনাথ)। 'রাত্রি শেষ না হইতেই এ দুনিয়া সে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে (অভাগীর স্বর্গ)। —'আ' বা 'আনো' প্রত্যয় যোগেও ক্রিয়া-বাচক বিশেষণ গঠিত হয়। 'সকালের রাঁধা ভাত নিয়ে এস।' এ গ্রামে বাঁধানো ঘাটে সন্ধ্যাবেলা সকলেই বসে।'

[৪] অসম্পূর্ণরূপ ক্রিয়া (Defective verb)

পৃথিবীর প্রাচীন ও নবীন অনেক ভাষায় এমন কতকগুলি ধাতু আছে যাহাদের রূপ সকল ভাবে (প্রকারে) বা কালে পাওয়া যায় না। ইহাদের পরিবর্তে সমার্থক অন্য ধাতুর রূপ বসাইয়া ব্যাকরণে ধাতুরূপকে পূর্ণ করা হইয়াছে। ইহারাই অসম্পূর্ণ ক্রিয়া। সংস্কৃত ভাষায় √দৃশ্ ধাতুর বর্তমানাদিকালে (সার্বধাতুক) রূপ নাই—ইহার স্থলে পশ্য (√স্পশ্) বসাইয়া রূপ করা হয়—যথা পশ্যতি (=দেখে) অপশ্যৎ (=দেখিয়াছিল)। ইংরেজি ভাষায় verb to go-এর অতীতের রূপ went—wend ধাতু হইতে আসিয়াছে। বাঙলাতেও এইরূপ অসম্পূর্ণরূপ (বা খণ্ড) ক্রিয়া আছে। যথা—√আছ ধাতুর বর্তমান ও অতীত আছে (আছে, আছিস>ছিল) কিন্তু ভবিষ্যৎ কালের পদ নাই। √বট ধাতু কেবল বর্তমানেই ব্যবহৃত হয়—'বটে'—'যা রটে তা বটে' 'আজ্ঞে হাঁ' 'তা তো বটেই'।

[৫] মৌলিক ক্রিয়া ও যৌগিক ক্রিয়া

একটি মূল্ ধাতুর উত্তর ক্রিয়া বিভক্তি যোগ করিয়া যে ক্রিয়া গঠিত হয় তাহাকে **মৌলিক ক্রিয়া** বলে। যথা—কর্ (ধাতু)+ই=করি, আস্+ইতেছে=আসিতেছে। খা+ইল =খাইল। ক্রিয়াবাচক পদের সহিত অপর (১) ক্রিয়া, ভাববাচক বিশেষ্য বা বিশেষণের সহিত (২) অন্য ধাতু যোগ করিয়া যে ক্রিয়া গঠিত হয় তাহাকে **যৌগিক ক্রিয়া বলে।** যথা—(১) 'জাগিয়া উঠি বৈতালিক গাহিছে জয় গান' (রবীন্দ্রনাথ)। চমকিয়া উঠা, বসিয়া পড়া, পাইয়া বসা, হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া, চলিয়া যাওয়া—সে এখান হইতে চলিয়া গেল (স্থান ত্যাগ করিল), অল্প টাকাতে আমার বেশ চলে যাচ্ছে, কাঁদিয়া ফেলা। (২) ক্ষুধিতকে অন্ন দান কর. তিনি ভোজন করিলেন, বাতাস করা, শান্ত হওয়া. মনে করা, পাখা করা (বিদেশী শব্দের সহিত) ফোন করা টেলিগ্রাম করা, পালিশ করা. তিলক কাটা. চেক কাটা, পাশ কাটা, সাঁতার কাটা (ধ্বন্যাত্মক শব্দের সহিত ধাতু যোগে) ভনভন্ করা, ঘিনঘিন্ করা, খাঁ-খাঁ করা, (শূন্যতাদ্যোতক)।

অনুশীলনী

১। খাঁটি বাঙ্লা উদাহরণসহ সংক্ষেপে আলোচনা করঃ -

(১) সাধিত ধাতু (উঃ মাঃ ১৯৬০) (২) নামধাতু (৩) সংযোগাত্মক ধাতু (৪) মৌলিক ক্রিয়া (৫) যৌগিক ক্রিয়া (৬) প্রযোজক ক্রিয়া (৭) দ্বিকর্মক ক্রিয়া (৮) ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া।

২। ধাতু কাহাকে বলে? বাংলা ভাষায় ধাতুর শ্রেণীবিভাগ কর এবং প্রত্যেকটির একটি করিয়া উদাহরণ দাও।

৩। মৌলিক ক্রিয়া ও যৌগিক ক্রিয়ার পার্থক্য বুঝাইয়া দাও। (উঃ মাঃ ১৯৬০ কম)।

পঞ্চম অধ্যায়

ক্রিয়ার প্রকার ও কাল

[১] ক্রিয়ার প্রকার

কোন বাক্যকে বিশ্লেষণ করিলে তাহার দুইটি প্রধান অংশ পাওয়া যায়—একটি উদ্দেশ্য, অপরটি বিধেয়।

যাহার সম্বন্ধে কিছু বলা হয় সে বা তাহা উদ্দেশ্য, আর যাহা বলা হয় তাহা বিধেয়। বাক্যের বিধেয়াংশে ক্রিয়া পদের প্রাধান্য থাকে আর উদ্দেশ্যাংশে কর্তৃপদ প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু সমগ্র বাক্যে ক্রিয়া-পদেরই প্রাধান্য, কারণ ক্রিয়াই বাক্যকে প্রকৃতপক্ষে প্রকাশিত করিয়া থাকে। ক্রিয়ার কার্য হইতেছে কর্তার সম্বন্ধে কিছু প্রতিপাদন করা (assertion) এই প্রতিপাদন বা অবধারণ নানা প্রকারে বা উপায়ে (Mood) করা হইয়া থাকে। এইরূপ উপায়কে পাশ্চাত্ত্য ব্যাকরণে Mood বলা হয়।

সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্রে Mood বা উপায়-অনুসারে ক্রিয়াপদকে বিভক্ত করা হয় না। তবে ল-কারের অর্থের মধ্যে moodকে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। ক্রিয়াবিভক্তির বিশেষ বিশেষ অর্থের সহিতই Mood জড়িত আছে। [সংস্কৃত ব্যাকরণে (পাণিনি) 'ল-কার বলিতে Tense এবং Mood উভয়কেই বুঝায়। ল-কারার্থ নির্ণয়ে Mood-এরও বিচার আছে।]

ক্রিয়ার প্রকার বা ভাবকে বাঙ্‌লা ভাষায় তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ—

(১) **নির্দেশক প্রকার** (Indicative Mood) বা **অবধারক প্রকার,** (২) **অনুজ্ঞা** (Imperative) (৩) **ঘটনান্তরাপেক্ষিত প্রকার।** (Subjunctive)

(১) **নির্দেশক প্রকার** (Indicative Mood) নির্দেশক প্রকারে শুধু ক্রিয়ার অবধারণ বা নির্দেশ হইয়া থাকে। এখানে **স্বার্থে ক্রিয়ার প্রকার হইয়াছে বুঝিতে হইবে** [স্বার্থ= নিজের অর্থ, কোন বিশেষ অর্থ নহে।]

ক্রিয়ার যে কার্য (অবধারণ assertion) শুধু তাহাই আছে—তদতিরিক্ত কোন 'প্রকার' এখানে নাই। সুতরাং নির্দেশক প্রকার স্বার্থে (নিজের অর্থে) প্রকার ব্যতীত আর কিছুই নহে। যথা- 'রাম যায়'—এই বাক্যে রামের সম্বন্ধে, ক্রিয়াপদ ('যায়') গমন ক্রিয়াকে অব-ধারণ (প্রতিপাদন) করিতেছে। সুতরাং রামের যাওয়া (গমন) এবং নির্দেশক প্রকার প্রতিপাদিত গমন ক্রিয়ার অবধারণ একই কথা। অতএব এখানে স্বার্থে ক্রিয়ার প্রকার হইয়াছে।

(২) **অনুজ্ঞা প্রকার** (Imperative Mood)ঃ—বক্তার আদেশ, অনুনয়, প্রার্থনা, অনুমোদন বুঝাইতে **অনুজ্ঞা প্রকার** হয়। যথা- সে এখান থেকে চলে যাক্‌। 'ভিক্ষু কহে ডাকি, হে নিদ্রিত পুর, দেহ ভিক্ষা মোরে করো নিদ্রা দূর।'—রবীন্দ্রনাথ। এখানে অবধারণ ব্যতীত অনুজ্ঞারূপ অতিরিক্ত অর্থ রহিয়াছে একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্‌।

'উঠাও সন্ন্যাসী উঠাও সে তান
হিমাদ্রি শিখরে উঠিল যে গান।' (স্বামী বিবেকানন্দ)

'গভীর ওঙ্কারে হুঙ্কারি দেরে ডাক্‌
কাঁপিয়া উঠুক বিশ্ব মেদিনীটা ফেটে যাক্‌।'—মুকুন্দ দাস।

(৩) **ঘটনান্তরাপেক্ষিত প্রকার** (Subjunctive Mood)ঃ—একটি ক্রিয়া অপর ক্রিয়ার উপর নির্ভর করিলে **ঘটনান্তরাপেক্ষিত প্রকার** হইয়া থাকে। এই 'প্রকার' অনিশ্চয়তা এবং সম্ভাবনা সূচনা করে। 'সে বাজারে গেলে আমিও যাইব'—আমার যাওয়া তাহার যাওয়ার উপর অপেক্ষা বা নির্ভর করিতেছে সুতরাং ইহা অনিশ্চিত ব্যাপার। 'সে যদি বাজারে যায় তবে আমিও যাইব'—এখানেও অপেক্ষা রহিয়াছে। 'যদি সে বাড়ি যাইত আমিও যাইতে পারিতাম'—এখানে সম্ভাবনা বুঝাইতেছে। **নির্দেশক বা অনুজ্ঞা ব্যতীত বাঙ্‌লা ধাতুরূপ বিভিন্ন প্রকার অনুসারে বিভিন্নরূপ ধারণ করে না।**

[২] **ক্রিয়ার কাল**

ক্রিয়া ঘটিবার সময়কে কাল বলে। **বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার** এই তিনটি প্রধান কাল। কাল অনুসারে ক্রিয়া বিভক্তির পরিবর্তন হইয়া থাকে।

যে ক্রিয়া বর্তমান সময়ে ঘটে তাহাকে **বর্তমান** কালের ক্রিয়া বলা হয়। যথা—'কে গায় ওই?' (কমলাকান্ত)। 'কে আসে কে যায়, তার খবর কে রাখে?'

যে ক্রিয়া পূর্বে সমাপ্ত হইয়াছে তাহা অতীত কালের ক্রিয়া।

'এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি পূর্বে যবে
[illegible]

যে ক্রিয়া এখনও হয় নাই,—যাহা পরে হইবে তাহাকে **ভবিষ্যৎ** কালের ক্রিয়া বলে।

'এক ধর্মরাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন
বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি।' (শিবাজী উৎসব)

'আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা' (দ্বিজেন্দ্রলাল)। 'গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত' (মধুসূদন)।

অর্থ এবং ক্রিয়া বিভক্তির রূপভেদ-অনুসারে উক্ত তিনটি কালের ভিত্তির উপর ক্রিয়ার [ক] **মৌলিক কালকে** (Simple Tense) চারিটি কালে বিভক্ত করা যায়ঃ—(১) সাধারণ বর্তমান (Simple Present) নিত্য বর্তমান, অনির্দিষ্ট বর্তমান); (২) সাধারণ অতীত (নিত্য বা অনির্দিষ্ট অতীত) (Indefinite Past, Simple Past) (৩) নিত্যবৃত্ত অতীত (Habitual Past) (৪) সাধারণ ভবিষ্যৎ (Simple Future)।

উদাহরণঃ—(১) চলে (২) চলিল (৩) চলিত (৪) চলিবে।

[খ] **মিশ্র বা যৌগিক কালসমূহ** (Compound Tenses)ঃ—মৌলিক কালে মূল ধাতুটির সহিত ক্রিয়-বিভক্তির প্রয়োগ হয—যথা চল্+এ=চলে, চল্+ইত=চলিত (**নিত্যবৃত্ত অতীত**), চল+ইবে=চলিবে।

মিশ্র বা যৌগিক কাল, ক্রিয়ার- কৃদন্ত -ইতে যুক্তরূপ অথবা অসমাপিকা—ইয়া-প্রত্যয়ান্ত রূপের সহিত 'আছ' ধাতুর মূলরূপ যুক্ত করিয়া গঠিত হয়। যথা—কর্+ইতে+আছে= করিতেছে, কর ইতে+আছিল=করিতেছিল, কর্+ইয়া+আছিল=করিয়াছিল, কর্+ইতে +থাকিবে=করিতে থাকিবে, কর্+ইতে+ছিল=করিতেছিল। 'দুলিতেছিল সে তরুশাখা ধীরে, প্রভাত সমীরে কাঁপিয়া।'

ক্রিয়ার কাল, পুরুষ এবং **বচন** থাকে। ক্রিয়ার বক্তা **উত্তম পুরুষ**, (আমি)। যাহাকে বলা হয় সে **মধ্যম পুরুষ**, (তুমি)। আর যাহার সম্বন্ধে বলা হয় সে **প্রথম পুরুষ**, (সে, রাম যদু) (Third Person—তৃতীয় পুরুষ নহে)।

বচন শব্দের অর্থ সংখ্যা। নাম পদ বা ক্রিয়া পদে **একবচন** থাকিলে—একজন ব্যক্তি বা একটি বস্তুকে বুঝায়, **বহুবচন** থাকিলে একাধিক ব্যক্তি বা বস্তুর অর্থ প্রকাশিত হয়।

বাঙ্লায় ক্রিয়ার বহুবচনে ক্রিয়া-বিভক্তির রূপের কোন পরিবর্তন হয় না। যথা—আমি যাই আমরা যাই, সে যায়, তাহারা যায়। মিশ্র বা যৌগিক কালের নিম্নলিখিত প্রকার ভেদ রহিয়াছে ঃ—

[খ অ] **ঘটমান কালসমূহ** (Progressive Tenses)

(১) **ঘটমান বর্তমান**—(যে বর্তমানের আরম্ভ হইয়াছে অথচ যাহার শেষ নাই) করিতেছি, চলিতেছি, চলিতেছ চলিতেছে, চলিতেছেন।

(২) **ঘটমান অতীত** (Past Progressive Tenses)—চলিতেছিলাম, চলিতেছিল, চলিতেছিলেন।

(৩) **ঘটমান ভবিষ্যৎ** (Future Progressive Tenses) চলিতে থাকিব, চলিতে থাকিবে, চলিতে থাকিবে।

[খ আ] পুরাঘটিত কাল (Perfect Tenses)

(১) পুরাঘটিত বর্তমান (Present Perfect) যে ক্রিয়া পূর্বে আরম্ভ হইয়া এইমাত্র সম্পন্ন হইয়াছে এবং যাহার ফল এখনও ভোগ করিতেছি।

করিয়াছি,	করিয়াছ	করিয়াছে
চলিয়াছি	চলিয়াছ	চলিয়াছে

(২) পুরাঘটিত অতীত

চলিয়াছিলাম	চলিয়াছিলে	চলিয়াছিল
	চলিয়াছিলি	চলিয়াছিলেন
চলিয়া থাকিব	চলিয়া থাকিবে	চলিয়া থাকিলে
	চলিয়া থাকিবি	

(৩) ঘটমান পুরা নিত্যবৃত্ত (Progressive Habitual)

চলিতে থাকিতাম	চলিতে থাকিতে	চলিতে থাকিত
	চলিতে থাকিতিস্	চলিতে থাকিতেন

(৫) পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত (Perfect Conditional)

চলিয়া থাকিতাম	চলিয়া থাকিতে	চলিয়া থাকিত

[গ] অনুজ্ঞা (Imperative)

যদিও ইহা ক্রিয়াব এক প্রকার ভাব Mood তবু ইহা সংঘটনের কাল আছে। সে কাল বর্তমান বা ভবিষ্যৎ সুতরাং অনুজ্ঞাকে কালের মধ্যে ধরা যায়ঃ-

(১) বর্তমান অনুজ্ঞা	(২) ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা
(তুমি চল চলহ (আপনি) চলুন	মধ্যমপুরুষ—চলিও, চ'লো
তোরা চল্, তোরা ডাক দিয়ে বল্	'চলিস,
(সে) চলুক তিনি চলুন।	যেও
(তুই) চল্	খেও,
তোরা চল্	করো।

উদাহরণ—(১) 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্, (রবীন্দ্রনাথ) (২) 'জননি তাহারে করিও রক্ষা আপন বক্ষোবসনে' (রবীন্দ্রনাথ)।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা অর্থে—মধ্যমপুরুষে ও অন্য পুরুষে সাধারণ ভবিষ্যৎ হইয়া থাকে। 'বিনা সংগ্রামে আজমিরগড দিবে মারাঠার করে' (রবীন্দ্রনাথ)।

[ঘ] কালার্থ নির্ণয়

[সংস্কৃত ব্যাকরণে 'কাল' স্থানে সংক্ষিপ্ততরূপে 'ল'কার সংজ্ঞা ব্যবহার করা হয়। কালের 'কা'বাদ দিলে থাকে 'ল'-কার। দ্বারা Moods and Tenses দুই বুঝায়]

১। নিত্য বর্তমান ঃ—আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত ঘটনা বা যাহা আমাদের সামনে ঘটে এবং যাহা কোন নির্দিষ্ট কালের সহিত যুক্ত নহে—এরূপ স্থলে নিত্য বর্তমান ব্যবহৃত হয়। যথা—খোকা হাসে, জল পড়ে, আমরা খাবার খাই, গ্রামের মেয়েরা নদীর জল আনে। নিত্য বর্তমানের সহিত—নি, নু বা নাই যোগ করিলে অতীত কাল বুঝায়—'আম নাই নব

ফাল্গুনে' (রবীন্দ্রনাথ)। (নিত্য বর্তমান অনেক সময়ে অনুজ্ঞার অর্থ প্রকাশ করেঃ— 'চল নদীর ধারে যাই।') 'চাল্‌সেরে বাঁধা দিনু মাটিয়া পাথরা'।

২। **ঐতিহাসিক বর্তমানঃ**—কোন অতীত ঘটনা বা ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক কাহিনী বর্ণনা করিতে ঐতিহাসিক বর্তমান প্রযুক্ত হয়। ইহা অতীতের অর্থে বর্তমান কাল।

'বহু বৎসর পরে
বৃক্ষলতায় ফুল **ফুটে** থরে থরে
শুষ্ক শাখায় উদ্গত কিশলয়,
তারপরে শিখী বিথারে কলাপচয়।' (কালিদাস রায়, গাথাঞ্জলি)

"চলে না চল মলয়ানিল বহিয়া ফুল গন্ধভার" (কালিদাস রায়)

৩। **সাধারণ অতীতঃ**—কোন অনির্দিষ্ট কালের ঘটনা বুঝাইতে **সাধারণ অতীতের** প্রয়োগ হয়ঃ-রাম পিতার আজ্ঞা পালন করিলেন। হরি বাড়ি গেল। 'ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি, চণ্ডীদাস গাহিল গান' (দ্বিজেন্দ্রলাল)।

৪। **নিত্যবৃত্ত অতীতঃ**—কর্তার অভ্যস্ত অতীত ঘটনা বুঝাইতে নিত্যবৃত্ত অতীত প্রয়োগ হয়—'সদা করিতেন সেবা লক্ষ্মণ সুমতি'। 'মৃগয়া করিতেন কভু প্রভু'। 'অতিথি **আসিত** নিত্য করভ করভী'। '**দেখিতাম** তরল সলিলে নূতন গগন যেন নব তারাবলী'— (মধুসূদন)।

৫। **সাধারণ ভবিষ্যৎ ঃ**—সাধারণ ভবিষ্যৎ অল্পকালের মধ্যে যাহা ঘটিবে বা বহুদিন পরে যাহা ঘটিবে তাহার কালকে বুঝায়ঃ—'এক ধর্মরাজ্য পাশে খণ্ডছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি' (রবীন্দ্রনাথ)। আজই পরীক্ষার খবর পাব।

৬। **ঘটমান বর্তমানঃ**—(সংস্কৃত লট্ বা বর্তমান দ্বারা প্রকাশিত হইত)। যে ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে এবং যাহার এখনও পরিসমাপ্তি ঘটে নাই তাহা ঘটমান বর্তমানের ক্রিয়াঃ—

'দুলিতেছে তরী ফুলিতেছে জল
ভুলিতেছে মাঝি পথ'—(নজরুল)।

'সদ্য মেলিতেছে তরুণ তপন' (শ্রেষ্ঠভিক্ষা) [ঐতিহাসিক বর্তমান ঘটমান]

৭। **ঘটমান অতীতঃ**—অতীতে যে ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া চলিতেছে (যাহার সমাপ্তি ঘটে নাই) তাহা বুঝাইতে ঘটমান অতীত ব্যবহৃত হয়ঃ—

'তখন **গাহিতেছিল** তরুশাখা প'রে
সুললিতস্বরে পাপিয়া,
তখন **দুলিতেছিল** সে তরুশাখা ধীরে
প্রভাত সমীরে কাঁপিয়া' (দ্বিজেন্দ্রলাল, 'সাজাহান নাটক')।

৮। **ঘটমান ভবিষ্যৎ ঃ**—ভবিষ্যৎ কালে কোন ঘটনা ঘটিতে থাকিলে এবং তাহার পরিসমাপ্তি না হইলে এই কাল ব্যবহৃত হয়। যথাঃ—এইরকম ধাপ্পাবাজি আরও কিছুদিন চলিতে থাকিবে।

৯। **পুরাঘটিত বর্তমান :**—পূর্বের কার্যের ফল বর্তমানেও বিদ্যমান থাকিলে পুরাঘটিত বর্তমানের প্রয়োগ হয়। যথা :—আকাশে তারা ফুটিয়াছে (রবীন্দ্রনাথ)

'হাজার হাজার বছর কেটেছে
কেহ তো কহেনি কথা' (রবীন্দ্রনাথ)
উর্বশী মোরে পাঠায়েছে কবি
স্বর্গ ভুবন হতে।' (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

১০। **পুরাঘটিত অতীত :**—দূর অতীত বুঝাইতে ইহার প্রয়োগ হয়। ক্রিয়ার ফল বিদ্যমান থাকিতে পাবে নাও পারে :—পথের ধারে একটি রুগ্ন কুকুর পড়িয়াছিল। চল্লিশ বৎসর পূর্বে আমার ডান পা ভাঙিয়া গিয়াছিল।

১১। **পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ :**—অতীতে সংঘটিত এবং সম্ভাবনার অর্থে প্রযুক্ত ক্রিয়া বুঝাইতে ইহাব প্রযোগ হয :—আমাব এখন মনে নাই, তবে আমিই হযতো তোমাকে অনেকদিন পূর্বে এই কথা **বলিয়া থাকিব।**

১২। **ঘটমান পুরানিত্যবৃত্ত :**—ঘটমান পুবানিত্যবৃত্ত ক্রিয়া কোন ক্রিয়া অতীতে বহুক্ষণ বা অল্পক্ষণ ধরিয়া চলিবাব অর্থ প্রকাশ করে :—সে আসিতে থাকিলে আমরাও যাইতে **থাকিতাম।**

১৩। **পুরাসম্ভাব্য নিত্যবৃত্ত :** অতীতে কোন কার্য সম্পন্ন করিবাব পব কর্তার অবস্থিতির প্রকাশক কাল হইতেছে পুবাসম্ভাব্য নিত্যবৃত্ত :—কুকুরটি প্রত্যহ বৈকালে শ্মশানে মৃত প্রভুব আশায় বসিয়া থাকিত।

ধাতু-বিভক্তির আকৃতি (সাধু ভাষায়)

কাল	প্রথম পুরুষ (সামান্য)	প্রথম ও মধ্যম পুরুষ (গৌরবার্থক)	মধ্যমপুরুষ (সামান্য)	মধ্যমপুরুষ (অনাদরর্থক)	উত্তমপুরুষ
বর্তমান					
সাধারণ (নিত্য)	—এ	—এন	—অ, —ও	—ইস্	—ই
ঘটমান	—ইতেছে	—ইতেছেন	—ইতেছ	—ইতেছিস্	—ইতেছি
পুরাঘটিত	—ইয়াছে	—ইয়াছেন	—ইয়াছ	—ইয়াছিস্	—ইয়াছি
অনুজ্ঞা	—উক্	—উন্	—অ, —ও	বিভক্তি লোপ ও ধাতুর হসন্ত	
অতীতকাল					
সাধারণ (নিত্য)	—ইল	—ইলেন	—ইলে	—ইলি	—ইলাম
নিত্যবৃত্ত	—ইত	—ইতেন	—ইতে	—ইতিস্	—ইতাম
ঘটমান	—ইতেছিল	—ইতেছিলেন	—ইতেছিলেন	—ইতেছিলি	—ইতেছিলাম
পুরাঘটিত	—ইয়াছিল	—ইয়াছিলেন	—ইয়াছিলে	—ইয়াছিলি	—ইয়াছিলাম
ভবিষ্যত্ কাল					
সাধারণ	—ইবে	—ইবেন	—ইবে	—ইবি	—ইব
ঘটমান	—ইতে+ইবে	—ইতে+ইবেন	—ইতে+ইবে	—ইতে+ইবি	—ইতে+ইব
পুরাঘটিত	—ইয়া+ইবে	—ইয়া+ইবেন	—ইয়া+ইবে	—ইয়া+ইবি	—ইয়া+ইব
অনুজ্ঞা	—ইবে	—ইবেন	—ইও (ইয়ো)	—ইস্	

ধাতু-বিভক্তির আকৃতি (চলিত ভাষায়)

কাল	প্রথমপুরুষ (সামান্য)	প্রথম ও মধ্যমপুরুষ (গৌরবার্থক)	মধ্যমপুরুষ (সামান্য)	মধ্যমপুরুষ (অনাদরার্থক)	উত্তমপুরুষ
বর্তমান					
সাধারণ (বা নিত্য বর্তমান)	-এ	—এন	—অ (ও)	—ইস্	—ই
ঘটমান	-ছে	—ছেন	—ছ	—ছিস্	—ছি
পুরাঘটিত	-এছে	—এছেন	—এছ, এছো	—এ ছিস্	-এ ছি
অনুজ্ঞা	—উক	—উন	—অ, ও	বিভক্তি লোপ ও ধাতুর হসন্তরূপ	
অতীত					
সাধারণ	—ল	—লেন	—লে	—লি	—লাম, —লেম, —লুম
নিত্যবৃত্ত	ত, তো	—তেন	—তে	—তিস্	—তাম, —তেম, —তুম
ঘটমান	-তে ছিল	-তে ছিলেন	—তেছিলে	—তেছিলি	—ছিলাম, —ছিলেম, ছিলুম
পুরাঘটিত	—এছিল	—এ ছিলেন	—এ ছিলে	-এ ছিলি	—এছিলেম, —এছিলুম —এ ছিলাম
ভবিষ্যৎ					
সাধারণ	—বে	—বেন	বে	—বি	—বো, —ব
ঘটমান	—তে থাকবে,	—তে থাকবেন	—তে থাকবেন	তে থাকবি	—তে থাকবো
পুরাঘটিত	—এ+থাকবে	-এ+থাকবেন	—এ থাকবে	—এ+থাকবি	এ থাকবো
অনুজ্ঞা	—বে	—বেন	—ও	—ইস্	—

ধাতুরূপ

ধাতুরূপ—কর ধাতু (সাধু ভাষায়)

বর্তমান কাল

	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
১। সাধারণ	করে, করেন	(আপনি) করেন (তুমি) কর (তুই) করিস্	করি
২। ঘটমান	করিতেছে, করিতেছেন	(আপনি) করিতেছেন (তুমি) করিতেছ (তুই) করিতেছিস্	করিতেছি
৩। পুরাঘটিত	করিয়াছে (সে) করিয়াছেন (তিনি)	করিয়াছেন, করিয়াছ, করিয়াছিস্	করিয়াছি
৪। অনুজ্ঞা	করুক, করুন	কর, কর্ (অনাদরে)	—

অতীতকাল

	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
১। সাধারণ	করিল, করিলেন	করিলে, করিলেন, করিলি	করিলাম
২। নিত্যবৃত্ত	করিত, করিতেন	করিতে, করিতেন করিতিস্	করিতাম
৩। ঘটমান	করিতেছিল, করিতেছিলেন	করিতেছিলে, করিতেছিলেন, করিতেছিলি	করিতেছিলাম
৪। পুরাঘটিত	করিয়াছিলেন করিয়াছিল	করিয়াছিলে (তুমি) করিয়াছিলেন (আপনি) করিয়াছিলি (তুই)	করিয়াছিলাম

—কর ধাতু (সাধু ভাষায়)

ভবিষ্যৎ কাল

	প্রথম পুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
১। সাধারণ	করিবে,	করিবে, করিবেন,	করিব
	করিবেন	করিবি	
২। ঘটমান	করিতে থাকিবে,	করিতে থাকিবে	
	করিতে থাকিবেন	করিতে থাকিবেন	
		করিতে থাকিবি	করিতে থাকিব
৩। পুরাঘটিত	করিয়া থাকিবে	করিয়া থাকিবেন	করিয়া থাকিবি
	করিয়া থাকিবেন	করিয়া থাকিবে, করিয়া থাকিবি	
		করিয়া থাকিবি	
৪। অনুজ্ঞা	করিবে	করিও,	
	করিবেন	করিবেন	
		করিবি	

ধাতুরূপ

√কর্ ধাতু (চলিতভাষায়)

বর্তমান কাল

	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
১। সাধারণ	করে	কর, করেন, করিস্	করি
২। ঘটমান	করছে	করছ, করছেন	করছি
	কোচ্ছে	কোচ্ছিস্	(ক'চ্ছি)
৩। পুরাঘটিত	করেছে	করেছ	
	করেছেন	করেছেন (গৌরবে)	করেছি
		করেছিস (অনাদরে)	
৪। অনুজ্ঞা	করুক	করো, ক'র্ (অনাদরে)	
	করুন	করুন (গৌরবে)	

অতীত কাল

	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
১। সাধারণ	করলো	করলে	কল্লাম,
	কল্লো	কল্লে	কল্লেম
	কল্লেন	কল্লি	কল্লুম
	করলেন	কল্লেন, করলেন	
২। নিত্যবৃত্ত	কোত্তো	করতে, কোত্তিস্, (অনাদরে)	করতাম, কোত্তুম,
	করতো	কত্তে	কোত্তাম
	কোত্তেন	কোত্তেন	
	করতেন	করতেন	
৩। ঘটমান	কোচ্ছিল	কোচ্ছিলে, কোচ্ছিলি	কর্‌ছিলাম
	কোত্তেছিল	কোচ্ছিলেন	কোচ্ছিলাম
	করতেছিল		কোচ্ছিলেম
	করতেছিলেন		কোচ্ছিলুম
	কোত্তেছিলেন		কর্‌ছিলাম
৪। পুরাঘটিত	ক'রেছিল	ক'রেছিলেন	করেছিলুম
	ক'রেছিলেন	ক'রেছিলে	ক'রেছিলেন

ভবিষ্যৎ কাল

	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
১। সাধারণ	ক'র্‌বে	করবে, কর্‌বেন (গৌরবে)	কোর্বো, কোর্‌বো
	কর্‌বেন		
২। ঘটমান	ক'রতে থাকবে	করতে থাকবে	করতে থাকবো,
	ক'রতে থাকবেন	করতে থাকবেন	কোত্তে থাকবো
৩। পুরাঘটিত	ক'রে থাকবে	করে থাকবে	ক'রে থাকব
	ক'রে থাকবেন	করে থাকবেন	
৪। অনুজ্ঞা	ক'রবে	করবে, ক'রবেন, কর, কর্	

অনুশীলনী

১। বাঙ্‌লা ভাষায় ক্রিয়াপদের বিভিন্ন কালরূপের শ্রেণীবিভাগ কর। ২। সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া উদাহরণ দাও—(ক) ঐতিহাসিক বর্তমান (খ) ঘটমান বর্তমান (গ) পুরাঘটিত বর্তমান (ঘ) অনুজ্ঞা প্রকার (ঙ) পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ (উঃ মাঃ ১৯৬০) (চ) পুরাসম্ভাব্য নিত্যবৃত্ত। ৩। বাংলায় অতীতকালের চারিটি বিভিন্ন রূপের প্রয়োগ দেখাইয়া চারিটি বাক্য রচনা কর। (কর্লি, মাধ্য, ১৯৫৭)। ৪। √হ ধাতুর অথবা শুন ধাতুর পুরাঘটিত বর্তমান, ঘটমান অতীত বর্তমান অনুজ্ঞা, এবং ঘটমান ভবিষ্যতের প্রথম পুরুষের সাধু ও চলিত রূপ লিখ। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সনন্ত ও যঙন্ত ধাতু হইতে নিষ্পন্ন শব্দের উদাহরণ দাও। (উঃ মাঃ ১৯৬১ কম)।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সমাস

পরস্পর সংগতার্থ দুই বা ততোধিক পদের একপদীভাবকে সমাস বলে। **সমাসে অন্ততঃ দুইটি পদ থাকা চাই।** খাঁটি বাঙ্‌লায় সাধারণতঃ দুই পদে সমাস হয়,—দুইয়ের **বেশি পদে সমাস সাধু বাঙ্‌লা রচনায় পাওয়া যায়।**

লৌকিক সংস্কৃত ভাষায় সমাসে পদের সংখ্যা নির্দিষ্ট নাই—বহুপদে সেখানে সমাস হয়। কিন্তু বৈদিক ভাষাতে দুইটি পদ লইয়া সাধারণতঃ সমাস হয়—কখন কখন তিনপদের সমাসও দেখা যায়। এবিষয়ে **খাঁটি বাঙ্‌লা বৈদিক সংস্কৃতের তুল্য।**

সমাসে পদের বিভক্তি লোপ হয়। যেখানে বিভক্তির লোপ হয় না, তাহাকে **অলুক্ সমাস** বলে (লুক্ কথার অর্থ লোপ—অলুক্=অলোপ)।

সমাসের উদাহরণ—যথা—(১) রাজার পুত্র=রাজপুত্র, (২) মিলের অভাব=বেমিল, গরমিল, (৩) দা দিয়া (যাহা) কাটা (হইয়াছে)=**দা-কাটা**, (৪) **গায়ে হলুদ** (যে অনুষ্ঠানে) =গায়েহলুদ।

(১) রাজার সহিত 'পুত্র' পদের জন্যজনক সম্বন্ধে ষষ্ঠী। এই পদ দুইটি মিলিত করিয়া ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস করা হইয়াছে। এখানে পরপদের প্রাধান্য, সুতরাং তৎপুরুষ সমাস। ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ (র-কার লোপ) হওয়ায় ইহা ষষ্ঠী তৎপুরুষ। সংস্কৃত রাজন্ শব্দের সমাসে ন্-কার লুপ্ত হইয়াছে।

যে সমস্ত পদ লইয়া সমাস গঠিত হয় তাহাদের সকলের মিলিত নাম—**সমস্তপদ। 'রাজপুত্র'—সমস্তপদ।** সমস্তপদের অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য যে বাক্য ব্যবহৃত হয়, তাহাকে **বিগ্রহ-বাক্য (ব্যাসবাক্য) বলে।** যথা—'রাজার পুত্র'—বিগ্রহ বাক্য।

(২) বেমিল—অব্যয়ীভাব সমাস—'বে' এই বিদেশী অব্যয়ের সহিত অনব্যয় **'মিল'** পদের সমাস হইয়াছে। 'মিলের অভাব'—বিগ্রহ বাক্য।

(৩) 'দা-কাটা'—সমস্তপদ। দা দিয়া কাটা বিগ্রহ বাক্য। এখানে 'দিয়া' তৃতীয়া বিভক্তির চিহ্ন সমাসে লুপ্ত এবং পরপদ 'কাটা'র প্রাধান্য। এটি তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস।

(৪) গায়েহলুদ—অলুক্-বহুব্রীহি সমাস। এখানে সমস্ত পদে পূর্বপদ 'গায়ে' কথার সপ্তমী বিভক্তির লোপ হয় নাই, যেরূপ পূর্ববর্তী সকল উদাহরণে লোপ হইয়াছে। 'গায়ে-

হলুদ' (যে অনুষ্ঠানে) তাহা। এখানে অন্যপদের অর্থ প্রধান। গায়ে এবং হলুদ পদকে না বুঝাইয়া বিশেষ একটি অনুষ্ঠান অর্থে ইহাদের যুক্তরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

সমস্ত পদের পূর্ব ভাগকে পূর্বপদ এবং পরবর্তী ভাগকে **পরপদ** বা **উত্তরপদ** বলে। গায়ে (পূর্বপদ) হলুদ (উত্তরপদ)।

[১] সমাসের শ্রেণী বিভাগ

(ক) **পূর্বপদ**, উত্তরপদ, **উভয়পদ** এবং অন্যপদের অর্থের প্রাধান্য হেতু সমাস **প্রধানতঃ চার প্রকার**ঃ—পূর্বপদের **অর্থ যে সমাসে** সাধারণতঃ **প্রধান থাকে** তাহাকে (১) **'অব্যয়ীভাব'** বলে। উত্তরপদের **অর্থ প্রধান হয় যে সমাসে** তাহার **সাধারণ নাম** (২) **'তৎপুরুষ'**। **উভয় পদ** যেখানে প্রধান তাহার **সাধারণ নাম** (৩) **দ্বন্দ্ব**। সমাসের অন্তর্গত পদসমূহের **প্রাধান্যবোধ** না হইয়া, যেখানে অন্যপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয় তাহাকে (৪) **বহুব্রীহি** সমাস বলে।

তৎপুরুষ সমাসের অবান্তর ভেদ (৫) **কর্মধারয়** এবং (৬) **দ্বিগু** (৭) **উপপদসমাস**। যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বস্থিত বিশেষণ পদ পরবর্তী বিশেষ্য পদের সহিত **সমাসবদ্ধ** হয়, তাহাকে **কর্মধারয়** বলে।

সমাহারাদি অর্থে সংখ্যাবাচক পদের সহিত যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাহাকে **দ্বিগু** বলে।

যে তৎপুরুষ সমাসে, পূর্বপদ একটি উপপদ এবং পবপদ একটি কৃদন্ত পদ থাকে এবং উভয় মিলিয়া যখন নিত্য (compulsory) সমাস হয় তাহাকে উপপদসমাস বলে।

(খ) **পাশ্চাত্ত্য ভাষাতাত্ত্বিকগণের** মতে সমাসের সামগ্রিক অর্থানুসারে নিম্নলিখিত দ্বিতীয় প্রকার বিভাগ স্বীকৃত হয় (হুইটনি প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য শাব্দিকগণের মতে)ঃ—

(১) **সংযোগমূলক সমাস**—ইহাতে সমস্যমান পদের অর্থের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। পদগুলির অর্থ পরস্পর সংযুক্ত হয়। এই শ্রেণীর সমাসের উদাহরণ **দ্বন্দ্ব** সমাস। রাম-লক্ষ্মণ। ঝি-জামাই। বামুন-কায়েত।

(২) **ব্যাখ্যানমূলক সমাস**—ইহাতে পূর্বপদ উত্তবপদের অর্থকে সীমিত করে। এই শ্রেণীর সমাসে—তৎপুরুষ, কর্মধারয়, দ্বিগু, একদেশী, প্রাদি, অব্যয়ীভাব প্রভৃতি পড়ে। রাজপুত্র বলিলে পুত্র শব্দ রাজন্ শব্দযোগে বিশেষিত হইতেছে। (কেননা সকল পুত্রই রাজপুত্র নহে)। নিলাজনীল, আলুসেদ্ধ।

(৩) **বর্ণনামূলক সমাস**—বর্ণনামূলক সমাসে ব্যবহৃত পদগুলির অর্থছাড়া অন্য একটি বিষয় বা ব্যক্তির বর্ণনা করা হয়। বহুব্রীহি সমাস—উহার অবান্তর ভেদ সহ বর্ণনামূলক সমাসের উদাহরণ। গায়েহলুদ, চিরুণদাঁতী।

(গ) **গঠন, অনুসারে সমাসের তৃতীয় প্রকারের শ্রেণী বিভাগ** মুগ্ধাযুগের ভারতের বৈয়াকরণগণ দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছেঃ--(১) **নামপদের সহিত নামপদের বা বিশেষণ পদের সমাস**—রাজারপুত্র, (বাঙলায় বিশেষণের বিভক্তি নাই) বিশেষণ সমাস—নীলোৎপল, কেয়া-পাতা। (২) **ক্রিয়ার সহিত উপসর্গের সমাস** (বাঙলাতে নাই)। (৩) **উপপদের সহিত কৃদন্ত পদের সমাস**—কুম্ভকার, ছেলেধরা। (৪) **ধাতুর সহিত পূর্বপদের সমাস**—অজস্র।

(৫) ক্রিয়াপদের সহিত ক্রিয়াপদের সমাস বাঙ্‌লায় **'ত্রাহি ত্রাহি'** (রব); মরিয়ার মুখে মারণের বাণী উঠিতেছে **'মারমার'** (নজরুল)। (নিনাদ) **ধরধর** (ভারতচন্দ্র), **দোহিদোঁহি** (রব), মারকাট শব্দ। (৬) ক্রিয়াপদের সহিত নামপদের **'চোখগেল'** (পাখি) **বউকথাকও** (পাখি)।

সমাসে সন্ধিঃ—সমাসে সন্ধি করাই সাধারণ নিয়ম। সন্ধিতে উচ্চারণ সুখকর না হইলে বাঙ্‌লায় সন্ধি করা হয় নাঃ—'মঞ্জরিত-ইন্দুমল্লী-বল্লরী বিতানে' (রবীন্দ্রনাথ)। **'চন্দ্রবংশ-অবতংস'** (মোহিতলাল)।

চলিত বাঙ্‌লায় সাধারণতঃ **দুইপদে** সমাস হয়। কোন কোন স্থলে **ত্রিপদেও** হয়; **কিন্তু** কবিতায় এবং সাধু বাঙ্‌লায় বহুপদে সমাস দেখা যায়ঃ—দা-কাটা, গায়ে-হলুদ, প্রভৃতি **দ্বিপদ সমাস। খানিকটা-পাশ-করা** (ডাক্তার), **দুকানকাটা,** নাককান কাটা, নমাসে-**ছমাসে** (অলুক্ দ্বন্দ্ব), **সাতরাজার-ধন** (মাণিক) (অলুক্ ষষ্ঠীতৎপুরুষ) ইত্যাদি খাঁটি বাঙ্‌লায় দুইপদের অধিক পদ লইয়া গঠিত সমাস।

কবিতায় ও সাধু গদ্যে বহুপদ সমাসের উদাহরণ- শ্বেতসৈকতপুলিনমধ্যবাহিনী' (যমুনা—বঙ্কিম) 'সতত-সঞ্চরমাণ-জলধরপটল-সংযোগ' (বিদ্যাসাগর, সীতার বনবাস), 'মধুকর-পদভর-কম্পিতচম্পক' (গৃহপ্রবেশ—রবীন্দ্রনাথ), 'পুরুষসিংহতসমীবচঞ্চল' (রজনীকান্ত সেন), 'নারদ-কীর্তনপুলকিতমাধববিগলিত করুণা' (দ্বিজেন্দ্রলাল), 'মঞ্জরিত-ইন্দু-মল্লী-বল্লরী বিতানে' (রবীন্দ্রনাথ), 'আনন্দঘন-রস-সরসিত' (মোহিতলাল), বিরহনীরবকণ্ঠ (দ্বিজেন্দ্রলাল), 'নদীজপমালাধৃত'।

[২] অব্যয়ীভাব

যোগ্যতা, বীপ্সা, অভাব প্রভৃতি অর্থে পূর্বপদ অব্যয়ের সহিত (কখনো কখনো পরবর্তী অব্যয়ের সহিত) অন্য পদের অব্যয়ীভাব সমাস হয়। যাহা পূর্বে অব্যয় ছিল না তাহা অব্যয়রূপে পরিণত হইলে তাহাকে অব্যয়ীভাব বলে। সংজ্ঞাটি এখানে সার্থক।

সংস্কৃত সমাস—রূপের যোগ্য—অনুরূপ, শক্তিকে অতিক্রম না করিয়া- যথাশক্তি, যথাবিধি যথাজ্ঞান। যথেষ্ট (ইষ্টকে অতিক্রম না করিয়া)। দিন দিন বা দিনে দিনে—প্রতিদিন (বীপ্সার্থে), ক্ষণে ক্ষণে—অনুক্ষণ, মক্ষিকার অভাব=নির্মক্ষিক, **দুর্ভিক্ষ**; জনে জনে= প্রতিজন, জনপ্রতি। আসমুদ্র (সীমার্থে), **আ-শৈশব**, আপাদমস্তক, অনুগোদ (প্রদেশ—'রামায়ণীকথা—গোদাবরীর সমীপ) ক্রমকে অনুসরণ করিয়া=অনুক্রম, (in order) আবালবৃদ্ধবনিতা, অনুগঙ্গ (**গঙ্গার ধারে ধারে), প্রত্যক্ষ, সমক্ষ,** বহির্দ্বার ('উঠিয়াছে রাজধানী **বহির্দ্বারে** বিজয়তোরণ' রবীন্দ্রনাথ 'বিসর্জন', সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে সপ্তমী বিভক্তির লোপ হয় নাই) কিন্তু বাঙ্‌লায় 'বাহির' শব্দ বিশেষণ পদরূপে ব্যবহৃত হয়। 'বাহির বিশ্ব' (রবীন্দ্রনাথ); 'বাহির দ্বারে বেজে উঠল ভেরী' ('বিবাহ'—রবীন্দ্রনাথ), উপবন, হররোজ (রোজ রোজ),, বেগতিক (গতির অভাব), আকণ্ঠ (কণ্ঠ পর্যন্ত)।

বাঙ্‌লা অব্যয়ীভাব

ফিঘর, মাথাপিছু, গরমিল, বেমিল, দিনভর, নাকবরাবর, মণপ্রতি ('মণপ্রতি যত তঙ্কা **হইবেক দর'—শুভঙ্করী**)। [অকারান্ত অব্যয়ীভাব **সংস্কৃতে** কোন কোন **স্থানে সবিভক্তিক**

কোন কোন স্থানে নির্বিভক্তিক। বাঙলায় অনেক স্থলে সবিভক্তিক] বন্দোবস্তের অভাব —বেবন্দোবস্ত। •

[৩] তৎপুরুষ

যে সমাসে পরপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয় তাহাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। তৎপুরুষ কথার অর্থ (তৎ 'তাহার পুরুষ') 'তাহার পুরুষ', 'তৎপুরুষ পদে উত্তরপদের প্রাধান্য—তৎপুরুষ বলিলে 'তাহাকে' বুঝায় না—প্রধানতঃ তাহার লোককে বুঝায়। তৎপুরুষের মতো যে সমাস তাহার নাম তৎপুরুষ। এখানে উদাহরণ হইতে সংজ্ঞা গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সমাসে পূর্বপদে দ্বিতীয়াদি বিভক্তির লোপ হইয়া থাকে।

[ক] দ্বিতীয়া তৎপুরুষ

স্থানাপন্ন (স্থানকে আপন্ন—প্রাপ্ত, (officiating) বিপদাপন্ন, শরণাপন্ন, মরণাপন্ন, সংগতিকে পন্ন (প্রাপ্ত) সংগতিপন্ন, আলোকপ্রাপ্ত, স্বর্গগত মজ্জাগত, রামাশ্রিত, দুঃখাতীত, মুহূর্তসুখ, পারগামী, (বৌদ্ধ গান ও দোহা), গজারূঢ়, সিংহাসনারূঢ়, ফুল-তোলা, মাথাগোঁজা (মাথাগোঁজার যায়গা নেই), বাসনমাজা, বেগুনবেচা, নথনাড়া, আঁচল-নাড়া ('কূলে কূলে কানন লক্ষ্মী দিল আঁচলনাড়া'—রবীন্দ্রনাথ), গাঢাকা, কলাবেচা, চির-সুখী, অর্ধচ্যুত, আধমরা, মেঘবিছান (শৈলমালা), চুলচেরা (তর্ক, ভাগ), চিরসুখ, পানসাজা (পানকে সাজা), নৌকাবোঝাই (নৌকাকে বোঝাই)।

[খ] প্রথমা বিভক্ত্যর্থক তৎপুরুষ

বাঙলায় শূন্য প্রথমা বিভক্তিব লোপেব কোন প্রশ্ন উঠে না [এখানে কর্তার অর্থে প্রথমা]। বঙলাগা (জামা), চা-লাগা (চাদব), মশা বসা (লেবু-নেবু)।

[গ] তৃতীয়া তৎপুরুষ

'ঋণগ্রস্ত' (ঋণদ্বাবা গ্রস্ত—বিদ্যাসাগরেব নিকট ঋণগ্রস্ত নহেন), তাবকাখচিত (তাবকা দ্বারা খচিত), মনুষ্যসৃষ্ট (দুর্ভিক্ষ), কুসুমভূষণজড়িত (চরণ), লজ্জাহত (কণ্ঠস্বরে বজ্র লজ্জাহত—রবীন্দ্রনাথ) রবাহূত, স্বোপার্জিত, শোণিতাক্ত, রক্তাক্ত, তৃষ্ণার্ত, শোণিতরাঙা (কান্তি ঘোষ), শিবোধার্য, কীটদষ্ট মনগড়া (বিদ্যাসাগব—'শকুন্তলা'), ছোরাখেলা, হাত-ছানি, রেলচালানি (মাল), কলছাটা (চাল), মধুমাখা (গীত, নাম), লাঠিপেটা, বাছুরচোসা, জনসংকুল, জনশূন্য আবর্তচঞ্চলা (নর্মদা--রবীন্দ্রনাথ), ধামাচাপা (ধামা দ্বারা চাপা= অন্যায়ভাবে লোকচক্ষু হইতে অপসৃত)। লাঠিখেলা (লাঠি দ্বারা খেলা) হাতেপোতা (গাছ) অলুক্ তৃতীয়া তৎপুরুষ (অভাগীব স্বর্গ), ব্যাঘ্রকবলিত, বাগ্‌যুদ্ধ (বাক্-বাগ্‌দ্বারা যুদ্ধ) প্রীতিবিকশিত, স্বহস্ত কর্তিত (স্বহস্তদ্বারা কর্তিত), লগিঠেলা।

[ঘ] চতুর্থী তৎপুরুষ (উদ্দেশ্যার্থক)

দেবদত্ত (দেবতাকে দত্ত), যূপকাষ্ঠ (যূপের জন্য কাষ্ঠ), দেবোত্তর, ভোগোত্তর (পরিহাসে বা নিন্দায়), অতিথিশালা, আরোগ্যনিকেতন, শান্তিনিকেতন (কিন্তু) 'নিজনিকেতন ষষ্ঠী তৎপুরুষও হয়)। নিজের নিকেতন—বাড়ি 'মন চল নিজ নিকেতন' (স্বামী বিবেকানন্দ), দেবস্তুতি ('পুণ্য দেবস্তুতি উঠিতেছে ধীরে'), জয়ডঙ্কা ('এসেছিল তারা জয়ডঙ্কা তুলে' —হেমচন্দ্র), মেয়েস্কুল (মেয়েদের জন্য স্কুল), স্মৃতিমন্দির (স্মৃতির জন্য মন্দির) মেয়েগাড়ি,

বরণডালা (বলেন্দ্রনাথ), মরণডঙ্কা ('শমন পাইত শঙ্কা শুনাতে মরণডঙ্কা)—'ইন্দ্রপাত' (অমৃতলাল বসু), মালগুদাম, দেববলি, পুরোহিত, দেবমন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, বিয়েব জন্য পাগলা—বিয়েপাগলা (প্রফুল্ল—গিরিশচন্দ্র), স্বামিপাগলা (মন্মথ রায়), যজ্ঞের জন্য উপবীত=যজ্ঞোপবীত। (অথবা যজ্ঞ সহায়ক উপবীত মধ্যপদলোপী কর্মধারয়—পরে দেখ)

[ঙ] পঞ্চমী তৎপুরুষ (অপাদানার্থক)

ধর্মভীরু, ব্যাঘ্রভীতি, জলাতঙ্ক, সমাজচ্যুত, বৃন্তচ্যুত (কুসুম), আকাশবাণী, সর্পভীতি ধর্মভ্রষ্ট, লক্ষ্যভ্রষ্ট, দুগ্ধজাত (milk products) বিলাতফেরত, জেলখালাস, ঘর ছাড়া ('পাগল' শব্দের বিশেষণ) সৃষ্টিছাড়া, স্কুলপালানো (ছেলে), লক্ষ্মীছাড়া, থলে-ঝাড়া (দুটি পয়সা) পালছাড়া (গোরু), রোগমুক্ত, মিত্রজা, ঘোষজা, বসুজা 'পাঠশালা-পলায়ন ('দুই বিঘা জমি), অগ্নিভয়, শ্রেণীহারা (শ্রেণী [দল] হইতে হারা—ভ্রষ্ট) ঐশ্বর্যভ্রষ্ট।

[চ] ষষ্ঠী তৎপুরুষ (সম্বন্ধে ষষ্ঠী সমাস)

পিতৃগৃহ (পিতার গৃহ), অতিথিসেবা সমুদ্রদর্শন, রাজপুত্র ছাগদুগ্ধ (ছাগীর দুগ্ধ), তীর্থগৌরব, মৌচাক (মৌর—মধুর চাক), ধানক্ষেত, কেয়াপাতা, পলতা (পটল লতা), কাজলতা (কাজল লতা কাজলের লতা—আধারাধেয় সম্বন্ধে ষষ্ঠী), কেয়াবন, কদমকেশর বনতল, কেতকীকেশর, কদমকেশর ঢেকেছে আজ বনতলের ধূলি (রবীন্দ্রনাথ), তমাল-কুঞ্জতিমির 'রাত্রিনিশীথে (নজরুল—বাস বাক্য 'রাত্রির নিশীথ মধ্য সময়ে অবয়বাবয় বিভাব সম্বন্ধে ষষ্ঠী) কুমোরবাড়ি (কিন্তু মামারবাড়ি অলুক্ ষষ্ঠী সমাস) বামুনপাড়া ('গাঁয়ের বামুনপাড়া তারই ছায়াতলে রবীন্দ্রনাথ), বাবুঘাট চাঁপাতলা (স্থানের নাম), কলতলা ফুলবাগিচা, কুন্দকলি, খ্রীষ্টধর্ম, রাজহংস (হংসের রাজা), রাজপথ (পথের রাজা), রাজমিস্ত্রী (মিস্ত্রীদের মধ্যে রাজা—শ্রেষ্ঠ, যে পাকাবাড়ি তৈয়ারি করে—পর্তুগীজ মিস্ত্রী শব্দের সহিত সংস্কৃত 'রাজন' শব্দের সমাস), জেলদারোগা, পুলিসসাহেব, জ্ঞান তপস্বী (অথবা সপ্তমী তৎপুরুষ) বেটাছেলে (বেটার ছেলে—গালিবিশেষ), সইমা—(মায়ের সই), পাততাড়ি (তাড়ির-তালের পাত)। মুষ্টিযোগ (মুষ্টির যোগ, মুষ্টি-টোটকা ঔষধের যোগ প্রতীকার বা প্রয়োগ)। হংসীর ডিম্ব—হংসডিম্ব, মৃগীর শাবক—মৃগশাবক।

[ছ] সপ্তমী তৎপুরুষ

কানপাতলা, বগচটা রণপণ্ডিত, জ্ঞানবৃদ্ধ, অকালপক্ক, গাছপাকা ঘরপোড়া (গোরু—কিন্তু ঘরপোড়া হনুমান্ উপপদ তৎপুরুষ), বাটাভরা, গালভরা (নাম), আকাশপ্রদীপ, বিশ্ববিখ্যাত, রাত-কানা, লিপিভুক্ত, নথিভুক্ত, তপসীলভুক্ত, গৃহবাস, কাশীবাসী গঙ্গাবাস (গঙ্গার নিকটে বাস), শ্রীঘরবাস (জেলে বাস), গলাধাক্কা থালাভরা (মিঠাই), শাখামৃগ (বানর), 'গাছ-পাঁঠা' (ইঁচড—'নববিধান' শরৎচন্দ্র), প্রলয়লোলুপ (রসনা) গৃহাগত, ধ্যান-মগ্ন (ধ্যানে মগ্ন)।

[জ] অলুক্ তৎপুরুষ সমাস

(তৎপুরুষ সমাসে যেখানে নাম-বিভক্তি লুপ্ত হয় না)।

হাতেপোঁতা গাছ (অলুক্ তৃতীয়া তৎ) (অভাগীর স্বর্গ), চোরের বাড়ি (চোরবাড়ি নহে), ঠকের ধাড়ি, মামার বাড়ি, (মামাবাড়ি নহে—অলুক্ ষষ্ঠীতৎপুরুষ), হাতে-গরম (শিঙগাড়া), গোরুর গাড়ি ('কুমোর পাড়ায় গোরুর গাড়ি, বোঝাই তাতে কলসী-হাঁড়ি'—রবীন্দ্রনাথ), গায়ে-পড়া, ইঁচড়ে (এঁচড়ে এঁচোড়ে)-পাকা, পায়ে-ধরা, কানেখাট (খাটো), যুধিষ্ঠির, চোখেদেখা (অলুক্ তৃতীয়া)।

মনসিজ - [উপপদ তৎপুরুষে সপ্তমী বিভক্তির লোপ হয় নাই।—'দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মুরতি'--কাশীরাম দাস, খেচর, পরাৎপর, বাচস্পতি, নিশিকান্ত (বাঙ্‌লায়) কলের জল, জলের-কল কলের পুতুল, মাটির প্রদীপ, ননীর পুতুল, মোমের পুতুল পাতে খাওয়া (ঘি পাতে খাইবার যোগ্য, ঘি--ভবিষ্যদর্থে ভূতবৎ উপচার) অথবা পাতে-খাবার (ঘি)। গায়ে পড়া (মানুষ- অলুক সপ্তমী তৎ)। সরসি (সরোবরে) জন্মে যাহা **সরসিজ**। যুধিষ্ঠির।

[ঝ] উপপদ তৎপুরুষ সমাস

উপ (সমীপে) উচ্চারিত পদ (নাম বিভক্তিযুক্ত পদ বা ক্রিয়া বিভক্তিযুক্ত পদকে) সংস্কৃত ব্যাকরণে উপপদ বলে। উপপদের সহিত কৃদন্ত (কৃৎ প্রত্যয়ান্ত পদের যে নিত্য (আবশ্যিক Compulsory) **সমাস হয়, তাহাকে উপপদ সমাস বলে।** উপপদ সমাস **তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্গত।** যেমন কুম্ভকার, কর্মকার চর্মকার স্বর্ণকার, মালাকার সুপকার (পাচক) ভাস্কর (ভাস্ কৃ ট (কর্তৃবাচ্যে) তস্কর মধুপ, পাপ দস্যু নিশাকর দুঃখকর মনোহর সব্যসাচী (সব্য - বাম (হস্তেও) যিনি আকর্ষণ করেন সব্য\/সচ্+ ণিন্। গন্ধবহ নিশাচর অসূর্যম্পশ্যা, মণিকার, পরন্তপ ইত্যাদি **সংস্কৃত উপপদ সমাসের** উদাহরণ। বাঙ্‌লা সাধু ভাষায় ইহাদের ব্যবহার দেখা যায়। শত্রুঘ্ন (শত্রুকে হনন করেন যিনি)। লিপিকর। সিদ্ধিকবী।

('কুম্ভকার' পদের বিগ্রহ বাক্য) 'কুম্ভ (কুম্ভকে) করে যে, কুম্ভ -(উপপদ) কৃ (ধাতু)। অণ (প্রত্যয়)' কর্মবোধক 'কুম্ভ' উপপদের সহিত কার এই কৃৎ প্রত্যয়ান্ত অংশের আবশ্যিক (নিত্য) সমাস হইয়াছে দ্বিতীয়া বিভক্তি আসিবার পূর্বেই, অর্থাৎ—('কার' অংশের কোন পৃথক সত্তা নাই)-ইহা উপপদ সমাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই- 'কার'কে স্বাধীনভাবে ভাষায় ব্যবহার করা যায় না, যথা—'কুম্ভের 'কার' কেননা এরূপ বাক্য কোন অর্থের বোধ জন্মায় না। এইরূপ, 'কর্ম' কৃ। অণ কর্ম করে যে (কর্মকার) মনস—হৃ+অচ্ -মন (মনস) হরণ করে যে (মনোহর)। ('মনসিজ' মনে যে জন্মে এই অর্থে মনসি। জন্+ড—**অলুক্ উপপদ)। সরসিজ** (অলুক্ উপপদ তৎপুরুষ)। খেচর। "ভবদম" (কবিগুরু বন্দনা) অম্বুজা। নানাচিহ্নধারী। দিবাকর (দিবা করে যে) প্রকৃতিস্থ, সন্দেশবহ।

[ঞ] বাঙ্‌লা উপপদ সমাস

ঘরপোড়া (হনুমান) পাড়াবেড়ানী, ঘর-জ্বালানী, নেই-আঁকড়ে (ন্যায>নেই+ আঁকড়িয়া ন্যায়কে আঁকড়ে ধরে যে, নেই আঁকাড়িয়া>নেই-আঁকুড়ে—ন্যায়নিষ্ঠ), ছেলেধরা (ছেলে ধরে যে)। পাখ-মারা (সংস্কৃত ভাষায় সমার্থক শব্দ শকুনিলুব্ধক) **'চিঁড়ি-মার'**

(শাহী) চিড়িয়া—(পাখী)+মারা (ধাতু)+আ=চিড়িয়া মারদের শাহী (রাজ্য)>চিড়িমার-শাহী—মেদিনীপুর শহরে পল্লীবিশেষ—'পাখীশিকারীদের রাজ্য') পকেটমার, গাঁটকাটা, ভুঁইফোঁড়, ছেলেধরা, কাফেন (ইং—কফিন)—চুর্ ধাতু+আ='কাফেন চেরা' [কর্তৃবাচ্যে-কফিন শবাধার চুরি করে যে'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'], ননীচোরা-ননী√চুর্+আ। **কানমলা সর্দার** (কান মলে যে সর্দার—রবীন্দ্রনাথ)।

আলোচনা—'ঘরজ্বালানী' √ঘর—জ্বালা (ধাতু)+নী (—অনী) ঘরকে জ্বালায় (অতিষ্ঠ করিয়া তোলে) যে স্ত্রীলোক। পাড়া—বেড়া+নী পাড়ায় বেড়ান স্বভাব যাহার-পাড়াবেড়ানী। উল্লিখিত উদাহরণগুলিতে যেমন ঘরপোড়া, পকেট-মারা প্রভৃতিতে সমাসের পরপদ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হইতে পাবে না।

'পোড়া', 'মারা', 'মার' প্রভৃতি কৃদন্ত পদ কর্তৃবাচ্যে—'আ' এবং 'অ' প্রত্যয যোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহারা সমাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সমাস ছাড়া ইহারা উক্ত অর্থে ভাষায় চলিতে পারে না—সুতরাং সমাস আবশ্যিক। উপপদ তৎপুরুষের লক্ষণ এখানে খাটে।

কিন্তু 'পোড়া', 'মারা', 'ধরা' 'মার' প্রভৃতি কৃদন্ত পদ যখন ক্ত-প্রত্যয হইতে উৎপন্ন **অ-বা আ-প্রত্যয় যুক্ত** হয় তখন ইহারা স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয় এবং উপপদ তৎপুরুষের অঙ্গরূপে ইহাদিগকে গ্রহণ করিবার কোন প্রশ্ন উঠে না। যথা-পোড়ামাটি পোড়াকপাল, ঘরপোড়া (ঘর পোড়া—ঘরে পোড়া), (গোরু) সপ্তমী তৎপুরুষ। 'বড়বাবু আমার **হাতধরা** লোক (তৃতীয়া তৎপুরুষ) আপিস থেকে মারা টাকাটার জন্য আমাকে হযতো বিশেষ কিছু বলবেন না।' ব্যবসায়ে তাহার অনেক টাকা **মারা** গিয়াছে। বঙালীর **মার** দুনিয়ার বার (বাঙালীদের প্রহারের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও পাওয়া যায় না—অবশ্য সংঘবদ্ধ হইলে)।

'ধামাধরা' (তোষামোদকারী) সংস্কৃত 'ধর্মধর' শব্দ হইতে ধামা (ধর্ম+ধর্+আ কর্তৃবাচ্যে 'ধর্মকেই ধরিয়া থাকে যে'—বুৎপত্তিলভ্য অর্থ। অর্থের প্রসারে 'একনিষ্ঠ লোক' —তারপর অর্থের অবনতিতে খোসামুদে লোক (ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়ার মত) ধর্ম> ধম্ম>ধাম ('বৌদ্ধগান ও দোহা') ('ধামার্থে চাটিল সঙ্কমগঢ়ই')। ইহা বেতদ্বারা তৈয়ারি পাত্রবিশেষ নহে—সুতরাং 'ধামাধরা' (basket-holder) নহে। "কর্মনাশা" (বাবা-সাক্ষী)।

[ট] নঞ্ তৎপুরুষ সমাস

প্রতিষেধার্থক অব্যয় 'ন'-কারের সহিত যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাহাকে নঞ্ তৎপুরুষ সমাস বলে। এই 'ন'-কার (অ বা অন্ সহ) ছয় প্রকার অর্থ প্রকাশ করে। (১) অভাব (২) বিরোধ (৩) অন্যত্ব (৪) অপ্রশস্ততা (৫) অল্পতা (৬) সাদৃশ্য। যথাঃ—অযত্ন (যত্নের অভাব), অসুর (সুর বিরোধী) অসুখ, অস্ত্রী (স্ত্রী ছাড়া) অজন্মা, অকাল, অব্রাহ্মণ। সংস্কৃত ব্যাকরণে দুইটি 'ন'-কার স্বীকার করা হইয়া থাকে—একটি (১) 'নঞ্' ও অপরটি (২) 'ন'। সমাসের আদিতে ব্যবহৃত নঞ্, অব্যয়ের পর স্বরাদি শব্দ থাকিলে (ক) অন্ হয় অর্থাৎ ন-কারের **স্থিতিপরিবৃত্তি** হয় (ন=ন্+অ। অকার স্থান পরিবর্তন করিয়া ন্কারের পূর্বে বসে)।

ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে 'ন'-কারের ন্ লোপ হয় শুধু (খ) 'অ' থাকে।

ন (নয়) স্নাত =অস্নাত (অভুক্ত ইত্যাদি)।

ন (নয়) ব্রাহ্মণ	=অব্রাহ্মণ	ন (নয়) কাজ (যাহা)	=অকাজ
ন (নয়) সুন্দর	=অসুন্দর	আচারের বিরুদ্ধে	=অনাচার
ন (নয়) গাধ	=অগাধ (অথৈ জল)	ন (নয়) আকৃষ্ট	=অনাকৃষ্ট

ন (নয়) কাতর অকাতর 'অকাতরে ঘুমায় সবাই' (রবীন্দ্রনাথ)।

ন (নয়) আদর =অনাদর

(২) 'ন'-র কোন পরিবর্তন হয় না

ন অতি দূরে	নাতিদূরে	ন পুমান্ ন স্ত্রী	নপুংসক
ন অতি দীর্ঘ	নাতিদীর্ঘ	নখ	নখ, নকুল

খাটি বাঙ্‌লায় নঞ্ তৎপুরুষে **ন-কার স্থানে অ আ, অনা** হইয়া থাকে। কাহারও কাহারও মতে 'আ' এই 'না' হইতে (ন্।আ না) ন লোপে উৎপন্ন হইয়াছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে 'ন' অর্থে 'না' শব্দের প্রয়োগ আছে। **'নাম-না-জানা পাখী** নাচে শিস্ দিয়ে যায় বুলবুলি'—শিলঙের চিঠি।

নয় চেনা	অচেনা	নয় জানা	অজানা, আগাছা, আঘাটা
নয় দেখা	আদেখা (না দেখা)	নয় কাড়া	আকাড়া (চাল)
নয় ঝাড়া	আঝাড়া (ধান)	না সৃষ্টি নয়—	অনাছিষ্টি (অর্ধতৎসম শব্দ)

।অনাদর, অনাচার প্রভৃতির সাদৃশ্যে 'ছিষ্টি' শব্দের পূর্বে অন্ হইয়াছে। 'না' (অশুভ) মুখ যাহার অনামুখ, অনামুখো। অনেক সময় এই পূর্ববর্তী-**'আ' স্বার্থে** ব্যবহৃত হয়—নিষেধার্থ থাকে না—'আকুমারী' কুমারী অর্থে। **'না' অব্যয়ের** স্বার্থে প্রয়োগ দেখা যায় 'সে না বাড়ি আসিয়া সব নষ্ট করিয়াছে'=সে বাড়ি আসিয়াই সব নষ্ট করিয়াছে। (পূর্ববঙ্গ)।

[৩] কর্মধারয় সমাস

কর্মধারয় হইতেছে তৎপুরুষ সমাসের অবান্তর ভেদ। বিশেষণ পদের সহিত অন্বিত বিশেষ্য পদের যে সমাস হয় তাহাকে কর্মধারয় বলে। **কর্মধারয়** সমাসে বিশেষণ সাধারণতঃ পূর্বে বসে, বিশেষ্য পরপদরূপে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ বিশেষ পদের সহিত সমাসে বিশেষ্য পূর্বপদরূপে ব্যবহৃত হয়, বিশেষণ হয় উত্তর পদ।

বিভিন্ন প্রকারের কর্মধারয় সমাসের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—'নীলোৎপল'—নীল যে উৎপল (বিগ্রহ) এখানে উৎপল শব্দের অর্থ সমাসে প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। নীলোৎপল বলিলে উৎপলকে বুঝায়—'নীল' পদ ইহাকে বিশেষিত করিতেছে। 'সুপ্তোত্থিত' প্রথমে সুপ্ত পরে (সুপ্তি হইতে) উত্থিত (বিগ্রহ বাক্য)—[এখানে পূর্বে কালবোধক পদের সহিত উত্তরকালবোধক পদের সমাস হইয়াছে। দুইটিই কৃদন্ত বিশেষণ পদ হইলেও (সুপ্ত+উত্থিত)—দ্বিতীয় পদ পূর্বপদের সম্পর্কে বিশেষ্যের মতো আচরণ করিতেছে। পরপদের উত্থান ক্রিয়াকে 'সুপ্ত' পদ বিশেষিত করিতেছে।

(১) বিশেষণ পূর্বপদ ঃ—নীলোৎপল, রক্তাশোক, কালপেঁচা, 'কড়ে-রাড়ী' (পরম-পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ—অচিন্ত্য সেন), 'ডুরেশাড়ী', 'ফুলকোঁচা' [ফুলা (ফোলা) যে কোঁচা)—মালকোঁচার বিপরীতার্থক শব্দ] কাঁচাকলা (কাঁচা কলা—সমাস পূর্বপদের অন্ত্যস্বরের

লোপ, 'ফুলকোঁচা', বট্ঠাকুর পদদ্বয়ের অন্ত্যস্বর লক্ষণীয়। বট্ঠাকুর (বড়ঠাকুর), **'কাঁচপোকা'** (পরশুরাম) [উজ্জ্বল নীলবর্ণ বোলতাজাতীয় পোকাবিশেষ। সংস্কৃত দীপ্তি-বাচক 'কাঞ্চ' ধাতু হইতে, কাঁচ (উজ্জ্বল যে পোকা)—নিত্যসমাস—[কৃষ্ণসর্পের মতো], 'নীলমণি', ফুটোপয়সা, কানাকড়ি, খাসদখল, 'নবনীপল্লব' (দল), নীলাম্বরী, মহর্ষি, মহামুনি, বিশ্বচরাচর, কালসাপ, মিছেকথা, নীলশাড়ী, চোরাবালি, উত্তরকাশী, পূর্ববঙ্গ। ('বড়' অর্থে **'রাম'** ও **'রাঘব'** শব্দের বিশেষণরূপে প্রয়োগ), 'রামদা' (বড় কাটারী), 'রাম-ছাগল' ['রাম (বড়) যে ছাগল] 'রামছাত্র' (নিন্দার্থে) রামপাঁঠা, রামশিঙ্গা, 'রামধনু' (বড় ধনু—রামের ধনু নহে, ইন্দ্রধনু প্রকৃত নাম। আকাশে প্রকাশিত ইন্দ্রধনুকে রামধনু বলা হয়), বুড়োখোকা (বেশি বয়সে যে শিশুর মত ব্যবহার করে) কিন্তু 'রাঘববোয়াল' (বড় বোয়াল), **'রাঘবশাহী'** [রাজশাহী শহরের বিখ্যাত সন্দেশ-জাতীয় মিষ্টান্নবিশেষ; শাহী—শাহের রাজা=রাজার (শাহের) (অর্থের প্রসার) 'ভোগ্যবস্তু' রাঘব (বড়, উৎকৃষ্ট) যে শাহী - যেমন 'রাজভোগ'—মিষ্টান্ন বিশেষের নাম)] 'অজপাড়াগাঁ' 'মাধবীনিশিথিনী' (রবীন্দ্র-নাথ), কালশিরা, (কালশিটা, কালশিটে), 'কাল বাজার' (কালা বাজার, কালো বাজার), কালাপানী, ফটিকজল (ফটিক=স্ফটিক হইতে স্বচ্ছ যে জল) 'সোনামৃগ' (=সোনালি যে মৃগ। 'সোনা' বিশেষণরূপে প্রযুক্ত—'সেই গান ভেসে আসে দূর হতে দূরে, শরতের আকাশেতে 'সোনারোদ্দুরে' —রবীন্দ্রনাথ সহজপাঠ'), সোনাব্যাঙ, (কিন্তু 'কোলাব্যাঙ' মধ্যপদলোপী কর্মধারয়), চোরাগোপ্তা (চোরা গোপ্তা)।

(২) পরপদ বিশেষণঃ ঘনশ্যাম, বকধূর্ত, রাধাসতী, ('ভক্তি হবে রাধাসতী'- দাশরথি রায়), 'সীতাসতী', মিশকালো, **ঘাকতক, জনকতক, ছটাকখানেক, বিঘেদুই, তিলেক, আধেক**, 'হাতীকড়া' (কালকেতু—মুকুন্দরাম), আলুসিদ্ধ।

(৩) দুইটিই বিশেষণ পদঃ (পূর্বপদ ও উত্তরপদ) নূতনজাগা ('কুঞ্জবনে কুহরি ওঠে পিক'—রবীন্দ্রনাথ) নীললোহিত, অম্লমধুর, উতলাআকুল (রবীন্দ্রনাথ), ছোট-খাট (গল্প, ঘর), তিতাবেহায়া, শান্তসুনীল, নিলাজনীল, মিঠেকড়া, কাঁচামিঠে, সভ্যভব্য, তাজামড়া, ফিকেনীল, বাসিমড়া, সুপ্তোত্থিত (সিংহ), স্নাতানুলিপ্ত—(পূর্বে স্নাত পরে অনুলিপ্ত), শ্লথসিক্ত, (শ্যামাঙ্গল নরেন্দ্র দেব,), নরমগরম, বিবশনীল, নিমরাজি, অর্ধচ্যুত, অর্ধদগ্ধ, আড়পাগলা, আধপাগলা, পরমসুন্দরী, হৃষ্টপুষ্টে উগ্রচণ্ডা, 'পরমমায়াবী' (মধুসূদন), **ন্যূনাধিক** (ন্যূন বা অধিক), শীতোষ্ণ, সতীলক্ষ্মী, ঘনবিন্যস্ত।

(৪) (ক) উভয়পদ বিশেষ্যঃ—সর্দার-পড়ো, সর্দার-খেলোয়াড়, মাসিমা, গুরুমা, রায়বাঘিনী, (বৃহৎ ব্যাঘ্রী—উগ্রচণ্ডা নারী (Amazon) মেয়েমর্দ, পণ্ডিতমহাশয়, গোলাপ-ফুল, মলয়পর্বত, চন্দনতরু, মাঠাকরুণ, গিন্নীমা, রানীমা, 'দাদুভাই' মন্ত্রিমহোদয়, মৌলবী-সাহেব, ঠাকুরদাদা, 'দিদিভাই', মাগোঁসাই, শুক্রবার, অমরাবতীপুরী, শিপ্রানদী, দেবর্ষি, দেবেন্দ্র, শুকতারা, কাননভূমি, ভারতভূমি, বিশ্বেশ্বরক্ষেত্র, খোকাবাবু, খোকা-সাহেব, পীরসাহেব, ফকিরসাহেব ('ষোড়শী') ডাক্তারসাহেব, বউঠাকুরানী, বধূঠাকুরানী, নৃপশিষ্য (প্রতিনিধি)।

(খ) উত্তর পদে প্রশংসার্থক বিশেষ্য পদ পূর্বপদেও বিশেষ্যঃ—কেশপাশ (প্রশংসনীয়

কেশ), কটিতট, **বক্ষস্থল, গণ্ডস্থল, অংকস্থল,** (প্রশস্ত অংক—ক্রোড়) 'যখন জৈমিনি গর্গ, পতঞ্জলি মম **অংকস্থল** শোভায় উজলি' ('ভারত ভিক্ষা'—হেমচন্দ্র), 'কেতকীকেশরে **কেশপাশ** কর সুরভি' (রবীন্দ্রনাথ), (পরবর্তী শব্দগুলি বিশেষ্য হইয়াও বিশেষণের কাজ করিতেছে এবং সকলগুলির অর্থই এক, তবে সাহিত্যে প্রয়োগ দেখিয়া প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করিতে হইবে) 'গ্রন্থিত মালতীমালা কুঞ্চিত কুন্তলে গৌর **কণ্ঠতটে'** (বিজয়িনী—রবীন্দ্রনাথ), (প্রশংসনীয় বা সুন্দর কণ্ঠ=কণ্ঠতট)। **'বক্ষস্থলে'** গঙ্গা প্রবহমান (রামেন্দ্রসুন্দর)।

(৫) উপমান কর্মধারয়ঃ—উপমান বাচক পদের সহিত (উপমান ও উপমেয়ের) সামান্য ধর্মবাচক পদের যে সমাস হইয়া থাকে তাহাকে **উপমান কর্মধারয় সমাস** বলা হয়।

যাহার বর্ণনা করিতে (বর্ণনার বিষয়) তুলনার আশ্রয় লইতে হয় তাহার নাম **উপমেয়** (বা **উপমিত**)। যাহার সহিত উপমেয়ের তুলনা করা যায় তাহাকে বলে **উপমান।** উপমান ও উপমেয় উভয়ের ভিতর যে সাধারণ গুণ বা ধর্ম থাকে, যাহা অবলম্বন করিয়া উপমা অর্থাৎ তুলনা দেওয়া হয় তাহাকে সামান্য ধর্ম বা সাধারণ ধর্ম বলে।

উপমান **সমাসে** উপমান পদ ও সামান্য ধর্ম উপস্থিত থাকে—**উপমেয়** (উপমিত) **পদ সমাসের বাহিরে থাকে।** উদাহরণ—**ঘনশ্যাম** শ্রীকৃষ্ণ আমাদের দুঃখ দূর করুন। এখানে **শ্রীকৃষ্ণ** উপমেয় পদ, কেননা বর্ণনার বিষয় তিনি। তাঁহার বর্ণনায় চমৎকারিত্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে উপমার বা তুলনার সাহায্য লওয়া হইয়াছে। সুতরাং **কৃষ্ণ উপমেয়** (উপমিত) পদ। এই পদ, (উপমিত) **ঘনশ্যাম** রূপ সমস্ত পদের অংশ নহে। ইহা সমাসের বাহিরে আছে। **শ্রীকৃষ্ণকে** ঘনের (মেঘ) সহিত তুলনা দেওয়া হইতেছে সুতরাং **'ঘন' উপমান** পদ। ঘন (মেঘ) হইতেছে শ্যাম বর্ণ, **শ্রীকৃষ্ণও শ্যামবর্ণ।** অতএব **'শ্যামত্ব'** উপমান ও উপমেয়ের **সাধারণ ধর্ম—**এ দুইয়ের মধ্যেই আছে।

এ সমাসে পূর্বপদ বিশেষ্য পরপদ বিশেষণ হইয়া থাকে। **উদাহরণঃ—**তুষারধবল, কুন্দধবলা (বীণাপাণি), **তুষারশুভ্র,** মসিকৃষ্ণ কনকগৌর, কোয়েলকালা, ফুটিফাটা (মাঠ), **মিশকালো** (মিশির মত কালো), অরুণরাঙা (চরণ ফেলে—রবীন্দ্রনাথ), শিরীষ-সুকুমার, পুষ্পপেলব, **শশব্যস্ত,** 'নবনীতকোমলা', 'কুসুমকোমল' (ত্রিরত্ন)। মালী তাহাকে **শশব্যস্ত** হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল ('স্বদেশিকতা')। ব্যাসবাক্য—কুন্দের মতো ধবলা কুন্দধবলা (বীণাপাণি), ফুটির মত ফাটা (ফুটিফাটা মাঠ- শরৎচন্দ্র)।

(৬) **উপমিত কর্মধারয়ঃ**—[উপমান—কর্মধারয়ে উপমান বাচক পদ পূর্বে বসে—সাধারণ ধর্মবাচক পদ পরে থাকে। উপমিত (উপমেয়) পদ সমাসের বাহিরে থাকে। কিন্তু **উপমিত কর্মধারয়** সমাসে **উপমিত-পদ** সমাসের পূর্বাংশে থাকে এবং শ্রেষ্ঠার্থ-বাচক (ব্যাঘ্রাদি) **উপমান পদের** সহিত উহার সমাস হয়। **সাধারণ ধর্মের সমাসে** প্রয়োগ হয় না।

যথা—পুরুষব্যাঘ্র (পুরুষ ব্যাঘ্রের মত তেজস্বী) এখানে পুরুষের কথাই বলা হইতেছে। পুরুষ উপমিত পদ, ব্যাঘ্রের সহিত তাহার তেজস্বিতা ও বীরত্বের জন্য তুলনা করিয়া তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। কিন্তু এই সাধারণ ধর্ম (শ্রেষ্ঠত্ব) সমাসের বাহিরে বক্তা ও শ্রোতার মনে রহিয়াছে।

উদাহরণ—পুরুষব্যাঘ্র (আশুতোষ), **পুরুষসিংহ**, নরশার্দুল, করপল্লব, চরণপদ্ম, বীর-কুঞ্জর (কুঞ্জরের মত বীর), বীরকেশরী, রাজসিংহ, ফটিকচাঁদ, কৃষ্ণচন্দ্র, কালাচাঁদ কেলে সোনা (কেলো) (কালিয়া) (সোনার মতো), ফুলবাবু (ফুলবাবুর মত), কথামৃত (কথা অমৃতের মত) তুলঃ—'মহাভারতের কথা অমৃত সমান' (কাশীরাম দাস), চরণপদ্ম, **মামণি, পিসিমণি,** দিদিমণি, খুকুমণি, পরানমৃণাল।

(৭) **রূপক কর্মধারয়ঃ**—উপমান এবং উপমেয়ের মধ্যে যখন কোন ভেদ কল্পনা করা হয় না তখন **রূপক সমাস** হয়। উপমেয় পদ এই সমাসের পূর্বপদ রূপে ব্যবহৃত হয় এবং উত্তরপদে উপমানবাচক পদ থাকে। যেমন রাম **শোকাগ্নিতে** দগ্ধ হইতে লাগিলেন। এখানে 'শোকের' বর্ণনা করা হইতেছে। 'শোক' উপমেয়। শোককে আগুনের (অগ্নির) সহিত তুলনা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু শোক আর আগুনে কোন ভেদ নাই। সুতরাং ব্যাসবাক্য 'শোকরূপ অগ্নি'। **শোকানল,** রূপবহ্নি, মন্ত্রশক্তি।

মনবজমিন, 'কেলোসোনা' কেলো (কালিয়া) রূপ সোনা) 'হৃদয়সাগর', জ্ঞানালোক, শোকসিন্ধু, বিষাদসিন্ধু, প্রাণপাখী, 'মর্মরকাব্য' (নবীনচন্দ্র—'অমিতাভ') বচনামৃত, শান্তিবারি (১) শান্তিরূপ বারি—এখানে 'শান্তি'পদের অর্থের প্রাধান্য রহিয়াছে আর (২) 'শান্তির জন্য বারি'তে—বারি শব্দের প্রাধান্যে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস হইবে। (১) এখানে জল (বারি) বলিয়া কিছুই নাই। বারি কাল্পনিক (২) এখানে বারি বা জল আছে। **'করুণা মন্দাকিনীর** ধারা বহিল' (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর) আকাশরূপ পট—আকাশপট, মেঘকজ্জল। ভাবরত্নাকর, আশাবারি, 'পথমায়াবী' (জসিমুদ্দিন), 'কীর্তিমেখলা' ('বসুধা বেষ্টিত যার কীর্তিমেখলায়'—রঙ্গলাল), 'চেতনা-প্রত্যুষ (কর্ণকুন্তী- রবীন্দ্রনাথ) 'স্নেহ-ক্ষুধা' (রবীন্দ্রনাথ) 'ফুলবাবু'—ফুলরূপ বাবু ('শিউলির বিয়ে'—মোহিতলাল মজুমদার 'কাব্য-মঞ্জুষা'), 'বালুকাসিন্ধু' (পৃথ্বীরাজ কাব্য—যোগীন্দ্র বসু) 'জীবনসিন্ধু', (জীবন-রূপ সিন্ধু—**'জীবনসিন্ধু** মথিয়া সে জন আনিবে **অমৃতবারি'**—চিত্তনামা—নজরুল), মন-মাঝি' (মনরূপ মাঝি), **'ভারতজননী'** (ভারতরূপিণী জননী), **'জননী-বঙ্গভাষা'** (দ্বিজেন্দ্র-লাল), 'দেশলক্ষ্মী', 'স্বদেশলক্ষ্মী' (রবীন্দ্রনাথ) মরণশোন, বিরহআঁধার অধরকমল (অধররূপ কমল)।

(৮) **মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাসঃ**—যে কর্মধারয় সমাসে মধ্যস্থিত পদের লোপ হয় তাহাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় বলে। ব্যাসবাক্যে ব্যবহৃত, ব্যাখ্যাসূচক এই মধ্যবর্তী পদ, সমাসে স্থান পায় না। যেমন **'ঘিভাত'** (ঘিয়ে পাক করা ভাত, ঘি মেশানো ভাত) 'দুধসাগু' (সাবু) (দুধ মেশানো সাগু) দুধভাত, (সমাসে 'পাক করা' অথবা মেশানো শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই কিন্তু উহা সমাসের অর্থ বুঝিবার সহায়ক), 'পলান্ন' (পলমিশ্রিত অন্ন), 'মোটর-গাড়ি' (মোটর দ্বারা চালিত>মোটর চালিত গাড়ি), পাল্কীগাড়ি (পাল্কী সদৃশ গাড়ি), গোলাপজাম (গোলাপগন্ধী জাম), কাঞ্চনকোকনদ, মালবাবু (মালচালকবাবু), 'কাঠবাদাম' (কাষ্ঠোৎপন্ন বাদাম>কাঠবাদাম (যে বাদাম গাছে হয়—চিনেবাদামের মতো মাটিতে হয় না), 'মর্কটবৈরাগ্য' (মর্কটের বৈরাগ্য—মর্কটবৈরাগ্য সদৃশ বৈরাগ্য), **হাঁসকল** (হংস>হাঁস, হাঁস সদৃশ কল—(কপাট ঝুলাইবার হংসাকৃতি লৌহখণ্ড বিশেষ), **'বকযন্ত্র'** (বকাকৃতি যন্ত্র)।

'ফ্লবাব্' (ফ্ল সদৃশ কোমলবাব্), ভিক্ষান্ন (ভিক্ষালব্ধ অন্ন), 'বরযাত্রী' (বরানুগমনকারী যাত্রী), ফ্লবড়ি (ফ্লাকৃতি বড়ি), চাঁপাকলা (চাঁপারঙের কলা), শ্যেনদৃষ্টি (শ্যেনের দৃষ্টি —শ্যেনদৃষ্টি, শ্যেনদৃষ্টির মত দৃষ্টি), কাকস্নান (কাকের স্নানের মত স্নান), কাকতন্দ্রা, ফ্লপাড়, ফ্লপাড় (ফ্ল অঙ্কিত পাড়—ফ্লকাটা পাড়), 'মালকোঁচা' (মাল—মল্ল, মালের কোঁচার মতন কোঁচা—ফ্ল কোঁচার বিপরীতার্থবোধক শব্দ), 'কোলাব্যাঙ' (কোলার মত ফ্লা পেট যে ব্যাঙের), জলজীয়ন্ত (জল মধ্যস্থ মাছের ন্যায় জীবিত—অতিশয় স্পষ্ট), 'রান্নাদি', টিকিটবাব্, পাত্ক্ষীর, তেলধ্তি, বরযাত্রী, স্মৃতিমন্দির, সমাধিমন্দির, স্বাধীনতা-দিবস (স্বাধীনতা-স্মারক দিবস) বনস্থলী (স্থলী=অকৃত্রিম স্থান—প্রকৃতিরচিত-স্থান), বনসম্বিতা স্থলী [ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে]. ফলাহার (ফলসহিত বা ফলযুক্ত আহার, যজ্ঞোপবীত=যজ্ঞসহায়ক উপবীত [চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস দেখ], আনন্দাশ্রু (আনন্দজাত অশ্রু)।

[৪] দ্বিগু সমাস

তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদে সংখ্যাবাচক শব্দ থাকিলে যদি সমাসবদ্ধ পদে সমাহারের অর্থ বুঝায় তবে উহাকে **দ্বিগু সমাস** বলা হয়। যেমন 'ত্রিভুবন'—তিন ভুবনের সমাহার পঞ্চবটী (পঞ্চ বটের সমাহার)। **ত্রিরত্ন, ত্রিভুবন, পঞ্চপাত্র,** চৌমাথা, চৌবস্তা, চৌঘুরী, তেঘরিয়া (পূর্ববঙ্গের একটি গ্রামের নাম), সাতকুড়িয়া (গ্রামবিশেষ), দশবেড়িয়া, তেমাথা, তেকাঠা নবরত্ন, দোগাঙ্গী (গ্রামবিশেষ), পঞ্চভূত, চারচোখ, চৌদিক, ('চৌদিকে উঠিতে-ছিল মধুর রাগিণী জলে স্থলে নভস্তলে'- রবীন্দ্রনাথ), **শতাব্দী,** (শত অব্দের সমাহার Century), সপ্তাহ (সপ্ত অহের সমাহার), চতুরঙ্গ, 'দোচালা', দোপাটা (ফুলের'র নামসমস্যা)।

[৫] দ্বন্দ্ব সমাস

পরস্পরাপেক্ষ অনেক নামপদের প্রত্যেকের অর্থের প্রাধান্যে **দ্বন্দ্ব সমাস** হয়।

ইতরেতর যোগ ও সমাহারার্থে দ্বন্দ্ব সমাস হয়। সমস্যমান পদ যেখানে পরস্পরের সহিত অর্থে যুক্ত অথচ উভয়ের অর্থের প্রাধান্য যেখানে বজায় থাকে এরূপ স্থলে **ইতরেতর যোগ (ইতরেতর দ্বন্দ্ব)** হয়। আর সমাহারের অর্থ যেখানে প্রাধান্য লাভ করে, সেখানে **সমাহার দ্বন্দ্ব সমাস** হয়।

যথা—'হরিহর' (হরি এবং হর—উভয়ে ভাবের **(ইতরেতর যোগ)** দিক দিয়া পরস্পর যুক্ত অথচ এখানে দুইটি পদের অর্থই প্রধান রহিয়াছে), শিব-শিবানী। **(সমাহার দ্বন্দ্ব) 'বধূবর'** (বধূ ও বর তাহাদের সমাহার—তাহাদিগকে পৃথকরূপে এখানে কল্পনা করা হয় নাই।) **'ডালরুটি'**—ডাল ও রুটি পৃথক বস্তু হইলেও ডাল ও রুটি পদ দুইটিকে একত্র করিলে ইহাদের সমাহারের অর্থ বোধ হয়। ডালরুটি='খাদ্য': 'চাকুরি গেলে সিপাহীর **ডালরুটিও** যাবে', 'ধনুকবাণ' (রবীন্দ্রনাথ)।

উদাহরণ:—(১) বাঙ্‌লা সাধুভাষায় ব্যবহৃত **সংস্কৃত দ্বন্দ্ব সমাস,—'শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ'**, তালতমালহিন্তাল, অহোরাত্র (অহ ও রাত্রি, দিবারাত্র (দিবা ও রাত্রি), অহর্নিশ (অহ ও নিশা)—'কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ'—ভারতচন্দ্র। তাল-মান-লয়, অশোক-

পলাশকর্ণিকার, মালাচন্দন, বেণুবীণা, অশোক-চাঁপাকরবী, (তৎসম-তদ্ভব মিশ্রিত উদাহরণ)।

বাঙ্‌লা দ্বন্দ্ব সমাস—ক্ষীরছানাননী, -ইটকাঠচুনসুরখী, তেল-নুন-লকড়ি, বাপ-বেটা, শ্বশুর-জামাই, কর্তা-গিন্নি, হাতমুখ, লেনদেন, হাতীঘোড়া, সকাল-সাঁঝ, বাদশা-বেগম, রেল-স্টীমার, উকীল-মোক্তার, ইষ্ট-কুটুম্ব (ইষ্টি-কুটুম্ব), পিতামাতা। **বাঙ্‌লা সমাহার দ্বন্দ্ব**—ঝিজামাই, গোরুজোরু, (সংস্কৃত ভাষায় 'দারাগব'), ডালভাত, ডালরুটি, মালাচন্দন।

[ক] দ্বন্দ্ব সমাসের কতকগুলি বিশিষ্ট প্রয়োগ

(১) সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম-অনুসারে দ্বন্দ্ব সমাসের পূর্বে ঋকারান্ত পদ থাকিলে এবং বিদ্যা বা জন্ম সম্বন্ধ বুঝাইলে এই ঋকার স্থানে 'আ' হয়। যথা—মাতাপিতা, হোতা-পোতা (বেদবিদ্যা সম্বন্ধে)। পুত্র শব্দ পরে থাকিলেও পূর্ববর্তী ঋকারের এই পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। যথা—পিতাপুত্র, মাতাপুত্র, [বাঙ্‌লায় 'পিতৃমাতৃহীন' বলিলে যাহার পিতা-মাতা নাই—কিন্তু সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণে ইহা অশুদ্ধ প্রয়োগরূপে পরিগণিত হয়]।

(২) স্বামী এবং স্ত্রী অর্থে বাঙ্‌লায় ও সংস্কৃত ভাষায় 'দম্পতি' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। সংস্কৃত ভাষায় অবশ্য দুইজন লোককে বুঝায় বলিয়া দ্বিবচনে ইহার প্রয়োগ হয়। যথা—দম্পতী। বাঙ্‌লা ভাষায় 'দম্পতি' ও দম্পতী (সংস্কৃতের অনুকরণে)—এই দুই রকম বানান দেখা যায়। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে বাঙ্‌লাতেও 'জায়া ও পতি, ইহার ব্যাসবাক্য। 'জায়া'-শব্দের স্থলে দম্‌ ও জম্‌ আদেশ হয় বিকল্পে। সুতরাং সমস্তপদ হইতেছে দম্পতী, জম্পতী জায়াপতি ['জম্পতি' বাঙ্‌লায় চলে না]। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার অতি প্রাচীন ব্যাকরণে (পাণিনি) এরূপ পরিবর্তনের কোন নিয়ম পাওয়া যায় না। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন 'দম্পতী' 'দমের (গৃহের)—[বৈদিক ভাষায় 'দম' শব্দের অর্থ গৃহ, পতী—পতি এবং পত্নী অর্থাৎ ঘরের কর্তা এবং গিন্নী]।

কুশ এবং লব শব্দের দ্বন্দ্ব সমাসে **'কুশীলব'** হয়। নট অর্থে এই সমস্ত পদের প্রয়োগ বাঙ্‌লা নাটকেও দেখা যায়। 'দিবানিশি' দিবারাত্র'—দিবা শব্দ প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন সংস্কৃতে তৃতীয়ান্ত পদ (দিব্‌ দিবসার্থক)+আ (তৃতীয়া—পরবর্তীকালে অব্যয়রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।—অর্থ 'দিনের বেলায়' এবং 'নিশি' সপ্তম্যন্ত পদ) বাঙ্‌লা ভাষায় প্রথমা বিভক্তির অর্থে-দ্বন্দ্ব সমাস গঠিত হয়। 'দিবা এবং নিশি' দিবা এবং রাত্রি ইহাদের যথাক্রমে ব্যাসবাক্য।

(৩) **সমুহার্থে সমজাতীয় বা সমার্থক পদের দ্বন্দ্ব সমাস**ঃ—কান্নাকাটি, দলিল-দস্তাবেজ, চিঠিপত্র, আমীরওমরাহ, বনে-জঙ্গলে, উকিলমোক্তার, ডাক্তারকবিরাজ, ডাক্তার-বৈদ্য, 'ঝড়তি-পড়তি', ভিটেমাটি, কাজকর্ম, কামকাজ, ছাইভস্ম, মাথামুণ্ডু, ধর-পাকড়, বসবাস, চালচলতি, পথ-ঘাট, ঘটী-বাটী, জমি-জিরাত, ক্ষেতগিরস্তি, ক্ষেত-খামার, মণ্ডা-মিঠাই, চালচুলো, চুনা-পুটি, [কিন্তু 'চুনাগলি'—ছোট গলি কর্মধারয়]—গয়নাগাটি, অস্ত্র-শস্ত্র, লাঠিসোটা, লাঠিঠেঙ্গা, জপ-তপ, পোকামাকড়, যত্ন-আত্তি (যত্ন-আর্তি), পুজা-অর্চা, (পুজো আচ্চা), হাঁক-ডাক, সেবা-যত্ন, গাগতর, শিক্ষাসহবৎ, মন্তরতন্তর (স্বরভক্তি ও শব্দদ্বৈত দেখ)।

(৪) **বিপরীতার্থক পদের দ্বন্দ্ব সমাস**ঃ—ঝিচাকর, স্ত্রীপুরুষ, নরনারী, পাপপুণ্য, সুখদুঃখ, জ্বরাভয়, আনাগোনা, কেনাবেচা, জীবন-মৃত্যুর ওঠা-পড়া (রবীন্দ্রনাথ—শাজাহান)

ভাঙ্গাগড়া, লাভালাভ, জয়াজয়, জয়পরাজয়, ইষ্টানিষ্ট, দেনাপাওনা, লাভলোকসান, আমদানি-রপ্তানি, আসাযাওয়া। 'পুণ্যপাপে' দুঃখেসুখে 'পতনে উত্থানে' মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে।—(রবীন্দ্রনাথ)। 'ওলটপালট', চরাচর, স্থাবর জঙ্গম আলো-ছায়া। 'আলো-ছায়া ল'য়ে করিলে খেলা'—(কুমুদরঞ্জন মল্লিক)।

(৫) **শব্দদ্বৈত জনিত দ্বন্দ্ব সমাস ঃ**—প্রভৃতি, ইত্যাদি অর্থে এইরূপ দ্বন্দ্ব সমাস হইয়া থাকে। হাঁড়ী-কুঁড়ী (কুঁড়ী, কুণ্ডা কুণ্ডিকা হইতে, জল রাখিবার জালা)।

(৬) **অলুক্ দ্বন্দ্ব সমাস ঃ**—(দ্বন্দ্ব সমাসে যেখানে বিভক্তির লোপ হয় নাই।) মায়ে-ঝিয়ে, 'ওপাড়া হইতে আয় মায়েঝিয়ে' (রবীন্দ্রনাথ), পথে-প্রবাসে, বুকে-পিঠে, ছলেবলে, দুধে-ভাতে, ঘিয়ে-দুধে, আদায়-কাঁচকলায়, বাঘেমোষে, যমেবৈদ্যে, হাঁকে-ডাকে।

[৬] বহুব্রীহি সমাস

যে সমাসে সমস্যমান পদের অর্থ প্রধান না হইয়া অন্য পদের অর্থ প্রধান হয় তাহাকে বহুব্রীহি বলে। বহুব্রীহি পদটি বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ—সুতরাং এই সংজ্ঞাটি নিজ উদাহরণ হইতে আসিযাছে। যথা—বহু (অনেক) ব্রীহি (ধান) আছে যাহার (সেই লোক)। এখানে সমাসের 'বহু' ও 'ধানের' অর্থের প্রাধান্য নাই—প্রাধান্য আছে সেই লোকের যাহার অনেক ধান আছে। যদি বলা হয় 'বহুব্রীহিকে ধরে নিয়ে এসো'—তবে অনেক ধান কেহ আনে না,—যে লোকের অনেক ধান আছে তাহাকেই নিয়া আসে। আর যদি বলা হয় 'লম্বকর্ণকে নিয়ে এসো' 'লম্বা' কানকে কেহ আনে না গাধা অথবা **পাঁঠাকে** (রামছাগলকে) নিয়া আসে।—অবশ্য তাহাদের কান সঙ্গে সঙ্গে আসে। প্রথম উদাহরণের ধান (ব্রীহি) ধান্যস্বামীর সহিত আসে নাই দ্বিতীয় উদাহরণের 'কর্ণ' শব্দের প্রতিপাদ্য বস্তু আসিয়াছে।

[ক] বহুব্রীহি সমাসের প্রকার ভেদ

(১) **সমানাধিকরণ বহুব্রীহি ঃ** বিশেষ্য বিশেষণে যে বহুব্রীহি সমাস হয় এবং উহাতে পূর্বপদ যদি বিশেষণ হয় তাহা হইলে উহা হয় সমানাধিকরণ বহুব্রীহি ঃ— গলিতনীহার (কৈলাস, গলিত হইয়াছে নীহার যাহা হইতে), নীলাম্বর (বলরাম) পীতাম্বর (হরি), প্রসন্নসলিলা (গোদাবরী), 'রক্ত-আঁখি (কহিল তবে **রক্ত আঁখি** বাদশাহের অনুচর (রবীন্দ্রনাথ)। নিরপেক্ষ (নির্ নাই অপেক্ষা যাহার বা যাহাতে), স্বার্থপর।

(২) **ব্যধিকরণ বহুব্রীহি ঃ**—অন্য পদের অর্থের প্রাধান্য বর্তমান থাকিলেও যেখানে প্রথমান্ত পদ ছাড়া অন্য বিভক্ত্যন্ত পদের সহিত সমাস হয় সেখানে ব্যধিকরণ বহুব্রীহি হয় ঃ—পদ্মনাভ (পদ্মনাভিতে যাঁহার—হরি), বীণাপাণি (বীণা পাণিতে (হাতে) যাঁহার—সরস্বতী) 'বীণাহাতে' (বীণা হাতে যাঁহার—), মকরচূড (মুকুট) মকর চূড়াতে যাহার, চন্দ্রচূড (শিব)।

(৩) **ক্রিয়া ব্যতিহার (কর্মব্যতিহার** অথবা **ব্যতিহার) বহুব্রীহি ঃ**—পরস্পর ক্রিয়া বিনিময় (exchange) বুঝাইলে কর্মব্যতিহার বা ক্রিয়াব্যতিহার হয়। এই অর্থে একই পদের দ্বিত্ব সাধন করিয়া সমাস গঠন করিতে হয়। পূর্বপদের অন্ত্যস্বর দীর্ঘ হয়। হানাহানি কোলাকুলি, হাঁকাহাঁকি (অভাগীর স্বর্গ) হাতাহাতি, ঘুষাঘুষি (ঘুষি দ্বারা পরস্পরের যুদ্ধ Exchange of blows) ঠেলাঠেলি, লাঠালাঠি, চুলাচুলি। কিন্তু বেলাবেলি,

'রাতারাতি', (রাত্রিকে অতিক্রম না করিয়া এদিকে রাত্রি ওদিকে রাত্রি)। হাসাহাসি, চোখা-চোখি, মুখোমুখি। দেবষাদ্বেষি।

(৪) উপমানপূর্বপদ বহুব্রীহিঃ—এইরূপ বহুব্রীহিতে পূর্বপদ উপমানবাচক হইয়া থাকে। ইহার পরবর্তী পদের (উত্তর পদের বা মধ্য পদের প্রয়োজনমত) লোপ হয়। **ইহাকে উপমান পূর্বপদ বহুব্রীহি, উত্তরপদলোপী বহুব্রীহি** বা **মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি** বলা চলে। বরাখুরিয়া (বরাখুরে)—বরার (বরাহের) খুর=বরাখুর—বরাখুরের মত খুর যাহার। [বরাহের সহিত খুরের তুলনা দেওয়া চলে না। বরাহের খুরের সহিত অপরের খুরের তুলনা দেওয়া চলিতে পারে; সুতরাং এখানে উক্তরূপ ব্যাসবাক্য করিতে হইবে। যদি বলা হয় (ছোট ছেলেরা বলে) 'বাবা **তোমার মত**' আমারও একটা কুকুর চাই তবে এখানে উপমায় দোষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কারণ বাবার সঙ্গে কুকুরের তুলনা দেওয়া চলে না-- বাবার কুকুরের সঙ্গে অন্য কুকুরেরই তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং **সমাসের ব্যাস** (বিগ্রহ) বাক্য লিখিতে উহার বিশুদ্ধরূপ লিখিতে হইবে- চলিত ভাষায় **যেরূপ প্রয়োগই হউক না কেন।]**

চিরুণদাঁতী (চিরুণের দাঁতের মত দাঁত যাহার), ভ্যাড়ানাকী, বিড়ালচোখী। 'বিধুমুখী', 'চন্দ্রমুখী'র ব্যাসবাক্যে মুখ শব্দের দুইবার প্রয়োগের দরকার নাই এবং মধ্যপদলোপের প্রশ্ন উঠে না। যথা 'বিধু (চন্দ্রের) মতো মুখ যার', চন্দ্রমুখী মেয়ে আমার পরের ঘরে যায়। খাঁদানাকী বৌগুলো বাটার পান খায়।' চন্দ্রের সঙ্গে মুখের তুলনা চলে কেননা উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। বরাহের সহিত খুরের তুলনা চলে না। **'বিড়ালাক্ষী'** ('বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী'—ঈশ্বর গুপ্ত)।

(৫) **তুল্যযোগে বহুব্রীহিঃ**—দুইটি কর্তার যদি একই কার্যে যোগ থাকে (তুল্যযোগ— Equal participation in an act) তাহা হইলে 'সহ' এই অব্যয়ের সহিত অপ্রধান কর্তার বহুব্রীহি সমাস হয়। ইহাকে **তুল্যযোগে বহুব্রীহি** বলেঃ—সপুত্র (পুত্রের সহিত বর্তমান) **সস্ত্রীক**, সপত্নীক, সদলবলে, সশিষ্য। সশিষ্য দুর্বাসামুনি দৈবতবনে উপস্থিত হইলেন। শিষ্যগণের সহিত বর্তমান (ব্যাস বাক্য) মুনি উপস্থিত হইলেন শিষ্যেরাও উপস্থিত হইলেন। 'উপস্থিত হওয়া' ক্রিয়ায় দুর্বাসামুনি ও শিষ্যগণের তুল্য যোগ রহিয়াছে, সবিনয়, সাবধান।

(৬) নঞ্ বহুব্রীহিঃ—ন (ঞ্) অব্যয়ের সহিত অস্ত্যর্থবাচক পদের বহুব্রীহিতে উত্তর পদের লোপ হয়--ন (অবিদ্যমান) আদি যাহার 'অনাদি'। অসীম। অতল ইত্যাদি।

[খ] বিভিন্ন প্রকার বহুব্রীহির উদাহরণ

লব্ধপ্রতিষ্ঠ (লব্ধ হইয়াছে প্রতিষ্ঠা যৎকর্তৃক) শূন্যহৃদয়, সুশ্রী, ম্লানমুখী, (ম্লান-মুখী শেফালিকা পড়িতেছে ঝরি'—নজরুল), মকরচূড় (মুকুট), মন্দমতি (অল্পবুদ্ধি), 'অনাদি অসীম অতল অপার আলোকে বসতি যাঁর' (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত), অতুলন (**নঞ্ বহুব্রীহি)** সত্যসন্ধ, পুলকিত-তনু, শ্যামকলেবর, নির্লজ্জ, (খাঁটি বাঙলায় 'নিলাজ', 'ভগবান ভানু রক্তনয়নে হেরিয়া নিলাজ নিঠুর লীলা। **'নিলজী'** (স্ত্রীলিঙ্গে) [তৃণ জাতীয় গুল্মবিশেষ, ইহার কাঁটা কাপড়ে বিঁধিলে ছাড়ান কণ্টকর—'চোরকাঁটা' 'ভাটোই', 'ওকাড়া', 'বিধির বাড়ন'

প্রভৃতি নামে পরিচিত। 'লজ্জাবতী' লতার বিপরীত। 'নির্লজ্জের'র মত পথিকের কাপড়ে লাগিয়া যায়। লাজ নাই, নিলজ্জীর তুইলা বান্ধে খোপা। আগুন দিয়া পুইড়া ফ্যালা নিলজ্জীর ছোপা' (টাঙ্গাইল-মাণিকগঞ্জের গ্রাম্যছড়া)] 'উদয়তারা' (শাড়ি)—উদিত তারা (তারাচিহ্ন যাহাতে, যাহাতে উদিত তারা চিহ্ন অঙ্কিত—ময়মনসিংহ গীতিকা), সমানধর্মা, সাবমেয়ধর্মা, সপত্নী (সমান পতি যাহার—স্ত্রীলিঙ্গে), বীরপত্নী, পুষ্পধনু, গাণ্ডীবধন্বা, ফুলধনু (মদন), যুবজানি (যুবতি জায়া যাহার), সীতাজানি (রামচন্দ্র), প্রোষিতভর্তৃকা (প্রোষিত (প্রবাসগত) ভর্তা যা'র (স্ত্রীলিঙ্গে), নদীমাতৃক (দেশ), বিগতা হইয়াছে পত্নী যাহার বিপত্নীক, শুচিবাইয়া (শুচিবেয়ে—শুচি বায়ু যাহার), নিনাইয়া, নি নাই (নাও, নৌকা) যাহার, কোলাকুলি, টানাটানি, ষাঁড়াষাঁড়ি (গৌণার্থে ষাঁড়ের লড়াইর গর্জনের ন্যায় গর্জন বিশিষ্ট) গঙ্গার জলোচ্ছ্বাস (কোটাল), 'ষাড়াষাঁড়ির কোটাল', ষাঁড়াষাড়িব বান', গেরুয়াবসনা (সন্ধ্যা)। তেমাথা (তিন মাথা আছে যাহার), হতবুদ্ধি (হত হইয়াছে বুদ্ধি যাহার)।

অলুক্ বহুব্রীহিঃ—গায়ে-হলুদ [গায়ে (দত্ত) হলুদ যে অনুষ্ঠানে—এখানে সপ্তমীর পর দত্ত শব্দের লোপ হইয়াছে। তুলনীয়ঃ—কণ্ঠেকাল [কণ্ঠে স্থিত কাল (কূট) যাহার শিব], **কানে-কলম** (কেরানী—ব্যঙ্গবাক্য 'কানে গোঁজা কলম যাহার'), 'লালজুতুয়া-পায়ে' (লাল জুতো পায়ে আছে যার খোকা যাবে নায়ে', 'লালজুতুয়া-পায়ে।' রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত)। 'মুখেমধু (ফুল্লরা কবিকংকণ)—'মুখে স্থিত মধু যার। 'মুখভাত', 'হাতে-খড়ি।'

[৭] সমাসান্ত বিধি সমাসাশ্রয় বিধি

সমাসের উত্তর পদের অন্তিম অবয়বের পরিবর্তনের নিয়মকে **সমাসান্ত** বিধি বলে। ইহা ছাড়া সমাসে অন্য কোন রূপ ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়মকে সমাসাশ্রয় বিধি বলে।

[ক] সমাসাশ্রয় বিধি

কর্মধারয় সমাসে পূর্বপদের স্ত্রী প্রত্যয়ের লোপ হইয়া পুংবদ্ভাব হয়ঃ—

(ক) কৃষ্ণা চতুর্দশী—কৃষ্ণচতুর্দশী, মৃগীর মতো চঞ্চলা—মৃগচঞ্চলা।

(খ) মহৎ শব্দের স্থানে মহা হয়—মহতী বুদ্ধি—মহাবুদ্ধি। (কিন্তু মহতের বুদ্ধি =মহদ্‌বুদ্ধি। মহান্ রাজা-মহারাজ। মহান্ পুরুষ—মহাপুরুষ, মহাতর্ক (কর্মধারয়)।

(গ) তৎপুরুষ সমাসে পাদ শব্দের স্থানে 'পৎ' হয়ঃ—পাদের হতি (ছাপ) '**পদ্ধতি**' (শিক্ষার নূতন পদ্ধতি আয়ত্ত করা কঠিন)।

(ঘ) **লোকের নাম বুঝাইলে** অনেক স্থানে তৎপুরুষ সমাসে স্ত্রী প্রত্যয়ান্ত পূর্বপদ হ্রস্ব হয়ঃ—কালীর দাস—'**কালিদাস**' (মহাকবি), কিন্তু কালীর ভৃত্য বা সেবক অর্থে—**কালীদাস**। কাহারও কাহারও মতে দেবীর দাস—দেবিদাস, চণ্ডীর দাস—চণ্ডিদাস অন্যথা দেবীদাস, চণ্ডীদাস।

(ঙ) সমাসে পূর্বপদের অন্ত্য অবয়বের অনেক স্থলে লোপ হয়ঃ—বড় ঠাকুর—বট্‌ঠাকুর, মিশ্‌কালো (মিশিকালা), পাখিমারা (পাখ্‌মারা), চিড়িমার (শাহী—চিড়িয়া+মার), ঘোড়্‌গাড়ি (ঘোড়ারগাড়ি), খুড়্‌শ্বশুর (খুড়া-শ্বশুর), দিজ্জামাই (দিদি-জামাই—পূর্ববঙ্গ

প্রাদেশিক), দিদিমা—দিদ্‌মা, নাজ্জামাই (নাত্‌নি জামাই), পলতা (পটল+লতা), কাজল-লতা, কাজলতা (প্রাদেশিক), পানকৌড়ি (পানি+কৌড়ি), পান্তুয়া (পানি+তবা (উচ্চারণ 'তওয়া'—ফারসী), **পানফল** (পানি+ফল), পান্‌বসন্ত (পানিবসন্ত)।

[খ] সমাসান্ত বিধি

(১) তৎপুরুষ সমাসের অন্তে রাজা শব্দ (রাজন্‌), অহন্‌ এবং সখি শব্দ অকারান্ত রূপে ব্যবহৃত হয়। মহান্‌ রাজা=মহারাজ 'চলে গেছ তুমি আজ **মহারাজ**' (শাজাহান—রবীন্দ্রনাথ)। কিন্তু কখনও কখনও আকারান্তও হইয়া থাকে। যথা—বিকানীরের মহারাজা এখানে আসিয়াছিলেন। **সমাসান্ত বিধি, অনিত্য বিধি** [সমাসের অন্তে পরিবর্তনের নিয়ম সর্বত্র চলে না] পাণ্ডবের সখা=পাণ্ডবসখ—তৎপুরুষ, পাণ্ডবসখা (বহুব্রীহি)। কিন্তু অহন্‌ শব্দ 'অহ' হইয়া থাকে—'পুণ্যাহ'।

(২) অক্ষি শব্দ সমাসে (সাধারণতঃ **বহুব্রীহিতে**) 'অক্ষ' হয়। যথা—গবাক্ষ (তৎপুরুষ), কমলাক্ষ (স্ত্রীলিঙ্গে কমলাক্ষী), **'কপোতাক্ষ'**, (নদ)' ময়ূরাক্ষী (নদী); কিন্তু 'কপোতাক্ষি গিয়াছে তোমার ময়ূরাক্ষী শুধু আছে' (কালিদাস রায়)। এখানে বহুব্রীহি সমাস হয় নাই—মধ্যপদলোপী কর্মধারয় হইয়াছে।

(৩) জায়া শব্দ বহুব্রীহি সমাসের অন্তে থাকিলে 'জানি' হয়। (প্রকৃতপক্ষে 'জনী' শব্দ বহুব্রীহির অন্তে 'জানি' হইয়াছে। যুবতি জনী (জায়া যাহার—যুবজানি) জনী (নারী, স্ত্রী, পত্নী)।

(৪) বহুব্রীহি সমাসের অন্তে স্ত্রী প্রত্যয়ান্ত শব্দের দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হয়ঃ—**বীতস্পৃহ** (বীত (গত) হইয়াছে স্পৃহা যাহার), কৃতবিদ্য, **লব্ধপ্রতিষ্ঠ** (লব্ধ+প্রতিষ্ঠা)। ঈ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ এবং ঋ-কারান্ত শব্দ বহুব্রীহির অন্তে থাকিলে সমাসান্ত ক হয়ঃ—নদীমাতৃক, বিপত্নীক, সস্ত্রীক, প্রোষিত-ভর্তৃকা ইত্যাদি।

(৫) খাঁটি বাঙ্‌লা সমাসের অন্তে স্থলবিশেষে **-আ -উয়া** (ও) **-ইয়া** এবং **-ঈ** হয়। **-আ হরবোলা** (হর (নানারকম) বলে যে), হরিবোলা (হরি বলে যে—হরিনাম সাধনাকে যে ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে), অবোলা অবলাজীব—('বদন থাকিতে না পারি বলিতে তে'ইতো অবলা (আবোলা) নাম'—বৈষ্ণব পদাবলী), ঘোড়ামুখো, নাদাপেটা, নাদার (বড় জালার মত **পেট** যাহার—('উপমান পূর্বপদ বহুব্রীহি অথবা মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি (জটাবেটা, ঘোড়ামুখো, নাদাপেটা'—'দেড়শো খোকার কাণ্ড'—হেমেন্দ্র রায়), অভাগা, হতভাগা, নাককাটা—(সেপাই), দোনলা (বন্দুক, তেঠ্যাঙ্গা, তেকাঠা, চৌকোণা)। **-উয়া (ও)** বেড়ালচোখো (-চোখুয়া), ঘোড়ামুখো, গোমড়ামুখো, মানুষখেকো (বাঘ)। **-ইয়া (-এ)** কালাপেড়ে (কালাপাড়িয়া, সেকেলে, বরাখুরে, গোঁফখেজুরে, নেইআঁকুড়ে, হাবাতে (হাভাতিয়া)। **-ঈ** বিশগজী (থান), বেনামী (সম্পত্তি চৌমুহনী, চৌহদ্দী, চৌঘুড়ী (চৌঘুড়ি—চার ঘোরা দ্বারা বাহিত শকট), সমবয়সী, দক্ষিণদুয়ারী (ঘর)।

[৮] নিত্য সমাস এবং অনিত্য সমাস

['অলুক্‌ সমাস' যেমন কোন সমাস বিশেষের নাম নহে সেইরূপ নিত্য সমাসও কোন বিশেষ সমাসের নাম নহে]।

সমাস যেখানে নিত্য বা আবশ্যিক (compulsory) তাহাকে নিত্য সমাস বলে। নিত্য সমাস ছাড়া আর বাকি সম্ভাবিত সব যায়গায় সমাস অনিত্য। সমাস অধিকাংশ স্থলেই অনিত্য (optional) বা বক্তার ইচ্ছাধীন। বক্তা ইচ্ছা করিলে সমাসও ব্যবহার করিতে পারেন—বাক্যও ব্যবহার করিতে পারেন। সমাস কোথায় নিত্য আর কোথায় অনিত্য তাহার আলোচনা দরকার। সমস্যমান পদের যেখানে **ব্যাসবাক্য রচনা করিলেও** সমাসের অর্থবোধ হয় না তাহাকে **নিত্য সমাস** বলে। অনেক স্থলে অন্য পদের সহায়তায় অর্থের বোধ হইয়া থাকে। উদাহরণ (১) **'কৃষ্ণসর্প'** বলিলে 'কালকেউটা'কে বুঝায়। এখানে কৃষ্ণ (বা কাল যে) সর্প এইরূপ ব্যাসবাক্য করিলে 'কালকেউটাকে' না বুঝাইয়া যে কোন কাল রঙের সাপকে বুঝাইবে। সুতরাং ইহা নিত্য সমাস। ইহার ব্যাসবাক্য হয় না। (এখানে বলিতে হইবে ইহা **'অবিগ্রহ নিত্য কর্মধারয়** সমাস) (২) 'গ্রামান্তর' পদের 'অন্তর যে গ্রাম' এইরূপ কোন ব্যাসবাক্য ভাষায় প্রয়োগ হয় না। এখানে 'ভিন্ন'—পদদ্বারা ব্যাসবাক্য রচনা করিয়া সমাসের অর্থ বুঝাইতে হইবে। ভিন্ন গ্রাম বা অন্যগ্রাম—'গ্রামান্তর'—এখানে **অ-স্ব-পদ বিগ্রহ নিত্য কর্মধারয় সমাস** হইয়াছে (স্বপদ=নিজের পদ, অ-স্ব-পদ—যেখানে নিজের পদ ব্যবহার করা হয় নাই)। (৩) 'গরমিল'—মিলের গর 'গর যে মিল' এরূপ কোন ব্যাসবাক্য হয় না। 'মিলের অভাব' এইরূপ অ-স্বপদ-বিগ্রহ দ্বারা অর্থ বুঝান যায়। ইহা 'অ-স্বপদ-বিগ্রহ **নিত্য অব্যয়ীভাব সমাস**।' (৪) **সুহৃদ্**—সু (শোভন) হৃদয় (হৃদ্) যাহার বহুব্রীহি সমাস —অর্থ 'বন্ধু (friend)। কিন্তু যে কোন লোকের হৃদয় ভাল থাকিলে তাহাকে কেহ **সুহৃদ্** বলে না। 'বন্ধু' বলিতে যাহা বুঝায় ব্যাসবাক্য তাহা বুঝাইতে অক্ষম। এখানে 'নিত্য বহুব্রীহি' সমাস হইয়াছে—সমাস দ্বারা শুধু 'বন্ধু'কেই বুঝাইবে—অন্য কাহাকেও নহে। তাহা হইলে দেখা যায় প্রায় প্রত্যেক সমাসেই নিত্য সমাসের উদাহরণ পাওয়া যায়।]

অনুশীলনী

১। সমাস কাহাকে বলে? সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও। (উঃ মাঃ ১৯৬০ কম)

২। সমাস কয় প্রকার? প্রত্যেক সমাসের একটি করিয়া উদাহরণ দাও। কর্মধারয় ও বহুব্রীহি সমাসের প্রভেদ প্রদর্শন কর।

৩। ব্যতিহার বহুব্রীহি, অলুক্‌দ্বন্দ্ব, নঞ্‌ বহুব্রীহি (উঃ মা ১৯৬৩) অলুক্ তৎপুরুষ, তৎপুরুষ, উপপদসমাস, অলুক্ বহুব্রীহি, রূপক কর্মধারয়, উপমান পূর্বপদ বহুব্রীহি—ইহাদের উপর উদাহরণ সহ টীকা লিখ। (উঃ মাঃ ১৯৬৩)

৪। 'উপমিত' ও 'রূপক' সমাসের পার্থক্য বুঝাও। (উঃ মাঃ ১৯৬১)

৫। মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ও মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাসের পার্থক্য উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও। (উঃ মাঃ ১৯৬১)

৬। ব্যধিকরণ বহুব্রীহি ও সমানাধিকরণ বহুব্রীহির পার্থক্য উদাহরণসহ বুঝাও। (উঃ মাঃ ১৯৬০ কম)

৭। ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম উল্লেখ করঃ—

অনুরূপ, প্রত্যক্ষ, প্রোষিতভর্তৃকা, বাহির্দ্বার, গাঢাকা, বেমিল, ফুলকাটা, চিরসুখী, চুলচেরা, চালাগা (চাদর), যূপকাষ্ঠ, মেয়েগাড়ি, জেলখালাস, কেয়াপাতা, মামারবাড়ি, রাজ-

হংস, সর্দারপড়ো, (সর্দার পড়ুয়া), ননীর পুতুল, ছেলেধরা, ঘরপোড়া, দুঃখকর, ধামাধরা, শলর্থসিক্ত, আড়পাগলা, পুলিস-সাহেব, নাম-না-জানা, আদেখা, অনামুখো, বিপত্নীক, নদীমাতৃক, গায়েহলুদ, মুখেভাত, আকুমারী, মালকোঁচা, ফুলকোঁচা, নিলাজ, কাঁচপোকা, রামছাগল, ঘনশ্যাম, কুন্দধবলা, হৃদয়সাগর, বিষাদসিন্ধু, বালুকাসিন্ধু, ফুলবাবু, ভারতজননী, তেকাঠা, ত্রিরত্ন, ষাঁড়াষাঁড়ি, হাতাহাতি, সদলবল, চিরুণদাঁতী, মিশকালা, দম্পতি, ময়ূরাক্ষী, কপোতাক্ষ, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, রাতারাতি, বেলাবেলি, চরণপদ্ম, গেরুয়াবসনা, মহাতর্ক, ঠেলাঠেলি, শশব্যস্ত, স্বাধীনতাদিবস (উঃ মঃ ১৯৬০), ভিক্ষান্ন, অগ্নিভয়, ডাক্তারসাহেব, লাঠিখেলা, লাঠালাঠি, ঘরমুখো, গোঁজামিল, নবনীতকোমল, পঞ্চরাত্র, পুরুষসিংহ, সিংহাসন, লোকদেখান, ধনিগণ, ভ্রাতুষ্পুত্র, সুখশান্তি, নিখুঁত, গৃহজাত, গাছপাকা, বধূবর, ছাগদুগ্ধ, সস্ত্রীক, কোলাকুলি, খেচর, মধুকর।

তৃতীয় পর্ব

শব্দ প্রকরণ

প্রথম অধ্যায়

শব্দ ও পদের পার্থক্য

অর্থবিশিষ্ট ধ্বনি বা ধ্বনির সমষ্টির নাম শব্দ। ব্যাকরণশাস্ত্র অর্থবিশিষ্ট শব্দেরই বিচার করিয়া থাকে। নিরর্থক শব্দের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই।

সার্থক শব্দ চার প্রকারঃ—**ধাতু, প্রাতিপদিক, পদ** এবং **প্রত্যয়।**

ক্রিয়াবাচক কর্, চল্, যা, খা, প্রভৃতিকে **ধাতু** বলে। **অধিকাংশ শব্দের মূলে রহিয়াছে ধাতু।** এমন কতকগুলি **দেশী শব্দ** প্রাগার্য যুগ হইতে ভারতীয় ভাষায় চলিতেছে যাহাদের মূল অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা যায় না। এই শব্দগুলি এবং সংস্কৃত ভাষায় প্রচলিত অনেক শব্দের মূল বাহির করা যায় না এবং মূলের সহিত কোন প্রত্যয় প্রয়োগ করা চলে না। এই সকল শব্দকে **অব্যুৎপন্ন** শব্দ বলে। যেমন বাঙলা ভাষায় প্রচলিত চাঙ্গা শব্দ। বাঙলা অর্থ সুস্থ, সবল। প্রাকৃত ভাষায় চঙ্গ রূপে ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহার অর্থ—'সুন্দর'। কিন্তু ইহার মূল কোন্ ধাতু তাহা আমরা জানি না এবং সেই অজ্ঞাত ধাতুর সহিত প্রত্যয়ও যুক্ত করা সম্ভবপর নহে।

ধাতু, প্রত্যয়, প্রত্যয়ান্ত ছাড়া অর্থবিশিষ্ট শব্দকে **প্রাতিপদিক** বলে।

ধাতুর উত্তর ক্রিয়াবিভক্তি (যথা ই, ইতেছে ইত্যাদি) যোগ করিলে ক্রিয়াপদ হয়। কর্ ধাতু+ই=(আমি) 'করি' একটি পদ। 'করি' পদের মূলে কর্ ধাতু আছে।

এই (কর্ ধাতুর মূলে) 'কৃ' ধাতুর উত্তর+(কর্মবাচ্যে) ক্তি প্রত্যয় যোগ করিলে 'কৃতি'—প্রাতিপদিক হয়—অর্থ 'কর্ম'। ইহা কৃদন্ত প্রাতিপদিক কেননা **কৃৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দও প্রাতিপদিক।**

বাংলা শব্দসম্ভার, শব্দদ্বৈত ও ভিন্নার্থক সদৃশ শব্দ অন্যত্র আলোচনা করা হইয়াছে।

ধাতুর উত্তর ক্রিয়াবিভক্তি ছাড়া যখন অন্য প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠিত হয় তখন সেই সকল প্রত্যয়কে **কৃৎ-প্রত্যয় বলে।** উপরের উদাহরণে—তি প্রত্যয় কৃৎ-প্রত্যয়।

এই কৃতি শব্দের উত্তর **(প্রাতিপদিকের উত্তর)**+মৎ (মতুপ্,) প্রত্যয় (প্রশংসার্থে) যোগ করিলে আবার আর একটি প্রাতিপদিক হয়। উহা হইতেছে তদ্ধিতান্ত প্রাতিপদিক। **যথা** 'কৃতিমৎ'—প্রথমার একবচন অর্থাৎ **নাম** বিভক্তি যোগ করিলে উহা হয় নামপদ। যথা 'কৃতি-মান্' (প্রশংসনীয় কাজ যে করে বা করিয়াছে।)

'কৃতি'—এই প্রাতিপদিকটিকে পদরূপে পরিণত করা যায়। নামবিভক্তি যোগ করিলে উহা হয় **নামপদ।** যথা **'কৃতিদ্বারা'।**

সুতরাং নামবিভক্তি যুক্ত প্রাতিপদিক **নামপদে** এবং ক্রিয়া বিভক্তি যুক্ত ধাতুই **ক্রিয়াপদে** (আখ্যাতে) পরিণত হয়।

ধাতু ও প্রাতিপদিককে ব্যাকরণ শাস্ত্রে **প্রকৃতি** বলে। 'প্র' প্রথমে করা হয়—স্থাপন করা হয় যাহাকে তাহা প্রকৃতি। শব্দের বা পদের প্রথম অংশ প্রকৃতি এবং তাহার পরের অংশ **প্রত্যয়।** যথা 'রামকে'—এই পদে 'রাম' (প্রকৃতি)।কে (প্রত্যয়—বা নাম বিভক্তি)।

'করি' পদের প্রথম অংশ 'কর্' (ধাতু প্রকৃতি)+ই (প্রত্যয় বা ক্রিয়া-বিভক্তি)। অতএব 'করি' **ক্রিয়াপদ।**

অর্থবিশিষ্ট হইলেও প্রত্যয়গুলি স্বাধীনভাবে ভাষায় ব্যবহৃত হইতে পারে না। তাহারা ধাতু বা প্রাতিপদিকের উত্তর বসিয়া শব্দ বা পদ গঠন করে। আর প্রকৃতিরও (ধাতু এবং প্রাতিপদিক) স্বাধীনভাবে ভাষায় ব্যবহৃত হইবার যোগ্যতা নাই। প্রকৃতি যখন পদে পরিণত হয় তখন ভাষায় উহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। 'করি' পদের 'কর্' ধাতু বা—ই প্রত্যয় দ্বারা কোন বাক্য গঠিত হইতে পারে না। যদি বলা হয়—'তুই' কাজ কর্—এখানে কর্‌এর সহিত তো কোন প্রত্যয় নাই। ইহা কিরূপে বাক্যে ব্যবহৃত হইল? উত্তর হইতেছে মধ্যম পুরুষের বিভক্তি এখানে বিলুপ্ত হইয়াছে বা শূন্য বিভক্তি হইয়াছে। বিভক্তি লোপ হইলেও বিভক্তির কাজ হয়।

শুধু কৃৎপ্রত্যয়ান্ত শব্দই প্রাতিপদিক নহে—অনেক অব্যুৎপন্ন প্রাতিপদিকের উত্তরও প্রত্যয়যোগে নূতন তদ্ধিতান্ত প্রাতিপদিক গঠিত হইয়া থাকে। যেমন বাবু+গিরি (তদ্ধিত প্রত্যয়—ভাব বা কার্য অর্থে—বাবুর ভাব)=বাবুগিরি।

অর্থানুসারে শব্দ বা প্রাতিপদিকের বিভাগ

(১) যৌগিক প্রাতিপদিক ঃ প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থদ্বারা যে প্রাতিপদিকের (শব্দের) অর্থ নির্ধারণ করা যায় তাহাকে যৌগিক শব্দ বলে—যথা 'কারক'√কৃ ধাতু (প্রকৃতি)র অর্থ 'করা' অক প্রত্যয়ের অর্থ কর্তা উভয়ে মিলিয়া (কৃ+অক) অর্থ হইল—'যে করে',—√সেবা+ আইত—সেবাইত,-যে সেবা করে,√খেল+অনা (করণ বাচ্যে) যাহাদ্বারা খেলা যায় (খেলনা)।

(২) যোগরূঢ় প্রাতিপদিক ঃ যে শব্দের অর্থ নির্ণয়ে প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের মিলিত অর্থ বা সমস্ত পদের অর্থ সামান্যার্থে ব্যবহৃত না হইয়া একটি বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে তাহাকে যোগরূঢ় শব্দ বলে—যথা **পঙ্কজ—পঙ্ক+√জন্+ড=পঙ্কে জন্মে যে—ইহা পঙ্কে জাত** অন্যান্য বস্তুকে না বুঝাইয়া শুধু পদ্মকেই বুঝায়, বিমর্ষ—বি√মৃষ্+অসংস্কৃত ভাষায়

বিচারার্থক√মৃষ ধাতু বি—উপসর্গযোগে বিশেষ বিচার—কিন্তু বাঙলায় দুঃখিত। **প্রবীণ** বলিতে যে ব্যক্তি ভাল বীণা বাজাইতে পারে। কিন্তু ইহা ব্যবহৃত হয় অভিজ্ঞ অর্থে।

(৩) রূঢ় প্রাতিপদিক ঃ প্রকৃতি প্রত্যয় দ্বারা শব্দের অর্থ নির্ধারিত না হইয়া যেখানে একটি বিশেষ অর্থে শব্দের ব্যবহার চলিয়া আসিয়াছে তাহাকে রূঢ় শব্দ বলা হয়—**মণ্ডপ** শব্দের অর্থ মাড় (ভাতের মাড়) পান করে যে—কিন্তু ইহা গৃহার্থে রূঢ়। অর্থী **শব্দের** যৌগিকার্থ যাহার টাকা (অর্থ) আছে—কিন্তু যাহার টাকা নাই -অর্থাৎ যে যাচক তাহাকে **অর্থী** বলে।

অনুশীলনী

১। শব্দ ও পদের পার্থক্য কি তাহা বুঝাও।

২। অব্যুৎপন্ন শব্দ কাহাকে বলে উদাহরণসহ বুঝাও।

৩। উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর ঃ—যোগরূঢ় শব্দ, রূঢ়শব্দ, প্রকৃতি, ধাতু, প্রাতিপদিক।

৪। শব্দ, পদ ও বিভক্তি কাহাকে বলে, এবং ইহাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও। (উঃ মাঃ ১৯৬০ কম)

দ্বিতীয় অধ্যায়

কৃৎপ্রত্যয

ধাতুর উত্তর ক্রিয়া-বিভক্তি ব্যতীত অন্য যে সকল প্রত্যয় দ্বারা প্রাতিপদিক গঠিত হয় তাহাদিগকে কৃৎপ্রত্যয় বলে। ক্রিয়াবাচক√কর্, স্থা (থাকা) প্রভৃতি শব্দকে **ধাতু** বলে। অধিকাংশ শব্দের মূলে কোন না কোন ধাতু রহিয়াছে।

[ক] সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয়

সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয দ্বারা তৎসম শব্দ গঠিত হইয়া থাকে। **তব্য, অনীয়, য প্রত্যয়—** ধাতুর উত্তর ঔচিত্যার্থে এই প্রত্যয়গুলি কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে হয়। **ভবিষ্যৎ কালের অর্থে** ইহারা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। [ইহারা বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ গঠন করে]

তব্য কৃ+তব্য (কর্মবাচ্যে)—কর্তব্য (করা উচিত, করিতে, হইবে)। গম্+তব্য=গন্তব্য, শ্রু=তব্য=শ্রোতব্য, পঠ্+তব্য=পঠিতব্য। **অনীয়** স্মৃ+অনীয়=স্মরণীয় (স্মরণ করার যোগ্য, মনে রাখিতে হইবে)। বৃ+অনীয়=বরণীয় পা+অনীয়=পানীয (পানের যোগ্য)। অথবা যাহাকে পান করা যাইতে পারে—(জল বিশেষ)।

—য (—ণ্যৎ, —ক্যপ্ —য)

য পা+যৎ=পেয়। দা+যৎ=দেয। মা+যৎ=মেয়। হা+যৎ=হেয (ত্যাগ করিবার যোগ্য, ঘৃণিত—বিশেষণ)। কৃ+য (ণ্যত্)—কার্য। ধৃ+য (ণ্যৎ)=ধার্য। বচ্ (ব্রূ ধাতু)+য (ণ্যৎ)= বাচ্য, বাক্য। বাচ্য—যাহা বলা উচিত—বাক্য (কতকগুলি সার্থক অন্বিত পদের সমষ্টি) শক্য। সহ্য। √বহ্+য (ণ্যৎ)=বাহ্য। √হন্+য (স্ত্রীলিঙ্গে)=হত্যা।

(ব্রূ) বচ্+য (ণ্যৎ)—বাচ্য, পচ+য (ণ্যৎ)=পাচ্য, ভৃ+য (ণ্যৎ)=ভার্যা (ভরণের যোগ্যা। **কৃ+য (কর্মবাচ্যে)=কৃত্য**—করিবার যোগ্য, ভৃ+য (ক্যপ্)=ভৃত্য, ঋ+য (ণ্যৎ)=আর্য, আ—চর্+য (ণ্যৎ)=আচার্য, বি—চর্=য (ণ্যৎ)=বিচার্য, ভুজ্+য (ণ্যৎ)=ভোজ্য (খাদ্যদ্রব্য), ভুজ্+

য (ণ্যৎ)=ভোগ্য (ভোগের বস্তু)। দৃশ্+য (ক্যপ্)=দৃশ্য। -অনীয় প্রত্যয় কখন কখন কর্তৃবাচ্যে ও সম্প্রদান বাচ্যে হইয়া থাকে ঃ—লুভ্+অনীয়=লোভনীয় (কর্তৃবাচ্যে, যে প্রলুব্ধ করে) 'কাজটি আমার লোভনীয়' কাজটি আমাকে প্রলুব্ধ করিতেছে। √দা+অনীয় (দানের পাত্র—যে ব্যক্তিকে দেওয়া যায়। যথা—'দানীয় ব্রাহ্মণ', সম্প্রদান বাচ্যে 'অনীয়' প্রত্যয়। √শুচ্+অনীয়=শোচনীয়। √পালি+অনীয় পালনীয়। পূজ্+অনীয়=পূজনীয়।

শতৃ ও শানচ্ প্রত্যয় (শতৃ=অৎ, শানচ্=আন) বিশেষণ)

বর্তমান কালে ধাতুর উত্তর শতৃ ও শানচ্ প্রত্যয় হয়। এই দুই প্রত্যয়দ্বারা গঠিত পদ কৃদন্ত বিশেষণ হইয়া থাকে। ইহারা শব্দের অন্তে অৎ এবং আন রূপে বর্তমান থাকে। সাধারণতঃ এই দুই প্রত্যয়-যাহাদের অন্তে থাকে সেই সমস্ত পদ সমাসে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাঙলায় সকল সংস্কৃত ধাতু হইতে গঠিত—অৎ প্রত্যয়ান্ত পদের প্রয়োগ হয় না। চল্+অৎ (শতৃ) চলৎ (চলৎ (চলৎ+শক্তি—চলচ্ছক্তি, কিন্তু 'চলৎশক্তি রহিত' লেখা হয়।) অস্+অৎ (শতৃ) সৎ সতী। ভূ+অৎ (শতৃ)—ভবৎ, ভবতী। জ্বল্+অৎ (শতৃ)=জ্বলৎ+চিতা (জ্বলচ্চিতা' মধ্যবর্তী')। গল্+অৎ (শতৃ)=গলৎ ('গলদশ্রু')। √বিদ্+শতৃ=√বিদ্+ (শতৃ স্থানে) বস্-বিদ্বস্>বিদ্বান্।

—আন প্রত্যয় (অ-কারের পর মান)

আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে এবং পরস্মৈপদী ধাতু এবং আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে শানচ্ প্রত্যয় হয়। সেব্+শানচ্—সেবমান (কর্তৃবাচ্যে), সেব্যমান (কর্মবাচ্যে)। দৃশ+(কর্মবাচ্য) শানচ্-দৃশ্যমান (জগৎ)। বিদ্+শানচ্ বিদ্যমান। বর্তমান। যঙ্ (পৌনঃ পুন্যার্থে) প্রত্যয়ান্ত ধাতুও আত্মনেপদী। ইহাদের উত্তর ও শানচ্ প্রত্যয় যোগে বিশেষণ গঠিত হয়। পুনঃ পুনঃ কাঁদিতেছে যে (স্ত্রী) রুদ+যঙ্—রোরুদ্য+শানচ্+আ—রোরুদ্যমানা (জননী)। মর্মরায়মাণ বেণু কুঞ্জ (রবীন্দ্রনাথ)। শ্যামায়মান বনভূমি (যাহা ক্রমশঃ শ্যামবর্ণ ধারণ করিতেছে শ্যাম+কাঙ্+শানচ্ কর্তৃবাচ্যে।

ভ্রম্ ধাতুর উত্তর কর্তবাচ্যে শানচ্ প্রত্যয় হয় না। সুতরাং 'ভ্রাম্যমান' শব্দ শুদ্ধ নয় [ভ্রম্ ধাতু সংস্কৃতে পরস্মৈপদী] শব্দ+কাঙ্+শানচ্-শব্দায়মান, নী+শানচ্ (কর্মবাচ্যে)= নীয়মান। প্রবহ্, চল্ ধাতুর উত্তর শানচ্ হয় না, শতৃ হয়। সুতরাং 'চলমান', 'প্রবহমান', ব্যাকরণ-অনুসারে অচল। (আত্মনেপদী) দোলায়+শানচ্ (কর্তবাচ্যে-দোলায়মান। অপ—সৃ+ণিচ+শানচ্ (কর্মবাচ্য=অপসার্যমান। শী+শানচ্ (কর্তৃবাচ্যে—শয়ান। ('বোতাম আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান'—রবীন্দ্রনাথ) আস্ (বসা)+শানচ্=আসীন। ('বাণী শুভ্র কমলাসীনা'—'সেথায় আমি কি গাহিব গান')। মৃ+শানচ্ (কর্তৃবাচ্যে)-ম্রিয়মাণ যজ্+শানচ্-যজমান। বৃধ্+শানচ্-বর্ধমান। পুনঃ পুনঃ দুলিতেছে—দোদুল্যমান√দুল্+ যঙ্+শানচ্।

—ণক (অক), (কর্তৃবাচ্যে) (বিশেষণার্থক)

ধৃ+অক-ধারক, কারক পাঠক (পঠ্+অক) জনক, গায়ক, নায়ক (নী+অক), চালক পাবক, দায়ক, তারক, প্রতারক, (প্রা+তৃ (তারি)+অক), তারক (ত্রাণকর্তা)। কিন্তু 'প্রতারক' =প্রবঞ্চক, উপসর্গযোগে ধাতুর (১) অর্থের পরিবর্তন) খন্+অক=খনক, রজক, ঘটক।

-তৃচ্, -তৃন্ (কর্তৃবাচ্যে) (বিশেষণ)

দা+তৃ=দাতৃ, কর্তা, হর্তা বিধাতা, সবিতা (সু+তৃচ্)। শমিতা (যজ্ঞে বধকারী শময়িতা (অন্যত্র) মাতা, পিতা, দুহিতা ও জনয়িতা (বেদে জনিতা)। নী+তৃচ নেতা বুধ্+তৃচ্=বোদ্ধা। শ্রু+তৃচ্=শ্রোতা। ত্রৈ+তৃচ্=ত্রাতা।

—অ প্রত্যয়

(১) প্রত্যয়ান্ত ধাতুর (যথা সনন্ত ধাতু) উত্তর ভাববাচ্যে 'অ' প্রত্যয় হয়। অ প্রত্যয়ান্ত পদ আকারন্ত (স্ত্রীলিঙ্গ) হয়। ইহা বিশেষ্য পদ। করিবার ইচ্ছা—চিকীর্ষ+অ (আ) চিকীর্ষা, √কিৎ>চিকিৎস্। অ-চিকিৎসা, শুশ্রূষা—শ্রু+সন্+অ (ভাবে) শুশ্রূষা শুনিবার ইচ্ছা, সেবা। জিঘাংসা, মীমাংসা জিজ্ঞাসা—জ্ঞা (সন্) জিজ্ঞাস্+অ জানিবার ইচ্ছা, পিপাসা =পান করিবার ইচ্ছা। জিগীষা=জয় করিবার ইচ্ছা। বুভুক্ষা।

(২) দীর্ঘস্বর যুক্ত ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর উত্তরও অ-প্রত্যয় হয়। √শিক্ষ্+অ (ভাবে) শিক্ষা—শেখা, দীক্ষা হিংসা, শঙ্কা (ভয় পাওয়া) প্রশংসা, লেখা রেখা ইত্যাদি। ইহা ছাড়া অন্য ধাতুর উত্তর ও এই প্রত্যয়যোগে বিশেষ্য পদ গঠিত হয়। √কৃপ+অ কৃপা, ত্বর+অ =ত্বরা 'এসো এসো ত্বরা' দোলা, তৃষা (হৃদয় তৃষায় হানে') ক্ষার, চিন্তা, পূজা চর্চা (পরচর্চা)। আ+√জ্ঞা+অ-আজ্ঞা। প্রতিজ্ঞা। অবজ্ঞা।

—অন (ল্যু) কর্তৃবাচ্যে (বিশেষণ-বিশেষ্য)

দহ্+অন—দহ—দহন (দাহকারী "এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো।" (রবীন্দ্রনাথ)। (শুভ্+ণিচ) শোভি+অন—শোভন (সুশোভন, অশোভন)। (লুভ্+ণিচ, লোভি+অন-লোভন (স্বর্ণে রত্নে শোভন লোভন জানি বর্ণে বর্ণে রচিত'- রবীন্দ্রনাথ)। কুপ্+অন=কোপন (স্বভাবকোপন দুর্বাসা)। তপ্+অন=তপন নন্দি+তান নন্দন।

—অন (অনট্, ল্যুট্) ভাববাচ্যে (ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্য)

গম্+অন (ভাবে)-গমন (যাওয়া)। শুধু ক্রিয়ার অর্থ যেখানে বুঝায় সেখানে ভাব-বাচ্য হয়। গম্ (ধাতুর অর্থ যাওয়া)। অন প্রত্যয় (ভাববাচ্যে) গমন অর্থও যাওয়া। সুতরাং ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর স্বার্থে প্রত্যয় হয় (নিজের অর্থে)—ভোজন, শয়ন, দান করণ, বরণ, হরণ, ভরণ পোষণ, মরণ, গমন, পান ও বচন। ভুজ্+অন (ভাবে) ভোজন, অশন, শয়ন, (শী+অন), বচন, বিরচন বিলেপন, আলিম্পন (আলপনা), সেচন (সিচ্+অন, বৈষ্ণব কবিরা এবং গদ্যে বঙ্কিমচন্দ্র 'সিঞ্চন' ব্যবহার করিয়াছেন)। মিল্+অন মেলন (সম্মেলন কিন্তু 'মিলন' শব্দ সংস্কৃত ও বাঙলায় আছে—বাঙলায় ইহাই চলে বেশি)। করণ, ধরণ, ভরণ, মরণ, পঠন (পড়া), পাঠন (পড়ান) [বাহন, যান—করণ বাচ্যে], শী+অন (অধিকরণ বাচ্যে)=শয়ন (শয্যা), স্থান (স্থা+অন—অধিকরণে—যেখানে থাকে। ভবণ, বসন, (করণ-বাচ্যে), ঘ্রাণ, ('গন্ধ, কিন্তু নাসিকা অর্থে ঘ্রা+অন করণবাচ্যে)।

ইষ্ণু প্রত্যয় (স্বভাব অর্থে (কর্তৃবাচ্যে) বিশেষণ)

সহ+ইষ্ণু=সহিষ্ণু (সহনশীল) নিরাকরিষ্ণু, বৃধ+ইষ্ণু—বর্ধিষ্ণু (গ্রাম), চরিষ্ণু ক্ষয়িষ্ণু (সমাজ)। এই অর্থে—স্নু, - জি+স্নু=জিষ্ণু (জয়শীল), স্থাস্নু (স্থিতিশীল)।

—ক্ত প্রত্যয় (=ত) (কর্তৃ কর্ম ভাব, অধিকরণ বাচ্যে) (বিশেষণে)

অতীতকালের কৃদন্ত-বিশেষণ বাঙ্‌লায় সংযুক্ত ক্রিয়া গঠন করে।

গম্‌+ক্ত গত (কর্তৃবাচ্যে) চলিত, পতিত, (কর্তৃবাচ্যে) কর্মবাচ্যে হৃত; মত (কর্মবাচ্যে মন+ক্ত)। দৃশ+ক্ত-দৃষ্ট, পৃষ্ট, শিষ্ট, অভীষ্ট, তুষ্ট, স্পষ্ট, ঘৃষ্ট, পিষ্ট। ছিদ্‌+ক্ত=ছিন্ন, ভিন্ন, ক্লিন্ন, আপন্ন, (আ+পদ্‌-ক্ত), বিপন্ন, সম্পন্ন। কৃ+ক্ত=কীর্ণ, বিকীর্ণ, সংকীর্ণ, জীর্ণ, শীর্ণ। স্বীকৃ+ক্ত স্বীকৃত (বিঃ) (স্বীকার)। পচ্‌+ক্ত-পক্ব (প্রকৃতপক্ষে -এখানে পচ্‌ ধাতুর উত্তর -ব প্রত্যয় হইয়াছে। পচ্‌+ক্ত=*পক্ত হয়। [কিন্তু 'পক্ত' পদ সংস্কৃত ভাষায় লোপ পাইয়াছে' বাঙ্‌লায় 'পোক্ত' হইয়া আছে।] সিচ্‌+ক্ত-সিক্ত। রিচ্‌+ক্ত+রিক্ত, বিবিক্ত, মুক্ত (মুচ্‌+ক্ত)। শুষ ক্ত=শুষ্ক কিন্তু এখানেও প্রকৃতপক্ষে শুষ্‌ ধাতব উত্তর--'ক' প্রত্যয় হইয়াছে। শুষ্‌ ধাতুর উত্তর+ক্ত প্রত্যয় করিলে পদ হয়* শুষ্ট যেমন হয় 'দৃষ্ট', 'তুষ্ট', 'পিষ্ট'। *শুষ্ট সংস্কৃতে বিলুপ্ত প্রাকৃত 'শুট্‌ঠ' হইয়া বাঙ্‌লায় 'শুঁঠ', (শুঠ) পর্বে বাঙ্‌লায়—**শুঠা** বা **শুটা** (মুড়ি, বেগুন প্রভৃতি শব্দের বিশেষণ) হইয়াছে। শী+ক্ত (কর্তৃবাচ্যে) **শায়িত**। **শায়িত** (কর্মবাচ্যে ণিজন্ত 'যাহাকে শোয়াইয়া দেওয়া হইয়াছে)। **অধিকরণ বাচ্যে**—'শয়িত' অর্থ শয্যা (যাহাতে শোয়া যায়) শয়িত (ভাববাচ্যে)=শয়ন, শোওয়া। হস্‌+ক্ত (কর্তৃবাচ্যে) হসিত—সে হাসিয়াছে 'জ্যোৎস্নাহসিত নীল আকাশে' (চন্দ্রগুপ্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল) ভাববাচ্যে-হসিত-হাসি। চল্‌+ক্ত (কর্তৃবাচ্যে)—চলিত ('আদি কর্মে' -ক্ত' প্রত্যয়। 'চলিত ভাষা' (যাহা চলিতেছে)। আদিকর্ম যে ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে)। ক্ষি+ক্ত =ক্ষীণ ('ক্ষীণ স্বচ্ছ শান্ত সরস্বতী'—রবীন্দ্রনাথ)।

—ক্তি (তি) (ভাববাচ্যে কর্মবাচ্যে, করণবাচ্যে, অধিকরণবাচ্যে) (বিশেষ্যে)

মন্‌+ক্তি মতি, বুধ ক্তি-বুদ্ধি, স্মৃতি (স্মৃ+ক্তি), কৃতি, (কৃ+ক্তি), কীর্তি (কৃৎ+ক্তি), 'অশোক যাহার কীর্তি ছাইল', শান্তি (√শম্‌ ধাতু হইতে) শ্রান্তি, ক্লান্তি, ভ্রান্তি, ('তবুও তোমার দূতে অমলিন শ্রান্তিক্লান্তিহীন'—শাজাহান), গতি (গমন ভাববাচ্যে) গতি আশ্রয় অধিকরণ বাচ্যে 'ঈশ্বর আমার একমাত্র গতি'—নীতি। সৃজ+ক্তি=সৃষ্টি **(কর্মবাচ্যে অর্থ** সৃষ্টবস্তু ভাববাচ্যে সৃষ্টিক্রিয়া)। দীপ+ক্তি-দীপ্তি (ভাবে), সম্‌+পদ্‌+ক্তি **(করণবাচ্যে)** =সম্পত্তি (যাহার দ্বারা সম্পদ্‌ লাভ হয় এমন সামগ্রী) 'শম, দম প্রভৃতি ছয়টি **সম্পত্তি'**— (যাহার দ্বারা পরমবস্তু লাভ হয়) সিধ+ক্তি-সিদ্ধি **(কর্মবাচ্যে**—সাধনলব্ধ বস্তু, ভাববাচ্যে =সাধন করা)।

ক্বিপ্‌ (ক্বিপ্‌ প্রত্যয়ের কিছুই থাকে না) (বিশেষণ-বিশেষ্য)

কর্তৃবাচ্যে সকল ধাতুর উত্তর ক্বিপ্‌ প্রত্যয় হয়। পরি—সদ্‌—ক্বিপ্‌=পরিষৎ (পরি (তঃ) চারিদিকে (লোকে) বসে (সদ্‌ ধাতু) যাহার (চারিদিকে একত্র হইয়া বসে যাহারা)। সম্‌+সদ্‌ +ক্বিপ্‌=সংসৎ (সংসদ্‌) ইন্দ্র—জি+ক্বিপ্‌=ইন্দ্রজিৎ (ইন্দ্রকে জয় করে যে), গম+ক্বিপ্‌= জগৎ (যাহা চলে—জগৎ সর্বদাই চলিতেছে)। সম্‌+পদ্‌+ক্বিপ্‌=সম্পৎ, আপৎ, বিপৎ (বাঙ্‌লায় প্রথমার একবচন 'ৎ' দিয়া লেখা হয়)। সেনা—নী+ক্বিপ্‌=সেনানী। ভাষা+বিদ্‌+ ক্বিপ্‌=ভাষাবিৎ। বি—দ্যুৎ+ক্বিপ্‌=বিদ্যুৎ। সম্‌—রাজ্‌+ক্বিপ্‌=সম্রাট্‌।

আলু—শীলার্থে আলু প্রত্যয় হয় (বিশেষণ)

নি—দ্রা+আলু=নিদ্রালু। শ্রৎ—ধা+আলু=শ্রদ্ধালু। দয়া+আলু=দয়ালু (দয়া করার স্বভাব যার—যে স্বভাবতঃ দয়া করে)।

—র প্রত্যয় (কর্তৃবাচ্যে শীলার্থে-র প্রত্যয়) (বিশেষণ)

নম্+র=নম্র (স্বভাবতঃ যে নত হয়)। কম্প্+র=কম্প্র (কম্পনশীল), 'কম্প্রবক্ষে নম্র নেত্রপাতে' ('উর্বশী'—রবীন্দ্রনাথ) নঞ্—জস্+র=অজস্র।

—উ প্রত্যয় (বিশেষণ)

শীলার্থে সন্নন্ত ও অন্যান্য কয়েকটি ধাতুর উত্তর—উ হয়, জিজ্ঞাসু।

জি+সন্+উ=জিগীষু (জয়শীল) পিপাসু, বুভুক্ষু, অনুসন্ধিৎসু, লিপ্সু (লাভ করিতে ইচ্ছুক)। ভিক্ষ্+উ=ভিক্ষু (ভিক্ষা করা স্বভাব যাহার, যে স্বভাবতঃ ভিক্ষা করে)।

—ইন্ (ণিনি প্রত্যয়) (শীলার্থে কর্তৃবাচ্যে)

উপপদের পর ধাতুর উত্তর এই প্রত্যয়যুক্ত কৃদন্ত পদের সহিত উপপদ সমাস হয়। সমাস ছাড়াও এই প্রত্যয় হইতে পারে—উপকারী (উপকার করা স্বভাব ইহার), স্থায়ী, হারী। তৃণ—ভুজ+ইন্ (ণিনি)=তৃণভোজী (প্রাণী)। হৃদয়—গ্রহ্+ইন্ (ণিনি)=হৃদয়গ্রাহী। সত্য—বদ্+ইন্ (ণিনি)=সত্যবাদী। ব্রহ্ম—বদ্+ইন্ (ণিনি)=ব্রহ্মবাদী, অরণ্যচারী, ব্রহ্মচারী।

—অণ্ প্রত্যয়, ট, অচ্ (বিশেষণ)

কর্মোপপদে ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে অ (অণ্)—অ (ট), (অচ্) প্রত্যয় হয় এবং সমগ্রপদ উপপদ সমাসের পদ হয়। কর্ম+কৃ+অণ্=কর্মকার, সূত্রধর, মালাকার, চর্মকার, বেশকার। দিবা+কৃ+অ (ট)=দিবাকর। নিশা+চর্+অ=নিশাচর। নিশাকর, প্রভাকর, ভাস্কর, তস্কর, দুঃখকর, অংশহর, বিত্তহর। মনস্+হৃ+অ (চ্)=মনোহর।

—ঘঞ্, অপ্, অচ্=অ (বিশেষ্য)

কর্তৃভিন্ন বাচ্যে ধাতুর উত্তর উল্লিখিত প্রত্যয়গুলি হয়। পচ্+অ (ঘঞ্)=ভাব-বাচ্যে পাক। ত্যাগ, (ত্যজ্+ঘঞ্), রাগ, অনুরাগ, বিরাগ, প্রতিকার (প্রতি+কৃ+ঘঞ্), নি+হৃ+ঘঞ্=নীহার, প্রহার, আহার, বিহার, প্রাকার। নী+অ (অচ্)=নয়। জি+অ (অচ্)=জয়। লী+অচ্=লয়। ক্ষি+অ (অচ্)=ক্ষয়। চি+অচ্=চয়। লু+অ (অপ্)=লব। ভী+অচ্=ভয়। ভৃ+অ (অপ্)=ভর, কৃ+অপ (করণবাচ্যে) কর (হাত—যাহা দ্বারা করা যায়)। স্তু+অপ্=স্তব (শুনিনু তোমার স্তবের মন্ত্র,—রবীন্দ্রনাথ)। রু+অপ্=রব ('কাঁপিছে কানন ঝিল্লীর রবে')।

—ক প্রত্যয় (=অ) কর্তৃবাচ্যে) (বিশেষণ-বিশেষ্য)

মধু—পা+ক=মধুপ গো+পা+ক=গোপ, সু-স্থা+ক=সুস্থ, প্রী+ক=প্রিয়, প্রকৃতি-স্থা+ক=প্রকৃতিস্থ।

—ড প্রত্যয় (=অ) (বিশেষণ-বিশেষ্য)

জল—জন্+ড=জলজ, পঙ্কজ, সরোজ, মনসি—জন্+ড=মনসিজ, বন+জন্+ড=বনজ, সহজ, আত্মজ, দেশজ, মলয়জ।

—খল্ (অ)—বিশেষণ

সুখার্থক 'সু',—দুঃখার্থক দুঃ (দুস্) শব্দের পর ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে খল্ (অ)

প্রত্যয় হয়। সুখে যাহা করিতে পারা যায়—**'সুকর'**=সু√কৃ+খল্ (কর্মবাচ্যে **দুষ্কর—**দুঃখের সহিত যাহা করিতে পারা যায় দুস্+√কৃ+খল্, দুর্গম—দুর্+√গম্+খল্। (যেখানে কষ্টে যাওয়া যায়—দুঃ+তৃ+খল- দুস্তর, যাহাকে কষ্টের সহিত অতিক্রম করা যায়। সুগম।

—খচ্ (অ) বিশেষণ

কর্মোপপদে ধাতুর উত্তর খচ্ প্রত্যয় হয়—প্রিয়—√বদ্+খচ্ (স্ত্রীলিঙ্গে) প্রিয়ংবদা প্রিয় বাক্য বলে যে ('প্রিয়ম্বদা' নহে) 'বশংবদ' (=অধীন)।

খশ্ (অ) (কর্তৃবাচ্যে) (উপপদ তৎপুরুষের পদ হয়।) (বিশেষণ)

মর্ম (ন্)—তুদ্ (পীড়া দেওয়া)+খশ্=মর্মন্তুদ (হৃদয় পীড়াদায়ক) মর্মন্তুদ ঘটনা। জনমেজয়, অসূর্য-দৃশ্+খশ্- **অসূর্যম্পশ্যা** (যে স্ত্রীলোক কখনও সূর্য দর্শন করে নাই—অন্তঃপুরে অবরুদ্ধা, ('অসূর্যম্পশ্যা রাজমহিষী')। পণ্ডিত—মন্+খশ্=**পণ্ডিতম্মন্য** (যে নিজেকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করে)।

—টক্ (বিশেষণ=অ)

~~কুল+হন্+টক—কুলঘ্ন, কৃতঘ্ন—কৃত+হন্+টক্~~।

[খ] বাঙ্লা কৃৎ প্রত্যয়

—অ প্রত্যয় (এই প্রত্যয়যোগে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠিত হয়)। ইহার উচ্চারণ হয় না। কাট্+অ-কাট্ ছাট্+অ=ছাট্, ধর্+অ-ধর্, পাকড়্+অ=পাকড়, নাচ্+অ—নাচ, পুছ্+অ-পোছ্ ঝাড়্+অ=ঝাড়্, ঝাট্।

—অ (উচ্চারিত) অথবা ও বা উ (বিশেষণ)

কাঁদ+অ=কাঁদ কাঁদ, মরো মরো। ডুবু (ডুব্+উ), ("রশ্মিরসে ডুবুডুবু বন"—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)। নিব্+উ-নিবুনিবু ("দীপখানি তব নিবুনিবু করে পবনে"—রবীন্দ্রনাথ)। পড়্ (পত্+অ)—পড় পড়, ('মাথার উপরে বাড়ি পড় পড়'—রবীন্দ্রনাথ)।

—অন প্রত্যয় (-ওন) ভাববাচ্যে—(ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য)

খা+অন=খাওন, যা+অন-যাওন, থাক্+অন=থাকন, কান্দ্+অন=কান্দন, ধরন, ধারণ, ঝাড়্+অন=ঝাড়ন (করণবাচ্যে—যাহা দ্বারা ঝাড়া যায়)। শুন্+অন-শুনন। উজা+অন= উজান। ফল্+অন=ফলান।

—অনা (=না) (বিশেষ্য)

কাঁদ+অনা=কান্না, রাঁধ+অনা—রান্না, বাড়্+অনা=বান্না, কর+অনা=কন্না, (ঘর-কন্না) বাট্+অনা—বাটনা (যাহাকে বাটা যায়—কর্মবাচ্যে, ডল্+অনা=ডলনা (যাহা দ্বারা ডলা যায়—করণবাচ্যে—ডলিবার কাঠিবিশেষ—পূর্ববঙ্গে), পা+অনা—পাওনা, ফেল্+অনা=ফেলনা (কর্মবাচ্যে—যাহাকে ফেলা হয়, খেল+অনা=খেলনা (করণবাচ্যে—যাহাদ্বারা খেলা যায়), বেল্+অনা=বেলনা (বেলুন—করণবাচ্যে—যাহা দ্বারা বেলা যায় (পূর্ববঙ্গে), বাজ্+অনা= বাজনা।

অনী (আনি) (স্বর-সংগতিতে—উনি) (বিশেষণ)

নাচ্+অনী=নাচুনী, (কর্তৃবাচ্যে), রাঁধ্+অনী=রাঁধুনী (রন্ধন কর্তা), ঢাক্+অনী= ঢাকনী, ঢাকুনি, ছিদ্+অনী=ছেদনী, (ছেদনিকা, ছেনী)।

-অন্ত

সংস্কৃত শতৃ প্রত্যয়ে বর্তমান কালবোধক কৃদন্ত বিশেষণ গঠিত হয়। বাঙলায় -অন্ত প্রত্যয়ান্ত পদ কৃদন্ত বিশেষণের (participle adjective) কাজ করে। চল্+অন্ত=চলন্ত (গাড়ি), পড়্+অন্ত=পড়ন্ত (বেলা), জ্বল্+অন্ত=জ্বলন্ত (আগুন), বাড়্+অন্ত=বাড়ন্ত (ঘরে চাল বাড়ন্ত, বাড়ন্ত বয়স), ঘুম্+অন্ত=ঘুমন্ত, ফুটন্ত (জল)।

স্ত্রীলিঙ্গে অন্তী, —অন্তি (বিশেষণ)

নাচ্+অন্তী=নাচন্তী, নাচুন্তী, দেখ+অন্তী=দেখুন্তী।

অত, অতা, —অতী (অতি) —তি (বিশেষণ-বিশেষ্য)

- অন্ত প্রত্যয়ের সহিত প্রায় সমার্থক এই **অত** প্রত্যয়।

ফির্+অত=ফেরত (জেল ফেরত আসামী), (**ফেরতা** 'আমরা বিলাত **ফেরতা** ক'ভাই, সাহেব সেজেছি সবাই'—দ্বিজেন্দ্রলাল)। সব+জান্+তা=‘সবজান্তা’—সব জানে যে। ‘উনি একজন সবজান্তা লোক কিনা তাই সব কিছুর উপর মতামত প্রকাশ করেন।’ উঠ্+অতি (**তি**)=উঠতি, পড়তি, বাড়তি। ‘উঠতি বয়স’। চল্+অতি=চলতি (চলতি বুলি, চলতি ভাষা)। বহ্+অতা=বহতা—‘বহতা নদী’। কম্ (ফারসী)+তি=কমতি। জ্বল্+তি=জ্বলতি (ঘি জ্বলিয়া গিয়া যাহা নষ্ট হয়)। ঘাট্+তি=ঘাট্‌তি।

—আ প্রত্যয় (বিশেষণ)

(১) অতীত কালবোধক (সংস্কৃত) ক্ত প্রত্যয় হইতে ইহা উদ্ভূত।

এই প্রত্যয় দ্বারা গঠিত শব্দ অতীতকালের কৃদন্ত বিশেষণের কাজ করে। সংস্কৃত ধৃত>ধর্+আ=ধরা। নোতুন কাপড় তো ভাই, তোমার জন্য ধরাই আছে। আমাদের বাড়ির এটাই **বাঁধাধরা** নিয়ম। সংস্কৃত দৃষ্ট দেখ্+আ=‘দেখা’, শ্রুত-শুন্+আ=‘শোনা’। তাহার কথা আমার **শোনা** আছে। **শোনা** কথার জন্য অত ভাবনা কিসের? **দেখা** পথে নিশ্চয় যেতে পারব। (২) **—আ** প্রত্যয় সংস্কৃত -‘অক’ হইতে এই আ আসিয়াছে। ইহার কার্য উপপদ তৎপুরুষ গঠন করা। মাছিমারা (কেরাণী)=মাছি+মার্+আ, আখমাড়া (কল)=আখ+মাড়া+আ, পাঁঠাকাটা (খাঁড়া)=পাঁঠাকাট্+আ। [কিন্তু কানকাটা (সেপাই) কানকে কাটা=কানকাটা (দ্বিতীয়া তৎপুরুষ)। কান কাটা হইয়াছে যাহার, কানকাটা (সেপাই)]।

—আই (ভাবার্থক) (ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য)

চড়+আই=চড়াই, উৎরাই খাড়াই, খোদ্+আই=খোদাই, ভরাই।

—আইৎ, আৎ (বিশেষণ-বিশেষ্য)

ডাক্+আইৎ=ডাকাইত (শতৃ প্রত্যয়ের অর্থে)। সেব্+আইৎ=সেবাইৎ। বা+আইৎ= বাইত্ (ঘনরাম—‘ধর্মমঙ্গল’=বাইত)।

-আন, আনো

—আন -আনো প্রেরণার্থক ধাতুর উত্তর এই সকল প্রত্যয়যোগে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠিত হয়ঃ—ধমকা+আনো=ধমকানো, জানান্+আনো=জানান বা জানানো। **নামধাতু হইতে লাঠি** +আ=লাঠা+আনো=লেঠানো। জমা+আ+আনো=জমানো।

—আরী, —উরী

কাঁসারী, শাঁখারী (শাঁখ+আরী), পূজারী, ভিখারী (ভিখ্+আরী), চুনারী (চুন+আরী)। ডুব্+আরী বা উরী প্রত্যয় ডুবারী, ডুবুরী (সেই কার্যে দক্ষ অর্থে), ধুনারী, ধুনুরী, কাটারী।

আনি—আনী—আনি—অনী (ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য)

নিড়ান—নিড়া+আনী=ক্ষেত নিড়ানের কাজ (ভাববাচ্যে) (করণবাচ্যে ক্ষেত নিড়াইবার যন্ত্র। শুনানী—শুন্+আনী=শোনার কার্য, (hearing) ঝলক+আনি='ঝলকানি' 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে'—রবীন্দ্রনাথ, পারানী, জ্বালানি।

—ই প্রত্যয় (ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য)

হাস্+ই=হাসি, কাশি। মারি (মাইর—পূর্ববঙ্গে—চলিত ভাষায়) মার। হারি (পূর্ব-বঙ্গে—হাইর—চলিত ভাষায়) হার। ডুব্+ই ডুবি (ভরাডুবি, 'বৌডুবির খাল')। বোড়-বুলি, ভাজি, ফেরি, ফিরি।

—ইয়া প্রত্যয় (বিশেষণ)

গা+ইয়া=গাইয়া>গাইয়ে (সুগায়ক), বাজিয়ে লিখিয়ে (সুলেখক), খাটিয়ে (পরিশ্রমী), বলিয়ে (সুবক্তা)। নাচিয়ে, লিখিয়ে, কইয়ে।

—উ প্রত্যয় (বিশেষণ)

হ+উ=হবু (হবু জামাই—কর্তৃবাচ্যে)। ঝাড়্+উ=ঝাড়ু (করণবাচ্যে—যাহাদ্বারা ঝাড়া যায়)। চল্ (চাল্)+উ=চালু (যাহা চলিতেছে বা চালানো হইতেছে)। ডুবু, 'নিবু' ইহাদের দ্বিত্ব প্রয়োগ পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। হাঁট্+উ=হাঁটু (করণবাচ্যে—যাহার সাহায্যে হাঁটা যায়)। খেল্+উ=খেলু (পূর্ববাঙলায় খেড়ু—খেলার সাথী)।

—উয়া প্রত্যয় (বিশেষণ-বিশেষ্য)

পড়্+উয়া=পড়ুয়া [সর্দার পড়ুয়া সংস্কৃত√পঠ্ ধাতু হইতে], হাগ্+উয়া=হাগুয়া (হেগো ছেলে, কর্তৃবাচ্যে)। খা+উয়া=খাউয়া (খেয়ো। পড়্ (পত্) ধাতু+উয়া=পড়ুয়া> পড়ো জমি)।

—উক প্রত্যয় (এবং উকা) (বিশেষণ)

তাহাই ইহার স্বভাব—এই অর্থে এই প্রত্যয় হয়।

মিশ্+উক=মিশুক। হিংস্+উক=হিংসুক (সংস্কৃত ভাষায় 'হিংসক')। নিন্দ্+উক=নিন্দুক (সংস্কৃত ভাষায় 'নিন্দক')। খা+উকা=খাউকা>খেকো।

—ক প্রত্যয় (স্বার্থে অথবা সংযোগ অর্থে) (বিশেষ্য)

চড়ক, মড়ক, বৈঠক। মুড়্+ক=মোড়ক। ফাট্+ক=ফাটক (ফটক), টান্+ক=টনক। হেঁচ+কা=হেঁচকা (টান)।

তদ্ধিত প্রত্যয়

[১] সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়

(বাঙ্‌লা ভাষায় তৎসম শব্দে ব্যবহৃত)

'তাহার হিত'—প্রভৃতি অর্থে কৃদন্ত প্রাতিপদিক, তদ্ধিতান্ত প্রাতিপদিক এবং অব্যুৎপন্ন প্রাতিপদিকের উত্তর কতকগুলি প্রত্যয় যোগে নূতন প্রাতিপদিক গঠিত হয়। এই সকল প্রত্যয়কে **তদ্ধিত প্রত্যয়** বলে। অনেক স্থলে **তদ্ধিতান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর** পুনরায় তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে নূতন প্রাতিপদিক গঠিত হইয়া থাকে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীর প্রাতিপদিকের উত্তর **তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে প্রাতিপদিক গঠিত হয়ঃ—**

(১) কৃদন্ত প্রাতিপদিক—যথা√জ্ঞা+অন (ট্‌ ভাববাচ্যে), জ্ঞান (কৃদন্ত প্রাতিপদিক) +বৎ (বতুপ্‌—**তদ্ধিত প্রত্যয়** তাহার আছে এই অর্থে)=জ্ঞানবান্‌, জ্ঞানবানের ভাব এই অর্থে জ্ঞানবৎ।তা (**তদ্ধিত প্রত্যয়**)=জ্ঞানবত্তা।

(২) তদ্ধিতান্ত প্রাতিপদিক--যথা—উল্লিখিত উদাহরণে জ্ঞানবৎ+তা (ভাবার্থে) 'জ্ঞানবত্তা' শব্দটি একটি নূতন প্রাতিপদিক।

(৩) অব্যুৎপন্ন প্রাতিপদিক—**চঙ্গ+ত্ব=চঙ্গত্ব** (ভাবার্থে), ঘোটক+ত্ব=ঘোটকত্ব (ভাবার্থে)।

ত্ব, তা অ (ণ্‌), য্যঞ্‌ (য), ইমন্‌ (ভাবার্থে বিশেষ্য)

"তাহার ভাব" এই অর্থে উক্ত প্রত্যয়গুলি হয়। বিশেষণ হইতে বিশেষ্য গঠনে ইহাদের প্রয়োগ হয়ঃ—গুরু+ত্ব=গুরুত্ব গুরু+তা=গুরুতা, সাধুতা, গৌরব (গুরু+অণ), গুরু+ইমন্‌=গরিমা (গরিমন্‌)। লঘু+ত্ব=লঘুত্ব, লঘু+অণ্‌=লাঘব, লঘু+ইমন্‌=লঘিমা। **মৃদু+ত্ব=মৃদুত্ব, মৃদুতা, মার্দব,** মৃদু+ইমন্‌=**ম্রদিমা।** তনু (সূক্ষ্ম, সরু)+ত্ব=তনুত্ব, **তনুতা, তানব, তনিমা** ("জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা"—**উর্বশী—রবীন্দ্রনাথ**)। **মনুষ্য+ত্ব**=মনুষ্যত্ব, পশু+ত্ব=পশুত্ব, দেবত্ব। পুরুষ+অণ্‌=পৌরুষ, পুরুষত্ব, ('দৈবায়ত্ত কুলে জন্ম পুরুষত্ব করায়ত্ত মোর'—**কর্ণার্জুন**)। পণ্ডিতের ভাব পাণ্ডিত্য, কঠোরতা, পার্থক্য (পৃথগ্‌ ভাব)।

অপত্যার্থক প্রত্যয় (বিশেষণ-বিশেষ্য)

অ (অণ্‌), আয়ন, ই, এয়, য

অণ্‌ঃ বিমাতার অপত্য বিমাতৃ+অ (ণ্‌)=বৈমাত্র, পুত্রের অপত্য পুত্র+অ (ণ্‌)=পৌত্র। **পাণ্ডুর** অপত্য=পাণ্ডু+অ(ণ্‌) পাণ্ডব। কাশ্যপ=কশ্যপ+অ (ণ্‌)। কৌরব=কুরু+অ(ণ্‌), =**ককুৎস্থ—কাকুৎস্থ।** যদু-যাদব, মধু-মাধব, পৃথা-পার্থ, দনু-দানব, দুহিতার অপত্য—দুহিতৃ+অ (**ণ্‌**)—**দৌহিত্র, রঘু—রাঘব।**

অনুশীলনী পরবর্তী অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে।

আয়নঃ দ্বীপনামক ঋষির গোত্রাপত্য=দ্বীপ+আয়ন দ্বৈপায়ন (ব্যাসদেব)। নর+আয়ন =নারায়ণ। অশ্বলের গোত্রাপত্য অশ্বল+আয়ন=আশ্বলায়ন।

ই দশরথের অপত্য দশরথ+ই (ঞ্) দাশরথি। দ্রোণ—দ্রৌণি। আর্জুনি। রাবণের অপত্য রাবণ+ই(ঞ্) রাবণি (মেঘনাদ), সুমিত্রা—সৌমিত্রি (লক্ষ্মণ)। মৈথিলের কন্যা—**মৈথিলী।** ব্যাসের পুত্র—বৈয়াসকি।

এয় বিনতার অপত্য—বিনতা+এয়=বৈনতেয়। গঙ্গার অপত্য গঙ্গা—এয়=গাঙ্গেয় (ভীষ্মদেব), সরমার অপত্য—সরমা+এয় সারমেয় (কুকুর) ভগিনী—ভাগিনেয়। বিমাতার অপত্য—বিমাতৃ+এয়=বৈমাত্রেয়। কার্তিকেয় (কৃত্তিকার অপত্য)। কুন্তি—কৌন্তেয়। রাধার অপত্য রাধা+এয়=রাধেয় (কর্ণ), গাধি+এয়=গাধেয়—গাধির অপত্য (বিশ্বামিত্র ঋষি) দ্রৌপদী—দ্রৌপদেয়।

য—দিতির অপত্য—দিতি+য=দৈত্য। অদিতির অপত্য—অদিতি+য=আদিত্য। চণকের অপত্য চণক+য=চাণক্য। মুদ্গলের অপত্য—মুদ্গল+য=মৌদ্গল্য (মৌদ্গোল্য নহে) জমদগ্নি—জামদগ্ন্য। বৎস—বাৎস্য। শণ্ডিল-শাণ্ডিল্য। মনুর অপত্য জাতি-মনুষ্য (ষকারগম)

ইয়—ক্ষত্র+ইয়=ক্ষত্রিয় (ক্ষত্রের অপত্য)

ব্যৎ—ভ্রাতৃ+ব্যৎ (অপত্যার্থে) ভ্রাতৃ বা ভাইয়ের ছেলে।

তাঁহার উপাসক বা ভক্ত (তিনি ইহার দেবতা)

অ (ণ্)—বিষ্ণু+অণ্—বৈষ্ণব। শৈব। সৌর (সূর্যের উপাসক), বৌদ্ধ। শাক্ত। **য**—গাণপত্য (গণপতির উপাসক)।

তাহার ইহা এই অর্থে (তৎসম্বন্ধীয়) **অণ্, ঈয়, ইক (বিশেষণ)**

অণ্—সূর্য+অণ্=সৌর (মণ্ডল, জগৎ), **আর্ষ।** শিবের ইহা শৈব—শিব+অণ্ (শৈব ধনু) চক্ষু (স্)+অণ্=চাক্ষুষ (জ্ঞান)। **ঈয়**—রাজক+ঈয়=রাজকীয়, পরকীয়। **তদীয়** (তাহার ইহা) অস্মদ্ (মদ্)+ঈয়=মদীয় (একবচনে)। ভবৎ+ঈয়=ভবদীয়। **স্বর্গীয়,** দেশীয়, বাষ্পীয় (পদার্থ), শারদীয়। পার্থিব (পৃথিবী)।

ইক—শরীর সম্বন্ধীয়—শরীর+ইক=শারীরিক ('শারীর'ও হয়)। বসন্ত—বাসন্তিক, লৌকিক, নৈতিক (চরিত্র), অর্ণব+ইক=আর্ণবিক, দৈহিক, লক্ষণ+ইক=লাক্ষণিক, বৈদ্যুতিক, আন্তরিক, রাসায়নিক, বৈজ্ঞানিক, পারিশ্রমিক।

—ঈন (বিশেষণ)

(ক) সৎকুলে **জন্মগ্রহণ** করিয়াছে এই অর্থে—কুল+ঈন=কুলীন। (খ) **হিতার্থে** বিশ্বজন+ঈন=বিশ্বজনীন, (বিশ্বজনের হিতের জন্য)।

সর্বজন+ঈন—সার্বজনীন, সর্বজনীন, সর্বজনের হিতের জন্য বা হিতকর, সার্বজনীন দুর্গোৎসব, সার্বজনীন সেবা, সার্বজনীন চিকিৎসালয়। (গ) **জাতার্থে, সম্বন্ধার্থে**—গ্রাম+ঈন=গ্রামীণ।

—ইক প্রত্যয় (বিশেষণ)

(১) তাহা **অধ্যয়ন** করে বা জানে এই অর্থে ঃ—বেদ+ইক বৈদিক, পৌরাণিক, **দার্শনিক**। [তৎসম্বন্ধীয় অর্থে এই শব্দগুলিরও প্রয়োগ হইয়া থাকে, যথাঃ—বেদসম্বন্ধীয় বৈদিক, পুরাণসম্বন্ধীয় পৌরাণিক, ইত্যাদি]

(২) এই **সময়ের মধ্যে সম্পন্ন** এই অর্থেঃ—একমাসে সম্পন্ন মাস+ইক=মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক—'এই চিনির কলে **দৈনিক** হাজার মণ চিনি তৈয়ারি হয়।'

(৩) তাহাদ্বারা জীবিকা অর্জন করে এই অর্থে ঃ—বেতন দ্বারা বাঁচিয়া থাকে—বেতন+ইক=বৈতনিক (Stipendiary) বৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট, অবৈতনিক (Honorary) হলদ্বারা জীবিকা অর্জন করে—হল+ইক=হালিক, জালিক (জেলে), দণ্ড দ্বারা জীবিকা অর্জন করে যে দণ্ড+ইক=**দাণ্ডিক** (Police officer) (Cambridge History of India), আয়ুধ (অস্ত্র, শস্ত্রদ্বারা) জীবিকা অর্জন করে যে—আয়ুধিক, আয়ুধ+ইব (শস্ত্রজীবী—সিপাহী)।

(৪) তাহা **রক্ষা** করে এই অর্থে ঃ—**সামাজিক** সমাজ+ইক (যে সমাজকে রক্ষা করে)। ধার্মিক-ধর্ম+ইক (ধর্ম রক্ষাকারী)। দ্বার—দৌবারিক।

(৫) ঈশ্বর বা পরলোকেব কর্মফলে বা বেদে **বিশ্বাসী**—অস্তি+ইক=**আস্তিক**। যে উহাতে বিশ্বাসী নহে—নাস্তি+ইক=নাস্তিক।

—ইত প্রত্যয় (ইতচ্) (বিশেষণ)

তাহা ইহার জন্মিয়াছে এই অর্থে -ইত প্রত্যয় হয়ঃ—

কুসুম জন্মিয়াছে ইহার—কুসুম+ইত='**কুসুমিত** উপবন', '**পুষ্পিত** কানন', সুখিত, দুঃখিত, পল্লবিত, পুলকিত, 'মুকুলিত', লজ্জিত, কণ্টকিত, ক্ষুধিত (পাষাণ), অঙ্কুরিত, শঙ্কিত (শঙ্কা+ইতচ্)।

—ইল, ল (চ্) (অস্ত্যর্থে) (বিশেষণ)

তাহা ইহার বা ইহাতে আছে—এই অর্থে উল্লিখিত প্রত্যয় হয়।

ফেন ইহাতে আছে—ফেন+ইল (চ্)=**ফেনিল** "দক্ষিণে অনন্ত নীল ফেনিল সাগর" (নবীনচন্দ্র—"পলাশীর যুদ্ধ"), জটা+ইলচ্=**জটিল**। 'লুটিয়ে পড়া জটিল জটা ঘন পাতার গহন ঘটা' —(রবীন্দ্রনাথ)। পিচ্ছ+ইলচ=**পিচ্ছিল** (পথ), **পঙ্কিল** (কাদায় ভরা), "চলইতে শঙ্কিত, পঙ্কিল বাট"—গোবিন্দদাস। **সর্পিল** (ধূম্রপুঞ্জ)—সাপের গতির ন্যায় আঁকা বাঁকা। **—লচ্ প্রত্যয়ান্ত কয়েকটি প্রাতিপদিক উল্লেখযোগ্যঃ**—শ্রীল=(শ্রীযুক্ত), মাংসল, বৎসল, (পুত্র বৎসলা জননী), মঞ্জুল (কিবণ), শ্যামল ("হে মাতঃ বঙ্গ শ্যামল অঙ্গ"—বঙ্গেশরৎ), পিঙ্গল 'পিঙ্গল জটা ঝলিছে ললাটে, পূর্ব অচলে উষার মতো"—রবীন্দ্রনাথ)।

—ইন্, —বিন্, —মতুপ্, (—বতুপ্) (অস্ত্যর্থক প্রত্যয়) বিশেষণ

তাহার বা তাহাতে ইহা আছে—এই অর্থে উক্ত প্রত্যয়গুলি হয়।

ইন্ গুণ+ইন্=গুণী (গুণ আছে ইঁহাতে)। ধনী, মানী, স্বদেশী, বিদেশী, বিরহী, কৃতী। গৃহী, বানপ্রস্থী (বনী)। নাস্ত্যর্থেও হয়—অর্থ+ইন্=অর্থী (যাচক)।

বিন্‌—যশস্‌ (যশ)+বিন্‌ (যশ আছে ইঁহার) যশস্বী, তপস্বী, মেধাবী, মায়াবী, ওজস্বী।

মতুপ্‌—(মৎ) বুদ্ধি=মতুপ্‌=বুদ্ধিমৎ>বুদ্ধিমান্‌ (বুদ্ধি আছে ইঁহার) প্রীতিমান্‌, শ্রীমান্‌, কৃতিমান্‌।

—বতুপ্‌

অকারান্ত শব্দ, অন্ত্যবর্ণের পূর্বে মকার থাকিলে মতুপের মকার স্থানে ব হয় (বতুপ্‌ হয়)।

বতুপ্‌ . (বৎ) জ্ঞান+বতুপ্‌=জ্ঞানবান্‌, ধনবান্‌, শ্রদ্ধাবান্‌, লক্ষ্মীবান্‌, স্বাস্থ্যবান্‌, মূল্যবান্‌, চরিত্রবান, বিদ্যাবান্‌, অর্থবান্‌, ('অর্থী'—যে টাকা চাহে—যাহার টাকা আছে সে অর্থবান্‌)। অন্যত্র মতুপ্‌ প্রত্যয় হয়। **মতুপ্‌ই সাধারণ অস্ত্যর্থক প্রত্যয়**— অতএব রুচি যাহার আছে—রুচিমান্‌ (রুচিবান্‌ নহে), মতিমান্‌ **(বুদ্ধিমান্‌)**। কিন্তু **যশস্বান্‌** (যশস্‌+বতুপ্‌), **যবমান্‌**।

দ্রষ্টব্যঃ তৎসমপদে গঠিত সমাসদ্বারা অভিপ্রেত অর্থের বোধ হইলে বহুব্রীহি সমাসের পর আর উল্লিখিত প্রত্যয়গুলি হয় না। 'সচ্চরিত্রবান্‌' কথা অশুদ্ধ কারণ সৎ (ভাল) চরিত্র হইতেছে যাহার সে 'সচ্চরিত্র'। ইহার পর 'অস্ত্যর্থক' প্রত্যয় অনাবশ্যক। **নির্ধনী অশুদ্ধ**, নির্ধন শুদ্ধ। এইরূপ নির্‌ (নাই) অপরাধ যাহার বহুব্রীহি (স্ত্রীলিঙ্গে) **নিরপরাধা**। **সমাস-**দ্বারাই অর্থ বুঝাইলে অস্তর্থক—ইন্‌ প্রত্যয় অনাবশ্যক।

—ইম

অগ্রিম, বঙ্কিম, রক্তিম। পশ্চিম-পশ্চাৎ+ইম। আদি+ইম=আদিম।

—ইমন্‌ প্রত্যয় ভাবার্থে

নীলের ভাব=নীল+ইমন্‌ নীলিমা, রক্তিমা (লালের ভাব) মধুরিমা, শ্যামলিমা।

—ক প্রত্যয় (স্বার্থে, অল্পার্থে)

মাতা<মাতৃ+ক=মাতৃকা (স্বার্থে—মাতৃ শব্দের অর্থেই প্রত্যয়)—মাতা। বাল+ক=বালক (স্বার্থে)। কন্যা (মেয়ে)+ক=কন্যকা (ছোট্ট মেয়েটি)। কণা+ক=কণিকা (খুব ছোট কণা)।

—তর, তম, ঈয়স্‌, ইষ্ঠ (বিশেষণ)

(আতিশয্যার্থক প্রত্যয) (আতিশয্য+অর্থক)

দুইটি বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে একের অপর হইতে আধিক্য বুঝাইলে—তর ও ঈয়স্‌ প্রত্যয় হয়। আর বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বা নিকৃষ্টতা বুঝাইলে—তম ও ইষ্ঠ প্রত্যয় হয়।

সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ্য, বিশেষণ এবং অব্যয়ের উত্তর ও স্থল বিশেষে ক্রিয়ার উত্তর তর তম প্রত্যয় হয়। কিন্তু বাঙ্‌লায় এই সকল প্রত্যয় বিশেষণের উত্তর হয়।

শব্দ	**—তর, ঈয়স্‌**	**তম, ইষ্ঠ**
সুন্দর	সুন্দরতর	সুন্দরতম
গৌর	গৌরতর	গৌরতম
গুণবান্‌	গুণবত্তর	গুণবত্তম
লঘু	লঘুতর, লঘীয়ান্‌	লঘিষ্ঠ
বহু	বহুতর, ভূয়ান্‌	বহুতম, ভূয়িষ্ঠ

গুরু	গুরুতর, গরীয়ান্	গুরুতম, গরিষ্ঠ
প্রশস্য (প্রশংসনীয়)	প্রশস্যতর, শ্রেয়ান্	প্রশস্যতম, শ্রেষ্ঠ
(যুবন্) অল্প	অল্পতর, অল্পীয়ান্	অল্পতম,
	কনীয়ান্	কনিষ্ঠ

—ডতর, ডতম প্রত্যয় (বিশেষণ)

একতর (ডতর) প্রত্যয় একতম (ডতম) অন্যতর অন্যতম শত্রুবৎ

বৎ প্রত্যয় (তুল্যার্থে)

শত্রুবৎ।

—তন ট্যু (ট্যুল) প্রত্যয় (বিশেষণ)

—তন কালবাচক-অব্যয়ের উত্তর হয়ঃ—পুরাতন, চিরন্তন, ইদানীন্তন, সনাতন, সায়ন্তন (সায়ম্ (সন্ধ্যা)+তন), অদ্যতন, অধস্তন, উপরিতন, অধুনাতন।

—ময়ট্ প্রত্যয়

ব্যাপ্তি, বিকার অবয়ব (অংশ) প্রভৃতি অর্থে প্রকৃতির উত্তর এই প্রত্যয় হয়।

জলময় (জলদ্বারা ব্যাপ্ত), সুবর্ণের বিকার সুবর্ণময় (অলংকার)—কাষ্ঠময় (হস্তী) মাটির বিকার মৃৎ+ময়ট্=মৃন্ময় (পাত্র), হিরণ্যের বিকার হিরণ্য+ময়ট্=হিরণ্ময়। বাঙ্ময়—বাক্ অবয়ব ইহার বাঙ্ময় (শাস্ত্র) চিন্ময়, ঘৃতময় (অন্ন)। কিন্তু পুরীষ অর্থে গো+ময়ট্ =গোময় (গোবর)। এই প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে—ঈ হয়। সুবর্ণময়—সুবর্ণময়ী, মৃন্ময়ী ইত্যাদি।

—ত্য প্রত্যয় (বিশেষণ)

দাক্ষিণাত্য, পাশ্চাত্ত্য, তত্রত্য, অত্রত্য, অমাত্য।

—তা (সমূহার্থে)—অ (ণ্) —য, কাণ্ড (বিশেষ্য)

জনসমূহ=জনতা, ভিক্ষাসমূহ—ভৈক্ষ. **বন্যা** (য প্রত্যয়—**বনের** (জলের) সমূহ—জল-প্লাবন), দূর্বাকাণ্ড (দূর্বাসমূহ), কর্মকাণ্ড (কর্মসমূহ)।

—ত্ব, তা প্রত্যয় ভাবার্থে

গুরুর ভাব=গুরুত্ব, লঘুত্ব, লঘুতা, কবিত্ব ণত্ব, ষত্ব মনুষ্যত্ব।

—কল্প (ঈষদসমাপ্তি অর্থে—ঈষৎ অসমাপ্তি) (বিশেষণ)

প্রভাত হয় হয়=প্রভাতকল্পা (রজনী)। মরার মত, **মরমর** অবস্থা—**মৃতকল্প**। পিতার মতো—পিতৃকল্প। ঋষির মতো—ঋষিকল্প। খাঁটি বাঙ্লায় শব্দদ্বৈতদ্বারা ক্রিয়ার ঈষৎ অসমাপ্তি বুঝান যায়ঃ "পূর্বগগনে পূর্ণিমা চাঁদ করিতেছে 'উঠি উঠি'—(রবীন্দ্রনাথ)= উদিতকল্প। অনেক সময়ে বাক্যাত্মক বিশেষণ দ্বারা এইরূপ অর্থ প্রকাশ করা হয়। যথা— **'খানিকটা-পাশকরা ডাক্তার'** (রামের সুমতি)=চিকিৎসককল্প। 'বিদ্বৎকল্প'—(খানিকটা জানা বিদ্বান্)। গুরুকল্প—গুরুরমতো।

[২] বাঙ্লা তদ্ধিত প্রত্যয়

তদ্ভব, তৎসম, দেশী বিদেশী সকল প্রকার প্রাতিপদিকের উত্তর বাঙ্লা তদ্ধিত প্রত্যয় হইতে পারে।

—আ প্রত্যয় (বিশেষ্য)

স্বার্থে অথবা নিন্দার্থে, সমাসান্তরূপে (কর্তৃত্ব বুঝাইতে বা সম্বন্ধার্থে)—আ প্রত্যয় হয়। চাঁদ—চাঁদা, চোর—চোরা (স্বার্থে ও নিন্দার্থে), কেষ্ট—কেষ্টা (স্বার্থে বা নিন্দার্থে—'কেষ্টা বেটাই চোর'), নেপাল—ন্যাপলা (নিন্দার্থে 'চিকিৎসাসঙ্কট'—পরশুরাম), এক—একা (স্বার্থে—'কূলে একা বসে আছি'), বামন, বামুন—বামনা (নিন্দার্থে, 'চৌগোঁপ্পা (সমসান্ত-আ-'দেবীচৌধুরাণী'), কাপড়-কাচা সাবান (কর্তৃত্বে) (বিশেষণ), **লোনা** (লবণ >লোন+আ **লোনা (অস্ত্যর্থে)**।

আই (বিশেষ্য)

আদর অর্থে লোকের নামের পর এবং ভাবার্থে এই প্রত্যয় হয়ঃ—শ্রীমন্ত—ছিরা+আই =ছিরাই, বলাই (বলদেব), নিতাই (নিত্যানন্দ), জগাই, মাধাই, নিমাই।

ভাবার্থে—বড়+আই বড়াই (বড়র ভাব দেখান—অহঙ্কার), চওড়াই, বামুনের **ভাব বামনাই** (নিন্দার্থে), **মিঠাই** (মিঠাবস্তু), সেলাই, **ঢাকাই, পাটনাই,** মোগলাই (তৎসম্বন্ধীয়), পোষ্টাই, চড়াই, উৎরাই।

—আনি (বিশেষ্য)

নাকানি, আমানি, ডুবানি (জল বা তৎসংশ্লিষ্ট অর্থে)

—আলি, আলী (ভাবার্থে) বিশেষ্য—বিশেষণ)

ঠাকুর+আলী-ঠাকুরালী, মিতালী। সোনালি (সোনালী), সুতালি (সুতালী) সুতার মতো সরু **(বিশেষণ অর্থে)**। 'আকাশে **সুতালি** চাঁদ।' (মোহিতলাল) মেয়েলি।

আরি—আরী (উরী)

ধাতুর উত্তর কর্তবাচ্যে—আরি প্রত্যয় হয়। √কাট্+আরি-কাটারি (যাহাদ্বারা কাটা যায়) কর্তৃবাচ্যে দক্ষতা অর্থে—√ডুব্+আরী-ডুবারী। (২) কারী>=আরী- ভিখারী, পূজারী (পূজাকারী)।

—আরু

দিশারু (=দিক্ প্রদর্শনকারী কাক) ডুবারু, খোঁজারু, বন্দারু, বাগারু, বোমারু, **শশারু**।

—আল, —আলা, ওয়াল, ওয়ালা (সম্বন্ধীয়) (বিশেষণ—বিশেষ্য)

কোটাল (কোটপাল), বাড়িওয়ালা (স্ত্রীলিঙ্গে) বাড়িউলি।

—আলো (বিশেষণ)

ধার+আল (আলো)=ধারালো। পাঁক+আল (পাঁক সম্বন্ধীয়)=পাঁকাল (মাছ)। বঙ্গ+আল (সম্বন্ধার্থে)—বাঙ্গাল (বঙ্গদেশীয় ব্যক্তি), মাতাল (মত্ততাযুক্ত) ('দখিন হতে হাওয়া বকুলবনে মাতাল হ'য়ে এলো'—হোরিখেলা), দাঁতাল (দন্তযুক্ত দাঁত+আলো)।

—ঈ, —ই (বিশেষণ—বিশেষ্য)

সম্বন্ধ সংযোগ প্রভৃতি অর্থে হয়। বেগুন+ই-বেগুনী (রঙ্)। প্রভাতী (তারা)। দাগ+ঈ দাগী (আসামী, চোর)। মরম+ঈ- মরমী (কবি) (Mystic)। গোলাপী (রঙ্) স্বদেশী, সুতী (কাপড়), বেনারসী (শাড়ী), রাঁধুনি (রাঁধন+ই), কাগজী (যে কাগজ

তৈয়ারি করে), (ঢাকা শহরের 'কাগজী টোলায়' কাগজ তৈয়ারি হইত), কাগজী (লেবু কাগজের মত পাতলা আবরণ বিশিষ্ট—'সংসদ অভিধান'), মজদুর+ই=মজদুরি, ডাক্তারি, দালালি, ওকালতি, পণ্ডিতি, মাষ্টারি, রাখালি, মজুরি, (ভাববাচক বিশেষ্য) শয়তানি।

—ইয়া (=এ)

(সম্বন্ধসূচক বিশেষ্য ও বিশেষণ ইহাদ্বারা গঠিত হয়)।

নাও+ইয়া=নাইয়া (নেয়ে), হাল+ইয়া=হালিয়া (হেলে—হালচালক—হাল সম্বন্ধীয়), জালিয়া (জেলে), মাটিয়া>মেটে ('পাথরা'—মুকুন্দরাম), মেটে, ওড়—(উড়িষ্যা বা ওড্রদেশ)+ইয়া=ওড়িয়া, উড়িয়া>উড়ে ('ঝুঁটিবাঁধা উড়ে সপ্তম সুরে পাড়িতে লাগিল গালি'—'দুই বিঘা জমি'। ডুলি+ইয়া (ডুলি বাহক)=ডুলিয়া>দুলিয়া দুলে (পশ্চিমবঙ্গে ডুলি-বহনকারী জাতিবিশেষ)।

—উ, —উয়া (বিশেষণ)

উ, (আদরে) খোকা-খুকু (শিশুকন্যা), বলরাম—বলু, নিত্যানন্দ>নিতাই, নিতু।

উয়া (সম্বন্ধ, সংযোগ, অনাদর অর্থে), রাম—রামুয়া>রেমো। মধু—মধুয়া>ম'ধো। ঘর+উয়া=ঘরুয়া>ঘরো (কথা)। বড়+উয়া=বড়ুয়া (উপাধি বিশেষ)। সাথ+উয়া=সাথুয়া>সেথো। দাঁত+উয়া=দাঁতুয়া>দে'তো। বাত+উয়া=বাতুয়া>বেতো (ঘোড়া)। ঘা+উয়া=ঘাউয়া>ঘেয়ো (মাছি)। জল+উয়া=জলুয়া>জলো (দুধ)। হেগো (কাপড়), ভেতো (ভাতুয়া), গেছো (গাছ+উয়া)।

—উক (বিশেষণ)

লাজ+উক=লাজুক, পেট+উক=পেটুক, মিথ্যা+উক=মিথ্যুক।

—আর, আরী (সংস্কৃত—'কার', 'কারী' হইতে উৎপন্ন)

(কর্তার অর্থ বুঝাইতে) (বিশেষণ—বিশেষ্য)

গোঁয়ার—গাঁও+আর=গাঁওযার, গোঁয়ার (-গ্রামবাসী)। পূজারী—পূজা+আরী (পূজা-কারী)। শাঁখারী—শাঁখা+আরী (শাঁখারী)। 'দেউরী'—দেউ (দেব)+আরী (দেবমূর্তি নির্মাণকারী দেবকারী'—পূর্ববঙ্গে), ভিখারী, ধুনারী (ধুনুরী), পিয়ার (প্রিয়কার, স্ত্রী পিয়ারী)।

—পনা, —পানা, —পারা (প্রায়) (বিশেষণ)

—পনা (ভাবার্থে)—গিন্নীপনা, দাসীপনা, ঢীটপনা, 'বীরপনা' (মেঘনাদ বধ), ন্যাকামি-পনা, গুরুপনা, মেয়েলিপনা।

পানা (সাদৃশ্যার্থে)—'চাঁদপানা' (চাঁদের মত), (মুখ—'কৃষ্ণকান্তের উইল'). কুলোপানা (কুলা+পানা চক্র), লালপানা (অনেকটা লাল), লম্বাপানা।

পারা (সাদৃশ্যার্থে)—পাগল-পারা (পাগলের প্রায়, 'আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া আকুল পাগল-পারা'—রবীন্দ্রনাথ)। চাঁদপারা।

—আন্, —ওয়ান্ (বিদেশী প্রত্যয়) (বিশেষণ)

তাহার আছে বা তাহাতে নিযুক্ত এই অর্থে—আন্, —ওয়ান প্রত্যয় হয়।

ওয়ান্ গাড়ি+ওয়ান=গাড়োয়ান, দ্বার+ওয়ান্=দরওয়ান্, বাগওয়ান্ (উদ্যানে যে কাজ করে; 'মালঞ্চের মালাকার')।

—আনা, —আনী (শীলার্থে প্রত্যয়) (বিশেষ্য)

সাহেবীআনা, বিবিয়ানা, হিন্দুয়ানী, 'নবেলিয়ানা'।

—গিরি ব্যবসায়ী অর্থে) (বিশেষ্য)

দালালগিরি, কেরানীগিরি, ডেপুটীগিরি, পান্ডাগিরি, রানীগিরি (রানীগিরির ঠাট—দেবী চৌধুরাণী), বাবুগিরি।

—চী (তুর্কী প্রত্যয়) (ব্যবসায় অর্থে) (বিশেষ্য)

বাবুর্চী, মশালচী, তবলচী, খাজানচী।

—তুত (সম্পর্কার্থে)

মাসতুত, পিসতুত পিসি+তুত—পিসি সম্পর্কিত।

—দার (ধারক বা কর্তা বুঝাইতে), (বিশেষণ)

তবল-দার, (তবল-কুঠার, 'কাষ্ঠ ছেদনকারী'—রাজশাহী), সমজদার, অংশীদার, ঠিকা-দার, বাজনদার (বাজনদেরে), চৌকিদার, মজুমদার তবিলদাব (তবিলদার—Bursar), ঠিকাদাব, দোকানদার, ছড়িদার, **কামদার (কারুকার্য-বিশিষ্ট)**, চড়নদার (escort), (সঙ্কুচিত অর্থে—নারী ও শিশুদিগের রক্ষক আরোহী, সাধারণ অর্থ 'আবোহী'), জমিদার, দানাদার (দানাযুক্ত 'দানাদার চিনি', দানাদার গুড়='দানাগুড়'), মাইনদার—বেতনভুক্ ভৃত্য (যশোহর-নড়াল) (মাহিয়ানা+দার) চোপদার, পোদ্দার, মজাদার (যাহাতে মজা-আনন্দ আছে)।

—বাজ (বিশেষণ)

তাহাতে অভ্যস্ত এই অর্থে—বাজ প্রত্যয এবং ইহার উত্তর কর্মার্থে বা ভাবার্থে ই যোগে বাজি। মামলাবাজ, ধাপ্পাবাজ, দাঙ্গাবাজ, ফেরেববাজ, লাঠিবাজ, চালবাজ, ছক্কাবাজ।

—বাজি (বিশেষ্য)

ধাপ্পাবাজি, ছক্কাবাজি, ('জনা'—গিরিশ ঘোষ) গলাবাজি, চালবাজি।

নির্দেশক ও উহার বিপরীতার্থক প্রত্যয়

-টা, -টী, টি, -টুকু, -খানা, -খানি

বাঙ্‌লা ভাষায় টা -টী প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ বা শব্দাংশ আছে। ইহারা শব্দের পরে বা সংখ্যাবাচক বিশেষণের পর বিশেষ্যের পূর্বে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাদের কার্য হইতেছে সংযুক্ত বিশেষ্যের গুণ বা প্রকৃতি নির্দেশ করা। ইহাদিগকে বাঙ্‌লা ব্যাকরণে নির্দেশক সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়।

লোকটা, ছেলেটা, চাকরটা, পাড়ার মোড়লটি, লাঠিটা, দোকানদারটি, সারা দেশটা, (চিকন চিকুরের) ছায়াখানি, ঘরখানি, কাপড়খানা, (মানসবনের) পদ্মখানি, দেড়বছরেরটি, লাঠিগাছা, মালাগাছি, দুধটুকু।

উল্লিখিত উদাহরণগুলিতে প্রযুক্ত প্রত্যয় কোন বস্তু বা ব্যক্তির নির্দিষ্ট গুণ বা অবস্থা প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু সংখ্যাবাচক শব্দের পর ইহাদের যোগ হইলে এবং কোন বিশেষ্যের

বিশেষণরূপে প্রয়োগ করিলে ইহারা **অনির্দিষ্ট অর্থ** প্রকাশ করে। যেমন আমি তিনখানা ছবি কিনবো=যে কোন তিনখানা ছবি কিনবো। 'আমার বাড়িতে আজ তিনটি ছেলে এসেছিল'। আবার যদি সংখ্যাবাচক শব্দের সহিত যুক্ত এই টা, টী, প্রভৃতি **বিশেষ্যের** পরে বসে তবে উহারা **নির্দিষ্ট অর্থ প্রকটিত করে।** যথা—'ছেলে তিনটিকে তোমরা জান' এখানে **নির্দিষ্ট** তিনজন ছেলের কথা বলা হইতেছে।

অনির্দিষ্টার্থক শব্দ বা শব্দাংশ

কতকগুলি শব্দ বা শব্দাংশের বিশিষ্ট প্রয়োগ দ্বারা নির্দেশকের বিপরীত অর্থ (**অনির্দিষ্টা**র্থে) প্রকাশ করা যাইতে পারে। 'খান', 'জন' শব্দের উত্তর সংখ্যাবাচক শব্দের সংযোগে উৎপন্ন বিশেষণ, বিশেষ্যের পূর্বে বসাইলে অনির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশিত হইয়া থাকে। যথা—**জনদুই** লোক (অনির্দিষ্ট), খানচার কাপড়, **খানকতক লুচি**, 'জন ছয় সাথে মিলি' এক সাথে পরম বন্ধুভাবে করিলাম বাসা'—রবীন্দ্রনাথ।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি (derivation) প্রদর্শন কর (অর্থ নির্দেশ সহ):—চলতি, বার্ষিক, ঠিকাদার, দাশরথি, মেয়েলি, বড়াই, চড়নদার, ঘড়িয়াল, পাকামি, ঘরামি, পূজারী, বৈষ্ণব, শোভন, ম্রিয়মাণ, পক্ব, শুষ্ক, সিদ্ধি, নম্র, রাঁধুনী, বাটনা, মাছি-মারা, গাইয়ে, বর্ধিষ্ণু, শয়ান, গিরিশ, প্রিয়ংবদা, তামাটে, রামা, বুনো, নৈয়ায়িক, শুনানী, মড়ক, বৈঠক, নীলিমা, চাক্ষুষ, নৈতিক, সামাজিক, কুসুমিত, লজ্জিত, বৈতনিক, ফেনিল, শ্রেষ্ঠ, সনাতন, বন্যা, বিম্ববৎকল্প, মৃতকল্প, কোটাল, পাঁকাল, গুণপনা, পাগলপারা, বিবিয়ানা, কামদার, ধাপ্পাবাজ, শুশ্রূষা, ভার্যা, কৃত্য, রোরুদ্যমান, মাতৃকা, ভূমা, কাণ্ডারি, বড়াই।

২। কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের পার্থক্য কি? তিনটি কৃৎ প্রত্যয়ের নাম কর এবং কৃদন্ত শব্দ প্রয়োগ করিয়া বাক্য রচনা কর।

৩। খাঁটি বাংলা শব্দে বিদেশী প্রত্যয় যোগের কয়েকটি উদাহরণ দিয়া তাহারা কি কি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা বল।

৪। লঘু ও দরিদ্র এই দুইটি বিশেষণ পদের প্রত্যেকটির সহিত বিভিন্ন তদ্ধিত প্রত্যয় যোগ করিয়া তিনটি করিয়া বিশেষ্যপদ এবং দর্শন ও ব্যবহার এই দুইটি বিশেষ্য পদের প্রত্যেকটির সহিত কৃৎ এবং তদ্ধিত প্রত্যয় যোগ করিয়া একটি করিয়া বিশেষণ পদ গঠন কর। (উঃ মাঃ ১৯৬১ কম)

চতুর্থ অধ্যায়

উপসর্গ

সংস্কৃত ভাষায় **প্র, পরা, সম্, প্রতি, পরি, নি, অপ, দুস্, দুর্, নিস্ নির্, বি, অভি, অনু, অব, সু, উৎ, অতি, উপ, অপি, আ, অধি**—এই বাইশটি অব্যয় যখন ক্রিয়ার পূর্বে যুক্ত হয়, তখন ইহাদিগকে **উপসর্গ** বলা হয়। ক্রিয়া ব্যতীত অনেক সময়ে তাহারা নাম-পদের সহিতও যুক্ত হইয়া থাকে। তখনই এই উপসর্গগুলি প্রচ্ছন্ন ক্রিয়ার সহিত মিলিত থাকে।

এই সকল উপসর্গ কখনও বাঙ্‌লা ধাতুর সহিত যুক্ত হয় না। বাঙ্‌লা ভাষায় উপসর্গ জাতীয় কতকগুলি শব্দ বা শব্দাংশ রহিয়াছে তাহাদিগকে **বাঙ্‌লা উপসর্গ** বলা চলে।

উপসর্গ কোন সময়ে ধাতুর অর্থকে (১) বিশেষিত করে (২) কোন সময় বা তাহার অর্থকে বাধা দেয় (অন্য রূপ অর্থ প্রকাশ করে), (৩) কোন সময় বা ধাতুর যে অর্থ আছে তাহারই অনুসরণ করে। যথা—হৃ-ধাতুর অর্থ 'হরণ করা বা চুরি করা'। 'কাল সব কিছু হরণ করে'। কিন্তু উপসর্গের যোগে এই ধাতুর অর্থের নানারূপ পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। 'প্রহার' শব্দের অর্থ আঘাত করা, 'বিহার'—ভ্রমণ করা, আহার—খাওয়া, 'সংহার'—ধ্বংস করা, নীহার –শিশির।

[১] উপসর্গের অর্থ

প্র—(প্রকর্ষ, প্রগতি), পরা (দূর, বিপরীত), অপ (উলটা, নিকৃষ্ট), সম্ (সম্যক্, সহিত), অনু (পশ্চাৎ, সঙ্গে সঙ্গে), নির্, নিস্ (শূন্যতা, বহির্গত), অধি (প্রভুত্ব, উপরে), উপ (সমীপ, ছোট, দিকে), অতি (অতিক্রম), প্রতি (লক্ষ্য, বিপরীত), অপি (উপর, ভিতর)—সংস্কৃত ভাষায় সংক্ষিপ্ত রূপ 'পি'—'পিন্ধ' ধাতু (পরিধান করা)। প্রাচীন বাঙ্‌লায় 'পিন্ধ' ধাতু-তে সংস্কৃত 'অপি' উপসর্গের 'পি' আছে এবং এখনও বাঙ্‌লা উপভাষায় 'পিন্ধ' ধাতুর প্রয়োগ হয়। 'অদুনায়ে পিন্ধে কাপড় মেঘনাল শাড়ী, সেই শাড়ীর মূল্য ছিল বাইশ লক্ষ কড়ি ('গোপীচন্দ্রের গান) পরাভব, নির্গত, অধিকার, অতিক্রম, সঙ্গত, সঞ্চার, অভি (সম্মুখ, চারিদিক, সমীপ), অব (নীচে), আ (প্রতি), উৎ (উপরে), নি (নীচে), পরি (চতুর্দিকে), সু (সুন্দর), বি (বিশ্লেষ, বিশেষ ভাবে), অভিযান, অবনতি, পরিগত, পরিচয় বিয়োগ, বিজয় বিগত।

প্রকর্ষ, প্রহর্ষ, প্রভাব, পরাজয় (জয়ের বিপরীত), অপশব্দ, অপভ্রংস, অপবাদ, অনুগত, স্বাগত, অভিভাষণ, অভিষেক, অবনত, উন্নত, উন্নতি, উপবন, (বনের মতো, ছোট বন), উপদেশ, নির্ধন, দুঃস্থ (দুস্থ), বিকার, বিশেষ, বিনিময়, উৎসাহ, উদ্গত, বিগত, অনুগত, উত্তীর্ণ, অতিকায় (জন্তু) প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিকার, পরিবেশ, পরিধি, পরিস্থিতি, আবাল-বৃদ্ধবনিতা, আরম্ভ, আকণ্ঠ, (ভোজন) সুসময়।

ইহা ছাড়া আরো কতকগুলি অব্যয় উপসর্গের মত কার্য করে। তাহাদের মধ্যে কোন কোন অব্যয়ের নাম সংস্কৃত ব্যাকরণে **গতি**। (গতি) আবিস্ (আবিষ্কার), তিরস্ (তিরস্করণী বিদ্যা—তিরোধান), শ্রদ্ধা (শ্রৎ—বিশ্বাস ধা—স্থাপনার্থক), বহির্দেশ, বহির্দ্বার ইত্যাদি।

[২] বাঙ্‌লায় উপসর্গস্থানীয় শব্দ

ন, না, অ, অন, বা অনা, আন্, আ:—

অচিন্ ('অচিন্ দেশের রাজপুত্র নচিন দেশে যাও'—রূপকথা), নচিন্, অনাদায়ী (টাকা), অনামুখো, অনাছিষ্টি, আনকোরা, আকাট্ (মূর্খ), আছোলা, আগাছা আবছা, নারাজ, নাচার।

বি, বে:—বিঘোর, বিভুঁই, বে-বন্দোবস্ত, বেতর, বেবুঝ (অবুঝ), বেসামাল।

গর, দর—গরহাজির, গরমিল, (তহবিল গরমিল), দরকাঁচা, দরদালান।

হর, নিম্—হরবোলা, নিমরাজি, নিমচাকর, নিমখুন, হরদম, হরেক, হরঘর।
ভর, ফি—ভরসন্ধ্যা, ভরদিন, ফিদিন, ফিবছর।
সে—সেপায়া, সেতার, সেপত্তনী।

অনুশীলনী

১। উপসর্গ কাহাকে বলে? বাঙ্‌লা ও সংস্কৃত উপসর্গের সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।
২। বাঙ্‌লা ভাষায় খাঁটি বাঙ্‌লা উপসর্গের ব্যবহার আছে কি? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

চতুর্থ পর্ব

বাক্য প্রকরণ

প্রথম অধ্যায়

বাক্য

যে পদসমষ্টি পরস্পর অন্বিত এবং পূর্ণ অর্থের প্রকাশক তাহাকে ব্যাকরণশাস্ত্রে **বাক্য বলে**। একাধিক পদে বাক্য গঠিত হয়। অনেক বাক্যে একটিমাত্র পদ দেখা যায়। সে সমস্ত স্থলে অন্বয়ের জন্য পদ উহ্য রহিয়াছে মনে করিতে হইবে। যথা—'সে যায়', 'যাও'। প্রথম বাক্যটিতে দুইটি পদ আছে—তাহারা পরস্পর অন্বিত, যেহেতু "যায়" ক্রিয়ার কর্তা 'সে' পদ বাক্যে রহিয়াছে। ইহা পূর্ণ অর্থের প্রকাশক। 'যাও' একটি বাক্য, কেননা এখানে তুমি পদ উহ্য আছে। 'যাও'—ক্রিয়াপদের 'ও' বিভক্তি মধ্যমপুরুষ-কর্তা 'তুমি'—পদকে জ্ঞাপন করিতেছে। বাক্যে পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করিতে হইলে অন্ততঃ একটি ক্রিয়া এবং একটি কর্তা চাই। **"যোগ্যতা", "আকাঙ্ক্ষা", "আসত্তি"** না থাকিলে কেবল কতকগুলি পদের সমষ্টি বা সমূহ দ্বারা উহাদের পরস্পর অন্বয় সম্ভবপর হয় না এবং পূর্ণ অর্থও প্রকাশিত হইতে পারে না। সুতরাং সেরূপ স্থলে বাক্যও গঠিত হইতে পারে না।

[১] যোগ্যতা (Compatibility)

পদসমষ্টির অর্থদ্বারা পরস্পর সম্পর্ক স্থাপনের সামর্থ্যকে যোগ্যতা বলে। যদি কেহ বলে 'দীঘির জলে আগুন লাগিয়াছে' তবে ইহা বাক্য বলিয়া স্বীকৃত হয় না। জল ভিজা জিনিস, তাহাতে আগুন লাগিবার যোগ্যতা বা সামর্থ্য নাই। সুতরাং এরূপ উক্তি নিরর্থক বা অসঙ্গত (absurd)। এখানে যোগ্যতাহানি হওয়ায় ইহা বাক্য হয় নাই। মায়েরা বিরক্ত হইয়া অনেক সময় শিশুকে বলেন "পাখা দিয়ে তোমায় চাবকাবো"—'চাবুক' হইতে নাম ধাতু "চাবকান"। পাখা দিয়া পাখার বাড়ি দেওয়া চলে, চাবুকের বাড়ি (চাবকান) চলে না। এখানে যোগ্যতা হানি হইলেও ইহা বাক্য। পাখার বাড়ি অপেক্ষা চাবুকের বাড়িতে কষ্ট বেশি হয়। অধিকতর কষ্টের কথা বলিয়া শিশুকে ভয় দেখান এই বাক্যের তাৎপর্য। সুতরাং এখানে বাক্যটি শুদ্ধ। এইরূপ ছোট শিশুরা অনেক সময় সঙ্গীদের সঙ্গে ঝগড়া

হইলে বলে "লাঠি দিয়ে থাপ্পড় মারবো"। শিশুর জ্ঞানানুসারে থাপ্পড় খাওয়াই সবচেয়ে বেশি আঘাত পাওয়া। সুতরাং আঘাতের গুরুত্ব বুঝাইতে শিশুর মুখে লাঠি দিয়ে থাপ্পড় মারবো—শুদ্ধ।

[২] আকাঙ্ক্ষা (Expectancy)

অর্থের পূর্ণপ্রতীতির অভাবকে আকাঙ্ক্ষা বলে। পদ উচ্চারিত হইবার পর শ্রোতার মনে উহার সম্বন্ধে আরো কিছু জানিবার জন্য আগ্রহ জন্মে। বাক্যে ব্যবহৃত অন্য পদের বা পদসমূহের অভাবে সেই আগ্রহ বা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না। আকাঙ্ক্ষার সহিত থাকিবে আকাঙ্ক্ষিত পদ; তবেই উহা বাক্য বলিয়া গণ্য হয়। "ঘোড়া" বলিলে ঘোড়ার সম্বন্ধে তখনই আরো কিছু জানিবার আগ্রহ জন্মে। তখন বলা হয় 'ঘোড়া দৌড়ায়'। ইহা একটি বাক্য। কিন্তু যদি বলা হয় ঘোড়া, গোরু, হাতী তবে এই সব পদের পরস্পর কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। সুতরাং ইহাদের মিলনে বাক্য হয় না। ফলকথা আকাঙ্ক্ষা ও আকাঙ্ক্ষিত পদ না থাকিলে বাক্য গঠিত হইতে পারে না।

[৩] আসত্তি বা সান্নিধ (Juxtaposition)

বাক্যমধ্যে পরস্পর অন্বিত পদের নিকট অবস্থান ছাড়া বাক্যের অর্থ বুঝিতে বাধা জন্মে। সুতরাং অন্বিত পদসমূহের নিকট অবস্থান বা **আসত্তি** প্রয়োজনীয়।

এখন 'জল' পদ উচ্চারণ করিয়া তার কয়েক ঘণ্টা পরে 'নিয়ে এসো' বলিলে কোন অর্থের বোধ হয় না।. তাহা বাক্যও হয় না। মুদ্রিত পুস্তকে অন্বিত পদগুলি যথা সম্ভব পদের ক্রম অনুসারে পর পর বসিবে—ইহাই অনুধাবন করিতে হইবে। 'গিয়াছিলাম তোমাদের সকালে বাড়ি' এরূপ বাক্য হয় না। কারণ "তোমাদের" পদের সহিত বাড়ি শব্দের অন্বয়—'সকালে' পদের সহিত 'গিয়াছিলাম' এবং কর্তা আমি পদের অন্বয়। 'আমি' পদ সর্বাগ্রে বসিবে (কর্তৃপদ) ক্রিয়া 'গিয়াছিলাম' সর্বশেষে বসিবে। আসত্তি বিষয়ে অন্বিত পদ পরস্পর নিকটে স্থাপন করিবার বেলায় বাঙ্‌লা ভাষায় পদবিন্যাস রীতির ক্রমের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, 'যোগ্যতা' 'আকাঙ্ক্ষা' এবং 'আসত্তি' বাক্যের অর্থ বুঝিবার কারণ। ইহাদের ছাড়া বাক্যের সম্পূর্ণ অর্থ বোধ হয় না।

অনুশীলনী

১। দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা কর:—(ক) আকাঙ্ক্ষা, (খ) আসত্তি, (গ) যোগ্যতা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাক্যের প্রকারভেদ

গঠনের দৃষ্টিতে বাক্যকে তিন প্রকারে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—

(১) সরল, (২) জটিল, এবং (৩) যৌগিক।

[১] সরলবাক্য (Simple Sentence)

যে বাক্যে একটি মাত্র উদ্দেশ্য (কর্তা) ও একটি মাত্র বিধেয় (ক্রিয়া) থাকে তাহাকে সরল বাক্য বলে। সরল বাক্যের বিধেয় **সমাপিকা ক্রিয়া** হওয়া চাই।

নানা প্রকারে উদ্দেশ্যকে সম্প্রসারিত করা যায়। বিশেষণপদদ্বারা এবং সম্বন্ধপদদ্বারা এই কার্য হইতে পারে।

(১) ক্রিয়া বিশেষণ দ্বারা বিধেয়ের সম্প্রসারণ হইতে পারে। (২) বিভিন্ন কারকযোগেও সম্প্রসারণ হয়। কর্ম ও সম্প্রদানের সহিত প্রযুক্ত বিশেষ্য পদ **বিধেয়ের পরিপূরক** (Complement of the Predicate)

উদাহরণঃ—

সরল বাক্য— রাম বাড়ি যায়।

উদ্দেশ্য	**বিধেয়**	**সম্প্রসারণ**
রাম	যায়	বাড়ি

হরিবাবুর পুত্র রাম বাড়ি যায়। হরিবাবুর পুত্র—উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক।

[২] জটিল বা মিশ্র বাক্য (Complex Sentence)

জটিল বা মিশ্র বাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের অধীন, অথবা উদ্দেশ্য বা বিধেয়ের যে কোন একটির উপব নির্ভরশীল খণ্ডবাক্য (clause) থাকে।

এই খণ্ড বাক্য **প্রধান বাক্যের** (Principal clause) অর্থের পরিপূরক। খণ্ড বাক্যে কোন সময়ে সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, কোন সময়ে বা অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়।

মিশ্র বাক্যঃ—তুমি চাঁদা দিলে আমিও দিব। এখানে— 'তুমি চাঁদা দিলে' একটি খণ্ড বাক্য। এই বাক্য **'দিব'**—ক্রিয়াকে (প্রধান ক্রিয়া (Principal Verb) বিশেষিত করিতেছে। **মুখ্য বাক্য**--'আমিও দিব'।

মিশ্র বাক্যের অন্তর্ভুক্ত খংডবাক্যগুলি প্রধান বাক্যে (১) বিশেষ্য (২) বিশেষণ ও (৩) ক্রিয়া বিশেষণের কার্য করিয়া থাকে। সুতরাং ইহাদিগকে যথাক্রমে (১) **বিশেষ্যার্থক খণ্ড বাক্য** (noun clause) (২) **বিশেষণার্থক খণ্ড বাক্য** (adjective clause) (৩) **ক্রিয়া-বিশেষণার্থক খণ্ডবাক্য** (adverbial clause) বলা চলে।

উদাহরণঃ—'কে না জানে সবলের কখনও পরাজয় নাই'। 'কে না জানে'—প্রধান বাক্য (principal) 'সবলের কখনও পরাজয় নাই,—**বিশেষ্যার্থক খণ্ড-** (noun clause) **বাক্য** (প্রধান বাক্যের অধীন)—সমগ্র খণ্ডবাক্যটি 'জানে' ক্রিয়ার কর্ম। 'এমন ভাবে বাস করিবে যাহাতে কেহই জানিতে না পারে'। 'এমন ভাবে বাস করিবে'—প্রধান বাক্য, 'যাহাতে কেহই জানিতে না পারে'—**ক্রিয়াবিশেষণার্থক খণ্ডবাক্য**, 'বাস করিবে' ক্রিয়াকে বিশেষিত করিতেছে। 'অপরের প্রতারণা যাহারা বিদ্যার অনুশীলনের মতো অভ্যাস করে, তাহারাই তোমার বিশ্বাস-পাত্র হইবে।' 'তাহারাই তোমার বিশ্বাস-পাত্র হইবে'—প্রধান বাক্য। 'অপরের প্রতারণা যাহারা বিদ্যাব অনুশীলনের মতো অভ্যাস করে' **বিশেষণার্থক খণ্ডবাক্য,** 'তাহারা' পদকে বিশেষিত করিতেছে।

[৩] যৌগিক বাক্য (Compound sentence)

দুই বা ততোধিক বাক্য যখন সংযোগার্থক অথবা প্রতিষেধার্থক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয়, তখন সেই বাক্যকে **যৌগিক বাক্য** বলা হয়।

যৌগিক বাক্য গঠনে **"এবং"**, **"অথচ"**, **"কিন্তু"**, **'পরন্তু'**, **'নতুবা'**, **'ও'** প্রভৃতি অব্যয় ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণঃ—রাম যাবে, লক্ষ্মণ যাবে, সীতা যাবে, আর সঙ্গে যাবে সুমন্ত্র সারথি। তুমি পড়িতে চাও অথচ তোমার আর্থিক সঙ্গতি নাই। লোকে যেমন কর্ম করে সেইরকম ফল পাইয়া থাকে, এক কথা বারবার তোমাকে বলিয়াছি কিন্তু তুমি ইহাতে কর্ণপাত কর নাই।

(এখানে মিশ্রবাক্যযুক্ত যৌগিক বাক্য 'কিন্তু'—অব্যয় দ্বারা গঠিত হইয়াছে)

অনুশীলনী

১। গঠনের দৃষ্টিতে বাক্যের বিভাগ প্রদর্শন কর। ২। সরল, মিশ্র ও যৌগিক বাক্য কাহাকে বলে? প্রত্যেকটির একটি করিয়া উদাহরণ দাও। ৩। সরল ও জটিল বাক্য-সম্বলিত একটি যৌগিক বাক্য রচনা করিয়া তাহার অন্তর্গত সরল ও জটিল বাক্যের অংশগুলি দেখাইয়া দাও। এই ত্রিবিধ বাক্যের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও। (উ. মা. ১৯৬২)

তৃতীয় অধ্যায়

অর্থানুসারে বাক্যের শ্রেণীবিভাগ (বিভিন্ন ধরনের বাক্য)

গঠনানুসারে বাক্য সরল, জটিল ও যৌগিক—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। ইহা পূর্বেই দেখানো হইয়াছে।

[১] শ্রেণী বিভাগ

সমগ্র বাক্যের অর্থ বিচার করিলে বাক্যকে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান শ্রেণীতে ফেলা যায়ঃ—

(১) **প্রশ্নবোধক বাক্য** (Interrogative Sentence) :—

তুমি কি যাবে? তুমি কি কর? কেন এখানে রোজ রোজ জ্বালাতে আস?

(২) **অবধারণার্থক** (Indicative Sentence)

তুমিই সেই মহাপুরুষ। আমি গতকাল এখানে আসিয়াছি। আজ সে স্কুলে যাবে। অবধারণার্থক বাক্যে **নিষেধার্থক** বাক্যকেও গ্রহণ করা হয়। 'তুমি নব ফাল্গুনে আস নাই।'

(৩) **আজ্ঞা বা 'অনুজ্ঞার্থক'** (Imperative)

আদেশ, অনুনয়, নিষেধ, প্রার্থনা প্রভৃতি ইহার অন্তর্ভুক্ত।

'এখান থেকে **বেরিয়ে যাও**।' আমার ছেলেটিকে একটু **দেখবেন**। 'খোকা, ঘর থেকে **বেরিও** না বলছি।'

(৪) **ইচ্ছার্থক** (Optative)

'জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।' 'আজ সময় নেই, বেশ কাল সকালে আসুন না!'

(৫) **হেতুহেতুমদ্ভাবার্থক** (Conditional)

হেতু=কারণ, হেতুমৎ=কার্য বা ফল। হেতুহেতুমদ্ভাবার্থক বাক্যে একটি ঘটনা বা কার্য অপরটির উপর নির্ভরশীল। মন দিয়া পড়িলে **পাশ** হইবে। 'মন দিয়া পড়া'—কারণ, পাশ হওয়া তাহার কার্য বা ফল।

(৬) সন্দেহসূচক (Dubitative)

উপবাস করিয়া হয়তো সে রাত্রিতে খায়। যদিই বা সে একটা কিছু করিয়া ফেলে আমি আর দূর হইতে কি করিতে পারি। ঘটনা সত্যও হইতে পারে—আবার মিথ্যাও হইতে পারে। ওষুধ খেলে ভাল হতে পারেন আবার নাও হতে পারেন।

(৭) বিস্ময়াদি বোধক (Interjective)

কি আশ্চর্য এই দেশ! দেশবরেণ্য তুমিই ধন্য!

ইহা ছাড়া নিন্দা, প্রশংসা, পরিবেদনা প্রভৃতি বিভিন্ন অর্থানুসারে বাক্যের অনেক প্রকার শ্রেণী বিভাগ করা চলে।

[৩] বাক্যান্তরীকরণ (Conversion of Sentences)

অর্থের পরিবর্তন সাধন না করিয়া পূর্বে উক্ত (১) গঠনানুসারে বিভক্ত (২) অর্থানুসারে বিভক্ত দুই শ্রেণীর বাক্যের পরিবর্তন সাধন করা চলে।

সরল বাক্যকে

'আমরা ইহা জানি'	'আমরা এইরূপ লোক যাহাদের নিকট ইহা অজানা নাই।'
গাঁয়ের মোড়ল কোথায় থাকে?	যে গাঁয়ের মোড়লি করে সে কোথায় থাকে?

মিশ্র বাক্যকে সরল বাক্যে পরিবর্তন

মিশ্র	সরল
যে লোক সত্য কথা বলে তাহাকে সকলে বিশ্বাস করে।	সত্যবাদী লোককে সকলে বিশ্বাস করে।
জ্ঞান যাহার আছে এই রকম লোক সকলের পূজা পাইয়া থাকে।	জ্ঞানবান্ লোক সকলের পূজ্য।

যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে পরিবর্তন

যৌগিক	সরল
হয় সত্য কথা বলো নতুবা শাস্তি ভোগ কর।	সত্য বলা বা শাস্তি ভোগ করা—এ দুয়ের একটি কর।
সে এখানে আসিতে পাবে, কিন্তু আমার যাওয়া চলিবে না।	এখানে তাহার আসাতেও আমার যাওয়া চলিবে না।
সরল	**যৌগিক**
'দুর্ভিক্ষের পর আসিল মহামারী'।	দুর্ভিক্ষ আসিল এবং পরে মহামারী আরম্ভ হইল।
তুমি আমার কথায় কাজ ছাড়িও না।	আমি তোমাকে কাজ ছাড়িতে বলি, কিন্তু সেই মত কাজ ছাড়া উচিত নয়।

অর্থের দৃষ্টিতে বিভক্ত বিভিন্ন বাক্যের পরিবর্তন

প্রশ্নবোধক বাক্য	অবধারণার্থক বাক্য
তুমি কি কাজ কর?	তোমার কাজের পরিচয় চাহি। তুমি কি প্রকার কাজ কর তাহার খবর চাই। তোমার কাজের নাম কর।
তুমি কোথায় যাবে?	তোমার গন্তব্যস্থান জানিতে চাই। তোমার গন্তব্যস্থান বল।
তোমার নাম কি?	তোমার নাম জানাতে চাহিতেছি। তোমার নাম বল।
নিষেধার্থক বাক্য	**অস্ত্যর্থক বাক্য**
সে কাজ করে না।	তাহার কাজ করা মিথ্যা কথা! তাহার কাজ করার কথা অলীক।
সে বহুকাল বাড়ি যায় না।	সে বহুকাল বাড়িছাড়া। সে বহুকাল বাড়ির বাহিরে রহিয়াছে।
অনুজ্ঞার্থক বাক্য	
বেরিয়ে যাও।	তোমায় বেরিয়ে যেতে বলছি। তোমায় বেরিয়ে যাবার হুকুম দিচ্ছি।
হেতুহেতুমদ্‌ভাবাত্মক	
'মন দিয়া পড়িলে পাশ হইবে'।	মন দিয়া পড়ার ফল পাশ হওয়া।
ইচ্ছার্থক বাক্য	
জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।	জগদীশ্বরের নিকট আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করি।
আজ সময় নেই, বেশ কাল সকালে আসুন না!	আজ সময়ের অভাব, আমার ইচ্ছা আপনি কাল সকালে আসেন।
বিস্ময়ার্থক বাক্য	
কি আশ্চর্য এই দেশ!	এই দেশ অতি বিচিত্র।
'কি বিচিত্র এই দেশ!' (দ্বিজেন্দ্রলাল)	এই দেশ অতি আশ্চর্য।
হায় কি হোল দেশের দশা।' হেমচন্দ্র)	দেশের দশা অতি শোচনীয় হইল।

অনুশীলনী

১। অস্ত্যর্থক, বিস্ময়ার্থক ও অনুজ্ঞার্থক বাক্যের উদাহরণ দাও।

২। তোমার প্রদত্ত উদাহরণগুলিকে আবশ্যকমত অস্ত্যর্থক বা অবধারণার্থক বাক্যে পরিণত কর।

চতুর্থ অধ্যায়

বাক্যের উক্তি পরিবর্তন

ভাষায় বক্তা দুইরকমে নিজের বা অপরের উক্তিকে শ্রোতার সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারে। প্রত্যক্ষ উক্তি বা পরোক্ষ উক্তির সাহায্যে ইহা করিতে পারা যায়।

(১) **প্রত্যক্ষ উক্তি** (Direct narration)—আদি বক্তার উক্তির কোনরূপ পরিবর্তন না করিয়া বর্তমান বক্তার সম্মুখে উপস্থিত দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট উহার যথাযথ প্রকাশকে প্রত্যক্ষ উক্তি বলে। যথা—"হরিবাবু বলিলেন, 'আমি সেদিন বন্ধুর সহিত দুর্ব্যবহার করিয়া ভাল কাজ করি নাই'।"

(২) **পরোক্ষ উক্তি** (Indirect narration)—কোন উক্তি যথাযথভাবে প্রকাশ না করিয়া নিজ ভাষায় তাহার বিবরণ দিলে উহাকে **পরোক্ষ উক্তি** বলা হয়।

পূর্ব অনুচ্ছেদের উক্তির পরোক্ষ রূপঃ—হরিবাবু বলিলেন যে, তিনি সেদিন তাঁহার বন্ধুর সহিত দুর্ব্যবহার করিয়া ভাল কাজ করেন নাই।

উদাহরণঃ—প্রত্যক্ষ উক্তি—হরিবাবু সেদিন অফিসে বসিয়া বলিলেন, 'আমি আজ বাড়ি ফিরিব না।' **পরোক্ষ উক্তি**—হরিবাবু সেদিন অফিসে বসিয়া বলিলেন যে তিনি সেদিন বাড়ি ফিরিবেন না। হরিবাবু বলিলেন, 'আমি বিষয়টির কিছুই বুঝিতেছি না' (প্রত্যক্ষ উক্তি)। হরিবাবু বলিলেন যে তিনি বিষয়টির কিছুই বুঝিতেছেন না (পরোক্ষ উক্তি)।

বাঙ্‌লা ভাষায় প্রত্যক্ষ উক্তিরই সর্বাধিক প্রচলন দেখা যায়। আধুনিক লেখকেরা অনেকে ইংরেজী ভাষার অনুকরণে পরোক্ষ উক্তি ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রত্যক্ষ উক্তির ব্যবহারে বাঙ্‌লা ভাষা সংস্কৃতের অনুগামী। সংস্কৃত ভাষায় পরোক্ষ উক্তি একরূপ নাই বলিলেই চলে। পরোক্ষ উক্তির কালবিচারেও বাঙ্‌লা ভাষা সংস্কৃতের কালবিচারকে অনুসরণ করিয়া থাকে-ইংরেজীর অনুবর্তন করে না। বাঙ্‌লায় পরোক্ষ উক্তিতে প্রধান ক্রিয়ার অতীতকাল দ্বারা বাক্য আরম্ভ করিয়া অপ্রধান (গৌণ) ক্রিয়ার অতীতকাল প্রয়োগ করা হয় না। সংস্কৃত ভাষার যেরূপ প্রধান ক্রিয়ার কাল গৌণ ক্রিয়ার কাল নিরূপণ করিয়া থাকে, বাঙ্‌লাতেও সেইরূপ হয়।

যথা—'হরিবাবু বলিলেন যে তিনি বিষয়টির কিছুই বুঝিতেছেন না' এখানে প্রধান ক্রিয়া 'বলিলেন'। ইহা অতীতকালের ক্রিয়া। 'বুঝিতেছেন' গৌণ ক্রিয়া, ঘটমান বর্তমান কাল। কিন্তু 'বলিলেন' এর অতীতকালই 'বুঝিতেছেন' ক্রিয়ার অতীতকাল নিরূপণ করিতেছে। [পূর্বে দুইপ্রকার বাক্যান্তরীকরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। উক্তির পরিবর্তন হইতেছে তৃতীয় প্রকারের বাক্যান্তরীকরণ।]

অনুশীলনী

১। উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করঃ—(ক) প্রত্যক্ষ উক্তি (খ) পরোক্ষ উক্তি।

পঞ্চম অধ্যায়

বাচ্য

প্রত্যয়ের অর্থের নাম বাচ্য। প্রত্যয় যখন কর্তার অর্থ প্রকাশ করে তখন ক্রিয়া বা অন্যপ্রকারের পদে (যাহার সহিত ক্রিয়ার সম্পর্ক আছে তাহাতে) কর্তৃবাচ্য বা কর্তার অর্থ—যুক্ত আছে বুঝিতে হইবে। ক্রিয়াদ্বারা কর্তার অর্থ যেখানে প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়—সেখানে কর্তৃবাচ্য (Active Voice) আছে মনে করিতে হইবে। যথা—'চালক' চালি+ণক (কর্তৃবাচ্যে) চালি ধাতুর অর্থ 'চালান—অক (ণক) প্রত্যয়ের অর্থ 'কর্তা'—দুইটি মিলিয়া অর্থ হইল চালাইবার কর্তা—অর্থাৎ, যে চালায়। 'করি' বলিলে 'কর' ধাতুর অর্থ 'করা',-ই প্রত্যয়ের অর্থ (বিভক্তির অর্থ) 'কর্তা'—'করি' পদটির —ই কর্তাকে প্রকাশ করিতেছে—অতএব ইহা কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া। 'করা হয়' বলিলে—যাহাকে করা হইতেছে তাহাঁকে বুঝায় (=কর্মকে বুঝায়; কর্ ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে আ (=সংস্কৃত—'ত' প্রত্যয় হইতে উদ্ভূত 'আ' প্রত্যয়), 'করা'—'কৃদন্ত বিশেষণ'। কি করা হয়? উত্তর কাজটি করা হয় (আমাদ্বারা)। এখানে কর্মের অর্থ প্রধান। **কর্মবাচ্যে** (Passive Voice) কর্মের অর্থ প্রধান হয়।

ভাববাচ্য—এখানে শুধু **ক্রিয়ার অর্থ** প্রধান হয়। আমার এখনও **নাওয়া**-খাওয়া হয় নাই। এখানে 'নাওয়া' পদটিতে ভাববাচ্য আছে কারণ ইহা কর্তা বা কর্মের প্রাধান্য জ্ঞাপন না করিয়া শুধু **ক্রিয়ার (ভাবের)** প্রাধান্য জ্ঞাপন করিতেছে।

কর্মকর্তৃবাচ্য (Quasi-passive):—এখানে কর্ম কর্তার মত আচরণ করে। যথা—বইখানি বাজারে বেশ **কাট্ছে**। বাগানে বাঁশ **ভাঙ্গে**। মাথা **ধরিয়াছে** (মাথাকে ধরিয়াছে)। 'মাথা'—পদ কর্ম, কিন্তু এখানে কর্তার কাজ করিতেছে। 'সকল বেলায় **বিকায়** হেলায়' (হাট)।

[যখন কোন প্রত্যয়ের সহিত ক্রিয়ার সম্পর্ক স্থাপিত হয়—তখনই সেই প্রত্যয়ের প্রয়োগে বাচ্যের প্রশ্ন উঠে। বাচ্য সর্বসমেত আটটি—ছয় কারকের অর্থে ছয় বাচ্য—কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ এবং ভাববাচ্য ও কর্মকর্তৃবাচ্য। সমাপিকা ক্রিয়ার **কর্তা, কর্ম, ভাব** এবং **কর্মকর্তৃবাচ্য** -এই চার বাচ্য ব্যবহার হয়। আর কৃদন্ত পদে সকল বাচ্যই দেখা যায়।]

বাচ্য পরিবর্তন

সংস্কৃত ভাষায় ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যের বা ভাববাচ্যের প্রত্যয় যোগে (-য প্রত্যয় যোগে) অথবা কৃদন্ত পদের সাহায্যে কর্মবাচ্যের সমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়।

প্রাচীন বাঙ্‌লা ভাষায়, বাঙ্‌লার কোন কোন স্থানের উপ-ভাষায় এবং আধুনিক বাঙ্‌লা ভাষায় প্রত্যয়ান্ত ('বিভক্তিমূলক') কর্মবাচ্যের ক্রিয়ার অল্প প্রয়োগ দেখা যায়।

(১) সাধু ও চলিত ভাষায় **'আ' প্রত্যয়যোগে** এক প্রকার **কর্মবাচ্যের ক্রিয়া** ব্যবহৃত

হইয়া থাকেঃ—'এ বেশে তোমাকে মানায় না। ছোট মুখে বড় কথা ভাল **শোনায় না।** তোমাকে ভাল **দেখায়** না।

—**'ইয়ে'** (সংস্কৃত য=ইঅ) প্রত্যয় যোগে—'উত্তরপাড়া যাইয়ে না, ভাজাপোড়া খাইয়ে না' ('নড়াল-যশোহর-ঝাড়ার মন্ত্র)। **ই প্রত্যয়ান্ত**—তোমার কি চাই।

(২) বিশ্লেষণ দ্বারা গঠিত কর্ম ভাববাচ্যের ক্রিয়াঃ—

(ক) কর্মবাচ্যে সাধু বাঙলায় (**কর্মবাচ্যের কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হয়**) ক্রিয়াটি কৃদন্ত হয় এবং তাহার উত্তর কালানুসারে 'হ' ধাতুর প্রয়োগ হইয়া থাকে। আমি চন্দ্র দেখি (কর্তৃবাচ্য)। আমাকর্তৃক চন্দ্র দৃষ্ট হয় (কর্মবাচ্য)। এইরূপ, আমাকর্তৃক চন্দ্র দৃষ্ট হইতেছে। আমা-কর্তৃক চন্দ্র দৃষ্ট হইয়াছিল। আমাকর্তৃক চন্দ্র দৃষ্ট হইবে ইত্যাদি।

(খ) খাঁটি বাঙলা (চলিত ভাষায়) **কৃদন্ত পদের সহিত অন্য ক্রিয়া যোগে** কর্মবাচ্য বা ভাববাচ্যের ক্রিয়া গঠিত হয। হরিবাবু আমাকে ধরিয়া ফেলিয়াছেন (কর্তৃবাচ্য)। আমি হরিবাবুর কাছে ধরা পড়িয়াছি (কর্মবাচ্য)। আমি কাশী দেখিয়াছি (কর্তৃবাচ্য)। কাশী আমার দেখা আছে (কর্মবাচ্য)। অঙ্কটি আমি করিয়াছিলাম (কর্তৃবাচ্য)। অঙ্কটি আমাব কবা ছিল (কর্মবাচ্য)। অঙ্কটি আমি করিব (কর্তৃবাচ্য)। অঙ্কটি আমার করা হইবে। (কর্মবাচ্য)।

(গ) **ভাববাচ্যের ক্রিয়াঃ**—আমি হাসি (কর্তৃবাচ্য)। আমার হাসা হয ভাববাচ্য)। আমার হাসি পায়। সে নাচে (কর্তৃবাচ্য)। তাহার নাচা হয় (ভাববাচ্য)।

কর্ম ও ভাববাচ্যের কর্তার বিভক্তি

কর্মবাচ্যের কর্তায তৃতীযা বিভক্তি হয (এই কর্তাকে অনুক্ত কর্তা বলে)। রাম আমাকে দেখে (কর্তৃবাচক) আমি রাম কর্তৃক দৃষ্ট হই, **কখন কখন ষষ্ঠী বিভক্তি হয়**—বঙ্কিম-চন্দ্রের রচিত পুস্তক, তোমারই দেওয়া প্রাণ, আমার খাওয়া হয, **মহাশয়ের** থাকা হয কোথায? (উঃ মঃ ১৯৬০)।

অনুশীলনী

১। বাঙলায় বাচ্য পরিবর্তনের নিয়ম কি কি? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

২। ভাব ও কর্মবাচ্যের গঠন ও প্রযোগ উদাহরণসহ বুঝাও।

৩। কর্তৃবাচ্যে একটি বাক্য বচনা করিয়া উহাকে কর্মবাচ্যে পরিবর্তিত কর এবং এই বাক্যদ্বয়ের সাহায্যে কতৃবাচ্য ও কর্মবাচ্যের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও। ভাববাচ্যের প্রযোগটিও উদাহরণযোগে বুঝাইয়া দাও। (উঃ মাঃ ১৯৬২)

পঞ্চম পর্ব

শব্দার্থ

প্রথম অধ্যায়

শব্দদ্বৈত

(Reduplication of Words)

বাঙ্‌লা ভাষায় সর্বপ্রকার পদের দ্বিত্ব লক্ষিত হয়—ইহা এই ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য। এই দ্বিত্ব বিশিষ্টার্থ প্রকাশ করিয়া থাকে।

[ক] পুনরাবৃত্তি বুঝাইতে—(১) বছর বছর লোকটা আসে। (২) গোরুর দুধ গলিগলি ফিরিয়া বিক্রীত হয়। (৩) 'হাজার হাজার বছর কেটেছে কেহ ত কহেনি কথা।'—(রবীন্দ্রনাথ) (বহুবচন)। বড় বড় বানরের বড় বড় লেজ (বহুবচন)। 'মুঠো মুঠো রঙা জবা কে দিল তোর পায়—(নজরুল)। (৪) সকাল সকাল কাজ সেরে ঘরে যাব (প্রকর্ষর্থক)। (৫) খোকন, চিড়িয়াখানায় গেলে তুমি ইয়া-ইয়া বাঘ দেখতে পাবে (এইরূপ বড় এবং অনেকগুলি)। (৬) ছেলে **ভালয় ভালয়** বিলেত থেকে ফিরলেই হয় (নিরাপদে) (প্রকর্ষার্থক)।

[খ] ভিন্নশব্দ যোগে (সম্পূর্ণতা দ্যোতিত করে)—(১) আমি এ ব্যাপারে মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারি না (সম্পূর্ণ)। (২) জনমানবশূন্য এই বনে তুমি কি করে এলে! (৩) তুমি নিজেই লজ্জাসরমের মাথা খেয়েছো—অন্য পরে কা কথা! (৪) এই দুর্দিনে আণ্ডাবাচ্চা নিয়ে বড় কষ্টে দিন চলছে।

[গ] সাদৃশ্যার্থে অথবা ঈষদর্থেঃ—(১) এসো তোমরা! আমরা চোর-চোর খেলব (চোরের মত সাজিয়া)। (২) লোকটার ভাল মানুষ ভাল মানুষ চেহারা, কিন্তু পেটে পেটে যত কুবুদ্ধি। (৩) আমার জ্বর জ্বর বোধ হচ্ছে (জ্বরের মত)। (৪) রামপ্রসাদ মা-মা করে দিন কাটাতেন (মা-জগন্মাতাকে পাইবার জন্য আগ্রহ)। দাদা দাদা করিয়া ছোট ভাই তো পাগল—কিন্তু দাদা সাড়া দেন না। (৫) 'পূর্ব গগনে পূর্ণিমার চাঁদ করিতেছে উঠি উঠি'—রবীন্দ্রনাথ। 'মাথার উপরে বাড়ি পড় পড়' (ঈষদ্‌ভাবে)—রবীন্দ্রনাথ। (৬) 'রশ্মি-রসে ডুবু-ডুবু বন আবির্ভূতা বনে বনদেবী'—(সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)।

[ঘ] ব্যতিহার অর্থেঃ—(১) দুজনে মুখামুখি হইয়া বসিলেন (একজনের মুখ আর একজনের দিকে দিয়া)। (২) এখান থেকে একেবারে সোজাসুজি রাজবাড়ি চলে যাও। (৩) জাতিবর্ণনির্বিশেষে বিজয়ার কোলাকুলিতে যে আন্তরিকতা প্রকাশ পায় তাহার তুলনা মিলে না (পরস্পর আলিঙ্গন)। (৪) রাতারাতি কাজ হাসিল করা চাই (অনতিক্রমণ)। (৫) বেলাবেলি আপন ঘরে ফিরি। (৬) শহরে বড় ধরাধরি চলিতেছে (ধরা প্রভৃতি একাধিকবার)।

[ঙ] বীপ্সার্থে শব্দদ্বৈত—"বনে বনে উড়ে তোমার রঙীন বসন প্রান্ত।" (রবীন্দ্রনাথ)

[চ] অনুকার ধ্বনিবিশিষ্ট শব্দদ্বৈত—অনুকার শব্দদ্বৈত দুই প্রকারঃ—(১) ধ্বন্যাত্মক শব্দ (২) ধ্বন্যাত্মক শব্দে অন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাব দ্যোতিত করে এই প্রকার শব্দ।

(১) ভদ্রলোক কাঁচ শসা কচ্ কচ্ করিয়া খাইতে লাগিলেন। (২) চারিদিকে মেলার লোকেরা যে রকম কচর কচর আরম্ভ করিয়া দিয়াছে তাহাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত (গোলমালের অনুকরণ ধ্বনি)। (৩) মনের মত কথা শুনিতে না পাইয়া তিনি রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন (চাপা ক্রোধের ভাবব্যঞ্জক শব্দ)। (৪) কাঠঠোকরা পাখীটি বাড়ির পাশের গাছটায় ঠোঁট দিয়া অনবরত ঠক্‌ঠক্ করছে (শুষ্ক কাষ্ঠে ছোট কিছু দিয়া আঘাতে উত্থিত অনুকার শব্দ)।

ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলিতে অনেকস্থলে ধ্বনির ভাব প্রকাশ না করিয়া **অন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভাবের প্রকাশক হইয়া থাকে**:—(১) ফোঁড়ার ব্যথায় টন্ টন্ করে (তীব্র ও তীক্ষ্ণানুভূতি বিশেষ)। (২) দুই চোখ জ্বালায় কর্‌কর্ করিতেছে (কাঁকড়ের আঁচড় লাগার অনুভূতি)। (৩) চোর ধরা পড়ামাত্রই ওকে মারবার জন্য আমার হাত নিশপিশ (নিসপিস) করতে লাগলো (অস্থিরাতবোধ)। (৪) 'বামেতে মাঠ শুধু সদাই করে ধু ধু'—বধূ—(রবীন্দ্রনাথ)—শূন্যতা ও ব্যাপ্তিদ্যোতক)। (৫) বৈশাখের খররৌদ্রে মাঠ খাঁ খাঁ করিতেছে (শূন্যতা-দ্যোতক)। (৬) 'কেতুনপুরে রাজার উপবনে সবে তখন ঝিকিমিকি বেলা'—রবীন্দ্রনাথ (অল্প আলোতে ঝক্‌মক্ করার ভাব)। (৭) 'দিনান্ত সুরম্য, বায়ু বহে ঝুর্‌ঝুর্ (অভিজ্ঞান শকুন্তলা—অনুবাদ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ), (মৃদুতা প্রকাশক)। (৮) 'গলার হার দিল ঝিলিমিলি'—কৃত্তিবাস (ঝিলিমিলি উজ্জ্বলতা দ্যোতক—সীতাকে উজ্জ্বল হার পরাইল)। (৯) 'দুশমন-লোহু ঈর্ষায় নীল, তব তরঙ্গে করে ঝিল্-মিল্'—(শাত-ইল আরব') (উজ্জ্বলতাদ্যোতক)। (১০) (ক) "সেই 'দাঁড়াও' শব্দ অনেকক্ষণ ধরিয়া যেন গম্‌গম্ করিতে লাগিল।" (রাজর্ষি—রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৩৯, গম্ভীরভাবে শব্দিত হইতে লাগিল)। (খ) 'অরণ্যের প্রত্যেক পাতাটা যেন সেই শব্দের কম্পনে রীরী (রিরি) করিতে লাগিল'। (তীব্র ক্রোধের (প্রভৃতির) অনুভূতি সূচিত করিতে লাগিল)—রাজর্ষি—রবীন্দ্রনাথ পৃঃ ৩৯)। (১১) সন্ধ্যাবেলায় সেই পড়ো বাড়ির কথা মনে হলেই গা ছম্‌ছম্ করে (ভয়ে দেহের বিকার)। (১২) আজ আঁকাশ বড়ই পরিষ্কার—বেশ ফুটফুটে জ্যোৎস্না (উজ্জ্বল ধবধবে)। (১৩) এটা ঘোর কলিকাল। কট্‌মট্ করে লোকের দিকে তাকালেই তাকে আজকাল ভস্ম করা যায় না (কঠোরতা পূর্ণ)। (১৪) লোকটা একেবারে কাঠখোট্টা—এত অনুনয় বিনয় করেও দরিদ্র ছেলেটির জন্য তাকে দিয়ে কিছু করান গেল না (দয়ামায়া শূন্য, রসবোধহীন)।

[ছ] ধ্বন্যাত্মক শব্দ (Onomatopoetic words)

ধ্বন্যাত্মক বা অনুকরণ শব্দ বাঙ্‌লা ভাষার অন্যতম বিশিষ্ট সম্পদ। অনুকরণাত্মক শব্দের সংখ্যা প্রায় সাতশতের মতো। বর্ণনার কাজে ইহাদিগকে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ইহারা যে কার্য সাধন করে তাহা করিবার জন্য অন্য শব্দের প্রয়োগ করা চলে না। বাঙ্‌লা-ভাষার নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় ইহাদের সকলগুলির মূল পাওয়া যায় না। ইহারা দেশী শব্দের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। 'মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা বাজল ঠঙ্ ঠঙ্' (রবীন্দ্রনাথ) কাঁসর ঘণ্টা প্রভৃতির বাজনার শব্দ 'ঠঙ্গ্ ঠঙ্গ'কে স্থির করায় ঐরূপ শব্দ (ধ্বনি) ক্রমাগত চলিতেছে বুঝা যায়।

ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি সাধারণতঃ ক্রিয়া বিশেষণ রূপে '-ইয়া' (অসমাপিকাসূচক প্রত্যয়)

প্রত্যয় যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—কোন সময় বা বিনা বিভক্তিতেও ইহাদের প্রয়োগ হয়। পূর্বোক্ত উদাহরণে 'ঠং ঠং' এতে কোন বিভক্তি নাই—ইহাদিগকে অব্যয়রূপে স্বীকার করা হয়। "ঝনঝনিয়ে (=ঝন ঝন-ইয়া) ঝিকিয়ে উঠে অসি।"

ধ্বন্যাত্মক শব্দের গঠন

(১) শুদ্ধ ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়ার কোন পরিবর্তন হয় না যথা—হাঁক, ফোঁস, হাঁচ। 'হাঁকে বীর' শির দেগা নাহি দেগা আমামা। (নজরুল ইসলাম)

'খলজল তুলি লক্ষ ফণা
ফুঁসিছে গর্জিছে নিত্য করিছে কামনা।'—(রবীন্দ্রনাথ)

(২) অধিকাংশ যায়গায় ক্রিয়াকে দ্বিত্ব করা হইয়া থাকেঃ—ফোড়াটা বেশ টনটনাচ্ছে।

(৩) অনেক স্থলে দ্বিত্বপ্রাপ্ত ক্রিয়ার পরবর্তী অংশের ধ্বনির আংশিক পরিবর্তন হয়ঃ—বীরপদভরে ধরণী টলটলায় (আন্দোলিত হইতেছে)।

বিভিন্নধ্বনি প্রকাশক শব্দ

কাঁসরঘণ্টা—ঠং ঠং। দুন্দুভি (দামামা)—দ্রিম্ দ্রিম্—দ্রিম্ দ্রিম্ বাজে দুন্দুভি দামামা' (নজরুল ইসলাম) 'ডিম ডিম'—দুন্দুভি বেজে ওঠে ডিম্ ডিম্ রবে', (রবীন্দ্রনাথ)। দামামা—দমদম (ভারতচন্দ্র) কামান—গবগব (ভারতচন্দ্র) অসি ঝনঝন (=ঝঞ্ঝন) 'বক্ষের পাশে ঘন উল্লাসে অসি বাজে ঝঞ্ঝন।

'ধুদ্ ধুদ্ ধুদ্ ধুদ্ ধুদ্ নৌবত বাজে।
ঘন ভোরঙ্গ ভম ভম্ দামামা দম দম
ঝনন্ন ঝম ঝম ঝাঁঝে॥
কত নিশান ফর ফর নিনাদ ধর ধর
কামান গরগর গাজে॥' (ভারতচন্দ্র)

কাড়ার বাজনা—(১) কড়্ কড়্—'বাজে কাড়া কড়কড়' (মধুসূদন) [কাড়া=ঢাক জাতীয় বাদ্য যন্ত্র] (২) কড়্ কড়্—বাজ পড়ার শব্দ। হাড় কাঠ ইত্যাদি ভাঙ্গিবার শব্দ—মড়্মড়্—মড় মড়্ করিয়া গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িল। [কিন্তু পাতার মর্মর]

গম্ভীর শব্দে শব্দিত বা ভরপুর হওয়ার ভাবপ্রকাশ—'গমগম'—আসর গমগম করছে (সংসদ অভিধান)। ক্রমাগত ব্যর্থ প্রার্থনার ভাব প্রকাশ—ঘ্যা ঘ্যা (করা লোকটা নিজের দুঃখের কথা শোনাবার জন্য এর ওর কাছে ঘ্যা ঘ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কে ওর কথা শোনে!

নাকী কান্না বা নাছোড়বান্দা অনুনয়ের ভাবসূচক—প্যান প্যান। তোমাকে কিছুতেই সন্তুষ্ট করা যাবে না—তোমার প্যানপ্যান (করা) সব সময় লেগেই আছে।

[এই প্রসঙ্গে সপ্তম পর্ব—চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য]

অনুশীলনী

১। অর্থ নির্দেশপূর্বক নিম্নলিখিত শব্দ দ্বিত্বগুলি দ্বারা সার্থক বাক্য রচনা কর:— কটকট্। চোর-চোর। ডুবুডুবু। কচ্কচ্। টন্টন্। কর্কর্। ঝিকিমিকি। ধুধু। ঝন্ঝন্। ঝিলিমিলি। খাঁ খাঁ (কলিঃ ১৯৫৩)। গম্গম্। রী রী। ছম্ছম্। জলটল,

কলকল, ছলছল, উঠিউঠি, মা মা, চা চা, মুঠো মুঠো, ইয়া-ইয়া, বন্ বন্, ভালয় ভালয়, মুখোমুখি, রেষারেষি, হাজার হাজার।

২। শব্দদ্বৈত কিরূপে গঠিত হয়? শব্দদ্বৈতের বিভিন্ন অর্থ প্রকাশের উদাহরণ দাও।

৩। অনুকার ধ্বনিবিশিষ্ট শব্দদ্বৈত বলিতে কি বুঝ? উদাহরণদ্বারা বুঝাও।

৪। নিম্নলিখিত প্রয়োগসমূহের উদাহরণ-সহযোগে অর্থ নির্দেশ কর—(ক) ঈষদর্থে শব্দদ্বৈতের প্রয়োগ, (খ) পুনরাবৃত্তি বুঝাইতে শব্দদ্বৈতের প্রয়োগ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভিন্নার্থক সমোচ্চার্য বা সদৃশ শব্দ

অংশ—ভাগ। আমার অংশের টাকা ভালয় ভালয় দিয়ে দাও।

অংস—স্কন্ধ। 'বামাংস উন্নত তাই হয়েছে তাঁহার' (নবীনচন্দ্র দাস কবি গুণাকর)।

অন্ন—খাদ্যবস্তু। পরান্ন ভাল তবু পরগৃহ ভাল নহে।

অন্য—অপর, ভিন্ন।

অর্ঘ—মূল্য, পূজার উপকরণ।

অর্ঘ্য—পূজার উপকরণ, 'পূজ্য'।

অশন—ভোজন। অন্নপ্রাশন শব্দের অন্তে 'অশন'। 'না ছিল তাহার অশনভূষণ'—(রবীন্দ্রনাথ)। **নিরশন**—যাহার খাদ্য নাই।

অসন—দূর করা। গুরুর নিকট হইতে সব সন্দেহের **নিরসন** করিয়া লও। (নির্+অস্+অন)।

অশক্ত—অসমর্থ, অপরাগ। আজ এ কাজ করিতে অশক্ত হইলে করিব না।

অসক্ত—আসক্তিশূন্য, স্পৃহাশূন্য। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন 'অসক্ত হইয়া কর্ম করিবে।'

আহুতি—হোম। হোমের সামগ্রী।

'একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া'—(রবীন্দ্রনাথ)।

আহূতি—আহ্বান। দেশমাতৃকার আহূতির ধ্বনি সেদিন সকলে শুনিল।

করবী—ফুলবিশেষ। 'ছড়াত সবে'

আঁচল হতে অশোক চাঁপা করবী'—(রবীন্দ্রনাথ)।

কবরী—বেণী, (মেয়েদের) খোঁপা।

কুট—পর্বত, দুর্গ। হেমকুট হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা তেজঃপুঞ্জ'—(মাইকেল)।

কূট—(১) কুটিল, দুর্বোধ (২) পর্বতশৃংগ (৩) চূড়া।

(২) কূটবুদ্ধি সম্পন্ন লোক অপরের কাছে সহজে ধরা দেয় না। (২) চিত্রকূটে রাম বাস করিয়াছিলেন। (৩) 'দিল্লীপ্রাসাদকূট, হোথা বারবার বাদশাজাদার তন্দ্রা যেতেছে ছুটে' (বন্দীবীর)।

কুল—(১) বংশ। 'ক্ষত্রকুলে জন্ম তার, থাকে যদি তরবার'—(পৃথ্বীরাজ' কাব্য)। (২) সমূহ—কত যে ফুটিত ফুলকুল নিত্য নিত্য' (মধুসূদন)।

কূল—নদীর তীর। 'উছলি উঠে কলরোদন নদীর কূলে কূলে'—(গীতাঞ্জলি)।

কৃতি—কর্ম। চিত্রকর স্বীয় কৃতির পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। দুষ্কৃতির শাস্তি একদিন লাভ করিতেই হইবে।

কৃতী—কর্মকুশল, কৃতকার্য। আজ আমরা বঙ্গজননীর কৃতী সন্তান আশুতোষকে স্মরণ করি।
কটি—কোমর। 'ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী'—(বর্ষামঙ্গল—রবীন্দ্রনাথ)।

ক্ষীণ কটি ঘেরি বাজে কিঙ্কিনী' (আবির্ভাব—রবীন্দ্রনাথ)।

কোটি—(১) শত লক্ষ। 'সপ্তকোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদ করালে'—(বঙ্কিমচন্দ্র)।

(২) প্রান্ত। উচ্চ কোটির সংগীত গাহিবার লোকের অভাব। (উৎকৃষ্ট)।

গোলক—গোলাকার বস্তু, যাহার উপরে পৃথিবীর প্রতিরূপ অঙ্কিত আছে।

গোলকের সাহায্যে ভূগোল শিক্ষা দেওয়া হয়।

গোলোক—বৈকুণ্ঠ, বিষ্ণুলোক। গোলোকপতি ভগবান্ গোবিন্দকে প্রণাম কর।

চীর—(১) ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড। 'চলিল সন্ন্যাসী ত্যজিয়া নগর, ছিন্ন **চীরখানি** ল'য়ে শির পর' (শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা—রবীন্দ্রনাথ)। 'চীর গৈরিক দিয়া আশিসিল ভারতজননী কাঁদি'—(চিত্তনামা—নজরুল)।

(২) বল্কল। 'আমি জটা চীরধারণ করিয়া রাজাজ্ঞা পালনের জন্য বনবাসী হইব' (রামায়ণী কথা)।

চূত—আম্র। 'নব মধুলোভী ওগো মধুকর,
চূতমঞ্জরী চুমি'—(প্রাচীন সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ)।

চ্যুত—(স্খলিত) (১) "চ্যুত মঞ্জরীর গন্ধে অঞ্জলি ভরিল আম্রবন"
—(রবীন্দ্র-মঙ্গল'—নরেন্দ্র দেব)।

(২) কর্মচ্যুত লোকটির দুঃখের পরিসীমা রহিল না।

তরণী—নৌকা
তরুণী—যুবতী,
} '**তরুণীরা** মিলি' **তরণী** বহিয়া পঞ্চসুরে ধরিল গান,—('পতিতা', রবীন্দ্রনাথ)।

নীড়—পাখীর বাসা, কুলায়।

'ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ পক্ষী-সমান
ছুটে যেন নিজ **নীড়ে**'—(বন্দীবীর, রবীন্দ্রনাথ)।

নীর—জল। (১) 'পরিপূর্ণ নীল **নীর** স্থির অনাহত—' —(বিজয়িনী, রবীন্দ্রনাথ)
(২) 'কোথা শিপ্রানদীনীরে হেরে উজ্জয়িনী স্বমহিমচ্ছায়া'।

বলি—(১) দেবতার উদ্দেশ্য নিবেদিত বস্তু। পূজোপহার।

বলির ছাগের আত্মরক্ষার কোন উপায় থাকে না।
'আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা
দিবে কোন বলিদান'—(নজরুল)।

(২) জরাজনিত গাত্রচর্মের শিথিলতা। মুখের সর্বত্র বলি দেখা যাইতেছে, কিন্তু বৃদ্ধের তৃষ্ণার বিরাম নাই।

বলী—বলবান্। 'জীবনাশে সতত
বিরত সখি! রাঘবেন্দ্র বলী'—(মধুসূদন)।

লক্ষ—একশ হাজার, বহু। 'থল জল ছলভরা, তুলি' লক্ষফণা
ফুঁসিছে গর্জ্জিছে নিত্য—(রবীন্দ্রনাথ)।

লক্ষ্য—(১) উদ্দিষ্ট বস্তু। 'লক্ষ্যশূন্য লক্ষবাসনা'—(রজনীকান্ত সেন)।
(২) নিশানা। 'পুনঃ পুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বয়ম্বরস্থলে।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে বলে ক্ষত্রিয়সকলে॥' (কাশীরাম দাস)।

বান—(২) বন্যা } গৌরাঙ্গ অবতারে প্রেমের ঠাকুর বাণদ্বারা (১) কাহাকেও
বাণ—(১) শর } জয় করেন নাই—প্রেমের বানে (২) দেশ ভাসাইয়াছিলেন।
(১) 'ছন্দোবাণবিদ্ধ বাল্মীকিরে বারেক শুধায়ে এসো'—(রবীন্দ্রনাথ)।
(২) 'বান ডেকেছে মরা গাঙে
খুলতে হবে নাও
তোমরা এখনও ঘুমাও'—(মুকুন্দ দাস)।

বিনা—ব্যতীত। 'বিনা মেঘে বজ্রাঘাত অকস্মাৎ ইন্দ্রপাত'—(অমৃতলাল বসু)।

বীণা—বীন—বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। 'অমৃতরসে রসনা সিকতি
আপনার স্বর্ণবীণা আরোপিলা করে'—(মধুসূদন)।

সুত—পুত্র। 'অনাথ পিণ্ডদ সুতা বেদনায় অশ্রুপ্লুতা'—(রবীন্দ্রনাথ)। অধিরথ সুত কর্ণ রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইলেন।

সূত—সারথি। 'সূত হই সূতপুত্র যেবা কেবা হই'—("কর্ণার্জ্জুন")।

কালিদাস—লোকের নাম (সংজ্ঞা শব্দ)। কালিদাস মহাকবি ছিলেন।
'আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে'—(রবীন্দ্রনাথ)।

কালীদাস—কালীর সেবক। এই লোকটি কালীদাস (কালীর ভক্ত সেবক)।

গ্রহীতা—গ্রহণকারী। দাতা থাকিলে দানের একজন গ্রহীতা চাই।

গৃহীতা—গ্রহণ করা হইয়াছে যাহাকে (স্ত্রীলিঙ্গ)। রাক্ষসগৃহীতা সীতা রামচন্দ্র কর্তৃক অগ্নিশুদ্ধির পর পুনর্গৃহীতা হইলেন।

টিকা—(১) তিলক। (২) বসন্তাদি রোগের প্রতিষেধক। (৩) অঙ্গরাদিদ্বারা প্রস্তুত বটিকা। (১) নক্ষত্র রায় রাজটিকা পরিলেন।

টীকা—ব্যাখ্যা। কঠিন সংস্কৃত গ্রন্থ টীকা ছাড়া বুঝা যায় না।

দ্রষ্টব্যঃ—কাজি নজরুল 'শাত-ইল-আরব' কবিতায় তিলক অর্থে 'টীকা' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন—'ললাটে তোমার ভাস্বর টীকা'। 'দিয়ে গেনু ভালে তোর বেদনার টীকা'। (দারিদ্র্য)।

স্বগোত্র—নিজের গোত্র। তুমি তোমার স্বগোত্র বল।

সগোত্র—সমান গোত্র। এই ভদ্রলোক আমার সগোত্র।

সজ্জা—(১)। 'গৃহসজ্জা' ঘরের আসবাবপত্র।

শয্যা—(২) বিছানা। 'গৃহশয্যা'—ঘরের বিছানা।
(১) 'এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণসজ্জা'—(শঙ্খ, রবীন্দ্রনাথ)।
(২) 'শয্যাপ্রান্তে লীন তনু ক্ষীণ শশি-রেখা'—(মেঘদূত—রবীন্দ্রনাথ)।

সাক্ষর—যে লিখিতে পড়িতে পারে, যাহার সহিত অক্ষরের পরিচয় আছে। ব্রিটিশ আমল অপেক্ষা বর্তমানে ভারতে সাক্ষর লোকের সংখ্যা বাড়িয়াছে।

স্বাক্ষর—দস্তখত। আবেদনপত্রে তোমার স্বাক্ষর চাই।

কৃতদাস—যাহাকে ভৃত্য করা হইয়াছে। অফিসে কাজ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই লোকের স্বাধীনসত্তা নষ্ট হয়—সে তখন হয় অপরের কৃতদাস।

ক্রীতদাস—যাহাকে অর্থের বিনিময়ে ভৃত্যরূপে ক্রয় করা হইয়াছে। প্রাচীনকালে ক্রীতদাসপ্রথা সুসভ্য জাতির কলঙ্কস্বরূপ ছিল।

শরণ—আশ্রয়স্থল। ভগবান্ বুদ্ধের শরণাপন্ন হইতেছি। কোশলরাজ দীনের শরণ ছিলেন।

সরণ—পথ। 'যাব আজীবন কাল পাষাণকঠিন সরণে—(সংকল্প—রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ১০)।

স্মরণ—(১) মনে করা, (২) স্মৃতি। (১) 'নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি' **স্মরণের** আবরণে মরণেরে যত্নে রাখে ঢাকি'—(তাজমহল—রবীন্দ্রনাথ)।

জাল—মাছ ধরার জন্য জেলেরা নদীতে জাল ফেলে।

জ্বাল—দুধ জ্বাল দেওয়া হইয়া থাকে।

তারা—'আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে'—(রবীন্দ্রনাথ)।

তাড়া—তাড়া খেয়েও লোকটা নড়তে চায় না। চিঠির তাড়া (গোছা) নিয়ে কাজ করি।

থাটি—দিন থাটি দিন খাই।

খাটি, খাঁটি—বিশুদ্ধ। বেশি দাম দিলেও খাঁটি জিনিস মেলা ভার।

সিত—সিত—শুভ্র। 'সিত মর্মরে খচি বিরাট দেউল রচি'—(কালিদাস রায়)।

শীত—ঠান্ডা, শীত ঋতু। 'আসিল শীত সঙ্গে লয়ে দীর্ঘ দুখ নিশা'—(রবীন্দ্রনাথ)। উত্তর দিক হইতে শীতবায়ু নির্মমভাবে বহিতে লাগিল।

স্বত্ব—অধিকার। এ জমিতে তোমার কোন স্বত্ব নাই।

সত্ত্ব—তিন গুণের মধ্যে প্রধান গুণ, অস্তিত্ব, প্রাণী। সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট সর্বকিছু সহজেই প্রকাশিত হয়।

সম—সমান। 'চেতনা মোর কল্যাণরস সরসে শ্বেতশতদল সম ফুটিল হরষে,—(রবীন্দ্রনাথ)।

শম—শান্তগুণ। ঋষির তপোবনে শমগুণ বিরাজিত।

সর্গ—(১) সৃষ্টি। পুরাণে সর্গ অতিসর্গ মন্বন্তর প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

(২) পদ্য কাব্যের অধ্যায়। 'ছ-টা সর্গে বার্তা তাহার বৈতো কাব্যে গাঁথা' (সেকাল—রবীন্দ্রনাথ)। (ছ-টা সর্গ=ঋতুসংহার কাব্যের ছয় সর্গ)

স্বর্গ—দেবলোক, ইন্দ্রলোক। 'সমুদ্র তরঙ্গবাহু তুলি কি কহিছে স্বর্গ পানে'—(রবীন্দ্রনাথ)।

সার্থ—দল। সার্থবাহ সহ বণিক্‌সার্থ উটের পিঠে মাল বোঝাই করিয়া দুর্গম পথে প্রাচীনকালে বাণিজ্য করিত। (সার্থবাহ=বণিক্ সংঘের নেতা)।

স্বার্থ—নিজের প্রয়োজন। স্বার্থ সকলেই দেখে। 'স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত'—(রবীন্দ্রনাথ)।

স্বর—ধ্বনি। 'কণ্ঠস্বরে বজ্র লজ্জাহত' (হোরিখেলা—রবীন্দ্রনাথ)।

সর—দুধ দধির উপরের আবরণ। দুধের সর খেয়ে ফেললে থাকে কি?

শর—(১) বাণ। ভীষ্ম শরশয্যা গ্রহণ করিলেন। (২) খাগড়াগাছ। শরবনে কার্তিকের জন্ম হয়।

শিখর—পর্বতের চূড়া। 'এস হে গিরিশিখর চুমি ছায়ায় ঘিরি কাননভূমি'—(রবীন্দ্রনাথ)।

শেখর—শিরোমালা। চূড়া। 'কবিশেখর' 'রাজশেখর,' 'শশিশেখর'।

অন্নপুষ্ট—অন্ন (খাদ্য) দ্বারা পালিত। আমাদের এই অন্নপুষ্ট দেহের জন্য মায়া হয় বৈকি।

অন্যপুষ্ট—(১) অন্যের দ্বারা (অপর লোকের দ্বারা) পালিত। যে লোক অপরের ঘরে বাস করে এবং অন্যপুষ্ট তাহার পক্ষে স্বাধীন চিন্তা করা সম্ভব নহে। (২) 'কোকিল'।

অর্ধাশন—অর্ধ+অশন (ভোজন) অর্ধেক আহার। আমাদের দেশে বহু লোক অর্ধাশনে দিন কাটায়।

অর্ধাসন—আসনের অর্ধাংশ। রাজা দুষ্মন্ত ইন্দ্রের সহিত অর্ধাসনে বসিতেন।

কিল—মুষ্টাঘাত। কিল খেয়ে যারা কিল চুরি করে তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না।

কীল—হুড়কো, খিল, গোঁজ, পেরেক। দুইটি কাষ্ঠখণ্ড কীল দ্বারা যুক্ত করা যাইতে পারে।

জমক—সমারোহ। সকল ঐশ্বর্য যাঁর হাতের মুঠোর ভিতরে, জাঁকজমকে পুজো করে তাঁকে খুসী করবো!

যমক—সাহিত্যে ব্যবহৃত অলংকারবিশেষ। বাংলা সাহিত্যে 'গুপ্তকবির' যমক প্রয়োগ সকলের পরিচিত।

আষাঢ়—বৎসরের তৃতীয় মাস। 'কোন্ পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে লিখেছিলে মেঘদূত।'

আসার—প্রবল বৃষ্টির ধারা। অবশেষে একদিন বহুপ্রত্যাশিত আসার নামিল।

বানি—গয়না বানাইবার মজুরি। বানির টাকা যোগাড় হলেই গয়না গড়াবো।

বাণী—বাক্য, সরস্বতী। 'অহরহ শুনি তব আহ্বান বাণী'—(রবীন্দ্রনাথ)।

সূক্তি—(সু-উক্তি, 'ভাল কথা', সুবচন, সুভাষিত)। সংস্কৃত সাহিত্যে সূক্তি-সংগ্রহ-কারদের মধ্যে বল্লভদেব অন্যতম।

শুক্তি—ঝিনুক। 'আসন তোমার দেখি শুক্তিগাঁথা নদীর কূলে।'

পরিচ্ছেদ—পুস্তকের অধ্যায়। এই উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে কি আছে?

পরিচ্ছদ—পোষাক। মহামূল্য পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া রাজা সভায় আসিলেন।

মতি—বুদ্ধি। দেশের কাজে যেন মতি থাকে।

মোতি—মুক্তা। 'আধগলে বনমালা বিরাজিত আধগলে গজমতি।'

অন্ত—শেষ। তোমার অন্ত পাওয়া ভার। তোমার দুষ্টামির অন্ত নাই।

অন্ত্য—(বিশেষণ পদ, শেষে অবস্থিত)। গমন শব্দের অন্ত্যবর্ণ উচ্চারিত হয় না। (অন্ত্যবর্ণ সর্বশেষ বর্ণ এখানে 'অ' কার)।

দিন—দিবস। 'দিনের আলো নিভে এল।'

দীন—দরিদ্র। 'দীনের এ পূজা, দীন আয়োজন'—(রবীন্দ্রনাথ)।

শিকার—মৃগয়া। রাজা শিকারে বাহির হইলেন।

স্বীকার—অঙ্গীকার। তোমার কথা স্বীকার না করে উপায় কি?
স্বর—গানের নিয়ন্ত্রিত ধ্বনি। 'দেখতে হবে জগদ্বীণা কোন্ সুরেতে বাজে'—(মুকুন্দ দাস)।
শূর—বীর। শূরশ্রেষ্ঠ অর্জুন লক্ষ্যভেদ করিলেন।
ছত্র—ছাতা। 'শ্বেতপদ্ম ছত্র শোভে শরতের শিরে'—(কবিগুণাকর)।
ছত্র—(সংস্কৃত 'সত্র' হইতে)। অন্ন, জল প্রভৃতি যেখানে দান করা হয়। অন্নপূর্ণার রাজ্যে আগে ছত্র হইতে আহার্য মিলিত।
দ্বিপ—হস্তী। বনদ্বিপের উৎপাতে ঋষিরা ব্যাকুল হইলেন।
দীপ—প্রদীপ। 'জ্বালা দীপমালা নগরে নগরে'। 'জ্বলে না গৃহে গৃহদীপ'—(কালিদাস রায়)।
দ্বীপ—(দ্বি-অপ্ [জল] দুইদিকে, চারিদিকে=জল যাহার। 'নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ প্রবাল দিয়ে ঘেরা'—রবীন্দ্রনাথ)।
হার—গলার মালা। 'পুষ্পহারে বেড় রাজধানী'—(জনা')।
হাড়—অস্থি। সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র রবীন্দ্রনাথের নিকট হাড়ের চেয়েও কঠিন লাগিত।
অকিঞ্চন—যাহার কিছুই নাই, সর্বহারা। এ দান অকিঞ্চন জনের প্রাপ্য।
আকিঞ্চন—অভিলাষ। দীনের গৃহে মধ্যাহ্নভোজন করিবেন—এই আকিঞ্চন।
ইহা—এই জিনিস। ইহা কি বল তো!
ঈহা—চেষ্টা। ঈহা বা চেষ্টা যাহার নাই সেই নিরীহ লোক।
ওষধি—ফল পাকিলে যে উদ্ভিদ্ নষ্ট হয়। বসন্তকালের ওষধিগুলির মধ্যে যব প্রধান।
ঔষধি—ঔষধ। কেহ কেহ বলেন মূর্খের কোন ঔষধি নাই। কাহারও কাহারও মতে মূর্খের লাঠ্যৌষধি।
কৃত্তি—বাঘের চামড়া। ভগবান্ শিবকে কৃত্তিবাস বলে।
কীর্তি—যশ। কর্তা চলিয়া গেলেও কীর্তি চিরকাল থাকে।
ধরা—ধারণ করা। চোর পালানোর পর চোর ধরার লোক অনেক পাওয়া যায়।
ধড়া—কটিবস্ত্র। শ্রীকৃষ্ণ পীতধড়া বনমালী।
ধড়—ছিন্নমস্তক দেহ। দুর্বৃত্তগণ বাড়ির মালিকের কেবল ধড়টি ফেলিয়া গিয়াছে।
প্রসাদ—অনুগ্রহ। দেবতার প্রসাদে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলাম।
প্রাসাদ—রাজবাড়ি। 'তোমার প্রাসাদ সৌধ অনিন্দ্য নির্মল'—(রবীন্দ্রনাথ)।
পটল—সমূহ, রাশি। জলধর-পটল, তিমির পটল। জলধরপটলে আকাশ আচ্ছন্ন।
পটোল (পটল)—পটোলের পাতায় পিত্তনাশ হয়। [পটলচেরা চোখ, 'পটলতোলা']।
শিকার—মৃগয়া। রাজপুত্র শিকারে বাহির হইলেন।
স্বীকার—অঙ্গীকার। পরের জন্য দুঃখকষ্ট স্বীকার অনেকেই করে না।
বর্ষা—(ঋতুবিশেষ)। 'বর্ষা রাতে মেঘের গুরু গুরু'—(রবীন্দ্রনাথ)।
বর্শা—সড়কি। 'বরশা হাতে, ভরসা প্রাণে সদাই নিরুদ্দেশ'—(রবীন্দ্রনাথ)।
প্রকার—রকম। সমাস কয় প্রকার?
প্রাকার—প্রাচীর। আগ্রা দুর্গের প্রাকার অত্যন্ত দৃঢ়।
পুৎ—(১) নরক বিশেষ। (২) প্রাদেশিক ['পুত্র' শব্দ হইতে] ছেলে।

পূত—পবিত্র। 'আনো পূতবারি আনো হেমঝারি।'—(ক্ষীরোদপ্রসাদ)।

বিজন—নির্জন। এ বিজন বনে মানুষের তো বাস করার কথা নয়। 'ভূধরে সাগরে বিজনে নগরে যখন যেখানে ভ্রমি'—(রবীন্দ্রনাথ)।

বীজন—পাখা। রামচন্দ্র তালপাত্রের বীজনদ্বারা সীতার ক্লান্তি দূর করিলেন।

শবল—নানাবর্ণযুক্ত। আকাশে শবল ইন্দ্রধনু (রামধনু) দেখিলে আনন্দ বোধ হয়।

সবল—বলবান্। সবল লোক দুর্বলের উপর অত্যাচার করে।

সব—সকল। ভাইসব, বেড়িয়ে এসো।

শব—মৃতদেহ। মাত্রা বদলাইলেই শব শিব হইয়া থাকেন।

অবিচার—অবিবেচনা। এ অন্যায় অবিচার আমরা সহ্য করবো না।

অভিচার—অপরের অনিষ্টার্থে তান্ত্রিক ক্রিয়া। রাজা শত্রুকে অভিচার দ্বারা মারিলেন।

সান্ত—অন্তবিশিষ্ট—যাহার অন্ত আছে। ঈশ্বর অনন্ত হইয়াও সান্ত।

শান্ত—ধীর, অনুদ্ধত। 'ভদ্র মোরা শান্ত বড়ো পোষমানা এ প্রাণ।'—(রবীন্দ্রনাথ)

শাপ—অভিশাপ, অভিসম্পাত। যক্ষ প্রভুর শাপে নির্বাসিত হইল।

সাপ—সর্প। সব সাপের মাথায় মণি থাকে না।

শিল—মসলা বাঁটিবার পাথর। 'ঝি জব্দ কিলে, বৌ জব্দ শিলে।' (প্রবাদ)

শীল—স্বভাব। যাহার কুল শীল জানা নাই তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা ভাল নয়।

অবদান—উন্নত কার্য। 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা' একটি বৌদ্ধ অবদান কাহিনী।

অবধান—মনোযোগ। 'সভাজন কর অবধান।'

সাম—গানের বেদ। 'প্রথম প্রচারিত **সামরব** তব তপোবনে',—(রবীন্দ্রনাথ)।

শ্যাম—সবুজ রঙ্। 'আকুল করেছো শ্যামসমারোহে'—(রবীন্দ্রনাথ)।

জড়—(১) একত্র করা। 'রাশি রাশি মিল করিয়াছ জড়'—(রবীন্দ্রনাথ)। (২) অবচেতন। আচার্য জগদীশচন্দ্র জড়ের প্রাণশক্তি প্রমাণিত করিয়াছেন। (৩) শিকড়।

জ্বর—রোগবিশেষ। ম্যালেরিয়া জ্বরে দেশ উজাড় হইল।

শিকড়—গাছের মূল। গাছের শিকড়ে জল ঢাল।

শীকর—জলকণা। 'চিকুর সিন্ধু-শীকর-লিপ্ত'—(দ্বিজেন্দ্রলাল)।

বসন—বস্ত্র। 'বসন কার দেখিতে পাই জ্যোৎস্নালোকে লুণ্ঠিত।'

ব্যসন—(১) ঘোর বিপদ। (২) বিলাসিতা প্রভৃতি দোষ। (১) উৎসবে ব্যসনে দুর্ভিক্ষে যে থাকে সেই প্রকৃত বন্ধু। (২) রাজারাজড়ারা কত টাকা বিলাসব্যসনে ব্যয় করিতেন।

তুলা—তুলনা, মাপিবার যন্ত্র। 'কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা।'

তূলা—কার্পাস বা শিমুল তূলা। ঝড়ের মুখে শিমুল তূলা কতক্ষণ থাকে।

অন্যান্য—অপর সকল। আমাদের অদ্যকার আলোচনার অন্যান্য বিষয় ছাড়িয়া দিয়া কেবল আমরা সমাজ সেবার কথা আরো গভীরভাবে চিন্তা করিতে থাকিব।

অন্যোন্য—পরস্পর। এ যুগের মানুষ সমাজের নিকট অন্যোন্য সুবিচার চাহে।

অবতরণ—নামা। ভগীরথের কঠোর তপস্যায় প্রীত হইয়া গঙ্গা ভূতলে অবতরণ করিলেন।

অবতারণ—নামান (নাবান)। ভগীরথের কঠোর তপস্যাই গঙ্গার মর্ত্যলোকে অবতারণের কারণ।

উপকথা—গল্প। বাঙ্‌লা সাহিত্যে উপকথার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

রূপকথা—ছেলে ভুলান অসম্ভব গল্প। ঠাকুরমার কাছে শিশুরা রূপকথা শোনে।

কাশি—কাশিবার শব্দ। লোকের হাসি দেখিলে হাসি পায়—আর কাশি শুনিলেও কাশি পায়।

কাশী—বারাণসী। বৈরাগ্য উপস্থিত না হইলে কেহ কাশীতে বাস করিতে পারে না।

কাঁসি—কাঁসর ঘণ্টা। সন্ধ্যায় দেবমন্দিরে কাঁসি বাজে। 'ঘরে আমার রাখতে যে হয় বহুলোকের মন, অনেক বাঁশি, অনেক কাঁসি, অনেক আয়োজন'—রবীন্দ্রনাথ।

বাঁশি—মুরলী (বংশী)। 'অতি দূর হ'তে আসিছে পবনে বাঁশির মদির মন্দ্র'।

বাসি (বাসী)—পর্যুষিত (তৎসম শব্দ) টাটকা নহে এমন। (১) বাসি খাবার খাইয়া অনেকেই অসুখে ভোগে। [বাসী কাপড়, বাসি জল (পূর্বরাত্রে তোলা জল) বাসী মড়া (পূর্বরাত্রের মধ্যে যাহাকে দাহ করা হয় নাই), বাসী মুখ—সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর যে মুখ ধোয়া হয়। (২) অতি পুরাতন, নতুনত্ববিহীন—বাসি খবর। 'সে যুগ হয়েছে বাসি' (নজরুল ইসলাম)]।

কেড়ে—কাড়িয়া (বলপূর্বক অপরের জিনিস লওয়া) কমলাকান্তের মত—'যদি খেতে হয় তো কেড়ে খাবে।'

কেঁড়ে—মাটির হাড়ি বা ভাঁড। যাব দুধের কেঁড়েতে দুধ আছে তার সঙ্গে কেউ পারে না।

কেরে—কোন্ ব্যক্তি। নাও বেয়ে কোথা যাস কেরে তুই নেয়ে।

গোলা—(১) কামানের গোলা (সংস্কৃত 'গোলক' শব্দ হইতে) শত্রুপক্ষ দুবেপাল্লাব কামান দ্বারা গোলা বর্ষণ করিতেছিল। (২) ধান্যাদির মরাই—আড়ত। গোলাভরা যার ধান আছে তার মতো সুখী কে? [দেশী শব্দ] (৩) তরল করা (ক্রিয়াপদ) গোবর গুলিয়া রাখিলে তাহা দ্বারা গৃহস্থের অনেক কাজ হয়।

গুলি—(১) বন্দুকের ছররা বা বুলেট [হ্রস্বার্থে—ই প্রত্যয়]=ক্ষুদ্র গোলা। (২) ঔষধের বটিকা (বড়ি)। (১) বন্দুক থাকিলেই যে কোন লোকের উপর গুলি ছুড়িতে হইবে—ইহা কেহ বলে না। (২) একটি হজমিগুলি খেলেই পেটের গোলমাল সেরে যাবে।

জোড়—মিলন, এক সঙ্গে লাগান, সংযোগ। (১) দুইটি বিরুদ্ধ বস্তু কখনও জোড় খায় না (=সংযুক্ত হয় না)। (২) যুগল—রাম শ্যাম দুই বন্ধু যেন মাণিক জোড়।

জোর—গায়ের জোরে কবিতা মিলানো চলে না।

সহস্ত—হস্তের সহিত বর্তমান। ব্রহ্ম অহস্ত হইয়াও সৃষ্টিবিষয়ে সহস্ত।

স্বহস্ত—নিজের হাত। তুমি স্বহস্তের দান ফিরাইয়া লইও না।

প্রত্যাশা—আশা করা। আমি পরের ধনের প্রত্যাশা করি না।

প্রতি-আশা—লোকের প্রতি-আশাই সফল হয় না।

রসনা—জিহ্বা। দেহে ভাল রাখিতে হইলে রসনার সংযম দরকার।

রশনা—স্ত্রীলোকের কটিভূষণ, কাঞ্চী, মেখলা, চন্দ্রহার। দেশের সর্বপ্রকার সম্পদ বৃদ্ধি হইলেই ভারতমাতা রত্নরশনা পরিবেন।

মরা—মৃত। মরা গোরু কি কখনও ঘাস খায়?

মড়া—শব, মৃতদেহ। পোড়াইবার লোক না থাকায় মড়া তিন দিন ঘরে পড়িয়া রহিল।

প্রকৃত—যথার্থ, সত্য। তুমিই প্রকৃত কথা বলিয়াছ।

প্রাকৃত—সাধারণ। প্রাকৃত জনের মতো রামচন্দ্র অনেক সময় শোকপ্রকাশ করিয়াছেন।

কৃত—যাহা করা হইয়াছে। নিজের কৃতকর্মের ফল ভোগ কর।

ক্রীত—যাহা কেনা হইয়াছে। ক্রীত দ্রব্য ফেরত দেওয়া মুস্কিল।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুচ্ছে সমভাবে উচ্চারিত শব্দের ভিন্নার্থে প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়া বাক্য রচনা করঃ—

শরণ, স্মরণ, সরণ। শ্রুতি, স্রুতি। টিকা, টীকা। অশক্ত, অসক্ত। আত্মবন্ধু, আপ্তবন্ধু। কুল, কূল। লক্ষ, লক্ষ্য। বান, বাণ। তরুণী, তরণী। নীর, নীড়। চির, চীর। গোলোক, গোলক। কৃতি, কৃতী। সর, শর, স্বর। শিখর, শেখর। গ্রহীতা, গৃহীতা। শয্যা, সজ্জা। খাটি, খাঁটি (খাঁটি)। সত্ত্ব, স্বত্ব। কৃতদাস, ক্রীতদাস। জমক, যমক। মতি, মোতি। সুক্তি, শুক্তি। দ্বিপ, দ্বীপ। প্রসাদ প্রাসাদ। অবিচার, অভিচার। অবদান, অবধান। পরিচ্ছদ পরিচ্ছেদ। তুলা, তুলা। হার, হাড়। জোর, জোড। কাঁসি, কাশি। উপকথা, রূপকথা। নিরশন, নিরসন (কম)।

ষষ্ঠ পর্ব

বাগ্‌ভঙ্গী, শব্দ ও বাক্যাংশের বিশেষ অর্থে প্রয়োগ

প্রথম অধ্যায়

বাঙ্‌লা বাগ্‌ভঙ্গী (চলতি বুলি, বাক্যরীতি Idioms)

জগতের প্রাণবান্ ভাষামাত্রেরই নিজস্ব প্রকাশভঙ্গী আছে। সেইসব প্রকাশভঙ্গী যে সব সময় ব্যাকরণ-শাস্ত্র-সম্মত হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। এখানে বহুল শিষ্ট প্রয়োগই শুদ্ধতা নির্ণয়ের প্রমাণ।

জগতের অন্যতম প্রধান ভাষা বাঙ্‌লাতেও তাহার বিচিত্র প্রকাশভঙ্গী রহিয়াছে। তাহা বিশিষ্ট লেখকগণের প্রয়োগ হইতে শিক্ষা করিতে হইবে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাঙ্‌লা বাগ্-ভঙ্গীসম্মত বহু প্রয়োগ সন্নিবেশিত হইল। বিদ্যার্থিগণ এই অধ্যায়টি চতুর্থ অধ্যায়ের সহিত আলোচনা করিলে বাঙ্‌লা বাগ্‌ভঙ্গী বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবেন।

'রবিতল' কথাটি (ইংরেজি under the sun) পৃথিবী অর্থে বাঙ্‌লা গদ্যে প্রযুক্ত হয় না। পদ্যে ইহার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়ঃ—

'আর আর বস্তু যাহা রবিতলে রয়।'—ঈশ্বর গুপ্ত।

'মহীতলে' 'ভূতলে' 'আকাশতলে' "অম্বরতলে" প্রভৃতি গদ্যে প্রয়োগ দেখা যায়, পদ্যেও

আছে। শুভ্রচিন্তা (=পবিত্র চিন্তা অর্থে) 'উঠে শুভ্রচিন্তা কত'—কামিনী রায়। 'অনাবিল চিন্তা', 'নির্মল চিন্তা', 'পবিত্র চিন্তা' প্রভৃতির বহুল প্রয়োগ সাহিত্যে পাওয়া যায়।

'আপনার উপস্থিতি প্রার্থনীয়'—প্রার্থনা করা যাইতেছে অর্থে প্রার্থনীয় পদ ব্যাকরণ-দুষ্ট হইলেও বাগ্‌ভঙ্গী-অনুসারে শুদ্ধ (হিন্দীর মত 'প্রার্থিত' পদ এস্থলে অচল)।

'কালাপেড়ে কাপড়'—শুদ্ধ প্রয়োগ। উহা 'কালোপেড়ে কাপড়' হইবে না। 'এমন সময় সাদাসিদে সরু কালাপেড়ে একখানি শাড়ি পরে মাথায় ঘোমটা টেনে কুমু ঘরে প্রবেশ করলে।'—(যোগাযোগ—রবীন্দ্রনাথ)।

'তাহার মাথার ঠিক নাই'—(=তাহার বুদ্ধি নাশ হইয়াছে) 'মাথা ঠিক নাই' হইবে না।

'মামার বাড়ি'—(শুদ্ধ) ('মামাবাড়ি' নহে)। 'এটা স্কুল, এ তোমার মামার বাড়ি নয়'।

'তিনি এ বিষয়ে **যোগ্যতা প্রাপ্ত করিয়াছেন'**—ব্যাকরণশুদ্ধ হইলেও অপপ্রয়োগ,—শুদ্ধ প্রয়োগ—যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন, অর্জন করিয়াছেন।

গ্রন্থাগার সন্ধ্যা সাতটায় খোলে—সভ্যগণ **খেয়াল রাখিবেন**—সভ্যগণ অবহিত হইবেন—মনে রাখিবেন প্রভৃতি প্রয়োগ হইয়া থাকে।

খাবার বেলায় বলা হয়,—(করণ-প্রয়োগ) 'হাতে করে খাও'—নেবার বেলায় বলি 'হাত দিয়ে নাও' হাত দিয়ে খাও'—হাতের সাহায্যে খাও—অন্য কোন উপায়ে **নহে**।

'গেল **বছরকার** আপনার দেনার টাকাটা মিটিয়ে দিন' শুদ্ধ। 'চৈত্রমাসকার টাকা আপনাকে দিতে হবে'—অশুদ্ধ।

'মানুষ থেকে গন্ধ বেরোচ্ছে' (অশুদ্ধ) 'মানুষের গা থেকে গন্ধ বেরোচ্ছে' (শুদ্ধ)। 'মানুষের কাপড় থেকে গন্ধ বেরোচ্ছে' (শুদ্ধ)।

'বাবা তোমার মতন একটা কুকুর চাই' (অশুদ্ধ), তোমার কুকুরের মতন একটা কুকুর চাই (শুদ্ধ)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শব্দ ও বাক্যাংশের বিশেষার্থে প্রয়োগ
(Idomatic use of Words and Phrases)

বিশেষ্য পদ

হাত—(১) এ কাজে তাঁর কোনই হাত নাই। (২) কাজটি তাঁর হাতেই আছে (অধিকার)। (৩) যেরূপেই হোক না কেন লোকটাকে হাত করে দলে টানতে হবে (আয়ত্ত)। (৪) দোকানটি বহু হাত বদলিয়েছে (বহু মালিকের অধীন হইয়াছে)। (৫) অপরের নিকট হাত পাতা মানী লোক কখনও সহ্য করিতে পারে না (কিছু প্রার্থনা করা)। (৬) হাতে হাত মেলান শত্রুর পক্ষে এখন হয়তো সম্ভবপর হতে পারে (একমত হওয়া)। (৭) তাকে হাতে না মেরে ভাতে মারবো। (হাতে মারা—শারীরিক কষ্ট দেওয়া)। (৮) এই বদমেজাজী লোকটি যখন তখন যার তার হাতে মাথা কাটতে চায় (সদ্য কঠোর শাস্তি দেওয়া)। (৯) শ্রীধর এখন সন্ন্যাসী হইয়াছেন, কিন্তু পাঠশালায় পড়িবার সময় তার হাতটান (চুরির অভ্যাস) ছিল।

মুখ—(১) ঝড়ের মুখে শিমুল তুলা কতক্ষণ থাকে? (সামনে আক্রমণে)। (২) মুখে মুখে লঙ্কাজয় সকলেই করিতে পারে (কথায়)। (৩) সমগ্র রাজপুত জাতি এই সঙ্কটে মেবারের মহারাণার মুখের দিকে চেয়ে আছে (আদেশের প্রতীক্ষায় আছে)। (৪) বাপধন! চাঁদ মুখ খোল, তুমি যদি বোবা হও তবে এ দুনিয়ায় বৃহস্পতি আর কে আছে? (মুখ খোলা=কথা বলা)। (৫) নদীর মুখে (মোহনায়) যখন নৌকা উপস্থিত হইল, তখন আকাশে ঘোর ঘনঘটা। (৬) রোজ আমায় পাঁচটি মুখের (ব্যক্তির) আহার জোটাতে হয়। (৭) এই ব্যাপারের পর আমি আর কাউকে মুখ দেখাতে পারি না (লজ্জিত হওয়া)। (৮) মিথ্যা কথা হাতে নাতে ধরা পড়ায় তার মুখ চুণ হইয়া গেল। (ভয়ে বা লজ্জায় সাদা ফ্যাকাসে হওয়া)। (৯) উচিত কথা বলায় বন্ধু মুখ হাঁড়ি করিলেন। (=গম্ভীর)।

চোখ—(১) পরের জিনিসে চোখ দেওয়া (লোলুপ দৃষ্টি) ভাল কাজ নয়। (২) ছোট ছেলেটির চোখ উঠিয়াছে (বিশেষ একপ্রকার চক্ষুরোগ হইয়াছে)। (৩) অপরের উন্নতিতে চোখ টাটানোর হাত থেকে অনেক ভাল লোকও বাদ যায় না (পরের উন্নতি দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হওয়া)। (৪) ছেলেটি এত দুষ্ট হইয়াছে যে তাহাকে চোখে চোখে রাখা দরকার (সতর্কদৃষ্টি)। (৫) আপনি আমার ওপরওয়ালা হতে পারেন, কিন্তু বিনা দোষে আমার উপর আপনার চোখ পাকানো সহ্য করবো না (ক্রুদ্ধ দৃষ্টি)।

কান—(১) পাওনার কথা শুনিবার জন্য কর্তা কান খাড়া করিলেন (শুনিবার জন্য উৎসুক)। (২) সব দিকে ব্যর্থ হইয়া লোকটা অবশেষে আমার নিকট আত্মীয়দের কান ভাঙ্গাইতে আরম্ভ করিল (বিরুদ্ধে মিথ্যা বলিয়া মনোমালিন্য সৃষ্টি করা)। (৩) এত বড় একজন লোকের বিরুদ্ধে এইরূপ গর্হিত মন্তব্য শুনিতে হইলে সকলেরই কানে আঙ্গুল দেওয়া ছাড়া উপায় কি? (অশ্রাব্য কথা শুনিতে না চাওয়া)।

নাম—(১) তুমি কোথাকার কে হে' তোমার বাপ দাদার নাম জানিনে। (পরিচয়)। (২) সবটাই তিনি করিলেন, অথচ এরূপ কঠিন কাজে তাঁহার কোন নাম নাই। (খ্যাতি—প্রশংসা)। (৩) সনাতন গোস্বামী এক মনে নাম জপ করিতেছিলেন (ইষ্টদেবতার নাম)। কলিতে নামে মুক্তি (ভগবানের নাম জপে)। (৪) (ক) ধর্মের নামে পয়সা রোজগার তো চলেই (ধর্মের অজুহাতে)। (খ) জাতের নামে বজ্জাতি এ যুগে কেউ বরদাস্ত করবে না। (৫) 'কালিদাস তো নামেই আছেন, আমি আছি বেঁচে'—রবীন্দ্রনাথ (নামমাত্র—শব্দমাত্রে)। হরি বাবু তো নামেই, কাজে ন'ন। (৬) এই পাড়াগাঁয়ের স্টেশনটিতে যাত্রীর নামমাত্র বিশ্রামাগার আছে।

পেট—(১) বাবা এত বুদ্ধি তোমার পেটে পেটে (মনে)! পেটের কথা বার করা আমার পক্ষে কঠিন হবে না। (২) পেটের জন্যই তো রোজ ভূতের বেগার খাটি (জীবন ধারণ)। (৩) পেটে বোমা মারলেও কিছু বার হয় না যার তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে যাচ্ছে? (নিতান্তই মূর্খ)। (৪) সংসারের চার দিহে বিপদ দেখে আমার তো পেটের ভিতর হাত-পা সেঁধিয়ে যাচ্ছে (কি কর্তব্য তাহা স্থির করিতে না পারা)।

বুক—(১) (অন্তর, হৃদয়) 'বুকের মাঝে কয় সে (ঝরণা) কথা সোহাগঝরা সংগীতে' —রবীন্দ্রনাথ। (২) কে এ বিপদের সামনে বুক ঠুকিয়া (সাহস করিয়া) দাঁড়াইতে পারে!

(৩) এই রকম গান দেশকে শোনাও কবি, যে গানে নিদ্রিত মানুষের বুক ফুলে ওঠে (অত্যধিক উৎসাহিত হয়)। (৪) বুকের রক্ত দিয়া যাঁহারা দেশকে স্বাধীন করিয়াছেন তাঁহাদের কথা লোকের ভুলিলে চলিবে না। (প্রাণ দেওয়া, আত্মোৎসর্গ করা)। (৫) বক্তৃতার বহর বন্ধ কর বাপু, বুকে হাত দিয়ে বল দেখি সত্যিই কি তুমি দেশকে ভালবাস (বিবেকের নির্দেশমানা)। (৬) বিদেশী বণিক্ রাষ্ট্রশক্তির আশ্রয়ে এতকাল ধরিয়া এ-দেশের বুকের রক্ত চুষিয়া খাইয়াছে। (অত্যাচারদ্বারা ধীরে ধীরে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে)।

মন—(১) ছেলেটির মিষ্টি কথা শুনে মন গলে যায় (হৃদয়)। (২) তার ন্যায্য কথা-গুলো আমার বেশ মনে লাগে (হৃদয় স্পর্শ করে)। (৩) আমার মনে হয় লোকের অভাবেই স্বভাব নষ্ট—স্বভাবে লোক অভাব বোধ করে না (ধারণা)। (৪) বাল্যকালের সুন্দর দিনগুলি এখন মনে পড়ে (স্মৃতিতে উদিত হয়)। (৫) সংসারের দিকে তাঁর মন যায় না (প্রবৃত্তি)। (৬) ছেলেটির পড়াশুনায় একেবারেই মন নাই (একাগ্রতা)। (৭) 'করিলাম মন শ্রীবৃন্দাবন বারেক আসিব ফিরি'—(অর্থ—সংকল্প) রবীন্দ্রনাথ)। (৮) 'মন দিয়া কর সবে বিদ্যা উপার্জন (আন্তরিকতা)। (৯) যা'র তা'র মন যোগান আমার কাজ নয় ভাই! (মনের মত কাজ করিয়া সন্তুষ্ট করা)।

মাটি—(১) যার লাঠি তার মাটি (ভূ-সম্পত্তি)। (২) দারুণ বর্ষাতে এবার পুজোর আনন্দ একেবারে মাটি হোল (নষ্ট)। (৩) যে গাঁয়ে আমার এত অপমান, জীবনে সেখানকার মাটি আর মাড়াতে চাই না (উপস্থিত হওয়া)। (৪) এবার ক'লকাতায় মাছ সস্তা হলেও তো মাটির দর হ'তে পারে না (অত্যন্ত সস্তাদর)। (৫) সারাজীবন দেশের কাজে দেহ মাটি করেছি -আর ভাইসব তোমরা এখন আমাকে চাও না (দেহপাত করা)। (৬) তোমার মত দায়িত্বহীন ছেলের হাতে মেয়ে দেওয়ায় আমি **মাটি খেয়েছি** আর তোমার বাবাও খেয়েছেন (অন্যায় কাজের জন্য অনুতপ্ত হওয়া)।

মাথা—(১) পাহাড়ের মাথায় বরফ জমেছে (চূড়া)। (২) রাস্তার মাথায় একদল লোক জটলা করছে (প্রান্তে)। (৩) অঙ্কেতে ছেলেটির বেশ মাথা আছে বলতে হবে (বোধশক্তি)। (৪) মুখুজ্জেমশায় এখন গাঁয়ের মাথা (প্রধান ব্যক্তি)। (৫) এত বড়াই তোমার সাজে না—তুমি করেছো তো আমার মাথা! (কিছুই না)। (৬) আমার লাঠির সামনে এসে দাঁড়ায় এমন কে সেই লোক যার ঘাড়ে দুটো মাথা আছে (দুঃসাহস থাকা)। (৭) দেখুন মশায়! কিছু মনে করবেন না—সেদিন রাগের মাথায় (প্রভাবে) যা বলে ফেলেছি আজ আপনাকে তা ক্ষমা করতে হবে। (৮) পূর্ববঙ্গের বিস্থাপিতদের মাথা গোঁজবার জায়গা-টুকু পর্যন্ত নেই তাই এই অসন্তোষ (কোনপ্রকার আশ্রয় লওয়া)। (৯) এই গোলমালে এক-জন পাকা মাথার পরামর্শ গ্রহণ করলে ভাল হয় (প্রবীণ ব্যক্তি)।

ধান—(১) 'কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা'—রবীন্দ্রনাথ (ধান কাটিয়া স্তূপাকার করা)। (২) ধান দিয়া লেখাপড়া শিখেছি নাকি যে মাইনে দেবার বেলায় মশাইয়ের চোখ চড়ক গাছ (অতি সামান্য অকেজো লেখাপড়া শেখা)! (৩) মাত্র পাঁচ টাকায় সারা রাত যাত্রার পালা গাইতে হ'বে আব্দার মন্দ নয়—এ দেখছি উড়ি ধানের মুড়ি (অসম্ভব বা

অলীক বা ফাঁকিবাজির বস্তু)। (৪) বাপের হোটেলে খাও কত ধানে কত চাল হয়—তার খবর তো তুমি রাখবে না! (প্রকৃত অবস্থা)।

কথা—(১) আমার কথা অনুসারে কাজ করলে তোমার ভাল হ'ত (উপদেশ—পরামর্শ)। তিনি স্ত্রীর কথায় উঠেন বসেন। (২) কথা দিয়ে কথা রাখাইতো সৎলোকের কাজ (প্রতিশ্রুতি)। (৩) আজ এখানে রামায়ণ কথা হবে (কথকতা)। (৪) আমার কথা হলে তুমিই উত্তর দেবে ভাই (প্রসঙ্গ)। (৫) দুই বন্ধুর মধ্যে বিনা কারণে আজ ক'দিন কথা বন্ধ (আলাপ)। (৭) 'কথা কও, কথা কও, অনাদি অতীত'—রবীন্দ্রনাথ (মৌন ভঙ্গ করা)। (৮) ঘরের কথা কখনও পরকে বলবে না (ব্যাপার)। (৯) কথায় কথায় সেদিন ছেলের বিয়ের কথাও উঠেছিল (প্রসঙ্গক্রমে)। (১০) দেখো যেন কথার নড়চড় না হয় (প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ)।

গা—(১) তাহার গা অত্যন্ত খসখসে (চামড়া)। (২) মন্দিরের গা ঘেষিয়া নদী প্রবাহিত (কিনারা)। (৩) কলসীর গা বেয়ে জল পড়ছে (পৃষ্ঠদেশে)। (৪) কিলগুতো অপমান কিছুই তা'র গায়ে লাগে না (সহ্য হওয়া, গ্রাহ্য না করা)। (৫) এসব কাজে তিনি মোটেই গা করেন না (মনোযোগ দেওয়া)। (৬) এই মেঘলা দিনে গা কেমন কেমন করে (অসুস্থতা বোধ করা)। (৭) এত বড় একটা বিপদের পর এখন তিনি বেশ গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছেন (উৎসাহ ফিরিয়া আসিয়াছে)। (৮) (ক) এই লোকটার দৈনিক উৎপাত আমার গাসহা হয়ে গেছে (অভ্যস্ত হওয়া)। (খ) রেশনের দোকানে তীর্থের কাকের মত ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা আমার গা সহা হয়ে গেছে। (৯) পরের ছেলের গায়ে হাত তুলতে নেই (প্রহার করা)। (১০) শাশুড়ীর বকুনি খেয়ে বৌ তুমি অন্যের উপর গায়ের ঝাল ঝাড়ছ কেন (অন্তরে সঞ্চিত ক্রোধ প্রবলভাবে প্রকাশ করা) (১১) লোকটার অন্যায় আব্দারে আমার গা জ্বলিয়া উঠিল (হঠাৎ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হওয়া)। (১২) জাহাজ চলিবার সময় সমুদ্রের ঢেউয়ের ধাক্কায় তাহার গা বমি বমি করিতে লাগিল (বমির ভাব বোধ করা)।

তৃতীয় অধ্যায়

বিশিষ্টার্থ প্রকাশক শব্দ সমষ্টি

[১] ক্রিয়াপদ

(Phrasal uses of Words)

উঠা—(১) গাছের চারাগুলি বেশ ভাল ভাবেই উঠেছে (গজান)। (২) দিনের পর দিন রোগীর জ্বর উঠছে (বাড়িতেছে)। (৩) ছেলেটি এবার দশম শ্রেণীতে উঠেছে (পরীক্ষায় উপরের শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছে)। (৪) পূজাতে পাঁচশত টাকা চাঁদা উঠিয়াছে (সংগৃহীত)। (৫) একথা যখন কর্তার কাছে উঠেছে (প্রবিষ্ট হওয়া) তখন প্রতিকার হবেই হবে। (৬) বাজারে আজ ভাল মাছ উঠেছে (আমদানি)। (৭) আজকাল এক ধুয়া উঠেছে (প্রচলিত), দেশের কাজ কর দেশের কাজ কর। (৮) তার এখানকার পাট উঠে গেছে

(বাস করা লুপ্ত হইল)। (৯) ভাড়াটেরা ভবানীপুর থেকে চাঁপাতলায় উঠে গেছে (স্থানান্তরিত হওয়া)। (১০) বেণ্টিকের সময় সতীদাহ প্রথা উঠিয়া যায় (রহিত হয়)। (১১) 'ওঠ হে ওঠ রবি আমারে তুলে লও'—রবীন্দ্রনাথ (উদিত হও)। (১২) ব্যাপারটা ক্রমে পাকিয়া উঠিল (পরিণতির পথে উপস্থিত হইল)।

করা—(১) বেশি শীতে ঘরে একটু আগুন করে বসলে মন্দ হয় না (উৎপাদন)। (২) ভাই, যা হয় একটা বুদ্ধি কর (উদ্ভাবন করা)। (৩) রাস্তার ধারেই তিনি ঘর করিয়াছেন (নির্মাণ)। (৪) পুত্র অসুস্থ পিতাকে হাওয়া করিতে লাগিল (সঞ্চালন)। (৫) তোমার মত বিশ্বাসঘাতককে গুলী করিয়া মারিতে ইচ্ছা করে (নিক্ষেপ করা)। (৬) মেয়ে কয়েকদিনের মধ্যে তাহার স্বামীর ঘর করিতে যাইবে (পরিচালনা)। (৭) গাড়ি করে বাড়ি যাবো (ভাড়া)। (৮) 'দিল্লী থেকে ফোন করেছেন শাহান্‌শাহের নাতি' (নিত্যধন ভট্টাচার্য) (টেলিফোনে সংবাদ পাঠান)। (৯) যুদ্ধের বাজারে ঠিকাদারী ব্যবসা আর কালোবাজারের মহিমায় অনেক লোক বেশ টাকা করেছে (সঞ্চয়)। (১০) 'মেঘের উপর মেঘ করেছে'-রবীন্দ্রনাথ (সঞ্চারিত হওয়া, জমা হওয়া)। (১১) রত্নাকর দস্যু রাম নাম করিয়া মুক্তি লাভ করিলেন (উচ্চারণ করিয়া)। (১২) ঠান্ডা লাগলে নিমোনিয়া ক'রে বসবে (সৃষ্টি করা)। (১৩) অন্যায়ের জন্য কৈফিয়ৎ তলব করা হইল (চাওয়া)। (১৪) ছেলেকে আমিই মানুষ করেছি।

কাটা—(১) এরূপ দুর্বল যুক্তি অনায়াসে কাটা যায় (খণ্ডন)। (২) 'সকাল বেলা কাটিয়া গেল বিকাল নাহি যায়' (অতিবাহিত হইল)—রবীন্দ্রনাথ। (৩) 'কেটে যাবে মেঘ নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর' (দূর হওয়া)—দ্বিজেন্দ্রলাল। (৪) 'দুখনিশা গেছে কেটে সুখরবি ওই ওঠে ওঠে'—মুকুন্দ দাস। (৫) ময়রা তার দোকানে প্রত্যহ ছানা কাটে (তৈয়ারি করে)। (৬) প্রাতঃকালে গোসাঁই প্রভু কপালে তিলক কাটেন (অঙ্কিত করেন)। (৭) 'আগে টিকিট কাট তারপর বাসে ওঠ' ইহাই উত্তরপ্রদেশের সরকারী পরিবহন বিভাগের নিয়ম (ক্রয় কর)। (৮) বইখানি বাজারে ভাল কাটছে (বিক্রয়)। (৯) এত টাকার চেক না কাটলে দি কি করে (লেখা)। (১০) ছোট ভাই তখন জিভ কাটিয়া বলিল (শপথ পূর্বক অস্বীকার) দাদার বিরুদ্ধে এরকম অন্যায় সে করিতেই পারে না।

খাওয়া—(১) তিনি রোজ সকাল বেলা দুধ খাওয়ার পর হাওয়া খেতে বাইরে যান (সেবন করা)। (২) কিল খেয়ে কিল চুরি অনেক সময় করতে হয় (সহ্য করা)। (৩) সাথীরা ছেলেটির মাথা একেবারে খেয়েছে (নষ্ট করা)। (৪) বড় বাবু নিজের শালাকে বসাবার জন্য আমার চাকরি খাবেন (চাকরি হইতে ছাড়াইয়া দেওয়া) বলেই মনে হয়। (৫) তার কথার সঙ্গে কাজ খাপ খায় না (সামঞ্জস্য থাকা)। (৬) যে নিজে ঘুষ খায় সে কখনও দুর্নীতি দমন করিতে পারে না (গ্রহণ করা)। (৭) আমার কাজটি করে দিন বাবু, আমি আপনাকে পানখাবার জন্য পাঁচ টাকা দেব (ঘুষ)। (৮) প্রবল ঢেউয়ের ধাক্কা খেয়ে নৌকা উলটে গেল।

ছাড়া—(১) আজ চাকরি ছেড়ে আর তার সঙ্গে এই বানরে পোষাক ছেড়ে (পরিবর্তন করিয়া) সত্যই মুক্তি লাভ করলুম। (২) ঘাম দিয়ে তার জ্বর ছেড়ে গেল (দূর হইল,

জরের বিরাম হইল)। (৩)"আহাহা, বাহা বাহা" কহিছে কানে, "গলা ছাড়িয়া গান গাহো" (স্বর উচ্চে তোলো)—রবীন্দ্রনাথ। (৪) চিঠিগুলো ডাকে ছেড়ে দিয়ে এসো (ডাকে দেওয়া)।

তোলা—(অনেক কথার পর ভদ্রলোক আমার কাছে মেয়ের বিবাহের কথা তুলিলেন (উত্থাপন করা)। (২) আসন্ন উৎসবের চাঁদা তুলিবার জন্য ছেলেরা লাগিয়া গেল (সংগ্রহ)। (৩) মেয়েরা কাপড়ের উপর ফুল তুলিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে (সূচীকর্ম দ্বারা তৈয়ারি করা)। (৪) পাল তুলিয়া নৌকা দুখানি চলিয়াছে (খাটাইয়া)। (৫) তোমার সদুপদেশ আপাততঃ শিকেয় তুলে রাখ (অব্যবহার্য, অকরণীয়)।

থাকা—(১) এ গরমে ঘরে থাকা দায় (বাস করা)। (২) টাকা থাকলে কিনা হয় (অধিকারে থাকা)। (৩) বাপ থাকতে ছেলের এরূপ কাজে যাওয়া ভাল না (জীবিত থাকা)। (৪) আপনার কথা আমার মনে থাকবে (জাগরূক রহিবে)। (৫) ও কথা থাক। আর এক সময় শুনব (স্থগিত থাকা)। (৬) ঠাকুরের প্রসাদ আমার মাথায় থাক (সসম্মানে রক্ষিত)। (৭) দরিদ্র পাটনী বলিল আমার ছেলেপুলেরা যেন দুধেভাতে থাকে (সচ্ছল অবস্থায় বাস করে)।

দেখা—(১) আমার দরখাস্তটা একবার দেখুন স্যর (পাঠ করা)। (২) ডাক্তারবাবু রোগীর নাড়ী দেখিয়া বিশেষ কোন ভরসা দিতে পারিলেন না (পরীক্ষা)। (৩) এ কয়দিন আমার বাড়িটা একটু দেখো (নজর রাখিও)। (৪) এ বর্ষাতে আর একটু দেখি (অপেক্ষা করা) তারপর ভিজেই বাড়ি যাব। (৫) তোমরা যার যার পথ দেখো—আমাকে দিয়ে আর কিছু হবে না (অবলম্বন করা)। (৬) যত আত্মীয়তা লোকে এখন দেখাক না কেন শেষ বয়সে এর কেউ আমাকে দেখবে না (সেবা করা)। (৭) কতক লোক কাজ করে, আর বাকি লোক মজা দেখে (উপভোগ করা)।

ধরা-(১) সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া রাবণ পঞ্চবটী বনে প্রবেশ করিল (পরিধান করা)। (২) পুত্রও পিতার পথ ধরিল (অনুসরণ করা)। (৩) চাকরির জন্য বড় সাহেবকে ধরিতে হইল (সনির্বন্ধ অনুরোধ)। (৪) 'বোল ধরেছে আম্র বনে বনে'। 'পথ তরুশাখে ধরেছে মুকুল'—রবীন্দ্রনাথ (প্রকাশ পাওয়া)। (৫) অবহেলার ফলে শেষে উনুনে চড়ান পায়েস ধরে গেল (পুড়িয়া উঠা)। (৬) বুড়ি ধরে থাকলে খেলায় মারে কে! (স্পর্শ করা)। (৭) 'এ পাগলের কথা ধর, এখনো সরে পড়,—মুকুন্দদাস (গ্রাহ্য কর)। (৮) বৃষ্টিটা এখন ধরেছে (বন্ধ হইয়াছে)। (৯) আমার মাথাটা বেশ ধরেছে (যন্ত্রণা হইয়াছে)। (১০) 'আবার যখন গান ধরেছি গাবো গো সেই গান'—মুকুন্দদাস (আরম্ভ করিয়াছি)। (১১) এই অল্প বয়সেই সে সিগারেট ছেড়ে দিয়ে তামাক ধরেছে (কু-অভ্যাস করা)। (১২) এ কবিতার অর্থ কিছুতেই ধরিতে পারিতেছি না (বুঝিতে পারা)। (১৩) পাড়ার ছেলেরা বলতো তোমাদের মধ্যে কে আমার কাগজ-পত্র ধরেছে? (ইতস্ততঃ বিশৃঙ্খল)। (১৪) শীত-কালে উপর্যুপরি কয়েক রাত্রি বাড়ির বিবাহের কাজে হাঁকডাঁক করিয়া অবশেষে গলাটা বেশ ধরিয়া গেল (স্বর বন্ধ হওয়া)। (১৫) 'পঞ্চাননকে ধরল এসে যমে'—রবীন্দ্রনাথ —(মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া)।

নাড়া—(১) 'প্রতাপ রায় তাই দেখিছে শুধু, কাশীর বৃথা মাথানাড়া'—রবীন্দ্রনাথ

(সঞ্চালিত করা)। (২) চামচ দিয়া গরম চা নাড়িয়া লইলে ভাল হয় (ঘোঁটা)। (৩) ছেলেরা বলতো তোমাদের মধ্যে কে আমার কাগজ-পত্র নেড়েছে (ইতস্ততঃ বিশৃঙ্খল অবস্থায় ফেলেছো)? (৪) ঠাকুরঘরে জোরে ঘণ্টা নাড়িলেই বেশি ধার্মিক হওয়া যায় না (বাজান)। (৫) রোগীকে এরূপ অবস্থায় এ ঘর হইতে নাড়িলে ক্ষতি হইবে (স্থানচ্যুত করা)। (৬) গিন্নীমার মুখ নাড়া সহ্য করে কাজ করতে পারবো না (মুখ ঝামটা)।

নামা—(১) তোমার ঘাড়ের ভূত না নামিয়ে ছাড়ছি না (তাড়ান)। (২) ডালটা সবে নেমেছে মেসের বাবুরা, একটু পরে বসুন (রন্ধন শেষ হওয়া)। (৩) 'জলে না নামিলে কেহ শিখে না সাঁতার' (ভিতরে প্রবেশ করা)। (৪) 'গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে' (শুরু হওয়া) --রবীন্দ্রনাথ। আঁধার নেমেছে ঘন পথরেখা আবরি (শুরু হওয়া)। 'গেরুয়াবসনা সন্ধ্যা নামিল পশ্চিম মাঠ পরে'—রবীন্দ্রনাথ। (৫) তিনি নির্বাচন যুদ্ধে নামিলেন (অবতীর্ণ হওয়া, প্রবৃত্ত হওয়া)। (৬) সূর্য পশ্চিম আকাশের শেষপ্রান্তে নামিল (অদৃশ্য হওয়া)।

পড়া—(১) (ছেলে) 'এই কুড়িতে পড়িবে সামনের ফাল্গুনে।' (চাষার ঘরে—যতীন্দ্র-মোহন বাগচী), (উনিশ পর হইয়া কুড়ি বৎসরে পদার্পণ করিবে)। (২) লোকটা গায়ে পড়িয়া আমাকে সদুপদেশ দিল (অযাচিতভাবে)। (৩) 'এমন মানব জমিন রৈল পড়ে, আবাদ করলে ফলতো সোনা—রামপ্রসাদ (অনাবাদী থাকা)। (৪) অনেক টাকা পড়িয়া গিয়া কারবারটি নষ্ট হইল (অনাদায়)। (৫) 'বেলা যে পড়ে এল জলকে চল'—রবীন্দ্রনাথ (অবসান)। (৬) বাড়ির পাশের জমিটার উপর বড়কর্তার চোখ পড়িল (স্থাপিত হওয়া)। (৭) মেয়ে যখন বড় ঘরে পড়েছে তখন তার চালচলন একটু অন্য রকম হবে (বিবাহিত হইয়াছে)। (৮) এখানে এবার বড গরম পড়েছে (উপস্থিত হওয়া)। (৯) এখন তাঁর রাগ পড়েছে (শান্ত হওয়া)। পাওনা টাকা শোধ করতে হবে শুনে লোকটা যে আকাশ থেকে পড়ল (আশ্চর্যান্বিত হওয়া)। (১০) বাতাস পড়ে গেল (কমিয়া গেল)। (১১) শেষকালে অনেক লোক যোগ্য প্রার্থীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। (১২) অপর পক্ষের উকিল তখন রাম-কানাইকে লইয়া পড়িল (আক্রমণ করিল)।

বলা—(১) বাঙলায় খবর বলা আপাততঃ এইখানেই শেষ হ'ল (জ্ঞাপন, জানান)। (২) বাবা বললে সবই করতে পারি—তোমার কথা শুনব না (অনুমতি দিলে)। (৩) ভাই তুমি এবিষয়ে কি বল (মতামত প্রকাশ)! (৪) এ বাড়ির বিয়েতে কেবল তাঁহাকেই বলা হয় নি (নিমন্ত্রণ)। (৫) ধনী বল দরিদ্র বল পণ্ডিত বল মূর্খ বল—সকলকেই একদিন এই শ্মশানে আসিতে হইবে (বিচার করিয়া দেখ)। (৬) ওহে হনুমান্! এখন লঙ্কার কথা বল (বর্ণনা কর)। (৭) আমি তো বলেছি আপনার কাজ (আমি) করে দেব (স্বীকার করা, প্রতিশ্রুতি দেওয়া)।

পাওয়া (১) 'সুবের পর সুর ফিরিয়া যায় হৃদয়ে নাহি পায় সাড়া' -রবীন্দ্রনাথ (মেলা, জোটা)। (২) আমি আপনার কথা শুনিতে পাই না (সমর্থ হওয়া)। (৩) ঘুম থেকে উঠলেই খোকার ক্ষিদে পায় (বোধ হয়)। পড়া জিজ্ঞেস করলেই কান্না পায় (৪) তাকে ভূতে না পেলে এ রকম ভাব দেখাত না (ভূতগ্রস্ত হওয়া)। (৫) শিশুটিকে পেঁচোয় পেয়েছে (পঞ্চানন্দ নামক কল্পিত অপদেবতার আক্রমণে ধনুষ্টংকার হইয়াছে)। (৬)

আজকে এখানে ঠাকুরের প্রসাদ পাবেন (খাওয়া অর্থে)। (৭) অন্তিম সময়ে যেন কাশী পাই (মৃত্যু হওয়া)। (৮) 'স্তব্ধ বসুন্ধরা শুনি বেদগান অসাড় শরীরে পাইল পরাণ'—হেমচন্দ্র (শরীরে প্রাণ পাওয়া, পুনরুজ্জীবিত হওয়া)। (৯) দিন কতক পরে সব টের পাবে (বুঝিতে পারা)।

ফেরা—(১) ডাহিনে ফিরিয়া দেখ তোমার কে আসিয়াছেন (অভিমুখী হওয়া)। (২) ছেলেটির স্বভাব পরিবর্তন হয়েছে, সে এখন ভালর দিকে ফিরেছে (পরিবর্তন হওয়া)। (৩) ব্যবসা করায় তার অবস্থা ফিরেছে। তার চেহারা ফিরেছে। (৪) 'দ্বার হতে দ্বারে ফিরিল শ্রীমতী'—রবীন্দ্রনাথ (ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ঘুরিয়া বেড়ান)। (৫) 'আমারে যে ডাক দেবে এ জীবনে তারে বারম্বার ফিরেছি ডাকিয়া' (ঘুরিয়া বেড়ান)—রবীন্দ্রনাথ।

রাখা—(১) ভগবান্ ভক্তকে সব সময়ে পায়ে রাখেন (আশ্রয় দেওয়া)। (২) ব্যাঙ্কে টাকা রাখলে টাকার সুদও পাওয়া যায় এবং টাকা নিরাপদও বটে (গচ্ছিত রাখা, জমান)। (৩) সন্ন্যাসী মাথায় জটা রাখিয়াছেন (ধারণ করা)। (৪) সোনার গহনা রেখে আমি টাকা কর্জ দিয়ে থাকি (বন্ধক রাখা)। (৫) চাকর রাখতে খরচ বেশ লাগে (নিযুক্ত করা)। (৬) তোমার কথা রাখ হে বাপু, অমন অনেক কথা আগেও শুনেছি (তুলিও না)। (৭) গাড়িখানি একটু রাখ (গতিবন্ধ কর, থামাও)। (৮) ছোট ছেলের কি নাম রাখলে? (নাম দেওয়া)। (৯) আমি অন্যায় ভাবে তার মন রাখতে পারব না (সন্তুষ্ট করা)। (১০) ফেরিওয়ালার নিকট হতে কি জিনিস রাখবে তুমি? (কেনা)।

লওয়া—(১) আমরা খরিদ্দারের নিকট হইতে টাকা লইয়া পুস্তক পাঠাইয়া থাকি (অগ্রিম টাকা লওয়া)। (২) রাম লক্ষ্মণকে লইয়া বনে রওনা হইলেন (সহিত)। (৩) হে ঠাকুর! তোমার চরণধূলি যেন জন্মে জন্মে মাথায় লইতে পারি (স্থাপন করা)। (৪) রাম নাম লইলে বিপদ থাকে না (স্মরণ বা উচ্চারণ)। (৫) কয়েক দিন হয় কলেরার টিকা লইয়াছি (ঔষধ রূপে গ্রহণ)। (৬) ছোট শিশু খেলা লইয়া বেশ আছে (ব্যাপৃত হইয়া)।

লাগা—(১) 'অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া।'—রবীন্দ্রনাথ (স্পর্শ করা)। (২) নৌকা তীরে লাগিলে যাত্রীরা সকলেই নামিয়া পড়িল (ভেড়া)। (৩) এ কাজে কিছু দিন লাগিয়া থাকিলে উন্নতির আশা আছে (ব্যাপৃত)। (৪) চাকর পয়লা তারিখেই কাজে লেগে যাবে (আরম্ভ করিবে)। (৫) বড্ড লাগে! অত জোরে চেপে ধরো না ভাই (যন্ত্রণা অনুভব হয়)। (৬) ক্লাসে তোমরা কেন ওই গোবেচারা ছেলেটির পেছনে লাগ আমি তা বুঝিনে (উৎপাত করা)। (৭) সুপুরি খাবার পর তার বিষম লেগেছে (গলায় কিছু লাগার ফলে হঠাৎ কাশি আসা)।

সরা—(১) মশায় সরে দাঁড়ান (পথ ছেড়ে দিন)। (২) এ অন্যায় কাজ তুমি ছাড়া আর কেউ করতে পারে না— তাই বুঝি মুখ দিয়ে কথা সরছে না (নির্গত হওয়া)। মাঠ থেকে জল সরে গেলেই কৃষকেরা আবার কাজ আরম্ভ করবে। (৩) পাওনাদারদের কিছু না দিয়ে তিনি এখান থেকে সরে পড়েছেন (পলায়ন করা)। (৪) এরকম বেগার খাটতে ভাই কারই বা মন সরে (ইচ্ছা করা)। (৫) এইরূপ খারাপ খবর শোনবার পর আমার কোন কাজে হাত সরছে না (সক্রিয় থাকা)।

সাজা—(১) (ক) 'সেই স্বপ্ন আজি এসেছে কি পান্ডব জননীরূপে সাজি —রবীন্দ্রনাথ। (খ) দুষ্টের দল সাধু সেজে চুরি করে (কৃত্রিম বেশ ধারণ করা)। (২) তুচ্ছ এই ব্যাপারে তোমার মত জ্ঞানী ব্যক্তির অভিমান করা সাজে না (উপযুক্ত হয় না, শোভা পায় না)। (৩) সৈন্যগণ জয়যাত্রার জন্য সাজিল (পোষাক পরিয়া প্রস্তুত হইল)। (৪) এত লোকের নেমন্তন্ন, ঘরে পান না সাজলে যে অনেক খরচ পড়বে (সেবনের জন্য প্রস্তুত করা)। (৫) 'অলক সাজত কুন্দ ফুলে, শিরীষ পরত কর্ণমূলে'—রবীন্দ্রনাথ (শোভিত করা)। (৬) 'সাজ সাজ ছাড়ি গৃহকাজ' (জয়দেব—হরিপদ চট্টোপাধ্যায়) (প্রস্তুত হওয়া)।

দেওয়া (১) তোমার ঘরে যখন মেয়ে দিয়েছি তখন তো নাকাল হবই (বিবাহ দেওয়া)। (২) এতরাত্রে সকলেই যে যার ঘরে দুয়ার দিয়াছে (বন্ধ করা)। (৩) বিয়ে যখন করেছ তখন স্ত্রীকে ভাত কাপড় দিতেই হবে (যোগান)। (৪) ভিজা বিছানা রোদে দাও (শুষ্ক হইবার জন্য ছড়াইয়া দেওয়া)। (৫) দু'পয়সার কাগজ দাও (ইহার অর্থ 'দান করা নহে'—বিনিময়ে দেওয়া)। (৬) গলায় আঙ্গুল দিয়ে অনেকে বমি করে (প্রবেশ করান)। (৭) তোমার সঙ্গে মিতালি করার জন্য গলায় হাত দেই নাই আশা করি ব্যাপারটা বুঝিয়াছ (স্থাপন করা—ধাক্কা দিয়া তাড়াইবার উদ্দেশ্যে)। (৮) চোখে চশমা দিয়েও কোন সুবিধে পাচ্ছিনে (পরিধান করা)। (৯) 'বৈদর্ভী কবিতা লক্ষ্মী দিল তব কণ্ঠে বরমালা, তুমি দিলে গলে তার 'ত্রিদিবের সুধা গন্ধ ঢালা'—জয়ন্তী উৎসর্গ (দান ও প্রতিদান)। (১০) 'সুন্দরী অরণ্যভূমি সহস্র বৎসর দিয়াছ বল্লভছায়া'।—রবীন্দ্রনাথ (সেবা করা)। 'করতলে দিব তালি' —রবীন্দ্রনাথ (বাজান)। (১২) এ গ্রামে তিনি পুকুর দিয়েছেন (প্রতিষ্ঠিত করেছেন)। (১৩) গাছটি ফল দেয় না (উৎপাদন করে না)। (১৪) 'সাদা মেঘ দেয় নারে জল'—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (বর্ষণ করা)। (১৫) ও বড় কান্না জুড়িয়া দিয়াছে—ওর পিঠে কিল দাও (আঘাত)। (১৬) কাঁথা গায়ে দিতে পারিলে আর শীত লাগার সম্ভাবনা নাই (ঢাকা)) (১৭) 'সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী'—ভারতচন্দ্র (নৌকাদ্বারা পারাপার করান)। (১৮) উঠানে পা দিতেই রূপো কাকা আমাদের বকে উঠল।

যাওয়া—(১) ছেলের জন্য যে টাকা খরচ করেছি—তার উদাসীনতার ফলে উহা জলে গেল (বৃথা নষ্ট হওয়া)। (২) অনেক টাকা তার সে বছর খোয়া যায় (নষ্ট হয়, হারিয়ে যায়)। [**জলেযাওয়া**—একেবারে নষ্ট হওয়া—উদাসীনতা বা নিষ্ক্রিয়তা এখানে কারণ। খোয়া যাওয়া—কাহারও আয়ত্তের বাহিরে নষ্ট হওয়া] (৩) বেলা যায়—এখন ঘরে বসে আছো (অবসান হওয়া)। (৪) শিবাজীর রাজ্য যায় তাঁহার বংশধরদের হাত থেকে (ধ্বংস হওয়া)। (৫) এ ধুতি আমার এক বছর যাবে (টিঁকিবে)। (৬) জাত থাকিলে সহজে জাতি যায় না (সমাজচ্যুত হওয়া)। (৭) তোমার কথায় তো আমার কিছু এসে যায় না (লাভ ক্ষতি হয় না)। (৮) কুসঙ্গে পড়িয়া পুত্রটি গোল্লায় যাইবার উপক্রম করিতেছে (ধ্বংস হওয়া—উৎসন্ন যাওয়া)। (৯) ছেলেটির যে অবস্থা তাহাতে সে অল্পদিনের মধ্যে বিগড়াইয়া যাইবে।

আসা—(১) তরুণ কবির কবিতা শুনে আমার ঘুম আসে (আক্রান্ত হওয়া)। (২) তার কথা শুনলে আমার হাসি আসে (উপস্থিত হয়—উদ্রিক্ত হয়)। (৩) 'আসিল সে

আমার ভাঙা দ্বার খুলিয়া'—রবীন্দ্রনাথ (প্রবেশ করিল)। (৪) দেশে আসিল দুর্ভিক্ষ—তার পর কলেরা—মহামারী (প্রকাশ, আক্রমণ)। (৫) জমিদারী হইতে প্রত্যেক বছর অনেক টাকা আসিত (আমদানি হওয়া)। (৬) এইরূপ নির্মম সত্যের সম্মুখে উত্তর দিবার মত কোন কথা তাহার মুখে আসিল না (উচ্চারিত হইল না)। (৭) 'হুজুর, আপনাব সেতার বাজনা আসে? (পটুতা থাকা—প্রায়শ্চিত্ত—রবীন্দ্রনাথ)।

হওয়া—(১) 'পুত্র হৈল দ্বিজবংশী মনসার বরে'—চন্দ্রাবতী (জন্মগ্রহণ করা)। (২) বেশি টাকা তোমার হয়েছে—তাই এত অহঙ্কার জন্মিয়াছে। (৩) আমাদের গাছে এবার অনেক আম হয়েছে (ফলিয়াছে)। (৪) ব্রজের রাখাল এখন ভূপাল হয়েছেন মথুরায় (পদলাভ করা)। (৫) তা'র আজ চারদিন হয় (১) জ্বর (২) হয়েছে। [(১) ব্যাপ্তি (২) রোগদ্বারা. আক্রমণ]। (৬) কয়েক দিনের মধ্যে তোমার চাকরি হবে (জুটিয়া যাওয়া)। (৭) আজ বেশ বৃষ্টি হইতেছে (পড়িতেছে)। (৮) যে চিরদিনের জন্য সংসার ছেড়ে চলে গেছে সে কি আর কখনও আমার হবে (আপন হওয়া)। (৯) যে এতদিন সংসার ছেড়ে চলে গেছে সে ছেলে কি আর ফিরে আসে? তোমরা যখন বলছো তা হ'বে। (সংশযযুক্ত সম্ভাবনা ঘটা)। (১০) যে অসুখ তাতে আর ভাল হবার আমি তো কোন লক্ষণ দেখিনে—তাব হযে এল (জীবন শেষ হওযা)।

উড়া—(১) এ খবরটা এখন বেশ উড়ছে (প্রচারিত হওয়া)। (২) এরকম অদ্ভুত কথা আমি একেবারে উড়াইযা দিলাম (অগ্রাহ্য করা)। (৩) ঘড়িটা বোধ হয় এখান থেকে উড়ে গেছে (অদৃশ্য হয়েছে)। (৪) বড়লোকের ছেলেটি বাজে কাজে অনেক টাকা উড়াইয়া এখন সর্বহারা হয়েছে (নষ্ট করা)। (৫) যাকে কেউ কখনও এ বাড়ির লোক চিনত না সে এখানে কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে (বিনা অধিকারে সব কিছু দখল করিয়া বসিযাছে)।

দাঁড়ান—(১) বন্ধুর জন্য অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি (অপেক্ষা বা প্রতীক্ষা করা)। (২) পঞ্চাশ বেত মারবেন—তা বেশ' একটু দাঁড়ান, এই বেত খাবার আমার একজন অংশীদার আছেন (সবুর করুন)। (৩) এ ছোট স্টেশনে গাড়ি দাঁড়ায় মাত্র এক মিনিট (থামা)। (৪) ওকালতি ব্যবসায়ে তিনি এখন দাঁড়িয়ে গেছেন (সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া)। (৫) এ দলগত গোলমাল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় বলা শক্ত (শেষ হয়)। (৬) ঠনঠনে কালীবাড়িব ওখানটাব রাস্তায বৃষ্টি হলেই জল দাঁড়ায় (জমে)। (৭) আসামীর পক্ষে দাঁড়িয়েছেন একজন নামজাদা ব্যারিস্টার (পক্ষ সমর্থন করা)।

বসা—(১) সূর্য অপরাহ্নে পাটে বসে (অস্ত যায়)। (২) তাহার বুকে সর্দি বসে গেছে (জমাট হয়ে গেছে)। (৩) এ সব বাজে কাজে আমার মন বসে না (নিবিষ্ট হওযা)। (৪) কাদায় রথের চাকা বসে গেল (প্রবিষ্ট হওয়া)। (৫) তাহার গলার স্বর বসিযা গিয়াছে (বন্ধ হওয়া)। (৬) ঐ ছেলের সঙ্গেই মেয়েটি অবশেষে বিয়েতে বসেছে (করিয়াছে)। (৭) বসে বসে কেন বাপের উপর দিয়ে খাচ্ছ (কোন কাজ না করিয়া)। (৮) লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতির খবর যখন তাঁহার কাছে গেল তিনি অমনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। (কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন)। (৯) তোমার সবই তো গেছে—বাকি শুধু বাড়িখানা—তাও

যেতে বসেছে (নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে)। (১০) নতুনদা আমাদের কোন সাহায্য না করে ঠায় বসে রইলেন (নিশ্চল)।

ভাঙ্গা—(১) মানুষের কপাল যখন ভাঙ্গে তখন ঘড়ির স্প্রিং থেকে আরম্ভ করে সব কিছুই ভাঙ্গে (হীনতা প্রাপ্ত হয়)। (২) পুত্রশোকে স্নেহবান্ পিতার মন ভেঙ্গে পড়েছে (হতাশ হওয়া)। (৩) মান নিজে না ভাঙ্গিলে অন্য কেহ ভাঙ্গিতে পারে না (ঘুচান)। (৪) লোকটা ভাঙ্গেও না মচকায়ও না (একেবারে অবনত হওয়া)। (৬) 'ভাঙ্গার মাঝে কি সুর বাজে।'—রবীন্দ্রনাথ (সবই যখন চলিয়া যায়)। (৭) কথাটা ভেঙ্গে বল না (পরিষ্কারভাবে)। (৮) সে দীর্ঘ পথ ভাঙ্গিয়া (অতিক্রম করিয়া) আসিয়াছে।

মারা—(১) ছাত্রটিকে শিক্ষক মারিতেছেন (প্রহার)। (২) গুণ্ডারা প্রকাশ্য রাজপথে ছুরি মারা শুরু করিয়া দিয়াছে (আঘাতের উদ্দেশ্য প্রয়োগ)। (৩) এযুগে কে কার জাত মারে (নষ্ট করা)? (৪) বেঞ্চির উপর টিকিটগুলি মারিয়া দিলেই তোমার ছুটি (লাগান)। (৫) এত ভীড়ে টাকা পয়সা সাবধান, পকেট মারা যাইতে পারে (লুণ্ঠিত হওয়া)। (৬) পরের টাকা মেরে বড় লোক হতে হ'লে কুবুদ্ধির দরকার (আত্মসাৎ করা)। (৭) মালকোঁচা মেরে দুই বীর 'যুদ্ধং দেহি' রবে অগ্রসর হোল (ধারণ করা)। (৮) কেন বাপু, এদিক-ওদিক উঁকি মারছ? তোমার কি চাই বল না! (দেওয়া)।

[২] বিশিষ্টার্থে বিশেষণ পদ প্রয়োগ

কাঁচা—(১) প্রাচীন কালের কাঁচা ইটের বাড়ি ভূগর্ভ হইতে বাহির করা হইয়াছে (অদগ্ধ)। (২) শহর হইতে গ্রামের দিকে রাস্তা গিয়াছে বটে, কিন্তু একেবারে কাঁচা রাস্তা (অবাঁধন)। (৩) শরতের প্রভাতে শিউলিতলার পাশে কাঁচা ঘাসের উপর শিশির বিন্দু মুক্তার পঙ্‌ক্তির মত দেখাইতেছিল (কোমল)। (৪) কাঁচা পয়সার লোভ অনেকেই সম্বরণ করিতে পারে না (সহজ লভ্য)। (৫) ইউরোপকে কাঁচা মালের জন্য ভারতের উপর নির্ভর করিতে হয় (স্বাভাবিক অবস্থায় স্থিত (raw material)। (৬) ঠিক কি হয়েছে খুলে বল—ও সব কাঁচামিঠে কথায় পেট ভরবে না (আপাত মধুর)। (৭) চেষ্টা করলে সবই হয়—কাঁচা কথাও পাকা করা যায় (পরিবর্তনশীল, অস্থায়ী)। (৮) ওসব কাঁচালোক দিয়ে এখানকার কঠিন কাজ চলবে না (অদক্ষ)। (৯) হিসাব কাঁচাখাতা থেকে পাকাতে না উঠালে চলবে কেন (প্রাথমিক খসড়া)। (১০) খোকা কাঁচা ঘুম থেকে উঠেছে—তাই এত গোলমাল করছে (সদ্য)। (১১) লোকটাকে চেন না অথচ এতগুলো টাকা তাকে শুধু মুখের কথায় দিয়ে কাঁচা কাজ করেছ (নির্বোধের মত —দায়িত্বশূন্য)।

খারাপ—(১) খারাপ কাপড় খোকাবাবু পরতে পারেন না (নিকৃষ্ট)। (২) মন খারাপ করে লাভ কি ভাই—আজকাল ফেল অনেকেই করে (দুঃখিত হওয়া)। (৩) এ ভদ্রলোকের কাছে আমি এরকম খারাপ ব্যবহার পাব তা স্বপ্নেও ভাবিনি (অভদ্র)। (৪) সাইকেল খারাপ হয়ে গেছে (অব্যবহার্য)। (৫) আজ দিন খারাপ, তাই মা বাড়ি থেকে যেতে দিচ্ছেন না (অশুভ)। (৬) চেহারা খারাপ হলেও মেয়েটির স্বভাব বড় সুন্দর (অসুন্দর)। (৭) ডাকঘর তো আর যাত্রার আসর নয় যে ওখানে আদর করে বসতে দেবে, কেন মিছামিছি

ওদের ব্যবহারে মাথা খারাপ করছ (ক্রুদ্ধ হওয়া—অসহনীয় ভাব দেখান)। (৮) অতি লোভে ধ্রুনুর পেট খারাপ করেছে (অজীর্ণ রোগ হয়েছে)।

ঠিক—(১) বিয়ের দিন ঠিক করা হয়েছে (নির্ধারিত)। (২) অঙ্কের ফল ঠিকই হইয়াছে (শুদ্ধ)। (৩) যদি আমার হাতে ক্ষমতা আসে তবে, তোমাকে আমি ঠিক দুদিনে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারি (কম বা বেশি নহে)। (৪) গাড়ি ঠিক করিয়াছি (ভাড়া স্থির করিয়া রাখিয়াছি)। (৫) চুলটা ঠিক করে নিয়ে তবে ওবাড়ি খেতে যাও (বিন্যস্ত)। (৬) লোকটার মাথার ঠিক নেই—তার কথা শুনে কি হবে? (সুস্থ)। (৭) প্রথমে আমরা ওকে পাগল বলে ঠিক করেছি- (বিবেচিত) কিন্তু ওর পেটেপেটে এত বুদ্ধি তাতো জানতুম না।

নরম—(১) কোন বিশেষ কারণে এই উদ্ধত লোকটা এখন বেশ নরম সুরে কথা বলছে (মৃদু)। (২) সেই মহাপুরুষ সন্ন্যাসের নিয়মপালনে অত্যন্ত কঠোর, কিন্তু পরের দুঃখে তাঁর মন খুবই নরম হয় (স্নেহে, দয়ায়, কোমল)। (৩) এখন জাতের বাঁধান নরম হয়েছে (শিথিল)। (৪) লোকটাকে নরম পেয়ে তার কাছ থেকে অন্যায় আব্দার করে সুখসুবিধা অনেকেই নিয়ে থাকে (দুর্বল)। (৫) দরকার হলে অবস্থা বুঝে তাকে নরমগরম শোনান যাবে (মিঠেকড়া)।

পাকা—(১) পাকা বাড়িতে বাস কর, চোরের ভয় কি? (ইষ্টকনির্মিত)। (২) 'ব্যাটা সাধু বেশে পাকা চোর অতিশয়'—দুই বিঘা জমি (নিপুণ, অভিজ্ঞ)। (৩) পাকা সোনাই তোমাকে দেব (অবিমিশ্র)। (৪) পাকা ফলার দিতে পাবলে আশা করি খাবার লোকেব অভাব হবে না (উচ্চ ধরনের লুচি মিঠাই যুক্ত)। (৫) মেয়েব পাকা দেখা তো কালই হয়ে গেছে (সম্বন্ধ স্থির করিয়া বর বা কন্যাকে আশীর্বাদ করা)। (৬) বয়স কম হলে কি হবে তোমার নাতি একটি পাকা ছেলে (বুদ্ধিতে পরিপক্ব)।

ফাঁকা ও ফাঁক—(১) ফাঁকা (শূন্য) মাঠের মধ্যে একটি মাত্র অশ্বত্থ গাছ। (২) ফাঁকা হাতে (অর্থ শূন্য) কুটুমের বাড়ি যাওয়া চলে না। (৩) 'সমনে হেরি সুনীল বারি তালিবনের ফাঁকে' (অবকাশ) (করুণানিধান)। (৪) কোথায় যেন এর একটা ফাঁক আছে (ত্রুটি)। (৫) 'সে বছর ফাঁকা পেনু কিছু টাকা করিয়া দালালগিরি'—রবীন্দ্রনাথ (উপরি পাওয়া)। (৬) মাষ্টার! ছেলেদের তো ভয় দেখাচ্ছ, কিন্তু ওরা তোমার ফাঁকা আওয়াজ বুঝে ফেলেছে (ফাঁকি দেয় এমন আওয়াজ—যার কোন বাস্তব রূপ নাই)।

বড়—(১) বড় মন্দিরের নিকটেই তাঁর বাড়ি (প্রকাণ্ড)। (২) বড় বইখানা নিয়ে এস (লম্বা)। (৩) নায়েব মহাশয় তাঁহার বড় ভুঁড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন (স্থূল)। (৪) বড় দুঃখে ভাই আজ তোমার কাছে এসেছি (অত্যন্ত)। (৫) পাশ করাটা বড় কথা নয়—বড় কথা হইতেছে ছেলেটির চরিত্র গঠন এই স্থানেই হইয়াছে (আসল কথা)। (৬) আমি আমার বড় মুখ নিয়ে যেন সকলের সামনে দাঁড়াতে পারি—তুই আমার মুখে কালি দিস না (গর্বিত)। (৭) বড় ঘরের (উচ্চ বংশ) মেয়ের বড় নজর হয়। (৮) তিনি এখানকার বড় (খ্যাতনামা, শ্রেষ্ঠ) ডাক্তার।

সাদা—(১) সাদা মন (কুটিলতা শূন্য) নিয়ে আমি আমার কর্তব্য করেছি। (২) সাদা কাপড়ের দাম বাজারে কিছু কম (পাড়হীন)। (৩) সাদা কাগজে দস্তখত চাচ্ছ—মতলবটা কি

শুনি? (অলিখিত)। (৪) আমি সাদা কথার মানুষ—আমার কাছে চালবাজি রাখ (স্পষ্ট কথা)।

[৩] সর্বনাম ও তৎসংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট প্রয়োগ

অতিরিক্ত বিনয় ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য উত্তম পুরুষের সর্বনাম 'আমি' ব্যবহার না করিয়া, দাস, গরিব, সেবক, অধম, অধীন এবং মধ্যম পুরুষের 'আপনি' ব্যবহার না করিয়া, মহাশয়, প্রভু, হুজুর, শেঠজী, ঠাকুর প্রভৃতি পদের প্রয়োগ হয়।

(১) সে বসে বঞ্চিত দাস গোবিন্দ (আমি শ্রীগোবিন্দ)। (২) এ গরিব সব সময়েই হুজুরের হুকুমের অপেক্ষায় আছি (এ গরিব-আমি)। (৩) 'জয় হোক মহারাণী রাজ রাজেশ্বরী (আপনি=আপনার)। (৪) 'শেঠজী বোধ হয় সুদের তাগাদায় কাশিমবাজারে এসেছিলেন' ('সিরাজদৌলা', শেঠজী-অপনি)। (৫) মহাশয়ের নাম? (আপনার)। (৬) প্রভুপাদ যা, আজ্ঞা করবেন দাস তা, সব সময়ে পালন করতে প্রস্তুত (প্রভুপাদ=আপনি)। (৭) মহাশয়ের থাকা হয় কোথায়? (উঃ মঃ ১৯৬০)।

যে—(১) আজ যে বৃষ্টি হবে কে তোমায বলেছে? (অব্যয়রূপে ব্যবহার)। (২) কি যে হবে কে জানে। (ঐ) (সংশয় প্রকাশে) (৩) 'বেলা যে পড়ে এল'—রবীন্দ্রনাথ (বিস্ময় প্রকাশ)। (৪) দলের যে কেহ আসতে পাবে। তোমাদেব পাড়ায যে সে একথা জানে (সাধারণ লোক) (সর্বনাম)। (৫) তিনি এখানকাব একজন যে সে নন (অসাধাবণ) যে, তোমবা তাঁর সম্বন্ধে যা তা কথা বলবে (অবজ্ঞাসূচক, বিশেষণ)।

সে—(১) সেদিন তো অতীত হয়েছে ভাই। 'সে নারী বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে খুলিযাছে দ্বাব'—(রবীন্দ্রনাথ)। 'সেদিন নদীব নিকষে অরুণ আঁকিল প্রথম সোনার লেখা' —রবীন্দ্রনাথ। (২) 'সেইত মল খসালি তবে কেন লোক হাসালি' (অব্যয়)। (৩) যেই সে এল সেই সে বাড়ি ছেড়ে পালাল (সঙ্গে সঙ্গে)। (৪) সেই যে তোমার ছেলে বাড়ি থেকে পালাল, আজ পর্যন্তও এখানে ফিরবার নাম নেই।

এ—(১) এ সখি হামারি দুঃখের নাহি ওব (অব্যয়)। (২) এ পথ আমাদের অনেক দিনের চেনা (বিশেষণ)।

এই—(১) দুষ্টের শাস্তি হোক আমি এই চাই। (সর্বনাম)। (২) 'এই জল এই মাটি এই ছায়ালোক গুঞ্জরিল সুন্দরের স্বপ্নময় স্নেহের কাহিনী' (মোহিতলাল মজুমদার) (বিশেষণ)। (৩) এই রে এই সেরেছে। জ্যেঠামশায এদিকে আসছেন। আজকের আড্ডাটাই মাটি। (অব্যয)।

ঐ—(ওই, অই) (১) ঐত আমি চাই (সর্বনাম)। (২) 'ঐ বুঝি বাঁশী বাজে' (রবীন্দ্রনাথ)। 'ঐ গো বাজে বাঁশী' (গিরিশচন্দ্র)। (৩) ঐ যা! সব কিছু একদম ভুলে গেছি। (অব্যয়)। (৪) ঐ লোকটাই যত নষ্টের গোড়া। (বিশেষণ)।

কি—(১) 'সমুদ্র তরঙ্গবাহু তুলি কি কহিছে স্বর্গ জানে'—(রবীন্দ্রনাথ)। (সর্বনাম)। (২) 'কি আর বলিব আমি'—চণ্ডীদাস (কিছু না)। (৩) তোমার কথা ঠিক কি করে হয় (ক্রিয়াবিশেষণ)। (৪) কি ধনী, কি দরিদ্র, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, সকলকেই শ্মশানে আসতে হবে (অব্যয় পদ—'অথবা' অর্থে প্রযুক্ত)।

কোন্—(১) কোন্‌টি ধান আর কোন্‌টি চাল তা আমার জানা আছে—তোমার বক্তৃতা বন্ধ কর (বহুর মধ্যে এক)। (২) শুধু সমাজসেবা না করে তোমরা ছেলেরা ভাল করে পড়াশুনা করো'—কোনদিন হয়তো হেডমাষ্টার মশায় বলে বসবেন আমিই তোমাদের মাথা খেয়েছি (অনির্দিষ্ট দিনে)। (৩) হ'রে আর তার ছোটভাই এরা অন্যায় কবে, কিন্তু তুমিই বা কোন্ যুধিষ্ঠির! (কি প্রকাবে—বিশেষণীয বিশেষণ), তুমিই বা কোন ভাল ছেলে।

সব—(১) সব দেশেই ধনীও আছে দরিদ্রও আছে (বিশেষণ)। (২) আমি তার সব জানি (সর্বনাম)। (৩) আমি এ বিপদে সবই তো হারিয়েছি (বিশেষ্য=সর্বস্ব)।

যা (যাহা)—(১) যা পেটে সয তাই খাবে (সর্বনাম)। (২) যা তা ব'কোনা বলছি (বিশেষ্য=অনির্দিষ্ট খারাপ কিছু)। (৩) তুমি যা তা কাজ কববে আর আমি চুপ কবে বসে থাকবো (যথেচ্ছ—বিশেষণ)। (৪) তুমি যা তা খাবে—আর অসুখের দোষ! (খারাপ জিনিস—বিশেষ্যপদ)।

আপন—(১) সে আপন বুঝে চলে তাব বিপদ হয় না (নিজ)।

(২) 'সুখেব তুমি নও তো শুধু আপনভোলা কবি'—কান্তিচন্দ্র ঘোষ (আত্মহারা)।

(৩) 'আজি হৃদয় দল খুলিও আজি আপনপব ভুলিও'—রবীন্দ্রনাথ (শত্রু মিত্র)।

(৪) হৃদয়ে ভাবেব আবেশে আপনা-আপনি সুবের আলাপন চলে (স্বতঃ—ক্রিয়া বিশেষণ)।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রবচনমূলক বাক্য ও বাগ্‌ধারা

(Idioms and Proverbs)

[১] **অকূলে কূল পাওয়া**—সম্বলহীন বিধবা মাতা একমাত্র পুত্রের কর্মলাভে অকূলে কূল পাইলেন।

[২] **অতিলোভে তাঁতি নষ্ট**—অতিলোভে তাঁতি নষ্ট—এই কারণে সন্তোষ সুখের মূল (তুলনীয় : অতি আশ সর্বনাশ)।

[৩] **অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট**—এক কাজে যখন বহু কর্তা লাগিয়াছে তখন অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট সন্দেহ নাই।

[৪] **অভাবে স্বভাব নষ্ট**—অভাবে স্বভাব নষ্ট হয় বলিয়াই ভাললোক দুর্ভিক্ষে চুরি করে।

[৫] **অরণ্যে রোদন**—সহানুভূতিহীন প্রভুর নিকটে ভৃত্যের আবেদননিবেদন অরণ্যে রোদনে পরিণত হয়।

[৬] **অর্ধচন্দ্র দেওয়া**—ক্ষমতার অপব্যবহারকারী শক্তিশালী লোক স্পষ্টবাদী দুর্বলকে অর্ধচন্দ্র দিয়া বিদায় করে।

[৭] **আকাশকুসুম**—দরিদ্রের রাজ্যেশ্বর হওয়া আকাশকুসুম কল্পনা মাত্র।

[১৩০] **অগ্নিশর্মা** (অতিশয়ক্রোধী)—ছেলের এত বড় অন্যায়ে পিতা রাগে অগ্নিশর্মা হইলেন।

[১৩১] **ননীর পুতুল** (অত্যন্ত কোমল)—দেশের প্রত্যেক মাতা যদি ছেলেদের ননীর পুতুল করিয়া রাখেন তবে প্রয়োজনমত যুদ্ধে কেহই নামিবে না।

[১৩২] **হাল ছাড়িয়া দেওয়া** (আশা ভরসা ত্যাগ করা)—কমলাকান্তের জবানবন্দীতে বাদীপক্ষের উকিল মোকদ্দমা জয়বিষয়ে একেবারে হাল ছাড়িয়া দিলেন।

[১৩৩] **সোনায় সোহাগা** (যথাযোগ্য মিলন)—চোরের সঙ্গে যখন বাটপাড় জুটিয়াছে তখন সোনায় সোহাগা।

[১৩৪] **গায়ের ঝাল** (সঞ্চিত ক্রোধ)—শত্রু এখন দুর্বল—গায়ের ঝাল ঝাড়িবার ইহাই প্রকৃত সময়।

[১৩৫] **ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলা** (অসময়ে তুচ্ছ লোকের দরকার)—ও বাড়িতে বিয়ের নিমন্ত্রণে কেউ ডাকে না—মড়া পোড়াব সময় ডাক আসে—ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলা তো দরকার হবেই।

[১৩৬] **আকাশের চাঁদ** (অপ্রাপ্য বস্তু)—এত ভাল ভাল প্রার্থীর মধ্যে এই লোভনীয় কাজ পাওয়া সাধারণ লোকেব পক্ষে আকাশেব চাঁদ পাওয়া।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত বিশিষ্টার্থ বাক্যাংশদ্বারা (পদসমষ্টি দ্বারা) সার্থক বাক্য রচনা কর :–(পনেরয়) পা দেওয়া, চোখ মেলে দেখা, চড় কষাইয়া দেওয়া, কান খাড়া করা, কান্নায় ফাটিয়া পড়া, কেঁদে মরা, প্রাণ দেওয়া, কপালে থাকা, গোলে পড়া, হাত দেখান, মনের শিকল ছেঁড়া, কারাপ্রাচীর ভাঙ্গা, বিস্ময়ে মরা, মাটিতে চরণ ঠেকা সাহিত্যের খ্যাতি চুরি করা, সুরে সাড়া জাগা, মনেব গহনে স্বর পাঠান, মর্মের বেদনা উদ্ধার করা, জীবনে জীবন যোগ করা, উদরের চিন্তা ভার সহা, বিগড়াইয়া যাওয়া, জলের মতো চোখে পড়া, গা জ্বলিয়া যাওয়া, কথা ভাঙা, মাথায় খুন চড়ে যাওয়া, দিব্যি করা, গা করা, গা কী রকম করে, এক হাত নেওয়া, বাড়ি চড়াও হওয়া, মুখ হাঁড়ি করা, দূরে ঠেকাইয়া রাখা, রাস্তা মারা, বাজারে চলা, তরী পারে নেওয়া, মজা টের পাওয়া, বুকে ধরা, অশনি হানা, আকাশ ভাঙিয়া পড়া, হর্ষ ধরে (না), গাঁটে কড়ি বাঁধা, প্রসাদ পাওয়া, উপবাস ভাঙ্গা, ভাতে মারা, মুখ দেখান, চোখে চোখে রাখা, কান ভাঙ্গান, পেটে বোমা মেরেও, পাকা মাথা, বুকের রক্ত চুষিয়া খাওয়া, বুকে হাত দিয়া বলা, দেহ মাটি করা, কত ধানে কত চাল, চাকরি খাওয়া, গোল (goal) খাওয়া, গলা ধরে যাওয়া, গায়ে পড়া, ভূতে পাওয়া, কাশী (Banaras) পাওয়া, মাথায় লওয়া, সরে পড়া, উড়ে এসে জুড়ে বসা, টাকা মারা, পসার মারা মান ভাঙ্গা, পথ ভাঙ্গা, কপাল ভাঙ্গা।

২। নিম্নলিখিত বাক্যাংশগুলির বিশিষ্ট অর্থ নির্দেশ করিয়া বাক্য রচনা কর :— চুল ঠিক করা, নরম সুর, পাকা ফলার, নরম গরম শোনান, ফাঁকা আওয়াজ, বড় মুখ, সাদা কাগজ, বাঁকা কথা, পাকা দেখা, পাকা খেলোয়াড়, বাঁশ বনে শেয়াল রাজা, হাঁড়ির হাল, চোখের চামড়া, বিপদের কাণ্ডারী, চোখের পর্দা, বয়সের গাছ পাথর, গায়ের ঝাল, জিব কাটা, পিঁপড়ের পেট টেপা, ঠেলার নাম বাবাজী, বাস্তুঘুঘু, কেতা দুরস্ত (দোরস্ত), একূল ওকূল দুকূল যাওয়া, নুন (বা নিমক) খাওয়া, 'খাবি খাওয়া', খুদে রাক্কস, গজকচ্ছপের

লড়াই, সাত ঘাটের জল খাওয়, রণচণ্ডী, মাথা নাড়া দেওয়া, রাবণের চিতা, ছেঁকে ধরা, জগাখিচুড়ি বুদ্ধির ঢেঁকি, 'দাঁতে কুটো করা', দুঃখের দুঃখী ধর্মের ঢাক আপনি বাজে, উড়ে ধানের মুড়ি বালির বাধ, 'পোয়াবারো' (পোয়াবার)।

৩। অর্থ নির্দেশপূর্বক বাক্যরচনা কর:—শিবরাত্রির সলতে, বিদুরের খুদকুঁড়া, ব্যাঙের আধুলি, অকাল কুষ্মাণ্ড, গোঁয়ারের বলদ, শাকের করাত হাবহর আত্মা, চক্ষু চড়ক গাছ, অরণ্যে রোদন, হাতী পোষা, বিড়াল তপস্বী পাকধানে মই দেওয়া সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল, স্বর্গ হাতে পাওয়া, সোনায় সোহাগা সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় সাতেও নেই পাঁচেও নেই, সাতসমুদ্র তের নদীর পার, রথ দেখা ও কলাবেচা যমের অরুচি, মিছরির ছুরি, ভিমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়া ভাগ্নের মা গঙ্গা পায় না ভস্মে ঘি ঢালা, নেড়া আর কি বেলতলায় যায়, গুড়ে বালি, বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি, পাথরে পাঁচকিল, সাপের ছুঁচো গেল, ডুবে ডুবে জল খাওয়া, ঝোলে ঝোলে অম্বলে, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা, দুশ্চক্রে ভগবান ভূত।

৪। উপযুক্ত পদদ্বারা শূন্যস্থান পূর্ণ কর: (১) অনাথা বালিকা এই নির্মম সংসারে — ফুল হইয়া ভাসিতে লাগিল। (২) চোর ধরা পড়িলে পর গৃহস্থ তাহাকে — মধ্যম দিয়া বিচার কার্য সমাধা করিলেন। (৩) ছেলে উপার্জনে — কিন্তু বাপকে লম্বা লম্বা কথা বলে। (৪) বন্ধুর অনেকদিন দেখা নাই, তিনি এখন — ফুল হয়ে উঠেছেন।

সপ্তম পর্ব

ব্যাকরণ-রচনা সহায়ক

প্রথম অধ্যায়

নানার্থক শব্দ

বাঙ্‌লা ভাষায় একাকৃতি অনেক শব্দ বহুপ্রকার অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বর্তমান আকারের সহিত তাহার মূলের অনেক ক্ষেত্রে কোন সম্পর্ক থাকে না। যথা কল শব্দের অর্থ যখন যন্ত্র' তখন ইহা দেশী শব্দ। আর যখন ইহা মধুর অস্ফুট অর্থে প্রযুক্ত হয় তখন ইহার রূপ সংস্কৃত কল—(অব্যক্ত মধুর) কিন্তু লিখিত আকৃতি ইহাদের দুইয়েরই এক। অর্থের সংকোচ বা প্রসারে একই শব্দের অর্থের পরিবর্তন দেখা যায়। কাগজ— বলিতে লিখিবার কাগজকে প্রথমে বুঝা যাইত—কিন্তু অর্থের প্রসারে উহা পরে 'খবরের কাগজ' এবং কোম্পানীর কাগজ'কেও বুঝাইতেছে।

সাহিত্যে ব্যবহৃত বিভিন্নার্থক কতকগুলি শব্দের অর্থের আলোচনা করা হইল:—

অঙ্গ—(১) দেবীর প্রত্যেক অঙ্গ দিব্য অলংকারে শোভিত। (শরীরের অংশ) (২) 'একদা তুমি অঙ্গ ধরি ফিরিতে নবভুবনে' (শরীর)—রবীন্দ্রনাথ। (৩) দেখিবে যেন উৎসবের কোন অঙ্গহানি না হয়। (=আংশিক ত্রুটি) (৪) ধূপদীপ নৈবেদ্য প্রভৃতি পূজার অঙ্গ (অপরিহার্য অংশ)

অমর—(১) অমরগণের সহ অসুরদের যুদ্ধ লাগিয়াই আছে (দেবতা)। (২)

দেবতারা অমৃত পান করিয়া অমর হইয়াছেন (মৃত্যুহীন)। ভগবান্ শিব অমৃত পান না করিয়াই অমর। (৩) হনুমান্ ও বিভীষণ অমর হইয়াছেন (চিরজীবী)। (৪) মেঘদূতে কালিদাসের অমরকীর্তি (অবিনশ্বর)।

অভিনয়—(১) আজ আমাদের এখানে চন্দ্রগুপ্ত নাটকের অভিনয় হইবে (=নাট্য প্রদর্শন)। (২) লোকটা সাধুত্বের অভিনয় করিয়া সরিয়া পড়িল (কৃত্রিম ভাবপ্রকাশ করা)।

আলাপ—(১) পথিক অচেনা লোকটির সহিত আলাপ (কথাবার্তা) শুরু করিয়া দিল। আলাপে প্রলাপে হাসি উচ্ছ্বাসে আকাশ উঠিল আকুলি?—(রবীন্দ্রনাথ)। (২) লোকটি বহুকাল এই শহরে আছে, কিন্তু কাহারও সহিত আলাপ নাই (পরিচয়)। (৩) মিঞা তানসেন তখন সুরের আলাপ (গানের সুর ভাঁজা) করিতে লাগিলেন।

অঙ্ক—(১) ছেলেটির অঙ্কে বেশ মাথা আছে (গণিতে)। (২) সাতটি অঙ্কে নাটক শেষ হইয়াছে (নাটকের অংশবিশেষ)। (৩) শৈব্যা মৃত পুত্রকে অঙ্কে লইয়া শ্মশানে বসিয়া রহিলেন (ক্রোড়ে)। (৪) মাটিতে অঙ্কপাত করিয়া গণনা কার্য অনেকে করিয়া থাকেন (=চিহ্ন স্থাপন)।

কাগজ—(১) কাগজের অভাবে লেখাপড়ার কাজ অচল হইতে চলিয়াছে (লিখনের পত্র বা উপকরণ)। (২) অদ্যকার দৈনিক কাগজে পরীক্ষার ফল বাহির হইবার কথা (সংবাদপত্র—Newspaper) আছে। (৩) 'কোম্পানীর কাগজ' বিক্রয় করিলে এখন অনেক লাভ হইবে (দলিল পত্র)।

কণ্ঠ—(১) মাতার কণ্ঠে শেফালি মালা শোভা পাইতেছে (=গলা)। (২) আইন দ্বারা লোকের কণ্ঠরোধ করা চলিতে পারে কিন্তু শাসন করা চলে না (বাক্য ভাষা)। (৩) গায়কটি সুকণ্ঠ—এই বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ নাই (কণ্ঠ=স্বর)। 'হয়তো তখন কণ্ঠহারা মুখের পানে রব চেয়ে'—রবীন্দ্রনাথ।

খর (তীক্ষ্ণ)—(১) দেশজননী দ্বাত্রিংশ কোটি হস্তে খর কর-বাল ধারণ করিয়া আছেন (=ধারাল)। (২) চৈত্রের খর রৌদ্রে কৃষক মাঠে কাজ করে (উগ্র—প্রখর)। (৩) খরবেগে দামোদর নদ ছুটিয়া চলিয়াছে (অতিদ্রুত)।

চরণ—(১) হস্তে তোমার বিতর অন্ন চরণে তোমার বিতর মুক্তি (=পদ)—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। (২) কবিতা আবৃত্তি করিতে গিয়া ছেলেটি উহার এক চরণ ভুলিয়া গেল (=কবিতার পঙ্ক্তি)। (৩) মহাত্মাগণের চরণ লক্ষ্য করিয়া আমরাও যাত্রা করিব (পদচিহ্ন)।

ছড়া—(১) একখানা ছড়ার বই সংগ্রহ করিলে ভাল হয় (গ্রাম্য কবিতা বিশেষ)। (২) একছড়া কলা আর একছড়া সোনার হারের দাম সমান নহে (গুচ্ছ)। (৩) সকাল বেলায় গৃহস্থের উঠানে গোবর ছড়া পড়ে (ছিটা)।

জন্ম—(১) দেশের এক শুভ মুহূর্তে এই মহাপুরুষের জন্ম হয় (ভূমিষ্ঠ হ'ন)। (২) বিষ্ণু অযোধ্যার রাম হইয়া জন্ম নিলেন (দেহধারণ করিলেন)। (৩) সুখে দুঃখে তাঁহার জন্ম (জীবন) কাটিল।

নন্দন—(১) 'তব রাজকর লয়ে আট কোটি বঙ্গের নন্দন (পুত্র—অধিবাসী) দাঁড়াইবে আজ'—(রবীন্দ্রনাথ)। (২) চেষ্টা ও একাগ্রতা থাকিলে মরুভূমিকেও নন্দনে (স্বর্গের উদ্যান)

পরিণত করা যায়। (৩) শবরী নয়ননন্দন (আনন্দদায়ক) রামের আগমন প্রতীক্ষায় দীর্ঘ-কাল কাটাইল।

না (অব্যয়)—(১) আমি যাব না (অস্বীকার)। (২) সে যাবে না, না যাবে না (অনিশ্চয়)। (৩) ভাই আমার কাজটা করই না (অনুনয়), একবার খেয়েই দেখ না আম কি রকম। (৪) পরের জন্য কিছু করিতে পারিলে তাতে কত না (অধিক) সুখ। (৫) আমাদের না আছে অন্ন না আছে বস্ত্র (অথবা) 'আমি নাইবা গেলাম বিলাত নাইবা পেলাম রাজার খিলাত'—(রবীন্দ্রনাথ)। হে দেশ বরেণ্য' তুমি না সবার প্রিয় (স্বার্থে—অস্ত্যার্থে-তুমি সবার প্রিয়)। (৭) খোকা যাবে নায়ে। লাল জুতুয়া পায়ে॥ (রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত) (=না-নৌকা)।

পাট—(১) রাজা রাজপাটে বসিলেন (সিংহাসন)। (২) ধোবা পাটে কাপড় কাচে (তক্তা)। (৩) এ বাড়িতে বেলা আটটার আগে চায়ের পাট (প্রথা-নিত্যকর্মের ধারা) নেই। (৪) কাপড়ের পাটে (ভাঁজ) টাকা আছে। (৫) গৌড়েশ্বর দিল মোরে পাটের (রেশমের) পাছড়া (উড়ুনি)—কৃত্তিবাস। (৬) কুয়ার পাটের গায়ে কোলা ব্যাঙ্ দেখা যাইতেছে (পাতকুয়ার মধ্যস্থ পোড়ামাটির বেষ্টনী)। (৭) আমাদের পাড়ায় থিয়েটারে এবার চাণক্যের পার্ট (part) নেবেন হরিবাবু (অভিনেতা বা অভিনেতার বক্তব্য)। (৮) তখন সূর্য পাটে নামিল (অস্তে গেল)।

উত্তর—(১) 'কুবের আলয় ছাড়ি উত্তরে আমার বাড়ি' (মেঘদূত) (উত্তর দিক)। (২) সকলেই প্রশ্ন করে কিন্তু উত্তর কে দেয় (প্রত্যুত্তর—জবাব) (৩) লোকত্তর পুরুষ স্যার আশুতোষ তাঁহার কীর্তির মধ্যেই জীবিত রহিয়াছেন (উত্তর-উত্তম শ্রেষ্ঠ)। (৪) সুভাষচন্দ্র যে উত্তরকালে একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ হইবেন তাহার আভাস পূর্বেই পাওয়া গিয়াছিল (পরবর্তী)। (৫) রামচন্দ্র অষ্টোত্তর শত পদ্মদ্বারা মহাশক্তির আরাধনা করিতে সংকল্প করিলেন (অধিক)। (৬) রবীন্দ্রোত্তর বাঙলাসাহিত্য নানা বৈশিষ্ট্য লইয়া পুষ্ট হইতেছে। (=রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী)।

যাত্রা—(১) আজ পদযাত্রার চতুর্থ দিন (গমন)। (২) সামান্য আয়ে লোকটির জীবনযাত্রা নির্বাহ হইয়া থাকে (যাপন অতিবাহন)। (৩) মাহেশের রথযাত্রার দিন গাড়িতে জায়গা পাওয়া যায় না (দেবতার উৎসব)। (৪) এবারকার পূজোতে গ্রামে কোন যাত্রার দল আসে নি (অভিনয়-বিশেষ)। (৫) বৃদ্ধ গুরুতর অসুস্থ হয়েও এ যাত্রা রক্ষে পেলেন।

ভিত্তি—(১) মহামান্য রাজ্যপাল এই চিকিৎসালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন (মূল পাকাবাড়ির বুনিয়াদ)। (২) প্রাচীন দুর্গের পাষাণ ভিত্তি দূর হইতে দেখা যাইতেছে (প্রাচীর দেওয়াল)। (৩) পথেঘাটে যে সব কথা শুনা যায় তাহার অধিকাংশেরই কোন ভিত্তি নাই (=মূল শূন্য অমূলক)।

বিম্ব—(১) জীবন জলবিম্বের মত ক্ষণস্থায়ী (বুদ্বুদ্)। (২) নদীবক্ষে ঘন বন শ্রেণীর বিম্ব (ছায়া, প্রতিবিম্ব) পড়িয়াছে। (৩) মেঘের অন্তরাল হইতে সহসা চন্দ্রবিম্ব প্রকাশিত হইল (বিম্ব=মণ্ডল)। (৪) বিম্বাধরা রমা সমুদ্রের তলদেশে নির্বাসিতা হইয়া-ছিলেন (বিম্ব—তেলা কুচ, তেলাকুচ ফলের ন্যায় লাল টকটকে ঠোঁট যার)।

স্থান—(১) আজকাল গাড়িতে স্থানাভাব চলিয়াছে (যায়গা)। (২) দণ্ডকারণ্যে অংশ-

বিশেষের প্রাচীন নাম জনস্থান (=প্রদেশ, অঞ্চল)। (৩) বাবা তারকেশ্বরের স্থানের (তীর্থক্ষেত্র) দিকে রাম চলিয়া গেল। (৪) হিংসাশ্বারা লোকালয়কে পশুর স্থান (আবাস) করিতে চাহিনা। (৫) বড়সাহেবের স্থানে (পরিবর্তে) যিনি আসিলেন তিনিও তাঁরই মতো কড়া লোক।

সারা—(১) বাজে কাজে সারা দিন গেল (সমগ্র)। (২) 'বাদল ধারা হোল সারা' (সমাপ্ত) —রবীন্দ্রনাথ। (৩) ভাল করে খুঁজে দেখ—এই ঘরেই কোন লোক তোমার টাকা সেরে রেখেছে (লুকাইয়া রাখা)। (৪) ঘড়ি সারাতে বেশ কিছু খরচ হোল (মেরামত)। (৫) ওষুধ খেলে সর্দি সাতদিনে **সারে** (আর) না খেলে এক হপ্তায় (সপ্তাহে) **সারে** (রোগমুক্ত)।

কথা—(১) কথা না বলে থাকতে পারোনা বুঝি? (উক্তি, বচন) (২) আমাদের বাড়িতে আজ রামায়ণ কথা হইবে (কথকতা)। (৩) তুমি আমার **কথা** রাখিবে কি না বল (অনুরোধ)। (৪) তোমায় **কথা** দিয়ে আমি **কথা** রেখেছি (প্রতিশ্রুতি)। (৫) তাদের দুজনের মধ্যে আজ কয়েকদিন হয় একেবারে **কথা** বন্ধ (আলাপ)। (৬) পরের কথায় (পরামর্শ) যে লোক উঠে আর বসে তাঁর কথায় (প্রসঙ্গ) আমাদের কোন কাজ নেই। (৭) তোমার সঙ্গে প্রত্যেক দিনই বেড়াতে হবে এমন তো কোন কথা নেই (বাধ্যবাধকতা)। (৮) কথায় বলে যাব যত বেশি আছে সে তত বেশি চায় (প্রবাদ)।

দণ্ড—(১) দৌবারিক স্বর্ণ দণ্ড হস্তে রাবণের সভার দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। (=লাঠি)। (২) "ময়ূর নিদ্রায় মগ্ন স্বর্ণ দণ্ড পরে"—রবীন্দ্রনাথ (পাখির দাঁড়)। (৩) অন্যায় করিয়া দণ্ড ভোগ করা যায় কিন্তু মার্জনার ভার বহন করা যায় না (শাস্তি)। (৪) তিলে তিলে দণ্ডে দণ্ডে মানুষের আয়ু কমিতেছে (মুহূর্ত)।

ছত্র—(১) "শ্বেতপদ্ম ছত্র শোভে শরতের শিরে"—কবিগুণাকর (ছাতা)। (২) কাশীধামে গরমের সময় রাস্তার পাশে অনেকে জলছত্র দিয়া থাকেন (অন্ন জল প্রভৃতির সদাব্রত)। (৩) তিনছত্র লেখা লিখিতে তোমার কেন এত সময় লাগে হে? (পঙ্‌ক্তি লাইন) (৪) যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যগণ একবার **ছত্রভঙ্গ** হইলে জয়ে বিপর্যয় ঘটে (দলে ভঙ্গ)।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ দেখাইয়া সার্থক বাক্য রচনা কর:— অমর, অঙ্গ, কথা, কাগজ, জন্ম, না, ছড়া, উত্তর, ভিত্তি, স্থান, দণ্ড।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্য হইতে শব্দ চয়ন করিয়া শূন্যস্থান পূর্ণ কর। (প্রত্যেক বাক্যে যত শূন্য স্থান আছে তাহাতে একের অধিক শব্দ ব্যবহার করা চলিবে না):—

সারা, পাট, বিম্ব, উত্তর, জন্ম, কণ্ঠ, চরণ, অভিনয়, নন্দন, যাত্রা, ছত্র।

(ক) আমি——দিন ধরে ঘড়ি——ব্যস্ত, কিন্তু উহা আর কোন রকমেই——হয় না।

উত্তর:—আমি **সারা** দিন ধরে ঘড়ি সারাতে ব্যস্ত, কিন্তু উহা আর কোন রকমেই **সারা** হয় না।

(খ) তোমার——আমার শত মিনতি হে দেব, আমি যেন সাধুগণের——লক্ষ্য করিয়া জীবনপথে চলিতে পারি।

(গ) তুমি নিরুদ্দেশ——করিয়াছিলে বলিয়া এ——বিশেষ কিছু সুবিধা করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না।

(ঘ) সাধুত্বের——করা সহজ হইলেও নাটকের——অত সহজ নহে।

(ঙ) সূর্য যখন——বসেন তখন পর্যন্তও ও বাড়ির গিন্নীর রান্নার—— সারা হয় না।

(চ) এ লোকগুলো——প্রদেশের বাসিন্দা হলেও——কোন ধার ধারে না।

(ছ) সাধক রামপ্রসাদের——এই বাঙলায়, এইখানেই তিনি সারা——বাস করিয়াছেন

(জ) চন্দ্রের——আকাশ হইতে জলে পড়ে কিন্তু জলের——জলে মিশিয়া যায়।

(ঝ) বসন্তে ধরণীর——কর্ণিকার মালা আর কোকিলের——মধুরতা।

(ঞ) স্বর্গের——বনে ইন্দ্রের——বিহার করেন।

(ট) আপনি দয়া করিয়া কয়েক——লিখিয়া দিলে আমারা টাকা পাইতে পারি এবং অন্ন——খুলিতে পারি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রতিশব্দ

কোন শব্দের সমার্থক শব্দকে প্রতিশব্দ বলে। এই শব্দের বার বার প্রয়োগ নিবারণ এবং রচনায় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিবার কাজে প্রতিশব্দের জ্ঞানের দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

জল—বারি, সলিল, পয়(স্), জীবন, তোয়, অম্বু, উদক, নীর, পানীয়।

স্থান—স্থল, ভূমি, জায়গা, ঠাঁই, অঞ্চল, দেশ, প্রদেশ।

স্থল—স্থান, ভূমি, ডাঙ্গা, ক্ষেত, পাত্র।

আকাশ—গগন, অন্তরীক্ষ ব্যোম, শূন্য, অম্বর, অভ্র।

বাতাস—বায়ু, সমীরণ, অনিল, পবন, হাওয়া, গন্ধবহ, বাত।

ঝড়—প্রভঞ্জন, বাত্যা, ঝটিকা, ঝঞ্ঝা, ঝঞ্ঝাবাত।

সূর্য—আদিত্য, দিবাকর, ভাস্কর, প্রভাকর, সপ্তাশ্ব, সবিতা, মিত্র, বিভাকর দিনকর, দিনমণি, অংশুমালী, সহস্ররশ্মি, মার্তণ্ড মিহির, অরুণ, তপন, রবি, ভানু।

চন্দ্র—শুধাংশু, চন্দ্রমা, ইন্দু, বিধু, শশধর, নিশাপতি, নিশানাথ নিশাকর, নিশাকান্ত, সোম, মৃগাঙ্ক, শশাঙ্ক, চাঁদ।

অগ্নি—বিভাবসু, অনল, দহন, আগুন, পাবক, বহ্নি, হুতাশন, বৈশ্বানর তনূনপাৎ (মুকুন্দরাম), জাতবেদাঃ, জ্বলন।

বন—বিপিন, কানন, গহন, অরণ্য, অটবি কান্তার, জঙ্গল।

নগর—নগরী, পত্তন, সহর, (শহর), পুরী।

রাজা—নৃপ, নৃপতি রাজ্যেশ্বর, নরপতি, অধিপতি, লোকপাল, ভূপাল, মহীপাল, ভূমিপ, পার্থিব।

লতা—বল্লী, বল্লরী, ব্রততী।

পোষাক—পরিচ্ছদ, বসন, জামাকাপড়, বেশ।

নদী—তরঙ্গিণী, শৈবলিনী, তটিনী, প্রবাহিণী, সরিৎ, (নদ), স্রোতস্বতী, গাঙ্।

গৃহ—আলয়, আগার আবাস, ভবন, নিকেতন, নিলয়, ঘর, সদন, বাড়ি।

পর্বত—ভূধর, ধরাধর, মহীধর, শৈল, অচল, নগ, গিরি, অদ্রি।

পদ্ম—শতদল, কমল, পঙ্কজ, উৎপল, কোকনদ, রাজীব, সরসিজ সরোজ, পুণ্ডরীক, তামরস, ইন্দীবর, কুবলয়।

বিদ্যুৎ—বিজলী, ক্ষণপ্রভা, সৌদামিনী, তড়িৎ, চপলা।

মেঘ—অভ্র, ঘন, জলধর, নীরদ, অম্বুদ, তোয়দ, বলাহক, জলদ, পুষ্কর, বারিদ, জীমূত, পর্জন্য।

রাত্রি—নিশিথিনী, ত্রিযামা, রজনী, বিভাবরী, যামিনী, শর্বরী, নিশা, ক্ষণদা।

নারী—স্ত্রী, মহিলা, রমণী, ললনা, অবলা, প্রমদা, বনিতা কান্তা, অঙ্গনা, বধূ, সীমন্তিনী, বামা, বরবর্ণিনী।

নর—পুরুষ, মানব, মনুষ্য, পুমান্, জন, ব্যক্তি, লোক, মনুজ।

বৃক্ষ—তরু, বিটপী, শাখী, পাদপ, দ্রুম, গাছ।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির তিনটি করিয়া প্রতিশব্দ দ্বারা বাক্য রচনা করঃ—পদ্ম, জল, বন নদী, পৃথিবী, রাজা গৃহ রাত্রি।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির তিনটি করিয়া প্রতিশব্দ লিখঃ—মেঘ, সূর্য, আকাশ, বাতাস, চন্দ্র, নারী গৃহ।

৩। স্থূলাক্ষরে মুদ্রিত স্থলগুলিতে প্রতিশব্দ বসাইয়া আবশ্যকমত বাক্যের পরিবর্তন সাধন করঃ—(১) আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। (২) কল কল্লোলে লাজ দিল আজ **নারী কণ্ঠের** কাকলি (রবীন্দ্রনাথ)। (৩) **'মনুষ্যের পদবৃদ্ধি** হইলেই সে **বিজ্ঞ** বলিয়া গণ্য হয়' (বঙ্কিমচন্দ্র)। (৪) **গভীর জলধি** কখনও অল্প কারণে **আকুলিত** হয় না (সীতার বনবাস)। (৫) তেলমাথায় তেল দেওয়া **মনুষ্য জাতির রোগ** (বঙ্কিমচন্দ্র)। (৬) অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ **পৃথিবীতে** কেহ আইসে নাই (বঙ্কিমচন্দ্র)। (৭) 'তাহারই **প্রত্যুত্তরে** আমার স্বর্গবাসিনী জননী এই **গঙ্গাজল-দুহিতার বিবাহের** সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া যে **চিঠি** লিখিয়াছিলেন, এ খানি সেই মূল্যবান্ দলিল'—শ্রীকান্ত। (৮) **প্রাচীরবন্ধ কারাগারে ক্ষুদ্র** প্রাঙ্গণে বহু দিনের আলোকের অপ্রাচুর্যের মধ্যে শরতের যে সামান্য আলোর **প্রকাশ হইয়াছে** তাহাতে **কবিচিত্ত** পুলকিত।

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলির যতগুলি প্রতিশব্দ তোমার জানা আছে তাহা লিখঃ—

বৃক্ষ, লতা, ফুল, বাতাস, ইস্কুল শিক্ষক পিতা, মাতা, বিদ্যুৎ, পাখা, পক্ষী, ব্যাঘ্র ধনুক, বাণ, মাছ, মাংস, আলো, লাঠি, জুতা, জামা, জজ, দুধ, কলা, সাপ, ব্যাঙ্, পশু, হরিণ, শিয়াল, চুল, মাথা, কান, চোখ, মুখ, রাস্তা, ঘাট, চোর, ডাকাত, ঠক, বেকুব; বড়, ছোট।

তৃতীয় অধ্যায়

বিপরীতার্থক শব্দ

বিপরীতার্থক শব্দ প্রয়োগে অনেক সময়ে রচনার শক্তি বর্ধিত হয় এবং রচনা সরস হইয়া উঠে।

নানা উপায়ে মূল শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ গঠন করা যায় অথবা সাহিত্য হইতে বিপরীতার্থক শব্দ চয়ন করিয়া রচনায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

পৃথক্ শব্দের ব্যবহারদ্বারা :—গোপনীয়—প্রকাশ্য। উদিত—অস্তমিত। কৃতজ্ঞ—কৃতঘ্ন। সুন্দর—কুৎসিত। হর্ষ—বিষাদ। জন্ম—মৃত্যু। জীবন—মৃত্যু ('জীবনমৃত্যুর ওঠাপড়া' রবীন্দ্রনাথ)। উঠা—পড়া, বসা। উত্থান—পতন। সুখ—দুঃখ। বৃদ্ধি—ক্ষয়, হ্রাস। উৎপত্তি—বিনাশ। ধনী—দরিদ্র নিঃস্ব। পূর্ণ—রিক্ত, শূন্য, অপূর্ণ, (অপূর্ণ বাসনা রহিল কাহার, দেখিতে বারেক ফিরি না চায়'—কামিনী রায়)। লঘু—গুরু। লঘিষ্ঠ—গরিষ্ঠ। শুক্ল—কৃষ্ণ। স্থাবর—জঙ্গম। সরল—কুটিল, [**জটিল** (প্রশ্ন), কুটিল পথ, কুটিল লোক]। দিন, দিবা—রাত্রি। দূর—নিকট। স্বর্গ—মর্ত্য। আসা—যাওয়া। বেচা—কেনা। লেন—দেন। স্তুতি—নিন্দা। সাদা—কালা। উদার—ক্রুর। গরল—অমৃত। দৃঢ়—শিথিল। আসল—নকল। আরম্ভ—শেষ। বাল্য—জরা। আকাশ—পাতাল ('আকাশপাতাল কতই মনে হয়')। ছোট—বড়। পুণ্য—পাপ। সহর (শহর)—গ্রাম (আমার সাথে আস্‌বে হেথায়, দূর সে রেখে সহর গ্রাম—কান্তিচন্দ্র ঘোষ)। রক্ষক—ভক্ষক। রাখাল—ভূপাল। সন্ধি—বিগ্রহ। যান—আসন। উচ্চ-নীচ। জড়—চেতন। গ্রাহ্য—ত্যাজ্য। গ্রহণীয়—বর্জনীয়। আত্ম—পর ('দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি')। স্বাভাবিক—বিকৃত। কদাচিৎ—সর্বদা। বর্তমান—অতীত। প্রোথিত—উত্তোলিত। বিস্তৃত—সংকুচিত। শুষ্ক—আর্দ্র। আলোক—অন্ধকার। সংকীর্ণ—প্রশস্ত। মৃত—জীবিত। জল—ডাঙ্গা। ব্যস্ত—শান্ত। স্থগিত—চালু, সক্রিয়। অনাস্থা—ভরসা। বহাল—বরখাস্ত। আবাহন—বিসর্জন।

উপসর্গের পরিবর্তন দ্বারা :—সংযোগ—বিয়োগ। নিবৃত্ত—প্রবৃত্ত। অনুগ্রহ—নিগ্রহ। জয়—পরাজয়। চড়াই—উৎরাই। উপকার—অপকার। অনুরক্ত—বিরক্ত। অনুরাগ—বিরাগ। উন্নতি—অবনতি। সম্পদ্—বিপদ্, আপদ্। সঞ্চয়—অপচয়। আয়—ব্যয়। আবির্ভাব—তিরোভাব। আদান—প্রদান। সম্মান—অপমান। স্মৃতি—বিস্মৃতি। সমাস—ব্যাস, (বিগ্রহ)। উন্মীলন—নিমীলন। সকাল—বিকাল ('সকাল বেলা কাটিয়া গেল, বিকাল নাহি যায়'—রবীন্দ্রনাথ)। উদ্‌বিগ্ন—নিরুদ্বেগ। আগত—প্রত্যাগত। আরোহণ—অবতরণ। দুর্বল—সবল। প্রবেশ—নির্গম। অধিকার—অনধিকার। অপরাধী—নিরপরাধ। নগ্ন—আবৃত, সবস্ত্র, সাচ্ছাদন। উপক্রম—অবসান। আমিষ—নিরামিষ।

নঞ্‌যোগে :—চিন্তা—অচিন্ত্য। পরিমিত—অগণিত। স্পর্শ—অস্পর্শ। মলিন—অমলিন ('তবুও তোমার দূত অমলিন শ্রান্তি ক্লান্তিহীন'—রবীন্দ্রনাথ)। শান্ত—অশান্ত ('অশান্ত ক্রন্দন)। আহার—অনাহার। সাধু—অসাধু। নিদ্রা—অনিদ্রা। কাল—অকাল। ভুক্ত—অভুক্ত।

ইষ্ট—অনিষ্ট। ন্যায়—অন্যায়। ধর্ম—অধর্ম। অশন—অনশন ('অনশন ধর্মঘট')। কৃত—অকৃত। চল—অচল। পাঠ্য—অপাঠ্য। খাদ্য—অখাদ্য। ভক্ষ্য—অভক্ষ্য। যত্ন—অযত্ন। নিন্দনীয়—অনিন্দ্য, অনিন্দনীয়। শব্দ—অশব্দ। শরীরী—অশরীরী। রূপী—অরূপ। আস্তিক—নাস্তিক। আদর—অনাদর ('শ্রীরূপে কমলা ছায়াসম যাঁর আদরে ও অনাদরে'—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)। অস্তি—নাস্তি 'অস্তিনাস্তি শেষ করেছি'—কান্তি ঘোষ)। শোভন—অশোভন। সম্ভাব্য—অসম্ভাব্য। ভয়—অভয়।

বিশেষণ যোগেঃ—সুদিন—কুদিন, দুর্দিন। ইহলোক—পরলোক। স্বার্থ—পরার্থ। স্বপক্ষ—বিপক্ষ। সাকার—নিরাকার। সজল—নির্জল, (জলহারা)। বিখ্যাত—কুখ্যাত, অখ্যাত। খ্যাত—অখ্যাত। ঐহিক-পারত্রিক। ভৈরব কল্লোল—কল কল্লোল। স্বার্থপর—পরার্থপর। চরিতার্থ--ব্যর্থ। নিষ্কর্মা—কর্মব্যস্ত।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীতার্থবোধক শব্দদ্বারা বাক্য রচনা করঃ—উদ্বিগ্ন, শুষ্ক, বিস্তৃত স্থগিত, লঘু, সবল, স্থাবর, উৎপত্তি, যান, জড়, অনুগ্রহ, অনুকূল, সঞ্চয়, আবির্ভাব, সমাস, আস্তিক, স্বার্থ, কৃতঘ্ন, গরিষ্ঠ, ভিতর, পাপ, বৃদ্ধি, সম্পদ, ধনী, অপরাধী, পণ্ডিত, সুপ্ত, শূন্য, নরম, রক্ষক, স্থগিত, সজীব বিয়োগ, বিকৃত, হিসাবী, আন্তরিক, সংঘর্ষ, কল্যাণ, সুষুপ্ত, অবতরণ, মানব, কনিষ্ঠ, শয়তান, কৃত্রিম, নিস্তব্ধ, কঠোর, অধীন, ঐক্য, উন্নতি, সজ্জিত, ধপধপে, গোপনীয়, উদিত, আবির্ভাব, ক্ষীণ, সমাধান, বহুল, আহ্বান, ডুবন্ত, জ্বলন্ত।

২। অর্থের সংগতি রক্ষা করিয়া শূন্যস্থান পূর্ণ করঃ—(ক) সুন্দরবনে—বাঘ—কুমীর। (খ) রামবাবুর মতো সৎলোকের নিকট হইতে টাকাটা পাইবার আশাই করিতে পারি কেন--করি না। (গ) তাঁহার আন্তরিক হৃদ্যতার মধ্যে যে—আছে তাহা আমি স্বীকার করি না। (ঘ) কি কি--সকলকেই একদিন না একদিন শ্মশানে আসিতে হইবে। (ঙ) লোকালয়ে থাকিতে না পারি—আশা করি থাকিতে পারিব। (চ) সুখ যদি চাও তবে তোমাকে অবশ্যই দুর্বে—বরণ করিয়া লইতে হইবে। (ছ) ধর্মগ্রন্থ পাঠের উপক্রম থাকিলে—ও থাকিবে। (জ) মনিব—বেশ দুকথা শুনিয়ে দিলেন। (ঝ) যখন কোন যায়গায় দাঙ্গা-দাঙ্গামা বাধে তখন গোলমালের মধ্যে কে—কেইবা—তাহা ঠিক করা শান্তিরক্ষকদের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে। (ঞ) ঘটনার—রূপের বর্ণনা না করিয়া তুমি তাহাকে—করিয়াছ। (ট) "অন্ধ জাগো কিবা—"। (ঠ) সুস্থ মানব যাহা করিতে পারে না—তাহা করিতে পারে। (ড) তোমার উন্নতিতে আমি যেমন সুখী তেমনি তোমার—আমি দুঃখিত হইব। (ঢ) যে জাতির অতীত আছে তাহার—থাকিবেই। (ণ) পর্বতে—কঠিন কিন্তু—অপেক্ষাকৃত সহজ।

চতুর্থ অধ্যায়

বিশিষ্ট-ধ্বনিবোধক শব্দ

ধ্বন্যাত্মক শব্দ বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সম্পদ। শব্দদ্বৈতদ্বারা বিভিন্ন প্রকারের ধ্বনির বোধ হইয়া থাকে। ইহার আলোচনা অন্যত্র করা হইতেছে। (পঞ্চমপর্ব, প্রথম অধ্যায়)। ইহা ছাড়া জীব, জন্তু, নদী, বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতির ধ্বনি প্রকাশক একক শব্দও আমাদের সাহিত্যে রহিয়াছে। এই সম্বন্ধে আলোচনা দ্বারা শিক্ষার্থিগণ রচনা বিষয়ে উপকৃত হইবেন।

ঘোড়ার ডাক—**হ্রেষা। আলোচনাঃ—সংস্কৃত**√হ্রেষ্ হইতে (১) বিশেষ্যরূপে (হ্রেষা) **'অশ্বের হ্রেষায়** আর হস্তীর বৃংহিতে' ('প্রাচীন ভারত')। (২) ক্রিয়ারূপে– 'মন্দুরায় হ্রেষে অশ্ব' (মধুসূদন)।

হাতীর ডাক—**বৃংহণ, বৃংহিত। আলোচনাঃ**—সংস্কৃত√বৃন্‌হ্ ধাতু হইতে। বৃন্‌হ্ বড় করা, বড় হওয়া। বৃন্‌হ্+অন-বৃংহণ বড় হওয়া, বড় করা (বিশেষ্য), বৃংহিত—বৃন্‌হ্+ক্ত (ভাববাচ্যে) বড় হওয়া, (কর্মবাচ্যে অর্থ যাহাকে বাড়ান হইয়াছে=বর্ধিত। বিশেষ অর্থে 'হাতীর ডাক', দীর্ঘ সময়ব্যাপী শব্দ। 'হস্তীর বৃংহিতে' (প্রাচীন ভারত)। [এই বৃন্‌হ্ ধাতু হইতে 'ব্রহ্ম' হইয়াছে—যাঁহার বড় আর কেহ নাই, যিনি সকলের বড়]।

পাখির ডাক—(১) **কূজন** (২) **কাকলি। আলোচনাঃ**—(১) সংস্কৃত√কূজ্ ধাতু হইতে ভাবে অন প্রত্যয়। 'পাপিয়া পিকের কাকলি শুনিলে সকাল সন্ধ্যাবেলা' (কুমুদরঞ্জন মল্লিক)। "কলধ্বনি" অর্থেও রবীন্দ্রনাথ প্রয়োগ করিয়াছেন—কলকল্লোলে লাজ দিল আজ **নারীকণ্ঠের 'কাকলি'**।

কোকিলের ডাক—(১) (অনুকরণাত্মক) **'কুহু'। আলোচনাঃ**—ক্রিয়া 'কুহর' 'নূতন জাগা কুঞ্জবনে কুহরি উঠে পিক' (রবীন্দ্রনাথ)। (২) সংস্কৃত ভাষায় কুহু শব্দের অর্থ 'অমাবস্যা'। বৈষ্ণব কবিরা অমাবস্যার রাত্রি অর্থে 'কুহুযামিনী' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন—'একে কুল-কামিনী তাহে কুহু-যামিনী' (গোবিন্দদাস)।

ময়ূরের রব—কেকা।—'উতলা কলাপী কেকা কলরবে বিহরে' (রবীন্দ্রনাথ)।

ভ্রমর, অলি, মধুপের ধ্বনি—**গুঞ্জন**। 'মধুপগুঞ্জনগীতি' ('ব্রাহ্মণ' রবীন্দ্রনাথ)।

হংসের রব—**কলধ্বনি**। 'রেবার কূলে কলহংস-কলধ্বনির মতো' (রবীন্দ্রনাথ)।

নদীর ধ্বনি–(১) **কুলুকুলু** (অনুকরণাত্মক) 'কুলুকুলুধ্বনি চলে মন্দাকিনী'—**হেমচন্দ্র**।

আলোচনাঃ—(২) **কলধ্বনি**। 'এ নদীর কলধ্বনি সেথায় বাজে না' (রবীন্দ্রনাথ) (৩) **কল্লোল**। 'তীর ছাপি নদী **কলকল্লোল** এল পল্লীর কাছে রে' (রবীন্দ্রনাথ)। জলদল—কলরব (দ্বিজেন্দ্রলাল)।

বাঘসিংহ প্রভৃতির ডাক—গর্জন। **আলোচনাঃ**—'সিংহের গর্জন শুনিয়া লোকে মূর্ছা যায়'।

কামানের— গর্জন।

মেঘের শব্দ—(১) **গর্জন**। মেঘের গর্জন ভ্রমে পুরউপবনে '

নাচিছে উল্লাসভরে ময়ূরনিকর॥—(নবীনচন্দ্র কবিগুণাকর)

(২) **গুরুগুরু** (অনুকরণাত্মক) 'বর্ষাবাতে মেঘের **গুরুগুরু**' (রবীন্দ্রনাথ)। বেণুবীণার মিলিত শব্দ—**কলরব**। কোন বসন্তের মহোৎসবে বেণুবীণার কলরবে, (রবীন্দ্রনাথ)।

শুষ্কপত্রের ধ্বনি—**মর্মর**। **মর্মর মুখরছায়া** মাধবীবনের হোত স্বপনের (রবীন্দ্রনাথ)। 'পর্ণরাশি মুর্মর মঞ্জীর' (চার্বাক ও মঞ্জুভাষা)। **আলোচনা**ঃ—[(মর্মর শব্দের আর একটি অর্থ শ্বেত পাথর। সিত মর্মরে খচি বিরাট দেউল রচি —কালিদাস রায়)]।

অলংকারের শব্দ—**শিঞ্জন, শিঞ্জিত**। কাহার নূপুর শিঞ্জিত পদ সহসা বাজিল বক্ষে ('অভিসার'—রবীন্দ্রনাথ)।

নূপুরের শব্দ—**নিক্কণ** (ঝংকার ধ্বনি)। তব পুরসুন্দরীর নূপুরনিক্কণ (রবীন্দ্রনাথ)।

কঙ্কণের **শব্দ—ঝংকার** (১) 'কঙ্কণের ঝংকার নূপুর বাজে। **আলোচনা**ঃ (২) বীণার ঝংকার (৩) ভ্রমরের ঝংকার (৪) বণিকের ধন ঝংকার (৫) অসন্তুষ্ট হইয়া তর্জন গর্জন করা—বাসন পর্বত পাশে **ঝিয়ের ঝংকার**' (হাসির তোড়া)। (৬) নাচিয়ে দিত ময়ূরটিরে **কঙ্কণ** ঝংকারে—(রবীন্দ্রনাথ)।

রথের চক্রের শব্দ (১) ঘর্ঘর। রথের ঘর্ঘরমন্দ্রে (রবীন্দ্রনাথ) (২) ভেকের ডাক

ধনুকের শব্দ—**টঙ্কার**। ধনুর টঙ্কার

অসির শব্দ—**ঝঞ্জন, ঝঞ্জনা**। অসির ঝঞ্জনা (নজরুল)।

যোদ্ধার ধ্বনি (Warcry) **হুংকার**। ডরায়ে ধরার রণহুংকার (বিশ্বদেব—রবীন্দ্রনাথ)।

[**অতিরিক্ত উদাহরণ**ঃ

অশ্বের **হ্রেষায়** আর হস্তীর বৃংহিতে
অসির **ঝঞ্জনা** আর ধনুর **টংকারে**
বীণার **সংগীত** আর নূপুর **ঝংকারে**
বন্দীর বন্দনারবে উৎসব উচ্ছ্বাসে
উন্মাদ শঙ্খের **গর্জে**, বিজয় উল্লাসে,
রথের **ঘর্ঘরমন্দ্রে**, পথের **কল্লোলে**
নিয়তধ্বনিত ধ্মাত **কর্মকলরোলে**'—(প্রাচীন ভারত)।

অল্পকাল মধ্যেই অশ্বের **হ্রেষারবে** হস্তীর **বৃংহিতে** রথের **ঘর্ঘরে** যোদ্ধাগণের **চীৎকারে** সেই নিপুণ সৈন্যসমাগম ক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রের ন্যায় শব্দিত হইতে লাগিল

—(কুরুপাণ্ডব, পৃঃ ৮০)]

অনুশীলনী

১। নির্দিষ্ট বিশিষ্টধ্বনিবোধক শব্দ যোগে সার্থক বাক্য রচনা কর**ঃ—শুকনা পাতার শব্দ** ময়ূরের ডাক নদীর শব্দ, ধনুকের ছিলার শব্দ, ঘোড়ার ডাক কামানের গোলার শব্দ, '**কোকিল ডাকা** সেই শুনেছি কবে'—(যতীন্দ্রমোহন বাগচী), অসির (তরোয়াল) শব্দ, গয়নার আওয়াজ।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলিদ্বারা যত প্রকার ধ্বনি প্রকাশ করা যায় তাহা দেখাইয়া বাক্য রচনা কর ঃ—কলরব, গর্জন, কাকলি, ঝংকার, ঘর্ঘর, গুঞ্জন।

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির পূর্বে উপযুক্ত বিশেষণ পদ বসাইয়া বাক্য রচনা কর ঃ -কল্লোল, কাকলি, গর্জন, কূজন, টংকার, বৃংহিত।

পঞ্চম অধ্যায়

পদ-পরিবর্তন

সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয় যোগে

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
আরোহণ	আরূঢ় (আ+রুহ+ক্ত)	প্রসাদ	প্রসন্ন (প্র+সদ্+ক্ত)
		অবসাদ	অবসন্ন
পাক	পক্ব (পচ+ক্ত)	সম্পদ	সম্পন্ন
শোষণ	শুষ্ক	বিপদ্	বিপন্ন
দোষ	দুষ্ট	ভেদ	ভিন্ন
আদর	আদরণীয়, আদৃত	বিষাদ	বিষণ্ণ
পূজা	পূজনীয়, পূজিত	ত্যাগ	ত্যক্ত
	পূজ্য	ভোজন	ভুক্ত, ভোজ্য
উন্মাদ	উন্মত্ত	রোগ	রুগ্ন
লোভ	লোভন (কর্তৃবাচ্যে),	অনুবাদ	অনূদিত
	লুব্ধ [নয়ন লোভন]	প্রশ্ন	পৃষ্ট
শোভা	শোভন (অশোভন	প্রণয়ন	প্রণীত
	কাজ করিয়াছে),	উদ্যম	উদ্যত
	শোভিত	বিধি	বিহিত
গ্রাস	গ্রস্ত (গ্রস+ক্ত)	স্পর্শ	স্পৃষ্ট
প্রসঙ্গ	প্রসক্ত	মোহ	মুগ্ধ, মোহিত, মোহন
পান	পানীয় (পানীয়জল)	ক্ষয়	ক্ষীণ (কৃষ্ণপক্ষের
	পীত		ক্ষীণ (চন্দ্র)
নিরসন	নিরস্ত		
আবেশ	আবিষ্ট	ভক্তি	ভক্ত, ভজনীয়
উদ্বর্তন	উদ্বৃত্ত	প্রতিষ্ঠা	প্রতিষ্ঠিত
অবসান	অবসিত	দুর্গতি	দুর্গত
উৎকর্ষ	উৎকৃষ্ট	উদ্বেগ	উদ্বিগ্ন

বাঙ্লা কৃৎপ্রত্যয় যোগে

ডুব	ডুবু ডুবু	পূজা	পূজারী
পড়া (পতিত হওয়া)	পড়ন্ত (সংস্কৃত পত্ ধাতু)	ভরা	ভরাট
		বাজানা	বাজিয়ে
বাড়	বাড়ন্ত (ঘরে চাল বাড়ন্ত)	বলা	বলিয়ে
		ফেরা	ফেরত, ফেরতা

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
ঘুম	ঘুমন্ত (ঘুমন্ত জাতি)	জানা	জান্তা
		উঠা	উঠতি (বয়স)
সেবা	সেবাইৎ	ফেরা	ফিরতি (গাড়ি)
খেলা	খেলুড়ি খেলোয়াড় খেলুড়ে	চলা	চলতি (বুলি)
		ডুব	ডুবুরি (রতন থাকে অগাধ জলে তে ডুবে তোলে। — নন্দদাস)
মিশা	মিশুক		
লাজ	লাজুক (লাজুক তবা তাই শুনে কি পালিয়ে গেছে দিগ্বিদিক — কান্তিচন্দ্র ঘোষ)	বসা (বাস করা)	বসত (বাটি)
		পড়া (পঠ্ ধাতু)	পড়ুয়া

সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে

বস্তু	বাস্তব	শ্রী	শ্রীল শ্রীমান
শক্তি	শাক্ত	অর্থ	অর্থবান্ (যার অনেক টাকা আছে)।
বিষ্ণু	বৈষ্ণব (বৈষ্ণবশাস্ত্র)		
শিব	শৈব (ধনু)	অর্থ	অর্থী (যাহার টাকা নাই টাকার প্রার্থী)।
গণপতি	গাণপত্য		
কুল	কুলীন	বন	বন্য
গ্রাম	গ্রামীণ গ্রাম্য	চির	চিরন্তন
পুরাণ	পৌরাণিক	সায়ম্	সায়ন্তন
বেতন	বৈতনিক	দক্ষিণ (সর্বনাম	দাক্ষিণাত্য
ধর্ম	ধার্মিক, ধর্ম্য	বিমান	বৈমানিক
কুসুম	কুসুমিত (উপবন)	সন্ধ্যা	সান্ধ্য
চন্দ্র	চান্দ্র		
পুলক	পুলকিত	বর্ষ	বার্ষিক
সর্প	সর্পিল	অতিথি	আতিথেয়
ফেন	ফেনিল	বিধি	বৈধ
মাংস	মাংসল	বায়ু	বায়বীয়
গুণ	গুণী গুণবান	দেহ	দৈহিক
বিরহ	বিরহী	শরীর	শারীরিক
শক্তি	শক্তিমান্	চরিত্র	চারিত্রিক
দেব	দৈব	পিতা	পৈতৃক

বাঙ্লা তদ্ধিত যোগে

ঢাকা	ঢাকাই	ঝগড়া	ঝগড়াটে
মোগল	মোগলাই	তামা	তামাটে
		ভাড়া	ভাড়াটে
ফুল	ফুলেল	হিংসা	হিংসুটে

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
সোনা	সোনালি	চাঁদ	চাঁদপানা
রূপা	রূপালি	কুলো	কুলোপানা
সুতা	সুতালি	ভাত	ভেতো
বেনারস	বেনারসী	বেত	বেতো
চোর	চোরাই	পাথর	পাথুরে (প্রমাণ)
দানা	দানাদার (চিনি)	দাঁত	দেঁতো (হাসি)
গোলাপ	গোলাপী	মাছ	মেছো (মেছো হাট, মেছো কুমীর)
'সুনীলবরণ'	'সুনীলবরণী'		

[আকাশ......করেছে সুনীলবরণী]

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
ঘুষ	ঘুষখোর	মাঠ	মেঠো
জল	জলো (সংস্কৃত জলীয়)	খুন	খুনে
		ধান	ধেনো
দাঁত	দাঁতালো	জোর	জোরালো
পাত	পাতলা (পাতের মতো)	জঙ্গল	জঙ্গলী, জংলা
		মেয়ে	মেয়েলী
		গাঁ	গেঁয়ো
মেঘ	মেঘলা ('মেঘলা দিনে মনে পড়ে ছেলে-খেলার গান')	বন	বুনো (সংস্কৃত বন্য)
		বালি	বেলে
		চীন	চীনা, চৈনিক
রোগ	রোগাটে (প্রায় রুগ্ন)	চৈত	চৈতালি (হাওয়া)
ঢাল	ঢালী	মিথ্যা	মিথ্যুক
লাঠি	লেঠেল	পেট	পেটুক
দাড়ি	দেড়েল		

নামধাতুরূপে পদ পরিবর্তন

বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ প্রত্যয় যোগে ক্রিয়াতে পরিণত হয়ঃ—

বিশেষ্য বা বিশেষণ	ক্রিয়া (বা কৃদন্ত বিশেষণ বাংলায়)	বিশেষ্য বা বিশেষণ	ক্রিয়া (বা কৃদন্ত বিশেষণ বাংলায়)
শ্যাম (+ক্যঙ্)	শ্যামায়মান (শানচ্	হাত+আ	হাতায়
ঘন (+কাঙ্)	ঘনায়মান	কাম+আ	কামায়
ফেন (+ক্যঙ্ (ষ)	ফেনায় (+ইয়া) 'ফেনাইয়া উঠে'	পান+আ	পানায়
		রঙ্গ+আ	রঙ্গায়
পিছল+আ	পিছলায়	তল+আ	তলায় (নীচে যায়)
জুতা+আ	জুতায়		

সমাসে পদ পরিবর্তন

(১) অব্যয়ীভাবে বিশেষ্যপদ অব্যয় যোগে অব্যয় হয় ঃ
যথাশক্তি, অনুক্রম, বেমিল, গরমিল ইত্যাদি

(২) **বহুব্রীহি সমাসে** বিশেষ্য বিশেষণ সব মিলিয়া সমস্ত পদটি অন্যপদের **বিশেষণ হয়ঃ—**
পীতাম্বর (হরি), নীলাম্বর (বলরাম)

বিশেষণের বিশেষ্যরূপে পরিবর্তন

সংস্কৃত তদ্ধিত যোগে

বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য
দুরাত্মা	দৌরাত্ম্য	ঋজু	আর্জব
অধীন	অধীনতা	পৃথক্	পার্থক্য
সরল	সরলতা সারল্য	অতিশয়	আতিশয্য
কোমল	কোমলতা	অলস	আলস্য, অলসতা
গরিষ্ঠ	গরিষ্ঠতা	বিচিত্র	বৈচিত্র্য
গুরু	গৌরব, গুরুত্ব	শিথিল	শৈথিল্য, শিথিলতা
লঘু (অণু)	লাঘব, লঘুত্ব, লঘিমা	উপকারী	উপকারিতা
স্তব্ধ	স্তব্ধতা	ক্ষীণ	ক্ষীণতা
তেজস্বী	তেজস্বিতা	নিরাপদ	নিরাপত্তা
নীল (ইমন)	নীলিমা	নিরাশ	নৈরাশ্য
	(পুংলিঙ্গ সংস্কৃত)	মহাত্মা	মাহাত্ম্য
সমকক্ষ	সমকক্ষতা	স্বতন্ত্র	স্বাতন্ত্র্যতা
মহৎ	মহিমা মহত্ত্ব	মন্দ	মান্দ্য (অগ্নিমান্দ্য)
তনু	তনিমা (তনুর তনিমা)	কৃপণ	কার্পণ্য
		অনুগত	আনুগত্য
এক	ঐক্য	অশুচি	অশৌচ
উচিত	ঔচিত্য	গম্ভীর	গাম্ভীর্য
		অভিজাত	আভিজাত্য

বাঙ্‌লা তদ্ধিত যোগে

বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য
বড়	বড়াই	ন্যাকা	ন্যাকাপনা, ন্যাকামি
শয়তান	শয়তানি	জ্যাঠা	জ্যাঠামি
চালাক	চালাকি	দুরন্ত	দুরন্তপনা
ভালমানুষ	ভালমানুষি	চতুর	চতুরালি
বাবু	বাবুগিরি	বেয়াদব	বেয়াদবি
বুড়ো	বুড়োমি	খ্যাপা	খ্যাপামি
বোকা	বোকামি	ভেতো	ভাত
গেঁয়ো	গাঁ		

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীতার্থ-বোধক শব্দদ্বারা বাক্য রচনা কর:—
দরিদ্র, লঘু, সবল, স্থাবর, উৎপত্তি, যান, অনুগ্রহ, অনুকূল, সঞ্চয়, আবির্ভাব, সমাস, আস্তিক, স্বার্থ, কৃতঘ্ন। গরিষ্ঠ, ভিতর পাপ বুদ্ধি, সম্পদ, ধনী পণ্ডিত, সঞ্চিত শূন্য, রচনা রক্ষক।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে প্রত্যয়যোগে বন্ধনীতে নির্দিষ্ট পদান্তরে পরিণত করিয়া বাক্য রচনা কর:—ফেন (ক্রিয়াপদ), জুতা (ক্রিয়াপদ), ঘন (কৃদন্তপদ), জানা (বাঙ্‌লা কৃদন্ত বিশেষণ), ডুব (বিশেষণ), ফেরা (বিশেষণ পদ), হিংসা (বাঙ্‌লা তদ্ধিতযোগে বিশেষণ), উঠা (বিশেষণ), ভাত (বিশেষণ, প্রত্যয়যোগে), দাঁত (বিশেষণ), ক্ষয় (বিশেষণ), কুসুম (বিশেষণ) চির (বিশেষণ), অতিথি (বিশেষণ), উদ্যম (বিশেষণ), সরল (বিশেষ্য), নীল

(বিশেষ্য), তন্দ্র (বিশেষ্য), শিথিল (বিশেষ্য), ফুল (বিশেষণ), পাথর (বিশেষণ), চলা (কৃদন্ত বিশেষণ), বড় (বিশেষ্য), ন্যাকা (বিশেষ্য), অলস (বিশেষ্য) মহৎ (বিশেষ্য), নিরাশ (বিশেষ্য। ঘুম (বিশেষণ), শিথিল (নামধাতু)।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাক্যের সংক্ষিপ্ত প্রয়োগ বা বৃত্তি

বাক্যকে সংক্ষিপ্তরূপে প্রকাশ করিলে রচনার চমৎকারিত্ব, তাহার পদার্থের পরিস্ফুট অভিপ্রায় উপলব্ধি করা যায়। **"বৃত্তি"** দ্বারা তাহা করা সম্ভবপর। কৃৎ, তদ্ধিত, সমাস, একশেষ, প্রত্যয়ান্ত ধাতু এই পাঁচটিকে বৃত্তি বলে। 'বৃত্তি' হইতেছে বাক্যের সংক্ষিপ্ত রূপ। বাক্যকে ব্যাসবাক্য **বা বিগ্রহবাক্য** বলে।

(ক) কৃৎ প্রত্যয় প্রয়োগে

বিগ্রহ	বৃত্তি	বিগ্রহ	বৃত্তি
যাহাকে বাদ দেওয়া যায় না	অপরিহার্য	যাহা সহজে ভাঙিয়া যায়	ভঙ্গুর
যুদ্ধ করে যে	যোদ্ধা (যুধ্ তৃচ্)	ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে যাহা	ক্ষয়িষ্ণু
		সহ্য করা যাহার স্বভাব	সহিষ্ণু
উপেক্ষার যোগ্য	উপেক্ষণীয়	যাহার মৃত্যু নিকটবর্তী (মর মর)	মুমূর্ষু
যাহা বলা হইয়াছে	উক্ত		
যাহা হইবে	ভাবী	ভিন্ন দেশের লোক বা বিদেশ হইতে আসিয়াছে	বিদেশী বৈদেশিক (তদ্ধিত)
যাহা বলা হইতেছে	বক্ষ্যমাণ		
যাহা চুষিয়া খাইতে হয়	চূষ্য (চোষ্য নহে)	অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা	অনুসন্ধিৎসা
লাভের ইচ্ছা	লিপ্সা	হনন করিবার ইচ্ছা	জিঘাংসা
খাইতে ইচ্ছুক	বুভুক্ষু	গ্রহণ করিবার যোগ্য	গ্রাহ্য
জয়ের অভিলাষ	জিগীষা	যাহা আরোহণ করিতে কষ্ট হয়	দুরারোহ
যাহা উড়িয়া যাইতেছে	উড্ডীয়মান, উড়ন্ত, উড়ো	যিনি আরাধনার যোগ্য	আরাধ্য
(যে জল) ফুটিতেছে	ফুটন্ত (জল)	উপকার করিবার ইচ্ছা	উপচিকীর্ষা
যাহার পরিমাণ করা যায় না	অপরিমেয়	উপেক্ষার যোগ্য	উপেক্ষণীয়

(খ) তদ্ধিত প্রয়োগে

বিগ্রহ	বৃত্তি	বিগ্রহ	বৃত্তি
সখার ভাব	সখ্য	যাহাকে রোগা রোগা মনে হয়	রোগাটে
অগণিত লোকের ক্রমাগত রোগে হেতু মৃত্যু	মড়ক	দশরথের পুত্র	দাশরথি
		বহুলোক, জনসমূহ	জনতা
ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না যে	নাস্তিক		

বিগ্রহ	বৃত্তি	বিগ্রহ	বৃত্তি
রেশমে নির্মিত	রেশমী	প্রভূত জল (বন)	বন্যা
সাপ ধরিতে পটু	সাপুড়ে, সাপুড়িয়া	চাঁদের মতো	চাঁদপানা
যে গাড়ি চালায়	গাড়োয়ান	পাগলের মতো	পাগলপারা
শূদ্রজাতীয়া স্ত্রী	শূদ্রী	মরণের অবস্থা যাহার	মৃতকল্প
যে বহু কথা বলে	বাচাল	ভোর হয় হয়	প্রভাতকল্প
স্মৃতি শাস্ত্র জানেন যিনি	স্মার্ত	মাটি দিয়া গড়া	মৃন্ময়
যশ যাহার আছে	যশস্বী	সোনার তৈরি	হিরণ্ময়
উন্নত মন যাঁহার	মনস্বী	জলদ্বারা ব্যাপ্ত	জলময়
রাত্রি প্রায় প্রভাত হইয়াছে	প্রভাতকল্প	অনেকটা লম্বা ধরনের	লম্বাটে
যাহাতে মজা আছে	মজাদার	ব্যাকরণ যিনি জানেন	বৈয়াকরণ

(গ) সমাস প্রয়োগে

বন্দোবস্তের অভাব	বেবন্দোবস্ত
বরফের মতো ঠাণ্ডা	তুষারশীতল
যাহার মমতা নাই	নির্মম
সমুদ্র হইতে হিমাচল পর্যন্ত	'আসমুদ্র হিমাচল' (অব্যয়ীভাব)
গলা পর্যন্ত	আকণ্ঠ
যে পরের উপকার স্মরণ করে না	কৃতঘ্ন (উপপদ সমাস)
যে স্ত্রীলোক সূর্যের মুখ দেখে না	অসূর্যম্পশ্যা (ঐ)
যাহার উপায় নাই	নিরুপায়
যাহার পরিমাণ করা যায় না	অপরিমেয়
যাহার অন্য উপায় নাই	অনন্যোপায় (বহুব্রীহি)
যাহা বলা যায় না	অনির্বচনীয় (নঞ্ তৎপুরুষ)
যাহার ভাতের অভাব আছে	হাভাতে
যাহা পূর্বে শোনা যায় নাই	অশ্রুতপূর্ব
সুন্দর দন্ত যাহার (স্ত্রী)	সুদন্তী
যাহা খুব দীর্ঘ নহে	নাতিদীর্ঘ
সে জীবিত থাকিয়াও মৃতবৎ	জীবন্মৃত
যাহা খুব দূর নহে	অনতিদূর, নাতিদূর
যে সময়ে অত্যন্ত দুঃখে ভিক্ষা পাওয়া যায়	দুর্ভিক্ষ
জন্মের পর হইতেই যার সঙ্গে পরিচয়	আজন্ম পরিচিত
যাহা হইতে পারে না	অসম্ভব অভাব্য (নঞ্ তৎপুরুষ)
যে অগ্রে জন্মিয়াছে	অগ্রজ
যাহা শোনার যোগ্য নহে	অশ্রাব্য
যে আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করে	পণ্ডিতম্মন্য (উপপদ সমাস)
যাহার অনেক দেখাশুনা আছে	বহুদর্শী (উপপদ)
পরিণামে কি হইবে তাহা যে ব্যক্তি দেখে না	অপরিণামদর্শী
সকল পদার্থ ভক্ষণ করে যে	সর্বভুক্
পরীক্ষা করিয়া যাহা পাওয়া গিয়াছে	পরীক্ষালব্ধ

বিগ্রহ	**বৃত্তি**
আগে থেকে যার সঙ্গে পরিচয় আছে	পূর্বপরিচিত
যে ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া কার্য করে না	অবিমৃষ্যকারী
আকাশে চরে যে	আকাশচর (খেচর, ব্যোমচর, নভশ্চর)
কার্য করিবার সামর্থ্য যাহার আছে	কার্যক্ষম
কর্ণ পর্যন্ত বিস্তৃত	আকর্ণ (অব্যয়ীভাব)
যে নারীর স্বামী প্রবাসে থাকে	প্রোষিত-ভর্তৃকা (বহুব্রীহি) 'পথিক বধূ' (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)
স্ত্রীর সহিত বর্তমান	সস্ত্রীক
যিনি সর্বত্র গমন করেন	সর্বত্রগ (উপপদ সমাস)
যে জামাই শ্বশুর বাড়ি চিরকাল থাকে	ঘরজামাই (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)
যাহা নিত্য নহে (চিরকাল স্থায়ী নহে)	অনিত্য (নঞ্ তৎপুরুষ)
রাত্রির মধ্যে, রাত্রি থাকিতে থাকিতে (রাত্রিকে অতিক্রম না করিয়া)	রাতারাতি (বহুব্রীহি)
দেবতা যাহার প্রতি অনুগ্রহ দেখাইযাছেন	দেবতানুগৃহীত
বেলা থাকিতে থাকিতে (-আগেও বেলা পরেও বেলা)	বেলাবেলি (গিরীশ ঘোষ)
সত্য কথা বলা যাহার স্বভাব	সত্যবাদী
উপস্থিত বুদ্ধি আছে যাহার	প্রত্যুৎপন্নমতি
প্রথমে যাহা মধুর	আপাতমধুর
শৈশবকাল হইতে	আশৈশব
যে ব্যক্তি একবার খায়	একাহারী, একাহার
কণ্ঠ পর্যন্ত	আকণ্ঠ (অব্যয়ীভাব)
পা হইতে মাথা পর্যন্ত	আপাদমস্তক
যতটা পারা যায় (শক্তিকে অতিক্রম না করিয়া)	যথাশক্তি (উঃ মাঃ ১৯৬০)
পথ দেখায় যে	পথপ্রদর্শক, পথিপ্রদর্শক
যে বিদেশে থাকে না	অপ্রবাসী
যিনি ইন্দ্রিয়কে জয় করিয়াছেন	
যাহার বাহু জানু পর্যন্ত লম্বিত	আজানুলম্বিত বাহু
পরিমিত কথা বলে যে	মিতভাষী
যে ব্যক্তি কেবল স্বার্থকেই বড় বলে মনে করে	স্বার্থপর
যাহা পূর্বে (কখনও শোনা যায় নাই	অশ্রুতপূর্ব
যাহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে	বিপত্নীক
নদী মাতা যাহার	নদীমাতৃক
যে গলায় কাপড় দিয়াছে	গললগ্নী-কৃতবাস
শৈশবকাল হইতে	আশৈশব
যাহার কুল ও শীল (স্বভাব) জানা নাই	অজ্ঞাতকুলশীল
শিক্ষার উপর নির্ভর করে না যাহা (১৯৬০ উঃ মাঃ)	শিক্ষানিরপেক্ষ

(ঘ) প্রত্যয়ান্ত ধাতুযোগে বাক্য সংক্ষেপ

ঢিলা করিয়া দেওয়া (সধবা নারীর পক্ষে 'খোলা' বলা চলে না)	'কেয়ূর কাঁকণ শিথলে (শিথিল) (বিশেষণ হইতে নামধাতু) দেরে খুলে দে কুণ্ডল, ('কয়াধু'—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

(-আ প্রত্যয়যোগে নামধাতু)

জুতা মারা	জুতান
বাহির হওয়া	বেরোনো
লাঠি দিয়া মারা	লেঠোনো
ধমক দেওয়া	মা ছেলেকে রোজ **ধমকান**
রঙ্ লাগান	শুধু পরার কাপড় **রাঙাইলে** বৈরাগ্য উপস্থিত হয় না মনকে রঙান দরকার। 'সন্ধ্যার কনক বর্ণে **রাঙিছ অঞ্চল,** ঊষার গলিত স্বর্ণে গড়িছ মেখলা' —রবীন্দ্রনাথ।

সপ্তম অধ্যায়

অশুদ্ধি শোধন

[১] বানান ভুল

অশুদ্ধ	**শুদ্ধ**
মধুসুধন	মধুসূদন
বাল্মিকী	বাল্মীকি
অজাগর	অজগর (অজ+গৃ+অ)
ভাগিরথী	ভাগীরথী
ধ্বংশ	ধ্বংস
সুসুপ্ত	সুষুপ্ত
দুর্বিসহ	দুর্বিষহ
চিৎকার	চীৎকার
অদ্ভুত	অদ্ভূত (প্রভূত, সম্ভূত, উদ্ভূত প্রভৃতি যত 'ভূত' আছে সকলেই দীর্ঘ উকার যুক্ত। কিন্তু অদ্ভুতের বানান 'অদ্ভুত')
উজ্জল	'উজ্জ্বল' (উৎ+জ্বল—'জলে'র সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই)
অমাবশ্যা	অমাবস্যা (অমা (অব্যয়)+বস্ (ধাতু)+য) 'বস্' ধাতুর 'স' কার দন্ত্য 'স' তালব্য নহে।
আয়ত্ব	আয়ত্ত (আ+√যত্+ক্ত(ত) 'যৎ ধাতুর ত্+ প্রত্যয়ের ত দুইয়ে মিলিয়া 'ত্ত' হইয়াছে)
ক্ষিন্ন	খিন্ন (খিদ্+ক্ত [ত] ছিন্ন, ভিন্ন যেমন করিয়া হয়। ক্ষি+ক্ত='ক্ষীণ'।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
গ্রস্থ	'গ্রস্ত' (গ্রস্‌+ক্ত (ত)
মুখস্ত	'মুখস্থ' (মুখ+স্থা+ক)
ব্যাথা	ব্যথা (ব্যথ্‌ ধাতু)
ব্যাবহার	ব্যবহার
পরিত্যাজ্য	পরিত্যাজ্য (ত্যাজ্যপুত্র)
মহান্ত	মহন্ত (মঠের মহন্ত=মঠাধীশ)
(সর্ব) সত্ত্ব (সংরক্ষিত	(সর্ব) স্বত্ব (সংরক্ষিত)
মঞ্জুরী	মঞ্জরী (আম্রমঞ্জরী) 'মাধবীমঞ্জরী' (রবীন্দ্রনাথ) (মুকুল, শীষ) [কিন্তু মঞ্জুরী কমিশন] আরবী শব্দ
পারিস্কার	পরিষ্কার
মৃণ্ময়ী	মৃন্ময়ী (জননী জন্মভূমি) মৃৎ+ময়ট্‌+ঈ
হিরন্ময়ী	হিরণ্ময়ী (হিরণ্য=হিরণ্‌+ময়ট্‌+ঈ)
পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ	পুঙ্খানুপুঙ্খ
কামাক্ষ্যা	কামাখ্যা
ব্যাবসায়	ব্যবসায় (বি+অব+সো+ঘঞ্‌)
সম্মত	সম্মত (সম্‌+মত)=অনুমোদিত সন্মত (সৎ+মত=সাধু লোকের দ্বারা অনুমোদিত হইয়াছিল যাহা)
সাক্ষাত	সাক্ষাৎ
মুহুর্ত	মুহূর্ত
স্বরস্বতী	সরস্বতী (সরস্‌+বৎ+ঈ)
দন্দ্ব, দ্বন্দ	দ্বন্দ্ব (সমাসের নাম, ঝগড়া)
বিকীরণ	বিকিরণ
আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা
নিরোগ	নীরোগ (নিঃ+রোগ, চক্ষুরোগ)
দ্বীতিয়	দ্বিতীয়
পিপিলিকা	পিপীলিকা
ভৌগলিক	ভৌগোলিক (ভূগোল+ইক)
উদ্গীরণ	উদ্গিরণ
জ্ঞানীগণ	জ্ঞানিগণ
লক্ষণ (রামের ভাই)	লক্ষ্মণ
সংগীত	সঙ্গীত
সাহার্য	সাহায্য
দুরুহ	দুরূহ
ময়ুর	ময়ূর
হটাৎ	হঠাৎ
সাস্থ্য	স্বাস্থ্য
সান্তনা	সান্ত্বনা
পরাস্থ	পরাস্ত

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
বাড়িভারা	বাড়িভাড়া
মাকরসা	মাকড়সা
কাপর	কাপড়
অনাটন	অনটন
অত্যাধিক	অত্যধিক (অতি+অধিক
দুরাবস্থা	দুরবস্থা (দুঃ+অবস্থা)
সাঁপ (হিন্দীতে)	সাপ
আচ	আঁচ
হাঁতী	হাতী, হাতি
হাঁসপাতাল	হাসপাতাল
আলচ্য	আলোচ্য
রিশ্‌কা	রিক্‌শা
পিচাশ	পিশাচ
টেস্ক	টেক্স
বাস্ক	বাক্স
অর্পণা দেবী	অপর্ণা দেবী

[২] সন্ধিগত ভুল বা অন্য প্রকার ভুল

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ (শিরঃ+ছেদ)
বন্দপাধ্যায়	বন্দ্যোপাধ্যায় (বন্দ্য+উপাধ্যায)
রবিন্দ্র	রবীন্দ্র (রবি+ইন্দ্র)
বিদ্যুতর্গনী	বিদ্যুদর্গিন
অনুমত্যানুসারে	অনুমত্যনুসারে (অনুমতি+অনুসারে)
বাগেশ্বরী	বাগীশ্বরী (বাক্‌+ঈশ্বরী)
গায়কী	গায়িকা
বিদ্যান্‌	বিদ্বান্‌
এতদ্বারা	এতদ্দ্বারা (এতৎ+দ্বারা দুইটি দ'কার হইবে।)
এতদ্‌সত্ত্বেও	এতৎসত্ত্বেও (উঃ মঃ)
অচিন্ত	অচিন্ত্য
অচিন্ত্যনীয়	অচিন্তনীয় (নঞ্‌=অ+চিন্ত্‌+অনীয়)
কিদৃশ	কীদৃশ
নীরোদ	নীরদ (নীর+দা+ক)
সদ্যজাত	সদ্যোজাত (সদ্যঃ+জাত)
পরপোকার	পরোপকার (পর+উপকার)
মনযোগ	মনোযোগ (মনঃ+যোগ)
উপিত	উপ্ত
আইনানুসারে	আইন-অনুসারে
বক্ষদেশ	বক্ষোদেশ (বক্ষঃ+দেশ)

অশুদ্ধ	**শুদ্ধ**
উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ (–তা প্রত্যয় অনাবশ্যক ভাবার্থক কৃৎ-প্রত্যয় দ্বারাই অর্থ প্রকাশিত হইযাছে)
পৌরহিত্য	পৌরোহিত্য
পৈত্রিক	পৈতৃক
বাহুল্যতা	বাহুল্য
সৌজন্যতা	সৌজন্য (—তা প্রত্যয অনাবশ্যক 'সুজনতা' হইতে পারে)
আধিকত্যা	আধিক্য (চলতি বাঙ্‌লায় মেযেদের ভাষায় 'আদিখ্যেতা')
সখ্যতা	সখ্য (সখার ভাব বা কার্য সখ্য—**একই অর্থে দুই প্রত্যয় অনাবশ্যক—স্বার্থিক প্রত্যয়ছাড়া,** যেমন—দেব=দেবতা, প্রজ্ঞ=প্রাজ্ঞ)
লজ্জাস্কর	লজ্জাকর

[৩] সমাসগত ভুল

রাজাগণ	'বাজগণ' (সংস্কৃত 'রাজন্‌' এর সহিত গণ এব সমাসে **ন্‌-কার লোপ। সমাসে** পূর্বপদেব ন্‌-কার লোপ হয়)
ষষ্ঠদশ	ষোডশ
গুণীগণ	গুণিগণ (গুণিন্‌+গণ)
ধনীগণ	ধনিগণ (ধনিন্‌+গণ)
হস্তীমূর্খ	হস্তিমূর্খ (হস্তিন্‌+মূর্খ)
ভ্রাতাযুগল	ভ্রাতৃযুগল (পিতা, মাতা, ভ্রাতা, দুহিতা, ক্রেতা, বিক্রেতা, দাতা—এই সকল পদের মূলে ঋকারান্ত—পিতৃ, মাতৃ, ভ্রাতৃ ইত্যাদি। সমাসে বিভক্তি লোপ হইলে মূল শব্দটিই ব্যবহৃত হয। কিন্তু 'পিতাঠাকুর' 'মাতাঠাকুরাণী' পদে এ নিযম খাটিবে না, কারণ ইহারা খাঁটি সংস্কৃত (তৎসম) সমাস নহে। **উদাহরণ**—ক্রেতৃগণ, পিতৃলোক, কর্তৃপক্ষ, জামাতৃযজ্ঞ (সীতাব বনবাস), 'বিধাতৃ-চরণ' (দ্বিজেন্দ্রলাল) মাতৃপূজা, সবিতৃমণ্ডল।
মহারাজা	'মহারাজ' (মহান্‌ রাজা (রাজন্‌) তৎপুরুষ সমাসের অন্তে রাজন্‌, অহন্‌ ও সখি শব্দেব অন্তে অ-কার হয। **সমাসান্তবিধি অনিত্য বলিয়া 'মহারাজা' পদকেও সমর্থন করা চলে।** [অনিত্য=যাহা সব সময়ে হয় না।]
সম্রাজ্ঞী	**রাজার স্ত্রী (পত্নী) রাজ্ঞী—সম্যক্‌ রাজ্ঞী সম্রাজ্ঞী** (প্রাদি সমাস) (শুদ্ধ)
সম্রাজ্ঞী	সম্যক্‌ রাজা=(প্রাদি সমাস) **সম্রাজ স্ত্রীলিঙ্গে সম্রাজ্ঞী।** (শুদ্ধ)

মহারাজী — মহান্ রাজা (কর্মধারয়) মহারাজ, স্ত্রীলিঙ্গে মহারাজী (শুদ্ধ)

মহারাজ্ঞী — মহতী রাজ্ঞী (কর্মধারয়) মহারাজ্ঞী (শুদ্ধ)।
দ্রষ্টব্য ঃ সংস্কৃত (তৎসম) ব্যাকরণ-অনুসারে সম্রাট্ (সম্রাজ্ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে সম্রাট্-ই হয় তবে উল্লিখিত পদগুলি যেরূপে সমর্থন করা চলে তাহা দেখান হইল)। বাংলা ভাষায় 'সম্রাজ্ঞী' পদের বহুল শিষ্ট প্রয়োগ রহিয়াছে সুতরাং উহা শুদ্ধ। 'সম্রাজী' পদের শিষ্ট প্রয়োগ দেখা যায় না—প্রয়োগ করিলে ক্ষতি নাই।

সানন্দিত — 'সানন্দ', 'আনন্দিত' (আনন্দের সহিত বর্তমান 'সানন্দ' (তুল্যযোগে বহুব্রীহি ইহার উত্তর -ইত প্রত্যয় 'জাতার্থে'—অনাবশ্যক কেন না সমাস-দ্বারাই অভিলষিত অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে। আনন্দ শব্দের উত্তর -ইত প্রত্যয়ে আনন্দিত। এইরূপ পুলকিত, লজ্জিত (সলজ্জিত নহে) সলজ্জ (শুদ্ধ)—তুল্যযোগে বহুব্রীহি। "সলজ্জিত বাসর শয্যাতে" (রবীন্দ্রনাথ। ইহা মহাকবি প্রয়োগ হইলেও) **ব্যাকরণদুষ্ট পদ, শঙ্কিত** সশঙ্কিত নহে।

সমাস কৃৎ তদ্ধিত প্রভৃতিদ্বারা অভীষ্ট অর্থ একবার প্রকাশিত হইলে শব্দের উত্তর একই অর্থে প্রত্যয় যোগ করা চলে না।

উদাহরণ—গুণ যাহার আছে সে গুণী (গুণ+ইন্)—তাহার আছে এই অর্থে -ইন্ প্রত্যয় হয়। গুণ যাহার নাই 'নির্গুণ'। ইহার উত্তর ইন্ প্রত্যয় অনাবশ্যক। এইরূপ '**নির-পরাধ**' (উঃ মাঃ ১৯৬১) (নিরপরাধী নহে) 'নির্ধন' (নির্ধনী নহে)। 'সুবুদ্ধি' সু (শোভন) বুদ্ধি (আছে) যাহার সে 'সুবুদ্ধি'। (এখানে অস্ত্যর্থক প্রত্যয় অনাবশ্যক; অতএব 'সুবুদ্ধি-মান্' হইবে না। 'বুদ্ধিমান্' কথা শুদ্ধ। 'ক্ষম' শব্দের অর্থ সমর্থ। ইহার সহিত সহ শব্দের একই অর্থে সমাস অনাবশ্যক। অতএব 'সক্ষম'—শব্দ ব্যাকরণ-অনুসারে শুদ্ধ নহে। তবে সাহিত্যে ইহার প্রচুর প্রয়োগ আছে এবং চলিয়া যাইতেছে।

[৪] অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগগত ভুল

দুইটি ক্রিয়ার এক কর্তা হইলে পূর্বকালবোধক ক্রিয়া-বাচক ধাতুর উত্তর—ইয়া প্রত্যয়-যোগে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়। ভিন্ন কর্তায় এই ক্রিয়ার প্রয়োগ অশুদ্ধ হয়। (১) 'আমি জ্বর হইয়া বড় কষ্ট পাইতেছি' (অশুদ্ধ)। এখানে 'পাইতেছি' ক্রিয়ার কর্তা 'আমি' আর 'হইয়া' ক্রিয়ার কর্তা জ্বর।

শুদ্ধরূপঃ—(ক) আমি জ্বরে আক্রান্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছি। (খ) আমার জ্বর হওয়ায় বড় কষ্ট পাইতেছি।

(২) সে সিঁড়ি দিয়া নামিতে গিয়া হাত-পা ভাঙিগল (অশুদ্ধ)।

শুদ্ধ ঃ—সে সিঁড়ি দিয়া নামিতে গিয়া পড়িয়া যাওয়ায় তাহার হাত-পা ভাঙিল।

[৫] একই অর্থে একাধিক পদের প্রয়োগ

অশুদ্ধ ঃ—তিনি অশ্রুজল বিসর্জন করিলেন (অশ্রু=নয়নের জল, জল অনাবশ্যক)। (২) তিনি অদ্যাপিও আসিলেন না। (অদ্য+অপি (ও)। 'ও' পদ অনাবশ্যক)। (৩) সদাসর্বদা গুরুবাক্য পালন করিবে। (সদা, সর্বদা এই দুই পদের অর্থ এক)। (৪) আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ-সমূহ দৃষ্টিগোচর হইল। (পুঞ্জ=সমূহ। ইহার পর সমূহ অনাবশ্যক। (৫) মলয়ানিল সমীরণে বৃক্ষলতা আন্দোলিত হইল। (অনিল ও সমীরণ একার্থক শব্দ)।

শুদ্ধ ঃ—(১) তিনি অশ্রু বিসর্জন করিলেন। (২) তিনি অদ্যাপি (বা আজিও) আসিলেন না। (৩) সদা (বা সর্বদা) গুরুবাক্য পালন করিবে। (৪) আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ (বা নক্ষত্রসমূহ) দৃষ্টিগোচর হইতেছে। (৫) মলয সমীরণে (বা মলয়ানিলে) বৃক্ষলতা আন্দোলিত হইল।

[৬] গুরুচণ্ডালী (গুরুচণ্ডালিয়া, গুরু চণ্ডালিকা) দোষ

সাধু ভাষার সহিত চলতি ভাষার মিশ্রণে এই দোষ হয। সাধু ভাষা ব্যবহার করিলে সাধু ভাষাই ব্যবহার করিতে হইবে ইহার সহিত 'চলতি' (চলিত) ভাষাব ব্যবহার চলিবে না। নেত্রঝলসানো—(বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর) চোখ ঝলসানো লেখা উচিত।

'শব পোড়া' 'মড়া দাহ', শব দাহ বা মড়া পোড়া লিখিতে হইবে। এ'দো পুকুরে 'নিমজ্জন' লেখা চলে না—'এ'দো পুকুরে ডুব দেওয়া' লিখিতে হইবে।

[৭] যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি উপেক্ষা করা

বাক্যের অর্থ প্রকাশ যুক্তির উপর নির্ভর করে—অবশ্য কবি প্রসিদ্ধি ও আলংকারিক প্রয়োগ ছাড়া।

রাত্রিতে সূর্যের আলোতে লোকে কাজ করে—এইরূপ বাক্য ব্যাকরণ শুদ্ধ হইলেও অবাক্য। 'ডাকিছে দোয়েল, গাহিছে কোযেল তোমার কানন-সভাতে'—এরূপ বাক্যে অসঙ্গতি আছে কারণ শরৎকালে কোকিল ডাকে না। 'তখন আষাঢ় মাস, কুন্দ কুসুমগুলি বিকসিত হইতেছিল।'

আকাঙ্ক্ষাগত দোষ ঃ—শ্রোতার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত কেবল একাধিক শব্দের প্রয়োগে বাক্য হয় না। 'রামের পুত্র' বলিলে তাহার সম্বন্ধে আরও জানিবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, সুতরাং ইহা বাক্য নহে।

'এ গৃহে আপনার শুভাগমন' বাক্য নহে। ইহার পর আরও কিছু জানিবার আছে।

আসত্তিগত দোষ ঃ—আসত্তি কথার অর্থ নৈকট্য। যে পদের সহিত যে পদেব সম্বন্ধ তাহার নিকটে সেই পদের অবস্থান আবশ্যক। তাহা না হইলে বাক্যের অর্থবোধ হয় না। যথা—'গিয়াছিলাম সহিত বন্ধুব ধাবে সকাল বেলায আমি নদীর।' 'আমি সকাল বেলায বন্ধুর সহিত নদীব ধারে গিযাছিলাম' হইবে।

[৮] বাগ্‌ভঙ্গীর অপপ্রয়োগ

প্রত্যেক প্রাণবান্ ভাষার নিজস্ব প্রকাশভঙ্গী আছে। তাহাকে অতিক্রম করিয়া যে রচনা সৃষ্ট হয়, তাহা সেই ভাষার রচনা বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। ব্যাকরণগত

শুদ্ধতার সহিত ইহার কোন সংশ্রব নাই। ইহার কতকগুলি উদাহরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে।

'দু'পয়সার কাগজ দাও—দান কর বলা চলিবে না। এ কাজে আমার মন সরে না—মন 'গমন করে না' হইবে না।

[৯] বাগ্‌ভঙ্গীসিদ্ধ প্রয়োগের পরিবর্তন চলিবে না

'মণিকাঞ্চন যোগ' স্থলে 'কাঞ্চন মণিযোগ' অচল। 'মাথা **খাও' স্থলে** 'মস্তিষ্ক **ভক্ষণ'** চলিবে না। **'চড় মারা'র** জায়গায় 'চপেটাঘাত' চলিবে, কিন্তু **'পকেট মারার'** জায়গায় 'পকেটাঘাত' হাস্যকর। 'ছুরিকাঘাত' ও 'ছুরি মারা' দুইই চলে, তবে 'ঘুষ্যাঘাত' না লিখিয়া 'ঘুষি মারা' লিখিতে হইবে। 'পকেটে হাত দেওয়া'র পরিবর্তে 'পকেটে হস্ত প্রদান' লিখিলে 'গুরুচণ্ডালী' দোষ হইবে। 'চোখে সর্ষে ফুল দেখা' স্থানে 'অক্ষিতে সর্ষপ পুষ্প দর্শন করা' লেখা চলে না।

[১০] বিদেশী ভাষার বাঙ্‌লায় অনুবাদ

বিদেশী ভাষার স্ব স্ব প্রকাশরীতি আছে। তাহা বাঙ্‌লার সহিত মিলে না। বাঙ্‌লা লিখিবার সময় বাঙ্‌লা ভাষার নিজস্ব প্রকাশভঙ্গীকে অবলম্বন করিতে হইবে-তবেই অনুবাদকে বাঙ্‌লা অনুবাদ বলা যাইবে।

'সুবর্ণ সুযোগ'—Golden opportunity-র আক্ষরিক অনুবাদ। 'মহা সুযোগ' 'পরম সুযোগ' লিখিলে উহা বাঙ্‌লা বলিয়া মনে হইবে। To live from hand to mouth--কায়ক্লেশে 'জীবনযাত্রা' নির্বাহ করা, 'কোন রকমে চলা', 'অতি কষ্টে চলা' (হাত হইতে মুখে বাঁচা নহে) A cock and bull story--আষাঢে গল্প, আজগুবী (আজগুবি, আজগবী) গল্প—['মোরগ ও ষাঁড়ের গল্প নহে] Silence is golden—চুপ করিয়া থাকা ভাল, 'মৌনই শোভন'। It rains—বৃষ্টি হইতেছে (ইহা বৃষ্টি হইতেছে নহে)। It rains cats and dogs মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে। Warm reception সাদর অভ্যর্থনা Thanks—সাধুবাদ (ধন্যবাদ বেশি চলে), Warm thanks—আন্তরিক সাধুবাদ। Under the sun--'সূর্যের নীচে চলিবে না। আকাশতলে ভূতলে অম্বরতলে প্রভৃতি চলিবে।

[১১] ভারতীয় স্থান ব্যক্তি প্রভৃতির নামে ভুল

ভুল	শুদ্ধ	ভুল	শুদ্ধ
কণ্টাই	কাঁথি	(উপাধি) প'ল	পাল
বার্ডোয়ান (Burdwan)	বর্ধমান	ডাট (Dutta)	দত্ত
টামলুক (Tumluk)	তমলুক	ডস্ (Doss)	দাস
চিটাগাঙ্	চট্টগ্রাম	রয় (Roy)	রায়
অজন্তা (Ajanta) (মারাঠী আজণ্টা হইতে)	অজণ্টা	টেগোর (Tagore)	ঠাকুর
বম্বে (Bombay)	বোম্বাই	মিটার (Mitter)	মিত্র
মিড্‌ন্যাপুর	মেদিনীপুর	বাসু	বসু
		চ্যাটার্জি	চট্টোপাধ্যায়

ভুল	শুদ্ধ	ভুল	শুদ্ধ
মাট্রা (Muttra)	মথুরা	ব্যানার্জি	বন্দ্যোপাধ্যায়
বরদা, বরোদা	বড়োদা	মুখার্জি	মুখোপাধ্যায়
চিতোর	চিতোড়	(চাটুজ্যে, বাড়ুজ্যে, মুখুজ্যে)	
হার্ডোয়ার (Hardwar)	হরিদ্বার	মতিলাল নেহরু	মোতিলাল নেহরু
		জহরলাল নেহেরু	জবাহরলাল নেহরু
ব্যালাসোর (Balasore)	বালেশ্বর	মাড়োয়ার	মারবাড়
কৃষ্ণগর (Krishnagar)	কৃষ্ণনগর	[কিন্তু রবীন্দ্রপ্রয়োগে	'মাড়োয়ার হ'তে দূত
ডামডাম (Dum Dum)	দমদম (দমদমা)	আসি বলে' (পণরক্ষা)]	
স্যায়েন্স্ক্রীট্, স্যানস্ক্রিট, সন্সক্রিৎ (পশ্চিমে)	সংস্কৃত	আজমির, আজমীর, আজমীঢ়	'অজমের'
তেলেগু	তেলুগু	[রবীন্দ্র-প্রয়োগ ঃ—'বিনা সংগ্রামে	
ত্রিচিনোপলি	তিরুচিরপল্লী	আজমিরগড় দিবে মারাঠার করে']	

[১২] বিদেশী নামে ভুল

ভুল	শুদ্ধ	ভুল	শুদ্ধ
র‍্যাশা (Russia)	রুশদেশ	জুলিয়াস সীজার্	য়ুলিয়ুস কাএসার্
Shakespeare	শেক্স্পিয়ার্	Hiuen Tang	হিউএনৎ সাঙ্
নাজী	নাৎসী	Pharoh	ফারাওহ্ (ফারাও নহে)
নেপোলিয়ন বোনাপার্ট	বোনাপার্ত নাপেলেঅ	Sha Jehan	শাহ্ জহান্
		Sylvain Levi	সিলভ্যাঁ লেভি
সক্রেটিশ	সোক্রাতেস্ (গ্রীক)	Goethe	গ্যেটে
মোক্ষমূলর, মক্ষমূলর	মাকস্ম্যুলর্	Zoroster	এরথুশ্ত্র
		Seleukos	সেলেউকোস্ (সেলুকাস নহে)
Buda Pest	বুদা পেশ্ত্		

অনুশীলনী

১। ভুল থাকিলে কারণ দেখাইয়া শুদ্ধ করিয়া লিখঃ—শুশ্রুষা, আবশ্যকীয়, উজ্জল, লক্ষী, যদ্যাপি, অদ্যাপিও, বাল্মীকী, সুসৃপ্ত, আয়ত্ব, বিকীরণ, ভোগলিক, অত্যাচারিত, সম্মত, পরিত্যাজ্য, পুঙ্খানুপুঙ্খ, কামাক্ষ্যা, পিপিলিকা, মুখস্ত, পরাস্থ, স্বরস্বতী, অনাটন, পিচাশ, অর্পনাদেবী, মধুসুধন, বারিভাড়া, সাঁপ, কাঁচ, আঁখি, হটাৎ, মনযোগ উৎকর্ষতা, আধিক্যতা, জামাতাম্বয়, হাঁসপাতাল, হাসপাখি, আলচ্য, পৈত্রিক, মহারাজা, পৌরহিত্য, আকাংখা, ব্যাবহার, লজ্জাস্কর।

২। অশুদ্ধি সংশোধন করঃ—(১) অপরাধীকে ধরিতে না পারিলে নিরপরাধীকে শাস্তি দেওয়া উচিত নহে। (২) বসন্তে মলয়ানিল সমীরণে বৃক্ষেরা আন্দোলিত হইতেছিল। (৩) এক সন্ধ্যায় পথিক সানন্দিত হইয়া গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হইল। (৪) সদা সর্বদা কায়মনবাক্যে গুরুর সেবা করিবে। (৫) শরৎচন্দ্রের বাণীতে বন্দীর বেদনা মুক্তি হইয়াছে, তার দরদভরা হিয়া দুখীর পাশে দাড়াইয়াছে। (৬) এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে এই রাস্তা মেরামত কালীন কেহ এইস্থান দ্বারা আগমন গমন করিতে পারিবেক না, করিলে আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেক। (৭) সাক্ষাতমত সকল কথা আলোচনা করিলেই আমাদের সকল দ্বন্দ্ব ঘুচিয়া যাবে। আমার প্রেরিত প্রীত্যুপহার

গ্রহণ না করিয়া আমার মনোকষ্টের কারণ হয়েছে। আপনি আমার দুরাবস্থার বিষয় বিবেচনা করিলে সুখী হব। (৮) বাগেশ্বরী স্বরস্বতীর অপার অনুগ্রহ। তাহার কৃপা অচিন্তনীয়। মূর্খকে তিনি পন্ডিত বানান আর বিদ্যান্ অনেক বেশি জ্ঞানে উৎকর্ষতা লাভ করে। পৈত্রিক সম্পত্তি কাহারও চিরকাল হস্তগত থাকিবে না কিন্তু বিদ্যা কেহ অনাটনে পরিলেও চুরি করিবে না। (৯) আমি জড় হইয়া আগত তিন দিন বড় দুঃখ পাইতেছি। (১০) আকাশে অগনিত নক্ষত্রপুঞ্জ সমূহ দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। (১১) আমাদের পাড়ার কার্যে রামবাবু সাহার্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াও তিনদিন কোনো সাড়া পাইতেছি না। (১২) আপনি জলদি আমার কাজ করিয়া দিন—বাজে কথা বলা একদম বেকার। ওসব কথায় আমার কোন মতলব নেই। (১৩) এককালের বর্ধিষ্ণু গ্রামের মজা নদীর তটে জমিদারবাবুর পুরুষ পরম্পরাগত সুরম্য প্রাসাদোপম নিকেতন। কিন্তু তৎপশ্চাতে এঁদো পুকুরের পঙ্কিল জলরাশি মশার আবাসস্থল হইয়া গ্রামের সাস্থ একেবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। (১৪) তখন আষাড় মাস, শিসিরে ভিজিয়া কুন্দকলি বিকাশ হইতেছিল। মধুমত্ত ভ্রমরাকুল চারিদিকে কাকলি দ্বারা মুখরিত করিতেছিল। (১৫) দরিদ্র বামুন সামান্য কয়েক বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি লইয়া গ্রামে বাস করিতেন। কিন্তু দুর্ভিক্ষের জন্য দুগ্ধপুষ্য বাচ্চাগণকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে না পারিয়া মহিমাময় ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া লক্ষ্মীস্বরূপিণী পত্নীকে লইয়া বহির্গত হইলেন। (১৬) উন্মাদ যুবক। তুমি কাহাকে কি বলছো ভাবিয়া দেখ নাই। এই অস্তায়মান সূর্যলোকে তোমার বদন দর্শন করিয়া তোমার হৃদয়ে সংসারের প্রতি যে বীতরাগ জন্মিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিতেছি।

ব্যাকরণের বিবিধ আলোচনা

১। সংজ্ঞা

ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া

নিরর্থক অনুকরণধ্বনি যে ক্রিয়াতে প্রধান হইয়া সার্থক হয় তাহা ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া—'গুরু **গরজায় বাজ**'। গর্জে উঠে মাড়োয়ারের দূত। '**ঝনঝনিয়ে ঝিকিয়ে** উঠে অসি।'

ব্যতিহার কর্তা

(পরস্পর) ক্রিয়ার বিনিময়ে দ্যোতিত হইলে কর্তাকে ব্যতিহার কর্তা বলে।

পন্ডিতে পন্ডিতে লড়াই—মূর্খে ইহার কি বুঝিবে। **মায়ে ঝিয়ে** কথা বলে—এতে অন্যের কি!

সন্ধ্যক্ষর (যৌগিক স্বরধ্বনি, সন্ধিস্বর)

একাধিক স্বরধ্বনির মিলনে যে যুক্ত স্বরধ্বনির উৎপত্তি হয় তাহাকে সন্ধ্যক্ষর বলে।

একাধিক স্বরধ্বনির মিলনে যে যুক্ত স্বরধ্বনির উৎপত্তি হয় তাহাকে সন্ধ্যক্ষর বলে। জন্য বিশেষ বর্ণ আছে--যথা '**ঐ**'=(ওই) এবং '**ঔ**'=(ওউ)। বাকিগুলি মৌলিক স্বরবর্ণ একক বা য়-কারের সহিত যুক্ত করিয়া প্রকাশ করা হয়। যথা—আই (যাই পাই), ইয়ে বা ইএ (নিয়ে, দিয়ে) ইত্যাদি।

বর্ণাগম

প্রকৃতি প্রত্যয়কে কোনরূপে বিকৃত না করিয়া কোন অতিরিক্ত বর্ণ শব্দের মধ্যে প্রবেশ

করিলে তাহাকে বর্ণাগম বলা হয়। যথা—আ+পদ=আস্পদ; গো+পদ=গোষ্পদ; √ভৃ+য (ক্যপ্ প্রত্যয়) ভৃত্য (ত্ কার আগম হইয়াছে)।

দ্বিমাত্রিকতা

বাঙ্‌লা চলিত ভাষার একটি বিশেষ উচ্চারণের রীতির নাম **দ্বিমাত্রিকতা।** এই রীতি অনুসারে দুইয়ের বেশি অক্ষর কোন শব্দে থাকিলে ও পৃথক্ পৃথক্ রূপে উচ্চারিত হইবার সময়ও উহাদিগকে দ্বিমাত্রিক করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়। ফলে শব্দটি সংক্ষিপ্ত হইযা পড়ে। চ-ল—চল্—উভয়ত্র শব্দটি দ্বিমাত্রিক; ভাগিনেয় (৪ মাত্রা)—ভাগ্‌নে (২ মাত্রা)।

তাড়নজাত ধ্বনি

বাঙ্‌লা ভাষার 'ড়'র উচ্চারণের ধ্বনি জিহ্বার অধোভাগ দ্বারা দন্তমূল তাড়ন হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে **'তাড়নজাত'** ধ্বনি বলা হয়। ড়-কারের উচ্চারণে জিভের তলার দিক দিয়া দন্তের মূলে আঘাত করিতে হয়।

প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি

ট ঠ ড ঢ ণ—এই সকল বর্ণের উচ্চারণকালে জিহ্বার অগ্রভাগকে উল্টাইয়া (=প্রতি-বেষ্টিত করিযা) তালুর কঠিন অংশকে স্পর্শ করিবার প্রয়োজন হয। এই কারণে এই মূর্ধন্য ধ্বনিগুলিকে প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি বলা হয়।

সাধিত ধাতু

প্রত্যযযোগে ধাতুকে নূতন ধাতুরূপে গঠন বা প্রাতিপদিককে প্রত্যয়যোগে ধাতুরূপে পরিণত করিলে উহা **সাধিত ধাতু** হয। যথা—√খা—অর্থ খাওয়া—'আ' বা 'ওয়া' (=ওআ) প্রত্যযযোগে প্রেরণার্থক ধাতৃরূপে পরিণত করা যায—খায় **খাওয়ায়** (সাধিত ধাতু হইতে প্রেরণার্থক ক্রিযা—দেখে>দেখায়। জুতা (বিশেষ্য প্রাতিপদিক) 'আ' যেগে জুতান ক্রিযা পদ, 'জুতায়' (নামধাতু হইতে পাই)।

যোগরূঢ় শব্দ

প্রকৃতি প্রত্যয় গঠিত শব্দের যুক্তার্থ যখন কোন বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয তখন শব্দটি হয় **যোগরূঢ়।** যেমন—'পঙ্কজ'—ইহা যৌগিক (প্রকৃতি+প্রত্যয) অর্থ পঙ্কে জন্ম গ্রহণ করে যে, পঙ্ক—√জন্+ড (কর্তৃবাচ্যে)—পঙ্কে অনেক কিছুই জন্মে—তাহাদের সকলকে না বুঝাইয়া 'পঙ্কজ' বলিলে কেবল পদ্মকেই বুঝায়।

স্থিতিপরিবৃত্তি (বর্ণবিপর্যয়, আদ্যন্ত বিপর্যয়, আদ্যন্তব্যাপত্তি)

উচ্চারণের সময় শব্দস্থিত বর্ণের স্থানপরিবর্তনের নাম বর্ণবিপর্যয়।

বারাণসী>বানারসী (পূর্ববর্তী র্‌কার পরে গিয়াছে। পরবর্তী নকার পূর্বে আসিয়াছে)>বেনারসী। টেক্‌স>টেস্‌ক। বাক্‌স>বাস্‌ক। বাসক>বাকস। আলনা >আনলা, চোর>রচো। বোচকা>বোক্‌চা। হিন্‌স>সিংহ।

বিদেশী উপসর্গ

কতকগুলি বিদেশীশব্দ বিশেষতঃ পারসী ভাষার শব্দ বাঙ্‌লায় উপসর্গের মতো কাজ করে। ইহাদিগকে বিদেশী উপসর্গ বলা হয়—যথা **দর-পত্তনী, গরহাজির, ফি** সন

(=প্রত্যেক বৎসর), **বে মিল, হররবোলা, হররএক**, বেগর, বে-বন্দোবস্ত। (ইংরেজি) **হেড্** মাষ্টার, **সব্**-ডেপুটি, হেড্ পণ্ডিত।

বিদেশী তদ্ধিত

শব্দের উত্তর প্রত্যয়কে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। বিদেশী বিশেষতঃ অনেক ফার্সী **শব্দ** তদ্ধিতরূপে বাঙ্‌লা ভাষায় প্রবেশ **করিয়াছে—ইহারাই** বিদেশী তদ্ধিত।

—গিরি—বাবুগিরি, রানীগিরি, পাণ্ডাগিরি।

—চা চি চী (তুর্কি প্রত্যয়)—তবলচী, মশালচী, খাজাঞ্চি।

- খোর—ঘুষখোর, অফিমখোর।

—ওয়ান—দরওয়ান্, গাড়োয়ান্।

—নবিশ—নকলনবিশ, শিক্ষানবিশ।

-বাজ—মামলাবাজ, হুক্কাবাজ, দাঙ্গাবাজ।

—দার—চৌকীদার, সমঝ্‌দার, হাবিলদার।

—তর—কেমনতর, এমনতর।

বাক্যালংকার অব্যয়

বাক্য মধ্যে ব্যবহৃত যে সকল অব্যয়ের কোন সঙ্গত অর্থ নাই—বুঝিতে হইবে তাহারা বাক্যের সৌন্দর্যবর্ধনে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাদের নাম বাক্যালংকার অব্যয়।

তুমি **না** যাবে শুনছি (=তুমি যাবে শুনছি)। সে **যেন** এখানে আসে। (=সে এখানে আসুক। কতই **বা** এর দাম। তুমি **তো** একথা বিশ্বাস করবে না (=তুমি এ কথা বিশ্বাস করবে না)।

বিধেয় বিশেষণ

যে বিশেষণ বাক্যের বিধেয়াংশে ব্যবহৃত হয় তাহাকে **বিধেয় বিশেষণ বলে। বালকটি** বেশ শান্ত

রূঢ়ি শব্দ

শব্দের ব্যুৎপত্তি বহির্ভূত অর্থ প্রকাশের **শক্তিকে** রূঢ়ি বলে। এই রূঢ়ি যে **শব্দে আছে** তাহাকে **রূঢ়ি** শব্দ বলে। যথা 'মণ্ডপ' শব্দ। ইহার ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থ দাঁড়ায়—মণ্ড+√পা+ক (কর্তৃবাচ্যে), যে মণ্ড (মাড়) পান করে। কিন্তু বাঙ্‌লায় ও সংস্কৃতে ইহার অর্থ (১) ছাদযুক্ত স্থান (২) চাঁদোয়া-ঢাকা স্থান। মাধবীমণ্ডপ, লতামণ্ডপ, পূজামণ্ডপ, সভা-মণ্ডপ, ছায়ামণ্ডপ (=ছাঁদনাতলা)।

অসম্পূর্ণ ক্রিয়া (পঙ্গু ক্রিয়া)

কতকগুলি ধাতুর সকল কাল ও ভাবে পূর্ণরূপ পাওয়া যায় না। অন্য ধাতুর রূপ দিয়া এই অপূর্ণতাকে পূর্ণ করিতে হয়। এই কারণে এই সকল ধাতুকে অসম্পূর্ণ ধাতু **বলে** এই সকল ধাতুর অর্থের নাম অসম্পূর্ণ ক্রিয়া। যথা√**আছ** (ধাতু অর্থ থাকা)—সেখানে ইহার রূপ পাওয়া যায় না—সেখানে√থাক্ ধাতুর রূপ দিয়া উহা পূর্ণ করা হয়। √বট (ধাতু)—হওয়া অর্থ। √যা ধাতু (যাওয়া)—সাধারণ অতীতকালে 'গেল'।

সমধাতুজ কর্ম (ধাত্বর্থক কর্ম, সগোত্র কর্ম)

বাক্যের ক্রিয়া যে ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে কর্মও যদি সেই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন পদ হয় তবে উহাকে (ঐ কর্মকে) সমধাতুজ কর্ম বলে।

নটরাজ প্রলয় **নাচন** নাচেন। বাবু কাষ্ঠ হাসি হাসিলেন। খুব **চাল** চেলেছ। খেলায় ভাল **দানই** দিয়েছ।

ব্যতিহার সর্বনাম '(ব্যাতিহারিক সর্বনাম, পারস্পারিক সর্বনাম)

একাধিক ব্যক্তির যুগপৎ একই আচরণের নাম **ব্যাতিহার** (ব্যতীহার)। এইরূপ আচরণে সর্বনামের দ্বিত্ব হয়। এই দ্বিত্বপ্রাপ্ত সর্বনামকে **ব্যাতিহার সর্বনাম** বলা হয়। **যথা পরস্পর, অন্যোন্য।** "সভার মাঝে **পরস্পর** নীরবে উঠে পরিহাস" (—"মানী"—রবীন্দ্রনাথ)।

ইহা ছাড়া কয়েকটি একক সর্বনামকেও ব্যাতিহার সর্বনাম বলা হয়। যথা **'আপস', 'নিজেরা'।** 'গ্রামের দুই দলের লোকেরা মোকদ্দমা **নিজেরা** বা **আপসে** নিষ্পত্তি করিয়াছে (=নিজেদের মধ্যে নিজেরা)। 'আপনাআপনি', নিজে নিজে, আপনার আপনার।

উদ্দেশ্য কর্ম ও বিধেয় কর্ম

কর্মের পরিপূরক রূপে বাক্যের বিধেয়াংশে যে কর্মের ব্যবহার হয় তাহাকে **বিধেয় কর্ম** বলে। উদ্দেশ্যাংশে এইরূপ বাক্যে যে কর্ম থাকে তাহাকে **উদ্দেশ্য কর্ম** বলা হয়।

তিনি **শিব** গড়িতে **বানর** গড়িয়াছেন। ভগবান্ **বুদ্ধকে** অনেকে বিষ্ণুর **অবতার** মনে করে। **"দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা"।** এই উদাহরণগুলিতে 'শিব', 'বুদ্ধকে', 'দেবতারে', 'প্রিয়েরে'—উদ্দেশ্য কর্ম। বিধেয় কর্ম—'বানর', 'অবতার', 'প্রিয়', 'দেবতা'।

যৌগিক বিশেষণ (সমস্তপদ বিশেষণ)

সমাসদ্বারা গঠিত বিশেষণকে যৌগিক বিশেষণ বা **সমস্তপদ** বিশেষণ বলে। হাতে-গরম (সিঙ্গারা), মা-মরা (ছেলে), মন-মরা (লোক), দা-কাটা (তামাক), পীতাম্বর (হরি), আলোকোদ্ভাসিত (গৃহ), হর্ষোৎফুল্ল (লোচন)।

অনন্বয়ী অব্যয়

যে সকল অব্যয়ের মূল বাক্যের সহিত অন্বয় থাকে না এইরূপ মনোভাব প্রকাশক অব্যয়কে **অনন্বয়ী অব্যয়** বলে। হাঁ হাঁ। সবাস্ সাবাস্। বা বেশ্। "আরে **রাম রাম!** নিবারণ সাথ যাবে" (পুরাতন ভৃত্য)। **"ওরে রে!** লয়ে আয় তামাকু পান।" (গানভঙ্গ) **ভ্যালারে** নন্দলাল।

সিদ্ধ ধাতু (মৌলিক ধাতু)

যে সকল ধাতুর কোন বিশ্লেষণ চলে না সেই সকল ধাতুকে **মৌলিক** বা **সিদ্ধ ধাতু** বলে। উদাহরণ—লিখ্, দহ্, গর্জ, কর্, খা, নাহ, ভর্।

সামীপ্যাধিকরণ (গৌণার্থক-অধিকরণ)

অধিকরণ কারক অনেক সময়ে মুখ্য আধারকে না বুঝাইয়া গৌণার্থে (সামীপ্যাদি অর্থে) ব্যবহৃত হয়। এইরূপ অধিকরণকে গৌণার্থক অধিকরণ বা সামীপ্যাধিকরণ বলা চলে। **'জলের কলে** ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বাসা'=জলের কলের সমীপে। 'বসন্ত আজি জাগ্রত **দ্বারে'** (রবীন্দ্রনাথ)=দ্বারের কাছে—অতি নিকটে। **গঙ্গাসাগরে** মেলা বসে (=নিকটে)। "চরকার দৌলতে আমার **দুয়ারে** বাঁধা হাতী"।

সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য (নামবাচক বিশেষ্য)

যাহাদ্বারা কোন ব্যক্তি, স্থান, দেশ, পর্বত, নদী প্রভৃতির স্বকীয় নাম বা বিশেষ নাম বুঝায় এইরূপ পদকে সংজ্ঞাবাচক বা নামবাচক বিশেষ্য বলে।

রবীন্দ্রনাথ, সিন্ধু, হিমালয়, গঙ্গা, কলিকাতা, ভারতবর্ষ।

বিষমীভবন (বিষমীকরণ)

একই শব্দে এক জাতীয় ধ্বনির আবৃত্তি অনেক সময়ে পীড়াদায়ক। এইজন্য একাধিক সম-ধ্বনির মধ্যে একটিকে বদলাইয়া তাহার স্থানে অন্য ধ্বনির সমাবেশের নাম **বিষমীভবন।** সমজ> **যমক** (আগেও জ ধ্বনি পরেও জ ধ্বনি—পরবর্তী ধ্বনির স্থানে ক—বসাইযা উদ্বেগ নিবারণ করা হইল); (ধান) ভাঙা>**ভানা (ধান ভানিতে শিবের গীত)।**

নির্ধারণ (নির্ধার)

জাতি গুণ ক্রিয়া এবং সংজ্ঞাদ্বারা সমুদায় হইতে একদেশের (=অংশবিশেষের) পৃথক্-**করণের নাম নির্ধারণ।**

নির্ধারণে ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। **কবিদের মধ্যে** কালিদাস শ্রেষ্ঠ। মনুষ্যদের মধ্যে ক্ষত্রিয়েরা বড় বীর। পাড়ার ছেলেদের মধ্যে নিমাই ভাল। তিনি সবার বড়।

কম্পনজাত বর্ণ

বাঙ্‌লা বর্ণমালার র্-কার ধ্বনি জিহ্বার অগ্রভাগকে কম্পিত করিয়া তদ্দ্বারা দন্ত-মূলকে একাধিকবার দ্রুত আঘাত করিয়া উচ্চারিত হয়। জিহ্বার অগ্রভাগ কম্পিত হয় বলিয়া 'র্' ধ্বনিকে কম্পনজাত ধ্বনি বলা হয়।

সংশয়বাচক অব্যয়

যে সকল অব্যয় দ্বারা সংশয়ের অর্থ (=সন্দেহের অর্থ) প্রকাশ করা হয় তাহাদিগকে সংশয়ার্থক অব্যয় বলে। যথা **পাছে, যদি, যদ্যপি, তবু।** "**পাছে** লোকে কিছু বলে"। **যদি** রাম নাই আসে আমি কি করিতে পারি!

শব্দার্থের সংকোচ

যখন কোন শব্দের মৌলিক বা স্বাভাবিক অর্থ পূর্ণ পদার্থের বোধ না জন্মাইয়া তাহার অংশবিশেষের অর্থকে বুঝায় তখন মনে করিতে হইবে **শব্দার্থের সংকোচ হইয়াছে।**

'**নিধন**' শব্দের আভিধানিক প্রাচীন অর্থ (স্বাভাবিক) মৃত্যু বা হত্যা। কিন্তু বাঙ্‌লায় ইহার অর্থ হত্যাজনিত মৃত্যু—সুতরাং এখানে অর্থের সংকোচ হইয়াছে।

'**সম্বন্ধী**'—বলিতে যাহার সহিত সম্বন্ধ আছে এরূপ সকল লোককে বুঝায়।—কিন্তু বাঙ্‌লায় ইহার সঙ্কুচিত অর্থ 'শ্যালক'।

লক্ষণাত্মক করণ (উপলক্ষণাত্মক করণ, উপলক্ষণে তৃতীয়া)

যাহাদ্বারা কোন বস্তুর পরিচয় হয় তাহাকে উপলক্ষণ (বা লক্ষণ) বলে। এই উপলক্ষণে তৃতীয়া (—এ, য়)হয়। দুঃখের **বেশে** আসিয়াছে। বামুন চেনা যায় **পৈতায়। গোঁফে** শিকারী বিড়ালকে চেনা যায়। "দুঃখের বেশে তোমারই রণতূর্য বাজে"।

['করণ' কারক বিশেষ। ইহার সহিত ক্রিয়ার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকা চাই। এইরূপ সম্বন্ধ উপলক্ষণ বা লক্ষণের নাই বলিয়া উহা করণকারক নহে। উহা একপ্রকার বিশেষণ। উহা

বাক্যস্থ কর্তৃপদকে এখানে বিশেষিত করিতেছে। সে দুঃখের বেশে আসিয়াছে—সে—কর্তা দুঃখের বেশ ধারণকারী।]

বাঙলা ব্যাকরণে এই উপলক্ষণ বা লক্ষণকে করণের প্রকারভেদরূপে কেহ কেহ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ইহাই লক্ষণাত্মক করণ।

অযোগবাহ বর্ণ (আশ্রয় স্থানভাগী বর্ণ)

অনুস্বার (ং) ও বিসর্গকে (ঃ) অযোগবাহ বর্ণ বলা হয়। ইহাদের নিজ কোন উচ্চারণ স্থান নাই। ইহারা যে সমস্ত বর্ণকে আশ্রয় করে তাহাদের উচ্চারণস্থান প্রাপ্ত হয়। এই কারণে ইহাদিগকে **আশ্রয়স্থানভাগী বর্ণ** বলে। বর্ণমালার বাহিরে অবস্থিত বলিয়া ইহাদের নাম **অযোগবাহ** বর্ণ। 'বরং শব্দের অনুস্বার পূর্ববর্তী কণ্ঠ্য অকারকে আশ্রয় করিয়াছে।

পদমধ্যস্থ বিসর্গের উচ্চারণ

পদের মধ্যে বিসর্গ থাকিলে বিসর্গ স্থানে পরবর্তী বর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। যাদঃ পতি (মধুসূদন দত্ত) (উচ্চারণে যাদপ্পতি)। অধঃপতন (=অধপ্‌পাত)।

বর্ণদ্বিত্ব (ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্বভাব)

অর্থের পার্থক্যের জন্য অনেক সময় ব্যঞ্জনবর্ণকে দ্বিত্ব করা হয়। যেমন কাচা—কাচ্চা (পরিমাণ বিশেষ)। ছোট—ছোট্ট (আদরার্থে)। মালা—মাল্লা (নৌকার মাঝি)। কিন্তু অনেক স্থলে অর্থের পরিবর্তন না বুঝাইতেও উচ্চারণের অভ্যাসবশতঃ দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। যথা চাদ্দর (চাদর স্থলে পূর্ববঙ্গে), পাত্তল (পাতল), থাপ্পড় (থাপর স্থলে বিরক্তিতে)।

শব্দার্থের প্রসার

শব্দের মূল অর্থের সহিত অধিক অর্থ সংযুক্ত হইলে। মূল অর্থের অতিরিক্ত কোন অর্থ উপথিত হইলে শব্দের **অর্থের প্রসার** হইয়াছে বুঝিতে হইবে। 'সন্দেশ'—শব্দের আদিম অর্থ সংবাদ সমাচার। কিন্তু শুধু হাতে সংবাদ অপরকে দেওয়া যাইত না- সঙ্গে মিষ্টান্ন লইয়া যাইতে হইত। অর্থের প্রসারে মিষ্টান্ন বিশেষের নামে 'সন্দেশ'- শব্দের প্রয়োগ হয়। 'কাগজ'—শব্দের অর্থ লিখিবার কাগজ ছিল উহা অর্থের প্রসারে খবরের কাগজও বুঝায়।

বিরক্তিসূচক অব্যয়

যে সকল অব্যয় দ্বারা বিরক্তি বা অসন্তোষের অর্থ বুঝায় তাহাদিগকে বিরক্তিসূচক অব্যয় বলে।

"আরে রাম রাম! নিবারণ সাথে যাবে"। **দূত্তর!** কিছু ভাল লাগে না। **আ মলো যা! রাম কহো!**

নিরপেক্ষ কর্তা

যে ক্রিয়ার কালদ্বারা অন্য ক্রিয়ার কাল নিরূপিত হয় সেই ক্রিয়াকে ভাব বলে। ভাবের কর্তাকে **নিরপেক্ষ কর্তা** বলে। সূর্য উদিত হইলে যাত্রীরা অত্যন্ত আনন্দিত হইল। এখানে মূল ক্রিয়া "আনন্দিত হইল"—ইহার সহিত 'যাত্রীরা'—এই কর্তৃপদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে। 'সূর্য উদিত হইলে'—এই অসমাপিকা ক্রিয়া যুক্ত বাক্যের কর্তা সূর্যের সহিত 'আনন্দিত হইল'—এই মূল বাক্যগত ক্রিয়ার সম্বন্ধ নাই। এই জন্য 'সূর্য'— নিরপেক্ষ কর্তা।

তুলনাশ্রিত কর্মধারয়

(১) উপমান কর্মধারয়, (২) উপমিত কর্মধারয়, (৩) রূপক কর্মধারয়—এই তিন প্রকারের কর্মধারয়ে তুলনার আশ্রয় লওয়া হয়—এই কারণে ইহারা তুলনাশ্রিত কর্মধারয়।

(১) যাহার সহিত **তুলনা** দেওয়া হয় তাহাকে বলে **উপমান** পদ। যাহার বিষয়ে তুলনার আশ্রয় লওয়া হয় তাহা উপমেয় বা **উপমিত** পদ। উপমান **উপমেয়ের সাধারণ ধর্মকে বলা** হয় **সামান্যবচন**। উপমান কর্মধারয়ে উপমান ও সামান্যধর্মের সমাস হয়। যথা **ঘনশ্যাম** (শ্রীকৃষ্ণ) ঘনর (উপমান) মতো শ্যাম (**শ্যাম সামান্যবচন**)। এখানে উপমেয় (**উপমিত**) পদ সমাসের মধ্যে নাই—শ্রীকৃষ্ণ পদ বাহিরে আছে।

(২) উপমিত **কর্মধারয়ে** উপমিত (উপমেয়) বাচক পদ প্রথমে বসে—**উপমানবাচক** পদ পরে বসে কিন্তু সামান্যধর্ম সমাসের মধ্যে থাকে না। যথা **পুরুষব্যাঘ্র** (পুরুষ **ব্যাঘ্রের** মতো) (বীর)—'বীরত্ব'—সমাসে নাই।

(৩) রূপক কর্মধারয়ে উপমান ও উপমেয়ের অভেদ কল্পনা হয। **শোকাগ্নি**—শোকরূপ অগ্নি—যদিও শোক আর অগ্নি পৃথক্ পদার্থ তথাপি শোক আর অগ্নিকে এক **বলিয়া** কল্পনা করা হইয়াছে।

উপপদ

উপ (সমীপে) থাকে যে পদ তাহাকে বলে **উপপদ**। ইহা সমাসে **কৃদন্ত পদের** পূর্বে বসে এবং এই পদের সঙ্গে কৃদন্ত পদের **নিত্য** সমাস হয়। **কুম্ভকার** পদে **কুম্ভ** উপপদ **কার** পদের সহিত নিত্য সমাস হইয়াছে—এই 'কার' পদকে পৃথক্ করিযা ব্যবহার করা চলিবে না।

অর্ধস্বর—য ও ব (অন্তঃস্থ)—এই দুইটি বর্ণকে অর্ধস্বর বলা হয়। (সংস্কৃতে ইহাদের উচ্চারণ যথাক্রমে ইঅ (দ্রুত), উ অ)। স্বরধ্বনি ব্যঞ্জনের মধ্যে থাকায় ইহারা অর্ধস্বর।

শব্দার্থের অপকর্ষ

শব্দের মূল অর্থের যখন অবনতি ঘটে তখন উহাকে শব্দার্থের অপকর্ষ বলে। যথা—'মহাজন' বলিতে মহৎ ব্যক্তিকে বুঝায়—ইহাই আদিম অর্থ—কিন্তু "ব্যবসায়ী" অর্থে ইহার প্রয়োগে অর্থের অপকর্ষ হইয়াছে—তুঃ "জনগণে যারা জোঁকসম শোষে তারে মহাজন কয়। (কাজী নজরুল ইসলাম)

ঢাকা শহরে 'মহারাজ'—শব্দের অর্থ "মহাশয় ব্যক্তি" "বাবু"। বিহারে 'বাবাজী' অর্থ রাঁধুনী বামন। কাশীতে "সর্দার"—অর্থ গোয়ালাদের মধ্যে মাতব্বর ব্যক্তি। **"চৌধুরী" শব্দের অর্থ পশ্চিমে হালের মাঝি, কাশীর শ্মশানে ডোমদের সর্দার (ডোম চৌধুরী)।**

স্বরের গুণ

(১) উ ঊ স্থানে 'ও', ই ঈ স্থানে 'এ' ঋ ৠ স্থানে 'অর্' ঌ স্থানে অল্ হওয়াকে **গুণ** বলে। যথা√নী+অনট্ (ভাববাচ্যে)—নে+অন=নয়ন—এখানে নী ধাতুর ঈকার গুণরূপে পরিবর্তন লাভ করিয়া এ হইয়াছে। তাহার পর সন্ধিতে 'এ' স্থানে অয়্ হইয়াছে।

(২) উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিন প্রকার স্বরধ্বনিও—**স্বরের ধর্ম বা গুণ**। বৈদিক মন্ত্রে এই তিন রকমের সঙ্গীতের সুর পাওয়া যায়।

উচ্চ আরোহী সুর উদাত্ত—নিম্নস্বর অনুদাত্ত—উচ্চ হইতে নিম্নগামী স্বর স্বরিত।

বাঙ্‌লায় শুধু বাক্যে এই সুর পাওয়া যায়—অন্যত্র নহে।

শ্রুতিধ্বনি

বাঙ্‌লায় দুইটি স্বরবর্ণের মধ্যে -য এবং ব-কারের আগম হয়। এই ধ্বনিদ্বয়কে -যশ্রুতি ও ব-শ্রুতি বলে। ইহারাই শ্রুতিধ্বনি (glide) দেওআ>দেয়া। মা এর>মায়ের। গোআল > গোয়াল। ছা+আ > ব শ্রুতি লেখা ছাবা>ছাওয়া।

আত্মবাচক সর্বনাম .

আত্মা, স্বয়ং নিজ,—ইহারা আত্মবাচক সর্বনাম।

সাধিত শব্দ

প্রকৃতি প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দকে **সাধিত শব্দ** বলে। সাধিত শব্দ দুই প্রকারঃ—(১) **প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ**—যথা 'করা' ইহাতে কর্ ধাতু (প্রকৃতি)+আ (প্রত্যয়)=করা (**করা** কাজ)। (২) **সমস্ত পদ**—প্রত্যয় নিষ্পন্ন একাধিক পদের দ্বারা যেখানে সমাস হয়। 'বেল-পাতা' 'দা-কাটা'। 'পুরুষব্যাঘ্র'।

ঐকদেশিক অধিকরণ

ক্রিয়ার আধার যখন অংশবিশেষকে (=এক দেশ) বুঝাইবে—তখন **ঐকদেশিক অধিকরণ** হইবে। যেমন লোকটি কলিকাতায় (=**কলিকাতার** অংশ বিশেষে) বাস করে। **জলে মাছ** থাকে (-জলের অংশবিশেষ)। কিন্তু দুধে মাখন আছে বলিলে—দুধের সর্বত্র মাখন আছে—কোন একটা বিশেষ অংশে নাই বুঝিতে হইবে।

অসংলগ্ন সমাস

যে পদের সহিত যে পদের অর্থের সামর্থ্য আছে তাহার সহিত তাহার সমাস হয়। কিন্তু বাঙ্‌লা ভাষায় লেখার প্রচলিত রীতিতে এই সঙ্গতি না দেখাইযা সমস্ত পদকে আকাঙ্ক্ষিত পদ হইতে দূরে রাখা হয। এইরূপ সমাসকে অসংলগ্ন সমাস বলে। যথা, গম্ভীরনাদী বারিধি তটে'—**গম্ভীরনাদী** পদটি 'বারিধি' পদের বিশেষণ—গম্ভীরনাদি-বারিধিতটে এইরূপ হওয়া উচিত অন্বযের জন্য। ইহা অসংলগ্ন সমাসের উদাহরণ।

বর্ণবিকার

ভাষার যে কোনরূপ ধ্বনি পরিবর্তনের নাম **বর্ণবিকার। কাক>কাগ।** বক-বগ। গূঢ়+আত্মা>গূঢ়াত্মা, এতৎ+অঞ্চল=এতদঞ্চল। নী+অন(ট্) নে+অন>নয়ন।

সমস্যমান পদ

যে সকল পদ সমাস গঠনে প্রযোগ করা হয় তাহাদিগকে সমস্যমান পদ বলে। 'কৃতবিদ্য' —(সমস্তপদ)। ব্যাসবাক্য-কৃত হইয়াছে বিদ্যা যৎকর্তৃক। এই বাক্যের মধ্যে মাত্র দুইটি পদ 'কৃত' এবং 'বিদ্যা' লইয়া সমাস গঠিত হইয়াছে—ইহারা সমস্যমান পদ।

সাপেক্ষ সর্বনাম (আপেক্ষিক সর্বনাম, সহসঙ্গতিবাচক সর্বনাম, পারস্পরিক সঙ্গতিমূলক সর্বনাম (Correlatives)

যে সে, যিনি তিনি, যাহা তাহা, এই কয়টি সর্বনাম যুগল এবং এই শব্দগুলি হইতে উৎপন্ন বিশেষণ শব্দ বাক্যে পরস্পরকে অপেক্ষা করিয়া (নিত্য সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া) ব্যবহৃত হয়। ইহারা পরস্পর সাপেক্ষ—এই কারণে ইহাদিগকে **সাপেক্ষ সর্বনাম** বলে। (ইহাদের

৭ ॥ কারণ নির্দেশপূর্বক শুদ্ধতা বিচার

শ্রীচরণেসু—'শ্রীচরণেষু' শুদ্ধ—একারের পর প্রত্যয়ের 'স'—ষ হইয়াছে। শ্রীচরণ+সু—ইহা তৎসম পদ।

বরনীয়—'বরণীয়'—শুদ্ধ। √বৃ+অনীয়—বরণীয় এক পদে রকারের পর 'ন'—মূর্ধন্য 'ণ' হইয়াছে।

ম্রিয়মান—মৃ+(কর্তৃবাচ্যে শানচ্) শুদ্ধ পদ **'ম্রিয়মাণ'** একপদে র্ কারের পর 'ন' আছে এবং স্বরবর্ণ, য এবং প বর্গ ব্যবধান আছে—সুতরাং 'ণ' হইবে।

দর্শণ—'দর্শন' শুদ্ধ। একপদে 'র' কারের পর 'শ' কার ব্যবধান আছে—সুতরাং ণত্ব বিধি এখানে কার্যকর হইবে না।

তুসাররাশি—'তুষাররাশি'—শুদ্ধ। 'তুষার' শব্দের 'ষ' কার স্বাভাবিক "ষ"।

অনাথিনী -'অনাথা' শুদ্ধ—অবিদ্যমান নাথ (পতি, অভিভাবক) যাহার, নঞ্ বহুব্রীহি সমাস। স্ত্রীলিঙ্গে ইহার উত্তর অস্ত্যর্থক—ইন্ প্রত্যয় অনাবশ্যক কারণ বহুব্রীহিদ্বারাই অর্থপ্রতিপাদিত হইয়াছে।

সঠিক—'ঠিক' শুদ্ধ। ঠিক শব্দ দ্বারাই অভিলষিত অর্থ পাওয়া যাইতেছে।—সুতরাং তুল্যযোগে বহুব্রীহি অনাবশ্যক।

পৌরহিত্য—'পৌরোহিত্য শুদ্ধ। পুরঃ+হিত সন্ধিতে 'পুরোহিত'+ষ্যঞ্ (তাহার কর্ম বা ভাবার্থে)=পৌরোহিত্য।

সশঙ্কিত- 'শঙ্কিত' শুদ্ধ। 'শঙ্কা' জন্মিযাছে ইহার শঙ্কা+ইতচ্ জাতার্থে। ইহার উত্তব একই অর্থে তুল্যযোগে বহুব্রীহি অনাবশ্যক। তবে 'সশঙ্ক' পদ শুদ্ধ শঙ্কার সহিত বর্তমান (বহুব্রীহি)।

শান্তনা- সান্ত্বনা' শুদ্ধ। বাঙ্‌লা ভাষায় তৎসম বা তদ্ভব বা দেশী 'শান্তনা' শব্দ নাই। সবিনয়পূর্বক—'বিনয়পূর্বক' শুদ্ধ॥ বিনয পূর্বে যাহার বিনয়পূর্বক—(বহুব্রীহি) ইহার সহিত পুনরায় তুল্যযোগে বহুব্রীহি অনাবশ্যক।

বশম্বদ—'বংশবদ' শুদ্ধ। বশম্+বদ্ (বশ—বদ+খচ্) ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকায় ম স্থানে অনুস্বার হইয়াছে। পরবর্তী বদ্ ধাতুর 'ব'-কার অন্তস্থ 'ব'-কার। সুতরাং অনুস্বার স্থানে বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয় নাই। যদি বর্গীয় ব থাকিত তবে 'বশম্বদ শুদ্ধ হইত।

সাষ্টাঙ্গ সহকারে—অষ্টাঙ্গসহকারে শুদ্ধ। অষ্ট অঙ্গের সহকার যাহাতে সেইরূপে (বহুব্রীহি)—ইহার সহিত পুনরায় 'সহ'—শব্দের যোগ করিয়া তুল্যযোগে বহুব্রীহি করা অনাবশ্যক।

মন্যোকষ্ট—মনঃ+কষ্ট=মনঃকষ্ট শুদ্ধ। বিসর্গের পর 'ক' থাকিলে সন্ধিতে বিসর্গের কোন পরিবর্তন হইবে না।

উৎকর্ষতা—উৎকর্ষ শুদ্ধ। উৎ+কৃষ্ +ঘঞ্=উৎকর্ষ—একই অর্থে তা প্রত্যয় অনাবশ্যক।

আবশ্যকীয়—'আবশ্যক' শুদ্ধ। একই অর্থে ঈয় প্রত্যয় প্রয়োগ করা অনাবশ্যক।

অনুবাদিত—(১) 'অনূদিত' শুদ্ধ। অনু+√বদ্+ক্ত (কর্মবাচ্যে) √'বদ্' ধাতুর 'ব-কারের সম্প্রসারণ হইয়া 'উ' হইয়াছে সুতরাং অনু+উদ্+ক্ত। [ণিচ্ প্রত্যয় যোগে অনু-বাদিত শুদ্ধ]।

(২) অন্য লোক দ্বারা অনুবাদ করাইলে অর্থাৎ প্রেরণার্থে ধাতুটির সহিত 'ণিচ্' যোগ করিলে উহা হইবে 'অনুবাদি' অনুবাদি+ক্ত='অনুবাদিত' শুদ্ধ।

অর্চনা—শুদ্ধ। র কারের পর একপদে চকার স্বরবর্ণ ব্যবধান আছে। সুতরাং 'ন'-কারেব কোন পাবিবর্তন হইবে না।

বিষম—'বিষম' শুদ্ধ। "সুষমাদি" শব্দের 'স' মূর্ধন্য 'ষ' হয়।

অভিসেক—অভি+√সিচ্+ঘঞ্ অভিষেক শুদ্ধ। উপসর্গের ই কারেব পবে 'সিচ ধাতুর 'স' কার 'ষ' হয়।

অধ্যায়ন—'অধ্যয়ন' শুদ্ধ। অধি+√ই+অনট্—সন্ধিতে অধ্যযন। আ কাব আসিবাব কোন কাবণ নাই। (অধি+অযন)।

বাহুল্যতা—বহুল+ষঞ্ প্রত্যযে বাহুল্য (ভাবার্থে) একই অর্থে দ্বিতীযবাব অন্যপ্রত্যয (-তা) যুক্ত কবা অনাবশ্যক।

সর্বাঙ্গীন—শুদ্ধ। সর্ব যে অঙ্গ 'সর্বাঙ্গ' (কর্মধাবয সমাস) সর্বাঙ্গ+ঈন এখানে র কারের পব 'ন' কাব একপদে নাই। সুতবাং এখানে ণত্ববিধি কার্যকর হইবে না।

স্থায়ীত্ব—'স্থাযিত্ব' শুদ্ধ। 'স্থাযিন্+ত্ব—নকাব লোপে বাকি থাকিল হ্রস্ব ইকাব—দীর্ঘ ঈকাব হইবাব কোন কাবণ নাই।

ঐক্যমত্য—'ঐকমত্য' শুদ্ধ। 'একমত' শব্দ হইতে ষ্যঞ্ যোগে ঐকমত্য হইযাছে। একেব ভাব 'ঐক্য' সুতবাং ইহাব সহিত 'মত' শব্দ জুড়িযা দিযা ষ্যঞ্‌প্রত্যয অনাবশ্যক।

এতদাঞ্চল—'এতদঞ্চল' শুদ্ধ। এতৎ+অঞ্চল। স্ববর্ণ পবে থাকায পদেব অন্তস্থিত বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে সন্ধিতে তৃতীয় বর্ণ হইযাছে।

সমৃদ্ধশালী—'সমৃদ্ধ' অথবা 'সমৃদ্ধিশালী' শুদ্ধ। সম্+ঋধ্+ক্ত= সমৃদ্ধ'—অর্থ সম্যক্ ধনসম্পন্ন। ইহাব উত্তর অস্ত্যর্থে 'শালিন্' প্রত্যয অনাবশ্যক। 'সমৃদ্ধি' শব্দেব উত্তব অস্ত্যর্থে শালিন্ প্রত্যয় যোগ করা যায।

মাধুরিমা—মধুরিমা শুদ্ধ। মধুর+ইমন্=মধুরিমন্ প্রথমাব একবচনে সংস্কৃতে 'মধুরিমা' (=মাধুর্য)। আদিবর্ণের বৃদ্ধি হইবার কোন কারণ নাই।

বিবিধ প্রশ্নমালা ও উত্তর—১

১। উদাহরণ সহ বুঝাইয়া দাও:—অন্তঃস্থ বর্ণ, আ-কারের দীর্ঘ উচ্চারণ, অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয়, অর্ধতৎসম, বর্ণাগম, সাধিত ধাতু, সমধাতুজকর্ম, প্রযোজক কর্তা, পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ।

উঃ অন্তঃস্থ বর্ণ—স্পর্শবর্ণ ও উষ্মবর্ণের মধ্যবর্তী (অন্তঃস্থ-অন্তঃ মধ্য তাহাতে থাকে যাহারা) বর্ণসমূহকে অন্তঃস্থ বর্ণ বলে। যথা য, র, ল, ব।

আকরের দীর্ঘ উচ্চারণ—হসন্ত বর্ণের পূর্বে উচ্চারিত 'আ'-বর্ণ দীর্ঘ হয়. যথা আম (আম্), পাত (পাত্), কাত (কাত্), চাল (চাল্)।

অনুসর্গ—বাঙ্‌লা ভাষায় কতকগুলি স্বাধীনসত্তাবিশিষ্ট শব্দ বিশেষ্য বা তৎস্থানীয় শব্দের পরে বসিয়া কারক সৃষ্টি করিয়া থাকে। ইহাদিগকে **অনুসর্গ** বলা হয়। যথা—তাহার দ্বারা, **আমাদ্বারা, রাম বিনা** গতি নাই। শ্যামের **অপেক্ষা** রাম বড় ['কর্মপ্রবচনীয়ে'র এরূপ স্বাধীন সত্তা নাই—উহা 'অনুসর্গের' কাজ করে না—**পাঠ্যক্রমে 'অনুসর্গ'**—আছে কর্মপ্রবচনীয় নাই—ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে]।

অর্ধতৎসম—যে সকল সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের বাঙ্‌লা ভাষায় আংশিক বিকৃত উচ্চারণ করা হয় তাহাদিগকে অর্ধতৎসম শব্দ বলে। যথা—যজ্ঞ (তৎসম শব্দ=সংস্কৃত শব্দ) বাঙ্‌লায় **যজ্ঞি**, পথ্য—**পাথ্যি**, উৎসর্গ—**উচ্ছুগ্‌গো, সৃষ্টি—ছিষ্টি** [অর্ধ—অংশ, অর্ধতৎসম—আংশিক তৎসম]।

বর্ণাগম—প্রকৃতি প্রত্যয়ের লোপ না করিয়া তন্মধ্যে কোন বর্ণের উপস্থিতিকে বর্ণাগম বলে। যথা—আ+চর্য=আশ্চর্য এখানে 'শকার' আগম হইয়াছে। আ+পদ=আস্পদ—'স'-কার আগম√কৃ (ধাতু)+ক্যপ্‌=কৃত্য, ভৃত্য প্রভৃতিতে ত্‌-কার আসিয়াছে।

সাধিত ধাতু—এক বা একাধিক প্রত্যয়ান্ত ধাতু এবং নামপদকে প্রত্যয়যোগে ধাতুতে পরিণত করিলে তাহাকে **সাধিত ধাতু** বলা হয়। চরে (চর্‌ ধাতু হইতে) ইহার সহিত আ+য় প্রত্যয়যোগে 'চরায়'—ধাতু হয়। প্রেরণার্থে গোরু চরে—রাখাল গোরু 'চরায়'। ফেন (শব্দের) উত্তর+আ+ইয়া যোগে 'ফেনাইয়া'—নামধাতু ইহাও সাধিত ধাতু।

সমধাতুজকর্ম—ক্রিয়া ও তাহার কর্ম একই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইলে সেই কর্মকে **সমধাতুজকর্ম বলে।** রামবাবু কাষ্ঠ **হাসি** হাসিলেন। মেয়ের জন্য মা কি **কাঁদাকাটাই** না কাঁদিয়াছেন।

প্রযোজক কর্তা—প্রেরণার্থক ক্রিয়ার প্রবর্তক কর্তাকে প্রযোজক কর্তা বলে। বনের ধারে **মধুসূদন** শূকর চরায়। **মাতা** শিশুকে ভাত খাওয়ায়।

পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ—অতীতে সংঘটিত এবং সম্ভাবনা অর্থে প্রযুক্ত ক্রিয়ার কালকে পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ বলা হয়—'আমার এখন মনে নাই, তবে আমিই হয়তো তোমাকে অনেক-দিন পূর্বে এই কথা **বলিয়া থাকিব**'।

অথবা, নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে **যে-কোন পাঁচটিতে** 'ন' ও 'ণ' এবং 'স' ও 'ষ'-এর ব্যবহারের বিধান বুঝাইয়া দাও :—ম্রিয়মাণ, কীর্তন, কণ্টক, দুর্নাম, **করকমলেষু**, সুচরিতাসু, বুভুক্ষা, ভূমিসাৎ, পরিবেষিত।

উত্তর :—ম্রিয়মাণ—একপদে র-কারের পর স্বরবর্ণ, য-কার পবর্গ ব্যবধানে 'ন' স্থানে মূর্ধন্য ণ-কার হইয়াছে। **কীর্তন**—'র'-কারের পর একপদে 'ত' বর্গ ব্যবধান থাকায় দন্ত্য ন-কারের পরিবর্তন হয় নাই। **কণ্টক**—ট বর্গযুক্ত দন্ত্য ন-কার মূর্ধন্য ণ-কার হইয়াছে। **দুর্নাম**—এখানে দুর্‌ এবং নাম দুইটি ভিন্ন পদ থাকায় র-কারের পর ন-কার মূর্ধন্য ণ-কারে পরিবর্তিত হয় নাই। **করকমলেষু**—অ আ ভিন্ন স্বরবর্ণের ('এ'-কার) পরবর্তী প্রত্যয়ের 'স' মূর্ধন্য 'ষ'-কার হয় 'সু'—প্রত্যয় সংস্কৃত সপ্তমী বিভক্তির বহুবচন। ইহা তৎসম পদ। আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের সপ্তমীর বহুবচনের পদ। বাঙ্‌লায় চিঠিতে এইরূপ ব্যবহার হয়। **সুচরিতাসু**—আকারের পর প্রত্যয়ের দন্ত্য 'স' মূর্ধন্য ষ-কার হয় না। ইহা তৎসম পদ। বুভুক্ষা—'ক'-কারের পর 'সন্‌'-প্রত্যয়ের 'স' মূর্ধন্য ষ-কার হইয়াছে [ভুজ্‌ (ধাতু)+সন্‌+অ+আ (স্ত্রীলিঙ্গে)=বুভুজ্‌+স্‌+আ+বুভুক্‌+সা—ক-কারে পরবর্তী প্রত্যয়ের 'স্‌'-কার মূর্ধন্য ষ্‌ হইয়াছে] **ভূমিসাৎ**—সাধারণ নিয়মানুসারে 'উ'-কারের পরবর্তী প্রত্যয়ের 'স'-কার ষ-কার হয়, কিন্তু 'স্যাৎ'—প্রত্যয়ের সকারের কোন পরিবর্তন হয় না। **পরিবেষিত**—পরি√বিষ্‌ (ধাতু)+ণিচ্‌ (প্রেরণার্থে)+ক্ত—এখানকার 'ষ'-কার 'বিষ' ধাতুর স্বাভাবিক 'ষ'-কার।

২। বড় হরফে মুদ্রিত পদগুলির মধ্যে **যে-কোনও পাঁচটির** কারক নির্ণয় কর :—

(ক) আমা হতে হেন কার্য হবে না সাধন। (খ) বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত আনন্দমঠ। (গ) বিবাদে ক্ষান্ত হও। (ঘ) তিনি পীড়ায় কাতর। (ঙ) মহাশয়ের থাকা হয় কোথায়? (চ) মৃতজনে দেহ প্রাণ। (ছ) সে তাস খেলছে। (জ) বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে। (ঝ) গুরুশিষ্যে কথা বলে। **উত্তর**ঃ—(ক) করণকারকে পঞ্চমী বিভক্তি (আমা হতে=আমা দ্বারা)। (খ) বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত=বঙ্কিমচন্দ্রদ্বারা রচিত—কর্মবাচ্যের কর্তায় ষষ্ঠী বিভক্তি বা অনুক্ত কর্তায় ষষ্ঠী। (গ) বিবাদে=বিবাদ হইতে—অপাদানে সপ্তমী বিভক্তি। (ঘ) পীড়ায়=পীড়াহেতু হেত্বর্থে (হেতু—অর্থে) তৃতীয়া বিভক্তি 'য়'। (ঙ) মহাশয়ের—ভাববাচ্যের কর্তায় ষষ্ঠী। (চ) মৃতজনে=সম্প্রদানকারকে 'এ' বিভক্তি। (ছ) তাস খেলে=তাসদ্বারা খেলে—করণকারকে লুপ্ত তৃতীয়া বিভক্তি। (জ) বাড়ি বাড়ি=বাড়িতে বাড়িতে—অধিকরণ কারকে লুপ্ত সপ্তমী বিভক্তি—'তে'। (ঝ) গুরুশিষ্যে=গুরু ও শিষ্যে=পরস্পর=একে অন্যের সহিত ক্রিয়া ব্যতিহারে কর্তায় 'এ' বিভক্তি অথবা সহার্থে তৃতীয়া 'এ' বিভক্তি।

অথবা, ব্যাসবাক্য-সহ **যে-কোনও পাঁচটির** সমাস নির্ণয় করঃ—তুষারধবল, যথাশক্তি, পুরুষসিংহ, স্বাধীনতা-দিবস, চিরসুখ, ন্যূনাধিক, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, হাসাহাসি, রাজপথ। **তুষারধবল**—তুষারের মতো ধবল (উপমান কর্মধারয়)। **যথাশক্তি**—শক্তিকে অতিক্রম না করিয়া (অব্যয়ীভাব)। **পুরুষসিংহ**—পুরুষ সিংহের মতো (উপমিত কর্মধারয়)। **স্বাধীনতা-দিবস**—স্বাধীনতা-স্মারক দিবস (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। **চিরসুখ**—চির (কাল) ব্যাপী সুখ (দ্বিতীয়া তৎপুরুষ)। **ন্যূনাধিক**—ন্যূন অথবা অধিক (কর্মধারয়)। **লব্ধপ্রতিষ্ঠ**—লব্ধ হইয়াছে প্রতিষ্ঠা যৎ কর্তৃক—বহুব্রীহি)। **হাসাহাসি**—পরস্পর হাসা (ব্যতিহার বহুব্রীহি)। **রাজপথ**—পথের রাজা (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)।

৩। **যে-কোন পাঁচটি শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করঃ**

লোনা, মেটে, দাঁতাল, সহিষ্ণু, সৌমিত্রি, ছিন্ন, শব্দায়মান, দিশারু, পড়ন্ত, লাজুক।

উত্তরঃ—লোনা—লুন (নুন)+আ (অস্ত্যর্থে—লবণ ইহাতে আছে লবণাক্ত)। মেটে—মাটি+ইয়া (মাটিদ্বারা নির্মিত) মাটিয়া>মেটে (স্বর-সঙ্গতিদ্বারা)। দাঁতাল—দাঁত+আল (অস্ত্যর্থে)। সহিষ্ণু—সহ্ (ধাতু)+ইষ্ণু (শীলার্থে)। সৌমিত্রি—সুমিত্রার অপত্য এই অর্থে সুমিত্রা+ইঞ্। ছিন্ন—√ছিদ্ (ধাতু)+ক্ত (কর্মবাচ্যে)। শব্দায়মান—শব্দ+ক্যঙ্ (করণার্থে—শব্দ করিতেছে) শব্দায়+শানচ্ (বর্তমানকালে কর্তৃবাচ্যে)। দিশারু—দিশ্ বা দিশা+আরু (দিক্ জানে যে—দিক চিনিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতে পারে যে)। পড়ন্ত—পড়্ (ধাতু)+অন্ত (বর্তমানকালে)। লাজুক—লাজ+উক (অস্ত্যর্থে)।

অথবা, যে-কোনও পাঁচটি শব্দের দ্বারা **পাঁচটি** বাক্য রচনা করঃ—ভঙ্গুর, মানবেতর, রূপদক্ষ, বদ্ধাঞ্জলি, হিরন্ময়, অধিগত, অন্তঃসলিলা, নিখরচা, বেদরদী।

উত্তরঃ—মানবজীবন **ক্ষণভঙ্গুর। মানবেতর** প্রাণীদেরও বুদ্ধি আছে। দেবদত্ত বারাণসীর **রূপদক্ষ** শিল্পী ছিল। প্রজাগণ রাজার নিকট **বদ্ধাঞ্জলি** হইয়া অপরাধীর প্রাণভিক্ষা চাহিল। **হিরন্ময়** অলংকারে দেবীর দেহ বিভূষিত ছিল। **অধিগত** বিদ্যাকে কাজে না লাগাইতে পারিলে উহা নিষ্ফল। অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো মায়ের স্নেহ হৃদয়েই লুক্কায়িত ছিল। **নিখরচায়** পড়াশুনা চালান গরিবের পক্ষে পরম সৌভাগ্য সন্দেহ নাই। **বেদরদী** লোকের সঙ্গে কেহ কাজ করিতে পারে না।

বিবিধ প্রশ্নমালা—২

(১) উদাহরণ-সহ **যে-কোনও পাঁচটির** পার্থক্য বুঝাইয়া দাওঃ—(ক) অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ; (খ) তৎসম ও তদ্ভব; (গ) সন্ধি ও সমাস; (ঘ) মৌলিক ক্রিয়া ও যৌগিক

ক্রিয়া; (ঙ) কৃৎ-প্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয়; (চ) ব্যধিকরণ বহুব্রীহি ও সমানাধিকরণ বহুব্রীহি; (ছ) উপসর্গ ও অনুসর্গ।

উত্তর:—(১৭ (ক) **মহাপ্রাণ** বর্ণ—বর্গের দ্বিতীয়, চতুর্থ বর্ণ—খ ছ ঠ থ ফ ঘ ঝ ঢ ধ ভ —ইহাদের উচ্চারণ করিতে হইলে হ জাতীয় ধ্বনি (প্রাণ) সংযোগ করিতে হয়—এই কারণে ইহাদের নাম মহাপ্রাণ বর্ণ। যথা—ক্+হ্=খ্, গ্+হ্=ঘ্ ইত্যাদি।

অল্পপ্রাণ বর্ণ—বর্গের প্রথম তৃতীয় বর্ণের উচ্চারণে 'হ' জাতীয় ধ্বনির সহায়তা আবশ্যক হয় না, এই কারণে উহাদিগকে অল্পপ্রাণ বর্ণ বলে।—ক চ ট ত প গ জ ড দ ব ইহারা অল্পপ্রাণ বর্ণ।

(খ) তৎসম ও তদ্ভব—সংস্কৃত ভাষার যে সকল শব্দ কিছুমাত্র পরিবর্তিত না হইয়া অবিকল একই রূপে বাঙ্লা ভাষায় ব্যবহৃত হয় তাহাকে **তৎসম শব্দ** বলে। যথা—বৃক্ষ, লতা, জল, অনল, অনিল, দৈবাৎ, হঠাৎ, শ্রীচরণেষু, সুচরিতাসু।

সংস্কৃত ভাষার শব্দের ধ্বনি পরিবর্তনজাত প্রাকৃত ও অপভ্রংশের মধ্য দিয়া যে সকল শব্দ বাঙ্লা ভাষায় আসিয়াছে তাহাদিগকে তদ্ভব শব্দ বলে। যথা—সংস্কৃত অদ্য প্রাকৃত অজ্জ—বাঙ্লা—আজ। আজ—শব্দটি তদ্ভব বা প্রাকৃতজ শব্দ।

(গ) সন্ধি ও সমাস—পাশাপাশি দুইটি ধ্বনি থাকিলে তাহাদের দ্রুত উচ্চারণে একটির অথবা উভয়ের যে পরিবর্তন হয় তাহাকে সন্ধি বলে। সন্ধিতে এককালতা থাকিবে (একই সময়ে উচ্চারিত হইবে)। ভিন্ন কালতা থাকিলে—সন্ধিজ পরিবর্তন হইলে তাহাকে বিবৃত্তি বলে। যথা—দেব+আলয়—সন্ধিতে দেবালয় (এককালতা), শিরঃ+উপরি=শিরউপরি (সন্ধির নিয়মের প্রয়োগ হইয়াছে—কিন্তু একসঙ্গে উচ্চারিত হয় না)। দুইটি স্বর পাশাপাশি বসিয়া একসঙ্গে উচ্চারিত না হইলে তাহাকে বিবৃত্তি বলে।

সঙ্গতার্থ একাধিক পদের মিলনে একীভাব হইলে সমাস হয়। যথা—দেবের আলয়—দেবালয় (ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস) (দেব সম্বন্ধী আলয়—এখানে অর্থের সঙ্গতি থাকায় দেব এবং আলয় দুইটি পদের সমাস হইয়াছে)।

সন্ধিতে **বর্ণদ্বয়ের ধ্বনিগত** সংযোগে পরিবর্তন সাধিত হয়। সমাসে **পদদ্বয় বা তদধিক পদের অর্থগত সংযোগে** একপদে পরিণত হয়। সন্ধিতে অর্থের সঙ্গতি থাকুক আর নাই থাকুক দ্রুত উচ্চারণে ধ্বনির পরিবর্তন হয়। যথা—পো+অন=পবন($\sqrt{}$পূ-ধাতু হইতে 'পো' হইয়াছে—পূ-ধাতুর অর্থ পবিত্র করা বা শুদ্ধ করা—কিন্তু 'পো'-শব্দের এখানে অর্থ নাই—ইহা ব্যাকরণের প্রক্রিয়া দেখাইবার জন্য করা হইয়াছে); কিন্তু সমাসে দেবালয়-এর দুইটি পদের মধ্যে অর্থের সঙ্গতি রক্ষিত হইয়া সমাস হইয়াছে। 'সমাসে' সন্ধিকার্য আবশ্যিক—কিন্তু সন্ধি সর্বত্র আবশ্যক নহে। এক পদের অংশবিশেষের সঙ্গে অন্য পদের সমাস হয় না, কিন্তু একপদের অংশবিশেষের সঙ্গে অপরপদের অংশবিশেষের সন্ধি হইয়া থাকে।

(ঘ) মৌলিক ক্রিয়া ও যৌগিক ক্রিয়া:—যে সকল ধাতুর বিশ্লেষণ চলে না তাহাদিগকে মৌলিক ধাতু বলে। লিখ্, গর্জ্, দহ প্রভৃতি ধাতু। এই জাতীয় ধাতুর উত্তর বিভক্তিযোগে যে ক্রিয়াপদ গঠিত হয় তাহাকে মৌলিক ক্রিয়াপদ বলে। লিখ্ (ধাতু)+এ=লেখে—ইহা একটি মৌলিক ক্রিয়াপদ—এইরূপ 'গর্জ'—'যত গর্জে তত বর্ষে না'।

ক্রিয়াবাচক পদের সহিত অপর ক্রিয়া, ভাববাচক বিশেষ্য বা বিশেষণের সহিত অন্য ধাতু যোগ করিয়া যে ক্রিয়াপদ গঠিত হয় তাহাকে **যৌগিক ক্রিয়া** বলে। যথা—জাগিয়া উঠা, বসিয়া পড়া, প্রণাম করা ইত্যাদি। বৈতালিক **জাগিয়া উঠিল**, 'কুণ্ঠিত সেই বঙ্গের বধূ, হে কবি' তোমায় প্রণাম করে।' প্রথমটিতে ধাতুর উত্তর ক্রিয়াপদের বিভক্তি যুক্ত হয়। দ্বিতীয় প্রকার ধাতু ভাববাচক বিশেষ্যের সহিত অন্য ধাতুর যোগে নিষ্পন্ন হয়।

(ঙ) কৃৎ-প্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয়ঃ—ধাতুর উত্তর ক্রিয়াবিভক্তির চিহ্ন ছাড়া অন্য প্রত্যয় যুক্ত হইয়া প্রাতিপদিক গঠিত হইলে তাহাকে কৃৎ-প্রত্যয় বলে। যথা—কৃ (ধাতু)+তব্য=কর্তব্য, ঢাক্+অনি=ঢাকনি, বাড়্+অন্ত=বাড়ন্ত। এখানে তব্য, অনি, অন্ত—কৃৎ-প্রত্যয়।

তদ্ধিত প্রত্যয়—'তাহার হিত' (তৎ+হিত=তদ্ধিত)—এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যে প্রত্যয় হয় তাহা এবং তদনুরূপ বিভিন্নার্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যে সকল প্রত্যয় তাহাকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। বুদ্ধি+মতুপ্=বুদ্ধিমান্।

বিশ্বজনের হিতার্থে বিশ্বজনীন—বিশ্বজন+ঈন, দশরথের অপত্য—দশরথ+ইঞ্=দাশরথি। এখানে 'মতুপ্' 'ই' 'ঈন' 'ইঞ্' (=ই) তদ্ধিত প্রত্যয়। ধন+ইন্=ধনিন্।

(চ) ব্যধিকরণ বহুব্রীহি ও সমানাধিকরণ বহুব্রীহিঃ—যে বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদের বিভক্তি বচন লিঙ্গ পরপদের অনুরূপ হয় তাহাকে **সমানাধিকরণ বহুব্রীহি** বলে। আর **বহুব্রীহি** সমাসের পূর্বপদ ও উত্তরপদের যেখানে এইরূপ সমতা থাকে না সেখানে **ব্যধিকরণ বহুব্রীহি** হয়।

বিগতা হইয়াছে পত্নী যাহার—বিপত্নীক (সমানাধিকরণ বহুব্রীহি)। কণ্ঠেকাল—কণ্ঠে স্থিত কাল যাহার—কণ্ঠেকাল (=শিব—ব্যধিকরণ বহুব্রীহি)—এখানে পূর্বপদে সপ্তমী বিভক্তি—পরপদে প্রথমা বিভক্তি (লুপ্ত)।

(ছ) উপসর্গ ও অনুসর্গ ঃ—ক্রিয়ার পূর্বে প্র পরা অপ সম্ প্রভৃতি বাইশটি অব্যয় বসিয়া উহার অর্থকে বিশেষিত করিলে বা অনুবর্তন করিলে উহাদিগকে **উপসর্গ বলে।** যথা—গত—অনুগত (পিছনে পিছনে আসিয়াছে যে) গত—বিগত।

অনুসর্গ—দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক, 'হইতে'—প্রভৃতি কতকগুলি স্বাধীন সত্তাবিশিষ্ট শব্দ যখন কোন **শব্দের পরে** বসিয়া কারক-বিভক্তি বা অন্যপ্রকার বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত হয় তখন উহাদিগকে অনুসর্গ বলে। যথা—'তাহাকে **দিয়া**', 'রাম **বিনা**', 'তাহার **জন্য**'।

ক্রিয়ার পূর্বে উপসর্গ বসে আর অনুসর্গ **শব্দের পরে** বসে। উপসর্গ থাকিলে বুঝিতে হইবে তাহার পর ক্রিয়া আছে—আর অনুসর্গের পূর্বে থাকে শব্দ।

অথবা, বাঙ্লা শব্দের পুংলিঙ্গ হইতে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তনের **যে-কোনও পাঁচটি** নিয়মের (**দুইটি** করিয়া—উদাহরণ-সহ) উল্লেখ কর**ঃ—উত্তরঃ**—বই দেখ।

২। **একটি করিয়া বাক্য রচনা করিয়া নিম্নলিখিত কারকসমূহে** -'এ' বিভক্তির ব্যবহার **দেখাইয়া দাওঃ**—কর্তৃকারক, কর্মকারক, করণকারক, অপাদান কারক, অধিকরণ কারক। **উত্তরঃ—কর্তৃকারকে** 'এ'—চোরে সব টাকা লইয়া পালাইয়াছে। কর্মকারকে 'এ'—"**দূর কর মারাই** উচিত। অপাদান কারকে 'এ'—"**বিপদে** (=বিপদ হইতে) মোরে **রক্ষা কর** এ নহে মোর প্রার্থনা"। অধিকরণ কারকে 'এ'—**জলে মাছ** থাকে।

অথবা, ব্যাসবাক্যসহ **যে-কোনও পাঁচটির** সমাস নির্ধারণ **করঃ**—পঞ্চপাত্র, পুরুষ-সিংহ, সিংহাসন, লোকদেখানো, ধনিগণ, ভ্রাতুষ্পুত্র, সুখশান্তি, নিখুঁত। **উত্তরঃ**—পঞ্চ-**পাত্রের সমাহার** (সমাহার দ্বিগু)। পুরুষ সিংহের মতো (উপমিত কর্মধারয়)। সিংহ চিহ্নিত আসন (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। (শুধু) লোক দেখায় যাহা (উপপদ তৎপুরুষ)। ধনী-দিগের, গণ (**'ষষ্ঠীতৎপুরুষ'**)। ভ্রাতার পুত্র (অলুক্ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস)। সুখ ও শান্তি (**দ্বন্দ্ব সমাস**)। নি (নাই) খুঁত যাহাতে বা যাহার (বহুব্রীহি)।

৩। **যে-কোনও পাঁচটি** শব্দের অর্থসহ প্রত্যয় নির্ধারণ করঃ—বরণীয়, কার্য, নম্র, জলদ, ভস্মসাৎ, লোনা, চিরন্তক, সাপুড়ে। **উত্তরঃ**—বরণীয়—বৃ+অনীয় (কর্মবাচ্যে) বরণীয় (বরণের যোগ্য)—**যাহাকে বরণ করা** উচিত। কার্য—কৃ+ণ্যৎ (য) (কর্মবাচ্যে)—যাহা করা উচিত। নম্র—নম্+র **কর্তৃবাচ্যে** (শীলার্থে)—নমনশীল। **জলদ**—জল+দা+ক (কর্তৃবাচ্যে)—

যাহা জল দান করে। ভস্মসাৎ—ভস্ম+সাৎ কাৎস্ন্যার্থে। (সম্পূর্ণ অর্থে) সম্পূর্ণ রূপে ভস্মীভূত করা। সাপুড়ে—সাপ+ড়িয়া=সাপুড়িয়া—স্বর সঙ্গতিতে 'সাপুড়ে'—সাপ দিয়া যে খেলা দেখায়—সাপ দিয়া যে জীবিকা অর্জন করে।

অথবা, যে-কোনও পাঁচটি শব্দের দ্বারা **পাঁচটি** বাক্য রচনা কর ঃ—আতিশয্য, নিরবচ্ছিন্ন, জুগুপ্সিত, প্রতিস্পর্ধা, দুরাবগাহ, নিঃসংশয়, ঘূর্ণ্যমান, অভ্রভেদী, ইন্দ্রজাল।

উত্তর ঃ—কোন কিছুর **আতিশয্য** (বাড়াবাড়ি) ভাল নহে। আজ চারদিন নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টি চলিয়াছে। যুদ্ধে ভীরুতা প্রদর্শন ক্ষত্রিয়ের নিকট **জুগুপ্সিত**। শক্তিমানের বিরুদ্ধে দুর্বলের **প্রতিস্পর্ধা** অশোভন। সমুদ্রের দুরাবগাহ জলের কে পরিমাণ স্থির করিতে পারে? বহু অনুসন্ধানের পর অপরাধীকে নিঃসংশয়ে ধরিতে পারা গেল। অকূল সমুদ্রের ঝড়ে যে তরী **ঘূর্ণ্যমাণ** তাহাকে কে রক্ষা করিবে! শত্রুকে শিক্ষা দিবার জন্য হিমালয়ের **অভ্রভেদী** শৃঙ্গে ভারতের বীর সৈনিকগণকে আরোহণ করিতে হইয়াছে। তাজমহলকে শুধু সমাধি মন্দির না বলিয়া মর্মরের **ইন্দ্রজালও** বলা চলে।

বিবিধ প্রশ্নমালা ৩

১। এমন **একটি** বাক্য রচনা কর যাহাতে সমস্ত কারক প্রয়োগ করা হইয়াছে। রচিত বাক্যে কোন্ কারকে কোন্ বিভক্তি হইয়াছে দেখাইয়া দাও। সম্বন্ধ ও সম্বোধন কারক কি না, আলোচনা কর। **উত্তর ঃ**—রাম সিংহাসনে বসিয়া স্বীয় ধনাগার হইতে ধন লইয়া নিজ হাত দিয়া দরিদ্রদিগকে দান করিলেন। রাম—কর্তৃকারকে শূন্য প্রথমা বিভক্তি—'দান করিলেন' —ক্রিয়ার কর্তা। ধন—কর্মে দ্বিতীয়া শূন্য বিভক্তি। হাতদিয়া—করণকারকে তৃতীয়া বিভক্তি। দরিদ্রদিগকে- সম্প্রদানে চতুর্থী। ধনাগার হইতে—অপাদানে পঞ্চমী। সিংহাসনে—অধিকরণে সপ্তমী।

সম্বন্ধ—কারক নহে, কেন না ক্রিয়ার সহিত ইহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকে না। "রামের পুত্র বাড়ি যায়।" ক্রিয়া 'যায়' পদের সহিত 'পুত্র'—পদের সাক্ষাৎ কর্তৃত্বসম্বন্ধ রহিয়াছে—রামের পদের সহিত ক্রিয়ার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। 'রামের'—পদটি পুত্র পদটির সহিত জন্যজনক সম্বন্ধে যুক্ত। 'রামের' পদটির সহিত ক্রিয়া 'যায়' পদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকিলেও পরম্পরা সম্বন্ধ রহিয়াছে—তবু সম্বন্ধ কারক নহে কেন না কারক সংজ্ঞাদ্বারা মাত্র কর্তা প্রভৃতি এই ছয়টিকে বুঝায়—(কর্তা কর্ম করণ সম্প্রদান অপাদান অধিকরণ)।

সম্বোধনপদ—কারক নহে—উহা মূল বাক্যের ক্রিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন পদ।

হে রাম' যাও—হে রাম বলিয়া রামের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে মাত্র।'যাও' ক্রিয়ার সহিত 'তুমি'—এই উহ্য কর্তার সম্বন্ধ।

অথবা

"গ্রামে লোকে এক মনে পূজয়ে দেবতাগণে
খড়্গে ছাগে কাটে লোকহিতে।"

উপরি-উদ্ধৃত কবিতাংশে 'এ' বিভক্তির ব্যাপক প্রয়োগে গঠিত পদসমূহের **পরিচয়** দাও। অপাদান কারকে 'এ' বিভক্তির প্রয়োগ দেখাইয়া একটি বাক্য রচনা কর।

গ্রামে—অধিকরণে 'এ' বিভক্তি। **লোকে**—কর্তৃকারকে প্রথমা 'এ' বিভক্তি। **এক মনে**—ক্রিয়া বিশেষণে তৃতীয়া 'এ' বিভক্তি। **দেবতাগণে**—কর্মে দ্বিতীয়া 'এ' বিভক্তি। **খড়্গে**—করণে তৃতীয়া 'এ' বিভক্তি। **লোকহিতে** (—লোকহিতের জন্য) নিমিত্তার্থে চতুর্থী বিভক্তি। (অপাদান কারকে 'এ' বিভক্তি—লোকমুখে শুনি কথা চিন্তিত রাজন।—কাশীরাম দাস। রাজা লোক-**মুখে** (=লোকের মুখ হইতে) এই কথা শুনিতে পাইলেন)।

২। উদাহরণ-সহকারে **যে কোনও পাঁচটি** পরিভাষার ব্যাখ্যা কর ঃ—নামধাতু; প্রাকৃতজ শব্দ; মিশ্রবাক্য; স্বাভাবিক ণত্ব; সর্বনামীয় বিশেষণ; নিপাতনে সন্ধি; ব্যতিহার বহুব্রীহি

এবং অনন্বয়ী অব্যয়। **উত্তর :—নামধাতু**—নামপদের উত্তর প্রত্যয়যোগে উহা ধাতুতে পরিণত হইলে উহাকে **নামধাতু** বলে। পদ্যে নামধাতুর বহুল ব্যবহার দেখা যায়।—প্রভাতিল, নীরবিলা (নীরব হইল), দানিলা (দান করিল)—ই প্রত্যয় যোগ (দান+ই=দানি ধাতু—নামধাতু) —এইরূপ—আয় প্রত্যয়যোগে—ঘনায়, বিষায়, ফেনায় ('ফেনাইয়া উঠে')। **প্রাকৃতজ শব্দ—** প্রাকৃত ভাষা হইতে যে সকল শব্দ ধ্বনিপরিবর্তনের মধ্য দিয়া বাঙ্‌লা ভাষায় আসিয়াছে তাহাদের নাম প্রাকৃতজ্জ শব্দ। যথা—সংস্কৃত 'অদ্য' প্রাকৃত 'অজ্জ' হইতে বাঙ্‌লায় 'আজ' মৎস্য—'মচ্ছ' হইতে 'মাছ'। কর্ম—কম্ম হইতে 'কাম'। **মিশ্রবাক্য (জটিলবাক্য)**—যে বাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের অথবা তাহাদের যে কোন একটিব উপর নির্ভবশীল খণ্ডবাক্য থাকে তাহাকে **মিশ্র বা জটিল বাক্য** বলে। যথা—'কে না জানে ধার্মিকের কখনও পরাজয় নাই।' 'ধার্মিকের কখনও পরাজয় নাই'—ইহা একটি খণ্ড বাক্য—ইহা 'কে না জানে'—এই মুখ্য বাক্যের অধীন বিশেষ্যার্থক খণ্ডবাক্য এই খণ্ডবাক্যে জানে—এই মুখ্য ক্রিয়াব অধীন—ইহা ইহার কর্ম [পাঠক্রমে জটিলবাক্য নাম ব্যবহার করা হইয়াছে] **স্বাভাবিক ণত্ব**—ঋ-ব ষ-কারেব উপস্থিতি ব্যতিরেকে যে ণত্ব হয় উহাকে **স্বাভাবিক ণত্ব** বলে। ইহাতে কোন পূর্বনিমিত্তের আবশ্যক হয় না। যথা—বাণ, বীণা, বেণু, কঙ্কণ, লবণ।

সর্বনামীয় বিশেষণ—সর্বনাম হইতে উৎপন্ন বা সর্বনাম যখন অপব পদকে বিশেষিত করে তখন উহাকে **সর্বনামীয় বিশেষণ বলে। বিশ্বজন, সর্বলোক, আপন** হাত, **যে** লোক, **সেই** দেশ **মদীয়** পুত্র ইত্যাদি। **নিপাতনে সন্ধি**—কোন বিশেষ পদের সাধুত্বের জন্য যেখানে ব্যাকরণের কোন বিধি পাওয়া যায না অথচ পদটিকে সাধু বলিযা স্বীকাব কবা হয তখন উহাকে নিপাতন সিদ্ধ বলা হয়।

সন্ধি বিষয়ে এইরূপ পদ পাইলে তাহাতে নিপাতনে সন্ধি হইয়াছে বলা হয। যথা—সীমন্ত (সীমন্‌+অন্ত), কুলটা (কুল+অটা—কুলাটা নহে), পতঞ্জলি (পতৎ+অঞ্জলি)।

ব্যতিহার বহুব্রীহি—পরস্পর একজাতীয় ক্রিয়া সম্পন্ন কবিলে সপ্তম্যন্ত অথবা তৃতীয়ান্ত পদের বহুব্রীহি সমাস হয। ইহাতে ক্রিয়া বিনিময থাকায ইহাব নাম **ব্যতিহার বহুব্রীহি**। যথা—হাতাহাতি (পরস্পরেব মধ্যে হাত দিযা যুদ্ধ) কানাকানি (কানে কানে পরস্পর মধ্যে কথা), ঘুষাঘুষি, মারামারি।

অনন্বয়ী অব্যয়—বেদনা আনন্দ প্রভৃতি মনের ভাব-প্রকাশক কতকগুলি অব্যয যাহাদের মূল বাক্যের সহিত অন্বয় থাকে না তাহাদিগকে **অনন্বয়ী অব্যয়** বলে। তা **বেশ বেশ!** তুমি বাড়ি যাও। **সাবাস্‌ সাবাস্‌!** খেলোয়াড়গণ তোমরা জিতেছ।

অথবা

রূপক কর্মধারয়, উপমান কর্মধারয় এবং উপমিত কর্মধারয়েব পার্থক্য উদাহরণ দিযা বুঝাইয়া দাও। মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ও মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাসেব পার্থক্য উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও। **উত্তর :—রূপক কর্মধারয় ও উপমান কর্মধারয়**—উপমানবাচক পদের সহিত সামান্য ধর্মবাচক শব্দের যে কর্মধাবয সমাস হয তাহাকে **উপমান কর্মধারয়** বলে। ঘনশ্যাম (শ্রীকৃষ্ণ)—ইহাতে উপমানবাচক পদ যথা—ঘন (মেঘ) সামান্য ধর্মবাচক পদ—'শ্যাম' (কালো) উপস্থিত আছে—মেঘ কালো শ্রীকৃষ্ণও কালো সুতরাং 'শ্যামত্ব' দুইয়ের মধ্যেই আছে। উপমিত পদ শ্রীকৃষ্ণ—সমাসের মধ্যে নাই।

কিন্তু রূপক কর্মধারয় সমাসে উপমানবাচক পদ ও উপমিতবাচক পদ থাকে—সামান্য ধর্মবাচক পদ উপস্থিত থাকে না এবং উপমান ও উপমিত পদের অভেদ কল্পনা করা হয়—শোকবহ্নি (=শোকের আগুন) 'শোক'—উপমিত পদ কেননা তাহারই বর্ণনা করা হইতেছে—উপমানবাচক পদ 'বহ্নি'—এই দুইয়ে মিলিয়া সমাস হইয়াছে—এবং যাহা শোক তাহাই অগ্নি-

রূপে কল্পিত হইয়াছে।—'যাহা শোক তাহাই বহ্নি—ব্যাসবাক্য; অথবা শোকরূপ বহ্নি—সামান্য ধর্ম-দহন করিবার শক্তি যাহা উভয়ের মধ্যে আছে তাহার সূচক কোন পদ সমাসে নাই। **মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ও মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি**—কর্মধারয় সমাসে উত্তরপদের অর্থের প্রাধান্য থাকে এবং পূর্বপদ সাধারণতঃ বিশেষণ হইয়া থাকে। বহুব্রীহি সমাসে সমস্যমান পদের অর্থের প্রাধান্য না থাকায় অন্য পদের অর্থের প্রাধান্য হয়।

মধ্যপদলোপী বহুব্রীহিতে বহুব্রীহির সকল লক্ষণই বর্তমান, তবে (১) উপমান পূর্বপদে থাকে বা সপ্তম্যন্ত পদ পূর্বে থাকে এবং তাহার পরপদের লোপ হয়। (২) প্রাদি (প্র পরা প্রভৃতি উপসর্গ পদের) উত্তর ধাতুজ পদের সহিত পরবর্তী পদের বহুব্রীহি সমাস হয় এবং ধাতুজ পদের লোপ হয়।

মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ে সাকাঙ্ক্ষ যে কোন মধ্যপদের লোপ হইতে পারে। **মধ্যপদলোপী কর্মধারয়**—দেবপূজক ব্রাহ্মণ—দেবব্রাহ্মণ, পলমিশ্রিত অন্ন-পলান্ন। **মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি**—উষ্ট্রের মুখের মত মুখ যাহার—উষ্ট্রমুখ। কণ্ঠে স্থিত কাল (কালকূট অথবা কালো চিহ্ন) যাহার কণ্ঠেকাল (শিব)। (২) প্রপতিত হইয়াছে পর্ণ যাহা হইতে প্রপর্ণ (বৃক্ষ), নির্গত হইয়াছে লজ্জা যাহার (যাহার লজ্জাসরম চলিয়া গিয়াছে) নির্লজ্জ।

৩। **যে কোন পাঁচটি** শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লিখঃ—

শুশ্রূষা, ভার্যা, কৃত্য, রোরুদ্যমান, মাতৃকা, কাটারি এবং বড়াই।

উত্তরঃ—শুশ্রূষা—√শ্রু+সন্+অ (ভাববাচ্যে)+আ (স্ত্রীলিঙ্গে) (ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ শুনিবার ইচ্ছা—অর্থের প্রসারে 'সেবা')। ভার্যা—√ভৃ+ণ্যৎ (য) কর্মবাচ্যে—ভরণ (পোষণ) করিবার যোগ্যা—**পত্নী**। **কৃত্য**—√কৃ+ক্যপ্ (কর্মবাচ্যে)—যাহা করা উচিত—কর্তব্য কার্য। **রোরুদ্যমান**—√রুদ্+যঙ্+শানচ (কর্তৃবাচ্যে) পুনঃ পুনঃ কাঁদিতেছে যে। **মাতৃকা**—মাতৃ+ক (স্বার্থে) যিনি মাতা তিনিই মাতৃকা। **কাটারি**—√কাট্ (বাঙ্লা ধাতু)+আরি (করণবাচ্যে—যাহা দিয়া কাটা যায়। **বড়াই**—বড় (বিশেষণ শব্দ)+আই (ভাবার্থে) বড়র ভাব—নিজেকে বড় বলিয়া দেখা—অহংকার।

অথবা, নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলির **যে কোনও পাঁচটি** শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, কারণ দেখাইয়া বিচার করঃ—নিরপরাধিনী, সম্রাজ্ঞী, রুচিবান্, উৎকর্ষতা, প্রাঙ্গন, বিদ্যুতালোক, সত্ত্বা এবং প্রতিযোগীতা। **নিরপরাধিনী**—অশুদ্ধ; নির্ (নাই) অপরাধ যাহার—নিরপরাধ (বহুব্রীহি) স্ত্রীলিঙ্গে—আ প্রত্যয়যোগে 'নিরপরাধা'—শুদ্ধ। এখানে বহুব্রীহি সমাস দ্বারাই অভিলষিত অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং অস্ত্যর্থক-ইন্-প্রত্যয় অনাবশ্যক। **সম্রাজ্ঞী**—সংস্কৃত 'সম্রাজ্' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে কোন পরিবর্তন হয় না।—তবে বাঙ্লা ভাষায় 'সম্রাজ্ঞী' পদের বহুস্থানে শিষ্ট প্রয়োগ থাকায় ইহা শুদ্ধ। সম্যক্ রাজ্ঞী—সম্রাজ্ঞী (প্রাদিতৎপুরুষ)—এইরূপে ইহার সমর্থন চলে। **রুচিবান্—অশুদ্ধ**। 'রুচিমান্'—শুদ্ধ। রুচি+মতুপ্=রুচিমৎ হইতে 'রুচিমান্'—ই-কারের পর মতুপের 'ম' স্থানে 'ব' হয় না—সুতরাং রুচিবান্ অশুদ্ধ পদ। **উৎকর্ষতা—অশুদ্ধ**। শুদ্ধ 'উৎকর্ষ'—উৎকর্ষ (উৎ+কৃষ্+ঘঞ্) দ্বারাই অভিলষিত অর্থ প্রকাশ পায়—সুতরাং উহার উত্তর ভাবার্থক 'তা'—প্রত্যয় অনাবশ্যক।

প্রাঙ্গন—পূর্বপদের উপসর্গের র-কারের পর কৃৎপ্রত্যয়ের স্বরবর্ণের পর 'ন' থাকিলে মূর্ধন্য হয়। এই নিয়মে মূর্ধন্য ণ-কার হওয়া উচিত, কিন্তু ইহা সার্বত্রিক নহে। ক্ষুভ্নাদি পদে 'ন'-কল্প হয়—এই নিয়মে 'ন'-কার সমর্থনযোগ্য। **বিদ্যুতালোক**—ব্যাকরণগত অশুদ্ধি রহিয়াছে। বিদ্যুৎ+আলোক=বিদ্যুদালোক হইবে। সন্ধিতে 'স্বরবর্ণ পরে থাকিলে বর্গের প্রথম বর্ণস্থানে তৃতীয় বর্ণ হয়—এই নিয়ম এখানে প্রযোজ্য। **সত্ত্বা**—অশুদ্ধ, কারণ সৎ+তা

(ভাবার্থে) 'সত্তা' হয় অথবা সৎ+ত্ব=সত্ত্ব। **প্রতিযোগীতা**—অশুদ্ধ। শুদ্ধরূপ—'প্রতিযোগিতা' --প্রতিযোগিন্+তা (ভাবার্থে)—ন্-কার লুপ্ত হইয়াছে প্রত্যয়ের পূর্বে।

বিবিধ প্রশ্নমালা ৪

১। শব্দ, পদ ও বিভক্তি কাহাকে বলে এবং ইহাদের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক কি? **উত্তর**--অর্থবিশিষ্ট বর্ণসমষ্টি বা একক বর্ণকে শব্দ বলে। শব্দের উত্তর বিভক্তি যোগ করিলে উহা হয় পদ। যাঁহাদ্বারা সংখ্যা ও কারকের বোধ জন্মে তাহাকে বিভক্তি বলে। ব্-আ-ল্-অ-ক্ (অ)--এই ছয়টি বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ ব্যবহার করিলে তাহাদের কোন অর্থ হয় না। (নিরর্থক এই পাঁচটি বর্ণকে একত্র পর পর উচ্চারণ করিলে 'বালক' শব্দ (বালক্) হয়--ইহার অর্থ আমরা বুঝি। ইহার উত্তর -'রা' বিভক্তি যোগ করিলে ইহা হয় একটি পদ--ইহাদ্বারা 'বালকে'র সংখ্যা বুঝায় এবং ইহা কর্তৃকারকরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। 'ও'—একটি একক বর্ণ—কিন্তু একটি বর্ণেই একটি অর্থবিশিষ্ট শব্দ হইয়াছে। বিভক্তি—রা যোগ করিলে উহার সংখ্যার আর কারকের বোধ হয়। যথা 'ওরা কাজ করে।'

অথবা, √হ ধাতু অথবা √শুন ধাতুর পুরাঘটিত বর্তমান, ঘটমান অতীত বর্তমান অনুজ্ঞা এবং ঘটমান ভবিষ্যতের প্রথম পুরুষের সাধু ও চলিত রূপ লিখ। বাঙ্লা ভাষায় ব্যবহৃত সনন্ত ও যঙন্ত ধাতু হইতে নিষ্পন্ন শব্দের উদাহরণ দাও। **নিজে চেষ্টা কর।**

উঃ—সনন্ত শব্দ—শুশ্রূষা, মুমূর্ষু, চিকিৎসা জিগীষা। **যঙন্ত শব্দ**—রোরুদ্যমান, লেলিহান, সরীসৃপ।

২। উদাহরণ-সহকারে **যে কোনও পাঁচটি** পরিভাষার ব্যাখ্যা কর: প্রযোজ্যকর্তা; উপপদতৎপুরুষ; ভাববাচ্য উষ্মবর্ণ; ধ্বন্যাত্মক শব্দ স্বরভক্তি দেশী শব্দ এবং বিধেয় বিশেষণ।

উঃ—প্রযোজ্য কর্তা—কর্তা যাহাকে কাজের প্রেরণা দিয়া কাজ করান তাহার নাম প্রযোজ্য **কর্তা।** প্রভু **ভৃত্যকে দিয়া** কাজ করান। **উপপদ তৎপুরুষ**—কৃদন্ত পদের সহিত উপপদের যে নিত্য তৎপুরুষ সমাস হয় তাহাকে **উপপদ তৎপুরুষ** বলে। যেমন কুম্ভকার, ভাস্কর, **কানমলা** (সর্দার)-কান মলে যে (খাঁটী বাঙলা উপপদ তৎপুরুষ)। **ভাববাচ্যে**-কোন বাক্যে ক্রিয়ার অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হইলে **ভাববাচ্য** হয়। আমার থাকা হয়, আমার যাওয়া হয় 'আমার নাওয়া-খাওয়া এখনও হয় নাই'। **উষ্মবর্ণ**—শ ষ স হ্—ইহাদিগকে **উষ্মবর্ণ** বলে। **ধ্বন্যাত্মক শব্দ**—অনুকরণধ্বনিদ্বারা গঠিত অর্থবোধক শব্দকে **ধ্বন্যাত্মক শব্দ** বলে। যথা—ঠং ঠং (কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ) কচ্ কচ্ (শশা খাইবার শব্দ) কিচির কিচির (পাখীর শব্দ) ইত্যাদি। **স্বরভক্তি**—উচ্চারণের সুবিধার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে স্বরধ্বনি প্রবেশ করাইয়া দেওয়ার নাম **স্বরভক্তি।** চন্দ্র—চন্দর, মূর্তি—মূরতি, জন্ম—জনম ইত্যাদি। 'জন্ম' শব্দের ন্ ও ম-কারের মধ্যে 'অ' বর্ণ প্রবেশ করাইয়া দেওয়ায় 'অ'-কার স্বরভক্তি। **দেশী শব্দ**--বাঙ্লা ভাষার যে সকল শব্দের মূল সংস্কৃত বা বিদেশী ভাষায় অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না তাহাদিগকে **দেশী শব্দ** বলে। যথা—ঢেঁকি, কুলা, চাঙ্গা, ঝড় ইত্যাদি। **বিধেয় বিশেষণ**—বাক্যের বিধেয়াংশে যে বিশেষণ পদের ব্যবহার হয় তাহাকে **বিধেয় বিশেষণ** বলে। যথা—পাখিটি বেশ **সুন্দর,** ছেলেটি এখন **ভাল** হইয়াছে।

অথবা, লঘু ও দরিদ্র, এই দুইটি বিশেষণ পদের প্রত্যেকটির সহিত বিভিন্ন তদ্ধিত প্রত্যয় যোগ করিয়া তিনটি করিয়া বিশেষ্য পদ, এবং দর্শন ও ব্যবহার, এই দুইটি বিশেষ্য পদের প্রত্যেকটির সহিত কৃৎ-প্রত্যয় এবং তদ্ধিত উভয় প্রকারের প্রত্যয় যোগ করিয়া একটি করিয়া বিশেষণ পদ গঠন কর।

লঘু—লঘুত্ব, লঘুতা, লঘিমা, লাঘব। দরিদ্র—দরিদ্রতা, দারিদ্র, দরিদ্রত্ব। দৃষ্ট, দার্শনিক—দর্শন। ব্যবহৃত—ব্যবহারিক, ব্যবহার।

৩। ব্যাসবাক্য-সহকারে যে কোনও পাঁচটির সমাস বল ঃ—গৃহাগত; গাছপাকা; বধূবর; গৌরাঙ্গ; ছাগদুগ্ধ; সস্ত্রীক; কোলাকুলি এবং খেচর।

উত্তর ঃ—গৃহাগত—গৃহে আগত (সপ্তমী তৎপুরুষ)। **গাছপাকা**—গাছে পাকা (সপ্তমী তৎপুরুষ)। **বধূবর**—(১) বধূ সহিত বর (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। (২) বধূ এবং বর —তাহাদের সমাহার (সমাহার দ্বন্দ্ব সমাস)। **গৌরাঙ্গ—গৌর** হইয়াছে অঙ্গ যাহার (বহুব্রীহি)। **ছাগদুগ্ধ**—ছাগীর দুগ্ধ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। **সস্ত্রীক**—স্ত্রীর সহিত বর্তমান (তুল্যযোগে বহুব্রীহি)। **কোলাকুলি**—পরস্পর কোল বিনিময় (একে অন্যকে কোল দেওয়া) (ব্যতিহার বহুব্রীহি)। **খেচর**—খে (আকাশে) চরে যে (অলুক্ উপপদ তৎপুরুষ সমাস)।

অথবা, যে কোনও পাঁচটির সন্ধিবিচ্ছেদ কর ঃ—স্বাগত; নীরন্ধ্র; উচ্ছ্বাস; শীতার্ত; নবোঢ়া; অন্ত্যেষ্টি, শুদ্ধোদন এবং যৎপরোনাস্তি। **উঃ**—স্বাগত—সু+আগত। নীরন্ধ্র—নিঃ+রন্ধ্র। উচ্ছ্বাস—উৎ+শ্বাস। শীতার্ত—শীত+ঋত। নবোঢ়া—নব+ঊঢা। অন্ত্যেষ্টি—অন্ত্য+ইষ্টি। শুদ্ধোদন—শুদ্ধ+ওদন (নিপাতনে)। যৎপরোনাস্তি—যদ্+পরঃ+ন+অস্তি।

বিবিধ প্রশ্নমালা—৫

১। (ক) কর্তৃবাচ্যে একটি বাক্য রচনা করিয়া উহাকে কর্মবাচ্যে পরিবর্তিত কর এবং বাক্যদ্বয়ের সাহায্যে কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্যের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও। ভাববাচ্যের প্রয়োগটিও উদাহরণযোগে বুঝাইয়া দাও। **উঃ**—আমি চন্দ্র দেখি (কর্তৃবাচ্য)। আমাকর্তৃক চন্দ্র দৃষ্ট হয়। (কর্মবাচ্য)। কর্তৃবাচ্যের বাক্যে কর্তার প্রাধান্য থাকে এবং ক্রিয়া কর্তাকে অনুসরণ করে। পূর্বোক্ত প্রথম বাক্যে 'আমি' পদ 'দেখি' ক্রিয়ার কর্তা—এই ক্রিয়া উত্তমপুরুষ এক বচনের ক্রিয়া 'আমি'—পদের পুরুষ বচন বিভক্তিকে অনুসরণ করে কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যের ক্রিয়া (দৃষ্ট হয়) কর্তাকে ('আমাকর্তৃক') অনুসরণ না করিয়া কর্মপদ 'চন্দ্র'কে অনুসরণ করে। এখানে বাক্যে কর্মপদের প্রাধান্য—তাই ইহা কর্মবাচ্য।

ভাববাচ্যের বাক্যে ক্রিয়ার (বা ভাবের) প্রাধান্য থাকে বলিয়া উহাকে ভাববাচ্য বলা হয়। ভাববাচ্যে কর্ম থাকে না—অকর্মক ক্রিয়ারই ভাববাচ্য হয়। 'আমি হাসি' (কর্তৃবাচ্য), 'আমার হাসা হয়' (ভাববাচ্য)—এখানকার কর্তার সহিত ক্রিয়ার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই—আর ক্রিয়াও কৃদন্ত ভাবপদের সহিত যুক্ত থাকে—'হাসা হয়'।

অথবা, সরল ও জটিল বাক্য-সংবলিত একটি যৌগিক বাক্য রচনা করিয়া তাহার অন্তর্গত সরল ও জটিল বাক্যের অংশগুলি দেখাইয়া দাও। এই ত্রিবিধ বাক্যের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও।

(খ) সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ—উদ্ধৃত, ণিজন্ত, গোষ্পদ, পুরোহিত, প্রাতরাশ, স্বস্তি, রাজর্ষি। **উঃ**—উৎ+হৃত ণিচ্+অন্ত, গো+পদ, পুরঃ+হিত, প্রাতঃ+আশ, সু+অস্তি, রাজ (ন্)+ঋষি। (রাজা+ঋষি লিখিলে ভুল হইবে)।

অথবা, সমাস বল ঃ—দেশান্তর, কাঁচামিঠে, শরণাপন্ন, সরসিজ, শোকানল, বিয়েপাগলা, বিপত্নীক।

উঃ—অন্যদেশ (নিত্যতৎপুরুষ সমাস)। কাঁচা এবং মিঠে (কর্মধারয়)। শরণকে আপন্ন (দ্বিতীয়া তৎপুরুষ)। সরসি (=সরোবরে) জন্মগ্রহণ করে যে (উপপদ তৎপুরুষ সমাস—সপ্তমী বিভক্তির অলুক্)। শোক অনলের মতো (উপমিত কর্মধারয়) অথবা শোকরূপ অনল (রূপক কর্মধারয়)। বিয়ের জন্য পাগলা (চতুর্থী তৎপুরুষ)। বিগতা হইয়াছে পত্নী যাহার (বহুব্রীহি)।

২। উদাহরণ সহকারে ব্যাখ্যা কর ঃ—যৌগিক ক্রিয়া; অর্ধতৎসম শব্দ; বিপ্রকর্ষ; বিধেয় বিশেষণ; ঘটমান অতীত; প্রযোজ্য কর্তা; ঘোষবর্ণ; বিভক্তিশূন্য অধিকরণ কারকের পদ। **(উত্তর ঃ—বই দেখ)**

অথবা, নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলি শুদ্ধ কি কি অশুদ্ধ তাহা কারণ দেখাইয়া বল:—
সর্ব সত্ব সংরক্ষিত; প্রাক্-রবীন্দ্র; ১৯৪৪ সালের ষষ্ঠদশ আইনানুসারে; গুণীগণ; তড়িতাহত; শিরোশোভা; গায়কী; বক্ষদেশ।

উত্তর—সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত—শুদ্ধ। সর্ব যে স্বত্ব (কর্মধারয়) সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত হইয়াছে যাহার (বহুব্রীহি) পদ হওয়া উচিত 'সংরক্ষিত সর্বস্বত্ব'—কিন্তু -ক্ত- প্রত্যয়ান্ত বিশেষণের (সংরক্ষিত) পরনিপাতে 'সর্বস্বত্বসংরক্ষিত' পদের শুদ্ধতা সমর্থন করা চলে। **প্রাক্‌রবীন্দ্র—**অশুদ্ধ। শুদ্ধ পদ হইবে 'প্রাগ্‌ রবীন্দ্র'—সন্ধিতে র পরে থাকায় পূর্ববর্তী পদের অন্তস্থিত প্রথমবর্ণ (ক্) স্থানে তৃতীয় বর্ণ (গ্) হইবে। **'ষোড়শ আইন-অনুসারে'—**শুদ্ধ। ষট্ দশ ষোড়শ হয় 'ষষ্ঠদশ' হয় না। আইন পদ বিদেশী শব্দ—ইহার সহিত তৎসম পদের সন্ধি করা চলে না—হাইফেন চিহ্ন দিয়া পদ দুইটিকে পৃথক দেখাইতে হইবে। **গুণীগণ—**গুণিগণ (শুদ্ধ)। পূর্বপদের গুণিন্ শব্দের অন্ত্য ন্‌কার সমাসে লুপ্ত হইয়াছে। **তড়িতাহত—**তড়িৎ+আহত='তড়িদাহত'—শুদ্ধ। পদের অন্তস্থিত প্রথমবর্ণ স্থানে তৃতীয় বর্ণ হইবে (দ্) কারণ স্বরবর্ণ পরে আছে: **শিরোশোভা—**শিরঃ+শোভা শিরঃশোভা—শুদ্ধ। শ-কার পরে আছে—এখানে বাঙলার বিসর্গের কোন পরিবর্তন হইবে না। **গায়কী—**শুদ্ধ পদ 'গায়িকা'। গায়ক+আ (স্ত্রীলিঙ্গে)। **বক্ষদেশ—**শুদ্ধ পদ **বক্ষোদেশ**। বক্ষঃ (স্)+দেশ—সন্ধিতে বিসর্গস্থানে 'ও' কার। (সন্ধিসূত্র দেখ)

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে বিশেষ্যক্ষেত্রে বিশেষণ এবং বিশেষণক্ষেত্রে বিশেষ্য পদ গঠন কর:—নিরস্ত, ক্ষীণ, উদ্বেগ, ভাত মহৎ, গাঁ, বিচিত্র।

উত্তর:—

বিশেষ্য	**বিশেষণ**	**বিশেষ্য**	**বিশেষণ**
নিরসন	নিরস্ত	ভাত	ভেতো
ক্ষয়, ক্ষীণতা	ক্ষীণ	মহত্ত্ব	মহৎ
উদ্বেগ	উদ্বিগ্ন	গাঁ	গেঁয়ো
		বৈচিত্র্য	বিচিত্র

অথবা, 'গীত' এবং 'গুরু' এই দুইটি শব্দকে বিশেষ্য ও বিশেষণ রূপে ব্যবহার করিয়া পৃথক্ পৃথক্ বাক্য রচনা কর। 'গীত' শব্দের ব্যুৎপত্তি কি? **উত্তর**—সীতা কোকিলের **গীত** শুনিয়া নিজে গান গাহিতেন (বিশেষ্য)

স্বদেশ জননীর বন্দনা গান অযুত কণ্ঠে **গীত** হইল (বিশেষণ)। গুরু (বিশেষ্য) শিষ্যের নিকট দক্ষিণার অর্থের পরিবর্তে তাহার ভক্তি চাহিলেন।

পিতার মৃত্যুতে সংসারের গুরু (বিশেষণ) কর্তব্যের ভার পুত্রের উপর পড়িল। গীত—গৈ (গান করা)+ক্ত (কর্মবাচ্যে) যাহাকে গান করা হইয়াছে।

বিবিধ প্রশ্নমালা—৬

১ (ক) প্রকৃতি, প্রত্যয় ও উপসর্গ কাহাকে বলে? উদাহরণযোগে বুঝাইয়া দাও। **উঃ**—প্রত্যয়বিহীন শব্দ বা ধাতুকে **প্রকৃতি** বলে। ভূ (ধাতু প্রকৃতি)+অপ্ (প্রত্যয়)=ভব। **বালক** (প্রকৃতি)+রা (প্রত্যয়)=বালকেরা। প্রকৃতির উত্তর যাহা বসে তাহাকে **প্রত্যয়** বলে। উক্ত উদাহরণগুলিতে অপ্, -রা হইতেছে প্রত্যয়। **অথবা,** তদ্ধিত ও কৃৎ প্রত্যয়ের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও; খাঁটি বাংলায় ও সংস্কৃত উভয়বিধ কৃৎ ও তদ্ধিতের উদাহরণ দাও। **উত্তর—খাঁটি বাঙ্‌লা কৃৎ প্রত্যয়:**

ঢাক্ (ঢাকা অর্থে ঢাক্ ধাতু)+আনি (করণবাচ্যে)=ঢাকনি। 'আনি'—খাঁটি বাঙ্‌লা কৃতের উদাহরণ।

বাঙ্‌লা তদ্ধিত—বড়+আই=বড়াই 'আই'—প্রত্যয় খাঁটি বাঙ্‌লা তদ্ধিতের উদাহরণ।

সংস্কৃত তদ্ধিত—দশরথ+ইঞ্ (অপত্যার্থে)—ইঞ্ প্রত্যয় সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়।

(খ) সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য উদাহরণযোগে বুঝাইয়া দাও। (বই দেখ)

অথবা, নিম্নলিখিত শব্দগুলি হইতে চন্দ্রবিন্দু বাদ দিলে অর্থের কিরূপ ব্যতিক্রম হয় তাহা বল :—কাঁটা, বাঁধা, গাঁথা, পাঁজি, পাঁক, এবং তাঁহার।

উঃ—কাঁটা—কণ্টক, কিন্তু কাটা—কর্তন করা। বাঁধা—যাহাকে বন্ধন করা হইয়াছে কিন্তু বাধা—প্রতিবন্ধক। গাঁথা—সূত্রাদি দ্বারা গ্রন্থন করা কিন্তু গাথা পদ্যরচনাবিশেষ। পাঁজি —পঞ্জিকা কিন্তু পাজি—খারাপ। পাঁক—কাদা, কিন্তু পাক—রন্ধন করা। তাঁহার— পূর্বোল্লিখিত কোন সম্মানিত ব্যক্তির, কিন্তু তাহার- পূর্বোল্লিখিত কোন অনাদরণীয় ব্যক্তির।

২। উদাহরণ সহকারে ব্যাখ্যা কর :—সমধাতুজ কর্ম; দেশী শব্দ; মহাপ্রাণ বর্ণ; স্বরসংগতি; ধ্বন্যাত্মক শব্দদ্বৈত; নিত্যবৃত্ত অতীত, পূরণবাচক বিশেষণ। **উঃ—স্বরসংগতি** চলতি ভাষায় (এবং কখনও কখনও সাধুভাষায়) পরবর্তী বা পূর্ববর্তী স্বরের প্রভাবে যে ধ্বনিপরিবর্তন হয় তাহাকে **স্বরসংগতি** বলে। দেশী > দিশি (পরবর্তী ঈকারের প্রভাবে পূর্ববর্তী এ-স্থানে 'ই' হইয়াছে)। মিছা > মিছে—পূর্ববর্তী ইকারের প্রভাবে পরবর্তী আ -স্থানে 'এ' হইয়াছে।

ধ্বন্যাত্মক শব্দদ্বৈত—অনুকরণ ধ্বনি দ্বারা গঠিত অর্থবোধক শব্দকে **ধ্বন্যাত্মক শব্দ** বলে। এই শ্রেণীর শব্দের দ্বিত্ব প্রয়োগ হয়। ইহারাই ধ্বন্যাত্মক শব্দদ্বৈত। যথা—মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা বাজল ঠং ঠং। লোকটা **কচ্‌কচ্** করিয়া কচি শশা খায়।

অথবা, নিম্নলিখিত শব্দগুলি শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, কারণ দেখাইয়া বল :—মহিমা-মণ্ডিত, শ্রদ্ধাষ্পদ নিরভিমানিনী দূরবস্থা, সশঙ্কিত, মন্থিত সাবধানী, দৈন্যতা। **উত্তর :— মহিমামণ্ডিত**—অশুদ্ধ। শুদ্ধপদ **"মহিমমণ্ডিত"** 'মহিমন'—সমাসের এই পূর্বপদের অন্তে ন্ কার আছে। এই নকার সমাসে লুপ্ত হইয়াছে। **শ্রদ্ধাষ্পদ**—অশুদ্ধ—শুদ্ধ পদ **"শ্রদ্ধাস্পদ"** 'আস্পদ'—শব্দে, বর্ণাগম 'স' হইয়াছে আর আকারের পর 'ষ' হয় না। **নিরভিমানিনী**— অশুদ্ধ—নির (নাই) অভিমান যাহার নিরভিমান (বহুব্রীহি স্ত্রীলিঙ্গে 'আ'যোগে '**নিরভিমানা**' শুদ্ধ। বহুব্রীহি সমাসদ্বারা অভিলষিত অর্থ প্রকাশ পাওয়ায় অস্ত্যর্থক ইন্ প্রত্যয় অনাবশ্যক—স্ত্রীলিঙ্গে দীর্ঘ ঈকারের কোন প্রশ্ন উঠে না। **দুরাবস্থা**—অশুদ্ধ—শুদ্ধ পদ **দুরবস্থা** দুর্ (দুঃ)। অবস্থা—সন্ধিতে 'দুরবস্থা'—দুর্ শব্দের অন্তে 'অ' কার না থাকায় 'আকার' সন্ধিতে লিখিলে ভুল হইবে। **সশঙ্কিত**—অশুদ্ধ। শুদ্ধপদ—**সশঙ্ক** অথবা **শঙ্কিত**। শঙ্কার সহিত বর্তমান (তুল্যযোগে বহুব্রীহি) 'সশঙ্ক' —জাতার্থে ইতচ্ প্রত্যয় অনাবশ্যক। শঙ্কা জন্মিয়াছে ইহার এই অর্থে— **শঙ্কা+ইতচ্** = 'শঙ্কিত' শুদ্ধ। **'মন্থিত'**—অশুদ্ধ। √মন্থ্+ক্ত=**মথিত** শুদ্ধ। **সাবধানী**—(১) অবধানের সহিত বর্তমান 'সাবধান' তুল্যযোগে বহুব্রীহি। ইহার উত্তর অস্ত্যর্থক—ইন্ প্রত্যয় হয় না। 'সাবধান' (২) ইহার সহিত স্বার্থে বাংলা ঈ প্রত্যয় যোগ করিলে 'সাবধানী' সমর্থন করা চলে। **দৈন্যতা—দীনতা** বা **দৈন্য** শুদ্ধ। একার্থে ভিন্নপ্রত্যয় হয় না।

৩। 'ভালো' এবং 'অজ্ঞান' এই দুইটি শব্দকে বিশেষ্য এবং বিশেষণরূপে ব্যবহার করিয়া পৃথক্ পৃথক্ বাক্য রচনা কর। অদৃষ্ট শব্দের দুইটি অর্থ বল। **উঃ**—যে লোক মরিয়া গিয়াছে তাহার ভালো (বিশেষ্য) মন্দ লইয়া তর্কাতর্কি করা উচিত নহে। বড় শহরে এখন ভাল (বিশেষণ) বাসা পাওয়া যাইতেছে না। অজ্ঞানই (বিশেষ্য) সব কিছু না বুঝিবার কারণ। অজ্ঞান (বিশেষণ) লোক অপরের অনিষ্ট করিতে পারে।

অথবা, সমাস বল :—পাপপুণ্য, প্রত্যক্ষ, ঘনশ্যাম, সুপ্তোত্থিত, বিশ্বামিত্র, বেচাকেনা, অন্তেবাসী, অপুত্রক। **উত্তর :—পাপ এবং পুণ্য** (দ্বন্দ্ব সমাস —বিপরীতার্থক পদদ্বয়ের দ্বন্দ্ব)—পাপপুণ্য। **প্রত্যক্ষ—অক্ষির** (চোখের) অভিমুখে

(অব্যয়ীভাব)। ঘনশ্যাম—ঘনের (মেঘের) মতো শ্যাম—(উপমান কর্মধারয়)। সুপ্তোত্থিত—পূর্বে সুপ্ত পরে উত্থিত—(স্নাতানুলিপ্তবৎ কর্মধারয় সমাস)। বিশ্বামিত্র—কোন একজন ঋষির নাম বুঝাইতে—বিশ্বের মিত্র (ষষ্ঠী তৎপুরুষ), নাম না বুঝাইলে "বিশ্বমিত্র" 'বিশ্বের মিত্র' (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)—অর্থ বিশ্বের বন্ধু। বেচাকেনা—বেচা এবং কেনা (দ্বন্দ্ব সমাস)। অন্তেবাসী—অন্তে (গুরুর) সমীপে, বাস করে যে (অলুক্ উপপদ তৎপুরুষ সমাস পূর্বপদের সপ্তমী বিভক্তির লোপ না হওয়ায় অলুক্ সমাস)। অপুত্রক—অ (নঞ্ হইতে)—অবিদ্যমান পুত্র যাহার (নঞ্ বহুব্রীহি বা মধ্য-পদলোপী বহুব্রীহি বলা যাইতে পারে)।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রশ্নমালা

১৯৬১

১। সংজ্ঞা লিখ ও উদাহরণ দাও:—নিপাতনে সন্ধি, যৌগিক স্বর, কর্মবাচ্য, তালব্য বর্ণ, নিত্যবৃত্ত অতীত, রূপক কর্মধারয় সমাস, অপাদান কারক।

২। সূত্র নির্দেশপূর্বক সন্ধি বিচ্ছেদ কর:-অন্বেষণ, বিদ্যুল্লেখা, নীরক্ত, উচ্ছৃঙ্খল, স্বচ্ছ, সপ্তর্ষি, পূর্যবেক্ষণ শিরশ্ছেদ, শাখাচ্ছেদ, উচ্ছেদ।

অথবা, নিম্নলিখিত শ্রেণীর ক্রিযাব দৃষ্টান্ত দেখাইয়া **চারিটি** বাক্য রচনা কর:—
(১) যৌগিক ক্রিয়া, (২) প্রযোজক ক্রিয়া, (৩) ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া, (৪) দ্বিকর্মক ক্রিয়া।

৩। ব্যাসবাক্যসহ যে-কোন চারিটির সমাস নির্ণয় কর:—ভিক্ষান্ন, অগ্নিভয়, ডাক্তারসাহেব, ল্যাঠিখেলা, ঘরমুখো, গোঁজামিল নবনীতকোমল।

অথবা, যে-কোন চারিটির সাহয্যে সার্থক বাক্য বচনা কর:—বাগে পাওয়া, চোখ টাঁটানো, ড্যাক্তারসাহেব, লাঠিখেলা, লাঠালাঠি, ঘরমুখো গোঁজামিল, নবনী, কোমল।

৪। সমাহার দ্বিগু সমাস কিংবা অধিকবণ কারক সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা কব।

১৯৬১—কম্পার্টমেণ্টাল

১। সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা কাহাকে বলে? কয়েকটি বাক্যের দৃষ্টান্ত সহযোগে উহাদের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও। **উত্তর**:— বই দেখ।

অথবা, চলিত ভাষায় পরিবর্তন কর:—

"অণুবীক্ষণ নামে .. হইয়া পড়েন। (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পাঠসংকলন, পৃ: ৯৮)।

উত্তর:—অণুবীক্ষণ নামে একরকম যন্ত্র আছে, যাতে ছোটো জিনিসকে বড়ো ক'রে দেখায়; বড়ো জিনিসকে ছোটো কবে দেখাবার জন্যে পদার্থবিদ্যা শাস্ত্রে উপায় নির্দিষ্ট থাকলেও ও উদ্দেশ্যে তৈরি করা কোন যন্ত্র আমাদের মধ্যে ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু বিদ্যা-সাগরের জীবনচরিত, বড়ো জিনিসকে ছোটো করে দেখাবার জন্যে তৈরি করা যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাঁরা খুব বড় ব'লে আমাদের কাছে পরিচিত ঐ গ্রন্থ একখানা সুমুখে ধরবামাত্র তাঁরা হঠাৎ অতিমাত্র ছোটো ছোটো হয়ে পড়েন।

অথবা, সার্থক বাক্য রচনা কর:—কড়ায়গণ্ডায়, একচোখা, অন্ধের যষ্টি, অরণ্যে রোদন কাঠের পুতুল, উত্তম মধ্যম, কলুর বলদ, শাঁখের করাত।

উত্তর:—মহাজন তাহার পাওনা **কড়ায়গণ্ডায়** বুঝিয়া লয়। **একচোখা** দৃষ্টি দিয়া কিছু দেখিলে সত্য জানা যায় না। বৃদ্ধবয়সে পিতার একমাত্র সন্তান তাহার **'অন্ধের যষ্টি'**। রক্ষক যেখানে ভক্ষক সেখানে অত্যাচারিতের বিচার প্রার্থনা **অরণ্যে রোদনে** পরিণত হয়। মির্জাফরের ইঙ্গিতে পলাশীর মাঠে সুসজ্জিত সৈন্যগণ **কাঠের পুতুল** হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সেকালে চোরধরা পড়িলে তাহাকে **উত্তম মধ্যম** দিয়া বিদায় করা হইত। সংসারে লোকে **কলুর বলদ**

হইয়া প্রভুর আজ্ঞায় খাটে। বিদেশীর নিকট স্বদেশের দোষ উদ্ঘাটন শাঁখের করাত হইলেও দেশের হিতের জন্য উহা প্রকাশ না করিয়া চুপচাপ থাকাই ভাল।

৪। সমাস প্রধানতঃ কয় প্রকার, তাহাদের নাম উল্লেখ করিয়াই প্রত্যেকটির উদাহরণ দাও। **উত্তর**ঃ—পৃঃ ৬৭-৬৮ দেখ [১ম খণ্ড]।

অথবা, শুদ্ধ করিয়া লিখ ও সংশোধনের যুক্তি দেখাওঃ—

নিরপরাধী—নিরপরাধ-শুদ্ধ। নির্ (নাই) অপরাধ যাহার বহুব্রীহি সমাসদ্বারাই **অর্থ** বোধ হওয়ায় অস্ত্যর্থক -'ইন্' প্রত্যয় অনাবশ্যক। **কল্যাণীয়াষু—কল্যাণীয়াসু শুদ্ধ**, আকারের পর প্রত্যয়ের দন্ত্য 'স'—কারের পরিবর্তন হয় না। **অপকর্ষতা—অপকর্ষ শুদ্ধ**। স্বার্থিক প্রত্যয় ছাড়া একার্থে দুই প্রত্যয় হয় না। অপ+কৃষ্ (ধাতু) ভাবে ঘঞ্। ভাবার্থে 'তা' প্রত্যয় অনাবশ্যক। **ভৌগলিক**-ভৌগোলিক শুদ্ধ। মূল শব্দ 'ভূগল' নহে। ভূগোল+ষ্ণিক। **মনযোগ—মনোযোগ** শুদ্ধ। মনঃ+যোগ, অকারের পরবর্তী বিসর্গের পর 'য' থাকায় বিসর্গ স্থানে 'ও'কার হইয়াছে। **মহত্ব**—'মহত্ত্ব' শুদ্ধ মহৎ+ত্ব এখানে ত্ দুইটি আছে। **মৃয়মান—ম্রিয়মাণ** শুদ্ধ—র-কারে (ম্র। ই-ম্রি) পর স্বরবর্ণ, 'য' পবর্গ, (ম) ব্যবধান থাকায় একপদে 'ন'—স্থানে 'ণ' হইবে। **অপরাহ্ন**—অপরাহ্ণ—এখানে নকার মূর্ধন্য হইবে। এখানে পদ দুইটি 'অপর' এবং অহন্ (অহ্ন) অকারান্ত পূর্বপদের রকারের পরস্থিত 'অহ্ন'—**পদের** ন কার মূর্ধন্য হয়। **অপকর্ষতা**—'অপকর্ষ' - অপ+কৃষ্+ঘঞ্ (ভাবে) 'তা'-(**ভাবার্থে**) অনাবশ্যক।

আবশ্যকীয়—আবশ্যক—শুদ্ধ অবশ্যম্+ক (ভাবার্থে)-'আবশ্যক'—ইহার উত্তর **একই** অর্থে ঈয় প্রত্যয়ের কোন দরকার নাই, কিন্তু 'আবশ্যকীয়'—'আবশ্যক' বাঙলা ভাষায় চলিতেছে।

অথবা, উপসর্গ প্রয়োগ করিয়া পৃথক শব্দ গঠন করঃ—প্র, অভি, পরা, নির, দুর্, বি; অধি, উপ। **উত্তর**ঃ—কৃ+ঘঞ্=কার, প্রকার, বিকার, অধিকার, অপকার। **গত**—প্রগত, অভিগত, পরাগত, নির্গত, দুর্গত বিগত, অধিগত, উপগত।

অথবা, একশব্দে পরিণত করঃ

(১) খেলায় দক্ষ- খেলোয়াড়। (২) কুৎসিত আকার যাহার—কদাকার। (৩) **যাহার** জন্য কর দিতে হয় না—নিষ্কর। (৪) পান করিবার যোগ্য—পেয়, পানীয়। (৫) **প্রিয়** বাক্য বলে যে রমণী—প্রিয়ংবদা। (৬) খরচের হিসাব নাই যার—বেহিসাবী। (৭) **উড়িয়া** যাইতেছে যাহা—উড্ডীয়মান। (৮) যাহা কম্পিত হইতেছে—কম্পমান।

১৯৬২

১। নিম্নলিখিত বর্ণগুলির উচ্চারণ স্থান সম্বন্ধে টীকা লিখঃ—**ঐ**, ল, হ্, **ক্ষ**, ং, **য**, ণ, ঞ। **উত্তর**ঃ—১০-১৫ পৃষ্ঠা দেখ [১ম খণ্ড]

২। সংজ্ঞা লিখ ও উদাহরণ দাওঃ—তদ্ভব **শব্দ**—১ম খণ্ড ৪ পৃষ্ঠা দেখ। **অন্তঃস্থ বর্ণ**—১২ পৃষ্ঠা দেখ। **অনুসর্গ**—৪৬ পৃষ্ঠা দেখ। **অব্যয়ীভাব সমাস**—৬৮ পৃষ্ঠা দেখ। **ভাববাচ্য**—১১১ পৃষ্ঠা দেখ। **অনুজ্ঞা**—৫৬ পৃষ্ঠা দেখ। **বিধেয় কর্ম**—বাক্যের বিধেয়ের **পরিপূরক যে** কর্ম তাহাকে বিধেয় কর্ম বলে—রামকে **রাজা** বলিয়া সকলে জানে।

৩। সূত্র নির্দেশ করিয়া সন্ধি বিচ্ছেদ **কর**ঃ—**শীতার্ত**, **যদ্যপি**, **অধমর্ণ**, **তন্বিত**, গ্রাহ্যস্পর্শ, ব্যুৎপত্তি, বহিশ্চর, বাঙ্নিষ্পত্তি। **উত্তর**ঃ—**শীতার্ত**—শীত+ঋত (শীতদ্বারা ঋত—পীড়িত) তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাসে অকারের পর 'ঋত' থাকিলে অকার এবং **পরবর্তী** ঋকার মিলিয়া **'আর্'** হয়। **যদ্যপি**—যদি+অপি—অসমান স্বরবর্ণ পরে থাকিলে **'ই' স্থানে 'য' হয়**। **অধমর্ণ**—অধম+ঋণ, অকারের পর **'ঋ'** থাকিলে উভয়ে মিলিয়া **'অর্'** হয়। **তন্বিত**—

তৎ+হিত (১) 'হ'—পরে থাকিলে পদান্ত বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে তৃতীয় বর্ণ (এখানে দ্) হয়। বর্গের তৃতীয় বর্ণের পর 'হ' থাকিলে হ স্থানে পূর্ববর্তী বর্ণের বর্গের চতুর্থ বর্ণ হয়। অতএব 'ধ' হইল। **ত্র্যহস্পর্শ** ত্রি+অহস্পর্শ—অসমান স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ই' স্থানে 'য্' হয়। ত্র্যহঃ+স্পর্শ—বিসর্গের পরে সংযুক্ত স্প স্থ ইত্যাদি থাকিলে বিসর্গের বিকল্পে লোপ হয়।

ব্যুৎপত্তি—বি+উৎপত্তি অসমান স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ই স্থানে য' হয়। **বহিশ্চর**-বহিঃ চর বিসর্গের পর চ থাকিলে বিসর্গ স্থানে শ' হয়। **বাঙ্‌নিষ্পত্তি**—বাক্+নিষ্পত্তি। বর্গের পঞ্চম বর্ণ পরে থাকিলে প্রথম বর্ণ স্থানে বিকল্পে পঞ্চম বর্ণ হয়। নিষ্পত্তি—নিস্+পত্তি ই কারের পরবর্তী উপসর্গে স স্থানে ষ হয়। **অথবা,** পদ পরিবর্তন করিয়া বাক্য রচনা কর যেন, শ্রদ্ধা, স্নেহ সিন্ধু, গা বস, অন্ত, সমাস, বিধি, ঋষি। **উত্তর**ঃ—**যেন—যেমন—যেমন** কর্ম তেমন ফল। **শ্রদ্ধা—শ্রদ্ধেয় শ্রদ্ধেয়** সভাপতি মহাশয়ের আদেশ শুনিতে সভ্যেরা বাধ্য। **স্নেহ—স্নেহবান্‌** পিতা পুত্রকে দণ্ড দিয়া অন্তরে কষ্ট পান। **সিন্ধু—সৈন্ধব—সৈন্ধব** লবণ অনেকেই ব্যবহার করে। **গা—গেয়ো**—গেয়ো ভূত কোথাকার কথা বলিতেও জান না। **রস—রসিক** লোক সংসারে খুব বেশি নাই। **অন্ত অন্ত্য**. ব্যাকরণ শাস্ত্রে শব্দের **অন্ত্য** বর্ণের পূর্ববর্ণকে উপধা বলে। **সমাস সমস্ত**—পাড়ার **সমস্ত** লোকই দুষ্ট ছেলেটির উপর চটা। **বিধি বৈধ**—কোন **বৈধ** আন্দোলন চালাইলে কাহারো কিছু বলিবার নাই। **ঋষি—আর্য**, মহাভারত **আর্য** গ্রন্থ।

৪। অর্থ নির্দেশ করিয়া ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর—কানাই সেবাইত মিতালি জৈন মূর্ধন্য আতিথ্য, মিথ্যুক নৈয়ায়িক। **উত্তর**ঃ—কৃষ্ণ হইতে কান+আই (আদরার্থে)—**কানাই**। সেবা+আইত (সেবাকার, সেবা ব্যবসায় ইহার) **সেবাইত**। মিতা+আলি (ভাবার্থে)। জিনের উপাসক এই অর্থে জিন+অণ্ **জৈন**। মূর্ধন+য (সেখানে উৎপন্ন) **মূর্ধন্য**। অতিথির হিত—অতিথি+য্যঞ্ **আতিথ্য**। মিথ্যা বলা স্বভাব ইহার মিথ্যা+উক=**মিথ্যুক**। ন্যায় (শাস্ত্র) জানেন যিনি ন্যায়+ষ্ণিক—**নৈয়ায়িক**।

অথবা, একপদে পরিণত করঃ—(১) যাহা সহজে লঙ্ঘন করা যায় না—**দুর্লঙ্ঘ্য**। (২) যাহা জ্বল জ্বল করিতেছে—**জাজ্বল্যমান**। (৩) যাহা কোথাও নীচু কোথাও উঁচু—**নতোন্নত**। (৪) যে ডুবিয়া যাইতেছে—**নিমজ্জমান**। (৫) যাহা মাথা পাতিয়া লওয়ার যোগ্য—**শিরোধার্য**। (৬) পরের সৌভাগ্য দেখিয়া যে কাতর হয়—**পরশ্রীকাতর, মৎসরী**। (৭) যাহা পান করার অযোগ্য—**অপানীয়, অপেয়**।

১৯৬২—কম্পার্টমেণ্টাল

১। অ-কার এবং এ-কারের বিভিন্ন উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য উদাহরণসহ বুঝাইয়া দাও। **উত্তর**ঃ—**অকার** পৃঃ ১০-১১ দেখ (১ম খণ্ড) **একার** পৃঃ ১১ দেখ (১ম খণ্ড)।

অথবা, সূত্র নির্দেশপূর্বক সন্ধিবিচ্ছেদ করঃ—প্রৌঢ় দুশ্চর, ষড়যন্ত্র, ভাস্কর অহোরাত্র, উত্তমর্ণ, প্রতীক্ষা। উত্তরঃ—প্রৌঢ়—প্র+ঊঢ় প্র শব্দের পরে ঊঢ় শব্দ থাকিলে পূর্ববর্তী অ-কার ও পরবর্তী ঊ-কারে মিলিয়া 'ঔ'-কার হয়। **দুশ্চর**—দুঃ+চর—বিসর্গের পর চ কিংবা ছ থাকিলে বিসর্গ স্থানে 'শ' হয়। **ষড়যন্ত্র**—ষট্+যন্ত্র পদের অন্তস্থিত (ট-কার, বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে তৃতীয় বর্ণ হয় যদি পরে স্বরবর্ণ য র ল ব হ থাকে। **ভাস্কর** ভাঃ+কর আকারের পরবর্তী বিসর্গ স্থানে স্ক হয় (বা পরে থাকিলে)। **অহোরাত্র**—অহঃ+রাত্র 'অহঃ' শব্দের পরের বিসর্গ স্থানে ও-কার হয় যদি রাত্রি রূপ প্রভৃতি শব্দ থাকে। **উত্তমর্ণ**—উত্তম+ঋণ, অ-কারের পর ঋ থাকিলে 'অ' ও 'ঋ' মিলিয়া অর্ হয়। **প্রতীক্ষা**—

প্রতি+ঈক্ষা ই-কারের পর দীর্ঘ ঈ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া এক দীর্ঘ ঈ-কার হয়।

২। সংজ্ঞার অর্থ লিখ ও উদাহরণ দাওঃ—উপসর্গ, অনুসর্গ যৌগিক ক্রিয়া, বিধেয় কর্ম, প্রযোজ্য কর্তা স্বরভক্তি, অর্ধ-তৎসম। **উত্তরঃ—অনুসর্গ**—পৃঃ ৪৬ দেখ (১ম খণ্ড)। যৌগিক ক্রিয়া—পৃঃ ৫৫ দেখ (১ম খণ্ড)। **বিধেয় কর্ম**—বিধেয়ের পরিপূরক কর্ম বিধেয় কর্ম। তাঁহাকে তোমার **গুরু** মনে করা উচিত। **প্রযোজ্য কর্তা**—৪০ পৃঃ দেখ। **স্বরভক্তি**—১৪ পৃঃ দেখ। **অর্ধ-তৎসম**—৪ পৃঃ দেখ।'

অথবা, নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাওঃ—(ক) রামলালের বয়স কম ছিল কিন্তু দুষ্ট-বুদ্ধি কম ছিল না (সরলবাক্যে পরিবর্তিত কর)। (খ) শাদা মেঘে বৃষ্টি দেয় না। এ কলমে লেখা যায় না (মেঘে ও কলমে—ইহাদের কারক নির্ণয় কর)। (গ) লক্ষ্য করার যোগ্য; ভোজন করার ইচ্ছা (একপদে পরিণত কর)। (ঘ) সুন্দর সুন্দর বই; জ্বর জ্বর ভাব (সুন্দর ও জ্বর শব্দের কি কারণে দ্বিরুক্তি হইয়াছে, আলোচনা কর)। (ঙ) প্রমাণ, প্রধান এখানে ণ ও ন হইবার কারণ দেখাও। (চ) পুস্তিকা, অরণ্যানী (স্ত্রী-প্রত্যয়ের সার্থকতা বুঝাইয়া বল)। **উত্তর**ঃ—(ক) রামলালের বয়স কম থাকিলেও দুষ্টবুদ্ধি কম ছিল না। (খ) মেঘে—কর্তায় 'এ' (প্রথমা বিভক্তি)। কলমে—করণে তৃতীয়া (এ বিভক্তি)। (গ) **লক্ষণীয়, বুভুক্ষা**। (ঘ) বহুবচনার্থে বিশেষণের দ্বিরুক্তি (সুন্দর সুন্দর), **জ্বর জ্বর**—তুল্যার্থে দ্বিরুক্তি। (ঙ) **প্রমাণ** —উপসর্গের র-কারের পর কৃৎ-প্রত্যয়ের স্বরবর্ণ পরবর্তী 'ন'-কার মূর্ধন্য ণ-কার হয়। প্র+মা (ধাতু+অনট্ (ভাবে)। প্রধান—প্র+ধা—অনট্ (অধিকরণ বাচ্যে)। উক্ত ণত্ব-বিধির নিয়ম ক্ষুভ্যাদি ধাতু স্থলে চলিবে না। প্রধান শব্দে, ক্ষুভ্যাদিতে পড়ায় ন-কারের কোন পরিবর্তন হইবে না। (চ) **পুস্তিকা**—ক্ষুদ্রার্থে 'ইকা' স্ত্রীলিঙ্গে। অরণ্যানী—মহত্ত্ব বুঝাইতে স্ত্রীলিঙ্গে আনী প্রত্যয়।

৩। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লিখঃ—যথাশক্তি, কৃতকার্য, সপ্তাহ, গ্রামবাসী, বেহায়া, ঘি-ভাত, লোকলজ্জা। **উত্তর**ঃ—**যথাশক্তি**—শক্তিকে অতিক্রম না করিয়া (অব্যয়ীভাব)। **কৃতকার্য**—কৃত (সম্পন্ন) হইয়াছে কার্য যাহার দ্বারা (বহুব্রীহি)। **সপ্তাহ**—সপ্ত অহের (দিনের) সমাহার (সমাহার দ্বিগু)। **গ্রামবাসী**—গ্রামে বাস করে যে (উপপদ তৎপুরুষ)। **বেহায়া**—বে নাই হায়া (লজ্জা) যাহার (বহুব্রীহি)। **ঘি-ভাত**—ঘি মিশ্রিত ভাত (মধ্যপদ-লোপী কর্মধারয়)। **লোকলজ্জা**—লোকোৎপন্ন লজ্জা—মধ্যপদলোপী কর্মধারয়।

অথবা, ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর এবং কোন প্রত্যয় কি কারণে হইয়াছে লিখঃ—সহিষ্ণু, দাশরথি, পথ্য, কনিষ্ঠ, কাটারি, জমকাল। **উত্তর**ঃ—সহিষ্ণু—সহ্ (ধাতু)+ইষ্ণুচ্ (প্রত্যয়) শীলার্থে কর্তৃবাচ্যে—অর্থ সহনশীল। **দাশরথি**—দশরথের অপত্য এই অর্থে দশরথ+ইঞ্। **পথ্য**—পথে সাধু বা হিতকর অর্থে- পথিন্+য। **কনিষ্ঠ**—যুবন্+ইষ্ঠ—বহুর মধ্যে তুলনায়। **জমকাল**—জমক+আল-প্রত্যয় জমক আছে ইহার। **কাটারি**—কাট্+আরি (করণবাচ্যে) যাহা দিয়া কাটা যায়।

৪। বাক্য রচনা করঃ—(১) বিধেয় বিশেষণ, (২) গুণবাচক বিশেষণ, (৩) পূরাণবাচক বিশেষণ, (৪) সর্বনামীয় বিশেষণ। **উত্তরঃ—**(১) রামকে সকলে **ভাল** বলে, (২) **দয়ালু** নৃপতি দরিদ্রকে ধন দিলেন, (৩) হরেন এবার **ষষ্ঠ শ্রেণীতে** উঠিয়াছে, (৪) **সেকথা** মুখে আনিও না। **সর্ব**লোকে এই কথা বলে।

৫। সার্থক বাক্য রচনা করঃ—শাপে বর, চর্বিত-চর্বণ, আকাশ-কুসুম, ননীর পুতুল, শ্মশান-বৈরাগ্য, হাল ধরা। **উত্তর**ঃ—অফিসে গোলমাল হওয়ায় চাকুরি হইতে বরখাস্ত করিয়া দিলে লোকটি বেশি মাহিনায় কাজ পাওয়ায় তাহার **শাপে বর হইল**। সকলের বলা কথা তুমি বারবার বলিয়া কেন **চর্বিত-চর্বণ কর**। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা আর **আকাশ-কুসুম** চিন্তা করা দুইই সমান। **ননীর পুতুল** হইয়া ছেলে ঘরে বসিয়া

থাকিলে তাহার কোন উন্নতির আশা নাই। সংসারী লোকের টাকা স্পর্শ না করার প্রতিজ্ঞা শ্মশান-বৈরাগ্য ছাড়া আর কিছুই নহে। আমাদের এ বিপদসাগরে হাল ধরিবার লোক নাই।

১৯৬৩

১। সংজ্ঞা লিখ :—উষ্মবর্ণ, অর্ধতৎসম শব্দ, কৃৎ-প্রত্যয়, অনুক্ত কর্তা, নিত্যবৃত্ত অতীত, কর্মবাচ্য, উপমান কর্মধারয়। **উত্তর :—উষ্মবর্ণ**—পৃঃ ১৩ দেখ। **অর্ধ-তৎসম**—পৃঃ ৪ (১ম খণ্ড)। **কৃৎ-প্রত্যয়**—৮৬ পৃষ্ঠা দেখ। **অনুক্ত কর্তা**—পৃঃ ৪০ দেখ। **নিত্যবৃত্ত অতীত**—পৃঃ ৫৯ দেখ। **কর্মবাচ্য**—পৃঃ ১১১ দেখ। **উপমান কর্মধারয়**—পৃঃ ৭৫ দেখ।

২। সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য কি? দুইটি করিয়া সন্ধির ও দুইটি করিয়া সমাসের উদাহরণ দাও। **উত্তর :**—১৯৩ পৃঃ দেখ।

অথবা, বাংলা কোন্ কোন্ কারকে এ বিভক্তি হয় লেখ এবং একটি করিয়া উদাহরণ দাও। **উত্তর :—কর্তৃকারকে**—এ **চোরে সব** লইয়া গেল। **কর্মকারকে** (কবিতায)—ছাগে কাটে (=ছাগকে কাটে)। **করণকারকে**—বাবু রাগের চোটে সকলেরই **হাতে** মাথা কাটিতে চান। **সম্প্রদানে**—দীনে অর্থ দাও। **অপাদান**—তাহার মুখে (=মুখ হইতে) কথা বাহির হইল না। **অধিকরণে—জলে মাছ থাকে।**

৩। নিম্নলিখিত **পত্র**খানি শুদ্ধ করিয়া লিখ :—

ক্ষমা স্বরস্বতীর কৃপায় তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ন হইযাছ এই সংবাদে আনন্দিত হইলাম। তোমার জননী দুরাবোগ্য ব্যাধিতে ভুগিতেছেন জানিযা দুঃখিত হইযাছি। তাহার যথাযোগ্য সেবাসুশ্রুসা করিবে। তোমার শারিরীক কশল কামনা করি। ইতি—

নিত্যশুভার্থী
মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তর :—শুদ্ধ—ক্ষমা, সরস্বতীর কৃপায় তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইযাছ। এই সংবাদে আনন্দিত হইলাম। তোমার জননী দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগিতেছেন জানিয়া দুঃখিত হইয়াছি। তাঁহার যথাযোগ্য সেবাশুশ্রূষা করিবে। তোমার শারীরিক কুশল কামনা করি। ইতি—

নিত্যশুভার্থী
শ্রীমধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়

অথবা, সূত্র নির্দেশপূর্বক সন্ধিবিচ্ছেদ কর :—

ক্ষুধার্ত; বাগীশ, উচ্ছ্বাস; পিত্রালয়; নদ্যম্বু; চলচ্চিত্র; উদ্ধৃতি। উত্তর :—**ক্ষুধার্ত**—ক্ষুধা+ঋত, সূত্র পৃঃ ১৮ দেখ। **বাগীশ**—বাক্+ঈশ। পৃঃ ১৯ দেখ। **উচ্ছ্বাস**—উৎ+শ্বাস। পৃঃ ১৯ দেখ। **পিত্রালয়**—পিতৃ+আলয়। পৃঃ ১৮ দেখ। **নদ্যম্বু**—নদী+অম্বু। পৃঃ ১৮ দেখ। **চলচ্চিত্র**—চলৎ+চিত্র। পৃঃ ১৯ দেখ। **উদ্ধৃতি**—উৎ+হৃতি। পৃঃ ২১ দেখ।

সার্থক বাক্য রচনা কর :—পায়াভারী, মাটির মানুষ, কলুর বলদ, বিদুরের খুদ, গোবরগণেশ, চোখের চামড়া, ধান ভানতে শিবের গীত। **উত্তর :**—সে এখন এখানকার প্রতিষ্ঠিত লোক সে **পায়াভারী** লোকের সঙ্গে কথা বলতেও এখন অপমান বোধ করে। নবদ্বীপের বাবা ছিলেন **মাটির মানুষ,** তাই দাদা যাহা লিখিতে বলিলেন তিনি তখনই লিখিয়া ফেলিলেন। দুর্ভিক্ষে সামান্য আমাদের দান **বিদুরের খুদ** (কুড়া) লইয়া আসিয়াছি। লোকটা একটা **গোবরগণেশ,** যাহাতে হাত দেয় সেই কাজ নষ্ট হয়। লোকটার **চোখের চামড়া** নাই বলিয়া সকলের সম্মুখে দেনার টাকার কথা অস্বীকার করিল। তোমার নিকট অঙ্কের উত্তর চাই—ইতিহাসের উত্তর দেওয়া তো **ধান ভানতে শিবের গীত।**

একপদে পরিণত কর :—উত্তর :—উপস্থিত বুদ্ধি যাহার আছে—প্রত্যুৎপন্নমতি। যাহা

সহজে ভাঙে—ভঙ্গুর। জানিবার ইচ্ছা—জিজ্ঞাসা। যে বস্তু পাইতে ইচ্ছা হয়—ঈপ্সিত (বস্তু)। যাহার অনুরাগ দূরে হইয়াছে—বীতরাগ। পুরাকালের বিষয় জানে যে—পুরাবিৎ পুরাতত্ত্ববিৎ। হৃদয়ের প্রীতিকর—হৃদ্য।

১৯৬৩ কম্পার্টমেন্টাল

১। যে কোন চারিটির সংজ্ঞা লেখ ও উদাহরণ দাও :—মহাপ্রাণ বর্ণ; অনুসর্গ, তদ্ধিত প্রত্যয়; গৌণ কর্ম; ব্যতিহার বহুব্রীহি; যৌগিক কাল; অলুক সমাস।

২। **যে কোন চারিটির বানান শুদ্ধ করিয়া লেখ :—**
ভৌগলীক; অচিন্ত্যনীয়; পূর্বাহ্ন; প্রতিদ্বন্দিতা; মনোকষ্ট; পুরস্কৃত; ভূলভ্রান্তী।

অথবা, যে কোন চারিটিকে বিশেষ্য হইতে বিশেষণে পরিণত কর :—অধ্যয়ন, অন্তর্ধান, ধ্বংস; অপনয়ন, বস্তু, শয়ন, প্রশ্ন, বায়ু।

৩। অধিকরণ কারক কাহাকে বলে? অধিকরণ কারকের মধ্যে প্রধান তিন প্রকারের উদাহরণ দাও।

অথবা, বহুব্রীহি সমাস কাহাকে বলে? সমানাধিকরণ, ব্যধিকরণ ও মধ্যপদলোপী বহুব্রীহির উদাহরণ দাও।

৪। যে কোন চারিটির সাহায্যে চারিটি সার্থক বাক্য রচনা কর—দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ, শাঁখের করাত; তুলসী বনের বাঘ; আকাশকুসুম; সোনার পাথরবাটি; সুখের পায়রা; বর্ণচোরা; গভীর জলের মাছ।

১৯৬৪

১। যে-কোন চারিটির সংজ্ঞা লেখ ও উদাহরণ দাও :—মহাপ্রাণ বর্ণ; যোগরূঢ় শব্দ; বিষয়াধিকরণ; অনুসর্গ; কর্মকর্তৃবাচ্য; সাপেক্ষ সর্বনাম; ব্যধিকরণ বহুব্রীহি; সাধিত ধাতু।

২। কর্মধারয় সমাস কাহাকে বলে? উপমান কর্মধারয়, উপমিত কর্মধারয় ও রূপক কর্মধারয়ের পার্থক্য বুঝাইয়া প্রত্যেকের একটি করিয়া উদাহরণ দাও।

অথবা, নিত্য অতীত, নিত্যবৃত্ত অতীত, ঘটমান অতীত, পুরাঘটিত অতীত—এই চারিটি কালের পার্থক্য বুঝাইয়া প্রত্যেকের একটি করিয়া উদাহরণ দাও।

৩। যে-কোন চারিটি বিপরীতার্থক শব্দের সাহায্যে চারিটি বাক্য রচনা কর :—উত্তমর্ণ; ঋজু; অর্বাচীন; বর্ধমান; গরিষ্ঠ; অনুলোম; উন্নত; সংকুচিত।

অথবা, যে-কোন চারিটিকে একপদে পরিণত করিয়া চারিটি সার্থক বাক্য রচনা কর :—
যে গাছ ফল পাকিলে মরিয়া যায়; আদর করার যোগ্য যে বা যাহা; যে বিদেশে থাকে না; যে ব্যক্তি বিশেষ বিবেচনা করিয়া কাজ করেন না; যাহার গুণ নাই; যাহা মর্মকে পীড়া দেয়; যাহার শুনিবার ইচ্ছা আছে; যাহা বচনের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না।

৪। যে-কোন চারিটির সাহায্যে চারিটি বাক্য রচনা কর :—ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো; ভাঁড়ে মা ভবানী; গোবরে পদ্মফুল; ভস্মে ঘি ঢালা; রাঘব বোয়াল; আষাঢ়ে গল্প; তিলে তাল করা; বক ধার্মিক।

অথবা, যে-কোন চারিটিকে বিশেষণে পরিবর্তিত করিয়া চারিটি বাক্য রচনা কর :—
কল্পনা; বায়ু; মাধুর্য; মন; বস্তু; মূল; পরস্পর।

দ্বিতীয় খণ্ড

পাঠ-সংকলনের ব্যাকরণ

পাঠ-সংকলনের ব্যাকরণ

কবিগুরু-বন্দনা (পৃঃ ১)

সন্ধি ঃ—পদ + অম্বুজে = পদাম্বুজে। শিরঃ (স্) + চূড়ামণি = শিরশ্চূড়ামণি। রাজ + ইন্দ্রসঙ্গমে = রাজেন্দ্রসঙ্গমে। মুর + অরি = মুরারি। মনঃ (স্) + হর = মনোহর। কাব্য + উদ্যান = কাব্যোদ্যান। রত্ন + আকর = রত্নাকর। অ-কিম্ + চন (এ—দ্বিতীয়া বিভক্তি)।

গদ্যরূপ ঃ—নমি—নমস্কার করি। দরশনে—দর্শনে। পশিয়াছে—প্রবেশ করিয়াছে। দমনিয়া—দমন করিয়া। যযতনে—সযত্নে। তব—তোমার। মিলি—মিলিয়া। কেলি—খেলা।

লিঙ্গান্তর ঃ—অনুগামী—অনুগামিনী ; দাস—দাসী ; দীন—দীনা ; রাজেন্দ্র—রাজেন্দ্রাণী ; (মধুসূদন) ; যাত্রী—যাত্রিণী ; দুরন্ত—দুরন্তা ; খ্যাত—খ্যাতা ; সুমধুরভাষী—সুমধুরভাষিণী ; মনোহর—মনোহরা ; কবি—স্ত্রীকবি, মহিলা কবি, কবয়িত্রী (ঝলকিকারের মতে) ; রাজহংস—রাজহংসী ; অমর—অমরী।

পদান্তর ঃ—ভারত—ভারতীয় ; অনুগামী—অনুগমন ; দীন—দৈন্য, দীনতা ; যাত্রী—যাত্রা ; যশ (স্)—যশস্বী ; দুরন্ত—দুরন্তপনা ; অমর—অমরতা ; খ্যাত—খ্যাতি ; অলংকার—অলংকৃত ; ফুল—ফুলেল ; ইচ্ছা—ঐচ্ছিক ; ভূষণ—ভূষিত ; কৃপা—কৃপালু ; নূতন—নূতনত্ব ; মালা—মালী।

কারক বিভক্তি প্রভৃতি ঃ—**যশের** মন্দিরে—অভেদ সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি (যশ এবং মন্দিরে কোন ভেদ নাই, যাহা যশ তাহাই মন্দির)। **রাজেন্দ্রসঙ্গমে**—সহার্থে তৃতীয়া (-এ বিভক্তি)। **রাজহংসকুলে**—সহার্থে তৃতীয়া (-এ বিভক্তি) হংসদের রাজা—রাজহংস, ষষ্ঠীতৎপুরুষ, তাহাদিগের কুল (সমূহ) ; 'কুল'-শব্দ প্রয়োগ বহুবচনের অর্থের প্রকাশ করিতেছে। **রত্নরাজি**—রত্নের রাজি (সমূহ) ষষ্ঠীতৎপুরুষ ; 'রাজি'-শব্দ বহুবচনের অর্থপ্রকাশক।

সমাস ঃ—**শিরশ্চূড়ামণি**—চূড়াস্থিত মণি চূড়ামণি (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়) শিরসের (বা শিরের) চূড়ামণি (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। **অনুগামী**—অনু (পশ্চাতে) গমন করে যে (উপপদ তৎপুরুষ সমাস)। **দিবানিশি**—দিবা এবং নিশি (দ্বন্দ্ব সমাস) [দ্রষ্টব্য : দিবা অব্যয় পদ বাঙলায় প্রথমা বিভক্তিতে প্রয়োগ হয়, নিশি সংস্কৃতে সপ্তম্যন্ত পদ বাঙলায় প্রথমার অর্থে ব্যবহৃত হয়—তাই দ্বন্দ্ব সমাস হইয়াছে] (ব্যাপ্তি-অর্থে) ব্যাপ্ত্যর্থে শূন্য দ্বিতীয়া বিভক্তি। **ভবদম**—ভবকে (সংসারকে) দমন করেন যিনি (উপপদ তৎপুরুষ)। পদাম্বুজে—পদরূপ অম্বুজ (পদ্ম) রূপক

কর্মধারয়, অথবা পদ অম্বুজের মতো উপমিত কর্মধারয়। কাব্যোদ্যান—কাব্যরূপ উদ্যান—রূপক কর্মধারয়। **অকিঞ্চন**—অ (নাই) কিঞ্চন (কিছু) যাহার (সংস্কৃত কিম্ + চন) সংস্কৃতে তৎপুরুষ সমাস—বাঙ্‌লায় বহুব্রীহি।

ব্যুৎপত্তি (Derivation) :—অনুগামী = অনু + গম্ + ণিন্ কর্তৃবাচ্যে (অনুগামিন্ শব্দ হইতে)। সুমধুরভাষী = সুমধুর + ভাষ্ + ণিন্ (কর্তৃবাচ্যে) স্ত্রীলিঙ্গে 'সুমধুরভাষিণী' উপপদ তৎপুরুষ সমাস। **দমনিয়া**—দমন শব্দ হইতে কবিতায় **(ব্যবহৃত নামধাতু) + ইয়া**। গদ্যে 'দমন করিয়া'। মনোহর—মনস্ (:) + হৃ + অচ্ কর্তৃবাচ্যে (উপপদ সমাস)। দ্বৈপায়ন—দ্বীপ + আয়ন, (অপত্যার্থে) অথবা দ্বীপ অয়ন (বাসস্থান যাঁহার)—বহুব্রীহি দ্বীপায়ন + অণ (স্বার্থে)।

অনুশীলনী

১। ব্যাকরণ সংক্রান্ত টীকা লিখ :—পদাম্বুজে, দিবানিশি, **যশের** মন্দিরে, **কবিতারসের সরে**, মনোহর, চন্দ্রচূড়, আছিলা, জাহ্নবী, দ্বৈপায়ন।

২। পদান্তরে পরিবর্তিত কর :—মনোহর, অনুগামী, ফুল, মালা, নূতন।

৩। **ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন কর** :—মনোহর, অনুগামী, দমনিয়া, দ্বৈপায়ন (উ.মা. ১৯৬৩)

৪। **গদ্যরূপ লিখ** :—(১) তব পদচিহ্ন ধ্যান করি......অমর। (২) হে পিতঃ......তুমি ? **উত্তর** :—(১) তোমার পদচিহ্ন দিবানিশি ধ্যান করিয়া কত অমর যাত্রী ভবদম দুরন্ত শমনকে দমন করিয়া যশের মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে। (২) হে পিতঃ। তুমি না শিখাইলে আমি কিরূপে কবিতারসের সরোবরে রাজহংসকুলের সহিত মিলিয়া খেলা করি ?

৫। **বাচ্য পরিবর্তন কর** :—(১) তব পদচিহ্ন......অমর। (২) হে পিতঃ। ......তুমি। **উত্তর** :—(১) তোমার পদচিহ্ন দিবানিশি ধ্যান করিয়া কত অমর যাত্রীর ভবদম দুরন্ত শমনকে দমন করিয়া যশের মন্দিরে প্রবেশ করা হইয়াছে। (২) হে পিতঃ। তোমাকর্তৃক শিক্ষিত না হইলে আমার কিরূপে রাজহংসকুলের সহিত মিলিয়া খেলা করা হইতে পারে ?

৬। **অশুদ্ধি শোধন কর** :—

গাথিব নুতন মালা, তুলি সযতন
তব কাব্যবাগানে ফুল ; ইচ্ছা শাজাইতে
বিবিদ ভূবনে ভাষা কিন্ত কোথা পাব
(দিন আমি) রত্নরাজি, তুমি নাহি দিলে,
রত্নকর ? কৃপা, প্রভো, করো আকিঞ্চনে।

৬। **অনুক্ত স্থান পূরণ কর ঃ—**

নমি — কবিগুরু, তব —
বাল্মীকি। হে — শিরশ্চূড়ামণি
তব — দাস, —
দীন — যায় দূর —।

দধীচির তনুত্যাগ (পৃঃ ৫)

সন্ধি ঃ—তপোধন=তপ: (তপস্)+ধন (সাধু)। **শিরোরত্ন=শিরঃ** (শিরস্)+রত্ন। নিষ্কাম=নিস্+কাম, ('নিস্পন্দ, নিশ্বাস'-পদে কোন সন্ধি নাই মনে রাখিবে।) মহর্ষি—মহা+ঋষি, মুনীন্দ্র (মুখে)=মুনি+ইন্দ্র। নিশ্চল=নিঃ+চল, নিঃ+উপম (বহুব্রীহির অন্তে উপমা শব্দের হ্রস্বত্ব)। জ্যোতিঃপূর্ণ—জ্যোতিঃ (স্)+পূর্ণ। পুষ্পাসার—পুষ্প+আসার। চতুর্বেদগান—চতুঃ (র্)+বেদগান।

কারক-বিভক্তি ঃ—নরের (কর্তব্য নরের… …পরিহার)—তব্য প্রত্যয়-যোগে অনুক্ত কর্তায় (কর্মবাচ্যের কর্তায়) ষষ্ঠী। **মুনীন্দ্র**—কর্মে দ্বিতীয়া (-এ বিভক্তি) 'আচ্ছাদি' ক্রিয়ার কর্ম। **মঙ্গলে**—(=মঙ্গলের নিমিত্ত নিমিত্তার্থে চতুর্থী (-এ বিভক্তি)। **দেবের** (মঙ্গল)—নিমিত্ত সম্বন্ধে ষষ্ঠী (তুঃ পূজার ফুল, স্নানের ধুতি)। **পুষ্পাসার** (পুষ্পসমূহের আসার)—প্রবল বৃষ্টি। **সমার্থক ধাতুজ কর্মে বিভক্তিশূন্য** দ্বিতীয়া। 'বরষিল'—ক্রিয়ার কর্ম। পাঞ্চজন্য—কর্ম-কর্তৃবাচ্যের কর্তা, ক্রিয়া 'বাজিল'। পঞ্চজন নামক দৈত্য হইতে (কৃষ্ণ কর্তৃক) গৃহীত।—পঞ্চজন+য (ষ্যঞ্)।

সমাস ঃ—সাধুশিরোরত্ন—শিরস্থিত রত্ন 'শিরোরত্ন' (মধ্যপদলোপী কর্মধারয) সাধুগণের শিরোরত্ন (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। **জীবকুলকল্যাণসাধন**=জীবদিগের কুল (ষষ্ঠীতৎ) তাহার-কল্যাণ (ষষ্ঠী তৎ সমাস) তাহার সাধন (ষষ্ঠীতৎ সমাস)। অনুদিন (=প্রতিদিন) দিন দিন (বীপ্সার্থে) অব্যয়ীভাব (তুলঃ 'প্রতিদিন', অনুক্ষণ)। **পরহিতব্রত**—পরের হিত (ষষ্ঠীতৎ), পরহিতরূপ ব্রত (রূপক কর্মধারয়)। বাষ্পাকুল—বাষ্প দ্বারা (চোখের জল) আকুল (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। **নিরুপম**—নিস্ (অথবা নির্—নাই) উপমা যাহার (বহুব্রীহি)।

ব্যুৎপত্তি ঃ—মুগ্ধ—মুহ্+ক্ত (কর্তৃবাচ্যে, অপর পদ 'মূঢ়')। মগ্ন—মসজ্+ক্ত। দ্বৈপায়ন—দ্বীপায়ন (দ্বীপ+অয়ন)+অ (অণ্ বা ষ্ণ) স্বার্থে দ্বীপ অয়ন (বাসস্থান বা জন্মস্থান) যাঁহার 'ব্যাসদেব' স্বার্থে অ (অণ্) প্রত্যয়। পাঞ্চজন্য—পঞ্চজন+য (ষ্যঞ্)। সাত্ত্বিক—সত্ত্ব+ইক (ষ্ণিক)।

গদ্যরূপ ঃ—অগ্রসরি—অগ্রসর হইয়া; হরষ—হর্ষ; কহিলা—কহিলেন (বলিলেন); শুনি—শুনিয়া; নিরমল—নির্মল; আরম্ভিলা—আরম্ভ করিলেন;

বাহিরিল—বাহির হইল ; যুড়ি—যুড়িয়া ; বরষিল—বর্ষণ করিল'; আচ্ছাদি—আচ্ছাদন করিয়া ; ত্যজিলা—ত্যাগ করিলেন ; স্পর্শি—স্পর্শ করিয়া।

লিঙ্গান্তর ঃ—আকুল—আকুলা ; সাত্ত্বিক—সাত্ত্বিকী ; চিরমোক্ষফলপ্রদ—চিরমোক্ষফলপ্রদা ; নিত্যহিতকর—নিত্যহিতকরী ; নিষ্কাম—নিষ্কামা ; প্রাতঃস্মরণীয়—প্রাতঃস্মরণীয়া ; মধুর—মধুরা ; গম্ভীর—গম্ভীরা, মগ্ন—মগ্না ; বিপুল—বিপুলা ; নিশ্চল—নিশ্চলা ; নিস্পন্দ—নিস্পন্দা ; নিরুপম—নিরুপমা ; জ্যোতিঃপূর্ণ—জ্যোতিঃপূর্ণা ; দেব—দেবী।

পদান্তর ঃ—সত্ত্ব—সাত্ত্বিক ; ঋষি—আর্য ; মুগ্ধ—মোহ ; তাপস—তপ (ঃ) ; শোভা—শোভিত, শোভন ; মগ্ন—মজ্জন ; গম্ভীর—গাম্ভীর্য, গম্ভীরতা ; সাধন—সাধিত, সাধ্য ; ব্রত—ব্রতী ; ধ্যান—ধ্যেয়, ধ্যানী ; কর্তব্য—করণ, কর্ম ; বর—বৃত ; বংশ—বংশীয় ; পুণ্য—পুণ্যবান্ ; নিরমল (=নির্মল)—নির্মলতা ; মধুর—মাধুরী, মাধুর্য ; বিপুল—বিপুলতা ; নিস্পন্দ—নিস্পন্দতা ; ক্ষণ—ক্ষণিক ; (ক্ষুদ্রার্থক) তনু (বিশেষণ)—তনিমা ; দেব—দৈব ; মঙ্গল—মাঙ্গলিক ; আশ্রম—আশ্রমিক, আশ্রমী।

বাচ্যান্তর ঃ—কর্তৃবাচ্য—(১) তুমি বুঝিলা সার জীবের সাধন (২) কর্মবাচ্য—তোমারই জীবের সাধন সার বোঝা (বুঝা) হইল (২) দধীচি ত্যাজিলা তনু দেবের মঙ্গলে—দধীচি কর্তৃক দেবের মঙ্গলে তনু ত্যক্ত হইল।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত পদগুলি ব্যবহারপূর্বক বাক্য রচনা কর ঃ—নিরুপম, পরহিতব্রত, নিস্পন্দ, বাষ্পাকুল।

২। পদ পরিবর্তন কর ঃ—সাত্ত্বিক, ঋষি, তাপস, শোভা, মগ্ন, গম্ভীর।

৩। ব্যাকরণ-সংক্রান্ত টীকা লিখ ঃ—(ক) **দেখিতে দেখিতে** নেত্র হইল নিশ্চল। **উত্তর** ঃ—ইতে—প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষণের (Participle) ভাবে প্রয়োগ (Absolute use) (তুঃ '**দেখিতে দেখিতে** গুরুর মন্ত্রে জাগিয়া উঠেছে শিখ')। (খ) দধীচি ত্যজিল তনু **দেবের মঙ্গলে**।

৪। **গদ্যরূপ লিখ ঃ**—(১) বলিয়া রোমাঞ্চ......নিরমল। (২) ধ্যানে মগ্ন......উল্লাসে। (৩) দধীচি ত্যজিলা......মঙ্গল। **উত্তর** ঃ—(১) বাসব (এই কথা) বলিয়া মুনীন্দ্রমুখে নির্মল শোভা নিরীক্ষণ করিয়া রোমাঞ্চতনু হইলেন। (২) ধ্যানে মগ্ন ঋষি, বিপুল উল্লাসে নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিলেন। (৩) দধীচি দেবের মঙ্গলের জন্য তনু ত্যাগ করিলেন।

৫। **উক্তি পরিবর্তন কর** ঃ—(১) কহিলা বাসব......নরকুলে। **উত্তর** ঃ—(১) বাসব সাধুশিরোরত্ন ঋষিকে সম্বোধন করিয়া অভিনন্দিত করিলেন যে তিনি

সাত্ত্বিক, তিনিই জীবের সার সাধন বুঝিয়াছেন। তিনিই এই জগতীতলে নিত্য-হিতকর চিরমোক্ষফলপ্রদ ব্রত সাধন করিয়াছেন। (তিনিই বুঝিয়াছেন) যে নিত্য স্বার্থ পরিহার এবং জীবকুলের অনুদিন কল্যাণসাধন নরের কর্তব্য। পরহিতব্রত যে পরমধর্ম ইহা এই ঋষি বুঝিযাছেন এবং উহা সেইদিন উদ্‌যাপিত করিয়াছেন। তিনি নিষ্কাম তাপস, তাই তিনি কোন বর চাহেন নাই—ইন্দ্রেরও কোন বর তাঁহাকে দিবার নাই। (তবে) (তাঁহার) এই সুকীর্তি নিত্য নরকুলে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

৬। **অশুদ্ধি সংশোধন কর**ঃ—তপধন। সাধুশিররত্ন। সাত্তিক। চির-মক্ষফলপ্রদ। সার্থপরিহার (কর্তব্য নরের নিত্য সার্থপরিহার)। জীবকুলকল্যান। নিস্কাম। প্রাতস্মরণীয। পুন্যভুমি। মুনিন্দ্র। বাস্পাকুল। চতুব্বেদগান। নিরুপম। জ্যোতিপূর্ণ। পঞ্চজন্য। পুস্পাষাঢ বরসিল মুনিন্দ্রে আচ্ছাদি'। দধিচি ত্যজিলা তনু দেবের মঙ্গলে।

৭। **বাচ্য পরিবর্তন কর**ঃ—(১) দধীচি ত্যজিলা তনু দেবের মঙ্গলে। (২) এ সুকীর্তি তব প্রাতঃস্মরণীয় নিত্য হবে নরকুলে। **উত্তর**ঃ—(১) দধীচি কর্তৃক দেবের মঙ্গলে তনু ত্যক্ত হইল। (২) নরকুল তোমার এ সুকীর্তি প্রাতঃকালে নিত্য স্মরণ করিবে।

৮। **শূন্য স্থান পূরণ কর**ঃ—

দেখিতে — নেত্র হইল —
নাসিকা —, নিস্পন্দ —,
বাহিরিল — ব্রহ্মরন্ধ্র —
— জ্যোতিঃপূর্ণ ক্ষণে — উঠি
মিশাইল —।

মধ্যাহ্নে (পৃঃ ৯—১০)

ভাষা চর্চার দিক্ হইতে এই কবিতা গুরুত্বপূর্ণ। খাঁটী বাঙ্‌লা (তদ্ভব শব্দ) শব্দে ইহার বাক্যগুলি প্রধানতঃ রচিত। ইহাতে কিছু তৎসম শব্দও রহিয়াছে। দুইটি পদের অধিক পদদ্বারা কোন সমাস গঠিত হয় নাই। কেবল একটি সমাসে 'অলস-স্বপন-জাল (পৃঃ ১০) তিনটি পদ আছে। বিভিন্ন প্রকার **শব্দদ্বৈত** প্রয়োগ এই কবিতার ভাষার বৈশিষ্ট্য।

সন্ধিঃ—এ কবিতায় একটি পদ ছাড়া কোন সন্ধির যোগ্য তৎসমপদে সমাস হয় নাই। সুতরাং ইহাতে সন্ধি নাই বলিলেই চলে। মধ্যাহ্ন—মধ্য + অহ্ন।

সমাসঃ—'নদীকূলে'—নদীর কূলে (ষষ্ঠীতৎ)। 'কুলবধূ'—কুলের বধূ (ষষ্ঠীতৎ)। **'অলস-স্বপন-জাল'** অলস (যে স্বপন কর্মধারয়), তাহার জাল

(ষষ্ঠীতৎ)—**তিন পদে সমাস।** 'নদী-বাঁকে—নদীর বাঁকে (তদ্ভব শব্দ) ষষ্ঠীতৎ। **তদ্ভব-তদ্ভব পদে সমাস**—'আঁখিপাতা'—আঁখির পাতা—(ষষ্ঠী-তৎপুরুষ)।

পদটীকা ঃ—নধর সুস্পষ্ট, কমনীয়<সংস্কৃত 'নবধর শব্দ', **নিঝুম (নিঝ্‌ঝুম)** সম্পূর্ণ নীরব, নিষ্পন্দ। (দেশী) ঝিম ধাতু হইতে ঝিম>ঝুম নি (নাই) ঝুম যাহাতে ['ঝিম' ধাতুর অর্থ তন্দ্রাজনিত অবসন্নতা, তাহারও পর্যন্ত অভাব]। (ডিঙা) **ডিঙাখানি**—ডিঙা+খানি (নির্দেশক প্রত্যয়) ডিঙা **(দেশী শব্দ অব্যুৎপন্ন)** নৌকাবিশেষ হ্রস্বার্থে, 'ডিঙি'। ডুবে উঠে=ডুবিয়া উঠে। আগে ডুবে পরে উঠে। [কিন্তু 'রেগে উঠে' আগে রাগে পরে উঠে' নহে—'হঠাৎ রাগিয়া যায়, বিশিষ্ট বাগ্‌ভঙ্গি লক্ষ্য কর। **আঁখি**=<অক্ষি। জেলে=জাল+ইয়া। (তদ্ধিত প্রত্যয়) [জালদ্বারা জীবিকা অর্জন করে যে] জালিয়া>জেলে (চলিত ভাষায়)। মেঠো=মাঠ+উয়া (সম্বন্ধীয়)=মাঠুয়া> **মেঠো** চলিত ভাষায়। (বিশেষণ পদ)।

শব্দদ্বৈত ঃ—গুটিগুটি—ক্রিয়া বিশেষণ, (গুটিপোকার ন্যায় আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া ধীরে গমন) সাদৃশ্যে দ্বিরুক্তি। ঢল ঢল—আবেশ বিভোর ও চঞ্চল (দেশী শব্দ) বিশেষণ পদ বিশেষ্য 'আঁখি'। কুব্‌ কুব্‌=অনুকরণ শব্দে দ্বিরুক্তি। **খসে খসে**=খসিয়া খসিয়া পৌনঃপুন্যার্থে দ্বিরুক্তি। **চেয়ে চেয়ে শুধু চেয়ে**—'এক দৃষ্টে চাহিয়া' দীর্ঘকাল বর্তিয়া অর্থে দ্বিরুক্তি। [পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা—সংস্কৃত ভাষার এই রীতি তুলনীয়। **ছায়া ছায়া**—ছায়ার মতো অস্পষ্ট। **সাদৃশ্যার্থে দ্বিরুক্তি।**

গদ্যরূপ ঃ—আঁখি (অক্ষি)—চোখ, স্বপন-স্বপ্ন।

পদান্তর ঃ—জগৎ-জাগতিক। ঘর-ঘরোয়া। ভাঙা-ভাঙন ('বিষ্ণু দিলেন **ভাঙনের** গদা'-নজরুল)। কাতর-কাতরতা জল-জলো। পথিক-পথ। মেঠো—মাঠ। দ্রুত—দ্রুততা। লাজ—লাজুক অলস—অলসতা, আলস্য। স্বপন—স্বপ্ন। মৃদু—মার্দব, মৃদুতা। গভীর—গভীরতা। গান—গীত। বিরাম—বিরত। ব্যথা—ব্যথিত।

লিঙ্গান্তর ঃ—চাতক-চাতকী, চাতকিনী (বাংলায়)। কাতর-কাতরা। হংস-হংসী। গাভী-ষাঁড়। জেলে-জেলেনী, জেলেবৌ।

বিপরীতার্থক শব্দ ঃ—ভাঙা-জোড়া। দ্রুত-মন্থর, বিলম্বিত। অলস-কর্মঠ, নিরলস। দূর-নিকট। মুদে-খোলে। আরাম—আরামহীন, ব্যারাম। গভীর (শ্বাস)-মৃদু।

সার্থক বিশেষণ প্রয়োগ ঃ—নধর (বট, বালক), ভাঙা (তীর, দেউল, মন্দির, হৃদয়), মেঠো (পথ, হাওয়া, সুর), ঢল ঢল (অঙ্গের লাবণ্য), নিঝুম (মধ্যাহ্ন, মধ্যরাত্র), অলস (গমন, স্বপ্ন), গভীর (শ্বাস, ভক্তি, প্রেম)।

তৎসম শব্দে পরিবর্তন :—ভুল—বিস্মৃতি। পড়া—পতিত হাওয়া। নধর—হৃষ্টপুষ্ট। ডুবা—নিমজ্জন। পাশ—পার্শ্ব। আঁখি—অক্ষি। লাজ—লজ্জা। নিঝুম—নিস্তব্ধ। মাঠ—প্রান্তর। চেয়ে—দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া। এলায়ে পড়ে—শিথিল হয় বা শিথিলতা আসে।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত বিশিষ্টার্থক পদসমষ্টি দ্বারা সার্থক বাক্য রচনা কর :—'এলায়ে পড়ে', 'পড়িয়া থাকা', 'মুদিয়া আসা', 'হেলে পড়া'।

২। মাঠ, জল, দাঁত, বাত—এই শব্দ কয়টিকে বাঙ্‌লা তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে বিশেষণে পরিবর্তিত করিয়া সার্থক বাক্য রচনা কর।

৩। এই কবিতায় ব্যবহৃত 'ভাঙা' (তীরে) শব্দ দ্বারা বিশিষ্টার্থক প্রকাশক পদসমষ্টি গঠনপূর্বক (phrase) পাঁচটি বাক্য রচনা কর। (উত্তর—প্রথম খণ্ড দেখ)।

৪। নিম্নলিখিত শব্দদ্বৈতগুলি দ্বারা বাক্য রচনা কর :—গুটি গুটি, ঢল ঢল, ছায়া ছায়া।

৫। **গদ্যরূপ দাও** :—(১) হৃদয় এলায়ে পড়ে যেন কী স্বপনভরে। (২) মুদে আসে আঁখিপাতা যেন কি আরামে। **উত্তর** :—(১) কী যেন স্বপ্নভরে হৃদয় এলাইয়া (শিথিল হইয়া) পড়ে। (২) কী যেন আরামে চোখের পাতা মুদ্রিত হইয়া আসে।

৬। **অশুদ্ধি শোধন কর** :—(১) একেলা জগৎ ভুলে পড়ে আছি, নদীকূলে (২) পাতাগুলি কাপিছে সমিরে (৩) ডিঙাখানি বেঁধে কুলে জেলে ঘরে যায়। (৪) আখি দুটি ঢল ঢল। (৫) মনে পড়ে কত গাঁথা। (৬) ছায়াছায়া কত ব্যাথা ঘুড়ে ধরাধামে।

৭। **বাচ্য পরিবর্তন কর** :—(১) ডিঙাখানি বেঁধে কূলে জেলে ঘরে যায়। **উত্তর**—(১) কূলে ডিঙাখানি বাঁধা হইলে জেলের ঘরে যাওয়া হয়। (২) নিঝুম মধ্যাহ্নকাল.........ভরিয়া। **উত্তর**—নিঝুম মধ্যাহ্নকাল কর্তৃক অন্যমনে হৃদয় ভরিয়া অলস স্বপ্নজাল রচিত হইতেছে।

প্রতিনিধি (পৃঃ ১৩—১৭)

সন্ধি :—রাজ্যেশ্বর = রাজ্য + ঈশ্বর, পদানত = পদ + আনত, **'ভিক্ষা + আশে'—'ভিক্ষাশে'** এরূপ সন্ধি বাঙ্‌লায় হয় না। উচ্চারণে যেখানে উদ্বেগ জন্মে সেখানে সন্ধি হয় না (তুঃ স্ত্রী-আচার, প্রীতি-উপহার)। ভবেশ = ভব + ঈশ। দিবস + অন্তে = দিবসান্তে। 'ভিক্ষা-অন্ন'—সন্ধি হয় নাই, ছন্দের অনুরোধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে। শঙ্কর (শংকর) = শম্ + কর। আশীর্বাদ-আশীঃ + বাদ। চর + অচর = চরাচর। পুনঃ + বার = পুনর্বার।

সমাস ঃ—'সর্বচরাচর'—চর এবং অচর (স্থাবর এবং জঙ্গম) দ্বন্দ্ব সমাস, অচর —ন (নয়) চর (গতিশীল) নঞ তৎপুরুষ। সর্বচরাচর (কর্মধারয়), কৌতূহলভরে—কৌতূহলের ভরে (ষষ্ঠী তৎ), পাদপদ্ম—পাদ পদ্মের মতো (উপমিত কর্মধারয়), একতারে—একটিমাত্র তার যাহার বহুব্রীহি (বাদ্যযন্ত্র বিশেষ) তাহাতে। অনুরূপ—(রূপের যোগ্য) (যোগ্যতা অর্থে অব্যয়ীভাব) অথবা অনুগত হইয়াছে রূপ যাহার (উত্তর পদলোপী বহুব্রীহি), 'নৃপশিশু'—যিনি নৃপ তিনিই শিশু—কর্মধারয় (তুল্যঃ রাজর্ষি—দুইটি বিশেষ্য পদে কর্মধারয় সমাস) 'রাখালবেণু'—রাখালের বেণু (ষষ্ঠী তৎ)। ইহার গদ্যে সমাস ব্যবহার করা হয় না।

বিভক্তি ঃ—ভিক্ষা-আশে—নিমিত্তার্থে চতুর্থী, ('এ' বিভক্তি), **কৌতূহল-ভরে—হেত্বর্থে,** পঞ্চমী (-এ বিভক্তি)।

পদটীকা ঃ—দ্বারে দ্বারে—বীপ্সার্থে দ্বিরুক্তি। ভিখারী—ভিখ (ভিক্ষা)+ আরী (কারী শব্দ হইতে), গেরুয়া—গৈরিক>গেরুক, গেরুকা (পালি)<গেরুয়া ('গৈরিক' শব্দ হইতে) শিষ্য=শাস্+ক্যপ্ (কর্মবাচ্যে) (শাসনের যোগ্য), বৈরাগী—(বিরাগের ভাব) বৈরাগ (বিরাগ+অণ বা ষ্ণ)+ইন্=বৈরাগী (গিন্) (সংসারের প্রতি বিরাগের ভাব যাঁহার মধ্যে আছে), আড়ালে—অন্তরালে, গোপন ব্যবধান, বাং 'আড' (সং 'আবর্ত' হইতে)+আল। ঘনায়—ঘন (শব্দ—'নিবিড়')+আ (প্রত্যযযোগে **নামধাতু**)+প্রথম পুরুষ (Third person) একবচন।

বিশিষ্ট বাগ্ধারা (বাগভঙ্গী) **:**—'প্রসাদ পাইল শিশু' (প্রসাদের বেলায় 'খাওয়া' বলা চলে না), চিন্তারাশি ঘনায় ললাটে', 'সূর্য পাটে গেল' (সূর্য পাটে নামে=সূর্য অস্ত যায়), 'পূরবী') সঙ্গীতের রাগিণী বিশেষ—দিবাবসানে গাওয়া হয়। পূরবীতে 'তান ধরা'=গান আরম্ভ করা। লক্ষণীয়—'তান তোলা'= ধীরে ধীরে সুর উচ্চে তোলা। [যে তান ধরা হয় তাহাতে—'তে' বিভক্তি হয়। তুলনীয় "তান ধরিয়া ইমন ভূপালিতে" (রবীন্দ্রনাথ)—"হোলিখেলা" কিন্তু "সানাই তখন দ্বারের কাছে ধবল কানাড়া" (ঐ)। কানাড়া=কর্ণাট রাগিণী।]

পদান্তর ঃ—দ্বার—দ্বারী। দীন—দৈন্য। নতি—নত। শেষ—শিষ্ট। ভার ভারী। লিখন—লিখিত, লেখক। অদ্য—অদ্যতন। গুণ—গুণী। ঈশ্বর—ঐশ্বর্য। কৌতূহল—কৌতূহলী। ব্রত—ব্রতী। আনন্দ—আনন্দিত। নগর—নাগরিক। মুখ—মুখ্য। প্রসাদ—প্রসন্ন। গর্ব—গর্বিত। প্রস্তুত—প্রস্তুতি। অভিলাষ—অভিলষিত। কঠিন—কাঠিন্য। বিধি—বৈধ। বৎস—বৎসল। পতাকা—পতাকী। সূর্য-সৌর। সংসার—সাংসরিক। সন্ধ্যা—সান্ধ্য। রাখাল—রাখালী। উদাসীন-উদাসীনতা। ব্রত—ব্রতী।

লিঙ্গান্তর ঃ—গুরু—**গুরু, গুর্বী, গুরুপত্নী,** গুরুমা। রাজ্যেশ্বর—রাজ্যেশ্বরী। শংকর—শংকরী। অন্নপূর্ণা—বিশ্বেশ্বর। ভিখারী—ভিখারিণী। গুণী—গুণিণী। মহৎ (মহান্)—মহতী। পুরবাসী—পুরবাসিনী। শিষ্য—শিষ্যা। রাজা—রাজ্ঞী, রানী। উদাসীন—উদাসীনা। বৎস—বৎসা। বৈরাগী—বৈরাগিণী। সূর্য—সূর্যা, সূরী। অনুচর—অনুচরী। প্রতিনিধি—মহিলা প্রতিনিধি।

গদ্যরূপ ঃ—হেরিলা—দেখিলেন। ফিরিছেন—ফিরিতেছেন। কাড়ি—কাড়িয়া। সমাপন—সমাপ্ত। করি—করিয়া। আসিলা—আসিলেন। নমিযা—নমস্কার করিয়া। বন্দি—বন্দনা করিযা। সঁপিছে—সমর্পণ করিতেছে। দেখিলা—দেখিলেন। করিবারে-করিবার জন্য। সাথে-সঙ্গে। ধেযে-ধাবিত হইযা। পিতারে মাতারে-পিতাকে—মাতাকে। থরোথরে—থরথর করিয়া। লহো—লও। রচি—রচনা করিয়া।

অনুশীলনী

১। 'ভিক্ষা-আশে', 'ভিক্ষা-অন্ন' পদদ্বয়ে সন্ধি না হইবার কারণ নির্দেশ কর। বাংলা সাহিত্য হইতে আরো কয়েকটি অনুরূপ উদাহরণ দাও।

২। 'ভিখারী', 'বৈরাগী', 'ঘনায' পদের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন কর। 'ঘনায়'—পদের মতো আরো কয়েকটি পদের উদাহরণ দাও।

৩। (ক) **'তান ধরা'** আর **'তানতোলার'** মধ্যে পার্থক্য দেখাও। (খ) 'সূর্য পাটে গেল' বাক্যটিকে বিভিন্নভাবে প্রকাশ কর। উত্তর :—(খ) 'সূর্য পাটে নামিল', 'সূর্য পাটে বসিল', 'সূর্য অস্ত গেল', 'সূর্য অস্তমিত হইল', 'সূর্য ডুবিয়া গেল।

৪। কারণসহ বিভক্তি নির্দেশ কর ঃ—**'সবারে দিয়েছ ঘর'** **'গুরু……ভিক্ষা-আসে** আসিবেন।' **'মোর নামে**……রাজ্য পুনর্বার। **'হৃদয়ে হৃদয়ে ফের'**।

৫। **গদ্যরূপ লিখ** ঃ—(১) সমাপন করি……………রাজধানী। **উত্তর** ঃ—যখন (গুরু) গান এবং মধ্যাহ্ণ-স্নান সমাপন করিয়া দুর্গদ্বারে আসিলেন তখন বালাজি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া (তাঁহার) পদমূলে লিখন রাখিয়া একধারে দাঁড়াইলেন। গুরু কৌতূহলভরে পত্রখানি পড়িয়া দেখিলেন—তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া শিবাজী সেইদিন তাঁহাকে নিজ রাজ্য, রাজধানী সমর্পণ করিতেছেন। (২) গুরু চলেছেন……অনুচর।

৬। **উক্তি-পরিবর্তন কর** ঃ—(১) পরদিন রামদাস………করিবারে। **উত্তর** ঃ—পরদিন রামদাস রাজার পার্শ্বে গমন করিয়া পুত্র সম্বোধনে তাঁহাকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে বলিলেন যে, যদি রাজ্য তাঁহাকে দেওয়াই রাজার অভিপ্রায় হয় তবে তাঁহার (রাজার) কোন্ গুণ আছে আর তিনি কি কাজেই বা লাগিবেন। শিবাজি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উত্তর দিলেন যে তাঁহারই দাসত্বে তিনি নিজ

প্রাণ আনন্দে দান করিতে সংকল্প করিয়াছেন। (২) পুরবীতে ধরি.........এসো চলে।

৭। **বাচ্য পরিবর্তন কর** ঃ—(১) "বৎস, তবে এই লহ.........গাত্রাবাস। (২) আমার রাজার.........বাস ? (৩) রাজা কহে.........ভিক্ষুক। **উত্তর** ঃ—(১) বৎস, আমার আশীর্বাদসহ আমার গেরুয়া বাস তোমাকর্তৃক লওয়া (গৃহীত) হউক। (২) সংসার মাঝে আমাকে রাজার সাজে বসাইয়া কে তোমার আড়ালে বাস করা হইতেছে। (৩) রাজাকর্তৃক হাসিয়া উক্ত হয়—'নৃপতির গর্ব নাশ করিয়া পথের ভিক্ষুক করা হইয়াছে'।

৮। (ক) নিম্নলিখিত পদগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট সাধু শব্দ নির্দেশ কর :—**ফুটা** (পাত্র), **গোট, ধেয়ে** (সম্মুখে চলেছে ধেয়ে) **পড়িয়া, ঘর, পাট**। **'গোট'** এবং **'গোঠ'** শব্দের অর্থের পার্থক্য দেখাও। (খ) 'পড়িয়া', 'পরিয়া'—এই পদযুগলের অর্থের পার্থক্য দেখাও। (গ) 'ফুটা', পাট, ঘর—এই তিনটি শব্দের প্রত্যেকটির বিভিন্ন অর্থে (একাধিক অর্থে) প্রয়োগ প্রদর্শন পূর্বক বাক্য রচনা কর।

৯। স্ত্রীলিঙ্গের রূপ প্রদর্শন কর :—ভিখারী, বৈরাগী, রাজ্যেশ্বর, গুরু, অনুচর, পুরবাসী, শিষ্য, প্রতিনিধি, দীন, রাজা।

প্রাচীন ভারত (পৃঃ ১৭)

সন্ধি ঃ—**অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে**=সন্ধি করা হয় নাই। সন্ধি করিলে শ্রুতিকটু হইত এবং অক্ষরসংখ্যাও কম হইয়া যাইত। উৎসব-উচ্ছ্বাসে—পূর্বোক্ত কারণে সন্ধি করা হয় নাই। বিজয়-উল্লাসে—সন্ধি হয় নাই, কারণ পূর্বে বলা হইয়াছে। **নির্বাক্**=নিঃ+বাক্।

সমাস ঃ—উদ্ধতললাট—উদ্ধত হইয়াছে ললাট যাহাদের (বহুব্রীহি, বিশেষণ পদ)। উৎসব-উচ্ছ্বাসে—উৎসবের উচ্ছ্বাসে—(ষষ্ঠীতৎ), উন্নাদ—উৎ (ঊর্ধ্বগত) নাদ যাহার বহুব্রীহি। নিয়ত ধ্বনিতধ্মাত (নিয়ত=সর্বদা) (তৎপুরুষ সমাস) ধ্বনিত অথচ ধ্মাত (কর্মধারয়)। স্ফীতস্ফূর্ত—স্ফীত অথচ স্ফূর্ত (কর্মধারয়)। মহামৌন—মহৎ (বিশেষভাবে) হইযাছে মৌন (নিস্তব্ধতা—বিশেষ্যপদ) যাহার (বহুব্রীহি)।

কারক-বিভক্তি ঃ—অপাঙ্গইঙ্গিতে—হেত্বর্থে তৃতীয়া (-'এ') বিভক্তি [এইরূপ যত -'এ' প্রত্যয়ান্ত (বিভক্ত্যন্ত) পদ এই কবিতায় আছে—সর্বত্র হেত্বর্থে তৃতীয়া হইয়াছে] **তাহার (অদূরে)**='অদূর' শব্দের যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি।

পদটীকা ঃ—স্পর্ধিছে—নামধাতু—ক্রিয়া পদ (কেবল কবিতায় ব্যবহৃত হয়) ধ্মাত—√ধ্মা (বাজান)+ক্ত (কর্মবাচ্য)। অশ্বের হ্রেষা, 'হস্তীর বৃংহিত' প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ধ্বনিবোধক শব্দের আলোচনার জন্য প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

লিঙ্গান্তর ঃ—অশ্ব—অশ্বা ; হস্তী—হস্তিনী ; বন্দী—বন্দিনী ; ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণী ; গম্ভীর—গম্ভীরা ; শান্ত—শান্তা ; সংযত—সংযতা ; উদার—উদারা ; মত্ত—মত্তা ; স্ফীতস্ফূর্ত—স্ফীতস্ফূর্তা ; ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়াণী ; স্তব্ধ—স্তব্ধা।

পদান্তর ঃ—বিদর্ভ—বৈদর্ভ। বিরাট—বৈরাট। উচ্ছ্বাস—উচ্ছ্বসিত (তুঃ নিত্য উচ্ছ্বসিত হ'য়ে সকরুণ করুক আকাশ—রবীন্দ্রনাথ)। বিজয়—বিজিত। উল্লাস—উল্লসিত। ঝংকার—ঝংকৃত। পথ—পথ্য, পথিক। ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ্য। গম্ভীর—গাম্ভীর্য, গম্ভীরতা। শান্ত—শান্তি। সংযত—সংযম। উদার—ঔদার্য, উদারতা। মত্ত—মদ, মত্ততা। স্তব্ধ—স্তব্ধতা। মৌন—মৌনী। ধনুক—ধানুকী, ধানুষ্ক।

প্রতিশব্দ ঃ—**অম্বর**—আকাশ, নভঃ, ব্যোম, দিব্, বিয়ৎ। **অশ্ব**—ঘোটক, ঘোড়া, হয়, তুরঙ্গ, তুরগ, তুরঙ্গম, বাহ, বাজী। **পথ**—রাস্তা, মার্গ, সরণি, পন্থা, রথ্যা। **অসি**—খড়্গ, তরোয়াল, করবাল, চন্দ্রহাস, কৃপাণ, তরবারি, খাঁড়া।

ব্যুৎপত্তি :—উদ্ধত—উৎ— √হন্ + ক্ত (কর্তৃবাচ্যে)। সংযত—সম্ + √যম্ ক্ত। মৌন—মুনি + অ (ষ্ণ) = মুনির ভাব বা কর্ম—নিস্তব্ধতা, বাক্‌শূন্যতা। অপাঙ্গ—(= চোখের কোণ) অপ— √অন্গ + অ (কর্তৃবাচ্যে)। ইঙ্গিত— √ইন্গ্ + ক্ত (ভাবে)। বৃংহিত—বৃন্হ্ + ক্ত (ভাবে)। শান্ত— √শম + ক্ত (ভাবে)। গরিমা—গুরু + ইমন্ (ভাবার্থে—গুরুর ভাব = গৌরব বা গরিমন্—গরিমা)।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে পদান্তরিত করিয়া বাক্য রচনা কর :—গম্ভীর, মৌন, ধনু, ঝংকার, উচ্ছ্বাস, পথ, ব্রাহ্মণ, শান্ত।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির প্রকৃতিপ্রত্যয় প্রদর্শন কর :—

উদ্ধত, বৃংহিত, উচ্ছ্বাস, ধ্মাত, গরিমা, সংযত, মৌন।

৩। ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্দেশ কর :—কর্মকলরোল, (খ) উন্নাদ, (গ) তপোবন, (ঘ) মহামৌন, (ঙ) উদ্ধতললাট।

উত্তর ঃ—(ক) কল যে রোল (কর্মধারয়) কলরোল, কর্মের কলরোল (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। অথবা কর্মজনিত কলরোল (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়), (খ) **উন্নাদ**—উদ্‌গত হইয়াছে নাদ যাহার (বহুব্রীহি), (গ) তপের (তপস্ শব্দ) বন (নিমিত্তার্থে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস), (ঘ) **মহামৌন**—মহৎ হইতেছে মৌন (নিস্তব্ধতা—বিশেষ্যপদ) যাহার (বহুব্রীহি) 'ব্রাহ্মণ মহিমা'—পদের বিশেষণ, (ঙ) উদ্ধত হইয়াছে ললাট যাহাদের (বহুব্রীহি)।

৪। **গদ্যরূপ দাও :**—(১) হেথা…………ব্রাহ্মণ মহিমা। **উত্তর ঃ**—

এখানে মত্ত স্ফীতস্ফূর্ত ক্ষত্রিয়-গরিমা আর সেখানে স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণ-মহিমা (বিরাজ করিতেছ)।

৫। **অশুদ্ধি শোধন কর** ঃ—(১) ব্রাহ্মণের তপবন অদূরে তাহার—নির্বাক্ গম্ভির শান্ত সম্যত উদার। হেথা মত্ত স্ফীতস্ফূর্ত ক্ষত্রিয গরিমা, হোথা স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণ মহিমা। (২) অপাঙ্গেঙ্গিতে। উৎসব-উচ্ছাসে। বিজয়োল্লাসে। নুপুরঝঞ্জনা। হস্তীর হ্লেসা। অশ্বের বৃংহিতে। উন্মাদশঙ্খের কল্লোলে। বন্দীর কল্লোলে। **উত্তর** :—(১), (২)—নিজে চেষ্টা কর। সমগ্র কবিতাটি কণ্ঠস্থ কর এবং একাধিকবার শুদ্ধ করিয়া লিখ।

প্রার্থনা (পৃঃ ১৮)

সন্ধি ঃ—উচ্ছ্বসিয়া = উৎ + শ্বসিয়া, নির্বারিত = নিঃ (স) + বারিত, স্রোতঃপথ = স্রোতঃ (স্) + পথ ('স্রোতপথ'—নহে)। প্রাঙ্গণ—প্র + অঙ্গন। চরিত + অর্থ = চরিতার্থ। নিঃ + দয = নির্দয়।

সমাস ঃ—'ভয়শূন্য'—ভয় হইতে শূন্য (পঞ্চমী তৎপুরুষ), দিবসশর্বরী—দিবস ও শর্বরী (রাত্রি) (দ্বন্দ্বসমাস), চরিতার্থতা (য)—চরিত (প্রাপ্ত) হইয়াছে অর্থ (উদ্দেশ্য) যাহাতে (বহুব্রীহি) চরিতার্থ, তাহার ভাব চরিতার্থ + তা (ভাবার্থে) নিমিত্তার্থে চতুর্থী (-য়) বিভক্তি। **'আচারের** মরুবালুরাশি'—মরুর বালু তাহার রাশি (ষষ্ঠীতৎপুরুষ) অভেদ সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি। 'আচার' পদের সহিত মরুবালুরাশির পদের অন্বয—সুতরাং 'আচার-মরুবালুরাশি'—এইরূপ সমস্ত পদ হওয়া স্বাভাবিক—অর্থ আচাররূপ 'মরুবালুরাশি'। কিন্তু সমাসের বাহিরে আচার পদকে রাখা হইয়াছে। অর্থ বুঝিবার অসুবিধা না হইলে এরূপ সমাস সমর্থনযোগ্য। **নির্দয়**—নির্ (নিস্) দযা যাহাতে (বহুব্রীহি) 'আঘাত' পদের বিশেষণ। সহস্রবিধ—সহস্র (বহু) বিধা (প্রকার) যাহাতে, অর্থ—বহুরকম (বহুব্রীহি)। বসুকে ধারণ করে যে = বসুধা (উপপদ তৎপুরুষ) পৃথিবী।

বিভক্তি ঃ—দিশে দিশে—বীপ্সার্থে দ্বিরুক্তি, অধিকরণে সপ্তমী (সংস্কৃত দিশ্ বা দিশা শব্দ হইতে—অকারান্ত সপ্তমীর একবচন)। **আনন্দের** (নেতা)—কৃদ্‌যোগে কর্মে ষষ্ঠী, ভারতেরে—কর্মে দ্বিতীয়া [কবিতায়]।

পদটীকা ঃ—মুক্ত—√মুচ্ + ক্ত (কর্মবাচ্যে ক্ত-প্রত্যয়), বসুধা—বসু—√ধা + ক্বিপ্, অজস্র,—নঞ্ + জস্ (ধাতু) শীলার্থে র-প্রত্যয়, ক্রিয়াবিশেষণ (নঞ্‌পূর্বক জস্ ধাতুর অর্থ সর্বদা কার্যকরা—অজস্র 'সতত'। শতধা—শত + ধা (প্রকারার্থে) অব্যয়, পৌরুষ—পুরুষ + অ (ণ্) প্রত্যয় ভাবার্থে পুরুষের ভাব।

পদান্তর ঃ—চিত্ত—চৈত্তিক, চৈত্ত। ভয়—ভীত। শূন্য—শূন্যতা। উচ্চ—উচ্চতা। জ্ঞান—জ্ঞেয়, জ্ঞাত। মুক্ত—মুক্তি, মোচন। খণ্ড—খণ্ডিত। ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রতা। বাক্য—উক্ত। নির্বারিত—নির্বারণ। দেশ—দেশী, দেশীয়। অজস্র—

অজস্রতা। চরিতার্থ—চরিতার্থতা। তুচ্ছ—তুচ্ছতা। আচার—আচরিত। বিচার—বিচারিত, বিচার্য। নিত্য—নিত্যতা। চিন্তা—চিন্তিত। নির্দয়—নির্দয়তা। আঘাত—আহত। পিতা—পৈতৃক। স্বর্গ—স্বর্গীয়। জাগরিত—জাগরণ। গৃহ—গৃহী।

প্রতিশব্দ ঃ—শর্বরী—রাত্রি, নিশীথিনী, ত্রিযামা, বিভাবরী, রজনী, ক্ষণদা, ক্ষপা, নিশা। **বসুধা**—পৃথিবী, পৃথ্বী, ভূমি, ভূ, বসুন্ধরা, বসুমতী, রসা, ভূতল, ধরণী, অবনী, ভূলোক, মর্ত্যলোক, মেদিনী। **গৃহ**—আলয়, নিলয়, সদন, আগার, শরণ। **স্বর্গ**—ত্রিদিব, দেবলোক, নাক, ত্রিদশালয়, দিব্, স্বর্লোক, অমরাবতী, অমরালয়, ত্রিবিষ্টপ।

গদ্যরূপ :—যেথা—যেখানে। করি—করিয়া। উচ্ছ্বসিয়া—উচ্ছ্বাসযুক্ত হইয়া। দিশে দিশে—দিকে দিকে। ধায়—ধাবিত হয়। গ্রাসি—গ্রাস করিয়া।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত স্থলগুলিতে কেন কোন্ বিভক্তির ব্যবহার হইয়াছে লিখ :—(ক) গৃহের প্রাচীর **দিবসশর্বরী**···রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি। (খ) বাক্য হৃদয়ের **উৎসমুখ হ'তে** উচ্ছ্বসিয়া উঠে। (গ) **ভারতের সেই স্বর্গে** করো জাগরিত। (ঘ) **নিজহস্তে** নির্দয় আঘাত করি ···।

২। পদান্তরে পরিবর্তিত কর :—জ্ঞান, মুক্ত, গৃহ, ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, বাক্য, নির্দয়, আঘাত।

৩। 'আচার' শব্দে চর্ ধাতু (আ-চর্+ঘঞ্) আছে। উপসর্গের 'চর' ধাতুর অর্থের পরিবর্তন প্রদর্শন পূর্বক শব্দ রচনা কর। **উত্তর :**— √চর ধাতুর অর্থ চলা। আচার (conduct—রীতি, প্রথা), বিচার (বিবেচনা), প্রচার (ঘোষণা), সঞ্চার (গতি, ব্যাপ্তি), 'অভিচার' (অপরের অনিষ্টের জন্য কৃত তান্ত্রিক ক্রিয়া)।

৪। **গদ্যরূপ দাও ঃ**—(সমগ্র কবিতাটি একটি মিশ্রবাক্যে রচিত—অন্বয়ের জন্য খণ্ড বাক্যগুলির গদ্যরূপ একসঙ্গে দিতে হইবে)।

(হে) পিতঃ! যেখানে চিত্ত ভয়শূন্য, যেখানে শির উচ্চ, যেখানে জ্ঞান মুক্ত, যেখানে গৃহের প্রাচীর দিবসশর্বরী আপন প্রাঙ্গণতলে বসুধাকে খণ্ড ক্ষুদ্র করিয়া রাখে নাই, যেখানে বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, যেখানে কর্মধারা নির্বারিত স্রোতে দেশে দেশে দিকে দিকে অজস্র চরিতার্থতায় ধাবিত হয়, যেখানে তুচ্ছ আচারের মরু বালিরাশি বিচারের স্রোতঃপথকে গ্রাস করিয়া ফেলে নাই, পৌরুষকে শতধা করে নাই, যেখানে তুমি সর্ব কর্ম, চিন্তা, আনন্দের নিত্য নেতা, নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করিয়া ভারতকে (তুমি) সেই স্বর্গে জাগরিত কর।

৫। **অশুদ্ধি শোধন কর ঃ—**

যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালীরাশি
বিচারের স্রোতোপথ ফেলে নাই গ্রাস,
পৌরষেরে করে নাই শতধা, নিত্য হেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা
নিজ হস্তে নিদয় আঘাত করি পিতা,
ভাবতেরে সেই সর্গে করো জাগরিত।

সমগ্র কবিতাটি কণ্ঠস্থ কর এবং শুদ্ধ করিয়া লিখ।

৬। **উপযুক্ত বিশেষণ পদদ্বারা শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ—**

চিত্ত যেথা—, — যেথা শিব,
জ্ঞান যেথা—, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই — — নাই করি।

৭। **বাচ্যপরিবর্তন কর ঃ**—(১) যেথা……গৃহের প্রাচীর……বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি। (২) পিতঃ! ভারতের সেই স্বর্গে করো জাগরিত। **উত্তর :**—(১) যেখানে গৃহের প্রাচীর কর্তৃক বসুধা খণ্ড ক্ষুদ্র করিয়া রক্ষিত হয় নাই। (২) পিতঃ (তোমা কর্তৃক) ভারতকে সেই স্বর্গে জাগরিত করা হউক।

নন্দলাল (পৃঃ ২৩-২৫)

সন্ধি ঃ—উদ্ধার = উৎ + হার।

সমাস ঃ—গলাটিপুনি—গলায় টিপুনি (সপ্তমী তৎপুরুষ) (√টিপ্ + উনি প্রত্যয়)। **ফিসন**—প্রত্যেক সন (বৎসর) (অব্যয়ীভাব সমাস)। গাড়ি-চাপা-পড়া—গাড়িদ্বারা চাপা 'গাড়ি চাপা' (তৃতীয়া তৎপুরুষ) তাহাতে পড়া (সপ্তমী তৎপুরুষ)।

বিভক্তি ঃ—গলাটিপুনিতে (আমি যদি মারা যাই) করণে তৃতীয়া (—তে বিভক্তি) বা হেত্বর্থে তৃতীয়া।

পদটীকা ঃ—গালি—তিরস্কারপূর্ণ বাক্য। সং √গল + ই (কর্তৃবাচ্যে)। **জাহির**—আরবী 'জাহির' শব্দ হইতে—প্রকাশ। **সুচি**—ছোকা—(ছোঁকা) 'ঘিয়ে সাঁতলান বিবিধ তরকারির ব্যঞ্জনবিশেষ', ছকা [**দেশী শব্দ—অব্যুৎপন্ন**] **বিঘত** (তদ্ভ) সংস্কৃত 'বিতস্তি' শব্দ হইতে। (নাকে) 'খত' শব্দের বিশেষণ। **থালথাল**—বীপ্সার্থে দ্বিরুক্তি।

আবেগ প্রকাশক অব্যয় (Interjection) ঃ—আহা হা (করকী করকী নন্দলাল) সহানুভূতিসূচক অব্যয়। বাহবা—প্রশংসার্থক অব্যয়। **হাঁ হাঁ**

হাঁ—অনুমোদনার্থক অব্যয়। ভ্যালারে—বিদ্রূপ বা বিরক্তি—অর্থে 'ভালরে' স্থলে 'ভ্যালারে—অব্যয় পদ (Interjection আবেগ প্রকাশক অব্যয়)।

বাগ্‌ভঙ্গি ঃ—'নাকে খত দেওয়া', 'বিদ্যা জাহির করা', 'পণকরা', 'খাটিয়া খুন হওয়া', 'ছাড়ো না ছাই'।

পদান্তর ঃ—ভীষণ—ভীষণতা। জীবন—জীবিত। উদ্ধার—উদ্ধৃত। সেবা—সেবিত। দরকার—দরকারী। বিদ্যা—বিদ্যাবান্। খুন—খুনী, খুনে। সাহেব—সাহেবী।

লিঙ্গান্তর ঃ—ভীষণ—ভীষণা। ভাই—বোন। অভাগা—অভাগী। ধন্য—ধন্যা। সাহেব—মেম। সর্প—সর্পী। কুক্কুর—কুক্কুরী।

বিপরীতার্থক শব্দ ঃ—ভীষণ—মনোজ্ঞ; স্বদেশ—বিদেশ ; জীবন—মরণ ; অভাগা—ভাগ্যবান্ ; গালি—প্রশংসা ; বাহির—ভিতর।

প্রতিশব্দ ঃ—স্বদেশ—জন্মভূমি, দেশ, মাতৃভূমি, দেশমাতৃকা, দেশজননী, দেশলক্ষ্মী। ভাই—ভ্রাতা, সহোদর, অনুজ, অগ্রজ, সোদর। দিক্—আশা, কাষ্ঠা, ককুভ্, দিশা। কাগজ—সমাচারপত্রিকা, সমাচারপত্র, সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, খবরের কাগজ। গাড়ি—শকট, যান, রথ।

অনুশীলনী

১। 'নন্দলাল' কবিতা হইতে তিনটি আবেগ প্রকাশক অব্যয় বাছিয়া লইয়া সার্থক বাক্য রচনা কর।

২। 'কাগজ' (আরবী' —শব্দের বিভিন্নার্থে প্রয়োগ দেখাইয়া বাক্য রচনা কর :—**উত্তর** ঃ—(ক) লিখনের পত্র বা উপকরণ (paper)—'কাগজের অভাবে লেখাপড়ার কাজ অচল হইতে চলিয়াছে'। (খ) সংবাদপত্র (Newspaper), 'অদ্যকার দৈনিক কাগজে পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। (গ) 'দলিলপত্র'—এমাসে আমাকে 'কোম্পানীর কাগজ' বিক্রয় করিতে হইবে।

৩। **গদ্যরূপ লিখ** ঃ—(১) নন্দলাল······চিরকাল ? উঃ—(১) একদা নন্দলাল একটা ভীষণ পণ করিল (যে) স্বদেশের জন্য যাহা করিয়াই হউক সে জীবন রাখিবেই। সকলে বলিল, "আহা-হা করকী করকী নন্দলাল ?" নন্দ বলিল, "চিরকাল কি বসিয়া বসিয়া থাকিব ?" (২) বাঁচাটা আমার অতি দরকার, ভেবে দেখি চারিদিক······ঠিক। উঃ—(২) চারিদিক ভাবিয়া দেখি আমার বাঁচাটা অতি দরকার। তখন সকলে বলিল, "হাঁ হাঁ, তাহা ঠিক বটে। তাহা ঠিক বটে।"

৪। **উক্তি পরিবর্তন কর** ঃ—(১) সকলে বলিল, 'আহা-হা কর কী কর কী নন্দলাল ?' **উত্তর** ঃ—(১) (পরোক্ষ) সকলে নন্দলালের প্রতি ব্যঙ্গমিশ্রিত সহানুভূতিসূচক বাক্যে উহা করিতে নিষেধ করিল। (২) নন্দলাল বসিয়া···। **উত্তর** ঃ—(পরোক্ষ) নন্দ প্রতিবাদ করিয়া বলিল, চিরকাল সে এই দেশে কেবল বসিয়া

থাকিতে পারিবে না। সে ছাড়া এই দেশ উদ্ধার করিবার আর কেহ নাই। (৩) তখন সকলে……বেশ! উঃ—(পরোক্ষ) তখন সকলে ব্যঙ্গমিশ্রিত সুরে তাহাকে খুব তারিফ করিল। (৪) নন্দের ভাই……ঠিক। উঃ—(পরোক্ষ) নন্দের ভাই কলেরায় মরে। কিন্তু তাহাকে দেখিবার লোক নাই দেখিয়া সকলে নন্দকে ভাইয়ের সেবা করিবার জন্য তাহাকে কাতর অনুরোধ করিল। নন্দ চারিদিক ভাবিয়া স্থির করিল, ভাইয়ের জন্য না-হয় জীবনটা দেওয়া যায়, কিন্তু ইহাতে অভাগা দেশের কিছু হইবে না; দেশের জন্য তাহার বাঁচা অতি দরকার। তখন সকলে ব্যঙ্গের স্বরে তাহার মতকে সমর্থন করিল। (৫) নন্দ একদা কাগজেতে এক……বাহা বাহা। উঃ—(পরোক্ষ) একদা নন্দ এক সাহেবকে কাগজে গালি দেয়, সাহেব আসিয়া খালি তাহার গলা টিপিয়া ধরিতেই সে অত্যন্ত কাকুতি-মিনতি করিয়া ঐ কাজ করিতে তাহাকে বারণ করিয়া ছাড়িয়া দিতে বলিল এবং অত্যন্ত কাতরস্বরে নাকে কয় বিঘত খত দিতে হইবে এবং সাহেব আর যাহা করিতে হুকুম দিবে সে তাহাই করিতে রাজী আছে জানাইল; কেননা গলা-টিপুনিতে সে মারা গেলে, দেশের দশা কি হইবে ভাবিয়া সে আকুল হইয়াছে। তখন সকলে ব্যঙ্গের স্বরে তাহাকে খুব তারিফ করিল।

৫। **অশুদ্ধি শোধন কর**:—ভিষণ। সদেশ। উধ্ধার। হটাৎ। দিগুন। ছারো না ছাই। চরিত না গাডী। 'হাটিতে সর্প কুকুর, আর গাড়ী চাপা পরা ভয়। 'কষ্টে বাচিয়া রহিল নন্দলাল।

৬। **বাচ্য পরিবর্তন কর**:—"নন্দলাল তো একদা একটা করিল ভীষণ পণ (কর্তৃবাচ্য)। (কর্মবাচ্যে নন্দলালের একটা ভীষণ পণ করা হইল। বসিয়া বসিয়া রহিব কি চিরকাল, (কর্তৃবাচ্য)—ভাববাচ্যে—চিরকাল আমার, কি বসিয়া বসিয়া থাকা হবে? নন্দ একদা হঠাৎ একটা কাগজ করিল বাহির (কর্তৃবাচ্যে) (কর্মবাচ্য) —একদা হঠাৎ নন্দের একটা কাগজ বাহির করা হইল। লেখে যত তার দ্বিগুণ ঘুমায় (কর্তৃবাচ্যে)। যত লেখা হয় তার দ্বিগুণ ঘুমান হয় (ভাববাচ্য)। চড়িত না গাডি (কর্তৃবাচ্য)। তা'র গাডি চড়া হইত না (ভাববাচ্যে)। তাই শুয়ে শুয়ে কষ্টে বাঁচিয়া রহিল নন্দলাল (কর্তৃবাচ্য)। (ভাববাচ্যে) তাই শুয়ে শুয়ে নন্দের কষ্টে বেঁচে থাকা হ'ল।

৭। বাক্য রচনা কর:—আহাহা, ভ্যালারে, খাটিয়া খুন হওয়া, খেতে ধরা, নাকে খত দেওয়া, বিদ্যা জাহির করা।

মা আমার (পৃঃ ২৫-২৬)

সমাস:—'হিয়ামাঝে'—হৃদয় শব্দ হইতে কবিতায় 'হিয়া', হিয়ার মাঝে (৬ষ্ঠীতৎ)। 'ছোটোখাটো'—ছোট অথচ খাটো (দুইটি বিশেষণে কর্মধারয়.

সমাস)। কলঙ্কভার—কলঙ্কের ভার (ষষ্ঠীতৎ পুরুষ)। তরে (কবিতায়) গদ্যে জন্য।

পদটীকা :—বিসর্জন—বি √সৃজ+অনট্ (ভাববাচ্যে)। অতীত—অতি √ই+ক্ত (কর্তৃবাচ্যে), বর্তমান—√বৃত্+শানচ্। বিষাদময়=বিষাদ+ময়ট্, বি+সদ্+ঘঞ্=বিষাদ। ডালি=উপহার, ডালি দেওয়া—উপহার দেওয়া। ডালা+ই (ক্ষুদ্রার্থে)।

গদ্যরূপ :—দিনু—দিলাম; হিয়া—হৃদয়; আপনারে—আপনাকে; অপরেরে—অপরকে; তায়—তাহাকে; তরে—জন্য।

পদান্তর :—দিন—দৈনিক; জীবন—জীবিত; হাসি—হাসিহাসি (শব্দদ্বৈত দ্বারা বিশেষণ—প্রফুল্ল) ['হাসি' মুখ—এখানে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস হইয়াছে—হাসিযুক্ত মুখ] হিসাব—হিসাবী; কাজ—কেজো (কেজো লোক, কেজো জিনিস); অতীত—অত্যয়; বিষাদময়—বিষাদ; কলংক—কলংকিত; প্রাণ—প্রাণবান্; অশ্রু—অশ্রুমান্ (অশ্রুমতী—স্ত্রীলিঙ্গে; বিসর্জন—বিসৃষ্ট; গান—গীত।

লিঙ্গান্তর :—দুখিনী—দুখী; অতীত—অতীতা; বর্তমান—বর্তমানা; বিষাদময়—বিষাদময়ী।

বিপরীতার্থক শব্দ :—হাসি—কান্না; বিসর্জন—সমর্পণ; হাসিবার—কাঁদিবার; অতীত—বর্তমান; ছোট—বড়; সুখ—দুঃখ; বিষাদময়—আনন্দময়; জীবন—মরণ।

অনুশীলনী

১। পদান্তরে পরিবর্তিত করিয়া বাক্য রচনা কর : জীবন, অশ্রু, বিসর্জন, গান, কলঙ্ক, জীবিত, অশ্রুমান্ (অশ্রুমতী), বিসৃষ্ট, গীত, কলঙ্কিত।

২। '(এ) জীবন (কেবা) ধরে'—'জীবন ধরা' কথাটিকে বিভিন্নভাবে প্রকাশ কর :—**উত্তর** :—প্রাণ ধারণ করা, জীবন ধারণ করা, বাঁচিয়া থাকা, জীবিত থাকা, দেহধারণ করা, সজীব থাকা, জীবনলীলা উদ্‌যাপন করা।

৩। **গদ্যরূপ দাও** :—(১) যেদিন·········মা আমার! মা আমার! **উত্তর** :—দুখিনী জন্মভূমি! মা আমার! মা আমার! যেদিন ও চরণে এ জীবন উপঢৌকন দিয়াছিলাম সেই দিন (হইতে) হাসি অশ্রু বিসর্জন করিয়াছি (কারণ) হাসিবার কাঁদিবার আর অবসর নাই। (২) অনল পুষিতে······মা আমার! মা আমার! উঃ—মা আমার! মা আমার! আপনাকে অপরকে তোমার কাজে নিযুক্ত করিবার জন্য আপনার হৃদয়মধ্যে অনল পোষণ করিতে চাহি। তুমি যখন কাজ চাহ (তখন) ছোটোখাটো সুখদুঃখের হিসাব কে রাখে। (৩) অতীতের কথা······মা আমার!

৪। **অনুক্ত স্থান পূর্ণ কর ঃ—**

মরিব তোমারি — বাঁচিব — তরে,
নহিলে — এ জীবন — — ধরে।
যত — না — তোমার —,
থাক্ — যাক — মা আমার, মা আমার !

৫। **অশুদ্ধি শোধন কর ঃ—**

অতিতের কথা কহি বর্তমান যদি যায়
সে কথাও কহিব না হিয়ায় জপিব তাহায়।
গাই যদি কোনো গান, গাব তবে অনীবার,
মরিব তোমারি জন্য—আমার মা, মা আমার।

বাঙালীর মা (পৃঃ ২৬-২৭)

সন্ধি ঃ—হিমাদ্রি—হিম + অদ্রি ; শ্বেত-ছত্র = শ্বেতছত্র, শ্বেতচ্ছত্র ; নিখিল সাগর অঙ্কে—সন্ধি হয় নাই—বিবৃত্তি করা হইয়াছে। পদ্মাসনে—পদ্ম + আসনে = পদ্মাসনে। পাদোদকসুধা = পাদ + উদক (সুধা)।

গদ্যরূপ ঃ—রাখি—রাখিয়া। তব—তোমার। হিরণ—হিরণ্য। পরান—প্রাণ। অমিয়—অমৃত। নমেন—নমস্কার করেন, প্রণাম করেন।

পদান্তর ঃ—ছত্র—ছত্রী ; মেঘ—মেঘলা : অনুরাগ—অনুরক্ত ; মিষ্ট—মিষ্টতা ; বায়ু—বায়ব, বায়বীয় ; চামর—চামরিণী (= চামরধারিণী) ; আমোদ = আমোদিত ; স্বর্গ—স্বর্গীয় ; দ্বার—দ্বারী ; নিত্য—নিত্যতা ; লক্ষ্মী—লক্ষ্মীবান্ ; ক্ষুধিত—ক্ষুধা ; অন্ন—অন্নবান্ ; পিপাসিত—পিপাসা ; শীতল—শীতলতা ; পানীয়—পান ; ঋদ্ধি—ঋদ্ধ ; সিদ্ধি—সিদ্ধ ; দেবতা—দিব্য ; জগৎ—জাগতিক ; সন্ধ্যা—সান্ধ্য ; ধান—ধানী ; ভগবান্—ভাগবত।

লিঙ্গান্তর ঃ—অজগর (অজাগর নহে)—অজগরী ; লক্ষ্মী—নারায়ণ ; করী—করিণী ; ভগবান্—ভগবতী।

প্রতিশব্দ (সাধু) ঃ—ঢেউ—তরঙ্গ, উর্মি ; ঝাঁপি—পেটিকা ; আঙিনা—অঙ্গন, প্রাঙ্গণ।

ব্যুৎপত্তি ঃ—ম্লান— √ম্লৈ + ক্ত (কর্তৃবাচ্যে) ; অনুরাগ—অনু— √রঞ্জ্ + ঘঞ্ (ভাবে)।

সমাস ঃ—শ্বেতছত্র (কর্মধারয়), কাঞ্চীসম—কাঞ্চীর সম (ষষ্ঠী তৎপুরুষ), হিরণ-হরিত—'হিরণ্য' শব্দ হইতে কবিতায় 'হিরণ', হিরণ এবং হরিত (দ্বন্দ্ব), ফুলপুঞ্জ—ফুলের পুঞ্জ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ), মেঘধারাযন্ত্রে—মেঘরূপ ধারা যন্ত্র (রূপক কর্মধারয়), ধারার যন্ত্র (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। পাদোদকসুধা—(পাদ + উদক) পাদার্ঘ

উদকং (জল) (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়) পাদোদকরূপ সুধা (রূপক কর্মধারয়), 'কিরণকমল'—কিরণরূপ কমল (রূপক কর্মধারয়)। পুঞ্জীভূত—যাহা পুঞ্জ ছিল না পরে পুঞ্জ হইয়াছে—অভূততদ্‌ভাবে চি প্রত্যয়, গতি সমাস।

পদটীকা ঃ—ঝালর (মেঘের)—সংস্কৃত 'ঝল্লরী' শব্দ হইতে, বস্ত্রাদির কুঞ্চিত প্রান্তদেশ। **ঢেউ**—(**দেশী শব্দ**) তরঙ্গ, ঊর্মি। আমোদিত—হর্ষযুক্ত, আ+ √মুদ্+ণিচ্+ক্ত (কর্মবাচ্য)। [যখন অর্থ হইবে 'সুগন্ধযুক্ত' তখন ব্যুৎপত্তি হইবে আমোদ (সুগন্ধ)+ইতচ্—(জাতার্থে)। ঝাঁপি—ঢাকনিযুক্ত ক্ষুদ্র পেটিকা বিশেষ। ঝাঁপ (ঢাকনি বাংলা শব্দ)+ই বা ঈ প্রত্যয় ক্ষুদ্রার্থে। রাতুল—সংস্কৃত 'রক্ত'+উল প্রাকৃত* রত্‌তুল>বাং রাতুল রক্তবর্ণ, রাঙা। ক্ষুধিত ক্ষুধা+ইতচ্ (জাতার্থে)। (কিরণের) ছড়া—ইতস্ততঃ ছিটান (তরল পদার্থ), 'গোবর ছড়া', জলের ছড়া ইত্যাদি বাং √ছড়া (ধাতু)+আ ভাববাচ্য। আঙিনা—উঠান সংস্কৃত 'অঙ্গন' শব্দ হইতে। পুঞ্জীভূত—যাহা পুঞ্জ ছিল না পরে পুঞ্জ হইযাছে—পুঞ্জ+চ্বি (পুঞ্জী)+ভূ+ক্ত (কর্তৃবাচ্যে)।

অনুশীলনী

১। ঝাঁপি, ঝালর, ছড়া, রাতুল, আঙিনা—ইহারা কোন্ শ্রেণীর শব্দের মধ্যে পড়ে?

২। কেন কোন্ কোন্ বিভক্তি হইয়াছে লিখ :—(ক) "**অনশনে** হরিতেছে জগতের ক্ষুধা।" (খ) "**কিরণের** ছড়া উষা দিয়ে যায়।" (গ) **ক্ষুধিতে** যোগায় অন্ন। **উত্তর** ঃ—(ক) ক্রিয়া বিশেষণে তৃতীয়া (—এ বিভক্তি) (খ) '**ছড়া**' পদের সহিত উপাদান সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি। (গ) সম্প্রদানে চতুর্থী (—এ বিভক্তি)।

৩। 'ছড়া' শব্দের বিভিন্ন অর্থ প্রদর্শনপূর্বক বাক্য রচনা কর :—(১) গ্রাম্য কবিতাবিশেষ—'একখানা ছড়ার বই সংগ্রহ করিলে ভাল হয়।' (২) গুচ্ছ—একছড়া কলার আর একছড়া সোনার হারের দাম সমান নহে। (৩) 'ছিটা'—সকালবেলায় গৃহস্থের উঠানে গোবর-ছড়া পড়ে। আলংকারিক ভাষায়—'উষা' তোমার আঙিনায় কিরণের ছড়া দিয়া যায়।

৪। 'চামর'—শব্দকে পদান্তরিত করিয়া বাক্য রচনা কর। **উত্তর** ঃ—(১) চামরী, চমরী—হিমালয়ে চমরী গাই দেখা যায়, (২) 'চামরধারিণী'—অর্থে মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রয়োগ—'ঢুলাইছে **চামরিণী** সুচামর'।

৫। **পূর্ণরূপ দাও** ঃ—(১) মেঘের ঝালর তায়······করে। (২) কাঞ্চীসম ······জাহ্নবী। (৩) চরে তব······অঞ্জলি। (৫) তব মেঘধারা যন্ত্রে······ পানীয়। (৬) নিজে রহি······জগতের ক্ষুধা। (৭) তোমারে আশিসি পুন নমেন······ভগবান্। (৮) কুঞ্জ······পরান অঞ্জলি। **উত্তর** :—(১) তাহাতে

মেঘের ঝালর ঢেউ খেলাইয়া দিক্ শোভিত করে। (২) কটিকে বেষ্টন করিয়া কাঞ্চীসম জাহ্নবী নাচিয়া ধ্বনিত হইতেছে। (৩) হিরণ্য হরিতে গড়া, সরিতে সরিতে ভরা তোমার আনন্দভুবন কলকল গীতে আমোদিত স্বর্গ তোমার ও ধূলায় লুটাইতে দ্বারে নাম (=নামিয়া আসে)। (৪) তোমার শ্যাম গোষ্ঠে বেণুরবে ধবলী শ্যামলী চরে। (৫) তোমার ধারাযন্ত্রে অমৃত ঝরঝর করিয়া ঝরিতেছে। (৬) নিজে অনশনে থাকিয়া জগতের ক্ষুধা হরণ করিতেছ। (৭) ভগবান তোমাকে আশীর্বাদ করিয়া পুনঃ নমস্কার করেন। (৮) কুঞ্জ ফুলপুঞ্জে প্রাণাঞ্জলি দেয়।

৬। **শুদ্ধ করিয়া লিখ ঃ**—হিম-অদ্রি। তুসাব। শেতছত্র। গর্জে নিম্নে কলকল। লক্ষফণা অজাগর। সর্গ নামে তব দারে ও ধুলায় লুটিতে। বেহুরব। বৈতালীক। ক্ষুধিতে যোগায় অন্ন। পুঞ্জিভূত দুর্বা আর ধান।

৭। **অনুক্ত স্থান পূরণ কর ঃ**—

নিখিল সাগর — তুমি —কমলে কামিনী,
বসে আছ —মহাধ্যানে —
ঋদ্ধি — দুই —শান্তিঘট — —
ঢালিতেছে — শিবে দেবতার — —
নিজে রহি — হরিতেছ — ক্ষুধা।

৮। **বাচ্য পরিবর্তন কর ঃ**—(১) কুঞ্জ দেয়·····অঞ্জলি। (২) মিষ্ট বায়ু চামর ঢুলায়। (৩) বঙ্গসিন্ধু পদযুগ ..ধোয়ায়। উত্তর ঃ—(১) কুঞ্জকর্তৃক ফুলপুঞ্জ-দ্বারা প্রাণাঞ্জলি দেওয়া (প্রদত্ত) হয়। (২) মিষ্টবায়ু কর্তৃক চামর আন্দোলিত হয়। (৩) বঙ্গসিন্ধুকতৃক পদযুগ শিরে রাখিয়া ধৌত করা হয়।

ছোটর দাবি (পৃঃ ৩৪-৩৫)

সন্ধি ঃ—চন্দ্রাননে=চন্দ্র+আননে। গিরীশ—গিরি+ঈশ।

সমাস ঃ—**তরুবর**—তরুগণের মধ্যে বর (শ্রেষ্ঠ) (ষষ্ঠীতৎপুরুষ), **রাবণরাজা**—যিনি রাবণ তিনিই রাজা (দুইটি বিশেষ্য পদে কর্মধারয়, তুঃ রাজর্ষি অথবা রাবণ নামক রাজা (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। **বিদুর-ক্ষুদ**—বিদুরের ক্ষুদ (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। **মহামায়া**—মহা (মহতী) মায়া যাঁহার (দুর্গা—নিত্য সমাস বহুব্রীহি)। **চন্দ্রাননে**—চন্দ্রতুল্য আনন (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়) তুঃ 'বিম্বাধর'। **অট্টহাসি**—অট্ট (অতিশয় উচ্চ) যে হাসি (কর্মধারয়)।

পদটীকা ঃ—দাবি—অধিকার (আরবী শব্দ) দাবিয়া (দাবাইয়া=দমন করিয়া) বাঙলা √দাবা (ধাতু+ইয়া>দাবিয়া চলে=যৌগিক ক্রিয়া (তুঃ উঠিয়া পড়া, পাইয়া বসা ইত্যাদি)। ছোটো—(সং ক্ষুদ্র শব্দ)। বড়—[সংস্কৃত বড্র শব্দ হইতে "সংসদ অভিধান"] বৃহৎ প্রকাণ্ড। গাবিয়া—গাবাইয়া গর্ব করিয়া

গাহিয়া বা ঘোষণা করিয়া (সং গর্ব>গাব+আ) (নাম ধাতু)+ইয়া=গাবাইয়া গাবিয়ে। ভুলায়—ভুল+আ (প্রেরণার্থক)+প্রথম পুরুষ একবচন। ফাগ—সংস্কৃত ফল্গু শব্দ হইতে—আবীর। বাঁশরী—বাঁশি পদ্যে সাধারণতঃ বাঁশরী। গিরীশ—গিরিগণের ঈশ (অধীশ্বর)—(১) **হিমালয়** (২) গিরির (কৈলাস গিরির) ঈশ (অধীশ্বর—প্রভু) **শিব**। গিরিশ—**শিব** (গিরিতে শয়ন করেন যিনি। গিরিশ শব্দের অর্থ **শিব** কিন্তু গিরীশ শব্দে হিমালয় ও শিবকে বুঝায়। ম্লান √ম্লৈ+ক্ত। পাণ্ডব—পাণ্ডুর অপত্য—পাণ্ডু+অণ্ (প্রত্যয়)। (প্রেম) সখ্য—সখার ভাব সখি+য (ভাবার্থে)। সখীত্ব—সখী+ত্ব ভাবার্থে। দ্বারাবতী—দ্বার+মতুপ্ (বতুপ) নিপাতনে দীর্ঘ।

কারক বিভক্তিঃ—"ভুলায় বড়োর **অট্টহাসি** ছোটর কণা **নয়নজলে**"—নয়নজলে প্রযোজক কর্তায় প্রথমা বিভক্তি (-এ) অট্টহাসি—কর্মে শূন্য দ্বিতীয়া বিভক্তি [=অট্টহাসিকে] বড়োর—কৃদ্‌যোগে কর্তায় ষষ্ঠী বিভক্তি ['হাসি' (অট্টহাসি √হস্‌ন্ত পদের কর্তা "বড়োর"] কণা (নয়নজল)—'নয়ন জল' পদের বিশেষণ (কণা=এককণা)। **"মহামায়ায়** যতই **মানাক** সিংহ আর **সিংহাসনে**" মহামায়ায় (=মহামায়াকে) কর্মক-কর্তৃবাচ্য বা কর্মবাচ্যের কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি [তুলঃ এ বেশে তোমাকে **মানায়** না, ছোট মুখে বড় কথা ভাল শোনায় না] **মানাক**— √মান+আ (কর্ম বা কর্ম-কর্তৃবাচ্যে)+অনুজ্ঞা-বিভক্তি—প্রথম পুরুষ। **সিংহাসনে**— উপলক্ষণে তৃতীয়া (—এ বিভক্তি)।

অনুশীলনী

১। ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন কর :—ম্লান, পাণ্ডব, সখ্য, দ্বারাবতী।

২। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লিখ :—মহামায়া, সিংহাসন, চন্দ্রানন, অট্টহাসি। ৩। **"গিরিশ"** ও **"গিরিশ"** শব্দের অর্থের কোন পার্থক্য আছে কি? যদি থাকে বা না থাকে তাহার কারণ নির্দেশ কর। **উত্তরঃ**—(১) **গিরিশ শব্দের একমাত্র অর্থ শিব**। (গিরিতে—কৈলাস গিরিতে যিনি শয়ন করেন—গিরি+শী+ড) কর্তৃবাচ্য কৈলাশ পর্বতবাসী শিব। (২) গিরীশ, শব্দের অর্থ দুইটি—গিরির (কৈলাশ গিরির) ঈশ অধীশ্বর (ক) **শিব**। 'শিব' অর্থে **'গিরিশ'** এবং **'গিরীশের'** মধ্যে **কোন প্রভেদ নাই**। (খ) গিরিগণের ঈশ্বর—অর্থ 'হিমালয়'। যেখানে অর্থ **হিমালয়** সেখানে প্রভেদ আছে। সুতরাং সার্থক **বাক্য** দেখিলে বলা যায় প্রভেদ আছে কি নাই। **বাক্য হইতে বিচ্ছিন্ন শব্দ** দুইটির পার্থক্য আলোচনা করা যাইতে পারে না। "ছোটর দাবি" কবিতায় (মা মেনকার অশ্রুকণায় বিশাল **গিরীশ** পড়ল ঢাকা) গিরীশ শব্দের অর্থ হিমালয়। সুতরাং "গিরিশ" এবং "গিরীশের" মধ্যে পার্থক্য এখানে আছে।

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীতার্থ বোধক শব্দ দ্বারা বাক্য রচনা কর :—তুচ্ছ, ভুলায়, ম্লান, কাতর, পূর্ণতা, মিষ্ট, বিশাল, হিংসা, মধু, ঢাকা ('পড়্‌ল ঢাকা')।

৫। চতুর্থ প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলিকে পদান্তরে পরিবর্তিত করিয়া বাক্য রচনা কর।

৬। **গদ্যরূপ দাও** :—(১) ছোট যে হায়····দাবিয়ে চলে। (২) ভুলি কোশল······সীতার সাথে। উঃ—(১) হায়। ছোটো বড়োর দাবিকে অনেক সময় দাবাইয়া চলে, যে জল বড়ো তাহা রেখা টানিয়া ছোটর গতিকে দাবাইয়া চলে। (২) আমরা কোশল পৌরভবন ভুলি, (কিন্তু) অশোক কানন (আর) বন্দিনী মা সীতার সঙ্গে সরমার সখীত্বটি ভুলিতে পারি না।

৭। **বাচ্য পরিবর্তন কর** :—(১) ছোটোর অনুরাগের রাখী আয়াস করেও খুলতে নারি। (২) আদর করি শিখীর চেয়ে চূড়ার শোভা শিখীর পাখা। (৩) খনি রেখে মণিই তুলি। (৪) ভুলি দ্বারাবতীর ঘটা। উঃ—(১) ছোটোর অনুরাগের রাখী আয়াস করিয়াও খোলা যায় না। (২) শিখীর চেয়ে চূড়ার শোভা (আর) শিখীর পাখা (বেশি) আদৃত হয়। (৩) খনি রাখিয়া মণিই তোলা হয়। (৪) দ্বারাবতীর ঘটা ভোলা হয়।

৮। **অশুদ্ধি শোধন কর** :—মহামায়ায় যতই মানাক সিংহ এবং সিংহাসনে,
রামপ্রসাদের বেরার ধারে দেখেই যে হয় হিংসা মনে।
বাজ্ঞি ঘটা লক্ষ্যবলী—অলক্ষে সব যায় যে চলি—
বোক্ষ্যে জাগে দৃষ্টি মিষ্টি হাসি চন্দ্রবদনে।

জন্মভূমি (পৃঃ ২৯—৩১)

সন্ধি :—স্বাধীন—স্ব+অধীন : **সমাস** :—আঁধার-করা—আধারকে করা (√কর্+আ=কৃত) দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, বিশেষণ (বিশেষ্য 'প্রান্তটি,')। কেয়াঝাড় —কেয়ার ঝাড়—ষষ্ঠীতৎপুরুষ ; ঝোপে-ঝাড়ে—ঝোপ এবং ঝাড় (তাহাদিগেতে) **সমার্থক পদে দ্বন্দ্ব সমাস**। পূর্ব পদের বিভক্তির লোপ না হওয়ায় **'ঝোপে-ঝাড়ে'** অলুক্ দ্বন্দ্ব সমাস। (তুলঃ 'মায়ে-ঝিয়ে' 'বনে-জঙ্গলে' 'পথে-প্রবাসে')। **ঘুটে-ছাই**—(খাঁটি বাঙ্গলা সমাস) ঘুঁটে ও ছাই—দ্বন্দ্ব সমাস। **গলাগলি**—গলায় গলায় (=পরস্পরের গলায়) লাগিয়া থাকা—ব্যতিহার বহুব্রীহি। **বনে-ভরা**—বনে (=বন দ্বারা—তৃতীয়া—'এ' বিভক্তির অলুক্) ভরা—(পূর্ণ) অলুক্ তৃতীয়া তৎপুরুষ। পদ্মদিঘি—পদ্মে ভরা দিঘি (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। **বাধা-বাঁধন হারা**—বাধা (তৎসম-শব্দ) এবং বাঁধন অর্ধ-তৎসম (দ্বন্দ্ব সমাস) বাধা-বাঁধন হইতে হারা (মুক্ত) পঞ্চমীতৎ। সাদাসিদে—সাধা অথচ সিধা

(দুইটি বিশেষণ পদে কর্মধারয় সমাস)। সৃষ্টিছাড়া—সৃষ্টি হইতে ছাড়া (পঞ্চমী তৎপুরুষ) [তুলঃ 'ঘরছাড়া', 'পালছাড়া', (গোরু)।

পদটীকাঃ—জটলা—জট্ + লা (সাদৃশ্যার্থে) (বাংলায়) জটের মত (যেমন চুল জমাট বাঁধিয়া জট হয়, সেইরূপ বহুলোকের একত্র সমাবেশে জটলা হয়)। [তুলঃ—'ছুঁচল ছুঁচলা', ছুঁচের মত সরু।] বেড়া—বেষ্টনী, বৃত্তি (সংস্কৃত), বাং গুঁড়োয়, বাং গুঁড়া (ধাতু সং √গুণ্ড + প্রথম পুরুষ একবচন কর্মকর্তৃবাচ্য। বদ্দি—ডাক্তার, চিকিৎসক 'বৈদ্য'-শব্দ হইতে অর্ধতৎসম শব্দ 'বদ্দি' (তুঃ পোথি বা পথি পথ্য হইতে)। সান্ধ্য—সন্ধ্যা + অ (ণ) সন্ধ্যা সম্বন্ধীয়। আবাদ—কৃষি, চাষ—ফারসী শব্দ। বিবাদ—ঝগড়া, বি + √বদ্ (বলা) + ঘঞ্ (ভাবে)। সুবাদ—বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা, সু + বদ্ + ঘঞ্ ['আবাদে'র সহিত বিবাদের √বদ্ ধাতু এবং সুবাদের √বদ্ ধাতুর কোন সম্পর্ক নাই। কেবল ধ্বনির আংশিক সমতা আছে। বিবাদের 'বদ্' ধাতু ও সুবাদের বদ্ ধাতু সমার্থক। উপসর্গের যোগে ইহার অর্থের পরিবর্তন হইয়াছে।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির সাধু ভাষায় ব্যবহৃত প্রতিশব্দ লিখ :—(১) বাগান (ফারসী), (২) জটলা, (৩) কেয়াঝাড়, (৪) বাঁশবাগান, (৫) বেড়া, (৬) শুকনো, (৭) গাঁ, (৮) বাধা-বাঁধন-হারা, (৯) আবাদ, (১০) গোরুর গাড়ি, (১১) গাদা. (১২) ডোবা, (১৩) কুমোরপাড়া, (১৪) কাদা। উত্তর :—(১) উদ্যান, (২) জন সমাবেশ, (১) কেতকীকুঞ্জ, কেতকীনিকুঞ্জ, (৩) বেণুকুঞ্জ, [তুঃ 'মর্মরিত বেণুকুঞ্জে বাজে তব বাঁশি'—নরেন্দ্রদেব]। (৫) বৃত্তি, (৬) শুষ্ক, (৭) গ্রাম, (৮) বাধা-বন্ধহীন, (৯) কৃষিকার্য, (১০) গোযান, গো-শকট, (১১) পরিপূর্ণ, (১২) পল্বল, (১৩) কুম্ভকার-পল্লী, (৪) কর্দম।

২। পদান্তরে পরিবর্তিত করিয়া বাক্য রচনা কর :—আবাদ, গাঁ, শুকনো, শান্তি। উঃ আবাদী, গেঁয়ো, শোষণ, শান্ত।

৩। প্রকৃতি-প্রত্যয় প্রদর্শন কর :—সান্ধ্য, সৃষ্টি, সুখী, জটলা, শান্তি। উঃ—সন্ধ্যা + অণ্, √সৃজ + ক্তি (ভাবে), সুখ + ইন্, জট + লা, শম্ + ক্তি।

৪। অর্থের প্রভেদ দেখাইয়া বাক্য রচনা কর :—কাদা, কাঁদা ; গা, গাঁ ; বন, বান ; ভাট, ভাঁট ; চুড়ি, চুরি। উত্তর :—ভাট—স্তুতিপাঠক। ভাট—রাজার গৌরব গাথা গান করিলেন। ভাঁট—ঘেঁটু ফুলের গাছ (সংস্কৃত 'ভাণ্ডীর') সেই 'পড়ো গ্রামে অজস্র ভাঁটফুল ফুটিয়া রহিয়াছে।

৫। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম কর :—পদ্মদিঘি, সাদাসিধে, গলাগলি, বাঁধনহারা।

৬। বাক্য রচনা কর ঃ—পায়ে পায়ে, সাদাসিধে, বাঁধনহারা, সৃষ্টিছাড়া, জটলা, সুবাদ।

৭। **বাচ্য পরিবর্তন কর ঃ**—(১) তবু আমার চিত্ত সেথায় গেছে চুরি। (২) পদ্মদীঘি কোথায় পাব (কর্তৃবাচ্য)। (৩) ঐ যে গাঁটি দেখা যাচ্ছে। (কর্মবাচ্য)। উত্তর ঃ—(১) তবু আমার চিত্তকে সেখানে কেহ চুরি করেছে (কর্তৃবাচ্য)। (২) পদ্মদীঘি কোথায় পাওয়া যাবে (কর্মবাচ্য)। (৩) লোকে ঐ যে গাঁটিকে দেখছে। (কর্তৃবাচ্য)।

৮। **অশুদ্ধি শোধন কর ঃ**—

(১) গরুর গাড়ীর চাকায পথে সুকায নাকো কাঁদা
কোথাও বা তার বেরার পাসে ঘুটে ছাইয়েব গাঁদা—
তবু আমার জন্মভূমী সর্গপুরি,
বিশ্বশোভা এইখানেতে গেছে চুরী।

(২) ঐযে গাটি যাচ্ছে দেখা আইবিখেতের আরে—
প্রান্তটি যাঁর আধারকরা শবুজ কেঁয়াঝারে,
পুবের দিকে আমকাঠালের বাগান দিযে ঘেড়া,
জটলা করে যাঁহার তলে রাখাল বালকেরা
ঐটি আমার গ্রাম, আমার সর্গপুবি
ঐখানেতে হৃদয আমার গেছে চুরী।

৯। **শূন্য স্থান পূরণ কর ঃ**—

তবু উঠে —— কদমতলাব ধারে
—— মিলনগীতি —— অন্ধকারে,
সবাই —— স্বাধীন —— বাধাবাঁধনহারা
—— করে, বিবাদ —— সুবাদ করে —— ;
এমনি —— সাদাসিধে স্বর্গপুরী,
তাই —— আমার —— সেথায় —— চুরি।

১০। **সার্থক বাক্য রচনা কর ঃ**—জটলা, কম্‌তি, সুবাদ, সাদাসিদে, বাঁধনহারা, গলাগলি, সৃষ্টিছাডা।

শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা (পৃঃ ৪৭-৫১)

[**দ্রষ্টব্য ঃ**—পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গদ্য-রচনা-শৈলীর আধারের উপর বাঙ্‌লা সাধু গদ্য-রীতি প্রতিষ্ঠিত। "বিদ্যাসাগর"ই বাঙ্‌লা গদ্য-রীতিতে সুষমা আনয়ন করেন। এই দুই কারণে তাঁহাকে বাঙ্‌লা গদ্যের জনক বলা হয়। তাঁহার ভাষা প্রয়োগ-রীতি ছাত্রগণের লক্ষণীয়।]

সন্ধি ঃ—বাক্ + শক্তি = বাক্‌শক্তি, [বাক্‌ছক্তি] ['ছকার' এখানে বৈকল্পিক। শুনিতে ভাল শোনা যায় না বলিয়া লেখক 'বাক্‌শক্তিই ব্যবহার করিয়াছেন। হৃৎকম্প—হৃদ্ + কম্প। সমাধান—সম্ + আধান। মহর্ষি—মহা + ঋষি (কিন্তু রাজর্ষি রাজ + ঋষি—রাজা + ঋষি নহে)। প্রিয়ংবদা—প্রিয়ম্ + বদা (প্রিয়ম্বদা নহে—লিখিলে ভুল হইবে)। শোকাকুল—শোক + আকুল। আশ্চর্য—আ + চর্য (অনিত্য বস্তু) [কিন্তু 'আচর্য' = আচরণীয়]। শোকাবেগ—শোক + আবেগ। সংবরণ—সম্ + বরণ (সম্বরণ নহে)। গাত্রোত্থান—গাত্র + উত্থান (উৎ + স্থান = উত্থান)। ব্যগ্র—বি + অগ্র। তপোবন—তপঃ + বন। নিরানন্দ—নিঃ + আনন্দ। পরাঙ্‌মুখ—পরাক্ + মুখ। সম্ভাষণ—সম্ + ভাষণ (= সংভাষণ নহে)। রক্ষণাবেক্ষণ—রক্ষণ + অবেক্ষণ। স্বেচ্ছাক্রমে—স্ব + ইচ্ছাক্রমে। সন্দেশ—সম্ + দেশ। নির্দেশ—নিঃ + দেশ। সম্বোধন—সম্ + বোধন ('সংবোধন' নহে)। একাধিপতি—এক + অধিপতি। শান্তরসাস্পদ—শান্তরস + আস্পদ (আ + পদ = আস্পদ)। বহির্ভূত—বহিঃ + ভূত। আশ্রমাভিমুখে—আশ্রম + অভিমুখে। প্রত্যর্পিত—প্রতি + অর্পিত। নিশ্চিন্ত—নিঃ + চিন্ত। নিরুদ্বেগ—নিঃ + উদ্বেগ (উৎ + বেগ = উদ্বেগ)।

সমাস ঃ—অনুক্ষণ = ক্ষণে ক্ষণে (অব্যয়ীভাব)। ভূষণপ্রিয়া—ভূষণ প্রিয় যাহার (স্ত্রীলিঙ্গে) (বহুব্রীহি) বিকল্পে 'প্রিয়ভূষণা'। শাখাবাহু—শাখারূপ বাহু (রূপক কর্মধারয়)। অশ্রুবেগ—অশ্রুর বেগ (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। ক্ষীরপাদপ—ক্ষীর (রস) বর্ষী পাদপ (বৃক্ষ) (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। পাদ (পা) দ্বারা পান করে যে—পাদপ (উপপদ তৎপুরুষ)। সসাগরা—সাগরের সহিত বর্তমান (স্ত্রীলিঙ্গে) তুল্যযোগে বহুব্রীহি। ব্রণশোষণ = ব্রণের (ক্ষতের সংস্কৃত ভাষায় ব্রণ শব্দের অর্থ 'ক্ষত') শোষণ (শুকান, 'ঘা শুকান' চলিত কথায়) ষষ্ঠীতৎপুরুষ। [এই গদ্য সন্দর্ভে দুইটি পদের বেশি পদে কোন সমাস নাই। ইহা খাঁটি বাঙলা সমাসের রীতি।]

বিভক্তি ঃ—মধুকর মধুকরী মধুপানে বিরত হইয়াছে—(মধুপানে বিরত = মধুপান হইতে বিরত) অপাদানের অধিকরণ বিবক্ষায় সপ্তমী বিভক্তি। [বিবক্ষা = বলিবার ইচ্ছা, বক্তার বলিবার ধরন অনুসারে এক কারকের স্থানে অন্য কারকের প্রযোগ হয়]। তোমারে (ও) = তোমাকে [প্রাচীন প্রযোগে এবং আধুনিক ও প্রাচীন কবিতাতে "তোমারে" ব্যবহার হয়। গদ্যে "তোমাকে" প্রযুক্ত হয়] সম্প্রদানে চতুর্থী। রসাস্বাদে (বিমুখ)—বিষয়াধিকরণে সপ্তমী। হস্তে—সম্প্রদানে চতুর্থী (হস্তে সমর্পণ)। স্বেচ্ছাক্রমে—ক্রিয়াবিশেষণে তৃতীয়া (—এ বিভক্তি)।

পদটীকা ঃ—বৈক্লব্য—বিক্লব + য (ষ্যঞ্) ভাবার্থে। মধুকর—মধু—√

কৃ+অ (ট) কর্তৃবাচ্যে। আপনকার—আধুনিক বাঙ্লায় 'আপনার'। যাইবেক—বর্তমান সাধু বাঙ্লায় 'যাইবে'—প্রাদেশিক 'যাবেক' অবশ্যার্থে (=অবশ্য যাইবে—নিশ্চয় যাইবে)। সন্দেশ—সংবাদ (অর্থের প্রসারে মিষ্টান্ন বিশেষ,—খালি হাতে সংবাদ লইয়া কেহ যায় না—'মিষ্টি' লইয়া যায়—অবশ্য ভাল খবর হইলে)। কার্কশ্য—কর্কশ+য (ষঞ্) ভাবার্থে (কর্কশতা)। সন্নিবেশিত—সম্+নি √বিশ্ (ণিচ্)+ক্ত (কর্মবাচ্যে)।

বাগ্‌ভঙ্গি ঃ (বেশভূষার) সমাধান=অর্থ (বেশভূষার) ব্যবস্থা। বর্তমানে সাধু ভাষায় এই অর্থে 'সমাধান' শব্দের প্রয়োগ রীতিবিরুদ্ধ। 'প্রশ্নের সমাধান', 'সমস্যার সমাধান'—এইসব স্থলে 'সমাধান' ব্যবহার হয়। শকুন্তলাকে সান্ত্বনা করিবে—বর্তমান বাঙ্লায় 'সান্ত্বনা দিবে' প্রয়োগ হয়। **সন্দেশ নির্দেশ করিয়া**—বর্তমান সাধুরীতিতে 'বাণী' প্রেরণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া **'আমার পা উঠিতেছে না, 'বেলা বহিয়া যায়'** (বেলা বয়ে যায়) আধুনিক বাঙ্লা ভাষায়ও এইরূপ প্রয়োগ লক্ষণীয়।

সাধুভাষার পদ বা পদসমষ্টি চলিত ভাষায় পরিবর্তন ঃ—বেশভূষার সমাধান করিয়া দিলেন—কাপড়-গহনা দিয়ে সাজিয়ে দিলেন। বৈক্লব্য—ছটফটানো। কাহার হস্তে সমর্পণ করিলে—কার হাতে দিয়ে গেলে। দৃষ্টিপাত হওয়াতে—চোখ পড়াতে। পদক্ষেপ—পা ফেলা। ব্রণশোষণ—ঘা শুকান, রক্ষণাবেক্ষণ—দেখাশোনা, অবস্থিত হইলে—দাঁড়ালে, অশ্রুবেগ—চোখের জলের ধারা, প্রতিগমন কর—ফিরে যাও, **স্বনামাঙ্কিত**—নিজের নাম খোদাই করা, **কার্কশ্য প্রদর্শন করা**—কড়া মেজাজ দেখানো, প্রাণধারণ করব—বাঁচব।

পদান্তর ঃ—প্রস্থান—প্রস্থিত ; প্রস্তুত—প্রস্তাব ; সমাধান—সমাহিত ; অত্যু—অত্যুক্ত ; উৎকণ্ঠিত—উৎকণ্ঠা ; অভিভূত—অভিভব ; সংবরণ—সংবৃত ; সম্বোধন—সম্বোধিত ; প্রস্থান—প্রস্থিত ; স্নেহ—স্নিগ্ধ, স্নেহবান্ ; ব্যগ্র—ব্যগ্রতা ; পরিত্যাগ—পরিত্যক্ত ; বিরত—বিরাম ; সম্ভাষণ—সম্ভাষিত ; আলিঙ্গন—আলিঙ্গিত ; রোদন—রুদিত ; আঘাত—আহত ; বিলম্ব—বিলম্বিত ; প্রার্থনা—প্রার্থিত ; সন্দেশ—সন্দিষ্ট ; নির্দেশ—নির্দিষ্ট ; লৌকিক—লোক ; অনভিজ্ঞ—অনভিজ্ঞতা ; শুশ্রূষা—শুশ্রূষু ; সন্নিবেশিত—সন্নিবেশ ; প্রতিষ্ঠিত—প্রতিষ্ঠা ; সাংসারিক—সংসার ; শীঘ্র—শীঘ্রতা ; প্রতিগমন—প্রতিগত ; নিশ্চিন্ত—নিশ্চিন্ততা ; কর্কশ—কার্কশ্য।

লিঙ্গান্তর ঃ—গৌতমী—গৌতম, বনবাসী—বনবাসিনী ; সংসারী—সংসারিণী ; হরিণ—হরিণী ; ময়ূর—ময়ূরী ; কোকিল—কোকিলা ; মধুকর—মধুকরী ; দূরবর্তিনী—দূরবর্তী ; অনুরাগিণী—অনুরাগী ; সখি, সখী—সখা ; গৃহী—গৃহিণী ; রাজা—রাজ্ঞী, রানী ; তনয়—তনয়া।

প্রাচীন প্রয়োগের আধুনিক রূপ ঃ—সমভিব্যাহারে—সঙ্গে, সহিত। যাইবেক—যাইবে। সান্ত্বনা করিবে—সান্ত্বনা দিবে। আপনকার—আপনার। ঘটিবেক—ঘটিবে। হইবেক—হইবে।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির চলিত ভাষায় ব্যবহৃত প্রতিশব্দ লিখ :—গাত্রোত্থান, নিরুদ্বেগ, সপত্নী, কার্কশ্য রোষবশা, সান্ত্বনা, হৃৎকম্প, কালহরণ, গাত্রে হস্ত প্রদান করিয়া।

২। 'সন্দেশ' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শনপূর্বক ইহার মূল যে ধাতু তাহার সহিত উপসর্গ যোগে বিভিন্নার্থক শব্দ গঠন কর। **উত্তর** ঃ—সন্দেশ—সম্ + দিশ্ + অ (ঘঞ্), আদেশ, নির্দেশ, প্রদেশ, অতিদেশ, অপদেশ (ছল), উদ্দেশ, উপদেশ।

৩। পদান্তরে পরিবর্তিত কর :—শীঘ্র, শঙ্কিত, গর্ব, সন্নিবেশিত, উত্থান, শোষণ, লৌকিক, সমাপ্ত, ব্যস্ত, প্রতিগমন, স্নেহ, ক্ষান্ত, বিরত।

৪। লিঙ্গান্তরে পরিবর্তিত কর :—পতি, মধুকর, বনবাসী, অনুরাগিণী।

৫। "দুষ্যন্তরাজধানী-উদ্দেশে"—এখানে সন্ধি না করিবার কারণ নির্দেশ কর।

৬। **বাচ্য পরিবর্তন কর** ঃ—(১) অনসূয়া ও······দিলেন। (কর্তৃবাচ্য); (২) জড়তায় নিতান্ত অভিভূত হইতেছি। (৩) কদাচ তোমাদের······করিতেন না। (৪) মধুকর মধুকরী মধুপানে বিরত হইয়াছে ও গুন্‌গুন্ ধ্বনি পরিত্যাগ করিয়াছে। (৫) আমি বনতোষিণীকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম। (৬) ইহাদের বিবাহ হয় নাই। (৭) যদি রাজা শীঘ্র চিনিতে না পারেন, তাঁহাকে স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দেখাইও। **উত্তর** :—(১) অনুসূয়া ও প্রিয়ংবদা কর্তৃক যথাসম্ভব বেশভূষা সমাহিত হইল (কর্ম-বাচ্য)। (২) জড়তা আমার নিতান্ত অবিভব উপস্থিত করিতেছে। (৩) যাঁহাদ্বারা কদাচ তোমাদের পল্লব ভগ্ন হইত না। (৪) মধুকর মধুকরীদের মধু পানের বিরতি হইযাছে ও তাহাদিগের দ্বারা গুন্ গুন্ ধ্বনি পরিত্যক্ত হইয়াছে। (৫) আমাকর্তৃক বনতোষিণী তোমার হস্তে সমর্পিত হইল। (৬) ইহারা বরকর্তৃক অনূঢ়া (কর্মবাচ্যে)। (৭) যদি রাজা-কর্তৃক শীঘ্র পরিজ্ঞাত না হও, তাঁহাকে স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় (তোমার) প্রদর্শনীয় (কর্মবাচ্যে)।

৭। **উপযুক্ত বিশেষণপদদ্বারা শূন্যস্থান পূর্ণ কর** ঃ—

প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি! তুমিই যে কেবল তপোবন বিরহে—হইতেছে—নহে, তোমার বিরহে তপোবনের কী অবস্থা ঘটিতেছে দেখ! জীবমাত্রেই—ও—, হরিণগণ আহার বিহারে—হইয়া,—হইয়া রহিয়াছে, মুখের গ্রাস মুখ হইতে পড়িয়া যাইতেছে, ময়ূর-ময়ূরী নৃত্য পরিত্যাগ করিয়া—হইয়া রহিয়াছে; কোকিলগণ আম্রমুকুলের রসাস্বাদে—হইয়া—হইয়া আছে, মধুকর মধুকরী মধুপানে—হইয়াছে।

৮। **শুদ্ধ করিয়া লিখ ঃ**—বাগ্‌শক্তি। কী আশ্চার্য। ইদৃশ। প্রিয়ম্বদা। সম্বরণ। সংবোধন। কালাহরণ। 'যাঁহার অসীম আনন্দের সীমা থাকিত না। গুরুজনগণদিগকে। ব্যাগ্র। তপবন। কেবল জীবমন্ত্রেই নিরানন্দ। পরাগ্‌মুখ। নিরব হইয়া আছে। সংভাষণ। অনান্তর, পাগোল, শাস্তনা, সম্বাদ, ব্রনশোষন, বারেবার, কিযদ্ক্ষণ, স্বমুখ, বোনোবাসী। বন্ধুবর্গগণের, সেচ্ছাক্রমে, অনুরাগিনী, লোকিক, ব্যাপাব, শুশ্রূষা, ব্যাবহার, সমভিব্যাহার, প্রতিকূলচাবিনী। অশ্রুসলিল পূর্ণ নয়নে, ভগবান !, সংসারিক, অনুক্ষন, ব্যাস্ত, সম্রাজ্য, "তাঁহাকে তদীয় সনামাঙ্কিত অঙ্গুরিয় দেখাইও", হৃদ্‌কম্প, নিরুৎবেগ।

৯। **উক্তি পরিবর্তন কর ঃ**—(১) অনন্তব তিনি………করো। **উত্তর ঃ**—(১) অনন্তর তিনি শোকাবেগ সংবরণ কবিযা শকুন্তলাকে বাৎসল্যসূচক সম্বোধন করিয়া বেলা হওয়াতে অনর্থক কালহরণ না করিয়া প্রস্থান কবিতে আদেশ দিলেন। তিনি তপোবন-তরুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—যিনি তাহাদের জলসেচনা না করিযা কদাচ জল পান করিতেন না, যিনি ভূষণ প্রিয়া হইয়াও, স্নেহবশতঃ কদাচ তাহাদের পল্লবভঙ্গ করিতেন না, তাহাদেব কুসুমপ্রসবেব সময় উপস্থিত হইলে যাঁহার আনন্দেব সীমা থাকিত না, সেই শকুন্তলা, সেই দিন পতিগৃহে যাইতেছেন। তাহারা সকলে যেন উহা অনুমোদন করে। (২) কণ্ব কহিলেন, বৎসে আর কেন বিলম্ব কর, বেলা হয়। **উত্তর ঃ**—(২) কণ্ব বেলা হয় দেখিযা (শকুন্তলাকে) অধিক বিলম্ব করিতে নিষেধ করিলেন। (৩) তিনি বনতোষিণীর……হইলাম। উ ঃ—(৩) তিনি বনতোষিণীর নিকট গিযা তাহাকে সম্বোধন করিযা স্নেহভরে আলিঙ্গন করিতে বলিলেন এবং ঐদিন হইতে দূরবর্তিনী হইলেন, বলিযা জানাইলেন। (৪) তখন কণ্ব কহিলেন……আরম্ভ করিলেন। **উত্তর ঃ**—(৪) তখন কণ্ব, অনুসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে শকুন্তলাকে সান্ত্বনা দিবার পরিবর্তে নিজেরাই পাগলের মতো কাঁদিতে আরম্ভ করায মৃদু ভর্ৎসনা করিলেন।

১০। **আধুনিক ভাষায় পরিবর্তন কর ঃ**—(১) অনুসূয়া ও প্রিয়ংবদা যথা সম্ভব বেশভূষার সমাধান করিয়া দিলেন। উঃ—(১) অনুসূয়া ও প্রিয়ংবদা যথসম্ভব বেশভূযা দিযা সাজাইযা দিলেন। (**চলিতরূপ**) অনুসূয়া প্রিযংবদা যতটা পারা যায় শাড়ি গযনা দিযে সাজিযে দিলেন (২) অদ্য শকুন্তলা যাইবেক ……………হইতেছে। উ ঃ—(২) অদ্য শকুন্তলা নিশ্চয় যাইবে বলিযা, মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে। (চলিতরূপ) আজ শকুন্তলা নিশ্চয়ই যাবে বলে মন বড় আকুল হ'চ্ছে। (৩) নয়ন বাষ্পবারিতে…………হইতেছে। উঃ—(৩) চোখ অবিরাম জলে ভবিয়া আসিতেছে। (চলিত) চোখ অবিরাম জলে ভরে আসছে। (৪) তোমাদের কুসুমপ্রসবের সময় উপস্থিত হইলে যাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না। (৪) তোমাদের ফুলফোটার সময উপস্থিত হইলে যাঁহার আনন্দের সীমা

থাকিত না। (চলিত) তোমাদের ফুলফোটার সময় এসে গেলে যাঁর আনন্দ সীমা ছাড়িয়ে যেত। (৫) আমাদিগকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া গেলে। (চলিত) আমাদের কার হাতে সঁপে দিয়ে গেলে। (৬) তাহার দিকে দৃষ্টিপাত হওয়াতে। তাহার দিকে চাহিতে। (চলিত) তার দিকে চোখ পড়াতে। (৭) উচ্চ নীচ না দেখিয়া পদক্ষেপ করাতে বারংবার আঘাত লাগিতেছে। (চলিত) উঁচুনিচু না দেখে পা ফেলাতে বারবার চোট লাগ্‌ছে।

১১। **নির্দেশ অনুসারে পরিবর্তন কর**ঃ—

(১) অনন্তর সকলে গাত্রত্থান করিলেন (চলিত ভাষায়)। (২) শকুন্তলাকে এইরূপ শোকাকুল দেখিয়া, গৌতমী কহিলেন, বাছা! আর কেন ক্ষান্ত হও, যাইবার বেলা বহিয়া যায় (চলিত ভাষায়)। (৩) তুমি পতিগৃহে গিয়া, গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিবে (বাচ্য পরিবর্তন কর)। (৪) ইহাদের বিবাহ হয় নাই (অস্ত্যর্থক বাক্যে)। (৫) সেখানে কেমন করিয়া প্রাণধারণ করিব? (নির্দেশসূচক বাক্যে পরিবর্তন কর)। (৬) স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দেখাইও (চলিত ভাষায়)। (৭) তোমাদের সহচরী দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়াছেন; এক্ষণে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া, আমার সহিত আশ্রমে প্রতিগমন করো। (চলিত ভাষায়)

উত্তরঃ—(১) তারপর, তারা সব উঠে পড়লেন। (২) শকুন্তলাকে দুঃখে এরকম অস্থির দেখে, গৌতমী বললেন, বাছা! আর কেন! খুব হয়েছে, এখন থামো, যাবার বেলা বয়ে যাচ্ছে।" (চলিত ভাষায়) (৩) পতিগৃহে গিয়া গুরুজনদিগের শুশ্রূষা তোমার কর্তব্য (অথবা করণীয়) (কর্মবাচ্যে)। (৪) ইহারা অনূঢ়া; ইহারা অবিবাহিতা; ইহারা অপরিণীতা (অস্ত্যর্থক)। (৫) সেখানে কোনপ্রকারেই প্রাণ ধারণ অসম্ভব। (৬) (তাঁর) নিজের নাম খোদাই করা আংটিটি দেখিও (চলিত ভাষায়)। (৭) তোমাদের সই এখন চোখের আড়াল হয়েছেন; এখন দুঃখের জন্যে মনের যে চঞ্চলতা এসেছে তা সাম্‌লে নিয়ে আমার সঙ্গে আশ্রমে ফিরে চল (চলিত ভাষায়)।

সাগরসঙ্গমে নবকুমার (পৃঃ ৫২—৫৯)

সন্ধিঃ—দিঙ্‌নিরূপণ—দিক্ + নিরূপণ, জগদীশ্বর—জগৎ + ঈশ্বর, পশ্চাদাগত —পশ্চাৎ + আগত, **জলোচ্ছ্বাস আরম্ভেই**—সন্ধি করা হয় নাই। (পূর্বার্ধে সন্ধি করা হইয়াছে—জল + উচ্ছ্বাস),—শ্রুতিকটুতা নিবারণের জন্য সন্ধি হয় নাই। 'কাষ্ঠ-আহরণে'—সন্ধি হয় নাই। প্রত্যাগমন—প্রতি + আগমন। কথোপকথন —কথা + উপকথন। বারেক—বার + এক **(বাঙ্‌লা সন্ধি)**। ইতস্ততঃ— ইতঃ + ততঃ (খাঁটি তৎসম পদদ্বয়ে সন্ধি—সংস্কৃতের মতো সন্ধি)। তিরস্কার —তিরঃ + কার। **সম্বৎসর**—সম্ + বৎসর (সন্ধিতে 'সংবৎসর' শুদ্ধ সম্বৎসর

নহে—এখানে অভিযুক্ত কবিপ্রয়োগ বলিতে হইবে)। পরস্পর—পর+পর। দিগ্‌ভ্রম—দিক্+ভ্রম। নৌকারোহী—নৌকা+আরোহী। তদনুরূপ—তৎ+অনুরূপ। নিশ্চেষ্ট—নিঃ+চেষ্ট। কণ্ঠাগতপ্রাণ—কণ্ঠ+আগত (প্রাণ)। তরঙ্গান্দোলনকম্প—তরঙ্গ+আন্দোলন (কম্প)। প্রতীক্ষা—প্রতি+ঈক্ষা। প্রাগুক্ত—প্রাক্+উক্ত।' মণ্ডলাকারে—মণ্ডল+আকারে। ইত্যবসরে—ইতি+অবসরে। তরঙ্গাভিঘাত—তরঙ্গ+অভিঘাত। তিলার্ধ—তিল+অর্ধ। ওষ্ঠাগত—ওষ্ঠ+আগত। কাষ্ঠাহরণ—কাষ্ঠ+আহরণ। উপহাসাস্পদ—উপহাস+আস্পদ (আ+পদ=আস্পদ)। আত্মোপকারী—আত্ম+উপকারী।

সমাসঃ—**নাবিকদস্যু**—(জলদস্যু, যে নাবিক সেই দস্যু (pirate) দুইটি বিশেষ্য পদে (কর্মধারয় সমাস) [তুলঃ দেবর্ষি, রাজর্ষি, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, জজ-জামাই, শিক্ষক-সম্পাদক], একতানমনা—এক (একটি মাত্র) তান (সুর) কর্মধারয়, একতানে মন যাহার (বহুব্রীহি)=একাগ্রচিত্ত, নিবিষ্ট চিত্ত (হইয়া). সশঙ্কচিত্তে—শঙ্কার সহিত বর্তমান 'সশঙ্ক' (তুল্যযোগে বহুব্রীহি—**সশঙ্কিত নহে**)। সশঙ্ক হইয়াছে চিত্ত (মন) যাহার (বহুব্রীহি) ক্রিয়াবিশেষণে তৃতীয়া (—এ বিভক্তি)। বারদরিয়া—বার ('বাহির শব্দের কথ্যরূপ) যে **দরিয়া (ফারসী শব্দ—সমুদ্র) বাহির** সমুদ্র। **কণ্ঠাগতপ্রাণ**—কণ্ঠে **আগত** (সপ্তমী তৎপুরুষ) কণ্ঠাগত হইয়াছে প্রাণ যাহাদের (বহুব্রীহি)। তরঙ্গান্দোলনকম্প—তরঙ্গের আন্দোলন (ষষ্ঠী তৎ) তাহার কম্প (ষষ্ঠী তৎ)। রবিরশ্মিমালা-প্রদীপ্ত—রবিরশ্মির (বা তৎসমূহের) মালা (ষষ্ঠীতৎ) তাহাদ্বারা প্রদীপ্ত (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। কলধৌত-প্রবাহবৎ কলধৌতের (রৌপ্যের) প্রবাহ (ষষ্ঠীতৎপুরুষ) তাহার তুল্য—তুল্যার্থে—বৎ প্রত্যয়। **সূর্যপ্রতি**—সূর্যের প্রতি (ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস) [অব্যয়ের সহিত ষষ্ঠীতৎপুরুষ—তুলঃ—তীরোপরি, তদুপরি (কবিতায় 'সূর্যপানে')], নীলপ্রভা—নীল প্রভা যাহার (বহুব্রীহি), **উপকূল**—কূলের সমীপ (অব্যয়ীভাব সমাস)।

কারক ও বিভক্তিঃ—'পণ্ডিতে বলিতে পারে না' কর্তৃকারকে প্রথমা (—এ বিভক্তি তুঃ 'চোরে লইয়া গেল')। নৌকায় **পাকের** কাষ্ঠ নাই—সম্বন্ধে ষষ্ঠী কাষ্ঠের—নিমিত্ত সম্বন্ধ)! ছেলেপিলে **সম্বৎসর** খাবে কি?—ব্যাপ্তি অর্থে শূন্য দ্বিতীয়া বিভক্তি। অন্য যাত্রীর **মুখে** পাইয়াছিলেন—অপদানার্থে তৃতীয়া (এ বিভক্তি)।

লক্ষ্যণীয় বিশিষ্ট বাগ্‌ভঙ্গীঃ—'জগদীশ্বরের হাত', 'তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে', 'বড়ো সাধ ছিল' 'ভয়ে কণ্ঠাগতপ্রাণ', (সকলের) 'প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে', 'তিলার্ধ মাত্র', 'কেনারায় পড়্', 'রোদ উঠেছে', 'নৌকা মারা যাওয়া'।

পদটীকাঃ—নব্য—নব+য (প্রত্যয়), সৈকত—সিকতা (বালু) সিকতা+

অণ্ (প্রত্যয়), উদ্বিগ্ন—উৎ+বিজ্+ক্ত। সম্ভাব্য—সম্+ভূ (+ণিচ্)+য। মন্দীভূত—যাহা মন্দ (কম) ছিল না—পরে মন্দ হইয়াছে—মন্দ+চি (অভূততদ্ভাবে)+ √ভূ+ক্ত (কর্তৃবাচ্যে)—গতি সমাস। বনবাসিত—বনে বাসিত (সপ্তমী তৎপুরুষ) বস্+ণিচ্+ক্ত (কর্মবাচ্যে)। ঔৎসুক্য—উৎসুক+ষ্যঞ্ (ভাবার্থে)।

পদান্তর ঃ—যাত্রী—যাত্রা। বৎসর—বাৎসরিক। প্রাচীন—প্রাচীনত্ব। ক্রুদ্ধ—ক্রোধ। সমুদ্র—সামুদ্রিক। শ্রুতি—শ্রুত। খারাবি—খারাব। প্রভাত—প্রভাতী। আশঙ্কা—আশঙ্কিত। বিপদ্—বিপন্ন। অনুভব—অনুভূত। সূর্য—সৌর। বিমুক্ত—বিমোচন। সমাপ্ত—সমাপ্তি। আরম্ভ—আরব্ধ। প্রবৃত্ত—প্রবৃত্তি। উদ্বিগ্ন—উদ্বেগ। সম্ভাব্য—সম্ভাবনা। উত্থিত—উত্থান। প্লাবিত—প্লাবন। মন্দীভূত—মন্দীভাব। প্রত্যাবর্তন—প্রত্যাবৃত্ত। হত্যা—হত। বিসর্জিত—বিসর্জন। স্বভাব—স্বাভাবিক।

লিঙ্গান্তর ঃ—যাত্রী—যাত্রিণী। নাবিক—নাবিকী। আরোহী—আরোহিণী। প্রাচীন—প্রাচীনা। যুবক—যুবতি, যুবতী। ('যুবন্' 'যুবৎ' শব্দ হইতে)। অভিভাবক—অভিভাবিকা। বক্তা—বক্ত্রী। জগদীশ্বর—জগদীশ্বরী। মাঝি—মাঝিবৌ। স্ত্রীলোক—পুরুষ। নব্য—নব্যা। মন্দগামী—মন্দগামিনী। প্রতিবেশী—প্রতিবেশিনী। উত্তম—উত্তমা।

ব্যুৎপত্তি ঃ—নাবিক—নৌ+ঠিক (ইক) (তদ্দ্বারা জীবিকা অর্জন করে অথবা তদ্দ্বারা উত্তীর্ণ হয়)। যাত্রী—যাত্রা+ইন্। ঔৎসুক্য—উৎসুকের ভাব ঔৎসুক্য উৎসুক+ষ্যঞ্ (য)। উদ্বিগ্ন—উৎ+ √বিজ্+ক্ত (কর্তৃবাচ্যে)।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে লিঙ্গান্তরিত কর :—নব্য, যুবক, সভিব্যাহারী, যাত্রী, সুনিপুণ, মাঝি, বক্তা, আরোহী। উঃ নব্যা, যুবতী, সমভিব্যাহারিণী, যাত্রিণী, সুনিপুণা, মাঝিবৌ, বক্ত্রী, আরোহিণী।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীতার্থক **শব্দ লিখ** :—(১) উদ্বিগ্ন ; (২) ভৈরব কল্লোল, (৩) সম্ভাব্য, (৪) যুবক, (৫) বারদরিয়া, (৬) ডাঙ্গা [দেশী], (৭) অগণিত, (৮) অবতরণ, (৯) স্থগিত, (১০) আশঙ্কা, (১১) বিস্তার, (১২) সুনিপুণ। **উত্তর** ঃ—(১) নিরুদ্বেগ, (২) কলকল্লোল, (৩) অসম্ভাব্য, (৪) বৃদ্ধ, (৫) ভিতর দরিয়া, (৬) জল (ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুমীর), (৭) অপরিমিত, (৮) আরোহণ, (৯) চালু, চলিত, প্রচলিত, (১০) ভরসা, আশা, (১১) দৈর্ঘ্য (length), (১২) অনিপুণ, আনাড়ী।

উল্লিখিত শব্দগুলির দ্বারা সার্থক বাক্য রচনা কর।

৩। চলিত ভাষায় সমার্থক শব্দ বা শব্দসমষ্টি প্রয়োগ করিয়া বাক্য রচনা কর :—সৈকত, কাষ্ঠসমাহরণ, জলোচ্ছ্বাস, মহাকোলাহল, আর্তনাদ, তরঙ্গাভিঘাত, স্বেদস্রুতি, রবিরশ্মিমালা-প্রদীপ্ত, সমভিব্যাহারী।

৪। সাধুভাষায় প্রতিশব্দ দাও :—**ডাঙ্গা, কেনারা, (ফারসী) মাঝি, বহর,** (নৌকার) **সামলাইতে** পারিল না। **উত্তর** :—স্থল, তট, নাবিক, নৌশ্রেণী, সংযত করিতে পারিল না।

৫। (রাত্রি) 'প্রায় প্রভাত হইয়াছে' নাবিকেরা কোনদিকে যাইতেছে তাহার নিশ্চয় পাইতেছে না', 'তিনকাল গিয়ে এককাল ঠেকেছে'—উল্লিখিত বাক্যগুলি সংক্ষিপ্ত করিয়া প্রকাশ কর।

৬। নিম্নলিখিত শব্দ যুগলের অর্থের পার্থক্য দেখাও :—(ক) শ্রুতি, স্রুতি, (খ) সশঙ্ক, শশাঙ্ক (গ) অনুভব, অনুভাব (ঘ) বিস্তার, বিস্তর (ঙ) পাক, পাঁক (চ) স্বভাব, সভাব (ছ) চর, চড (জ) প্রবল, প্রবাল (ঝ) আত্মবন্ধু, আপ্তবন্ধু (ঞ) শিকার, স্বীকার।

৭। **বাচ্য পরিবর্তন কর** :—(১) রাত্রিশেষে ঘোরতর কুজ্ঝটিকা দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছিল। (২) মাঝি.........বলিতে পারিল না। (৩) মহাশয়ের আসা ভালো হয় নাই। (৪) এখন পরকালের কর্ম করিব না তো কবে করিব? (৫) তবে তুমি এলে কেন? (৬) কোনো দিকে কিছুই দেখা যাইতেছে না। (৭) নৌকা কদাচ মারা যাইবে না (কর্মবাচ্য)। (৮) পশ্চাৎ রৌদ্র হইলে পরামর্শ করা যাইবে। (৯) সেই কেবল কাঁদিল না। (১০) অপরকূলের চিহ্ন দেখা যায় না (কর্মবাচ্য)। (১১) আমরা এতগুলি লোক মারা যাই। (১২) তাকে শিযালে খাইযাছে। (১৩) নৌকা আর ফিরিল না। (১৪) নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে। (১৫) নবকুমার বনবাসে বিসর্জিত হইলেন। **উত্তর** :—(১) রাত্রিশেষে ঘোরতর কুজ্ঝটিকাদ্বারা দিগন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল (কর্মবাচ্য)। (২) মাঝিদের ইতস্ততঃ করিয়া বলা হইল—বলিতে পারা গেল না, (কর্মবাচ্যে)। (৩) মহাশয় আসিয়া ভাল করেন নাই (কর্তৃবাচ্যে)। (৪) এখন পরকালের কর্ম করা হইবে না তো কবে করা হইবে? (৫) তবে তোমার আসা হইল কেন (ভাবাচ্যে)? (৬) (আরোহিগণ) কিছু দেখিতে পারিতেছেন না (কর্তৃবাচ্য)। (৭) নৌকাকে কদাচ কেহ মারিতে (=নষ্ট করিতে) পারিবে না। (৮) পশ্চাৎ রৌদ্র হইলে পরামর্শ করিব (কর্তৃবাচ্য)। (৯) তাহারই কেবল কাঁদা হইল না (ভাববাচ্যে)। (১০) অপরকূলের চিহ্ন কেহ দেখিতে পায় না (কর্তৃবাচ্য)। (১১) আমরা এতগুলি লোক মরি (কর্তৃবাচ্য)। (১২) সে শৃগাল কর্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে (কর্মবাচ্য)। (১৩) নৌকা আর ফিরানো গেল

না। (১৪) নবকুমার ব্যাঘ্রকর্তৃক হত হইয়াছে (কর্মবাচ্য)। (১৫) যাত্রীরা নবকুমারকে (কর্তৃবাচ্য) বনবাসে বিসর্জন দিলেন।

৮। **উক্তি পরিবর্তন কর :**—(১) বৃদ্ধ নাবিকদিগকে…… কী?

উত্তর :—(১) বৃদ্ধ কথাবার্তা স্থগিত রাখিয়া নাবিকদিগের নিকট জানিতে চাহিলেন ঐদিন তাহারা কতদূর যাইতে পারিবে। নাবিক (মাঝি) কিছু ইতস্ততঃ করিয়া জানাইল সে উহা বলিতে সমর্থ নয়। বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া নাবিককে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। যুবক নাবিকের পক্ষ সমর্থন করিয়া জগদীশ্বরের অধীন কার্য সম্বন্ধে যেখানে পণ্ডিত ব্যক্তিও অজ্ঞ সেখানে মূর্খের অসামার্থ্য জানাইয়া বৃদ্ধকে শান্ত হইবার জন্য অনুনয় করিল।

৯। **অশুদ্ধি শোধন কর :**—নৌকারোহীগন। সঙ্গীহীন। দিক্ নিরুপন। তিরস্কার। সম্বৎসর। সম্বাদ, অত্যান্ত, দিক্‌ভ্রম, স্ত্রিলোক, তথাপিও, সকলেই মৃত্যু নিকট নিশ্চয় করিলেন। সেই কেবল একা কাদিল না। অকস্মাৎ। কিন্তিত। উৎসুকসহকারে। দিক্‌মণ্ডল একেবারে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হইয়াছে। অন্ধকার রাত্রি হইতে, দুরন্ত শ্যামবারিরাশীসমূহ নীলপ্রভ। সঙ্গমস্থলের দক্ষিণ পার্শ্বে বৃহৎ বিস্তীর্ণ সৈকতভূমিখণ্ডে অসংখ্য নানাবিধ পক্ষীগণসমূহ অগণিত-সংখ্যায় ক্রিয়া করিতেছিল।

১০। **শূন্যস্থান পূর্ণ কর :**—আত্মোপকারী—বিসর্জন করা—প্রভৃতি তাহারা—আত্মোপকারীকে—দিবে কিন্তু—বনবাসিত করুকনা—, পরের—করা যাহার—সে—পরের—যাইবে। তুমি—তাই বলিয়া—না হইব—?

১১। **নির্দেশ অনুসারে পরিবর্তন কর :**—(১) বৃদ্ধ নাবিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাঝি, আজ কতদূর যাইতে পারিবি"? (উক্তি পরিবর্তন কর)। (২) চতুর্দিকে অতি গাঢ় কুজ্ঝটিকায় ব্যাপ্ত হইয়াছে (বাচ্য পরিবর্তন)। (৩) নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে (বাচ্য পরিবর্তন)। (৪) বেশি বাতাস নাই (অস্ত্যর্থক বাক্যে)। (৫) এই নৌকারোহীরা সঙ্গিহীন (নাস্ত্যর্থক বাক্যে)। (৬) একটি স্ত্রীলোক গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন করিয়া আসিয়াছিল (বাচ্য পরিবর্তন কর)। (৭) নবকুমার সেই ভীষণ সমুদ্রতীরে বনবাসে বিসর্জিত হইলেন (বাচ্য পরিবর্তন)। (৮) জোয়ারের বিলম্ব আছে (নাস্ত্যর্থক বাক্যে)। (৯) নৌকারোহিগণ অনেকেই নিদ্রা যাইতেছিলেন (নাস্ত্যর্থক বাক্যে)। (১০) মাঝি উত্তর করিল না (অস্ত্যর্থক বাক্যে)। (১১) নবকুমার কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "অচ্ছা যাইব; কুড়ালি দাও, আর দা লইয়া একজন আমার সঙ্গে আইস" (উক্তি পরিবর্তন কর)। (১২) কেহই নবকুমারের সহিত যাইতে চাহিল না (অস্ত্যর্থক বাক্যে)। (১৩) বৃদ্ধ কহিলেন, "তবে তুমি এলে কেন?" (উক্তি পরিবর্তন কর)। (১৪) যুবা উত্তর করিলেন, "আমি তো আগেই বলিয়াছি যে, সমুদ্র দেখিব বড়ো সাধ ছিল, সেইজন্যই আসিয়াছি" (উক্তি পরিবর্তন কর)।

উত্তর :—(১) বৃদ্ধ মাঝিদিগকে ডাকিয়া তাহারা ঐদিন কতদূর যাইতে পারিবে জানিতে চাহিলেন (পরোক্ষ উক্তি)। (২) অতি গাঢ় কুজ্ঝটিকা চতুর্দিককে ব্যাপ্ত করিয়াছে (কর্তৃবাচ্য)। (৩) নবকুমার ব্যাঘ্রদ্বারা হত হইয়াছে (কর্মবাচ্যে)। (৫) এই নৌকারোহীদের অন্য কোন সঙ্গী নাই। (৬) একটি স্ত্রীলোক কর্তৃক গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জিত (=বিসৃষ্ট) হইয়াছিল (কর্মবাচ্যে)। (৭) (সকলে) নবকুমারকে সেই সমুদ্রতীরে বনবাসে বিসর্জন দিলেন (কর্তৃবাচ্য)। (৮) জোয়ার শীঘ্র আসিবে না (নাস্ত্যর্থক বাক্য)। (৯) নৌকারোহীদের মধ্যে বেশি লোক জাগিয়া ছিলেন না (নাস্ত্যর্থক)। (১০) মাঝি মৌনাবলম্বন করিল **অথবা** মাঝি মূক হইয়া রহিল **অথবা** মাঝি নিরুত্তর রহিল (অস্ত্যর্থক)।

মহাত্মা রামমোহন (পৃঃ ৬৭-৭১)

সন্ধিঃ—মানবাত্মা—মানব + আত্মা, মর্মাহত—মর্ম + আহত, উড্ডীন—উৎ + ডীন, স্বোপার্জিত,—স্ব + উপার্জিত, পরিচ্ছদ—পরি + ছদ, উন্মোচন—উৎ + মোচন। নিরুদ্যম—নিঃ + উদ্যম, বিচ্ছিন্ন—বি + ছিন্ন, প্রতিজ্ঞারূঢ়—প্রতিজ্ঞা + আরূঢ়। বিশ্বাত্মা—বিশ্ব + আত্মা। অত্যাচার—অতি + আচার। পরান্ত—পর + অন্ত। অপেক্ষা—অপ + ঈক্ষা। অন্তরীপ—অন্তঃ + ঈপ (অপ্ স্থানে ঈপ)। অপরাহ্ণ—অপর + অহ্ন। অন্তর্নিহিত—অন্তঃ + নিহিত। স্বাবলম্বন—স্ব + অবলম্বন। নিরন্ত—নিঃ + অন্ত। অভীষ্ট—অভি + ইষ্ট। শরণাপন্ন—শরণ + আপন্ন। পূর্বাশ্রিত—পূর্ব + আশ্রিত।

পদান্তর ঃ—পবিত্র—পবিত্রতা। চক্ষু—চাক্ষুষ। সামাজিক—সমাজ। রাজনীতি—রাজনীতিক। লাভ—লব্ধ। জাতি—জাতীয়। সংবাদ—সাংবাদিক। নিমন্ত্রণ—নিমন্ত্রিত। বিলাত—বিলাতী। জাহাজ—জাহাজী। নিষেধ—নিষিদ্ধ। প্রকাশ্য—প্রকাশ। জ্ঞান—জ্ঞাত। আঘাত—আহত। গূঢ়—গূঢ়তা। বিশ্বাস—বিশ্বস্ত। বিমুখ—বিমুখতা। অনুষ্ঠান—অনুষ্ঠেয়। উৎসাহিত—উৎসাহ। পিতা—পৈত্রিক, পৈত্র। সংকল্প—সংকল্পিত। উঠা—উঠ্‌তি। বড়ো—বড়াই। ভিতর—ভিতরকার। উন্মোচন—উন্মুক্ত।

লিঙ্গান্তর ঃ—পাচক—পাচিকা। কর্মচারী—কর্মচারিণী। কুমারী—কুমার। উদযোগী—উদ্‌যোগিনী। বন্ধু—বান্ধবী। ছাত্র—ছাত্রী, ছাত্রা। ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণী।

সমাস ঃ—অকৃতকার্য—অ (না) না হইয়াছে—কৃত (সম্পন্ন) কার্য (কার্য) যাহাদ্বারা (অসফল) (বহুব্রীহি)। বজ্রমুষ্টি—বজ্রকঠোর মুষ্টি (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়) [বজ্রের মত কঠোর) উপমান কর্মধারয় বজ্রকঠোর]। স্বাধীনতা-প্রিয়তা—স্বাধীনতাপ্রিয় যাহার (বহুব্রীহি) স্বাধীনতাপ্রিয় + তা (প্রত্যয়) [তাহার ভাব এই অর্থে]। জাতিচ্যুত—জাতি হইতে চ্যুত (পঞ্চমীতৎপুরুষ)। গৃহতাড়িত—গৃহ হইতে তাড়িত (পঞ্চমীতৎপুরুষ)।

পদটীকা ঃ—সামাজিক—সমাজ + ইক (তৎ সম্বন্ধে) সমাজসম্বন্ধীয়। পরাস্ত—পরা + অস্ + ক্ত (কর্মবাচ্যে) √অস্ + (ক্ত) যোগে 'অস্ত' হয় 'অস্থ' হয় না, সুতরাং 'পরাস্থ' শুদ্ধ নহে। দরদরধারে = দরদর ধারা যাহাতে—ক্রিয়া-বিশেষণে তৃতীয়া (-'এ' বিভক্তি) ['দর'-প্রবাহ দরদর—দ্বিত্ব—ক্ষরণ, বা স্রাবের অব্যক্ত ধ্বনিবোধক] উড্ডীন—উৎ + √ডী + ক্ত। **সমুদয় বা সমুদায়** বিশেষণ (বিশেষ্য—সম্পত্তি)। বৈষযিক—বিষয় + ইক (সম্বন্ধার্থে) গুঢ় √গুহ্ + ক্ত (কর্মবাচ্যে)।

বাগ্‌ভঙ্গি ও কয়েকটি প্রয়োগের আলোচনা ঃ—'হটিয়া যাওয়া' পশ্চাৎপদ হওয়া 'পিছু পা হওয়া' = 'হটিয়া যাওয়া'। ('পশ্চাৎপদ হওয়া)। 'সেই প্রস্তাবে আপনাকে এতদূর নিক্ষেপ করিয়াছিলেম,—ইংরেজির তর্জমা বাঙ্‌লা নহে। সাধু বাঙ্‌লায় 'সেই প্রস্তাবে তিনি স্বয়ং এতদূর নিবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন'—'এতদূর মগ্ন হইয়াছিলেন'। 'পৃথিবীর যে কোন বিভাগে'—আধুনিক প্রয়োগ 'পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলে' বা 'যে কোন স্থানে'। দেশীয় বিভাগে—ভারতীয় পল্লীতে ('পাড়'ায়) ('সাহেব পাড়ায়'—কথার বিপরীত) —('দেশীয় বিভাগ'—বলিলে 'এতদ্দেশীয় লোকদের 'পল্লী' বুঝিতে অসুবিধা হয়। 'বিঘ্ন বাধা…………জীবনের সমস্যা, **"সকলেরই পথে উপস্থিত হয়"** = সকলেরই 'যাত্রা পথে' বা 'অগ্রগতির পথে' উপস্থিত হয় বলিলে অর্থ পরিষ্কার হয়। 'অপরাজিত বিশ্বাস'—'অবিচলিত বিশ্বাস' বা 'দৃঢ় বিশ্বাস' বাঙ্‌লায় চলে।

অনুশীলনী

১। সাধু ভাষায় পরিণত করিয়া প্রয়োগ কর :—'হটিয়া যাওয়া' 'ছাপাখানা' 'সমুদ্রে পা বাড়ালেই', 'গায়ের উপরকার পরিচ্ছদ খুলিযা', 'ভিতরকার কথা', 'কামড়'।

২। চলিতভাষায় পরিণত কর :—'জ্যাতিচ্যুত', 'গৃহতাড়িত', 'দেশীয় বিভাগ', 'প্রতিজ্ঞারূঢ়' 'বিচ্ছিন্ন করা', 'উন্মোচন', 'উর্ধ্বতন', মর্মাহত। উঃ—একঘরে, ঘরখেদান, দিশিপাড়া (দেশীপাড়া), করিবেন বলিয়া ঠিক করিলেন, আলাহিদা, খুলিয়া ফেলা, উপরকার, মনে ঘা লাগা।

৩। পদান্তরে পরিবর্তন কর :—বৈষয়িক, পরিচ্ছদ, উড্ডীন, বিলাতী, গূঢ়, সমুদয়, প্রতিপক্ষ, উপস্থিত, কঠিন, আহ্বান, পথ, সংগ্রহ, স্থির, পরিদর্শন। উঃ বিষয়, পরিচ্ছন্ন, উড্ডীন, বিলাত, গূঢ়তা, সামুদায়িক, প্রতিপক্ষীয়, উপস্থিতি, কাঠিন্য, আহুত, পাথেয়, সংগৃহীত, স্থিরতা, পরিদর্শক।

৪। লিঙ্গান্তরিত কর :—পাচক, কর্মচারী, উদ্যোগী, বন্ধু, ছাত্র, ব্রাহ্মণ।

৫। **বাচ্য পরিবর্তন কর**—(১) মানবের আত্মাকে রামমোহন অতি পবিত্র

চক্ষে দেখিতেন। (২) পৃথিবীর দাসত্বকে তিনি এইজন্য অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। (৩) স্বাধীনতা লাভে কোন জাতি অকৃতকার্য হইলে তিনি মর্মাহত হইতেন। (৪) তাহা সকলেরই পাঠ করা উচিত। (৫) তাঁহার চক্ষে অপমান বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। (৬) পিতাকর্তৃক গৃহতাড়িত হইয়াও স্বীয় সঙ্কল্প ত্যাগ করেন নাই। **উত্তর** ঃ—(১) রামমোহনের চক্ষে মানবের আত্মা অতি পবিত্র দৃষ্ট হইত (কর্মবাচ্য)। (২) পৃথিবীর দাসত্ব অন্তরের সহিত তাঁহাদ্বারা ঘৃণিত হইত। (৩) স্বাধীনতালাভে কোন জাতি অকৃতকার্য হইলে তিনি মর্মে আঘাত পাইতেন (কর্তৃবাচ্য)। (৪) তাহা সকলেরই পাঠ্য (কর্মবাচ্যে)। (৫) তিনি ইহাকে তাঁহার চক্ষে অপমান বলিয়া গণ্য করিতেন (কর্তৃবাচ্য)। (৬) পিতা তাঁহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিলেও, স্বীয় সঙ্কল্প তৎকর্তৃক ত্যক্ত হয় নাই।

৬। **উক্তি পরিবর্তন কর** ঃ—রামমোহন রায় বলিলেন, ছোট লোক মনে করে। **উত্তর** ঃ—(পরোক্ষ) রামমোহন রায় পূর্বে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া গায়ের উপরকার পরিচ্ছদ খুলিবার অনুমতি চাহিলেন, পরিচ্ছদ উন্মোচন করিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত জল চাহিলেন। ত্বরায় জল দেওয়া হইল। জল পান করিয়া একটু সুস্থ হইয়া তিনি ক্ষোভ ও ঘৃণার সহিত, খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণে তাঁহার (রামমোহন রায়ের) পদবৃদ্ধি হইবে বিশপ মিড্‌লটনের এইরূপ প্রলোভনসূচক প্রস্তাবে, তিনি যে সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান আঘাত পাইয়াছেন এবং তাঁহাকে যে নীচাশয় মনে করিয়া এই প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা জানাইলেন।

৭। **শূন্যস্থান পূরণ কর** ঃ—বিঘ্ন দেখিয়া—যাওয়া, ভীত হওয়া, প্রাণভয়ে—হওয়া, লোকের—সংকল্পিত—পরিত্যাগ—তিনি—ও—শক্তির—বলিয়া—করিতেন।

৮। **অশুদ্ধি শোধন কর** ঃ—মানবাত্মার মহত্ত যে জানে না। সাবলম্বনশক্তি যে আসে না। এ জগতে মানুষের আপনার ঘর আপনে রচনা করে। তুমি বড় হইয়া দাঁড়াইবে, কি ছোট থাকবে তোমারই হাতে। বীঘ্ন বাঁধা পাপী প্রলোভোন জীবনের সমস্যা সকলেই পথে উপস্থিত হয়। কাহার উপরি উঠা বা নীচে যাওয়া ইহার উপরে বড় বা ছোট নির্ভর করে। রামমোহন রায় উপরে উঠিয়াছিল, এজন্য বড়ো, আমি আর তুমি নীচে পড়িয়া যাও, এই জন্যে আমরা ছোট। সে যে উপরে উঠিয়াছিল তাঁহার ভিতরেরকার কথা নিজের শক্তি সামর্থের ও মহত্তে অপরাজিত বিশ্বাস।

৯। **নির্দেশ অনুসারে পরিবর্তন কর** ঃ—(১) নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিলেন না (অস্ত্যর্থক বাক্যে)। (২) তিনি প্রথমে কটি ছাত্র সংগ্রহ করিয়া দিলেন (বাচ্য পরিবর্তন কর)। (৩) মানবাত্মার মহত্ব যে জানে না, স্বাবলম্বন শক্তি তাহার আসে না (সরল বাক্যে পরিবর্তন কর)। (৪) যাহা একবার করণীয় বলিয়া অনুভব করিতেন বজ্রমুষ্টিতে তাহাকে ধরিতেন এবং পূর্ণমাত্রায় তাহা না করিয়া নিরস্ত হইতেন না (সরল বাক্যে)। (৫) তাহার দেহকে মস্তক হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেও সে

কামড় ছাড়ে না ('জটিল বাক্যে)। (৬) তিনি বিলাত গমনার্থ উন্মত হইলে তাঁহার প্রতিপক্ষগণ তাঁহাকে জাতিচ্যুত করিবার ও পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন (চলিত ভাষায় পরিবর্তন কর)।

উত্তর :—(১) নিমন্ত্রণ রক্ষা অসম্ভব হইল। (২) প্রথমে তৎকর্তৃক কয়েকটি ছাত্র সংগৃহীত এবং (পরে) প্রদত্ত হইল (কর্মবাচ্যে) (৩) মানবাত্মার মহত্ত্বে অজ্ঞ (জ্ঞানহীন) ব্যক্তির স্বাবলম্বন শক্তি আসে না (সরলবাক্য)। (৪) কর্তব্যবোধে বজ্রমুষ্টি ধৃত, অসম্পূর্ণ কার্য হইতে, তিনি নিরস্ত হইতেন না (সরলবাক্য)। (৫) যখন তাহার দেহকে মস্তক হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয় তখন পর্যন্তও সে কামড় ছাড়ে না (জটিল বাক্য)। (৬) তাঁর বিলেত যাবার মুখে বিরোধী দলের লোকেরা তাঁকে সমাজে একঘরে করবার এবং তিনি যাতে করে পিতার বিষয়-আশয় হ'তে বঞ্চিত হ'ন সেই রকম করবার ভয় দেখাতে লাগলেন (চলিত ভাষা)।

সমুদ্রপথে (পৃঃ ৭১-৭৬)

সন্ধি :—দ্বীপ—দ্বি + অপ (অপ্ স্থানে ঈপ)। ব্যবসায়—বি + অবসায়। সংস্কার—সম্ + কার।

পদান্তর :—সংস্কার—সংস্কৃত। সংগ্রহ—সংগৃহীত। পয়—পযমস্ত। আহ্লাদ—আহ্লাদিত, আহ্লাদী। মেরামত—মেরামতি। ঝড—ঝড়ো। উপকার—উপকৃত। সমুদ্র—সামুদ্রিক। স্থির—স্থিরতা। গঙ্গা—গাঙ্গেয়, গাঙ্গ।

লিঙ্গান্তর :—ঠাকুর—ঠাকরুণ, ঠাকুরাণী। বরুণ—বরুণানী। মাঝি—মাঝিবৌ। বেনে—বেনেবৌ। স্ত্রী—স্বামী। পাগল—পাগলী, পাগলিনী।

সাধু প্রতিশব্দে পরিবর্তন :—পীপা (পিপা)—ঢক্কাকৃতি কাষ্ঠপাত্রবিশেষ। দুই-দ্বি। গহনা—অলংকার। তদারক—পর্যবেক্ষণ। বস্তা—গোণী। আড্ডা—মিলনস্থান, বাসস্থান। মোহনা—নদীমুখ। মেরামত—সংস্কার। জিনিস—দ্রব্য, বস্তু।

উক্তি পরিবর্তন :—প্রত্যক্ষ : তখন বিহারী······ফেলি (পৃঃ ৭৫)

পরোক্ষ :—তখন বিহারী পাগলের মতো হইয়া তাহার কাছে গিয়া উপস্থিত হইয়া মাঝিকে স্ত্রী ও মেয়ের সংকটাপন্ন অবস্থা স্মরণ করাইয়া ইহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য কাতর অনুনয় করিল। উত্তরে মাঝি বলিল সাত আট লক্ষ টাকার ক্ষতি স্বীকার করিলে সে ঢেউ থামাইয়া দিতে পারে। বিহারী যথাসর্বস্বের বিনিময়ে স্ত্রী ও কন্যার প্রাণরক্ষা ও সুস্থতা লাভে প্রস্তুত। তখন মাঝি তাহাকে ঘরে যাইতে বলিল এবং তাঁহার জ্ঞানানুসারে ইহার প্রতিকার করিবার প্রতিশ্রুতি দিল।

সমাস :—দ্বীপ—দ্বি (দুই দিকে, দুই দিক, দুই দিক করিয়া) (অপ্) (জল) যাহার (island) (বহুব্রীহি)। বহালবরখাস্ত—পদে নিয়োগ ও পদচ্যুতি—বহাল

ও ববখাস্ত (বিপরীতার্থ পদযোগে দ্বন্দ্ব সমাস)। লাভালাভ—লাভ ও অলাভ (বিপরীতার্থ পদযোগে দ্বন্দ্ব)। 'ঝড়-ঝাপটা'—ঝড় এবং ঝাপটা (সমজাতীয় শব্দে দ্বন্দ্ব সমাস—তুঃ ডাক্তাব-বদ্দি, উকিল-মোক্তার)। ঝাপটা = বাতাসের প্রবলধাক্কা। 'গলদ্‌ঘর্ম'—গলৎ (পড়িতেছে বা ঝবিতেছে) যে ঘর্ম (কর্মধারয় সমাস)। বেনেবউ —বেনের বউ (ষষ্ঠীতৎপুরুষ) অথবা বেনে যে বউ—(কর্মধাবয)। দাঁত-কপাটি —দাঁতের কপাটি (ষষ্ঠীতৎ) দাঁতে দাঁতে লাগিয়া যাওয়া, অচৈতন্য হওয়া।

পদটীকা ঃ—আড্ডা = বাসস্থান মিলন স্থান (**দেশী শব্দ**)। তদাবক = তত্ত্বাবধান, দেখাশুনা (আরবী শব্দ)। **ফলাও** = বিস্তৃর্ণ, ব্যাপক (**আরবী শব্দ**)। জিনিস—দ্রব্য, বস্তু (আরবী শব্দ)। খুশী—(বানান-'খুসি', 'খুশি' **বিশেষ্য—ফারসী শব্দ**) **আনন্দিত** এখানে বিশেষণ। পয়—সৌভাগ্য (সংস্কৃত 'পদ' শব্দ হইতে সম্ভবতঃ) সংস্কার—ধারণা। গহনা—অলংকার (সম্ভবতঃ 'গ্রহণ' শব্দ হইতে)। টানা—আকর্ষণ (বাং টান্ ধাতু হইতে)। খেলুড়ি—খেলার সাথী (খেলা + ড়িয়া (প্রত্যয়) খেলড়িয়া>খেলুড়ি, খেলুড়ে)। **মেরামত—জীর্ণ সংস্কার** (**আরবী** 'মবাম্মাৎ' হইতে)। ছই—নৌকার ছাদ (সংস্কৃত 'ছদি')। **মিসমিসে**—মসীবৎ (কালির মতো) বিশেষণ শব্দ, সদৃশার্থে দ্বিরুক্তি। **কামরা—প্রকোষ্ঠ**, ঘর (**পোর্তুগীজ cammara** হইতে)। পাটনী—খেয়ামাঝি, পারঘাটার মাঝি (নৌ পত্তন>পাটন + ঈ) পালসুদ্ধ—পাল + সুদ্ধ (তদ্ধিত প্রত্যয়ের মতো ব্যবহৃত হইয়াছে—সহিতার্থে)। চুরমার—(বিশেষণ) অর্থ—'একেবারে চূর্ণ এবং নষ্ট চুর = চূর্ণীকৃত এবং মার মৃত (নষ্ট) চুর (চূর্ণ) অথচ মার (নষ্ট) দুইটি বিশেষণে কর্মধারয় সমাস। চড়নদার (চড়ন-দার)—চড়ন + দার (তদ্ধিত প্রত্যয়) 'আরোহী'। বস্তা—বড় থলি, (ফারসী শব্দ)। পিঁজা তুলা = 'ধূনিত কার্পাস' (সাধু ভাষায়)। **পীপা**—ঢাকের আকৃতি বিশিষ্ট কাঠের পাত্র বিশেষ পোর্তুগীজ শব্দ (**pipa**)। মোহানা—নদীর মুখ—তদ্ভব শব্দ, সং মুখ>প্রাকৃত 'মুহ' + অনা (প্রত্যয়)।

অনুশীলনী

১। এই সকল শব্দ সমষ্টি দ্বারা সার্থক বাক্য রচনা কর :—দাঁত কপাটি লাগা গা বমি বমি করা, প্রমাদ ঘটা, ঝড়ঝাপটা।

২। এই সকল শব্দগুলির শ্রেণী বিভাগ করিয়া সাধু ভাষায় ব্যবহৃত প্রতিশব্দ লিখ :—পীপা, ছুই, গহনা, তদারক, বস্তা, আড্ডা, মোহানা, মেরামত, জিনিস।

৩। ব্যাকরণ সংক্রান্ত টীকা লিখ :—চড়নদার, চুরমার, মিসমিসে, পালসুদ্ধ, খেলুড়ি।

৪। **বাচ্য পরিবর্তন কর** ঃ—(১)……সব জায়গাই একবার ঘুরিলেন ;

(২) হিসাব দেখিলেন, বহাল বরখাস্ত করিলেন। (৩) সকলেই মেয়েকে আদর করিয়াছে, জিনিস দিয়াছে। (৪) ডিঙা গণিয়া দেখে। (৫) আপনারা আপন আপন কামরায় যান। (৬) তেল, সমুদ্রের মধ্যে ঢালিতে লাগিল। (৭) সব ডিঙাগুলি দেখা যাইতেছে। **উত্তর :**—(১) সব জায়গাই একবার তাঁহার ঘোরা হইল। (২) হিসাব দেখা হইল, বহাল বরখাস্ত করা হইল। (৩) সকল (লোক) দ্বারা মেয়ে আদৃত হইয়াছেন—জিনিস প্রদত্ত হইয়াছে। (৪) ডিঙা গণিয়া দেখা হয়। (৫) আপনাদের আপন আপন কামরায় যাওয়া হউক। (৬) তেল সমুদ্রের মধ্যে ঢালা হইতে লাগিল। (৭) তিনি সব ডিঙাগুলি দেখিতেছেন।

৫। **অশুদ্ধিশোধন কর :**—ব্যবসা, বিহারীর সাথে যাহারই কারবার ছিল, মেযেকে খুব আদৃত করিয়াছে। মেযে আবার পুরাণা খেলোয়াড়দের সাথে খেলা করিবে। বাদিদ্বিপ, আজ বড় সুবিধার নয়, বেশী চড়া নড়া করায় প্রমাদ হইবে। নৌকা যেন চুরমার হইয়া পড়িতে লাগিল, জল প্রথম কাপিয়া ফুলিয়া উঠে। নিশ্বাস স্তব্ধ হইয়া পড়িতেছে। আজ সন্ধ্যার একটু পরেই হউক বা পূর্বেই হউক গঙ্গার মোহানায় গিযা পৌছিব।

৬। **উক্তি পরিবর্তন কর :**—গালি দিলে তাহারা গালি পাড়ে। একজন বলিল......বল দেখি। **উত্তর:**—গালি দিলে তাহারাও গালি পাড়ে। এক জন তাচ্ছিল্যের স্বরে বিহারী দত্তের সেই সাংঘায় অবস্থিতি জানাইযা মাঝিদিগকে সতর্ক করিয়া দিল, যে সে (বিহারী) যদি ডুবে, বাঙ্গালা দেশটা অন্ধকার হইবে। তাহারাও উত্তেজনার সহিত উহা স্বীকার করিল এবং তাহার পালটা জবাব দিল, তাহাদের কাছে নিজের প্রাণটা শত শত বিহারী দত্তের চেয়েও বেশী দরকারী ; বিহারী মরিলে তাহার ধন আছে, দৌলত আছে, তাহার পরিবারদের দেখিবার অনেক লোক হইবে। কিন্তু মাঝিদের স্ত্রীপুত্রকে দেখিবার কেহ নাই, এই কথাই দৃঢ়তার সহিত তাহারা বলিল।

৭। **নির্দেশ অনুসারে পরিবর্তন কর :**—(১) ঐ যে মেঘখানা দেখিতেছেন ওখানা ভালো নয় (অস্ত্যর্থক বাক্যে)। (২) আমাদের স্ত্রী-পুত্রকে দেখিবার কে আছে ? (নির্দেশসূচক বাক্যে)। (৩) মেয়েও খুব খুশী (নাস্ত্যর্থক বাক্যে)। স্থির হইয়া বসিয়া থাকিবেন (নাস্ত্যর্থক বাক্যে)। (৪) মাঝি বলিল, "দত্ত মহাশয়, আজ বড়ো সুবিধা নয়, ঐ যে মেঘখানা দেখিতেছেন ওখানা ভালো নয় (উক্তি পরিবর্তন)। (৫) মাঝি বলিল," ঝড়ে আমাদের বড়োই উপকার করিয়াছে, আমরা এক বেলায় সাত-আট দিনের পথ আসিয়া পড়িয়াছি। আজ সন্ধ্যার পূর্বেই হউক বা একটু পরেই হউক, গঙ্গার মোহনায় গিয়া পৌঁছিব।" (উক্তি পরিবর্তন)। (৬) তখন বিহারী পাগলের মতো হইয়া তাহার কাছে গিয়া উপস্থিত। বলিল, "আমার স্ত্রীর এই অবস্থা, আমার মেয়ের

এই অবস্থা, আমায় রক্ষা কর" (এক বাক্যে পরিণত কর)। (৭)' বিহারী বলিল, "আমার যথাসর্বস্ব যায় সেও আচ্ছা, আমার স্ত্রী ও কন্যা যেন প্রাণ পায় ও সুস্থ হয়।" (উক্তি পরিবর্তন কর)। **উত্তর ঃ**—(১) ঐ যে মেঘখানা দেখিতেছেন ওখানা খারাপ (অস্ত্যর্থক বাক্য)। (২) আমাদের স্ত্রীপুত্রকে দেখিবার লোকের অভাব (নির্দেশসূচক বাক্য)। (৩) মেয়েও যে খুব খুশি হয় নাই এমন নহে (নাস্ত্যর্থক)। (৪) মাঝি দত্তমহাশয়কে সতর্ক করিতে গিয়া একখানা মেঘ দেখাইয়া তাঁহাকে আসন্ন বিপদের সংকেত দিল। (৫) মাঝি আনন্দিত হইয়া ঝড়ের অত্যন্ত উপকারিতার কথা তাঁহাকে বুঝাইল। তাহারা একবেলায় সাত আট দিনের পথ আগাইয়া আসিয়াছে। ঐ দিন সন্ধ্যার পূর্বে বা পরে গঙ্গার মোহানায় গিয়া তাহারা পৌঁছিতে পারিবে। (৬) তখন বিহারী পাগলের মতো হইয়া তাহার স্ত্রীর, মেয়েরও নিজের সংকটাপন্ন অবস্থা হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য কাতর অনুনয় করিল। (৭) বিহারী তাহার যথাসর্বস্বের বিনিময়ে স্ত্রী ও কন্যার সুস্থ হইবার আর প্রাণ ফিরিয়া পাইবার জন্য কাতর অনুনয় করিল।

সাক্ষী (পৃঃ ৮৯-৯৩)

সন্ধি ঃ—**উত্তরাধিকারী**—উত্তর + অধিকারী। পৃথগন্ন—পৃথক্ + অন্ন। নির্জীব—নিঃ + জীব। বৃত্তান্ত—বৃত্ত + অন্ত। সর্বাপেক্ষা—সর্ব + অপেক্ষা। নিশ্চল—নিঃ + চল। স্থানান্তরিত—স্থান + অন্তরিত। নিঃস্বার্থ—নিস্ + স্বার্থ। করাঘাত—কর + আঘাত। নীরব—নিঃ + রব। কারাবরুদ্ধ—কারা + অবরুদ্ধ। নির্বোধ—নিঃ + বোধ। মুখাগ্নি—মুখ + অগ্নি। সদ্যোমৃত—সদ্যঃ + মৃত। **পিণ্ডনাশ-আশঙ্কায়**—শ্রুতিকটুতার জন্য সন্ধি করা হয় নাই। হস্তাক্ষর—হস্ত + অক্ষর।

পদান্তর ঃ—জবাব—জবাবী। স্থাবর—স্থিতি। কম্পিত—কম্পন। পরিতৃপ্তি—পরিতৃপ্ত। ভিক্ষা—ভিক্ষুক। অপরাধ—অপরাধী। আশ্রয়—আশ্রিত। প্রমাণ—প্রমাণিত। মামা—মামাতো। আয়োজন—আয়োজিত। অনুমান—অনুমিত। আহার—আহৃত। উদ্যোগ—উদ্‌যোগী। সামর্থ্য—সমর্থ। মিথ্যা—মিথ্যুক। মূর্ছিত—মূর্ছা। চতুর—চতুরতা, চাতুরী, চাতুর্য। শহর (সহর)—সহরে।

ব্যুৎপত্তি ঃ—স্থাবর—√স্থা + বরচ্ (শীলার্থে)। গাড়োয়ান—গাড়ি + ওয়ান (চালকার্থে)। সাক্ষী—সাক্ষাৎ + ইন্ দ্রষ্টার অর্থে। নায্য—ন্যায় + যৎ অন পেতার্থে। শীর্ণ—শৄ + ক্ত (কর্তৃবাচ্যে), কৌশল—কুশল + অণ্ (ভাবার্থে) মূর্ছিত—মূর্ছা + ইতচ্ (জাতার্থে), অবরুদ্ধ—অব + রুধ্ + ক্ত (কর্মবাচ্যে)।

সমাস ঃ—পিণ্ডনাশ-আশঙ্কায় = পিণ্ডের নাশ (ষষ্ঠীতৎ) তাহা 'হইতে আশঙ্কা (পঞ্চমী তৎপুরুষ), **কর্মনাশা** = কর্ম নাশ করে যে (উপপদতৎ)—কর্ম— √নাশ্ + আ (কর্তৃবাচ্যে)। হাড়জ্বালানী—হাড় (কে পর্যন্ত) জ্বালায় যে (স্ত্রী) হাড়—

জ্বাল্ + আনী—জ্বল্ + আ (প্রেরণার্থক) = জ্বালা। গৃহপোষ্য—গৃহে পোষ্য (সপ্তমী তৎপুরুষ)। [কিন্তু 'দুগ্ধপোষ্য'—দুগ্ধ দ্বারা পোষ্য তৃতীয়া তৎপুরুষ]। উপস্থিত মত—উপস্থিতের (বর্তমান সময়) মত (অব্যয়পদ অনুসর্গ = জন্য) বর্তমান সময়ের জন্য ইং [for the present] কাঠগড়া—কাঠের বেড়াযুক্ত ঘর বা মঞ্চ (Witness box) কাঠের গড়া (ষষ্ঠীতৎপুরুষ—হিন্দী "কাঠঘর্রা" হইতে)।

পদটীকাঃ—বুদ্ধিসুদ্ধি—শব্দদ্বৈত, ইত্যাদি—অর্থে—দ্বন্দ্ব সমাস। সপিনা—আদালতে হাজির হইবার পরওয়ানা, সমন [ইং subpoena আরবী 'সফীনা'। ডাকিনী—ডাইনী, ডাক + ইন্ + ঈ স্ত্রীলিঙ্গে। ভণ্ডুল—পণ্ড, ব্যর্থ। সহি—('হস্তাক্ষর' হিন্দী—স্বাক্ষর দস্তখত (ফারসী) [আরবী 'সহীহ্ হইতে] এমনতরো—এইরূপ, এই প্রকার—এমন + তর (বিদেশী) প্রত্যয়—প্রকারার্থক 'তরহ' শব্দ হইতে)। আস্ত—পুরোপুরি, বিশেষণীয় বিশেষণ।

কারক ও বিভক্তিঃ—পিণ্ডনাশ-আশঙ্কায—তৃতীয়া -'য়' বিভক্তি, হেত্বর্থে তৃতীয়া। সোনার (ছেলে)—'বিশেষণ সম্বন্ধে ষষ্ঠী।

বিশিষ্ট বাগ্‌ভঙ্গিঃ—"কলম সরিতেছিল না"—লিখিতে পারিতেছিলেন না। 'শত্রুর মুখে ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া'—চলিত বুলিতে 'শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে = শত্রুর অভিপ্রায় ব্যর্থ হইবার কামনা করা। 'জিভ কাটিয়া বলা'—অস্বীকার করা (শপথ পূর্বক অস্বীকার)। ('রামকানাইকে') লইয়া পড়া—আক্রমণ করা। (ব্যাপারটা) পাকিয়া উঠিল = কোন ঘটনা পরিণতির পথে উপস্থিত হইল। 'ললাটে করাঘাত করা' = চলিত বুলিতে 'কপাল চাপড়ান'। 'ঠেসেধরা—কথা বাহির করিবার জন্য চাপ দেওয়া, 'কাল হওয়া'—মরিয়া যাওয়া।

অনুশীলনী

১। বাক্য রচনা কর :—'মুখাগ্নি', 'উপস্থিতমত', 'লইয়া পড়া', 'চক্ষু স্থির হওয়া', 'কলম সরা', 'কাল হওয়া', 'জিভ কাটা', 'কর্মনাশা', 'পাকিয়া উঠা'। ২। এই সকল পদ বা বাক্যাংশগুলির মধ্যে 'তৎসম' পদগুলিকে চলিত ভাষার পদে পরিণত কর এবং চলিত ভাষার বা বিদেশী ভাষার পদকে সাধু ভাষায় পরিণত করিয়া বাক্য রচনা কর :—'গুঁতা', 'সদ্যোমৃত', 'ভণ্ডুল', সহি, কলম, ললাটে করাঘাত, কারাবরুদ্ধ, কাঠগড়া, অশ্রুবিসর্জন, জেলে পাঠান।

৩। লিঙ্গান্তরিত কর :—দাদা, সাক্ষী, গৃহপোষ্য, ধর্মপত্নী, বুদ্ধিমান্, বন্ধু, পার্শ্ববর্তী। **উত্তর**ঃ—দাদা—দিদি, বৌঠাকুরাণী, বৌদিদি। সাক্ষী—(সাক্ষিন্—শব্দ) সাক্ষিণী। গৃহপোষ্য—গৃহপোষ্যা। ধর্মপত্নী—পতি [ধর্মের (নিমিত্ত) পত্নী—নিমিত্তার্থে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস। 'পত্নী'—'পতি'—শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে-ঈ প্রত্যয়ে পত্নী হয়—সহধর্মিণী, বিবাহিতা স্ত্রী যিনি যজ্ঞের ফলভাগিনী। 'পত্নী শব্দ—

'ধর্মপতি' হইতে উৎপন্ন হয় নাই, সুতরাং **পুংলিঙ্গে ধর্মপতি হইবে না—'পতি' শব্দই লিখিতে হইবে**। বুদ্ধিমান্ (বুদ্ধিমৎ)—বুদ্ধিমতী। **বন্ধু**—আধুনিক বাঙালায় **বান্ধবী** ['সখা'—শব্দ দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গে একই অর্থ প্রকাশ করা যায়], পার্শ্ববর্তী (পার্শ্ববর্তিন্)—পার্শ্ববর্তিনী।

৪। **বাচ্য পরিবর্তন কর** :—(১) তথাপি রামকানাই লিখিলেন এবং সই করিবার জন্য কলমটা দাদার হাতে দিলেন। (২) কিছুদিনের মতো বাবাকে এখান হইতে স্থানান্তরিত করা চাই। (৩) কাশীতে গিয়া আশ্রয় লইলেন। (৪) আমি সাক্ষ্য দিব এবং আরো সাক্ষী জুটাইব। (৫) আহার ত্যাগ করিলেন। (৬) আমি বুড়োকে ভাল বলে জানতুম। **উত্তর** :—(১) তথাপি রামকানাই কর্তৃক লিখিত হইল এবং সই করিবার জন্য কলমটা দাদার হাতে প্রদত্ত (দেওয়া) হইল। (২) কিছুদিনের জন্য বাবাকে অবশ্যই এখান হইতে স্থানান্তরিত করিব। (৩) কাশীতে গিয়া তাঁহার আশ্রয় লওয়া হইল। (৪) আমাকর্তৃক সাক্ষ্য দেওয়া হইবে এবং আরো সাক্ষী সংগৃহীত হইবে। (৪) তৎকর্তৃক আহার ত্যক্ত হইল; (৬) বুড়োকে (বুড়ো) আমার ভাল বলে জানা ছিল।

৫। **অশুদ্ধি শোধন কর** :—(১) নবদ্বিপের বাবার বুদ্ধিশুদ্ধির উপর নবদ্বীপের মার কিছুমাত্র অল্প ছেরেদ্দা ছিল না, সুতরাং কথা তারও মনে হইল না। অবশেষে মার তারণায় এই নিতান্ত অত্যানবশ্যক নির্বোধ, কর্মণাশা বাবা একটা যেনতেন ছলা করিয়া কয়েকদিনের মতো কাশীতে গিয়া আশ্রিত হইলেন। (২) সে বলিল দিদি তোমার কোন ভাবনা মোটেই নাই, আমিই সাক্ষী দিব এবং আরো অনেককে সাক্ষী জুটাইব। (৩) আবার সোণার পুত্র জেলে পাঠাইবার উদ্যোগ আয়োজন করিতেছে। (৪) রামকানাইর অক্ষি স্থির হইয়া গেল।

৬। **উক্তি পরিবর্তন কর** :—(১) অবশেষে কাতরস্বরে কহিলেন, "আমার অপরাধ কী। আমি তো দাদা নই।" নবদ্বীপের মা ফোঁস করিয়া উঠিয়া বলিলেন, "না তুমি বড়ো ভালোমানুষ, তুমি কিছু বোঝ না। দাদা বল্লেন লেখো, ভাই অমনি লিখে গেলেন। তোমরা সবাই সমান।" এদিকে নবদ্বীপ তাহার বুদ্ধিমান্ বন্ধুদের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহার মাকে আসিয়া বলিল, "কোনো ভাবনা নাই। এ বিষয় আমিই পাইব। কিছুদিনের মতো বাবাকে এখন হইতে স্থানান্তরিত করা চাই। তিনি থাকিলে সমস্ত ভণ্ডুল হইয়া যাইবে।" **উত্তর** :—(১) তিনি অবশেষে কাতরস্বরে বলিলেন তাঁহার অপরাধ নাই। তিনি তো দাদা নহেন। নবদ্বীপের মা তর্জন করিয়া উঠিয়া বিদ্রূপের সুরে তাঁহাকে বলিলেন তিনি বড়ো ভালোমানুষ কিনা তাই তিনি কিছুই বোঝেন না। দাদা বলায় ভাই অমনি লিখিলেন, তাঁহারা সকলেই সমান। (বাকিটুকু নিজে চেষ্টা কর) (২) চতুর ব্যারিষ্টার......জনাতুম। **উত্তর** :—(২) চতুর ব্যারিষ্টার পার্শ্ববর্তী এটর্নির নিকট

নিজের (বাহাদুরি) কৃতিত্ব প্রকাশ করিবার জন্য শপথ করিয়া বলিলেন, লোকটাকে তিনি কথা বাহির করিবার জন্য খুবই চাপিয়া ধরিয়াছিলেন। মামাত ভাইটি গিয়া দিদিকে তাহার বাহাদুরির কথা বলিল যে, বৃদ্ধ সমস্তই মাটি করিয়াছিল কেবল তাহারই সাক্ষ্যে মকদ্দমা রক্ষা পায়। দিদি ভাইয়ের কথায় সায় দিয়া বলিলেন কেহই লোক ঠিকমত চিনিতে পারে না, তিনি বৃদ্ধকে ভাল বলিয়াই পূর্বে জানিতেন।

৭। **নির্দেশ অনুসারে পরিবর্তন কর ঃ**—(১) রামকানাই লিখিলেন, কিন্তু লিখিতে তাঁহার কলম সরিতেছিল না (সরল বাক্যে)। (২) নবদ্বীপ যখন সংবাদ পাইয়া আসিল তখন তাহার জ্যাঠামহাশয়ের কাল হইয়াছে। (সরল বাক্যে)। (৩) যদি তোমার উইল করিবার ইচ্ছা থাকে তো বলো (সরল বাক্যে)। (৪) তোমার তো বুদ্ধিনাশের সময় হয় নাই, তবে তোমার এমন ব্যবহার কেন? (জটিল বাক্যে)। (৫) ডাক্তার যখন জবাব দিয়ে গেল তখন গুরুচরণের ভাই রামকানাই কহিলেন (সরলবাক্য)। (৬) আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত বিষয়সম্পত্তি আমার ধর্মপত্নী শ্রীমতী বরদাসুন্দরীকে দান করিলাম (চলিত ভাষায়)। (৭) নবদ্বীপ কহিল, "দেখিব মুখাগ্নি কে করে এবং শ্রাদ্ধশান্তি যদি করি তো আমার নাম নবদ্বীপ নয়" (উক্তি পরিবর্তন কর)। (৮) রামকানাই বলিলেন, "বউঠাকুরাণী, দাদা তোমাকেই সমস্ত বিষয় দিয়া গিয়াছেন। এই তাঁহার উইল। লোহার সিন্দুকে যত্নপূর্বক রাখিয়া দিও (উক্তি পরিবর্তন কর)। (৯) গৃহিণী বলিলেন, "কেন এতে নবদ্বীপের দোস হয়েছে কী। সে তার জ্যাঠার বিষয় নেবে না। অমনি এক কথায় ছেড়ে দেবে।" (উক্তি পরিবর্তন)। (১০) হতবুদ্ধি রামকানাই যখন দেখিলেন তাঁহার স্ত্রী পুত্র উভয়ে মিলিয়া কখনও বা তর্জনগর্জন কখনও বা অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন, তখন ললাটে করাঘাত করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন ; আহার ত্যাগ করিলেন, জল পর্যন্ত স্পর্শ করিলেন না। (চলিত ভাষায় পরিবর্তিত কর) (১১) দিদি বলিলেন, "বটে! লোক কে চিনতে পারে। আমি বুড়োকে ভাল করে জানতুম" (উক্তি পরিবর্তন)। (১২) ব্যাপারটা যখন সম্পূর্ণ পাকিয়া উঠিল তখন নবদ্বীপের মা নবদ্বীপের বাপকে কাশী হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন ; (সরল বাক্য)। (১৩) তোমার যা কিছু বক্তব্য আছে আমাকে অবসর মত বলিও। (বাচ্য পরিবর্তন কর)। **উত্তর ঃ**—লিখিতে কলম না সরিলেও, রামকানাই লিখিলেন (সরল বাক্য)। (২) জ্যাঠা মহাশয়ের কাল হইলে সংবাদ পাইয়া নবদ্বীপ আসিল (সরল বাক্য)। (৩) তোমার উইল করিবার ইচ্ছা থাকিলে বল। (সরল বাক্য) (৪) যখন বুদ্ধিনাশের সময় হয় নাই তখন তোমার এমন ব্যবহার কেন? (জটিল বাক্য) (৫) ডাক্তার জবাব দিয়া যাইতে গুরুচরণের ভাই রামকানাই কহিল (সরলবাক্য)। (৬) আমার স্থাবর অস্থাবর বিষয়-আশয় আমার বিয়ে-করা স্ত্রী শ্রীমতী বরদা সুন্দরীকে দিলুম।

(৭) (পরোক্ষ) নবদ্বীপ শাসাইল যে সে মুখাগ্নি বা শ্রাদ্ধ শান্তি কিছুই করিবে না। (৮) (পরোক্ষ) রামকানাই তাঁহার বউঠাকুরাণীকে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্তৃক সমস্ত বিষয় দিয়া যাইবার সংবাদ জানাইয়া তাঁহার উইলখানি বাহির করিয়া উহা লোহার সিন্দুকে যত্নপূর্বক রাখিয়া দিতে বলিল। (৯) (পরোক্ষ) গৃহিণী খুব ঝাঁঝাল সুরে ঐ ব্যাপারে নবদ্বীপের কোন দোষ হয় না বলিয়া (নবদ্বীপের) তাহার কাজের সমর্থন করিলেন। জ্যেঠার বিষয় না লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া তাহার পক্ষে কোনক্রমেই উচিত হইবে না। (১০) রামকানাই কি করবেন ঠিক করতে পারলেন না। তিনি যখন দেখলেন তাঁর স্ত্রী ও ছেলে কখনও রাগে গস্‌গস্ করছেন বা কড়া কথা শুনাচ্ছেন অথবা চোখের জল ফেলছেন, তখন তিনি কপাল চাপড়ে বসে রইলেন, খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিলেন। এমনকি জলটুকু পর্যন্ত ছুঁলেন না। (চলিত ভাষায়)। (১১) তখন দিদি আত্মপ্রসাদের সুরে বলিলেন লোককে কেহই চিনিতে পারে না, তবে তিনি পূর্ব হইতেই, বৃদ্ধকে ভালভাবে জানিতেন (পরোক্ষ)। (১২) ব্যাপারটা সম্পূর্ণ পাকিয়া উঠায় নবদ্বীপের বাবাকে কাশী হইতে ডাকাইয়া পাঠাইলেন (সরলবাক্য)। (১৩) তুমি যাহা বলিবে তাহা যেন আমার অবসরমত আমাকে বলা হয়। (বাচ্য পরিবর্তন)। অথবা, তুমি যাহা কিছু বলিতে চাও, তাহা যেন আমার অবসর মত আমাকে বলা হয় (উক্ত হয়)।

লুই পাস্তুর (পৃঃ ১৪৪-১৪৮)

সমাস ঃ—ক্ষতবিক্ষত—ক্ষত এবং বিক্ষত [দুইটি বিশেষণ শব্দে কর্মধারয় সমাস]। পরীক্ষালব্ধ—পরীক্ষাদ্বারা লব্ধ (তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস)। লোকারণ্য—লোকরূপ অরণ্য (রূপক কর্মধারয়—তুলনীয় 'জনঅরণ্য'—রবীন্দ্রনাথ)। জলাতঙ্ক—জল হইতে আতঙ্ক (ভয়) যাহাতে (বহুব্রীহি)—রোগবিশেষ। **পদটীকা ঃ**—প্রতিষেধক (preventive)—প্রতি— √সিধ্ + অক (ণক)। ফুটন্ত— √ফুট্ + অন্ত—যাহা ফুটিতেছে (তুলঃ—বাড়ন্ত, চলন্ত, ঘুমন্ত)। উপরকার—উপর + কার (সম্বন্ধে ষষ্ঠীর অর্থে প্রত্যয়)। (দুধ) **টকে যায়—কর্ম—কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া।** মড়ক—মড়া (সং মৃত) + ক (অর্থ মহামারী) [তুলঃ চড়ক, ফাটক, আটক ইত্যাদি]। লম্বাটে—লম্বা + টিয়া > টে বিশেষণার্থক প্রত্যয় (তুঃ—রোগাটে, তামাটে, ভাড়াটে)। **টিকা ঃ**—'অঙ্গে ক্ষত করিয়া বসন্তাদি রোগের প্রতিষেধক বীজ প্রয়োগ (সংসদ অভিধান)। অমায়িক—কপটতাহীন সরল-মায়া + ইক = মায়িক, নয় মায়িক (নঞ্‌ তৎপুরুষ) অমায়িক। পদ্ধতি—উপায়-পদ + হতি—'পদে'র (পায়ের) 'হতি' আঘাত (চরণ চিহ্ন) যেখানে অর্থাৎ রাস্তা, (পদ)—হন্ + ক্তি। [হতি শব্দ পরে থাকিলে 'পদ' শব্দের স্থানে 'পদ্‌' আদেশ হয়]।

অনুশীলনী

১। বড় হরফে মুদ্রিত অংশ সংক্ষিপ্ত করিয়া বাক্যগুলি পরিবর্তিত কর :—(১) যে জল **ফুটিতেছে** তাহা চায়ের উপর ঢালিয়া দাও। (২) লোকটাকে **রোগা রোগা মনে হয়**। (৩) **উপরে যে ঘর রহিয়াছে** তাহাতে কেহ বাস করে না। (৪) পিতার **আনন্দের অবধি রহিল না**। (৫) এবারকার **কলেরায় দেশে অগণিত লোক মারা যাইতেছে**।

২। ব্যাকরণ সংক্রান্ত টীকা লিখ :—লম্বাটে, দুধ **টকে যায়,** পরীক্ষালব্ধ, অমায়িক, লোকারণ্য, **চিনির** গেজে ওঠা।

৩। 'টিকা' শব্দের বিভিন্ন অর্থ নির্দেশ করিয়া বাক্য রচনা কর এবং **'টীকা'** শব্দের সহিত অর্থের ভেদ থাকিলে তাহা প্রদর্শন কর। **উত্তর** ঃ—(১) **'টিকা'**—বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক বীজ সূচি দ্বারা প্রয়োগ—কলিকাতায় গেলবছর অনেকে কলেরার টিকা লইয়াছে'। (২) অঙ্গারাদি দ্বারা প্রস্তুত গুটিকা। **"টিকার** আগুন ধূপদানীতে ব্যবহার করা চলে"। (৩) তিলক, কপালের ফোঁটা —'নক্ষত্ররায় **রাজটিকা** পরিলেন'। (৪) টিকা (টেকা) ক্রিয়াপদ—থাকা, স্থায়ী হওয়া। কোন কাজে এ ছেলের টিকা (টেকা) অসম্ভব। **টীকা**—ব্যাখ্যা, টিপ্পনী—**টীকা** ছাড়া সংস্কৃত পুস্তক (বা কঠিন পুস্তক) পড়া যায় না। (প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য)

৪। **বাচ্যান্তরিত কর** ঃ—(১) মিষ্টারের দেহ ক্ষতবিক্ষত হ'ল। (২) তিনি লুই পাস্তুর ও তাঁহার আবিষ্কারের কথা শুনেছিলেন। (৩) লোকটি বিট থেকে কোহল তৈরী করত। (৪) তিনি তাদের চিনলেন। (৫) পঁচিশটিকে তিনি ......করেন নি। (৬) এর পর পাস্তুর জলাতঙ্ক রোগের কারণ ও তার নিবারণের পদ্ধতি নির্ণয় করলেন। (৭) বহুসংখ্যক লোক ভোট দিয়েছিল। (৮) একটা কুকুর এক মেষপালক বালককে আক্রমণ করছে। **উত্তর** ঃ—(১) মিষ্টারের দেহকে ক্ষতবিক্ষত করল। (২) তৎকর্তৃক লুই পাস্তুর ও তাঁর আবিষ্কারের কথা শোনা হয়েছিল। (৩) লোকটি দ্বারা বিট থেকে কোহল তৈরী করা হ'ত। (৪) তাঁহাদ্বারা তাদের চেনা হল। (৫) তাঁহাদ্বারা পঁচিশটিকে মৃদু টিকা দেওয়া হয়েছে; বাকি পঁচিশটির কিছুই তাঁহাদ্বারা করা হয় নি। (৬) এর পর পাস্তুর কর্তৃক জলাতঙ্ক রোগের কারণ ও তার নিবারণের পদ্ধতি নির্ণীত হল। (৭) বহুসংখ্যক লোকের ভোট দেওয়া হয়েছিল। (৮) একটা কুকুর দ্বারা এক মেষপালক আক্রান্ত হচ্ছে।

৫। **অশুদ্ধি শোধন কর ঃ—চীকিৎসা, সাহার্য, ব্যবসা, পিতার অসীম আনন্দের অবধি রইল না, মউলিক গবেষনা, রসায়নিক, বীজানু, পাতার উপর উজ্জল আলো ফেললেন, লম্বাটে মতন ধরনের জীবানু, গুটিপোকার মরক লাগল,**

জীবজন্তুজানোয়ার মারা যেত, সম্ভভাবে, মৃহু টীকা দিয়েছেন, অমাষিক, হল (hall) বহু লোকে লোকারন্য, দর্শকমণ্ডলীগণ।

৬। **নির্দেশ অনুসারে পরিবর্তিত কর** :—(১) মিষ্টারের দেহ ক্ষত বিক্ষত হইল। (নাস্ত্যর্থক)। (২) পাগলা কুকুরে কামড়ালে জলাতঙ্ক রোগ দেখা দেয় আর তাতে মৃত্যু অনিবার্য (সরলবাক্য)। (৩) ভদ্রলোক অবিলম্বে ছেলেটিকে পাস্তরের কাছে পাঠাইলেন (মিশ্রবাক্য)। (৪) সংবাদটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল (নাস্ত্যর্থক)। (৫) পাস্তর বহু অনুসন্ধান করে সুনিশ্চিত হলেন যে, পাউসেটের সিদ্ধান্ত ভুল (নাস্ত্যর্থক)। (৬) তিনি দেখলেন যে, লম্বাটে ধরনের একরকমের জীবাণু কোহলকে খারাপ করে (সম্প্রসারিত কর)। (৭) **বিপুল হর্ষের মধ্যে** (সংক্ষিপ্ত কর)। **জনমণ্ডলী** (তদ্ধিতান্ত পদ) জয়ধ্বনি করল। (৮) এই গবেষণা কেন্দ্রের প্রাঙ্গণে একটি মর্মর মূর্তি স্থাপিত হয়েছে—একটা কুকুর এক মেষপালক বালককে আক্রমণ করেছে, ছেলেটি বাধা দিচ্ছে। (সরল বাক্য)।

উত্তর :—(১) মিষ্টারের দেহ ক্ষতবিক্ষত হইল না এমন নহে। (২) পাগলা কুকুরের দংশনে উৎপন্ন, জলাতঙ্ক রোগের উপস্থিতিতে মৃত্যু অনিবার্য। (৩) ভদ্রলোক, যখন ছেলেটিকে পাস্তরের কাছে পাঠাইলেন, তখন তাহার এই কাজে মোটেই বিলম্ব হয় নাই। (৪) সংবাদটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল না এমন নয়। (৫) পাস্তর বহু অনুসন্ধান ক'রে মোটেই অনিশ্চিত রইলেন না, যে পাউসের সিদ্ধান্ত নির্ভুল নয়। (৬) তিনি দেখলেন যে এক রকমের জীবাণু, যারা লম্বামতো হয় তারা কোহলকে খারাপ করে। (৭) বিপুল হর্ষে জনতা জয়ধ্বনি করলে। (৮) এক কুকুরদ্বারা এক মেষপালক বালকের আক্রমণ ও উহার বাধা অবলম্বনে রচিত একটি মর্মর মূর্তি এই গবেষণা কেন্দ্রের প্রাঙ্গণে স্থাপিত হইয়াছে।

ভরত (পৃঃ ১০৪-১১২)

সন্ধি :—উল্লেখ—উৎ+লেখ। দ্ব্যর্থব্যঞ্জক—দ্বি+অর্থব্যঞ্জক। দুশ্চিন্তা—দুঃ+চিন্তা। সদ্যোবিধবা—সদ্যঃ+বিধবা। পরশুচ্ছিন্ন—পরশু+ছিন্ন। প্রীতি-উৎপাদন—সমাসে সন্ধি অবশ্যকরণীয়, কিন্তু শ্রুতিকটুতা নিবারণের জন্য বাংলায় সন্ধি করা হয় না। এখানেও হয় নাই। কটূক্তি—কটু+উক্তি।

সমাস :—ত্রিলোকবিশ্রুতকীর্তি—ত্রিলোকের সমাহার (দ্বিগু সমাস) **ত্রিলোক,** ত্রিলোকে বিশ্রুত (সপ্তমী তৎপুরুষ) **ত্রিলোকবিশ্রুত**—ত্রিলোক-বিশ্রুত হইয়াছে কীর্তি যাহার (বহুব্রীহি)। পরশুচ্ছিন্ন—পরশু দ্বারা ছিন্ন (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। ধর্মভীরু—ধর্ম হইতে ভীরু (পঞ্চমী তৎপুরুষ)। উত্তরীয়-প্রক্ষিপ্ত—উত্তরীয় হইতে প্রক্ষিপ্ত (পঞ্চমী তৎপুরুষ)। রাজশ্রী-উজ্জ্বল—রাজশ্রী দ্বারা উজ্জ্বল (তৃতীয়া তৎপুরুষ) **সন্ধি করা হয় নাই** (তুঃ 'প্রীতি-উৎপাদন' সন্ধি

দ্রষ্টব্য)। **চীরবাস**—যাহা চীর তাহাই বাস (দুইটি বিশেষ্য পদে কর্মধারয় সমাস। তুঃ 'চন্দনতরু', 'শিপ্রানদী')। **পদটীকা ঃ—সন্দেহের বাণ**—অভেদ সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি। বিমর্ষ—[সংস্কৃত ভাষায় বিমর্ষ বিশেষ্য পদ—অর্থ 'অসন্তোষ', অসহন] বাংলায় অর্থ 'বিষণ্ণ', 'দুঃখিত'—বিশেষণ পদ। ভিখারী—ভিখ + আরী (সং কারী' হইতে প্রত্যয়)।

মুহ্যমান— √মুহ্ + শানচ (কর্মবাচ্যে) **'মোহ্যমান' হওয়া উচিত**। √মুহ্ ধাতু অকর্মক—প্রেরণার্থক 'ণিচ্' প্রত্যয় যোগ করিলে উহা সকর্মক হয়—রূপ হইবে মোহ্ ('মোহি' ধাতু), তখন কর্মবাচ্যের —'য' প্রত্যয় যোগ করা যায় এবং তাহার উত্তর—'শানচ্' (আন>মান) প্রত্যয় হয়। কিন্তু বাঙ্লা ভাষায় ('মুহ্যমান') শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। মৌনী—মৌন + ইন্ (অস্ত্যর্থে)। আতিথ্য—অতিথি + য (ষ্যঞ্) প্রত্যয়। অতিথির ভাব বা কর্ম। ঔর্ধ্বদৈহিক—ঊর্ধ্বদেহ + ইক (তৎ সম্বন্ধীয় অর্থে)। (ভোগবিলাসের) **দ্রব্যে** আমার কাজ নাই—প্রয়োজনার্থক 'কাজ' শব্দের যোগে তৃতীয়া—'এ' বিভক্তি। (আমি) **চতুর্দশ বৎসর** বনবাসী হইব—ব্যাপ্তি অর্থে শূন্য দ্বিতীয়া বিভক্তি। সহস্র **ভূষণে** যে শোভা দিতে অসমর্থ—কর্তৃকারকে প্রথমা—'এ' বিভক্তি।

অনুশীলনী

১। (ক) 'বিমর্ষ' শব্দের অর্থ বিচার কর, (খ) 'মৌন' শব্দের বিশেষ্য এবং বিশেষণরূপে প্রয়োগ প্রদর্শন কর।

২। চলিত ভাষায় প্রকাশ কর :—মৌনী হইয়া, পরশু, প্রতীক্ষা, নিক্ষেপ, আহ্বান, সূচিকা, প্রাতঃকাল, জলনিষেক, অসংযত, কবাট, ভাবী (ভবিষ্যৎ), হর্ম্যাগ্র, উত্তরীয়, বাগ্‌বিতণ্ডা, পাদুকাদ্বয়।

৩। সাধুভাষায় প্রকাশ কর :—কৈফিয়ৎ (কারণ নির্দেশ), খুঁত (ত্রুটি), ভালো, বেশি, পাগলিনী (উন্মত্তা), ভিখারী (ভিক্ষুক)।

৪। ব্যাকরণ সংক্রান্ত টীকা লিখ :—(ক) "ভোগবিলাসের **দ্রব্যে** আমার কাজ নাই।" (খ) "আমি চতুর্দশ **বৎসর** বনবাসী হইব।" (গ) **"সহস্রভূষণে"** যে শোভা দিতে অসমর্থ।"

৫। **নির্দেশ অনুসারে পরিবর্তন কর ঃ**—(১) নগরীর সেই চিরশ্রুত তুমুল শব্দ শুনিতেছি না কেন? (বাচ্য পরিবর্তন)। (২) ঋদ্ধিযুক্ত পুরুষেরা পরের প্রশংসা শুনিতে ভালবাসেন না (জটিল বাক্যে)। (৩) তুমি আমার ধর্মবৎসল পিতাকে বিনাশ করিয়াছ (বাচ্য পরিবর্তন)। (৪) ভরত বলিলেন, "দেব, তুমি এই অযোগ্য করে যে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়াছিলে, তাহা গ্রহণ করো।" (উক্তি পরিবর্তন)। (৫) ত্রিলোকবিশ্রুতকীর্তি মহারাজ দশরথ পুত্রশোকে

প্রাণত্যাগ করিয়াছেন ; অভিষেক মঞ্চে পাদোত্তোলনোদ্যত জ্যেষ্ঠ রাজকুমার বিধিশাপে অভিশপ্ত হইয়া পাগলের বেশে বনে গিয়াছেন (চলিত ভাষায়)। (৬) যাঁহার আয়ত এবং সুবৃত্ত বাহুদ্বয় অঙ্গদ প্রভৃতি সর্বভূষণ ধারণের যোগ্য 'সেই সুবর্ণছবি লক্ষ্মণ ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন (চলিত ভাষায়)। (৭) চতুর্দশ বৎসরে'রাজকোষে সঞ্চিত অর্থ দশগুণ বেশী হইয়াছে (জটিল বাক্যে)। (৮) পিতার হস্তের সুখের স্পর্শ কোথায় পাইব ? (বাচ্য পরিবর্তন)। (৯) ভরত বলিলেন, "এই নাকি তাঁহার শয্যা—যিনি আকাশস্পর্শী রাজপ্রাসাদে চিরদিন বাস করিতে অভ্যস্ত" (উক্তি পরিবর্তন)। (১০) ভরতের চরিত্রে কোন খুঁত নাই (বাক্য সংক্ষেপ কর)। (১১) ভরদ্বাজ ··জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি সেই নিষ্পাপ রাজপুত্রের প্রতি কোনো পাপ অভিপ্রায় বহন করিয়া তো যাইতেছেন না ?" (উক্তি পরিবর্তন কর)। (১২) তিনি পতিঘাতিনী ও সমস্ত অনর্থের মূল, বৃথা প্রজ্ঞামানিনী ও রাজ্যকামুকা—এ দুর্ভাগার মাতা (সম্প্রসারণ কর)। (১৩) ভোগবিলাসের দ্রব্যে আমার কাজ নাই (আমার স্থানে আমি ব্যবহার)। (১৪) ভরত নিজে একেবারে চেষ্টাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন (নাস্ত্যর্থক বাক্যে)। (১৫) রামচন্দ্রও ভরতের প্রতি দুই একটি সন্দেহের বাণ নিক্ষেপ না করিয়াছেন, এমন নহে (অস্ত্যর্থক বাক্যে)।

উত্তর :—(১) নগরীর তুমুল শব্দ যাহা চিরকাল শুনিয়াছি তাহা শুনা যাইতেছে না কেন ? (বাচ্যান্তর)। (২) যাঁহারা ঋদ্ধিযুক্ত পুরুষ, তাঁহারা পরের প্রশংসা শুনিতে ভালবাসেন না (জটিল)। (৩) আমার ধর্মবৎসল পিতা তোমাদ্বারা বিনষ্ট হইয়াছেন (কর্মবাচ্য)। (৪) ভরত তাঁহার অযোগ্য কর হইতে, অর্পিত রাজ্যভার ফিরাইয়া লইবার জন্য, বিনীত প্রার্থনা জানাইলেন (পরোক্ষ)। (৫) মহারাজ দশরথের কীর্তি তিনলোকের সকলেই জানে। তিনি ছেলের জন্যে দুঃখে মারা গেছেন ; বড় ছেলে যেমনি অভিষেকের মঞ্চের উপর উঠার জন্য পা বাড়িয়েছেন অমনি বিধির শাপে অভিশপ্ত হ'য়ে পাগলের বেশে বনে চলে গেছেন। (চলিতভাষা)। (৬) গোলগাল লম্বা যা'র দুখানি বাহু, যা বাজু প্রভৃতি সবরকম গয়না পরার যোগ্য, কাঁচা সোনার রঙের মতো যাঁর গায়ের রঙ সেই লক্ষ্মণ বড় ভাই এবং ভাই বৌর সঙ্গে চলেছেন। (৭) চতুর্দশ বৎসরে রাজকোষে যে অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে তাহা (পরিমাণে) দশগুণ বেশি হইয়াছে। (৮) পিতার হস্তের সুখের স্পর্শ কোথায় পাওয়া যাইবে ? (কর্মবাচ্যে)। (৯) যিনি আকাশ-স্পর্শী রাজপ্রাসাদে চিরদিন বাস করিতে অভ্যস্ত সেই রামচন্দ্রের হীন শয্যা দেখিয়া ভরতের ক্ষোভ ও বিস্ময়ের অবধি রহিল না (পরোক্ষ উক্তি)। (১০) ভরতের চরিত্র একেবারে নিখুঁত। (বাক্য সংকোচন)। (১১) ভরদ্বাজ ভরতের কার্যে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া তাঁহাকে সেই নিষ্পাপ রাজপুত্র (রামচন্দ্রের) প্রতি কোন পাপ অভিপ্রায় বহন করিয়া সেখানে যাইতেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। (১২) যিনি

পতিকে হত্যা করিয়াছেন, যিনি সমস্ত অনর্থের মূল, যিনি বৃথাই প্রজ্ঞার (জ্ঞানের) অভিমান করিয়া থাকেন, যিনি রাজ্য কামনা করেন, তিনিই এই ব্যক্তি যাহার ভাগ্য খারাপ তাহারই মাতা (বাক্য সম্প্রসারণ)। (১৩) আমি ভোগবিলাসের দ্রব্য চাহি না অথবা ভোগবিলাসের দ্রব্যে আমি কোন প্রয়োজন বোধ করি না, অথবা ভোগবিলাসের দ্রব্য আমি অকেজো মনে করি অথবা আমি ভোগ-বিলাসের দ্রব্য দিয়া কি কাজ করিব? অথবা ভোগবিলাসের দ্রব্য আমি কোন কাজেই লাগাইতে পারিব না। (১৪) ভরত মোটেই (আদৌ) সচেষ্ট হন নাই অথবা ভরত কোন চেষ্টাই করেন নাই। (১৫) রামচন্দ্র ভরতের প্রতি দুই একটি সন্দেহের বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন।

৬। **বাচ্য পরিবর্তন কর**ঃ—(১) অথচ সেই রামচন্দ্র ভারতের প্রতি দুই-একটি সন্দেহের বাণ নিক্ষেপ না করিয়াছেন এমন নহে। (২) রামকে তিনি আহ্বান করিয়া আনিয়া বলিয়াছিলেন। (৩) সিংহাসন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারই প্রাপ্য। (৪) এই সন্দেহও একান্ত অমার্জনীয়। (৫) দৈবচক্রে……লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। (৬) তুমি আমার ধর্মবৎসল পিতাকে বিনাশ করিয়াছ। (৭) আপনি তাঁহাকে রক্ষা করুন। (৮) এই পাদুকা সেই অপূর্ব রাজশ্রী ভরতকে দিল। (৯) দেব! তুমি এই অযোগ্য করে যে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়াছিলে তাহা গ্রহণ করো। **উত্তর**ঃ—(১) অথচ রামচন্দ্র কর্তৃক ভরতের প্রতি দুই-একটি সন্দেহের বাণ নিক্ষিপ্ত না হইয়াছে এমন নহে। (২) রাম তাঁহাদ্বারা আহৃত এবং আনীত হইয়া উক্ত হইয়াছিলেন। (৩) সিংহাসন জ্যেষ্ঠভ্রাতা অবশ্যই পাইবেন। (৪) এই সন্দেহকেও কোনক্রমেই মার্জনা করিব না। (৫) দৈবচক্রে পতিত এই দেবতুল্য চরিত্রকে বিশ্বের সকলে সন্দেহের ভাজন করিয়া লাঞ্ছিত করিয়াছিলেন। (৬) তোমাকর্তৃক আমার ধর্মবৎসল পিতা বিনষ্ট হইয়াছেন। (৭) আপনাকর্তৃক তিনি রক্ষিত হউন। (৮) এই পাদুকাদ্বারা ভরতকে সেই অপূর্বশ্রী দত্ত হইল। (৯) দেব! তোমাকর্তৃক এই অযোগ্য করে যে রাজ্যভার ন্যস্ত হইয়াছিল তাহা গ্রহণ করা হউক।

৭। **শূন্যস্থান পূরণ কর**ঃ—অনশনকৃশ — শোকের — মূর্তি — ভরত — তৃণের — উপবিষ্ট দেখিয়া — ন্যায় উচ্চকণ্ঠে — লাগিলেন "— যাঁহার মস্তকের — শোভা —, সেই রাজশ্রী-উজ্জ্বল — আজ — কেন? — অগ্রজের চন্দনও — মার্জিত — ; আজ — অঙ্গরাগবিরহিত কান্তি —।

৮। **অশুদ্ধি সংশোধন কর**ঃ—ঊর্দ্ধদৈহিক। সন্দেহের শস্ত্র নিক্ষেপ না করিয়াছেন এমন নহে। আব্‌ভান। ইক্ষাকুবংশ। অগ্রগন্য। জগতে নিরপরাধীর দণ্ড অনেকবার হইয়াছে। এই নির্দোষী রাজপুত্রের দিকে অন্যায় কটাক্ষপাত হইয়াছে। ব্যাগ্রকণ্ঠ। স্বার্থব্যাঞ্জক উত্তর। চন্দ্রের হট্ট ভগ্ন হইয়াছে। বিপনি বন্ধ।

রাজপথ পরিত্যাক্ত। আমার প্রাণ ব্যকুল হইতেছে। ভ্রাতাগনকে পন্থার ভিখারী করিয়াছ। কটুক্তি। শোকে মুহ্যমান হইয়া পতিত হইয়া গেলেন। তাঁহাকে অঙ্কে স্থাপনা করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শ্মশানঘাটে মড়াপিতার কণ্ঠলগ্নপূর্বক কাদিতে কাদিতে বলিলেন। ভরত মৌন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভরত জ্ঞান লাভ করিয়া সাশ্রুজলনেত্র সহকারে। ভরদ্বাজের আশ্রমে একরাত্রি তিনি আতিথ্য সিকার করিলেন। ভুলুণ্ঠিত হইয়া মাটিতে গড়াইতে লাগিলেন। মহার্ঘ্য পরিচ্ছেদ পড়িলেন। ত্যাগী রাজকুমার। পাদুকাযুগলদ্বয়। রাজ্যভার ন্যাস্ত করিয়াছিলেন। লকথনের কথা অনেক কালে অতি রুক্ষ ও দুর্বিনিত হইয়াছে। ভরতের চরিত্রে কোন খুঁত নাই। এই রাজর্ষির চিত্র এক অনন্য অদ্বিতীয় সৌন্দর্যপাত করিতেছে।

৯। **উক্তি পরিবর্তন কর** ঃ—(১) হনুমানকে ভরতের নিকট পাঠাইয়া বলিয়া দিলেন "আমার প্রত্যাগমন............করিও। (২) তিনি সীতার নিকট বলিয়াছিলেন; "তুমি ভরতের নিকট আমার প্রশংসা করিও না—ঋদ্ধিযুক্ত পুরুষেরা পরের প্রশংসা শুনিতে ভালবাসে না।" **উত্তর** ঃ—(১) রাম হনুমানকে ভরতের নিকট পাঠাইবার সময়, তাঁহার প্রত্যাগমনের সংবাদে ভরতের মুখে কোন বিকৃতি হয় কিনা, তাহা লক্ষ্য করিতে বলিয়া দিলেন। (২) তিনি সীতাকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছিলেন, তিনি (সীতা) যেন ভরতের সম্মুখে রামের প্রশংসা না করেন, কারণ ঋদ্ধিযুক্ত পুরুষেরা পরের প্রশংসা সহ্য করিতে পারে না।

ভারতবর্ষ (পৃঃ ১৬১—১৬৪)

পদটীকা ঃ—মুদিখানা—মুদি + খানা (বিদেশী প্রত্যয়—ঘর বা স্থান অর্থে [তুঃ ডাক্তারখানা, নহবৎখানা, কবরখানা, ছাপাখানা, পুথিখানা ইত্যাদি]। সাপখেলানো—সাপকে খেলানো (প্রেরণার্থক) হয় যাহাদ্বারা অথবা সাপকে খেলায় (প্রেরণার্থক) যাহা (উপপদ-তৎপুরুষ) সাপ + খেল্ + আ (প্রেরণার্থক) + আনো (কৃৎপ্রত্যয়) কর্তৃবাচ্য বা করণবাচ্যে [তুলঃ 'নয়ন ভুলানো', শান্তি-জুড়ানো, ছেলে ভুলানো ইত্যাদি—এখানে গৌণার্থে সাপ খেলাইবার (সুরের) মত সুর]। শ্মশ্রুগুম্ফশূন্য—গোঁফদাড়ি ছাড়া (চলিত ভাষায়)। দেখাশুনা—তত্ত্বাবধান (সাধুভাষায়)। ক্রিয়াকাণ্ড—ক্রিয়া এবং কাণ্ড (অত্যাশ্চর্য ব্যাপার) (সমজাতীয় শব্দের সহিত) দ্বন্দ্ব সমাস। ['ক্রিয়াকাণ্ড' বলিতে সাধারণতঃ কর্ম বা অনুষ্ঠানসমূহকে বুঝায়। ক্রিয়া + কাণ্ড (প্রত্যয়-সমূহার্থে)]। 'কতশত'—বহু অর্থে শতশব্দের প্রয়োগ—(বিশিষ্টার্থক শব্দসমষ্টি)। ঘরকন্না—ঘরের কন্না (= ঘরের কাজ—সংসার চালান) √কব্ + না = কন্না [তুলঃ রান্নাবান্না, ধন্না = ধর্না ইত্যাদি। মিটমিট—স্তিমিত প্রায়, ক্ষীণ আলোক বিকিরণের ভাব প্রকাশ—অব্যয় পদ শব্দদ্বৈত। **ঠাকুরদাদা**—ঠাকুর (শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি) অথচ দাদা—

বিশেষ্যপদে কর্মধারয় সমাস। অথবা ঠাকুর (পিতা=পিতার পিতা অথচ দাদা স্ত্রীলিঙ্গে 'ঠানদি' 'ঠানদিদি' [কিন্তু "দাদাঠাকুর" ('দাঠাকুর') ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তির ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিবার শব্দ] খদ্দের—ক্রেতা—খরিদ+দার (প্রত্যয়) খরিদদার>খদ্দের (তুঃ বাজনদার—বাজনদেরে, দোকানদার, আড়ৎদার, চড়নদার)। স্মিত আস্যে=হাসিমুখে। স্মিত ঈষৎ হাস্যযুক্ত আস্য (মুখ) যাহার (তাহার সহিত) বহুব্রীহি।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলি দ্বারা বাক্য রচনা কর :—মিটমাট, ধপধপে, দেখা-শুনা।

২। নিম্নলিখিত পদযুগলের অর্থের প্রভেদ প্রদর্শন কর :—কতশত, অতশত, ঠাকুরদাদা, দাদাঠাকুর, গদি, গদা, খুঁট, খুঁটা।

৩। সংক্ষিপ্ত করিয়া লিখ :—পা হইতে মাথা পর্যন্ত, যাহার মুখে দাড়ি ও গোঁফ নাই, যাহা অবশ্যই হইবে, 'তারপর কোথা থেকে যে কোথা গেলুম, তার ঠিকানা নেই' [অজ্ঞাতস্থানে গেলুম]।

৪। সাধুভাষায় প্রকাশ কর :—ঠাকুরদাদা, নিখুঁত, খদ্দের, মোটা, চেহারা, দেখা-শুনা, গাড়ি, বাতি, খালি, মাপ (মাফ্) করা, ফিরে (এল), পঁচিশ বছর, ভুলে যাওয়া, বয়ে গেল। উত্তর :—ঠাকুরদাদা—পিতামহ, নিখুঁত—ত্রুটিলেশশূন্য, খদ্দের—ক্রেতা, মোটা-চেহারা—স্থূলকায়, দেখাশুনা—তত্ত্বাবধান, গাড়ি—শকট, রথ—যান, বাতি—প্রদীপ, খালি—রিক্ত, শূন্য ; মাফ (মাফ্)—ক্ষমা, মার্জনা ; ফিরে এল—প্রত্যাবর্তন করিল, পঁচিশ বছর—পঞ্চবিংশতি (বর্ষ) বৎসর, ভুলে যাওয়া—বিস্মৃত হওয়া, বয়ে গেল—অতিক্রান্ত হইল।

৫। লিঙ্গ পরিবর্তন কর :—বৃদ্ধ—বৃদ্ধা, বুড়ো—বুড়ী, তন্ময়—তন্ময়ী, মধ্যবয়স্ক—মধ্যবয়স্কা।

৬। সন্ধি বিশ্লেষণ কর :—উজ্জ্বল—উৎ+জ্বল, কন্না, কর্+না (ঘরকন্না), স্মিত-আস্যে—শ্রুতিকটুতার জন্য সন্ধি করা হয় নাই।

৭। পদান্তরিত কর :—গদি—গদীয়ান্ (গদীতে উপবিষ্ট), গদিনশীন। উপভোগ—উপভুক্ত। উৎসাহ—উৎসাহিত। বিস্ময়—বিস্মিত। স্বর্গ—স্বর্গীয়। গম্ভীর—গাম্ভীর্য। ইচ্ছা—ইষ্ট। জন্ম—জাত। অভিবাদন—অভিবাদিত। প্রকৃত—প্রকৃতি। পরিবর্তন—পরিবর্তিত।

৮। বাচ্য পরিবর্তন কর :—(১) পঁচিশ বৎসর পূর্বে আমি একবার কলিকাতা এসেছিলুম। (২) আমাদের যাওয়া আসা করতে হ'ত। (৩)……একটি বৃদ্ধ……কী পড়ত। (পৃঃ ১৬১) (৪) খদ্দের এলে তাদের দেখাশুনা করত। (৫) সেই পাঠ শুনত। (৬) বিষয়টি তারা বিশেষভাবে উপভোগ করছে। (৭) আর

পার হয়েই বা কি করেছিলেন, তা তখন জানতে পারি নাই। (৮) বড় বড় মোটর অনবরত যাওয়া-আসা করছে। (৯) আবশ্যকমত খদ্দেরের দেখাশুনা করছিল। (পৃঃ ১৬৩) (১০) বৃদ্ধ পড়ছিল রামচন্দ্রের সেই সেতুবন্ধনের কথা। (১১) বৃদ্ধ...... আমার আপাদমস্তক একবার ভালো করে দেখে নিলে (পৃঃ ১৬৩)। (১২) বৃদ্ধ বললে "তাহলে আপনি আমার স্বর্গীয় পিতা-মহাশয়কে এই রামায়ণ পড়তে দেখেছেন।" (পৃঃ ১৬৩) (১৩) বৃদ্ধকে অভিবাদন......ত্যাগ করলুম। (১৪) মনে হল, আমি দিব্য চক্ষু পেয়েছি। উত্তর :—(১) পঁচিশ বৎব পূর্বে আমাব একবার কলকাতা আসা হয়েছিল। (২) আমরা যাওয়া-আসা করতুম। (৩) একটি বৃদ্ধেব কী পড়া হ'ত। (পৃঃ ১৬১) (৪) খদ্দেব এলে তাদের দেখাশুনা কবা হ'ত। (৫) সেই পাঠ তাদের শোনানো হ'ত। (৬) বিষয়টি তাদেব বিশেষভাবে উপভোগ করা হচ্ছে। (৭) আব পার হয়েই বা কী কবা হয়েছিল, তা তখন জানা যায নি। (৮) বড় বড মোটরের যাওয়া-আসা হচ্ছে। (৯) আবশ্যক মত খদ্দেরকে দেখাশুনা করা হচ্ছিল। (১০) বৃদ্ধদ্বারা সেই বামচন্দ্রেব সেতুবন্ধনের কথা পড়া হচ্ছিল। (১১) বৃদ্ধ দ্বারা আমার আপাদমস্তক একবার ভালো করে দেখে নেওয়া হ'ল।

৯। **উক্তি পরিবর্তন কর** :—(১) সোজা বৃদ্ধের কাছে গিয়ে বললুম, "মহাশয় মাপ......আছেন। (পৃঃ ১৬৩) (২) তারপব বিস্ময়ের.....ঐ ছেলের সন্তান (পৃঃ ১৬৩) (৩) বৃদ্ধেব.........স্মিতআস্যে বৃদ্ধ......হয় নি" (পৃঃ ১৬৩-১৬৪)। উত্তর :—(১) লেখক সোজা বৃদ্ধের কাছে গিয়ে তাঁর কাছে মাপ চেয়ে বিনীতভাবে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঠিক পঁচিশ বছর পূর্বে তিনি ঐ ছেলেমেয়েদের সামনে তাঁকে সেই একই বই পডতে দেখেছেন, ঐ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ওরা আর বড় হয়েছে কি না, বৃদ্ধের মধ্যে কোন পরিবর্তন এসেছে কি না, আর রামচন্দ্র তখনও কি সেই সেতু বন্ধনের কাজে ব্যস্ত আছেন কিনা। (২) তারপর বিস্ময়ের স্বরে বৃদ্ধ লেখকের নিকট জানতে চাইলেন পঁচিশ বছর আগে তিনি (লেখক) ওখান দিয়ে গিয়েছিলেন কিনা। লেখক উত্তর করলেন তিনিই ওখান দিয়ে গিযেছিলেন। বৃদ্ধ বললে তাহলে তিনি (লেখক) তাঁর স্বগায় পিতামহাশয়কে সেই রামায়ণ পড়তে দেখেছেন। বৃদ্ধের ছেলেমেয়েরা তাঁর (পিতাব) কাছে বসে পাঠ শুনত। ছেলেটিকে আঙুল দিয়ে দেখিযে বললেন সে তখন ঐ রকম বড়ো হয়েছে। ওর বয়স লেখকের মতোই হবে। মেয়েদের বিয়ে হযে গেছে। ভগবানের ইচ্ছায় তারা স্বামী-পুত্র নিয়ে ঘরকন্না করছে। ঐ ছেলেটি হচ্ছে তাঁর নাতি, আর ঐ মেয়ে দুটি তাঁর (বৃদ্ধের) নাতনি—তাঁর ঐ ছেলের সন্তান। (৩) লেখক বৃদ্ধের হাতের বইটি দেখিয়ে জানতে চাইলেন ও বইটি কবেকার। স্মিতআস্যে বৃদ্ধ বললে, সেটি হচ্ছে কৃত্তিবাসের রামায়ণ। তাঁর ঠাকুরদাদা বটতলায় তা কিনেছিলেন তাঁর জন্মের অনেক আগে।

১০। **অশুদ্ধি সংশোধন কর ঃ**—বৃদ্ধ তাঁর চোক দুটী তুলে আমার দিগে একবার চাইলে। নাকের উপব থেকে চসমা খুলে ধুতীর খুট দিয়ে গ্লাস দুটিকে ভালো করে পুছে আবার সেটিকে নাঁকের উপর চড়ালেন। ধির গম্ভীর দৃষ্টিতে আমার আপদমস্তক পর্যন্ত একবার ভালো করে দেখে নিলে, তারপর বিস্ময়ের সরে বললে. "পঁচিশ বছর আগে আপনি এখান হয়ে গিয়েছিলেন ?"

১১। **সাধুভাষায় পরিবর্তিত কর ঃ**—বুড়ো কী পড়ছে.........পারি নি। (পৃঃ ১৬১)। **উত্তর ঃ**—বৃদ্ধ কী পড়িতেছে (=পাঠ করিতেছে) জানিবার জন্য আমার বিশেষ কৌতূহল হইল। বাসা হইতে বাহির হইয়া মুদিদোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া (=দণ্ডায়মান হইয়া) আমি শুনিতে লাগিলাম। রামচন্দ্র কী করিয়া কপিসেনার সাহায্যে সমুদ্রের উপর সেতু বন্ধন কবিয়া লঙ্কাদ্বীপে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহাই ছিল পাঠের বিনয়। সেই অপূর্ব ক্রিয়াকাণ্ডের কথা শুনিয়া বালকদের মুখ আনন্দ, আগ্রহ এবং উৎসাহে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। আমি যখন সেই বর্ণনা শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া যাইতাম, তখন কেহ না কেহ আসিয়া আমাকে ডাকিয়া লইয়া যাইত। সেতু বন্ধন হইতেছিল, তাহাই আমি জানিয়াছিলাম। রামচন্দ্র সেতু পার হইয়াছিলেন কি না এবং পার হইয়াই বা কি করিয়াছিলেন তাহা তখন জানিতে পারি নাই।

১২। **নির্দেশ অনুসারে পরিবর্তন কর ঃ**—(১) স্মিত আস্যে বৃদ্ধ বললে, "এ হচ্ছে কৃত্তিবাসের রামায়ণ" (সাধু ভাষায় উক্তি পরিবর্তিত কর)। (২) বৃদ্ধ বললে, "তা হলে আপনি আমার স্বর্গীয পিতা মহাশযকে এই রামায়ণ পড়তে দেখেছেন।......ছেলেটি এখন ঐ বড়ো হয়েছে। ওর বয়স আপনার মতোই হবে" (উক্তি পরিবর্তন কর)। (৩) কোনো মায়ামন্ত্রবলে সেই সুদূর অতীত আবাব ফিরে এল নাকি! (অস্ত্যর্থক)। (৪) বুড়ো কি পড়ছে জানবার জন্য আমার বিশেষ কৌতূহল হলো (মিশ্র বা জটিল বাক্য)। (৫) রামচন্দ্র কী ক'রে কপিসেনার সাহায্যে সমুদ্রের উপরে সেতু বেঁধে লঙ্কাদ্বীপে পৌঁছেছিলেন তাই ছিল পাঠের বিষয় (সরল বাক্য)। (৬) আমি কালের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের কথা ভাবছি (মিশ্রবাক্য)। (৭) আগে মিটমিট করে গ্যাসের বাতি জলত (সাধুভাষা)। (৮) পঁচিশ বছর আগে.........দুটি মেয়ে। (পৃঃ ১৬২-৬৩) (সাধুভাষা)। **উত্তর ঃ**—(১) স্মিতআস্যে বৃদ্ধ উত্তর দিল উহা কৃত্তিবাসের রামায়ণ, তাহার পিতামহ বটতলায উহা তাহার (বক্তার) জন্মের বহু পূর্বে ক্রয় করিয়াছিলেন। (২) বৃদ্ধ তাঁহাকে (আগন্তুককে) বুঝাইয়া বলিল, যে তিনি তাহার স্বর্গীয় পিতাকে, ঐ রামায়ণ পড়িতে দেখিয়াছেন তাহার ছেলেমেয়েরা তখন তাঁহার (স্বর্গীয় পিতার) কাছে বসিয়া পাঠ শুনিত। তার ছেলেটিকে দেখাইয়া বৃদ্ধ বলিল, তাহার বয়স বাড়িয়া যাওয়ায় শ্রোতার মতোই সে তখন বড়

হইয়াছে। (৩) কোন মায়ামন্ত্রবলে, সেই সুদূর অতীত আবার সত্যই ফিরিয়া আসিয়াছে। (৪) বৃদ্ধ যাহা পড়িতেছে, তাহা জানিবার জন্য আমার বিশেষ কৌতূহল হইল অথবা বুড়ো যা পড়ছে, তা জানবার জন্যে আমার বিশেষ কৌতূহল হ'ল। (৫) কপিসেনার সাহায্যে রামচন্দ্রের সমুদ্রের উপর সেতুবন্ধনের উপায় ও তাঁহার লঙ্কায় পৌঁছান পাঠের বিষয় ছিল। (৬) কালে যে পরিবর্তন অবশ্যই হইবে, আমি তাহারই কথা ভাবিতেছি। (৭) পূর্বে গ্যাসের স্তিমিত প্রদীপ জ্বলিত। (৮) পঁচিশ বৎসর পূর্বে যে বৃদ্ধকে দেখিয়াছিলাম, ঠিক তাহারই মতো একটি বৃদ্ধ গদির উপর বসিয়া একখানি পুস্তক লইয়া সাপ খেলাইবার সুরে কী (যেন) পড়িতেছিল। পঁচিশ বৎসর পূর্বের সেই মধ্যবয়স্ক লোক এক একবার আসিয়া সেই পাঠ শুনিতেছিল আর আবশ্যকমতো ক্রেতাদের দেখাশুনা করিতেছিল। ঠিক পূর্বের বালকটির মতো আর একটি বালক উন্মুক্ত গাত্রে বৃদ্ধের মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়াছিল। তাহার পার্শ্বেই বালিকাদ্বয় পূর্ববৎ বসিয়াছিল।

রূপো কাকা (পৃঃ ১৬৪-১৭২)

পদটীকা ঃ—চণ্ডীমণ্ডপ—চণ্ডীর (জন্য=পূজার জন্য) মণ্ডপ (নিমিত্তার্থে ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। উঠান—প্রাঙ্গণ, আঙিনা। চাবালি—(প্রান্তিক, দেশী শব্দ) চোয়াল, চাবালি+টা (নির্দেশক প্রত্যয়) রাজপুৎতুর', 'বামুন' অর্ধ-তৎসম শব্দ বা ভগ্ন-তৎসম শব্দ ('রাজপুত্র' ও 'ব্রাহ্মণ'—শব্দের আংশিক বিকৃত উচ্চারণ)। চোখ—কর্মকারকে শূন্য দ্বিতীয়া বিভক্তি (ক্রিয়া 'রাঙাবে' রাঙাবে—রঙ্গ+অ (প্রত্যয় যোগে নাম ধাতু—ভবিষ্যত্ কাল [এখানে ঔচিত্যার্থে ভবিষ্যতের প্রয়োগ হইয়াছে—তুঃ "ও বাড়ির ছেলেরা যখন তখন যার তার গায়ে হাত তুলবে নাকি?"] ছারপোকা—দেশী শব্দ (সংস্কৃত মৎকুণ)। গোমস্তা=তহশীলদার, খাজনা-আদায়কারী—বিদেশী শব্দ (ফার্সী)—গোমশ্‌তা। চৌকিদার=পাহারাওলা (গ্রামের) চৌকি+দার (বিদেশী প্রত্যয়)। গাড়ু—নলযুক্ত জলপাত্র বিশেষ—ঝারি (সংস্কৃত—'গড্ডুক')। খাতকপত্র—খাতক, অধমর্ণ, দেনাদার, ঋণী। খাতক এবং পত্র (তৎসংক্রান্ত দলিল—শব্দদ্বৈতজনিত দ্বন্দ্ব সমাস [তুঃ কাগজপত্র, রুগীপত্র, 'সমূহ' বা 'ইত্যাদি' অর্থও এখানে হইতে পারে]। মহাজনী—মহাজন (ব্যবসায়ী) সম্বন্ধীয় 'মহাজনী' মহাজন+ঈ বিশেষণ পদ। বাড়ি—বাড়্‌তি। সলি (শলি)—ধানের পরিমাণ বিশেষ [সং 'শল্ব' শব্দ হইতে]। ঝকমকে—উজ্জ্বল, ধ্বন্যাত্মক শব্দদ্বৈত বিশেষণ। রূপোবাঁধান—রূপো দ্বারা বাঁধান (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। তালেবর—মান্যগণ্য (এখানে ব্যঙ্গে) (আরবী 'তালাবর' শব্দ হইতে)। ঝামেলা—ঝঞ্ঝাট, গোলমাল (হিন্দী 'ঝমেলা')। গোলাপালা—গোলা এবং পালা (বিচালীর গাদা) সমজাতীয় পদের দ্বন্দ্ব

সমাস (তুঃ ডালপালা—'পালা' শব্দ 'পল্লব' হইতে—পূর্ববঙ্গে 'পালো'—নদীয়া জেলায় 'পালো')। **ছেলেপিলে—সমজাতীয় পদে দ্বন্দ্ব—ছেলে** এবং 'পিলে' (দ্রাবিড় শব্দ **শিশু** ('ছেলেপুলে', আণ্ডাবাচ্চা ইত্যাদি)। **মিটমাট**—মীমাংসা **শব্দদ্বৈত**। পৈঁঠা—সোপান, সিঁড়ি, ধাপ (সং প্রতিষ্ঠা' হইতে)। খোলসা—**মুক্ত** (আরবী 'খুলসা')। **ডোবা**—(দেশীশব্দ) **ক্ষুদ্র জলাশয়**। মাদুর—তৃণ নির্মিত আস্তরণ বিশেষ (সং 'মন্দুরা')। মুড়ো—অগ্রভাগ, প্রান্ত। জুয়াচুরি—প্রবঞ্চনা, প্রতারণা।

বাগ্‌ভঙ্গি ঃ—উঠানে পা দিতেই—উঠানে উপস্থিত হইবামাত্র। বকে উঠল—গালি দিল। চোখ রাঙাবে—ধমকাইবে। হাতীর পাঁচ পা দেখা—নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান্ মনে করা। তেলে বেগুনে জ্বলে উঠা—হঠাৎ রাগিয়া যাওয়া।

কারক ও বিভক্তি ঃ—(বাবা) **বাড়ি** এলেন=অধিকরণে লুপ্ত সপ্তমী বিভক্তি। (রুপো কাকা) **আমাদের** চোখ রাঙাবে—সম্বন্ধসামান্যে ষষ্ঠী (তুঃ 'তুমি ছাড়া আমাদের দেখবে কে? **সাজিমাটির** নৌকাতে চড়ে নেমেছিল—আধার আধেয় সম্বন্ধে ষষ্ঠী (নৌকা—আধার, সাজিমাটি আধেয়)। একথা সবার **মুখেতে** শুনে এসেছি—**অপাদানে সপ্তমী (তে) বিভক্তি (তুঃ** "এ কি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে") মধুসূদন।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দ ও বাক্যাংশের সাধু প্রতিশব্দ দাও :—

বক্কে উঠল, চৌকিদার, পিসি, দেখাশুনা, তালেবর, মিটমাট, পৈঁঠা, খোলসা, ঘাড়ে ফেলে, ছারপোকা। **উত্তর ঃ**—বকে উঠল—গালি দিল। চৌকিদার—যামিক, গ্রামরক্ষী। পিসি—পিতৃস্বসা। দেখাশুনা—তত্ত্বাবধান। তালেবর—প্রতিষ্ঠিত, প্রধান। মিটমাট—মীমাংসা। পৈঁঠা—পাদপীঠ। খোলসা—পরিষ্কার। ঘাড়ে ফেলে—স্কন্ধে লইয়া। ছারপোকা—মৎকুণ।

২। বিগ্রহ বাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর :—অনর্গল, রূপোবাঁধান, চণ্ডীমণ্ডপ, ঠাকুরদাদা, বিষয়-আশয়, গৃহত্যাগী, চালাঘর, নিরাশ্রয়।

৩। বাক্য রচনা কর :—**'তেলে বেগুনে জ্বলে উঠা', 'মানুষ করা', চোখ রাঙান, কোলে পিঠে।**

৪। সাধুভাষায় রূপান্তরিত কর :—বাবার সঙ্গে···ভুল বকছ···। **উত্তর ঃ**—পিতাঠাকুর মহাশয়ের সহিত আমরাও যাইয়া রুপো কাকাকে দেখিতে পাইলাম। রুপোকাকার ক্ষুদ্র কুটীর। উহার একদিকে এক ক্ষুদ্র জলাশয়। আর একদিকে বাঁশের ঝাড়। ছিন্ন মলিন কাঁথায় আপাদমস্তক আবৃত করিয়া শীর্ণ শ্বেতশ্মশ্রু রুপা কাকা পুরাতন মাদুরে শুইয়া আছেন। রুপা কাকার পুত্রের নাম 'বেজা'। সে

আমাদিগকে দেখিয়া বলিল, "বাবুরা (এইদিকে) আসুন, পিতাঠাকুর মহাশয়কে দেখুন। তাঁহার জ্ঞান নাই, তিনি প্রলাপোক্তি করিতেছেন।"

৫। **বাচ্য পরিবর্তন কর ঃ**—(১) আমি সকালে···পড়তে। (পৃঃ ১৬৪)। (২) আমরা সব ভাই···কী কী আনলেন ? (৩) বলি, ক'রে খাবা কী ভাবে ? (৪) বামুনের ছেলে, কি লাঙল চষতি যাবা ? (৫) কেন এসেছিলো দেশ থেকে তা শুনি নি। (৬) একথা সবার মুখে শুনেছি জ্ঞান হয়ে অবধি। (৭) বাবা তখন চণ্ডী-মণ্ডপে ব'সে হিসাবের খাতাপত্র দেখছিলেন। (৮) এবার আসুক, কিছুতেই আর এ বোঝা ঘাড়ে রাখছিনে। (৯) বাবার সঙ্গে গিয়ে আমরাও দেখতে পেলাম রুপো কাকাকে। (১০) সেদিন সন্ধ্যাবেলা রুপো কাকা আমাদের গোলাপালার দায়িত্ব চিরদিনের মতো ঝেড়ে ফেলে দিয়ে গেল। **উত্তর ঃ**—(১) সকালে উঠেই আমার চণ্ডীমণ্ডপে হীরু মাষ্টারের কাছে পড়তে যাওয়া হত (পৃঃ ১৬৪)। (২) বিছানা থেকে উঠে আমাদের সব ভাই-বোনের, বাবা আমাদের জন্য কী কী আনলেন, তাই দেখতে (দেখার জন্যে) যাওয়া হল। (৩) বলি, কী ভাবে করে খাওয়া হবে ? (৪) বামুনের ছেলের কি লাঙল চষতে যাওয়া হবে ? (৫) কেন (তার) আসা হয়েছিল দেশ থেকে তা জানা যায় নি। (৬) জ্ঞান হয়ে একথা সবার মুখে শুনা হয়েছে। (৭) চণ্ডীমণ্ডপে ব'সে বাবার তখন হিসাবের খাতাপত্র দেখা হচ্ছিল। (৮) এবার (তার) আসা হোক, কিছুতেই আর বোঝা ঘাড়ে রাখা হচ্ছে না। (৯) বাবার সঙ্গে গিয়ে আমাদেরও দেখা হ'ল রুপোকাকাকে। (১০) সেদিন সন্ধ্যেবেলা রুপোকাকার আমাদের গোলাপালার দায়িত্ব চিরদিনের মতো ঝেড়ে ফেলে দিয়ে চলে যাওয়া হ'ল (পৃঃ ১৭১)।

৬। **উক্তি পরিবর্তন কর ঃ**—(১) "দাদা ভয়ে ভয়ে····· যা তাড়াতাড়ি পড়তে যা।" (পৃঃ ১৬৪)। (২) বাবা বলতেন কে কী নিয়েছে রুপো······ বাড়ি সাত কাঠা। (পৃঃ ১৬৬-৬৭) (৩) বাবা ওকে দেখেই কড়া সুরে·····হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললে। (পৃঃ ১৬৭-৬৮) (৪) ঠাকুরমা রুপোর কান্না······ নে তোর চাবিছড়া (পৃঃ ১৬৮-৬৯)····· রেখে দে। (৫) শেষে বাবা বললেন, বেশ তাহলে······বলেই বাবা কেঁদে ফেলল। (৬) একদিন হীরু মাষ্টার······ রাখছিনে মুই। (পৃঃ ১৭০-৭১)। **উত্তর ঃ**—(১) (গল্পের বক্তার) দাদা ভয়ে ভয়ে রুপোকাকাকে নিজেদের অন্যায় কাজের কৈফিয়ত দিতে গিয়ে বললে, পূর্বরাত্রিতে খাটের বহু ছারপোকার কামড়ে তাদের ঘুম হয় নি। তখন রুপোকাকা তাদের তাড়াতাড়ি পড়তে যেতে বললে (পৃঃ ১৬৪)। (২) বক্তার বাবা বাড়ি এসে মহাজনী খাতা খুলে রুপোর কাছে জানতে চাইতেন শস্য যারা ধার নিয়েছে তাদের নাম আর তার পরিমাণ কত। রুপো একটি একটি ক'রে খাতকের নাম ও ধার-করা শস্যের পরিমাণ বলে তা লেখা হ'লে, পরবর্তী নাম বলে সঙ্গে সঙ্গে পরিমাণ বলে যেত। এরকম ক'রে সে বীরু মণ্ডলের নামে দু বিশ ধান, বাড়তি

পাঁচ সলি ; সনাতন ঘোষের নামে ছ' কাঠা কলাই, দু কাঠা বীজের মুগ, বাড়তি ছ' কাঠা ; নিজের নামে এক বিশ ধান, দু কাঠা কলাই ; কাটু কলুর নামে চার কাঠা কলাই, বাড়তি চার কাঠা ; ময়জদ্দি শেখের নামে এগারো কাঠা ধান, বাড়তি সাত কাঠা (মালিককে দিয়ে খাতায়) লেখাত।

(৩) বক্তার বাবা ওকে (রুপোকে) দেখেই কড়া সুরে ওর নাম উচ্চারণ করে ওকে ডাকলেন। রুপো জানতে চাইলে তিনি কী বলতে চাচ্ছেন। তিনি রুপোর বাড়ি পায়ে হেঁটে যাবেন এরকম স্পর্ধাপূর্ণ ভাষায় তাঁকে হুকুম দেবার উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন এবং বিস্ময় বোধ করলেন। তারপর তিনি ওকে সতর্ক করে দিলেন যে, ও তাঁর মত লোকের সামনে দাঁড়িয়ে থেকেও সেকথা ভুলে গেছে। তার মুণ্ডুটা কেটে ফেললেও খোঁজ হয় না। তিনি বিদ্রূপপূর্ণ সুরে ওকে জিজ্ঞেস করলেন, কবে সে ঐ রকম বড়লোক হয়েছে।

রুপোকাকাও সমানে গলা চড়িয়ে মনিবকে বিদ্রূপের সুরে উত্তর দিলে সীতানাথ তখন বড় হয়ে সীতেবাবু হয়েছেন বলেই তো ওর মুণ্ডু কাটতে যাচ্ছেন ? তারপর স্নেহের সুরে ও যে তাঁকে কোলে করে মানুষ করেছে তা মনে করিয়ে দিলে আর বললে, ওর 'সীতেনাথ' বড্ড গুণবন্ত হয়েছে। 'তুমি' ছেড়ে' তুই বলে সাড়ে তিন টাকা মাইনের কর্মচারী রুপো তাঁকে সকলের সামনে সম্বোধন করলে। (বক্তার) বাবা ওকে নিরর্থক বকতে নিষেধ করলেন। রুপো মনে অত্যন্ত আঘাত পেয়ে— সীতেনাথ তখন তালেবর হয়েছে, ওর মুণ্ডু তারই তো নেওয়া উচিত বলে দুঃখে আর ক্ষোভে হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেললে। (৪) ঠাকুরমা রুপোর কান্না শুনে বক্তার বাবাকে যথেষ্ট বকলেন। রুপোর ওরকম বলার জন্যেই তো তিনি ওকে ঐ রকম কথা বলেছিলেন।

ঠাকুরমা সীতানাথের কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজের জন্য তাঁকে বকলেন। এর পর 'রুপোকাকার' হাত ধরে যে ভুল হয়েছে তাঁর জন্যে মাপ চাইলেন। কিন্তু "রুপোকাকা"র রাগ কমে না। সে তখন, তাদের কাজে তার কোন দরকার নেই বলে চাবিছড়া ফিরিয়ে দিলে।

(৫) শেষে বাবা গোলাপালা প্রজাপত্র ছেড়ে যেতে চাইলেন, পরদিন সকালের গাড়িতেই। রুপোকাকা ঝাঁঝের সঙ্গে বাবাকে জিজ্ঞেস করলে বাড়ির বাইরে গেলে কাচ্চাবাচ্চা মানুষ করার তো কোন লোক থাকে না। উত্তরে এ কাজ তারই শুনে সে বললে এতো তার কোন দায় নয়। তাঁকে মানুষ করেছে বলেই তো ছেলেপুলের দায় তার নয়। যৌবনে সে যে কাজ করেছে বৃদ্ধ বয়সে তা করা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। বাবা কিছুতেই ওর কথা শুনতে চান না। নবেলডাঙায় তিনি পরদিনই চলে যাওয়া ঠিক করেছেন। তিনি জোর করে বললেন যেমন করেই হোক তিনি নিশ্চয়ই ঘর ছাড়বেন। এই কথা বলে বাবা কেঁদে ফেললেন।

(৬) একদিন (রাত্রিতে) হীরু মাষ্টার বাইরে এসে ওকে (চণ্ডীমণ্ডপের পৈঠায় বসে থাকতে দেখে ওর ওখানে বসে থাকবার কারণ কি তা জিজ্ঞেস করলেন। তখন ও, বিদ্রূপের সুরে উত্তর দিলে, তাঁদের ভাবনা নেই, তাই তাঁরা দিব্যি ঘুমোচ্ছেন। গোলার ধান চুরি গেলে সীতানাথের যাবে। (গ্রামে) চোরের উপদ্রবের খবর তো তাঁরা জানেন না। ওর নিজের উপর কত ঝক্কি। তাঁদের মতো ঘুমলে ওর চলবে না। তখন ও আক্ষেপ প্রকাশ করলে, সীতানাথের এসব ঝামেলা সে আর বেশিদিন পোয়াতে পারবে না। ঐ সময় সীতানাথ এলে ছাবিছড়া তাঁর হাতে দিয়ে ও খোলসা হবে। ও আর বুড়ো বয়সে রাত জাগতে পারে না। হীরুমাষ্টার তখন ওকে ঘুমুতে বলায় ও উত্তর দিলে তাঁদের মতো ও নিশ্চিন্ত হ'তে পারে না, এর তো আর কোন প্রতিকার নেই কারণ ধানগুলোর ভার ওর উপর চাপিয়ে দিয়ে বাবু দিব্যি চাঙা হয়ে বসে আছেন। ঐবার সীতেনাথ এলে পর, ও ঐ গুরুতর বোঝা নিজের উপর আর রাখবে না।

৭। **অশুদ্ধি শোধন কর** ঃ—রুপো কাকা বাড়ির কিশেনগিরি করছে ন'-দশ বছর। আমাদেরকে ও জন্মাতে দেখেছে। কিন্তু সে কথা অতি আশ্চার্য কথা নয়, আশ্চার্য কথা এই যে, ও আমার বাবাকে কোলে করে মানুষ করে বড় করেছে নাকি। অথচ রুপো কাকাকে দেখতে তেমন বুড়ো বলে মনে হয় না।

আমার ঠাকুরদাদা হরিরাম চক্কোত্তি গাড়ু হাতে নিয়ে নদীর ধারের উপর গিযে দাঁড়িয়ে ছিলেন সায়েবের ঘাটের উপর রুই মৎস্য কেনবার জন্য। রুপো কাকা সাজীমাটির উপর নৌকার উপর বসে ছিলেন। ওর অবস্থা দেখে হরিরাম চক্কোত্তি ওকে গ্রামের আশ্রয় দেন।

কাশীরাম দাস (পৃঃ ২)

সন্ধি ঃ—কবীশ (দলে)—কবি + ঈশ।

সমাস ঃ—চন্দ্রচূড়-জটাজাল (১৯৬১ কম্পার্ট)—চন্দ্র চূড়াতে যাঁহার (বহুব্রীহি) চন্দ্রচূড়-চন্দ্রচূড়ের জটা (ষষ্ঠী তৎপুরুষ) তাহার জাল (সমূহ) ষষ্ঠী তৎপুরুষ। **সংস্কৃত-হ্রদ**—সংস্কৃত (= সংস্কৃত ভাষা) রূপ হ্রদ রূপক কর্মধারয়। ভারত-রস—ভারত (= মহাভারত—সংক্ষিপ্ত রূপ ভারত) ভারতরূপ রস (রূপক কর্মধারয়)। নরকুলধন—নরের কুল (সমূহ) ষষ্ঠী তৎপুরুষ; তাহাদের মধ্যে ধন (নির্ধারণে সপ্তমী তৎপুরুষ) অথবা সম্বন্ধে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস (ব্যাসবাক্য—নরকুলের ধন = নরকুল শ্রেষ্ঠ)। ভাষাপথ—ভাষারূপ পথ (রূপক কর্মধারয়)। গৌড়ভূমি—গৌড় নামক ভূমি (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়) অথবা যেই গৌড় সেই ভূমি (দুইটি বিশেষ্য পদে কর্মধারয় সমাস)।

কারক-বিভক্তি :—**তৃষ্ণায়** (আকুল বঙ্গ)—হেত্বর্থে তৃতীয়া (-য়) বিভক্তি। কঠোরে—ক্রিয়া-বিশেষণে তৃতীয়া (-এ) বিভক্তি। **ভারতরসের** (স্রোতঃ)—স্রোত শব্দের সহিত অভেদ সম্বন্ধে ষষ্ঠী।

পদটীকা :—**যেমতি**—**পদ্যে ব্যবহৃত হয়, গদ্যে 'যেমন'। জাহ্নবী** (১৯৬১ কম্পার্ট)—জহ্নু+অণ্ (অপত্যার্থে)+ঈ (স্ত্রীলিঙ্গে)। **দ্বৈপায়ন** (১৯৬০ কম্পার্ট)—দ্বীপায়ন—দ্বীপ+অয়ন (বাসস্থান) যাঁহার+অণ্ অথবা **দ্বীপ** (তন্নামক ঋষিবিশেষ)+আয়ন (অপত্যার্থে)। ব্যাসদেব—কৃষ্ণদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণদ্বৈপায়নও বলা হয—সংসদ অভিধান। (কবিতায়) গঙ্গায়=গঙ্গাকে (কবিতায় দ্বিতীয়া বিভক্তিব চিহ্ন—'য়', তুলঃ—'এ', য়ে বিভক্তি)। তাপস—তপস্+অণ্। **মুকতি—কবিতায় 'মুকতি', গদ্যে 'মুক্তি'**—ইহা হইতে **'স্বরভক্তি' প্রয়োগে 'মুকতি'। [গ্রাম্য উচ্চারণে এইরূপ স্বরভক্তির বিশেষ প্রয়োগ দেখা যায়—যথা,** চন্দ্র>চন্দব, মহেন্দ্র>মহেন্দির, চিত্র>চিত্তির, মিত্র>মিত্তির, শ্রোত্রিয়>(ব্রাহ্মণ) (পূর্ব বাংলায়) 'ছুরিত্তির,। পবিত্রিলা (পদ্যে)=**পবিত্র করিলেন—(গদ্যে)** নামধাতুজ ক্রিয়া। **খননি= খনন করিয়া**—নাম ধাতু—অসমাপিকা ক্রিয়া **(কবিতায়)**। নারিবে—**পদ্যে, (গদ্যে 'পারিবে না'।)** তৃষা—√তৃষ্+অঙ্ (ভাববাচ্যে)=তৃষ্ণা।

গদ্যরূপ :—**আছিলা (১৯৬১ কম্পার্ট)**—ছিল (ছিলেন); যেমতি—যেমন; তেমতি—সেইরূপ: ঢালি—ঢালিয়া; মুকতি—মুক্তি; পবিত্রিলা—পবিত্র করিলেন; মায়ে=মাকে (কবিতায় দ্বিতীয়া বিভক্তির রূপ); **খননি** (১৯৬০) —খনন করিয়া; নারিবে—পারিবে না।

পদান্তর :—চন্দ্র—চান্দ্র; জটা—জটিল; ঋষি—আর্য; তৃষ্ণা—তৃষিত; **আকুল**—আকুলতা; বঙ্গ—বঙ্গীয়; রোদন—রুদিত; গঙ্গা—গাঙ্গ, গাঙ্গেয়; ব্রতী—ব্রত; তপ(ঃ)—তাপস; স্রোতঃ—স্রোতস্বতী, স্রোতস্বান, গৌড়—গৌড়ীয়; জল—জলীয়, জলো; ধার—ধারক, ধারী; পুণ্যবান্—পুণ্য; মহাভারত—মহাভারতীয়; কথা—কথ্য।

লিঙ্গান্তর :—ব্রতী—ব্রতিনী; ঋষি—ঋষি, (স্বয়ং বেদমন্ত্রদ্রষ্ট্রী) ঋষী, ঋষিপত্নী (ঋষির স্ত্রী), ঋষ্যাণী (শূন্যপুরাণ); বিমল—বিমলা।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্দেশ কর :—জাহ্নবী, দ্বৈপায়ন, তাপস, পুণ্যবান, তৃষা।

২। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লিখ :—নরকুলধন, সংস্কৃতহ্রদ, চন্দ্রচূড়-জটাজাল।

৩। ব্যাকরণ সংক্রান্ত টীকা লিখ :—(ক) **তৃষ্ণায় আকুল** বঙ্গ করিত রোদন। (খ) **কঠোরে** গঙ্গায় পূজি···ব্রতী। (গ) জুড়াতে গৌড়ের **তৃষা সে বিমল জলে।** (ঘ) **ভারতরসের** স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি।

৪। 'জটাজাল' পদে 'জাল' শব্দের অর্থ নির্দেশপূর্বক এখানে উহার বৈশিষ্ট্য অন্য প্রকারে প্রকাশ করিতে যে যে শব্দের প্রয়োজন হয় তাহা 'জটা শব্দের সহিত যুক্ত কর। **উত্তর :**—'জাল শব্দ এখানে সমূহার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা বহুবচনের অর্থ প্রকাশক। 'কলাপ' প্রভৃতি শব্দ দ্বারাও এই অর্থ প্রকাশ করা যায়। যথা 'জটাকলাপ' 'জটাজূট', 'জটামণ্ডল', জটারাশি'।

৫। **গদ্যরূপ লিখ :**—(১) চন্দ্রচূড়······রোদন। (২) সেইরূপে······স্ববলে সে বিমল জলে। (৩) নারিবে······গৌড়ভূমি। **উত্তর :**—(১) যেরূপ চন্দ্রচূড় জটাজালে জাহ্নবী ছিলেন সেইরূপ ঋষি দ্বৈপায়ন ভারতরসকে সংস্কৃতহ্রদে ঢালিয়া রাখিলেন, ইহাতে বঙ্গ তৃষ্ণায় আকুল হইয়া রোদন করিত। (২) সেইরূপ ভাষাপথকে স্ববলে খনন করিয়া ভারতরসের শ্রোতকে উহার 'বিমল জল দিয়া গৌড়ের তৃষা জুড়াইবার **(নিবারণ করিবার)** জন্য আনিয়াছ। (৩) গৌড়ভূমি কখনও (এই) ধার শোধ করিতে পারিবে না।

৬। **অশুদ্ধি শোধন কর :**—জটাজালসমূহ। দ্বৈপায়ণ। ভগিরথ। তাপশ। হেকাশী। কবিশদলে তুমি পূন্যবান্।

৭। **বাচ্যান্তরিত কর :**—(১) তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন, (২) সগরবংশের যথা সাধিলা মুকতি, (৩) ভারতরসের স্রোত আনিয়াছ তুমি, (৪) নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি, (৫) চন্দ্রচূড়-জটাজালে আছিলা যেমতি জাহ্নবী। **উত্তর :**—(১) তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গের রোদন করা হইত (ভাববাচ্যে)। (২) সগর বংশের যেরূপ মুক্তি সাধিত হইল (কর্মবাচ্যে)। (৩) তোমাকর্তৃক ভারতরসের স্রোত (:) আনীত হইয়াছে। (৪) গৌড়ভূমিদ্বারা কখনও ধার শোধ করা হইবে না। (৫) যেরূপ চন্দ্রচূড়জটাজালে জাহ্নবীর থাকা হইয়াছিল।

আত্মবিলাপ (পৃঃ ৩-৫)

সন্ধি :—জীবন-উদ্যান—ছন্দের অনুরোধে সন্ধি করা হয় নাই। **কু-আশা**—(কু কুৎসিত আশা—'কদাশা' হওয়া উচিত)—এখানে সন্ধি বা সমাসের নিয়ম পালিত হয় নাই—সন্ধি করিলে উহা শ্রুতিকটু হইত—সমাসে ছন্দ রক্ষা করা যাইত না। **অর্থ-অন্বেষণে**—ছন্দের অনুরোধে সন্ধি করা হয় নাই। যশোলাভ (লাভে)=যশঃ+লাভ।

সমাস :—জীবন-উদ্যান=জীবনরূপ উদ্যান (রূপক কর্মধারয় সমাস)। যৌবন-কুসুম-ভাতি—যৌবনরূপ কুসুম (রূপক কর্মধারয়) তাহার ভাতি (দীপ্তি—

ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। **মাৎসর্য-বিষদশন**—মাৎসর্যরূপ বিষ (রূপক কর্মধারয়) মাৎসর্যবিষযুক্ত দশন (দন্ত) মধ্য-পদলোপী কর্মধারয়। **মুকুতাফল** (=গদ্যে) মুক্তাফল—মুকুতা (মুক্তা হইতে—স্বরভক্তি) ফলের মতো (উপমিত কর্মধারয়)। **অনুক্ষণ**—ক্ষণে ক্ষণে (বীপ্সার্থে অব্যয়ীভাব)।

পদটীকা :—প্রমত্ত—প্র + √মদ্ + ক্ত (কর্তৃবাচ্যে)। **প্রেমের নিগড়**—অভেদ সম্বন্ধে ষষ্ঠী (প্রেমের শিকল)। **সাধ** সাধিতে—সমধাতুজ কর্ম (লভিলি) **লাভ**—সমধাতুজ কর্ম। **অর্থ-অন্বেষণে**—অধিকরণে সপ্তমী।

গদ্যরূপ :—লভিনু—লাভ করিলাম, ধাইলি—ধাবিত হইলি, **নারিলি** (উঃ মঃ ১৯৬০)—পারিস নাই, ব্যয়িলি—ব্যয় করিলি, মম—আমার, স্বপন—স্বপ্ন, পরান—প্রাণ।

সমধাতুজ কর্ম :—(১) সে **সাধ** সাধিতে। (২) লভিলি **লাভ**।

নামধাতু :—লভিলি (লাভ শব্দ হইতে), ব্যয়িলি (ব্যয় শব্দ হইতে)।

স্বরভক্তি :—স্বপ্ন—স্বপন, প্রাণ—পরান।

অনুশীলনী

১। **'আত্মবিলাপ'** কবিতা হইতে (ক) **'সমধাতুজ কর্ম'** (খ) **'নামধাতু'** এবং (গ) **স্বর-ভক্তির** উদাহরণ দাও।

২। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লিখ :—অনুক্ষণ, মুকুতাফল, মাৎসর্যবিষদশন।

৩। নিম্নলিখিত শব্দযুগলের অর্থের পার্থক্য প্রদর্শন কর :—**প্রমত্ত ; উন্মত্ত ; দংশন ; কুয়াশা ; কু-আশা ; আশা, আসা ; দিন, দীন ; কি, কী।**

৪। **'প্রেমের** নিগড়,' 'কি লভিলি লাভ', **'পরান'**,—ইহাদের উপর ব্যাকরণ সংক্রান্ত টীকা লিখ।

৫। **'কামড়ে'** (১৯৬০), (২) 'ছুটিল না', (৩) 'নেশা', (৪) পোহাইবে', (৫) **'ধাঁধিতে'** (১৯৬০), (৬) 'ফাঁদ', (৭) উড়িয়া পড়িলি, (৮) 'ভুলিবি', (৯) 'ফেলিস', (১০) 'ফিরি দিবে', (পদ্যে) (১১) 'ধাইলি' (পদ্যে)। **উত্তর** :—(১) দংশন করে, (২) দূরীভূত হইল না, (৩) বিহ্বলতা, মোহ, (৪) প্রভাত হইবে, (৫) দৃষ্টিভ্রম জন্মাইতে, (৬) চক্রান্ত, কৌশল, (৭) উড্ডীন হইয়া পতিত হইলি, (৮) বিস্মৃত হইবি, (৯) বিসর্জন করিস, (১০) প্রত্যর্পণ করিবে, ফিরাইয়া দিবে, (১১) ধাবিত হইলি।

৬। **বাচ্য পরিবর্তন কর** :—(১) আশার ছলনে……মনে। (২) জাগিবি রে কবে ? (৩) জাগে সে কাঁদিতে। (৪) প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাধে। (৫) দংশিল কেবল ফণী। (৬) যশোলাভে……কাহারে ? (৭) কামড়ে সে অনুক্ষণ। (৮) মুকুতা ফলের লোভে……ধীবর। (৯) শতমুক্তা……পামর।

(১০) কে তোরে·····ছলে? **উত্তর**ঃ—(১) আশাব ছলনায় ভুলিয়া আমার কি লাভ করা হয় তাহা আমার মনে ভাবা হয়। (২) কবে তোর জাগা হইবে। (৩) কাঁদিতে তার জাগা হয়। (৪) প্রেমের নিগড গড়িয়া সাধের সহিত চরণে পরা হইল। (৫) কেবল ফণীদ্বারা দষ্ট হইলি। (৬) হায় যশোলাভলোভে কত আয়ু ব্যয়িত হইল তাহা কাকে বলা হইবে? (৭) তাহাদ্বারা অনুক্ষণ কামড় দেওয়া হয়। (৮) ধীবরের মুক্তাফলের লোভে অতল জলে যত্নে ডুবা হয়। (৯) হে পামর! শত মুক্তাধিক আয়ু কালসিন্ধুজলে তোব ফেলা হয়! (১০) হে অবোধ মন! তোকে কাহাদ্বারা হারাধন ফিবাইয়া দেওয়া হইবে, হায় রে! আশার কুহক ছলদ্বারা তোব কত আশা ভোলা হইল?

আশা (পৃঃ ৭-৯)

সন্ধিঃ—মানবমনোমন্দিরে = মানবমনঃ + মন্দিরে। দুরাশা—দুঃ + আশা। দুর্বল—দুঃ + বল। নিশ্চয়—নিঃ + চয়। ভবিষ্যৎ-অন্ধ—সন্ধি করিলে '**ভবিষ্যদন্ধ**' হয়। [কবিব মতে ভিন্নকালতা রক্ষার জন্য সন্ধি অনাবশ্যক]। বর্তুল-আকার—সন্ধিতে '**বর্তুলাকার**'—হয়। ছন্দের অক্ষর সংখ্যা ঠিক রাখাব জন্য সন্ধি করা হয় নাই। এইরূপ '**দুর্গন্ধ-আধার**', '**জঠর-অনল**', '**বঙ্গ-ইতিহাস**' পদে সন্ধি হয় নাই। যশোলাভ—যশঃ + লাভ।

সমাসঃ—মানবমনোমন্দিরে—মানবের মন (ষষ্ঠীতৎ) মানবমনোরূপ মন্দিবে—রূপক (কর্মধারয়)। সংসারচক্র—সংসাররূপ চক্র (রূপক কর্মধারয়)। জীবনযুদ্ধ—জীবনরূপ যুদ্ধ (রূপক কর্মধারয়)। মূঢমতি—মূঢ় মতি (বুদ্ধি) যাহার (বহুব্রীহি), অথবা মূঢেব মতির মতো মতি (বুদ্ধি) যাহার (**উপমান পূর্বপদ বহুব্রীহি**)। কল্পনালোকে—কল্পনা আলোকেব মতো (উপমিত কর্মধারয়) তাহাতে। **অবিদ্ধ**—নয় বিদ্ধ (খচিত) নঞ্ তৎপুরুষ সমাস (অবিদ্ধ রতনে = যাহা রত্নখচিত নহে)। **মাতৃভাষা-কম-কলেবরে**—কম (কমনীয়, নরম, সুন্দর) যে কলেবর [রবীন্দ্রনাথ এই অর্থে 'কম্র' শব্দেব প্রয়োগ করিয়াছেন '**কম্রবক্ষপাতে**'] কর্মধারয় সমাস, মাতৃভাষার কম কলেবর (ষষ্ঠী-তৎপুরুষ) তাহাতে—'মাতৃভাষা' মাতার ভাষা। (ষষ্ঠী তৎপুরুষ) অথবা মাতৃরূপিণী ভাষা (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়) 'মাতৃসমা ভাষা' (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। **বরবপু**—বর (শ্রেষ্ঠ, বরণীয়, সম্মানিত) বপু (কর্মধারয় সমাস)—[সম্মানিত ব্যক্তি বা বস্তুর বর্ণনায় শব্দের পূর্বে, '**বর**', '**শ্রী**' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হয়—যথা, মাতৃভাষার '**বপু**'-'**বরবপু**', সম্মানিত লোকের অঙ্গ '**শ্রী-অঙ্গ**', '**বরমাল্য**', শ্রেষ্ঠ নারী = '**বরনারী**' **শ্রীখোল, শ্রীধাম, শ্রীচরণ** ইত্যাদি]।

পদটীকা ঃ—কুহকিনি—কুহক + ইন্ + ঈ (স্ত্রীলিঙ্গে) 'কুহকিনী'-শব্দের সম্বোধন পদ। মুগ্ধ—মুহ্ + ক্ত কর্তৃবাচ্যে (মুহ্ + ধাতুর উত্তর ক্ত-প্রত্যয় 'মূঢ়' ও মুগ্ধ দুইটি পদ হয়)। অচিন্ত্য—নঞ্ √চিন্ত্ + য চিন্তার অতীত। উন্মত্ততা—উৎ + মদ্ + ক্ত + তা (ভাবার্থে) উন্মত্তের ভাব। বর্তুল—বৃত্ + উল (কর্তৃবাচ্যে)। অর্বাচীন—অর্বাচ্ + ঈন। কাঙাল—দেশী-শব্দ | অব্যুৎপন্ন (প্রকৃতিপ্রত্যয় বিভাগ চলে না) দরিদ্র, নিঃস্ব। রুগ্ন = রুজ + ক্ত (কর্তৃবাচ্যে) [তুলনীয় লগ্ন. মগ্ন, ভগ্ন, উদ্বিগ্ন]। তিমিরা—তিমির (অন্ধকার) + (অস্ত্যর্থে) অ (তিমির যাহাতে আছে) + আ স্ত্রীলিঙ্গে, রজনী শব্দের বিশেষণ। সজ্জিত—সজ্জা + ইত (প্রত্যয়) বিশেষণ পদ। [সজ্জা—বেশভূষা হইয়াছে ইহার সজ্জিত—জাতার্থে ইত (চ্)-প্রত্যয়]।

গদ্যরূপ ঃ—লভিয়াছে—লাভ করিয়াছে, রঞ্জিত—রঞ্জিত করিতেছ, স্বজিত—সৃষ্টি করিত, আলোকে—আলোকিত করে।

পদান্তর ঃ—মুগ্ধ—মোহ ; উন্মত্ততা—উন্মত্ত ; ইন্দ্রজাল—ঐন্দ্রজালিক ; অর্বাচীন—অর্বাচীনতা ; কাঙাল—কাঙালপনা ; রুগ্ন—রোগ ; প্রকাশিত—প্রকাশ ; নক্ষত্র নাক্ষত্রিক ; সজ্জিত—সজ্জা ; মায়া—মায়িক, মায়াবী।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ দ্বারা বাক্য রচনা কর :—দুর্বল, দুঃখ, ভয়, অসার, অর্বাচীন, কাঙাল, রুগ্ন, সুদূর, দয়াবতী, ক্ষুদ্র। **উত্তর** ঃ—দুর্বল—সবল। দুঃখ—সুখ। ভয—অভয়, ভরসা। অসার—সারবান্। অর্বাচীন—প্রবীণ। কাঙাল—ধনী ; রুগ্ন—নীরোগ, সুস্থ। সুদূর—অদূর। দয়াবতী—দয়াহীনা, নির্দয়া। ক্ষুদ্র—বৃহৎ [বাক্যরচনা নিজে কর]।

২। (ক) 'সুকর' ও 'কর্ম' শব্দের বিভিন্ন অর্থ প্রদর্শন করিয়া বাক্য রচনা কর। (খ) আধার. আঁধার ; অসার, অসাড় ; নীর, নীড় ; দার, দ্বার ; সুকর, শূকর —ইহাদের পার্থক্য প্রদর্শন কর। **উত্তর** ঃ—(ক) সুকর—(১) সু-(সুন্দর) কর (হস্ত) : কবি তাঁহার সুকরে রাজসম্মান গ্রহণ করিলেন। (২) সুকর—যাহা সহজে করা যায়, সহজসাধ্য : যে কাজ তোমার পক্ষে সুকর তাহা হয়তো আমার দুষ্কর। (ক) কম—কমনীয়, সুন্দর ; কম—অল্প।

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির প্রকৃতিপ্রত্যয় প্রদর্শন কর :—মুগ্ধ, অচিন্ত্য, অধিষ্ঠাত্রী, মূঢ়, রুগ্ন, সজ্জিত।

৪। লিঙ্গান্তরে পরিবর্তিত কর :—কাঙাল, অধিষ্ঠাত্রী, ব্যাঘ্র, বাজিকর, কুহকিনী, দয়াবতী, বর্তুল, অর্বাচীন।

উত্তর ঃ—কাঙালিনী, অধিষ্ঠাতা, ব্যাঘ্রী, বাজিকরী, কুহকী, দয়াবান্, বর্তুলা, অর্বাচীনা।

৫। নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে সাধুভাষায় ব্যবহৃত শব্দকে চলিত ভাষায় প্রকাশিত কর এবং চলিত ভাষার শব্দের সাধুভাষায় প্রতিশব্দ দাও :—উত্তর :— **মুগ্ধ**—বোকা, বেয়াকুব ; **উন্মত্ততা**—পাগলামি ; **সংসার চক্র**—দুনিয়ার চাকা ; **ঘোরে**—আবর্তিত হয় ; **বর্তুল**—গোল ; **যুদ্ধ**—লড়াই ; **অর্বাচীন**—আনাড়ী ; **কাঙাল**—নিঃস্ব ; **ক্ষুদ্র**—ছোট ; **রজনী**—রাত ; **সজ্জিত**—সাজা (বিশেষণ) সাজান ("সাজান বাগান')।

৬। **বাচ্য পরিবর্তন কর** :—(১) চিন্তার অচিন্ত্য অস্ত্র নাশিত অচিরে সে মনোমন্দির শোভা। (২) উন্মত্ততা ব্যঘ্ররূপে করিত নিবাস। (৩) দুরাশার মন্ত্রে আমি মুগ্ধ মূঢ়মতি। (৪) কত ক্ষুদ্র নব ধরি পদছায়া তব লভিয়াছে অমরতা এ মর ধরায়। (৫) কী চিত্রে রঞ্জিত আজি শ্বেতসেনাপতি। **উত্তর** :—(১) চিন্তার অচিন্ত্য অস্ত্রদ্বারা অচিরে সে মনোমন্দিরশোভা নাশিত হইত। (২) ব্যাঘ্ররূপে উন্মত্ততার নিবাস করা হইত। (৩) দুরাশার মন্ত্র দ্বারা মূঢ়মতি আমি মোহিত হইয়াছি। (৪) এই মর ধরায় কত ক্ষুদ্র নরকর্তৃক তোমার পদচ্ছায়া ধরিয়া অমরতা লব্ধ হইয়াছে। (৫) তোমাকর্তৃক শ্বেতসেনাপতি কি চিত্রে রঞ্জিত হইতেছেন ?

৭। **গদ্যরূপ লিখ** :—(১) না আলোকে······উজলে ধরণী। (২) নাচায় পুতুল······নরে। (৩) ভিক্ষা করি...···নির্বাপিত। **উত্তর** :—(১) যদি শশী তিমিরা রজনীকে আলোকিত না করে তবে নক্ষত্রের উহাকে উজ্জ্বল করিবার সাধ্য নাই। (২) দক্ষ বাজিকর যেরূপ পুতুলকে নাচায় সেইরূপ তুমি অর্বাচীন নরকে নাচাও। (৩) এ তিন প্রহর (ধরিয়া) দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া সে যাহা পাইয়াছে তদ্দ্বারা (তাহার) জঠরানল নির্বাপিত হইবে না।

৮। **অশুদ্ধি শোধন কর** :—দুর্বলমানবমনমন্দির। নিবাসপ্রণয়। চিন্তার অচিন্ত। অচীরে। ব্যঘ্র। বাজীকর। অর্বাচিন। জির্ণ পবিদেহ বস্ত্র। রুগ্ন। মুড়মোতি। পুন্য। সজ্জিত। শেতসেনাপতি। **উত্তর** :—নিজে চেষ্টা কর।

ভারততীর্থ (পৃঃ ১০-১২)

সন্ধি :—পরমানন্দে—পরম + আনন্দে ; হোমানলে—হোম + অনলে ; দুর্বার—দুঃ + বার।

সমাস :—নরদেবতা—নররূপী দেবতা (রূপক কর্মধারয়)। ধ্যানগম্ভীর—ধ্যানে গম্ভীর (সপ্তমী তৎপুরুষ)। **নদীজপমালাধৃত** (উঃ মঃ ১৯৬০)—**নদীরূপ জপমালা (রূপককর্মধারয়) নদীজপমালা ধৃত হইয়াছে যৎ কর্তৃক (বহুব্রীহি সমাস) [ধৃত শব্দের পরনিপাত, তুলঃ 'সিদ্ধ আলু' আলুসিদ্ধ', 'সিদ্ধকলা', 'কলাসিদ্ধ'] প্রান্তর শব্দের বিশেষণ।** রুদ্রবীণা—রুদ্রা বীণা (কর্মধারয়)। **হৃদয়তন্ত্র—হৃদয়রূপ তন্ত্র (রূপক কর্মধারয়, তন্ত্র = তার)। আনতশিরে = আনত**

ঈষৎ নত) আনত হইয়াছে শির যে ক্রিয়াতে (বহুব্রীহি)—ক্রিয়াবিশেষণে '-এ'—তৃতীয়া) বিভক্তি। গিরিপর্বত—গিরি এবং পর্বত (ইত্যাদি অর্থে সমার্থক পদের সহিত দ্বন্দ্ব সমাস)।

পদটীকা ঃ—হেথায় (কবিতায় ও গ্রাম্যভাষায় 'দত্তা'—শরৎচন্দ্র = এখানে) দুর্বার—দুর্ + বৃ (ণিচ্) + খল্ (কর্মবাচ্যে = কষ্টে যাহাকে বারণ করা যায়)। লীন—লী + ক্ত (কর্তৃবাচ্যে)। রনরনি—ধ্বন্যাত্মক **শব্দদ্বৈত—অসমাপিকা ক্রিয়া।** মিলিবারে = 'মিলিতে'—অর্থে কবিতায় ব্যবহার (হবে মিলিবারে = মিলিতে হবে)। দুখের = অভেদসম্বন্ধে ষষ্ঠী, 'রক্তশিখা'-পদের সহিত সম্বন্ধ। অভিষেক—অভি + সিচ্ + ঘঞ্ (অ) প্রত্যয় ভাবে। **সবার-পরশে-পবিত্র-করা**—(বহুপদবিশেষণ) বাক্যাত্মক **বিশেষণ** (তুঃ 'যার-পর-নাই পাজি', 'যাচ্ছে তাই')।

গদ্যরূপ ঃ—মিলিবারে—মিলিতে, হেথায়—এখানে, ভেদি—ভেদ করিয়া, হের—দেখ, মোর—আমার, ঘিরে—ঘিরিয়া, হিয়া—হৃদয়, আজি—আজ, সবারে—সকলকে, **রনরনি** (১৯৬০)—রনরন করিয়া, রণরণিত হইয়া।

ব্যুৎপত্তি ঃ—পুণ্য— √পূ + যৎ। ভূধর-- √ধৃ + অচ্ = ধর। ভূর (পৃথিবীর) ধর, (ষষ্ঠীতৎ)। পবিত্র—পূ + ইত্র। আহ্বান—আ √হ্বে + অনট্ (ভাবে)। দুর্বার—দুর্— √বৃ + ণিচ্ + খল্ (কর্মবাচ্যে)। লীন— √লী + ক্ত (কর্তৃবাচ্যে)। উপহার—উপ— √হৃ = ঘঞ্ (ভাবে)। উন্মাদ—উৎ + মদ্ + ণিচ্ + ঘঞ্। অভিষেক—অভি— √সিচ্ + ঘঞ্ (ভাবে)। অপনীত—অপ— √নী + ক্ত (কর্মবাচ্যে)। বিভেদ— √বি—ভিদ্ + ঘঞ্।

লিঙ্গান্তর ঃ - আর্য—আর্যা ; পাঠান—পাঠানী ; ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণী ; পতিত - পতিতা ; লীন—লীনা ; দুর্বার—দুর্বারা ; জননী—'জনন' শব্দ হইতে আসিয়াছে—বাংলায়—জনক ; কিন্তু জনক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'জনিকা' হয়।

বিপরীতার্থক শব্দ ঃ—পুণ্য—পাপ ; উদার—কৃপণ, কুণ্ঠিত, অনুদার ; আর্য—অনার্য ; পশ্চিম—পূর্ব ; দিবে—নিবে ; দূর—নিকট , ঘৃণা—আদর ; বন্ধ—মোচন ; এক—বহু ; বিভেদ—ঐক্য ; খোলা—বন্ধ ; অপমান—সম্মান।

পদান্তর ঃ—উদার—উদারতা ; আহ্বান—আহূত ; দ্বার—দ্বারী, দৌবারিক ; উপহার—উপহৃত ; বিচিত্র—বৈচিত্র্য, বিচিত্রতা ; শিখা—শিখী ; লাজ—লাজুক ; ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ্য ; শুচি—শৌচ, শুচিতা, শুচিত্ব ; পতিত—পাতিত্য ; অভিষেক—অভিষিক্ত।

বাক্য পরিবর্তন (অর্থের পরিবর্তন না করিয়া) ঃ—(১) নেতিসূচক গদ্য বাক্যে পরিণত কর :—সেই সাধনার······খোলা আজি দ্বার। (ক) আজ সেই সাধনার সেই আরাধনার দ্বার খোলা নয় এমন তো নয়! (খ) আজ সেই······

দ্বার বন্ধ থাকিতে পারে না বা বন্ধ নহে। (২) **বাচ্যান্তরে পরিবর্তন ঃ**—পশ্চিম আজি......সাগরতীরে। **উত্তর ঃ**—পশ্চিম কর্তৃক আজ দ্বার খোলা হইয়াছে—সেই স্থান হইতে সকল লোক কর্তৃক উপহার আনীত হইতেছে। (উহার পরিবর্তে) দিতে হইবে নিতে হইবে—মিলিতে হইবে—মিলাইতে হইবে কাহারও ফিরিয়া যাওয়া হইবে না।

অনুশীলনী

১। ব্যাকরণ সংক্রান্ত টীকা লিখ :—(ক) দুখের রক্তশিখা, (খ) যত লাজভয় **করো করো** জয়, (গ) এসো এসো **ত্বরা**, (ঘ) **সবার-পরশে-পবিত্র-করা** (তীর্থনীরে)।

২। পদান্তরে পরিবর্তিত কর :—আহ্বান, লীন, উন্মাদ, আহুতি, বিভেদ, রক্ত, অপমান, বিপুল, মন, অভিষেক। **উত্তর ঃ**—আহূত, লয়, উন্মত্ত, আহুত, বিভিন্ন, রক্তিম, অপমানিত, বিহ্বলতা, মানসিক, অভিষিক্ত।

৩। চলিত ভাষায় প্রকাশ কর :—প্রান্তর, দ্বার, আনতশিরে, নীড়, ত্বরা, আহ্বান, ধ্বনি।

৪। ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন কর :—দুর্বার, লীন, আহুতি, অভিষেক।

৫। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লিখ :—নরদেবতা, মঙ্গলঘট, হৃদয়তন্ত্র, নদী-জপমালা-ধৃত (প্রান্তর) (উঃ মাধ্যঃ ১৯৬০)।

৬। নিম্নলিখিত শব্দযুগলের বা শব্দ-ত্রিতয়ের বা শব্দ-চতুষ্টয়ের অর্থের পার্থক্য প্রদর্শনপূর্বক বাক্য রচনা কর :—**স্বর, সুর ; শূর, শুঁড় ; আহুতি, আহূতি ; ধ্বনি, ধনী, ধনি ; নীর, নীড় ; জ্বলে, জলে ; শুচি, সূচি ; ত্বরা, তরা, ঘট, ঘোট।**

৭। **গদ্যরূপ দাও ঃ**—(১) হেথায় নিত্য হেরো······ধরিত্রীরে। (২) পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার·········উপহার। (৩) তারা মোর মাঝে·········তার বিচিত্র সুর। (৪) তপস্যাবলে······একটি বিরাট হিয়া। (৫) হেথা········· উঠেছিল রণরণি। (৬) হেথায় সবারে হবে·········সাগরতীরে। **উত্তর ঃ**—(১) এখানে ধরিত্রীকে নিত্য পবিত্র দেখ। (২) আজ পশ্চিম দ্বার খুলিয়াছে, সেখান হইতে সকলে উপহার আনে। (৩) তাহারা সকলেই আমার মধ্যে বিরাজ করিতেছে, কেহ দূর নহে—কেহ দূর নহে। আমার শোণিতে আর ধ্বনিতে তাহার বিচিত্র সুর রহিয়াছে। (মহাওঙ্কারধ্বনি) তপস্যাবলে একের অনলে বহুকে আহুতি দিয়া বিভেদ ভুলিল এবং একটি বিরাট হৃদয়কে জাগাইয়া তুলিল। (৫) একদিন এখানে হৃদয়তন্ত্রে মহাওঙ্কারধ্বনি একের মন্ত্রে (রণরণিত) শব্দিত হইয়া উঠিয়াছিল (অথবা ঝংকৃত হইয়াছিল)।

৮। **অশুদ্ধি সংশোধন কর**ঃ—

(ক) ধ্যানগম্ভির এই যে ভূদর,
নদি যপমালাধৃত প্রান্তর,
হোথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্তিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

(খ) হে রুদ্রবিনা, বাজো বাজো বাজো
ঘ্রিনা করি দূরে আছে যারা আজো,
বন্ধন নাশিবে, তারাও আসিবে, দাড়াবে ঘিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতিরে।

৯। **উপযুক্ত পদদ্বারা শূন্যস্থান পূর্ণ কর**ঃ—

কেহ — জানে — আহ্বানে — মানুষের—
দুর্বার — এলো —হতে, সমুদ্রে হারা।
— আর্য — অনার্য, — দ্রাবিড় —
শক — দল — মোগল —দেহে — লীন।
পশ্চিম — খুলিয়াছে —,
— হতে — আনে —
দিবে — নিবে, মিলাবে, —, যাবে না —
এই — মহামানবের —।

১০। **বাচ্য পরিবর্তন কর**ঃ—(১) পশ্চিম·········দ্বার (২) সেথা হতে সবে আনে উপহার (৩) হে রুদ্রবীণা ····সাগর তীরে। (৪) জন্ম লভিল কী বিশাল প্রাণ। (৫) মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা। **উত্তর**ঃ—(১) **পশ্চিম দ্বারা দ্বার** খোলা হইয়াছে। (২) সেখান হইতে সকলের উপহার আনীত হয়। (৩) এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে, হে রুদ্রবীণা, তোমার বাজা হউক। ঘৃণা করিয়া আজও যাহাদের দূরে রাখা হইয়াছে, বন্ধ নাশ করা হইবে, তাহাদেরও আসা হইবে, ঘিরিয়া দাঁড়ান হইবে। (৪) কী বিশাল প্রাণের জন্মলাভ হইল। (৫) মার অভিষেকে ত্বরায় আসা হউক, আসা হউক।

ধূলামন্দির (পৃঃ ১৯)

সন্ধিঃ—দেবালায়—দেব + আলয় [আর কোন সন্ধিবদ্ধ পদ নাই]।

সমাসঃ—দুইয়ের অধিক পদে কোন সমাস এখানে নাই—সমাসের সংখ্যা মাত্র ছয়টি। **রুদ্ধদ্বারে**—রুদ্ধ হইয়াছে দ্বার যে ক্রিয়াতে (বহুব্রীহি সমাস)—ক্রিয়াবিশেষণে তৃতীয়া—'এ' বিভক্তি—'আছিস' ক্রিয়ার বিশেষণ। **দেবালয়**—দেবের আলয় (আধার আধেয় সম্বন্ধে ষষ্ঠী) ষষ্ঠীতৎপুরুষ। **আপন-মনে**—

আপন (সর্বনাম—বিশেষণ) **মন** (কর্মধারয় সমাস)। **সৃষ্টিবাঁধন**—সৃষ্টির বাঁধন (বন্ধন) ষষ্ঠীতৎপুরুষ—**তদ্ভব-তৎসমপদে সমাস**। **ধূলাবালি**—ধূলা এবং বালি —**সমজাতীয় পদে দ্বন্দ্ব সমাস**। **কর্মযোগে**—কর্মের যোগে (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)।

পদটীকাঃ—**সংগোপনে**—ক্রিয়াবিশেষণে—'এ' (তৃতীয়া) বিভক্তি। মুক্তি — √মুচ্ + ক্তি (ভাবে)। **ফুলের** (ডালি)—অভেদসম্বন্ধে ষষ্ঠী, ডালি—উপহার। **জলে = বর্ষায়** ['জল' শব্দের বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ—অনুশীলনীতে দেখ]।

গদ্যরূপঃ—পূজিস—পূজা করিস, চেবে—চাহিয়া, ঝরে—ঝরিযা।

অনুশীলনী

১। পদান্তরে পরিবর্তিত কর :—ভজন, পূজন, রুদ্ধ, মাটি, চাষ, পাথর, মাস সাথ, শুচি, মুক্তি, সৃষ্টি, ফুল। ভজন—ভক্ত। পূজন—পূজক। রুদ্ধ—বোধ। মাটি—মেটে। চাষ—চাষী। পাথর—পাথুরে। সাথ—সাথী। শুচি—শুচিতা। মুক্তি—মুক্ত। সৃষ্টি—সৃষ্ট। ফুল—ফুলেল।

২। ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন কর:—ভজন, রুদ্ধ, সংগোপন, দেবতা, বসন, মুক্তি, সৃষ্টি, বস্ত্র, কর্ম। ভজন √ভজ + অনট্ (ভাবে)। রুদ্ধ— √রুধ্ + ক্ত (কর্মবাচ্যে)। সংগোপন—সম্ √গুপ্ + অনট্ (ভাবে)। দেবতা—দেব + তা (স্বার্থে)। বসন—√বস্ + অনট্ (করণবাচ্যে)। মুক্তি— √মুচ্ + ক্তি (ভাববাচ্যে); সৃজ্ + ক্তি = সৃষ্টি ; বস্ত্র— √বস্ + ষ্ট্রন্ (করণবাচ্যে); কর্ম— √কৃ + মন্ (ভাবে), আরাধনা —আ √রাধ্ (ণিচ্) + যুচ্ (অন + আ)—ভাবে।

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ করিয়া (Idiomatic use) বাক্য রচনা কর :—(ক) **হাত**, (খ) **ধূলা**, (গ) **মাটি**, (ঘ) **জল**, (ঙ) **ডালি**। **উত্তর**—(ক) হাত—প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠপর্ব পৃঃ ১৩৩ দ্রষ্টব্য। (খ) (১) গুরুতর অন্যায়ের জন্য তাহার গায়ে ধূলা দিতে কেহই ইতস্ততঃ করিল না (=ধিক্কার দেওয়া)। (২) সেয়ানা লোকের চক্ষে ধূলা দেওয়া অত সহজ নয় (=ফাঁকি দেওয়া)। (৩) সাপের মাথায় ঠিক ঠিক ধূলা-পড়া (মন্ত্রপূত ধূলি) দিতে পারলে কাজ হয় বৈকি! (গ) মাটি —প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ পর্ব ১৩৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য। (ঘ) (১) জল ছাড়া মাছ বাঁচে না (=বারি, সলিল)। (২) ঝড় জলে কারো ঘরের বাইরে যাবার ইচ্ছা হয় না (জল=বৃষ্টি)। (৩) নিজের দোষে কারবারের টাকা জল হয়ে গেল (জল হওয়া=নষ্ট হওয়া)। (৪) ভাত খাবার পয়সা নেই—জল খাবার (অল্প খাবার) পয়সা কোথায় পাব ? (ঙ) **ডালি**—ছোট ডালা (হ্রস্বার্থে 'ডালা' শব্দের উত্তর -'ই' প্রত্যয়)। (১) ডালিতে ফুল সাজাইয়া দেবতার মন্দিরে পূজারী উপস্থিত হইল। (২) ডালি—উপহার। বড়দিনের ডালি লইয়া সাহেবের কাছে উপস্থিত হইবার দিন চলিয়া গিয়াছে (উপহার)। (৩) ডালি প্রাচুর্যের আধার। শকুন্তলার রূপের কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়—সে রূপের ডালি।

৪। **বাচ্য পরিবর্তন কর ঃ**—(১) কাহারে তুই পূজিস্ সংগোপনে ? (২) ধুলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে। (৩) তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি আয়রে ধূলার পর। (৪) আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন প'রে বাঁধা সবার কাছে। (৫) কর্মযোগে তার সাথে এক হ'য়ে ঘর্ম পড়ুক ঝরে। (৬) রাখো রে ধ্যান, থাকুবে ফুলের ডালি। **উত্তর ঃ**—(১) কাহাকে তোর সংগোপনে পূজো করা হয়। (২) তিনি দুই হাতে ধুলো লাগিয়েছেন। (৩) তাঁরই মতন শুচিবসন ছেড়ে ধূলার উপর আসা হোক্। (৪) সৃষ্টি-বন্ধনের উপর সকলে তাঁকে বেঁধেছে। (৫) কর্মযোগে তাঁর সঙ্গে এক হ'য়ে ঘর্মের ঝ'রে পড়া হোক্। (৬) তোদের দ্বারা ধ্যান রাখা হোক, ফুলের ডালির থাকা হোক্।

শুচি (পৃঃ ২০-২৩)

সন্ধি ঃ—পাদোদক—পাদ + উদক। নীরব—নিঃ + রব। অরুণ-আলো—তৎসম ও তদ্ভব শব্দে সন্ধি হয় নাই। রাম + আনন্দ = রামানন্দ।

সমাস ঃ—নানাচিহ্নধারী—নানা (নানাপ্রকার) চিহ্ন (কর্মধারয়) ধারণ করে যাহারা (উপপদ সমাস)। প্রাণপ্রবাহিণী—প্রাণরূপ প্রবাহিণী (রূপক কর্মধারয়), ধ্যানমগ্ন ধ্যানে মগ্ন (সপ্তমী তৎপুরুষ)। হাতজোড় জোড় হাত—(কর্মধারয়—সমাসে বিশেষণের পর নিপাত)। শুকতারা—শুক (সংস্কৃত—'শুক্র') নামক তারা (মধ্যপদলোপী কর্মধারয় = **প্রভাতী তারা**)।

পদটীকা ঃ—(সারাদিন) কাটে—কর্মকর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া। ভোজ্য = √ভুজ্ + ণ্যৎ (য) কর্মবাচ্যে **ভোজনের দ্রব্য, খাদ্য [ভোগ্য = ভোগের সামগ্রী]।** **শুষ্ক**— √শুষ্ + ক্ত (কর্তৃবাচ্যে)। **আমাকে** (বেজেছে)—[= আমার আঘাত লাগিয়াছে বা আমাকে আঘাত করিয়াছে] 'বেজেছে' ক্রিয়ার কর্মে দ্বিতীয়া—কর্তা 'অপমান'। হেয়— √হা + য (কর্মবাচ্যে)। (প্রভাতের) **অপেক্ষায়**—নিমিত্তার্থে চতুর্থী বিভক্তি। (তোমার) হাতে (আমি **শুচি বস্ত্র পরব**)—করণে তৃতীয়া 'এ' বিভক্তি। শিষ্য— √শাস্ + ক্যপ্ (য) কর্মবাচ্যে। [শাসনের—উপদেশের যোগ্য] ভাঙে—কর্মকর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া।

বিশিষ্ট বাগ্ধারা ঃ—(তাদের অপমান) **আমাকে বেজেছে, তাঁর উপবাস ভাঙে,** (ঠাকুরের) **প্রসাদ পান, প্রসাদ নামল না।**

লিঙ্গান্তর ঃ—গুরু—গুর্বী, গুরু, গুরুপত্নী। ঠাকুর—ঠাকুরাণী। রাজা—রাজ্ঞী, রানী। পণ্ডিত—পণ্ডিতা, পণ্ডিতানী। ভক্ত—ভক্তা। শুদ্ধ—শুদ্ধা। মানুষ—মানুষী। ধ্যানমগ্ন—ধ্যানমগ্না। একাকী—একাকিনী। চণ্ডাল—চণ্ডালী, চণ্ডালিনী। অপরাধী—অপরাধিনী। নগ্ন—নগ্না। শিষ্য—শিষ্যা। সূর্য—সূর্যা, সূরী। ব্যাপৃত—ব্যাপৃতা।

পদান্তর :—(বিশেষণ) গুরু—গুরুত্ব। নিবেদন—নিবেদিত। উপবাস—উপবাসী। অন্তর—আন্তরিক। সন্ধ্যা—সান্ধ্য। শুষ্ক—শুষ্কতা। সীমা—সীমিত। ধ্যান—ধ্যেয়। মগ্ন—মজ্জন। নীরব—নীরবতা। অপেক্ষা—অপেক্ষিত। ব্যাপৃত—ব্যাপৃতি, ব্যাপৃততা। হেয়—হেয়তা। সংকার—সংকৃত। সঙ্গ—সঙ্গী। নীচ—নীচতা।

ব্যুৎপত্তি ঃ—শুষ্ক— √শুষ্ক + ক্ত (কর্তৃবাচ্যে)। শিষ্য— √শাস্ + ক্যপ্ (কর্মবাচ্যে)। পণ্ডিত—পণ্ডা + ইতচ্ (জাতার্থে)। ধ্যান— √ধ্যৈ + অনট্ (ভাবে)। একাকী—এক + আকিন্—(অসহায়ার্থে)। সূর্য—সৃ + ক্যপ্ (য) কর্তৃবাচ্যে।

অনুশীলনী

১। ব্যাকরণ সংক্রান্ত টীকা লিখ :—(ক) **সারাদিন** তাঁর কাটে জপে তপে : (খ) যার প্রাঙ্গনে সকল মানুষের নিমন্ত্রণ। যাও তোমার **ব্রত পালনে**।

২। **'ভোজ্য'** এবং **'ভোগ্যের'** মধ্যে অর্থের প্রভেদ দেখাইয়া বাক্য রচনা কর।

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীতার্থবোধক শব্দদ্বারা বাক্য রচনা কর :—

শুষ্ক, ভাঙে, ভোজ্য, প্রবেশ, স্পর্শ, অধিকার, অন্ধকার, অবসান, অপরাধী, অচেতন, মত, ব্যস্ত, নীচ, নগ্ন, মলিন, ব্যাপৃত, অপমান।

৪। নিম্নলিখিত পদগুলির ব্যাসবাক্য লিখ :—প্রাণবাহিনী, হাতজোড়, শুকতারা।

৫। লিঙ্গান্তরে পরিবর্তিত কর :—ঠাকুর, পণ্ডিত, ভক্ত, গুরু, একাকী, শিষ্য, সূর্য। **উত্তর** ঃ ঠাকুরানী। পণ্ডিতা, পণ্ডিতানী। ভক্তা। গুরু, গুর্বী, গুরুমা। একাকিনী। শিষ্যা। সূর্যা, সূরী।

৬। **বাচ্যান্তরিত কর** ঃ—(১) রামানন্দ পেলেন গুরুর পদ। (২) সারাদিন তাঁর কাটে জপে তপে (কর্মকর্তৃবাচ্য)। (৩) সন্ধ্যাবেলায় ভোজ্য করেন নিবেদন। (৪) তারপর ভাঙে তাঁর উপবাস। (৫) রাজা এলেন, রানী এলেন। (৬) আহার হ'ল না সেদিন। (৭) সেদিন আমার মন্দিরে যারা প্রবেশ পায় নি। (৮) প্রভাতেই যাব এই সীমা ছেড়ে। (৯) রামানন্দ হাত জোড় করে বল্লেন। (১০) সময় হয়েছে, ওঠো, প্রতিজ্ঞা পালন কর। (১১) যাও তোমার ব্রত পালনে। (১২) আজ আমি পরবো শুচিবস্ত্র তোমার হাতে। (১৩) আজ তাঁকে সেখানে খুঁজে পেয়েছি। **উত্তর** ঃ—(১) রামানন্দকর্তৃক গুরুর পদ প্রাপ্ত হইল, রামানন্দের গুরুর পদ পাওয়া হ'ল। (২) তিনি জপেতপে সারাদিন কাটান (কর্তৃবাচ্য)। (৩) সন্ধ্যাবেলায় ভোজ্য নিবেদিত হয়। (৪) তারপর তিনি

উপবাস ভাঙেন।' (৫) রাজার আসা হোল, রানীর আসা হোল। (৬) তিনি সেদিন আহার' করিলেন না (কর্তৃবাচ্য)। (৭) সেদিন আমার মন্দিরে যাদের প্রবেশ পাওয়া হয় নি। (৮) প্রভাতেই আমার এই সীমা ছেড়ে যাওয়া হবে। (৯) হাত জোড় করিয়া রামানন্দকর্তৃক উক্ত হইল ; রামানন্দের হাত জোড় করে বলা হ'ল। (১০) সময় হয়েছে, তোমার উঠা হোক এবং প্রতিজ্ঞা পালন করা হোক ; সময় হইয়াছে উঠিবার পর তোমার প্রতিজ্ঞা পালিত হউক। (১১) ব্রত-পালনে তোমার যাওয়া হোক্। (১২) আজ তোমার হাতে আমার শুচিবস্ত্র পরা হবে ; আজ তোমার হাতে আমাকর্তৃক শুচিবস্ত্র পরিহিত হইবে। (১৩) আজ তাঁকে আমার খুঁজে পাওয়া হয়েছে।

৭। **অশুদ্ধি শোধন কর** ঃ—ঠাকুরকে ভোগ্য করেন নিবেদন। উপবাশ। অন্তরে পান ঠাকুরের প্রসাদ। পণ্ডীতমণ্ডলীরা। নৈবিদ্য। হিয়া রইল শুষ্ক হযে। আমার বাস কি কেবলমাত্র বৈকুণ্ঠে। আমার 'পর্শ যে তাদের সর্বঙ্গে। আমার অধীকারের সীমা দিতে চাও। এত বড় আস্পর্ধা। দুই হাত বাড়িয়ে তাকে নিলেন বোক্খে। হেয়ো আমার ঈবিত্তি। অচৈতন্য আমি। মৃতের সৎকার্য। ভোরেল পাখি। তাঁর কণ্ঠ জড়িয়ে ধ্বত করলেন।

জীবন-ভিক্ষা (পৃঃ ২৮-২৯)

সন্ধি ঃ—**বিয়োগ-উৎস-সরিৎ**—শ্রুতিকটুতা নিবারণের জন্য এবং ছন্দের অনুরোধে সন্ধি হয় নাই [যদিও সমাসে সন্ধি আবশ্যক] নির্বাণ—নিঃ+বান, তপোবল—তপঃ+বল। **বিরহ-আঁধার**—তদ্ভব শব্দের সহিত তৎসম শব্দের সন্ধি করা হয় না। [সংস্কৃত 'অন্ধকার' হইতে তদ্ভব 'আঁধার' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে]। নীরব (নীরব সমাধি) (নিঃ+রব)।

সমাস ঃ—**বিয়োগ-উৎস-সরিৎ**—বিয়োগরূপ উৎস (উৎস=ঝরণা) রূপক কর্মধারয়—বিয়োগ উৎসজাত সরিৎ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। **রসনা-প্রসুন**—রসনা (জিহ্বা) রূপ প্রসূন (ফুল) রূপক কর্মধারয়। পরসাদের ('প্রসাদ' শব্দ কবিতার ভাষায়)। মধুরস (ষষ্ঠী তৎপুরুষ) মধু (মধুর) রস (কর্মধারয়)। মুখ-চম্পক—মুখ চম্পকের মতো (উপমিত কর্মধারয়)। অধরকমলপর্ণ—অধররূপ কমল (রূপক কর্মধারয়) তাহার পর্ণ (পাপড়ি) ষষ্ঠীতৎপুরুষ। **পদ্মবেদী**—পদ্মনির্মিত বেদী (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। **ত্রিতাপদুঃখ**—ত্রি (তিন) তাপের সমাহার—ত্রিতাপ (সমাহার দ্বিগু সমাস) ত্রিতাপাত্মক দুঃখ=ত্রিতাপ দুঃখ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। নীরব-সমাধিমগ্ন—নির্ নাই রব (শব্দ) যাহাতে (বহুব্রীহি) নীরব যে সমাধি (কর্মধারয়) তাহাতে মগ্ন (সপ্তমী তৎপুরুষ)। **অশোকনিলয়**—অবিদ্যমান (নাই) শোক যাহাতে (বহুব্রীহি)—অশোক, অশোক যে নিলয়

(শোকশূন্য) গৃহ কর্মধারয় সমাস। **পরান-মৃণাল** (পরাণ-কবিতায় 'প্রাণ'-স্থানে **স্বরভক্তি**), পরান (প্রাণ) মৃণালের মতো (উপমিত কর্মধারয়)। **বিরহ-আঁধার**—বিরহরূপ আঁধার। সর্ষপচয়—সর্ষপের চয় (সমূহ) (ষষ্ঠীতৎ)। **মরণশ্যেন** (উঃ মাঃ ১৯৬০ কম্পার্ট)—মরণ (মৃত্যু) রূপ শ্যেন (রূপক কর্মধারয়)। **স্তনক্ষীরধার**—স্তনের ক্ষীর (দুগ্ধ) (ষষ্ঠী তৎপুরুষ) স্তনক্ষীরের ধারা যাহাতে বহুব্রীহি—বিশেষণ পদ 'অধর' পদের বিশেষণ।

পদটীকা ঃ—দেউল=দেবমন্দির (সংস্কৃত 'দেবকুল' হইতে)। দুলালে—কর্মে দ্বিতীয়া (কবিতায়, 'দুলালকে' স্থানে)। আগলি—অর্গল (খিল) হইতে 'আগল +আ (প্রত্যয়যোগে নাম ধাতু)+ইয়া (কবিতায় সংক্ষিপ্তরূপ 'ই'=রক্ষা **করিয়া**) গদ্যে। **আঁচলের** ধন—আধার আধেয় সম্বন্ধে ষষ্ঠী (অধিকরণ সম্বন্ধে)। পরিষিক্ত—পরি+ √সিচ্+ক্ত (কর্মবাচ্যে)। **আধো আধো**—বিশেষণ পদ—'বোলে' পদের বিশেষণ—শব্দদ্বৈত, **ঈষদর্থে দ্বিরুক্তি**। বোলে=বাক্যে অধিকরণে সপ্তমী। ননীর (পুতলি)—উপাদান সম্বন্ধে ষষ্ঠী [তুলঃ সোনার গহনা' 'রক্তের অক্ষর' **'ফুলের কঙ্কণ'**]। **যুবতী** – √যু+শতৃ=যুবৎ+ঈ (স্ত্রীলিঙ্গে [কিন্তু 'যুবতি'=যুব (ন্)+তি (স্ত্রীলিঙ্গে) দুইই শুদ্ধ] আলুথালু—অসংবৃত, অসংবদ্ধ **শব্দদ্বৈত** [অনুচর শব্দের আংশিক পরিবর্তন প্রকর্ষার্থে]। তুলঃ 'জলটল', 'লুচি-ফুচি—বিশেষণ পদ। 'বেশ' পদের বিশেষণ। **কহেন** (বুদ্ধ)—ঐতিহাসিক বর্তমান কালের ক্রিয়া [আধুনিক বাংলায় কবিতায় ব্যবহৃত হয়]। **মগ্ন**— √মস্জ+ক্ত (তুঃ লগ্ন, উদ্বিগ্ন)। **মরণের** (মহালগ্ন)—বিশেষণ সম্বন্ধে ষষ্ঠী। (যাত্রা করেছ দুরগম) পথ—'যাত্রা করা'—অকর্মক ক্রিয়া—এখানে অধিকরণের সপ্তমী বিভক্তি লুপ্ত।

গদ্যরূপ ঃ—পরসাদ—(১৯৬০) প্রসাদ, দুরগম—দুর্গম, পরান—প্রাণ, ভিখ্—ভিক্ষা, আগলি—বন্ধ করিয়া, পরশ—স্পর্শ, পুতলি—পুত্তলিকা, হরষ—হর্ষ, **জীয়াতে** (১৯৬০)—জীবিত করিতে, নিবেদিল—নিবেদন করিল।

লিঙ্গান্তর ঃ—দুলাল—দুলালী। বিহগ—বিহগী। অভাগা—অভাগী। শ্যেন শ্যেনী। **যুবতী**—'যুবৎ'—শব্দ হইতে। 'যুবা'—হইতে **'যুবতি'**। কুমার—কুমারী। তনয়—তনয়া।

পদান্তর ঃ—উষ্ণ—উষ্ণতা। চক্ষু—চাক্ষুষ। ধন—ধন্য, ধনবান্। আহত—আঘাত। পক্ষ—পাক্ষিক, পক্ষী, পক্ষবান্। তিক্ত—তিক্ততা। পরিষিক্ত—পরিষেক। শুষ্ক—শোষণ, শুষ্কতা। পাপ—পাপী। প্রাণ—প্রাণবান্। মাধুরী (বিশেষ্য)—মধুর (বিশেষণ)। কান্তি—কান্ত। চিহ্ন—চিহ্নিত। ভিন্ন—ভেদ, ভিন্নতা। যাত্রা—যাত্রী। সূক্ষ্ম—সূক্ষ্মতা। কুমার—কৌমার। ভগ্ন—ভঙ্গ (বিশেষ্য)। দ্বার—দ্বারী। বিরহ—বিরহিত।

ব্যুৎপত্তি ঃ—বিয়োগ—বি √যুজ্ + ঘঞ্ (ভাবে)। নয়ন—√নী + অনট্ (করণে)। পরিষিক্ত—পরি √সিচ্ + ক্ত (কর্মবাচ্যে। ভিন্ন—ভিদ্ + ক্ত। যুবতী—যু + শতৃ + ঈপ্ (স্ত্রীলিঙ্গে)। সমাধি—সম্-আ—√ধা + কি (ভাবে)। মগ্ন—মসজ্ + ক্ত। ভগ্ন—√ভঞ্জ্ + ক্ত (কর্তৃবাচ্যে)। আহত—আ √হন্ + ক্ত (কর্মবাচ্যে)। রিক্ত—রিচ্ + ক্ত (কর্তৃবাচ্যে)।

প্রতিশব্দ ঃ—**বিহগ**—পক্ষী, পাখি, বিহঙ্গ, পতঙ্গ, বিহঙ্গম, অণ্ডজ, দ্বিজ। **দেউল**—দেবালয়, মন্দির, উপাসনাগৃহ, দেবগৃহ, দেবায়তন। **তনয়**—পুত্র, আত্মজ, সন্তান, অপত্য।

সাধুভাষার রূপ ঃ—দুলাল—স্নেহপাত্র। আগলি—সুরক্ষিত করিয়া, বদ্ধ করিয়া। আঁচল—অঞ্চল। বাছা—বৎস। আধো আধো বোল—অর্ধস্ফুট বচন। আলু থালু—অসংবৃত। দুলিয়া উঠিবে—স্পন্দিত হইবে। জীয়াতে—পুনরুজ্জীবিত করিতে। ভিখ—ভিক্ষা। ননী—নবনীত।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত বিশিষ্টার্থ পদসমষ্টি দ্বারা সার্থক বাক্য রচনা কর ঃ—'আঁচলের ধন', 'আধো আধো', 'ননীর পুতলি'।

২। ব্যাকরণসংক্রান্ত টীকা লিখ ঃ—বিয়োগ-উৎস-সরিৎ, বসনা-প্রসূন, ত্রিতাপ-দুঃখ, নীরব-সমাধি-মগ্ন

৩। লিঙ্গ পরিবর্তন কর ঃ—বিহগী, কুমার, যুবা, তনয়, অভাগী।

৪। ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন কর ঃ—আহত, রিক্ত, ভিন্ন, ভগ্ন।

৫। তৎসম (সাধুভাষার) প্রতিশব্দ লিখ ঃ—দুলাল, আগলি, আঁচল, বাছা, আধো আধো বোল, আলু থালু, দুলিয়া উঠিবে, জীয়াতে, ভিখ্।

৬। যাত্রা শব্দের বিভিন্ন অর্থ প্রদর্শন করিয়া বাক্য রচনা কর। **উত্তর ঃ**—(১) যাত্রা=গমন, প্রস্থান,—আজ পদযাত্রার চতুর্থ দিন। (২) নির্বাহ করা—সামান্য আয়ে লোকটির জীবন যাত্রা নির্বাহ হইয়া থাকে। (৩) দেবতার উৎসব—মাহেশের রথযাত্রার ভিড়ের জন্য গাড়ীতে যায়গা পাওয়া যায় না। (৪) অভিনয় বিশেষ—এবারকার পুজোতে গ্রামে যাত্রার দল আসে নি। (৫) বার—বৃদ্ধ গুরুতর অসুস্থ হয়েও এ যাত্রা বেঁচে গেলেন।

৭। গদ্যের ভাষায় প্রতিশব্দ লিখ ঃ—পরান, আগলি, পরসাদ, পরশে, পুতলি, হরষে, ভিখ্, জীয়াতে [উজ্জীবিত করিতে]।

৮। **কারণ নির্দেশপূর্বক অশুদ্ধি সংশোধন কর ঃ—**

(১) "দেউলে দেউলে কাদিয়া ফিরিগো, দুলালের আগলি বোকৃখে
উষ্ম বিয়োগ-উৎস-সরিৎ দরবিগলীত চোকখে,
শত চুম্বনে মেলে না নয়ান চুরি গেছে মম আচলের ধন
অভাগী বিহঙ্গী আজিকে আহত শ্যেন মরণের পোকৃখে।

(২) কোথা সে মাধুরী আধা আধা বোলে ? কুন্দবৃন্তচ্ছিন্ন,
দন্তরুচিতে কই সে কান্তি পুণ্যহাঁসির চিন্ন ?
জানি হে প্রভু তোমার পানির পরশে পুতলিননীর জাগিবে হরিষে
কেন্ পাশানের বানবিষে তার নয়নের মনি ভিন্ন ?

(৩) চম্পকমুখে মরুর বর্ণ। শুষ্ক কমলাধর পর্ণ। প্রস্থনরসনা।

বাচ্য পরিবর্তন কর ঃ—(১) দেউলে দেউলে কাঁদিয়া ফিরিগো। (২) অভাগী বিহগী আজিকে আহত মরণ শ্যেনের পক্ষে। (৩) রসনাপ্রস্থন কোন পবসাদ মধুরসে পরিষিক্ত। (৪) কোন্ পাষাণের বিষবাণে তার নয়নের মণি ভিন্ন। (৫) অবনীর এই পদ্মবেদীতে হরিলে ত্রিতাপ দুঃখ। (৬) দিয়ে তপোবল, মহানির্বাণ, কুমারে আমারে কর প্রাণ দান। (৭) হরো জগতের বিরহ-আধার দাও গো অমৃত দীক্ষা। **উত্তর ঃ—**(১) দেউলে দেউলে আমার কাঁদিয়া ফিরা হয় গো। (২) মরণ শ্যেনের পক্ষে অভাগী বিহগীকে আজ কেহ আঘাত করিয়াছে। (৩) কোন্ মধুরস রসনাপ্রস্থনকে (আজ) পরিষিক্ত করিয়াছে ? (৪) কোন্ পাষাণের বিষবাণ তাহার নয়নের মণিকে ভেদ করিয়াছে ? (৫) অবনীর এই পদ্মবেদিতে তোম-কর্তৃক ত্রিতাপ দুঃখ হৃত হইয়াছে। (৬) মহানির্বাণ তপোবলদ্বারা আমার কুমারকে প্রাণ দেওয়া হউক। (৭) জগতের বিরহ-আঁধার হৃত হউক, অমৃত-দীক্ষা দত্ত হউক।

১০। **উক্তি পরিবর্তন কর ঃ—**(১) কহেন বুদ্ধ······মৃণাল ভগ্ন। **উত্তর—** (১) বুদ্ধ তাহাকে বলিলেন তাহার তনয় নীরব সমাধিতে মগ্ন হইয়াছে এবং চিরসুন্দর মরণের মহালগ্নকে বরণ করিয়াছে; তবে যদি সে কোথাও কোন অশোকনিলয় হইতে ভিক্ষা করিয়া সর্ষপচয় আনিতে পারে তাহা হইলে তাহার স্পর্শে ভগ্ন প্রাণ মৃণাল দুলিয়া উঠিবে।

আমরা (পৃঃ ৩১-৩৪)

সন্ধি ঃ—আশীর্বাদ—আশীঃ+বাদ। অতসী-অপরাজিতায় (সন্ধি করিলে শুনিতে উৎকট হইত—আর ছন্দের অক্ষর সংখ্যা ঠিক রাখা চলিত না)। চতুরঙ্গ—চতুঃ+অঙ্গ। দেব-ঋণ—সন্ধিতে বর্ণের কোন পরিবর্তন হয় নাই [প্রকৃতি ভাব হইয়াছে—হ্রস্ব স্বরের পর ঋকার থাকিলে ঋকার স্থানে 'অর্' হয় বিকল্পে এবং

দীর্ঘস্বরের পর থাকিলে দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হয়। দেব + ঋণ = দেবর্ণ, দেব-ঋণ—'দেবর্ণ' শ্রুতিকটু হয় বলিয়া—এই নিয়ম অনুসারে সন্ধি করা হয় নাই। ব্রহ্ম + ঋষি = ব্রহ্মর্ষি, [ব্রহ্মঋষি সমাস, দেখ]। **মন্বন্তর**—মনু + অন্তর। দশানন—দশ + আনন।

সমাস ঃ—মুক্তবেণীর (র)—মুক্ত হইয়াছে বেণী যাহার (বহুব্রীহি), বরদ—বর দান করেন যিনি উপপদ সমাস—বর √দা + ক (কর্তৃবাচ্যে) (তুঃ প্রদ, জলদ, করদ, ধনদ ইত্যাদি), মধুকমালা—মধুকের মালা (ষষ্ঠীতৎপুরুষ), কাঞ্চনশৃঙ্গমুকুট—কাঞ্চন শৃঙ্গরূপ মুকুট (রূপক কর্মধারয়), **কোলভরা**—কোলে ভরা (সপ্তমী তৎপুরুষ), চতুরঙ্গে—চতুর্ (সংস্কৃতে) চার অঙ্গের সমাহার—সমাহার দ্বিগু সমাস [হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতি—এই চারিটি সেনার অঙ্গ]।—করণে তৃতীয়া—'এ' বিভক্তি, **বাঙালীর-হিয়া-অমিয়**—বাঙালীর হিয়া (কবিতায় হৃদয় শব্দের রূপ) অলুক ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস, বাঙালীব হিয়ারূপ-অমিয় (কবিতায় 'অমৃত' স্থানে) রূপক কর্মধারয়।' গরমিলে—মিলের অভাব—গরমিল (অব্যয়ীভাব) তাহাকে—কর্মে দ্বিতীয়া—'এ' বিভক্তি (কবিতায়), **পঞ্চবটী**—(১৯৬০) **পঞ্চবটের** সমাহাব [**সমাহার দ্বিগু সমাস—বৃক্ষ সামান্যে বট শব্দের প্রয়োগ**—অশ্বত্থ, বট, বিল্ব, আমলকী, অশোক এই পঞ্চ বৃক্ষেব (বটের) বন] দ্বেষাদ্বেষি—পরস্পরের সহিত দ্বেষ যে ক্রিযাতে (**ব্যতিহার বহুব্রীহি**)। **দেব-ঋণ**—(অধিকরণে সপ্তমী = দেব ঋণ বিষযে দেবতাকে দেয়—দেবদেয (চতুর্থী তৎপুরুষ), দেবদেয় ঋণ দেবঋণ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। কনকধান্য—কনক (সোনালি রঙের) যে ধান্য কর্মধারয সমাস (তুঃ কনকচাঁপা স্বর্ণচম্পক, সোনামুগ, ('সোনাব্যাঙ')। **মন্বন্তর**—(১৯৬০ কম্পার্ট ও ১৯৬২) অন্য মনু (মনুর পরিবর্তনের সময়—বিষম সংকটময় কাল) (**নিত্যতৎপুরুষ সমাস**)।

পদটীকা ঃ—অতসী অপরাজিতার—করণে তৃতীয়া য় বিভক্তি, শৌর্য—শূর + য (ষ্যঞ্) ভাবার্থে (শূরের ভাব)। জ্ঞানের (দীপ)—অভেদ সম্বন্ধে ষষ্ঠী। পটুয়া (পটো)—চিত্রকর—পট + উয়া—পটো (তুঃ পড়ুয়া <পোড়ো)। বাউল—সং 'বাতুল' হইতে তদ্ভব শব্দ। মারী—√মৃ + ণিচ্ + ঈ (ভাববাচ্যে) মহামারী মড়ক। পরি—পরিয়া—পরিধান করিয়া। ঠাকুরালি—ঠাকুর + আলি (ভাবার্থে) তুঃ মিতালি (মিত্রতা)। **জগৎময়**—সংস্কৃতে **"জগন্ময়"** ['ময' প্রত্যয় পরে থাকিলে তৎসম শব্দে সন্ধিতে প্রত্যয়ের পঞ্চম বর্ণের যোগে পূর্ববর্তী পদের প্রথম বর্ণ স্থানে পঞ্চম বর্ণ হওয়া আবশ্যিক—এখানে **কবি এরূপ সন্ধি করেন নাই।** ইহাকে '**অভিযুক্ত**' প্রয়োগ বলা হয়।] **গৌরবে** হেত্বর্থে তৃতীয়া—'এ' বিভক্তি গুরু + অণ্ (ভাবার্থে) [তুলনীয় 'সৌষ্ঠব', মার্দব, পাটব]।

গদ্যরূপ ঃ—পরি—পরিয়া, ধেয়ান—ধ্যান, পানে—দিকে। **হিয়া—হৃদয়,**

অমিয়—অমৃত, লজ্জিল—লজ্জন করিল। আলা—আলোকিত। জনম—জন্ম। মথিয়া (১৯৬২)—মন্থন করিয়া।

পদান্তরঃ–বঙ্গ—বঙ্গীয়। স্নেহ—স্নিগ্ধ। ভূষিত—ভূষণ। দেহ—দৈহিক। বন্দনা—বন্দিত। সজ্জিত—সজ্জা। সিংহল—সিংহলী। মোগল—মোগলাই বিদ্বান্—বিদ্যা। সূত্র—সৌত্র। ভয়ংকর—ভয়ংকরতা। তিব্বত—তিব্বতী, তিব্বতীয়। কিশোর—কৈশোর। দেশ—দেশী। যশ (স্)—যশস্বী। কান্ত—কান্তি। কোমল—কোমলতা। সুরভি—সৌরভ। প্রাচীন—প্রাচীনতা কীর্তি—কীর্তিমান্। মূর্তি—মূর্ত। অবিনশ্বর—অবিনশ্বরতা। লীলা—লীলায়িত কীর্তন—কীর্তনীয়। বিধি—বৈধ। কায়া—কায়িক। সাধনা—সাধ্য। ধাতু—ধাতব। আহ্লাদ—আহ্লাদিত। সূচনা—সূচিত। গৌরব (বিশেষ্য)—গুরু (বিশেষণ)। দীক্ষিত—দীক্ষা। ধীর (বিশেষণ)—ধৈর্য।

কারক বিভক্তিঃ—**সিংহল নামে** (শৌর্যের পরিচয়)—করণে তৃতীয়া —'এ' বিভক্তি অথবা অধিকরণে সপ্তমী। **প্রপিতামহের** সঙ্গে—সঙ্গে এই অনুসর্গ যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি। **ব্যাঘ্রে বৃষভে**—সহার্থে তৃতীয়া—'এ' বিভক্তি। **শবসাধনার বাড়া—অপেক্ষার্থে**—ষষ্ঠী (তুঃ রাম শ্যামের বড়) **তারবেশি**—অপেক্ষার্থে ষষ্ঠী (দুইয়ের বা বহুর মধ্যে তুলনায়) ভবিষ্যতের পানে —'পানে'—এই অনুসর্গযোগে ষষ্ঠী বিভক্তি।

ব্যুৎপত্তিঃ—বরদ—বর— √দা + ক (কর্তৃবাচ্যে) (বর দান করেন যিনি—স্ত্রীলিঙ্গে বরদা)। স্নেহ— √স্নিহ্ + ঘঞ্। ভূষিত— √ভূষ্ + ক্ত। বাঞ্ছিত—বাঞ্ছা + ইতচ্ অথবা √বাঞ্ছ + ক্ত। শৌর্য—শূর + ষ্যঞ্ (ভাবার্থে)। সাংখ্যকার —সাংখ্য + √কৃ + অণ্ [কর্তৃবাচ্যে (সাংখ্য—দর্শন শাস্ত্র বিশেষ) করেন যিনি]। শাতন (কর্তন)— √শত্ + ণিচ্ + অনট্ (ভাবে)। কান্ত— √কম্ + ক্ত। ব্যাঘ্র —বি – আ— √ঘ্রা + ক (কর্তৃবাচ্যে)। ভিত্তি— √ভিদ্ + ক্তি। কীর্তি— √কৄৎ + ক্তি (ভাবে)। অবিনশ্বর—নঞ্—বি √নশ্ + বরচ্। নিভৃত—নি— √ভৃ + ক্ত। আত্মীয়—আত্ম (ন্) + ঈয়। অতীত—অতি + √ই + ক্ত (কর্তৃবাচ্যে)। বিধাতা (তৃ)—বি— √ধা + তৃচ্ (কর্তৃবাচ্যে) দীক্ষিত— √দীক্ষ্ + ক্ত (কর্মবাচ্যে)।

অনুশীলনী

১। কারণ নির্দেশপূর্বক বিভক্তি নির্ণয় কর :—(ক) **সিংহলনামে** .... **শৌর্যের পরিচয়**। (খ) ....রামচন্দ্রের **প্রপিতামহের** সঙ্গে। (গ) বাঙালীর ছেলে **ব্যাঘ্রে-বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়**। (ঘ) আমাদের এই নবীন সাধনা **শবসাধনার বাড়া**। (ঙ) ভবিষ্যতের **পানে** মোরা **চাই**। (চ) ...... **লাগিবেনা তার** বেশী।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে লিঙ্গান্তরিত কর :—কিশোর, বরদ, বাঘ, ব্যাঘ্র, নাগ, ভয়ঙ্কর, সাধক, বিধাতা, সন্ন্যাসী, কবি, মানব। **উত্তর** ঃ—কিশোরী, বরদা, বাঘিনী, ব্যাঘ্রী, নাগ—(১) নাগী (সংস্কৃতে) বাঙ্‌লায় (২) নাগিনী ; ভয়ঙ্করী, সাধিকা, বিধাত্রী, সন্ন্যাসিনী, কবি—মহিলা কবি, স্ত্রী কবি, কবয়িত্রী, মানব-মানবী।

৩। নিম্নলিখিত পদসমষ্টিগুলির অন্তর্ভুক্ত পদের পরস্পর অর্থের প্রভেদ প্রদর্শন পূর্বক বাক্য রচনা কর :—(১) পরি, পড়ি, পরী ; (২) কৃত্তি, কীর্তি ; (৩) জড়, জ্বর ; (৪) সাড়া, সারা। **উত্তর** ঃ—(১) আমরা ছেলেরা পোশাক **পরি** এবং বইতে **পরীর** গল্প পড়ি।

৪। **বুক, সুরভি, ভাস্কর, ভিত্তি, সারা**—এই পদ কয়টি বিভিন্নার্থে সাধারণ ও বিশিষ্ট প্রয়োগ দেখাইয়া বাক্য রচনা কর। **উত্তর** ঃ—**বুক**—প্রথম খণ্ড দেখ।

সুরভি ঃ—(১) বিশেষ্য পদ 'সুগন্ধ', 'সৌরভ',—পম্পা সরোবর হইতে পদ্মের **সুরভি** বহন করিয়া বায়ু প্রবাহিত হইতেছে ; (২) বিশেষণ পদ—'সুগন্ধযুক্ত', জয়দেবের কান্তকোমল পদ সংস্কৃতের সোনার পদ্মকেও **সুরভিত** করিয়াছে। **ভাস্কর** ঃ—(১) সূর্য (বাংলায় ও সংস্কৃতে)—নিদাঘ ভাস্কর সারাদিন অনলরাশি বর্ষণ করিয়া অপরাহ্নে দূর তরুশিরে সোনার সিংহাসন পাতিয়াছে। (২) **বাঙ্‌লায়** ধাতু বা প্রস্তর দ্বারা মূর্তিনির্মাণকারী ('আমরা' কবিতায় এই অর্থে ভাস্কর শব্দের ব্যবহার হইয়াছে')—"প্রাচীন বাঙ্‌লার **ভাস্করের** কীর্তির চিহ্ন দ্বীপময় ভারতে আজও দেখিতে পাওয়া যায়।" **ভিত্তি** ঃ—(১) মূল, পাকাবাড়ির বনিয়াদ (বুনিয়াদ)—মহামান্য রাজ্যপাল এই চিকিৎসালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন। (২) **দেওয়াল, প্রাচীর**—প্রাচীন দুর্গের পাষাণ ভিত্তি দূর হইতে দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। (৩) পথে ঘাটে যে সব গুজব শুনিতে পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশেরই কোন ভিত্তি নাই (অমূলক)। **সারা** ঃ—(১) সকল, সমগ্র। কাজে কাজে সারাদিন গেল। (২) **সমাপ্ত** "বাদল ধারা হোল সারা" (রবীন্দ্রনাথ)। (৩) **লুকাইয়া রাখা**—ভাল করে খুঁজে দেখ—এই ঘরেই তোমার টাকা কোন লোক সেরে রেখেছে। (৪) ঘড়ি সারাতে (**মেরামত করা**) কিছু খরচ হোল। (৫) ভয় কি ! অসুখ নিশ্চয়ই সেরে যাবে (রোগমুক্ত হওয়া)। (৬) ভুল সকলেরই হয়, কিন্তু সংসারে কয়জন নিজের ভুল সারে (সংশোধন করে)।

৫। **বাচ্যান্তরিত কর** ঃ—(১) আমরা বাঙালী বাস করি। (২) বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি। (৩) আমাদের সেনা যুদ্ধ করেছে। (৪) কপিল সাংখ্যকার এই বাঙলার......হীরক হার। (৫) বাঙলার রবি...... কাঞ্চন কোকনদে। (৬) মন্বন্তরে মরিনি আমরা। (৭) বীর সন্ন্যাসী........

জগৎময়। (৮) বাঙালীর কবি……গান। (৯) বিধাতাব কার্জ সাধিবে………আশীর্বাদে। (১০) মুক্ত হইব দেব-ঋণ মোরা মুক্তবেণীর তীরে। 'উত্তর :—(১) আমরা বাঙালীদের বাস করা হয়। (২) বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমাদের বাঁচিয়া থাকা হয়। (৩) আমাদের সেনাকর্তৃক যুদ্ধ করা হইয়াছে। (৪) কপিল সাংখ্যকার কর্তৃক'এই বাঙ্‌লার মাটিতে স্বত্রে হীবকহার গ্রথিত হইয়াছিল। (৫) বাঙ্‌লার রবি জয়দেব কবি কর্তৃক কান্ত কোমলপদে সংস্কতেব কাঞ্চন কোকনদকে সুবভিত করা হইয়াছে। (৬) মন্বন্তরে আমাদের মরা হয় নাই'। (৭) বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণীব জগৎময় ছোটা হয়েছে। (৮) বাঙালীর কবি কর্তৃক জগতে মহামিলনের গান গীত হইতেছে। (৯) ধাতাব আশীর্বাদে বাঙালী দ্বারা বিধাতার কাজ সাধিত হইবে। (১০) আমাদিগকর্তৃক শ্মশানের বুকে পঞ্চবটী রোপিত হইয়াছে। (১১) বিধাতার ববে বাঙালীব গৌরব ভুবনকে ভরিবে। (১২) মুক্তবেণীব তীরে আমাদেব মুক্তি পাওয়া হইবে।

৬। **কারণ নির্দেশপূর্বক শুদ্ধ করিয়া লিখ ঃ—**

(১) মন্নন্তরে মরি নাই আমরা মারি নিয়া ঘর করি,
বাচিয়া গিয়াছে বিধীব আশীষে অমৃতের টীকা পড়ি।
দেবতারে আমরা আত্মিয় জানি, আকাশেব প্রদিপ জালি,
আমাদের এই কুটিরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালী ;
ঘরের ছেলের চোক্ষে দেখেছি বিশ্বভুপের ছায়া,
বাঙালী-হিয়া-অ'ময় মন্থিয়া নিমাই ধবেছে কাযা।
বীর সন্নিসি বিবেকের বানী ছুটেছে জগৎ-ময়।
বাঙালীর ছেলে ব্যঘ্রে বৃশভে ঘটাবে সমন্নয়।

(২) বেনি। মধুক, মধুক। মুকূট। অতসি, সজ্জিত। চতুরঙ্গ। প্রোপিতামাহ। চাদপ্রতাপ। আদিবিদ্বান। জালিল জ্ঞানের দ্বীপ। দিপঙ্কর। কিশর বয়েস। স্থপতি। অবিনস্শ্বর। পটুয়া। বাঙালি সাধক পেয়েছে ভাবের সারা। রসায়ণ। আল্লাদ। শশান। পঞ্চবটি। শতকোটী। সুচনা। প্রতীভা। দেশাদ্বেষী। দিক্ষীত। মুক্তাবেনির তিরে।

৭। **নির্দেশ অনুসারে পরিবর্তন কর ঃ**—(১) কপিল সাংখ্যকার এই বাংলার মাটিতে গাঁথিল স্বত্রে হীরক-হাব (জটিল বাক্যে পরিণত কর)। (২) লাগিবে না তার বেশি (অস্ত্যর্থক বাক্যে)। (৩) সাগব যাহার বন্দনা রচে (বাচ্যান্তরিত কর)। (৪) বিফল নহে এ বাঙালী জনম (অস্ত্যর্থক বাক্যে)। (৫) আমাদের ছেলে বিজয়সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়, সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্যের পরিচয় (যৌগিক বাক্যে)। (৬) বিধাতার কাজ সাধিবে, বাঙালী ধাতার আশীর্বাদে (বাচ্য পরিবর্তন কর)। (৭) আমাদের কোন সুপটু পটুয়া

.........আমাদের পট অক্ষয় করে রেখেছে অজন্তায় (বাচ্য পরিবর্তন কর)। ৫ পৃঃ ৩৩)।' উত্তর ঃ—(১) কপিল, যিনি সাংখ্য রচনা করিয়াছেন, তিনি এই বাংলার মাটিতে সূত্রে হীরক-হার গাঁথিলেন। (২) তার কমে চলা অসম্ভব। (৩) সাগর দ্বারা যাহার বন্দনা রচিত হয়। (৪) এ বাঙালী জন্মে, বিফলতার অভাব রহিয়াছে। (৫) আমাদের ছেলে, বিজয়সিংহ লঙ্কা জয় করিয়াছে এবং সিংহল নামে নিজ শৌর্যের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছে। (৬) বাঙালী দ্বারা, ধাতার আশীর্বাদে,' বিধাতার কাজ সাধিত হইবে। (৭) আমাদেরই কোনও সুপটু পটুয়ার লীলায়িত তুলিকা দিয়ে, অজন্তায় আমাদের পট, অক্ষয় ক'রে রাখা হয়েছে।

হাট (৩৬-৩৭)

সন্ধি ঃ—নীরব—নিঃ+রব (আর কোন সন্ধি নাই)।

সমাস ঃ—বেচা-কেনা—বেচা এবং কেনা (দ্বন্দ্ব সমাস—বিপরীতার্থক পদদ্বয়ে দ্বন্দ্ব সমাস), **শ্রেণীহারা**—শ্রেণী হইতে হারা (=দলছাড়া) (পঞ্চমী তৎপুরুষ), **প্রশ্বাস**—প্র (প্রকৃষ্ট) শ্বাস (প্রাদিতৎপুরুষ), **পাকুড়-শাখে**—পাকুড়ের শাখা (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)—কবিতায় 'শাখা' শব্দ 'শাখে' রূপে ব্যবহৃত হয় (বিশেষতঃ সপ্তমী বিভক্তিতে) [তুঃ—'পথতরুশাখে ধরেছে মুকুল' (রবীন্দ্রনাথ)]। **দো-চালা**—দুই চালার সমাহার (সমাহার দ্বিগু সমাস)। **বিদ্রূপ-বাঁশি**—বিদ্রূপরূপ বাঁশি (রূপক কর্মধারয়) অথবা বিদ্রূপের বাঁশি (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। নির্জন— নির্ (নাই) জন যে স্থানে (বহুব্রীহি)। চেনা-অচেনা—চেনা ও অচেনা—বিপরীতার্থক পদে দ্বন্দ্ব সমাস [সং চিহ্ন > চেনা—দুইটি তদ্ভব পদে সমাস হওয়ায় সন্ধি হয় নাই] মাল-চেনাচিনি—মালের চেনা-চিনি (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। কানাকড়ি—কানা (ফুটো বা অচল) যে কড়ি (কর্মধারয়)। শিশিরবিমল—শিশির দ্বারা (শিশির স্পর্শে) বিমল (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। **হানাহানি** (১৯৬০) পরস্পরের প্রতি আঘাত হানা (**ব্যতিহার বহুব্রীহি**)।

পদটীকা ঃ—**জ্বলে উঠে**—সংযুক্ত ক্রিয়া—**কর্মকর্তৃবাচ্যে**—কর্তা 'দীপ'। ক্লান্ত—√ক্লম+ক্ত (কর্তৃবাচ্যে তুঃ—শ্রান্ত, বান্ত, ভ্রান্ত, দান্ত, শান্ত)। জীর্ণ √জৄ +ক্ত (কর্তৃবাচ্য, তুঃ—উত্তীর্ণ, কীর্ণ, উৎকীর্ণ, বিদীর্ণ)। **কত না**= কত বেশি, বহু [আধিক্যার্থে 'না' শব্দের প্রয়োগ]। ছিন্ন—√ছিদ্+ক্ত [তুঃ—ভিন্ন, ক্লিন্ন, আপন্ন]। **কত কে**—অনির্দিষ্ট বহুসংখ্যক। **কত বা—সম্ভাবনার্থে** 'বা' শব্দের প্রয়োগ। **কত না**—অবর্ণনীয়রূপে বহু। **প্রভাতের** (ফল)—আধার-আধেয় সম্বন্ধে ষষ্ঠী (প্রভাতের=প্রভাতকালীন)। **পরখ**—পরীক্ষা শব্দ হইতে পরখের (ছল)—কৃদ্‌যোগে কর্তায় ষষ্ঠী (কর্ম সম্বন্ধে ষষ্ঠী)। বিকায়—**কর্ম কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া**। হেলায়—ক্রিয়া-বিশেষণে তৃতীয়া 'য়' বিভক্তি। **পসরা**—বিক্রয় দ্রব্যের স্তূপ ঝুড় বা বোঝা [তুলঃ 'মাংসের **পসরা** লইয়া ফিরি ঘরে ঘরে—মুকুন্দরাম

বারমাস্যা]। ঠাঁই—সংস্কৃত স্থান। নাটের (খেলা)—নাট < 'নৃত্য' শব্দ হইতে (অভিনয়) রঙ্গমঞ্চ। নাটের খেলা রঙ্গমঞ্চের অভিনয়। [আধার-আধেয় সম্বন্ধে ষষ্ঠী]। খোলা—মুক্ত।

বিশিষ্ট বাগ্‌ভঙ্গি ঃ—রাত্রি নামা (আরম্ভ হওয়া), কথার অন্ত (থাকে না), হিসাব না থাকা, বসা (হাট), গাঁটে কড়ি বাঁধে।

বিপরীতার্থক শব্দের প্রয়োগ ঃ—এই কবিতায় বিপরীতার্থক শব্দের প্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষণীয় :—সন্ধ্যা—প্রভাত, বেচা—কেনা, আলোক লুকায়—দীপ জ্বলে উঠে, চেনা—অচেনা, ওপার—এপার, বসা—ভাঙ্গা, নূতন—পুরানো, দিবস—রাত্রি, খোলা—বাধা, যায়—আসে।

শব্দদ্বৈত ঃ—চেনাচিনি, জানাজানি, টানাটানি, হানাহানি।

গদ্যরূপ ঃ—মুদিল—মুদ্রিত করিল, তরে—জন্য।

পদান্তর ঃ—হাট—হেটো, গ্রাম—গ্রাম্য, সন্ধ্যা—সান্ধ্য, প্রভাত—প্রভাতী, আলোক—আলোকিত, পুব—পুবান, নিশা—নৈশ, দূর—দূরত্ব, ক্লান্ত—ক্লান্তি, জীর্ণ—জরা, ছিন্ন—ছেদ, পসরা—পসারী, ফল—ফলবান্, বিকাল—বৈকালিক, ব্যথা—ব্যথিত, নীরব—নীরবতা, মাঠ—মেঠো।

বিপরীতার্থক শব্দ ঃ—দূর—নিকট, সন্ধ্যা—প্রভাত, বেচা—কেনা, সকাল—বিকাল, ঘর—বাহির, আলোক—অন্ধকার, পুব—পশ্চিম, জ্বলে উঠে—নিভে যায়, নিশা—দিবা, মুদিল—খুলিল, জীর্ণ—নূতন, নির্জন—জনবহুল, একক—একাধিক, চেনা—অচেনা, ওপার—এপার, ক্রেতা—বিক্রেতা, এল—গেল, নূতন—পুরানো, দিবস—রাত্রি, খোলা—বাধা।

সার্থক বিশেষণ প্রয়োগ ঃ—উদার আকাশ, ক্লান্ত কাক, জীর্ণ বাঁশ, নির্জন হাট, একক কাক, শিশিরবিমল ফল, নীরব ব্যথা, বসা হাটের মেলা, ভাঙা পুরানো হাটের মেলা, নূতন যাত্রী, মুক্ত বাতাস।

ব্যুৎপত্তি ঃ—সন্ধ্যা—সম্—ধ্যৈ + অঙ্, স্ত্রীলিঙ্গে আ। ক্লান্ত—√ক্লম্ + ক্ত (কর্তৃবাচ্য)। আহ্বান—আ √হ্বে + অনট্ (ভাবে)। প্রশ্বাস—প্র— √শ্বস্ + ঘঞ্ (ভাবে)। জীর্ণ— √জৄ + ক্ত (কর্তৃবাচ্যে)। প্রভাত—প্র— √ভা + ক্ত (কর্তৃবাচ্যে)। মুক্ত— √মুচ + ক্ত (কর্মবাচ্যে)।

অনুশীলনী

১। পদান্তরে পরিবর্তিত করিয়া বাক্য রচনা কর :—

সন্ধ্যা, হাট, বিকাল, ঘর, আলোক, গ্রাম, দীপ, নিশা, ক্লান্ত, পাখা, আহ্বান, জীর্ণ, ছিন্ন, কথা, ক্রেতা, ফল, নীরব ব্যথা, হিসাব, নূতন, যাত্রী, মুক্ত, উদার, খেলা, মাঠ, পসরা, প্রভাত।

২। (ক) **কত কে, কত না, কত বা,**—ইহাদের অর্থের প্রভেদ দেখাইয়া বাক্য রচনা কর। (খ) 'না'—শব্দের বিভিন্ন প্রকার প্রয়োগ দেখাইয়া বাক্য রচনা কর। **উত্তর** (খ) (১) না=নৌকার প্রাদেশিক রূপ—'না' নিয়ে গেল বোয়াল মাছে। (২) **নিষেধার্থক** অব্যয়—আমি ঘরে ফিরে যাব না। (৩) **আধিক্যার্থে**—কত না সুখের আশায় লোক বসে থাকে (=কত বেশি)। (৪) **অনুনয়ার্থে**—ভাই! আগে কাজটি করই না, তারপর পয়সার কথা চিন্তা করা যাবে। (৫) **অথবা অর্থে**—আমাদের না আছে অন্ন, না আছে বস্ত্র। (=অন্ন অথবা বস্ত্র নাই)। (অভাগীর) তাহার না আছে দিন না আছে রাত—অভাগীর স্বর্গ। (৬) **স্বার্থে বা অবধারণার্থে**—(গাথা কবিতায় (Ballad) পূর্ববঙ্গের স্থানে স্থানে চলিত কথায়)। "হাটিয়া না যাইতে কইন্যার পায়ে পড়ে চুল"—মৈমনসিংহ গীতিকা (হাটিয়া না যাইতে=হাটিয়া যাইতে)।

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির সাধু ভাষায় প্রতিশব্দ লিখ :—পাকুর, হাট, বাঁট, বেচা, কেনা, ঘর, পাখা, লুকায়, মাঠ, বাঁশ, বাঁশি, ফাঁক, ভিড়, ঠাঁই, পরখ, গাঁট।

৪। ব্যাস বাক্যসহ সমাসের নাম কর :—শ্রেণীহারা, দো-চালা, বিদ্রূপ-বাঁশি, টানা-টানি।

৫। লিঙ্গান্তরিত কর :—কাক, যাত্রী, ক্রেতা, ক্লান্ত, উদার।

উত্তর ঃ—কাক—কাকী ; যাত্রী—যাত্রিণী, মেয়ে যাত্রী, মহিলা যাত্রী ; ক্রেতা—ক্রেত্রী ; ক্লান্ত—ক্লান্তা ; উদার—উদারা।

৬। **'নামা', 'বসা', 'ভাঙা', 'পড়া',**—এই শব্দ কয়টিকে বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ করিয়া বাক্য রচনা কর। **নামা**—(১) ক্রিয়ারূপে প্রয়োগের উদাহরণ—প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠপর্ব দেখ। (২) উক্ত সকল অর্থে বিশেষণরূপে প্রয়োগ হইতে পারে। বাজারে সকল জিনিস কয়েকদিন হয় নামা দরে বিক্রীত হইতেছে। ঘরের নামা ছাদ (ঝুঁকিয়া পড়া) অবিলম্বে মেরামত করা দরকার ইত্যাদি। **বসা**—(১) ক্রিয়ারূপে প্রয়োগের উদাহরণ এই পুস্তকের ষষ্ঠপর্ব প্রথম খণ্ড দেখ। (২) **বিশেষণরূপে** ঃ—(ক) গ্রামের **বসা হাট** একদিন দুই জমিদারের লাঠালাঠিতে ভাঙ্গিয়া গেল (বসা=স্থাপিত)। (খ) বুকে **বসা** সর্দিতে কখন কি হয় বলা যায় না (জমাট বাঁধা)। (গ) **বসা** গলায় গান গাওয়া চলবে না (স্বর অবরুদ্ধ হওয়া)। **ভাঙ্গা**—ক্রিয়ারূপে প্রয়োগ, প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠপর্ব দ্রষ্টব্য। উক্ত সকল অর্থে বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হয়। (১) আমার ভাঙ্গা কপাল, কোন দিক দিয়েই সুবিধে হচ্ছে না। (=হীনতা প্রাপ্ত)। (২) **ভাঙ্গা মন** নিয়ে আর কাজ করা চলে না (=দুর্বল, হতাশ)। (৩) **ভাঙ্গা গলায়** (বিকৃত, স্বর বসিয়া যাওয়া) গান গাওয়া চলে না। (৪) **ভাঙ্গা হাটে** কোন জিনিসের ভাল দর পাওয়া যায় না। **পড়া** ঃ—প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ পর্ব, দ্রষ্টব্য।

৭। **বাচ্য পরিবর্তন কর** ঃ—(১) বকের পাখায় আলোক লুকায়। (২) মিশা…পাখা। (৩) কেউ গেল খালি ফিরে। (৪) প্রভাতের, ফল বিকাশ-

বেলায় বিকায়। (৫) কেহ কাঁদে, কেহ গাঁটে কড়ি বাঁধে। **উত্তর ঃ**—(১) বকের পাখায় আলোকের লুকান হয়। (২) দূরে শ্রেণীহারা একা ক্লান্ত কাকের পাখে, নিশার নামা হয়। (৩) কাহারও খালি ফিরে যাওয়া হ'ল। (৪) প্রভাতের ফল বিকালবেলায় বিক্রীত হয়। (৫) কাহার কাঁদা, কাহার বা গাঁটে কড়ি বাঁধা হয়।

৮। **শুদ্ধ করিয়া লিখ ঃ**—দুর। প্রদিপ। আলক। ব্যাথা। ছারিয়া। প্রঃশ্বাস। পার্শে। পাকুর। নিরব। নয়ন। নয়ান। আত্তান। বীভ্রূপ। বাশি। ঝির্ন বাশের ফাকে। রাত্রী। চিন্থ। ঠাই। কাণা-করি। ভির। নতোন। বশা। যাত্রি। মুক্ত। কাদে। গাটে করি বাধে। **উত্তর ঃ**—নিজে লিখ।

৯। **শূন্য স্থান পূর্ণ কর এবং কবিতাটি কণ্ঠস্থ কর ঃ**—

কত — আসিল, কত — আসিছে — — আসিবে — ;
ওপারের — নামালে — ছুটে — ক্রেতা
— —প্রভাতের —
শত — সহি —ছল
বিকাল — বিকায় — সহিয়া —ব্যথা।
— নাহি — এল — গেল — ক্রেতা-বিক্রেতা।

কালবৈশাখা (পৃ ৩৭-৪০)

সন্ধি ঃ—"কানন-আনন", দিক্-অন্তে, বেদনা-অধীর, তৃণ-অঙ্কুর, **নীল-অঞ্জন**—(গিরিনিভ) [ছন্দের অনুরোধে সন্ধি হয় নাই। সমাসবদ্ধ সবগুলি পদই তৎসম]। নির্ঘোষ—নিঃ (অথবা নির্) + ঘোষ, রশ্মি ছটা—সন্ধি করিলে 'রশ্মিচ্ছটা' হয়, লালিত্যের জন্য সন্ধি হয় নাই [তুঃ 'প্রসন্ন-মুখছবি'—রবীন্দ্রনাথ] **বনস্পতি—বন + পতি সন্ধিতে 'স্'কার আগম হইয়াছে—অর্থে বৃক্ষ বা বৃহৎ বৃক্ষ [সংজ্ঞাবাচক শব্দে এইরূপ হইয়া থাকে—কিন্তু 'বনপতি' বনের মালিক বা রক্ষক] দ্যুলোক**—দিব্ + লোক। নিশ্চিহ্ন—নিঃ + চিহ্ন। **উচ্ছ্বাস** (সে)—উৎ + শ্বাস। **নিঃশঙ্ক**—নিঃ + শঙ্ক (শঙ্কা হইতে বহুব্রীহি সমাসের অন্তে)। দুর্ধর্ষ—দুঃ + ধর্ষ, নিস্পন্দ—নি + স্পন্দ (কোন সন্ধি নাই)।

সমাস ঃ—কানন-আনন—কাননের আনন (মুখে) ষষ্ঠী তৎপুরুষ। **বনস্পতি**—বনের পতি (ষষ্ঠী তৎপুরুষ) (সন্ধিতে 'স্' কার আগম)। আকাশ কটাহে—আকাশ রূপ কটাহ (রূপক কর্মধারয়—তাহাতে)। ভীমকুণ্ডল—ভীম (ভীষণ) কুণ্ডল (কুণ্ডলের আকারে বেষ্টন = ভীষণাকারে পাকান) যাহার (বহুব্রীহি) জটা শব্দের বিশেষণ। সচল = চল—গতীশীল। [সচলপদে স (সহ) অনাবশ্যক যেহেতু 'চল'—কথা দ্বারাই সচল কথার অর্থ বুঝা যায়—কিন্তু বাঙলায় ইহা চলে]। দ্যুলোক—দিব্ (স্বর্গ) নামক লোক (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। অনাবৃষ্টি—ন (অভাব) বৃষ্টি (= বৃষ্টির অভাব) অভাবার্থে নঞ্ তৎপুরুষ। বাঁধভাঙা—বাঁধকে ভাঙে যে, বাঁধ + ভাঙ + আ (উপপদ তৎপুরুষ), মেঘকজ্জল—মেঘরূপ কজ্জল (রূপক কর্মধারয়)।

আকাশের (নীল)—সমবায় সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি, **নীল—বিশেষণের বিশেষ্য-রূপে প্রয়োগ** (নীল = নীলিমা), বঙ্কিম (বাঁকা) এবং নীল (দুইটি বিশেষণে কর্মধারয় সমাস), আলো ঝলমল—আলোদ্বারা ঝলমল (তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস); মেঘকজ্জল-মেঘরূপ কজ্জল (রূপক কর্মধারয়), তৃণ-অঙ্কুর—তৃণ এবং অঙ্কুর (দ্বন্দ্ব সমাস, সপ্তমী বিভক্তি), কালবৈশাখী = কাল (ভীষণ) যে বৈশাখ (কর্মধারয়) ঝড়, বৃষ্টির সময়। [(তৎসম্বন্ধীয়) কালবৈশাখী] নীল-অঞ্জন-গিরি-নিভ = নীল যে অঞ্জন (সুরমা-কাজল) নীল-অঞ্জন (নীলাঞ্জন—সন্ধির বৈশিষ্ট্য দ্রষ্টব্য) নীল-অঞ্জন নির্মিত গিরি = মধ্যপদলোপী কর্মধারয় অথবা নীল-অঞ্জনের গিরি (ষষ্ঠীতৎপুরুষ) তৎসদৃশ [নিত্য তৎপুরুষ সমাস—নিভা শব্দের সহিত—অস্ব-পদ-বিগ্রহ নিত্য-সমাস—প্রথম খণ্ড] নিশীথনীরব—নিশীথের (মধ্য রাত্রের) মতো নীরব (উপমান কর্মধারয়), ঘনঘোর—(১) ঘন দ্বারা, মেঘ হেতু ঘোর (ভীষণ) = ঘন মেঘাচ্ছন্ন—তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস, (২) অথবা ঘন (নিবিড়) ঘোর (ভীষণ) অন্ধকারে পূর্ণ = নিবিড় ভীষণতাযুক্ত—ছায়া পদের বিশেষণ।

পদটীকা :—পাণ্ডুর—পাণ্ডু + র (স্বার্থে) (মেঘের) ঘটা—সমূহ বহু বচনার্থক ঘটা শব্দের প্রযোগ ; ঘটা শব্দের অর্থ আড়ম্বরও হয়। যথা—'ঘনঘটা'—মেঘাড়ম্বর। যতেক—বিশেষণ—'যে পরিমাণ' **কেবল পদ্যে ব্যবহৃত হয়** [গদ্যে 'যত' শব্দের প্রয়োগ হয়]। **বারুদ**—কামান বন্দুকের মধ্যে ব্যবহৃত বিস্ফোরক চূর্ণ বিশেষ—**তুর্কি শব্দ** [সংস্কৃত নাম—তৎসম শব্দ 'অগ্নিচূর্ণ' (শুক্রনীতি)] নির্ঘোষ—নিঃ (নির্) + √ঘুষ্ + ঘঞ্ (ভাবে) শব্দ। আওয়াজ—শব্দ, ধ্বনি—ফারসী শব্দ। ম্লান— √ম্লৈ + ক্ত (কর্তৃবাচ্যে) মলিন। ছিন্ন— √ছিদ্ + ক্ত (তুঃ ভিন্ন, প্রসন্ন, বিপন্ন, ক্লিন্ন]। ধৌত— √ধাব্ + ক্ত (কর্মবাচ্যে)। অদ্ভুত—ইদম্ √ভূ + দ্ভুত। [প্রভূত, সম্ভূত, ভূত—সবই দীর্ঘ উকার দ্বারা লেখা হয়—কেবল **'অদ্ভুত' লিখিতে হ্রস্ব উকার ব্যবহৃত হয় মনে রাখিবে**]। **জানালা—পোর্তুগীজ শব্দ** [তৎসম 'বাতায়ন', 'গবাক্ষ']। দুর্ধর্ষ—যাহাকে সহজে পরাভূত করা যায় না—দুস্ (দুঃ) + √ধৃষ্ + খল্ (কর্মবাচ্যে) ['খল্' প্রত্যায়ান্ত শব্দ তুলঃ—সুকর, দুষ্কর]। **পিনাকে**—(পিনাক হইতে) অপাদানার্থে অধিকরণ প্রয়োগে, সপ্তমী।

বিশিষ্ট বাগ্‌ভঙ্গি :—(বনস্পতির) 'ভাগ্য মন্দ দেখি', 'নিমেষ গণিছে' ('প্রহর গণা' কড়িকাঠ গণা—তুলনীয়), 'আওয়াজ ডুবিয়া যায়', 'আকাশ ভাঙিয়া পড়া' (মাথার উপর আকাশ ভাঙিয়া পড়া), (ধরার) 'হর্ষ ধরে না'—তুঃ 'মাঠে মাঠে ধান ধরে নাক আর'—রবীন্দ্রনাথ)।

গদ্যরূপ :—যুঝিতেছে—যুদ্ধ করিতেছে, ধাইছে—ধাবিত হইতেছে, **বিদারিছে (উঃ মঃ ১৯৬০)**—বিদীর্ণ করিতেছে, হেরো—দেখ, মুক্তির—মুক্তিকার।

পদান্তর :—ছায়া—ছায়াময়, অন্ধ—আন্ধ্য, অন্ধতা, পাণ্ডুর—পাণ্ডুরতা,

তন্দ্রা—তন্দ্রিত, তন্দ্রালু। নিস্পন্দ—নিস্পন্দতা, ঘ্রাণ—ঘ্রাত, ঘ্রাতব্য, ঘ্রেয়। ধূম—ধূম্রতা, অচল—অচলতা, নির্ঘোষ—নির্ঘোষিত, ম্লান—ম্লানিমা (বিশেষ্য), ধৌত (বিশেষণ)—ধাবন, পঙ্ক (বিশেষ্য)—পঙ্কিল (বিশেষণ), বায়ু—বায়বীয়, মৃদু—মৃদুতা, মার্দব, উল্লাস—উল্লসিত, রস—রসিক, রসাল, রসবান্, মধু—মধুর, কীর্তি—কীর্তিত, কীর্তিমান্; ভীষণ—ভীষণতা।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত বিশিষ্টার্থক পদসমষ্টি দ্বারা সার্থক বাক্য রচনা কর :—'ভাগ্য মন্দ দেখি', 'নিমেষ গণা', 'আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়া, (মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়া)।

২। সাধু ভাষায় প্রতিশব্দ লিখ :—(তৎসম) বারুদ, আওয়াজ, উধাও, দুলিয়া উঠা, ঝড়, জানালা, উথলিছে, জুড়াইয়া, চমকিয়া উঠি। উত্তর ঃ—অগ্নিচূর্ণ, শব্দ, নির্ঘোষ ; নিরুদ্দেশ (উধাও—'ধাইছে উধাও' নিরুদ্দেশ যাত্রা করিতেছে), আন্দোলিত হওয়া, বাত্যা ('দুর্গেশনন্দিনী'—বঙ্কিমচন্দ্র), গবাক্ষ (বাতায়ন), স্ফীত হইতেছে (উদ্বেলিত হইতেছে বিশেষতঃ সাগর সম্বন্ধে উক্তিতে), শান্ত করিয়া, হঠাৎ আতঙ্কিত হই।

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির চলিত ভাষায় প্রতিশব্দ লিখ :—

রক্ত (রক্ত নয়ন), বঙ্কিম, কজ্জল, যবনিকা, রণবাহিনী, পঙ্ক, বিটপী, বিদ্যুৎ, বজ্র, বুক, মৃত্তিকা। উত্তর ঃ—লাল, বাঁকা, কাজল, পর্দা, ফৌজ, পাঁক, গাছ, বিজলী, বাজ, ছাতি, মাটি।

৪। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম কর :—নিশীথনীরব, মেঘকজ্জল, আলো-ঝলমল, আকাশকটাহে, মরুৎপাথার, 'নীল-অঞ্জন গিরি-নিভ'।

৫। ব্যাকরণসংক্রান্ত টীকা লিখ :—'ভয় ভুলে যাই অদ্ভুত উল্লাসে' 'প্রাণভরে', আকাশের নীল (নির্মল হল), শুনি টঙ্কার তাহার পিনাকে, গবাক্ষ, দুর্দ্ধর্ষ দ্যুলোক, উচ্ছ্বাস, বনস্পতি।

৬। ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন কর ঃ—ম্লান, দুর্ধর্ষ, অদ্ভুত, নির্ঘোষ, ধৌত।

৭। বাচ্য পরিবর্তন কর ঃ—(১) মধ্যদিনের রক্ত নয়ন অন্ধ করিল কে! (২) ধরনীর·········কে। (৩) গগন ভরিল কে! (৪) আজিকে যতেক বনস্পতির ভাগ্য দেখি যে মন্দ। (৫) ওই শোন তার ঘোর নির্ঘোষ, দুলিয়া উঠিল জটাভার। (৬) বঙ্কিম নীল অসির ফলকে দেহ হল কার ভিন্ন? (৭) কালো যবনিকা এতক্ষণে হল ছিন্ন। (৮) ফিরে চলে সে রণবাহিনী। (৯) নববর্ষের······কালবৈশাখী আসে। (১০) ভয় ভুলে যাই অদ্ভুত উল্লাসে। (১১) সে আসিছে আজ কালবৈশাখে। উত্তর ঃ— (১) কাহাদ্বারা মধ্যদিনের রক্ত নয়ন অন্ধ করা হইল। (২) ধরণীর উপর কাহাদ্বারা বিরাট ছত্র ধৃত হইল। (৩) কাহাদ্বারা গগন ভরা হইল। (৪) অদ্য যত বনস্পতির ভাগ্য মন্দ দৃষ্ট হয় যে। (৫) ওই তার ঘোর নির্ঘোষ শোনা

(শ্রুত) হউক। জটাভারের দুলিয়া উঠা হইল। (৬) বঙ্কিম নীল অসির ফলক কাহার দেহকে ভিন্ন করিল? (৭) এতক্ষণে কেহ আলোকের মুখে কালো যবনিকাকে ছিন্ন করিল। (৮) সে রণবাহিনীর ফিরিয়া চলা হয়। (৯) নববর্ষের পুণ্যবাসরে কালবৈশাখীর আসা হয়। (১০) অদ্ভুত উল্লাসে ভয় ভুলিয়া যাওয়া হয়। (১১) আজ কালবৈশাখে তাহার আসা হইতেছে। •

৮। **কারণ নির্দেশপূর্বক শুদ্ধ করিয়া লিখ**:—(১) অদ্ভূত উল্লাসে। (২) বজ্রের ধনি। (৩) নিঃস্পন্দন। (৪) মরুদ্‌পাথারে। (৫) দিক্ বারণেরা। (৬) দিক্-অন্তে। (৭) দিবলোকের। (৮) অনাবৃষ্টির অশূরের। (৯) যবনীকা। (১০) উচ্ছাসে। (১১) রণবাহিণী। (১২) নিশঙ্ক। (১৩) "মধু ভরি বুকে মৃত্তির"। (১৪) নিশীথনিরব। **উত্তরের দিগ্‌দর্শনী**:—(১) **'অদ্ভুত' শুদ্ধ** পদ—ইদম্ + ভূ + ডুত = ভূ ধাতুর দীর্ঘ উকার প্রত্যয়ের হ্রস্ব উকারের জন্য হ্রস্ব হইয়াছে [কিন্তু প্রভূত, সম্ভূত, পরাভূত—শুদ্ধ। দীর্ঘ উকার শুদ্ধ কেননা 'ক্ত' প্রত্যয়যোগে ভূ ধাতুর কোন পরিবর্তন হয় নাই]।

(১১) **"রণবাহিনী"** শুদ্ধ। একপদে ণত্ববিধির প্রয়োগ হয়—এখানে সমাস হওয়ায় একাধিক পদ আছে—দ্বিতীয়তঃ, র-কারের পর ট-বর্গ (ণ) ব্যবধান আছে। সুতরাং কোনরূপেই ণত্ববিধি প্রয়োগ করা যায় না। 'বাহিনী' পদের 'ন'—দন্ত্য ন-কারই থাকিবে। (৮) **অনাবৃষ্টির অসুর**—শুদ্ধ। 'অসুর'—সুর বা দেবতা-বিরোধী দানব—দেবতা বৃষ্টি দিয়া থাকেন, দানব তাহাকে বন্ধ করে। 'অশূর' শব্দের অর্থ 'যে বীর নহে'—যে বীর নহে—সে তো দেবতার সঙ্গে যুদ্ধই করিতে পারে না—সুতরাং 'অশূর' কথা এখানে অশুদ্ধ। [বাকিগুলির উত্তর নিজেই দিতে পারিবে]।

ত্রিরত্ন (পৃঃ ৪০—৪৪)

সন্ধি:—দিগ্‌জয়ী—দিক্ + জয়ী। প্রেমাবেশে—প্রেম + আবেশ। রণে-আহ্বান-বাণী—ছন্দের অনুরোধে সন্ধি হয় নাই। গোষ্পদ—গো + পদ (তুঃ আস্পদ)। চরণাশ্রিত—চরণ + আশ্রিত। চতুর্দোলা—চতুঃ + দোলা। পরমাগ্রহে—পরম + আগ্রহে।

সমাস:—'বীরপণ্ডিত'—বীর অথচ পণ্ডিত (দুইটি বিশেষণে কর্মধারয় সমাস), **"বিচারমল্ল"**—বিচার বিষয়ে মল্ল (মল্লের মতো) সপ্তমী তৎপুরুষ, বিজয়পত্রী—বিজয়ের পত্রী, জয়ভিখারী—জয়ে (বিষয়ে) ভিখারী সপ্তমী তৎপুরুষ (তৎসম ও তদ্ভব পদে সমাস), চরণাশ্রিত—চরণকে আশ্রিত (দ্বিতীয়া তৎপুরুষ), জ্ঞানসাগর—জ্ঞানরূপ সাগর (রূপক কর্মধারয়), রণে-আহ্বান-বাণী—রণে-আহ্বান (অলুক্ সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস—ছন্দের অনুরোধে বিভক্তির লোপ হয় নাই—সন্ধিও করা হয় নাই) তাহার বাণী (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। গোষ্পদ—গোর (গোরুর) পদ (পদচিহ্ন) ষষ্ঠী তৎপুরুষ। যশপ্রতিষ্ঠা—যশের প্রতিষ্ঠা (ষষ্ঠীতৎ) অথবা যশোপ্রতিষ্ঠা

(যশরূপ) প্রতিষ্ঠা (রূপক কর্মধারয়)। কুসুমকোমল—কুসুমের মতো কোমল (উপমান কর্মধারয় সমাস)। কঙ্কালসার—কঙ্কাল সার যাহার (বহুব্রীহি)। **অবুঝ**—অ (অবিদ্যমান) বুঝ (সং বুধ্ হইতে জ্ঞান বা প্রবোধ) যাহার, বহুব্রীহি —যে প্রবোধ মানে না।

পদটীকা :—দন্তী—দন্ত + ইন্ (অস্ত্যর্থে) দন্তিন্ শব্দ হইতে দন্তী। ঝাণ্ডা—পতাকা, নিশান (হিন্দী শব্দ)। **চতুর্দোলা**—চতুর্ (চারিব্যক্তি) বাহিত দোলা (**মধ্যপদলোপী** কর্মধারয়)। [কিন্তু 'চতুর্যুগ'—চারি যুগের সমাহার—সমাহার দ্বিগু]। **আগায়**—আগ (সংস্কৃত অগ্র শব্দ হইতে) + আ প্রত্যয়যোগে নাম ধাতু। [তুঃ পিছায়, ঘনায়, পানায়, ইত্যাদি] প্রথম পুরুষ একবচন বর্তমান কাল (**ঐতিহাসিক বর্তমান**)। পাণ্ডিত্য—পণ্ডিতের ভাব বা কার্য পণ্ডিত + ষ্যঞ্। **জ্ঞানসাগরের** (অঞ্জলি)—**অবয়ব-অবয়বিভাব সম্বন্ধে ষষ্ঠী (পূর্ণবস্তু ও** তাহার অংশের সহিত সম্বন্ধে। পাশ্চাত্ত্য ভাষাশাস্ত্রে ইহাকে Partitive genitive বলে)। **অট্টহাস্য**—"হাসিয়া উঠিল" ক্রিয়ার **সমধাতুজ কর্ম** (Cognate object) [তুঃ আকাশের বজ্র ঘোর পরিহাসে **হাসিল অট্টহাস্য**]। শাণিত—শাণ + ইতচ্ (জাতার্থে) যাহাতে শাণের ধার দেওয়া হইয়াছে—ধারাল। [অথবা √শাণ্ + ণিচ্ + ক্ত (কর্মবাচ্যে)। দণ্ডিত— √দণ্ড্ (শাস্তি দেওয়া + ক্ত (কর্মবাচ্যে)। পুলকিত—পুলক + ইতচ্ (জাতার্থে—পুলক আনন্দ জন্মিয়াছে ইহার—তুঃ কুসুমিত, পুষ্পিত, দুঃখিত, মুকুলিত, ইত্যাদি)। **অছিলায়**—হেত্বর্থে তৃতীয়া—'য়' বিভক্তি [**অছিলা—ফারসী শব্দ অর্থ** ছল, ছুতা ও অজুহাত]।

বিশিষ্ট বাগ্‌ভঙ্গি :—প্রেমাবেশে মজা, হৃদয় গলা, অশনি হানা, বুকেধরা।

পদান্তর :—মত্ত—মত্ততা। দেশ—দেশী, দেশীয়। অভিযান—অভিযাত। বিভোর—বিভোরতা। সূর্য—সৌর। বিস্ময়—বিস্মিত। ধৈর্য—ধীর। দম্ভ—দাম্ভিক। তরুণ—তারুণ্য। অভিমানী—অভিমান। তর্ক—তার্কিক। কুতুহলী—কুতুহল। শাণ—শাণিত। খণ্ড—খণ্ডিত। পুলক—পুলকিত। সিক্ত—সেচন। শুচি—শৌচ। শূকর—শৌকর (বিশেষণ)। কোপ—কুপিত। মর্ম—মার্মিক। সহিষ্ণু—সহিষ্ণুতা।

লিঙ্গান্তর :—দিগ্‌জয়ী—দিগ্‌জয়িনী। দন্তী—দন্তিনী। অশ্ব—অশ্বা। চারণ—চারণী। পণ্ডিত—পণ্ডিতা, (বাংলায়) পণ্ডিতানী, পণ্ডিতপত্নী। অনুচর—অনুচরী। ভিখারী—ভিখারিণী। সূর্য—সূর্যা, সূরী। শিষ্য—শিষ্যা। তরুণ—তরুণী। অভিমানী—অভিমানিনী। কেশরী—কেশরিণী। বাহক—বাহিকা। শূকর—শূকরী। বৈষ্ণব—বৈষ্ণবী। সহিষ্ণু—সহিষ্ণু। দীনতর—দীনতরা।

গদ্যরূপ :—ফুকারি—উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া। সরি—সরিয়া। করি—করিয়া। জিনে—জয় করিয়া। মোরে—আমাকে। বারতা—বার্তা। রূপ আর সনাতনে—রূপ আর সনাতনকে। তব—তোমার। পড়ি—পড়িয়া। গরব—গর্ব। গুরুরেও—গুরুকেও। **জিনিবারে** (উঃ মঃ ১৯৬০)—জয় করিতে। মোরা—আমরা।

তোমায়—তোমাকে। পরশ—স্পর্শ। **দোঁহে** (উঃ মঃ ১৯৬০)—দুইজনে। হেন—এইরূপ। **চুম্বিয়া**—চুম্বন করিয়া। **তিতিল** (উঃ মঃ ১৯৬০)—ভিজিল।

অনুশীলনী

১। বাক্য রচনা কর :—'প্রেমাবেশে মজা', 'হৃদয় গলা', 'অশনি হানা', 'বুকে ধরা', 'হার মানা'।

২। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম কর ঃ—চতুর্দোলা, চরণাশ্রিত, কুসুমকোমল, কঙ্কালসার, অবুঝ, গোষ্পদ।

৩। ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন কর :—মূঢ়, শাণিত, পুলকিত, বৈষ্ণব, অপরাধী।

৪। 'মজা', 'গলা', 'হানা', 'ধরা',—এই কয়টি শব্দের বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ দেখাইয়া বাক্য রচনা কর। **উত্তর ঃ—মজা (বিশেষ্যপদ)**—আমোদ, আনন্দ ও কৌতুক। (১) **মজা টের পাওয়া**—বিপদে পড়া—(১) তোমরা ছেলেরা খুব আমোদে আছ; একটু পরে মজা টের পাবে। (২) **মজা দেখা**—অন্যের বিপদে আনন্দ অনুভব করা। অপরে অসুবিধায় পড়লে দূর থেকে মজা দেখবার লোকের অভাব হয় না। (৩) **মজা মারা**—আমোদ বা আনন্দ উপভোগ করা। কালো-বাজারের কারবার করে যেমন **মজা মারছ**, তেমনি কিছুদিন পরে এর **মজাও টের পাবে**। **মজা (ক্রিয়াপদ)**—অভিভূত বা আসক্ত হওয়া। (১) ভক্ত ভগবানের প্রেমাবেশে মজে। (২) গ্রামের পুকুরে জলের অভাব হইয়াছে—কারণ অনেক পুকুর মজিয়া গিয়াছে (=কাদাতে ভরিয়া উঠা)। (৩) আম একেবারে মজিয়া গিয়াছে (=অতিরিক্ত পাকিয়া বা গলিয়া যাইবার অবস্থায় পরিণত হইয়াছে)। (৪) সীতা হরণ করিয়া রাবণ স্ববংশে মজিল (সর্বনাশগ্রস্ত)। (৫) অন্যায় কার্য করিয়া তুমি তোমার **কুল মজাইয়াছ** (=কুল কলঙ্কিত করিয়াছ)। **মজা (বিশেষণ)** (১) বাজারে **মজা** কলা কেহ কিনিতে চায় না (=অতিরিক্ত পাকা)। (২) **মজা** নদীর পারের এক কালের ঘনবসতিপূর্ণ গ্রাম এখন উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে (=বালিতে ভরিয়া উঠা নদী)। **গলা—ক্রিয়াপদ** (সাধারণ অর্থ দ্রবীভূত হওয়া)—(১) প্রফুল্লের মুখের ভাল কথাগুলি শুনিয়া শাশুড়ী স্নেহে গলিয়া গেলেন (=অভিভূত হওয়া)। (২) লোকটা এত কৃপণ যে তাহার ডান হাত দিয়া পরের জন্য কখনও এক পয়সাও গলে নাই (=ফাঁক দিয়া বাহির হওয়া)। (৩) দরজা বা জানালা বলিয়া এ ঘরে একটা ছিদ্র আছে বটে, কিন্তু তাহাতে মানুষের মাথা গলে না (=প্রবেশ করা)। (৪) এতদিন পরে তাহার হাতের ফোঁড়াটা গলিয়া গেল (=ফাটিয়া গেল)। **বিশেষণরূপে**—পচা **গলা** আম কেহ পয়সা দিয়ে কেনে না। মায়ের **গলা** মন আর ছেলের প্রতি কঠিন হইতে পারে না। কৃপণের হাতে **গলা** পয়সা যত্ন করে রাখবে বৈকি। **হানা ক্রিয়াপদ**—(মরিবার জন্য অস্ত্র নিক্ষেপ করা)। (১) "পিতা এ বিদীর্ণ বুকে আর হানিয়োনা বজ্র!" ('বিসর্জন'—রবীন্দ্রনাথ)। (২)

বিদেশী শত্রু দেশের প্রান্তে হানা দিয়াছে (=অস্ফালনসহ আক্রমণ)। বিশেষ্য —(৩) অপরাধীকে ধরিবার জন্য পুলিশের হানা এ বাড়ীর উপর পড়িয়াছে (আগমন) অথবা, অপরাধীকে ধরিবার জন্য পুলিস এ বাড়ীতে হানা দিয়াছে। বিশেষণরূপে—(অপদেবতা দ্বারা আক্রান্ত)। এ প্রাচীন গ্রামে কয়েকটি হানা বাড়ি আছে। •ধরা—বিশিষ্ট প্রয়োগের জন্য (প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠপর্ব,দ্রষ্টব্য)।

৫। ব্যাকরণ সংক্রান্ত টীকা লিখ:—(ক) পথের জনতা ভয়ে-বিস্ময়ে দু'ধারে দাঁড়ায় সরি। (খ) সিক্ত বসনে শ্রীজীব …ফিরেছেন। (গ) অট্টহাস্য হাসিয়া উঠিল পণ্ডিত……।

৬। সাধু (তৎসম) শব্দদ্বারা নিম্নলিখিত শব্দগুলির প্রতিশব্দ লিখ:—ঝাণ্ডা, ফুকারী, রটিয়াছে ভিখারী, হার মেনেছে, ঠাঁই, অছিলা, অবুঝ, সোজা উত্তর ঃ— পতাকা, আহ্বান করিয়া, প্রচারিত হইয়াছে, ভিক্ষুক, পরাজয় স্বীকার করিয়াছে, স্থান, ছল, নির্বোধ, সরল।

৭। 'খণ্ডিত', 'দণ্ডিত', 'পণ্ডিত',—এই তিনটি শব্দের ব্যুৎপত্তি কি একই প্রকার? যদি না হইয়া থাকে তবে ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন কর। উত্তর ঃ—খণ্ড্, দণ্ড্, ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে ক্ত। কিন্তু পণ্ডা+ইতচ্ (জাতার্থে)।

৮। পদান্তরে পরিবর্তিত কর:—সহিষ্ণু, দীন, গুরু, উপদেশ, দয়া, পণ্ডিত, ধৈর্য, শাণিত, দাম্ভিক, তৃতীয়, প্রতিষ্ঠা, ক্ষয়, মুখ, ব্যথা, বিকৃতি, প্রয়োজন, বর্জন, বড়ো, অভিমান, বোষ, মৃদু, স্থান, মূঢ়, রজ (স), শুচি, পুলকিত। উত্তর ঃ—সহিষ্ণুতা, দীনতা, গৌরব, উপদিষ্ট, দয়াবান্, পাণ্ডিত্য, ধীর, শাণ, দাম্ভিকতা, ত্রয়ী, প্রতিষ্ঠিত, ক্ষত, মুখ্য, ব্যথিত, বিকার, প্রযোজনীয়, বর্জিত, বড়াই, অভিমানী, রুষ্ট, মৃদুতা, স্থিত, মূঢ়তা, রাজসিক, শুচিতা, পুলক।

৯। উপযুক্ত পদদ্বারা শূন্যস্থান পূর্ণ কর:—"তরু—যেবা—সহিষ্ণু, তৃণ হতে দীনতর, সেই বৈষ্ণব জয়গৌরব—না—বড়ো।"

১০। লিঙ্গান্তরে পরিবর্তিত কর:—পণ্ডিত, অশ্ব, অনুচর, সনাতন, চারণ, ভিখারী, শিষ্য, গুরু, অভিমানী, বৈষ্ণব, অপরাধী। উঃ—পণ্ডিতা, অশ্বা, অনুচরী, সনাতনী, চারণী, ভিখারিণী, শিষ্যা, গুরু (গুর্বী), অভিমানিনী, বৈষ্ণবী অপরাধিনী।

১১। বাচ্য পরিবর্তন কর ঃ—(১) চতুর্দোলায় পণ্ডিত দোলে বিজয়মাল্য গলে। (২) ভয়ে সবে পুঁথিপত্র গুটায়। (৩) (দুইভাই) বিজয়পত্রী লিখিয়া দিলেন জয়ভিখারীর করে। (৪) বিনা বিচারেই হার মেনেছেন রূপ আর সনাতন। (৫) যাদের কুঞ্জে তুমি দিগ্‌গজ, করেছিলে অভিযান। (৬) অট্টহাস্য হাসিয়া উঠিল পণ্ডিত অভিমানী। (৭) শেষে ডুবিব কি গোস্পদে? (৮) ব্রজদাসিগণ জানাল এ কথা—বিজয়বারতা রূপ আর সনাতনে। (৯) যশপ্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা মেখে এসে সারা গায়। (১০) শ্রীহরির নাম জপে অবিরাম। (১১) জয়গৌরব

ভাবে না কভু সে বড়। (১২) বারবার তার ললাট চুমিয়া জুড়ায়ে দিলেন ক্ষত। উত্তর ঃ—(১) বিজয়মাল্যগলে পণ্ডিতের চতুর্দোলায় দোলা হয়। (২) ভয়ে সকলের পুঁথিপত্র গুটান হয়। (৩) জয়ভিখারীর করে বিজয়পত্র লিখিয়া দত্ত হইল। (৪) বিনা বিচারেই রূপ আর সনাতনের হার মানা হয়েছে। (৫) হে দিগ্‌গজ, যাহাদের কুঞ্জে তোমার অভিযান করা হয়েছিল। (৬) অভিমানী পণ্ডিতের অট্টহাস্যে হাসিয়া উঠা হইল। (৭) শেষে কি গোষ্পদে ডুবা হইবে? (৮) ব্রজবাসিগণকর্তৃক এই বিজয়বার্তার কথা রূপসনাতনকে জ্ঞাপিত করা হইল। (৯) তোমার সারা গায়ে শূকরীবিষ্ঠা যশপ্রতিষ্ঠা মাখিয়া আসা হইল। (১০) তাহার অবিরাম শ্রীহরির নাম জপ করা হয়। (১১) তাহাদ্বারা কখনও জয়গৌরব বড় ভাবা হয় না। (১২) বারবার ললাট চুম্বন করিয়া তাহার ক্ষত জুড়াইয়া দেওয়া হইল।

১২। **উক্তি পরিবর্তন কর** ঃ—(১) বলিলেন রূপ······এই ব্রজধাম। (পৃঃ ৪২) (২) শ্রীজীবের দশা দেখে সনাতন মর্মে·······অপরাধ। (পৃঃ ৪৩) (৩) এ কথা শুনিয়া·········এ মূঢ়ের অবিচারে। (পৃঃ ৪৪) (৪) শুনি সনাতন·· ······ দোষ কিছু নাই তায়। (পৃঃ ৪৩) উত্তর ঃ—(১) শ্রীরূপ জীবের পিছনে অনেক কোলাহল শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া নিজেই তাহার উত্তরে বলিলেন, জীব যমুনায় স্নান করিয়া শুচি হইয়া আসেন নাই—কেননা শূকরী বিষ্ঠারূপ যশপ্রতিষ্ঠা সারা গায়ে মাখিয়া আসিয়াছেন। তারপর শ্রীরূপ, শ্রীজীবকে বৃথা পালন করিয়াছেন আর রাজসভা তাঁহার সুযোগ্য স্থান—ব্রজধামে তাঁহার থাকা উচিত নহে বলিয়া ঘৃণায় তাঁহার (শ্রীজীবের) মুখ দর্শন করিতে অস্বীকার করিলেন। (২) শ্রীজীবের দশা দেখিয়া সনাতন মর্মে ব্যথা পাইলেন, তাঁহার (শ্রীজীবের) কাতরতা তাঁহার অন্তরকে ব্যথিত করিল। তখন তিনি মৃদুস্বরে জীবের পক্ষ সমর্থন করিয়া বিরূপ শ্রীরূপকে চুপেচুপে বুঝাইলেন যে, তিনি শ্রীজীবকে ত্যাগ করিবার কোনও কারণ খুঁজিয়া পান না, আর বৈষ্ণবগুরু হইয়াও তাঁহার বুদ্ধি এইরূপ বিকৃত হইল কেন ইহাও তিনি বুঝেন না, কারণ গুরুমর্যাদা রক্ষা করাই শ্রীজীবের সাধ ছিল, ইহার বেশি গুরুতর অপরাধ তিনি করেন নাই। (৩) এ কথা শুনিয়া রূপ চমকিয়া উঠিয়া বিস্ময় ও অনুতাপের স্বরে কাঁদিয়া তাহার অপেক্ষা নিজেকেই বেশি অপরাধী স্থির করিলেন, কারণ তিনি বৈষ্ণব হইয়াও নিজ সন্তানকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই এবং না বুঝিয়া জীবের কুসুমকোমল প্রাণে অশনির আঘাত হানিয়াছেন। ইহার পর তাঁহার জীবকে দ্রুত ডাকিয়া আনিবার জন্য, ভাইকে কাতর অনুরোধ করিলেন, কারণ মূঢ় তাঁহার অবিচারে সে অনেক যাতনা পাইতেছে। (৪) সনাতন (এই কথা শুনিয়া হাসির সহিত মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া ভাইকে (রূপকে) কহিলেন তাঁহাদের সন্তান জীব তখন পর্যন্ত বালকস্বভাব, তিনি অভিমান জয় করিতে পারেন নাই ইহা সত্য। কিন্তু তাঁহার পিতা এবং গুরু তিনি বৈষ্ণব হইয়াও সেদিন পর্যন্ত, রোষ জয় না করিতে পারায় তাঁহার কিছু দোষ অবশ্যই হয়।

১৩। **অনুক্ত স্থান পূর্ণ কর ঃ**

(ক) বিজয়গর্বে — পণ্ডিত — ফিরে,
— তখন — উপরে উঠিতেছে — —।
পথের — — — দুধারে দাঁড়ায় —
সিক্ত বসনে — তখন ফিরেছেন — —।
সম্মুখে — দাঁড়ালেন — শুনিয়া —
'— বিচারেই — মেনেছেন — আর — ।'

(খ) এল — — বীরপণ্ডিত — —,
যেন — মত্ত — পঙ্কজ বনে —।
অশ্বমুণ্ডে — ঝাণ্ডা — ফুকারি —,
চতুর্দোলায় — দোলে — — গলে।

কাণ্ডারী হু সিয়ার (পৃঃ ৪৫-৪৬)

সন্ধি ঃ—দুর্গম—দুঃ + গম, দুস্তর—দুঃ + তর, পরীক্ষা—পরি + ঈক্ষা, পুনর্বার—পুনঃ + বার, সন্তরণ—সম্ + তরণ। যুগযুগান্ত—যুগযুগ + অন্ত।

সমাস ঃ রাত্রি-নিশীথে—রাত্রির নিশীথে (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। [নিশীথ শব্দের অর্থই 'মধ্যরাত্র' বা 'অর্ধরাত্র'। সুতরাং রাত্রি শব্দের প্রযোগ অনাবশ্যক। পূর্বপদে রাত্রি শব্দের প্রয়োগ দ্বারা বুঝিতে হইবে 'নিশীথ'—শব্দ 'মধ্য'—অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে]। তিমিররাত্রি—তিমির (অন্ধকারময়) যে রাত্রি (কর্মধারয় সমাস) ['তিমির'—অন্ধকার বিশেষ্য পদ, এখানে বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে]। মাতৃ-মন্ত্রী—মাতৃ (মাতার) মন্ত্র—মাতৃ—সম্বন্ধীয় মন্ত্র ষষ্ঠীতৎপুরুষ। মাতৃমন্ত্র আছে যাহার মাতৃমন্ত্র + ইন্ 'মাতৃমন্ত্রের সাধক'। **সাবধান** (উ. মা. ১৯৬২)—অবধানের (মনোযোগ সতর্কতা) সহিত বর্তমান (তুল্যযোগে বহুব্রীহি)—অব্যয়পদ (Interjection) যুগযুগান্তসঞ্চিত—যুগ এবং যুগান্ত (দ্বন্দ্ব) তাহাতে সঞ্চিত (সপ্তমী তৎপুরুষ)। গিরিসংকট—গিরির সংকট (পর্বত মধ্যবর্তী দুর্গম পথ—Mountain Pass) গিরিবর্ত্ম ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস। পশ্চাৎ-পথ যাত্রী—পথের যাত্রী (ষষ্ঠী তৎপুরুষ), পথযাত্রী—পশ্চাদ্‌বর্তী পথযাত্রী—মধ্যপদলোপী কর্মধারয়। পথমাঝ—পথের মাঝ (মধ্য—ষষ্ঠী তৎপুরুষ) [তদ্ভব পদের সহিত তৎসম পদের সমাস। তুঃ 'বক্ষোমাঝে' 'মনোমাঝে' ইত্যাদি]। **দিবাকর**—দিবা (দিবসে প্রাণিগণকে চেষ্টাযুক্ত করেন যিনি (উপপদ তৎপুরুষ)—সূর্য, দিবা + √কৃ + ট (কর্তৃবাচ্যে) [তুঃ ভাস্কর, নিশাকর, প্রভাকর, ইত্যাদি]। মাতৃমুক্তি পণ—মাতার মুক্তি—মাতৃমুক্তি (ষষ্ঠী তৎপুরুষ, তাহাতে (সেই বিষয়ে) পণ (সপ্তমীতৎ)।

পদটীকা ঃ—কাণ্ডারী—সংস্কৃত 'কর্ণধারী' হইতে [কর্ণ = নৌকার হাল, উহা ধারণ করে যে—হালের মাঝি]। **হুঁশিয়ার**—হিন্দী 'হোশিয়ার' [চালাক, বুদ্ধিমান্—শব্দ হইতে]। বাঙলায় অর্থ "সাবধান"—অব্যয় পদ (Inter-

jection), বাঙলায় অর্থের পরিবর্তন ও উচ্চারণে অনুনাসিক বর্ণের সংযোগ হইয়াছে। হাল—(হাইল, হালি) নৌকার গতি নিয়ন্ত্রণ করিবার যন্ত্র—সংস্কৃতে 'কর্ণ'। হিম্মৎ—ক্ষমতা, বীরত্ব, সাহস [আরবী শব্দ]। জোয়ান—বলবান্ ব্যক্তি (ফারসী 'জবান' শব্দ হইতে)। আগুয়ান—অগ্রসর ['অগ্র'—শব্দ হইতে 'আগু', উহা হইতে বিশেষণ আগুয়ান]। **তুফান**—প্রবল ঝড—সংস্কৃত **'বাত্যা'** [আরবী 'তুফান', গ্রীক 'তুফোন', 'চীনদেশীয' তাইফুঙ্' (Typhoon)] **সান্ত্রী** [**সংস্কৃত শব্দ নহে**] প্রহরী, রক্ষী ইংরাজী Sentry শব্দ হইতে [তুঃ— 'হাসপাতাল', 'লাট', 'গেলাস' ইত্যাদি]। **ফেনাইয়া**—ফেন + (শব্দ হইতে নামধাতু) আ + ইয়া প্রত্যয়। **গরজায়**—বাংলা √'গর্জা' (সং √গর্জ্জ হইতে) বর্তমান কাল, প্রথন পুরুষের ক্রিয়া কর্মকর্তৃবাচ্য। গুরু **শূন্য বিভক্তি ক্রিয়া-বিশেষণে** [ঠিক সংস্কৃতের মতো প্রয়োগ : সংস্কৃতে ক্রিযাবিশেষণে ক্লীবলিঙ্গের দ্বিতীয়ার একবচন হয়। উকাবান্ত শব্দে দ্বিতীযার চিহ্ন—অম্—(ম্) বিলুপ্ত হয়। এখানেও ঠিক তাহাই হইযাছে। বাঙলায় ক্রিয়াবিশেষণে তৃতীয়া—'এ' বিভক্তি হয়]। বাজ—বজ্র [তদ্ভব শব্দ—সংস্কৃত 'বজ্র' শব্দ হইতে]। **হানাহানি**—শব্দদ্বৈত, পরস্পব হানা (আঘাত কবা) (ব্যতিহার বহুব্রীহি)। **খুন**—রক্ত, **ফারসী** 'খুন্' শব্দ হইতে [বাঙলায সাধাবণতঃ 'হত্যা' অর্থে খুন শব্দের ব্যবহার হয—যেমন 'খুন করা']। **খঞ্জর**—তলোযাব বা ছোরা (আরবী শব্দ)। ফাঁসি —(ফাঁসী, ফাঁসি) গলায় ফাঁস আটিয়া মৃত্যুদণ্ড (সং 'পাশ'>(প্রথম বর্ণ স্থানে দ্বিতীয় বর্ণ) ফাঁস<('পাশ'—দড়ি) + ই স্বতেঃঅনুনাসিকত্ব হইয়াছে Spontaneous nasalisation সংস্কৃত মূল শব্দে অনুনাসিক (ঁ) নাই—তুঃ আঁখি, পঙ্খী (ময়ুরপঙ্খী নৌকা) (হিন্দীতে সাঁপ)—সং উদ্বন্ধন। **জাতি**—জন্মভূমি, রাষ্ট্র, ভাষা, ধর্ম প্রভৃতির সমতা অনুসারে বিভক্ত মনুষ্য সমাজ বিশেষ (Nation) √জন্ + ক্তি (কর্তৃবাচ্যে) জাত্—বর্ণ [ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ] সংস্কৃত 'জাতি' শব্দ হইতে 'জাত্'।

বিশিষ্ট বাগ্‌ভঙ্গি ঃ—'পাড়ি দেওয়া', তরী পারে নেওয়া' সাথে সাথে নেওয়া, সন্দেহ জাগা। [সাথধরা, সাথ নেওয়া—এইগুলি বাঙলা ভাষার সিদ্ধ প্রযোগ শুদ্ধতার নিয়ামক]।

গদ্যরূপ ঃ—গরজায়—গর্জন করে, লজ্মিতে—লঙ্ঘন করিতে, মরিছে—মরিতেছে, ঘোষিতেছে—ঘোষণা করিয়াছে, সাথে—সঙ্গে, রাঙিয়া (উঃ মাঃ ১৯৬০)—রঞ্জিত হইয়া।

ব্যুৎপত্তি ঃ—দুর্গম—দুঃ + √গম্ + খল্ (কর্মবাচ্যে) ; দুস্তর—দুঃ + √তৃ + খল্ (কর্মবাচ্যে) ; যাত্রা—যাত্রী + ইন্ ; মাতৃমন্ত্রী—(মাতৃ) মন্ত্র + ইন্ = মন্ত্রিন্—মন্ত্রী [মাতার বা মাতৃসম্বন্ধীয় মন্ত্র = মাতৃমন্ত্র + ইন্ , বঞ্চিত— √বঞ্চ্ + ক্ত ; অভিযান—অভি√যা + অনট্ (ভাবে) ; অধিকার—অধি— √কৃ + ঘঞ্ (ভাবে) ;

সন্তরণ—সম্—√তৃ+অনট্ (ভাবে)। দিবাকর—দিবা√কৃ+ট (কর্তৃবাচ্যে); ত্রাণ—√ত্রৈ+অনট্ (ভাবে)। অভিমান—অভি-মন্+ঘঞ্ (ভাবে)। সন্দেহ-সম-দিহ্+ঘঞ্ (ভাবে)।

পদান্তরঃ—দুর্গম—দুর্গমতা; দুস্তর—দুস্তরতা; যাত্রী—যাত্রা; মন্ত্রী—মন্ত্র; বঞ্চিত—বঞ্চনা; অধিকার—অধিকৃত. অভিমান—অভিমানী; সন্দেহ—সন্দিগ্ধ; ত্রাণ—ত্রাত; খুন—খুনে, খুনী। হুঁশিয়ার—হুঁশিয়ারী।

লিঙ্গান্তরঃ দুর্গম—দুর্গমা; দুস্তর—দুস্তরা; যাত্রী—যাত্রিণী: মাতৃমন্ত্রী—মাতৃ-মন্ত্রিণী।

প্রতিশব্দঃ পারাবার—সমুদ্র, জলধি, পয়োধি, সিন্ধু, সাগর, রত্নাকর, তোয়নিধি, বারিনিধি, সরিৎপতি। **গিরি**—পর্বত, অচল, ভূধর, মহীধর, শৈল।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে বাংলা শব্দসম্ভারের বিভিন্ন শ্রেণী অনুসারে বিভক্ত করিয়া তৎসম শব্দে ইহাদের প্রতিশব্দ লিখ:—আগুয়ান কাণ্ডারী হুঁশিয়ার, খঞ্জর, হিম্মত, জাত, তুফান, সান্ত্রী, বাজ, ফাঁসি। **উত্তর**ঃ—তদ্ভব আগুয়ান, কাণ্ডারী, জাত্, বাজ, ফাঁসি। বিদেশী—হুঁশিয়ার, সান্ত্রী (উঃ মাঃ ১৯৬২), খঞ্জর, হিম্মৎ, তুফান।

২। চলিত ভাষায় প্রতিশব্দ দাও:—গিরি, নিশীথ, পুঞ্জিত, সন্তরণ, প্রান্তর, মঞ্চ। উঃ—পাহাড়, মাঝরাত, জড়, সাঁতার, মাঠ, মাচা।

৩। ব্যাকরণ সংক্রান্ত টীকা লিখ:—(ক) **ফেনাইয়া উঠে** ...অভিমান। (খ) **গুরু গরজায়** বাজ। (গ) বাঙালীর **খুনে** লাল হল যেথা...খঞ্জর। (গ) জাতির অথবা **জাতের** করিবে ত্রাণ। (ঙ) **সান্ত্রীরা সাবধান**।

৪। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লিখ:—রাত্রি-নিশীথে, মাতৃমুক্তিপণ, পশ্চাৎ-পথ-যাত্রীর, হানাহানি, দিবাকর।

৫। নিম্নলিখিত পদযুগলের অর্থের পার্থক্য দেখাইয়া বাক্য রচনা কর:— **জোয়ান, যোয়ান; তরি, তরী; পারি, পাড়ি; মাতৃমন্ত্রী, রাজমন্ত্রী; জাতি, জাত্।**

৬। ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন কর:—দুর্গম, দুস্তর, অভিমান, সন্তরণ, দিবাকর।

৭। নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিভিন্নার্থে প্রয়োগ দেখাইয়া বাক্য রচনা কর:— **হাল, বাজ, সংকট, খুন, জীবন, পরীক্ষা।** **হাল**—(১) **হালের** মাঝি ঠিক থাকলে নৌকা ঠিক পথেই চলে (নৌকার 'কর্ণ')। (২) কৃষকের হালের গোরু দুটোকে দেনার দায়ে মহাজন নিয়ে গেল (=লাঙ্গল)। (৩) বাপের টাকা দিয়ে তুমি রাজার **হালে** থাকতে পার (=অবস্থা)। (৪) **হালে বড়লোক** হয়েছ কিনা তাই বড় বড় কথা বল (=সম্প্রতি)। **হাল** ফ্যাসানের গয়না মেয়েদের চাই (হাল =আধুনিক)। বাজ—কালবৈশাখীর দিনে কার মাথায় কখন বাজ (বজ্র) পড়ে

তার ঠিক নাই। আমাদের জবাগাছে একটা বাজ (পাখি বিশেষ—শ্যেন) বসিয়াছিল। **সংকট**—আমাদের পরিবারের এই সংকটে (=কঠিন বিপদ) একমাত্র ঈশ্বর রক্ষাকর্তা। খাইবার **গিরিসংকট** দিয়া বহুবার ভারতে বিদেশী শত্রু প্রবেশ করিয়াছে। (অতি সংকীর্ণ পথ—Mountain Pass) **খুন**—(ক) পলাশিতে বাঙালির খুনে ক্লাইবের খঞ্জর লাল হ'ল (কবিতায়—নজরুল ইস্‌লামের প্রয়োগ, গদ্যে 'রক্ত' অর্থে খুন শব্দের প্রয়োগ বিশেষ দেখা যায় না)। (খ) যাকে তাকে **খুন করলেই** বীর হওয়া যায় না। (খুন করা=হত্যা করা)। (গ) ছোট ছেলে মায়ের জন্য **কেঁদে খুন হ'ল** (আকুল হওয়া), কিন্তু তার জন্য মা মোটেই ব্যস্ত হলেন না। (ঘ) প্রতারককে নিজের হাতে শাস্তি দিবার জন্য ভদ্রলোকের সেদিন **খুন চড়িল (চাপিল)** (মাথায় রক্ত উঠিল, অত্যন্ত উত্তেজিত হইলেন)। **জীবন**—(ক) ভদ্রলোকের জীবন (আয়ু) শেষ হইয়া আসিয়াছে। (খ) আমি আজীবন (=জীবনকাল) আপনার সেবা করিব। (গ) কেবল পুতুল তৈয়ারিই তাহার জীবনোপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে (জীবন=জীবিকা)। (ঘ) জলের অপর নাম জীবন (জীবন=জল)। "ভাসিছে সহস্র রবি **জাহ্নবী-জীবনে**"—(নবীনচন্দ্র সেন) (জাহ্নবীজীবনে=গঙ্গার জলে)। **পরীক্ষা**—(ক) শহরের লোক রত্নপরীক্ষা করাইতে গ্রামে যায় না (পরীক্ষা=যাচাই)। (খ) হস্তিনানগরে অস্ত্র পরীক্ষার দিনের কথা কুন্তির মনে উদিত হইল (পরীক্ষা=**যোগ্যতানিরূপণ**)। (গ) তিন বন্ধুতে ভাগ্য পরীক্ষার জন্য বিদেশে বাহির হইলেন (ক্রিয়া দ্বারা স্বরূপ নিরূপণ)। (ঘ) পাটের উপর বহুদিন হইতে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চলিয়া আসিতেছে (=গবেষণা)।

৮। উপযুক্ত পদ বসাইয়া শূন্য স্থান পূর্ণ কর:—[এক বা একাধিক পদ বসাও]

(ক) "ফাঁসির—গেয়ে গেল— —জয়গান
আসি অলক্ষ্যে—তারা, দিবে—বলিদান ?
আজি পরীক্ষা,—অথবা জাতের করিবে ত্রাণ ?
দুলিতেছে তরী—জল, —, হুঁশিয়ার।"

(খ) তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী—, সাবধান।
যুগযুগান্তসঞ্চিত—ঘোষিয়াছে অভিযান।

(গ) —জাতি মরিছে—, জানে—সন্তরণ,
কাণ্ডারী। —দেখিব—মাতৃমুক্তিরপণ।'

৯। **অশুদ্ধি শোধন কর**ঃ—দুর্গম। মরু। রাত্রী নিশিথে। যাত্রীরা হুশিয়ার। ছিড়িয়াছে পাল। হিম্মোৎ॥ পুনর্ব্বার, কে আছ যোয়ান। হাকিছে ভবিষ্যৎ। এ তুফোন ভারি দিতে হবে পারি। তীমির রাত্রি। ফেণাইয়া উঠে। পুঞ্জিত অভিমান। মাতৃ-মুক্তি-পোন। গিরীসংকট। ভিন্ন যাত্রিরা। গুরু গুরু

গরজায় বাজ। পশ্চাদ্‌পথযাত্রী। ফাঁসির মঞ্চ। আসি অলক্ষে দাঁড়ায়েছে তাঁরা। স্নান। কাণ্ডারী হুঁসিয়ার।

১০। **বাচ্য পরিবর্তন কর ঃ**—(১) দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ, ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল? (২) যুগ যুগ সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান। (৩) অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ। (৪) ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর। (৫) উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার। **উত্তর ঃ**—(১) তরীর দোলা হইতেছে, জলের ফুলা হইতেছে, মাঝির পথ ভুলা হইতেছে, পালের ছেঁড়া হইয়াছে কাহাদ্বারা হাল ধরা হইবে? (২) যুগযুগান্ত সঞ্চিত ব্যথাদ্বারা অভিযান ঘোষিত হইয়াছে। (৩) অসহায় জাতির ডুবিয়া মরা হইতেছে, তাহার সন্তরণ জানা নাই। (৪) হায়! ঐ গঙ্গায় ভারতের দিবাকরের ডুবা হইয়াছে। (৫) আমাদের খুনে রঞ্জিত হইয়া সে রবির আবার উঠা হইবে।

১১। **উক্তি পরিবর্তন কর ঃ**—(১) দুর্গম গিরি······তরী পার। (২) গিরি-সংকট······নিয়াছে যে মহাভার। **উত্তর ঃ**—(পরোক্ষ) (১) কবি বলিতেছেন নিশীথ রাত্রিতে দুর্গম গিরি মরু-কান্তার, দুস্তর পারাবার লঙ্ঘন করিতে হইবে,—যাত্রীরা যেন সতর্ক থাকেন। তরী দুলিতেছে, জল ফুলিতেছে, মাঝি পথ ভুলিতেছে, পাল ছিঁড়িয়াছে, হাল ধরিবার জন্য যাহার হিম্মৎ আছে এইরূপ লোককে তিনি ডাকিতেছেন। ভবিষ্যৎ (কাল) জোয়ানকে অগ্রসর হইবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান জানাইতেছে, কারণ ঐ তুফান ভারী কিন্তু তাহাকেই পাড়ি দিয়া (সাগরের) পরপারে তরীখানিকে নিতে হইবে। (২) কবি কাণ্ডারীকে সম্বোধন করিয়া আবেদন জানাইতেছেন—গিরিসংকট রহিয়াছে, যাত্রীরা ভীরু; বজ্রের গুরু গর্জন হইতেছে। এই সময় পশ্চাৎপথযাত্রীর মনেও সন্দেহ জাগিতেছে। এরূপ অবস্থায় (কাণ্ডারীকে) তাঁহকে পথ ভুলিলেও চলিবে না, আর পথের মধ্যে সবকিছু ছাড়িলেও চলিবে না—তিনি যে মহাভার গ্রহণ করিয়াছেন, সেই হানাহানির মধ্যেও তাঁহাকে উহা টানিয়া লইয়া চলিতে হইবে।

প্রতিভা (পৃঃ ৬৩-৬৭)

সন্ধি ঃ—প্রথমোক্ত (দিগকে) = প্রথম + উক্ত। অন্যাবিষ্কৃত = অন্য + আবিষ্কৃত। অন্যোদ্ভাবিত = অন্য + উদ্ভাবিত। আদ্যন্ত = আদি + অন্ত। দেবানুগৃহীত = দেব + অনুগৃহীত। (শিক্ষা) নিরপেক্ষ = নিঃ + অপেক্ষ। অত্যাশ্চর্য = অতি + আশ্চর্য। মনস্তুষ্টিসাধনার্থ = মনঃ + তুষ্টিসাধন + অর্থ। (শিক্ষা) ব্যতিরেকে = বি + অতিরেকে। ব্যুৎপত্তি = বি + উৎপত্তি। পর্যাপ্ত = পরি + আপ্ত। মনোযোগ = মনঃ + যোগ (মনযোগ নহে)। ছন্দোগ্রন্থনে = ছন্দঃ + গ্রন্থনে ('ছন্দগ্রন্থনে' নহে)। অল্পায়াসসাধ্য = অল্প + আয়াসসাধ্য। পুরাতনাতিরিক্ত = পুরাতন + অতিরিক্ত। পুনরুদ্ধার = পুনঃ + উদ্ধার।

সমাস ঃ—অন্যোদ্ভাবিত—অন্য (লোক) দ্বারা উদ্ভাবিত তৃতীয়া তৎপুরুষ। **কর্মক্ষম**—কার্যে ক্ষম ('সক্ষম' নহে—সমর্থ) সপ্তমী তৎপুরুষ। **শিক্ষা-নিরপেক্ষ**—নিঃ (নাই) অপেক্ষা যাহাতে (বহুব্রীহি) শিক্ষায় (শিক্ষা বিষয়ে) (উঃ মাঃ ১৯৬০) বা শিক্ষাতে নিরপেক্ষ সপ্তমী তৎপুরুষ। **অকিঞ্চিৎকর**—ন কিঞ্চিৎ (যাহা কিছুই নহে—তুচ্ছ) অকিঞ্চিৎ (নঞ্ তৎপুরুষ) অকিঞ্চিৎ করে যে (অকিঞ্চিৎকর—হেতুভূত) উপপদ তৎপুরুষ (অকিঞ্চিৎ + √কৃ + ট প্রত্যয় হেত্বর্থে)। সর্ববিদ্যাবিশারদ—সর্ব (সকল) বিদ্যা (কর্মধারয়) সর্ব বিদ্যায় বিশারদ (সপ্তমী তৎপুরুষ)। বল্লরী-পল্লব বিভূষিত—বল্লরী এবং পল্লব (দ্বন্দ্বসমাস) তদ্দারা বিভূষিত (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। অন্তরাত্মাস্বরূপ—অন্তর্ (ভিতরের, ভিতরকার) আত্মা (কর্মধারয় বা ষষ্ঠীতৎপুরুষ) অন্তরাত্মা স্বরূপ যাহার (বহুব্রীহি) অভিনবতত্ত্বমন্দির—তত্ত্বরূপ মন্দির (রূপক কর্মধারয়) অভিনব যে তত্ত্বমন্দির (কর্মধারয়)। **ভাবরত্নাকর** (উঃ মাঃ ১৯৬২) ভাবরূপ রত্নাকর (সমুদ্র) রূপক কর্মধারয। রত্নের আকর—রত্নাকর (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)।

পদটীকা ঃ—প্রাধান্য = প্রধান + ষ্যঞ্ (ভাবার্থে) প্রধানের ভাব। পণ্ডিত—পণ্ডা + ইতচ্ (জাতার্থে), **সৃষ্টিশক্তিতে** (বঞ্চিত)—হীনার্থক (বঞ্চিত) শব্দ যোগে তৃতীযা—'তে' বিভক্তি। **বাল্মীকি** (উঃ মঃ ১৯৬২)—বল্মীক (উঁইয়ের ঢিবি) হইতে জাত—বল্মীক + ইঞ্ (জাতার্থে) ["বাল্মিকী" নহে]। (সরস্বতীর) প্রসাদে—হেত্বর্থে তৃতীয়া—এ বিভক্তি। আকস্মিক—অকস্মাৎ + ইক। মোহিত—মোহ + ইতচ্ (তদ্ধিত প্রত্যয় জাতার্থে) অথবা √মুহ্ + ণিচ্ (প্রেরণার্থক) + ক্ত (কর্মবাচ্যে) [**যেখানে কৃৎ এবং তদ্ধিত উভয়প্রকার প্রত্যয় দ্বারা একটি শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখান যাইতে পারে, সেখানে তদ্ধিত প্রত্যয়ের ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।**] বৈযাকরণ—ব্যাকরণ (শাস্ত্র) যিনি জানেন বা অধ্যয়ন করেন, ব্যাকরণ + অণ্। পক্ষপাতী—পক্ষ + √পত্ + ণিন্ (কর্তৃবাচ্যে)। গ্রাহ্য—গ্রহ + ণ্যৎ (য, কর্মবাচ্য)—গ্রহণের যোগ্য।

লিঙ্গান্তর ঃ—পুরাতন—পুরাতনী। নূতনপথদর্শী—নূতনপথদর্শিনী। দক্ষ—দক্ষা। অলংকৃত—অলংকৃতা। প্রতিভাশালী—প্রতিভাশালিনী। ঈদৃশ—ঈদৃশী। ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টিকারী—ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টিকারিণী। রঙ্গময়—রঙ্গময়ী। বিদ্যাবান্—বিদ্যাবতী। প্রণেতা—প্রণেত্রী। আকস্মিক—আকস্মিকী। অনৈসর্গিক—অনৈসর্গিকী। মনোহর—মনোহরা। শৈলময়—শৈলময়ী। বন্ধুর—বন্ধুরা। কষ্টকর—কষ্টকরী। অধিকারী—অধিকারিণী। পক্ষপাতী—পক্ষপাতিনী।

পদান্তর ঃ—প্রধান—প্রাধান্য। বিভক্ত—বিভাগ। দক্ষ—দক্ষতা। অলংকৃত—অলংকার। গণ্য—গণনা। বিদ্যা—বিদ্যাবতী। প্রতিভা—প্রতিভাবান্। মিথ্যা—মিথ্যুক। বন্ধুর—বন্ধুরতা। শৈলময় (বিশেষণ)—শৈল। প্রফুল্ল—প্রফুল্লতা। স্বভাব—স্বাভাবিক। অশিক্ষিত—অশিক্ষা। অভিনয়—অভিনীত। অধ্যয়ন—অধীত। শক্তি—শাক্ত। স্বীকার—স্বীকৃত। মনোযোগ—মনোযোগী। ব্যাকরণ—

বৈয়াকরণ। স্মরণ—স্মৃত। সহকারী—সহকারিতা। তত্ত্ব—তাত্ত্বিক। শিক্ষা—শিক্ষিত। সন্তুষ্ট—সন্তোষ। পারদর্শী—পারদর্শিতা। অধিকার—অধিকৃত।

ব্যুৎপত্তি ঃ—পাণ্ডিত্য—পণ্ডিত + ষ্যঞ্ (ভাবার্থে)। বৈয়াকরণ—ব্যাকরণ + অণ্। পর্যাপ্ত—পরি—আপ + ক্ত (কর্মবাচ্যে)। স্বাভাবিক—স্বভাব + ষ্ণিক। আকস্মিক—অকস্মাৎ + ষ্ণিক। সাহায্য—সহায় + ষ্যঞ্। নিমগ্ন—নি— √মস্জ্ + ক্ত কর্তৃবাচ্যে)।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীতার্থবোধক শব্দ দ্বারা বাক্য রচনা কর :—আবিষ্কৃত, গ্রাহ্য, আদি, নিরপেক্ষ, আশ্চর্য, তুষ্টিসাধন, পর্যাপ্ত, মনোযোগ, পুরাতন, অভ্যাস, প্রকাশ। **উত্তর ঃ**—আবিষ্কৃত—উদ্ভাবিত। গ্রাহ্য—ত্যাজ্য। আদি—অন্ত। নিরপেক্ষ—সাপেক্ষ। আশ্চর্য—নিত্য। তুষ্টিসাধন—বিরক্তি-উৎপাদন। পর্যাপ্ত—স্বল্প **(অপর্যাপ্ত নহে)**। মনোযোগ—অমনোযোগ, উদাসীনতা। পুরাতন—নবীন। অভ্যাস—অনভ্যাস। প্রকাশ—গোপন।

২। **সংক্ষিপ্ত করিয়া লিখ ঃ**—যিনি ব্যাকরণ জানেন, গ্রহণ করিবার যোগ্য, কার্য করিবার সামর্থ্য যাহার আছে, দেবতা যাহার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন, **শিক্ষার** (উঃ মাঃ ১৯৬০) **উপর যাহা নির্ভর করে না**, সেই কালের, অল্প চেষ্টায় যাহা করিতে পারা যায়, পার দর্শন করিয়াছেন যিনি, অনেক বিদ্যা জানা আছে যাঁহার (স্ত্রীলিঙ্গে), যাহার কোন দরকার নাই, আগে থেকে যা'র সঙ্গে পরিচয় আছে, অপরে যাহা উদ্ভাবন করিয়াছে।

৩। **একটি সরল বাক্যে** পরিণত কর :—"সেক্ষপিয়র (সেক্সপিয়র) কল্পনা পুত্র ·····ছিল।" **উত্তর ঃ**—লোকদৃষ্টিতে অশিক্ষিত, 'কল্পনার পুত্র' সেক্ষপিয়রের নাটক-নিচয়-পাঠে তাঁহার নাটকাভিনয় দর্শনসহ বহুবিধ ইংরেজীগ্রন্থ চর্চার প্রমাণ পাওয়া যায়।

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে বিভক্তিযোগ ব্যতীত অন্য উপায়ে বহুবচনের অর্থে ব্যবহার কর :—মনুষ্য, নাটক, কার্য, বন, নিকুঞ্জ, পণ্ডিত, উদ্যান, প্রসূন। **উত্তর ঃ**—মনুষ্যজাতি, নাটকাবলি, কার্যজাত, বনরাজি, নিকুঞ্জরাজি, পণ্ডিতকুল, উদ্যানমালা, প্রসূনগুচ্ছ।

৫। নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে বিভিন্নার্থে প্রয়োগ করিয়া বাক্য রচনা কর :—**পদ, প্রকৃতি, পাঠ, অভিনয়।**

উত্তরের নমুনা ঃ—পদ (১) গুরুর পদে প্রণাম জানাই **(পদ = চরণ)**। (২) জীবনের প্রতি-পদে **(পদক্ষেপে)** মানুষের বাধা আসে। (৩) আমি মহাজনের পদাঙ্কসরণমাত্র করিতেছি (= পায়ের দাগ)। (৪) বাসুদেব ঘোষ শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ রচনা করিয়াছেন (বৈষ্ণব গীতি-কবিতা)। (৫) একটিমাত্র পদের জন্য হাজার লোক প্রার্থী হইয়াছে (পদ = চাকরি)। (৬) ভোজে ছয়টি পদ

পরিবেশন করা হইয়াছিল (বিভিন্ন প্রকারের বস্তু)। (৭) সংস্কৃত পদ্য সাধারণতঃ চতুষ্পদী (শ্লোকের চারি ভাগের একভাগ)। বাকিগুলির উত্তর নিজে লিখ।

৬। ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন কর :—পাণ্ডিত্য, বৈয়াকরণ, পর্যাপ্ত, স্বাভাবিক, আকস্মিক, সাহায্য, নিমগ্ন।

৭। 'পর্যাপ্ত' এবং 'অপর্যাপ্ত' এই দুইটি শব্দের অর্থের পার্থক্য আছে কি ? না থাকিলে উদাহরণসহ কারণ দেখাও। **উত্তর ঃ**—কতকগুলি প্রয়োগে ইহাদের অর্থের প্রভেদ নাই—অন্যত্র আছে। **পর্যাপ্ত**—প্রচুর, অধিক। (ক) বাজারে এবার **পর্যাপ্ত** আম উঠিয়াছে। (খ) **অপর্যাপ্ত**—প্রচুর, অধিক। শরৎকালে পদ্মদীঘিতে অপর্যাপ্ত পদ্মফুল ফুটিয়াছে। **মন্তব্য—এখানে 'অ' নেতিবাচক নহে, স্বার্থ বা অধিকার্থে 'অ'-কারের প্রয়োগ** হইয়াছে। [তুঃ অঘোর=ঘোর, অকুমারী=কুমারী, অরঙ্গা=রঙীন] **নিষেধার্থক বা নেতিবাচক** 'অ'—গ্রামের ছোট স্কুলটিতে তিনশত ছাত্রের পড়িবার স্থান অপর্যাপ্ত (=পর্যাপ্ত নহে, যথেষ্ট সংখ্যক নহে)'[এখানে অর্থের প্রভেদ আছে]।

৮। **বাচ্য পরিবর্তন কর ঃ**—(১) ভূমণ্ডলে যে সকল লোক প্রাধান্য লাভ করেন, তাঁহাদিগকে দুই দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (২) প্রথমোক্তদিগকে দক্ষ বা পারদর্শী এবং শেষোক্তদিগকে প্রতিভাশালী বলা যায়। (৩) আদ্যান্ত রামায়ণ যাঁহার কণ্ঠস্থ, এবং কথাবার্তায় ও লিখনপঠনে যিনি রামায়ণের শ্লোক উদ্ধৃত করিতে পারেন, তিনি যত কেন ক্ষমতাপন্ন হউন না তাঁহার ঈদৃশী দক্ষতা আদি কবি বাল্মীকির নূতন ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টিকারিণী প্রতিভা হইতে কত বিভিন্ন। (৪) পূর্বকালে প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ দেবানুগৃহীত বলিয়া গণ্য হইতেন। (৫) সৃষ্টিকর্তা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি দিয়াছেন। (৬) তিনি রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণাদি পড়িয়াছিলেন। (৭) ভট্টিকার বৈয়াকরণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারেন, কিন্তু কে তাঁহাকে রঘুবংশ রচয়িতার সহিত তুলনা করিবে ? (৮) কিন্তু স্মরণদ্বারা পূর্বপরিচিত তত্ত্বের পুনরুদ্ধার হয়, নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার হয় না। (৯) এই জন্যই আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, প্রতিভা শিক্ষা-নিরপেক্ষ নহে।

উত্তর ঃ—(১) ভূমণ্ডলে যে সকল লোক কর্তৃক প্রাধান্য লব্ধ হয়, তাঁহাদিগকে আমরা দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিতে পারি। (২) প্রথমোক্তদিগকে দক্ষ বা পারদর্শী এবং শেষোক্তদিগকে প্রতিভাশালী বলি। (৩) আদ্যান্ত রামায়ণ যৎকর্তৃক (বা যাহাদ্বারা) কণ্ঠস্থীকৃত, এবং কথাবার্তায় ও লিখন-পঠনে যাঁহাদ্বারা রামায়ণের শ্লোক উদ্ধৃত হইতে পারে, তাঁহাদ্বারা যত কেন ক্ষমতা অধিগত হউক না কেন, তাঁহার ঈদৃশী দক্ষতা আদি কবি বাল্মীকির নূতন ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টিকারিণী প্রতিভা হইতে কত বিভিন্ন। (৪) পূর্বকালে লোকে প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণকে দেবানুগৃহীত বলিয়া গণনা করিত। (৫) সৃষ্টিকর্তাদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি দত্ত হইয়াছে। (৬) তৎকর্তৃক রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণাদি পঠিত হইয়াছিল। (৭) লোকে ভট্টিকারকে বৈয়াকরণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে,

কিন্তু কাহাদ্বারা তিনি রঘুবংশ-রচয়িতার সহিত তুলিত হইতে পারেন ? (৮) কিন্তু লোকে স্মরণদ্বারা পূর্বপরিচিত তত্ত্বকে পুনরায় উদ্ধার করিতে পারে, নূতন তত্ত্বকে আবিষ্কার করিতে পারে না। (৯) এই জন্যই পূর্বে আমাদের দ্বারা উক্ত হইয়াছে যে প্রতিভা শিক্ষা-নিরপেক্ষ নহে।

৯। **নির্দেশ অনুসারে পরিবর্তন কর** ঃ—(১) কেহ বা বল্লরীপল্লবভূষিত নিকুঞ্জে মনস্তুষ্টি সাধনার্থ আশ্রয় লইলেন (সমাসবদ্ধ পদ দুইটিকে বিশ্লিষ্ট করিয়া লেখ)। (২) যত্নশীলই রত্নলাভে অধিকারী (মিশ্রবাক্যে পরিবর্তন কর)। (৩) প্রতিভা শিক্ষানিরপেক্ষ দেবদত্ত শক্তি (সমাসবদ্ধ পদটিকে বিশ্লিষ্ট করিয়া লেখ)। (৪) কেহ বা তরুলতা, বন্ধুর গিরি কষ্টকর বোধ করিয়া প্রসূনপরিপূরিত বল্লরীপল্লববিভূষিত নিকুঞ্জে মনস্তুষ্টিসাধনার্থ আশ্রয় লইবে। (চলতি কথায়) (৫) ভট্টিকার বৈয়াকরণ বলিযা গ্রাহ্য হইতে পারেন (সম্প্রসারণ কর)। (৬) যদি আমি তুমি কবিতা লিখিতে অভ্যাস করি, তাহা হইলে কি কালিদাস হইতে পারিব ? (অস্ত্যর্থক বাক্যে)। **উত্তর** ঃ—(১) কেহবা যে স্থান নিকুঞ্জ বল্লরী এবং পল্লবদ্বারা ভূষিত হইয়াছে, সেখানে মনের তুষ্টি সাধনের জন্য আশ্রয় লইলেন। (সমাস বিশ্লেষণ)। (২) যে ব্যক্তি যত্নশীল সেই রত্নলাভে অধিকারী (মিশ্র বাক্য)। (৩) প্রতিভা শিক্ষাকে অপেক্ষা করে না, ইহা দেবদ্বারা দত্ত শক্তি। **অথবা** দেবদত্ত শক্তি প্রতিভা শিক্ষাব অপেক্ষা রাখে না। (৪) কেউ বা, গাছ-লতা, উঁচু-নীচু পাহাড় (ভালো না লাগায়) কষ্টের কারণ মনে করে, ফুলেভরা লতায়-পল্লবে সাজান নিকুঞ্জে, মনকে খুশি করার জন্যে আশ্রয় নেবে। (চলিত ভাষায়)। (৫) ব্যাকরণের সূত্রের উদাহরণ দ্বারা বাক্য রচনা করায় ভট্টিকাব বৈয়াকরণ বলিয়া গ্রাহ্য ইহতে পারেন। (৬) কবিতা লেখা অভ্যাস করিলেও তোমার আমার কালিদাস হওয়া সম্ভাব্যতার বাহিরে বা অতীত।

স্বাদেশিকতা (পৃঃ ৮২-৮৮)

সন্ধি ঃ—হাস্যোচ্ছ্বাস—হাস্য + উচ্ছ্বাস (উৎ + শ্বাস)।

সমাস ঃ—স্বদেশপ্রেম—স্ব (নিজ বা নিজের) দেশ (কর্মধারয় সমাস) স্বদেশে প্রেম (সপ্তমী তৎপুরুষ) অথবা স্বদেশের জন্য প্রেম (চতুর্থী তৎপুরুষ)। রবাহূত—রব (শব্দ) দ্বারা আহূত (তৃতীয়া তৎপুরুষ)—অনিমন্ত্রিত। **ভরপুরমাত্রায়**—ভর (ভরা) এবং পুরা (পূর্ণ) দুইটি বিশেষণে কর্মধারয়—[তুঃ 'পাকাপোক্ত'] ভরপুরমাত্রা যাহাতে এরূপ ক্রিয়া—ক্রিয়াবিশেষণে—'য়' (তৃতীয়া) বিভক্তি। **বউ-ঠাকুরানী**—বউ (বধূ) অথচ (সম্মানিত মহিলা) ঠাকুরানী [কর্মধারয় সমাস উভয়-পদ বিশেষ্য] জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ। **শশব্যস্ত**—শশের (খরগোশের) মতো ব্যস্ত (উপমান কর্মধারয় সমাস)। **অন্তঃশীলা (উঃ মাঃ ১৯৬০, ১৯৬২)**—অন্তঃ সলিল যাহার, স্ত্রীলিঙ্গে —বহুব্রীহি = অন্তঃসলিলা, বাঙ্‌লায় অন্তঃশীলা (স্থিতি পরিবৃত্তি ও বর্ণলোপে)।

শব্দটীকা ঃ—আন্তরিক—অন্তরে জাত—অন্তর + ইক। মাতৃভাষার (চর্চা)—

কৃদ্‌যোগে কর্মে ষষ্ঠী। স্বাদেশিক=স্বদেশহিতৈষী—স্বদেশ+ইক। **পোড়ো** (বাড়ি) —পতিত, অব্যবহৃত বাং √পড়্ (সং পত্)+উয়া>পোড়ো বা পড়ো ['সর্দার পোড়ো'—এখানে পাঠকারী বা ছাত্র √পড়্ (সং পঠ্+উয়া>ও ছাত্রদিগের প্রধান] **অর্বাচীন**—পশ্চাদ্‌বর্তী, নবীন, অপরিণত বুদ্ধি—অর্বাচ্+ঈন—'আনাড়ী'। **খ্যাপামি**—ক্ষেপা (বিশেষণ) খেপা, খ্যাপা (ক্ষিপ্ত, পাগল)+আমি (ভাব বা কার্যার্থে) [তুঃ **জেঠামি, চোরামি, পাগলামি, পাকামি** ইত্যাদি] সাঙ্গ—সম্পূর্ণ-সমাপ্ত, অঙ্গের সহিত বর্তমান (তুল্যযোগ বহুব্রীহি) **লুচি** (তরকারী=লুচি এবং **তরকারী**) (মূল ফারসী শব্দ হইতে) [**সমাস হয় নাই—সমুচ্চয়ার্থক এবং বা 'ও' শব্দের অপ্রয়োগ হইয়াছে**—সংস্কৃত ভাষায় এরূপ প্রয়োগ আছে। ইংরেজিতে ইহাকে বলা হয় 'Asyndeton'—ইহা একপ্রকার অলংকারের মধ্যে গণ্য হয়। বাংলায় **'ডাল ভাত' 'শাক-চচ্চড়ি' 'থোড় বড়ি ঘংট'—প্রভৃতি স্থলে 'এবং' শব্দের প্রয়োগ নাই**]। **গাড়ি করা**=গাড়ি **ভাড়া করা** [কর্ ধাতুর বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ দ্রষ্টব্য। 'ফোন করা', 'হাত করা', 'ঘর করা', 'নাম করা'—প্রথম খণ্ড, (তৃতীয় অধ্যায়, ষষ্ঠ পর্ব)।] **তারা ফুটিয়াছে**=তারা প্রকাশিত হইয়াছে [বিভিন্নার্থে বিশিষ্ট প্রয়োগ অনুশীলনীতে দেখ]। **মুঠা-মুঠা—শব্দদ্বৈত, বহুবচনের অর্থে দ্বিত্ব।** **আগুনের** ('হরির লুট')=উপাদান সম্বন্ধে ষষ্ঠী 'হরির লুঠ'—অলুক্ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস। **খ্যাংরা** (বানান—'খেঙ্‌রা', 'খেঙরা', 'খ্যাঙ্‌রা', 'খাংরা')=সংস্কৃত 'খিঙ্গরী' শব্দ হইতে ঝাঁটা, সম্মার্জনী [খ্যাংরার কাঠি (ষষ্ঠীতৎ) কাঠি='কাষ্ঠিকা' হইতে 'শলাকা'। **হাতে**—অপাদানে সপ্তমী—'এ' বা তৃতীয়া—এ বিভক্তি (হাতে=হাত হইতে)। **গামছা**—গা+মুছ্ (বাংলা ধাতু)+আ (করণ বাচ্যে) যাহাদ্বারা গা মোছা যায়। সন্দিগ্ধতা—সম্+ √দিহ্+ক্ত=সন্দিগ্ধ+তা—সন্দেহের ভাব। সুবুদ্ধি—সু (ভালো) বুদ্ধি যাহার [**সুবুদ্ধিমান নহে**] বহুব্রীহি সমাস। বৈপরীত্য—বিপরীতের ভাব—বিপরীত+ষ্যঞ্। **মোড়ক**—পুরিয়া, প্যাকেট, বাঙ্‌লা √ মুড্+অক (-কৃৎপ্রত্যয়) [তুঃ—চড়ক, টনক, সড়ক, ফটক (ফাটক)]। **প্রবীণতা**—প্রবীণ+তা (ভাবে), অর্থ—বহুদর্শিতা, নিপুণতা [**'প্রবীণ' শব্দের মূল অর্থ হইতেছে প্র (প্রকৃষ্ট, উত্তম)** বীণাতে (বীণা বাদনে)—**যিনি ভাল বীণা-বাদক। অর্থের প্রসারে নিপুণ'** অভিজ্ঞ]। **বাহিরের** (প্রবীণতা)=বাহ্য (প্রবীণতা) **বিশেষণ সম্বন্ধে ষষ্ঠী [তুঃ চারের পৃষ্ঠা]** অথবা **সম্বন্ধ সামান্যে ষষ্ঠী।** চিরদিন—**ব্যাপ্তি-অর্থে শূন্য দ্বিতীয়া বিভক্তি।** তাজা—[ফারসী শব্দ] না (বয়সের গাম্ভীর্য) **না=অব্যয় পদ—'অথবা' 'কিংবা—অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে।** [বিভিন্ন অর্থে 'না' শব্দের প্রয়োগের উদাহরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে]। (শ্রদ্ধার) **বেগে**—ক্রিয়াবিশেষণে তৃতীয়া-'এ' বিভক্তি। **মাটির (মানুষ)**—উপাদান সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি (মুখ্যার্থে মাটি দিয়া তৈয়ার করা মানুষ—গৌণার্থে—অত্যন্ত সহিষ্ণু (মাটির মতো ও শান্ত প্রকৃতির মানুষ)।

(দেশের সমস্ত) খর্বতা দীনতা অপমানকে—'এবং' বা 'ও' শব্দের প্রয়োগ করা হয় নাই (Asyndeton)।

বিশিষ্টার্থক বাগভঙ্গি :—'দূরে ঠেকাইয়া রাখা', 'খ্যাপামির তপ্ত হাওয়া', "(সকল প্রকার) রাস্তা মারা," (অভিনয়) 'সাঙ্গ হওয়া', 'শিকার করা,' "শশব্যস্ত হওয়া," (ঝড়ের হাওয়ার) 'মাতামাতি', "মুঠামুঠা আগুনের হরির লুঠ", (চুলে) 'পাকধরা', 'দলে ভিড়া', 'মাটির মানুষ' 'ধাক্কা সামলান', 'বাজারে চলা', 'জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়া', 'গান ধরা', 'গলায় সুর লাগা', 'কণ্ঠে সুরখেলা' 'গলা ছাড়িয়া দেওয়া', 'সভা বসা'।

পদান্তর :—অন্তর—আন্তরিক। শ্রদ্ধা-শ্রদ্ধেয়। ভক্তি—ভক্ত। শিল্প—শিল্পী। পঠিত—পাঠ, পঠন। সভা—সভ্য। খ্যাপা—খ্যাপামি। সন্দিগ্ধ—সন্দিগ্ধতা। নিবেদন—নিবেদিত। উপবাস—উপবাসী।

লিঙ্গান্তর :—পিতৃদেব—মাতৃদেবী। শিক্ষিত—শিক্ষিতা। কর্মকর্তা—কর্মকর্ত্রী। শ্রোতা—শ্রোত্রী। অর্বাচীন—অর্বাচীনা। পক্ষী—পক্ষিণী। বউঠাকুরাণী—দাদা। মালী—মালিনী। নিষ্ঠাবান্—নিষ্ঠাবতী। ছাত্র—ছাত্রী, ছাত্রা।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দযুগলের অর্থের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া বাক্য রচনা কর :—মত, মতো ; লজ্জা, সংকোচ ; পাক, পাঁক ; শিকার, স্বীকার ; মুঠা, মুঠি ; কাঠ, কাঠি ; ফুটো (ফুটা), ফোঁটা।

২। স্বরচিত বাক্যে ব্যবহার কর :—'মাটির মানুষ', 'রাস্তা মারা', 'পাক ধরা', 'দলে ভিড়া', 'দূরে ঠেকাইয়া রাখা'।

৩। বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ কর :—পড়ো, মাটি, নিবেদন, মারা, বসা, 'না', ফোটা, ভিড়া।

৪। ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন কর :—গামছা, মোডক, বৈপরীত্য, সন্দিগ্ধতা, অর্বাচীন, খ্যাপামি, স্বাদেশিক।

৫। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম কর :—শশব্যস্ত, রবাহূত, বউঠাকুরানী, ভরপুরমাত্রায়, স্বদেশপ্রেম।

৬। ব্যাকরণ সংক্রান্ত টীকা লিখ :—(ক) এদিকে তিনি মাটির মানুষ...... পরিপূর্ণ ছিলেন। (খ) ঝড়ের হাওয়া মাতামাতি করিতে লাগিল। (গ) দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন।

৭। (ক) 'সুবুদ্ধি'-পদ 'সুবুদ্ধিমান্' হইবে কি?—না হইলে কারণ নির্দেশ কর। (খ) 'প্রবীণতা' শব্দের পদগত মূল অর্থের বিচার করিয়া অর্থ পরিবর্তনের কারণ নির্দেশ কর।

৮। সাধুভাষায় প্রতিশব্দ লিখ :—খ্যাংরা, গাড়ি, কাঠি, দেশালাই, গামছা, হাওয়া, ঝড়, পোড়ো (বাড়ি), ভিড়, খাটো, জিনিস।

৯। **চিহ্নিত** পদের পরিবর্তে নামধাতু প্রয়োগ কর :—ব্রজবাবুর মাথার চুলে **পাক ধরিয়াছে।** উঃ—পাকিতে আরম্ভ করিয়াছে।

১০। **নির্দেশ অনুসারে পরিবর্তন কর**ঃ—(১) উচ্চ-নীচ নির্বিচারে একত্র মিলিয়া লুচির পাত্রটিকে মাত্র বাকি রাখিতাম (সমাস ভাঙিয়া এবং ক্রিয়াপদে 'না' যোগ করিয়া রূপান্তরিত কর)। (২) সেই পূর্বস্মৃতির আলোচনা করিয়া আজ আমরা হাসিতেছি (আলোচনাকে কর্তৃপদে ব্যবহার কর)। (৩) ব্রজবাবুর মাথার চুলে পাক ধরিযাছে (পাক-এর বদলে নামধাতুর ক্রিযা ব্যবহার করিয়া)। (৪) ব্রজবাবু কহিলেন, 'আচ্ছা, ডাব পাড়িয়া আন্।' (উক্তি পরিবর্তন) (৫) দেশালাই তৈরি করিতে হইবে, তাহাব কাঠি পাওয়া শক্ত (সরল বাক্য)। (৬) এই সভায় আমবা এমন একটি খ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে ছিলাম যে অহরহ উৎসাহে যেন আমবা উড়িযা চলিতাম (সরল বাক্য)। (৭) ইনি মালীকে ডাকিযা কহিলেন, 'ওরে, ইতিমধ্যে মামা কি বাগানে আসিযাছিলেন? মালী তাঁহাকে শশব্যস্ত হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "আজ্ঞা না, বাবু তো আসে নাই" (উক্তি পরিবর্তন)। (৮) শ্রোতাদের মধ্যে নবীন সেন মহাশয উপস্থিত ছিলেন (জটিল বাক্যে)। **উত্তর**ঃ—(১) উঁচু-নীচু বিচার না করিয়া একত্র মিলিয়া লুচির পাত্রটি ছাডা আর কিছু বাকি রাখিতাম না। (২) সেই পূর্বস্মৃতির আলোচনা আজ আমাদের হাসির খোরাক যোগাইতেছে **অথবা**, সেই পূর্বস্মৃতির আলোচনা আজ আমাদিগকে হাসাইতেছে **অথবা**, সেই পূর্বস্মৃতির আলোচনা আজ আমাদের হাসি উদ্রিক্ত করিতেছে। (৩) ব্রজবাবুব মাথাব চুল পাকিতে আবম্ভ করিয়াছে **অথবা**, ব্রজবাবুর মাথাব চুল কিছু পাকিয়াছে। (৪) ব্রজবাবু তাহার উত্তর মানিয়া লইয়া (মালীকে) ডাব পাড়িযা আনিবার হুকুম দিলেন। (৫) তৈয়ারি করিবার দেশলাই-এর কাঠি পাওয়া শক্ত। (৬) এই সভায় খ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে অহরহ উৎসাহে আমবা যেন উড়িয়া চলিতাম। (৭) তিনি মালিকে ডাকিয়া, ঐ সময়ের মধ্যে তাঁহার মামার বাগানে আসিবার সংবাদ জানিতে চাহিলে, সে (মালী) সসম্মানে তাঁহাকে নেতিসূচক উত্তর দিল। (৮) যাঁহারা শ্রোতা ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন।

১১। **বাচ্য পরিবর্তন কর**ঃ—(১) তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশ প্রেমের সঞ্চার করিযা রাখিয়া দিয়াছিল। (২) আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্ট হইয়াছিল। (৩) মেজদাদা এই সময়ে বিখ্যাত জাতীয়সঙ্গীত 'মিলে সবে ভারত-সন্তান' রচনা করিয়াছিলেন। (৪) এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশীশিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত এবং দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত। (৫) সেটা পড়িয়াছিলাম হিন্দুমেলার গাছের তলায় দাঁড়াইয়া। (৬) সেই সভার সমস্ত অনুষ্ঠান রহস্যে আবৃত ছিল। (৭) তাহা আমাদের আত্মীয়রাও জানিতেন না। (৮) অহরহ উৎসাহে যেন আমরা উড়িয়া চলিতাম। (৯) সেই পূর্বস্মৃতির

আলোচনা করিয়া আজ আমরা হাসিতেছি। (১০) আমরা হত আহত পশু-পক্ষীর অতি তুচ্ছ অভাব কিছুমাত্র অনুভব করিতাম না। (১১) বউ-ঠাকুরানী রাশীকৃত লুচি-তরকারী প্রস্তুত করিয়া আমাদের সঙ্গে দিতেন। (১২) ঐ জিনিসটাকে শিকার করিয়া সংগ্রহ করিতে হইত না বলিয়া আমাদিগকে একদিনও উপবাস করিতে হয় নাই। (১৩) সেই ঝড়ে গঙ্গার ঘাটে দাঁড়াইয়া চীৎকার শব্দে আমরা গান জুড়িয়া দিলাম। (১৪) অনেক রাত্রে গাড়ি করিয়া বাড়ি ফিরিলাম। (১৫) গেলাম তাহার কল দেখিতে। (১৬) একদিকে তিনি আপনার জীবন এবং সংসারটিকে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন, আর একদিকে দেশের উন্নতিসাধন করিবার জন্য তিনি সর্বদাই কতরকম সাধ্য ও অসাধ্য প্ল্যান করিতেন তাহার অন্ত নাই।

উত্তর ঃ—তাহাদ্বারাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশ-প্রেমের সঞ্চার করিয়া রাখা হইয়াছিল। (২) (উদ্‌যোগিগণ) আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। (৩) মেঁজদাদাদ্বারা এই সময়ে বিখ্যাত জাতীয়-সঙ্গীত 'মিলে সবে ভারতসন্তান' রচিত হইয়াছিল। (৪) এই মেলায় (যোগদানকারিগণ) দেশের স্তবগান গাহিতেন, দেশানুরাগের কবিতা পাঠ করিতেন, দেশীশিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শন করিতেন এবং কর্তৃপক্ষ দেশী গুণিলোকদিগকে পুরস্কার দিতেন। (৫) সেটা পঠিত হইয়াছিল হিন্দুমেলার গাছের তলায় দাঁড়াইয়া। (৬) (উদ্‌যোগিগণ) সেই সভার সমস্ত অনুষ্ঠানকে রহস্যে ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন বা আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। (৭) তাহা আমাদের আত্মীয়দেরও অজানা ছিল। (৮) অহরহ উৎসাহে যেন আমাদের উড়িয়া চলা হইত। (৯) সেই পূর্বস্মৃতি আলোচিত হওয়ায় আজ আমাদের হাসি পাইতেছে (=হাসা হইতেছে)। (১০) আমাদেরদ্বারা হত আহত পশুপক্ষীর অতি তুচ্ছ অভাব অনুভূত হইত না। (১১) বউঠাকুরানীদ্বারা প্রস্তুত রাশীকৃত লুচি-তরকারি আমাদের সঙ্গে দেওয়া হইত (=প্রদত্ত হইত)। (১২) ঐ জিনিসটা শিকার করিয়া সংগৃহীত হইত না বলিয়া আমরা একদিনও উপবাস করি নাই। (১৩) সেই রাত্রে গঙ্গার ঘাটে দাঁড়াইয়া চীৎকার শব্দে আমাদের গান জুড়িয়া দেওয়া হইল। (১৪) অনেক রাত্রে আমাদের গাড়ি করিয়া বাড়ি ফিরা হইল। (১৫) তাহার কল দেখিতে আমাদের যাওয়া হইল। (১৬) একদিকে তাঁহাদ্বারা আপনার জীবন এবং সংসার ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ নিবেদিত হইয়াছিল, আর একদিকে দেশের উন্নতিসাধন করিবার জন্য তাঁহার সর্বদাই কতরকম সাধ্য ও অসাধ্য প্ল্যান করা হইত তাহার অন্ত নাই (অথবা তাঁহাদ্বারা সর্বদাই কত সাধ্য ও অসাধ্য প্ল্যান করা হইত তাহার অন্ত নাই)।

১২। **উপযুক্ত এক বা একাধিক পদদ্বারা শূন্য স্থান পূর্ণ কর ঃ—**

(১) তাঁহার — প্রবীণতা — মতো — তাঁহার — নবীনতাকে—তাজা—রাখিয়া। এমন —, প্রভুর — তাঁহার কোনো — করিতে —, তিনি — সহজ — মতোই।

(২) সকলেই — আমাদের — উপযুক্ত —খ্যাংরা — মধ্য — সত্তায় — তেজ প্রকাশ —, কিন্তু — যাহা — তাহা — নহে।

১৩। **অশুদ্ধি শোধন কর** :—(১) তিনিও গলা উন্মুক্ত করিয়া দিলেন এবং সুরের চাইতে ভাস্য যথা অনেক বেশী হয তথা তাহার উৎসাহের প্রচণ্ড হাতনাড়া তাঁহার ক্ষিণ গলাকে বহুদুরে অতিক্রম করিয়া গমন্ করিল, তালের ঝোকে মাথা সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং তাহার পাকা শ্মশ্রুর মধ্যে ঝরের বায়ু মাতামাতি করিতে লাগিল। (২) অন্ধকার নিবির, নিস্তব্ধ আকাশ, পারাগাযের পথ মনুষ্যহীন নির্জন, কেবলমাত্র দুই ধারের বোনশ্রেনির মধ্যে দলে দলে জ্যোতিরিঙ্গন যেন নিরবে নিঃশব্দে মুষ্টি মুষ্টি অগ্নির 'হরির লুঠ' ছড়াইতেছে।

১৪। **উক্তি পরিবর্তন কর** :—ইনি একদিন শিকার হইতে ফিরিবার পথে……হয় নাই। (পৃঃ ৮৫-৮৬)। **উত্তর** :—(পরোক্ষ) ইনি একদিন শিকার হইতে ফিরিবার পথে একটা বাগানে ঢুকিয়াই মালীকে ডাকিয়া তাহার নিকট (জানিতে চাহিলেন) প্রশ্ন করিয়া বসিলেন তাঁহার মামা কিছুদিন পূর্বে সেখানে আসিয়াছিলেন কি না। মালী শশব্যস্তে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিনীতভাবে নেতিসূচক উত্তর দিল। ব্রজবাবু সেই সংবাদে কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া মালীকে ডাব পাড়িয়া আনিবার হুকুম দিলেন।

১৫। **উপযুক্ত বিশেষণ পদদ্বারা শূন্যস্থান পূর্ণ কর** :—(১) মানুষের যাহা — এবং মানুষের কাছে যাহা চিরদিন — তাহার —রাস্তা -- ছিদ্র —করিয়া দিলে একটা — বিকারের সৃষ্টি করা হয় সে সম্বন্ধে — সন্দেহই থাকিতে পারে না।

১৬। **শূন্যস্থানে উপযুক্ত ক্রিয়াপদ বসাও** :—(২) আমার মত অর্বাচীনও এই সভার সভ্য —। এই সভায় আমরা যেন একটি খ্যাপামির তপ্ত হওয়ার মধ্যে — যে অহরহ উৎসাহে যেন আমরা — —। এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ উত্তেজনার আগুন —।

ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে (পৃঃ ৭৬-৮২)

সন্ধি :—গঙ্গা-আনয়ন-বৃত্তান্ত—শ্রুতিকটুতা নিবারণের জন্য সন্ধি করা হয় নাই। চিতানলে = চিতা + অনলে। অভীষ্ট = অভি + ইষ্ট। নভোমণ্ডল = নভঃ + মণ্ডল। পরস্পর = পর + পর। অর্ধোন্মীলিত = অর্ধ + উন্মীলিত। সাগরোদ্দেশে = সাগর + উদ্দেশে। প্রত্যাবর্তন = প্রতি + আবর্তন। অগ্ন্যুদ্গার = অগ্নি + উদ্গার। উড্ডীন = উৎ + ডীন। মহাযজ্ঞোত্থিত = মহাযজ্ঞ + উত্থিত।

সমাস :—আজন্মপরিচিত—জন্ম পর্যন্ত (অব্যয়ীভাব), আজন্ম পরিচিত (কর্মধারয় সমাস)। অভ্রভেদী—অভ্র (মেঘ) কে ভেদ করে বা করা স্বভাব যাহার (উপপদ তৎপুরুষ)। তুষারনদী = তুষারের নদী (ষষ্ঠী তৎপুরুষ), অথবা তুষারগঠিত নদী (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। হতচেতন—হত হইয়াছে চেতনা

যাহার (বহুব্রীহি)। **বনস্থলী**—(বনভূমি) বনসমন্বিত স্থলী (স্থলী—অকৃত্রিম —প্রকৃতির হস্তে রচিত—প্রাকৃতিক স্থান) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস। [সংস্কৃত ভাষায় '**স্থল**'—শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে "স্বাভাবিক স্থানের নাম স্থলী" এবং মানুষের হাতে পরিষ্কার করা যায়গার নাম 'স্থলা'। বাঙলায় 'স্থলী' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়,—"তোমার (সীতার) বিরহ-দুঃখে কান্দে বনস্থলী" (বিজয়চন্দ্র মজুমদার)]। **প্রস্তরীভূত**—(উঃ মাঃ ১৯৬১) যাহা পূর্বে প্রস্তর ছিল না তাহা প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে (গতি সমাস) প্রস্তর + চ্বি (অভূততদ্‌ভাবে—যাহা পূর্বে ছিল না এখন হইয়াছে এই অর্থে 'চ্বি' প্রত্যয় হয়) + √ভূ + ক্ত। **মহাচক্রপ্রবাহিত**—মহৎ (যে) চক্র (কর্মধারয়) তাহাতে প্রবাহিত (সপ্তমী তৎপুরুষ)। ত্রিশূল—ত্রি (তিনটি) ফলক যুক্ত শূল (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)।

পদটীকা :—সখ্য বন্ধুত্ব—সখার ভাব—সখি + ভাবার্থে ষ্যঞ্ (প্রত্যয়) [তুঃ শাঠ্য, জাড্য, পাণ্ডিত্য ইত্যাদি]। একাকী—সজাতীয় সহায় রহিত এক + আকিন্ (অসহায় অর্থে) স্ত্রীলিঙ্গে 'একাকিনী'—'হেথা সুখ গেলে স্মৃতি **একাকিনী** দীর্ঘশ্বাস ফেলে শূন্যগৃহে'। (রবীন্দ্রনাথ)] আছড়াইয়া **পড়া** = বেগে পতিত হওয়া (কর্মকর্তৃবাচ্য) বাং √আছড়া (ধাতু) + ইয়া [প্রত্যয় যোগে— সংযুক্ত ক্রিয়া]। পার্থিব—পৃথিবী সম্বন্ধীয়, পৃথিবী + অণ্। বাৎসল্য—বৎস + ল = বৎসল + ষ্যঞ্ (ভাবার্থে)। **অজ্ঞেয়**—নয় জ্ঞেয়— √জ্ঞা + যৎ (কর্মবাচ্যে) যাহাকে জানা যাইবে না। অজ্ঞাত—নঞ্ = নয় জ্ঞাত, জ্ঞা + ক্ত (কর্মবাচ্যে) যাহাকে জানিতে পারা যায় নাই। গ্রাম—ক্ষুদ্র জনবসতি, পাড়াগাঁ। জনপদ—প্রদেশ, রাজ্য। পর্বতমালা—বহু পর্বত—বহুবচনের অর্থে 'মালা' শব্দের প্রয়োগ। **অরণ্যানী**—মহারণ্য [মহত্ত্ব বুঝাইতে অরণ্য + আনী (প্রত্যয়) তুঃ 'হিমানী' বরফের বিশাল স্তূপ। বাংলায় 'অরণ্যানী'র দেখাদেখি '**বনানী** শব্দ চলিতেছে। নাট্যকার **দ্বিজেন্দ্রলাল** রায়ের পূর্বে ইহা কেহ সম্ভবতঃ প্রয়োগ করেন নাই—'লঙ্ঘি বনানী পর্বতরাজি'—'চন্দ্রগুপ্ত']। গরীয়সী—গুরু + ঈয়স্ (আতিশয্যে) (= গুরুতরা) + ঈ (স্ত্রীলিঙ্গে) (পুংলিঙ্গে—গরীয়ান্) = গৌরবান্বিতা বিশেষণ পদ। পরস্পর— কর্ম ব্যতিহার বা ক্রিয়া বিনিময় অর্থে 'পর' শব্দের দ্বিত্ব এবং সকারাগম [**সমাস নহে**] একে অন্যের (পার্শ্বে)। ঐন্দ্রজালিক—ইন্দ্রজাল, (যাদুবিদ্যা) + ইক (ইন্দ্রজাল বিদ্যা জানে যে)। পুলকিত—পুলক + ইতচ্ (জাতার্থে)। **দুর্নিরীক্ষ্য** (১৯৬০ কম্পার্ট)—দুর্ + নির্ + ঈক্ষ্ + য (কর্মবাচ্যে যাহাকে অতিকষ্টে দেখিতে পারা যায়)। উপত্যকা—উপ + ত্যকন্ + আ পর্বতের নিকটবর্তী ভূভাগ—[উপ = সমীপ, নিকট] **চূর্ণীকৃত** (উঃ মাঃ ১৯৬০) চূর্ণ + চ্বি + কৃ + ক্ত কর্মবাচ্যে।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দযুগলের অর্থের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া বাক্য রচনা কর :— **স্থল, স্থলী ; অরণ্য, অরণ্যানী ; পরপর, পরস্পর ; অজ্ঞাত, অজ্ঞেয়।**

২। পদান্তরে পরিবর্তিত করিয়া বাক্যরচনা কর :—প্রবাস, প্রবাহ, অংশ, উৎপত্তি, শৃঙ্গ, পশ্চাৎ, আরম্ভ, অবরোধ, উত্থিত, তরঙ্গ, পর্বত, মূর্তি, শুভ্র, সমৃদ্ধ, চক্ষু, বিতাড়িত, প্রকাশ, উন্নত, জটা।

৩। সংক্ষেপে লিখ :—বিশাল অরণ্য, অধিকতর গুরু (স্ত্রীলিঙ্গে), কষ্ট করিয়া যাহাকে দেখিতে পারা যায়, যাহার সহিত জন্মের পর হইতে পরিচয় রহিয়াছে, সখার ভাব, যাহা পূর্বে ভস্ম ছিল না কিন্তু এখন ভস্মে পরিণত হইয়াছে, পথ দেখায় যে, যাহাতে কষ্ট করিয়া চড়িতে হয়।

৪। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে (অর্থের পবিবর্তন সাধন না করিয়া) বিভিন্ন প্রকারে ইচ্ছানুসারে অথবা নির্দেশ মতো পরিবর্তিত কর :—(ক) "কিয়ৎক্ষণ পূর্বে পর্বতমালা আমার দৃষ্টি অবরোধ করিয়াছিল।" (খ) নদীকে আমার একটি অতিপরিবর্তনশীল জীব বলিয়া মনে হইত। (গ) নদীতট উল্লঙ্ঘন···প্লাবিত করিল (প্লাবিত স্থলে প্লাবন বসাও)। (উঃ মাঃ ১৯৬১) **উত্তর** ঃ—(ক) কিয়ৎক্ষণ পূর্বে পর্বতমালাদ্বারা আমার দৃষ্টি অবরুদ্ধ হইয়াছিল। কিয়ৎক্ষণ পূর্বে পর্বতমালায় আমার দৃষ্টির অবরোধ ঘটিয়াছিল। (খ) নদী একটি অতি পরিবর্তনশীল জীবরূপে আমার নিকট প্রতিভাত হইত। নদীর একটি অতিপরিবর্তনশীল জীবরূপ আমার কাছে ধরা পড়িত। (গ) নদীতট উল্লঙ্ঘন করায় দেশে প্লাবন উপস্থিত হইল। নদীদ্বারা তট উল্লঙ্ঘন করার ফলে দেশে প্লাবন উপস্থিত হইল। (উঃ মাঃ ১৯৬১)

৫। পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তিত কর :—(উঃ মাঃ ১৯৬১)। "একদিন আমি বলিলাম······আসিব" (পাঠসংকলন—পৃঃ ৭৭)।

৬। সাধুভাষায় প্রতিশব্দ লিখ :—পর্দা, হাতিয়ার, ছেলেবেলা, জোয়ার, খতম্‌, কানের ছেঁদা, আওয়াজ, চাঁদোয়া। **উত্তর**—যবনিকা, অস্ত্র, বাল্যকাল, জলোচ্ছ্বাস, সমাপ্ত, কর্ণকুহর, শব্দ (নির্ঘোষ), চন্দ্রাতপ।

৭। চলিত ভাষায় রূপান্তরিত কর :—(উঃ মাঃ ১৯৬০) (ক) শিখরে তুষার নিস্থত জলধারা ·····বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। **উত্তর** :—পাহাড়ের মাথার উপরকার বরফগলা জলের ধারা বাঁকা গতিতে নীচের উপত্যকায় পড়ছে। সুমুখে নন্দা দেবী ও ত্রিশূল এখন আর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। মাঝে জমাট কুয়াসা। এই (কুয়াসার) পর্দা ছাড়িয়ে গেলেই চোখের সুমুখের বাধা চলে যাবে। বরফের নদীর উপর দিয়ে উপরে উঠলুম (উঠলাম, উঠলেম)। এই নদী নাব্‌বার সময় পাহাড়ের গা ভেঙে গাদাগাদা পাথর বয়ে আনছে। এই গাদাগাদা পাথর এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে। (খ) কল্লোলিনীর সুললিত সঙ্গীত······নীরব হইল। (উঃ মাঃ ১৯৬১) (পৃঃ ৭৯) নদীর খুব কোমল শব্দ এতদিন ধরে কানে বাজছিল। হঠাৎ যেন কোন জাদুকরের (মায়ায়) মন্ত্রে সব চুপ চাপ হ'য়ে গেল।

৮। **বাচ্য পরিবর্তন কর** ঃ—(১) প্রতিদিন জোয়ার-ভাঁটায় বারিপ্রবাহের পরিবর্তন লক্ষ্য করিতাম। (২) বড়ো হইয়া নদীর উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক ব্যাখ্যা শুনিয়াছি। (৩) যে যায় সে তো আর ফিরে না। (৪) বাল্যকাল হইতে তুমি

আমার জীবন বেষ্টন করিয়া আছ। (৫) তোমার উৎপত্তিস্থান দেখিয়া আসিব। (৬) উত্তর-পশ্চিমে যে গিরিশৃঙ্গ দেখা যায়, তথা হইতে জাহ্নবীর উৎপত্তি হইয়াছে। (৭) কিয়ৎক্ষণ পূর্বে পর্বতমালা আমার দৃষ্টি অববোধ কবিয়াছিল। (৮) দেখিলাম অনন্ত প্রসারিত নীল নভোমণ্ডল। (৯) এই ত্রিশূল (পৃঃ ৭৮-৭৯)······আকাশ বিদ্ধ করিতেছে। (১০) এইরূপে পরস্পরের পার্শ্বে সৃষ্ট জগৎ ও সৃষ্টিকর্তার আয়ুধ সাকাররূপে দর্শন কবিলাম। (১১) তুষার-নদী দেখিতে পাইবে। (১২) কোন মহাশিল্পী যেন সমগ্র বিশ্বের স্ফটিকখনি নিঃশেষ কবিযা এই বিশাল ক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের মূর্তি বচনা কবিযা গিয়াছেন। (১৩) এই কঠিন হিরককণাই ······ করিতেছে। (১৪) বারিকণাবাই নিম্নে শুভ্র তুষারশয্যা রচনা করিয়া রাখিয়াছে। (১৫) নদীতট উল্লঙ্ঘন কবিয়া দেশ প্লাবিত কবিল। **উত্তর ঃ—** (১) প্রতিদিন জোয়াব-ভাঁটায বাবিপ্রবাহেব পরিবর্তন আমাদ্বাবা লক্ষ্য করা হইত। (২) বড়ো হইয়া নদীর উৎপত্তিস্থান সম্বন্ধে অনেক ব্যাখ্যা আমাকর্তৃক শ্রুত হইয়াছে। (৩) যার যাওয়া হয তাব তো আব ফিবা হয় না। (৪) বাল্যকাল হইতে তোমাদ্বাবা আমাব জীবন বেষ্টিত হইয়া আছে। (৫) তোমাব উৎপত্তিস্থান দেখিতে চাই অথবা, তোমাব উৎপত্তিস্থান দেখিযা আসা হইবে। (৬) উত্তর-পশ্চিমে যে গিবি-শ্রেণী আমবা দেখি, তথা হইতে জাহ্নবীর উৎপত্তি হইয়াছে। (৭) কিয়ৎক্ষণ পূর্বে পর্বতমালাদ্বাবা আমাব দৃষ্টি অবরুদ্ধ হইয়াছিল। (৮) অনন্ত প্রসাবিত নীল নভোমণ্ডল দৃষ্ট হইল অথবা, দেখা গেল। (৯) পাতাল গর্ভ হইতে উত্থিত এই ত্রিশূল কর্তৃক মেদিনী বিদারণপূর্বক শাণিত অগ্রভাগদ্বারা আকাশ বিদ্ধ হইতেছে। (১০) এইরূপে পবস্পবের পার্শ্বে সৃষ্ট জগৎ ও সৃষ্টিকর্তার আয়ুধ সাকাররূপে (আমাকর্তৃক) দৃষ্ট হইল। (১১) তোমাকর্তৃক তুষাবনদী দর্শনীয় অথবা, তোমার তুষাবনদী দেখা হইবে, তুষার নদী দেখিতে পাওয়া যাইবে। (১২) যেন কোন মহাশিল্পিকর্তৃক সমগ্র বিশ্বেব স্ফটিকখনি নিঃশেষ কবিয়া এই বিশাল ক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের মূর্তি বচিত হইয়া আছে। (১৩) এই কঠিন হীবকণাদ্বারাই ত্রিশূলাগ্র শাণিত হইতেছে। (১৫) বারিকণা-সমূহদ্বারাই শুভ্র তুষারশয্যা রচিত করিয়া রাখা হইয়াছে। (১৫) নদীতট উল্লঙ্ঘন কবিয়া দেশ প্লাবিত হইল।

৯। **উপযুক্ত (এক বা একাধিক) বিশেষণদ্বারা শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ—**একদিন — — — পথে চলিতে চলিতে — হইয়া বসিয়া পড়িলাম। আমার চতুর্দিকে পর্বতমালা, তাহাদের পার্শ্বদেশে — অরণ্যানী ; — — শৃঙ্গ তাহার — দেহদ্বারা — পশ্চাতের দৃশ্য — করিয়া সম্মুখে —। আমার পদপ্রদর্শক বলিল, "এই শৃঙ্গে উঠিলেই তোমাব অভীষ্ট —হইবে।" **উত্তর ঃ—**নিজে চেষ্টা কব।

১০। অশুদ্ধি শোধন কর ঃ—কিয়ৎক্ষণ পূর্বে পর্বতমালা আমার দৃষ্টি অবরোধ করিয়াছিল। এখন উচ্চ শৃঙ্গে চড়িবামাত্রই আমার সম্মুখের আবরন অপসরন হইল। দেখিলাম অনন্তপ্রসরিত নিলনভমণ্ডলসমূহ। সেই নিবীর নিল স্তর ভেদিয়া দুই সাদা-তুষার-মূর্তি শুন্যে উত্থান হইয়াছে। একটি গরিয়সি রমনীর মতো—মনে হইল যেন আমার দিগে সস্নেহসহকারে প্রশান্তদৃষ্টিতে দর্শন করিয়া রহিয়াছেন।

১১। **নির্দেশ অনুসারে পরিবর্তন কর :**—(১) নদীকে জিজ্ঞাসা করিতাম, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? নদী উত্তর করিত, "মহাদেবের জটা হইতে।" (উক্তি পরিবর্তন কর)। (২) একবার এই নদীতীরে আমার এক প্রিয়জনের পার্থিব অবশেষ চিতানলে ভস্মীভূত হইতে দেখিলাম। (বাক্য সম্প্রসারণ কর)। (৩) আমার পথপ্রদর্শক বলিল, "সম্মুখে এখনও দীর্ঘ পথ রহিয়াছে, উহা অতীব দুর্গম" (উক্তি পরিবর্তন কর)। (৪) অতি দুরারোহ স্তূপ হইতে স্তূপান্তরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। (বাক্যটি আর কি ভাবে লেখা যায়?) (৫) কঠিন পর্বতের দেহাবশেষ বৃক্ষলতার সজীব শ্যাম দেহ নির্মাণ করিল (বাচ্য পরিবর্তন)। (৬) আজন্ম পরিচিত বাৎসল্যের বাসমন্দির (অলংকার বাদ দিয়া লিখ)। (৭) এই যবনিকা ভেদ করিলেই দৃষ্টি অবারিত হইবে (নাস্ত্যর্থক বাক্যে)। (৮) পর্বতগাত্র ঘর্ষিত হইতে হইতে উপলস্তূপ চূর্ণীকৃত হইল (সম্প্রসারণ কর)। (৯) সন্ধ্যা হইলেই একাকী নদীতীরে আসিয়া বসিতাম (জটিল বাক্যে)। (১০) তাহা এখন দুর্নিরীক্ষ্য (সম্প্রসারণ কর)। (১১) তাহাদের পার্শ্বদেশে নিবিড় অরণ্যানী (সম্প্রসারণ কর)। (১২) জনপদের মধ্য দিয়া সাগরোদ্দেশে প্রবাহিত হইতেছে (সমাস ভাঙিয়া ব্যবহার কর)। (১৩) এই গতির বিরাম নাই, শেষ নাই (বাক্য সংকুচিত কর)। (১৪) দূরে দিক্ আলোড়ন করিয়া শঙ্খধ্বনির ন্যায় গভীর ধ্বনি উঠিতেছে (যৌগিক বাক্যে)।

উত্তর :—(১) নদীর উৎপত্তিস্থান কোথায় জানিতে চাহিলে তাহার উত্তর পাওয়া গেল মহাদেবের জটা। (২) যিনি আমার এক প্রিয়জন ছিলেন তাঁহার পৃথিবীতে যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহা ভস্ম হইয়াছে দেখিলাম। (৩) আমার পথপ্রদর্শক সম্মুখে অবস্থিত, অধিকতর দুর্গম অবশিষ্ট পথের কথা স্মরণ করাইয়া দিল। (৪) যা চড়্‌তে খুব কষ্ট হয় এমন একটার পর আর একটা ঢিবি পার হ'য়ে এগিয়ে যেতে লাগলুম। (চলিত ভাষায়), অথবা যাহা অতিকষ্টে আরোহণ করা যায় এমন এক স্তূপ হইতে অন্য স্তূপে অগ্রসর হইতে লাগিলাম (সাধু মিশ্রবাক্য)। (৫) কঠিন পর্বতের দেহাবশেষদ্বারা বৃক্ষলতার সজীব শ্যাম দেহ নির্মিত হইল। (৬) আমার আজন্ম পরিচিত বাৎসল্য যেখানে আছে। (৭) এই যবনিকা ভেদ না করিলে দৃষ্টি অবারিত হইবে না। অথবা এই যবনিকা ভেদ করিলে দৃষ্টি বারিত হইবে না (নাস্ত্যর্থক বাক্য)। (৮) যখন পর্বতগাত্রে অনবরত ঘর্ষিত হইতে লাগিল তখনই শিলাস্তূপ চূর্ণীকৃত হইতে লাগিল। (৯) যখনই সন্ধ্যা হইত তখনই একাকী নদীর তীরে আসিয়া বসিতাম (জটিল বাক্য)। (১০) তাহা এখন কষ্টে দেখিতে পারি। (১১) তাহাদের পাশে যে সকল যায়গা আছে তাহাতে বিশাল বন রহিয়াছে। (১২) যে সকল স্থানে লোকেরা বসতি স্থাপন করিয়াছে উহাদের মধ্যদিয়া সাগর যে দিকে আছে সেই দিকে প্রবাহিত হইতেছে। (১৩) অশেষ অবিরাম এই গতি। (১৪) দূরে দিক্ আলোড়ন করিয়া ধ্বনি উঠিতেছে এবং ইহা শঙ্খের ধ্বনির ন্যায়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (পৃঃ ৯৮-১০৪)

সন্ধি ঃ—চতুষ্পার্শ্বস্থ—চতুঃ + পার্শ্বস্থ। নিষ্প্রভ—নিঃ + প্রভ। দুর্গম—দুঃ + গম। বক্ষঃস্থল—বক্ষঃ + (স্) + স্থল বিকল্পে 'বক্ষস্থল'।

সমাস ঃ—**যন্ত্রস্বরূপ**—যন্ত্রই স্বরূপ যাহার (বহুব্রীহি)। **কঠোর-কঙ্কাল-বিশিষ্ট**—কঠোর কঙ্কাল (কর্মধারয়) তাহার দ্বারা বিশিষ্ট (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। **পাশ্চাত্যজাতিসুলভ**—পাশ্চাত্য জাতি (কর্মধারয়) পাশ্চাত্য জাতিতে সুলভ (সপ্তমী তৎপুরুষ)। রোদনপ্রবণতা—রোদনে প্রবণতা (সপ্তমী তৎপুরুষ)। **করুণামন্দাকিনী**—করুণারূপিণী মন্দাকিনী (রূপক কর্মধারয়)। **বক্ষঃস্থল**—প্রশস্ত বক্ষঃ (কর্মধারয়)। [প্রশংসাবাচক স্থল শব্দের পরনিপাত হইয়াছে। হইয়াছে। তুঃ 'কেশপাশ', 'কণ্ঠতট', 'গণ্ডস্থল' ইত্যাদি] **ঋণগ্রস্ত**—ঋণ দ্বারা গ্রস্ত (গ্রস্থ নহে) তৃতীয়া তৎপুরুষ। **অসদ্ভাব**—সতের ভাব = সদ্ভাব (ষষ্ঠীতৎ) নয় সদ্ভাব (নঞ্‌তৎ)।

পদটীকা ঃ—ঐতিহাসিক—ইতিহাস + ষ্ণিক (সম্বন্ধার্থে—"তাহার ইহা" এই অর্থে)। পৌরুষ—পুরুষের ভাব—পুরুষ + অণ্। আনুকূল্য—অনুকূল + ষ্যঞ্ (ভাবার্থে) পাশ্চাত্ত্য—পশ্চৎ + ত্যক্ (পাশ্চাত্য বানানও লেখা হয়)। আত্যন্তিক—অত্যন্ত + ইক (স্বার্থে প্রত্যয়)। বহমানা—√বহ্ + শানচ্ (কর্তৃবাচ্য + আ) (স্ত্রীলিঙ্গে)। প্রতীয়মান—প্রতি + ই + শানচ্ (কর্মবাচ্যে), নমিত √নম্ + ণিচ্ + ক্ত (কর্মবাচ্যে [প্রেরণার্থক ণিচ্ প্রত্যয়ের প্রয়োগ না হইলে √নম্ + ক্ত (কর্তৃবাচ্যে) 'নত'।

অনুশীলনী

১। সংক্ষেপে প্রকাশ কর :—বাঙ্গালীর ভাব, ইতিহাসে লিখিয়া রাখিবার উপযুক্ত, পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে যাহা সহজে পাওয়া যায়, যে ব্যক্তি সহজেই কাঁদে (সাধুভাষা ও চলিত ভাষা), যাহা কেহ নোয়াইতে পারে না, বেগ যাহার আছে, আলোচনার বিষয় বা যোগ্য, মোট বহন করে যে, যাহার তুলনা মিলে না।

২। ব্যাকরণ সংক্রান্ত টীকা লিখ :—(ক) বিদ্যাসাগরের **করুণার** প্রবাহ… …ধারা বহিল। (খ) প্রকৃতির নিষ্ঠুর **হস্তে** মানব নির্যাতন……রাখিত। (গ) মানুষ……আপন দুঃখের **বোঝায়** ভার চাপায়।

৩। পদান্তরে পরিবর্তিত কর ও বাক্য রচনা কর :—অভিভূত, গঙ্গা, সম্পত্তি, সামর্থ্য, ইচ্ছা, গভীর, অনুকূল, পিতা, প্রকৃতি, অসাধারণ, স্বীকার, সাদৃশ্য, সন্দেহ, প্রতীয়মান।

৪। **বাচ্য পরিবর্তন কর ঃ**—(১) যাহাতে ছোট জিনিসকে বড়ো করিয়া দেখায়। (২) তাঁহার বঙ্গদেশে আবির্ভাব একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনা মধ্যে গণ্য হইবে সন্দেহ নাই। (৩) অনেকে বিদ্যাসাগরের চরিত্রে পাশ্চাত্ত্য জাতিসুলভ বিবিধ গুণের বিকাশ দেখেন। (৪) বিদ্যাসাগরের বাল্যজীবনটা দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। (৫) কিন্তু এইরূপে কাঁটাগুলাকে

ছাটিয়া দলিয়া, চলিয়া যাইতে অল্প লোককেই দেখা যায়। (৬) পরজীবনে তিনি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্ত্য দীক্ষা অনেকটা পাইয়াছিলেন। (৭) এই পরস্বকে সম্মুখ হইতে দূরে ফেলিতেন। (৮) ইহা কোনরূপ নীতিশাস্ত্রের, ধর্মশাস্ত্রের, অর্থশাস্ত্র বা সমাজশাস্ত্রের অপেক্ষা করিত না। (৯) তিনি হিতৈষণাবশে যে সকল কাজ করিযাছেন তাহার অনেকই আধুনিক সমাজতত্ত্ব মঞ্জুর করিবে না। (১০) দেশাচারের দারুণ বাঁধ তাহা রোধ করিতে পারে নাই। (১১) কাহারও সাধ্য নাই যে, সে মেরুদণ্ড নমিত করে। **উত্তর**ঃ—(১) যাহাতে ছোট জিনিসকে বড়ো করিয়া দেখি। (২) সকলে তাঁহার বঙ্গদেশে আবির্ভাবকে একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনা মধ্যে গণ্য করিবে। (৩) অনেক লোকদ্বারা বিদ্যাসাগরের চরিত্রে পাশ্চাত্য জাতিসুলভ বিবিধগুণের বিকাশ দৃষ্ট হয়। (৪) বিদ্যাসাগর দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিতে বাল্য জীবনটা অতিবাহিত করিযাছিলেন। (৫) কিন্তু এইরূপে কাঁটাগুলাকে ছাঁটিয়া দলিযা চলিযা যাইতে আমরা অল্পলোককেই দেখিয়া থাকি। (৬) পরজীবনে তৎকর্তৃক (বা তাহাদ্বারা) পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্ত্য দীক্ষা অনেকটা লব্ধ (প্রাপ্ত) হইয়াছিল। (৭) (তাঁহাদ্বারা) এই পরস্বকে সম্মুখ হইতে দূরে ফেলা (=পরিত্যক্ত) হইত। (৮) ইহাদ্বারা কোনরূপ নীতিশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র বা সমাজশাস্ত্র অপেক্ষিত হইত না। (৯) তাঁহাদ্বারা (=তৎকর্তৃক) হিতৈষণা বশে যে সকল কাজ (কার্য) কৃত (সম্পন্ন) হইয়াছে তাহার অনেকই আধুনিক সমাজতত্ত্বদ্বারা মঞ্জুরীকৃত (অনুমোদিত) হইবে না। (১০) দেশাচারের দারুণ বাঁধদ্বারা তাহা রুদ্ধ হইতে পারে নাই। (১১) কাহাদ্বারাও সে মেরুদণ্ড নমিত হইবার সাধ্য নাই। (=অথবা কাহাদ্বারাও সে মেরুদণ্ড নমিত হওয়া অসাধ্য)।

৫। **উপযুক্ত পদদ্বারা শূন্যস্থান পূর্ণ কর**ঃ—চটিজুতায় — তাহার একটা — আসক্তি ছিল — তিনি যে চটিজুতা — অন্য — পাযে দিতেন না, — নহে। আমরা = স্বদেশের — চটি — করিযা — ধরিয়াছি, — তাহা — যেন বিদ্যাসাগরে — প্রতি —বাড়িয়া —। **উত্তর**ঃ—নিজে লিখ

৬। **নির্দেশ অনুসারে পরিবর্তন কর**ঃ—(১) বিদ্যাসাগরের জীবন্-চরিত, বড়ো জিনিসকে ছোটো দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ (সংক্ষেপ কর)। (২) প্রতীচ্য দেশের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু প্রাচ্য দেশে রোদনপ্রবণতা মনুষ্যচরিত্রের যেন একটা প্রধান অঙ্গ (চলতি ভাষায় পরিবর্তন কর)। (৩) কাহারও সাধ্য হয় নাই যে, সেই মেরুদণ্ড নমিত করে (অস্ত্যর্থক)। (৪) বান্ধবের মরণশোকে তাঁহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিত। (শোককে কর্তৃপদে পরিণত কর)। (৫) এই উদ্দেশ্যে নির্মিত কোনো যন্ত্র আমাদের মধ্যে সর্বদা ব্যবহৃত হয় না (বাচ্য পরিবর্তন কর)। (৬) তাঁহারা সহসা অতিমাত্র ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন (বাচ্য পরিবর্তন কর)। (৭) তিনি খাঁটি বাঙালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার বাল্যজীবনে ইউরোপীয় প্রভাব তিনি কিছুই অনুভব করেন নাই (বাচ্য পরিবর্তন কর)।

উত্তর ঃ—(১) বিদ্যাসাগর চরিত্র বৃহত্তের ক্ষুদ্রত্ব-প্রদর্শক যন্ত্র। (২) পশ্চিম দেশের কথা বলতে পারিনে ; কিন্তু পূব দেশে কাঁদুনে স্বভাব মানুষের চরিত্রের একটা বড়ো অঙ্গ। (৩) সেই মেরুদণ্ডকে নমিত করা সকলের পক্ষে অসাধ্য। **অথবা** সেই মেরুদণ্ডকে নমিত করা সকলের সাধ্যের অতীত। (৪) বান্ধবের মরণশোক তাঁহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইত। **অথবা** বান্ধবের মরণ শোক তাঁহার ধৈর্যচ্যুতির হেতু হইত। **অথবা** বান্ধবের মরণশোক তাঁহার ধৈর্যহানি করিত **অথবা** বান্ধবের মরণশোক তাঁহার ধৈর্যনাশ করিত **অথবা** বান্ধবের মরণশোক তাঁহার ধৈর্যনাশ ঘটাইত। (৫) এই উদ্দেশ্যে নির্মিত কোন যন্ত্রকে আমাদের মধ্যে সর্বদা ব্যবহার করি না। (৬) তাহাদের সহসা অতিমাত্র ক্ষুদ্র হইয়া পড়া হয়। (৭) খাঁটি বাঙালীর ঘরে তাঁহার জন্মগ্রহণ করা হইয়াছিল ; বাল্য জীবনে তাঁহাদ্বারা ইউরোপীয় প্রভাব কিছুই অনুভূত হয় নাই।

মন্ত্রশক্তি (পৃঃ ১১৩-১১৮)

সন্ধি ঃ—বিদ্যুদ্‌বেগে = বিদ্যুৎ + বেগে। দীর্ঘাকৃতি = দীর্ঘ + আকৃতি। সর্বাঙ্গে = সর্ব + অঙ্গে। জোড়াসন = জোড়া + আসন।

সমাস ঃ—চণ্ডীমণ্ডপ—চণ্ডীর (দুর্গা পূজার) মণ্ডপ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। **রাতদুপুর**—রাতের দুপুরে (দ্বিপ্রহরে, রাত্রিনিশীথে—সাধুভাষায় (নজরুল ইসলাম) অথবা দুপুর রাতে = রাতদুপুরে (কর্মধারয় সমাস বিশেষণের পর নিপাত)। **সবসেরা**—সবের সেরা অথবা সবের মধ্যে সেরা (ষষ্ঠী বা সপ্তমী তৎপুরুষ)। **একহাত (খেলা)** = একবার, এক (পর্যায়) একহাত (পর্যায়) যাহাতে (বহুব্রীহি) খেলা পদের বিশেষণ [লাঠি খেলায় হাতের কৌশলের প্রাধান্যের জন্য 'হাত' কথাদ্বারা খেলার পর্যায় বুঝাইতেছে] তুঃ 'একরাশ ফুল', 'একমাথা চুল' (মাথাভরা চুল) ইত্যাদি। **হাড়কাঠ** (দেশী শব্দ) **হাড়িকাঠ, হাড়কাট**—যূপকাষ্ঠ, পশুবলির জন্য কাষ্ঠ নির্মিত ফাঁদ বিশেষ। দিনেদুপুরে—দিনে এবং দুপুরে (দ্বিপ্রহরে) অলুক্ দ্বন্দ্ব সমাস। **ছেলেখেলা**—ছেলেদের খেলা (ষষ্ঠী তৎপুরুষ) (ছেলেখেলার মত খেলা) ছেলেখেলা সদৃশ খেলা (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়) নিতান্ত তুচ্ছ খেলা। **বছর কুড়িকের**—প্রায় কুড়ি বছর বয়সের [কুড়ি বছর (নির্দিষ্ট বয়স)] অনির্দিষ্ট ভাবকে স্পষ্টতঃ বুঝাইবার জন্য 'বছর' পদের পূর্ব নিপাত এবং সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর **অনির্দিষ্টার্থক—'এক' প্রত্যয়ের ব্যবহার**—কুড়ি বছর—নির্দিষ্টসংখ্যা বছরকুড়ি + এক = 'বছরকুড়ি' বিশেষণ সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি। দীর্ঘাকৃতি—দীর্ঘ (লম্বা) আকৃতি (চেহারা) যাহার (বহুব্রীহি)। **লাঠিখেলা**—লাঠি দ্বারা খেলা (তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস) **লগিঠেলা**—লগি দ্বারা ঠেলা (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। **জোড়াসন**—যুক্তপদাসন—(পা-) জোড়া (যুক্ত পদ) আসন (উপবেশন) যাহাতে (বহুব্রীহি) দুই পা জোড়া করিয়া বসা। (**ক্রিয়া বিশেষণ**) **লাঠিবৃষ্টি**—লাঠির বৃষ্টি (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। **মন্ত্রশক্তি**—মন্ত্ররূপ **শক্তি** (**রূপক কর্মধারয়**) মন্ত্র সাধনের

একাগ্রতাজনিত শক্তি) অথবা মন্ত্রের শক্তি (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। **মন্তর-তন্তর** (উঃ মঃ ১৯৬০)—মন্ত্রর এবং তন্তর (অর্ধতৎসম শব্দ) সমজাতীয় শব্দে দ্বন্দ্ব সমাস। (স্বরভক্তি প্রয়োগে চলিত (কথ্য) ভাষায়]।

পদটীকা ঃ—লেঠেল—লাঠি + ইয়াল = লাঠিয়াল < লেঠেল। **ছিপছিপে**—কৃশ ও লম্বা সাদৃশ্যার্থে শব্দদ্বৈত (ছিপ = **লম্বা সরু বাঁশ** যাহার সহিত বঁড়শির সুতা বাঁধা হয়—ছিপের মতো) বিশেষণ পদ। সেরা—শ্রেষ্ঠ [ফারসী শব্দ]। লকড়ি—ছোট লাঠি। **সড়কি** [**দেশী শব্দ**] **বর্শা**, বল্লম ['শূল' শক্তি] **গুলি** (খায়)—আফিম হইতে প্রস্তুত মাদকদ্রব্য বিশেষ—চণ্ডু [গুলি খায় = (১) খায় (২) বন্দুকের গুলি খায়] হিন্দী 'গোলী' শব্দ হইতে। **ফিনকি** (দিয়ে) সবেগে নির্গত রক্তের অতি সূক্ষ্মধারা। **ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে** = সবেগে সূক্ষ্মধারা নির্গত হইতেছে। কিন্তু জ্যোৎস্নায় **ফিনিক ফুটেছে** (দীপ্তি, ঔজ্জ্বল্য) = জ্যোৎস্না অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়াছে। ["ফুটফুটে জ্যোৎস্না"]। **কাজিযে** (**কাজিয়া**) —বিবাদ, দাঙ্গা [আরবী শব্দ]। নজববন্দী—নজর (আরবী শব্দ) + বন্দী (বদ্ধ বা গৃহীত অর্থে বিদেশী ফারসী প্রত্যয়) দৃষ্টিদ্বারা আবদ্ধ, চোখে চোখে রাখা [যেমন কয়েদীকে করা হয়]।

অনুশীলনী

১। অর্থের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া বাক্য রচনা কর :—**দশ-বারো জন, জনদশ-বারো ; জোড়াসন, আসনজোড়া ; জখম, খুন ; 'গা কী রকম করে' 'গা করা' ; দিব্যি করা, দিব্বি করা; এক হাত খেলা, এক হাত নেওয়া (লওয়া)** ; ফিনিক, ফিনকি।

২। পরোক্ষ উক্তিতে রূপান্তরিত কর :—(১) সে উত্তর করিলে......... করিবেন না। (পৃঃ ১১৪) (২) হেদাৎউল্লা....... সড়কি। (পৃঃ ১১৭) (৩) ঈশ্বর বললে....... আছে। (পৃঃ ১১৭) (৪) মিছু সর্দার.........তাঁরই। (পৃঃ ১১৮) উঃ—(১) সে সম্মানসূচক সম্বোধন করিয়া উত্তর করিল যে সে বালকবয়সে উহা জানিত। তাহার পর বিশ-পঁচিশ বৎসর সে লাঠি সড়কি ধরে নাই। ইহা ছাড়া তাহার একটা কথা আছে। উপস্থিত লাঠিয়ালাদগের নিকট লাঠি সড়কি স্পর্শ না করিবার জন্য দেবতার সম্মুখে সে যে দিব্যি (শপথ) করিয়াছে তাহা সে ভঙ্গ করিতে পারিবে না। তবে প্রভুর আদেশ অমান্য করা যায় না। এই কথা শুনিবার পর প্রভু যেন তাহার উপর ঐরূপ আদেশ প্রদান না করেন। ইহার জন্য সে তাঁহাকে সনিবন্ধ অনুরোধ করিল। (২) হেদাৎউল্লা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া (অবজ্ঞার সহিত) অবজ্ঞামিশ্রিত স্বরে ঈশ্বরকে সড়কি ধরিতে বলিল। (৩) ঈশ্বর (সড়কি) ধরিতে স্বীকৃত হইয়া তাহাকে (হেদাৎউল্লাকে) খুনে স্বভাবের জন্য অপরের পেটে সড়কি না বসাইতে সতর্ক করিয়া দিল এবং জানাইয়া দিল সকলের গায়েই রক্ত আছে আর এই খেলা 'ঝগড়ার খেলা' নহে—ইহা আপোষের খেলা। (৪) মিছু সর্দার প্রভুকে সম্বোধন করিয়া কহিল ঐ লোকটার জাদু জানার কথা

সত্য ইহা তিনি অবশ্যই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। মন্ত্রতন্ত্রের সহিত কেহই যুদ্ধ করিতে পারে না।

৩। নিম্নলিখিত বিশিষ্টার্থক পদসমষ্টি দ্বারা বাক্য রচনা কর:—দিব্যি করা, খড়িচড়াও হওয়া, রেগে আগুন হওয়া, ডোরা কাটা, মাথায় খুন চড়ে যাওয়া, কানেকানে বলা, কথা ভাঙা, ঘা মারা।

৪। সাধুভাষায় রূপান্তরিত কর:—(ক) ঘা, লাঠি, চলাফেরা, 'কাজিয়ে', একবার এগোয়, একবার পিছোয়, নাড়িভুঁড়ি, পেট, আইন-কানুন, ভর করা, সব-সেরা উত্তর ঃ—ঘা—আঘাত ; লাঠি, যষ্টি, দণ্ড ; চলাফেরা—গমনাগমন, ইতস্ততঃ পর্যটন ; কাজিয়ে—বিবাদ। একবার এগোয়—একবার অগ্রসর হয়। একবার পিছোয়—একবার পশ্চাদ্‌গামী হয় ; নাড়ীভুঁড়ি—অন্ত্র ; পেট—উদর ; আইন-কানুন —বিধিব্যবস্থা ; ভরকরা—আবিষ্ট হওয়া ; সবসেরা—সর্বশ্রেষ্ঠ। (খ) হুজুর লেঠেলি··· করবেন না। (পাঠসংকলন ১১৪ পৃঃ, উঃ মাঃ ১৬৬১)। উত্তরঃ—কর্তামহাশয়! লাঠিয়ালি আমার জাতিগত ব্যবসায় নহে। পিতৃ-পিতামহের ন্যায় আমিও খেয়ার নৌকা পারাপার করিয়াই যৎকিঞ্চিৎ উপার্জন করি। আমার কার্য লাঠিখেলা নহে—(আমার কাজ) নৌকা চালনা। সুতরাং আমার বক্তব্য হইতেছে কর্তামহাশয় আমাকে এইরূপ আদেশ করিবেন না।

৫। পদান্তরে পরিবর্তিত কর :—দাড়ি, সড়কি, মিথ্যা, বুড়ো, শরীর, ঢাল, পেট, খুন, শক্তি, দেহ, অনুগত, দেব (=দেবতা)।

৬। ব্যাকরণ সংক্রান্ত টীকা লিখ :—(ক) **মাথায় ছ'ফুটের** উপর। (খ) ঈশ্বর লেঠেল নয়······কি লাঠি, কি লড়কি, কি সড়কি—ও **হাতে** নিলে··· ··· পারে না। (গ) এ **শক্তি** যে কী, যাঁদের শরীরে তা নেই তাঁরা তা জানেন না। (ঘ) **নেশায়** শরীরের শক্তি যায়······যায় না। (ঙ) আমিই হয়ে উঠলুম **সকলের** সেরা। (চ) **লাঠিসড়কির** মার কোন্ দিক থেকে আসবে, **অন্তর** তন্তর (উঃ মাঃ ১৯৬০)।

৭। **বাচ্যান্তরিত কর** ঃ—(১) মন্ত্রশক্তিতে তোমরা বিশ্বাস কর না। (২) চোখে কী দেখেছি, বলছি। (৩) এঁকে কেউ দেখেননি, কিন্তু সকলেই ভয় করতেন। (৪) ঈশ্বর পাটনিকে একহাত খেলা দেখাতে হুকুম করুন না। (৫) হুজুর, এ আদেশ আমায় করবেন না। (৬) বিশ পঁচিশ বছর লাঠিও ধরিনি, লকড়িও ধরিনি, সড়কিও ধরিনি। (৭) সে কথা ভাঙি কী করে? (৮) আমি মন্তর-তন্তর কিছুই জানি নে। (৯) তারপর থেকে একদিনও লাঠি সড়কি ছুঁই নি। (১০) কথা সত্যি কি মিথ্যে—ঐ গুলিখোর মিছুকে জিজ্ঞেস করলেই টের পাবেন। (১১) তোমার হাতের লকড়ি কেড়ে নেব না, কিন্তু তোমার গায়ে আমার লকড়ির দাগ বসিয়ে দেব। (১২) ও বেটা জাদু জানে। (১৩) এ শক্তি যে কী যাঁদের শরীরে তা নেই তাঁরা তা জানেন না, আর যাদের শরীরে আছে তাঁরাও জানেন না।

উত্তর ঃ—(১) মন্ত্রশক্তিতে তোমাদের বিশ্বাস হয় না। (২) চোখে কী দেখা

হয়েছে বলা হচ্ছে। (৩) কারো এঁকে দেখা হয়নি, কিন্তু সকলেরই ভয় হত। (৪) ঈশ্বর পাটনিকে একহাত খেলা দেখাতে হুকুম করা হোক না। (৫) হুজুরের এ আদেশ যেন আমায় না করা হয়। (৬) বিশ পঁচিশ বছর আমার লাঠিও ধরা হয়নি, লক'ড়ও ধরা হয়নি, সড়কিও ধরা হয়নি। (৭) সে কথা আমার দ্বারা ভাঙা হয় কি করে ? (৮) আমার মন্তর-তন্তর কিছুই জানা নেই। (৯) তার পর থেকে আমার একদিনও লাঠি সড়কি ছোঁয়া হয়নি। (১০) কথা সত্যি কি মিথ্যে—ঐ গুলিখোর মিছুকে জিজ্ঞেস করা হ'লে টের পাওয়া যাবে। (১১) তোমাদের হাতের লকড়ি কেড়ে নেওয়া হবে না, কিন্তু তোমার গায়ে আমার লকড়ির দাগ বসিয়ে দেওয়া হবে। (১২) ও বেটার জাদু জানা আছে। (১৩) এ শক্তি যে কী, যাঁদের শরীরে তা নেই তাঁদের তা জানা নেই, আর যাঁদের শরীরে আছে তাঁদেরও জানা নেই।

৮। **উক্তি পরিবর্তন কর**ঃ—(১) এমন সময় নায়েববাবু······বিশেষ অনুগত প্রজা (পৃঃ ১১৩)। (২) আমি জিজ্ঞেস করলুম ·····করবেন না (পৃঃ ১১৪)। (৩) আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম, "ঈশ্বরের কথা সত্যি না মিথ্যে। সে হাঁ না কিছুই উত্তর করলে না (পৃঃ ১১৫)। (৪) তারপর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম······বিপ্তে সমান আছে।" (৪) অমনি লেঠেলরা সব এই বলে······জন্যে (পৃ° ১১৬)। (৫) ঈশ্বর বললে, "হুজুর······খুন করতে" (পৃঃ ১১৭)। (৬) ঈশ্বর বললে "তোমার হাতের······বসিয়ে দেব। **উত্তর**ঃ—(পরোক্ষ) (১) এমন সময় নায়েববাবু তাঁর কানে কানে, ঈশ্বর পাটনিকে একহাত খেলা দেখাতে হুকুম করবার জন্যে, বিনীত অনুরোধ জানালেন, তার পর তিনি বললেন ঈশ্বর লেঠেল নয়, কিন্তু তিনি (নায়েববাবু) শুনেছেন কি লাঠি, কি লকড়ি, কি সড়কি ও (ঈশ্বর) হাতে নিলে কোনো লেঠেলই ওর সুমুখে দাঁড়াতে পারে না। তিনি (জমিদারবাবু) হুকুম করলে ও অস্বীকার করতে পারবে না, কারণ ও তাঁদের (জমিদারবাবুদের) বিশেষ অনুগত প্রজা। (২) তিনি (জমিদারবাবু) তাকে (ঈশ্বরকে) জিজ্ঞেস করলেন তাহলে সে লাঠি খেলতে জানে কিনা। সে (জমিদারবাবুকে) সম্মানের সঙ্গে উত্তর করলে যে সে ছোকরা-বয়সে জানত। তারপর বিশ-পঁচিশ বছর লাঠি লকড়ি-সড়কি সে কিছুই ধরে নি। তাছাড়া আর একটা কথা আছে। সে ঐ লোকগুলোর কাছে ঠাকুরের সুমুখে লাঠি-সড়কি না ছোঁবার দিব্যি করেছে। সেকথা ভাঙার সাধ্য তার নেই। জমিদারবাবুর হুকুম হলে সে অস্বীকার করতে পারে না! তারপর, সে আরো বিনীতভাবে তার কথা শুনে তাঁকে এ রকম আদেশ না করবার জন্যে প্রার্থনা জানালে।

(৩) তিনি (জমিদারবাবু) জানতে চাইলেন, ঈশ্বরের কথা সত্যি কি মিথ্যা। সে (মিছু) 'হাঁ-না' কিছুই উত্তর করলে না। ঈশ্বর এর পর বিনীতভাবে বলে উঠল, সে জীবনে কখনও মিথ্যে কথা বলে নি আর কখনও বলবেও না; তারপর (জমিদারবাবু) তিনি তাকে (ঈশ্বরকে) জিজ্ঞেস করলেন মিছু গুলিখোর হয়ে পাকা লেঠেল কী করে হ'তে পারে। ঈশ্বর সবিনয়ে উত্তর দিলে যে নেশায় শক্তি যায়,

কিন্তু গুরুর কাছে শেখা বিদ্যে যায় না। বিদ্যে হল আসল শক্তি। সে বাবুকে মনে করিয়ে দিলে সেদিন তো বাবু দেখলেন ঠাকুরদাস কামার অত বড়ো মোষটার মাথা এক কোপে কাটলে, আর এই ঠাকুরদাস দিনে-দুপুরে গুলি খায়। ঈশ্বর নেশা করে না বটে কিন্তু বয়সে তার শরীরের জোর তখন তো কমে এসেছে—যেমন সকলেরই হয়। যদি ঐসব লোকেরা অনুমতি দেয় তাহলে তিনি (জমিদারবাবু) নিশ্চয়ই দেখতে পারেন তার বুড়ো হাড়েও বিদ্যে সমান আছে।

(৪) অমনি লেঠেলরা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে চীৎকার করে বাবুকে জানালে যে বেটা মন্তর আওড়াচ্ছে—তাদের নজরবন্দী করবার জন্যে। (৫) ঈশ্বর আত্মপক্ষ সমর্থন করে বিনীতভাবে বললে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ওর কব্জি সে জখম করেছে, নইলে ও তার পেটের নাড়ীভুঁড়ি বার করে দিত। সে যদি ওর হাত থেকে সড়কি খসিয়ে না দিত তাহলে তা তার পেটে ঠিক ঢুকে যেত। ঐ খেলায় ও বেটা আইনকানুন মানে না, ও চায় হয় জখম করতে, নয় খুন করতে। (৬) (মনিরুদ্দিকে) ঈশ্বর আগেই জানিয়ে দিলে তার হাতের লকড়ি সে কেড়ে নেবে না, কিন্তু তার গায়ে তার (নিজের) লকড়ির দাগ বসিয়ে দেবে।

৯। **সাধু ভাষায় পরিবর্তন কর** ঃ—(১) ঈশ্বর বললে, "ছেলেবেলায় ·· হচ্ছে চোখ।" **উত্তর** ঃ—ঈশ্বর বলিল, "বালক-বয়সে (বাল্যকালে) ইহারা সকলে খেলা শিখিত। আমিও খেলার লোভে ইহাদের দলে জুটিয়া গিয়াছিলাম। আমার বয়স যখন প্রায় বিশ বৎসর, তখন কি লাঠি, কি লকড়ি, কি সড়কিতে—আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিলাম। ইহারা ভাবিল যে আমি কোন মন্ত্রতন্ত্র শিক্ষা করিয়াছি—তাহারই গুণে আমি সকলকে পরাজিত করি। হুজুর, আমি মন্ত্রতন্ত্র কিছুই জানি না, তবে আমার যাহা ছিল তাহা ইহাদের মধ্যে কাহারও ছিল না। সেই বস্তুটি হইতেছে চক্ষু।" (উঃ মঃ ১৯৬২, কম্পার্টমেন্টাল) (২) **দাঁড়িয়েছিলুম····· করতেন।** (পৃঃ ১১৩) **উত্তর** ঃ—আমি চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিলাম পূর্বদিকে ভোগের দালানের ভগ্নাবশেষের সম্মুখে দশ-বারজন লাঠিয়ালের একত্র সমাবেশ হইয়াছিল। পশ্চিমে শিবের মন্দির, যাহার পার্শ্বে বিল্ববৃক্ষে একটি ব্রহ্মদৈত্য বাস করিতেন, যাঁহার সাক্ষাৎ গৃহের দাসদাসীরা দ্বিপ্রহর রাত্রিতে কখনও কখনও (কোন কোন সময়ে) পাইত—ধুমার মতো যাঁহার মস্তকহীন দেহ, এবং কুজ্ঝটিকার মতো যাঁহার জটা। আর দক্ষিণে পূজার আঙ্গিনা—যে আঙ্গিনায় (অঙ্গনে, চত্বরে) লক্ষবলি হইয়াছিল বলিয়া একটি কবন্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ইহাকে কেহই দর্শন করেন নাই, কিন্তু সকলেই ভয় করিতেন।

১০। **উপযুক্ত পদদ্বারা শূন্যস্থান পূর্ণ কর** ঃ—ঈশ্বরের — যিনি — করেন, — অর্থাৎ —। শুধু — নয়, পৃথিবীর — — যথা, — খেলাতে, পলিটিক্সে —, তিনিই — হন শরীরে — দৈবশক্তি — করে। এ শক্তি — কী, যাঁদের — তা — — তা — না, আর — শরীরে — তাঁরাও — না।

১১। **অশুদ্ধি সংশোধন কর** ঃ—চিৎকার। হুকুম। কাবু। মন্তরশক্তি।

ফিনকি দিয়া রক্ত বইছে। বিদ্যুৎবেগে। সিদুর। বা হাত। পাচ মিনিট। এরা বাতন্থপুরে আমার বাড়ি চড়াও করে কালীবাড়ি নিয়ে হারকাটে ফেলে বলী দেবার উৎযোগ করল। তুমি ঠাকুরের সম্মুখে দিব্য করো যে আর কক্খোনো লাঠি ছোবে না। কথা সত্যি কি মিথ্যা—ঐ গুলিখোঁর মিছুকে জিজ্ঞাসা করলেই টের পাবেন। তার শরীরে আছে সুধ্ হার আর মাষ, চর্বী একবিন্দুও নেই। মবিরুদ্দি বেগে অগ্নি হয়ে লকাড় হাতে করে এগিয়ে আস্লো। আমি কাউকেও এক ঘা মারি নাই। এলোমেলো লাঠি এর মাথায় পড়ছে, এর লাঠি ওর মাথায়। আমি যে এদের লাঠিবর্ষণের মধ্যে হইতে মাতা বাচিয়ে এযেছি, সে সুধু হুজুরের—বাব্মনের আশীর্বাদে।

নতুন দা (পৃঃ ১২৮-১৩৮)

সন্ধি ঃ—সু-উচ্চ—সু-উচ্চ (সন্ধিতে শ্রুতিকটু হয় বলিয়া সন্ধি হয় নাই)। চির-অপরিচিত—পূর্বোক্ত কারণে সন্ধি হয় নাই। উপদ্রব—অত্যাচার (ঐ কারণ)।

সমাস ঃ—আগাগোড়া—আগা এবং গোড়া (গোড়া হইতে আগা পর্যন্ত) বিপরীতার্থক পদে দ্বন্দ্ব সমাস)। অগ্নিশর্মা—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ [অগ্নির মত হিংসা (√শৃ—হিংসার্থ) করে যে—অগ্নি + শ + মনিন্ (প্রত্যয়)। **স্বার্থপর**—স্বার্থই নিজের সুখ-সুবিধা) পর (শ্রেষ্ঠ) (যাহার কাছে)—বহুব্রীহি। **আড়ষ্ট**—অসাড়, জড়, বিশেষণ পদ। **অতলস্পর্শী**—তল + √স্পৃশ্ + ণিন্ = তলস্পর্শিন্ = তলস্পর্শী [**উপপদ তৎপুরুষ** (যাহা) তল স্পর্শ করে, নয় তলস্পর্শী—(অতলস্পর্শী) নঞ্ তৎপুরুষ] আকণ্ঠনিমজ্জিত—কণ্ঠ পর্যন্ত = আকণ্ঠ (অব্যয়ীভাব) আকণ্ঠনিমজ্জিত কর্মধারয়)। তুষারশীতল—তুষারের মতো শীতল (উপমান কর্মধারয় সমাস)। ব্যাঘ্রকবলিত—ব্যাঘ্রদ্বারা কবলিত (তৃতীয়া তৎপুরুষ)।

শব্দটীকা ঃ—কন্‌কনে—অত্যন্ত তীব্র (অনুকার-ধ্বনিবিশিষ্ট শব্দদ্বৈত) কনকনে [বিশেষণ, শীত পদের—তুঃ চমচমে রোদ, টন্‌টনে ব্যথা)। পশলা (পসলা) = একবারের বর্ষণ। **গঙ্গা দিয়ে** (তৃতীয়া বিভক্তি)—ব্যাপ্তি অর্থে পথবাচক শব্দে তৃতীয়া (-দিয়া বিভক্তি (special instrumental) (অপবর্গে তৃতীয়া)। ভয়ংকর (বাবু)—অত্যন্ত (পরিহাসে), মূল অর্থ যাহাকে দেখিলে ভয় হয়। **যাচ্ছে-তাই—নিকৃষ্ট**—যা-ইচ্ছা-তাই = যাচ্ছেতাই—(উঃ মাঃ ১৯৬০) **বাক্যাত্মক বিশেষণ** বা **বহুপদময় বিশেষণ** (তুঃ **যারপরনাই** পাজি)। জাঁকিয়া (বসা)—চাপিয়া বসা—জাঁক (দেশী) + আ + ইয়া (অসমাপিকা ক্রিয়াবোধক প্রত্যয়) (তামাক) সাজ্‌চি—সাজিতেছি। [তুঃ 'পান-সাজা' 'অলক সাজা' = অলককে ভূষিত করা। কিন্তু 'সাধু সাজা' 'বোকা সাজা' 'যাত্রার দলে বাজা সাজা'—প্রভৃতির অর্থ লক্ষ্য কর] কালোপানা—কালোর মতো, অনেকটা কালো—কালো + পানা (প্রত্যয়)। **শীতের** (গঙ্গা)—বিশেষণ সম্বন্ধে ষষ্ঠী। **মেড়ো**—(অবজ্ঞার্থে) বাংলার বাহিরের উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মাড়বার প্রভৃতি স্থানের লোক।

মাড়বার>মাড+উয়া (অধিবাসী অর্থে) মাড়ুয়া>মেড়ো, মেড়ুয়া [পূর্ব বাঙলায় —'মাউরা' (স্থিতি পরিবৃত্তি)] মাড়োয়ার দেশের লোক—অর্থের প্রসারে বাঙ্লার বাহিরের উত্তর ও পশ্চিম প্রান্তের লোক। **খোট্টা**—[দেশী শব্দ] অবজ্ঞায়— উপরিলিখিত অর্থে ব্যবহার হয়।—(১) **খোট্টা-মোট্টা**, (২) **বস্তি-টস্তি**, (৩) **মুড়ি-টুরি**—[এই তিন স্থলেই মূল পদকে বিকৃত করিয়া 'অনুচর' পদ গঠিত হইয়াছে]· (১) **খোট্টা-মোট্টা—অবজ্ঞা** বা **অপ্রীতির ভাব** প্রকাশ করিতে অনুচর পদ 'ম' যোগে বিকৃত হয় ; (২), (৩) 'অনুরূপ' অর্থে (**তাহারই মতো**) **বস্তু অর্থে** পরবর্তীপদ (অনুচর পদ) বিকৃত হয়—'মুড়িটুরি'—মুড়ি বা তৎসদৃশ বস্তু, 'বস্তি-টস্তি'—বস্তি বা পল্লী]। ওই ওটাকে—অবজ্ঞা বা তুচ্ছার্থে—'ও' শব্দের পরে—'টা' (নির্দেশকের ব্যবহার) সংকীর্ণ জল=অল্প জল। **সৈকত**—বালুকাময় চরা বা তট। সিকতা (বালুকা)+অণ্=সৈকত='বালুচর'। পদচারণা= পায়চারি। চোর-টোব—শব্দদ্বৈত [চোর বা চোরের মত লোক—ডাকাত, বাটপাড় ইত্যাদি। আহার্য—খাবার—আ+ √হৃ+ণ্যৎ (য) কর্মবাচ্যে—আহারের সামগ্রী এমন-সব—এইরূপ অনেক—**বহুবচনের অর্থে 'সব' শব্দের প্রয়োগ**।

অনুশীলনী

১। (ক) সংক্ষেপে লিখ :—বরফের মতো ঠাণ্ডা, গলা পর্যন্ত, মেয়েদের মতো. যে ব্যক্তি স্বার্থকেই বড় বলিয়া মনে করে, সত্য কথা বলাই যাহার স্বভাব। **উত্তর** :—তুষারশীতল, আকণ্ঠ, মেয়েলি, স্বার্থপর, সত্যবাদী। (খ) বাচ্যান্তরিত কর—(১) বালির উপর দৌড়ান যায় না (কর্মবাচ্যে)। (১৯৬০, উঃ মাঃ) **উত্তর** ঃ—কোন লোক বালির উপর দৌড়াইতে পারে না (কতৃবাচ্যে)। (২) এই মহামান্য ব্যক্তিটিকে তাড়া করিয়াছিল (কর্তৃবাচ্য)। **উত্তর** ঃ—এই মহামান্য ব্যক্তিটি তাড়া খাইয়াছিলেন (কর্মবাচ্য)। (৩) জানোয়ারের মতো বসে থাকা হচ্ছে কেন ? **উত্তর** ঃ—জানোয়ারের মতো বসে আছ কেন ? (উঃ মাঃ ১৯৬১)।

২। পদান্তরে পরিবর্তিত করিয়া বাক্য রচনা কর ঃ—অনুগ্রহ, সংসর্গ, অতিক্রম. মেয়ে, খেয়াল, ক্ষুধা, ক্ষিপ্ত, জোর, জল, বিভক্ত, শ্রদ্ধা, দগ্ধ, বাঘ, দোষ, ভীরু, খবরদার, মগ্ন।

৩। নিম্নলিখিত বিশিষ্টার্থক শব্দসমষ্টি দ্বারা সার্থক বাক্য রচনা কর :—জাঁকিয়া বসা, 'বিগড়াইয়া যাওয়া', 'গন্ধে ভূত পালায়', 'বাতাস পড়িয়া গেলে', 'গা জ্বলিয়া যাওয়া', 'ঠায় বসিয়া থাকা' (=নিশ্চলভাবে, কিছু না করিয়া), 'নিমোনিয়া করা' 'ধাক্কা খাওয়া', 'জলের মতো চোখে পড়া', ফুলিয়া ঢোল হওয়া'।

৪। **পরোক্ষ উক্তিতে পরিণত কর** ঃ—"নতুন-দা মুখখানা বিকৃতি······ করিয়া ব্যামো হয়। (পৃঃ ১৩২)।

৫। অর্থের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া **ব্যাকরণ সংক্রান্ত** টীকা লিখ :— **চোর-টোর, চোর-চোর** ; 'তামাক সাজা', 'রাজা সাজা' ; **'যা ইচ্ছা তাই', যাচ্ছেতাই'** (উঃ মাঃ ১৯৬০) ; **'মুড়ি-টুড়ি', মুড়ি-ঝুড়ি**।

৬। **একবাক্যে পরিণত কর**ঃ—"তারপর একবার ইন্দ্র·········চলিতে হইল। (পৃঃ ১৩০)। **উত্তর**ঃ—তারপর পর্যাযক্রমে গুণ টানিযা ইন্দ্র ও আমাকে উঁচু পাড়ের উপর দিয়া বা নীচে নামিয়া সেই বরফের মতো ঠাণ্ডা জল ঘেষিয়া অত্যন্ত কষ্টে অগ্রসর হইতে হইল।

৭। বিপরীতার্থবোধক শব্দ লিখ:—**উত্তর**ঃ—স্বার্থপর—পরার্থপর, চরিতার্থ—ব্যর্থ, সংকীর্ণ—গভীর, প্রশস্ত, বিকৃত—স্বাভাবিক, কদাচিৎ—সর্বদা, নিষ্কর্মা—কর্মব্যস্ত, কর্মরত, নিরর্থক—সার্থক, নিবস্ত—প্রবৃত্ত।

৮। নির্দেশ অনুসারে বাক্যগুলিকে পরিবর্তিত কর:—(ক) ইন্দ্র নিজেও·····লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইযাছিল। (ইন্দ্রকে সম্বন্ধ পদে) (উঃ মঃ ১৯৬০)। (খ) আমার থিয়েটারে হারমোনিয়াম বাজাতেই হইবে (নেতিবাচক)। উঃ—না বাজালেই চলিবে না (উঃ মাঃ ১৯৬১)। **উত্তর**ঃ (ক) ইন্দ্রের নিজের ও তাহার ভ্রাতার ব্যবহারে মনে মনে অতিশয় ক্ষোভ ও লজ্জা হইযাছিল।

৮। (গ) তবে ভাগ্যে এমন সব নমুনা কদাচিৎ চোখে পড়ে [কদাচিৎ শব্দ প্রযোগ না করিযা] (নেতিবাচক কর উঃ মঃ ১৯৬০)। **উত্তর**ঃ—তবে ভাগ্যে এমন সব নমুনা দুই-একটা চোখে না পড়ে এমন নহে।

৯। ব্যাকরণমূলক টীকা লিখ:—(ক) ইন্দ্র ঝাঁপাইয়া পড়িযা **আকণ্ঠ নিমজ্জিত** তাহার **মাসতুত** ভাইকে টানিযা তীরে তুলিল। **উত্তর**ঃ—কণ্ঠপর্যন্ত **আকণ্ঠ** (অব্যযীভাব সমাস) **আকণ্ঠ নিমজ্জিত**—আকণ্ঠ নিমজ্জিত—কর্মধারয় সমাস। **মাসতুত**—মাসি+তুত (প্রত্যয় অপত্যার্থে—অন্ত্যলোপ। (তুঃ পিসতুত, খুড়তুত—কিন্তু মামাত)।

১০। **বাচ্যান্তরিত কর**ঃ—(১) একখানা ব্যাপার টানিযা লইযা ছুটিয়া বাহির হইলাম। (২) আমরা ডিঙিতে যাব। (৩) হযতো সময়মত উপস্থিত হইতে পারা যাইবে না। (৪) মানুষ চাকরকেও তো এমন বিকট ভঙ্গি করিয়া আদেশ করে না। (৫) তিনি সুখে তামাক টানিতে লাগিলেন। (৬) ইঁহার বাজনা পরে শুনিয়াছিলাম। (৭) বস্তুতঃ আমি এমন স্বার্থপর অসজ্জন ব্যক্তি জীবনে অল্পই দেখিয়াছি। (৮) অবিশ্রাম চ্যাঁচামেচি করিয়া হুকুম করিতে লাগিলেন। (৯) মুড়ি-টুড়ি পাওয়া যায় না? (১০) ভাত খাস্‌নে? (১১) ইন্দ্র, বল না তোর ওই ওটাকে, একটু জোর করে টেনে নিয়ে চলুক। (১২) সে খবরটা পাঠককে দেওয়া আবশ্যক। (১৩) এ অঞ্চলে পথঘাট, দোকানপত্র সমস্তই ইন্দ্রের জানা ছিল (পৃঃ ১৩৩)। (১৪) এই গভীরতা যে কিরূপ অতলস্পর্শী, সেকথা যাহার জানা নাই তাহাকে লিখিয়া বুঝানো যায় না (পৃঃ ১৩৩)। (১৫) কিন্তু মনে হয় যেন পাইয়াছেন, না হইলে বাঙালী ডেপুটির মাঝে মাঝে এত সুখ্যাতি শুনিতে পাই কী করিয়া? (১৬) কোনোমতেই তাহাকে নিরস্ত করা যাইবে না (পৃঃ ১৩৫)। (১৭) সেইটা অতিক্রম করিয়া দেখা গেল, অনেক দূরে জলের ধার ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া পাঁচ-সাতটা কুকুর চীৎকার করিতেছে (পৃঃ ১৩৬)।

উত্তর ঃ—(১) একখানা ব্যাপার টানিয়া লইয়া ছুটিয়া আমার বাহিরে যাওয়া হইল। (২) ডিঙিতে আমাদের যাওয়া হবে। (৩) হয়তো সময়মত আমরা উপস্থিত হইতে পারিব না। (৪) মানুষদ্বারা চাকরকেও এমন বিকট ভঙ্গি করিয়া আদেশ করা হয় না। (৫) তাঁহার মুখে তামাক টানা হইতে থাকিল। (৬) ইঁহার বাজনা পরে শোনা হইয়াছিল। (৭) বস্তুতঃ এমন স্বার্থপর অসজ্জন ব্যক্তি আমার জীবনে অল্পই দেখা হইয়াছে **অথবা** বস্তুতঃ এমন স্বার্থপর অসজ্জন ব্যক্তি আমার জীবনে অল্পই দৃষ্ট হইয়াছে। (৮) অবিশ্রাম চ্যাঁচামেচি করিয়া তাঁহার হুকুম করা চলিতে লাগিল। (৯) আমরা মুড়ি-টুবি পাইতে পারি কিনা? (১০) ভাত খাওয়া হয় না? (১১) ইন্দ্র, তোর ওই ওটাকে বলা হোক না, একটু জোর করে টেনে নিয়ে ওর চলা হোক। (১২) স খবরটা পাঠককে অবশ্যই দিব। (১৩) এ অঞ্চলে পথঘাট, দোকানপত্র সমস্তই ইন্দ্র জানিত (পৃঃ ১৩৩)। (১৪) এই গভীরতা যে কিরূপ অতলস্পর্শী সেকথা যে জানে না তাহাকে লিখিয়া বুঝাইতে পারিব না। (১৫) কিন্তু মনে হয়, যেন তাঁহার পাওয়া হইয়াছে, না হইলে, বাঙালী ডেপুটির এত সুখ্যাতি শুনা যায় কী করিয়া? (১৬ কোনো-মতেই তাহাকে নিবস্ত করিতে পারিব না। (১৭) সেইটা অতিক্রান্ত হইবার পর দেখিলাম অনেক দূরে জলের ধার ঘেঁসিয়া দাঁড়ানো পাঁচ-সাতটা কুকুরের চীৎকার চলিতেছে।

১১। **উক্তি পরিবর্তন কর** ঃ—(১) ইন্দ্র আসিয়া হাজির। কাহল,—"...থিয়েটার হবে যাবি?" থিয়েটারের নামে একেবারে লাফাইয়া উঠিলাম। ইন্দ্র কহিল, "তবে কাপড় প'রে শিগ্‌গির আমার বাড়ি আয়।" **উত্তর** ঃ—(পরোক্ষ) (১) ইন্দ্র আসিয়া হাজির। অমুক জায়গায় থিয়েটার হইবে এবং সে যাইতে রাজী আছে কিনা শ্রীকান্তের কাছে জানিতে চাহিল। থিয়েটারের নামে শ্রীকান্ত একেবারে লাফাইয়া উঠিল। ইন্দ্র তাহাকে কাপড় পরিয়া শীঘ্র তাহাদের বাড়ি আসিতে বলিল।

(২) (**প্রত্যক্ষ**) ইন্দ্র কহিল, 'তা নয়। আমরা ডিঙিতে যাব।' **উত্তর** ঃ—(**পরোক্ষ**) ইন্দ্র তাহার পূর্বেকার ধারণা সংশোধন করিয়া বলিল তাহারা ডিঙিতে যাইবে। (৩) (**প্রত্যক্ষ**) "তোর নাম কী রে?.........তামাক সাজুক।" (পৃঃ ১২৯) **উত্তর** ঃ—(**পরোক্ষ**) (৩) নতুনদা তাচ্ছিল্যের স্বরে শ্রীকান্তের নাম জিজ্ঞাসা করিতে, সে ভয়ে ভয়ে নিজের নাম জানাইল। তখন তিনি দাঁত বাহির করিয়া ভর্ৎসনা করিয়া শ্রীকান্তের নামের শ্রীটুকু অনাবশ্যক বা গরিবের পক্ষে স্পর্ধাসূচক বিবেচনা করিয়া উহা বাদ দিয়া শুধু 'কান্ত' করিয়া লইলেন। তাহার পর তিনি তাচ্ছিল্যের সহিত "কান্ত"কে তামাক সাজিবার হুকুম দিয়া ইন্দ্রকে হুঁকা-কলিকার খোঁজ করিয়া ছোঁড়াটিকে দিয়া তামাক সাজাইবার নির্দেশ দিলেন। (৪) **প্রত্যক্ষ** ঃ তামাক সাজিয়া হুঁকা হাতে দিতে......দেখি বসি।" (৪) **উত্তর** ঃ—(**পরোক্ষ**)—তামাক সাজিয়া হাতে হুঁকা দিতে তিনি প্রসন্নমুখে

কান্তের বাসস্থান জানিতে চাহিলেন; তাহার গায়েরকাপড়টি দেখিয়া উহাকে ব্যাপার বলিয়া স্বীকার করিতেও ঘৃণা বোধ করিলেন, কারণ তাঁহার মতে উহার তেলের গন্ধে ভূত পালায়। তবে শরীরের (অংশবিশেষে নৌকার কাঠ) ফুটায উহার উপর বসার জন্য শ্রীকান্তকে তিনি উহা পাতিয়া দিতে হুকুম করিলেন।

(৫) (প্রত্যক্ষ)ঃ ইন্দ্র ব্যাকুল……আমাদের ফিরতে হবে। (পৃঃ ১২৯-৩০) **উত্তর**ঃ—(৫) (**পরোক্ষ**)ঃ ইন্দ্র, বাতাস পড়িয়া যাওয়ায, আর মোটেই পাল না চলিবার কথা, তাহাব 'নতুনদা'কে ব্যাকুলভাবে জানাইল। কিন্তু তাহার দাদা, অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সহিত ঐ "ছোঁডাটাকে" দিযা দাঁড টানাইবার পরামর্শ ইন্দ্রকে দিলেন। কলিকাতাবাসী তাহার নতুনদার অভিজ্ঞতায়, সে(ইন্দ্র) ম্লান হাসিয়া বিস্ময়ের সহিত উত্তর দিল, রেত ঠেলিয়া দাঁড়ে উজান বাহিয়া যাওয়া কাহারো সাধ্য নয়; সুতরাং দাদাব নিকট সে তাহাদের ফিরিযা আসিবার প্রস্তাব করিল।

(৬) (প্রত্যক্ষ) প্রস্তাব শুনিয়া……বিশেষ করে ধরেচে (পৃঃ ১৩০) **উত্তর**ঃ—(**পরোক্ষ**) প্রস্তাব শুনিয়া নতুনদা একমুহূর্তেই ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া ভাইকে গালি দিযা, তাঁহাকে নিরর্থক লইযা আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ওখানে যেমন করিয়াই হউক তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে, কারণ তথাকার লোকেরা যখন থিয়েটারে হারমোনিয়াম বাজাইবার জন্য বিশেষ করিয়া তাঁহাকে ধরিয়াছে তখন তাহাকে সেখানে অবশ্যই বাজাইতে হইবে।

(৭) প্রত্যক্ষঃ—ইন্দ্র কহিল,……প্রয়োজন নাই (পৃঃ ১৩০) **উত্তর**ঃ—ইন্দ্র নতুন দাদাকে আশ্বাস দিয়া কহিল তিনি না গেলেও কাজ বন্ধ থাকিবে না, কারণ তাঁহাদের বাজাইবার লোক আছে। ইহাতে নতুনদা বিরক্ত হইয়া তাঁহার ভাইয়ের কথার প্রতিবাদ করিলেন। সেই মেড়োর দেশেব ছেলেদের পক্ষে হারমোনিযম বাজানো অসম্ভব। যেমন করিয়া পারে তাঁহাব ভাই তাঁহাকে যেন লইযা চলে—ইহাই তাঁহার হুকুম।

১২। **অশুদ্ধি শোধন কর**ঃ—রাত্রি দুটা হইতে পরে আমাদের ডিঙা আসিয়া ঘাটের সহিত ভিরিল। আমার যে র‍্যাপারখানার বিকট গন্ধে কলিকাতার আগত বাবু ইতঃপূর্বে মুর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন সেইখানা গায়ের উপর দিয়া, তাহারই অবিশ্রান্ত নিন্দা করিতে করিতে করিতে, 'পা মুছিতেও ঘ্রিনা হয়' তাহা পুন পুন শুনাইতে শুনাইতে, ইন্দ্রের খানি পরিধান করিয়া তিনি সে যাত্রায় আত্মরক্ষা করিযা বাটী গেলেন। যাই হউক, তিনি যে দয়া করিয়া ব্যঘ্র-মুখ-কবলিত না হওয়ায় স্বশরিরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, তাহার এই অনুগ্রহের আনন্দেই আমরা অতীব পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিলুম। এত উপদ্রবাত্যাচার হাসিমুখে সোহ্য করিয়া আজ নৌকা চরার পরিসমাপ্ত করিয়া, এই দুর্জয় শিতের গাত্রে কোচার খুট মাত্র অবলম্বন করিয়া কাপিতে কাপিতে বাটী ফিরিয়া গেলুম।

১৩। **শূন্যস্থান পূর্ণ কর**ঃ—"সেটা — পড়িয়া আছে" সংবাদ —, তিনি — দুঃখক্লেশ — হইয়া, তাহা অবিলম্বে — করিবার জন্য — — হইয়া উঠিলেন।

তার — কোটের — গলাবন্ধের — , মোজার — , দস্তানার— , এ'কে — পুনঃ — শোকপ্রকাশ — — । **উত্তর** নিজে প্রস্তুত কর ।

১৪ । **নির্দেশ অনুসারে পরিবর্তন কর** ঃ—(১) জানোয়ারের মতো বসে থাকা হচ্ছে কেন ? (অস্ত্যর্থক বাক্যে)। (২) ইন্দ্র আশ্বাস দিলেও আমি রাজী হইলাম না (জটিল বাক্যে)। (৩) বালির উপর দৌড়ান যায় না (কর্তৃবাচ্যে)। (৪) ইন্দ্র নিজেও তাহার ভ্রাতার ব্যবহারে মনে মনে লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিল (ইন্দ্রকে সম্বন্ধপদে ব্যবহার কর)। (৫) ভাগ্যে এমন-সব নমুনা কদাচিৎ চোখে পড়ে (নাস্ত্যর্থক বাক্যে)। (৬) আমার থিয়েটারে হারমোনিয়াম বাজাতেই হবে (কর্তৃবাচ্যে)। (৭) তিনি প্রশ্ন করিলেন, "তুই থাকিস কোথায় রে কান্ত ? তোর গায়ে ওটা কালোপানা কী রে ? র‍্যাপার ? আহা, ও র‍্যাপারের কী শ্রী। তেলের গন্ধে ভূত পালায়। ফুটচে— । পেতে দে দেখি, বসি" (উক্তি পরিবর্তন কর)। (৮) আমি নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলাম (নাস্ত্যর্থক বাক্যে)। (৯) ইন্দ্র চীৎকার করিয়া ডাকিল, "নতুন-দা" (উক্তি পরিবর্তন কর)।" (১০) জোর হাওয়া আছে, দেরি হবে না (অস্ত্যর্থক বাক্যে)। (১১) জানোয়ারের মতো বসে থাকা হচ্ছে কেন ? (মিশ্র বাক্যে)। (১২) সেখানে যাইতে হইলে ট্রেনে যাইতে হয় (জটিল বাক্যে)। (১৩) রাত্রি দুইটার পর আমাদের ডিঙি আসিয়া ঘাটে ভিড়িল (জটিল বাক্যে)। (১৪) নতুন-দা জবাব দিলেন, "এই ছোঁড়াটাকে দেনা, দাঁড় টানুক (উক্তি পরিবর্তন কর)। (১৫) তাঁহার একাকী থাকিতেও ইচ্ছা নাই (অস্ত্যর্থক বাক্যে)। (১৬) তিনি একটুকুও বিচলিত হইলেন না (অস্ত্যর্থক বাক্যে)। (১৭) নাবা দরকার (বাচ্যান্তরিত কর)। (১৮) "হ্যাঁ, দামী দস্তানাটা মাটি করে ফেলি আর-কি (নাস্ত্যর্থক)। (১৯) নে-যা করচিস্ কর (নাস্ত্যর্থক)। (২০) কলিকাতার বাবু কাবু হইয়া বলিলেন, "হ্যাঁরে ইন্দ্র, এ দিকে খোট্টা-মোট্টাদের বস্তি-টস্তি নেই ? মুড়ি-টুড়ি পাওয়া যায় না ?" (উক্তি পরিবর্তন)। (২১) "তবে লাগা লাগা। ওরে ছোঁড়া—ঐ — টান্‌না একটু জোরে ভাত খাস নে ? ইন্দ্র বল্ না তোর ওই ওটাকে, একটু জোর করে টেনে নিয়ে চলুক।" (সাধু ভাষায় পরিবর্তন কর) (২২) তিনি জ্যোৎস্নার আলোকে গঙ্গার শুভ্র সৈকতে পদচারণা করিতে লাগিলেন (চলিত ভাষায়)। (২৩) নতুন-দা মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিলেন, ভয় ! আমরা দর্জিপাড়ার ছেলে—যমকে ভয় করিনে, তা জানিস ? (উক্তি পরিবর্তন কর)। (২৪) ইন্দ্র ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আকণ্ঠ নিমজ্জিত মূর্চ্ছিতপ্রায় তাহার দর্জিপাড়ার মাসতুত ভাইকে টানিয়া তীরে তুলিল। (সম্প্রসারিত কর)। (২৫) এই দুর্দান্ত শীতের রাত্রে তুষারশীতল জলে আকণ্ঠ মগ্ন থাকিয়া অর্ধঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছিলেন। (সম্প্রসারিত কর)।

উত্তর ঃ—(১) জানোয়ারের মতো বসে থাকা অনুচিত (অসঙ্গত, অন্যায়)। (২) ইন্দ্র যখন আশ্বাস দিল তখনও আমি রাজী হইলাম না। (৩) বালির উপর

কেহ দৌড়াইতে পারে না। (৪) ইন্দ্রের নিজেরও তাহার ভ্রাতার ব্যবহারে মনে মনে লজ্জা ও ক্ষোভ বোধ হইয়াছিল। (৫) ভাগ্যে কদাচিৎ এমন সব নমুনা চোখে পড়ে না এমন নয়। (৬) আমি থিয়েটারে হারমোনিয়াম নিশ্চয়ই বাজাব অথবা আমি থিয়েটারে হারমোনিয়াম বাজাবই। (৭) তিনি অবজ্ঞামিশ্রিত স্বরে শ্রীকান্তের বাসস্থান আর তার গায়ের কালোপানা জিনিসটার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। ঐ জিনিসটাকে ভীষণ দুর্গন্ধের জন্য তিনি ব্যাপার বলিয়া স্বীকারই করিতে চাহেন না। তবে শরীরের অংশবিশেষে নৌকার কাঠ ফুটায় তিনি ঐ তথাকথিত ব্যাপারকেই পাতিয়া দিবার হুকুম দিলেন। (৮) আমার আর উৎসাহ রহিল না অথবা, আমি আর উৎসাহ বোধ করিলাম না। (৯) ইন্দ্র চীৎকার করিয়া "নতুনদা"কে ডাকিতে লাগিল। (১০) জোর হাওয়া আছে, সময়মত পৌঁছান যাবে অথবা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই যেতে পারব। (১১) জানোয়ার যেমন বসে থাকে তেমন করে বসে আছ কেন? (১২) যখনই সেখানে যাও, তোমাকে টেনে যাইতে হইবে। (১৩) যখন আমাদের ডিঙি ঘাটে আসিয়া ভিড়িল তখন রাত্রি দুইটা বাজিয়াছে। (১৪) নতুনদা অবজ্ঞামিশ্রিত স্বরে ঐ ছোড়াটাকে দাঁড় টানিবার কাজে লাগাইতে হুকুম দিলেন। (১৫) তাঁহার একাকী থাকিতে অনিচ্ছা অথবা, একাকী থাকা তাঁহার ইচ্ছার বিপরীত, অথবা, একাকী থাকায় তাঁহার ইচ্ছার অভাব। (১৬) তিনি সম্পূর্ণ শান্ত রহিলেন অথবা তিনি সম্পূর্ণ স্থির হইয়া রহিলেন, তিনি সম্পূর্ণ অবিচলিত হইয়া রহিলেন, তিনি পূর্ণ স্থৈর্য অবলম্বন করিলেন। (১৭) আমি অবশ্য নামিব। (১৮) না। আমি দস্তানাটা আমি মাটি করে ফেলব না। (১৯) নে। যা করছিস্ তা ছেড়ে দিস্ নে। (২০) কলিকাতার বাবু কাবু হইয়া কাতরকণ্ঠে ইন্দ্রের নিকট জানিতে চাহিলেন ঐ অঞ্চলের ঘৃণ্য অধিবাসীদের বস্তি প্রভৃতিতে মুড়ি প্রভৃতি পাওয়া যায় কিনা। (২১) তবে, (নৌকা) তীরে লইয়া চল্। তীরে লইয়া চল্। ওরে ছোকরা। ওরে! টান্ না, শক্তি দিয়া টান্, অল্প শক্তি দিয়া। ভাত খাওয়া হয় না বুঝি? ইন্দ্র, তোর ঐ ওটাকে বল্ না, ও শক্তি দিয়া টানিয়া লইয়া চলুক। (২২) তিনি চাঁদনির আলোতে বালুচরের উপর পায়চারি করতে লাগলেন। (২৩) নূতনদা তাচ্ছিল্যের সহিত বিদ্রূপপূর্ণ স্বরে জানাইয়া দিলেন দর্জিপাড়ার ছেলেরা যমকেও পর্যন্ত ভয় করে না। (২৪) ইন্দ্র ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দেখিল তাহার দর্জিপাড়ার মাসতুতভাইয়ের কণ্ঠ পর্যন্ত জলে ডুবিয়াছে এবং সে প্রায় মূর্চ্ছিত হইয়াছে; তাহাকে টানিয়া তীরে তুলিল। (২৫) এই রাত্রে যখন দুর্দান্ত শীত পড়িয়াছে, তুষারের মতো শীতল জলে কণ্ঠ পর্যন্ত মগ্ন থাকিয়া, অর্ধঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া, পূর্বে যে পাপ করিয়াছেন সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছিলেন।

কৌরবসভায় কৃষ্ণ (পৃঃ ১৩৪-১৩৮)

সন্ধি ঃ—নিদাঘান্তে—নিদাঘ + অন্তে। সজ্জন—সৎ + জন। নিরপরাধ—

নিঃ+অপরাধ। আনন্দাশ্রু—আনন্দ+অশ্রু। প্রত্যাখ্যান—প্রতি+আখ্যান। নির্যাতন—নিঃ+যাতন।

সমাসঃ—প্রকৃতিস্থ—প্রকৃতিতে (স্বভাবে—স্বভাবতঃ) যিনি থাকেন, প্রকৃতি + √স্থা+ক (কর্তৃবাচ্যে) উপপদ তৎপুরুষ। ধর্মসংগত—ধর্মকে সঙ্গত (প্রাপ্ত) (দ্বিতীয়া তৎপুরুষ)। নষ্টকীর্তি—নষ্ট হইয়াছে কীর্তি যাহাদ্বারা (বহুব্রীহি)। **আনন্দাশ্রু**—আনন্দ জনিত অথবা আনন্দজাত অশ্রু (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। ঐশ্বর্যভ্রষ্ট—ঐশ্বর্য হইতে ভ্রষ্ট (পঞ্চমী-তৎপুরুষ)। দূরদর্শিনী—দূরের (বস্তু বা ব্যাপারকে) দর্শন করেন যিনি (স্ত্রীলিঙ্গে) (উপপদ সমাস) দূর+ √দৃশ্+ণিন্ (কর্তৃবাচ্যে)+ঈ স্ত্রীলিঙ্গে=পরিণাম-দর্শিনী, বিচক্ষণা। **কুলঘ্ন**—কুলকে হনন (নষ্ট) করে যে, কুল+ √হন্+টক্ (উপপদ সমাস)।

পদটীকাঃ—যত্নবান্—যত্ন+মতুপ্ (=বতুপ্) প্রত্যয় (অস্ত্যর্থে)। (কপট) **দ্যুতে** (হরণ করেছিলেন) করণে তৃতীয়া—'এ' বিভক্তি। ন্যায্য—ন্যায়ানুমোদিত —ন্যায+যৎ (অনপেতার্থে-ন্যায়সংগত)। আশ্চর্য—আ+ √চর্+য=অনিত্য, যাহা সচরাচর ঘটে না। পরাস্ত—পরা+ √অস্ (নিক্ষেপ করা)+ক্ত (কর্মবাচ্যে) =পরাভূত। (অবশেষে) **তোমাকে** (সবই দান করতে হবে)=কর্তায় দ্বিতীয়া বিভক্তি (দান করতে হবে=অবশ্য দিতে হইবে)। (প্রভুত্বের) **লোভে**— (হারাচ্ছে)—হেত্বর্থে তৃতীয়া—এ বিভক্তি।

অনুশীলনী

১। অর্থের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া বাক্য রচনা কর:—**শরণাপন্ন, শরণ্য; ন্যায়, ন্যায্য; ধর্ম, ধর্ম্য; শুচি, সূচী; প্রকৃতিস্থ, প্রাকৃত; আশ্রয়, আশ্রিত; লক্ষ্য, লক্ষ; বাক্য, বাচ্য।**

২। সংক্ষেপে প্রকাশ কর:—অর্থলাভের হেতুভূত, ভালোবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন যিনি (সমাস অথবা তদ্ধিতান্তপদ) নিজের বংশকে নষ্ট করে যে, একতার বন্ধনে বাঁধা, যে কোন শাসন মানে না, যাহা পাওয়া উচিত, ন্যায়সম্মত।

৩। ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন কর:—পৈতৃক, কুলঘ্ন, ঐক্য, আশ্চর্য, নিবারিত, প্রকৃতিস্থ, প্রতিষ্ঠিত।

৪। চলিত ভাষায় প্রকাশ কর:—অশ্রুমোচন করা, পরাস্ত করা, প্রীতির বশে, ঐশ্বর্যভ্রষ্ট, দুষ্টপ্রবৃত্তি, দুরাত্মা, ক্রুদ্ধ হওয়া, পরাধীন, যুদ্ধারম্ভ, সর্বস্ব।

৫। (১) ব্যাকরণ সংক্রান্ত টীকা লিখ:—(ক) শকুনি **কপট দ্যুতে তাঁর সর্বস্ব** হরণ করেছিলেন। (খ) অবশেষে **তোমাকে** সবই দান করতে হবে। (গ) বিজিত ধন পিতার আজ্ঞায় **তাদের** ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। (ঘ) ভীষ্মাদি তোমার **অন্নে** প্রতিপালিত। (২) নির্দেশ অনুসারে পরিবর্তিত কর:— (ক) আপনি তাহাদের **পুত্রের ন্যায়** পালন করুন (তদ্ধিতান্ত পদে)...... **পুত্রবৎ**......। (খ) **সূচীর অগ্রভাগে যে পরিমাণ ভূমি বিদ্ধ হয় তাও**

আমি ছাড়ব না (একপদে)। **উত্তর ঃ**—সূচ্যগ্রভূমিও আমি ছাড়ব না (উঃ মঃ ১৯৬০)। (গ) ইহারা পরস্পরের **সুহৃৎ** (**সুহৃৎ** হইতে নিষ্পন্ন তদ্ধিত পদ প্রয়োগ কর)। **উত্তর ঃ**—(গ) ইহাদের পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য আছে।

৬। **বাচ্য পরিবর্তন কর ঃ**—(১) আপনি মহাভয় থেকে এদের রক্ষা করুন। (২) তারপর কপট দ্যূত শকুনি তাঁহার সর্বস্ব হরণ করেছিলেন। (৩) যিনি সাক্ষাৎ মহাদেবকে যুদ্ধে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, আমি যার সঙ্গে থাকব, সেই অর্জুনকে তুমি জয় করবার আশা কর ? (৪) যদি তুমি এঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান কর তবে নিশ্চয় পরাভূত হবে। (৫) ভীমসেন তোমাকে আলিঙ্গন করুন। (৬) সেখানে শকুনি তাঁদের রাজ্য জয় করেছিলেন। (৭) তুমি আর তোমার মন্ত্রীরা যুদ্ধে বীরশয্যাই লাভ করবে। (৮) সর্বদাই তুমি পাণ্ডবদের সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার করে আসছ। (৯) ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে বিদুর দুর্যোধনকে আবার সভায় নিয়ে এলেন। (১০) ভীষ্মাদি তোমার অন্নে পালিত। **উত্তর ঃ** (১) আপনা দ্বারা মহাভয় হইতে ইঁহারা রক্ষিত হউন। (২) তারপর শকুনি কর্তৃক কপট দ্যূতে তাঁহার সর্বস্ব হৃত হইয়াছে। (৩) যুদ্ধে যাঁহাদ্বারা সাক্ষাৎ মহাদেব সন্তোষিত হইয়াছিলেন, যাঁহার সঙ্গে আমার থাকা হইবে, সেই অর্জুনকে পরাজিত করিবার আশা করা যায় কি ? (৪) যদি তোমাকর্তৃক ইঁহার অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হয় তবে নিশ্চয়ই তোমাকে পরাভূত করিবে। (৫) ভীমসেন কর্তৃক তুমি আলিঙ্গিত হও। (৬) সেখানে শকুনিদ্বারা তাঁহাদের রাজ্য জিত হইয়াছিল। (৭) তোমাকর্তৃক আর তোমার মন্ত্রিগণকর্তৃক বীরশয্যা লব্ধ হইবে। (৮) ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে বিদুর দ্বারা দুর্যোধন আবার সভায় নীত হইলেন। (৯) সর্বদাই তোমার পাণ্ডবদের সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার করিয়া আসা হইতেছে। (১০) তুমি ভীষ্মাদিকে অন্নদ্বারা পালন করিতেছ সেইজন্য তাঁহাদের দ্বারা জীবন বিসর্জিত হইতে পারে, কিন্তু যুধিষ্ঠির শত্রুরূপে দ্রষ্টব্য নহে।

৭। **উক্তি পরিবর্তন কর ঃ**—গান্ধারী বললেন·········করছ। (পৃঃ ১৪৩) (১) **উত্তর ঃ (পরোক্ষ)** দুর্যোধনকে সন্ধির প্রস্তাবের তাৎপর্য বুঝাইবার জন্য, গান্ধারীকে আহ্বান করা হইলে, তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন অশিষ্ট, অবিনীত, ধর্মনাশক লোকের রাজ্য পাওয়া উচিত নহে, তথাপি সে রাজ্য পাইয়াছে। ইহার জন্য মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে গান্ধারী দোষী করিলেন, কারণ পুত্রের কুপ্রবৃত্তি জানিয়াও তিনি তাহার মতে চলিয়াছেন এবং মূঢ় দুরাত্মা লোভী কুসঙ্গী পুত্রকে রাজ্য দিয়া তাহার ফল ভোগ করিতেছেন।

(২) দুঃশাসন দুর্যোধনকে······ ···হাতে দেবেন (পৃঃ ১৪২)। **উত্তর** (২) (**পরোক্ষ**) ঃ—সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইবার জন্য, দুঃশাসন দুর্যোধনকে সতর্ক করিলেন, যদি তিনি সন্ধি না করেন, তবে ভীষ্মদেব এবং তাঁহাদের পিতা তাঁহাদের দুইজনকে বন্ধন করিয়া পাণ্ডবদের হাতে সমর্পণ করিবেন।

৮। **বিশেষণ পদ দ্বারা শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ— কৃষ্ণ —** বাক্যে দুর্যোধনকে

বললেন, — — বংশে তোমার জন্ম, তুমি — ও — যা — তাই কর। তুমি পিতামাতার — হও। যে লোক — সুহৃদগণের উপদেশ — করে — মন্ত্রণা-দাতাদের মতে চলে সে — বিপদে চলে। উত্তর—নিজে দাও।

৯। **শুদ্ধ করিয়া লিখঃ**—এরা নিবাপবাধ দাতা লজ্জাশীল, সৎজন সৎবংশীর এবং পরস্পরেব একে অন্যে সুহৃদ—আপনি মহৎ ভয় থেকে এদের রক্ষা করেন। এই সকল বাজাগণ, যাবা উত্তম বসন ও মাল্যধারন করিয়া ভোজনপানে তৃপ্ত হযে নিবাপদে নিজ গৃহে ফিরে যান। পিতৃহীন পাণ্ডবেব পুত্রগণ আপনার আশ্রযহেতু বর্ধিত হয়েছিল, অধুনা আপনি এখনও তাদেব ভেদ না নির্বিশেষে পুত্রেব ন্যায় পালন করুন।

১০। **নির্দেশ অনুসারে পরিবর্তন করঃ**—(১) তাতেও তুমি সম্মত নও (অস্ত্যর্থক বাক্যে)। (২) আপনি তাঁদেব পুত্রের ন্যায় পালন করুন (সংক্ষেপ কব)। (৩) কেউ তার সহায় হয় না (অস্ত্যর্থক বাক্যে। ৪) সূচীব অগ্রভাগে যে পবিমাণ ভূমি বিদ্ধ হয় তাও আমি ছাডব না (সংক্ষেপ কব)। (৫) আপনি ইচ্ছা কবলেই এই বিপদ নিবাবিত হতে পাবে (বাচ্য পবিবর্তন কর)। (৬) কোন্ মানুষ তাঁর সমকক্ষ? (নির্দেশসূচক বাক্যে)। (৭) আপনাব নিমিত্ত কোন অন্যায় কর্ম হওয়া উচিত নয (অস্ত্যর্থক বাক্যে)। (৮) আমাব কী দোষ? (নির্দেশসূচক বাক্যে)। (৯) ধৃতবাষ্ট্র বলিলেন, দুর্যোধন, মহাত্মা কৃষ্ণেব কথা অতিশয় মঙ্গলজনক, তাতে অলব্ধ বিষযেব লাভ হবে, লব্ধ বিষয়েব রক্ষা হবে (উক্তি পরিবর্তন)। (১০) লোকে যেন তোমাকে নষ্টকীর্তি কুলঘ্ন না বলে (বাক্য সম্প্রসারণ কব)। (১১) মহারাজ, তুমিই দোষী, পুত্রেব দুষ্ট প্রবৃত্তি জেনেও স্নেহবশে তার মতে চলেছ, মূঢ, দুরাত্মা, লোভী, কুসঙ্গী পুত্রকে বাজ্য দিয়ে এখন তাব ফল ভোগ করছ। (সাধু ভাষায়)। **উত্তরঃ**—(১) তাহাতেও তুমি অসম্মত **অথবা** তাহাতেও তোমাব সম্মতিব অভাব। (২) আপনি তাদের পুত্রবৎ পালন করুন। **অথবা** আপনি তাদেব পুত্রবৎ পালুন। (৩) সে সহায়হীন। **অথবা** সে অসহায়। (৪) সূচ্যগ্রভূমি আমাব অত্যাজ্য। (৫) আপনার ঈপ্সিত হইলেই আপনি বিপদ নিবাবণ করিতে পারেন। (৬) সকল মানুষই তাঁহার অসমকক্ষ **অথবা** সকল মানুষই তাঁহার সঙ্গে অতুলনীয় (৭) আপনাব নিমিত্ত সকল কর্ম ন্যায্য হওয়া উচিত। **অথবা** আপনাব নিমিত্ত অন্যায় কর্ম হওয়া অনুচিত। (৮) আমাব কোন দোষ নাই। **অথবা** আমি দোষশূন্য। (৯) ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে বুঝাইলেন কৃষ্ণের কথা মঙ্গলজনক, তাহাতে অলব্ধ বিষয়ের লাভ এবং লব্ধ বিষয়েব রক্ষা হইবে। (১০) তোমার কীর্তি নষ্ট হইয়াছে আর তুমি কুলনাশ করিয়াছ, একথা যেন লোকে না বলে। (১১) মহারাজ, তুমিই দোষী, পুত্রের দুষ্ট প্রবৃত্তি জানিয়াও স্নেহবশে তাহার মতে চলিয়াছ, মূঢ়, দুরাত্মা, লোভী, কুসঙ্গী পুত্রকে রাজ্য দিয়া এখন তাহাব ফল ভোগ করিতেছ।

স্বাধীনতা লাভের পর (পৃঃ ১৪৯-১৬১)

সন্ধি ঃ—নিশ্চিন্ত—নিঃ+চিন্ত। উদ্বর্তন—উৎ+বর্তন। শরদভ্রচ্ছায়া—শরদ্ (ং)+অভ্র+ছায়া। **মনোভাব**—মনঃ+ভাব (**মনভাব** নহে)। ভদাত্মিকা—ভদ+আত্মিকা। অপরিচ্ছন্ন—অ-পরি+ছন্ন। পৌরুষাভিমান—পৌরুষ+অভিমান। তিরস্কার—তিরঃ+কার। দুস্থ—দুঃ+স্থ (দুস্থও হয)। বিপৎসঙ্কুল—বিপদ্+সঙ্কুল। সংস্কার—সম+কার।

সমাস ঃ—বহুপ্রাণহানিজনিত—বহুর (বহুলোকের) প্রাণ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ) অথবা বহুপ্রাণ (কর্মধারয) তাহাদিগের হানি (ষষ্ঠী তৎ) তদ্দ্বারা জনিত (তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস)। বিধিবদ্ধ—বিধি দ্বারা বদ্ধ (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। শরদভ্রচ্ছায়া—শরতের অভ্র (ষ।) ষষ্ঠী তৎপুরুষ, তাহার ছায়া (ষষ্ঠীতৎ)। সন্ধ্যাভ্রবিভ্রমনিভ—সন্ধ্যার অভ্র (ষষ্ঠী তৎ) তাহার বিভ্রম (ষষ্ঠীতৎ) তাহার মতো, (নিত্য তৎপুরুষ সমাস)। **শৃঙ্খলানিষ্ঠ**—শৃঙ্খলায় নিষ্ঠা যাহার (বহুব্রীহি সমাস)। **দ্বেষাদ্বেষি**—একের অন্যের প্রতি দ্বেষ (কর্মব্যতিহারে বহুব্রীহি)। ভেদাত্মিকা—ভেদই আত্মা (স্বভাব) যাহার (বহুব্রীহি) ভেদাত্মক স্ত্রীলিঙ্গে—'ভেদাত্মিকা'—'বুদ্ধি' পদের বিশেষণ (বুদ্ধি স্ত্রীলিঙ্গ) [তুঃ 'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি'—গীতা]। বিয়ে-বাড়ি=বিয়ের বাড়ি (বিবাহ>বিয়া>বিয়ে) ষষ্ঠী তৎপুরুষ (আধার আধেয সম্বন্ধে ষষ্ঠী)। **মানহানিকর**=মানের হানি (ষষ্ঠী তৎ) মানহানি করে যে—বা যাহা, **মানহানি**+ √কৃ+ট (উপপদ সমাস)। **মানবজমিন**—মানবরূপ জমিন (রূপক কর্মধারয) তৎসম ও বিদেশী পদে সমাস)

পদটীকা ঃ—আত্মসাৎ—আত্মন্+সাৎ (সমগ্রতা অর্থে—সবটা নিজের করিয়া লওয়া—যাহা নিজের ছিল না তাহাকে নিজের করিয়া লওয়া)। শৈথিল্য—শিথিল+ষ্যঞ্ (ভাবার্থে)—শিথিলতা। মূঢ়তা—√মুহ্+ক্ত=মূঢ়+তা (ভাবে) =বোকামি। অনুকল্প—পরিবর্তিত রূপ [কল্পকে (মুখ্য ব্যবস্থা) অনুগমন করিয়াছে যাহা প্রাদিতৎপুরুষ সমাস]। **স্বার্থে স্বার্থে**—সহার্থে তৃতীয়া—'এ' বিভক্তি। বিদ্ধ—ব্যধ্+ক্ত (কর্মবাচ্যে)। **ছুড়িয়া ফেলা**—যৌগিক বিশেষণ (বিশেষ্য 'জিনিস') (তুঃ 'খসিয়া পড়া', 'লুটিয়ে পড়া')। **তছনছ**—[তচ্নচ্] বিপর্যস্ত, [হিন্দী তহস্ নহস্]। প্রসুপ্ত—যাহা ঘুমাইয়া আছে—প্র+স্বপ্+ক্ত কর্তৃবাচ্যে)। **কল্যাণাভিমুখী** (হইবে)—যাহা পূর্বে কল্যাণের অভিমুখে ছিল না তাহা কল্যাণের অভিমুখ হইবে—কল্যাণাভিমুখ+চি প্রত্যয (অভূততদ্ভাবে)= "কল্যাণাভিমুখী" (**এখানে স্ত্রীলিঙ্গ নহে) (গতি সমাস)**।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীতার্থ শব্দ দ্বারা বাক্য রচনা কর :—[বাক্য রচনা নিজে করিবে।] প্রসুপ্ত—প্রবুদ্ধ। পরিচ্ছন্ন—অপরিচ্ছন্ন। শোভন—অশোভন। গ্রহণীয়=বর্জনীয়। সঞ্চয়—অপচয়। ক্ষতি—লাভ। শৃঙ্খলা—বিশৃঙ্খলা। স্বাতন্ত্র্য—পরতন্ত্রতা। প্রকৃতিস্থ—অপ্রকৃতিস্থ। ভেদবুদ্ধি—ঐক্যবোধ। নিম্নস্তর—উচ্চস্তর। বিজয়—পরাজয়। সংগ্রাম—সন্ধি। সম্মতি—অসম্মতি।

২। চলিত ভাষায় প্রকাশ কর :—আত্মসাৎ, শৈথিল্য, মূঢ়তা, ভেদবুদ্ধি, ইষ্ট অপরিচ্ছন্ন, সংক্রামক ব্যাধি, অস্ত্রাঘাত, খণ্ডিত, বিধিবদ্ধ, ভজনালয়, কুণ্ডল, প্রসুপ্ত আরব্ধ, শ্রম, শিথিল, তিরস্কার।

৩। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম কর :—মানবজমীন, বিধিবদ্ধ, সন্ধ্যাভ্রবিভ্রমনিভ, শৃঙ্খলানিষ্ঠ, ভেদাত্মিকা, মানহানিকর।

৪। পদান্তরে পরিবর্তিত কর :—পার্থক্য, চরিত্র, কঠোর, স্বাতন্ত্র্য, বিপন্ন, মূঢ়, অধিকার, উদ্বর্তন, অশৌচ, বশ্যতা, অধীন, সমকক্ষ, আবিষ্ট, অবসান, গরিষ্ঠ, মজ্জীভূত।

৫। (ক) মিশ্রবাক্যে পরিণত কর :—(উঃ মাঃ ১৯৬১) ভিত্তি দৃঢ়······হইত না। উত্তর ঃ—যদি ভিত্তি দৃঢ় না হইত তবে পাথরে গড়া···হইত না। (খ) সরল বাক্যে পরিণত কর :—স্বদেশভূমি ·····ভাই (পৃঃ ১৫৩) উত্তর ঃ—স্বদেশ ভূমির মাতৃত্বহেতু দেশবাসী মাত্রেই ভাই।

৬। বাচ্য পরিবর্তন কর ঃ—(১) কেবল ধার্মিককে রাজা করিলেই ধর্মরাজ্য সংস্থাপিত হইল না। (২) ধর্মরাজ্য সংস্থাপন করিয়া রক্ষার জন্য ধর্মানুমত ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করাও চাই। (৩) এই শাশ্বতী ভাগবতী উক্তি প্রযোজ্য। (৪) সিজু গাছে কখনও কি চাঁপাফুল ফুটে। (৫) — — তাহা উপলব্ধি করা প্রত্যেক দেশবাসীর কর্তব্য। (৬) — — সংখ্যাগরিষ্ঠের বিজয়কে যথাযোগ্য বলিয়া নতশিরে স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। (৭) প্রাচীন গ্রীসের আদর্শই অনুসরণীয়। (৮) লাউডস্পীকারগুলি গানকে বাণে পরিণত করিয়া আমাদের কানকে বিদ্ধ করে (পৃঃ ১৫০)। (৯) শৃঙ্খলা সকল রীতিনীতিকে শাসন করে কিন্তু স্মৃতির দাসত্ব করে। (পৃঃ ১৫৭) (১০) বিনয় পাত্রতা অর্থাৎ যোগ্যতা নির্দেশ করে। উত্তর ঃ—(১) কেবল ধার্মিককে রাজা করা হইলেই (দেশবাসী) ধর্মরাজ্য সংস্থাপন করিল না। (২) ধর্মরাজ্য সংস্থাপিত করিয়া (উহার) রক্ষার জন্য (দেশবাসী) ধর্মানুমত ব্যবস্থাও অবশ্য করিবে। (৩) এই শাশ্বতী ভাগবতী উক্তিকে অবশ্যই প্রয়োগ করিবে। (৪) সিজুগাছে কি কখনও চাঁপাফুলের ফুটা হয় ? (৫) —তাঁহা প্রত্যেক দেশবাসী অবশ্যই করিবে। (৬) — — — সংখ্যাগরিষ্ঠের বিজয় নতশিরে স্বীকার করিয়া লইয়া থাকে বা থাকেন। (৭) — — প্রাচীন গ্রীসের আদর্শকেই অনুসরণ করিতে হইবে। (৮) লাউডস্পীকারগুলি দ্বারা গান বাণরূপে পরিণত হইলে উহাদ্বারা আমাদের কান বিদ্ধ হয়। (৯) শৃঙ্খলা দ্বারা সকল রীতি নীতি শাসিত হয় কিন্তু উহাদ্বারা স্মৃতির দাসত্ব করা হয়। (১) বিনয়দ্বারা পাত্রতা অর্থাৎ যোগ্যতা নির্দিষ্ট হয়।

৭। শুদ্ধ করিয়া লিখ ঃ—সাধীনতা। নিশ্চিন্ত্য। কর্তৃপক্ষীয় দায়ি থাকিবেন। সাধত্ব। অঙ্গিভূত। সাদগ্রহন করা। জাতিয় জিবনের সর্ববিদ দুর্বলতা, শৈথিলা, মূড়তা, দারীত্ব ভারবহণ। অবসাদগ্রস্থ। এই রকম অনেকটা এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন। ইদানিন্তন। প্রযুজ্য। ঘটনা চাকার উৎবর্তণে সাধীনতা আসিয়া পরিল। রাহুগ্রাস জাত অশৌজের অন্ত হয় নাই। জাতী যদি সুস্থ্য সবলবান হইয়া গরিয়া না উঠে আমাদের সাধীনতা হইবে শরতভ্রছায়া

অথোবা সোদ্ধাভ্রবীভ্রমণিড। আমরা এখোন গানপত্ত্য, অর্থাৎ মানে জোন গনই আমাদের অধিপতী ও আমাদের ভাগ্যবিধাতৃ। কাঁচের আঁকরেও পদ্মরাগ জম্মে না। এই অধীকারের মূল্য মর্যদা ও দায়িত্ব যে কতো উপলব্ধি করা প্রত্যেক দেশবাসীগণের কর্তব্য। সংখ্যা গরীষ্ট। দেষাদ্বেষী। থুতুশ্লেষ্মায় অপরিচ্ছন্ন। বিপৎজনক। ভাঙা কাঁচের জীনিশ। বিএবাড়ীর জীনিশপত্তর নছতছ করিয়া চলিয়া যাইত। তাই স্কুলের হাই বেঞ্চিগুলিকে অক্ষত দেখা যায় না, সে সবগুলিতে ছাত্র বিবগণসমুহ অস্ত্রঘাতে নিজের নাম অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছেন।

৮। **শূন্যস্থান পূর্ণ কর** :—জাতীয় — — বড়ো — শৃঙ্খলাবোধ — বলেন এই — যে — — বিদেশী — কাছে — হইযাছে — প্রধান —, তাহাদের — সেনার — সামরিক — সুব্যবস্থা আর — বহুসংখ্যক — মধ্যে তাহার — অভাব।

৯। **লিঙ্গ পরিবর্তন কর** :—নিশ্চিন্ত—নিশ্চিন্তা। দায়ী—দায়িনী। হস্তগত—হস্তগতা। অঙ্গীভূত—অঙ্গীভূতা। মূঢ়—মূঢ়া। উপভোগ্য—উপভোগ্যা। সুস্থ—সুস্থা।, প্রকৃতিস্থ—প্রকৃতিস্থা। বহুপ্রাণহানিজনিত—বহুপ্রাণহানিজনিতা। অবসাদগ্রস্ত—অবসাদগ্রস্তা। সংস্থাপিত—সংস্থাপিতা। ধর্মানুমত—ধর্মানুমতা। শাশ্বত—শাশ্বতী। ভাগবত—ভাগবতী প্রযোজ্য—প্রযোজ্যা। অসমাপ্ত—অসমাপ্তা। নির্বাচিত—নির্বাচিতা। পূর্ণ—পূর্ণা। ভাগ্যবিধাতা—ভাগ্যবিধাত্রী। প্রতিনিধি—মহিলা-প্রতিনিধি। শাসক—শাসিকা। জাতীয়—জাতীয়া। সর্বাঙ্গীন—সর্বাঙ্গীনা। আবিষ্ট—আবিষ্টা। আবদ্ধ—আবদ্ধা। প্রাপ্তবয়স্ক—প্রাপ্তবয়স্কা। নিম্নতম—নিম্নতমা। ভৃত্য—ভৃত্যা। বাহ্য—বাহ্যা। দেশবাসী—দেশবাসিনী। ব্যক্তিগত—ব্যক্তিগতা। দরিদ্র—দরিদ্রা। মূর্খ—মূর্খা। সম্মানিত—সম্মানিতা। বিরোধী—বিরোধিনী। বিপন্ন—বিপন্না। ভেদাত্মক—ভেদাত্মিকা। মন্দীভূত—মন্দীভূতা। অতীত—অতীতা। পরিণত—পরিণতা। অপরিচ্ছন্ন—অপরিচ্ছন্না উচ্ছৃঙ্খল—উচ্ছৃঙ্খলা। বিদ্ধ—বিদ্ধা। শ্রীহীন—শ্রীহীনা। অক্ষয়—অক্ষয়া। শুভ—শুভা। প্রকৃত—প্রকৃতা। অম্লান—অম্লানা। প্রকৃতিস্থ—প্রকৃতিস্থা। পূর্ণাঙ্গ—পূর্ণাঙ্গা, পূর্ণাঙ্গী। অক্ষুণ্ণ—অক্ষুণ্ণা। ঐতিহাসিক—ঐতিহাসিকী। সভ্য—সভ্যা। সামরিক—সামরিকী। শোচনীয়—শোচনীয়া। নব—নবা। রোগী—রোগিণী। সহজাত—সহজাতা। আরোহী—আরোহিণী। নাগরিক—নাগরিকী। ভ্রষ্ট—ভ্রষ্টা। অসুন্দর—অসুন্দরী। প্রসুপ্ত—প্রসুপ্তা। প্রবুদ্ধ—প্রবুদ্ধা। বিশ্বজনীন—বিশ্বজনীনা। বাঞ্ছনীয়—বাঞ্ছনীয়া। বেগবান্—বেগবতী। কুণ্ঠিত—কুণ্ঠিতা। দুর্বল—দুর্বলা। দুর্গম—দুর্গমা। বিপৎসঙ্কুল—বিপৎসঙ্কুলা। তরুণ—তরুণী। বৈদ্যুতিক—বৈদ্যুতিকী। উদ্গত—উদ্গতা। হতাশ—হতাশা। আভ্যন্তরিক—আভ্যন্তরিকী।

১০। **পদ পরিবর্তন কর** :—পার্থক্য—পৃথক্। চরিত্র—চারিত্র্য। কঠোর—কঠোরতা। স্বাতন্ত্র্য—স্বতন্ত্র। বিপন্ন—বিপদ্। মূঢ়—মূঢ়তা, মোহ। অধিকার—অধিকৃত। উদ্বর্তন—উদ্বৃত্ত। অশৌচ—অশুচি। বশ্যতা—বশ্য। অধীন—অধীনতা। সমকক্ষ—সমকক্ষতা। আবিষ্ট—আবেশ। অবসান—অবসিত।

গরিষ্ঠ—গরিষ্ঠতা। মন্দীভূত—মন্দীভাব। মুক্তি—মুক্ত। সংগ্রাম—সংগ্রামী। নিশ্চিন্ত—নিশ্চিন্ততা। কর্তব্য—করণ, কৃতি। মন—মানসিক। দায়ী—দায়িত্ব। সত্য—সত্যতা। সম্পূর্ণ—সম্পূর্ণতা। প্রাপ্তি—প্রাপ্ত। স্বাদ—স্বাদু। পরিপাক—পরিপক্ব। জীবন—জীবিত। অর্জন—অর্জিত। দেহ—দৈহিক। সময়—সাময়িক। অসম্মতি—অসম্মত। ব্যাখ্যা—ব্যাখ্যাত। নির্বেদ—নির্বিণ্ণ। শৈথিল্য—শিথিল। প্রসঙ্গ—প্রসক্ত। অনুকল্প—আনুকল্পিক। গণপতি—গাণপত্য। প্রতিনিধি—প্রতিনিধিত্ব। আকর—আকরিক। আধ্যাত্মিক—অধ্যাত্ম। রাষ্ট্র—রাষ্ট্রিক, রাষ্ট্রীয়। বিজয়ী—বিজয়। পক্ষ—পাক্ষিক। সকল—সাকল্য। বাহির—বাহ্য। অজ্ঞতা—অজ্ঞ। গড়া—গড়ন। প্রতিষ্ঠা—প্রতিষ্ঠিত। অতীত—অত্যয়। গৌরব—গুরু। পরিণত—পরিণতি, পরিণাম। গ্রাম—গ্রাম্য। লোক—লৌকিক। সংক্রামক—সংক্রম। ব্যাধি—ব্যাধিত। বিদ্ধ—বেধ। সম্ভব—সম্ভূত। আবরণ—আবৃত। অনিষ্ট—অনিচ্ছা। খাদ্য—খাদিত। প্রবৃত্তি—প্রবৃত্ত। ম্লান—ম্লানিমা। ভাষা—ভাষিত। আচার—আচরিত। বর্জন—বর্জিত। লক্ষণ—লক্ষিত। নদ—নাদেয়, নাদ্য। বিদেশ—বিদেশী, বৈদেশিক। হাত—হেতো। শ্রোতা—শ্রুত। সন্ধান—সন্ধানী। শ্রী—শ্রীল, শ্রীমান্‌। প্রসুপ্ত—প্রসুপ্তি। অতিরিক্ত—অতিরেক। অশিষ্ট—অশিষ্টতা। মাতাল—মাতলামি। বিলম্ব—বিলম্বিত। আরব্ধ—আরম্ভ। সাক্ষাৎ—সাক্ষী। আশ্রম—আশ্রমী, আশ্রমিক। বিশ্বজন—বিশ্বজনীন। দুর্গম—দুর্গত। চেতন—চৈতন্য। দেহ—দৈহিক। করুণা—কারুণ্য। ক্ষত্র, ক্ষত্রু—ক্ষাত্র, ক্ষাত্র। মোট—মুটে। সহায়—সাহায্য। সেবা—সেব্য, সেবিত। মুর্শিদাবাদ—মুর্শিদাবাদী। পরিশ্রম—পরিশ্রান্ত। কোদাল—কোদালিয়া, কোদালে। মাটি—মেটে, মাটিয়া। নীরব—নীরবতা। অভিব্যক্তি—অভিব্যক্ত। ন্যায়—ন্যায্য। উপর—উপরকার। নির্ভর—নির্ভরতা। জঙ্গল—জংলা, জংলী। জমি—জমিদার। শ্যামল—শ্যামলতা, শ্যামলিমা। প্রত্যাশা—প্রত্যাশিত। আবাদ—আবাদী। নিয়ম—নিয়মিত। নিদ্রা—নিদ্রিত। চোখ- চোখো, চোখল।

১১। **নির্দেশ অনুসারে পরিবর্তন কর** ঃ—(১) কেবল রাষ্ট্রগত স্বাধীনতাই পুরা স্বাধীনতা নয় (অস্ত্যর্থক বাক্য)। (২) জাতি গঠনের ব্রত অসমাপ্ত হইয়া আছে (নাস্ত্যর্থক বাক্যে)। (৩) সিজু গাছে কখনও কি চাঁপাফুল ফুটে? (নির্দেশসূচক বাক্যে)। (৪) এখনো আমাদের রাহুগ্রাসজনিত অশৌচের অন্ত নাই (অস্ত্যর্থক বাক্যে)। (৫) সমাজের বা জাতির যাহাতে মঙ্গল হয় এমন সকল কাজে বিবিধ বিরোধী দলের সহযোগিতাই বাঞ্ছনীয় (সরল বাক্যে)। (৬) মোহাচ্ছন্ন দেশে এই মনোভাব সহজে আসিবার কথা নয় (অস্ত্যর্থক বাক্যে)।

উত্তর ঃ—(১) রাষ্ট্রগত স্বাধীনতা ছাড়া আরো স্বাধীনতা আছে। (২) জাতি গঠনের ব্রত এখনও সমাপ্ত হয় নাই। (৩) সিজু গাছে কখনও চাঁপা ফুল ফুটে না। (৪) এখনও আমাদের রাহুগ্রাসজনিত অশৌচ লাগিয়া আছে। (৫) সমাজ ও জাতির মঙ্গলের জন্য কাজে বিরোধী দলের সহযোগিতাই কাম্য। (৬) মোহাচ্ছন্ন দেশে, এই মনোভাব আসা কঠিন।

তৃতীয় খণ্ড

উপপাঠ্য গ্রন্থ

কবিতা সংকলন, কুরুপাণ্ডব ও রামায়ণী কথা

প্রথম অধ্যায়

ভাবসম্প্রসারণ (Amplification)

ভাব সম্প্রসারণ করার অর্থ কোন একটি ভাব বা বিশেষ চিন্তার ধারাকে পরিবর্ধিত করিয়া উহার অর্থ পরিস্ফুট করা। ভাব সম্প্রসারণের জন্য নির্বাচিত বাক্য বা কবিতার অংশটির অর্থ প্রথমে ভালভাবে বুঝিবার চেষ্টা করা দরকার। তারপর উপলব্ধ ভাব-ধারা কিরূপে চিন্তাধারার মধ্য দিয়া ধাপে ধাপে বর্তমান পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহা দেখাইতে হইবে। ইহা গদ্য অনুচ্ছেদ রচনা করিয়া দেখান যাইতে পারে। ফলকথা ভাব সম্প্রসারণ একটি ক্ষুদ্রতম প্রবন্ধ রচনা বিশেষ। নির্বাচিত উপপাঠ্য গ্রন্থগুলি পাঠে, বিদ্যার্থিগণ প্রদত্ত বাক্যের ভাবধারা উপলব্ধি করিবার বিশেষ সহায়তা পাইবেন এ সহায়তা অনেক ক্ষেত্রে গদ্য গ্রন্থ হইতেই বেশি লাভ হইবে। পদ্য গ্রন্থের রচনা ভাবঘন। এখানে বিদ্যার্থীকে বেশি চিন্তা করিতে হইবে। ভাবসম্প্রসারণ রচনার আকার কত বড় হইবে তাহার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। উপরিলিখিত প্রণালীতে ভাবধারাকে সম্প্রসারিত করিতে যতটুকু লেখা দরকার তাহার বেশি লিখিলে বিদ্যার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। **এই অধ্যায়ে বিশেষ বিশেষ পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া ভাবসম্প্রসারণের নমুনা দেখান হইয়াছে। প্রশ্নকর্তা ইচ্ছা করিলে একটি সম্পূর্ণ বা বড় অনুচ্ছেদের ভাব সম্প্রসারণ করিতে দিতে পারেন। তাই যে সকল অনুচ্ছেদ হইতে এই অধ্যায়ের পংক্তিগুলি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সেই সকল অনুচ্ছেদের সহিত পরীক্ষার্থীদের পরিচয় থাকা বাঞ্ছনীয়। ইহার অন্যথায় পরীক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেন। যে সকল অনুচ্ছেদ হইতে এখানে উদ্ধৃতিগুলি গ্রহণ করা হইয়াছে সেই অনুচ্ছেদগুলি, ভাবার্থ বা সারসংক্ষেপ রচনার জন্যও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।**

কবিতা সংকলন

১। "জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে ?
চিরস্থির কবে নীর হায় রে জীবন-নদে ?" (পৃঃ ১)

মনুষ্য-জীবন অস্থায়ী। জন্ম হইলেই মানুষ চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবে না। তাহার যখন জন্ম আছে তখন মৃত্যু একদিন অবশ্যই উপস্থিত হইবে। ধনী-দরিদ্র বিদ্বান্-মূর্খ, ধার্মিক-অধার্মিক কেহই মৃত্যুর হাত হইতে কোন অবস্থায়ই নিষ্কৃতি পাইবে না। শিশু, বালক, কিশোর, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ—কে কখন মৃত্যুর কবলে পড়িবে তাহা পূর্ব হইতে কেহ বলিয়া দিতে পারে না। মৃত্যু অনিবার্য কিন্ত আকস্মিক। সুস্থ সবল ব্যক্তি হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়—আর রোগে জরাজীর্ণ অস্থিচর্মসার লোকও মৃত্যুর সহিত দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া অমানুষিক কষ্ট ভোগের পর মৃত্যুকেই অবশেষে আশ্রয় করে। দেবতারা অমর হইতে পারেন, কারণ তাঁহারা অমৃতের অধিকারী। রক্ত-মাংসের দেহ ধারণ করিলে দেহের স্বাভাবিক গতি হইবে মাটির সহিত মিশিয়া যাওয়া। দেহের এই পরিণাম হইতে কোন শক্তি তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। আর দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইলেই তাহার নাম মৃত্যু। মনুষ্যজীবন ক্ষণভঙ্গুর—অসত্য

—কিন্তু মৃত্যুর সত্যতায় অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই। জন্মের পর মৃত্যুর নিশ্চিত উপস্থিতি সম্বন্ধে জ্ঞানী-অজ্ঞান সকলেই একমত।

"সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজন।" (পৃঃ ১)

জীবের মৃত্যুই গতি ইহা সবজনস্বীকৃত। জন্মের অবশ্যম্ভাবী ফল মৃত্যু। কিন্তু একথা জানিয়াও লোকে এ সংসারে বাঁচিয়া থাকিতে চাহে। জগতের জন্য কোন কাজ না করিয়া, কেবল নিজের সুখ-স্বার্থ বজায় রাখিয়া লোকে যেমন আছে তেমনিই করিয়া চিরকাল সুখ ভোগ করিবার কল্পনা করিয়া থাকে। ধন-জন-জীবন-যৌবন-সম্মান সবই কোন না কোন দিন নষ্ট হইবে। এই অলীক আশা কোনদিনই পূর্ণ হইবে না। তবে দেহ ধ্বংস হইলে মানুষের অনন্তকাল বাঁচিয়া থাকিবার উপায় আছে। সেই উপায় সকলে জানে না—জানিলেও সে উপায়কে কেহ কাজে লাগাইতে চাহে না। উপায়টি হইল সৎকার্য সাধন। তাহা পরের জন্য স্বার্থ বিসর্জন করা। জ্ঞানী, গুণী, দাতা, চিন্তানায়ক, সমাজসেবক দেশমাতৃকার পূজক– ইঁহারাই মরিবার পরও আপন দানের জন্য লোকের মনোমন্দিরে পূজা পাইয়া থাকেন। জাতি ইঁহাদের কাছে ঋণী। দেশবাসী প্রতি মুহূর্তে ইঁহাদের কাজের মধ্যেই, ইঁহাদের আদর্শের মধ্যেই ইঁহাদিগকে জীবিত দেখিতে পান। ইঁহারা জগতের বাহিরে চলিয়া গেলেও প্রকৃতপক্ষে বাঁচিয়া থাকেন। শ্রদ্ধাপূত চিত্তে যখন লোকে এইসকল মহাত্মার আদর্শকে যুগ-যুগ ধরিয়া স্মরণ করে তখনই ইঁহারা অমর হইয়া থাকেন। দৈহিক মৃত্যুর সহিত ইঁহাদের মৃত্যু কেহই কল্পনা করে না।

৩। **"উচ্চশির যদি তুমি কুলমানধনে;**
করিও না ঘৃণা তবু নীচশির জনে।" (পৃঃ ১২ মধুসূদন দত্ত)

এক ব্যক্তির অপর ব্যক্তিকে ঘৃণা করিবার নানা কারণ বর্তমান থাকে। দুর্ব্যবহার বা অন্যায়ের জন্য—ক্ষয়-ক্ষতির জন্য লোকে অপরকে ঘৃণা করিয়া থাকে। এখানে ধন-মান-কুলের কোন প্রশ্ন উঠে না। দরিদ্র ব্যক্তিও ধনী-মানীকে তাহাদের ব্যবহারের জন্য অসন্তুষ্ট হইয়া ঘৃণা করিতে পারে। এখানে ঘৃণা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। লোকে অন্যায়কে, দুর্বলতাকে স্বভাবতই ঘৃণা করিবে। কিন্তু কুলীন অর্থশালী এবং মানী লোকেরা তাঁহাদের বংশমর্যাদা, সম্পত্তি এবং সম্মানের জন্য অপরকে অনেক সময়ে কৃপার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। অপরের প্রতি এসব লোকের এই ঘৃণার ভাব নিন্দনীয়। উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ দৈবায়ত্ত। যদি কোন লোক উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই কুলের উপযুক্ত সদ্‌গুণে অলংকৃত না হয়—তবে তাহার অহংকার বৃথা। লোকে গুণের পূজা করে—বংশের পূজা কেহ করে না। গুণের জন্য লোকে কোনও কালে কোনও পূর্বপুরুষে কৌলিন্য লাভ করিয়াছিল। সেইসকল গুণে যদি বর্তমান বংশধরগণ ভূষিত হয় তবে তাহারা পূজা পাইবার যোগ্য। কিন্তু অপরকে ঘৃণাদ্বারা সেই পূজার আসন হইতে তাহারা বঞ্চিত হইবে। লোকে উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া অহংকারে মত্ত হইলে, প্রকৃতি একদিন না একদিন তাহার প্রতিশোধ লইবে, কেননা অপরকে নীচে ফেলিতে গেলে নিজের উচ্চাসন হইতে পতন অবশ্যম্ভাবী। তারপর ধনসম্পত্তি যাহাদের আছে, তাহারা দরিদ্রের দিকে—সর্বরিক্তের দিকে কৃপার চক্ষে চাহিয়া থাকে। কিন্তু কে কাহাকে কৃপা করে! আজ যাহার অগাধ সম্পত্তি আছে কাল তাহার ভাগ্যবিপর্যয়ের ফলে সে ব্যক্তি পথের ভিক্ষুক হইতে পারে। সুতরাং সর্বরিক্তকে ঘৃণা করিবার কিছু নাই। সর্ব-

রিক্তের কোন দিক হইতে বিপদের আশঙ্কা নাই—কেননা যে সর্বরিক্ত তাহার বর্তমান অবস্থার পর আর কোন গুরুতর বিপদ আসিতে পারে না। আর মানী যদি নিজের মান রক্ষা করিতে না পারে তবে তাহারও চরম দুর্গতি হইয়া থাকে।

৪। (ক) **"স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়?"** (পৃঃ ১৩—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়)

(খ) **"অধীনতা, অপমান সহি অনিবার
কেমনে রাখিবে প্রাণ, নাহি পাবে পরিত্রাণ—
জ্বলিবে জ্বলিবে বুক হইবে অঙ্গার।"**
(পলাশির যুদ্ধক্ষেত্র, পৃঃ ৫৩)

কোনও রাষ্ট্র যখন বিদেশী শাসনের অধীনে যায়, তখন সেখানকার অধিবাসীদিগের চরম দুর্দশা হইয়া থাকে। এই চরম দুর্দশার কারণ পরাধীনতা। রাষ্ট্র যখন দেশবাসীর অধীনে থাকে, তখন উহাকে বলা যায় স্বাধীন। রাষ্ট্রের যখন স্বাধীনতা থাকে না, তখন দেশবাসী বাঁচিয়া থাকিয়াও হয় মৃতের মতো। পরাধীনতার মতো অন্য কোন বড় অভিশাপ কোন জাতির হয় না। কোন রাষ্ট্রের পূর্ণ অধিকার যখন বিদেশী সরকারের হাতে চলিয়া যায়, তখন সেই রাষ্ট্রের আইন-কানুন, বিধি-ব্যবস্থা, সকলই রচিত হয় বিদেশীয় শাসকসম্প্রদায়ের কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য। দেশের অর্থনীতিক কাঠামোও গড়িয়া উঠে, বিদেশী বণিকের সুখ-সুবিধা ও মুনাফা লাভের অনুকূল হইয়া। প্রজাসাধারণ করভারে প্রপীড়িত হয় কিন্তু কাহারও কোন প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতা থাকে না। প্রতিবাদ করিতে গেলে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শাসক সম্প্রদায় উহাতে কর্ণপাত করে না। এরূপ অবস্থায় লোকে নিজের দেশে থাকিয়াও, তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। স্বদেশের ভালো কাজ করিতে গেলেও লোককে কারাবরণ করিতে হয়। এইরূপ রাষ্ট্রে সত্যকে মিথ্যার আবরণে ঢাকা হয়, ন্যায় হয় পদদলিত। দেশবাসীর স্থান হয় শাসকগোষ্ঠীর পায়ের নীচে। তখন শাসকগোষ্ঠী হয় প্রভু—দেশবাসী হয় ভৃত্য। এরূপ দেশ দেশ নহে, উহা একটা বিরাট কারাগার। এইরূপ নিত্য কারাগারে বাস করিয়া লোকের জীবন হয় মৃত্যুতুল্য। সুতরাং স্বাধীনতাহীনতায় কেহই বাঁচিয়া থাকিতে চাহে না—কারণ জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে পরাধীন রাষ্ট্রে কোন প্রভেদ নাই।

**"সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে
বাহুবল তার,
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে
দেশের উদ্ধার।"**—রঙ্গলাল (পৃঃ ১৫)

জগতে সকলেই বাঁচে, তারপর মরে। এইরূপ জীবন-মরণের কোন গৌরব নাই। সৎকার্যে জীবন ও মৃত্যুকে ব্যবহার করিতে পারিলেই, লোকের পৃথিবীতে জন্মিবার সার্থকতা থাকে। কোন কাজ না করিয়া, বৃথা কাল কাটাইয়া মরার মতো অগৌরব আর কিছুই নাই।

ভাল কার্যে জীবনটাকে ব্যয় করিতে পারিলে জীবন হয় সার্থক। বাহুবল পরকে উৎপীড়নের জন্য নহে। বাহুবল দ্বারা দুর্বলকে উৎপীড়নের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিলে বাহুবল হয় সার্থক। কিন্তু লোকে যত ভাল কাজই করুক না কেন, সর্বাপেক্ষা বড় এবং ভাল কাজ হইতেছে শত্রুর হাত হইতে দেশের উদ্ধার। দেশের ফলে, জলে-বাতাসে, প্রতিটি অধিবাসী বাঁচিতেছে আর বড় হইতেছে। দেশ মায়ের মতো, সকলকে

পালন করিতেছে। দেশ পরাধীন হইলে দেশের প্রকৃত সন্তানের তাহার উপর কোন অধিকার থাকে না। এইরূপ অবস্থায়, দেশের অধিবাসীর বাহুবল শত্রুকে বিতাড়িত করিবার জন্য, সর্বতোভাবে ব্যবহৃত হওয়া উচিত। আত্মরক্ষার অধিকার যেমন মানব-মাত্রেরই স্বাভাবিক অধিকার, তেমনই মাতৃভূমি রক্ষায় বাহুবল ব্যবহার করাও তাহার জন্মগত অধিকার। কোন শক্তিই এই অধিকার হইতে তাহাকে কোনক্রমেই বঞ্চিত করিতে পারে না। জীবন ক্ষণস্থায়ী। একদিন না একদিন এ জীবনের ধ্বংস অনিবার্য। এ জীবন বাঁচাইয়া রাখিয়া পরাধীনতাকে বরণ করিবার মতো বড় পাপ মানুষের আর নাই। দেশের কল্যাণে প্রণাদান সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্য। পরের পদাঘাতে জর্জরিত জীবনধারণ মৃত্যুতুল্য। ইহা যদি সত্য হয়, দেশোদ্ধারের জন্য জীবনদানই সর্ব পুণ্যের মধ্যে বড়। ধর্মযুদ্ধে বাঁচিয়া জয়লাভ কবিলে, দেশ নিজের হাতে ফিরিয়া আসিবে আর রণক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করিলে স্বর্গলাভ হইবে। এই মৃত্যুকে কেহ মৃত্যু বলে না, ইহা হইতেছে বীরশয্যা। শত্রুকে স্বদেশ হইতে অপসারিত করিতে গিয়া বহুসংখ্যক দেশবাসীর মৃত্যু হইলেও ক্ষতি নাই, কারণ যে লোক মারা যাইবে তদপেক্ষা কোটি কোটি গুণ লোকের সুখসুবিধা হইবে। সংগ্রামে মৃত্যুবরণকারী বীরের স্বর্গলাভ সুনিশ্চিত, তদুপরি অনন্তকাল ধরিয়া এই বীরগণ জনগণের মনে পূজা পাইতে থাকিবেন।

৬। **"তুমি মা! না ধর দোষ,**
তুমি নাহি কর রোষ,
দুঃশীল মানব প্রাণে বেঁচে থাকে তায়!
শত অপরাধ করে,
তবু না মানব মরে,
শুধু তব হৃদয়ের প্রেমমহিমায়!" ('মাতৃস্তুতি' পৃঃ ২০)

অশেষ দোষে সন্তান দোষী হইলেও সকল সময়ে মাতা তাহার দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করিয়া থাকেন। সন্তানের অনন্ত অন্যায়ের মধ্যে মাতাব ধৈর্যের অন্ত থাকে না। তিনি তাহার সকল দোষ ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। মাতাব জ্ঞান আছে, ধৈর্য আছে। আর সন্তান অজ্ঞানতাবশেই তাঁহার কাছে অপরাধী হয। সংসারে কাহারও অপরাধ জ্ঞানকৃতই হউক, আর অজ্ঞতাপ্রযুক্তই হউক কেহই তাহা ক্ষমা করে না। কিন্তু মায়ের নিকট, সন্তানের আশ্রয়ের দ্বার সর্বদাই খোলা আছে। মাতার সহিত সন্তান মিত্রবৎ অথবা শত্রুবৎ যে কোনরূপ ব্যবহার করুক না কেন তাহাতে কিছু আসে যায় না, মায়ের কাছে সন্তান চিরমিত্রই থাকিয়া যায়। এই ধৈর্য ও ক্ষমাগুণ মায়ের মধ্যে না থাকিলে, কেন সন্তানেরই বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হইত না। মাতা সন্তানের জন্মে লালন-পালনে,—সর্বত্র অসীম ক্লেশ ভোগ কবিযা থাকেন। যদি প্রতি মুহূর্তেই মাতা এই ক্লেশ ভোগের হাত হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে চাহিতেন, তাহা হইলে সন্তানের দুর্দশার অন্ত থাকিত না, সন্তান তাহার বর্তমান অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছাইবার বহু পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইত। পুত্র অনেক সময়ে কুপুত্র হইয়া থাকে। কিন্তু কুমাতা কোথাও দেখা যায না। মানুষ এত অন্যায় কবিয়াও যে বাঁচিয়া আছে তাহা শুধু মাতৃস্নেহের গুণে।

৭। **"পর দীপশিখা নগরে নগরে,**
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।" (ভারত বিলাপ, পৃঃ ২২)

সর্বক্ষেত্রেই পরাধীন জাতিকে দুঃখ ভোগ করিতে হয়। বিদেশী শাসন যাহা কিছু ভিক্ষাস্বরূপ দিয়া থাকে তাহাতেই কেহ কোনদিন সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। ক্ষমতার

অধিষ্ঠিত বৈদেশিক শাসকগোষ্ঠী যাহা কিছু দেশকে দেয়, উহা হয় তাহার নিজের সুবিধার জন্য অথবা আত্মপ্রচারের জন্য। বিদেশী শাসকগোষ্ঠী অধীনস্থ দেশকে যে জ্ঞান প্রদান করে, উহার দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না—শিক্ষায় নানা ত্রুটি থাকে। এই ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাকে সম্বল করিয়া কেহ জীবন সংগ্রামে জয়ী হইতে পারে না। পরাধীন জাতি বিদেশী শাসনের প্রভাবে নিজের শিক্ষা সংস্কৃতি আর তার ঐতিহ্যকে ভুলে। শেষ পর্যন্ত এইরূপ দেশের বেশির ভাগ লোকই বিদেশীর চাকচিক্য আর তার বাহ্যাড়ম্বর দেখিয়া নিজের দেশকে, নিজের জাতিকে পরের নিকটে হেয় মনে করে। তাই নগরে নগরে যতই কেন বৈদ্যুতিক আলোক জ্বলুক না কেন, এরূপ বাহিরের আলো দিয়া দেশের অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর হয় না। পরাধীন জাতির অন্তরে সত্যকার জ্ঞানের আলো জ্বলিলে বাহিরের আলোকের সার্থকতা আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরের অন্ধকার দূর না হয়, ততক্ষণ শতশত নগরীর আলোকদ্বারা কোনই কাজ হয় না।

৮। **"পর বেশ নিলে, পরদেশে গেলে**
তবু ঠাঁই মিলে নাহি দাস বলে।
কহিতে বুক চায় দুভাগ হতে
নয়নে উথলে জল স্রোতশতে।" ('ভারত বিলাপ'—পৃঃ ২২)

পরাধীন জাতির দুঃখ নানাদিক দিয়া উপস্থিত হয়। জাতিতে জাতিতে, মানুষে মানুষে যে সমতা বিধাতাব দান, পবাধীন জাতি উহা হইতে সর্বপ্রকারে বঞ্চিত হইয়া থাকে। কেহ কোথাও পরাধীন জাতিকে মানুষ বলিয়া গণ্য কবে না। পরের সমান হইতে গিয়া যখন কোন জাতীয় লোক তাহার নিজের বেশভূষা ত্যাগ করিয়া অপরের পোষাক পবে, তখন সে না হয় স্বদেশেব, না হয় পরেব দেশের। এরূপ লোকেরা যখন পরের দেশে যায় তখন তাহারা সেখানে কোথাও থাকিবাব জায়গা পায় না। কৃত্রিম পোষাকে সজ্জিত এইসব লোককে বিদেশী ঘৃণার চক্ষে দেখে, কেন না পরানুকরণকারীকে কেহ সম্মান দিতে পারে না। স্বাধীন জাতি নিজের বেশভূষায় পৃথিবীর যে-কোন স্থানে আদবণীয় হয়। পরাধীন, পবেব পোষাকে সজ্জিত লোককে, বিদেশী দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়। সম্মান গেলে মানুষের সবকিছু যায়। আত্মসম্মানবোধ যা'র আছে তা'র কাছে পরের লাঞ্ছনা বড় পীড়াদায়ক। এইরূপ দেশবাসীর লাঞ্ছনার দুঃখ প্রকাশ করিতেও প্রাণে দুঃখ হয়।

৯। **"যাও সিন্ধুনীরে, ভূধর শিখরে,**
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে;
বায়ু উল্কাপাত বজ্রশিখা ধ'রে
স্বকার্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।" (পৃঃ ২৭, ভারত সঙ্গীত)

এ জগতে নিজের উন্নতি আর জাতির উন্নতি সাধনের একমাত্র উপায় নিজের বর্তমান হীন অবস্থার পরিবর্তন সাধন করা। যে জাতি অলস হইয়া কাল কাটায় তাহার ভাগ্য বিড়ম্বিত হয়, সে জাতি পরের পায়ের নীচে সব সময় নিজকে লুণ্ঠিত করিয়া থাকে। নিজের ছোট ঘরের কোণটিতে যে বসিয়া থাকিবে, চিরকাল সে জগতের কিছুই জানিতে পারিবে না, কিছুই নূতন আবিষ্কার করিতে পারিবে না, উপভোগ্য কোন বস্তুই উপভোগ করিতে পারিবে না। নিজের কার্যসাধনের জন্য জগতের যেখানে প্রয়োজন সেখানেই যাইতে হইবে। জাতির উন্নতির জন্য সাগরের অতল জলে প্রয়োজন হইলে নামিতে হইবে, সেখানকার তত্ত্ব ও তথ্যের সন্ধান লইতে হইবে। দুর্গম গিরির উচ্চ-শিখরে যদি কোন ভাল কিছুর সন্ধান করিতে ইচ্ছা হয় সেখানে যাইতে হইবে। প্রকৃতিতে

বায়ু, বজ্র, উল্কাপাতের মধ্যে প্রাপ্ত শক্তিকে কাজে লাগাইতে হইবে। অসীম আকাশের অনন্ত গ্রহ-নক্ষত্রলোকে যাত্রা করিতে হইবে। কেবল এই পৃথিবীর সবকিছুর খবর লইবার চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিলে চলিবে না—নূতন নূতন গ্রহে নূতন নূতন লোকের সন্ধান করিতে হইবে। এইরূপ করিতে পারিলেই জাতির সৌভাগ্য নামিয়া আসিবে।

১০। **'বাজ্‌রে শিঙা বাজ্ এই রবে,**
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,
সবাই জাগ্রত মনের গৌরবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে ?' (পৃঃ ২৮)

স্বাধীনতা মানুষমাত্রেরই জন্মগত অধিকার, এই অধিকারকে রক্ষা করা সকলেরই উচিত। স্বাধিকার রক্ষায় মানুষের মান-মর্যাদা রক্ষা হয়। এই নবীন যুগে সমস্ত জাতিই আত্মসচেতন হইয়া উঠিয়াছে। বিদেশীকে কেহ কাহারও উপর প্রভুত্ব করিতে দিতে চায় না; ইহার কারণ নিজের মান সম্বন্ধে সকলেই জাগ্রত হইয়াছে। জগৎ বিপুল বিরাট। এই বিপুল বিরাট জগতে মানবজাতির বিভিন্ন শাখা বাস করিতেছে। সর্বত্র মানুষের মধ্যে নব জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় ভারতের নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নয়। ভারতের আত্মমর্যাদা বোধ সুপ্ত হইয়া আছে—শুধু চাই তাহার জাগৃতি—আত্মসম্মানবোধ সম্বন্ধে তাহার নব জাগৃতি তাহাকে তাহার যথা-যোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবে। জগতের সকল জাতি যখন জাগে তখন ভারতেরও জাগিয়া জগৎসভায় তাহার শ্রেষ্ঠ আসন লইতে হইবে।

১১। **"রাজা রাজমন্ত্রি-লীলা, বলবীর্য স্রোতঃশিলা,**
সকলই কি ক্ষণস্থায়ী দেখিতে কেবলি ?
অই মৃণালের মতো নিস্তেজ সকলি !" (পদ্মের মৃণাল, পৃঃ ২৯)

জগতের সকল বস্তু ক্ষণস্থায়ী। জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব ইহার ধ্বংস অনিবার্য।

এখানে কিছুই স্থায়ী নহে—কালবশে একদিন না একদিন সব চলিয়া যাইবে। জগতের রাজ্য-সাম্রাজ্য, রাজা-মন্ত্রী, বড় বড় বীর সকলেই কালক্রমে ধ্বংসের কবলে পতিত হইয়াছে। কোন রাজা বা সম্রাট্ বড় রাজ্য বা সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া হয়ত ভাবিয়াছিলেন তাঁহাদের স্থাপিত রাজ্য অবিনশ্বর হইবে, কিন্তু কালের স্রোত সকলকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। বড় বড় বীর যোদ্ধা যাঁহাদের নামে এককালে সমগ্র পৃথিবী কম্পিত হইত, আজ তাঁহাদের চিহ্নমাত্র নাই। মহাকালের কাছে শক্তিমান্‌ও শক্তিহীন হয়, তাই কাল সর্বজয়ী।

১২। **"নিয়তির কাছে নর এত কি অক্ষম ?"** (পদ্মের মৃণাল, পৃঃ ৩০)

বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। যে জগতে পরিশ্রম করিবে, সর্বদা কোন না কোন কার্যে রত থাকিবে—সম্পদ তাহারই করতলগত। এইরূপ চেষ্টা মানুষমাত্রেরই স্বভাব, কেননা কাজ না করিয়া মানুষের চুপ করিয়া এক মুহূর্ত বসিয়া থাকিবার উপায় নাই। পরিশ্রম ও একাগ্রতা দ্বারা মানুষ অসাধ্য সাধন করে। মানুষ অশেষ শক্তির আধার। এই শক্তিকে ব্যবহার করিতে পারিলে সে অনেক কিছু জগতে করিতে পারে। লোকে প্রযত্ন বা চেষ্টা দ্বারা সব কিছু করিতে পারে,—এই মতকে সকলে স্বীকার করেন না। তাঁহারা মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার ফল স্বীকার করিয়াও দৈবকে বিশ্বাস করেন। দৈব প্রতিকূল হইলে মনুষ্যের সকল প্রকার চেষ্টা বিফল হয়। পৃথিবী বড় বড় রাজ্য-

সাম্রাজ্য একসময়ে তাঁহাদের কর্মপ্রচেষ্টায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু আজ তাহাদের দশা দেখিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। শুধু কর্মই যদি বড় হইত, তবে বড় চিরকাল বড় থাকিত, সে কোনকালেই অধঃপতিত হইত না। তাই মনে হয় এখানে নিয়তি বা দৈব প্রবল। দৈবের হাত হইতে মানুষের নিষ্কৃতি নাই। দৈব বা নিয়তি কোন কার্যের অবশ্যম্ভাবী ফল লইয়া উপস্থিত হইবে। নিয়তি আর কর্মপ্রচেষ্টা দুইই যখন একত্র হয়, তখন কার্যে সাফল্য অনিবার্য। দৈব অত্যন্ত প্রবল, সে সুখ বা দুঃখের দিকে অনবরত মানুষকে টানিতেছে।

১৩। **"না জানি কি আছে ভালে, তাই গো মা এ কাঙালে**
মিশাইছে অশ্রুধারা ভস্মেতে তোমার ;
ভারত কিরণময় হবে কি আবার ?" (পদ্মের মৃণাল, পৃঃ ৩২)

অনন্ত মহিমমণ্ডিত ভারত। নানা বিদেশীর অধিকারে ভারতের নানা গৌরব বিলুপ্ত হইয়াছে--কিন্তু কবির প্রশ্ন, কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা ভারত কোনদিনই সেই ভাগ্য-বিপর্যয়ের নিয়তিকে খণ্ডন করিতে পারিবে কিনা। ভারত যখন বিদেশী শাসক শক্তির অধীন ছিল তখনকার কথা হইতেছে। জগতে বহু জাতি গৌরবের উচ্চশিখরে উঠিয়াছে—আবার তাহাদের ভাগ্য চির অন্ধকারে আবৃত হইয়াছে। কিন্তু এমন জাতি দেখা যাইতেছে যাহাদের কোন অতীত নাই তাহারাও অন্ধকার ভেদ করিয়া নিজের চেষ্টায় নিজকে উদ্ভাসিত করিয়াছে। উত্থান আর পতনই নিয়তির অলঙ্ঘনীয় বিধান। যদি অজ্ঞানতা আর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন অন্য জাতি আবার নিজেকে জ্ঞানের আলোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, তবে ভারতই বা নিজেকে চেষ্টা দ্বারা অতীত গৌরবের আলোকে মণ্ডিত না করিবে কেন ? যাহা এক জায়গায় বা বহু জায়গায় ঘটিয়াছে, তাহা ভবিষ্যতে একদিন না একদিন ভারতে অবশ্যই ঘটিবে।

১৪। **"সমুদ্রের পার আছে, তল আছে তার,**
অতল অপার মাতৃস্নেহ পারাবার।" (ধাত্রীপান্না, পৃঃ ৩৯)

সন্তানের জন্য মায়ের স্নেহের কেহ পরিমাপ করিতে পারে না। উহার গভীরতা ও বিস্তার সমুদ্রের চেয়ে অনেক বেশি। সন্তান মাতৃগর্ভে জন্ম গ্রহণ করে। মাতা নিজের শরীরের অংশ সন্তানকে দিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া রাখেন। শিশু সন্তান যখন নিতান্ত অসহায়, তখন মাতাই তাহার সর্বপ্রকার সহায়তার স্থল। মাতা না থাকিলে সন্তান কোনক্রমেই বাঁচিতে পারে না। মাতা সন্তানের জন্য এত কষ্ট করেন শুধু তাঁহার স্নেহ-প্রবৃত্তির জন্য। মাতৃস্নেহ কোন প্রতিদানের অপেক্ষা রাখে না। পুত্রের জন্য মাতা সুখ-সম্পদ সবই বিসর্জন দিয়া থাকেন। প্রয়োজন হইলে, ঘোরতর বিপদের সময়, মাতা শিশুকে বাঁচাইবার জন্য, নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হ'ন। এই সকল কথা বিবেচনা করিলে দেখা যায় মাতৃস্নেহ বিশাল ও গভীর। মায়ের মনের গোপন খবর একমাত্র মাই জানেন। সন্তানের জন্য মায়ের আত্মত্যাগ কত গভীর তাহা অন্য কাহারো বিচারে ধরা পড়ে না।

১৫। **স্বার্থত্যাগ মহামন্ত্রে দীক্ষা যার আছে**
কঠোর বীরের ধর্ম পালে যেই জনে ;
আত্মপরিজন স্নেহ তুচ্ছ তার কাছে।
স্থির লক্ষ্য একমাত্র সংকল্পসাধনে। (ধাত্রীপান্না, পৃঃ ৪১)

সংসারে প্রায় সকলেই স্বার্থ খোঁজে, যেখানে কোন স্বার্থ সিদ্ধির উপায় নাই সেখানে কোন লোক যায় না ; যে কাজে নিজের কোন লাভ নেই সে কাজ কেহ করিতেও

চাহে না। কিন্তু এই স্বার্থপর জগতে এমন কতক লোক আছেন যাঁহারা স্বার্থত্যাগী। তাহাদের সংখ্যা কম হইলেও তাঁহাদের দর্শন দুর্লভ নহে। সকলেই যার যার স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত থাকিলে পরের জন্য কেহই কাজ করিবে না। জগতের বড় বড় কাজ এই স্বার্থত্যাগীদের দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। দশের কাজের জন্য এই সকল পুরুষেরাই আত্মদান করিতে পারেন। ইঁহারা শুধু নিজের আত্মীয় পরিজন লইয়া ব্যস্ত থাকেন না। ইহাদের কাছে আত্মপরিজনের প্রতি স্নেহ অকিঞ্চিৎকর। পরের জন্য আত্ম-পরিজনের স্নেহ ইঁহারা অনায়াসে ত্যাগ করিতে পারেন। এইরূপ স্বার্থ ত্যাগ বীর ব্যক্তিই করিতে পারেন। স্বার্থ ত্যাগ দুর্বলের ধর্ম নহে। দুর্বল ব্যক্তি জগতের কাছে নিতেও জানে না, জগৎকে কিছু দিতেও জানে না। স্বার্থত্যাগী বীরগণ নিজের সংকল্প সাধনেই সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম বলিয়া মনে করেন। নিজ পরিজনের স্নেহে ইঁহারা কখনও অপরের প্রতি কর্তব্য ভুলেন না।

১৬। **"ভীরুতা মমতা দুই নিকট সম্বন্ধ,**
কাপুরুষ ক্ষুদ্রচেতা সদা স্বার্থে অন্ধ।" (ধাত্রীপান্না, পৃঃ ৪১)

কাপুরুষদের নিকট উদারতা আশা করা যায় না। সব কাজেই তাহারা ভয় পায়, তবে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রতি তাহারা সর্বদাই সজাগ থাকে। নিজের স্বার্থের বশে ইহারা কখনও জগতের বৃহত্তম স্বার্থের কথা ভাবিতেও পারে না। অনবরত স্বার্থের সন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতে স্বার্থপর লোকেরা অপরের বিষয় চিন্তা করিবার অবসর পায় না। অবসর পাইলেও ভালমন্দ বিচার করিবার ক্ষমতাও এই শ্রেণীর লোকদের থাকে না। নিজের আত্মীয় পরিজনের বাহিরে অন্য কোন জগতের অস্তিত্ব ইহারা স্বীকার করে না। নিজের আত্মীয়ের প্রতি মমতা ইহাদের কাছে সর্বাপেক্ষা প্রধান গুণ বলিয়া মনে হয়। এই সব লোকেরাই ভীরু হইয়া থাকে। আত্মীয়ের প্রতি মমতা হেতু ইহারা অপরের দুঃখ বুঝে না। তাই ভীরুতার সঙ্গে মমতার সম্পর্ক সব চেয়ে বেশি। যে ব্যক্তির কাছে ভীরুতা কাপুরুষতা অন্যায় বলিয়া মনে হয়, সেই কেবল পরের জন্য স্বার্থ ত্যাগ করিতে সমর্থ হয়।

১৭। **"দাতাকর্ণ লভে পুণ্য বধি বৃষকেতু।**
আমারও অপত্যবধ হবে ধর্মহেতু।" (ধাত্রীপান্না, পৃঃ ৪১)

বৃহত্তর স্বার্থের জন্য মানুষ নিজের সর্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু ত্যাগ করিয়া পুণ্য লাভ করে। পিতার বা মাতার নিকট পুত্র সর্বাপেক্ষা প্রিয়। নিজের পুত্রকে ত্যাগ করা কঠিন কার্য। মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া জগতের কল্যাণের জন্য যে ব্যক্তি এইরূপ কার্য করিতে পারে, তাহার নিশ্চয়ই পুণ্য লাভ হয়। স্বার্থপর জগতে যেখানে অল্প ত্যাগ করিতেও লোকে কুণ্ঠিত হয়, সেখানে বৃহত্তর ত্যাগে নিঃসন্দেহে পরম কল্যাণ লাভ হয়।

দাতাকর্ণ অতিথি সেবার জন্য পুত্রকে বলিদান করিয়া পুণ্য লাভ করিয়াছিলেন। ধাত্রীপান্না প্রভুর পুত্রকে রক্ষা করিতে গিয়া নিজের পুত্রকে আততায়ীর হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন। পুত্রবধ গুরুতর পাপ। কিন্তু অবস্থার বিচারে সব কিছুর ভাল মন্দ বিচার করিতে হয়। ক্ষেত্র বিশেষে পাপও পুণ্য হয়, আর পুণ্যকে অনেকক্ষেত্রে পাপ মনে করা হয়। প্রভুপুত্রকে রক্ষা করা সর্বতোভাবে ধাত্রীর কর্তব্য। নিজের পুত্র দিয়াও যদি তাহা করা যায়, তবে পুত্রবধ পাপ না হইয়া পুণ্যে পরিণত হয়।

১৮। **"থাকুক প্রভাতরবি কুহেলি-তিমির,**
অচিরে প্রদীপ্ত তেজে উঠিবে মিহির।" (ধাত্রীপান্না, পৃঃ ৪২)

প্রথম কোন ব্যাপারে বিরুদ্ধ অবস্থার উপস্থিতিতে ধৈর্য ত্যাগ করা কাহারো পক্ষে

উপযুক্ত কার্য নহে। প্রাথমিক বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করিয়াই লোকে প্রকৃত পথের সন্ধান পায়। কোন কার্যের প্রথম ধাক্কা যে সামলাইতে পারে, তাহার পক্ষেই আরো অধিক অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা থাকে। যে প্রাথমিক বিপদে ভয় পাইয়া নিজের কাজ ছাড়িয়া দেয়, কোন দিক হইতেই তাহার সহায়তা আসে না। এখন যাহাতে অসুবিধা মনে হইতেছে, তাহাতে কালক্রমে অনুকূল পরিস্থিতির সম্ভাবনা অস্বীকার করা চলে না। প্রকৃত তেজকে কেহ ঢাকিয়া রাখিতে পারে না। প্রতিকূল অবস্থায় তেজ ঢাকা পড়িতে পারে, কিন্তু অনুকূল অবস্থায় তেজ জ্বলিয়া উঠিয়া আপনার শক্তি জগৎকে দেখাইয়া থাকে। প্রকৃত তেজস্বীকে কেহ কোনদিন অবনত করিয়া রাখিতে পারিবে না।

১৯। **"যদি নৃপ, কৃপা নাহি কর,**
দেবতার কৃপা কেমনে করিবে লাভ?
নির্দয় যে জন,
দেবগণ নির্দয় তাহার প্রতি।" (সিদ্ধার্থ ও বিম্বিসার, পৃঃ ৪৩)

ফুল, ফল, জল রবি শশী আকাশ বাতাস যাহা কিছু সুন্দর যাহা কিছু মানুষের উপকারে লাগে সবই দেবতার দান। দেবতারা যেমন মানুষকে নানা সুখ-সুবিধা দিয়া তাহাকে রক্ষা করিতেছেন, তেমনি মানুষেরও কর্তব্য হইতেছে দেবতাকে উপযুক্ত ত্যাগ দ্বারা সন্তুষ্ট করা। যে কেবল নিতেই চায় কাহাকেও কিছু দিতে চায় না, তাহার কিছু পাইবার অধিকার থাকে না। দেবতার কাছে পাই অনেক, যাহা পাই তাহা দিয়াই দেবতার পূজা করা উচিত। মানুষ দেবতার কৃপার ভিখারী। অপরকে কৃপা না করিলে দেবতার কৃপা লাভ করা যায় না। দেবতার সৃষ্ট জীবের প্রতি যদি মানুষের কৃপা না থাকে, তবে মানুষকে দেবতা কখনও কৃপা করেন না। দেবতার দয়াতে যে সৃষ্ট হইয়াছে তাহার প্রতিহিংসায় দেবতাকে সন্তুষ্ট করা চলে না। পূজকের উপর যেমন দেবতার দয়া, তেমনি সৃষ্ট অন্য জীবের উপরও তাঁহার দয়া সমভাবে বিরাজমান। একে অন্যের প্রীতি হিংসাভাব পোষণ করিলে দেবতার কৃপা হইতে হিংসুকের বঞ্চিত হওয়া ন্যায়সঙ্গত।

২০। **'হিংসায় কভু কি হয় ধর্ম উপার্জন?**
দেব তুষ্ট হিংসায় কি হয়,
মহাশয় জানিহ নিশ্চয়;
হিংসার অধিক পাপ নাহিক জগতে'। (পৃঃ ৪৩)

দেবগণ মনুষ্যের নিত্য কল্যাণকামী। তাহার ফল, ফুল জল, আলো, বাতাস দিয়া, মানুষের নিরন্তর উপকার করিতেছেন। তাঁহারা চাহেন জগৎ সুশৃঙ্খলার সহিত চলুক, সকলে সুখে ও শান্তিতে বাস করুক। তাঁহারা আত্মজ্ঞানী, তাই তাঁহারা সকলকে ন্যায়ের পথে, ধর্মের পথে চালিত করেন। কাহারো উপর হিংসা হয়, ইহা তাঁহাদের অভিপ্রেত নয়। মানুষ মানুষের প্রতি বা অন্য জীবের প্রতি যখন হিংস্র-ব্যবহার করে, তখন জগতে অশান্তি উপস্থিত হয় এই অশান্তি ধর্মের লক্ষণ নহে। ইহা কখনই ধর্ম হইতে পারেনা। দেবতার নিকট হিংসার ভাব লইয়া পশুবধ ধর্ম নহে। অপরের অস্ত্রের আঘাতে, নিজের যেমন কষ্ট লাগে, পশুরও সেইরূপ কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। অপরকে কষ্ট দিলে ধর্ম তো হয়ই না, বরং গুরুতর অধর্ম হয়। এইরূপ গুরুতর অধর্ম দ্বারা দেবতাকে সন্তুষ্ট করা যায় না, ধর্মও অর্জিত হয় না।

ধর্ম দ্বারা ধর্ম অর্জন হয়, অধর্মের পথে ধর্ম উপার্জন হইতে পারে না। তাই অধর্মের মূলে যে হিংসা আছে তাহার মতো আর কোন বড় পাপ সংসারে নাই।

২১। **প্রাণদানে নাহিক শকতি,**
হে ভূপতি,
তবে কেন কর প্রাণ নাশ?
প্রাণের বেদনা বুঝ আপনার প্রাণে। (সিদ্ধার্থ ও বিম্বিসার, পৃঃ ৪৩)

মানুষ অন্য কোন প্রাণীকে সৃষ্টি করে নাই। অন্য জীবের প্রাণ, সেই জীব মানুষের মতোই প্রকৃতি হইতে পাইয়াছে। মানুষ যাহা কিছু নিজ হাতে সৃষ্টি করে তাহাও প্রকৃতির সামগ্রীর পরিবর্তন, পরিবর্ধন করিয়া সম্পন্ন করে। কোন নূতন সৃষ্টির অধিকার তাহার নাই। মানুষ মানুষকে বা অন্য জীবকে, তাহার প্রাণ দান করিতে যখন অক্ষম, তখন কাহারও প্রাণ লইবার তাহার অধিকার নাই। গ্রহণ করিলে দান করিতে হয়, যে ব্যক্তি কখনও কিছু গ্রহণ করে না, তাহার দানেরও কোন প্রয়োজন নাই। অপরের প্রাণনাশ তখনই সমর্থনযোগ্য যখন সেই প্রাণ ফিরাইয়া দিতে পারা যায়। একবার প্রাণ নষ্ট হইলে তাহা কখনও ফিরাইবার উপায় নাই। আর প্রাণিবধে সেই প্রাণীর অন্তরে অপরিসীম বেদনা বোধ হয়, ইহা যেমন তেমন বেদনা নয়, কারণ প্রাণ নাশক বেদনার চেয়ে অন্য কোন বড় বেদনার কল্পনা করা যায় না। প্রত্যেক লোক যদি নিজেকে বধ্য মনে করিয়া অন্তিম বেদনার দুঃখের কথা চিন্তা করে, তবে কেহ কখনই প্রাণিবধ করিতে অগ্রসর হইবে না।

২২। **হে ভূপাল, ধরহ বচন,**
অকারণে রাজ্য ধন কি হেতু ত্যজিবে?
প্রেমে কর প্রজার পালন। (সিদ্ধার্থ ও বিম্বিসার, পৃঃ ৪৬)

যে ব্যক্তি যে অবস্থায় সমাজে আছে, সেই অবস্থায় সে যদি নিজের কর্তব্য পালন করে তবেই তাহার ধর্মাচরণ হইল মনে করিতে হইবে। রাজার ধর্ম আর সন্ন্যাসীর ধর্ম এক নহে। মুক্তির জন্য রাজার সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন নাই। রাজা রাজধর্ম পালন করিলে, তিনি তাহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সন্ন্যাসী অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহেন। আর সন্ন্যাসীরও সন্ন্যাস ছাড়িয়া রাজা হইবার দরকার নাই। রাজা রাজপদে অবস্থান করিয়া সহস্র প্রজার দুঃখ দৈন্য দূর করিতে পারেন। যদি প্রজার হিতসাধন তিনি না করেন তবে তিনি ধর্মভ্রষ্ট হইবেন। প্রেম প্রীতির সহিত তাঁহার প্রজাপালন করা উচিত, কেননা সহস্র প্রজার মঙ্গলামঙ্গলের ভাব রাজার উপর ন্যস্ত আছে। রাজা এবং ধন ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেই রাজা বড় হইতে পারেন না। তিনি তাঁহার কর্তব্যের মধ্যে থাকিলেই তাঁহার নিজের এবং তাঁহার উপর নির্ভরশীল বহু লোকের উপকার হইবে। অকারণে রাজ্য ও ধন ত্যাগ করা অন্যায়। কেবল ধন দিয়া রাজা প্রজাসাধারণের সকল হিতকর কাজ করিতে পারেন না; রাজ্য অযোগ্য লোকের হাতে পড়িলে উপকারের পরিবর্তে সকলের অপকার হইবে।

২৩। **'কীর্তিনাশা মানবের ভীষণ শিক্ষক।'** (কীর্তিনাশা পৃঃ ৪৮)

পদ্মা নদীর আর এক নাম কীর্তিনাশা। এই নদী রাজনগরের রাজা রাজবল্লভের কীর্তি নাশ করিয়া এই নাম ধারণ করিয়াছে। রাজনগরের একুশ রত্ন, প্রাসাদ প্রভৃতি রাজা রাজবল্লভ অক্ষয় করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। নদী মানুষের, বাড়ি ঘর ধনরত্ন, মানুষের দেহ, অন্যান্য জীব, তাহার কীর্তি সবই ভাসাইয়া লইয়া যায়। 'এ সকল হইতেছে নদীর ধ্বংসক্রিয়া, কিন্তু এই ধ্বংসের মধ্যেও

লোকে শিক্ষালাভ করিতে পারে। শিক্ষা দুই প্রকারে হইতে পারে। এক সুখের মধ্যে, আনন্দের মধ্যে পরের কাজ করায় যে শিক্ষালাভ হয় তাহা। মানুষ কষ্ট করিয়া সম্পত্তি অর্জন করে, তাহা দিয়া অপরের কষ্ট নিবারণ করে। ইহা সৃষ্টির কষ্টের পর আনন্দের শিক্ষা। আর দ্বিতীয় প্রকার শিক্ষা, অন্যায়কে ধ্বংস করিয়া জগৎকে শিক্ষা দেওয়া। কীর্তিনাশা মানুষের ভীষণ শিক্ষক—সে ধ্বংসের মধ্যে দিয়া মানুষকে শিক্ষা দেয়। বঙ্গের সিংহাসন লাভের জন্য সিরাজদৌলার বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত হয় তাহার মধ্যে অন্যতম চক্রী ছিলেন রাজনগরের রাজা রাজবল্লভ রায়। কিন্তু কীর্তিনাশা এই রাজার কীর্তিকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়া এই শিক্ষা দেয় যে কীর্তির মূলে অন্যায় রহিয়াছে, সে-কীর্তি কখনও চিরস্থায়ী হইতে পারে না। কর্তাব ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে তাহার কীর্তিরও বিলোপ হয। অন্যায়ের পরাজয় বা ধ্বংস একদিন অবশ্যই উপস্থিত হয়। কীর্তিনাশা ভীষণ ধ্বংসের মধ্য দিয়া মানবকে এই শিক্ষা দেয়।

২৪। **"কীর্তিনাশা! বৃথা নাম বৃথা অভিমান!**
কি সাধ্য প্রকৃত কীর্তি নাশিতে তোমার?
নাশিতে নরের সৃষ্টি সর্বশক্তিমান্
মানস সৃষ্টিতে তব নাহি অধিকার।" (নবীনচন্দ্র সেন, পৃঃ ৫০)

কীর্তি দুই প্রকার—এক ন্যায়মূলক কীর্তি, দ্বিতীয় প্রকার অন্যায়মূলক। ন্যাযমূলক কীর্তি বা সত্যকীর্তি চিবস্থাযী হয়—অন্যায়মূলক কীর্তির ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। রাজনগবের রাজা রাজবল্লভের ধনদৌলত, ইমাবত, লৌকিক ঐশ্বর্য কীর্তিনাশা ধ্বংস করিয়াছে—ইহা সত্য: কিন্তু কাহারও মানসিক সৃষ্টিকে ধ্বংস কবিবার শক্তি তাহার নাই। ইষ্টকের উপর ইষ্টক স্থাপন করিয়া প্রাসাদ তুলিয়া যাঁহাবা অমরতা লাভ কবিতে চাহেন, তাঁহাদের কীর্তি জগতে বেশিদিন থাকে না—কীর্তিনাশার মতো নদী তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া থাকে। কিন্তু এই নদী সকল প্রকাব কীর্তি নাশ কবিতে পারে না। যাঁহারা মানস সৃষ্টি দ্বাবা জগৎকে উপকৃত করেন, তাঁহাদের কীর্তি কীর্তিনাশা কেন, কোন শক্তিই ধ্বংস কবে না বা করিতে পাবে না। জগতেব জ্ঞানী-গুণীবা সাহিত্য শিল্প, দর্শন দিযা মানুষেব মনকে যুগ যুগ ধবিযা তৃপ্ত কবিতেছেন। তাঁহাদেব কীর্তি যতকাল মনুষ্য জাতি বাঁচিয়া থাকিবে কোনদিনই ধ্বংস হইবার নহে। ইঁহাদের কীর্তি সত্য কীর্তি—আর মাটি বা ইট দিয়া যাঁহারা কীর্তি স্থাপন করিতে চাহেন তাঁহাদের কীর্তি নশ্বব। কীর্তিনাশা এই নশ্বর কীর্তিব নাশক। সাহিত্য শিল্প দর্শনেব কীর্তি কল্পান্তকাল স্থায়ী হয়।

২৫। **'অধীনতা, অপমান সহি অনিবার**
কেমনে রাখিবে প্রাণ, নাহি পাবে পরিত্রাণ।' (পলাশিব যুদ্ধ, পঃ ৫৩)

উত্তর—'স্বাধীনতা হীনতাব কে বাঁচিতে চায়' দেখ।

২৬। **'কি ছার জীবন যদি নাহি থাকে মান।'** (পলাশিব যুদ্ধ, পৃঃ ৫৪)

উত্তর—'রামায়ণী কথা' ৯২ সংখ্যক ভাব সম্প্রসারণ দেখ।

২৭। **'মস্তক উপরে বজ্র, তপ্ত লৌহ পথে**
প্রজ্বলিত শৈলশৃঙ্গে হয় নিপতিত
তথাপি প্রতিজ্ঞা নাহি করিব লঙ্ঘন।' (বুদ্ধের গৃহত্যাগ' পৃঃ ৫৬)

সদ্ব্যক্তিগণ যে প্রতিজ্ঞা একবার করেন, তাহা কোন অবস্থায়ই পরিবর্তিত হয় না। অস্থিরচিত্ত লোকদের প্রতিজ্ঞা করিতেও বেশি সময় লাগে না: আর উহা ভঙ্গ করিতেও তাহাদের দেরি হয় না। তাহারা ঘন ঘন প্রতিজ্ঞা করে, আর ঘন ঘন

উহাকে লঙ্ঘন করে। এই শ্রেণীর লোকেরা সংসারে কোন কাজই সম্পন্ন করিতে পারে না। সমস্ত কাজের মূল হইতেছে সংকল্প। ইহা ঠিক রাখিতে পারিলে কার্যসিদ্ধ হইতে পারে। যাহাদের সংকল্পেই গোলযোগ উপস্থিত হয় তাহারা কি করিবে আর কি না করিবে তাহা স্থির করিতে পারে না। সুতরাং তাহাদের দ্বারা সংসারের কোন কাজই হয় না। পক্ষান্তরে স্থির সংকল্প লোকদের কার্যসিদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। প্রত্যেক কাজেই বাধাবিঘ্ন আছে, লাভালাভ জয়াজয় আছে। প্রাথমিক বাধাবিঘ্ন দেখিয়া ঐই শ্রেণীর লোকেরা ভয় পান না। ইহার পর কিছুদূর অগ্রসর হইলে আবার হয়তো নূতন বাধা বিঘ্ন আসে—কিন্তু কোন, অবস্থায়ই ইঁহাবা বিচলিত হন না। ধন-সম্পৎ এমনকি জীবন দিয়াও ইঁহারা নিজের প্রতিজ্ঞাকে রক্ষা করেন। প্রতিজ্ঞা রক্ষায় অসাফল্য আসিলেও ইঁহারা কখনও অবসন্ন হন না—কারণ মনোবল ইঁহাদের অত্যন্ত দৃঢ়। ইঁহারা জানেন, কার্য করিতে গেলে প্রতিজ্ঞাব অনুরূপ সফলতা সকল সময় উপস্থিত নাও হইতে পারে, কিন্তু তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই। চেষ্টা করিবাব পর কার্য নষ্ট হইলে কাহাকেও দোষ দেওয়া চলে না। যাহারা ঘন ঘন সংকল্প পরিত্যাগ করে, তাহারা জগতে কোন কাজকেই ধরিয়া থাকিতে পাবে না। সারা জীবন তাহাদের বিফলে কাটে। সংসার কর্মক্ষেত্র, এখানে সকলকেই কিছু না কিছু কাজ করিতে হইবে—তাহা ভুলই হউক আর ত্রুটিশূন্যই হউক। নিশ্চেষ্ট কাপুরুষেরাই কাজ করে না তাহাদের কাছে প্রতিজ্ঞা রক্ষারও কোন প্রয়োজন হয় না। পক্ষান্তরে সত্য-সংকল্প সজ্জনগণ প্রতিজ্ঞাপূরণ করিয়া আত্মমর্যাদা রক্ষা করিয়া থাকেন।

২৮। **"সমগ্র ভারতে সাম্য করুক বিরাজ,**
না থাকুক পরস্পর উচ্চনীচ ভেদ;
নয়ন সফল হয় দেখি যদি আজ ॥
না আছে ভারতবর্ষে জাতীয় বিচ্ছেদ।" (নববর্ষ, পৃঃ ৬১)

মিলনে শক্তি, ভেদে দুর্বলতা। বিদেশের লোক অপেক্ষা স্বদেশের লোকের মিলন সহজসাধ্য। এক দেশ এক লক্ষ্য যেখানে থাকে, সেখানে দেশবাসী পরস্পবের সহিত একযোগে কাজ করিতে পারে। দেশবাসীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত থাকা স্বাভাবিক—কিন্তু সকলের স্বার্থ যেখানে এক কাহারও জাতীয় লক্ষ্যের পথে বাধা সৃষ্টি করা উচিত নহে। জাতি বিপন্ন হইলে ব্যক্তির অস্তিত্বও বিপন্ন হয। জাতির শান্তিতে ব্যক্তিও শান্তির অধিকারী হয়। যে দেশে উচ্চনীচ ভেদজ্ঞান থাকে সেখানে কোন কল্যাণের কোন স্থান নাই। দেশ সকলের—ইহা ব্যক্তি-বিশেষের সম্পত্তি নহে। যাঁহারা ধনে মানে, বিদ্যায় বড়, তাঁহারা যদি অন্যলোককে হেয় মনে করেন, তবে তাহারা কোনও অবস্থায় বড়লোকদের সহিত এক সঙ্গে কাজ করিবে না। আর যাঁহারা উন্নত নহেন তাঁহারাও যদি পদে পদে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদিগকে সহ্য করিতে না পারেন, তবে সমাজ ও দেশ বিপন্ন হইবে। মিলনের মূল কথা হইতেছে সকলে সকলকে সমান জ্ঞান করিবে। একথা সত্য দরিদ্র না থাকিলে ধনীদের এক মুহূর্তও চলিবে না আর দরিদ্রেরও অর্থশালী লোক ছাড়া চলিবে না। দরিদ্র কাজ দিতে পাবে। কিন্তু কাজে অর্থেরও প্রয়োজন আছে। সুতরাং চাই দুইয়ের সামঞ্জস্য। দেশের কল্যাণের জন্য সকলে সকলের জন্য ভাবুক। দেশে ধনীর দরকার, দরিদ্রেরও দরকার। এই কারণে সাম্যনীতি প্রয়োজনীয়। ভারত এক এবং অখণ্ড। এই, বিরাট দেশে বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন আচার এবং ধর্মমত থাকা স্বাভাবিক। ইহাতে কোন ক্ষতি নাই—দেশের কল্যাণ যেখানে সেখানে সকলেই এক। বৈচিত্র্যের ভিতর ঐক্য হইল ভারতের লক্ষ্য।

এই আদর্শই যুগ যুগ ধরিয়া ভারতের মহামানবগণ শিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন। বাহিরের বৈচিত্র্যের মধ্যে একতার কোন বাধা নাই। সমগ্র ভারতের উচ্চ নীচ ভেদ দূর হইয়া ভারতের সাম্য বিরাজ করুক।

২৯। **"বহু পুণ্যফলে জন্মে নর এ ভারতে"** (ভারতের মানচিত্র, পৃঃ ৬৬)

ভারতবর্ষ দেবভূমি। এখানে প্রতি গিরি প্রতি নদী প্রতি জনপদ পুণ্য তীর্থ-রূপে পরিগণিত। ফলে জলে শস্যে এদেশ সমৃদ্ধ। বৎসরের প্রত্যেক ঋতু কোন না কোন জায়গায় উপস্থিত থাকে। এই দেশের ভূমি শস্যশ্যামলা। কোন জায়গায় উচ্চ পাহাড়, কোথাও ইহার সমভূমি, আবার কোথাও বা বিরাট মরুভূমি।

ভারতে বিভিন্ন জাতীয় মানবের বাস—কিন্তু সকলেই ভারতীয়। বিভিন্ন বর্ণের একত্র মিলনে ভারত যেন রামধনু।

সারা পৃথিবী যখন অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমগ্ন ছিল, তখন ভারতের ঋষিগণই জগতে সর্বপ্রথম জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়াছিলেন; সত্য ও ত্যাগের মহিমা জগৎকে তাঁহারাই শিক্ষা দিয়াছিলেন। আজও তাঁহাদের জ্ঞানরাশি ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রের মধ্যে নিহিত আছে।

যুগে যুগে অবতার পুরুষগণ আর মহামানবগণ সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিয়াছেন, মানুষের মধ্যে উচ্চনীচ ভেদাভেদ দূর করিয়াছেন। তাই বহু পুণ্য ফলে মানুষ এখানে জন্মগ্রহণ করে।

৩০। **"জান নাকি এ জগৎ নিশার স্বপন!**
মায়া-মরীচিকা প্রায় স্নেহ ভালবাসা—
জীবনের পাছে ঐ রয়েছে মরণ!
হে পান্থ, হেথায় শুধু আঁধারের স্তর;
মৃত্যুর উপরে মৃত্যু মৃত্যু তারপর!"
(মুন্সী কায়কোবাদ 'সায়াহ্ন'—পৃঃ ৬৮)

এই জগৎ নশ্বর। ইহা বাস্তবও নহে। মনুষ্য জীবন অস্থায়ী। চক্ষুর সম্মুখে আমরা যে জগৎকে দেখি তাহা অলীক। স্বপ্নে মানুষ যাহা দেখে তাহা সত্য নহে, কেন না রাত্রির অবসানে স্বপ্নে যাহা কিছু দেখা গিয়াছিল সকলই অন্তর্হিত হয়। এই জগৎ বর্তমানে আছে, কিন্তু ভবিষ্যতে ইহা থাকিবে না।

এইরূপ নশ্বর জগতে স্নেহ ভালবাসাকেও চিরস্থায়ী বলিয়া কল্পনা করা ভুল, কেননা স্নেহ ভালবাসার পাত্রগণ চিরকাল এখানে বাঁচিয়া থাকে না। যেখানে মানুষ চিরকাল বাঁচিয়া থাকে না, সেখানে স্নেহভালবাসারও কোন মূল্য নাই।

এখানে একমাত্র সত্যবস্তু হইতেছে মৃত্যু। সকলকেই একদিন না একদিন মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে হইবে। এ বিষয়ে কাহারো কোন সংশয় নাই। কারণ জীবনের পর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মানুষ এ জগতে ঠিক পথিকের মতো। সে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যায়। এই পৃথিবীর কাজ শেষ হইলে তাহাকে অন্যত্র যাইতে হয়। মৃত্যুর পরে কি হইবে,কেহ বলিতে পারে না।

মৃত্যুর পরের অবস্থা অজ্ঞেয়। উহা জানিবার জন্য যতই কেন চেষ্টা করা হউক না কেন তাহাতে অজ্ঞেয়তা বাড়িবে ছাড়া কমিবে না।

৩১। **"এ জগতে হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি।"**
(দুই বিঘা জমি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৭২)

মানুষের লোভ-পূরণের কোন সীমা নাই। কতটা পাইলে মানুষ তৃপ্ত হয় কেহ

তাহা বলিতে পারে না—এমন কি লোভী লোক নিজেই জানে না তাহার সন্তুষ্টি কিসে হইতে পারে। লোভের দিক দিয়া বিচার করিলে ধনী আর ধনহীনের মধ্যে কোন প্রভেদ দেখা যায় না। ধনহীনের ধনের প্রতি লোভ হওয়া স্বাভাবিক, কেননা তাহার ধনের প্রকৃত অভাব রহিয়াছে। ধনীরও অভাব নাই সত্য, কিন্তু তাহার অভাববোধ আছে; সে সর্বদাই এই কারণে অতৃপ্ত। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে একজনের টাকা নাই বলিয়া স্বাভাবিক অভাববোধ রহিয়াছে, আর অপব ব্যক্তির মানসিক বা কৃত্রিম অভাববোধের জন্য অধিকতর অর্থের প্রয়োজন।

ধনী দরিদ্র দুইজনেই সমান লোভী। কিন্তু অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় দরিদ্রের লোভ অল্পেতে শান্ত হয়। কিন্তু ধনীর পক্ষে হয় ইহার বিপরীত। ধনী যত পায় তত চায়, তাহার চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নাই তাহার চাওয়ার কোন সীমা নাই, পাওয়ারও কোন সীমারেখা নির্দেশ কবা চলে না।

দরিদ্রের আকাঙ্ক্ষা অল্প, তাই অল্পেতে তাহাব তৃপ্তি হয। ধনীর আকাঙ্ক্ষা বেশি, তাই তাহার কোনদিনই তৃপ্তি হয় না। এই কারণে রাজার ঐশ্বর্য যাহার আছে এইরূপ লোকও দরিদ্রের ক্ষুদ্র সম্পত্তি কাড়িয়া লইবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়ে।

৩২। "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"
(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "প্রাণ"—পৃঃ ৭৪)

মৃত্যু অপেক্ষা মানবের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা ভাল।

মৃত্যুর পর সুখের আকাঙ্ক্ষা কবিয়া ইহলোকের সৌন্দর্যকে এবং এখানকার সুখ দুঃখকে উপেক্ষা করা উচিত নহে। মানুষ মর্তের জীব, এখানকার সুখদুঃখ বিরহ মিলনকে উপেক্ষা করা তাহার অন্যায়। এখানকার সুখদুঃখেব অংশ কবিকে সমভাবে সকলের সঙ্গে গ্রহণ করিতে হইবে ইহাই কবির ইচ্ছা।

কবি যদি পৃথিবীব মানুষেব জীবন্ত প্রাণের মধ্যে স্থান পান, তবে তিনি কখনও মৃত্যু কামনা কবেন না। এই পৃথিবীর মানুষের সেবার জন্য কবি নূতন নূতন গীত বচনা করিতে চাহেন। এই সকল গীত দ্বারাই তিনি মর্ত্যলোককে অমরলোকে পরিণত কবিতে চাহেন। মর্ত্যলোক যখন অমরলোকে পরিণত হইবে তখন মৃত্যুর কোন সার্থকতা নাই।

৩৩। "যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।"

এই সংসারের জযযাত্রার পথে চলিবার অধিকার কাহারও একাব নহে। তাই একজনকে নীচে ফেলিয়া অপবে উপবে উঠিতে পাবে না, আর কেহ কাহাকে চিরকাল বলপূর্বক পিছনে রাখিয়াও অগ্রসর হইতে পারে না।

সকলেই বড় হইতে চাহে। অপরেব প্রতি যেরূপ ব্যবহার কোন লোক দেখায়, সেইরূপ ব্যবহার অপরের নিকট হইতে সে অবশ্যই পাইবে। একজনকে নীচে ফেলিবা অপর ব্যক্তি যদি নিজের উন্নতিসাধন করিতে যায়, নীচেব লোক সেই দিক হইতে তাহার বাধা সৃষ্টি করিবে। কাহাকে পিছনে রাখিয়া কোন ব্যক্তি যদি নিজে অগ্রসর হইতে চাহে, তাহা হইলে পিছনের লোকের চেষ্টা হইবে অগ্রগামীকে পশ্চাৎ হইতে আকর্ষণ করা।

এই সংসারে যাহার যাহা যোগ্য স্থান সে তাহা একদিন না একদিন অধিকার

করিয়া লইবে। এই পৃথিবী সকলের। ইহাতে সকলেরই তুল্য অধিকার। সুতরাং একজনকে নীচে ফেলিয়া অপর ব্যক্তি উপরে উঠিতে পারে না, অপরকে পিছনে ফেলিয়াও অগ্রসর হওয়া যায় না। কোন লোক অল্প সময়ের জন্য অপরকে পিছনে ফেলিয়া অগ্রসর হইতে পারে, কিন্তু এই অগ্রগতি চিরদিনের জন্য নহে।

৩৪। **"হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান।"**
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।'
(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'দুর্ভাগা দেশ' ('অপমানিত' পৃঃ ৭৭)

এই পৃথিবীতে যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম করে সে তাহার সেইরূপ ফল ভোগ করে। ইহারই নাম কার্যকারণ সম্বন্ধ।

মানুষ অপর মানুষের কাছে, ন্যায়, সমতা, সুবিচার লাভ করিবার অধিকারী। মানুষে মানুষে কোন ভেদ নাই। একজন যদি সমাজে সমতার অধিকার প্রাপ্ত হয়, আর সকলেরই সেইরূপ অধিকার লাভ না করিবার কোন কারণ নাই।

মানুষ মানুষকে অপমানিত করিলে, অপমানিত ব্যক্তি বা সমাজ অবমাননাকারীকে কখনও ক্ষমা করিবে না। অপরের অত্যাচার সহ্য করিতে করিতে অপমানিত সমাজে ক্রমশঃ সংঘবদ্ধতা আসে। ইহারা সংঘবদ্ধ হইয়া যখন অত্যাচারীকে আক্রমণ করিবে, অত্যাচারী তখন দুর্বল হইয়া পড়িবে। অপমানিতের প্রতিশোধে অত্যাচারী মাথা উঁচু করিয়া আর দাঁড়াইতে পারিবে না। সে নীচে নামিয়া সকলের সমান হইবে। প্রতীকারার্থী জনসমাজ যখন সংঘবদ্ধভাবে অত্যাচারীর বা অপমানকারীর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তখন তাহার শক্তি হয় অপরিসীম, কেননা মানুষ যুগ যুগান্তের সঞ্চিত ব্যথায় ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করিয়া একদিন প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করে। তখন সবল ব্যক্তি হয় অপেক্ষাকৃত দুর্বল, আর দুর্বল, শক্তিতে সবলের স্থান অধিকার করে। তাই পূর্বেকার সবল আর দুর্বল পরে হয় সমান।

৩৫। **শতেক শতাব্দী. .. .. ..সমান॥** (দুর্ভাগা দেশ, পৃঃ ৭৮)

প্রাচীন ভারতবর্ষ মানুষকে ধর্মের স্বাধীনতা আর চিন্তার স্বাধীনতা দিয়াছিল এবং ধর্মের আর উচ্চচিন্তার মাধ্যমে সাম্যবাদ প্রচার করিয়াছিল, কিন্তু সে মানুষের দেহকে বিধিনিষেধ এবং সামাজিক শৃঙ্খলের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। তাই মানুষ মানুষকে চিনিতে পারে নাই। একদল লোক বা বহুলোক যুগে যুগে নররূপী নারায়ণকে অবহেলা করিয়া আসিয়াছে। তাই ভারতবর্ষে অস্পৃশ্যের সংখ্যা, অবনত মানুষের সংখ্যা এত বেশি। যাহারা নবনারায়ণকে অবহেলা করিয়াছে, তাহারাও বার বার বিদেশী শত্রু দ্বারা পদদলিত হইয়াছে। তাহারা অপরের নিকট শতশতাব্দী ধরিয়া লাঞ্ছিত হইয়াও মানুষকে তাহার প্রকৃত মর্যাদা দান করে নাই।

এত অপমান সহ্য করিয়াও তথাকথিত উন্নত লোকেরা পতিতের ভগবানকে দেখিতে পায় নাই। পতিতের ভগবান ধূলির সহিত মিশিয়া আছেন, তাঁহাকে নমস্কার না জানাইলে জাতির কোন মুক্তি নাই। তাই দৃষ্টিভঙ্গিকে বদলাইয়া পদদলিত নরনারায়ণকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। একটু চেষ্টা করিলেই তাঁহাকে পাইতে বিলম্ব হইবে না। তাই মাটির দিকে দৃষ্টি দান করিয়া নত হইয়া সকলের সমান হইতে হইবে। তাহা না হইলে দেশের উন্নতি সুদূরপরাহত।

৩৬। **"বিধাতা দেছেন প্রাণ,**
সদা থাকি ম্রিয়মাণ,
শক্তি মরে ভীতির কবলে,

পাছে লোকে কিছু বলে।"

(কামিনী রায়, 'পাছে লোকে কিছু বলে'—পৃঃ ১৪)

প্রত্যেক মানুষের ভিতরে কিছুটা শক্তি আছে—সে দুর্বলই হউক আর সবলই হউক। পৃথিবীতে সকল লোকেরই যে খুব বেশি শক্তি থাকিবে ইহা ঠিক নয়, আ কম শক্তিও অনেকের থাকিবে একথাও যথার্থ নয়। পৃথিবীতে মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং বাঁচিয়া আছে—ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে তাহার কিছুটা শক্তি আছে। শক্তি থাকিতেও যে মানুষ নিশ্চেষ্ট তাহার জীবনে উন্নতির কোন আশা নাই

এই নিশ্চেষ্টতার মূলে আছে এক প্রকারের ভীরুতা এবং দুর্বলতা। এই শ্রেণী লোকেরা নিজেদের ভিতরের শক্তির দিকে দৃষ্টি না দিয়া পরের সমালোচনার দিকে দৃষ্টি দেয়। এ সমালোচনার ভয়ও সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক। এইরূপ ক্রমাগত ভ পাইতে পাইতে যে শক্তিটুকু ভিতরে ছিল, ভীরু লোক তাহা হইতে বঞ্চিত হয় শক্তি থাকিতে যাহারা ভয়ে উহার ব্যবহার না করে তাহাদের দুর্গতির সীমা থাকে না

৩৭। **পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি**

এ জীবন মন সকলি দাও;

তার মতো সুখ কোথাও কি আছে?

আপনার কথা ভুলিয়া যাও!

(কামিনী রায়—'সুখ' পৃঃ ১৬)

[উত্তরের জন্য 'ধাত্রীপান্না'—কবিতার (পৃঃ ৪০) 'স্বার্থত্যাগ মহামন্ত্রে সাধনে- এই স্তবকের ভাব সম্প্রসারণের সাহায্য লও]

৩৮। **নর কহে ধূলিকণা এ বুকে।** (পৃঃ ৯৯)

মানুষ তাহার দেহের পরিণামের কথা কখনই ভাবে না। সে তাহার বর্তমান অবস্থায় নিজকে গৌরবান্বিত মনে করে। এইরূপ অবস্থায় ধরাকে শরা জ্ঞান করা তাহার পক্ষে অসম্ভব নয়।

সে নিজেকে ছাড়া কাহাকেও বড় মনে করে না তাহার অপেক্ষা নীচের লোককে অতি অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকে এবং নানাভাবে অবনত অবস্থার জন্য তাহাকে বিদ্রূপ করে।

কিন্তু সে জানে না যে তাহার দেহ মাটি দিয়া গড়া এবং একদিন না একদিন তাহার সুন্দর সুঠাম শরীর মাটিতে পরিণত হইবে। মানুষ হইলেও সে মাটির পুতুল ছাড়া আর কিছুই নহে। এইরূপ মাটির পুতুলের অহঙ্কার কখনই শোভা পায় না।

অবস্থান্তর ঘটিলে মানুষ তাহার উৎপত্তি যেখান হইতে হইয়াছে তাহা একেবারে ভুলিয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় তাহার পিতাকেও সে বিদ্রূপ করে আর হেয় জ্ঞান করে। পিতা নিজে দুঃখ কষ্টের মধ্যে থাকিয়া পুত্রকে উন্নত করেন, পুত্রের কল্যাণের জন্য নিজের দুঃখকষ্ট সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যান। কিন্তু কৃতঘ্ন পুত্র পিতার দীন অবস্থায় তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা দূরে থাকুক, তাঁহার ঐ অবস্থাকে অত্যন্ত কৃপার চক্ষে দেখিয়া থাকে। পুত্র বোঝে না পিতার সঙ্গে একত্র থাকিতে গেলে পুত্রেরও ঐ অবস্থা বরণ করিতে হইবে। কিন্তু পিতা তাহা চাহেন না—তিনি নিজে কষ্টের মধ্যে থাকিলেও পুত্র সুখে থাকুক এই তাঁহার কামনা। তবে পুত্র এই অবস্থা বোঝে না বলিয়াই পিতার যত দুঃখ। পিতার অবস্থা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিলে পুত্র পিতাকে কখনও দীন হীন মনে করিত না।

স্বাধীন মতামত প্রকাশ করিবার উপায় নাই। এমন কি তাহার সর্বপ্রকার গতিবিধি অপরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এরূপ অবস্থায় তাহার জীবন মৃত্যুতুল্য। দীর্ঘকাল পরের অধীনে থাকিতে থাকিতে মানুষ তাহার স্বাভাবিক শক্তি হারায়, সে হয় জীবনে পঙ্গু।

স্বাধীন মানুষকে অনেক মূল্য দিয়া স্বাধীনতা ক্রয় করিতে হইয়াছে। স্বাধীন মানুষ বা জাতিকে সহস্র বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইবে। ত্যাগ না করিলে ভোগ করা যায় না। স্বাধীনতা ভোগ করিতে হইলে, ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিতে হয়।

সংসারে অতি সহজে খুব কম লোকেই সুখ ভোগ করিতে পারে। সুখকে কষ্ট দ্বারা অর্জন করিতে হয়। স্বাধীনতা লাভ করিয়া সে স্বাধীনতাকে স্থায়ী করিতে হইলে দুঃখ কষ্ট অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু পরাধীনতার তথাকথিত সুখ অপেক্ষা স্বাধীনতার দুঃখ সব দিক দিয়াই ভাল। বর্তমানে দুঃখ আছে, ভবিষ্যতে এ দুঃখ দূর হইবে, যদি স্বাধীনতা রক্ষায় ব্যক্তি বা জাতি তৎপর থাকে—আর দুঃখ দূর না হইলেও স্বাধীনতার দুঃখ কল্যাণকর। যাহাতে প্রকৃত কল্যাণ হয়, তাহারই জন্য জাতি বা ব্যক্তির অবহিত হওয়া দরকার।

৪৫। **"রাজারে কহিল, অরিরে জিনিতে করিলে সমরপণ।**
হায় নিরদয় কেন করিলে না হৃদয় সমর্পণ?"
(কৃষ্ণদয়াল বসু—'বিজয়ী'—পৃঃ ১৫৯)

অস্ত্র দ্বারা কাহাকেও প্রকৃতপক্ষে জয় করা যায় না। লোকের হৃদয় জয় দ্বারাই প্রকৃত জয় লাভ হয়।

যুদ্ধাস্ত্রের অযথা প্রয়োগে আক্রান্ত দেশের নরনারী, বালক বৃদ্ধ যুবা বহু কষ্টের সম্মুখীন হয়। এরূপ অবস্থায় বিজয়ী নৃপতি কখনও লোকের মনে শ্রদ্ধার আসন পান না। জাতি বা ব্যক্তি কোন রাষ্ট্রশক্তির অধীন হইতে পারে, কিন্তু মানুষের মনের উপর এ জগতের কাহারও প্রভুত্ব নাই। দেশ শুধু সব নয়, মানুষই প্রকৃত রাষ্ট্র। এখানে মাটির সঙ্গে রহিয়াছে মানুষ। সেই মানুষের হৃদয় যতক্ষণ জয় না করা যাইবে ততক্ষণ কোন রাষ্ট্র শক্তি বা নৃপতি জয়লাভ করিতে পারেন না। অপরকে জয় করিতে হইলে বিজয়ীকে বিজিতের নিকট সর্বাগ্রে নিজের মনপ্রাণ তাহাদের কল্যাণার্থে সমর্পণ করিতে হইবে, তাহা হইলেই বিজয়ী বিজিত জাতির মনপ্রাণে স্থান পাইবেন।

এই যে হৃদয়ের আদান প্রদান ইহাই প্রকৃত জয় সম্পন্ন করিয়া থাকে। অস্ত্র দ্বারা জয় কোনদিনই জয়রূপে পরিগণিত হয় নাই।

অস্ত্র দ্বারা যেখানে জয় হইয়াছে, সেখানে বিজেতা কখনই দেশের লোকের হৃদয়ে স্থান লাভ করেন নাই।

মানুষ মানুষের প্রতি সমান ব্যবহার চাহে। যেখানে সমব্যবহার নাই সেখানে কোন মিলন কেহ প্রত্যাশা করে না।

৪৬। **আমরা ধরি মৃত্যু রাজার যজ্ঞ ঘোড়ার রাশ,**
মোদের মৃত্যু লেখে মোদের জীবন-ইতিহাস!
হাসির দেশে আমরা আনি সর্বনাশী চোখের জল।
আমরা ছাত্রদল॥ ('ছাত্র দলের গান' পৃঃ ১৬৪)

দেশের স্বাধীনতা যজ্ঞে ছাত্রগণ জীবনাহুতি দিয়াছে। যখনই সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার কোন আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে তখনই ছাত্রগণ অগ্রসর হইয়াছে। তাহারা উহাতে প্রাণদান করিতে কোন কুণ্ঠা বোধ করে নাই। যেখানে কেহ অগ্রসর হয় না,

যেখানে মৃত্যুবরণ করিতে সকলেই ভয় পায়—সেইখানে তরুণ ছাত্রদল কঠোর মৃত্যুকে বরণ করিবার জন্য সর্বাগ্রে উপস্থিত হইয়াছে।

ছাত্রদের ত্যাগের কাহিনী অন্য কেহ না লিখিলেও মৃত্যুতে সেই ইতিহাস লেখা আছে। তাহাদের ত্যাগ তাহাদের কর্তব্য পালন অনেকক্ষেত্রে মৃত্যুতে সমাপ্ত হইয়াছে। তাহাদের মৃত্যুই বলিয়া দিবে, কত কষ্ট তাহারা সহ্য করিয়াছে।

মানুষ নিজের অবস্থা ভুলিয়া যখন কৃত্রিম এক পরাধীন জীবনের ক্ষণস্থায়ী আনন্দে মত্ত হয় তখনই ছাত্রগণ নানাভাবে এই ক্ষণিক মোহকে দূর করিয়া হাসির পরিবর্তে চক্ষুর জল বহাইয়াছে। নির্মম সত্যের সম্মুখীন হইতে হইলে, কৃত্রিম আনন্দকে ত্যাগ করিতে হইবে।

৪৭। **"আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের;**
বিলাস-বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের তরে ভাই
সময় যে হায় নাই!
(প্রেমেন্দ্র মিত্র, 'আমি কবি'—পৃঃ ১৭৫)

বর্তমান জগৎ অত্যন্ত কর্মব্যস্ত। কাহারও কোন অবসর নাই। এই পৃথিবী-রূপ বিরাট কর্মশালায় অনবরত কাজ চলিতেছে। শুধু পৃথিবীর উপরে কেবল কামার কুমার, কৃষক, শ্রমিক, যন্ত্রী, শিল্পীর কাজ চলিতেছে তাহা নহে, আধুনিক যুগের মানুষ মাটির নীচ হইতে কাজ করিয়া রত্ন আহরণ করিতেছে, সাগরের নীচে মুক্তার সন্ধান করিতেছে, নদনদীকে বন্ধন করিয়াছে, পাহাড়কে উড়াইয়া দিতেছে। এইরূপ অবস্থায় বর্তমান কবি প্রাচীন যুগের কবিদের মতো কল্পনার বিলাসে গা ঢালিয়া দিতে পারেন না। তাঁহাকে কর্মের জয়গান গাহিতে হইবে, শ্রমের মর্যাদার কথা জগৎকে শুনাইতে হইবে। প্রাচীনকালের লোকের কাজ ছিল কম, তাই কল্পনার ঐশ্বর্য দিয়া তাহারা কাব্য রচনা করিত—সে কাব্যকথা শুনিবার লোকেরও অভাব ছিল না। এ যুগের লোক বাস্তবের সম্মুখীন হইয়াছে—এখানে কল্পনার কোন অবকাশ নাই। সুতরাং এ যুগের কবি কল্পনায় মগ্ন হইয়া থাকিতে পারেন না।

৪৮। **জাফরি কাটানো চারণ চাই!**
(প্রেমেন্দ্র মিত্র 'আমি কবি'—পৃঃ ১৭৫-৭৬)

প্রাচীন যুগের কাব্যের বিশেষ বর্ণনীয় বিষয়বস্তু ছিল প্রিয়জনের বিরহে প্রতীক্ষমাণা নায়িকা।

নায়িকা তাহার আকাঙ্ক্ষিত প্রিয়জনের সহিত মিলনের জন্য নানাভাবে তাহার বিরহের জীবনযাপন করিত: কখনও বা অর্ধরাত্র পর্যন্ত বীণা লইয়া গান করিয়া কাটাইত। এইরূপ অবস্থায় বসিয়া থাকিতে থাকিতে চোখ ঘুমে ভরিয়া আসিত, কোলের বীণা কোলেই থাকিত, চোখ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িত। প্রাচীন যুগের কবি অর্ধরাত্রের এই বিরহিণী নায়িকার প্রতি সমবেদনা দেখাইয়া তাহার দুঃখের করুণ কাহিনী দিয়া তাঁহার কাব্য ভরিয়া ফেলিতেন। আর বর্তমান যুগের কবির কোন অবসর নাই। তাঁহার জগতে সহস্র সহস্র কর্মী সর্বদা নিজ নিজ কাজ লইয়া ব্যস্ত। ইহাদের কাজের দিকে দৃষ্টি না দিয়া, ইহাদের কাজের মহত্ত্ব বর্ণনা না করিয়া, বিরহিণী নায়িকার মিনতি রক্ষা করিতে কবি অক্ষম।

তাঁহার কাব্যে আছে, কর্মীর বর্ণনা আর শ্রমের বর্ণনা। পূর্বে কর্মীর কথা শ্রমিকের কথা কোন কবি লিখেন নাই। এতলোক যেখানে কর্মব্যস্ত সেখানে তাহাদের জয়যাত্রার গাথা গাহিবার জন্য কোন চারণ চাই। বর্তমান কবি সেই চারণের কার্যভার,

গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং কল্পনার বিলাসে গড়া বিরহিণী নায়িকার অনুরোধ কবি রক্ষা করিতে পারিবেন না।

৪৯। **'সারা দুনিয়ার......হায়! সময় নাই।**

(প্রেমেন্দ্র মিত্র 'আমি কবি'—পৃঃ ১৭৬)

[এই কবিতার পূর্বের দুইটি ভাবসম্প্রসারণের উত্তর দেখিয়া ইহার উত্তর প্রস্তুত কর]

৫০। **"ধর্ম যখন শৃঙ্খলিত......অবগুণ্ঠিত?"** (পার্থ, পৃঃ ১৬১)

৫১। **"মোদের কক্ষচ্যুত-ধূমকেতু-প্রায়...আমরা ছাত্রদল॥"** (পৃঃ ১৬৪)

৫২। **"তব নাম লয়ে মুখে... . না তাঁর!"** (প্রেমের দেবতা, ১৬৬)

৫৩। **"ক্ষুধিত জনের রুটি......লভুক প্রাণ।"** (ঐ, পৃঃ ১৬৭)

৫৪। **"গুরু হেসে কন......প্রকাশ তাঁর।"** (ঈশ্বর লাভ, পঃ ১৭৩)

[৫০ হইতে ৫৪ সংখ্যক ভাবসম্প্রসারণ নিজে চেষ্টা কর]

কুরুপাণ্ডব

৫৫। **"হে অর্জুন, এই রঙ্গভূমি যোদ্ধামাত্রেরই অধিকৃত; ইহাতে কাহাকেও আহ্বান বা নিবারণ করা সম্বন্ধে তোমার কোনো প্রভুতা নাই।"** (পৃঃ ১৩)

পরীক্ষা দ্বারাই লোকের কোন বিষয়ে যোগ্যতা প্রমাণিত হইয়া থাকে। যোগ্যতম ব্যক্তিকে নির্বাচন করিতে হইলে পরীক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া পরীক্ষার্থীর সংখ্যা যাহাতে অধিক হয় তাহা করা উচিত।—অধিক লোকের মধ্য হইতে গুণিনির্বাচনে যোগ্যতম ব্যক্তির সন্ধান নিশ্চিতরূপে হইয়া থাকে। ইহাই গুণিনির্বাচনের প্রকৃষ্ট পন্থা। যুদ্ধবিদ্যা প্রধানতঃ ফলিত বিদ্যা। এ বিদ্যা অস্ত্রকুশলতা সৈন্য চালনা, শৃঙ্খলা রক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারে সীমাবদ্ধ। এ বিদ্যার পরীক্ষাস্থলে যে কোন যুদ্ধ ব্যবসায়ী আপন পারদর্শিতা প্রদর্শনের অধিকারী। যুদ্ধবিদ্যা পরীক্ষার স্থানে কে প্রবেশ করিয়া প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিবেন আর কে প্রবেশ করিতে পারিবেন না—এ বিষয়ে বিধিনিষেধ আরোপ করিবার ক্ষমতা একমাত্র কর্তৃপক্ষের অধিকারে রহিয়াছে। যে কোন পরীক্ষার্থী স্বয়ং, পরীক্ষা পরিচালনার কর্তা নহে। তাহার পক্ষে অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী পরীক্ষার্থীর প্রতি প্রবেশের বিধিনিষেধ আরোপ করা সম্পূর্ণ অধিকার বহির্ভূত কার্য।—ইহার জন্য সে নিন্দার্হ। সুতরাং রাজকুলে জন্ম না হওয়ায় কর্ণের রঙ্গস্থলে প্রবেশে অর্জুন বাধাসৃষ্টি করিয়া তীব্র ভর্ৎসনার পাত্র হইয়াছিলেন।

৫৬। **"কার্যকারণপ্রবাহে যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিতেছে। তন্মধ্যে তুমি স্বীয় কর্তব্য অকাতরে পালন করিলে তোমার ধর্মরক্ষা ও পরিণামে শাশ্বত মঙ্গল লাভ হইবে।"** (পৃঃ ৫৮)

সমস্ত জগৎ কার্যকারণ প্রবাহের অধীন। মনুষ্যের নিকট উপলব্ধি হউক আর নাই হউক—সকল কার্যেরই কারণ রহিয়াছে—কারণ ছাড়া কোন কার্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। এই কার্যকারণ প্রবাহ অনাদি এবং অনন্ত। মানুষ ইচ্ছা করিয়া এই কার্যকারণ প্রবাহকে বন্ধ করিয়া দিতে পারে না, এমন কি অবতার পুরুষেরাও ইহা পারেন না। কার্যকারণ প্রবাহ প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম। কার্য আমাদের সামনে স্থূলভাবে দেখা দিলেও তাহার কারণ সূক্ষ্মভাবে থাকিতে পারে। এই কার্যকারণ প্রবাহ জন্মজন্মান্তর ধরিয়া চলে। সুতরাং আমাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের

এবং জগতের ক্লেশ সম্পূর্ণরূপে নিবারণের ক্ষমতা আমাদের হাতে নাই। এরূপ অবস্থায় নিজ নিজ কর্তব্য সাধনই পরম মঙ্গলের কারণ।

কর্তব্য পালনের নামই ধর্ম। জগতের স্রষ্টা আমরা নহি—জগতের সবপ্রকার সুখদুঃখের নিয়ন্ত্রণও আমাদের আয়ত্তের বাহিরে। সুতরাং আমাদের যাহার যেটুকু কর্তব্য আছে তাহা যথাযথভাবে পালন করিতে পারিলেই আমরা পরিণামে পরম কল্যাণের অধিকারী হইতে পারিব।

৫৭। **কর্ণের কথার উত্তরে কৃষ্ণ কহিতে লাগিলেন, "হে সূতপুত্র, তুমি ভাগ্যক্রমে এই সময়ে ধর্ম স্মরণ করিতেছ। নীচাশয়েরা দুঃখে নিমগ্ন হইলেও নিজ দুষ্কর্ম বিস্মৃত হইয়া দৈবকে নিন্দা করে।"** (পৃঃ ১৩৭)

যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম করে সে তদনুরূপ ফল ভোগ করিয়া থাকে। সৎকার্যে সুখের উৎপত্তি হয় আর অসৎ কার্যের ফল দুঃখ। সৎস্বভাব জ্ঞানী ব্যক্তি ইহা জানিয়া স্বকর্মজনিত দুঃখের জন্য দৈবকে দায়ী করিয়া ধর্মশাস্ত্রের বড় বড় বাক্যের দোহাই দেয় না। নীচ প্রকৃতির লোকেরাই নিজ দোষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাহারা জীবনে কখনও কোন অন্যায় আচরণ করিয়াছে বলিয়া মনে করে না। এই শ্রেণীর লোকের জীবনে যখনই কোন গুরুতর দুঃখ বা বিপর্যয় উপস্থিত হয়, তখনই তাহারা পূর্ব অপরাধ ভুলিয়া দৈবের উপর সকল দোষ চাপাইয়া দেয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পৃথিবী রথচক্রকে গ্রাস করিলে কর্ণ, শকুনির শঠতায়, দ্রৌপদীর লাঞ্ছনায়, অন্যায়ভাবে অভিমন্যু বধের প্ররোচনা দিয়া যে গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হয় নাই। তিনি তাঁহার বিপদের জন্য দৈবকে দোষ দিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার দোষ দেখাইয়াছিলেন।

৫৮। **'ক্ষত্রিয়দের বলই শ্রেষ্ঠ'।** (পৃঃ ১৫)

প্রত্যেক জাতিরই এক একটা বৈশিষ্ট্য থাকে। এই বৈশিষ্ট্য তাহার প্রকৃতিগত। ব্রাহ্মণ জ্ঞানী, ক্ষত্রিয় বলবান্, বৈশ্য সঞ্চয়শীল, শূদ্র সেবাপরায়ণ। ব্রাহ্মণাদিবর্ণের গুণের বিচারে তাহাদের অন্য বহুবিধ গুণের মধ্যে প্রকৃতিগত গুণকেই প্রাধান্য দিতে হইবে। ব্রাহ্মণের অপর সহস্র গুণ থাকিলেও ব্রাহ্মণ জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ—জ্ঞানদ্বারাই তাহার শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করিতে হইবে, কেননা জ্ঞানই তাহার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ক্ষত্রিয়ের প্রকৃতি বলপ্রধান—অন্য সহস্র গুণের মধ্যে যে ব্যক্তি শৌর্য বীর্যে বড় সেই লোকই ক্ষত্রিয় নামের যোগ্য। ক্ষত্রিয়ের কার্য অত্যাচারিত মানুষকে সর্বপ্রকার হিংসার হাত হইতে রক্ষা করা। অপরকে যদি কেহ রক্ষা করিতে যায় তবে তাহার নিজের শক্তি থাকা দরকার—যে ব্যক্তি নিজে শক্তিহীন সে কখনও অপর কাহারও রক্ষাকার্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারে না। শক্তিহীনের পক্ষে নিজেকেই রক্ষা করা সম্ভবপর নহে অপরকে তাহার পক্ষে সাহায্য করার কোন প্রশ্ন উঠে না। শক্তিহীন ব্যক্তি ক্ষত্রিয় নামের অযোগ্য। ক্ষত্রিয়ের মহত্ত্বের মানদণ্ড বল বা শক্তি। যে ব্যক্তি বলে প্রধান নহে, সে যদি ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও থাকে তবে তাহাকে ক্ষত্রিয় বলা চলে না। পক্ষান্তরে শৌর্যবীর্য দ্বারা যদি কোন ব্যক্তি জগৎসমক্ষে বরণীয় হয় তাহাকে অবশ্যই ক্ষত্রিয়ের সম্মান দিতে হইবে। গুণই পূজা পাইয়া থাকে—জাতি বা বর্ণের জন্য কেহ পূজা পায় না। ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ তাহার শক্তি বা বল—সুতরাং বলে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিই ক্ষত্রিয়ের সম্মান পাইবার যোগ্য।

৫৯। **"অগ্নি প্রচ্ছন্ন থাকিলেও অনায়াসেই পরিজ্ঞাত হয়।"** (পৃঃ ২৬)

যে ব্যক্তি শক্তিমান্ তাহাকে কেহই কোন আবরণ দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে পারে না।

শক্তির লক্ষণই হইতেছে কোন না কোন প্রকারে আত্মপ্রকাশ করা। এই বিশ্বের অণু-পরমাণু প্রচণ্ড শক্তির আধার। শক্তিকে কিছুকালের জন্য হয়তো লুকাইয়া রাখিতে পারা যায় কিন্তু সর্বকালে সর্বাবস্থায় উহা সম্ভবপর নহে। অনুকূল অবস্থায় গূঢ় শক্তি আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে--প্রতিকূল অবস্থায় শক্তি নিষ্ক্রি থাকে। শক্তির নিষ্ক্রিয়তাকে শক্তিহীনতা মনে করিলে ভুল করা হইবে, কারণ যাঁহারা সকল বস্তুর অন্তর বাহির দেখিতে পারেন তাঁহাদের কাছে যে কোন প্রকার শক্তি ধরা পড়ে। কোন বস্তুতে শক্তি থাকিলে তাহাকে উপলব্ধি করিতে বেশি কষ্ট পাইতে হয় না—তাহাকে লোকে অনায়াসেই জানিতে পারে। যেখানে শক্তি নাই--বা শক্তির ক্রিয়া নাই—সেখানে সাধারণ লোকের পক্ষে উহা অজানাই থাকিয়া যায়, পক্ষান্তরে যেখানে প্রকৃত শক্তি রহিয়াছে সেখানে উহা জানিবার জন্য বিশেষ কষ্ট করিতে হয় না।

৬০। 'ক্ষুদ্র মানবীয় সুখদুঃখের উপর কর্তব্যাকর্তব্য নির্ভর করে না।' (পৃঃ ৮৫)

মানুষের সুখদুঃখের গণ্ডী অতি ছোট। সাধারণ মানুষ অল্প সুখের জন্য বেশি কষ্ট করিয়া থাকে এবং সেই সুখ পাইলেই সে অন্য কাহারও দিকে চাহে না। সে অল্পে সন্তুষ্ট, তাই বৃহৎ তাহার কাছে অতি তুচ্ছ। সাধারণ মানুষ তাহার ক্ষুদ্র প্রয়োজন সিদ্ধ না হইলে নিজেকে অত্যন্ত দুঃখী মনে করে। এই অল্প দুঃখ নিবারণের জন্য সে যে কোন হীন উপায় অবলম্বন করে—কেননা বৃহত্তর চিন্তা তাহার মনে স্থান পায় না। যে মনুষ্য সমাজে এই অবস্থা, সেইখানে ক্ষুদ্র স্বার্থ কর্তব্য ও অকর্তব্যকে নির্ধারিত করিতে পারে না। যাহা করা উচিত তাহা কর্তব্য আর যাহা করিলে অন্যায় হয় তাহা অনুচিত বা অকর্তব্য। মানবের ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধিতে তাহার নিজের কিছু সুখসুবিধা হইয়াছে মনে হইতে পারে। আর তাহা হইলেও অল্পকালের জন্য হইতে পারে। নিজের আপাত স্বার্থে যদি সকলেই মগ্ন থাকে তবে জগতের কল্যাণ অসম্ভব। নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধি আর জগতের কল্যাণ—ইহারা পরস্পর বিরোধী। জগতের কল্যাণ করিতে গেলে অনেক সময়ে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দিতে হইবে। এ বিসর্জনে পরিণামে লাভ ছাড়া কাহারও কোন ক্ষতি নাই। সুতরাং ক্ষুদ্র মানবীয় স্বার্থ উচিত অনুচিত নির্ধারণ করিতে পারে না। কর্তব্য কর্মের লক্ষ্য বৃহত্তর কল্যাণ সাধন করা। এরূপ অবস্থায় সংসারের ছোটখাট সুখ লইয়া ব্যাপৃত থাকিলে কর্তব্য আর অকর্তব্যের নির্ধারণ করা যায় না—আর ক্ষুদ্র সুখদুঃখ কর্তব্য বা অকর্তব্যের পথে মানুষকে চালাইতে পারে না।

৬১। "তোমার পক্ষে যখন ধর্ম আছে তখন অবশ্যই তোমার জয় হইবে।" (পৃঃ ৮৭-৮৮)

জয়পরাজয় ধর্মাধর্মের উপর নির্ভর করে। জয় বলিতে কাহারও আপাত জয়কে বুঝায় না—আর পরাজয়ও আপাত পরাজয় নহে। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরা জয়পরাজয় বুঝিতে এইরূপ মনে করিয়া থাকেন। ছলে বলে কৌশলে কোন ব্যক্তি বা জাতির উপর যে লাভ করা যায় উহা পরিণামে স্থায়ী হয় না। জগতের সকল মানুষকে সকল সময়ের জন্য অধর্ম বা অপকৌশলদ্বারা ভুলাইয়া রাখা যায় না। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি বা জাতির সংখ্যা জগতে অল্প হইতে পারে, কিন্ত ইতিহাসের আলোচনায় দেখা যায় এই মুষ্টিমেয় ন্যায়পরায়ণ বা ধার্মিক ব্যক্তিরাই বিশ্বসংসারকে পরিচালিত করেন। তাঁহাদের আদর্শই জগতের উপর প্রভাব বিস্তার করে—মানুষ আপাত সুখের জন্য যে অধর্ম অবলম্বন করে তাহার ফল কোনরূপেই শুভ হইতে পারে না।

ধর্ম বা ন্যায়পরায়ণতা যেখানে প্রবল সেখানে জয় সুনিশ্চিত। ধার্মিক ব্যক্তি বা জাতি যতই বিপর্যয়েব সম্মুখীন হউক না কেন বিপদেব মধ্যেই তাহাব সকল সম্পদ সকল সাফল্য লুক্কায়িত আছে। সততা আব ধৈর্যেব সহিত বিপদেব বিবুদ্ধে ক্রমাগত যুদ্ধে একদিন জয় অবশ্যই উপস্থিত হইবে।

৬২। **"বিপৎকালে সকলেই ধর্মচিন্তা কবিয়া থাকে। সম্পদের সময় পরলোকের দ্বার রুদ্ধ অবলোকন করে।"** (পৃঃ ১৪৭)

সম্পদ আব বিপদ মানুষেব চিবসাথী। লোকেব সম্পদেব পব, বিপদ আসে আব বিপদেব পব আবাব সম্পদ উপস্থিত হয়। জগতে কাহাবও বিপদ বা সম্পদ চিবস্থাযী হয না। লোকে যখন সম্পদ লাভ কবে তখন তাহাব জীবনে পবিবর্তন উপস্থিত হয। সে সম্পদেব বলে সাবা সংসাবকে তুচ্ছ জ্ঞান কবে।—ধনসম্পত্তিদ্বাবা সে অসম্ভবকে সম্ভব কবিবাব চেষ্টা কবে। সম্পদেব বলে তাহাব অভিলষিত বস্তু কোন সমযেই দুষ্প্রাপ্য হয না—সমাজে তাহাব সম্মানপ্রতিপত্তি লাভ হয এবং সকল লোকে তাহারই প্রশংসায পঞ্চমুখ হয। প্রভুত্ব ও সম্মান লাভ কবিযা সম্পৎশালী ব্যক্তি ভাবে ইহলোকেব বাহিবে আব কোন স্থান নাই যেখানে তাহাব পাপপুণ্যেব ফল ভোগ কবিতে হইবে। পাপেব বা পুণ্যেব ফলে পবলোকে সুখ বা দুঃখ ভোগ কবিতে হয ইহাব কোন ধাবণা ধনাঢ্য ব্যক্তিব থাকে না। তাহাব কাছে পাপপুণ্যেব মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু বিপদে পডিলে লোকে ধর্ম চিন্তা কবে। ঘোব বিপদে যখন পূর্বেকাব জাগতিক সাফল্য প্রতিপত্তি শত চেষ্টাযও ব্যর্থ হয তখনই মানুষ ধর্মেব আশ্রয লয। দুঃখেব সময মানুষেব ধর্মবুদ্ধি জাগ্রত হয—তখন সে সৎকার্য কবে, সৎপথে চলে। সুখেব সমযে কোন মানুষেব পবলোকেব চিন্তা কবিবাব দবকাব হয না। লোকে চাহিবামাত্রই সকল সুখেব সামগ্রী তাহাব হাতেব কাছে আসে কিন্তু দুঃখেব সময মানুষ উহাব কাবণ খুঁজিয়া পায না এবং উহাব প্রতিকাব কবিতেও অসমর্থ হয। তখনই তাহাব ধর্মবুদ্ধি জাগ্রত হইযা থাকে। ধর্মকার্যে তখনই প্রবৃত্ত হইবাব জন্য লোকে অত্যন্ত ব্যস্ত হইযা পডে।

৬৩। **"অর্থ ও কামই ধর্মনাশেব কাবণ।"** (পৃঃ ১৫১)

ধর্ম অর্থ কাম আব মুক্তি এই চাবিটি বস্তু লাভ কবা মানব জীবনেব সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। এই চাবিটি বস্তু লাভ কবিতে হইলে ইহাদেব সমতা এবং সামঞ্জস্য বক্ষা কবিতে হইবে। ইহাদেব মধ্যে কোন একটি অতিমাত্রায পডিলে বা কমিলে ইহাদেব সামঞ্জস্য বক্ষা হইবে না ফলে মানবেব পূর্ণ উন্নতি সাধিত হইবে না। মানব-জীবনে অর্থেব প্রযোজন প্রতি পদক্ষেপে লক্ষিত হয। অর্থ সম্পদ ছাডা জীবন ধাবণ কবা হইতে আবম্ভ কবিযা নিজ পবিবাব সমাজ ও দেশেব কোন কাজ কবা সম্ভবপব নহে। কিন্তু কেবল অর্থ উপার্জনেব দিকে অনবরত চেষ্টা কবিতে থাকিলে মানবসমাজেব কলা শিল্পকলা সাহিত্য প্রভৃতি কাম্য বস্তুব ভোগ অগোচরে বাহিবে চলিযা যাইবে। পক্ষান্তবে যদি মানবেব জীবনে শুধু অর্থ আব কাম্যবস্তু লাভেব চেষ্টা অবিবাম চলিতে থাকে তবে ধর্মেব দিক বিলুপ্ত হইবে। যাহাবা কেবল অর্থ ও কামেব সেবা কবে তাহাদেব হিতাহিত জ্ঞান লুপ্ত হয। এই শ্রেণীব লোকেরা অতিমাত্রায স্বার্থপব হইযা থাকে। স্বার্থপব লোকদেব নিকট স্বার্থ পবমার্থ। তাহাবা নিজেব সুখ সমৃদ্ধি লাভেব জন্য অপবকে নানাভাবে পীডন কবিতে কুণ্ঠিত হয না। পবপীডন অধর্ম—এ বিষযে কোন সন্দেহ নাই। সুতবাং অর্থ ও কাম্য বস্তু লাভেব অতিবিক্ত প্রচেষ্টায লোকেব ধর্ম নাশ হয।

৬৪। "যদি নিজের অধর্মবুদ্ধিকেই না জয় করিতে পারিলে তবে রাজ্য জয় বা রাজ্য রক্ষা করিবার আশা কিরূপে করিতেছ।" (পৃঃ ৭৫)

ধর্ম বিশ্বস্থিতির মূল। এই ধর্মের অর্থ অতি ব্যাপক। সত্য, সমতা, সুবুদ্ধি, ধৈর্য, কর্তব্যকার্য সম্পাদন সবই ধর্মের মধ্যে পড়ে। সদ্বুদ্ধি ছাড়া প্রকৃত রাজ্য জয় কর চলে না। দুর্বুদ্ধিদ্বারা রাজ্য জয় করিলে সে রাজ্য কখনই স্থায়ী হয় না। রাজ্য কেবল রাজার একার নহে—উহা দেশের জনসাধারণের উহা কখনই রাজার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে। এরূপ অবস্থায় বিজিত রাজ্যকে রক্ষা করিতে হইলে রাজাকে দেশের জনসাধারণের বিশ্বাস ও আনুগত্য অর্জন করা চাই। রাজা যদি অধর্মবুদ্ধি ছাড়িতে না পারেন—তবে তিনি অন্য রাজ্য প্রকৃতপক্ষে জয় করিতে পারিবেন না। অধার্মিক রাজা অপরের রাজ্য অন্যায়ভাবে জয় করিতে গেলে তিনি সেই দেশের লোকের নিকট হইতে কোন সাহায্য পাইবেন না। ফলে তাঁহার বল প্রয়োগে লব্ধ রাজ্য তাঁহার হাতছাড়া হইবে। নিজকে যিনি জয় করিতে পারেন নাই—অপরকে জয় করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাহার আত্মজয়ের ক্ষমতা লোপ পাইয়াছে অত্যাচার দ্বারা সেই ব্যক্তি অপরকে জয় করে। যে ব্যক্তি নিজেকে জয় করিতে পারে না, তাহার মধ্যে কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি খারাপ প্রবৃত্তিগুলি বাসা বাঁধে। এই খারাপ প্রবৃত্তিদ্বারা চালিত হইয়া লোকে অপরের সর্বস্ব কাড়িয়া লয় কিন্তু পরিণামে সে উহা রক্ষা করিতে পারে না। অত্যাচারিত জনগণ অত্যাচারীর অন্যায়কে সংঘবদ্ধ হইয়া একদিন না একদিন প্রতিরোধ করে এবং তাহাকে সমূলে ধ্বংস করিয়া নিরস্ত হয়। সুতরাং অপরের রাজ্য জয় করিবার পূর্বে রাজার নিজের অধর্মবুদ্ধিকে জয় করা উচিত।

৬৫। "হে ক্ষত্রিয়গণ ব্যাধিদ্বারা গৃহে প্রাণ ত্যাগ করা অপেক্ষা যুদ্ধক্ষেত্রে শস্ত্রদ্বারা মৃত্যুই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয়। সংগ্রামেই স্বর্গগমনের অনাবৃত দ্বার; অতএব এক্ষণে সেই দ্বার অবলম্বনপূর্বক অভিলষিত লোক সকল লাভের নিমিত্ত প্রস্তুত হও।" (পৃঃ ৮২)

জন্মিলে মানুষের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মৃত্যু হইলে আবার তাহার জন্ম হয়। সুতরাং জন্ম-মৃত্যুর হাত হইতে কাহারও নিস্তার নাই। মানুষ নানাভাবে মরিতে পারে। জল, অগ্নি, বিষ, ক্ষুধা, ব্যাধি লোকের মৃত্যুর কারণ হয়। সংসারে বেশির ভাগ লোক মরে নানা রোগের জ্বালায়। এই জগতে লোক সুখের আশা করিয়া থাকে। জীবনের সুখ বা দুঃখকে মানুষ প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়া থাকে। সকলেই বাঁচিয়া থাকিতে চাহে। কেহ মরিতে চাহে না। আর দুঃখ মরিবার কথা কেহই ভাবে না। রোগে ভুগিয়া নানা কষ্ট পাইয়া লোকে যখন মরিতে বসে তখন সেই কষ্ট যাহাতে লাঘব হয় তাহার নানা চেষ্টা করে। কিন্তু সকলের কষ্টও দূর হয় না। সংসারে কষ্ট পাইতে হইবে এবং একদিন না একদিন সকলকেই মরিতে হইবে ইহাই চরম সত্য। এরূপ অবস্থায় মৃত্যুতে সুখ আছে কিনা ইহা বিচারের বিষয়। অবস্থাভেদে সুখ দুঃখে পরিণত হয়, আর দুঃখও সুখের কারণ হইয়া থাকে। জল, ব্যাধি বিষ দ্বারা দুর্ঘটনায় যে মৃত্যু সে মৃত্যু সাধারণ লোকের মৃত্যু। এ মৃত্যুতে সুখ নাই। কিন্তু দেশের জন্য, জাতির জন্য, অন্যায়ের হাত হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করিবার জন্য যে মৃত্যু তাহা বীরের মৃত্যু। রণক্ষেত্রে, বীর সত্যের জন্য ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষার জন্য যে মৃত্যু বরণ করে সে মৃত্যু স্বর্গলাভের কারণ। স্বর্গ পরম সুখকর স্থান। স্বর্গ লাভ করিতে লোককে ত্যাগ-তপস্যার আশ্রয় লইতে

হয়। ত্যাগ ছাড়া কোন মহৎ বস্তু লাভ হইতে পারে না। মানুষের কাছে জীবন অপেক্ষা আর প্রিয় কিছু নাই। সুতরাং এই প্রিয় জীবনকে ধর্মযুদ্ধে উৎসর্গ করিবার মতো কঠোর সাধনা আর নাই। নিজের সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু যে দান করিতে পারে তাহার মৃত্যুর পর সর্বাপেক্ষা সুখকর স্থান লাভ হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

৬৬। **"ফলাফল ও স্বীয় সুখ-দুঃখ নগণ্য করিয়া স্বশ্রেণীর নির্দিষ্ট ধর্মানুসারে কর্তব্য পালন করিতে হয়।"** (কুরুপাণ্ডব, পৃঃ ৮৫)

কেহ কোন কর্তব্য পালন করিতে গেলে ইহাদ্বারা অপরের কি ক্ষতি হইবে, নিজেরই বা বিশেষ কোন লাভ হইবে কিনা সে তাহা প্রথমে বিচার করে। এ বিচারে সংসারের ক্ষুদ্র লাভ ক্ষতির হিসাব পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র লাভ ক্ষতির বিচার বিবেচনা করিতে গেলে বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধন করা যায় না। বৃহত্তর কার্যে অনেক সময়ে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দিতে হয়, অথবা নিজেরও হযতো আপাততঃ কোন ক্ষতি দেখা যাইতে পারে। কিন্তু এ সকল বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করিতে হইবে। স্বশ্রেণীর ধর্মানুসারে কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ করিতে হইবে--এই ধর্ম হইতেছে, স্বভাবানুসারে কার্যে প্রবৃত্তি। লাভালাভ, জয়াজয়ের চিন্তা এখানে ত্যাগ করিতে হইবে। এইরূপ করিলে হৃদয়ের দুর্বলতা সহজেই দূর হইবে। তখন ক্ষুদ্র লাভালাভের চিন্তাও সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যাইবে, শুধু কর্তব্যকার্যই লোকের কাছে বড় হইবে। ব্রাহ্মণের প্রকৃতি বুদ্ধি প্রধান, ক্ষত্রিয়ের বল প্রধান, বৈশ্যের সৃষ্টি প্রধান, শূদ্রের প্রকৃতি সেবাপ্রধান। প্রকৃতি প্রাধান্য অনুসারেই ইহাদের কর্তব্য নির্দিষ্ট আছে। এই নির্দেশ অনুসারে মানুষকে চলিতে হইবে। এই কর্তব্যে বাধা সৃষ্টিকারী ব্যক্তি প্রিয়ই হউক আর অপ্রিয়ই হউক তাহাকে উপেক্ষা করিতে হইবে। কর্তব্যের কাছে ভাই বন্ধু কেহই নাই।

৬৭। **"প্রত্যেক ক্ষেত্রে সামান্য মনুষ্যবুদ্ধি অনুসারে ফলাফল বিচার করিতে গেলে সংশয়শূন্য ও স্থির-সংকল্প হইয়া কোনো কার্য করা চলে না।"** (কুরুপাণ্ডব, পৃঃ ৮৫)

কোন্ কার্য কোথায় মানুষকে লইয়া যাইবে, পূর্ব হইতে উহা স্থির করা অত্যন্ত কঠিন। মানুষ বেশি দূর পর্যন্ত দেখিতে পায় না, তাই সামান্য ক্ষয়ক্ষতি দেখিয়া সে সর্বদাই বিপদের আশঙ্কা করে। কিন্তু এই আশঙ্কা অনেক সময়েই অমূলক হয়। এই কারণে মানুষ তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অন্ধ। সেখানে ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত সেখানে যুক্তির মধ্যে সংশয় থাকিয়া যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত সংশয়শূন্য সে না হয় ততক্ষণ কার্য করিবার সংকল্পও গ্রহণ সে করিতে পারে না। যেখানে স্থির সংকল্প নাই সেখানে কোন কার্য হইবার সম্ভাবনাও নাই।

তাই সামান্য মনুষ্য বুদ্ধি দিয়া কোন কার্যের সুদূর প্রসারী ফল কল্পনা করা যায় না। এরূপ অবস্থায় যাহার যাহা কর্তব্যকর্ম তাহাই স্থির সংকল্প লইয়া সম্পাদন করিয়া যাওয়া উচিত।

৬৮। **"এক ব্যক্তির সহিত অনেকের যুদ্ধ কোনক্রমেই ধর্মসংগত হয় না।"** (কুরুপাণ্ডব, পৃঃ ১৪৬)

যুদ্ধ সমানে সমানে হওয়া উচিত। ইহাই ছিল প্রাচীন যুগের যুদ্ধ নীতি।

সমানে সমানে যুদ্ধ হইলে, কোন অন্যায় হয় না। বলপরীক্ষায় যে জয়ী হইবে তাহারই বিজয় হইবে ধর্মবিজয়। পক্ষান্তরে এক বীরের বিরুদ্ধে বহুশক্তিশালী

বীরের যুদ্ধ করা উচিত নহে। ইহা ক্ষাত্রধর্মের বিরোধী—ইহা হইল অন্যায় রণ। ইহাকে বীরত্ব না বলিয়া কাপুরুষতা বলাই সমীচীন। একক বীরকে একাধিক বীর অনায়াসে, জয় করিতে পারে। কেননা একা লোক কখনও প্রতিপক্ষীয় কাহাকে জয় করা দূরে থাকুক (সে) নিজে আত্মরক্ষা করিতেও অসমর্থ হয়। এইরূপ অন্যায় যুদ্ধ ভারতবর্ষ কখনও সমর্থন করে নাই।

অন্যায় চিরকালই অন্যায়। কথা হইতে পারে, যে শত্রু তাহাকে যে কোন অবস্থায় আঘাত করা যাইতে পারে—সে এককই হউক আর বহুলোক তাহার সঙ্গী হউক। শত্রুকে শেষ করিতে না পারিলে, পরে তাহার সুযোগের সময়ে সেই বেশি ক্ষতি করিবে। ইহার উত্তরে বলা যায়, যোদ্ধাকে যুদ্ধের শাস্ত্রসম্মত রীতি মানিতে হইবে। এই রীতির বিপরীত কাজ যে করিবে, সে হইবে অধার্মিক। তাহার ক্ষত্রিয় সমাজে স্থান হইবে না।

রামায়ণী-কথা

৬৯। **"রামায়ণ মহাভারতকে মনে হয় যেন জাহ্নবী ও হিমাচলের ন্যায় তাহারা ভারতেরই, ব্যাস বাল্মীকি উপলক্ষ মাত্র।"** (রামায়ণী কথা, ভূমিকা, পৃঃ ।\/)

কোন দুই জন লোক যেমন এক হয় না, তেমনি কোন দুইটি দেশও একরূপে হইতে পারে না। সকল দেশেরই কতকগুলি বৈশিষ্ট্য তাহাদিগকে অপর দেশ হইতে পৃথক করিয়া রাখে। এ সকল বৈশিষ্ট্য শুধু দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের উপর নির্ভর করে না—তাহার অন্তপ্রকৃতিও ইহাদের মধ্যে কাজ করিয়া থাকে। অন্তর ও বাহিরের সম্পদ লইয়া ভারতবর্ষ নানাভাবে জগতে অদ্বিতীয়। তাই ভারতবর্ষ চিরকাল ভারতবর্ষই রহিয়াছে। হিমালয় ও গঙ্গার কথা চিন্তা করিলে ভারতের এই অনন্যসাধারণতা সহজে ধরা পড়ে। ভারতের উত্তরে হিমালয়ের শান্ত সমাধিমগ্ন মূর্তি এখানকার আধ্যাত্মিক সম্পদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অন্য কোন দেশে হিমালয়কে কল্পনা করা যায় না ইহা ভারতের অনাদিকালের তপস্যার মূর্তি। এই হিমালয় হইতেই উদ্ভূত হইয়া গঙ্গা সমগ্র উত্তর ভারতকে সরস করিয়া শস্য সম্পদে সমৃদ্ধ করিয়া সাগরের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। গঙ্গা যেন এই তপোমূর্তি হিমালয়ের করুণার প্রবাহ। তপস্যা এবং কল্যাণরূপে জগতে উহার পরিব্যাপ্তি ভারতেরই বৈশিষ্ট্য। ভারতের দুই বিরাট কাব্য রামায়ণ ও মহাভারত বিরাট হিমালয় ও গঙ্গার মতোই একান্তভাবে ভারতবর্ষেরই। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এইরূপ কাব্য রচিত হয় নাই বা হইতে পারে না। অন্য কোন দেশ ভারতবর্ষ হইলে সেখানে রামায়ণ ও মহাভারতের উদ্ভব সম্ভবপর হইত। ভারতের যুগ-যুগের অনন্ত সাধনার বাণী এই দুই কাব্যে সঞ্চিত হইয়া আছে। এই দুই কাব্য কোন ব্যক্তি বিশেষ বা গণ বিশেষের কাহিনী বলে না। ইহারা সমগ্র ভারতের কথাই বলে। অন্য কাব্যে কবি কাব্য হইতে দূরে থাকেন না—কাব্যের ভাবধারার মধ্যেই তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করা যায়; কিন্তু রামায়ণ মহাভারতের সহিত উহাদের রচয়িতা কবির সম্বন্ধে শ্রোতা বা পাঠকের কোন কৌতূহল জাগে না। রামায়ণ মহাভারত কোন কবির ব্যক্তিগত কথা নহে বা সমাজ বা প্রদেশ বিশেষের কথাও নহে—উহারা সমগ্র দেশ বা সমগ্র জাতির প্রতিনিধি। রামায়ণ-মহাভারতের সহিত কবির নাম সংযুক্ত না থাকিলেও কোন ক্ষতি ছিল না বা নাই। রামায়ণ-মহাভারত বহু যুগসঞ্চিত ভারতের চিন্তাধারার বাহন। এইরূপ চিন্তার ধারা ভারত ছাড়া অন্য দেশে প্রবাহিত থাকিতে পারে না।

৭০। **বাহুবল নহে, জিগীষা নহে, রাষ্ট্রগৌরব নহে, শান্তরসাস্পদ গৃহধর্মকেই রামায়ণ করুণার অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে সুমহৎ বীর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।** (ভূমিকা, রামায়ণী কথা)

সমগ্র রামায়ণে বালকাণ্ড হইতে উত্তরকাণ্ড পর্যন্ত আলোচনা করিলে দেখা যায় বাহুল্যের পরিচয় এখানে নিতান্ত কম নহে। আর সবত্র রঘুবংশীয় রাজাদিগের রাজপুত্রগণের দেশ-জয়ের কীর্তিগাথায় রামায়ণ কাব্য মুখরিত। রাষ্ট্রশাসন ও তাহার সংরক্ষণ দৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত—রাজনীতি বিচারও রামায়ণে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

উক্ত কাব্যে বাহুবল, জিগীষা, রাষ্ট্রগৌরব যাহাই কেন আমাদের সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া উপস্থিত হউক না কেন, রামায়ণ প্রকৃতপক্ষে গৃহস্থাশ্রমের কাব্য। এইখানে গৃহধর্মকে কবি নিজ কাব্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই গৃহধর্ম ভোগ ও লালসায় পরিপূর্ণ নহে। ইহা ত্যাগ ও করুণাকে ভিত্তি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই ত্যাগে এবং করুণায় কোন দুর্বলতাকে স্থান দেওয়া হয় নাই—ইহার মূলে রহিয়াছে সুমহৎ বীর্য। আর এই গৃহধর্মে আছে শান্তরস—যে শান্তরস ঐশ্বর্যের মধ্যে বৈরাগ্য আনিয়া মানুষকে আনন্দের অধিকারী করে।

রামায়ণের গৃহ স্নেহবান্ পিতা, পুত্রবৎসলা মাতা, অনুগত ভ্রাতা—ষড়যন্ত্র-কারিণী বিমাতা—এই সকল উপাদানে গঠিত। স্নেহবান পিতা এখানে কর্তব্যে কঠোর, পুত্রবৎসলা জননী পুত্র-বিচ্ছেদের দারুণ দুঃখকে হৃদয়ে চাপিয়া পুত্রের কর্তব্য পালন ও প্রথমে সদ্ভাবে জীবন যাপনে অধিকতর আগ্রহশীলা, পিতৃসত্য-রক্ষার্থ পুত্রের আত্মত্যাগ, অনুগত ভ্রাতা জ্যেষ্ঠের জন্য সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ সাধন করিয়া তাহারই অনুগামী, বিমাতৃপুত্র মাতার অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করিতে গিয়া চতুর্দশবর্ষ রাজা হইয়াও এই সংসারাশ্রমেই মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। এখানে নানা ষড়যন্ত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠা সপত্নীর সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। পতিপ্রাণা রাজবধূ গভীর অরণ্যে স্বামীর সহচারিণী হইয়াছেন। ইঁহাদের কেহই দুর্বল বা হীনবীর্য নহেন। সবলের করুণায়, সবলের ত্যাগে কোন গ্লানি নাই —কিন্তু দুর্বলের পক্ষে ত্যাগ হয় কাপুরুষতার নামান্তর, কারুণ্য হয় অসহায়ের কাতর ক্রন্দন। ভোগের মধ্যে ভোগবিরতি, শক্তি থাকিতে কারুণ্য, কর্তব্যের জন্য ত্যাগ, সমবেদনার অশ্রু, প্রেমের আনন্দ, বিরহের দুঃখ—এইসকল গুণে রামায়ণের গৃহস্থাশ্রম মহনীয় হইয়াছে। চতুর্থ আশ্রম হয় শান্তরসের আকর—রামায়ণের দ্বিতীয় আশ্রমই সেই স্থান অধিকার করিয়াছে। চতুর্থাশ্রমে যদি পরম কল্যাণ উপস্থিত হয় —তবে দ্বিতীয় আশ্রমে আদর্শ গৃহী হইলে তাহা না হইবার হেতু নাই—কারণ গৃহস্থাশ্রমও আশ্রমচতুষ্টয়ের অন্যতম।

৭১। **রামায়ণে দেবতা নিজেকে খর্ব করিয়া মানুষ করেন নাই, মানুষই নিজ গুণে দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন।** (ভূমিকা)

দেবগণ আত্মজ্ঞানী—তাঁহারা অমৃতত্বের অধিকারী। তাঁহাদের কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্যের অধিকারী মানুষের পরিণত হইয়া নিজেকে ছোট করিবার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আদিকবি বাল্মীকি মুনি যে রামায়ণ কাব্য রচনা করিয়াছেন তাহা কখনও দেবলীলা হইতে পারে না—তাহা হইতেছে আদর্শ মানুষের চরিতকাহিনী। মানুষ তাঁহার অনন্যসাধারণ গুণে দেবতার পদ লাভ করিয়াছেন। রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্র সর্বগুণাধার। তিনি সর্বক্ষেত্রেই তাঁহার গুণের জন্য পূজা

পাইয়াছেন। কর্তব্যপরায়ণ পুত্র, স্নেহবান্ ভ্রাতা, একপত্নীনিষ্ঠ স্বামী, আদর্শ বন্ধু, আদর্শ রাজা, শক্তিমান্ যোদ্ধা, দুষ্টের শাসক, সজ্জনপালক রামচন্দ্র নিজগুণে দেবতা-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি গৃহের অস্থিরতার মধ্যে একাকী শান্ত সমাহিত—বাহিরের গোলযোগ তাঁহার শান্তি ভঙ্গ করিতে পারে নাই। পিতৃসত্য পালনের জন্য রাজ্যকে তিনি ধূলিমুষ্টির মতো নিক্ষেপ করিয়াছেন—যৌবনেই বনবাসী হইয়া মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি গৃহস্থাশ্রমকে ত্যাগের ক্ষেত্র করিয়া উহাকে শান্তরসাস্পদ করেন। রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য তিনি আপন প্রিয়তমা পত্নীকে নির্বাসিত করেন। কিন্তু তাহাকে নিজের মন হইতে কখনও নির্বাসিত করেন নাই। রামচন্দ্রের নিকট উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ছিল না—নিষাদপতি তাহার বন্ধু, সখা, সুহৃৎ, বানর তাঁহার আজ্ঞাকারী সহায়, সুহৃৎ। অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ আর জনমানবশূন্য দুর্গম বন তাঁহার নিকট তুল্য ছিল।—এইরূপ ব্যক্তিই নিজগুণে মানুষ হইয়া দেবত্ব লাভ করিয়াছেন।

৭২। "জরা, মৃত্যু ও বিধাতার ক্রোধ অনিবার্য।" (রামচন্দ্র, পৃঃ ৩৮)

প্রকৃতি মানুষকে তাহার মুঠোর ভিতরে রাখিয়াছে তাহাই প্রভুত্ব সর্বত্র বিরাজিত। মানুষ তাহার বুদ্ধিবলে নব নব আবিষ্কার দ্বারা, বা কলাকৌশলের প্রয়োগ দ্বারা, নানাভাবে প্রকৃতিকে জয় করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতি জয় মানুষের পূর্ণ জয় নহে। প্রকৃতির খুব অল্প অংশই সে জয় করিতে পারিয়াছে। প্রকৃতির সমস্ত শক্তিকে জয় করা মানুষের পক্ষে হয়তো কোনদিন সম্ভবপর হইবে না। মানুষ যতই বুদ্ধিমান্ হউক না কেন, জরা, মৃত্যু আর বিধাতার ক্রোধ তাহার পক্ষে জয় করা অসাধ্য। প্রকৃতির নিয়মে মানুষের জন্ম, শৈশব, যৌবন অতিক্রান্ত হইলে আপনা-আপনিই বার্ধক্য আসিয়া পড়ে। এমন কোন প্রক্রিয়া মানুষ আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করিতে পারে নাই যাহা দ্বারা সে কৈশোর বা যৌবনকে অম্লান করিয়া রাখিতে পারে বা বার্ধক্যকে রোধ করিতে পারে। জন্মের সহিত বার্ধক্যের নিবিড় যোগ রহিয়াছে। বাঁচিয়া থাকিলে বাল্য-কৈশোর-যৌবনের পর মানুষের অলক্ষিতে বার্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহার কারণ জীবের উপর প্রকৃতির প্রভুত্ব। আর মৃত্যু—সে তো জীবনের অচ্ছেদ্য অঙ্গ। কাহারও জন্ম হইলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মানুষ নানা প্রক্রিয়ার আশ্রয় লইয়া মৃত্যুকে স্বল্পকালের জন্য নিরোধ করিয়াছে—কিন্তু পরিণামে মানুষকে অমর করিতে পারে নাই। মৃত্যুর মতো চিরসত্য আর কিছুই নাই। এই মৃত্যুকে জয় করা চলে না। জগতের বড় বড় মহাপুরুষ যাঁহারা জগতে শান্তির বাণী এবং পরম ও চরম কল্যাণ-বাণী প্রচার করিয়াছেন তাঁহাদিগকে অন্য মানুষের মতোই মৃত্যুকে বরণ করিতে হইয়াছে। তারপর বিধাতার ক্রোধ। ইহার হাত হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই। বিধাতা এই জগতের সৃষ্টিকর্তা। তাঁহার উপর আর কেহ নাই। তিনি যে ব্যবস্থা যাহার জন্য করিয়াছেন তাহাকে অবনতমস্তকে সেই ব্যবস্থাকে গ্রহণ করিতে হইবে। মানুষের ক্রোধ মানুষ নানা চেষ্টায় শান্ত করিতে পারে। কিন্তু বিধাতাপুরুষ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভু। তাঁহার উপর আর কেহ নাই। তাঁহার ব্যবস্থার উপর কেহ হাত দিতে পারে না। তিনি ক্রুদ্ধ হইলে তাঁহার হাতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই।

৭৩। **"গভীর দুঃখে পড়িয়া লোকে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে, হৃদয়ে অমানিশার তুল্য শোক, নৈরাশ্য বা অনুশোচনার ঘোর অন্ধকার ঘনীভূত না হইলে সেই জ্ঞান আইসে না।"** (পৃঃ ১৩)

কোন্ কাজের কিরূপ ফল হইবে তাহা পূর্বে যাহারা ভাবে না তাহাদের দুঃখ. কেহ নিবারণ করিতে পারে না। নির্বোধ ব্যক্তি সংসারে চলিবার পথে কোন কিছুর ফল না ভাবিয়া কাজ করে আর পদে-পদে তাহার দুঃখ উপস্থিত হয়। এ দুঃখের জন্য সে নিজে দায়ী। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরও এইরূপ ভুল হইয়া থাকে। এই ভুল তাহার সম্পদের সময়েই বেশি হয়। সম্পদের আনন্দে মানুষ হয় আত্মহারা। এইরূপ অবস্থা বিপদ কাটিবার পর তাহাকে অতিমাত্রায় উল্লসিত করে। তখন যে যাহা তাহাকে করিতে বলে, যে যাহা চায় মানুষ নির্বিচারে তাহা করে বা দেয়। কিন্তু এই সকল প্রার্থনা-পূরণের সুদূরপ্রসারী ফলের কথা তখন একবারও তাহার মনে উদিত হয় না। অবিবেচনাপ্রসূত কার্যের জন্য যখন মানুষ গভীর দুঃখে পড়ে তখনই তাহার প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়। যখন চারিদিক হইতে আঘাত আসে আর মানুষ যখন দুঃখে জর্জরিত হয় তখনই সত্যের আলোকে তাহার মন উদ্ভাসিত হয়। সেই সত্যের আলোকে সে তখন সকল বস্তু বা কার্যের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারে।

৭৪। **"তোমার ন্যায় এ জগতে আর কোন্ ব্যক্তি আছেন. সুখে তোমার হর্ষ নাই, দুঃখে তুমি ব্যথিত হও না।"**—(রামচন্দ্র, পৃঃ ৩১)

সাধারণ লোক সকলেই সুখ-দুঃখের অধীন। সুখে তাহাদের আনন্দ হয়। দুঃখে তাহাদের অবসাদ আসে। সুখ স্থায়ী হউক আর অস্থায়ীই হউক, সুখ সকলের কাম্য—দুঃখকে কেহই বরণ করিতে চাহে না। সকলের চেষ্টা হইতেছে কি করিয়া সুখ লাভ করা যায়। কিন্তু দুঃখ যত শীঘ্র এবং অনায়াসে আসে সুখ তত শীঘ্র বা অনায়াসে উপস্থিত হয় না। লোকে সুখের আশা করিয়া দুঃখ পায়। তাই ইহা মানুষের কাছে এত ভয়ঙ্কর। দুঃখ জগতের কোথায় নাই! গৃহে, সমাজে, সংসারে, সর্বত্র মানুষের অভাব আছে। এই অভাববোধ যতদিন পর্যন্ত মানুষের থাকিবে ততদিন পর্যন্ত দুঃখ দূর হইবে না। এরূপ অবস্থায় যাঁহারা সুখ-দুঃখের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারেন তাহারা নিশ্চয়ই লোকোত্তর পুরুষ বা অনন্যসাধারণ পুরুষ। সুখদুঃখের অধীন ইঁহারা নহেন। মহাপুরুষেরা বিবেকবুদ্ধির বলে সুখ-দুঃখকে বিচার করিয়া ইহাদের প্রভাব হইতে মুক্ত হ'ন। সুখ-দুঃখ মানুষের মনের উপর প্রতিক্রিয়া করিয়া থাকে। কিন্তু এইসকল মহাপুরুষের অসাধারণ মনঃসংযমের ফলে সুখ-দুঃখের কোন প্রতিক্রিয়া ইঁহাদের হৃদয়ে উপস্থিত হয় না। তাই সুখকর কিছু ইঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে কোন হর্ষ ইঁহাদের মনে স্থান পায় না কারণ ইঁহারা জানেন পার্থিব সুখ ক্ষণস্থায়ী—ইহার পর দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। সুখ-দুঃখ যখন চক্রের মতো অনবরত পরিবর্তিত হইতেছে তখন অল্প সময়ের জন্য হর্ষ বা বিষাদের উপর ইঁহারা আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না। তাই মহাপুরুষেরা অনন্য-সাধারণ পুরুষ। তাঁহাদের তুলনা তাঁহারা নিজেরাই।

৭৫। **"যে প্রমোদরজনী অতীত হইয়াছে তাহা আর ফিরিয়া আইসে না, যমুনার যে প্রবাহ সাগরে সম্মিলিত হইয়াছে তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না, সেইরূপ আয়ুর যে অংশ ব্যয়িত হইয়াছে তাহা আর প্রত্যাবর্তিত হইবে না।"** (রামচন্দ্র, পৃঃ ৩১)

মনুষ্য জীবন ক্ষণস্থায়ী। অনন্তকালের তুলনায় মানুষের শতবর্ষের পরমায়ুও এক মুহূর্ত বলিয়া মনে হয়। মানুষের আয়ু দিন দিন ক্ষয় হইতেছে আয়ু দিন দিন বাড়িতেছে একথা বলা চলে না কেননা জীবনের পরই মৃত্যু। এ মৃত্যু কখন আসিয়া উপস্থিত হইবে কেহই তাহা বলিতে পারে না। কালের বশে পার্থিব সকল

বস্তুর ধ্বংস অনিবার্য। মানুষ এই ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে না। জগতে জীবন ছাড়া অন্য বস্তু ধ্বংস হইলেও পরে রূপান্তরিত হইয়া প্রকাশিত হইতে পারে। কিন্তু একমাত্র বস্তু হইতেছে কাল যাহা অনাদি অনন্ত হইয়া নিজের মধ্যে মানুষের আয়ুকে টানিয়া লয়। এই মহাকাল একবার যাহা গ্রহণ করে তাহাকে আর কখনও কোন অবস্থায় ফেরৎ দেয় না। কালবশে যাহা যায় তাহা চিরকালের জন্য চলিয়া যায়। যে আয়ু মহাকালের সঙ্গে মিশিয়া যায় তাহাকে পৃথক করিবার কোন উপায় নাই আর মহাকালের উপরে এমন কেহ নাই যিনি মানুষের আয়ু ফেরৎ দিতে পারেন। সুতরাং বিগত আয়ুর প্রত্যাবর্তন অসম্ভব।

৭৬ **"ভারতবর্ষের পল্লীতে পল্লীতে রাম-বনবাসের করুণ কথা হৃদয়ের রক্তে লিখিত রহিয়াছে। এ দেশের রাজভক্তি, পুত্রস্নেহ, জননীর আদর, স্ত্রীর প্রেম সকলই সেই অযোধ্যাকাণ্ডের চিরকরুণ স্মৃতির সঙ্গে জড়িত।"** (রামচন্দ্র, পৃঃ ২৭)

রামায়ণের কাহিনী বহু যুগের পরও একইভাবে ভারতের পল্লীর প্রাণের সহিত তাহার আদর্শের সহিত নিবিড়ভাবে জড়িত। এই মহাকাব্যের অন্য অংশ ছাড়িয়া দিয়াও কেবল অযোধ্যাকাণ্ডের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে ভারতের পল্লী-জীবনের স্নেহ-মমতা-প্রীতি ও ভক্তিতে যেন মহাগ্রন্থের সেই অংশের স্মৃতি ভাসিয়া উঠিতেছে। ভারতের পল্লীর প্রাণ যেন রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের প্রাণ। রাম বনবাসে চলিয়াছেন—এখানে আদর্শ নৃপতির প্রতি পৌরজনের রাজভক্তি ভারতের চিরন্তন আদর্শকে স্মরণ করাইয়া দেয়। বনবাসের নিদারুণ কষ্ট অবহেলা করিয়া ছায়ার মতো বাল্যবধূ পতির অনুসরণ করিতেছেন। সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, পতিপ্রাণা পত্নী স্বামীর জন্য সকল সুখ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। এই আদর্শকে পল্লী আজও ভুলে নাই। রামের বনবাসে কৌশল্যার মাতৃস্নেহ পল্লীমায়ের সন্তানস্নেহের সহিত যুগে যুগে সংযোগ স্থাপন করিয়া রহিয়াছে। পুত্রশোকাতুর দশরথের স্নেহের সহিত পল্লীর বৃদ্ধ পিতার পুত্রের বিচ্ছেদবেদনা আজও জীবন্ত। পল্লীর প্রাণে স্নেহমমতা প্রেম-ভক্তি যাহা আছে তাহা অতি প্রাচীন রামায়ণের যুগের প্রাণের সহিত সম্পর্ক রক্ষা করিয়া আজও বাঁচিয়া আছে। বস্তুতঃপক্ষে বর্তমান পল্লীর মানুষের প্রাণ আর রামায়ণের যুগের লোকের প্রাণ কালের পরিবর্তনেও একই অবস্থায় আছে।

৭৭। **"রামচরিত্র বিশাল বনস্পতির ন্যায়; উহা কীচিৎ নমিত হইয়া ভূস্পর্শ করিলেও সেই অবনয়ন তাঁহার নভঃস্পর্শী গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করে না—পার্থিব জ্ঞাতিত্বের পরিচয় দিয়া আমাদিগকে আশ্বস্ত করে মাত্র।"** (রামচন্দ্র, পৃঃ ৬১)

রামচন্দ্রের চরিত্র এমনই গম্ভীর বিরাট এবং উন্নত যে ইহাকে বনস্পতির সহিত তুলনা করা চলে। বিশাল বৃক্ষ তৃণগুল্মের রাজ্যে মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়ায় এবং সে অনন্ত আকাশে যখন মাথা তোলে তখন চারিদিকের সব কিছু হইতে তাহাকে অত্যন্ত বড় দেখায়। মনে হয়, তাহার সমান আর কোন বস্তু নাই- সে যেন অপর সকলের সহিত একক বিরাট অনন্যসাধারণ কিছু। কিন্তু এই বনস্পতিও নিম্নের মাটির পৃথিবীর দিকে সময় সময় আপনার শাখা-প্রশাখা অবনমিত করে। ইহাতে মনে হয় যে, মাটির পৃথিবীতে তাহার যে মূল রহিয়াছে তাহা যে তাহার নিজের ইহা বোধ করিতে কাহারও কষ্ট হয় না। ইহাতে বিশাল বৃক্ষ অপরের কাছে ছোট হয় না—ইহা তাহার মাটির সহিত আত্মীয়তা সূচিত করে।

রামচন্দ্রের চরিত্রও বনস্পতির মতো বিরাট বিশাল। স্নেহ, ত্যাগ, ভক্তি প্রভৃতি ব্যাপারে এই চরিত্র এতদূর উন্নত যে ইহার সমকক্ষ অন্য কোন লোকের চরিত্র খুঁজিয়া

পাওয়া যায় না—ইহা একক বা অনন্যসাধারণ কারণ অপর কেহ তাহার মতো ত্যাগ, স্নেহ, ভক্তি দেখাইতে পারেন নাই। রামচন্দ্র মানুষ—তিনি দেবতা হইলেও আত্ম-বিস্মৃত। মাটির মানুষ যতই উন্নত হউক না কেন—তাহার বিশাল বিরাটত্বের মধ্যেও এইখানকার অপর মানুষের মতো মাঝে-মাঝে শোকে, দুঃখে, আনন্দে বিহ্বলতা উপস্থিত হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

এই সকল বিহ্বলতায়ও বিরাট পুরুষ বিরাটই থাকিয়া যান—কেননা মানুষ মানুষই। কোন লোক অত্যুন্নত চরিত্রের অধিকারী হইলেও মনুষ্যোচিত দুর্বলতায় তিনি ছোট হইয়া পড়েন না—তিনি মাটির মানুষদের মধ্যে একজন ইহাই চিন্তাশীল ব্যক্তিরা মনে করিবেন।

রামচন্দ্রের স্নেহ, প্রেম, দয়া, ত্যাগ, ভক্তির মধ্যেও যে সকল দুর্বলতা দেখা যায়, তাহাতে তিনি ছোট তো নহেনই বরং তিনি বিরাট ও বিশাল—ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

৭৮। **"অবস্থার ক্রমাগত উৎপীড়ন সহ্য করিয়া লোকে সাধারণতঃ সাত্ত্বিকগুণ সম্পন্ন হইলেও দুই-এক স্থলে ভাবের ব্যত্যয় ঘটা স্বাভাবিক।"** (রামচন্দ্র, পৃঃ ৬১)

মানুষ অবস্থার দাস। মানব-চরিত্রের উত্থানপতন পারিপার্শ্বিক অবস্থাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যে ব্যক্তি ক্রমাগত নিজের অবস্থার পরিবর্তনের মধ্যে পড়ে সে অনবরত আঘাত সহ্য করিতে করিতে সাত্ত্বিক গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে, কারণ বিপদে না পড়িলে সত্ত্বগুণের প্রকাশ হয় না। এইসকল সত্ত্বগুণসম্পন্ন লোক মানুষ—তাহারা দেবতা নহে। মানুষ অপূর্ণ। সে যতই সত্ত্বগুণসম্পন্ন হউক না কেন পরিপূর্ণ সত্ত্বগুণের কখনই অধিকারী হইতে পারে না। জীবনে এমন সংকটপূর্ণ মুহূর্ত উপস্থিত হয় যখন সত্ত্বগুণসম্পন্ন লোকও বিচলিত হইয়া পড়ে। সব সময়ে মানুষকে মানুষ বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

অধিক সত্ত্বগুণসম্পন্ন মানুষ মাঝে মাঝে যখন সাধারণ মানুষের মত কাজ করে তখন লোকে তাহার বিরূপ সমালোচনা করে। দুই-একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনায় অস্থিরতা প্রকাশ দেখিয়া একজন সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তির সমগ্র চরিত্রের উপর বিচার চলে না কারণ মানুষ মানুষের মতোই চলিবে।

৭৯। **"বাল্মীকি-অঙ্কিত রামচরিত্র অতিমাত্রায় জীবন্ত—এ-চিত্রে সংনিবিষ্ট করিলে তাহা হইতে যেন রক্তবিন্দু ক্ষরিত হয়—এই চরিত্র ছায়া কিম্বা ধর্মবিগ্রহে পরিণত হইয়া পুস্তকান্তর্গত আদর্শ হইয়া পড়ে নাই।"** (রামায়ণী কথা পৃঃ ৬২)

রাম রক্তমাংসের দেহ ধারণ করিয়া মানুষ। কিন্তু তিনি এই মনুষ্য দেহকে আশ্রয় করিয়া দয়া ত্যাগ শৌর্যবীর্য ভক্তি স্নেহ প্রেমের যে আদর্শ দেখাইয়াছেন তাহা জীবন্ত মানুষের পক্ষে করা সম্ভব কি না ইহা বিচারের বিষয়। যদি কোন জীবন্ত মানুষ ইহা করিতে পারে তবে, ইহা বাস্তব—ইহা পুঁথিগত আদর্শ নহে। আর যদি এইরূপ করা জীবন্ত মানুষের পক্ষে সম্ভবপর না হয় তবে ইহা কবির কল্পিত আদর্শবিশেষ। রামায়ণ লিখিয়াছেন মহাকবি বাল্মীকি মুনি। কবির কল্পনাবিলাসী। তাঁহারা ইচ্ছামত যে কোন প্রকার চরিত্র সৃষ্টি করিতে পারেন—বাস্তবজীবনে সেরূপ চরিত্রের মানুষ নাও দেখা যাইতে পারে। কিন্তু যদি বাস্তব জীবনে এইরূপ আদর্শ পালন করিতে অন্ততঃ একজন মানুষকেও দেখা যায় তবে ইহা জীবন্ত। মহর্ষি বাল্মীকির সৃষ্ট রামের চরিত্র নিছক কবিকল্পনা নহে—তবে ইহা অনন্যসাধারণ এবং জীবন্ত। অন্যে এইরূপ স্নেহ, প্রেম ভক্তি ও আত্মত্যাগের আদর্শ রক্ষা নাও করিতে পারে কিন্তু রাম করিয়াছিলেন; তাই রামচন্দ্র এই অমর

রামায়ণ কাব্যের নায়ক। চরিত্রটির প্রতি অংশই জীবন্ত—ইহা মনুষ্যগণের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁহারই চিত্রিত চরিত্র—ইহা ছায়ামূর্তির বা ধর্মবিগ্রহের মধ্যে মুহূর্তেই শূন্যে মিলায় না—ইহা ধরাছোঁয়ার বাহিরে চলিয়া যায় না—ইহা একান্তই বাস্তব।

৮০। "জগতে নিরপরাধীর দণ্ড অনেকবার হইয়াছে, কিন্তু ভরতের মত আদর্শ ধার্মিকের প্রতি এইরূপ দণ্ড বিরল।" (রামায়ণী কথা, পৃঃ ৬৫)

ভরতের জীবন আগাগোড়াই তপস্যার এবং সংযমের জীবন। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভাইদের প্রতি ভক্তি ও স্নেহের বন্ধনে তিনি বদ্ধ--তাঁহার হৃদয়ে কোন প্রকারের কপটতা কোনদিন স্থান পায় নাই। তিনি কৈকেয়ীর পুত্র হইলেও মাতার দুঃস্বভাব তাঁহাকে প্রভাবিত করিতে পারে নাই। রাজ্য লাভ করিয়াও তিনি উহাকে গ্রহণ করা অন্যায় মনে করিয়া রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রিয়জনেরা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অবিচার করিয়াছেন। ইহা তাঁহার প্রতি বিনা অপরাধে গুরুতর দণ্ড বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। অপরাধ করিলে অপরাধীর চরিত্র সংশোধন ও সমাজের শিক্ষার জন্য তাহাকে দণ্ড দান করা হইয়া থাকে। অপরাধ করিলে অপরাধী যদি ধরা পড়ে এবং সাক্ষ্য-প্রমাণে সে যদি দণ্ডের যোগ্য হয় তবে তাহাকে দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে—এ বিষয়ে সকলেই একমত। নিরপরাধ ব্যক্তিকে দণ্ডদান গুরুতর অপরাধ। কিন্তু জগতে ভুল প্রমাণ প্রয়োগের জন্যই অনেকে বিনা দোষে দণ্ড লাভ করিয়াছে। ইহা কোন-রূপেই সমর্থনযোগ্য নহে। ইহার চেয়ে গুরুতর অন্যায় হয় তখনই যখন ধার্মিক ব্যক্তিকে তাহার প্রকৃত স্বভাব জানিয়াও লোকে দণ্ড প্রদান করে। ভরতের মতো এরূপ ধার্মিকের বিনা অপরাধে শাস্তির উদাহরণ জগতে বড় একটা পাওয়া যায় না। দশরথ, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ এই তিনজনই ভরতকে নিষ্পাপ, পিতৃভক্ত, ভ্রাতৃবৎসল, নির্লোভ, সত্যপরায়ণ বলিয়া জানিতেন। কিন্তু এই তিনজনেই ভরতের চরিত্রে অমূলক সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। রামচন্দ্রের মতো লোকও ভরতের বিরুদ্ধে সীতাকে বলিয়াছিলেন তিনি যেন ভরতের সম্মুখে রামের প্রশংসা না করেন; কারণ রাজৈশ্বর্য লাভ করিয়া অহঙ্কারী ভরত রামের প্রশংসা শুনিতে ভালবাসিবেন না। পিতা দশরথ ভরতকে নির্লোভ জানিয়াও তাঁহার মাতুলালয়ে অবস্থানের সময়েই রামের অভিষেক ক্রিয়া সমাপ্ত করিতে চাহিলেন, কারণ ভাল লোকের মনও খারাপ হইতে বেশি সময় লাগে না। অবস্থার চাপে পড়িয়া ভরতও অসাধু হইতে পারেন। যে লক্ষ্মণকে ভরত রামের সেবায় নিযুক্ত দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন সেই লক্ষ্মণও একদিন ভরতকে বধ করিলে কোন দোষ হইবে না বলিয়াছিলেন। কৌশল্যাও ভরতকে কটুবাক্যে জর্জরিত করিয়া তাঁহার প্রতি অবিচার করেন। ঋষি ভরদ্বাজও ভরতের চরিত্রে সন্দেহ প্রকাশ করেন। রামের পরমমিত্র গুহকও ভরতকে শত্রু বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন--অথচ কৈকেয়ীর পাপের জন্য ভরত দায়ী নহেন। এইভাবে কৈকেয়ীর দোষে পরম ধার্মিক ও সংযমী ভরতকে পদে পদে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। এইরূপ একের অপরাধে অপরের প্রতি অবিচারের দৃষ্টান্ত জগতে বিরল।

৮১। "ভরত ছাড়া আমরা রামকে কল্পনা করিতে পারি, এমন কি সীতা ছাড়া রাম-চরিত্র কল্পনা করিবার সুবিধাও কবিগুরু দিয়াছেন, কিন্তু লক্ষ্মণ ছাড়া রাম-চরিত্র একান্ত অসম্পূর্ণ।" (লক্ষ্মণ, পৃঃ ৭৪)

রাম-চরিত্রের সহিত ভরত সীতা এবং লক্ষ্মণ কোন না কোন প্রকারে জড়িত।

ই'হাদের সহিত রামচন্দ্রের সংযোগের তারতম্য বিচারে দেখা যায়—ভরতকে রামের জীবন হইতে একেবারে বাদ দিলে কোন প্রকারে রাম-চরিত্রের অঙ্গহানি হইত না, সীতাকেও কতকস্থলে বাদ দিলেও ক্ষতি ছিল না, কিন্তু লক্ষ্মণ-চরিত্রকে রামের জীবনকাহিনী হইতে মোটেই বাদ দেওয়া চলে না। ইহার কারণ রাম লক্ষ্মণ উভয়ে উভয় চরিত্রের পরিপূরক। লক্ষ্মণ ছাড়া রাম অসম্পূর্ণ আর রাম ছাড়া লক্ষ্মণের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। কৈকেয়ীর অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত ভরত করিয়াছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি প্রবল প্রেমে সিংহাসন ছাড়িয়া দিয়া তাঁহারই প্রতিনিধি-রূপে চতুর্দশ বর্ষ তপস্বীর জীবনযাপন করিয়া রামের জন্য সিংহাসন রক্ষা করিয়াছিলেন। এ অবশ্য অতি উচ্চস্তরের ত্যাগ। কিন্তু ভরত ইহা না করিলেও রামচন্দ্রের কোন ক্ষতি ছিল না। রাজ্য ত্যাগ করিয়া তিনি বনবাস গ্রহণ করিয়াছিলেন—এরূপ অবস্থায় রাজ্যশাসন কিরূপে চলিবে তাহার ব্যবস্থার জন্য রামচন্দ্র দায়ী নহেন। রামচন্দ্রের নিকট পিতৃসত্য রক্ষা করা বড় কর্তব্য, পরিত্যক্ত রাজ্যের শাসনব্যবস্থা তাহার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। ভরত ত্যাগ স্বীকার করিয়া নিজে গৌরবান্বিত হইয়াছেন। তিনি রামকে গৌরবান্বিত করেন নাই। সীতাদেবী রামচন্দ্রের সাধ্বী পত্নী। সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে পতি রামচন্দ্রের অনুগমন তাঁহার পক্ষে সর্বথা কর্তব্য। যেভাবে রামচন্দ্রের চরিত্র রামায়ণে কল্পিত হইয়াছে তাহাতে সীতাদেবী প্রতি পদক্ষেপে রামচন্দ্রের কাজের সহায়তা করেন নাই বরং বনে যাইয়া রাম-লক্ষ্মণ উভয়কে তিনি বিপন্ন করেন। সীতার বুদ্ধির দোষেই এত বড় লঙ্কাকাণ্ড ঘটিয়াছিল। সীতা রামের সহিত বনে গেলেন—বনবাসের বিপদ তাঁহাকে পূর্বেই জানান হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সকলের কথাই উপেক্ষা করিলেন। সীতার মতো নারী ক্ষত্রিয় কন্যা ক্ষত্রবধূ হইলে কি হয়—তিনি ছিলেন আত্মরক্ষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা। এইরূপ পত্নীকে গৃহে রাখিলে ভাল হইত। শশ্রূ কৌশল্যার সেবায় এবং সান্ত্বনায় তিনি প্রবাসী পতির জন্য অযোধ্যায় বিরহব্রত উদ্‌যাপন করিতে পারিতেন। তাহাতে সীতা-চরিত্র ক্ষুণ্ণ হইত না। সীতাকে বনবাস দিয়াও রামচন্দ্র বাঁচিয়া ছিলেন এবং প্রজানুরঞ্জন ব্রত পালন করিয়াছিলেন। কিন্তু লক্ষ্মণ ছাড়া রাম-চরিত্র অসম্পূর্ণ। লক্ষ্মণ সেবকরূপে রামের জন্য তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। রামের প্রতি পদক্ষেপে লক্ষ্মণ—সীতা সেখানে নাই। লক্ষ্মণ ছাড়া রামের চলে না। তাঁহাদের দেহ পৃথক—আত্মা এক। লক্ষ্মণের নিকট রাম ছিলেন বন্ধু, গুরু, সহায় সম্পদ, পিতা সবকিছু—আবার রামের নিকট লক্ষ্মণই সব। তিনি জীবন রাজ্য সবই লক্ষ্মণের প্রীতির জন্য কামনা করিতেন। রামচন্দ্রের প্রতি কেহ অন্যায় করিলে লক্ষ্মণ তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিতেন না—এমনকি পিতা দশরথকেও না। রাম শোকে অধীর হইয়া পড়েন, লক্ষ্মণ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া সুস্থির করেন। সীতা-হরণের পর লক্ষ্মণ কাছে না থাকিলে রামচন্দ্র বাঁচিতেন কি না সন্দেহ। রাম যেখানে অধীর হইয়াছেন সেখানে লক্ষ্মণের দৃঢ় কর্তব্যবুদ্ধি তাঁহাকে বাঁচাইয়াছে। রাম-সীতাকে সুখে রাখিবার জন্য লক্ষ্মণ বনবাসের কষ্টের বেশির ভাগই নিজে ভোগ করিয়াছেন। রামচন্দ্রের যত কঠোর কাজ তাহা তিনি লক্ষ্মণকে দিয়া করাইয়াছেন —লঙ্কায় সীতার অগ্নিপ্রবেশের অগ্নি নিজ হাতে লক্ষ্মণই জ্বালাইয়াছিলেন। সকল দেশে পত্নী মিলে, বন্ধুবান্ধব মিলে কিন্তু লক্ষ্মণের মতো ভাই যেখানে পাওয়া যায় সেরূপ দেশ বিরল। লক্ষ্মণ ছাড়া রামের চরিত্র কল্পনা করা যায় না।

৮২। **"মৃদু ব্যক্তিরাই সর্বদা নির্যাতনপ্রাপ্ত হন।"** (পৃঃ ৮৩)

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। মনুষ্যসমাজে সকল লোকই শান্ত দান্ত নিরীহ হইবে—এরূপ আশা করা যায় না। কতক লোক শান্ত দান্ত নিরীহ ও সৎস্বভাব—বাকি লোক উদ্ধত, স্বার্থপর ও কৌশলী। প্রত্যেক লোকই যার যার উন্নতির চেষ্টায় রত—এই উন্নতির চেষ্টা লোকের বাঁচিয়া থাকিবার চেষ্টা—তাহা অপরকে উৎপীড়ন করিয়াই হউক বা তাহাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়াই হউক—সকলকেই করিতে হয়। সবল ব্যক্তি জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারে—কারণ পরকে পীড়ন করিতে তাহার দ্বিধা হয় না—কিন্তু দুর্বল ব্যক্তির পদে পদে কষ্ট ও উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয়।

জীবন-সংগ্রামে দুর্বল ব্যক্তির কোন স্থান নাই। দুর্বল ব্যক্তি তাহার সরল ও নম্র ব্যবহার দ্বারা সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না—সুতরাং তাহার জীবনযাত্রায় সৎপথে চলিলেও তাহার বিপদের আশংকা আছে। সবল ব্যক্তি মৃদু বা দুর্বল লোককে অনায়াসেই নির্যাতিত করে। সবলকে তাহার অন্যায় কার্যে বাধা না দিলে নরম লোকের জীবন দিন দিন অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। মৃদু ব্যক্তি সংসারে বাস করিবার অযোগ্য কেননা তাহার চারিদিকে দুর্দান্ত লোকের বাস—তাহাদের অত্যাচারের যদি কোন প্রকারে সে বাধা না দেয় তবে তাহার নির্যাতনের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই। তাহার দুর্বলতার সুযোগ লইয়া সকল প্রবল লোকই তাহাকে উৎপীড়ন করিবে।

৮৩। **"আজ আমাদের রাম বনবাসী, লক্ষ্মণ প্রাসাদশীর্ষ হইতে সেই দৃশ্য উপভোগ করেন; আজ লক্ষ্মণের অন্ন জুটিতেছে না, রাম স্বর্ণথালে উপাদেয় আহার করিতেছেন।"** (লক্ষ্মণ, পৃঃ ৮৮)

প্রাচীনকালে যে সৌভ্রাত্র আমাদের সমাজে ছিল, দিন দিন তাহার অবসান ঘটিতেছে। পূর্বে ভাই ভাইয়ের জন্য সর্বপ্রকার স্বার্থত্যাগ করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইত না। সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে ভাইয়ের পিছনে ভাই দাঁড়াইত। তাহারা জীবনের সুখদুঃখ পরস্পরের মধ্যে ভাগ করিয়া লইত। এক ভাই অপর ভাই ছাড়া নিজের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করিত না। এই অবস্থা একান্তই স্বাভাবিক ছিল। পারিবারিক ব্যবস্থা এমনিভাবে নিয়ন্ত্রিত ছিল যে ভাইয়েব সহিত ভাইয়ের সম্পর্কের জন্য অভিভাবকের কোন প্রকার অনুশাসন বাক্য প্রয়োগের প্রয়োজন হইত না। যাহা স্বাভাবিক তাহার জন্য অনুশাসন বাক্য প্রয়োগ নিরর্থক। কিন্তু কালক্রমে সেই অবস্থা বিপরীত রূপ ধারণ করিয়াছে। এখন ভাইয়ের জন্য ভাইয়ের সেই প্রেম বা সমবেদনা নাই। এখন এক ভাই অপর ভাইয়ের জন্য একটুকুও ভাবে না—উভয়ের মধ্যে যে কোন সম্পর্ক আছে তাহাও তাহাদেব আচারব্যবহারে প্রকাশ পায় না। ভাইয়ের সহিত এখন ভাইয়ের শত্রুর মতো ব্যবহার চলিয়াছে। এক ভাই অপদস্থ হইলে অপর ভাইয়ের উহাতে আনন্দ হয়, এক ভাই দুর্দশার চরম সীমায় উপস্থিত হইলে অপর ভাই সেই দৃশ্য উপভোগ করে—এক ভাই অনাহারে ম্রিয়মাণ অপর ভাই তাহার দিকে না চাহিয়া ঐশ্বর্যের উপভোগে মত্ত।

৮৪। **"কৌশল্যাচরিত্র হিন্দুস্থানের আদর্শ জননীর চিত্র—আদর্শ স্ত্রীচরিত্র। প্রতি পল্লীগৃহের হিন্দুবালক এখনও এই স্নেহ ও আত্মত্যাগ উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইতেছে।"** (রামায়ণী কথা, পৃঃ ১০০)

কৌশল্যার চরিত্র আত্মত্যাগে স্নেহে নারীজাতির উচ্চ আদর্শরক্ষায় এখনও পল্লীনারীর প্রাণে জাগ্রত রহিয়াছে—হিন্দু বালক এখান হইতেই ভারতের মাতার চিরকালের স্নেহ উপলব্ধি করিতেছে। কৌশল্যার মূর্তি ত্যাগ ও তপস্যার মূর্তি। স্বামীর

প্রেম হইতে বঞ্চিতা হইয়াও রামচন্দ্রের মতো অলোকসামান্য পুত্র লাভ করিয়া রাজমহিষী কৌশল্যা ধন্যা হইয়াছিলেন। দেবতার আরাধনা আর পুত্রের মঙ্গল কামনাই তাঁহার জীবনের সান্ত্বনার স্থল ছিল। দেবসেবায় ব্যাপৃতা কৌশল্যাকে দেখিলে মনে হয় তপস্যাদ্বারা তিনি সকল দুঃখ কষ্টের লাঘব করিবার চেষ্টায় নিরত রহিয়াছেন। কৌশল্যার প্রাণ পুত্রস্নেহে ভরপুর। মায়ের প্রাণ কিছুতেই পিতৃসত্য পালনে উদ্যত প্রিয় পুত্রকে ত্যাগ করিতে চায় না। কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা পরম ধর্ম। উহা না করিতে পারিলে নিতান্ত অন্যায় হইবে জানিয়া কৌশল্যা রামকে বনে যাইবার অনুমতি দিলেন। এই কারণে চতুর্দশ বৎসর ধরিয়া নিদারুণ দুঃখে তাঁহার দিন কাটিয়াছে।

স্বামী দশরথের মৃত্যুর পর ভরতকে তিনি বলেন তাঁহাকে যেন রামচন্দ্রের নিকট বনে পাঠান হয়—বনবাসের নিদারুণ ক্লেশের অংশ গ্রহণ করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত। কিন্তু রামের প্রতি আনুগত্যে ভরতের প্রতি পুত্রস্নেহে কৌশল্যাদেবী ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

৮৫। (ক) **"ঐশ্বর্যযুক্ত পুরুষেরা পরের প্রশংসা শুনিতে ভালবাসেন না।"**
(খ) **"ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিরা অপরের প্রশংসা সহ্য করিতে পারেন না।"**

ধনসম্পত্তি বেশি থাকা ভাল কি খারাপ—এই বিষয়ে তর্ক উঠিতে পারে। দারিদ্র্য মানুষের সবচেয়ে বড় অভিশাপ, দরিদ্র লোক শতগুণ সম্পন্ন হইলেও তাহার পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকা মৃত্যুতুল্য। অর্থের অভাবে দরিদ্র নিজের আবশ্যক ব্যয় নির্বাহ করিতে পারে না—অর্থদ্বারা সমাজের সেবা করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। এরূপ অবস্থায় লোকের ধনসম্পত্তি থাকা উচিত। প্রচুর ধন সম্পত্তি ও প্রভুত্ব নিজের আয়ত্তে থাকিলে লোকে নিজে প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করিতে পারে এবং সমাজের সেবায় উহা কাজে লাগাইতে পারে। কিন্তু প্রভূত সম্পত্তির মালিক হইবার অনেক দোষও রহিয়াছে। সকলেরই নিজের প্রয়োজন এবং সমাজের প্রয়োজনের জন্য সম্পত্তি আবশ্যক এ বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। কিন্তু ধন সম্পত্তি হাতে থাকিলে লোকে ধরাকে শরা জ্ঞান করে। উহা অধিকার করিয়া লোকে নিরহংকার হইয়াছে—ইহার দৃষ্টান্ত বিরল। ধনী লোক পৃথিবীতে অন্য কাহাকেও নিজের চেয়ে বড় বলিয়া জ্ঞান করে না। নিজের অবস্থার অনুপাতে অতি অল্প দান করিয়াও সে মহাগর্বিত হয়। আর কোন কোন ধনীর অগাধ সম্পত্তি অর্জনের স্পৃহা এত প্রবল হয় যে তাহার খরচ করিবার প্রবৃত্তি জাগে না। এই দুই শ্রেণীর ধনী অপরের প্রশংসা শুনিতে পারে না। অপরের প্রশংসা শুনিবার জন্য উদারতার দরকার। উল্লিখিত দুই শ্রেণীর লোক ঐশ্বর্য গর্বে মত্ত, তাহাদের আত্মসর্বস্ব হৃদয়ে পরের প্রতি উদারতার কোন স্থান নাই। যেখানে পরের প্রতি উদারতা নাই সেখানে পরের প্রশংসা শ্রবণ করা সুদূর পরাহত। ঐশ্বর্যের এমনি দোষ যে উহা একবার যাহাকে আশ্রয় করিয়াছে তাহাকে চিরকালের জন্য মনুষ্যত্ব হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। মনুষ্যত্ব-হীন লোকের নিকট অপরের সদগুণের কোন আদর নাই—তাই তাহারা অন্যের প্রশংসা শুনিতে চায় না বা শুনিতেও পারে না।

৮৬। **"মনুষ্যের সৎপ্রবৃত্তি নিচয়ের বিকাশ করিবার জন্য একটি মহাবিদ্যালয় আবশ্যক রামায়ণে চিত্রিত যৌথ পরিবার সেই মহাবিদ্যালয়।"** (রামায়ণ ও সমাজ, ১৫৭)

মানুষের সৎপ্রবৃত্তি তাহার ভিতরে থাকিলেও উহার বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র চাই। উপযুক্ত ক্ষেত্রের অভাবে সহজাত সৎপ্রবৃত্তি নষ্ট হইয়া থাকে। পুনঃ পুনঃ প্রয়োগে

সৎপ্রবৃত্তি হৃদয়ে দৃঢ় হয় এবং উহা অভ্যাসে পরিণত হয়। সৎপ্রবৃত্তি প্রকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র হইতেছে মানব সমাজ।

মানব সমাজ বিশাল এবং বিরাট। এই বিশাল সমাজকে সৎপ্রবৃত্তি বিকাশের ক্ষেত্র বলিয়া গ্রহণ না করিলে কেহ নিত্য নিয়মিতভাবে সৎ কার্য করিবার সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে। কর্মক্ষেত্র যত ছোট হইবে উহা আত্মবিকাশের পক্ষে তত সুবিধাজনক হইবে। ছোট কর্মক্ষেত্রে অপরের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা যত সহজ বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব নহে। সুতরাং সৎপ্রবৃত্তি বিকাশের সব চেয়ে ভাল ক্ষেত্র হইতেছে যৌথ পরিবার বা একান্নবর্তী পরিবার। একান্নবর্তী পরিবার পিতামাতা ভাই ভগিনী আর পরিবারের নিকট আত্মীয় পোষ্যবর্গ লইয়া গঠিত। বিশ্বজনীন প্রেম, ত্যাগ ও ভ্রাতৃত্ব প্রদর্শনের পূর্বে যৌথ পরিবারে মানুষকে উহার প্রস্তুতি অভ্যাস করিতে হয়। এইরূপ পরিবারের প্রত্যেকটি লোক প্রত্যেকের জন্য ভাবিবে এবং ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিবে। এই ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকারে সৎপ্রবৃত্তি দিন দিন বাড়িতে থাকিবে। যৌথ-পরিবারে 'সকলের তরে সকলে আমরা' এইরূপ চিন্তা বিশেষভাবে বিকশিত হইয়া বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের জন্য মনুষকে প্রস্তুত করে। যৌথ পরিবারে প্রত্যেকটি লোকের অধিকার সমান। একজন সুস্থ সবল লোক যতটা খাটিতে পারে—দুর্বল লোক ততটা না খাটিলেও তাহার দেয় কাজের অপূর্ণতাকে অপরে পূর্ণ করিবে। পরিবারের একজন বেশি অর্থ উপার্জন করে—অপরে তাহা করে না বা করিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় অধিক উপার্জনকারীর অর্থদ্বারা পরিবারের ক্ষয় ক্ষতি পূর্ণ হইবে। কেবল অর্থদ্বারা পরিবারের সকল সমস্যার সমাধান হয় না। যে ব্যক্তি অর্থোপার্জন কম করিবে অন্যদিকে তাহার সেবাদ্বারা নিজেকে সে সার্থক করিয়া তুলিবে। এইরূপ পরস্পরের জন্য ত্যাগ সমবেদনা ও সহানুভূতিতে পরিবার শান্তির স্থল হইয়া দাঁড়াইবে। সুতরাং যৌথপরিবার সৎপ্রবৃত্তি শিক্ষার বিদ্যালয়স্বরূপ।

৮৭। "রামায়ণে যদি কোন চরিত্র ঠিক আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা যায় তবে তাহা একমাত্র ভরতের চরিত্র।" (ভরত পৃঃ ৭৩)

রামায়ণ বর্ণিত রাম লক্ষ্মণ দশরথ কৌশল্যা সীতা প্রভৃতি যে কোন চরিত্রের আলোচনায় দেখা যায় ইঁহারা সকল দিক দিয়া আদর্শ-চরিত্রের মানুষ নহেন। প্রত্যেকেরই অন্তরের মধ্যে কোন না কোন ত্রুটি চরিত্রগুলিকে কলঙ্কযুক্ত করিয়াছে। ইঁহাদের বিরাট বিশাল চরিত্র মাঝে মাঝে বিপরীতমুখী ভাবপ্রকাশে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। একমাত্র মহর্ষি বাল্মীকি বর্ণিত ভরতচরিত্র সর্বতোভাবে দোষ ত্রুটি হীন। রামায়ণ মহাকাব্যে ভরতের চরিত্র একমাত্র আদর্শ চরিত্র। সর্বাবস্থায় সবল, অকলঙ্ক কর্তব্যপরায়ণ, সুবিবেচক ত্যাগী এই ভরত। রাম ত্যাগে পিতৃসত্য পালনে বড় হইতে পারেন, কিন্তু ভরত রাজৈশ্বর্য তার প্রত্যক্ষ হাতের মুঠার মধ্যে পাইয়াও অন্যায় অনধিকার ভোগে পরাঙমুখ: তাই তাঁহাকে রাজর্ষি ভরত বলা যাইতে পারে। রাম পিতার প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য রাজৈশ্বর্য ত্যাগ করিলেন কিন্তু ভরত রাজৈশ্বর্য পাইয়াও অনধিকার ভোগে বিরত হইলেন জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রের জন্য; রাজ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহারই প্রতিনিধি হিসাবে উহার পরিচালনা করিতে লাগিলেন। অন্যায় অধিকারে লোভযুক্ত কৈকেয়ীর পুত্র বলিয়া অকারণে ভরতের প্রতি সকলে অবিচার করিয়াছে। ভরতকে পিতা বিমাতা ভ্রাতা সকলেই কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্রের অংশভাগী করিয়াছে—অথচ তিনি রাম বনবাস ও তাহার জন্য রাজ্যাধিকার লাভের বিন্দুবিসর্গও জানেন না। সবল সুস্থ চিত্তে তিনি যেখানেই

যান না কেন সকলেই তাঁহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখে। চিত্রকূট পর্বতে সসৈন্যে ভরতের উপস্থিতিতে সংসারে বীতস্পৃহ ভরদ্বাজ মুনি হইতে আরম্ভ করিয়া রাম লক্ষ্মণ পর্যন্ত সকলের মনে ভরতের সততায় সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে। পরে এ সকল সন্দেহ যে নিতান্ত অলীক তাহা ভরত আপনার কার্যদ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া সকলের মুখ মলিন করিয়া দিয়াছেন। ভরতের ত্যাগ রামচন্দ্রের ত্যাগকে নিতান্ত নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছে। রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য চতুর্দশ বৎসর বনবাসের ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন—কিন্তু ভরত লোকালয়ে অনন্ত ভোগ্য বস্তুর নিকটে থাকিয়া অন্যায়ের প্রতিবাদে এই চতুর্দশ বৎসর তপস্বিরূপে কাল কাটাইয়াছেন। অসীম ভোগের মধ্যে তপস্বীর ব্রত অতি কঠোর ব্রত। এই কঠোর ব্রতে তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন।

৮৮। **"আম্রতরু ছেদন করিয়া পলাশ-মূলে জল সেচন করিয়া মূঢ় ব্যক্তি শেষ ফল না পাইলে বিস্মৃত হয়, পলাশ ফুল হইতে আম্রফল উদ্গত হয় না।" (দশরথ, পৃঃ ৩)**

প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়মে জগতের সর্বত্র কার্য কারণ সম্বন্ধ বিদ্যমান। কারণ হইতে কার্যের উৎপত্তি হয়। ফুল না থাকিলে ফলের জন্ম হইত না। তাই ফুল কারণ ফল তাহার কার্য। সজাতীয় কারণ হইতে সজাতীয় কার্য উৎপন্ন হইয়া থাকে—বিজাতীয় ফলের জন্ম হয় না। আম্রবৃক্ষের মঞ্জরীতে আম্র ফলই জন্মিয়া থাকে—পলাশফুলে উহা উৎপন্ন হয় না। অসৎ কর্ম করিলে মানুষ পরিণামে দুঃখই ভোগ করিয়া থাকে আর সৎকর্মের দ্বারা তাহার সুখলাভ অবশ্যম্ভাবী। অজ্ঞান ব্যক্তি দুঃখে পতিত হইয়া—সেই দুঃখের মূল কারণ কি তাহা না জানিয়া, প্রতিকার করিতে যাইয়া নিজের ব্যর্থতায় বিস্মিত হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁহার দুঃখের প্রতিকার রহিত মূল কারণ জানিয়া নিজেকেই কৃতকার্যের জন্য দায়ী করিয়া থাকেন—অপরের উপরে কখনও দোষের বোঝা চাপাইয়া দেন না।

৮৯। **আমরা অনেক সময় যে দিক্ হইতে অশুভের আবির্ভাব আশঙ্কা করি, অশুভ সে দিক হইতে না আসিয়া অন্য দিক দিয়া উপস্থিত হয়। (রামায়ণী কথা পৃঃ ৫)**

মানুষ সকল সময়ই নিজের শুভাশুভের জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকে। শুভ আর অশুভ লইয়াই জগৎ। মানুষ শুভের আশা যতটা করুক আর নাই করুক—অশুভের আশঙ্কা তাহার মনে সব সময়ে অত্যন্ত প্রবল। সে প্রতিমুহূর্তে মনে করে এই বুঝি কোন অমঙ্গল উপস্থিত হইল। স্নেহ আর প্রেমের জন্যই এই অবস্থা মানুষের মনে আসে। এই অবস্থা মনে উপস্থিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কোন দিক হইতে বিপদ আসিতেছে সে তাহাও ঠিক করিয়া লয়। অস্থিরচিত্ত মানুষ বিচারবুদ্ধির অভাবে বিপদের উৎপত্তিস্থলকে কল্পনায় দেখে। কিন্তু এরূপ কল্পনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শূন্যে মিলাইয়া যায়—বিপদ আসে এমন স্থান হইতে যেখানে স্বাভাবিক ভাবে কল্পনা প্রবেশ করিতে পারে না। অধিকন্তু মানুষের শুভাশুভের উপর তাহার নিজের কোন হাত নাই। অনেকক্ষেত্রে শুভাশুভ আকস্মিকভাবে উপস্থিত হয়। অবশ্য এ জগতে আকস্মিক কিছুই সংঘটিত হয় না। সর্বত্র তাহার কার্যকারণ শৃঙ্খলা রহিয়াছে। মানববুদ্ধির যাহা অগোচর তাহাই অকস্মিক বলিয়া কল্পিত হয়। এইরূপ আকস্মিক বা অভাবনীয় ঘটনা জগতে অনবরতই ঘটিতেছে। ইহার জন্য লোকে পূর্ব হইতে প্রস্তুত থাকে না বা থাকিতে পারে না।

/ ৯০। **"সংগীতের ন্যায় মানবজীবনেরও একটা মূলরাগিণী আছে।" ইত্যাদি** (রামায়ণীকথা পৃঃ ৬২)

নানারূপ আচরণের মধ্য হইতে মানুষের মূল চরিত্রটিকে বাহির করিতে হয়। বাহিরের অসংখ্য আচরণের মধ্যে লোকের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সব সময়ে ধরা না পড়িলেও তাহার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য নহে একথা বললা চলে না। প্রত্যেক মানুষ চরিত্রের দিক দিয়া অপর মনুষ্য হইতে ভিন্ন। আপাত দৃষ্টিতে লোকের সাধারণ আচরণ এক হইলেও একজনের আচরণ আর অন্য ব্যক্তির আচরণ সর্বাংশে এক নহে। এই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যকে গানের মূলরাগিণীর সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে। প্রত্যেক গানেরই একটা মূল রাগিণী আছে। গায়ক ইচ্ছামত এই রাগিণীকে নানাভাবে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া—নানারূপে পরিবর্তিত প্রসারিত বা সঙ্কুচিত করিয়া গাহিয়া থাকে। কিন্তু এই পরিবর্তনের মধ্যে গানের মূল রাগিণীটি সংগীত রসজ্ঞের নিকট ধরা পড়ে। রামচন্দ্রের জীবনে ছোটবড় বহু কার্য বা ঘটনায় পরিপূর্ণ। কিন্তু কার্য বা ঘটনার গতি যে দিকেই অগ্রসর হউক না কেন, রামচরিত্রের মূল কথা সত্যের প্রতি অসীম নিষ্ঠা এবং তাহার ত্যাগ বুদ্ধি। এই ত্যাগ বুদ্ধিও সত্য নিষ্ঠা হইতে উৎপন্ন। রামচন্দ্র সত্যের জন্য সব কিছু করিতে প্রস্তুত। সুখ দুঃখ লাভ অলাভ, জয় পরাজয়—রামচন্দ্র কিছুতেই বিচলিত নহেন। তাঁহার সর্বদা আগ্রহ হইতেছে সত্যরক্ষার জন্য রামচন্দ্র সব কিছু পরিত্যাগ করিতেও বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত নহেন।

/ ৯১। **"দুঃখে পড়িয়া লোক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে; হৃদয়ে অমানিশার তুল্য শোক, নৈরাশ্য বা অনুশোচনার ঘোর অন্ধকার ঘনীভূত না হইলে সেই জ্ঞান আইসে না।"** (পৃঃ ১৩)

শোক, দুঃখ, নৈরাশ্য ও অনুশোচনার মতো মানবের আর কোন বড় শিক্ষক নাই। শোকদুঃখাদির চাপে পড়িলেই লোকের নূতন দৃষ্টিভঙ্গি জাগে, জ্ঞান ফিরিয়া আসে।

যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ কোন না কোন বিপদে না পড়ে ততক্ষণ সে নিজের সুখে মত্ত হইয়া থাকে, সে যাহা বুঝে তাহাই প্রকৃত জ্ঞান, সে যাহা করে তাহাই প্রকৃত কার্য, লোকের সহিত সে যেরূপ ব্যবহার করে তাহাই জগতের আদর্শ আচরণ। সুখের এমনি স্বভাব যে সুখ যখন আসে তখন সংসারে অন্য কেহ যে দুঃখী আছে তাহা কাহারও কল্পনায় উপস্থিত হয় না। চির সুখী ব্যক্তি দুঃখীর দুঃখকে অগ্রাহ্য করে। তাহার মতে, দুঃখী দুঃখ প্রকাশ করে তাহা তাহার নিজের স্বভাবের দোষেই করিয়া থাকে। তাহার মতে দুঃখীর দুঃখ কৃত্রিম- অপরের নিকট হইতে সুখসুবিধা আদায় করিবার ছলমাত্র।

যে কখনও বিপদে পড়ে নাই তাহার নিকট বিপদাপন্ন ব্যক্তির বিপদ নিতান্ত তুচ্ছ বিষয়। যে ব্যক্তির কামনা বাসনা প্রায়ই চরিতার্থ হয়, সে বিফলকাম ব্যক্তির ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের প্রতি উপহাস করিয়া থাকে। চিরসুখী ব্যক্তির স্বভাবই হইল এই প্রকার।

তাই জীবনে সুখের মতো দুঃখেরও প্রয়োজন আছে। দুঃখ না হইলে লোকের জ্ঞানচক্ষু খোলে না।

দুঃখে পড়িলেই লোক দুঃখের কারণ সন্ধান করে—তাহার নিবৃত্তির উপায়ও বাহির করিবার চেষ্টা করে। এইরূপ সন্ধানে আত্মনিয়োগ করিলে জ্ঞানের উদয় হয়। জ্ঞানের উদয়ে দুঃখ দূর হয়। এ সংসারে যে যেরূপ কার্য করে সে সেইরূপ ফল ভোগ করিয়া থাকে।

দশরথ রাজার পুত্রশোক হইয়াছিল। পুত্রশোকের দুঃখে পতিত হইয়া রাজা নিজের পূর্বকৃত অন্যায়ের কথা স্মরণ করিয়া নিজের দুঃখের কারণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অপরকে দুঃখ দিবার ফলেই তাহার নিজের দুঃখ হইয়াছিল। দুঃখ ছাড়া কেহ এজগতে আত্মানুসন্ধান করে না। আত্মানুসন্ধান ব্যতীত কাহারও কখনও জ্ঞানের উদয় হয় না।

২২। "মানীব্যক্তির অপমান মৃত্যুতুল্য।" (রামায়ণী কথা, পৃঃ ৭)

এ সংসারে একদল লোকোত্তর পুরুষ আছেন যাঁহাদের নিকট মান অপমানে কোন প্রভেদ নাই। তাঁহারা পৃথিবীকে অবহেলা করিয়া থাকেন কারণ তাহারা আত্মবলে বলীয়ান্। ইহার বিপরীত এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা স্বার্থসিদ্ধির জন্য মান অপমান সব কিছু ছাড়িতে পারে। ইহাদের নিকটেও মান অপমানের কোন মূল্য নাই। ইহা ছাড়া তৃতীয় প্রকারের একদল লোক জগতে আছেন—তাঁহারা হইতেছেন মানী লোক। ইঁহাদের নিকট আত্মসম্মান সর্বাপেক্ষা বড়। জাগতিক সুখসুবিধা, ঐশ্বর্য, লোকবল সব কিছু ইঁহাদের উপেক্ষার বস্তু। এই শ্রেণীর লোকেরা সত্যসঙ্কল্প এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ। নিজের জীবন, ধনসম্পত্তি সবই চলিয়া যায় যাক কিন্তু ইঁহারা প্রতিজ্ঞা হইতে কখনও ভ্রষ্ট হন না। সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হইতে পারে—অগ্নিও শীতল হইতে পারে—পর্বত শিখরে পদ্মের বিকাশও সম্ভব হইলেও হইতে পারে—কিন্তু মানী লোকের বাক্যের কখনও অন্যথা হয় না। নিজের কথা রক্ষা করিতে সমর্থ না হওয়াই মানী লোকের নিকট অপমানকর। এই অপমান মৃত্যুর সমান। দেহের নাশের নাম মৃত্যু। মানুষের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু জগতে আমাদের দেহকে রক্ষা করিবার জন্য, ইহার সুখসুবিধার জন্যই আমাদের সর্বপ্রকারের কর্মপ্রচেষ্টা চলিয়াছে। এই দেহের নাশের কথা ভাবিলে খুবই দুঃখ হয়। প্রকৃত মরণ অপেক্ষা মৃত্যু চিন্তায় মানুষ কাতর হয় অধিক, মানীর মান নষ্ট হওয়া মৃত্যুযন্ত্রণার সমান ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

২৩। "দেশ পর্যটনে মনের ভার লঘু হয়।" (রামায়ণী কথা, পৃঃ ২৫)

দীর্ঘদিন যাহারা জনবহুল স্থানে বাস করে এবং নানা সাংসারিক বিপর্যয়ে যাহাদের দেহ ও মন শান্ত ক্লান্ত তাহাদের পক্ষে দেশভ্রমণ নিতান্ত হিতকর। প্রকৃতির সৌন্দর্যরাশি নগর ও পল্লীতে মনুষ্যের হস্তক্ষেপের ফলে আত্মপ্রকাশে বাধা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে জনবিরল স্থানে প্রকৃতি পুষ্পে পল্লবে লতায় পাতায় আপনাকে সজ্জিত করিয়া আবির্ভূত হয়। প্রকৃতির মুখশ্রীতে থাকে মায়ের স্নিগ্ধ অভিনন্দন—যাহাতে ব্যথিতের ব্যথা দূর হয়। মেঘবিছান শৈলমালা, পার্বত্য নির্ঝরিণী, ক্লান্তজনকে কোলে স্থান দিবার জন্য আকুল আহ্বান জানায়। পাখীর কলগীতি ও নদীর কলতান শ্রান্ত পথিকের কর্ণে সুধা বর্ষণ করে। এখানে সে পায় ব্যথিতের প্রতি সমবেদনা—নির্মম জগতে সে পায় অবিচার, অন্যায় অত্যাচার। উদার উন্মুক্ত প্রকৃতির এই সমবেদনায় পথিকের হৃদয়ের দুঃখের ভার অত্যন্ত লঘু হইয়া পড়ে।

২৪। "অনন্ত সমুদ্রের একমাত্র উপমা আছে, সেই উপমা আকাশ এবং আকাশের একমাত্র উপমা সমুদ্র।" (রামায়ণী কথা, পৃঃ ৫০)

সমুদ্র আমাদের দৃষ্টিতে অনাদি অনন্ত প্রতীয়মান হইলেও সে প্রকৃতপক্ষে অনাদি অনন্ত নহে। তাহারও সীমা আছে। কিন্তু ঊর্ধ্বে আকাশ অসীম, অনাদি ও অনন্ত। এক আকাশ ব্যতীত সমুদ্রকে অন্য কোন কিছুর সহিত তুলনা করা চলে না। লোকদৃষ্টিতে সমুদ্র অসীম, অনাদি, অনন্ত, নীল, ফেনিল। আকাশও অনাদি,

অনন্ত—নীল, শুভ্রমেঘসমবায়ে ফেনিল। সমুদ্রে অগণিত মুক্তা—আকাশে অগণিত তারকাপুঞ্জ। সমুদ্রে অহরহ গম্ভীর গর্জনধ্বনি—আর শব্দগুণ আকাশে সমগ্র বিশ্বের শব্দের মিলনে অনাদি গম্ভীর রব শ্রুত হয়। আকাশ ও সমুদ্র দিকচক্রবালে এক হইয়া রহিয়াছে। এ যেন নীলিমায়, নীলিমায় মহিমায় মহিমায় অনন্তের মহা আলিঙ্গন।

৯৫। **"পক্কশস্যের যেরূপ পতনের ভয় নাই, সেইরূপ মনুষ্যেরও মৃত্যুর জন্য নির্ভয়ে প্রতীক্ষা করা উচিত—কারণ উহা অবধারিত।"** (রামায়ণী কথা, পৃঃ ৩১)

সত্যের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায় এ জগতে মৃত্যু একমাত্র সত্য বস্তু। ঈশ্বর ও পরলোক সম্বন্ধে অনেক লোক সন্দিহান—কেহ ইহাদের মানে আবার কেহ মানেও না। মৃত্যুকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জাগতিক বস্তু যাহাতে প্রাণসত্তা বিদ্যমান তাহার মৃত্যু বা ধ্বংস অনিবার্য। যে বস্তু জন্মে ক্রমে ক্রমে তাহার বৃদ্ধি, পরিণাম, ক্ষয়, এবং অবশেষে ধ্বংস উপস্থিত হয়। বস্তুত ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইবার কাহারও কোন উপায় নাই বা আজ পর্যন্তও কেহ বাহির করিতে পারে নাই। মানুষ প্রতিনিয়ত জীবের ধ্বংস স্বচক্ষে দেখিতেছে। কিন্তু সে মনে করে সে ছাড়া আর সকলেই চলিয়া যাইবে- অথবা মৃত্যুকে নিশ্চিত জানিয়াও জগতে চিরকাল বাস করিবার আশায় মরণকে অস্বীকার করিয়া থাকে। আত্মীয়স্বজন মারা গেলে লোকে তাহাদের সমাধি মন্দির গড়িয়া, ছবি আঁকিয়া, অথবা যে কোন প্রকারে সম্ভব হউক তাহাদের স্মৃতি রক্ষা করিয়া মৃত্যুকে ভুলিয়া থাকে। জ্ঞানী লোকের দৃষ্টিভঙ্গী অন্য প্রকারের। তাঁহারা সত্যকে সত্য বলিয়াই গ্রহণ করেন। তাহাকে কখনও মিথ্যার আবরণে ঢাকিয়া রাখেন না। মৃত্যু যখন জীবের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, তখন জীবনাশে দেহের সেই চরম পরিণতির জন্য তাঁহারা শঙ্কিত নন। জগতে যাহা অবশ্যই ঘটিবে তাহা অপ্রিয় হইলেও তাহাকে গ্রহণ না করিবার কোন উপায় নাই। সুতরাং ধীরস্থির ভাবে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। পতন আসন্ন হইলেও পক্ক শস্য তাহাতে বিচলিত না হইয়া নির্ভয়ে দণ্ডায়মান থাকে। মানুষেরও সেইরূপ [illegible]।

৯৬। **"মিত্রত্ব অর্জনই সুলভ, মিত্রত্ব রক্ষা করাই কঠিন।"** (পৃঃ ৪৭)

লাভ হউক আর ক্ষতিই হউক, সম্পদে বিপদে সুখে দুঃখে বন্ধু কখনও তাহার বন্ধুকে ত্যাগ করিবে না। ইহারই নাম আদর্শ মৈত্রী-বন্ধন। এরূপ আদর্শে অনুপ্রাণিত বন্ধু জগতে বিরল। আর একপ্রকার বন্ধুত্ব আছে, উহা সহজলভ্য এবং শেষ পর্যন্ত উহাকে রক্ষা করা কষ্টকর হইয়া পড়ে। দুই ব্যক্তির অবস্থা সমান হইলে তাহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইতে পারে, কারণ বন্ধুত্ব নির্ভর করে সমাবস্থার উপর। একব্যক্তি বিপদাপন্ন, আর এক ব্যক্তিও অনুরূপ বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে—এরূপ অবস্থায় দুয়ের মধ্যে অতি সহজেই বন্ধুত্ব স্থাপিত হইবার পক্ষে কোন বাধা নাই। বিসদৃশ অবস্থায় এরূপ বন্ধুত্ব কখনই স্থাপিত হইবে না—কারণ সেখানে আত্মরক্ষার জন্য এক পক্ষের মিত্রত্বের প্রয়োজন আছে, অপর পক্ষের কোন গরজ নাই। রাজনৈতিক চুক্তিও এক প্রকারের বন্ধুত্ব—ইহাও প্রয়োজনের তাগিদে স্থাপিত হইয়া থাকে। এসব বন্ধুত্ব লাভও হয় অতি তাড়াতাড়ি। যে বস্তু কষ্টের সহিত আমরা লাভ করি তাহা সহজে আমাদের ছাড়িয়া যায় না। যাহা সুলভ তাহা চুক্তি ভঙ্গের জন্য নষ্ট হয়। আবার অনেক সময়ে চুক্তি ভঙ্গের আশঙ্কার

উভয় পক্ষের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটায় পারস্পরিক সম্পর্ক ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়ে এবং অবশেষে উহা ছিন্ন হয়। অতএব মিত্রত্ব রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

৯৭। "যে ব্যক্তি অপমানিত হইয়া প্রতিশোধ না নেয় সে পৌরুষশূন্য কৃপার্হ।"

এ জগতে নিতান্ত কাপুরুষ ছাড়া সকল লোকের কাছেই আত্মসম্মানের চেয়ে বড় কিছু নাই। জীবন একদিন অবশ্যই ধ্বংস হইবে কিন্তু মান একবার গেলে উহা ফিরিয়া পাওয়া যায় না। যে কোন প্রকারেই হউক নিজের মানকে রক্ষা করিতে হইবে। নিজের সম্মান নিজে রক্ষা না করিলে বা না করিতে জানিলে অপর কেহ আসিয়া উহা রক্ষা করিয়া দিবে না। যে আমার টাকা নিয়া যায় সে আমার অল্প ক্ষতিই করে, কারণ টাকা গেলে আবার পরিশ্রম দ্বারা উহা উপার্জন করা যাইতে পারে। অপরে আমার সম্মান নষ্ট করিয়া আমার খুব বেশি অনিষ্ট করে। এত গুরুতর ক্ষতি যে করে তাহাকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করা উচিত। অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণ দুই শ্রেণীর লোকেরা করে না—এক অতি উচ্চ স্তরের লোক—ইঁহারা অতি শক্তিশালী ব্যক্তি। ইঁহারা শক্তি থাকিতেও নিজের শক্তির অপব্যবহার করেন না। কারণ ইঁহাদের চক্ষে অত্যাচারী বা অবমাননাকারী অতি নিম্নস্তরে অবস্থান করে। নীচ লোকের উপর প্রতিশোধ গ্রহণে ইঁহারা নিজের হাত কলঙ্কিত করিতে চাহেন না। আর প্রাগুক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরাও অপমানের প্রতিশোধ লয় না। ইহারা শক্তিহীন হইয়াও অপরকে তথাকথিত ক্ষমা করিতে যায়। ইহারা কাপুরুষ ছাড়া আর কিছুই নহে। অপমানকারীকে সমুচিত শিক্ষা না দিলে উহারা ক্রমশঃ প্রবল হইবে এবং অন্যায় কার্য ছাড়িয়া দিবে না। এই কাপুরুষের দল যাহারা অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করে না— তাহারা অন্যের কৃপার পাত্র। অবমাননাকারী তাহাদিগকে কৃপার চক্ষে দেখে—আর সারা জগৎও ইহাদিগকে দুর্বল ও কাপুরুষ বলিয়া গণ্য করে।

৯৮। "অতি দীন ও অশক্ত ব্যক্তিরাই দৈবের দোহাই দিয়া থাকে, পুরুষকার দ্বারা যাঁহারা দৈবের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হন, তাঁহারা আপনার ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়েন না।" (পৃঃ ৮৩)

মানুষ কর্ম করিতে পৃথিবীতে আসিয়াছে। কর্ম না করিয়া সে এক মুহূর্তও থাকিতে পারে না—তাহার প্রকৃতি তাহাকে কর্মের দিকে অহরহ চালাইতেছে। নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে তাহার শরীরযাত্রা নির্বাহ হইবে না। জগতে মানুষের কর্ম-প্রচেষ্টার নাম পুরুষকার। পুরুষকার, পুরুষ বা মানুষের কাজ। মানুষ কাজ করিয়াও তো অনেক সময় জগতে বিফল হইয়া থাকে। এ বিফলতার মূলে কি দৈবের কোন প্রভাব নাই? দৈব কি? পূর্বজন্মার্জিত কর্মের ফল দৈবরূপে আমাদের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া করে। যে ব্যক্তি যেরূপ কাজ করে সে সেইরূপ ফলভোগ করে। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িবে—ইহার কোন অন্যথা নাই। কতকগুলি বিপদ দৈবরূপে আমাদের উপর আসিয়া পড়ে। কিন্তু পূর্বজন্মের কার্যের ফলে যদি সব কিছু হয় তবে কাজ করিয়া লাভ কি? কর্মপ্রচেষ্টায় খুব বড় লাভ আছে। বিপদের মধ্যে চেষ্টা দ্বারা টিঁকিয়া থাকিতে পারা যায়—ইহাই বড় লাভ। এইরূপ চেষ্টা দ্বারা টিঁকিয়া থাকার নামই মনুষ্যত্ব। জীবনে বিপদ, দুঃখ, শোক, তাপ সবই আসিবে। পুরুষকারদ্বারা উহাদিগকে বাধা দিতে হইবে। অলস, কাপুরুষেরাই দৈবকে বাধা না দিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে। দুঃখকে পুরুষকার দ্বারা বাধা দিলে উহাকে দুঃখ বলিয়া মনে হইবে না।—দুঃখের কাছে মানুষের পরাজয় না হইয়া

এবং তাহাব উপব বিজয হইবে। যাহাবা অতি দুর্বল লোক যাহাদেব অলসতাব দরুণ কর্মশক্তিব অভাব ঘটিযাছে তাহাবাই দৈবেব দোহাই দিযা থাকে। যাহাবা কর্মযোগী তাহাবা কোন অবস্থাতেই মনোবল হাবায না। কর্মযোগীবা কর্মেব কৌশল জানে। যোগ কথাব অর্থ কাজেব কৌশল। এ কৌশল জানিলে কিছুতেই কাহাবও পবাজয হয না।

৯৯। "স্বেচ্ছাবৃত দুঃখেই মনুষ্যেব মহত্ব।" (পৃঃ ১৬০) মনুষ্যেব কতকগুলি এমন বিপদ আছে মনুষ্যেব মহত্ব'।

এই পূর্ণ অনুচ্ছেদটি হইতেছে নির্বাচিত বাক্যটিব ভাব সম্প্রসাবণ। সুতবাং মূল পুস্তকেব সহাযতাব উত্তব লেখা যাইবে।

১ ।। **"বাল্মীকি যে সুধাব উৎস সৃষ্টি কবিযা গিযাছেন তাহাব অফুবন্ত বিন্দুব জন্য এখনও ভাবতবর্ষ তৃষিত।"** (লেখকাবেব ভূমিকা)

বাল্মীকিব বামাযণ ... শব্দেব অর্থ অমৃত। অমৃতপানে দেবতাবা অমব হইযাছেন ... অনন্ত আনন্দেব অধিকাবী হইযাছেন। বামাযণ শুধু অসীম আনন্দেব পবিবেশক নহে। এ কাব্য মানুষকে মৃত্যুব ঊর্ধ্বে স্থাপন কবিতে পাবে। বামাযণ অমৃতেব অফুবন্ত উৎস। বামাযণেব বসধাবা আজও ভাবতবর্ষেব সর্বত্র কীর্তন যাত্রা কথকতাব মাধ্যমে নানাভাবে প্রবাহিত বহিযাছে। অমৃতপানেব জন্য দেবতা অসুব সকলেই লালাযিত ... বালক বৃদ্ধ যুবক পণ্ডিত মূর্খ সকলেই বামাযণকাহিনী হইতে বসধাবা গ্রহণে সমুৎসুক। নাবী ইহা হইতে পাইযাছে একাগ্রতা আব অসংখ্য দুঃখেব মধ্যে নিজেকে সংসাবেব জন্য বিলাইযা দিবাব গৌবব। ইহা হইতে ভোগী পাইতেছে ভোগেব পবিণামফল। ত্যাগী পাইতেছে ত্যাগেব গৌবব। বাজা পাইতেছেন পবেব কল্যাণে আত্মবিসর্জনেব আদর্শ। বীব ইহা হইতে পাইতেছে বীবেব দৃঢ়চবিত্র এবং কার্যকুশলতা। শত শত কবি বামাযণ হইতে কাব্যবচনাব প্রেবণা লাভ কবিযাছেন এবং কবিতেছেন। কথিত আছে—"ত্যাগদ্বাবাই মানুষ অমৃতত্ব লাভ কবে" —সে মবণেব ঊর্ধ্বে যায। বামাযণ সেই আত্মত্যাগেব সবচেযে বড শিক্ষাদাতা।

১০১। **"ভবত ভ্রাতৃভক্তিব পবাকাষ্ঠা—সুকোমল ভাবেব সমৃদ্ধ উদাহবণ। কিন্তু লক্ষ্মণ ভ্রাতৃভক্তিব অন্ন ব্যঞ্জন জীবিকাব সংস্থান।"** (উঃ মাঃ কম্পার্ট ১৯৬২)

পূজ্য ব্যক্তিব প্রতি অনুবাগেব নাম ভক্তি। সুতবাং ভ্রাতৃভক্তি জ্যেষ্ঠভ্রাতাব প্রতি কনিষ্ঠ ভ্রাতাব ভালবাসা বা আনুগত্য। এই ভক্তি প্রদর্শন দুই ভাবে হইতে পাবে। প্রথম ভাবটি প্রধানতঃ মানসিক—এ ভাবেব সহিত শাবীবিক কষ্টও আছে, তবে উক্ত আদর্শেব দিক দিযা বড। বড ভাইযেব জন্য ছোট ভাই যখন সর্বস্বত্যাগ কবিযা সর্বরিক্ত অবস্থায তপস্বীব মতো থাকে—তখন ইহাদ্বাবা জগতে উচ্চ আদর্শ স্থাপিত হইযা থাকে—জগতেব দৃষ্টি ও চালচলন অত্যন্ত দ্রুত হইযা থাকে। বাজনৈতিক বন্ধুত্ব বা চুক্তি অনেক সময একপক্ষেব এইরূপ সর্বত্যাগী ছোটভাইযেব উপব পডে। অবশ্য এরূপ ত্যাগ লোকশিক্ষাব অঙ্গ—ত্যাগীবও আত্মসংযম ও আত্মোন্নতি ইহাতে উপলব্ধ হয। কিন্তু পূজিত ব্যক্তি ইহাদ্বাবা ব্যক্তিগত কোন সুখ-সুবিধা লাভ কবেন না। পূজিত ব্যক্তিব কাছে পূজক উচ্চ স্তবেব ব্যক্তি বলিযা হৃদযেব অভিনন্দন লাভ কবেন সত্য, কিন্তু দ্বিতীয প্রকাবেব ভ্রাতৃভক্তি পূজিতেব পক্ষে নিতান্ত প্রযোজনীয়। এখানে পূজক সকল সমযে ছাযাব ন্যায জ্যেষ্ঠেব অনুগামী, সুখে-দুঃখে, সম্পদেবিপদে, বনেপর্বতে, সর্বত্র কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠেব সঙ্গে চলিযাছে। জ্যেষ্ঠেব সুখ-সুবিধাব জন্য আহাবনিদ্রা, জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতেও বাজী। জ্যেষ্ঠ

ছাড়া কনিষ্ঠের এখানে কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। কনিষ্ঠের এরূপ ভক্তি না হইলে জ্যেষ্ঠ বাঁচিতেই পারেন না। ভরতের ভ্রাতৃভক্তি প্রথম প্রকারের—লক্ষ্মণের হইল দ্বিতীয় প্রকারের।

ভরতের ভ্রাতৃভক্তি পলান্নের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। পলান্ন জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যক নহে। উহা বিলাসের খাদ্য। ভরতের ভ্রাতৃভক্তি আদর্শস্থানীয়। লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি অন্নব্যঞ্জনের সহিত তুলনীয়। অন্নব্যঞ্জন না খাইলে জীবন রক্ষা হয় না। লক্ষ্মণকে না হইলে রামচন্দ্রের বনবাস জীবনের কষ্ট সহ্য করা সম্ভবপর হইত না।

১০২। "যে জলরাশির স্বাভাবিক গতি আছে তাহা আপন নির্মলতা বজায় রাখিয়া চলিতে পারে, কি জল দাঁড়াইয়া গেলে উহা পঙ্কিল ও নানারূপ অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে।" (রামায়ণী কথা, পৃঃ ১৫৫)

স্বভাবের বিরুদ্ধে কোন কিছুই জগতে চলিতে পারে না—জোর করিয়া কাহারও উপর কাজ চাপাইলে—তাহার শক্তিতে না কুলাইলে বা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ হইলে কাজের গতি বন্ধ হইয়া যাইবে। কাজের যখন কোন গতি থাকিবে না তখন তাহার দুর্বলতার সুযোগ লইয়া যত অকাজ তাহার উপর আসিয়া পড়িবে। পক্ষান্তরে স্বভাবের অনুকূল কাজ পাইলে লোকে স্বভাবের বলে সর্বপ্রকার মলিনতাকে নির্মল করিতে করিতে গন্তব্যপথে অগ্রসর হইবে। যেখানে কাজ গতিহীন—বুঝিতে হইবে কাজ সেখানে লক্ষ্যহীন। চলতি জলে ময়লা আবর্জনা পড়িলে সে ময়লা আবর্জনা বেশিক্ষণ টিঁকিয়া থাকিতে পারিবে না—কারণ জল অনবরত চলার ফলে ময়লা পরিষ্কার হইয়া যাইবে। সম্মিলিত পরিবার সম্বন্ধেও এ কথা খাটে, যতদিন যৌথপরিবার—পরস্পর ত্যাগবুদ্ধিদ্বারা চালিত হইবে—ততদিন উহার ধ্বংস নাই—কারণ পরস্পর স্বার্থত্যাগের উপরই ইহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। যদি স্বাভাবিক স্বার্থত্যাগ বুদ্ধি কোন সময়ে বিকল হয় তবে সম্মিলিত পরিবারের অস্তিত্ব বিপন্ন হইবে এবং ক্রমে ক্রমে উহা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হইবে। গতিই জীবন। স্থিতি মৃত্যু। জলের গতি বন্ধ হইলে তাহাতে ময়লা প্রবেশ করিবে—সে ময়লা বাহির করিবার ক্ষমতা জলের থাকিবে না। যৌথপরিবারের কোন এক যায়গায় স্বার্থত্যাগ বুদ্ধি বিকল হইলে পরিবারে অবশ্যই ভাঙ্গন ধরিবে।

১০৩। "প্রাণ দান অপেক্ষা জীবন দানের গৌরব সমধিক, প্রাণ একবার বই দেওয়া যায় না—যদি বহুবার প্রাণ দেওয়ার কোন পথ থাকে, তবে তাহাকেই জীবন দান বলা যাইতে পারে।" (রামায়ণী কথা, পৃঃ ১৫৮)

প্রাণ হইতেছে মানুষের নিঃশ্বাসবায়ু। নিঃশ্বাসবায়ু বন্ধ হইয়া গেলে জীবন চলিয়া যায়। প্রাণ যাওয়ার নাম মৃত্যু। প্রাণ একবার গেলে তাহাকে ফিরিয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রাণ একবারের বেশি যায় না। বাঁচিয়া থাকার নাম জীবন। লোকে যতদিন বাঁচিয়া থাকে ততদিনই জীবন। জীবন দান করিলেও প্রাণ থাকিবে. জীবন দানের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ চলিয়া যায় না। সহস্রবার জীবন দান করিলেও দেহে প্রাণ থাকিবে। প্রাণদান ও জীবনদানের তাৎপর্য বিবেচনা করিলে দেখা যায় —মানুষের সর্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু প্রাণ। কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অনেক মহনীয় ব্যক্তি এই প্রাণ দান করেন। এই কার্য করিয়া তাঁহারা লোকের মনে চিরকাল অমর হইয়া থাকেন। কিন্তু এই দান অতি কষ্টকর হইলেও দানের পর আর কোন কষ্ট থাকে না, কারণ তখন দেহ নাই সুতরাং দুঃখ কষ্ট ভোগ করিবার লোক নাই।

কিন্তু জীবন দান সেরূপ দান নহে। জীবন দান হইতেছে কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জীবনকে উৎসর্গ করা। এখানে জীবন-উৎসর্গকারীর নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ কিছু নাই শুধু মহৎ উদ্দেশ্যের নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা। এই জীবনদানে প্রাণ না দিয়াও লোককে অনবরত দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হইতে হয়। ইহাতে প্রাণ দান অপেক্ষা দুঃখকষ্টের মাত্রা অনেক বেশি। যতবার বড় বড় কাজের জন্য জীবন দান করা যাইবে—ততবার দুঃখকষ্ট দাতাকে ঘিরিয়া ধরিবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে প্রাণদান অপেক্ষা জীবনদান অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। প্রাণ দানে কষ্ট একবার হয়—জীবন দানে বার বার হয়। প্রাণ দান যদি বার বার সম্ভবপর হইত তবে প্রাণদানই জীবনদানের পর্যায়ে পড়িত, কারণ মৃত্যুযন্ত্রণা বার বার সহ্য করা জীবনদানেরই তুল্য।

১০৪। **"কর্তব্য সম্পাদনে মৃত্যুর ন্যায় মহান্ মহিমা কিসে দিতে পারে?"** (রামায়ণী কথা, পৃঃ ১৫৬-৫৭)

এ সংসারে কর্তব্য সম্পাদনই মঙ্গলজনক। স্নেহ বা অন্য প্রকার দুর্বলতার বশে লোকে নিজের কর্তব্য কাজ ভুলিয়া যায়। ইহা অনেকের পক্ষে সারাজীবনই চলিতে থাকে। কিন্তু এইরূপ অবস্থার প্রতিকার করিতে না পারায় জীবনের শেষ মুহূর্তে লোকের মনে ক্ষোভ উপস্থিত হয়। সারাজীবন কর্তব্য না করিয়া মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে কর্তব্য দ্বারা নিজেকে মহিমান্বিত করিবার একটা আকাঙ্ক্ষা আসে। আর, ইহা মৃত্যুর পূর্বে নিতান্ত ভীরু লোকেরও হয়। জগতে মৃত্যুর মতো সত্যবস্তু আর নাই। মৃত্যু যে অবশ্যই একদিন উপস্থিত হইবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভীরু ব্যক্তিকেও যখন একদিন না একদিন মৃত্যুর কবলে পড়িতে হয় তখন ভীরুরও মনে কর্তব্য না করার জন্য অনুশোচনা আসে। মৃত্যু ও অনুশোচনা যখন সত্য তখন মৃত্যুই মানুষকে মহনীয় করিয়া তোলে। মৃত্যু যখন অবধারিত তখন স্নেহ মায়া মমতা সবকিছুকে উপেক্ষা করিয়া সারাজীবন নিজের কর্তব্য করাই উচিত ছিল। যাহাদের জন্য লোকে স্নেহ মায়া মমতায় বশীভূত হয় সেই আত্মীয়গণ মৃত্যুপথের কেহই সাথী নহে, অথচ এতকাল তাহারা মৃত্যুপথযাত্রীকে কর্তব্যভ্রষ্ট করিয়া আসিয়াছে। এই ভাব মৃত্যুকালে উপস্থিত হইয়া মানুষকে মায়া-মমতা শূন্য করিয়া কর্তব্যকে উচ্চতর স্থান দিয়া থাকে।

১০৫। **"যাঁহারা প্রেম বা ভক্তির উচ্ছ্বাসে কার্য করেন—তাঁহাদের কার্য প্রাণপণে নির্বাহিত হয়, কিন্তু সেই উচ্ছ্বসিত অনুষ্ঠানগুলি মধ্যে মধ্যে ভ্রমাত্মক হইয়া পড়িবার আশঙ্কা থাকে।"** (হনুমান, পৃঃ ১৪৫)

দোষ-ত্রুটিহীন কল্যাণকর কর্ম করিবার প্রধান উপায় হইতেছে—কর্মকে প্রতিপদে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া তাহার ত্রুটি সংশোধন করা। এরূপ না করিতে পারিলে কর্ম ফলপ্রসূ হয় না। কর্ম সম্পাদন করিতে গেলে তাহার উপর প্রেম বা ভক্তি থাকা দরকার। যেখানে কাজের প্রতি কোন প্রেম বা ভক্তি নাই—সেখানে লোকে কোন প্রকারেই কাজটি সুসম্পন্ন করিতে পারে না। উৎসাহ বা ভক্তির উচ্ছ্বাস দ্রুত কাজ সম্পন্ন করা বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করে—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যেখানে উৎসাহের অভাব সেখানে কাজে কেহ অগ্রসর হয় না। নিরুৎসাহ লোকদ্বারা কাজ করান আর না করান একই কথা। কিন্তু অতিরিক্ত উৎসাহ বা উচ্ছ্বাস কার্যসম্পাদন বিষয়ে উপকারী হইলেও ইহার মধ্যে গুরুতর ত্রুটি রহিয়াছে। ভক্তির উচ্ছ্বাস ভাবপ্রবণতার নামান্তর; ভাবপ্রবণতা যেখানে মাত্রা অতিক্রম করে সেখানে

বিচারবুদ্ধি মোটেই থাকে না। বিচারবুদ্ধিহীন কার্য নানা বিপদ ডাকিয়া আনে। কর্মকারীর উদ্দেশ্য ভাল থাকিলে কি হয়, তাহার বিবেকান্ধতা তাহাকে ভুল পথে চালিত করে। ভক্তি দুই প্রকার—সাত্ত্বিক ও তামসিক। সাত্ত্বিক ভক্তিতে ভক্তির সহিত বিচারবুদ্ধি যুক্ত থাকিবে। ইহাতে ভক্তি বা ভাবপ্রবণতাকে বিবেক দিয়া যাচাই করিয়া লইতে হইবে। বিচারবুদ্ধি যেখানে কাজ করে না সেখানে অন্ধভক্তি বিপদ ডাকিয়া আনে। সুতরাং কোন কার্য সুসম্পন্ন করিতে হইলে বিচারবুদ্ধি ও ভাবপ্রবণতা বা ভক্তির সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে। ভক্তির উচ্ছ্বাসে মানুষ অনেকক্ষেত্রে কর্তব্য করিতে ভুলিয়া যায়। কর্তব্য সুসম্পন্ন করাই বড়, ভক্তির উচ্ছ্বাস বড় নহে। ভক্তিও ভাল তবে তাহার মাত্রাধিক্য হইতে দূরে থাকিতে হইবে।

১০৬। (সীতা) **'তুমি আমাদের আদর্শ নহ, তুমি আমাদের প্রাপ্ত,—তুমি কবির সৃষ্টি নহ—তুমি ভগবানের দান। আমাদিগের নানা দুঃখ ও বিড়ম্বনার মধ্যে তোমারই প্রতিচ্ছায়া ভাসিয়া বেড়ায় ও তাহাতেই সমস্ত দৈন্য ঘুচিয়া আমাদের স্বল্পখাদ্য ও ছিন্ন কন্থার নিদ্রা পরম পরিতৃপ্তিকর হইয়া উঠে।'** (পৃঃ ১২৭)

সীতা কাব্যের প্রতিমূর্তি। তিনি দুঃখে ও সংকটে, ত্যাগে এবং পবিত্রতায় চিরউজ্জ্বল—ভারতে গার্হস্থ্যজীবনে চিরজীবন্ত। এই চিরজীবন্ত মূর্তি কবির মানসী সৃষ্টি নহে—এই কল্যাণীমূর্তি বিধাতার দান। কবি কল্পনাবলে যাহা সৃষ্টি করেন তাহা দোষযুক্ত হইতে পারে কেননা কবির সৃষ্টি আর ঈশ্বরের সৃষ্টি এক নহে। কবি যাহা সৃষ্টি করেন বাস্তব জগতে হয়তো অনেক সময়ে তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। কবিরা অতীন্দ্রিয়লোকে বিচরণ করেন সুতরাং অনেক সময়ে তাঁহাদের কল্পনা বাস্তব জগৎ হইতে অনেক দূরে থাকে। সাধারণ মানুষ কোনক্রমেই কবির কল্পলোকের অধিবাসী হইতে পারে না। বিধাতার দান জল মাটি আকাশ বাতাস ফুল ফল সর্বমানবের কাজে লাগে—কেননা ইহারা কৃত্রিম নহে—ইহারা মানবের নিত্যকার জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। অতি স্বাভাবিকভাবে মনুষ্যসাধারণ ইহাদিগকে গ্রহণ করিয়া থাকে। যদি কোন মানুষ ইহাদিগকে সৃষ্টি করিত তবে ইহারা মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইতে পারিত না। মানুষের কৃত্রিমহস্ত যাহা সৃষ্টি করে তাহা মানবের জীবনের সহিত মিশিতে পারে না—কোথায় যেন একটা ফাঁক থাকিয়া যায়।

বহু অতীত যুগ হইতে ভারত সীতাকে আপনার করিয়া লইয়াছে। সীতা যদি কবির কল্পনার বস্তু হইতেন তবে আজ পর্যন্ত ভারতের গৃহে গৃহে তিনি প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিতেন না। ভগবানের দান ফুল ফল আকাশ বাতাস জলের মতো ভারতের গৃহের তিনি অপরিহার্য অঙ্গ। সীতার সতীত্বের আদর্শ আজও ভারতের গৃহে গৃহে বিরাজ করিতেছে। সীতা লোকান্তরিত হইলেও ভারতের কুললক্ষ্মীদের মধ্যে আজও তিনি জীবন্ত। তাঁহাকে না হইলে যেন সংসার অচল। সীতা সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতের কুললক্ষ্মীদের মধ্যে নিজেকে জীবন্ত রাখিয়াছেন। সীতার ত্যাগ সীতার সহিষ্ণুতা আজও ভারতের কুললক্ষ্মীগণ ভুলেন নাই। ভারতের সামাজিক, আর্থিক বিড়ম্বনার মধ্যে একমাত্র শান্তির স্থল সীতার চরিত্র। ভারতবাসী দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করিয়াও যে শান্তিটুকু পায় তাহা সীতার জন্য। সীতা দুঃখ-দারিদ্র্যের নিকট কখনও নতি স্বীকার করেন নাই। তাই অগণিত কষ্ট ও বিড়ম্বনার মধ্যে সীতার মূর্তি ভারতবাসীকে অপ্রাচুর্যের মধ্যেও শান্তি প্রদান করিয়া থাকে।

১০৭। "গীতায় যে নিষ্কাম কর্মের আদর্শ সংস্থাপিত হইয়াছে হনুমান্ তাহারই জীবন্ত উদাহরণ।" (পৃঃ ১৪৪)

রামায়ণের হনুমানের চরিত্রে পরস্পরবিরোধী গুণের অতি আশ্চর্য সমন্বয় রহিয়াছে।

তেজের সহিত ধৈর্যের মিশ্রণ, নীতির সহিত সরলতার সংযোগ, সামর্থ্যের সহিত বিনয়ের মিলন, যশ এবং পৌরুষের সহিত তীক্ষ্ণবুদ্ধির সংশ্লেষ হনুমানকে আদর্শ কর্মবীর করিবার সহায়ক হইয়াছে। কর্মে মানুষের অধিকার আছে কিন্তু উহার ফলের প্রতি নিঃস্পৃহ হইয়া কাজ করিতে হইবে। সেবক কর্মফলকে সেব্যের উদ্দেশ্যে অর্পণ করিবে। সেব্য বা প্রভুর প্রীতি হইলেই সেবক কৃতার্থ হইবে— ইহার বেশি সেবক কিছু চাহিবে না। ইহাই গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মযোগ। এই নিষ্কাম কর্মযোগসাধনের জন্য যে সকল গুণের অধিকারী হওয়া দরকার হনুমানের তাহা ছিল। হনুমান্ সর্বত্রই উন্নত কর্তব্যবুদ্ধির প্রেরণায় রামচন্দ্রের জন্য সকল প্রকার বিপদসংকুল কাজে নামিয়াছেন। রামচন্দ্রকে যে সকল সেবা তিনি করিয়াছেন —ইহার মধ্যে নিজের লাভালাভ জয়পরাজয়ের হিসাব তিনি করেন নাই—তিনি কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য করিয়াছেন। তাঁহার সেবা সম্পূর্ণ অহেতুক। প্রভুর প্রতি তাঁহার কাজে ভক্তি আছে কিন্তু ভক্তির উচ্ছ্বাস নাই—তিনি সর্বক্ষেত্রে কর্তব্যের সহিত নিজের তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি আত্মান্বেষী সন্ন্যাসীর মতো কর্তব্যের পথে চলিয়াছেন। তিনি সর্বত্র কর্মসম্পাদনে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন।

১০৮। **"যৌথপরিবারে স্নেহের অনুশীলন সর্বাপেক্ষা বেশি, কিন্তু ক্রমে ক্রমে উহাতে হৃদয় এমন কোমল হইয়া পড়ে, এমন অসঙ্গত দুশ্চিন্তা ও সাবধানতা উৎপন্ন হয় যে মহৎ উদ্দেশ্যগুলি পদে পদে বাধা পায়।"** (রামায়ণী কথা, পৃঃ ১৫৮)

যৌথপরিবারে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক বাস করিলেও তাহারা একত্রবাসে অভ্যস্ত হইয়া সকলেই সকলের প্রতি স্নেহসম্পন্ন হয়। সকলের ভালমন্দের জন্য সকলেই অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়ে। স্নেহের অনুশীলন ভাল কিন্তু ইহার একটা ত্রুটি-পূর্ণ দিকও আছে। ইহা বিচার করা উচিত। সংসারে বড় হইতে হইলে লোককে স্বাবলম্বী হইতে হয়। স্বাবলম্বন ছাড়া কাহারও অন্তর্নিহিত সদ্বৃত্তি পরিচালনার সুবিধা থাকে না। যে যৌথপরিবারের ছেলেরা এক ছাঁচে গঠিত হয় তাহারা স্বাধীন-ভাবে জীবনপথে অগ্রসর হইতে পারে না। পিতা মাতা খুড়ি পিসি যে ছেলের অভাব-অভিযোগ দ্রুত মিটাইয়া থাকেন, বাড়ি হইতে বাহির হইলে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়েন তাহার নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইবার শক্তি লোপ পায়। আত্মীয়গণের অতি-স্নেহের প্রয়োগে শক্তিমান ছেলেকও পঙ্গু হইয়া পড়ে। বড় হইলেও ইহারা আত্মীয়-স্বজনের বিধিনিষেধ অতিক্রম করিতে না পারিয়া অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। যৌথপরিবারের বহু গুণের মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি।

১০৯। **"যৌথ পারিবারিক জীবন শান্তি লক্ষ্য করে এবং ইহা বিরুদ্ধ উপাদান-বিশিষ্ট চরিত্রগুলিকে পিটিয়া পিটিয়া এক ছাঁচে পরিণত করিতে চেষ্টা পায়।"** (পৃঃ ১৫৫)

পিতা মাতা ভাই ভগ্নী পিতামহ পিতামহী পিতৃব্য পিতৃব্যপত্নী পিতৃস্বসা— পরিবারের নিকট আত্মীয় দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়পরিজন লইয়া যৌথপরিবার গঠিত ছিল। এই পরিবারের প্রত্যেকটি লোকের মনোগতি স্বভাবতঃ এক হইবে—এরূপ কেহ আশা করিতে পারে না, কেননা নানা বিরুদ্ধ উপাদান লইয়া ইহার গঠন।

পরিবারের প্রত্যেকটি ব্যক্তির চালচলন স্বতন্ত্র হইলে সকলের একত্র বাস করা অশান্তিকর। সংসারে সুখশান্তি সকলেরই কাম্য। এরূপ অবস্থায় বিরুদ্ধভাবাপন্ন চরিত্রগুলিকে একভাবে গঠন করা দরকার। তাই যৌথপরিবারের ব্যবস্থা, এই পরিবারে সকলেই সকলের জন্য ভাবিবে এবং ত্যাগস্বীকার করিবে। ধনী নির্ধন সকলেরই এই পরিবারে সমান অধিকার। এখানকার খাওয়া-দাওয়া পোশাক-পরিচ্ছদ পরিবারের সামর্থ্যানুযায়ী অনুরূপ হইবে। একজন বিলাসিতায় রত থাকিবে, পরিবারের দ্বিতীয় ব্যক্তির অন্নবস্ত্র জুটিবে না—এরূপ অবস্থা হইবার সম্ভাবনা যৌথপরিবারে নাই। ইহার ফলে সকলেই সংযম অভ্যাস করিবে। অসুখ-বিসুখ হইলে সকলেই সকলের সেবা-শুশ্রূষা করিবে। পরিবারে সুখদুঃখ সকলে ভাগ করিয়া ভোগ করিবে। পরিবার একইভাবে চলিলে শান্তি ও শৃঙ্খলা দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হইবে। শান্তি যেখানে সকলের কাম্য সেখানে সকলেরই ত্যাগ এবং সংযম অভ্যাস করিতে হইবে। তাই যৌথপরিবারে বিরুদ্ধভাবাপন্ন চরিত্রগুলি একভাবে গঠিত হয়। পারিবারিক অশান্তির মূল হইতেছে উহার উপাদানের বিরুদ্ধপ্রকৃতি। ত্যাগ ও সংযমের অভ্যাসে এই বিরুদ্ধভাব দূর হইবে এবং পরিবারে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

১১০। **"যৌথ-পরিবারের শিক্ষানীতি ও শৃঙ্খলার দিকে। এই শিক্ষা ব্যক্তিগত সুখ ও বিলাসচেষ্টার প্রতিকূলে এবং উহা পরার্থ ত্যাগস্বীকারের প্রবর্তক।"** (পৃঃ ১৫৫)

যৌথপরিবার-প্রথা ছিল ভারতের পারিবারিক শিক্ষালয়। এই পরিবার পিতা মাতা খুড়া জেঠা, পিসি মাসি ভাই ভগিনী এবং অনেক নিকট ও দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় লইয়া গঠিত ছিল। বলা বাহুল্য এই সকল উপাদান বিভিন্ন প্রকৃতির। এই উপাদানগুলিকে গড়িয়া পিটিয়া একরকমের করা হয়। যৌথপরিবারের কেহ ধনীও নহে দরিদ্রও নহে। সকলের মিলিত আয়দ্বারা পরিবারের ব্যয় নির্বাহ হয়। ইহার মধ্যে সকলেই যে উপার্জনশীল হইবে এরূপ নহে। সুতরাং সকলের আহার-বিহার একই প্রকার হইবে—একজন বেশি আয় করিয়া বিলাসী হইবে—দ্বিতীয় ব্যক্তি বিনা আয়ে কষ্ট পাইবে—এরূপ এখানে চলিবার উপায় নাই; সুখ দুঃখ সকলে একসঙ্গে ভাগ করিয়া লইবে। সকলেই সকলের জন্য ভাবিবে এবং ত্যাগস্বীকার করিবে। ইহাতে ব্যক্তিগত সুখ বা বিলাসের স্থান নাই। যদি পরিবারের বিলাসিতা করিবার ক্ষমতা থাকে—সকলেই বিলাসী হইবে। একজনের রোগ হইলে তাহাকে সেবা করার দায়িত্ব সকলের। পরিবারের সকলের স্বার্থ এক, কাহারও কোন ব্যাপারে ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকিবে না। এইরূপ অবস্থায় গৃহে বিলাসিতা বর্জন এবং ত্যাগের শিক্ষা স্বাভাবিকভাবে আয়ত্ত হইয়া থাকে।

১১১। **"নানারূপ অকর্মণ্য উপদেশের হিড়িকে শিশুগুলি নিশ্চেষ্ট বুদ্ধমূর্তির মতো হইয়া যায়।"** (রামায়ণ ও সমাজ, পৃঃ ১৫৬)

যৌথপরিবারের প্রধান দোষ হইতেছে ইহাতে নিজের পায়ে নিজে কোন লোক দাঁড়াইতে পারে না। এখানে শিশুকাল হইতেই ছেলেরা ভীরু কাপুরুষ ও নিশ্চেষ্ট হইতে আরম্ভ করে। যে ছেলের জন্য সর্বক্ষণ মা পিসি খুড়ি খুড়া জেঠারা ভাবিতে আরম্ভ করেন এবং তাহার চলার পথে নানারূপ বিধিনিষেধ আরোপ করেন, সে কখনও তাহার স্বাভাবিক প্রবণতাকে বিকাশের পথে চালিত করিতে পারে না। ফলে এইরূপে বর্ধিত শিশুরা অল্প বয়স হইতে নিশ্চেষ্ট হইতে থাকে। তাহাদের নিজের জন্য নিজের ভাবিবার দরকার নাই—গুরুজনেরা যাহা বলিবেন তাহাদিগকে সেইপথে

চলিতে হইবে। যাহারা বড় হয় তাহারা সর্বদেশে সর্বকালে নিজের চেষ্টায় বড় হয়। যাহার কখনও দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে হয় নাই—যাহার দুঃখকষ্টগুলি আত্মীয়-স্বজনেরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইয়াছে সে সংসারে নিজের পথ নিজে করিয়া লইতে পারে না। যৌথপরিবার-প্রথা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিয়া মানুষকে জড়পদার্থে পরিণত করে।

১১২। **"পতনোন্মুখ পর্ণশালাকে যেমন নানারূপ কৃত্রিম অবলম্বনদ্বারা সমুন্নত রাখিতে হয়, আমাদের স্বার্থশিথিল আশঙ্কাজীর্ণ স্নেহের গৃহকে সেইরূপ নানারূপ শাস্ত্রবচনের অবলম্বনদ্বারা কোনরূপে রক্ষা করিতে হইতেছে—কিন্তু গৃহটি বাসের পক্ষে একান্ত অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে।"** (রামায়ণ ও সমাজ, পৃঃ ১৬০)

রামায়ণের যুগে যৌথপরিবারের ভিত্তি অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। পিতৃভক্তি ভ্রাতৃপ্রেম সে যুগে ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। পরিবারস্থ সকলেই সকলের জন্য ত্যাগস্বীকার করায় স্নেহ প্রেম প্রীতি প্রভৃতি সদ্‌গুণের স্বাভাবিক বন্ধনে গৃহ ছিল শান্তির নিলয়। কিন্তু পরবর্তী যুগ হইতেই গৃহের এই দৃঢ়বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এখন কেহ কাহারও জন্য ভাবে না—কাহারও জন্য কেহ ত্যাগ-স্বীকার করিতে চাহে না। আগে গৃহের আচরণ যাহা স্বাভাবিক ধর্মবুদ্ধি ছিল পরে তাহা হইয়াছে নিতান্ত অস্বাভাবিক। শান্তির স্থানের পরিবর্তে গৃহ-অশান্তির আবাসস্থলে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ অশান্তিপূর্ণ গৃহকে শান্তির নিলয়ে পরিণত করা অথবা ইহাকে ধ্বংস হইতে রক্ষার জন্য পরবর্তী যুগে শাস্ত্রের অনুশাসন প্রয়োগ করা হইয়াছে। পূর্বে গৃহের শান্তি আর প্রীতি রক্ষা যেখানে মানুষের স্বভাবের মধ্যে নিহিত ছিল সেখানে কোন শাস্ত্রের অনুশাসন দরকার হইত না। কেবল শাস্ত্রের অনুশাসন বিরুদ্ধস্বভাবের লোকের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে পারে না। মানুষ যেখানে তাহার স্বাভাবিক প্রেরণায় কাজ করে সেখানে শাস্ত্রের অনুশাসন থাকিলে উহা অধিকতর বলশালী হয়।

কিন্তু যেখানে স্বাভাবিক প্রেরণা নাই সেখানে শাস্ত্রের অনুশাসন কোন কাজ করিতে পারে না। যে যৌথপরিবার ধ্বংসোন্মুখ তাহা রামায়ণের যুগের পরে সহস্র শাস্ত্রবচনদ্বারা পতন হইতে রক্ষা পায় নাই কারণ পরিবারস্থ সকলেই বা অনেকে স্ব স্ব স্বার্থচিন্তায় মগ্ন। এরূপ অবস্থায় গৃহের বন্ধন স্বভাবতই শিথিল হইয়া পড়িয়াছে; এখানে শাস্ত্রের উদার বচন স্বভাবের বিরুদ্ধ কার্যকর হয় নাই।

১১৩। **"যেরূপ সমুদ্রে পতিত দৈববশে মিলিত কাষ্ঠদ্বয় পুনরায় স্রোতোবেগে ব্যবধান হইয়া পড়ে, সেইরূপ স্ত্রী-পুত্র ও জ্ঞাতিদের সহিত মিলন দৈবাধীন, কখন চিরবিরহ উপস্থিত হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই।"** (রামায়ণী কথা, পৃঃ ৪১)।

স্ত্রী-পুত্র জ্ঞাতিদের সহিত মিলন বা বিচ্ছেদ দৈবাধীন—ইহাতে মানুষের কোন হাত নাই। ইহজন্মেই হউক বা পরজন্মেই হউক কে কাহার সহিত আত্মীয়রূপে মিলিবে বা চিরকালের জন্য একে অপর হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। মানুষ অবস্থার দাস। অবস্থা অনুকূল হইলে স্বামী-স্ত্রী একত্র থাকিতে পারে এবং একত্র থাকিবার আশাও রাখে। কিন্তু সময় সময় এমন অবস্থাও হয় যাহাতে নিতান্ত আত্মীয়কে দূরে থাকিতে হয়। জীবনে কাহার সহিত কাহার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয় না।

ইহার উপর মৃত্যুর জন্য প্রিয়জনের সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ উপস্থিত হইতে পারে। মৃত্যু কখন কাহাকে টানিয়া লইবে কেহ বলিতে পারে না—প্রিয়জন দূর দেশে

থাকিলেও তাহার শুধু সংবাদ জানিলেও বিচ্ছেদব্যথার কতকটা উপশম হইতে পারে. কিন্তু মৃত্যুজনিত বিচ্ছেদ দুঃখ মানুষকে চিরকাল তাপিত করে। মৃত্যু, রাষ্ট্রবিপ্লব, অন্য পারিবারিক ব্যাপারে, দেশবিভাগে বা অন্যপ্রকার বিপদে কে কখন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে তাহার ঠিক নাই। তাই মৃত্যু ও বিচ্ছেদে কাহারও জন্য শোক করিতে নাই।

১১৪। **"যেখানে মনুষ্যবসতি নাই, সেখানকার প্রতি ফুল ও পল্লবে যেন বনলক্ষ্মীর কোমল মুখশ্রীর আভা পড়িয়া মায়ের মত স্নিগ্ধ অভিনন্দনে ব্যথিতের ব্যথা ভুলাইয়া দেয়।"** (রামায়ণী কথা পৃঃ ২৬)

মানুষ অরণ্য কাটিয়া গ্রাম এবং নগর পত্তন করিয়াছে—তাহার হস্তস্পর্শের পূর্বে অরণ্যপ্রকৃতি ফুলে ফলে ছায়ায় মানুষকে নিতান্ত আপনজনের মতো প্রতিপালন করিয়াছে।

গ্রামে ও নগরে অরণ্যের বৃক্ষলতাকে সেই মানুষ যখন কৃত্রিমভাবে স্থানচ্যুত করিয়া রোপণ ও উৎপাদন করিতে লাগিল তখন বৃক্ষ লতা ফুলের স্বাভাবিক শোভা চলিয়া গেল। তাই মনুষ্যবসতি যেখানে নাই সেখানে আদিম অরণ্যপ্রকৃতির কোমলতা ও স্নিগ্ধতা দেখা যায়। প্রতিবেশী বা তথাকথিত আত্মীয়স্বজনের অত্যাচারে যখন গ্রামে বা নগরে মানুষের বাস করিবার উপায় থাকে না তখন লোকে নির্জন প্রকৃতির মধ্যে বাস করিবার জন্য বনে যাইতে বাধ্য হয়। বনে গেলে সে অন্য সকলের স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইলেও অরণ্যপ্রকৃতি তাহার উপর স্নেহ বর্ষণ করিতে কার্পণ্য দেখায় না। বনের প্রতিটি ফুলে আর বৃক্ষের পল্লবের কোমলতায় যে স্বাভাবিক শ্রী ফুটিয়া উঠে তাহাতে মনে হয় বনলক্ষ্মীর মুখশ্রী মায়ের মুখের শোভা লইয়া ক্লান্ত পুত্রকে তাহার ব্যথা দূর করিবার জন্য প্রস্তুত আছে। গ্রামে নগরে মানুষের বিরূপতা মানুষকে ব্যথিত করিলেও বনলক্ষ্মীর মাতৃস্নেহ হইতে কেহই বঞ্চিত হয় না। লক্ষ্মীমায়ের দরজা সকলের জন্য খোলা আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সারসংক্ষেপ (Pre'cis)

কোন প্রবন্ধ বা অনুচ্ছেদের সারসংক্ষেপ বা সারমর্ম রচনা (সারসংকলন) করা ভাব সম্প্রসারণ করা অপেক্ষা সহজ। ইহাতে নির্বাচিত প্রবন্ধের অতি প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি সন্নিবেশিত করিতে হইবে—অনাবশ্যক কথা বাদ দিতে হইবে। আলংকারিক ভাষা সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয় যথাসম্ভব সরল ভাষায় তথ্যগুলি সুশৃঙ্খলভাবে লেখা দরকার। সারসংক্ষেপ রচনা প্রস্তুত করিবার সময় সাধারণতঃ মূল প্রবন্ধের শব্দ-সংখ্যার একতৃতীয়াংশ শব্দসংখ্যায় লেখক তাঁহার লেখাকে সীমিত করিলে ভাল হয়। অবশ্য পরীক্ষাগৃহে বিদ্যার্থীকে নির্ভর করিতে হইবে প্রশ্নপত্রের নির্দেশের উপর। সেখানে নির্দিষ্ট সংখ্যার অতিরিক্ত শব্দ দিয়া উত্তর লিখিলে লেখক ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।

সারসংক্ষেপ রচনার কতকগুলি নমুনা এই অধ্যায়ে দেখান হইল।

কুরুপাণ্ডব

১। বিদুর ... স্থাপন করিল। (পৃঃ ১১)

সারসংক্ষেপঃ—একটি সমতল স্থান রঙ্গভূমির জন্য নির্দিষ্ট হইল। উহার চারিদিকে প্রেক্ষাগৃহ ও মঞ্চ স্থাপন এবং তাঁবু খাটান হইল। ভীষ্ম, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ... কুরুপরিবারের মহিলাগণ যথানির্দিষ্ট প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করিলেন। নানা বর্ণের বহু লোক সেখানে আসিল। অস্ত্র পরীক্ষা আরম্ভ হইবার পূর্বক্ষণে বাদ্য বাজিয়া উঠিল। আচার্য দ্রোণ রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিয়া পুরোহিতদ্বারা মাঙ্গলিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করাইলেন। মঙ্গলাচরণের পর যথাস্থানে অস্ত্রশস্ত্র সংরক্ষিত হইল।

২। দুই পুত্রের... নাই। (পৃঃ ১৪)

সারসংক্ষেপঃ—অর্জুন ও কর্ণের মধ্যে দারুণ যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখিয়া মাতা কুন্তী মনের আবেগে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তখন কৃপাচার্য ব্যাপার বুঝিয়া অজ্ঞাতকুলশীল কর্ণের কুল পরিচয় চাহিলেন কারণ অর্জুন কেবল রাজপুত্রের সহিতই যুদ্ধ করিতে পারেন। দুর্যোধন কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে অসম্মান হইতে বাঁচাইলেন। তখন উভয়ের মধ্যে চিরসখ্য স্থাপিত হইল।

৩। শুভ মুহূর্তের ... করিলেন। (পৃঃ ২৩-২৪)

সারসংক্ষেপঃ—দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভা। রাজকুমারী বসনভূষণে সজ্জিতা হইয়া মালাহস্তে রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন সমবেত রাজগণকে ছিদ্রপথে লক্ষ্যভেদের আমন্ত্রণ জানাইলেন। দ্রৌপদীকে দেখিয়া সমবেত রাজগণ মোহিত হইলেন এবং সকলেই তাঁহাকে লাভ করিবার ইচ্ছায় পরস্পরকে জয় করিবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণ ও বলরাম ছদ্মবেশী পাণ্ডবদিগকে চিনিতে পারিয়া তাঁহাদের জীবিত থাকা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলেন। রাজারা শক্তি প্রদর্শন আরম্ভ করিলেন, কিন্তু লক্ষ্য ভেদ করা দূরে থাকুক, ধনুকে জ্যা আরোপণ করিতে না পারিয়া বসিয়া পড়িলেন।

৪। একদা... হইলেন। (পৃঃ ৩১-৩২)

সারসংক্ষেপ—দুর্যোধন ময়দানব নির্মিত যুধিষ্ঠিরের অপূর্ব সভা দেখিতে গেলেন, কিন্তু সেখানকার অত্যাশ্চর্য শোভাসম্পৎ দেখিয়া তাঁহার দৃষ্টিভ্রম হইল এবং নিজের কাজ দ্বারা তিনি পদে পদে অপরের হাস্যাস্পদ হইতে লাগিলেন।

৫। পাণ্ডবগণের.........করিয়াছেন। (পৃঃ ৩১-৩২)

সারসংক্ষেপ ঃ—অজ্ঞাতবাসের জন্য নির্ধারিত বৎসর উপস্থিত হইলে, পাণ্ডবগণের খোঁজ লইবার জন্য দুর্যোধন গুপ্তচর নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু পাণ্ডবেরা কোথায় আছেন কেহই সন্ধান দিতে পারিল না। কর্ণের মতে পাণ্ডবগণকে যাহারা জানে এইরূপ গুপ্তচর পাঠাইলে ভাল হয়। দুঃশাসন ইহা সমর্থন করিলেন। যে পর্যন্ত তাঁহাদের খোঁজ না পাওয়া যায়, ততদিন অনুসন্ধান চালাইতে হইবে।

৬। রাজাজ্ঞা.........উচিত। (পৃঃ ৫৩)

সারসংক্ষেপ ঃ—সন্ধ্যার প্রাক্কালে পাণ্ডবগণ বিরাটরাজের সহিত ত্রিগর্তদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। সূর্যাস্তের পর গাঢ় অন্ধকারে যুদ্ধ বন্ধ রহিল। তারপর চন্দ্র উঠিলে জ্যোৎস্নালোকে আবার গোধন অপহরণকারী ত্রিগর্তদিগের সহিত যুদ্ধ চলিতে থাকিল। ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা বিরাটরাজকে কৌশলে নিজের রথে উঠাইয়া তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করিলেন। এই সময়ে যুধিষ্ঠির ভীমকে সুশর্মার হাত হইতে বিরাটরাজকে উদ্ধার করিবার আদেশ দিলেন, কারণ বিরাটরাজ ঘোর বিপদের সময় তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

৭। এদিকে ......হইবেন। (পৃঃ ৫৭-৫৮)

সারসংক্ষেপ ঃ—রাজকুমার উত্তরের ধনুক এবং শর অসার জানিয়া অর্জুন তাঁহাকে শমীবৃক্ষ হইতে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আসিতে বলিলেন। অস্ত্র লইয়া আসিলে তিনি কুমারকে পাণ্ডবগণের প্রকৃত পরিচয় দিলেন। কৌরব সৈন্যমধ্যে, উত্তর নির্ভয়ে অশ্বচালনা করিতে পারেন বলিয়া অর্জুন তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন। অর্জুন স্ত্রীবেশ ত্যাগ করিয়া অন্য বেশ ধারণ করিলেন। তাঁহার গাণ্ডীবের টংকার শুনিয়া আচার্য দ্রোণ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন।

৮। যদুবংশাবতংস.. করিব না। (পৃঃ ৭৩-৭৪)

সারসংক্ষেপ ঃ—শ্রীকৃষ্ণ সভায় প্রবেশ করিবামাত্র কুরুবৃদ্ধগণ কর্তৃক অভিনন্দিত হইলেন। তিনিও সকলকে প্রত্যভিনন্দিত করিলেন। ইহার পর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পাণ্ডবদিগের সহিত কৌরবগণের সন্ধির প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। সন্ধির সর্ত পাণ্ডবগণকে অর্ধরাজ্য প্রদান। ধৃতরাষ্ট্র শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন, কিন্তু অবাধ্য পুত্র দুর্যোধনের উপর তাঁহার কোন প্রভুত্ব নাই জানাইলেন। এই ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনকে সম্মত করাইতে পারিলেই কার্য সিদ্ধ হয়। বাসুদেব যুক্তি দিয়া দুর্যোধনকে এই প্রস্তাব যে গ্রহণীয় তাহা বুঝাইলেন। ভীষ্মও শ্রীকৃষ্ণকে সমর্থন করিলেন। দুর্যোধন ইহাতে ক্রুদ্ধ হইলে, বিদুর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার শোচনীয় পরিণাম বুঝাইয়া দিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র এই প্রস্তাবের ইষ্টানিষ্ট দুর্যোধনকে আবার বুঝাইলেন। কিন্তু তাঁহার মতের কোনই পরিবর্তন হইল না। তিনি বিনা যুদ্ধে সূচাগ্র ভূমিও পাণ্ডবদিগকে ছাড়িয়া দিতে অস্বীকৃত হইলেন।

৯। কর্ণ........করুক। (পৃঃ ৭৭)

সারসংক্ষেপ ঃ—কর্ণের জন্মের পর মাতা কুন্তী তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। সূতজাতীয় অধিরথ ও তৎপত্নী রাধা কর্ণকে লালনপালন করেন, এবং সকলেই জানে তিনি সূতপুত্র। কর্ণের পত্নী আত্মীয়স্বজন, সকলেই সূত জাতীয়। ইঁহাদিগের উপকার ভুলিয়া কুন্তীপুত্রের পরিচয় দিয়া যুধিষ্ঠিরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা হিসাবে তিনি অর্ধেক রাজ্য গ্রহণ করিতে পারেন না। আর রাজ্য গ্রহণ করিলেও উহা তাঁহার মিত্র

দুর্যোধনের হইবে। সুতরাং কোন দিক দিয়াই তিনি পাণ্ডবদের সহিত যোগ দিতে পারিবেন না।

১০। অনন্তর.........সহ্য। (পৃঃ ১০৬)

সারসংক্ষেপ ঃ—একাদশ দিবসে দ্রোণ কৌরবগণকে লইয়া যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। তাঁহার দক্ষিণে, জয়দ্রথ প্রভৃতিরা বাম পার্শ্বে কৃপ, কৃতবর্মা, দুঃশাসন এবং আরো অনেকে রক্ষা কার্যে নিযুক্ত থাকিলেন। সর্বাগ্রে কর্ণ অগ্রসর হইলেন। ভীষ্মের অভাব কেহ বুঝিলেন না। যুধিষ্ঠিরও তাঁহার সৈন্য সমাবেশ করিলেন, ব্যূহমুখে রহিলেন কর্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী অর্জুন। আচার্য দ্রোণ ভীষণভাবে পাণ্ডব সৈন্য বধ করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির দ্রোণকে বাধা দিলেন। তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। শকুনি সহদেবকে আক্রমণ করিলেন, আর অন্যদিকে দ্রোণ সসৈন্যে দ্রুপদরাজার উপর পতিত হইলেন। ভীমসেনের সহিত যুদ্ধে কৌরবপক্ষীয়দের মধ্যে এক শল্য ছাড়া সকলেই পরাজিত হইলেন।

১১। মহাবীর কর্ণ. . করো। (পৃঃ ১২৭-২৮)

সারসংক্ষেপ ঃ—মধ্যরাত্রে কর্ণ কৌরবপক্ষীয় সৈন্যমধ্যে আর্তনাদ শুনিতে পাইয়া, অর্জুনবধের নিমিত্ত রক্ষিত ইন্দ্রাস্ত্র লইয়া বহির্গত হইলেন। কিন্তু সেই অস্ত্র অর্জুনকে না মারিয়া ভীমপুত্র ঘটোৎকচকে বধ করিয়া ইন্দ্রলোকে চলিয়া গেল। ইহাতে রাক্ষসের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া কৌরবগণ হর্ষধ্বনি করিল। কিন্তু পাণ্ডবগণ ভীমের পুত্রের শোকে কাতর। এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে তাঁহাদিগের মনে কষ্ট দিয়া হর্ষ প্রকাশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই অদ্ভুত আচরণে সকলেই বিস্মিত হইলেন। তখন তিনি অর্জুনকে ব্যাপারটি বুঝাইয়া দিলেন। কর্ণকর্তৃক রক্ষিত ইন্দ্রাস্ত্র অর্জুনের গায়ে লাগিলে আর রক্ষা ছিল না। ঘটোৎকচের উপর দিয়া উহা কাজ করায় ভাল হইয়াছে। কর্ণের হাতে উহা নাই। তিনি এখন পরাজিত হইয়াছেন মনে করা যাইতে পারে। যতদিন পর্যন্ত এইরূপ পর্ব প্রতি. .ব না হয় ততদিন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের জন্য ব্যস্ত ছিলেন। এখন তিনি নিশ্চিন্ত।

১২। "ক্রমে এক ফলমূলজলহীন একাকী সতর্কভাবে জাগরণ করি।" (পৃঃ ১৯-২০, প্রায় ২০০ শব্দ)

সারসংক্ষেপ ঃ—সন্ধ্যার অন্ধকারপূর্ণ ভীষণ অরণ্যে পাণ্ডবেরা ক্ষুধার পীড়ায় এবং নিদ্রার আবেগে কাতর হইয়া পথ চলিতে প্রায় অসমর্থ হইলেন। জননীর পিপাসার জল সংগ্রহ করিয়া ভীম ফিরিয়া আসিয়া দেখেন সকলেই নিদ্রিত। তাঁহাদের বিশ্রামের ব্যাঘাত করা যুক্তিযুক্ত নহে বিবেচনা করিয়া ভীম একাকী সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া তাঁহাদিগকে সতর্কতার সহিত রক্ষা করিতে লাগিলেন। (৪৯ শব্দ)

১২(ক)।"পাণ্ডবগণ কেবলমাত্র আর তাহার নিকট গমন করিত না।" (পৃঃ ৪৭, প্রায় ২৫০ শব্দ)

সারসংক্ষেপ ঃ—পাণ্ডবগণ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া চলিতে চলিতে ক্রমে মৎস্যদেশে উপস্থিত হইলেন। দ্রৌপদী পরিশ্রান্ত হইলে অর্জুন তাঁহাকে বহন করিয়া মৎস্যরাজধানীর নিকট পৌঁছাইয়া দিলেন। ছদ্মবেশে নগরপ্রবেশের পরামর্শ স্থির হওয়ায় পাণ্ডুপুত্রগণ নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্র উচ্চ পর্বতশৃঙ্গে শ্মশানের নিকটবর্তী এক শমীবৃক্ষশাখায় বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়া দিলেন। স্থানীয় কৃষকগণের নিকট বৃক্ষশাখায় মৃতদেহ বাঁধা আছে এই কথা প্রচার করায় সেখানে ভয়ে আর কেহ গমন করিত না। (৭৯ শব্দ)

১৩। "দুই দল সম্মুখীন হইয়া. .... আপনি স্বয়ং ভীষ্মকে রক্ষা করুন।" (পৃঃ ৮৩, প্রায় ১৭০ শব্দ)

সারসংক্ষেপঃ—পান্ডব ও কৌরব সৈন্য পরস্পর সম্মুখীন হইয়া স্ব স্ব স্থান গ্রহণ করিল। তাহাদের পরিধানে উজ্জ্বল বর্ম, অঙ্গে স্বর্ণের অঙ্গদ। হস্তী ও রথের সমুজ্জ্বল শোভা। প্রধান প্রধান বীরগণের বিচিত্র পতাকা শোভা পাইল। দুর্যোধন অপরপক্ষীয় ব্যূহ ভীমকর্তৃক রক্ষিত দেখিয়া দ্রোণাচার্যকে ভীষ্মের রক্ষার নিমিত্ত নির্দেশ দিয়া অন্যান্য বীরগণকে স্ব স্ব ব্যূহরক্ষায় নিযুক্ত থাকিতে আদেশ দিলেন। (৫৩ শব্দ)

রামায়ণী কথা

১৪। "তখন বর্ষাকাল. বাণ নিক্ষেপ করিলেন।" (রামায়ণী কথা, দশরথ পৃঃ ১৩, প্রায় ১০৮ শব্দ)

সারসংক্ষেপঃ—পার্বত্য অঞ্চলে বর্ষার সন্ধ্যায় সংকীর্ণ বিপজ্জনক পথ। আকাশে কালো মেঘ। বিন্দু বিন্দু জলের শব্দে ও ভেকের রবে স্থানটি মুখরিত। যুবরাজ দশরথ সরযূর তীরে মৃগয়া করিতে যাইয়া হস্তিভ্রমে এক মুনিকুমারকে বাণদ্বারা বধ করিলেন। (৩৫ শব্দ)

১৫। "প্রখরবেগশালী শোভা পাইতেছে।" (পৃঃ ১৭, ৯৯ শব্দ)

সারসংক্ষেপঃ—অভিষেকের বিপুল আয়োজন, জনগণের গুণগান নারীগণের সাগ্রহ দৃষ্টির মধ্যে, রামচন্দ্র পুষ্প-পতাকা-মন্দির-আলোকস্তম্ভে পরিশোভিত চিত্রের ন্যায় সুন্দর অযোধ্যার পথে অশ্বরথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। (২৬ শব্দ)

১৬। "সূর্য ভিন্ন জগৎ. ... বিদীর্ণ হইতে লাগিল।" (পৃঃ ৮৭, ১৭০ শব্দ)

সারসংক্ষেপ—রামের অকারণ বনবাসবর প্রত্যাহার করিয়া লইবার জন্য কৈকেয়ীর প্রতি দশরথের আবেদন, নিবেদন, ক্রোধ, গঞ্জনা ব্যর্থ হইলে রাজা আত্মগ্লানিতে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। (২৪ শব্দ)

১৭। "সঙ্গীতের ন্যায় ... কণ্ঠধ্বনি।" (পৃঃ ৬২-৬৩)

সারসংক্ষেপঃ—বহু ক্ষুদ্র ব্যবহারের মধ্যেও মনুষ্যচরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য থাকে। রামচরিত্রের বৈশিষ্ট্য যে ত্যাগ তাহা অতি সংকটের সময়েও দেখা যায়। অভিষেকের সময়ে সব কিছু প্রত্যাখ্যান আর লংকাযুদ্ধের সময় ক্লান্ত রাবণকে বিশ্রামের সুযোগ দান ইহার দৃষ্টান্ত।

১৮। "আরব্ধ কার্য.. ...করিতেছেন।" (পৃঃ ৮২-৮৩)

সারসংক্ষেপঃ—রামচন্দ্রের মতে আরব্ধ কার্য নষ্ট হইয়া যদি অনভীষ্ট পথে চলে সেখানে দৈব ইহার জন্য দায়ী। কিন্তু লক্ষ্মণের মতে কাপুরুষেরা দৈবের দোহাই দিয়া থাকে। তিনি পুরুষকার দ্বারা দৈবকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিলেন। **অথবা**, রামচন্দ্র মনে করেন যে কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে তাহা নষ্ট হইয়া যদি ভিন্ন পথে চলে তবে ইহাতে মানুষের কোন হাত নাই। লক্ষ্মণের মতে ইহা দুর্বলচিত্ত লোকের অভিমত। কর্মশক্তি প্রয়োগ করিলে দৈবকে বশে আনা যায়।

১৯। "চিত্রকূটের মনোহর......আইসে নাই।" (রামচন্দ্র, পৃঃ ২৯-৩০)

সারসংক্ষেপঃ—পর্বতবেষ্টিত চিত্রকূটের এক রমণীয় পরিবেশের মধ্যে পর্ণকুটির নির্মাণ করিয়া রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বাস করিতেছিলেন। তখন রামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের অনুরোধ লইয়া ভরত সসৈন্যে উপস্থিত হন। ইহাতে

লক্ষ্মণের মনে ভরতের প্রতি সন্দেহের উদ্রেক হয়। রামচন্দ্র যুক্তি দ্বারা লক্ষ্মণের অমূলক সন্দেহ দূর করেন। (৪৫ শব্দ)

২০। "পম্পাতীরবর্তী স্থান......লাগিলেন।" (পৃঃ ৪০, প্রায় ১৩০ শব্দ)

সারসংক্ষেপঃ—ঋষ্যমূক পর্বতের মেঘচুম্বী চূড়া, পার্শ্বের সমতল ভূমিতে মধ্যে মধ্যে কর্ণিকার পুষ্পের বিকাশ, অদূরে পম্পাসরোবরের তীরবনে বসন্তের শীতল পদ্মগন্ধী বায়ু, সরোবরে জলচর পক্ষীর রব—এই রম্য পরিবেশের মধ্যে আত্মহারা হইয়া রামচন্দ্র সীতার জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন। (৩৬ শব্দ) **অথবা**, পম্পা সরোবরের তীরে পরম রমণীয় বসন্ত প্রকৃতির সৌন্দর্যে আত্মহারা হইয়া রামচন্দ্র সীতার জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন। (১৬ শব্দ) **অথবা**, পম্পাতীরে বসন্ত প্রকৃতির সৌন্দর্যে আত্মহারা রামচন্দ্র সীতার জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন। (১২ শব্দ)

২১। "সমুদ্রের তীরে. জানিতেন।" (রামায়ণী-কথা, হনুমান পৃঃ ১৩২-৩৬)

সারসংক্ষেপঃ—বিরাট অনন্ত সমুদ্রের আকার ও অবস্থা দেখিয়া বানরপতিগণ সকলেই নিজনিজ শক্তির পরিমাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পরপারে যাইতে সমর্থ কিন্তু ফিরিয়া আসা বিষয়ে কেহই নিঃসন্দেহ হইতে পারিলেন না। ইঁহাদের মধ্যে হনুমান কেবল নির্বাক হইয়া আছেন কারণ তিনি আত্মবিশ্বাসী। এ কার্য তাঁহারই। তিনি কেবল জাম্ববানের আহ্বান অপেক্ষা করিতেছিলেন।

২২। "তখন বর্ষাকাল করিলেন।" (রামায়ণী-কথা, দশরথ—পৃঃ ১৩)

সারসংক্ষেপঃ—পার্বত্য প্রদেশে বর্ষার সন্ধ্যা। সারাদিন বৃষ্টি হইবার পর কিছুকালের জন্য বর্ষণ বন্ধ হইল। চারিদিকে ভেকের ডাক। পাহাড়ের গা বাহিয়া স্রোত নামিয়াছে পথ বিপদসঙ্কুল। যুবক দশরথ মৃগয়ায় বাহির হইয়া সেইখানে হস্তিভ্রমে এক মুনিকুমারের উপর বাণ নিক্ষেপ করিলেন। (১৪ সংখ্যক সারসংক্ষেপও দেখ)

২৩। "একদা ব্রহ্মার বরপ্রাপ্ত . নিষিদ্ধ।" (বালি, পৃঃ ১১৭-৪৮)

সারসংক্ষেপঃ—ব্রহ্মার বরে দুন্দুভি নামক রাক্ষস অজেয় হইয়া উঠিয়াছিল। সে কিষ্কিন্ধ্যাপতি বালিকে অপমান করায় তাহাকে বধ করিয়া বালি তাহার শব মাতঙ্গ মুনির আশ্রমে ফেলিয়া দেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ মুনি উক্ত আশ্রমে বালির প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন।

২৪। "কৈকেয়ী ক্রোধাগারে... ...দুই বর চাহিলেন।"—(দশরথ পৃঃ ৫-৬)

সারসংক্ষেপঃ—কৈকেয়ী ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়া সেখানকার গৃহসজ্জার সকল দ্রব্যকে বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিলেন। নিজের বেশভূষা চারিদিকে নিক্ষেপ করিয়া তিনি মাটিতে পড়িয়া রহিলেন। দশরথ তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া আতঙ্কিত হইলেন। এই সুযোগে কৈকেয়ী রাজার নিকট দুইটি বর চাহিলেন।

২৫। "কতক দূর যাইতে যাইতে.... ....পাইলেন।" (রামচন্দ্র পৃঃ ৩৮)

সারসংক্ষেপঃ—কতক দূর যাইতে যাইতে রাম ও লক্ষ্মণ মাটিতে সীতার উত্তরীয়ের সোনার কণা ও একজন লোকের শব, রক্তমাখা মাটি এবং ভাঙ্গা রথ দেখিয়া মনে করিলেন, সীতাকে রাক্ষসেরা খাইয়া ফেলিয়াছে। রামচন্দ্র ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিলে লক্ষ্মণ ভাল কথায় তাঁহাকে শান্ত করেন। [৩৫ সংখ্যক সারসংক্ষেপ দেখ]।

২৬। "কিছু পরেই ভরত...করিয়াছিলেন।" (রামায়ণী-কথা, ভরত, পৃঃ ৭১-৭২)।

সারসংক্ষেপঃ—জটাবল্কলধারী ভরত চিত্রকূটে রামচন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দীনবেশ দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। রামচন্দ্র বিবর্ণ ও কৃশ ভরতকে কষ্টে চিনিতে পারিলেন। তিনি অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইতে অস্বীকার করিয়া নিজ পাদুকা ভরতকে দিলেন। চতুর্দশ বৎসরের জন্য রামের প্রতীক্ষায় ভরত পাদুকার উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া অযোধ্যার বাহিরে নন্দীগ্রামে তাঁহারই প্রতিনিধিরূপে তপস্বী হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

২৭। "বাষ্পপূর্ণ চক্ষে মৌনী হইয়া রহিলেন।" (রামায়ণী-কথা—কৌশল্যা, পৃঃ ৯৮)

সারসংক্ষেপ ঃ—দশরথের মৃত্যুর শোকে কৌশল্যা প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে ভরত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কৈকেয়ীর দুষ্কার্যের জন্য কৌশল্যা ভরতের উপর দোষারোপ করিলেন। রামের চির-অনুরাগী ভরত নানারূপে শপথ করিয়া বিমাতাকে বুঝাইলেন মায়ের অন্যায়ের জন্য তিনি দায়ী নহেন।

২৮। "রাবণ সীতাকে বশীভূত করিয়া দাও।" (রামায়ণী-কথা—সীতা, পৃঃ ১২০)

সারসংক্ষেপ ঃ—রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লঙ্কায় সমাহৃত ত্রিলোকের ঐশ্বর্যের মধ্যে রাখিল। সীতা যদি রাবণের প্রতি প্রীত হন তবে ঐসকল ঐশ্বর্য তাঁহারই হইবে। সীতা দারুণ ক্রোধ ও বিরক্তির সহিত রাবণের প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করিলেন। রাবণ সীতাকে বশীভূত করিবার অন্য উপায় না দেখিয়া অবশেষে রাক্ষসীগণদ্বারা ছলে বলে কৌশলে তাঁহাকে নিজের আয়ত্তের মধ্যে আনিবার জন্য তাঁহাকে অশোক বনে পাঠাইল।

২৯। "দশরথ রাজার পূজা করিতে পারি।" (কৈকেয়ী, পৃঃ ১০২)

সারসংক্ষেপঃ—কৈকেয়ীর চরিত্রে মাহাত্ম্য ও নীচাশয়তা—এই দুইটি বিরোধী ভাব দেখা যায়। এইরূপ চরিত্রের লোক সাধারণতঃ প্রবল উত্তেজনার বশে কাজ করে। যুদ্ধে কাতর দশরথের অক্লান্ত সেবায় এ চরিত্রের উদারতা আর রাম-বনবাসের ষড়যন্ত্রে ইহার নীচাশয়তা প্রতিপন্ন হয়। হিন্দু-সমাজের গৃহলক্ষ্মী পরিবারের অসম উপাদান-গুলিকে সমান করিয়া দেন। স্বেচ্ছাচারিণী কৈকেয়ীর এগুণ ছিল না তাই পারিবারিক বিড়ম্বনা উপস্থিত হইয়াছিল।

৩০। "যে জলরাশির পায়।" (রামায়ণ ও সমাজ, পৃঃ ১৫৫-১৫৬)

সারসংক্ষেপ ঃ—যৌথপরিবারের দোষ হইতেছে ইহাতে জীবনকে অতিরিক্ত নিয়মিত করিবার ফলে মানুষের স্বাভাবিক শক্তির অপচয় ঘটে। গুরুজনের অতিরিক্ত আনুগত্য লোকের প্রতিভা বিকাশের পথে অন্তরায় হয়। একজনের জন্য সকলের স্নেহের অনুশীলনের ফলে স্নেহাস্পদ ব্যক্তি অতিরিক্ত কোমল হইয়া পড়ে।

৩১। "যে জাতি খণ্ডসত্যকে পথ পাইব।" (রামায়ণী-কথা—ভূমিকা, পৃঃ ॥/)

সারসংক্ষেপ ঃ—সংসারে দুই শ্রেণীর চিন্তাশীল লোক আছেন। ইঁহাদের মধ্যে একদল লোক খণ্ডসত্যকে প্রাধান্য দিয়া থাকেন এবং কাব্যকে প্রকৃতির দর্পণ বলিয়া মনে করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা পরিপূর্ণ সত্যের পূজারী। মানবজাতি এই উভয়শ্রেণীর লোকের নিকট ঋণী। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা কারখানা ঘরের মধ্যেও নির্মল বায়ু বহাইবার দাবি রাখেন।

৩২। "দেশ পর্যটনে......করিলেন।" (রামচন্দ্র, পৃঃ ২৫-২৬)

সারসংক্ষেপ ঃ—রাজকুমারদ্বয় ও সীতা রথে করিয়া বহুদূর পল্লীপ্রকৃতির মধ্য

দিয়া চলিলেন। তাঁহাদের হৃদয়ের ভার লঘু হইল। রামচন্দ্র গঙ্গাতীরে আসিয়া ঐ নদীর বিচিত্র গতিদর্শনে মুগ্ধ হইলেন। তাঁহারা আনন্দিত মনে ইঙ্গুদী গাছের ছায়ায় বিশ্রামের উদ্যোগ করিলেন।

৩৩। "কৃষ্ণসর্প......ফিরিয়া যাও।" (রামায়ণী-কথা—রামচন্দ্র, পৃঃ ২৭-২৮)

সারসংক্ষেপ ঃ—রাম সীতা লক্ষ্মণ হিংস্র জন্তুর আবাসস্থল বনে প্রবেশ করিতেছেন, অনভ্যস্ত পথে চলিতে চলিতে পদে পদে বাধা পাইতেছেন। এক গাছের নীচে তাঁহারা রাত্রিযাপন করিলেন। রামচন্দ্রের চোখে ঘুম নাই। লক্ষ্মণের নিকট কষ্টের কথা কহিতে কহিতে তাঁহার রাত্রি কাটিল। তিনি বনের কষ্ট ছাড়িয়া লক্ষ্মণকে অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইতে বলিলেন।

৩৪। "ভরত দেখিলেন অবধারিত।" (রামায়ণী-কথা—রামচন্দ্র, পৃঃ ৩০-৩১)

সারসংক্ষেপ ঃ—ভরত চিত্রকূটে আসিয়া দেখেন রামচন্দ্র মাটির উপর বসিয়া আছেন। তিনি ভ্রাতার পদতলে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ভরতের নিকট হইতে রাম পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনিলেন। তিনি পিতার উদ্দেশে পিণ্ডদান করিয়া ভরতকে মৃত্যুর মতো অবধারিত বিষয়ের জন্য শোকে অভিভূত হইতে বারণ করিলেন।

৩৫। "কতক দূরে দেখিতে পাইলেন।" (রামায়ণী-কথা—রামচন্দ্র, পৃঃ ৩৮)

সারসংক্ষেপ ঃ—রাম ও লক্ষ্মণ চলিতে চলিতে মাটির উপর রাক্ষসের পদচিহ্ন—পাশের মাটি রক্তে রাঙা এবং মাটির উপর সীতার উত্তরীয়ের সোনার কণা দেখিতে পাইলেন। আর পাশে যুদ্ধের চক্রশূন্য রথ এবং অদূরে একজন লোকের মৃতদেহ পড়িয়া আছে। ইহাতে রাক্ষসেরা সীতাকে খাইয়া ফেলিয়াছে এইরূপ অনুমান করিয়া রামচন্দ্র সীতাবধের প্রতিশোধ লইবার জন্য নির্বিচারে সকলকে মারিতে উদ্যত হইলেন। লক্ষ্মণ উন্মত্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে স্নেহপূর্ণ কথায় ভুলাইয়া এই অন্যায় কার্য হইতে নিরস্ত করিলেন।

৩৬। "ভরতের চিত্র করিলেন।" (রামায়ণী-কথা—ভরত, পৃঃ ৬৬)

সারসংক্ষেপ ঃ—বাল্মীকি তাঁহার কাব্যে ভরতের বর্ণনা করিতে গিয়া প্রথমতঃ তাঁহার বিষাদের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। মাতুলালয়ে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ভরত প্রাতঃকালে জাগ্রত হইয়াছেন। তাঁহার দুঃখের কারণ কাহাকেও বলেন নাই। অযোধ্যার কোন বিপদ তিনি আশঙ্কা করিয়া সেখানকার দূতগণকে উপস্থিত হইবমাত্র প্রত্যেকের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

৩৭। "তখন রমণীয় চিত্রকূটে পারিতেছি।" (রামায়ণী কথা—ভরত, পৃঃ ৭০)

সারসংক্ষেপ ঃ—তখন রমণীয় চিত্রকূট পর্বতের সর্বত্র নানা শোভার সমারোহ চলিতেছিল। নিম্ন অধিত্যকা ভূমিতে পুষ্পের সম্ভার। অদূরে মন্দাকিনী নদী নীল তরুরেখায় বিলীন হইয়াছে। রামচন্দ্র এখানে নির্মল আনন্দ উপভোগ করিতে পারিলেন।

৩৮। "অরণ্য জীবনের হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন।" (—লক্ষ্মণ, পৃঃ ৭৭)

সারসংক্ষেপ ঃ—অরণ্য-জীবনের কঠোরতার বেশিরভাগই লক্ষ্মণ স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। রামচন্দ্র ও সীতার বিবিধ সেবায় তন্ময় হইয়া লক্ষ্মণ নিজ সত্তা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। রামসীতা শান্তিতে বাস করিতেছিলেন। রামসীতার জন্য পর্ণশালা তিনিই নির্মাণ করিয়াছেন—রাত্রিশেষে সরোবর হইতে জল তিনিই আনিতেন—শয্যা রচনা লক্ষ্মণেরই কাজ ছিল।

৩৯। "রামের আজ্ঞাপালনে...আত্মহারা।" (রামায়ণী-কথা—লক্ষ্মণ, পৃঃ ৮১)

সারসংক্ষেপঃ—রামের প্রতি লক্ষ্মণের স্নেহ সম্পূর্ণ আত্মহারা। ন্যায় হউক অন্যায় হউক লক্ষ্মণ রামের আজ্ঞা নির্বিচারে প্রতিপালন করিয়াছেন। রামের আদেশে অতি কঠোর কর্তব্য তাঁহাকে পালন করিতে হইয়াছে।

৪০। "সীতার কাহিনী. . .উঠে।" (রামায়ণী-কথা—সীতা, পৃঃ ১২৭)

সারসংক্ষেপঃ—সীতার কাহিনী দুঃখ ও পবিত্রতার কাহিনী। সীতার সতীত্ব অলক্ষিতে ভারতীয় কুললক্ষ্মীগণের মধ্যে সতীত্ববুদ্ধির সঞ্চার করিয়াছে। সীতা-চরিত্র কবির কল্পনামাত্র নহে—ইহা ঈশ্বরের দান। সীতা ভারতবাসিনীদের মধ্যে সহস্র সহস্র বৎসর যে পুণ্যশক্তির সঞ্চার করিয়াছেন তাহা পুনরুদ্দীপিত হউক।

৪১। "এই সভায় . ব্যবস্থা হইল।" (রামায়ণী-কথা, হনুমান্, পৃঃ ১৪১)

সারসংক্ষেপঃ—রাবণের অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যে দাড়াইয়া তাহাকে হিতোপদেশ দিতে হনুমান্ অণুমাত্র বিচলিত হন নাই। তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দিলেও তিনি ভীত হন নাই। কর্তব্যনিষ্ঠাই হনুমানের নির্ভীকতার মূল।

কবিতা-সংকলন

৪২। "ছিনু মোরা সুলোচনে প্রসাদে।" (**সীতা ও সরমা**, মধুসূদন দত্ত, পৃঃ ৫-৬)

সারসংক্ষেপঃ—রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ গোদাবরী তীরের পঞ্চবটী বনে, পরম সুখে বাস করিতেন। মৃগয়ার মাংস আর ফলমূল ছিল তাঁহাদের জীবনধারণের সামগ্রী। সেই বনে ছিল চিরবসন্ত বিরাজমান, চারিদিকে নানা ফুলের সমারোহ, কোকিলের রব আর ময়ূরের নৃত্য। মৃগশিশু, হস্তিশাবক প্রভৃতি অহিংস্র জীবেরা নিত্য সীতার হাতের সেবা আর হৃদয়ের স্নেহ লাভ করিত।

৪৩। **কপোতাক্ষ নদ** (পৃঃ ৯)

সারসংক্ষেপঃ—সুদূর প্রবাস হইতে মধুসূদন যেন কপোতাক্ষ নদের কলধ্বনি শুনিতে পান। কপোতাক্ষের জল ছাড়া অন্য কোনো নদের জলে তাঁহার পিপাসা মিটে না। কবির নদের প্রতি অনুরোধ যেন সে তাহার কলধ্বনিদ্বারা অনাগত কালের বঙ্গ সন্তানগণকে তাঁহার নাম স্মরণ করাইয়া দেয়।

৪৪। **হিমালয়** (পৃঃ ১৫)

সারসংক্ষেপঃ—প্রকৃতির এক মহান্ উদার সৃষ্টি হিমালয় আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, নীচে সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত পৃথিবী শোভা পাইতেছে। হিমালয়ের বক্ষে সর্বদাই দুরন্ত ঝড়ের খেলা চলিতেছে। রবির উজ্জ্বল কিরণ ইহার উপর পতিত হয়; ইহার উচ্চ অনন্ত শৃঙ্গ রহিয়াছে, পর্বতগাত্রে গৈরিকের ছটা প্রকাশিত, উহাতে আছে সারি সারি দেবদারু বৃক্ষ। এই হিমালয় হইতেই অসংখ্য ঝরণা উৎপন্ন হইয়া পরে নদীর রূপ ধারণ করিয়া নীচে নামে। এইভাবে যোগীর ধ্যানের বস্তু গঙ্গানদী উৎপন্ন হইয়া বাহিয়া চলিয়াছেন। কবি গঙ্গার জলে ত্রিতাপ জ্বালা জুড়াইতে চাহেন।

৪৫। অয়ি সুখময়ি. . . তোমারে প্রদানিল। (**উষা** কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, পৃঃ ২১)

সারসংক্ষেপঃ—উষায় উজ্জ্বল আলোর প্রকাশে, পাখির গানে, পুষ্পের বিকাশে জীবগণের মধ্যে চেতনার সঞ্চারে কবি, আনন্দিত হইয়া, এই নব চেতনাশক্তির মূল যিনি, তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে চাহিতেছেন।

৪৬। **বন্দেমাতরম্** (পৃঃ ৩৫-৩৬)

সারসংক্ষেপঃ—(আমাদের) দেশমাতা সুজলা, শস্যশ্যামলা। তিনি রাত্রির চন্দ্রের

কিরণে উজ্জ্বল, তাঁর গাছে গাছে ফুলের শোভা, তাঁর সাত কোটি সন্তানের হাতে দ্বিসপ্তকোটি খড়্গ,—তিনি অবলা ন'ন। তিনিই বিদ্যা, ধর্ম,—তিনিই জাতির হৃদয় এবং জীবন। তাই সেই সরলা, অতুলনীয়া পালনকারিণী জননীর প্রতি ভক্তের নমস্কার।

৪৭। **যক্ষের আলয়** (পৃঃ ৩৭-৩৮)

সারসংক্ষেপ ঃ—কুবেরভবনের উত্তরে যক্ষের গৃহ। উহার সুন্দর বহির্দ্বারের পাশে এক পদ্ম সরোবর। এখানে হংসগণ ক্রীড়া করে। তাহার পাশে সুবর্ণ কদলীবৃক্ষে ঘেরা একটি ক্রীড়া-শৈল, ইহারই এক অংশে মাধবীমণ্ডপ। এখানে একটি অশোক তরু আর একটি ফুলে ভরা বকুলগাছ। এখানকার সোনার দাঁড়ের উপর বসা ময়ূরকে যক্ষপত্নী করতালি দিয়া নাচাইয়া থাকেন। এই বাড়ি চিনিয়া বাহির করিতে (মেঘের) কোন কষ্ট হইবে না। (৫৯ শব্দ)।

৪৮। **পলাশির যুদ্ধক্ষেত্রে** (পৃঃ ৫২)—নবীনচন্দ্র সেন।

সারসংক্ষেপ ঃ—সৈন্যগণকে পলায়ন না করিয়া রণক্ষেত্রে দাঁড়াইতে হইবে। পলায়নের ফল সকলের সবংশে বিনাশ। সৈন্যগণসহ সেনাপতি নিশ্চেষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, ইহা অত্যন্ত অশোভন। আজ বঙ্গের স্বাধীনতা সংকটাপন্ন। মহামূল্য স্বাধীনতাকে পরের হাতে তুলিয়া দিয়া নিজেকে কলঙ্কিত করা মূর্খের কাজ। বিদেশী শত্রুকে সামান্য বণিগ্‌জ্ঞানে অবহেলা করা উচিত নয়। ইহারা অস্ত্রে ও সামর্থ্যে নানাভাবে বড়। ইহাদের হাতে পরাজিত হইলে দুঃখে প্রাণরক্ষা করা দুষ্কর হইবে। বীরগণের একমাত্র সহায় তাহাদের সাহস, কিন্তু কাপুরুষের মত পলাইয়া গেলে জীবনে কোন সুখ থাকিবে না।' মান না থাকিলে জীবনের কোনই মূল্য নাই। তাই দ্বিতীয়বার ইংরেজের সহিত যুদ্ধের জন্য বীরগণকে দৃঢ়-সংকল্প লইয়া প্রস্তুত হইতে হইবে। অার বিলম্বের প্রয়োজন নাই, শীঘ্র যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বিক্রম প্রদর্শন করিতে হইবে।

৪৯। **আষাঢ়** (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৭৬)

সারসংক্ষেপ ঃ—আষাঢ়ের বিকাল। বেলা বেশি নাই। একটু পরেই অন্ধকারে সব ঢাকিয়া যাইবে। নূতন কালো মেঘে আকাশ ভরিয়া গিয়াছে, অনবরত বর্ষার জলের ধারা পড়িতেছে, মাঠে গাভীগুলি ঘন ঘন ডাকিতেছে, উহাদিগকে গোয়ালঘরে আনা দরকার। যাহারা মাঠে কাজ করিতে গিয়াছে, তাহারা ফিরিয়াছে কিনা খোঁজ লইতে হইবে। নদীর কূলে কোনও লোক নাই, পুবান হাওয়া বহিতেছে, জলে ঢেউগুলি উঠিতেছে আর পড়িতেছে; আজ খেয়ানৌকার পারাপার বন্ধ। আজ জল আনার জন্য ঘাটে যাওয়া চলিবে না কেননা পথ পিছল হইয়াছে, উহার পাশে বাঁশের বন ঘন ঘন দুলিতেছে। এমন দিনে ঘর হইতে বাহির হইতে নাই। (প্রায় ৮৭ শব্দ)

৫০। **ওরা কাজ করে** (পৃঃ ৭৯) (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

সারসংক্ষেপ ঃ—ভারতের উপর রাজ্য আর সাম্রাজ্যের লোভে কত বিদেশী আক্রমণ চালাইয়াছে এবং তাহার ফলে নূতন নূতন রাজশক্তির অভ্যুদয় হইয়াছে। কালে ইহাদের অত্যাচার বা গৌরবের চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল বিপুল পরিবর্তনের মধ্যেও শ্রমিক মানুষের নিত্য-প্রয়োজনের চাহিদা মিটাইবার জন্য প্রাচীন-কাল হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত সমভাবে কাজ করিয়া জীবনের জয়ধ্বনি ঘোষণা করিতেছে। **অথবা**, ভারতে বহু প্রাচীনকাল হইতে নানা রাজা-সাম্রাজ্যের ভাঙাগড়া চলিয়াছে। অনেকের কার্যের চিহ্ন পর্যন্ত নাই। এই বিরাট ভাঙাগড়ার মধ্যেও রোজ

পর্যন্ত লোকের নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা মিটাইবার জন্য শ্রমিকদল সমভাবে কাজ চালাইয়া তাহাদের জীবনীশক্তির পরিচয় দিয়া আসিতেছে।

৫১। **দিদি** (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—পৃঃ ৮১-৮২)। (মূল প্রায় ৭৫ শব্দ)

সারসংক্ষেপ ঃ—নদীর তীরে ইটের পাজা তৈয়ারি করিবার কাজে নিযুক্ত মজুরদের ছোট মেয়েকে অনেকবার বাসন মাজার কাজে ঘাটে আসিতে হয়। ইহারই ছোট ভাই—তার পরনে কাপড় নাই, দিদির আদেশে শান্ত-শিষ্ট হইয়া নদীর পাড়ে বসিয়া থাকে। আবার দিদি ফিরিবার সময় মাথায় জলের কলসী, বগলে বাসন আর ডান হাতে ভাইকে ধরিয়া ঠিক মায়ের মতো ঘরে ফিরিয়া যায়। (৫৪ শব্দ)।

৫২। **প্রশ্ন** (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—পৃঃ ৮৩)

সারসংক্ষেপ ঃ—ঈশ্বর যুগে যুগে অত্যাচারীকে ক্ষমা করিবার বাণী দিয়া মানুষের কাছে মহাপুরুষদের প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু হিংস্র পাশবিক শক্তিসম্পন্ন অত্যাচারীর প্রতিকার রহিত অত্যাচার দেখিয়া কবির মন মহাপুরুষদের বাণী গ্রহণ করে নাই। তাঁহার হৃদয়ে প্রবল সন্দেহ জাগিয়াছে ঈশ্বর স্বয়ং অত্যাচারীদের ক্ষমা করিতে পারিয়াছেন কিনা।

৫৩। **মুষ্টি ভিক্ষা** (বিজয়চন্দ্র মজুমদার—পৃঃ ৮৪-৮৫)

সারসংক্ষেপ ঃ—রাজার গরিবখানায় দান আছে, প্রাণ নাই; তাই ভিখারিণী দরদী রানীমায়ের কাছে মুষ্টিভিক্ষা প্রার্থনা করে। সামান্য অন্নে ক্ষুধা না মিটিলেও রানী মায়ের দেওয়া দান দরদে ভরা। তৃপ্তি উহাতেই আসে। ব্যথার ব্যথী রানীমায়ের সংসারের সুখে ভিখারিণী আপনার দুঃখ ভুলিয়া থাকে। সে তাচ্ছিল্যপূর্ণ কাঙাল-খানা ছাড়িয়া সদ্য দয়া লাভের আশায় রানীর কাছে প্রতিদিন ছুটিয়া আসে। তাহার জীবনে দুঃখের পর দুঃখ আসিতেছে। ইহার উপর কৃপার বোঝা না চাপাইয়া রানীমা শুধু সমবেদনার দৃষ্টি যেন তাহার উপর দান করেন।

৫৪। **তা বটেই তো, তা বটেই তো** (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—পৃঃ ৮৬-৮৭)

সারসংক্ষেপ ঃ—এক রাজার ধারণা, যদি কামানের গোলা বা অস্ত্রশস্ত্রে তাঁহার কোন ভয় না থাকিত, তবে তিনি একজন বড় বীর হইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি বাক-বীরই রহিয়া গেলেন। কাব্যের ভাব আর ভাষার অভাবে তিনি নীরব কবিই থাকিয়া গেলেন, স্মরণশক্তির অভাবে রাজনৈতিক বক্তার পরিবর্তে বৈঠকখানার বক্তা হইয়া রহিলেন, আর ক্ষমতা থাকিতেও শুধু প্রেরণার অভাবে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি না হইয়া যাহা ছিলেন তাহাই রহিয়া গেলেন। চাটুকার পারিষদবর্গ রাজার কথা সমর্থন করিল।

৫৫। **মেবার পাহাড়** (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—পৃঃ ৮৮-৮৯)

সারসংক্ষেপ ঃ—কাগার তীরে ধূম্রচূড়াবিশিষ্ট মেবার পাহাড়। ইহার কাননে সুরভিত পবন আর বিহঙ্গের কাকলি। ইহার বনের প্রান্ত জ্যোৎস্নায় ভাসিয়া যায়। ইহার জল আর শস্য অত্যন্ত মধুর। বীর্যে, স্নেহে আর নির্মল চরিত্রে মেবারের নারীর সমান কেহ নাই। এইখানে বাপ্পা বীর চিতোর হইতে শত্রুকে বিতাড়িত করিয়া গজনীরাজের কন্যাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন, পদ্মিনীকে লাভ করিবার জন্য ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল, বীর প্রতাপ সিংহ বিরাট দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে অটল থাকিয়া যুদ্ধ করেন; দেশের অযুত ভক্ত এইখানে তাঁহাদের রক্ত দান করেন। সাতশত বৎসর ধরিয়া এইখানে দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল।

৫৬। **নবীন পান্থ** (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—পৃঃ ৮৯-৯২)

সারসংক্ষেপ ঃ—কবির অনিন্দ্যসুন্দর শিশু তাঁহার হাত ধরিয়া লম্ফঝম্প দিয়া

সিঁড়ি বাহিয়া চলে। তিনি যখন ঘরে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে কাজে রত থাকেন, সে তখন ঘরের সবকিছু ভাঙিয়া নির্লিপ্ত মনে তার নিজের ধ্বংসকার্য দেখিতে থাকে। সে পিতামাতার বারণতাড়নকে উপহাসের সহিত অগ্রাহ্য করিয়া পিতার গলা জড়াইয়া ধরে—তাহার ভাবটা এই, পিতা তাহার আদেশ যেন ভৃত্যের মতো পালন করেন। এই ক্ষুদ্র বীর সর্বজয়ী, ইহার চিরদাস্য পিতার পক্ষে এড়ান কষ্টকর। ইহার ভাষা অস্ফুট, চরণভঙ্গী সঙ্গীতের তালযুক্ত; ইহার হাসি পৃথিবীর সকল সৌন্দর্যকে পরাভূত করে।

৫৭। **পাছে লোকে কিছু বলে** (কামিনী রায়—পৃঃ ৯৩-৯৪)

সারসংক্ষেপঃ—কাজ করিতে গেলে সংশয়ের লজ্জা আসে, সম্মুখে যাইতে চরণ চলে না, হৃদয়ের নির্মল চিন্তা কাজে পরিণত হইবার পূর্বেই হৃদয়েই মিলাইয়া যায়। লোকের ভয়ে স্নেহের কথা বলা হয় না, কোন মহৎ উদ্দেশ্যে অন্য লোকের সহিত মিশিতে দ্বিধা উপস্থিত হয়, শক্তি থাকিতেও কাল্পনিক ভীতি মানুষকে কিছু করিতে দেয় না।

৫৮। **বর্ষারানী** (মানকুমারী বসু—পৃঃ ১০০-১০১)

সারসংক্ষেপঃ—বর্ষায় রাত্রিদিন বৃষ্টি পড়িতেছে, কেতকী-কদম ফুটিয়াছে, মেঘের গর্জন আর ময়ূরের নৃত্য শোনা যায়। আকাশ হইতে রাত্রিতে চাঁদের জ্যোৎস্না নামিয়া আসে, গঙ্গা-পদ্মা উচ্ছলিত হয়। মেঘ, বিজলী, তারা একসঙ্গে চলিতেছে। বর্ষার অসীম নীলাকাশে বিপুল আনন্দের উৎস বহিয়াছে, সুন্দর একজন কেহ ইহার মধ্যে লুকাইয়া আছেন। তাহার জন্য সীমা অসীমে মিলিয়া যায়। শরৎ, বসন্ত, শীতে প্রকৃতির উজ্জ্বলতা দেখায়, কিন্তু বর্ষায় অনন্ত প্রেম উপলব্ধ হয়।

৫৯। **সাগর সঙ্গীত** (চিত্তরঞ্জন দাশ—পৃঃ ১০৩-১০৪)

সারসংক্ষেপঃ—মেঘপূর্ণ দিন। অশান্ত সমুদ্রের গর্জন, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আসিয়া কূলে পড়িতেছে। কবির হৃদয়ে সুখ-দুঃখ-প্রণয়ের এক অব্যক্ত অবস্থা চলিয়াছে। অন্তহীন দিশাহারা প্রলয়ের উন্মত্তভাব গান কবির হৃদয়ে বাজিতেছে। প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা-প্রলয়ের মধ্যে কবি আপনাকে ডুবাইতে চাহেন। তাই তিনি অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে মৃত্যুরূপী সমুদ্রকে নিজের হৃদয়ের মধ্যে উপলব্ধি করিবার জন্য তাহাকে সাদর আহ্বান জানাইতেছেন।

৬০। **অর্জুন** (প্রিয়ংবদা দেবী, পৃঃ ১০৫-১০৭)

সারসংক্ষেপঃ—অর্জুনের কীর্তি অবারিত। তাঁহার যৌবনের প্রণয় কখনও এক স্থানে বাঁধা ছিল না—তাই দ্রৌপদী, উলূপী, চিত্রাঙ্গদা, সুভদ্রা তাঁহার বিভিন্ন পত্নী। শুধু ভোগে নয় ত্যাগেও তিনি বড়। তাই উর্বশীকে স্বর্গলোকে তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, উত্তরাকে পুত্রের করে দান করিয়াছিলেন। জয়লব্ধ ধন তিনি ভ্রাতার অভিষেকে ব্যয় করেন, বিপন্ন দরিদ্র ব্রাহ্মণের উপকারের জন্য নির্বাসন দণ্ড স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন। তিনি দেবতাগণেরও প্রিয় বলিয়া বিভিন্ন দেবের নিকট নানা প্রকার অস্ত্র লাভ করিয়াছেন। স্বর্গের দরজা তাহার কাছে খোলা ছিল। তিনি অমরলোকে শক্তির দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রীতি অশেষ প্রেমে জগৎপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সারথি এবং চিরবন্ধু হইয়াছিলেন।

৬১। **শারদীয় বোধন** (প্রমথনাথ রায়চৌধুরী—পৃঃ ১০৭-৮)

সারসংক্ষেপঃ—বর্ষার পর প্রফুল্ল শরৎ ঋতুর আবির্ভাব। কূলগ্রাসী নদীর জল নীচে নামিয়াছে, বনভূমিতে নানা ফুল ফুটিয়াছে, পাখীর আনন্দ গানে, আসন্ন শুভ

উৎসবের সূচনা পাওয়া গেল। হরিৎ শস্যের ক্ষেত্র দেখিয়া মনে হইল, দেবীর বোধন আসিয়া গিয়াছে। আকাশে ইন্দ্রধনুর প্রকাশ, রাত্রিতে মেঘমুক্ত আকাশে চন্দ্রের দীপ্তি, লক্ষতারার প্রকাশ সকলই উৎসবের মধুর আগমনের কথা জানাইয়া দিল। শঙ্খের ধ্বনিতে বোধন উৎসব আরম্ভ হইল।

৬২। **আমি ও তুমি** (ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী—পৃঃ ১০৮-৯)

সারসংক্ষেপঃ—সেবকের নিকট ঈশ্বরই সেব্য। ঈশ্বরই সারবস্তু, তিনিই সেবককে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া আসেন। সেবকের জড়দেহের চৈতন্য তিনিই, সেবক মায়া মোহের অধীন; মুক্তি স্বয়ং ঈশ্বর। মানবের মনে তিনিই আরাধ্য দেবতা, তিনি প্রভু, মানুষ তাঁহাব দাস। অনন্ত কামনা বাসনা লইয়া মানুষ সর্বদা অস্থির, ঈশ্বর তাঁহার কাছে প্রেমস্বরূপ—এই প্রেমেই সেবকের শান্তি।

৬৩। **বর্ষা** (শশাঙ্কমোহন সেন—পৃঃ ১১০)

সারসংক্ষেপঃ—আকাশে মেঘের মৃদু গর্জন, ঝির্ ঝির্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। যুঁই চাপা মাটির উপর ফুটিযাছে। খাল, বিল, ডোবা সব জলে একাকার হইয়াছে, জলে অর্ধেক ডুবিযা শিমুল আর হিজলগাছ দাঁড়াইয়া আছে, জল শেওলা, পানা আব তৃণে ভরিয়া গিয়াছে। দোয়েল ভিজিয়া ভিজিয়া ডাকিতেছে। তিতির পাখির হাহাকার শোনা যাইতেছে। বর্ষায় মানুষ কর্মহীন গতিহীন; তাই বিশাল জগৎকে খুব ছোট বলিয়া মনে হয়।

৬৪। **দেবশিশু** (রমণীমোহন ঘোষ—পৃঃ ১১১)

সারসংক্ষেপঃ—একটি নগ্ন শিশু গায়ে ধূলা মাখিয়া খেলা করিতেছে, তাহার নির্মল হাসিভরা মুখখানি, কণ্ঠে সুমধুর কথা, সর্বাঙ্গ সোনার অলঙ্কারে ভরা। সেখানে কোন লোকজন নাই দেখিয়া এক চোর শিশুর গাত্র হইতে অলংকারগুলি খুলিয়া লইল। ইহা দেখিয়া চোরের দিকে নির্লিপ্তভাবে চাহিয়া, শিশু খল খল করিয়া হাসিয়া উঠিল। চোর এই সন্ন্যাসীর মতো নির্লিপ্ত ছেলেটিকে দেখিয়া সব চুরিকরা জিনিস ফিরাইয়া দিল। গয়নাগুলি যথাস্থানে পরাইয়া শিশুকে কোলে লইয়া আদর করিতে লাগিল। চোর এই দেবশিশুকে দেখিয়া চুরি করিয়া অর্থলালসা পূর্ণ করিবার পাপবুদ্ধি ত্যাগ করিল।

৬৫। **পদ্মপুকুরে** (করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃঃ ১১২-১১৩)

সারসংক্ষেপঃ—পদ্মপুকুরের ঢালু পারে মেঘে ঢাকা গাছপালায় বাতাস বহিতেছে। আকাশে চাতক ফটিক জল চায়। রাখাল জল থামিয়া গেলে গ্রামের চেনা পথে ফিরিল! আকাশে বলাকা নিরুদ্দেশের পথে চলিয়াছে। রাত্রি আসিল। তখন আর এক দৃশ্য—আলো ছায়াকে ঢাকিল। কবি ভাবিতেছেন তিনি কি এই সকল পরিবর্তনের কোন অংশী নন!

৬৬। **খেয়াডিঙি** (পৃঃ ১১৫-১১৬)

সারসংক্ষেপঃ—ঘাটের ডিঙিনৌকার মাঝির কাজ কেবল জলে ডোবা ক্ষেতের মধ্য হইতে প্রতিদিন শস্য পার করিয়া আনা। তাহার কাজে একদিনও ছুটি নাই। লোকে কত শস্য নষ্ট হইল, কতটা বা বাঁচিল তাহার হিসাব করে, কিন্তু খেয়ার মাঝি এসবের কোন হিসাব রাখে না। ভাদ্রমাসের বন্যায় যখন ধানের গোড়ায় আধহাঁটু জল, আর পাট গলাজলে থাকে, তখন তাহারই কিনারে এই মাঝির নৌকা চলে। কোমর জলে দাঁড়াইয়া চাষী যখন শস্য কাটে তখনও নৌকার মাঝির বিরাম নাই। —সে লোকের

কথায় কান না দিয়া কেবল শস্য পারাপারের খেয়ার হিসাব করে। মাঝি উদয়াস্ত প্রত্যহ এই কাজ করে।

৬৭। **বকুল তরু** (কুমুদরঞ্জন মল্লিক—১২৭-১২৮)

সারসংক্ষেপ ঃ—অজয়নদের পাড়ে পঁচিশ বছরের একটি প্রাচীন বকুল গাছ ছিল। সে এখন পাড় ভাঙগায় নদীতে পড়িয়া গিয়াছে। ইহার সহিত গ্রামের বহু স্মৃতি জড়িত। ইহা কত পাখির আশ্রয় ছিল, কত ছেলের খেলার জায়গা ছিল ইহার নীচে। অক্ষয়বট, বোধিদ্রুমের মতোই ইহার সম্মান। এই গাছের তলা অতি পবিত্র। (মহাজন কবি) লোচনদাস ইহারই তলে একদিন খেলা করিয়াছিলেন, ইহার ফুলের মালা গাঁথিয়া বনমালীর গলায় দিয়াছিলেন, এইখানেই তিনি চৈতন্যমঙ্গল লিখিয়াছিলেন। গ্রামের সব চেয়ে প্রাচীন অধিবাসী হইয়া বৃক্ষটি ছিল চির নবীন। কিন্তু আজ আর সে নাই। তাহার জন্য সকল গ্রামের শোক। গ্রামের সকলেই তাহার স্বর্গ কামনা করে।

৬৮। **রথযাত্রা** (কুমুদরঞ্জন মল্লিক—পৃঃ ১২৮-৩০)

সারসংক্ষেপ ঃ—শ্রীজগন্নাথের রথ দেখিতে এক বৃদ্ধা খঞ্জ চণ্ডালী মেদিনীপুরের পথে রওনা হইল। সে অতি কষ্টে কোন রকমে রথের দুইদিন পূর্বে কটকে পেঁাছিল। পুরীতে পেঁাছিবার অনেক পথ বাকি। এক অজ্ঞাত পথিক তাহাকে পথে তাড়াতাড়ি চলিতে বলিল, কারণ সে না গেলে রথ চলিবে না। সে কষ্টে হামাগুড়ি দিয়া ভগবানের শ্রীমুখদর্শনের জন্য চলিতে লাগিল। এদিকে জগন্নাথের রথ আর চলে না। প্রধান পাণ্ডা ধ্যানে জানিলেন ভক্তের পিছু টানে রথ চলিতেছে না। পাণ্ডার লোকেরা অনেক সাধু সন্ন্যাসী ধরিয়া আনিলেন। তাঁহাদের স্পর্শেও রথ চলিল না। পাণ্ডা তখন এক জায়গায় এই বুড়িকে দেখিয়া পয়সা ভিক্ষা দিয়া তাহাকে বিদায় করিতে চাহিলেন। কিন্তু সে পয়সা চাহে না, রথে ভগবানের শ্রীমুখ দেখিতে চাহে। তখন পাণ্ডা ইহাকেই প্রকৃত ভক্ত মনে করিয়া লইয়া আসিলেন। তাহারই হস্ত স্পর্শে জগন্নাথের রথ চলিতে লাগিল। তখন সকলেই বুঝিল ভগবান্ যথার্থই কাঙালের ঠাকুর।

৬৯। **ডাক হরকরা** (যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত—১৩৬-১৩৮)

[**দ্রষ্টব্য ঃ**—ইহার সহিত সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'রানার'—(পৃঃ ১৮৬) নামক কবিতা মিলাইয়া পড়িবে]।

সারসংক্ষেপ ঃ—ডাক হরকরা প্রভাত সন্ধ্যায় চিঠির পুলিন্দা বহিয়া দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যে পথ দিয়া ছুটিয়া চলে। পথে বিশ্রাম করিবার সময় তাহার নাই। কিসের আশায় সে ছুটিয়া চলে তাহা তাহার জানা নাই।—তবে তাহাকে ছুটিতে হইবে সে এইটুকু মাত্র জানে। নদীর ওপারে সন্ধ্যায় তাহাকে পেঁাছিতে হয়। ঘর্মাক্ত শরীর মুছিবার সেখানে একটু সময় মাত্র পাওয়া যায়। আবার পুলিন্দা লইয়া রাত্রির যাত্রা শুরু হয় তাহার। সে যে বোঝা বহিয়া আনে তাহার মধ্যে নাকি জগতের গুরুতর প্রয়োজনের বস্তু আছে! তাই যাইতে দেরী হইলে তাহার মনে ভয় হয়। এই বোঝার গুরুত্বের কথা মনে করিয়া সে নিজের শারীরিক কষ্টকে অগ্রাহ্য করিয়া থাকে। তাহার এই শ্রান্তি হইতে সে মুক্তি চায়, ব্যর্থ শূন্যের দিকে চাহিয়া সে আর ছুটিতে চায় না।

৭০। **ছাত্রধারা** (কালিদাস রায়, পৃঃ ১৪৫-১৪৭)

সারসংক্ষেপ ঃ—বিদ্যালয়ে প্রতি বছরই নূতন ছাত্র আসে, আবার কৃতকছাত্র সেখান

হইতে চলিয়া যায়। গুরু যতদিন ছাত্রেরা সেখানে থাকে তাহাদের নাম ধাম জানেন, খোঁজ খবর করেন। কিন্তু পরে সকলের কথা ভুলিয়া যান। তাহার কথা মনে থাকুক আর নাই থাকুক, পথে দেখা হইলে ছাত্রকে গুরু আশীর্বাদ করেন। বহু ছাত্রের মধ্যে, ক্ষুধায়, পরিশ্রমে নানা রোগে কাতর ছাত্রের কথা কেবল মনে থাকে। আর মনে থাকে ক্লাশে আবদ্ধ ছেলের কথা যাহার মন বাহিরে ঘুরিতেছে, ইহারা ঘুড়ি উড়াইবার জন্য-ব্যস্ত হইয়াছে—বা প্রিয়জনের কথা ইহাদের মনে পড়িয়াছে।

৭১। **চাঁদসদাগর** (কালিদাস রায়—পৃঃ ১৪৭-১৫০)

সারসংক্ষেপঃ—এই কোমল বঙ্গদেশে কোটি কোটি ভীরু অমানুষের মধ্যে জ্ঞানী প্রতিজ্ঞাপরায়ণ, সত্যসন্ধ, অসীম বিপদে অটল সাধু চন্দ্রধর নবযুগের মানুষের কাছেও সম্মানের পাত্র। সপ্ত পুত্রের মৃত্যু, পত্নীর ক্রন্দন, নিজের সর্বরিক্ততার মধ্যেও তিনি ভগবান্ শিবের প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তি রাখিয়া পুরুষকারে দৃঢ় বিশ্বাসী। তিনি চিরস্থায়ী সম্পদে ধনী, পার্থিব সম্পদকে গ্রাহ্য করেন না। দেবতা তাঁহার সহিত শত্রুতা করিতে গিয়া পরাজিত হইয়াছেন। মনুষ্যত্ব জগতে তুচ্ছ নহে—এই সত্য কথা চাঁদসদাগর সকলকে শুনাইয়াছেন।

৭২। **টবের গাছ** (কালিদাস রায়—পৃঃ ১৫০-১৫২)

সারসংক্ষেপঃ—টবে বন্দী চারাগাছ। ইহার উপর দিনের আলোও পড়ে না, রাত্রির শিশির হইতে ইহা বঞ্চিত। প্রকৃতি ইহাকে লালন-পালন করে না। নীল আকাশের তলে ইহার যদি একটু স্থান হইত, তাহা হইলে চারাগাছ—স্বাভাবিকভাবে দ্রুত বাড়িতে পারিত। বন্দী অবস্থায় ইহার সুখ-দুঃখের কোন বোধ নাই। মুক্ত থাকিলে ইহা ঝড় জলের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া নিজে বাঁচিয়া থাকিতে পারিত। কিন্তু বন্ধ অবস্থায় ইহার উন্নতি খর্ব হইয়াছে। ঝড়ের রাত্রিতে অরণ্যের শব্দে মনে হয়, বড় বড় গাছগুলি বন্দী টবের গাছের উদ্ধার সাধন করিতে আসিবে। জ্যোৎস্না রাত্রিতে মনে হয় যেন বন্ধনমুক্ত চারাগাছের চারিদিকে সকল তরুলতার ভিড় জমিয়াছে। কিন্তু এ সকল চিন্তা তাহার **পক্ষে অলীক।**

৭৩। **পল্লীরানী** (সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়—পৃঃ ১৫৪-১৫৫)

সারসংক্ষেপঃ—পল্লীরানীর পূর্বগৌরব অতীত হইয়াছে। আজ পল্লীমাতা ভিখারিণী। বিশ্বকে প্রয়োজনমত নিজের ঐশ্বর্য দান করিয়া তিনি দারিদ্র্য বরণ করিয়াছেন। লোকালয় বনে পরিণত হইয়াছে। সন্ধ্যায় তুলসীতলায় দীপ জ্বলে না, দেবমন্দিরে আর সন্ধ্যার আরতির বাজনা নাই। নূতন করিয়া পল্লীকে গঠন করিতে পারিলেই আবার পল্লীমায়ের সকল শক্তি ফিরিয়া আসিবে।

৭৪। **ধুতুরা ফুলের ব্যথা** (কৃষ্ণধন দে—পৃঃ ১৫৫-৫৬)

সারসংক্ষেপঃ—যিনি দীনের দেবতা তিনি দরিদ্রের মনের ব্যথা বুঝেন, তাই ভগবান্ শিব অকিঞ্চিৎকর ধুতুরাকে কানের ভূষণ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি অমৃতের ভাগ চাহেন না, যাহা কিছু অপরের পরিত্যক্ত তাহাই তিনি গ্রহণ করেন, তাই ধুতুরা তাঁহার কৃপা লাভ করিয়াছে। তিনি অনাদৃতের কথা শোনেন, তিনি দম্ভী দর্পীকে শাস্তি দিয়া থাকেন। মর্মদাহের বেদনা দিয়া ভোলানাথ ধুতুরাকে বড় করিয়াছেন। ধুলায় যাহার স্থান, দেবতার স্নেহে অনেক সময় তাহার সংকোচ আসে কারণ এই অন্যায় স্নেহের (লোকের মতে) জন্যই লোকে ভোলানাথকে পাগল বলে। সুতরাং ধুতুরাকে স্নেহ করিয়া তিনি ভুল করিয়াছেন।

৭৫। **বিজয়ী** (কৃষ্ণদয়াল বসু—পৃঃ ১৫৭-৬০)

সারসংক্ষেপ ঃ—কাঞ্চী ও কর্ণাটে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে। সূর্যাস্তের সময় সংবাদ আসিল কর্ণাটরাজ যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াছেন। এই ভীষণ যুদ্ধে কাঞ্চীর শত শত বীর আহত ও নিহত হইলেন। কর্ণাটরাজের সারথি এই ভীষণ যুদ্ধের ফল দেখিয়া সুখী হইতে পারেন নাই। রাজা সারথির এই অবস্থা দেখিয়া ইহার কারণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সারথি তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে এই প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, ধন আর ঐশ্বর্য ছাড়া এই বিজয়ে তাঁহার আর কোন সম্পদ লাভ হইয়াছে কিনা, কেননা পাণ্ডবেরা আর সম্রাট অশোক রণজয়ে অমৃতবিত্ত পাইয়াছিলেন। রাজা বলিলেন, তিনি স্বার্থের জন্য যুদ্ধ করেন নাই। তিনি রাজপুত্র পুরন্দরকে এই দুই সম্মিলিত রাজ্যের যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করিতে চাহেন। ইতিমধ্যে দূত আসিয়া খবর দিল, রাজপুত্র পুরন্দর বিজিত কাঞ্চী রাজ্যের বন্দীদের মুক্তি দিলেন এবং আহতগণের সেবার ও শুশ্রূষার ভার লইলেন। এইভাবে তিনি শত শত কাঞ্চী-বাসীর হৃদয় প্রেমদ্বারা জয় করিলেন। কর্ণাটরাজ বুঝিলেন, অস্ত্রের জয় অপেক্ষা প্রেমের জয় বড়।

৭৬। **বাংলা-মা** (কাজী নজরুল ইসলাম—পৃঃ ১৬৩-৬৪)

সারসংক্ষেপ ঃ—শ্যামলা-বাঙলা মা নানা সময়ে নানা রূপ ধারণ করেন। ধানের ক্ষেতে তাঁহার কালোবরণ, রাঙামাটির পথে তিনি বৈরাগিণী, পল্লীগ্রামে কাদামাটির পথে তিনি ভীরু মেয়ের রূপ ধরেন। দিঘির পদ্মফুলে তাঁর পদ্মমুখ দেখা যায়। কালবৈশাখীর ঝড়ের সময় তাঁর নৃত্য, নদীর স্রোতে কঙ্কণের শব্দ, সন্ধ্যায় তাঁহার কপালে তারার টিপ। সূর্যের উদয়ে তিনি কলসী কাঁখে নদীতে জল ভরিতে যান, ঝিল্লীর শব্দে তার নূপুর বাজে।

৭৭। **প্রেমের দেবতা** (পৃঃ ১৬৫-৬৭)

সারসংক্ষেপ ঃ—ঈশ্বর পুত্র ভগবান্ যীশুখৃষ্ট, মানবের প্রেমে মানুষ হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যে মূঢ়েরা তাঁহার অশেষ লাঞ্ছনা করিয়াছিল তাহাদের কাছে তিনি পরাজয় স্বীকার করেন নাই, তিনি তাহাদের ক্ষমা করিয়াছেন। তিনি নিজে অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া অত্যাচারীকে প্রেমদান করিয়াছেন। বর্তমান জগতে হিংসার হানাহানিতে তাঁহার সেই প্রেম চাপা পড়িয়াছে। এই অবস্থায় তাঁহার এখন ধরাধামে আসা দরকার। জগতের অবস্থা এখন অত্যন্ত সংকটাপন্ন, লোকের পেটে অন্ন নাই দুঃখ দুর্দশাও নানা প্রকারের। এইরূপ অবস্থায় আবার তিনি মানুষের রূপ ধরিয়া পৃথিবীতে আসুন।

৭৮। **তিন চূড়া পাহাড়ের দেশে** (সুনির্মল বসু—পৃঃ ১৬৮-৬৯)

সারসংক্ষেপ ঃ—গোধূলিতে দূর গাঁয়ের পথে ডুলিতে করিয়া চলিতে চলিতে দূরে তিন চূড়া পাহাড় দেখা যায়। সেদিন শীতের বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আকাশে খণ্ড খণ্ড সিঁদুরে মেঘ অতীতের স্মৃতিকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। তখন হাট ভাঙিয়াছে, পথে গোরুর গাড়ি আর সারি সারি লোক ঘরে ফিরিতেছে। সেখানকার মেয়েরা অবোধ্য ভাষায় গান গাহিয়া চলিয়াছে, কিন্তু যেটুকু অস্পষ্ট বুঝা যায়, তাহাতেই প্রাণ যেন কেমন আকুল করিতেছে। ডুলি মাঠ পার হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। দিনের আলো গাছের মাথার উপর মিলাইয়া গেল। পাখিগুলি তাহাদের বাসায় কলরব করিয়া ফিরিতে লাগিল। নিঝুম শীতের সন্ধ্যায় ধূসর বনের মধ্যে দিয়া ডুলি হেলিয়া দুলিয়া চলিতে লাগিল।

৮৯। **উড়ানির চর** (জসীমউদ্দিন—পৃঃ ১৭০)

সারসংক্ষেপঃ—দীর্ঘ উড়ানির চর শুধু বালি দিয়া গড়া। ইহা জলের কিনারা ঘেঁসিয়া চলিয়াছে। এখানকার বায়ু শিথিল শেফালিকে উড়াইয়া লইয়া চলে। এখানে কৃষাণ বধূর খড়ের ঘরের উপর সীমের লতা, আর জাঙলায় (=মাচায়) লাউয়ের লতা দুলিতেছে। কলার পাতার উপর ফাল্গুনের হাওয়া বহিতেছে। হাওয়া জোরে বহিয়া চরখানাকে যেন উড়াইয়া নিতে চায়। নীচে জলের কলরবে নূপুর বাজার মতো শব্দ শুনা যায়।

৮০। **ঈশ্বর লাভ** (রাধারাণী দেবী—পৃঃ ১৭১-১৭৩)

সারসংক্ষেপঃ—শিষ্য গুরুর নিকট ভগবানকে দর্শন করিবার উপায় জানিতে চাহিলেন। গুরু তাঁহাকে নির্জন স্থানে গিয়া একমনে ঈশ্বরের চিন্তা করিতে আদেশ করিলেন। শিষ্য কোপীনমাত্র সম্বল করিয়া তাহারই চিন্তা করিতে বনে গেলেন। যেদিন ক্ষুধায় অস্থির হইতেন তিনি কেবল সেই দিনই ভিক্ষা করিতেন। একদিন এক ইন্দুর তাঁহার কৌপীন কাটিয়া ফেলিল। লোকের পরামর্শে তিনি ইন্দুর তাড়াইবার জন্য বিড়াল পুষিলেন। বিড়ালের জন্য দুধ দরকার; কিন্তু চাল ভিক্ষা চলে, গৃহস্থের কাছে দুধ ভিক্ষা চলে না। দুধের জন্য সাধুকে গোরু পুষিতে হইল। গোরুর খাবার ঘাস, খড় দরকার, আর রাখালও একজন চাই। সুতরাং কৃষিকার্য করা আবশ্যক হইয়া পড়িল। কৃষির জন্য জমি পাওয়া গেল, ধীরে ধীরে সাধুর নির্জন সাধন স্থান, কামার কুমার ব্যবসায়ীতে ভরিয়া গেল। গুরু আসিয়া দেখেন শিষ্য ভগবানকে ছাড়িয়া, ঘোরতর সংসারী হইয়াছেন। কিন্তু শিষ্যের নিকট তিনি শুনিতে পাইলেন, যে ঈশ্বরকে তিনি ছাড়িবার পরিবর্তে বহুর মধ্যে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

৮১। **রানার** (সুকান্ত ভট্টাচার্য—পৃঃ ১৮৬-১৮৮)

সারসংক্ষেপঃ—রানার (ডাকহরকরা) নূতন খবর আনার কাজে ভর্তি হইয়া রাত্রিতে দিক হইতে দিগন্তে ছুটিয়া চলিয়াছে। ভোর হইবার কাছাকাছি সময়ে সে তাহার চলার গতিবেগ বাড়াইয়া দিয়াছে—পূর্বের আকাশ লাল হইতেছে—আকাশের তারা মিট্ মিট্ করিতেছে। এমনি করিয়াই বছরের পর বছর রানার পৃথিবীর বোঝা মেলে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। এ বোঝা টানার শেষ কবে হইবে তাহা অজ্ঞাত। রানারের সংসারে নিত্য অভাব, কিন্তু জীবন বিপদাপন্ন করিয়াও সে পরের টাকার বোঝা বহিতেছে, উহা হইতে তাহার এক কপর্দকও খরচ করিবার উপায় নাই। তাহার জীবনের দুঃখের কাহিনী লইয়া কেহ কোন দিন মাথা ঘামাইবে না। সে নিজেই জানে না, নিজেকে পরের জন্য বিলাইয়া দিয়া তাহার কি লাভ হইবে। কিন্তু ভীরুতা তাহার নিজের নিকট অমার্জনীয়। তাই সে শতদুঃখ সহ্য করিয়াও জগতের নূতন খবর লইয়া নিত্য নিয়মিত সময়ে তাহার গন্তব্যস্থলে পৌঁছিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

ভাবার্থ লিখন

কোন প্রবন্ধ বা অনুচ্ছেদের ভাবার্থ লিখিতে হইলে লিখিতব্য বিষয়ের মূল ভাব অল্প কথায় অনাড়ম্বরভাবে প্রকাশ করিতে হইবে। ভাবার্থ সার সংক্ষেপ নহে। সার সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় সব তথ্যই সন্নিবেশিত করিতে হয়—**আর ভাবার্থে** (Substance) ভাব বা অভিপ্রায়েরই প্রাধান্য হেতু ভাবধারার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ভাবার্থে অলংকার বর্জন করিতে হইবে। অযথা শব্দের প্রয়োগ উচিত নহে। মূল বিষয়টির শব্দগুলিকে পরিবর্তন করিলেই ভাবার্থ হয় না—ইহা বিদ্যার্থিগণের স্মরণ রাখা দরকার। এই অধ্যায়ে ভাবার্থ রচনার কয়েকটি নমুনা দেওয়া হইল। **মূল পুস্তকগুলি পাঠ করিয়া বিদ্যার্থিগণ এইগুলির অনুশীলন করিলে উপকৃত হইবেন।**

কুরুপাণ্ডব

১। **যুধিষ্ঠির.........করুন** (পৃঃ ৩৬)

ভাবার্থ ঃ—পাশা খেলায়, যুধিষ্ঠির দৈববশে অধিকতর লাভ হইতে পারে ভাবিয়া বার বার হারিয়া গিয়াও বেশি ধনরত্ন বাজি রাখিয়া খেলিতে লাগিলেন। কিন্তু শকুনির কপটতায় তিনি পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইতে লাগিলেন। এইরূপ অবস্থায় বিদুর সকলের হিতের জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে শকুনির কপট খেলা বন্ধ করাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

২। **দেখিতেছি. ....রহিল না** (পৃঃ ৩৭)

ভাবার্থ ঃ—বাজি রাখিয়া পাশা খেলিতে গিয়া যে লোক ক্রমাগতই হারে তাহার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। এরূপ অবস্থায় লোকে নিজেই নিজের দারুণ অমঙ্গল ডাকিয়া আনে। যুধিষ্ঠির শকুনির উত্তেজনাপূর্ণ কথা শুনিয়া সর্বস্ব খোয়াইয়া নিজের পরিবর্তে পত্নী দ্রৌপদীকে পণ রাখিলেন। ধর্মরাজের এই কার্যে সভায় ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতিরা দারুণ ক্ষুব্ধ হইলেন। কিন্তু তাঁহার এই দুর্বুদ্ধি দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্র ও বন্ধুগণের আহ্লাদের সীমা রহিল না। পরের দুঃখে সজ্জনদের দুঃখ হয়—আর দুষ্টেরা আনন্দিত হয়।

৩। **গান্ধারী ... .লাগিলেন** (পৃঃ ৭৫-৭৬)

ভাবার্থ ঃ—চিরকাল যে পিতা অবাধ্য পুত্রের দুষ্কর্মে তাহাকে প্রশ্রয় দিয়া থাকেন সংসারের ঘোরতর বিপদের সময়, সেই পুত্রের অন্যায় কার্য তিনি বন্ধ করিতে পারেন না। তাই ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে তাহার অন্যায় হইতে বিরত করিতে পারেন নাই। যে রাজা অধর্মবুদ্ধিকে জয় করিতে পারেন না তিনি রাজ্য জয় বা রক্ষার অনুপযুক্ত। ইহা গান্ধারীর মত। কিন্তু পুত্র দুর্যোধনের কাছে ইহারও কোন ফল হয় নাই।

৪। **অর্জুন কহিলেন......লাভ হইবে।** (পৃঃ ৮৪-৮৫)

ভাবার্থ ঃ—ধর্মযুদ্ধে ক্ষত্রিয়ের গুরুজন বধ আপাতদৃষ্টিতে দুঃখকর এবং অমঙ্গলের কারণ বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু এরূপ চিন্তার মধ্যে ত্রুটি রহিয়াছে। মানুষের সামান্য বুদ্ধি দিয়া সব সময় ন্যায়-অন্যায় বুঝা যায় না। এই কারণে যাহা যাহার স্বধর্ম তদনুসারে কার্য করিতে হয়। এখানে ফলাফল ও নিজের ব্যক্তিগত অল্প বা অধিক সুখদুঃখের বিচার করা চলে না। ক্ষত্রিয় তাহার ধর্মযুদ্ধে

যোগদান করার নির্দিষ্ট কর্তব্য হইতে কখনও বিমুখ হইবে না। এরূপ করিলে সে কখনও কাহারও মৃত্যুর জন্য দায়ী হইবে না। কার্যকারণ প্রবাহে সকল ঘটনা ঘটিতেছে; এখানে কর্তব্য করিবার পর কেহ অপরের ক্ষয়-ক্ষতির জন্য দায়ী হইবে না।

৫। **এদিকে.........নাই।** (পৃঃ ১২৫)

ভাবার্থ ঃ—অধর্মের ফল হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই। দুর্যোধন ইহা না ভাবিয়া যুদ্ধে তাহার বন্ধুগণের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিলেন। তাহার পক্ষের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটিতেই এইরূপ ঘটিয়াছে বলিয়া তাহার ধারণা। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। একে পাণ্ডবপক্ষীয়েরা অমিত বলশালী তাহার উপর কৌরবপক্ষের পাপ—এই দুইয়ে মিলিয়া তাহাদের অনর্থ ঘটাইতেছে।

৬। **তখন . কী হইবে?** (পৃঃ ১৩৭)

ভাবার্থ ঃ—প্রবল শত্রুর দুর্বল মুহূর্তে যদি কেহ তাহাকে ধ্বংস না করিয়া দয়া প্রদর্শন করে, তবে সে কখনই তাহার শত্রুকে বিনাশ করিতে পারিবে না। কাল বিলম্ব না করিয়া শত্রুকে ধ্বংস করা উচিত। শত্রুর বিপদের সময় তাহাকে আক্রমণ করা কাপুরুষতা নহে। নীচ ব্যক্তিরাই নিজের পূর্বের দুষ্কর্মের কথা স্মরণ না করিয়া সাময়িক বিপদের সময় দৈবকে দোষী করে। এরূপ শত্রু কখনও কৃপার যোগ্য নহে।

৭। **তখন রাজা....... .হইবে।** (পৃঃ ১৪৬-৪৭)

ভাবার্থ ঃ—পাপী যখন বিপদে পড়ে তখন সে ন্যায়ের কথা, ধর্মের কথা উত্থাপন করে। সম্পদের সময় সে ধর্মকে কোনরূপেই গ্রাহ্য করিতে চাহে না। বহু যোদ্ধার এক যোদ্ধাকে আক্রমণ করা ধর্মসংগত কার্য নহে। যে ধর্মপালন করে তাহারই মুখে ধর্মের কথা শোভা পায়। সুবিধাবাদীর নিকট ধর্মের কোন মূল্য নাই। দুর্যোধন একা নিরস্ত্র, কিন্তু তিনি নিজে পূর্বে অভিমন্যু বধের সময় ধর্মযুদ্ধের নিয়ম পালন করেন নাই। আর এখন প্রতিপক্ষ পাণ্ডবদের সংখ্যা বেশি। তথাপি ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাহাকে অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দ্বৈরথ যুদ্ধ করিবার অবকাশ দিলেন।

৮। **এই কথা বলিতে যাইবে।** (পৃঃ ১৫০-৫১)

ভাবার্থ ঃ—দুর্যোধনের দুঃসময়ে ভীম তাঁহাকে আক্রমণ করিতে গেলে, বলরাম তাঁহার প্রতি বিরূপ হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের মতে তাঁহাদের আত্মীয় পাণ্ডবগণের দোষ ধরা উচিত নহে। কেননা আত্মীয়গণ নানাভাবে কৌরবদের দ্বারা অত্যাচারিত। আর ভীম দুর্যোধনের উরু ভঙ্গের প্রতিজ্ঞাও করিয়াছিলেন। বলরামের নিকট শ্রীকৃষ্ণের কোন যুক্তি খাটিল না। তিনি অধর্মকে অধর্ম বলিয়াই মনে করেন। অর্থ এবং কামনা হইতে অধর্ম উৎপন্ন হয়।

৯। **"শুভমুহূর্ত দ্রৌপদীর আশা ত্যাগ করিলেন।"** (পৃঃ ২৩-২৪)

ভাবার্থ ঃ—দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-সভায় কৃষ্ণ ও বলরাম চারদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ছদ্মবেশী পাণ্ডবগণকে চিনিতে পারিলেন। জতুগৃহ-দাহের পর তাঁহারা অজ্ঞাত অবস্থায় আছেন জানিয়া দুই ভাই আশ্বস্ত হইলেন। তারপর লক্ষ্যভেদ কার্যে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজগণ সকলেই বিফল মনোরথ হইলেন।

১০। **"কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের . নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইবে।"** (পৃঃ ৯৮)

ভাবার্থ ঃ—অর্জুন কৃষ্ণের সখা। অর্জুনের ভীষ্মবধের প্রতিজ্ঞাভঙ্গের দুঃখ তাঁহারই সর্বাপেক্ষা অধিক। তাই তিনি অর্জুনের প্রতিজ্ঞা রক্ষাকল্পে ভীষ্মের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ইহাতেও আবার শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধে

অস্ত্র ধারণ না করার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়। সুতরাং যুধিষ্ঠির ইহাতে সম্মত না হইয়া উদারহৃদয় ভীষ্মের নিকট তাঁহার বধের উপায় জানিবার জন্য তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করা স্থির করিলেন।

১১। **"এইরূপ কথোপকথনে......কৌশল উপদেশ করি নাই।"** (পৃঃ ১১৬)

ভাবার্থ ঃ—কৃষ্ণ ও অর্জুন পাণ্ডব শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহারা শিবিরস্থ সকলকে নিতান্ত বিহ্বল দেখিয়া এবং অভিমন্যুকে তথায় উপস্থিত না দেখিতে পাইয়া তাহার চক্রব্যূহ প্রবেশ করিয়া বিপদাপন্ন হইবার আশঙ্কায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন।

রামায়ণী-কথা

১২। "অযোধ্যাকাণ্ডে বিশ্বশুদ্ধ সকল ব্যক্তি অধৈর্য। কেহ শোকাকুল, কেহ ক্রোধোন্মত্ত, কেহ বা রাজ্য-কামুক! রামচন্দ্র মাত্র এই অধ্যায়ে নিশ্চল কর্তব্যের বিগ্রহ স্বরূপ অকুণ্ঠিত। তাহার জন্য জগৎ কুণ্ঠিত কিন্তু তিনি নিজের জন্য কুণ্ঠিত নহেন। যেখানে বৈষয়িকের সঙ্গে বৈষয়িকের সংঘর্ষ—কেহ বা সত্যপরায়ণ কেহ বা অসত্য-পরায়ণ,—সেইখানেই রামচন্দ্র ত্যাগপরায়ণ। তাঁহার বিষয়ে ঘৃণা ও সত্যে অনুরাগ সর্বত্র আমাদিগের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠা অপরাপর অপূর্ব ত্যাগ স্বীকারে প্রণোদিত করিতেছে, অথচ কোন উন্নত গগনচুম্বী শৈলশৃঙ্গের ন্যায় তাঁহার শোভন চরিত্র সকলের ঊর্ধ্বে অবস্থিত।

কিন্তু পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে রামচন্দ্রের আত্ম-সংযম শিথিল হইয়া পড়িল। তিনি এ পর্যন্ত লক্ষ্মণাদিকে উপদেশ দিয়া সৎপথে প্রবর্তিত করিয়াছেন, এবার তিনি তাঁহাদের উপদেশার্হ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার লংকাজয় অপেক্ষা অযোধ্যাকাণ্ডের আত্মজয়ের আমরা অধিক পক্ষপাতী।

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে রামচন্দ্রের বৈরাগ্যের শ্রী কতক পরিমাণে চলিয়া গেলেও তিনি একটু শ্রীহীন হইলেন বলিয়া মনে হয় না, কাব্যশ্রী তাঁহাকে বিশেষরূপে অধিকার করিয়া বসিল! তাঁহার সুধামধুর প্রেমোন্মাদ, পুষ্পিত অনুগোদ প্রদেশের প্রাকৃতিক বিচিত্রভাবের সঙ্গে ঐক্যতান বিরহ-গীতি, ঋতুভেদে মাল্যবান্ পর্বতের বিবিধ শোভা-সম্পদ্ দর্শনে অনুরাগী রাজকুমারের উন্মত্ত ভাবাবেশ—এইসকল অধ্যায়ে অফুরন্ত মধুর ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। আমরা তাঁহার চিত্তসংযমের অভাবে পরিতৃপ্ত হইব কি সুখী হইব, তাহা মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারি নাই। নানা বিচিত্র ভাবে এই সকল অধ্যায়ে তাঁহার চরিত্রের বিকাশ পাইয়াছে।" (পৃঃ ৪৪-৪৫)

ভাবার্থ ঃ—অযোধ্যাকাণ্ডের রাম চরিত্র সর্বপ্রকার শোক দুঃখ, ক্রোধ, স্বার্থপরতার মধ্যেও ধৈর্য ও ত্যাগে মহীয়ান্। রামের আত্মজয় লংকা বিজয় অপেক্ষা বড় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু রামায়ণের পরবর্তী অংশের রাম চরিত্রে সীতা বিরহের দুঃখজনিত দুর্বলতা উপস্থিত হইলেও উহা কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট বলিয়া আমাদের নিকট উদ্বেগ-জনক নহে—বরং উপাদেয়।

১৩। "সূর্য ভিন্ন, জগৎ ও জল ভিন্ন শস্য বাঁচিতে পারে"—কিন্তু রামকে ছাড়িয়া আমি জীবনধারণ করিতে অসমর্থ। এই সকল কথা বলিয়া কখনও রাজা রুদ্ধস্বরে কৈকেয়ীকে গঞ্জনা করিলেন, কখনও কৃতাঞ্জলি হইয়া কৈকেয়ীর পদে পতিত হইলেন। কিন্তু কৈকেয়ীর হৃদয় কিছুমাত্র আর্দ্র হইল না; তিনি রুদ্ধস্বরে বলিলেন—"মহারাজ শিবি সত্য রক্ষার জন্য স্বীয় মাংস শ্যেন পক্ষীকে প্রদান করিয়াছিলেন, সত্যবদ্ধ হইয়া অলর্ক তাঁহার চক্ষু উৎপাটন করিয়াছিলেন, সমুদ্র সত্যবদ্ধ থাকাতে বেলাভূমি

আক্রমণ করেন না, তুমি যদি সত্যরক্ষা না কর, তবে এখনই আমি বিষ ভক্ষণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।" মহারাজ দশরথ ক্রমেই বিহ্বল হইয়া পড়িলেন; অভিষেকোৎসবে আমন্ত্রিত হইয়া নানা দিগ্‌দেশ হইতে রাজগণ আগত হইয়াছেন; বহু বৃদ্ধ, গুণবান্‌ ও সজ্জনগণ একত্র হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে লইয়া কল্য যে মহতী সভার অধিবেশন হইবে, তিনি সেই সভায় উপস্থিত হইবেন কিরূপে? আর জগতে তিনি কাহাকেও মুখ দেখাইতে পারিবেন না;—মানী ব্যক্তির অপমান মৃত্যুতুল্য; মহামান্য রাজা দশরথের যে সম্মান পর্বতের ন্যায় উচ্চ ও অটুট ছিল, আজ তাহা ভূলুণ্ঠিত হইবে। এক দিকে এই ঘোর লজ্জা,—অপর দিকে চিরস্নেহময়, অনুগত ভৃত্যের ন্যায় বশ্য, প্রিয়তম জ্যেষ্ঠপুত্রের ইন্দীবরসুন্দর মুখখানি মনে পড়িয়া, দশরথের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল।" (পৃঃ ৮-৯)

ভাবার্থঃ—একদিকে প্রিয় অনুগামী গুণবান্‌ পুত্রকে রাজ্যাধিকার হইতে অকারণে বঞ্চিত করিবার জন্য গ্লানি—আর অপর দিকে সত্যভ্রষ্ট হইবার মৃত্যুতুল্য অপমানের আশঙ্কায় দশরথের হৃদয় অতিমাত্রায় ব্যথিত হইয়া উঠিল।

১৪। **"ভরতের মুখ শুষ্ক, লজ্জা......কারণ অবধারিত।"** (পৃঃ ৪০)

ভাবার্থঃ—রামচন্দ্র ও ভরত দুইজনই ত্যাগী পুরুষ। রাজ্যত্যাগের গৌরবে রাম পৃথিবীর একমাত্র অধিপতিরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। ভরত লজ্জা ও মনস্তাপে শুষ্ক ও শীর্ণ। ভরতের নিকট পিতৃবিয়োগের সংবাদ শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র অবিচলিত থাকিলেন, কেন না মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী—তাহার জন্য প্রস্তুত থাকা সকলেরই উচিত।

১৫। **"আরব্ধ কার্য নষ্ট করিয়া যদি কোন অসংকল্পিত পথে কার্যপ্রবাহ প্রবর্তিত হয়.........দৈবের প্রশংসা করিতেছেন।"** (পৃঃ ১০৮-১০৯)

ভাবার্থঃ—আরব্ধ কার্য সংকল্পিত পথ হইতে অন্য দিকে চলিলে কতক লোক ইহার জন্য দৈবকে দায়ী করে। আর একদল লোকের কাছে দৈব বলিয়া কোন কিছু নাই। তাহারা বলে—প্রতিকারে অনিচ্ছুক অপারগ দুর্বলচিত্ত লোকেরাই দৈবের দোহাই দিয়া থাকে। চেষ্টা ও একাগ্রতা দ্বারা প্রতিকূল অবস্থাকে আয়ত্তে আনা যায়।

১৬। **"সীতার কাহিনী, দুঃখ ও পবিত্রতা এবং ত্যাগের কাহিনী........ ..পরম পরিতৃপ্তিকর হইয়া উঠে।"** (সীতা, ১৬৫-৬৬)

ভাবার্থ ঃ—রামায়ণের সীতা চরিত্র কবিসৃষ্ট কাল্পনিক আদর্শের বস্তু নহে। উহাতে দুঃখের মধ্যে ত্যাগ, সংযম ও পবিত্রতা রহিয়াছে। সীতার সতীত্ব ভারতের নারীগণের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। তাই আজও উহা জীবন্ত।

১৭। **"কিছুকালের মধ্যে.... লাগিলেন।"** (দশরথ, পৃঃ ১৭)

ভাবার্থ ঃ—গভীর দুঃখের আঘাত না পাইলে লোকের কখনও জ্ঞানসঞ্চার হয় না' কর্মানুসারে এ সংসারে সুখ-দুঃখ, সম্পদ-বিপদের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কোন কর্মের কিরূপ ফল হয়, দুঃখের সময়েই তাহা লোকে ভালভাবে চিন্তা করিলে জানিতে পারে। দশরথের মনে অকারণ অন্ধমুনিপুত্র বধের কথা উদিত হইল এবং রাম-বনবাসে পুত্রশোকের কারণ তিনি জানিতে পারিলেন।

১৮। **"আরব্ধ কার্য......করিতেছেন।"** (পৃঃ ১১১)

ভাবার্থ ঃ—মানুষ কোন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া কোন কাজ আরম্ভ করে। কিন্তু কাজ যখন তাহার অভিলষিত পথ হইতে অন্য দিকে যায় তখন সে ইহার জন্য দৈবকে দোষী করে। কিন্তু কর্মের শক্তিতে বিশ্বাসী ব্যক্তি কখনও দৈবকে দোষী

করিয়া কাপুরুষতা দেখায় না। সে তাহার কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা তাহাকে নিজের পথে চালাইতে প্রবৃত্ত হয়। দৈবের উপর দোষ চাপান দুর্বলতার লক্ষণ।

১৯। "প্রেমের পুরস্কার ছিল প্রেম, সৎকর্মের পুরস্কার ছিল আত্মতৃপ্তি, ইহা হইতে উচ্চতর স্বর্গের কল্পনা সমাজে প্রচলিত ছিল না; সেই যুগে সমস্ত বৃত্তির স্বাভাবিক উপায়ে বিকাশ ও চরিতার্থতা সম্পাদনের জন্য যৌথ পরিবার প্রথা উৎকৃষ্ট-রূপে মনুষ্য সমাজের উপযোগী ছিল।

সেইরূপ গৌরবোজ্জ্বল অবস্থা প্রকৃতই সমাজের কোনকালে হইয়াছিল কিনা, তৎ সম্বন্ধে কাহারও মনে দ্বিধা থাকিতে পারে। কিন্তু সমাজ যে এইরূপ এক মহিমা-মণ্ডিত শান্তিময় নিকেতনে পৌঁছিতে পারে. রামায়ণ কাব্যে সেই সম্ভাবনা যথার্থে পরিণত হইয়া অমর বর্ণে চিত্রিত হইয়া আছে। মনুষ্যের সৎপ্রবৃত্তিনিচয়ের বিকাশ করিবার জন্য একটি মহাবিদ্যালয় আবশ্যক.—বর্তমানে য়ুরোপীয় সমাজ সেই বিদ্যালয়ের স্থান গ্রহণ করিতে পারে নাই। সেই বিদ্যালয়ের স্বভাবের ছন্দে. উদার-ধর্মনীতির ভিত্তিতে গঠন করিতে হইবে—স্বর্গীয় পবিত্র আলোক এবং প্রাণসঞ্চারিত বায়ুপথ নিরোধ করিয়া প্রাচীর তুলিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। রামায়ণে চিত্রিত যৌথ-পরিবার সেই মহাবিদ্যালয়।" (রামায়ণ ও সমাজ, পৃষ্ঠা ২০০)

ভাবার্থ :—একান্নবর্তী পরিবারের লোকেরা নিজেদের মধ্যে সদ্বৃত্তি বিকাশের বিশেষ সুবিধা পাইয়া থাকে। ভাল কাজ করিয়া আত্মতৃপ্তি আর ভালবাসার পরিবর্তে ভালবাসা লাভ করা একান্নবর্তী পরিবারের মূল উদ্দেশ্য। ত্যাগ ও সংযম ইহার গোড়ার কথা। রামায়ণ হইতে এই শিক্ষালাভই করা যায়।

২০। সংগীতের ন্যায় মানবজীবনেরও একটি মূলরাগিণী আছে। সুগায়ক কণ্ঠের গীতি যেরূপ নানারূপ আলাপচারিতে ঘুরিয়া ফিরিয়াও স্বীয় মূলরাগিণীর বাহিরে যাইয়া পড়ে না, মানবচরিত্রেও সেইরূপ একটি স্বপরিচায়ক স্বাতন্ত্র্য আছে—সেইটিকে জীবনের মূলারাগিণী বলা যায়; জীবনের কার্যকলাপ সমগ্রভাবে বিবেচনা করিলে উহা আবিষ্কৃত হয় যিনি যাহাই বলুন.—সেই অভিষেকোপযোগী বিশাল সম্ভারের প্রতি অবজ্ঞাব সহিত দৃষ্টিপাত করিয়া অভিষেকব্রতোজ্জ্বল শুদ্ধ পট্টবস্ত্রধারী রামচন্দ্র যখন বলিয়াছিলেন—"তাহাই হউক. আমি রাজার প্রতিজ্ঞা পালনপূর্বক জটাবল্কল ধারণ করিয়া বনবাসী হইব।"—সেই দিনের সেই চিত্রই রামের অমর চিত্র.—এই অপূর্ব বৈরাগ্যের শ্রী তাঁহাকে চিনাইয়া দিবে। সেদিন রাবণ রামের শরাসনের তেজে ভ্রষ্টকুণ্ডল ও হৃতশ্রী হইয়া পলাইবার পন্থা পাইতেছিলেন না সেদিন রামচন্দ্র ক্ষমাশীল গভীর কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"রাক্ষস, তুমি আমার বহু সৈন্য নষ্ট করিয়া এখন একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ, আমি ক্লান্ত ব্যক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করি না. তুমি আজ গৃহে যাইয়া বিশ্রাম কর কল্য সবল হইয়া পুনরায় যুদ্ধ করিও।" সেই মহাহবের মহতী প্রাঙ্গণভূমিতে ধার্মিকপ্রবরের সেই কণ্ঠস্বর স্বর্গীয় ক্ষমা উচ্চারণ করিয়াছিল। উহাই তাঁহার চিরাভ্যস্ত কণ্ঠধ্বনি। (রামচন্দ্র, পৃঃ ৬২-৬৩, উঃ মাঃ ১৯৬০)

ভাবার্থ :—জীবনে মানুষ বহুপ্রকার কাজ করিয়া থাকে। বহু কাজের মধ্যে তাহার নানা প্রকার আচরণ দেখা যায়। কিন্তু এই বিচিত্র আচরণের মধ্যেও প্রত্যেকের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। রামচন্দ্রের চরিত্রের বিশিষ্টতা ত্যাগ ও বৈরাগ্য। তাঁহার জীবনের সর্বক্ষেত্রেই এই বিশিষ্টতা প্রকাশ পাইয়াছে।

২১। আজ আমরা স্বেচ্ছায় আমাদের গৃহগুলিকে লক্ষ্মীশূন্য করিতেছি। আজ বহুস্থানে সহধর্মিণীর স্থলে স্বার্থরূপিণী, অলংকার-পেটিকার যক্ষীগণ আমাদিগকে

ঘিরিয়া গৃহে একাধিপত্য স্থাপন করিতেছে, যাহারা এক উদরে স্থান পাইয়াছিলেন তাঁহারা আজ এক গৃহে স্থান পাইতেছেন না। হায়, কি দৈব বিড়ম্বনা! যাঁহাদিগকে বিশ্বনিয়ন্তা মাতৃগর্ভ হইতে পরম সুহৃদ্‌রূপে গড়িয়া দিয়া আমাদিগকে প্রকৃত সৌহার্দ্য শিখাইবেন তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া পাঞ্জাব ও পুণা হইতে আমরা সুহৃৎ সংগ্রহ করিব, এ কথা কি বিশ্বাস্য? আজ আমাদের রাম বনবাসী, লক্ষ্মণ প্রাসাদ-শীর্ষ হইতে সেই দৃশ্য উপভোগ করেন; আজ লক্ষ্মণের অন্ন জুটিতেছে না, রাম স্বর্ণথালে উপাদেয় আহার করিতেছেন। আজ আমাদের কষ্ট, দৈন্য বনবাসের দুঃখ সমস্তই দ্বিগুণতর পীড়াদায়ক, লক্ষ্মণগণকে আমাদের দুঃখের সহায় ও চিরসঙ্গী মনে ভাবিতে ভুলিয়া যাইতেছি। হে ভ্রাতৃবৎসল, মহর্ষি বাল্মীকি তোমাকে আঁকিয়া গিয়াছেন, চিত্র হিসাবে নহে—হিন্দুর গৃহদেবতা-স্বরূপ তুমি এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলে। আবার তুমি হিন্দুর ঘরে ফিরিয়া এস, সেই শত প্রিয়-প্রসঙ্গ-মুখরিত এক গৃহে একত্র বসিয়া আহার কর, স্বর্গ হইতে আমাদের মাতারা সেই দৃশ্য দেখিয়া আশীষ বর্ষণ করিবেন, আমাদের দক্ষিণ বাহু অভিনব বলদৃপ্ত হইয়া উঠিবে আমরা এ দুর্দিনের অন্ত দেখিতে পাইব। (লক্ষ্মণ, পৃঃ ৮৮-৮৯, **উঃ মাঃ ১৯৬১**)

ভাবার্থঃ—রামায়ণে সহোদর ভ্রাতার সহিত সহোদর ভ্রাতার স্বাভাবিক প্রেমের সম্পর্ক দেখান হইয়াছে। কিন্তু বর্তমান সমাজে অনুগত কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠের গৃহে স্থান পায় না। তাই একে অন্যের সুখদুঃখের সঙ্গী হইবার পরিবর্তে পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইতেছে। পূর্বে দুই সহোদরের সমবেত শক্তিদ্বারা জীবন-যাত্রার পথে যে কল্যাণ লাভ হইত তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা হউক।

২২। **"বনবাসাজ্ঞা তাঁহার প্রশংসা করিতেছেন।"** (লক্ষ্মণ, পৃঃ ৮২-৮৩)

ভাবার্থঃ—আবদ্ধ কার্য ঈপ্সিত পথ ছাড়িয়া ভিন্ন পথে চলিলে কতক লোক ইহার জন্য দৈবকে দায়ী করে। কিন্তু দীন এবং দুর্বল ব্যক্তিরাই দৈবের উপর আস্থা স্থাপন করে।

শক্তিমান্ অধ্যবসায় সম্পন্ন লোকেরা কখনও দৈবকে গ্রাহ্য করে না। তাহারা নিতান্ত সংকটের সময়ও চেষ্টা দ্বারা বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রাণপণে প্রতিকারসাধনে লাগিয়া যায়।

২৩। **"বাল্মীকি রামচরিত কথাকে কিনিয়া রাখিয়াছে।"** (রামায়ণী কথা ভূমিকা, পৃঃ ॥৶০)

ভাবার্থঃ—ভারতবর্ষে রামায়ণকে কেহ শুধু কাব্য বলিয়া বিবেচনা করে না। রামায়ণ পরিপূর্ণ মানবের আদর্শ চরিত্রের কাহিনী যুগ যুগ ধরিয়া ভারতকে শুনাই-য়াছে। পরিপূর্ণ সত্যকে জানিবার আকাঙ্ক্ষা ভারতের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা। ভারতের ভক্ত হৃদয়ে এই পরিপূর্ণতার আকাঙ্ক্ষাকে বাল্মীকি মুনি তাঁহার অমর কাব্যে রূপ দান করিয়াছেন।

২৪। **"এই কৌশল্যাচিত্র পাবেন না।"** (রামায়ণী কথা, কৌশল্যা, পৃঃ ১০০)

ভাবার্থঃ—রামায়ণের কৌশল্যা-চরিত্র ভারতের আদর্শ জননীর চরিত্র। ইহাতে সন্তানের জন্য একাধারে স্নেহ এবং আত্মত্যাগ একসঙ্গে মিশিয়াছে। কৌশল্যার মতে আজও শত শত জননী সন্তানের কল্যাণ কামনায় ব্রত এবং উপবাস করিতেছেন। পুত্রের আসন্ন বিচ্ছেদের দুঃখকে অন্তরে চাপিয়া রাখিয়া কৌশল্যা প্রবাসে সত্য ও নিষ্ঠার সহিত ধর্ম পালন করিবার উপদেশ দিয়া রামচন্দ্রকে বিদায় দিয়াছিলেন। এইখানেই ভারতের অন্য মাতৃগণের চরিত্র হইতে তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

২৫। **"যৌথ পরিবার.........আর কিসে দিতে পারে?"** (রামায়ণ ও সমাজ, পৃঃ ১৫৬-৫৭)

ভাবার্থ ঃ—কল্যাণের আদর্শ লইয়া যৌথ-পরিবার প্রাচীন সমাজের স্বভাব হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্তীযুগে সেই যৌথ পরিবারের স্নেহ মায়া মমতা আত্মত্যাগ নিতান্ত কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছে। স্বভাবকে আধুনিক মানুষ যত দূরে সরাইয়া দিক না কেন, মৃত্যুর পূর্বে প্রকৃত যৌথ-পরিবারের কল্যাণবাণী তাহাকে শুনাইবে। মৃত্যুর পূর্বে নিশ্চয়ই তাহাকে মনে করিতে হইবে সমাজে যাহা মঙ্গলময় ব্যবস্থা ছিল তাহা তাহার প্রতিপালন করা উচিত ছিল।

২৬। **"সূর্য ভিন্ন... ..হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল।"** (দশরথ, পৃঃ ৬)

ভাবার্থ ঃ—অভিষেকের পূর্বদিন কৈকেয়ী রাজা দশরথের নিকট রামের বনবাসের প্রস্তাব করিলেন। রাজার কৈকেয়ীকে এই নিদারুণ বরলাভ হইতে নানাভাবে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা বিফল হইল। একদিকে অভিষেক বন্ধ হওয়ায় নিমন্ত্রিত রাজগণের নিকট লজ্জায় আর অপরদিকে দোষলেশশূন্য অনুগত পুত্র রামচন্দ্রকে অকারণে বনবাসে পাঠাইবার কল্পনায় দারুণ দুঃখে তিনি অভিভূত হইলেন।

অথবা, অভিষেকের পূর্বদিন বিমাতা কৈকেয়ী দশরথের নিকট রামকে বনে পাঠাইবার বর চাহিলেন। রাজা বহু চেষ্টা করিয়াও কৈকেয়ীকে এই অন্যায় বর গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। অভিষেক বন্ধ হইলে মানী দশরথের সম্মান নিমন্ত্রিত রাজাদের নিকট নষ্ট হইবে। আর দ্বিতীয়তঃ দোষশূন্য অনুগত পুত্র রামচন্দ্রকে বনে পাঠাইবার তিনি কারণ খুঁজিয়া পাইলেন না। উক্ত দুইটি চিন্তায় দশরথ দারুণ দুঃখে অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

২৭। **"মনুষ্যের সদৃশ্য দেহ. শ্রেষ্ঠ কর্তব্য।"** (রামায়ণী কথা, রামচন্দ্র, পৃঃ ৩১)

ভাবার্থ ঃ—মৃত্যু জীবের স্বাভাবিক গতি এবং ইহা অবধারিত। মৃত্যুর জন্য নির্ভয়ে সকলেরই প্রতীক্ষা করা উচিত। জীবিত ব্যক্তির মৃত্যু যে কোন সময় উপস্থিত হইতে পারে—এরূপ অবস্থায় মৃতের জন্য শোক করা বৃথা, কারণ আয়ু ব্যয়িত হইলে তাহা ফিরিয়া আসে না। পিতার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা অপেক্ষা তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালনই পুত্রের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

২৮। **"অযোধ্যাকাণ্ডে..... আমরা অধিক পক্ষপাতী।"** (রামচন্দ্র, পৃঃ ৩৩-৩৪)

ভাবার্থ ঃ—রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডের সর্বত্র কেহ শোকে কেহ ক্রোধে, কেহবা রাজ্যলাভের জন্য নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। এই অস্থিরতার মধ্যে একমাত্র রামচন্দ্র ধৈর্যের প্রতিমূর্তি হইয়া আছেন। তাঁহার ভোগে স্পৃহা নাই, সত্যে ও কর্তব্যনিষ্ঠায় তিনি অটল। এইরূপ অবস্থা রামচন্দ্রের আত্মজয়ের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু রামায়ণের অন্যত্র সংকটের সময় তিনি নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়েন। লংকাজয়ের চেয়ে অযোধ্যাকাণ্ডে রামচন্দ্রের আত্মজয়কে বড় স্থান দেওয়া যাইতে পারে।

২৯। **"সীতার কাহিনী......পরিতৃপ্তিকর হইয়া উঠে।"** (সীতা, পৃঃ ১২৭)

ভাবার্থ ঃ—সীতার কাহিনী ত্যাগে, দুঃখে এবং পবিত্রতায় উজ্জ্বল। ভারতের গৃহে গৃহে তাঁহারই সতীত্বের আদর্শ সযত্নে রক্ষিত। ভারতীয় নারীগণের লজ্জা, বিনয় ও সহিষ্ণুতায় সীতা জীবন্ত। সীতা কবির সৃষ্ট নহেন- তিনি ভারতবর্ষে বিধাতার দানস্বরূপ। ভারতের দুঃখ ও বিড়ম্বনার মধ্যে সীতার চরিত্র সান্ত্বনার বস্তু।

৩০। **"যে কাজের ভার তিনি......করিয়াছেন।"** (হনুমান, পৃঃ ১৪৪-১৪৫)

ভাবার্থ ঃ—হনুমান রামচন্দ্রের জন্য যে সকল কাজ করিয়াছেন তাহাতে ভক্তির

বাহ্য উচ্ছ্বাস নাই। তিনি সকল কাজেই তীক্ষ্ণ বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। প্রভুর কার্য যাহাতে দোষত্রুটিশূন্য হইয়া সম্পন্ন হয় সেদিকে তিনি সর্বদা যত্নবান থাকিতেন। রামচন্দ্রের প্রতি তাঁহার ভক্তি শুধু ভক্তিই ছিল- তাহাতে তিনি কোন ফললাভের আশ করেন নাই। হনুমান্ নিষ্কাম কর্মযোগী।

৩১। **"আমাদের সমাজে. হয় না।"** (রামায়ণী কথা, 'রামায়ণ ও সমাজ', পৃঃ ১৫৫)

ভাবার্থ ঃ—যৌথ-পরিবারের লক্ষ্য পারিবারিক জীবনে শান্তিলাভ। নীতি এবং শৃঙ্খলার মাধ্যমে এই শান্তিকে লাভ করা যাইতে পারে। নীতি এবং শৃঙ্খলার সাহায্যে বিলাসিতা বর্জন এবং পরার্থে আত্মত্যাগের শিক্ষাই ইহার মূল কথা। যৌথ-পরিবারের বিভিন্ন উপাদানগুলিকে এক ছাঁচে গড়িয়া লক্ষ্যস্থানে পেঁৗছাইয়া দেওয়া হয়।

৩২। **"যে জলরাশির. সন্দেহ নাই।"** (রামায়ণী কথা, 'রামায়ণ ও সমাজ, পৃঃ ১৫৪-১৫৫)

ভাবার্থ ঃ—যৌথ-পরিবার যতদিন স্বাভাবিক পথে চলে ততদিনই ইহার উপকারিতা দেখা যায়। কিন্তু এই পারিবারিক সংস্থার দোষও আছে। জীবনকে অত্যধিক নিয়ম ও শৃঙ্খলার মধ্যে রাখিলে মানুষের স্বাধীন চিন্তা ও আত্মবিকাশের শক্তি বাধাপ্রাপ্ত হয়। একজনের জন্য পরিবারের সকলের বা বহুর অতিরিক্ত চিন্তা বা যত্ন সেই লোককে কাপুরুষ করিয়া তোলে।

৩৩। **"এদিকে... সমুত্থিত হইয়াছে।"** (রামায়ণী কথা, 'রামচন্দ্র' পৃঃ ২৮-২৯)

ভাবার্থ ঃ—গ্রীষ্মপ্রধান প্রকৃতির শোভার প্রাচুর্যের মধ্যে চিত্রকূট পর্বত দাঁড়াইয়া আছে। ইহার একদিকে এক শৃঙ্গশৈল। গেরুয়ার রঙে রাঙা চূড়ায় সূর্যের আলোতে মনে হইতেছে ইহা ঠিক যেন অগ্নিশিখা। অপরদিকে গুহার পাশ দিয়া সারি সারি পাহাড় আকাশে মাথা তুলিয়া আছে। এইসব পাহাড়ের গায়ের নানা অংশ সূর্যের কিরণে রুপার মত চকচক করিতেছে। কোথাও বা রক্তকাঞ্চন ও লোধ্র গাছ গায়ে-গায়ে লাগিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কোথাও বা ঢালু পথের উপর ·র্গগাছ নত হইয়া পড়িয়াছে। এখানে নানা গাছ—নানা লতার নানা রঙের সমারোহ। ইহার মধ্যে পার্বত্য নদীর গম্ভীর তরঙ্গধ্বনি শোনা যাইতেছে।

৩৪। **"কৃষ্ণ সর্প. যাও।"** (রামায়ণী কথা, 'রামচন্দ্র', পৃঃ ২৭-২৮)

ভাবার্থ ঃ—বনবাসের প্রথম রাত্রিতে রাম সীতা ও লক্ষ্মণ এক গাছের নীচে আশ্রয় লইলেন। হিংস্র জন্তুর বাসস্থল সেই বনে তাঁহারা অনভ্যস্ত জীবনযাপন করিতে গিয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইলেন। সারারাত্রি রামচন্দ্রের চোখে ঘুম নাই। তিনি নানা-ভাবে লক্ষ্মণের নিকট পরিতাপ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে বনবাসের কষ্ট ভোগ না করিয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইতে বলিলেন।

৩৫। **"চিত্রকূট পর্বতের ....আমার পরিহার্য।"** (রামায়ণী কথা. রামচন্দ্র. পৃঃ ২৯-৩০)

ভাবার্থ ঃ—বনবাসী রামকে অযোধ্যায় ফিরাইয়া লইবার জন্য ভরত আত্মীয় বন্ধু-গণকে লইয়া সসৈন্যে চিত্রকূটে উপস্থিত হইলেন। লক্ষ্মণ ভরতের আগমন দুরভি-সন্ধিমূলক মনে করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু রাম এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট রহিলেন। তাঁহার মতে ভাই ভরতকে বধ করিয়া যে ঐশ্বর্য পাওয়া যাইবে তাহা কখনও সুখের হইতে পারে না। আত্মীয়বধ দ্বারা লব্ধদ্রব্যকে বিষের মতো ত্যাগ করা উচিত।

৩৬। **"গভীর অরণ্যচ্ছায়ায়......বলিয়াছি।"** (রামায়ণী কথা, রামচন্দ্র পৃঃ ৪২)

ভাবার্থ ঃ—বৈরাগ্যের অনুশীলন করিতে রামচন্দ্র বনে আসিয়াছিলেন। তাঁহার কঠোর মূর্তি এখানে পাঠকসাধারণ হয়তো দেখিতে চাহেন। কিন্তু সীতাহরণের পর গোদাবরীর নিকটস্থ প্রদেশে এবং পম্পার তীরে নব বসন্ত উপস্থিত হইলে রাম সীতাবিরহে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। রামায়ণে ইহার বর্ণনা কাব্যের দিক দিয়া অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে এবং ইহাতে কোন অস্বাভাবিকতা নাই। কাব্যের উৎকর্ষের দিক দিয়া বিচার করিলে ইহাতে পাঠকগণের নিরাশ হইবার কারণ নাই।

৩৭। **"ব্যাঘ্রী যেরূপ......করিয়া রাখিয়াছে।"** (রামায়ণী কথা, রামচন্দ্র, পৃঃ ৬৩)

ভাবার্থ ঃ—রামায়ণে রামচন্দ্রের অতীব আশ্চর্য চরিত্রের সৌন্দর্যে মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না। তাঁহার অপার ভ্রাতৃস্নেহের শত শত উক্তিতে মনে হয় যেন এই পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হইয়াছে। সীতাবিরহের চিত্রে বৈরাগ্যের সৌন্দর্য না থাকিলেও পত্নী-প্রেমের অপূর্বতা রহিয়াছে। রামচন্দ্রের বিরহোৎকণ্ঠার অশ্রুর সহিত নির্জন সুশোভিত পার্বত্য প্রদেশের চিত্র কাব্যের দিক দিয়া মনোরম হইয়াছে।

৩৮। **"তন্দ্রাশূন্য. ....উদ্রেক করে।"** (রামায়ণী কথা, কৈকেয়ী, পৃঃ ১০৯)

ভাবার্থ ঃ—দশরথ মৃত্যুশয্যায় নিদারুণ যন্ত্রণায় কাতর। রামচন্দ্রের বনবাসের কঠোর সংকল্প, কৈকেয়ীর প্রতি প্রজাগণের উদাত্ত আক্রোশ, কিন্তু ইহার মধ্যে কৈকেয়ী নৃশংসতায় অচল অটল। রামায়ণে পতিভক্তির উচ্চ আদর্শ থাকা সত্ত্বেও তাঁহার উপর এস্থলে উহার কোন প্রভাব নাই। রামচন্দ্রের সংকল্পে বা প্রজাগণের আক্রোশেও কৈকেয়ী বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। রামায়ণ কাব্যে এমন নৃশংসতার চিত্র আর কোথাও নাই।

অথবা, রামায়ণের কোথাও যদি চূড়ান্ত নৃশংসতার বর্ণনা থাকিয়া থাকে তবে তাহা হইতেছে মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর দশরথ রাজাকে দেখিয়াও কৈকেয়ীর মনে দয়ার উদ্রেক না হওয়া। রামায়ণে পতিভক্তির উচ্চ আদর্শ এখানে নিষ্ফল হইয়াছে। প্রজাগণের উদাত্ত আক্রোশেও কৈকেয়ী ভয়ভীতা নহেন। আর রামচন্দ্রের কঠোর বৈরাগ্যের কোন প্রতিক্রিয়া তাহার উপর নাই।

কবিতা-সংকলন

৩৯। **'বঙ্গভূমির প্রতি'** (মধুসূদন দত্ত, পৃঃ ১-২)

ভাবার্থ ঃ—মনুষ্যজীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু দেশের লোক যদি দেশ-জননীর কোন সন্তানকে তাঁহার গুণের জন্য স্মরণ করিয়া রাখে তবে সেই ব্যক্তি অমর হয়। দোষ-গুণ লইয়া মানবজীবন। লোকের দোষের প্রতি দৃষ্টি না দিয়া শুধু গুণের প্রতি দেশবাসীর আদর থাকিলে লোক চিরজীবী হইতে পারে।

৪০। **রসাল ও স্বর্ণলতিকা** (মধুসূদন দত্ত, পৃঃ ১১-১২)।

ভাবার্থ ঃ—ধন, জন, যৌবন, শক্তি, প্রভুত্ব বড় হইলেও চিরকাল সমভাবে থাকিতে পারে না। ইহাদের হ্রাস-বৃদ্ধি ও ধ্বংস আছে। অতএব ইহাদের জন্য কাহারও গর্বিত হইয়া দুর্বলকে ঘৃণা করা উচিত নহে, কারণ ঘোর বিপদের সময়ে শক্তিমান্ নিশ্চিহ্ন হয়—কিন্তু অতি দুর্বলও বিপদের হাত হইতে বাঁচিয়া যায়।

৪১। **ধরা হলীরা হয়, হায়...পালন**। (মাতৃস্তুতি—সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, পৃঃ ২০)

ভাবার্থ ঃ—মায়ের নিকট সন্তানের প্রতিপালনের ঋণ অপরিসীম। অতি অপ্রাপ্য বস্তুর প্রাপ্তি ঘটিলেও, উহাদের দ্বারা অনন্তকালে মায়ের সেবা করিলেও সেই ঋণ কেহ শোধ করিতে পারে না।

৪২। **বড় দুঃখী তরু, আমি … পরাণে।** (অশোক তরু—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৩৫, ৫ম স্তবক)

ভাবার্থ :—অশোকতরুর নিকট কবির প্রার্থনা তিনি যেন তাঁহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত পরের সুখ দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জীবন কাটাইতে পারেন। পরের সুখ দেখিয়া নিজের দুঃখের জন্য কাঁদাই দুঃখনিপীড়িত কবির একমাত্র সুখ। আর কবির দ্বিতীয় প্রার্থনা হইতেছে অশোক তরুর নিকট দুঃখতাপিত অপর কেহ আসিলে সেও যেন দুঃখের সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে।

৪৩। **'তুমি তরু নিরন্তর … আগে।'** (অশোকতরু—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৪—৪র্থ স্তবক) **ভাবার্থ :**—অশোকতরু সর্বদাই বন্ধুবর্গের আদরে বাস করিতেছে তাহার প্রতি কাহারও বিদ্বেষ ভাব নাই। পৃথিবী, বাতাস নদীর জল সকলেই **অশোক তরুকে নানাভাবে সেবা করিতেছে। এই সকল স্নেহের সেবার মধ্যে বসন্ত সকলের আগে তাহার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করে।**

<u>৪৪। মা</u> (দেবেন্দ্রনাথ সেন, পৃঃ ৫৮-৫৯)। **ভাবার্থ :**—মাতৃপদ বা দেশমাতৃকার পদ সর্বতীর্থের সার। ভারতের প্রধান প্রধান যত তীর্থ আছে, সেই সকল স্থানের সহিত বিজড়িত সুখ-দুঃখের কাহিনীতে কবি মুগ্ধ হইয়া আনন্দে নৃত্য করিলেন দুঃখে কাঁদিলেন, কিন্তু মাতৃপদের মত পুণ্যের আর সুখের স্থান কোথাও নাই দেখিয়া ফিরিয়া আবার মায়ের পদে আশ্রয় লইলেন।

৪৫। **'অশোক'** (দেবেন্দ্রনাথ সেন পৃঃ ৫৯-৬০) [দ্রষ্টব্য—এই কবিতাটির সহিত হেমচন্দ্রের "অশোক তরু" কবিতাটি মিলাইয়া পড় এবং উভয়ের ভাবার্থের মধ্যে প্রভেদ লক্ষ্য কর।]

ভাবার্থ :—অশোককে লোকে কেন ঐ নামে পরিচিত করে কবি তাহা বুঝিতে পারেন না। কবির কিন্তু এই গাছের দিকে চাহিলে চোখ জলে ভরিয়া আসে। যত দুঃখের স্মৃতি অশোকের সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে। জন্মদুঃখিনী শোকের মূর্তি সীতার দুঃখের স্মৃতি এই অশোক বহন করিতেছে। সীতা অশোকের মূলে নিরন্তর চোখের জল ফেলিয়াছেন শোক দূর করিত বলিয়া জানকী অশোকের কাছে কৃতজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার চরণের স্পর্শে অশোকের ফুল ফুটিত—তিনি ক্ষণেকের জন্য রামচন্দ্রের বিয়োগ-ব্যথা ভুলিতেন। এই করুণ কাহিনীর সাক্ষী অশোককে অশোক বলা উচিত নহে।

৪৬। <u>**মুক্তি**</u> (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৮২)। **ভাবার্থ :**—জগতের সব কিছু হইতে নিজেকে সরাইয়া লইয়া যে সাধনায় মুক্তি পাওয়া যায় কবি তাহা স্বীকার করেন না। পৃথিবীর অসংখ্য বন্ধনের মধ্যে দৃশ্যে, গানে যে বৃহত্তর আনন্দ আছে, তাহাই উপভোগ করিয়া তাহার মধ্যেই তিনি মুক্তির আস্বাদ পাইতে চান। এ আনন্দ হইল সকল আনন্দের কেন্দ্রস্বরূপে ভগবানকে উপলব্ধি করা।

৪৭। <u>**প্রশ্ন**</u> (পৃঃ ৮৩-৮৮)। **ভাবার্থ :**—ঈশ্বরের দূতরূপে মহাপুরুষগণ যুগে যুগে পৃথিবীতে আসিয়া অত্যাচারী মানুষকে ক্ষমা করিতে বিশ্ববাসীকে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু জগতের যন্ত্রণার আজও প্রতিকার হয় নাই। তাই ঈশ্বরের কাছে এই প্রশ্ন স্বাভাবিক যে তিনি স্বয়ং, উহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন কিনা।

৪৮। **দুঃখের উপর.. চাই।** (মুষ্টিভিক্ষা—বিজয়চন্দ্র মজুমদার, পৃঃ ৮৫)

ভাবার্থ :—যে ব্যক্তির উপর প্রতিদিন দুঃখের উপর দুঃখ আসিতেছে, তাহার জন্য প্রাণহীন গরীবখানার দয়া না করিলেই তাহার কষ্টের লাঘব হইবে। মমতাভরা

প্রাণের লোক কেহ পাওয়া গেলে তাহার ঐশ্বর্য দেখিয়াও সর্বরিক্তেরও মনে আনন্দ আসিবে।

৪৯। **দেখেছি সন্ধ্যায়......মিষ্ট।** (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, 'নবীন পান্থ'—পৃঃ ৯২)

ভাবার্থঃ—গ্রীষ্মাদি ঋতুতে, ঊষা, প্রভাত, সন্ধ্যা প্রভৃতি কালে অশেষ সৌন্দর্য প্রকৃতিতে দেখা যায়। কিন্তু বিশ্বসৌন্দর্যের মধ্যে শিশুর মিষ্ট হাসির মতো আর কোন সৌন্দর্য সৃষ্ট হয় নাই।

৫০। **আমি ও তুমি** (ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী—পৃঃ ১০৮-১০৯)

ভাবার্থঃ—জগতের সারবস্তু ঈশ্বর। মানুষ তাঁহার উপর নির্ভরশীল। মনুষ্যের জড়দেহে তিনি চেতনা; মানুষ স্থূল, তিনি সূক্ষ্ম; মানুষ সেবক তিনি সেব্য। মানুষ মায়ামোহের বন্ধন, ঈশ্বর স্বয়ং মুক্তি। হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা ঈশ্বর। তিনি প্রেমরূপী, মানবহৃদয়ে তিনি মধু।

৫১। **পদ্মপুকুরে** (করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১১২-১১৩)

ভাবার্থঃ—পৃথিবীর সুন্দর দৃশ্য পরিবর্তনশীল। দিনের গাছ, লতাপাতা, পাখির গান, বলাকার নিরুদ্দেশ যাত্রা, সন্ধ্যায় যূথিকার সৌরভের মধ্যে রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হয়। আলোতে নীল আকাশ ভরিয়া যায়। ইহার মধ্যে কবির কোন স্থান আছে কিনা তাহা ভাবিয়া তাঁহার হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হয়।

৫২। **প্রবাসী** (করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১১৩-১১৪)

ভাবার্থঃ—কাহাকেও বন্ধনের মধ্যে রাখিয়া, তাহাকে সংকীর্ণ সুযোগ-সুবিধা, আদর দিয়া সন্তুষ্ট করা যায় না, কারণ মুক্তির আনন্দ পরাধীনতার আদর অপেক্ষা সহস্র গুণে ভাল। পৃথিবীতে একদিকে মুক্তি যেখানে আছে, সেখানে বন্ধনের মধ্যের আদরে দুঃখের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। বন্দী প্রাণ দিয়া ঘোষণা করে—যাহা সত্য তাহাই পুণ্য এবং প্রেমই ঈশ্বর।

৫৩। **আবছায়ার** (করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১১৪-১১৫)

ভাবার্থঃ—সংসারের অনন্ত সৌন্দর্যের মধ্যে তৃপ্তি পাওয়া যায় না, কেননা যাহাকে উজ্জ্বল দেখা যায় সে মুহূর্তের মধ্যে আঁধারে ঢাকা পড়ে। এরূপ অবস্থায় কষ্ট করিয়া শান্তির জন্য সারা জগৎ ঘুরিয়া বেড়াইবার কোন অর্থ হয় না, কারণ যাঁহার ঠিকানা জানিলে সকল আশার পূরণ হয় তাঁহার ঠিকানা বাহির করিতে হইবে। তবেই সকল দুঃখের অবসান হইবে।

৫৪। **অপরাজিতা** (যতীন্দ্রমোহন বাগচী, পৃঃ ১১৭)

ভাবার্থঃ—যে রূপগুণহীন, যাহার অন্য কোথাও স্থান হয় না, তাহার স্থান দেবতার চরণতলে অবশ্যই হইবে। অপরাজিতার রূপ, রস, গন্ধ—কিছুই নাই—সুতরাং মানুষের কোন উৎসবে তার স্থান নাই। দেবতার পদতলে সে স্থান পাইয়াছে।

৫৫। **জবা** (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃঃ ১২১)

ভাবার্থঃ—দেবী রুধিরে তুষ্ট। এ রুধির মানবশিশুর রুধির যেন না হয়। দেবীর তুষ্টির জন্য তাঁহার চরণে রক্তজবা বলি হইয়া আছে। রক্তজবা মানুষের হৃদয়রক্তের প্রতীক। তাহাকে বলি লইয়াই যেন দেবী তুষ্ট থাকেন।

৫৬। **জাতির পাতি** (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃঃ ১২১-২২)

ভাবার্থঃ—জগতে জাতিতে জাতিতে, বা জাতে জাতে যে প্রভেদ উহা বাস্তব নহে, উহা কৃত্রিম; কেননা জগতে এক মানুষ জাতি ছাড়া জাতি নাই। মানুষের বাহিরের খোলসটা কিছুই নহে। রাগ, অনুরাগ দেখিয়াই নিদ্রিত মানুষের জাগরণ হয়।

সমাজসেবায় সকল জাতের দান সমান—সুতরাং কেহ বড় কেহ ছোট নহে। জাতিতে জাতিতে ভেদের দিন চলিয়া গিয়াছে, সকলের ভাগ্য একত্র হইয়া আজ ঐক্য উপস্থিত হইয়াছে। নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়—সুতরাং মানুষে মানুষে কোন ভেদ নাই।

৫৭। **সাগরতর্পণে** (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃঃ ১২৩-১২৪)

ভাবার্থঃ—দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের মধ্যে একাধারে করুণা ও বীর্যের সমন্বয় ঘটিয়াছে। দয়াতে তাহার হৃদয় ছিল অতি প্রশস্ত, আব তাঁহার সৌম্যমূর্তি হইয়াছিল তেজে উদ্দীপ্ত। বহুকাল ধরিয়া তিনি নিবন্নকে অন্নদান আব জ্ঞানহীনকে অকাতরে বিদ্যাদান করিয়া আসিয়াছেন। এইভাবে দেশের অনেক লোকেব অদৃষ্টকেও তিনি পরিবর্তিত কবিয়া দিয়াছিলেন। এযুগে বিদ্যাসাগবেব মতো মানুষ পাওয়া গেলে তাঁহার প্রকৃতপূজা করা সম্ভবপর হইত।

বিদ্যাসাগর পরলোকে চলিয়া গেলেও তাহার এই উপাধি তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। এই উপাধি লোভনীয় হইলেও ইহাব সহিত তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনাও ছিল। বিদ্যা অর্জন করিয়া সাধাবণ লোক উপাধিলাভের জন্য ব্যগ্র হয়, কিন্তু উপাধির সহিত ত্যাগ থাকিলেই উপাধি হয় সার্থক।

৫৮। **লোহার ব্যথা** (যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, পৃঃ ১৩২-১৩৪)

ভাবার্থঃ—যাহাবা পরের হাতেব ক্রীড়নক (খেলাব বস্তু) তাহাদের দুর্গতিব অন্ত থাকে না। এইরূপ অত্যাচারিত এবং তাহাদের উপর অত্যাচাবীর মধ্যে কোনদিনই আপোষ মীমাংসা হয় না, কারণ এই দুইদলের স্বার্থ সকল সময়ে হয় পৃথক। অত্যাচারী নিজের সুবিধার জন্য তাহার অধীনস্থ লোককে দিবারাত্র কষ্ট দিয়া নিজেব সুবিধা করিয়া লয়, তাহাকে ইচ্ছামত ভাঙেগ গড়ে এবং অপরিচিতকে তাহার সহিত জুড়িয়া দিয়া বিভেদ সৃষ্টি করিয়া থাকে। তবে অনেক সময়ে অত্যাচারিত ব্যক্তি খুব দৃঢ়—মনোবলসম্পন্ন হইলে সকল অত্যাচাব অগ্রাহ্য করিয়া নির্ভয়ে উহার প্রতিবাদ করে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি দুঃখ অত্যাচারিতের তখনই হয় যখন প্রভু তাহাকে দিয়াই তাহার অপর স্বজাতিকে উৎপীড়ন করায়।

অধীনস্থ লোকের সাহায্য না পাইলে প্রভুর না খাইয়া মরিতে হইত একথা তিনি বুঝিয়াও বুঝেন না। কিন্তু এইরূপ প্রভু না থাকিলেও অধীনস্থ লোকের কোন ক্ষতি ছিল না। কিন্তু মানুষের স্বভাবই এইরূপ যে, যাহার নিকট সে বেশি উপকার পায় তাহারই উপর অত্যাচাব করিয়াই সে পূর্বের উপকার শোধ করে।

৫৯। **মানুষ** (যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, পৃঃ ১৩৪-১৩৫)

ভাবার্থঃ—যে সকল লোক মাঠে মাঠে প্রতিদিন উদয়াস্ত ঘুরিয়া পেটের ভাত আর পরনের কাপড় জোটাইতে পারে না, তাহারাও মানুষের সন্তান, তাহাদিগকে ঘৃণা করিবার কিছু নাই। যাহারা দারুণ গ্রীষ্মের দুপুরে ঝড়, ঝঞ্ঝা মুষলধার বৃষ্টির মধ্যে অতি সুন্দর কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত করে, যাহারা মিথ্যা ব্যবহার আর বিলাসিতা বর্জন করিয়াছে তাহারাও মানুষ। যাহারা অমার্জিত ভাষা প্রয়োগ করে, যাহারা উৎপন্ন শস্য পরের হাতে তুলিয়া দিয়া নিজেরা ভিক্ষায় বাহির হইয়া আজও বাঁচিয়া আছে তাহারাও মানুষের জাতি। মানুষের সম্মান তাহারাও পাইবার অধিকারী।

৬০। **রামগরুড়ের ছানা** (সুকুমার রায়, পৃঃ ১৩৮)

ভাবার্থঃ—সংসারে হাসি আর গাম্ভীর্য পর পর চলিতে থাকিলে জীবনে শান্তি কি বস্তু তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু যাহাদিগকে বাধ্য হইয়া হাসি বন্ধ করিতে হয়, তাহাদের জীবন হয় দুর্বিষহ। অন্য কেহ হাসিলে তাহাদের জন্মের

অবধি থাকে না, চোখে ভয়ে ঘুম আসে না, মনেও কোন সোয়াস্তি থাকে না।

৬১। **ভিখারি** (কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ১৩৯-৪১)

ভাবার্থ ঃ—সহায়সম্বলহীন ভিখারি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া লাঞ্ছিত হয়। কিন্তু তাহারও একদিন সুখসম্পদ ছিল। কিন্তু সবই তাহার খোয়া গিয়াছে। কিন্তু এই হতভাগ্যকে কেহই সাহায্য করে নাই। বস্তুতপক্ষে পৃথিবীতে ভিখারির কোন স্থান নাই। এইরূপ অবস্থায় ভিক্ষুক মনে করে, ধর্মাধর্ম বলিয়া কিছু নাই, বিচার নাই এমনকি ঈশ্বরও নাই—সুতরাং অপরকে মারিয়া টাকা লইবার ইচ্ছা তাহার মনে স্বভাবতই জাগে। ঈশ্বরের প্রতি এই যে অবিচারের সন্দেহ তিনি যেন ক্ষমা না করেন, সে ইহার শাস্তি লইতে প্রস্তুত, কারণ আঘাত সহিতে সহিতে সে বেশি আঘাতকেও এখন ভয় করে না।

৬২। **পুষ্পজীবন** (মোহিতলাল মজুমদার, পৃঃ ১৪১-৪২)

ভাবার্থ ঃ—ফুলের জীবনই সত্যজীবন। উহাদের কখনও ধ্বংস উপস্থিত হয় না। ফুল একবার ঝরিয়া পড়িলেও আবার সেই রূপ, সেই গন্ধ লইয়া সেই সময়ে ফিরিয়া আসে। পূর্বের আর পর বৎসরের ফুলের মধ্যে কোন ভেদ থাকে না। মাটির পৃথিবীকে তাহারা ভালবাসে, কিন্তু তাহাদিগকে অন্য কেহ ভালবাসিল বা না বাসিল ইহা তাহারা গ্রাহ্য করে না। ফুল সর্বদা আনন্দময়। সকল ফুল একই সঙ্গে বাঁচে একই সঙ্গে মরে। উহারা সকলেই এক।

৬৩। **ভোলানাথ** (মোহিতলাল মজুমদার, পৃঃ ১৪২-৪৩)

ভাবার্থ ঃ—ভোলানাথ ভুল করিয়া অল্প সময়ের জন্য জগতে আসিয়াছিল, অল্প সময়ের মধ্যে তাহাকে পৃথিবী ছাড়িতে হইল। যিনি তাহাকে ডাকিয়া লইয়াছেন, তাঁহার ভালবাসাই হয়তো সকলের প্রেম অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী। আসিবার বেলায় ভুল হইয়াছে কিন্তু যাইবার বেলায়ও সে হয়তো সেই ভুল করিয়াছে—উষার রক্তিম আভা বিকাশ হইতে না হইতেই সে চলিয়া গেল—হয়তো এই রক্তিম আভাটুকু সে জগৎকে দিয়া গেল।

৬৪। **গদ্য ও পদ্য** (মোহিতলাল মজুমদার, পৃঃ ১৪৩-৪৪)

ভাবার্থ ঃ—গদ্য কঠিন, পদ্য কোমল। তাই মনের অবস্থা যখন বাহিরের চাপে কঠিন হয়, তখন গদ্য লেখা বাহির হয়, আর মন যখন, বাতাসে ফুলের গন্ধে মধুর হয় তখনই পদ্য উপস্থিত হইবার সময়। গদ্যে সূক্ষ্ম বুদ্ধি দরকার। পদ্যে ভাবের উপস্থিতির প্রয়োজন। কিন্তু যুক্তিতর্কে গদ্য দরকার। হর্ষে প্রাণ যখন উচ্ছল হয় তখন স্বভাবতই পদ্য আসে। সংসারে অনেক দুঃখ অনেক অভাব রহিয়াছে —সুতরাং গদ্যই এখানে ভাল চলে। তবে মাঝে মাঝে ইহার মধ্যেই যখন ক্ষণিক আনন্দের উদ্ভব হয় তখনই পদ্য লিখিতে হয়।

৬৫। **টবের গাছ** (কালিদাস রায়, পৃঃ ১৫০-৫২)

ভাবার্থ ঃ—বন্দী তাহার বন্ধনদশায় যতই পরের যত্ন লাভ করুক না কেন, মনে সে কখনও শান্তি লাভ করে না—আর প্রকৃত সুখও সে পায় না। বন্দী অবস্থায় সে তাহার স্বাধীনতা হারায় তাহার বুদ্ধি থাকে না অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়।

স্বাধীনতা লাভ করিয়া, নানা অসুবিধার মধ্যেও সে যথার্থ মানুষের মতো থাকিতে পারে, বড়র সহিত না হউক দেশের দরিদ্র লোকের সহিত প্রাণ খুলিয়া মিশিতে পারে। সহস্র ক্লেশের মধ্যেও মুক্তি অমূল্য ধন।

৬৬। **'পল্লীমা'** (গোলাম মোস্তফা, পৃঃ ১৫২-৫৩)

ভাবার্থ ঃ—পল্লীমায়ের সন্তান দেশে থাকিতে মায়ের গৌরব বুঝে না। এই মা তখন অনাদৃতা থাকেন। সন্তান যতই দূরে যায়, মায়ের মহত্ত্ব তাহার কাছে ততই বেশি ধরা পড়ে। পল্লীমাতার মাঠে ছেলেদের ছুটাছুটি, পাখিদের গান, (তাঁহার) আপন সন্তান কালো কৃষক কাজে রত। রাগালের গানে পল্লীর মাঠ মুখরিত তাঁহার মুখের হাসির মতো কমলগুলি ফোটে, তাহারই কুড়ে ঘরে অসীম শান্তি বিরাজ করে। মায়ের মাটিতে শস্যরূপ গুপ্তধনের খবর চাষীরা বাখে। গ্রাম ছাড়িয়া তাহারা বিদেশে যায় না।

৬৭। **"দেখব এবার জগৎটাকে"** (কাজী নজরুল ইসলাম, পৃঃ ১৬১-৬৩)

ভাবার্থ ঃ—আমরা বন্ধ ঘরে না থাকিয়া বাহিরের জগৎটাকে ভাল করিয়া দেখিতে চাহি। আমাদেব যাত্রাব লক্ষ্য হইবে দেশ হইতে দেশান্তব, এক পাহাড হইতে অন্য পাহাড়, সম্পদের সন্ধানে সমুদ্রের গহ্বরে মাটির নীচে পাতালপুরে, ঊর্ধ্বে অনন্ত আকাশে গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে। সীমার বন্ধন ভাঙিয়া দিয়া আমরা দশদিকে ছুটিয়া চলিব। অন্য দেশের লোক যেমন এই নিরুদ্দেশ যাত্রার ফল লাভ করিতেছে, আমরাও তেমনি ইহাদ্বারা সম্পদলাভ করিব।

৬৮। **ছাত্র দলের গান** (কাজী নজরুল ইসলাম, পৃঃ ১৬৪-৬৫)

ভাবার্থ ঃ—ছাত্রগণই দেশের আশাভরসার স্থল। তাহারাই দেশের শক্তি, দেশের বল। তাহাদের প্রাণ অসীমশক্তির আধার। দেশের সৌভাগ্যের জনাই তাহাদের আত্মবলিদান। ছাত্রগণ যেমন জ্ঞানের সাধনা করে, তেমনি তাহারা নিত্য কালের ডাকে সাড়া দেয়। ছাত্রদের মধ্যে বিংশশতাব্দীর জন্য ব্যাকুলতার সন্ধান পাওয়া যায়। ছাত্রেরাই দেশের গৌরব অর্জন করিয়াছে; ছাত্রগণের লক্ষ্য হইল ভবিষ্যৎ কাল, যাহাতে শুধু মানবপ্রীতিই থাকিবে। বিশ্ববাসীর সর্বজনীন এক রাষ্ট্রগঠনের আশা ছাত্রেরাও করে।

৬৯। **পিঁপড়ে** (অমিয় চক্রবর্তী, পৃঃ ১৬৭-৬৮)

ভাবার্থ ঃ—পিঁপড়া ছোট হইলেও তাহারা কর্মব্যস্ত। তাহারা বিনা বাক্যে চলার পথে অগ্রসর হয়, তাহারা আলোতে গন্ধে মাটির পৃথিবীকে স্পর্শ করিতেছে। পিঁপড়া ছোট হইলেও তাহারা এই পৃথিবীরই আপনার জন। মাটির বুকে আমরা যাহারাই বাস করিতেছি সকলেই এখানে অনিত্য, সকলেই তাঁর স্মরণে একত্র মিলিত হইয়াছি।

৭০। **ভাড়াটে কুঠি** (প্রেমেন্দ্র মিত্র, পৃঃ ১৭৩-১৭৪)

ভাবার্থ ঃ—এক ভড়াটিয়া বাড়ির নানা অংশে নানা লোক বাস করে। কাহারও সঙ্গে কাহারও পরিচয় নাই। এদিকের ওদিকের লোকেরা পরস্পরের সুখ দুঃখে কাহারও দিকে ফিরিয়া চাহে না কারণ সকলেরই মধ্যে প্রাচীর ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে। এইরূপ বাড়ি ছাড়িয়া যাইতেও কষ্ট হয়। অপরের সুখ দুঃখ জানিবার জন্য প্রাণ যখন আকুল হয়, তখনও প্রাচীরের ব্যবধানে উহা জানিতে পারা যায় না।

৭১। **আমি কবি** (প্রেমেন্দ্র মিত্র, পৃঃ ১৭৪-৭৬)

ভাবার্থ ঃ—কামার কাঁসারি, ছুতোর, মুটে মজুর—সমাজে যাহারা অনাদৃত কবি তাহাদেরই প্রতিনিধি। তাঁহার সহিত কর্মের সম্পর্ক। কল্পনার বিলাসের সহিত তাঁহার কোন যোগ নাই। মাটিতে, জলে, পাতালে, যে বিচিত্র কর্মের গতি অবিরাম চলিতেছে কবি তাহারই কথা বলিতে চাহেন—বিশ্বের সৌন্দর্য দেখিবার সময় তাঁহার

নাই। অসংখ্য লোক নিত্য নিয়ত কাজ করিয়া যাইতেছে তাহাদের জয়যাত্রার কাহিনী গাহিবার জন্য লোক চাই, তাই কর্মব্যস্ত লোকের কবি প্রিয়ার করুণ মিনতি রক্ষা করিতে অক্ষম। সারা দুনিয়ার বোঝা বহন করা, রাস্তা বানান আর খাল কাটার কথা কর্মনিষ্ঠ কবির আলোচ্য বিষয়। কাল্পনিক জগতের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই।

৭২। **বেহুলা—হে কবি......দুইটি নয়ন** (ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১৭৮)

ভাবার্থঃ—মানুষ একবার মরিয়া গেলে, সেই মূর্তিতে সে আবার পৃথিবীতে আসিতে পারে ইহা অবশ্য মনসামঙ্গলের কবির আশার বাণী। কিন্তু ধরাধামের মানুষ আমরা ইহাতে আশা অপেক্ষা নিরাশাই বেশি পাই। তবে বেহুলার ভাসানে আমাদের নিরাশার মধ্যে শুধু ব্যথাহত বেহুলার অসীম ধৈর্যের চিত্র আমাদের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে।

৭৩। **সনেট** (পৃঃ ১৭৮-১৭৯)

ভাবার্থঃ—অতীতে দেশের গৌরব থাকিলেও আমাদের বর্তমানের অবস্থা উহাকে সমর্থন করে না—কারণ আমরা জীবনে অতীতের সুন্দরকে গ্রহণ করিতে পারি নাই। পূর্বের গৌরবের কাহিনীকে আমরাই মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছি। আর আমাদের পৌরুষ দিয়া যদি সেই পূর্ব গৌরবকে জয় করিয়া আনিতে পারি তবেই আবার আমরা ভারতকে স্বর্গের মতো আনন্দলোকে পরিণত করিতে পারিব।

৭৪। **সেথা আমি যাব একা** (অজিত দত্ত, পৃঃ ১৭৯-৮০)

ভাবার্থঃ—যে স্থান সর্বপ্রকারে আনন্দের—যেখানে দুঃখ বলিয়া কিছু নাই এমন স্থানে যাইতে হইলে আর একজন সাথী চাই—কেননা আনন্দ দুজনের মধ্যে ভাগ না করিয়া উপভোগ করিলে, উহার আদানপ্রদান না থাকিলে সে আনন্দ আনন্দই নয়। দুঃখের সহিত যেখানে কঠোর সংগ্রামে জীবন ক্লান্ত, যেখানে মৃত্যুর বিভীষিকা, কোন সঙ্গীসাথী পাইবার সম্ভাবনা নাই, সেখানে একাই দুঃখকষ্ট ভোগ করা ভাল। অন্যকে দুঃখের সাথী করিলে পৌরুষ ক্ষুন্ন হয়। তাই একাকী প্রতিকূলতার সহিত যুদ্ধের মধ্যে যে গৌরব আছে সে গৌরব একাই অর্জন করা ভাল।

৭৫। **রবীন্দ্রনাথের প্রতি** (বুদ্ধদেব বসু, পৃঃ ১৮১)

ভাবার্থঃ—সভ্যতা ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে। আজ অত্যাচার অবিচার সারা পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। নিরীহ শান্তিপ্রিয় জাতি বর্বরের অত্যাচারে আজ মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের অক্ষয়মন্ত্র জীবনের জয়কে ঘোষণা করিতেছে। ইহাই ভারতকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

৭৬। **ছবি** (বিমলচন্দ্র ঘোষ, পৃঃ ১৮২)

ভাবার্থঃ—দুপুর বেলার রৌদ্রে নিস্তব্ধ মাঠ। বক এক পায়ে দাঁড়াইয়া আছে—তাহার ক্লান্তি নাই। তাহার মাথার উপর নীল আকাশ দিগন্তের রেখায় মিশিয়াছে। দূরের গাঁয়ের কথা সে ভাবিতেছে। সূর্য ডুবিবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে লাল মেঘ দেখা গেল। বকগুলি ঝাঁকে ঝাঁকে দল বাঁধিয়া চলিয়াছে।

৭৭। **মায়াতরু** (অশোকবিজয় রাহা, পৃঃ ১৮২-৮৩)

প্রকৃতির রূপ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয়, সে কখনও কালোধূসর, মেঘের শব্দে তাহার মধ্যে থরহরি কম্প, এক পশলা বৃষ্টির পরে চাঁদ যখন উঠে তখন এসব থাকে না। অদ্ভুত তারা আকাশে ফুটিয়া উঠে। আবার ভোরের বেলায় এসব অদৃশ্য হয়, আকাশে সর্বপ্রথম আলোর প্রকাশ দেখা যায়।

৭৮। **মৌমাছি** (দিনেশ দাস), পৃঃ ১৮৩-৮৪)

ভাবার্থঃ—কবির ঘরখানা ছোট হইলেও উহাতে সমগ্র পৃথিবীকে পাওয়া যায়। একটি ছোট মৌমাছি উহাতে প্রবেশ করিয়া কবির নিকট সমস্ত পৃথিবীর সন্ধান দিয়াছে। উহার গায়ে বনের কাঁচা ফুলের ঘ্রাণ, অজানা বনের গন্ধ, গুনগুনানিতে পৃথিবীর কোমলতম গান, পাহাড়ের প্রতিধ্বনি পূর্ণ পৃথিবীর পরিচয় কবিকে দিতেছে।

৭৯। **বুমির ইচ্ছা** (নরেশ গুহ, পৃঃ ১৮৫)

ভাবার্থঃ—ভাব আর কল্পনার আবেগে বুমি দূর দূরান্তরে চলিয়া যাইতে চাহেন কারণ তাহাতে অতৃপ্তিকর কাজ হইতে ছুটি পাইতে পারেন। এ ছুটি ব্যর্থ হইবে না তিনি মধু আনিয়া দিতে পারিবেন। রঙিন কল্পনায় কবি এত ব্যস্ত যে মনে হয়, সময় অফুরন্ত।

ভাবার্থঃ—একটি মায়াতরু ছিল। ক্ষণে ক্ষণে তাহার মূর্তির পরিবর্তন হইত। সন্ধ্যায় তাঁহার মধ্যে আলোড়ন হইত, বনের উপরে যখন মেঘের উদয় হইত। তখন সে দেখিতে ভালুকের মতো হইত। বৃষ্টির পর চাঁদ উঠিলে সে গাছও থাকিত না—তাহার পরিবর্তে অগণিত হীবার মাছের মতো কি সব দেখা যাইত। ভোরবেলায় সে গাছ অদৃশ্য। শুধু সেখানে আছে রূপালি আলোর প্রকাশ।

চতুর্থ খণ্ড

বাংলা কাব্যের কাহিনী

ভূমিকা

॥ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ॥

মানুষের ভাষার সৃষ্টি হয় আগে, তারপর ধীরে ধীরে সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ধাপে ধাপে গড়িয়া উঠে তার সাহিত্য। জগতের অন্যান্য ভাষার মতো বাঙ্‌লা ভাষারও উদ্ভব হইয়াছিল বহু পূর্বে। এই ভাষা সাহিত্যের বাহন হয় বহুকাল পরে। আমরা প্রাচীন বেদমন্ত্রে ভারতীয় আর্যগণের সর্বপ্রাচীন কথ্য-ভাষার সাহিত্যিক রূপের নিদর্শন পাই। বেদে ব্যবহৃত ভাষা 'ছন্দস্' বা 'ছন্দোভাষা নামে পরিচিত। এই 'ছন্দোভাষা'র আধারের উপর ভারতের যুগ-যুগান্তরের শিক্ষা, সাধনা, জ্ঞান ও সংস্কৃতির ধারক পরম গৌরবময়ী সংস্কৃত ভাষা আত্মপ্রকাশ করে। এই ভাষাতেই রামায়ণ, মহাভারত, তন্ত্র, পুরাণ, দর্শন, কাব্য, ব্যাকরণ, নাটক, আয়ুর্বেদ, জ্যোতিষ, কথা ও কাহিনী বিরচিত হইয়াছিল।

সংস্কৃত ভাষার দুইটি রূপ—বৈদিক (ছন্দস্ বা ছন্দোভাষা) আর লৌকিক (বা সংস্কৃত ভাষা)। কালক্রমে বৈদিক যুগের কথ্যভাষা সর্বসাধারণের মুখে মুখে ব্যবহৃত হইয়া 'কোল', ভোটতিব্বতীয়, 'দ্রাবিড়' প্রভৃতি আর্যেতর ভাষার প্রভাবে নানা পরিবর্তনের ফলে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের কথ্যভাষা প্রাকৃতরূপে পরিণত হয়। বিভিন্ন প্রদেশের নাম অনুসারে এই সব প্রাকৃতভাষা মাগধী, অর্ধ-মাগধী, শৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি নামে পরিচিত হয়—এবং মহাকাব্য, নাটক, গীতিকাব্য, কথা ও কাহিনী ধর্মগ্রন্থ এই সকল ভাষাব মাধ্যমে বিরচিত হইতে থাকে। এই প্রাদেশিক প্রাকৃত ভাষাগুলির পুনঃ পরিবর্তনের ফলে "অপভ্রংশ" ভাষার আবির্ভাব হয়। খ্রীষ্টীয় নবম শতকের কাছাকাছি সময়ে অপভ্রংশ হইতে বাঙ্‌লা, উড়িয়া, আসামী, মৈথিলী; হিন্দী; মারাঠী প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা উৎপন্ন হয়।

এই সময়ে ভারতের পূর্বাঞ্চলে "মাগধী অপভ্রংশ" ভাষা জনগণের কথ্যভাষা ছিল। এই মাগধী অপভ্রংশ হইতে বাঙ্‌লা ভাষার উৎপত্তি হয়। 'আসামী', 'উড়িয়া', 'মহগী', মৈথিলী এবং ভোজ-পুরিয়া ভাষার জননীও মাগধী অপভ্রংশ। সুতরাং বাঙ্‌লা ভাষার বয়স প্রায় এক হাজার বৎসর।

পৃথিবীর যে আটটি প্রধান ভাষায় প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য পাওয়া যায় বাঙ্‌লা ভাষা তাহাদের মধ্যে অন্যতম। প্রায় সাত কোটি লোক তাহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় বাঙ্‌লা ভাষাকে ব্যবহার করিয়া থাকে। বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যের যাহা কিছু গৌরব, যাহা কিছু খ্যাতি তাহা হইয়াছে বিগত ষাট সত্তর বছরের রচিত আধুনিক সাহিত্যকে লইয়া।

আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্য বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের দানে সুসমৃদ্ধ। অনাদৃতা, বিস্মৃতা বঙ্গবাণীকে রাজরাজেশ্বরীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। আমাদের সাহিত্যের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা প্রধানতঃ তাঁহারই সাধনার ফলে সম্ভবপর হইয়াছে।

॥ বাঙ্‌লা সাহিত্যের উদ্ভব ॥

মানুষ তাহার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের দৈনন্দিন যোগাযোগ ছাড়া তাহার আশা ও আকাঙ্ক্ষা, তাহার বিচিত্র অনুভূতিকে রূপ দিতে যাইয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া থাকে। বাঙালীও তাহা করিয়াছিল—তাহার লৌকিক কাহিনীর প্রাচীন রূপে আর ডাক খনার বচনে। কিন্তু বৌদ্ধ সহজিয়া মতাবলম্বী সাধকগণের কীর্তন গানের পূর্বে খাঁটি বাঙ্‌লায় রচিত কোন গ্রন্থ আমরা সাহিত্যের নিদর্শনরূপে পাই না।

সুতরাং আমরা বলিতে পারি, বৌদ্ধ সাধকদের কীর্তন গানের গ্রন্থ 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়'-কে লইয়াই বাঙ্‌লা সাহিত্যের গোড়াপত্তন হয়।

চর্যাপদের আবির্ভাবের পর প্রায় দুই শতাব্দী পর্যন্ত বাঙ্‌লা সাহিত্যে কোন উল্লেখযোগ্য রচনা দৃষ্টিগোচর হয় না। বাঙ্‌লা সাহিত্য গীতিকবিতা অবলম্বন করিয়া আরম্ভ হয়।

গীতিকবিতা ছাড়াও প্রাচীন বাঙ্‌লা সাহিত্যের আরও একটি রূপ আছে। তাহা হইতেছে আখ্যানমূলক কাব্য। এই আখ্যানমূলক কাব্যগুলির মূলরূপ এই দুইশত বৎসরে উদ্ভূত হয়। তাহা না হইলে পরবর্তীকালে মনসা, চণ্ডী ও ধর্মঠাকুরের বিষয় অবলম্বন করিয়া সমৃদ্ধ মঙ্গলকাব্য রচিত হইতে পারিত না। চর্যাপদের প্রায় দুইশত বৎসর পরে খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে।

॥ মধ্যযুগের বাঙ্‌লা সাহিত্য ॥

রামায়ণ ও মহাভারত

মধ্যযুগের বাঙ্‌লা সাহিত্যের একটি বিশিষ্টরূপ হইতেছে অনুবাদ সাহিত্য।

রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই মহাকাব্য সমগ্র ভারতের জাতীয় কাব্য। এই কাব্যদ্বয় সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। ইহারা যুগ যুগ ধরিয়া ভারতের জনগণের চিত্তকে সরস করিয়া রাখিয়াছে। বৌদ্ধ পালরাজাগণের সময়ে বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য অঙ্কুরিত হইতেছে মাত্র। তারপর সেন-রাজগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিলেন। দেশে সংস্কৃত ভাষার আদর বাড়িল। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কি বিজয়ের পর বাঙ্গালায় দেশভাষার সমাদর ও মহত্ত্ব বাড়িতে লাগিল। বাঙ্গালার মুসলমান নরপতিগণের প্রোৎসাহদানে বাঙ্গলা ভাষা সমৃদ্ধির পথে বিশেষভাবে অগ্রসর হইল। মৌলিক রচনা যেমন ভাষার উন্নতির লক্ষণ—সেইরূপ ভাষান্তর হইতে অনুবাদও ভাষা এবং সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়া থাকে।

কৃত্তিবাস ওঝা বাঙ্গালা ভাষায় রামায়ণের প্রথম অনুবাদ করিয়া অক্ষয় কীর্তি অর্জন করিয়াছেন। তিনি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক। কৃত্তিবাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া উত্তর বঙ্গের অদ্ভুতাচার্য (বা নিত্যানন্দ আচার্য), পূর্ববঙ্গের মহিলা কবি চন্দ্রাবতী, নড়াইলের (যশোহর) গঙ্গারাম দত্ত প্রভৃতি রামায়ণ রচনা করেন।

মহর্ষি বেদব্যাসের মহাভারতের রসধারার প্রবাহকে জীবিত রাখিবার জন্য বহু কবি বাঙ্গালা ভাষায় মহাভারতের অনুবাদ করেন। তন্মধ্যে কাশীরামদাসের মহাভারতের জনপ্রিয়তা অবিসংবাদিত।

বাঙ্‌লা ভাষায় মহাভারতের প্রথম অনুবাদ করেন চট্টগ্রাম অঞ্চলের অধিবাসী কবীন্দ্র পরমেশ্বর (১৫০০-১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে)। কবীন্দ্র পরমেশ্বরের পরে শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত, নিত্যানন্দ ঘোষ, ঘনশ্যাম কবিচন্দ্র, সঞ্জয় প্রভৃতি মহাভারত রচনা করেন, কিন্তু বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে কাশীরাম দাসের মহাভারত যেরূপ সমাদর লাভ করিয়াছে সেরূপ অন্য কোন কবির রচনা করিতে পারে নাই।

মহাভারতের পুণ্য কাহিনী শুনাইয়া কাশীরাম দাস মধুসূদনের ভাষায় "কবীশদলে পুণ্যবান" খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। দ্বৈপায়ন ঋষির কমণ্ডলুর জল দ্বারা জননী বঙ্গভাষার তিনি অভিষেক করিয়াছেন—

"দ্বৈপায়নের ভৃঙ্গার জল আনি
অভিষেক করে কাশী।"—কালিদাস রায়।

বর্ধমান জেলার ইন্দ্রাণী পরগণায় সিঙ্গি গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। কবি ষোড়শ শতাব্দীর শেষ-ভাগে ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে জীবিত ছিলেন। কাশীদাসী মহাভারতের আদি, বন, বিরাট এবং সভাপর্ব তাঁহার নিজের রচনা। অন্য পর্বগুলি অন্যকবির রচনা।

মঙ্গল কাব্য

মধ্যযুগের বাঙ্‌লা সাহিত্যের দ্বিতীয় রূপ হইতেছে আখ্যানমূলক মঙ্গলকাব্য। মনসা, চণ্ডী, ও ধর্মঠাকুরের কাহিনী এই সকল কাব্যের উপজীব্য বিষয়। 'মঙ্গল' শব্দের অর্থ মাঙ্গলিক দ্রব্য, মাঙ্গলিক রচনা, অভ্যুদয় বা উন্নতি। এখানে মাঙ্গলিক রচনা অর্থে এই শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থসমূহে লেখক বা সমাজের অভ্যুদয়ের উদ্দেশ্যে শব্দদ্বারা দেবতার স্তুতি রচনা করিয়া

উহা গীত হইত। বাঙ্‌লা মঙ্গল কাব্য রচনায়, উহার পাঠে বা শ্রবণে মঙ্গল হয় বলিয়া—এই শ্রেণীর কাব্যকে মঙ্গল কাব্য বলা হইয়া থাকে।

সর্পের দেবতা মনসাকে লইয়া প্রাক্‌চৈতন্যযুগে মঙ্গলকাব্য রচনার সূত্রপাত হয়। এইরূপ কাব্য রচনাকালের বহুপূর্বে হইতেই লোকের মুখে মুখে উপজীব্য কাহিনীগুলি চলিয়া আসিতেছিল। জনসাধারণের চিত্ত এই সব কাহিনী হইতেই রস আহরণ করিত। এখানকার দেবতা রক্ত-মাংসের দেহযুক্ত মানুষ না হইলেও, আশা-আকাঙ্ক্ষা, অন্যায়ের প্রতিশোধ, এবং আত্মমহিমা প্রচারে মানুষের মতো আচরণে অভ্যস্ত। অলৌকিকতার জন্য তাঁহারা পরিণামে মানুষের উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

৮৯২ সালে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয়। তাঁহার আবির্ভাব বাঙ্‌লা সাহিত্যের দিক দিয়া একটি যুগান্তকারী ঘটনা। বঙ্গভাষা তাঁহারই মহিমায় ধর্মের ভাষার গৌরব অর্জন করে এবং এই সময় হইতেই বাঙ্‌লা সাহিত্যের বহুমুখী বিকাশ হইতে থাকে।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদের উদ্ভব হয়। কিন্তু তিনি আবির্ভূত হইয়া পূর্বরাগ, মান, প্রবাস, বিরহ প্রভৃতি শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার বিভিন্ন ভাব নিজজীবনে বিকশিত করিয়া যে আদর্শ স্থাপন করিয়া গেলেন, তাহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই পরবর্তী কালে বৈষ্ণব গীতি সাহিত্য তাহার নবীন জীবনরূপ লইয়া উপস্থিত হইল। ক্রমে ক্রমে আমরা পাইলাম চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, প্রভৃতি কবির অমর পদাবলী।

শাক্ত পদাবলী

বাঙ্‌লা সাহিত্যে বৈষ্ণব গীতিকবিতার পর শাক্তপদাবলী উল্লেখযোগ্য। শাক্ত মঙ্গলকাব্যগুলিতে মহাশক্তি চণ্ডীরূপে ~~দুষ্টের দমন উৎকর্ষ~~ সাধন করিয়াছেন—ঐহিক ঐশ্বর্যে তাহাদিগকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। আখ্যানমূলক মঙ্গলকাব্যের ধারার গতি রুদ্ধপ্রায় হইয়া গেলে বৈষ্ণব গীতিকবিতা দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া শাক্ত গীতিকবিতার উদ্ভব হয়। এ কবিতার আখ্যানভাগ বিশেষ কিছু নাই—পুরাণের বা মঙ্গলকাব্যের আখ্যানের গল্পাংশ অবলম্বন করিয়া কবিতা রচিত হইয়াছে।

শাক্ত গীতিকা শ্যামাসংগীত ও উমাসংগীত এই দুই প্রকার। শ্যামাসংগীত আধ্যাত্মিক সংগীত। ইহাতে পরমেশ্বরের মাতৃরূপে আরাধনা দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে মহাশক্তি সৃষ্টি স্থিতি ধ্বংসকারিণী জগন্মাতা কালী। সাধক তাঁহার শিশুসন্তান, শিশু মার কাছে তাঁর আব্দার জানাইয়া থাকে, সুখদুঃখের সব কথাই তাঁহাকে বলে। শক্তি সাধনায় সিদ্ধ পুরুষ, কুমারহট্ট নিবাসী কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন শাক্তপদাবলীর প্রতিষ্ঠাতা এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তিনি পলাশীর যুদ্ধের সমসাময়িক ব্যক্তি। তাঁহার গান আজও বাংলার ঘরে ঘরে গীত হয়। রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতি পরম সাধকের সাধনপথের পাথেয়রূপে কাজ করিয়াছে এই শ্যামাসংগীত।

উমাসংগীতে রহিয়াছে বাংলার স্নেহময়ী জননীর ঘরের কথা। ইহাতে রহিয়াছে উমার বাল্য-লীলা, বিবাহ, পতি শিবের গৃহে কষ্ট ভাবিয়া মাতা মেনকার দুঃখ, শরৎকালে স্বগৃহে তাঁহাকে আনয়ন, মহাপূজার তিন দিন তাঁহাকে সেবা তারপর বিদায় ব্যথা। ইহার আগমনী সংগীতে হর্ষ আর বিজয়ান্তে আছে ব্যথা। শ্যামাসংগীতের ন্যায় সাধক রামপ্রসাদই উমা-সংগীতের আদি কবি।

১। কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী

[কৃত্তিবাস ওঝা বাঙ্গালা ভাষায় রামায়ণের প্রথম অনুবাদ করিয়া অক্ষয় কীর্তি অর্জন করিয়াছেন। তিনি খৃস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যায় কৃতী হইবার পর তিনি তদানীন্তন গৌড়েশ্বর রুকুনুদ্দিন বারবক শাহের (১৪৫৯-১৪৭৪) সভায় বিশেষভাবে সম্মানিত হন। এই গৌড়েশ্বর তাঁহাকে রামায়ণ রচনা করিতে অনুপ্রেরিত করেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণের পূর্ণ অনুবাদ নহে। 'এই রামায়ণের মাঝে মাঝে পৌরাণিক কাহিনী জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্র ও বিচিত্র সুখদুঃখের অনুভূতি এ কাব্যে আমরা পাই। এ কাব্যের উপর কলম চালাইয়া পরবর্তী লেখকেরা পরিবর্তন পরিবর্ধন সাধন করিয়াছিলেন। রাজপ্রাসাদ হইতে দরিদ্রের কুটির পর্যন্ত শিক্ষিত অশিক্ষিত জনসাধারণের উপর রামায়ণের প্রভাব সমভাবে বিরাজমান।

কৃত্তিবাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় অনেকে রামায়ণ রচনা করেন। ইঁহাদের মধ্যে অদ্ভুতাচার্য, মহিলা কবি চন্দ্রাবতী, গঙ্গারাম দত্ত, প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।]

কৃত্তিবাস ওঝা সপ্তকাণ্ড রামায়ণের স্বরচিত মুখবন্ধে যে আত্মবিবরণ দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় তাঁহার পূর্বপুরুষ নরসিং ওঝা পূর্ববাঙলার 'বেদানুজ' নামক মহারাজার মন্ত্রী (পাত্র) ছিলেন। তিনি সেখানকার কোন রাষ্ট্রবিপ্লবজনিত কারণে ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া বর্তমান নদীয়া জেলার রাণাঘাটের নিকট গঙ্গার তীরে ফুলিয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন।

"বঙ্গদেশে প্রমাদ পড়িল হইল অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইল গঙ্গাতীর॥"

ফুলিয়াতে বসতি স্থাপন করিবার পর ওঝার বংশ 'ধন ধান্যে পুত্রে পৌত্রে' বাড়িতে লাগিল। এই বংশে বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় পুত্র সূর্য পণ্ডিতের ছেলের নাম বিভাকর। তিনি পিতার ন্যায় সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। সূর্যের দ্বিতীয় পুত্র নিশাপতির রাজসভায় বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। একবার গৌড়েশ্বর তাঁহাকে চড়িবার ঘোড়া উপহার দিয়াছিলেন। গোবিন্দের বংশে জয়াদিত্য বিদ্যাপতি ওঝা প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন।

নরসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র মুরারি ছিলেন কবির পিতামহ। মুরারি খুব ধার্মিক ও গুণশালী ছিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সাতপুত্র—ভৈরব, শৌরি, অনিরুদ্ধ, মদন, মার্কণ্ড, ব্যাস ও বনমালী জন্মগ্রহণ করিল। মুরারির সব পুত্রই জীবনে নানাভাবে উন্নত হইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ভৈরব রাজসভায় বিশেষ সম্মান পাইতেন। এই ভৈরবের পুত্র গজপতি ওঝাও একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন। সুদূর বারাণসী পর্যন্ত তাঁহার কীর্তি ছড়াইয়াছিল।

মুরারি ওঝার পুত্রদের মধ্যে সবচেয়ে শান্ত ও ভাগ্যবান্ ছিলেন কনিষ্ঠ বনমালী। ইনিই আমাদের কবির পিতা। তিনি প্রথমবার কুলীন গাঙ্গুলী বংশে বিবাহ করেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার ছয় পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। ইহাদের নাম—কৃত্তিবাস, মৃত্যুঞ্জয়, শান্তি, শ্রীধর (শ্রীকর বা শ্রীকন্ঠ), বলভদ্র ও চতুর্ভুজ (বা ভাস্কর)। কৃত্তিবাসের সহোদরার নাম জানা যায় না। তাঁহার এক বৈমাত্রেয় ভগ্নীও ছিলেন। (আর এক রাহিনি হইল সতাই উদর)। কবির দ্বিতীয় ভ্রাতা মৃত্যুঞ্জয় ষডরাত্রির উপবাস ব্রত করেন, শান্তি সর্বত্র খ্যাতিমান্। শ্রীকরও প্রায়ই ব্রত-উপবাস করিতেন। কৃত্তিবাসের মাতার নাম মালিনী (মেনকা, মাণিকি, মানকি, মালীকা ইত্যাদি বিভিন্ন পুঁথির পাঠ অনুসারে)। পাতিব্রত্যের জন্য তিনি সর্বত্রই প্রশংসিত হইতেন।

কৃত্তিবাসের জন্ম হয় পুণ্য মাঘ মাসের সংক্রান্তি দিনে রবিবারে—সেদিন ছিল শ্রীপঞ্চমীতিথি।

"আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘমাস।
তথি মধ্যে জন্মিলেন পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥"

ভূমিষ্ঠ হইবার পর পিতামহ তাঁহাকে উত্তম বস্ত্র দিয়া কোলে নিলেন এবং আনন্দিত হইয়া নবজাতকের নাম রাখিলেন কৃত্তিবাস। কৃত্তিবাস যখন এগার বৎসর পার হইয়া বারতে (১২) পা দিয়াছিলেন তখন তাঁহার উচ্চশিক্ষা শুরু হয়।

"এগার নীবড়ে যখন বারতে প্রবেশ।
হেন বেল্যা পড়িতে গেল্যাম উত্তরদেশ॥"

নিজ বাসভূমি ফুলিয়ার উত্তরে কোন স্থানে কবি পড়িতে যান। রাঢ়ের এই গুরু সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন,

"রাড়া মধে বন্দিনু আচার্যচূড়ামণি।
যার ঠাঁই কৃত্তিবাস পড়িলা আপুনি॥"

কৃত্তিবাস একাধিক স্থানে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছেন,—

"ছোটোর বন্দো বড়র বন্দো বড় গঙ্গার পার।
যথা তথা করিয়া বেড়ান বিদ্যার উদ্ধার॥"

দ্বিতীয়বার (বারান্তর) বড়গঙ্গার (অর্থাৎ পদ্মা) ওপারে উত্তরবঙ্গে তিনি গমন করেন।

"বৃহস্পতিবার ঊষা পোহালে শুক্রবার।
বারান্তর উত্তরে গেল্যাম বড় গঙ্গা পার॥"

তাঁহার অন্তিম গুরু ব্যাস বশিষ্ঠ বাল্মীকির তুল্য অগাধ পণ্ডিত ছিলেন,—

"ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বাল্মীকি চ্যবন।
হেন গুরুর ঠাঁঞি আমার বিদ্যার প্রসার॥"

পিতর পর গুরুকে দক্ষিণা দান করিয়া কবি গৃহে ফিরিলেন। গুরুর ভে কৃত্তিবাস ধন্য হইলেন।

"বিদ্যাসাঙ্গ হইল প্রথম কৈল মন।
গুরুকে দক্ষিণা দিআ ঘরকে গমন॥
গুরুকে মেলানি কৈল মঙ্গলবার দিসে।
গুরু প্রশংসিলা মোরে অশেষ বিশেষ॥"

কবির অন্তিম গুরুই তাঁহাকে মাতৃভাষায় রামায়ণ রচনার আদেশ দেন। গৃহে ফিরিয়া কবি এই কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন।

"বাপমায়ের আশীর্বাদ গুরু আজ্ঞা দান।
বাল্মীকি প্রসাদে রচে রামায়ণ গান॥"

সম্ভবতঃ গ্রন্থরচনা কিছুটা অগ্রসর হইবার পর কবি রাজপণ্ডিত হইবার আশায় গৌড়েশ্বরের সভায় যাইতে মনস্থ করিলেন। প্রথমে সেখানে উপস্থিত হইয়া দ্বারীর হাতে স্বরচিত সাতটি শ্লোক গৌড়পতিকে উপহার পাঠাইয়া রাজার আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া রাজদ্বারে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বেলা দ্বিপ্রহরের পর দ্বারী স্বর্ণ দণ্ড হস্তে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া রাজদর্শনের জন্য ফুলিয়ার কৃত্তিবাস মুখটিকে রাজার আহ্বান জানাইল। নয়টি ফটক পার হইয়া কৃত্তিবাস রাজার দরবারে উপনীত হইলেন। সোনারূপার ঘর দেখিয়া কৃত্তিবাস বিস্মিত হইলেন। তিনি সেখানে সিংহের মতো

গৌড়েশ্বরকে সিংহাসনে আসীন দেখিলেন। রাজার দক্ষিণে বামে মন্ত্রীরা বসিয়াছেন —জগদানন্দ রাজার দক্ষিণে—তাঁহার পিছনে ব্রাহ্মণ সুনন্দ। রাজার বামদিকে কেদার খাঁ—দক্ষিণে নারায়ণ রহিয়াছেন। রাজার পাশে তিনজন মন্ত্রী দাঁড়াইয়া আছেন। গন্ধর্বকল্প গন্ধর্ব রায় রাজসভায় বসিয়া আছেন। রাজার ডান দিকে কেদার রায় এবং বাদিকে তরণী এবং আশে পাশে সুন্দর শ্রীবৎস প্রভৃতি বিচারপতিগণ ও রাজার প্রধান সভাপণ্ডিত মুকুন্দ, মহাপাত্রের পুত্র জগদানন্দ প্রভৃতি বসিয়া আছেন।

নয় দেউড়ী পার হয়ে গেলাম দরবারে।
সিংহসম দেখি রাজা সিংহাসন পরে॥
রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন্দ।
তাহার পাছে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ॥
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ।
পাত্র মিত্র সহ রাজা পরিহাসে মন॥ (পাত্র—মন্ত্রী)

ইহা ছাড়া বহু লোক রাজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। রাজা পাত্রমিত্রের সহিত পরিহাসে রত রহিয়াছেন। রাজসভা দেখিলে মনে হয়, দেবতাগণ যেন স্বর্গ হইতে এখানে নামিয়াছেন।

"রাজার সভাখান যেন দেব অবতার।
দেখিয়া আমার চিত্তে লাগে চমৎকার॥"

চারিদিকে নৃত্যগীত চলিয়াছে—সকল লোকের মুখে হাস্য বিরাজমান। রাজপ্রাসাদের সর্বত্র কর্মব্যস্ত লোক ছুটাছুটি করিতেছে। গৌড়েশ্বরের প্রাসাদের আঙিনা লাল রঙের মাদুর দিয়া মোড়া—তাহার উপর পাতলা রেশমী চাদর পাতা। মাথার উপরি রেশমের চাঁদোয়া শোভা পাইতেছে। ইহার নীচে গৌড়রাজ মাঘ মাসের রৌদ্র পোহাইয়া থাকেন।

"আঙিনায় পড়িয়াছে রাঙ্গা মাজুরি।
তার উপর পড়িয়াছে নেতের পাছুড়ি॥
পাটের চাঁদোয়া শোভে মাথার উপর।
মাঘ মাসে খরা পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর॥"

[মাজুরি=মাদুর। নেত=পাতলা রেশমী কাপড়। পাট=রেশমী কাপড়, পাছুড়ি পাছড়া=উত্তরীয়, (গায়ের চাদর উড়ানি)]

রাজার সম্মুখে দাঁড়াতেই তিনি কৃত্তিবাসকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। রাজার সিংহাসন হইতে চার হাত দূরে তিনি দাঁড়াইয়া সাতটি শ্লোক পড়িলেন। শুধু ইহাই নহে নানা ছন্দে নানা শ্লোক কৃত্তিবাস রাজাকে শুনাইলেন। পঞ্চ গৌড়েশ্বর কবি কৃত্তিবাসের উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুষ্পমাল্যদ্বারা ভূষিত করিলেন—পাত্র কেদার খাঁ তাঁহার মাথায় চন্দনের ছড়া দিলেন।

রাজা কৃত্তিবাসকে ইচ্ছামত দান গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু কবি রাজার নিকট রেশমী উত্তরীয় মাত্র গ্রহণ করিলেন। আর কোন দান তিনি নিতে চাহিলেন না। কৃত্তিবাস বলিলেন—'এক সম্মান ছাড়া কাহারো কোন দ্রব্য গ্রহণ করি না'।

"কারো কাছে কিছু নাইলই করি পরিহার।
যথা যাই তথা গৌরবমাত্র সার॥"

কবি পূর্বে অনেক সম্মান লাভ করিয়াছেন—শুধু রাজসম্মান বাকি ছিল—তিনি তাহা [illegible]পাইলেন। রাজা কবিকে রামায়ণ রচনা [illegible] করিতে অনুরোধ করিলেন—

"সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোক।
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ ॥" (সন্তোক=পারিতোষিক)

রাজসভা হইতে কবি যখন বাহির হইলেন তখন তাঁহার সর্বাঙ্গ চন্দনে চর্চিত। কৃত্তিবাস সাধারণ লোক নহেন—তাঁহাকে দর্শনের জন্য দলে দলে লোক ছুটিয়া আসিল। সকলে বলিতে লাগিল—

"সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত।
* * *
মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী ॥"

কৃত্তিবাস পিতামাতার আশীর্বাদ, গুরুর আজ্ঞা এবং সর্বশেষে বাজার আজ্ঞায় (বাঙলায়) সপ্তকাণ্ড রামায়ণ গান রচনা করেন। কবির বাঙলায় রামায়ণ গান রচনা করিবার উদ্দেশ্য ছিল অতি মহৎ। বাল্মীকি মুনির রামায়ণ সংস্কৃত ভাষায় রচিত —তাই লোকশিক্ষার জন্য কৃত্তিবাস সবসাধারণের মধ্যে বাঙলায় রামায়ণ প্রচার করেন।

"সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝার তরে কৃত্তিবাস পণ্ডিত ॥
রঘুবংশের কীর্তি কেবা বর্ণিবারে পারে
কৃত্তিবাস রচে গীত সরস্বতীর বরে ॥"

কবির এই লোকশিক্ষার উদ্দেশ্য সার্থক হইয়াছে। রাজপ্রাসাদ হইতে দরিদ্রের কুটির পর্যন্ত শিক্ষিত অশিক্ষিত জনসাধারণের উপর রামায়ণের প্রভাব আজও সমভাবে বিরাজমান।

অনুশীলনী

১। কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীতে তাঁহাব যে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
২। কৃত্তিবাসের বিদ্যাশিক্ষা ও শিক্ষাগুরু সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।
৩। বিদ্যাসমাপ্তির পব কৃত্তিবাসের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি বর্ণনা কর।
৪। কৃত্তিবাস গৌড় দরবারে কেন গিয়াছিলেন? এই দরবারে তাঁহাকে যে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় তাহার বর্ণনা কর।
৫। কৃত্তিবাস গৌড় বাজসভাব যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা নিজের ভাষায় লিখ।
৬। কৃত্তিবাস কি উদ্দেশ্যে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন? এ কাব্য রচনায় কে বা কাহারা অনুপ্রেরণা দিয়াছিলেন?
৭। কৃত্তিবাস তাঁহার পূর্বপুরুষগণেব যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে লিখ।

২। রত্নাকর দস্যুর কাহিনী

[মূল বাল্মীকি রামায়ণে রত্নাকর দস্যুর কাহিনী নাই। অধ্যাত্ম রামায়ণের সংক্ষিপ্ত কাহিনীটি কৃত্তিবাস কল্পনার দ্বারা বাড়াইয়াছেন। কৃত্তিবাস তাঁহার রামায়ণের আদিকাণ্ডেব শুরুতেই বিষ্ণুর চারি অংশে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নের প্রকাশের কথা বর্ণনা করিয়াই, রত্নাকর দস্যুর কাহিনী ও রামায়ণ মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন।]

রামায়ণ রচয়িতা বাল্মীকি মুনির পূর্বের নাম রত্নাকর। রত্নাকরের পিতার নাম চ্যবনমুনি। কিন্তু রত্নাকর কোন শিক্ষাদীক্ষা লাভ করে নাই। সে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া পরিবার প্রতিপালন করে। নিজের সুবিধার জন্য এমন পাপকর্ম নাই যে

সে না করে। সাধারণ লোক তো দূরের কথা এমন কি মুনি ঋষিরাও তাহার হাতে লাঞ্ছিত হয় এবং প্রাণ হারায়। তাহার পাপের মাত্রার পরিমাণ করা যায় না—কারণ উহা অগণিত। এই মহাপাপীকে উদ্ধার করা দরকার। তাহা রাম নাম দ্বারাই সম্ভব। দেবাদিদেব শিব, ভগবান্ বিষ্ণুর রামরূপে জগতে অবতীর্ণ হইবার খবর ব্রহ্মা ও নারদকে দিলেন। কিন্তু জগতে অবতীর্ণ হইবার পূর্বেই তিনি 'রাম' নামের অসীম শক্তি প্রচার করিতে তাঁহাদিগকে উপদেশ দিলেন। ব্রহ্মা এবং নারদ ভগবান শিবের কাছেই এই রত্নাকরের বিবরণ জানিতে পারিলেন।

"তারে গিয়া রাম নাম দেহ একবার।
তবে সে নিতান্ত মুক্ত হইবে সংসার॥
চ্যবন মুনির পুত্র নাম রত্নাকর।
দস্যুবৃত্তি করে সেই বনের ভিতর॥"

রত্নাকর গাছে চড়িয়া দূর হইতে পথিকের গতিবিধি লক্ষ্য করিত। অসহায় পথিক পাইলে তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সর্বস্ব লুণ্ঠন করিত। ব্রহ্মা ও নারদ সন্ন্যাসীর বেশে রত্নাকরের নিকটে আসিলেন; সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ধনরত্ন কিছুই নাই তাঁহাদের সম্বল মাত্র কৌপীন।

"বিধাতার মায়া হৈল রত্নাকর প্রতি।
সেই দিনে সেই পথে কারো নাহি গতি॥"

রত্নাকর দূর হইতে দুই সন্ন্যাসীকে দেখিয়া গাছ হইতে নামিল এবং বনের মধ্যে লুকাইয়া রহিল, তাহার ইচ্ছা ইঁহাদের মারা এবং কৌপীন কাড়িয়া লওয়া। রত্নাকর ইঁহাদিগকে মারিবার জন্য লোহার মুগুর উঠাইল—কিন্তু ব্রহ্মার মায়াতে মুগুর অচল হইল। তখন ব্রহ্মা রত্নাকরের পরিচয় চাহিলেন। কিন্তু রত্নাকর বলিল, 'তুমি আমাকে চেন না! আমি তোমাকে মারিয়া বস্ত্র লইব'।

ব্রহ্মাকে মারিলে রত্নাকর সামান্য ধন পাইবে, কিন্তু ইহার পূর্বেকার পাপের হিসাব তিনি তাহাকে দিলেন। রত্নাকর অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া উত্তর দিল ব্রহ্মার মতো অনেক সন্ন্যাসী পূর্বেই সে মারিয়াছে। ব্রহ্মা বলিলেন যদি মারিতেই তাহার ইচ্ছা হইয়া থাকে তবে ভাল একটা যায়গায় লইয়া গিয়া যেন সে তাহাকে মারে। তাঁহার হত্যাতে যাহাতে অন্য কাহারো কোন ক্ষতি না হয় এইরূপ যায়গা বাছিয়া লইলে ভাল হয়। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন রত্নাকর কাহার জন্য এত পাপ করে এবং তাহার পাপের ভাগী আর কেহ আছে কিনা। রত্নাকর বলিল যাহারা তাহার অসদুপায়ে উপার্জনের অর্থ ব্যবহার করিয়া থাকে তাহারাও নিশ্চয়ই পাপের ভাগী হইবে। ব্রহ্মা উত্তর দিলেন একজনের পাপের ভাগী অন্য লোক হয় না। যে লোক পাপ করে কেবল তাহারই পাপের ফল ভোগ করিতে হয়। যাহাদের জন্য রত্নাকর পাপ করে তাহাদের নিকট হইতে ইহা জানিয়া সে যেন ব্রহ্মাকে ঠিক উত্তর দেয়। রত্নাকরের সন্দেহ হইল সন্ন্যাসী বুঝি ঐ স্থান হইতে পলাইবার বুদ্ধি করিতেছে। ব্রহ্মা প্রতিজ্ঞা করিলেন তিনি পালাইবেন না। তবু তাঁহার কথায় রত্নাকরের বিশ্বাস হয় না।

"ব্রহ্মা বলে সত্য করি না পলাব আমি।
মাতাকে পিতাকে সুধাইয়া আস তুমি॥
অতঃপর যায় মুনি ফিরিফিরি চায়।
ভাবে বুঝি ভাঁড়াইয়া সন্ন্যাসী পলায়॥"

রত্নাকর প্রথমে পিতা চ্যবন মুনিকে জিজ্ঞাসা করিল মানুষ মারিয়া পুত্রের টাকা

রোজগার করার পাপের তিনি অংশীদার কিনা। পুত্রের কথায় পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর দিলেন—

"কোন্ শাস্ত্রে শুনিয়াছ কে কহে তোমারে।
পুত্র কৃত পাপ কিবা লাগিবে পিতারে॥"

বৃদ্ধ পিতার ভরণ পোষণ করা পুত্রের কর্তব্য। উহা যে কোন উপায়ে করা যায় —কিন্তু উহার জন্য রত্নাকরকে কেহ মানুষ মারিতে কোনদিন বলে নাই।

"মনুষ্য মারিতে তোমা বলে কোন্ জন।
তোমার পাপের ভাগী হব কি কারণ॥"

রত্নাকর পিতার কথা শুনিয়া মাথা হেঁট করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের নিকট গেল। সে মায়ের নিকট হইতে একই প্রকার উত্তর পাইল—

"জননী কহিছে ক্রুদ্ধা হইয়া অপার।
দশ মাস গর্ভে ধরি পুষেছি তোমায়।
তব কৃত পাপ পুত্র না লাগে আমায়॥"

ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সে তাহার পত্নীর নিকট গমন করিল।

পত্নী রত্নাকরকে বলিল—এক ভরণপোষণের পাপপুণ্য ছাড়া অন্য সকল প্রকার পাপপুণ্যের অংশ স্বামীর সহিত স্ত্রী ভাগ করিয়া লইতে পারে।

"যখন করিলা তুমি আমারে গ্রহণ।
সর্বদা করিবা মম রক্ষণ পোষণ॥
অন্য যত পাপ-পুণ্য ভাগ লাগে মোরে।
পোষণার্থে পাপভাগ না লাগে আমারে॥
মনুষ্য মারিতে কেবা বলিল তোমায়।
এইমাত্র জানি তুমি পালিবা আমায়॥"

ভার্যার কথায় রত্নাকরের ভয় হইল। সে কিরূপে এই দুষ্কর্ম হইতে উদ্ধার পাইবে —এই চিন্তায় ক্ষোভে দুঃখে জর্জরিত হইয়া নিজের মাথায় নিজেই লোহার মুগুর মারিল। সে মাটিতে অচেতন হইয়া পড়িল। যখন তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল তখন সে ভাবিল সেই মহাপুরুষের কাছে গেলে উদ্ধারের উপায় হইতে পারে। সে ব্রহ্মা ও নারদের সম্মুখে আসিল। ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া সে পাপ হইতে পরিত্রাণের উপায় জানিতে চাহিল।

ব্রহ্মা তাহাকে নিকটবর্তী সরোবর হইতে স্নান করিয়া আসিতে বলিলেন। মহাপাপী রত্নাকর সরোবরের দিকে দৃষ্টি দিতেই উহা শুখাইয়া গেল—মাছ মকর কুমীর শুকনা যায়গায় পড়িয়া মরিতে লাগিল।

তখন ব্রহ্মা নারদকে বলিলেন 'ইহার পাপ পূর্ণ হইয়াছে, এ কিরূপে উদ্ধার পাইবে?' তখন তিনি রত্নাকরের মাথায় নিজ কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া ছিটাইয়া দিলেন। ইহার পর তিনি তাহাকে মহামন্ত্র উপদেশ দিতে উদ্যত হইলেন।

"নিকটে আসিয়া ব্রহ্মা কহে তার কর্ণে।
একবার রামনাম বলরে বদনে॥"

কিন্তু রামনাম উপদেশ করিয়াও কোন ফল হইল না। পাপে রত্নাকরের জিহ্বা অসাড় হইয়াছে—উহা দিয়া রাম নাম বাহির হয় না। তবে এক উপায় আছে। যদি সে উল্‌টা উচ্চারণ করে তবে পরে 'মরা' 'রাম' হইয়া যাইবে। সুতরাং ব্রহ্মা রত্নাকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মানুষ মরিলে তাহাকে কি বলা হয়?" তিনি উত্তর পাইলেন 'মড়া'

বলা হয়। ব্রহ্মা বলিলেন 'মড়া' না বলিয়া অবিরাম 'মরা' উচ্চারণ করিতে থাক। তবেই রামনাম মুখে আসিবে।

"ব্রহ্মা বলিলেন তাব উপায় চিন্তিয়া।
মনুষ্য মরিলে বাপু ডাক কি বলিযা॥
শুনিযা ব্রহ্মার কথা বলে রত্নাকর।
মৃত মনুষ্যেরে মড়া বলে সব নর॥
মড়া নয় মরা বলি জপ অবিশ্রাম।
তব মুখে তখনি আসিবে রাম নাম॥"

কিন্তু 'মরা'-কথাও রত্নাকরের মুখ দিয়া বাহির হয় না। তখন ব্রহ্মা তাহাকে একখানি শুকনা ডাল দেখাইলেন। রত্নাকর অনেক কষ্টে বলিল এই কাষ্ঠখানির নাম 'মরা' কাঠ। 'মরা' 'মরা' বলিতে বলিতে তাহার মুখে রাম নাম উচ্চারিত হইল।

"শুষ্ক কাষ্ঠ দেখিলেন বৃক্ষের উপরে।
অঙ্গুলি ঠারিয়া ব্রহ্মা দেখান তাহারে॥
বহুক্ষণ রত্নাকর করি অনুমান।
বলিল অনেক কষ্টে মরা কাষ্ঠখান॥
মরা মরা বলিতে আইল রাম নাম।
পাইল সকল পাপে মুনি পরিত্রাণ॥
তুলারাশি যেন অগ্নিতে ভস্ম হয়।
একবার রাম নামে সর্বপাপক্ষয়॥"

ব্রহ্মা নিজে রাম নামের মহিমায় বিস্মিত হইলেন এবং ভগবান্ শিবের কথা-ও মিথ্যা নয় জানিলেন।

ব্রহ্মার নিকট রাম নাম পাইয়া রত্নাকর ষাট হাজার বৎসর একাসনে বসিয়া উহা জপ করিল। এই দীর্ঘ সময়ে তাহার চারিদিকে উঁইয়ের ঢিবি জন্মিয়া উহা তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিল। উঁইয়ের ঢিবির নাম বল্মীক, রত্নাকর এই বল্মীকের মধ্যে থাকিয়া অবিরাম রাম নাম জপ করিতে লাগিল। তারপর ব্রহ্মা সেইখানে আসিয়া কোন মনুষ দেখেন না—কিন্তু সে জায়গা রাম নামে পূর্ণ। তিনি ইন্দ্রদেবের সহায্যে বৃষ্টিদ্বারা বল্মীক পরিষ্কার করিলেন। তখন রত্নাকর উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। ঐ দিন হইতে রত্নাকরের নাম বাল্মীকি মুনি হইল—

"ব্রহ্মা বলে তব নাম রত্নকর ছিল।
আজি হইতে তব নাম বাল্মীকি হইল॥"

ব্রহ্মা (রত্নাকরকে) বাল্মীকি মুনিকে সাতটি কাণ্ডে রামচন্দ্রের চরিত কথা রামায়ণ কাব্য লিখিতে বলিলেন। বাল্মীকির জিহ্বায় সব সময় সরস্বতী থাকিবেন—তাঁহারই প্রভাবে তাঁহার মুখ দিয়া অনর্গল কবিতারাশি নির্গত হইবে—এই বর দিয়া ব্রহ্মা নিজ ভবনে চলিয়া গেলেন।

অনুশীলনী

১। রত্নাকর কে ছিলেন? তিনি কি ভাবে বাল্মীকি হইলেন?

২। রত্নাকর দস্যুর চরিত্রে এমন কি বৈশিষ্ট্য ছিল যাহার ফলে পরবর্তীকালে তিনি মহাকবি বাল্মীকিতে পরিণত হন?

৩। রত্নাকর দস্যুর কাহিনীর সারসংক্ষেপ লিখ।

৩। লবকুশের কাহিনী

[কৃত্তিবাসী রামায়ণের উত্তরকাণ্ড হইতে এই উপাখ্যানটি গৃহীত হইয়াছে।]

লোকনিন্দার ভয়ে রাজা রামচন্দ্র আপন পত্নী সীতাকে বনবাস দিয়াছেন।

লক্ষ্মণ বাল্মীকি মুনির তপোবনের নিকট অসহায়া সীতাকে রাখিয়া আসিলেন, কেননা বাল্মীকির আশ্রম রামরাজ্যের সীমানার বাহিরে—নানা হিংস্র পশুতে ভরা সেই বন। সীতা অত্যন্ত ভীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। সেই করুণ ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া মহর্ষি বাল্মীকি সেখানে উপস্থিত হইয়া সীতাকে চিনিতে পারিলেন। এই সীতাই বাল্মীকি রচিত রামায়ণের নায়িকা—কবির মানস কন্যা। তপঃসিদ্ধ কবি, ইতিপূর্বেই সীতার বনবাস পর্যন্ত রামায়ণ কাব্যের রচনা সমাপ্ত করিয়াছেন। সীতা বাল্মীকির আশ্রমে ঋষিপত্নীগণের সহিত অতি সমাদরে ও স্নেহে বাস করিতে লাগিলেন। জানকীর মনে শান্তি নাই। স্বামিপরিত্যক্তা সীতা নিজ জীবন ত্যাগ করিতে পারিতেন—কিন্তু করিলেন না, কেননা রামের পুত্র লব কুশ তখন মাতৃগর্ভে। যথাসময়ে সীতা দুই যমজ পুত্র প্রসব করিলেন। বাল্মীকি এই সংবাদ শুনিয়া সীতার যমজ সন্তানকে লবণ আর কুশ মাখাইতে সীতা দেবীকে আদেশ দিলেন। 'শিশুকে মাখাতে বল লবণ আর কুশে।'

এই জন্য একজনের নাম লব আর দ্বিতীয় পুত্রের নাম মুনি কুশ রাখিলেন—।

দুই ভাইয়ের মধ্যে লব বড় কুশ ছোট। লব কুশ মুনির আশ্রমে দিন দিন বাড়িতে লাগিল। (দিনে দিনে বাড়ে দুই শিশু মহারথী) তথাকার বারশত শিষ্যের সহিত তাহারাও সেখানে মুনির নিকট পাঠ গ্রহণ করিতে লাগিল। তাহারা বহু বিদ্যার মধ্যে ধনুর্বিদ্যা ও সংগীত বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিল।

বালক দুইটির আকৃতি ও প্রকৃতি ঠিক পিতা রামচন্দ্রের মতো। কিন্তু মহর্ষির আদেশে তাহাদের বংশ পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন করিয়া রাখা হইল। লব কুশ নিজেরাও উহা জানে না। আর আশ্রমবাসী যাহারা জানে তাহাদেরও উহা প্রকাশ করা নিষিদ্ধ।

"হাসিয়া উত্তর করে দুই সহোদর।
জাতিকুলে আমার তোমার কি বিচার॥
বারশত শিষ্য পড়ে বাল্মীকির ঠাঁঞি।
তাঁর শিষ্য আমরা যমক দুই ভাই॥"

দুই ভাই তপোবনের নিকটে অন্য অনেক খেলার মধ্যে ধনুক বাণের খেলা বিশেষ করিয়া খেলে—

"ধনুর্বাণ হাতে দুই ভাই খেলা খেলে।
মৃগপক্ষী সব বিন্ধে বসি বৃক্ষ তলে॥"

ইতিমধ্যে একদিন মহর্ষি বাল্মীকি তাঁহার অধিকাংশ শিষ্য লইয়া চিত্রকূটে তপস্যা করিতে গেলেন। আশ্রম রক্ষার ভার লব কুশের উপর পড়িল—

"তপোবন রক্ষা কর ভাই দুইজন।
তথায় বিলম্ব মম হবে বহুদিন॥
কারো সঙ্গে না করিহ বাদ বিসম্বাদ।
মুনি সব জানে যত পড়িবে প্রমাদ॥

এদিকে রাজা রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছেন। সপত্নীক যজ্ঞ করিতে হয়—কিন্তু তাঁহার একমাত্র পত্নী নির্বাসিতা। রাজা সীতার স্বর্ণপ্রতিমা গড়িয়া পত্নীর স্থান পূর্ণ করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

অযোধ্যা নগরীর বাহিরে বিরাট যজ্ঞশালা নির্মিত হইল। বিভিন্ন দেশের রাজা

অমাত্য প্রভৃতি গণ্যমান্য লোক হইতে দীন দরিদ্র পর্যন্ত সকলেই এই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইলেন। দেশের মুনি ঋষি কেহই বাদ পড়িলেন না। যজ্ঞস্থলে নৃত্য গীত ক্রীড়া কৌতুক অভিনয় প্রভৃতি সর্বপ্রকার আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা হইল। দীক্ষিত রামচন্দ্র যজ্ঞশালায় রহিলেন। বহু সৈন্যসহ শত্রুঘ্নের অধিনায়কত্বে যজ্ঞের ঘোড়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। যজ্ঞের ঘোড়া—

"শ্যামবর্ণ অশ্ব শ্বেতবর্ণ চারি খুর।
নানা অলংকার শোভে সুহার কেয়ূর॥"

ঘোড়ার কপালে জয়পত্র লিখিয়া দেওয়া হইল। ঘোড়া ইচ্ছামত নানা দিক দেশের উপর দিয়া যাইবে—শক্তি থাকিলে বিপক্ষ নরপতি উহাকে আটকাইয়া যজ্ঞ নষ্ট করিয়া দিতে পারেন। এক বছর পর ঘোড়াকে যজ্ঞস্থলে ফিরিতে হইবে। এই ঘোড়া বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া চলিল. পূর্ব, উত্তর, পশ্চিমের সকল রাজ্য কোথাও বাধায় কোথাও বা বিনা বাধায় অতিক্রম করিল। অবশেষে যজ্ঞসমাপ্তির অতি অল্পকাল পূর্বে দৈবক্রমে অশ্বটি দক্ষিণ দিকে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং বাল্মীকির তপোবনের প্রান্তে উপনীত হইল। বাল্মীকি পূর্ব হইতেই জানিতেন শীঘ্রই আশ্রমে একটা গোলমাল উপস্থিত হইবে। তাই লবকুশকে আশ্রমের ভার দিয়া কাহারও সহিত ঝগড়া করিতে নিষেধ করিয়া চিত্রকূটে চলিয়া গিয়াছিলেন। দুই ভাই গাছের তলে ধনুর্বাণ লইয়া খেলিতেছিল। সেইখানে যজ্ঞের ঘোড়া উপস্থিত হইল। ঘোড়া দেখিয়া দুই ভাইয়ের মনে আনন্দ ধরে না—

"হেমপত্র তার ভালে দেখিল-লিখন।"—- ..

জয়পত্র পড়িয়া বালক দুইটি জানিল—ইহা রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া। ইহা জানিয়া লইয়া উহাকে গাছের তলায় তাহারা বাঁধিয়া রাখিল। দুই ভাই মায়ের নিকট ব্যাপারটি সম্পূর্ণ গোপন করিয়া রাখিল।

শত্রুঘ্ন ঘোড়ার রক্ষক—তাঁহার সহিত দুই অক্ষৌহিণী সেনা। আর এদিকে দুই ভাই—লব আর কুশ, তাহাদের হাতে কেবল ধনুর্বাণ। তাহাদের অন্য কোন সহায় সম্বল নাই। (শত্রুঘ্ন) খুড়া আর দুই ভাইপোতে প্রথমে বাগ্‌যুদ্ধ বাঁধিল: তারপর অস্ত্র যুদ্ধ, কেহ কাহাকে চিনে না। শত্রুঘ্ন বলিতেছেন—

"রামের বাণেতে মরে লঙ্কার রাবণ।
মরিল আমার বাণে দুর্জয় লবণ॥"

লব কুশ উত্তর দিল—

"এতেক বড়াই করে বীর শত্রুঘ্ন।
রুষিয়া সে লবকুশ করিছে তর্জন॥"
চারি ভাই তোমরা আমরা দুই ভাই।
আজি ঘোড়া লয়ে যাও আমি তাই চাই॥
মরিবারে কেন এলে আমার নিকটে।
কেমনে লইবে ঘোড়া পড়িলে সঙ্কটে॥
খুড়া ভাইপোতে গালি কেহ নাহি চিনে।
গালাগালি মহাযুদ্ধ বাজে তিনজনে॥"

শত্রুঘ্ন ইহার উত্তরে বলিলেন—

"শত্রুঘ্ন বলেন দেখি তোমরা বালক।
বালকের সনে যুদ্ধ হাসিবেক লোক॥"

"যদি তোমরা আমার সৈন্যবাহিনীকে জয় করিতে পার তবে তোমাদিগকে আমার সহিত যুদ্ধ করিবার যোগ্য বীর মনে করিব।" লবকুশ দুই ভাই তাহাই স্বীকার করিয়া লইল। কিন্তু কুশ একাই সকল সৈন্য মারিয়া ফেলিল· শত্রুঘ্ন ছাড়া আর কেহই জীবিত রহিল না। "বেড়াপাক" বাণ দিয়া কুশ এই অসাধ্য সাধন করিল। যুদ্ধের স্থানে রক্তের নদী বহিল। কুশ শত্রুঘ্নের দুর্বলতা লক্ষ্য করিয়া বলিল "হয় পালাও নয়তো আমার বড় ভাই লবের সহিত যুদ্ধ কর। পালাইলে বাঁচিতে পার—যুদ্ধ করিলে মরণ, সুনিশ্চিত. সারা পৃথিবীও আমার বড় ভাইয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইতে পারে না।" এখন শত্রুঘ্ন কুশের কথায় বিশ্বাস করিলেন—কিন্তু পলায়ন করিলে জগতে অখ্যাতি থাকিয়া যাইবে। তখন শত্রুঘ্ন কুশকে কোন অবতার পুরুষ বলিয়া মনে করিলেন—

"তোমার সহিত যুদ্ধে অবশ্য সংহার।
বুঝিতে না পারি তুমি কোন অবতার॥"

ক্ষত্রিয় কখনও যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পালায় না। তাই শত্রুঘ্ন ঠিক করিলেন—

"একবার যুদ্ধ করি মরি কিবা মারি॥"

এই সময় লব বলিল কুশ যখন সকল সৈন্যকে মারিয়াছে তখন বাকি কাজটুকু সে একাই করিবে। বাকি কাজ শত্রুঘ্নকে যুদ্ধে পরাজিত করা বা বধ করা। কিন্তু কুশ বড় ভাইয়ের কথা শুনিল না। তাহাকে পিছনে রাখিয়া শত্রুঘ্নের সহিত একাই যুদ্ধ আরম্ভ করিল। উভয় পক্ষে বাণবৃষ্টি চলিতে লাগিল। শত্রুঘ্নের তিন লক্ষ বাণ নিঃশেষিত হইল। উভয়ের আঘাতে উভয়ে জর্জরিত। অবশেষে শত্রুঘ্ন বিষ্ণু অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। কুশ মহাবিষ্ণু অস্ত্র দ্বারা উহাকে নষ্ট করিল। শত্রুঘ্নের শেষ সম্বল ফুরাইল। তখন তিনি কশকে বলিলেন তাঁহারা দুইজনেই সমান যোদ্ধা · অতএব দুই জনেরই যার যার ঘরে ফিরিয়া যাওয়াই ভাল। কিন্তু এই কথার উত্তরে কুশ হাসিতে লাগিল—

"সৌমিত্রিব কথা শুনি কুশবীর হাসে।
অবশ্য মারিব তোমা না যাইব দেশে॥"

ইহারই পর কুশ 'মহাপাশ' বাণ ধনুকে জুড়িল। এই বাণ সমস্ত পৃথিবীকে অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলিল। শত্রুঘ্ন নিরুপায়—অন্ধকারে কোন যুদ্ধই তিনি করিতে পারেন না। এই বাণ তাঁহার শরীরের বিভিন্ন স্থান বাঁধিয়া ফেলিয়া অবশেষে তাঁহার শ্বাসরোধ করিল। তিনি প্রাণ হারাইয়া রণক্ষেত্রে পড়িয়া রহিলেন। যুদ্ধ জয় করিয়া লব কুশ দুই ভাই মহানন্দে ঘরে ফিরিল। তাহারা মায়ের নিকট এই ব্যাপার সম্পূর্ণ গোপন করিয়া রাখিল।

এদিকে শত্রুঘ্নের শোচনীয় পরাজয় এবং নিদারুণ মৃত্যুসংবাদ লইয়া দূত অযোধ্যায় রামচন্দ্রের নিকট গেল। রামচন্দ্রের দুঃখ ক্ষোভ আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। ইহার পূর্বে অযোধ্যার কোন রাজা বা রাজকুমার যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করেন নাই—আর শত্রুঘ্নের পরাজয় ও মৃত্যু ঘটিয়াছে দুইটি বালকের হাতে। লক্ষ্মণ ও ভরত রামকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন—

"রামেরে প্রবোধ দেয় ভরত লক্ষ্মণ।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম হয় যুদ্ধেতে মরণ॥"

বিনাদোষে পতিব্রতা সীতাকে যখন রামচন্দ্র বনবাস দিয়াছেন তখন রাজপরিবারে নিশ্চই কোন মহাবিপদ ঘটিবে। লক্ষ্মণ ও ভরত বিস্তর সৈন্যসামন্ত লইয়া লব কুশকে বন্দী করিয়া আনিবার জন্য বাল্মীকির তপোবনের দিকে রওনা হইলেন।

"দুই ভাই কর যুদ্ধ যদি যুদ্ধ ঘটে।
দুই শিশু ধরি আন আমার নিকটে॥"

তাঁহাদের সঙ্গে ঋক্ষ বানর ভল্লুক প্রভৃতি সৈন্য ও লংকাযুদ্ধের সহায়ক সুগ্রীব হনুমান প্রভৃতি বীরগণ চলিলেন। রণস্থলে উপস্থিত হইয়া ভরত ও লক্ষ্মণ দেখিলেন কাতারে কাতারে শত্রুঘ্নের সৈন্যগণ মৃত অবস্থায় পতিত রহিয়াছে—শৃগাল কুকুর শকুনি গৃধিনী সৈন্যগণের মাংস লইয়া টানাটানি করিতেছে। ইহাদের মধ্যে ধনুক হস্তে শত্রুঘ্নও মৃত অবস্থায় পড়িয়া আছেন। এই হৃদয়বিদারক দৃশ্যে ভরত এবং লক্ষ্মণ অভিভূত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

মন্ত্রিগণ ভরত লক্ষ্মণকে যুদ্ধক্ষেত্রে ক্রন্দন হইতে নিবৃত্ত করিলেন এবং লব কুশকে শাস্তি দিয়া এই অন্যায়ের প্রতিকার করিতে পরামর্শ দিলেন।

এদিকে সীতাদেবী আশ্রমের অনতিদূরে সৈন্যগণের কোলাহল শুনিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন—এই দুরন্ত ছেলে দুইটি কখন কি কাণ্ড করিয়া বসে তার ঠিক নাই। তাহারা মাতার নিকট সমস্ত ব্যাপার গোপন করিয়া বলিল দেশের রাজা তপোবনে মৃগয়া করিতে আসিয়াছেন। তাহার লোকজন যদি আশ্রম নষ্ট করে তবে বাল্মীকি মুনি এই দুই বালককে ক্ষমা করিবেন না। সুতরাং এবারে মায়ের নিকট হইতে যুদ্ধের অনুমতি পাওয়া গেল। যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া দুই ভাই বাহির হইয়া আসিল।

তাহারা আসিয়াই দেখে ভরত এবং লক্ষ্মণ তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত—আর চারিদিকে অগণিত সৈন্য বিবিধ অস্ত্রে সজ্জিত। কিন্তু ইহাদের কাছে সৈন্যগণ তৃণের মতো তুচ্ছ—

"দুই ভাই গেল তথা ভরত-লক্ষ্মণ।
তৃণজ্ঞান করে সব দেখি সেনাগণ॥
লবকুশ দেখি সেনা কম্পিত অন্তর।
গরুড়ে দেখিয়া যেন ভুজঙ্গের ডর॥"

ইহাদের আকৃতি প্রকৃতি সবই রামের মতো। ভরত-লক্ষ্মণ বিস্মিত হইয়া ইহাদের পরিচয় চাহিলেন। লব কুশ হাসিয়া উত্তর করিল জাতিকুলের পরিচয়ে তো কোনো দরকার নাই। তাহারা বাল্মীকি মুনির শিষ্য এবং তপোবনের রক্ষক। এখানে গোলমাল করার ফলে শত্রুঘ্ন পূর্বেই প্রাণ হারাইয়াছেন। আবার সৈন্য নিয়া ভরত-লক্ষ্মণ এখানে কেন আসিয়াছেন, তাহারা তাহার কারণ জানিতে চাহে। এইভাবে দুই ভাই আর দুই খুড়ার মধ্যে কথা কাটাকাটি চলিল। তারপর ভীষণ অস্ত্রযুদ্ধ আরম্ভ হইল। লব ধূম্রবাণ ছুড়িবার পর সৈন্যবাহিনী অন্ধকারে পথ হারাইয়া যে যেদিকে পারিল পলাইতে লাগিল। সকলে পালাইয়া গেলে লক্ষ্মণ ব্রহ্মাগ্নি বাণদ্বারা অন্ধকার দূর করিলে সৈন্যগণ পথ দেখিয়া যথাস্থানে ফিরিল। লক্ষ্মণের বাণের শিক্ষা দেখিয়া লব ভীত হইল, কিন্তু তাহা অল্পক্ষণের জন্য। তাহার তূণের ভিতর অক্ষয়বাণ আছে—লবের হাতে পড়িলে লক্ষ্মণের নিস্তার নাই। তাহার এক বাণে লক্ষ্মণের সকল সৈন্য ধরাশায়ী হইল। এইবার লক্ষ্মণের পালা। লব ও লক্ষ্মণের মধ্যে বহুবিধ শক্তিশালী বাণের বিনিময় হইল। অবশেষে লক্ষ্মণের তূণের বাণ ফুরাইল। লব প্রতিজ্ঞা করিল 'পাশুপত' অস্ত্রের প্রয়োগ যদি লক্ষ্মণ সহ্য করিতে পারেন তবে সে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবে না। কিন্তু পাশুপত অস্ত্রের বলেই লক্ষ্মণ ভূপাতিত হইলেন। লব ইন্দ্রজিদ-বিজয়ী লক্ষ্মণকেও পরাজিত করিল। এখন কুশের পালা। কুশ ভরতকে আক্রমণ করিল; ভরতের সৈন্যগণ একবাণে নির্মূল হইল। সৈন্যগণের

মৃতদেহ পর্বতপ্রমাণ উচ্চ হইল। ভরত ভয় পাইয়া তাঁহার দলের আটজনকে ছাড়িয়া দিতে কুশকে কাতরভাবে অনুনয়-বিনয় করিলেন। ভরত কুশের নিকট যে উত্তর পাইলেন তাহা অত্যন্ত মর্মঘাতী—

"শুনহ ভরত বীর আমার উত্তর।
ক্ষত্রিয় হইয়া কেন হইলা কাতর॥
মনে ভাব পলাইয়া পাবে অব্যাহতি
যতকাল জীব তব থাকিবে অখ্যাতি॥
পলাইয়া গেলে যে থাকে অপযশ।
যুঝিয়া মরিলে থাকে অনন্ত পৌরুষ॥"

ভরতের উত্তর—

"ভরত বলেন কুশ ইহা মিথ্যা নয়।
শ্রীরামের রূপ দেখি তেঁই বাসি ভয়॥
শ্রীরামের তেজ বল তাঁর ধনুর্বাণ।
হারিলে তোমার ঠাই নাহি অপমান॥"

কুশ উত্তর দিল "রামের নাম লইয়া এত গর্ব করা নিষ্ফল। আমার হাতে আপনি মরিলে রাম কি করিবেন? আপনাকে ছাড়িয়া দিলে আমার দাদা লব এই কারণে হাসিবেন যে, আমি ভয়ে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছি। সুতরাং আপনার প্রাণও লইতে হইবে। তবে এজন্য বেশি বাণ ক্ষয় করিতে হইবে না এক বাণেই আপনাকে শেষ করিব।" ভরত আর কুশের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল। ভরত একবাণে তিন কোটি গন্ধর্বের সৃষ্টি করিলেন—তাহারা যুদ্ধ করিতে লাগিল। একবাণে কুশ গন্ধর্বদিগকে নিপাতিত করিল। ঐষিক অস্ত্রদ্বারা সে ভরতকে সংহার করিল। লব কুশের শরীর যুদ্ধের রক্তে রাঙা হইল। যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া দুই ভাই আনন্দে কোলাকুলি করিল। গায়ের রক্ত ধুইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া উভয়ে কুটীরে ফিরিল। এত ভীষণ কাণ্ড হইয়াছে তাহার বিন্দুবিসর্গও সীতাদেবী জানিতে পারিলেন না। মাতাকে লবকুশ অন্য কথা বলিয়া ঠকাইল।

এদিকে অযোধ্যায় রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের দীক্ষা লইয়া যজ্ঞশালায় বাস করিতেছেন। যজ্ঞ সমাপ্ত না হইলে সেস্থান হইতে বাহির হইবার উপায় নাই; কিন্তু ঘোড়া ফিরিয়া পাওয়া যাইতেছে না। এমন সময়ে ভগ্নদূত গিয়া ভরত লক্ষ্মণের শোচনীয় পরাজয় রামচন্দ্রের নিকট জানাইল। দূতগণ বলিল—

"দুই শিশু নর নহে বিষ্ণু অবতার।
তোমার যতেক সেনা করিল সংহার॥
আপনি যদ্যপি রাম যুঝ তার সনে।
জিনিতে নারিবে প্রভু হেন লয় মনে॥"

সকল কথা শুনিয়া রাম মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন—শত্রুঘ্ন পূর্বেই হত হইয়াছেন. ভরত-লক্ষ্মণও তাঁহার পথ অনুসরণ করিলেন।

মন্ত্রীদের কথায় রাম প্রবোধ মানিলেন। শ্রীরাম বলিলেন—

"শ্রীরাম বলেন যাই ভাইয়ের উদ্দেশে।
তিন ভাই গেল যদি আমি আছি কিসে॥
দুই শিশু মারিয়া শুধিব ভায়ের ধার।
অযোধ্যায় তবে সে গমন করি আর॥"

দুই বালকের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য রামচন্দ্র যে সামরিক আয়োজন করিলেন তাহা সত্যই বিস্ময়কর। এবাব একদিকে কিশোরবয়স্ক দুই বালক—তাহাদের সম্বল শুধু ধনুক আর বাণ; অপর দিকে দশাননজয়ী রামচন্দ্রের বিপুল সমরায়োজন।

আবার সৈন্যসামন্তের কোলাহল শুনিয়া লব-কুশ মনে করিল এবার বিপুল সেনাবাহিনী লইয়া স্বয়ং রাম আসিতেছেন। রামচন্দ্রকে যদি যুদ্ধে মারিতে পারা যায় তবে পৃথিবীতে লবকুশের নাম চিরস্থায়ী হইতে পারে; দুই ভাই গোপনে এই পরামর্শ করিল।

"সংগ্রামে পণ্ডিত অতি বিখ্যাত শ্রীরাম।
ইহাকে মারিতে পারি তবে থাকে নাম॥"

এমন সময়ে সীতাদেবী সেখানে আসিয়া দুই ভাইকে সাবধান করিয়া দিলেন তাহারা যেন কাহারও সহিত ঝগড়াঝাটি না করে। তবে যদি তাহারা যুদ্ধ করিতে বাধ্য হয় বা তাহাদিগকে কেহ আক্রমণ করে তবে শত্রু যেন তাহাদের হাতে পরাজিত হয়—

"উভয়ে করেন সীতাদেবী সাবধান।
শতশত আশীর্বাদ করেন কল্যাণ॥
কায়মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী।
তোসবার যুদ্ধে কারো নাহি অব্যাহতি॥
অব্যর্থ সীতার বাক্য নহে অন্যমত,
যা বলেন যাহারে সে ফলে সেই মত॥"

মায়ের চরণে প্রণাম করিয়া দুই ভাই রামের নিকট উপস্থিত হইল।

সেখানকার লোকেরা বলাবলি করিল—তিন রাম একত্র হইয়াছেন। বানর সেনাপতিগণেরও সন্দেহ হইল, 'এ ছেলে দুইটি রামের পুত্র হইতে পারে।' সারথি সুমন্ত্রও এই কথা সমর্থন করিলেন—তিনি গর্ভবতী সীতাকে এইখানে বিসর্জন দিয়াছিলেন। রামচন্দ্র বালকদের পরিচয় চাহিলেন, কেন না পুত্রের সহিত যুদ্ধ করা চলে না। উহারা পিতার নাম জানে না, তবে মায়ের নিকট পরে জানিয়া লইবে। এইরূপ দুই ভাইযে গোপন পরামর্শ করিল। প্রকাশ্যে তাহারা অতি কঠোর ভাষায় বলিল—

"এতদিনে অবোধের সনে দরশন।
পরিচয় দিলে হবে কোন্ প্রয়োজন॥
পুত্র হযে পিতৃসনে কেবা করে রণ।
আপনার পুত্র বলি ভাব মনে মন॥
আমা দোঁহে দেখিয়া যে কাঁপিলে অন্তরে।
পরিচয় তেকারণে চাহ বারে বারে॥
তোমারে কহিব শুন অবোধ শ্রীরাম।
বড ভয় পাও তুমি করিতে সংগ্রাম॥"

পরিচয়ের পরিবর্তে পিতা আর পুত্রদ্বয়ের মধ্যে গালাগালি চলিল। রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া বিরাট সৈন্যবাহিনীকে উহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিবার আদেশ দিলেন। প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বিরাট সৈন্যবাহিনী দেখিয়া লব-কুশের একেবারে ভয় হয় নাই—এমন নহে।

"সৈন্য দেখি দুই ভাই ভাবিত অন্তর।
কেমনে মারিব ঠাট কটক বিস্তর॥"

কিন্তু তাহাদের মনোবল দ্রুত ফিরিয়া আসিল। প্রবল বিক্রমে নানা অস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া তাহারা যুদ্ধ করিয়া অগণিত সেনা মারিল। রামের লংকা যুদ্ধের সহায় হনুমান ছোটখাট একটা পাহাড় ছুঁড়িয়া মারিল কুশের উপর, কিন্তু কুশের বাণের আঘাতে হনুমান মূর্চ্ছিত। মন্ত্রী রামকে দেশে ফিরিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। এদিকে সেনাপতি রণে ভংগ দিয়া পলায়ন করিলেন। কিন্তু রাম একাই যুদ্ধ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন।

পিতা আর দুই পুত্রের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বাধিল। অবশ্য যুদ্ধের আগে কথা কাটাকাটি হইল।

"আমার পুত্রের স্থানে আছে পরাজয়।
পিতাকে জিনিতে পুত্র পারে শাস্ত্রে কয়॥
আমার আকৃতি দেখি তোমরা দুজন।
মম পুত্র হও যদি না করিহ রণ॥"

রামের কথা শুনিয়া দুই ভাই হাসিয়া উঠিল—

শুনহ তোমারে বলি অবোধ শ্রীরাম।
বড় ভয় পেলে করিতে সংগ্রাম॥

* * *

রণেতে পণ্ডিত তুমি নিজে মহারাজ।
বারে বারে পুত্র বলি নাহি বসে লাজ॥
রাবণে মারিয়া কত আপনা বাখান।
পড়িলে বীরের হাতে ভাল মতে জান॥
অধিক কি কব রাম শুনহ উত্তর।
ক্ষত্রিয় হইয়া কেন হইলা কাতর॥
আমরা মুনির পুত্র সেই মত বল।
তুমি ত ধরণীপতি কেন কর ছল॥

দুই শিশুর উপর শ্রীরামের বাণ আসিয়া পড়িতে লাগিল। নানা অস্ত্রের আঘাতও তাহাদের উপর পড়িল। তাহারা পালায়ন করিল। কিন্তু বালক দুইটির অদ্ভুত যুদ্ধে রামচন্দ্রের দুঃখের অবধি রহিল না—রঘুবংশের পূর্বকীর্তি সব লোপ পাইল। রাম একা বাঁচিয়া আছেন—আর বন্ধুগণ সকলেই মরিয়াছেন। হয়তো বা রামের পূর্ব-বৈরী রাবণ ও কুম্ভকর্ণ পূর্বশত্রুতার প্রতিশোধ লইতে লব-কুশের রূপ ধরিয়া যুদ্ধে নামিয়াছে। রামচন্দ্র অবশেষে এক ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন—

"আজি দুই শিশু মারি সে রক্তে তর্পণ করি
তবে আমি রঘুবংশ হই।
যুঝিব শিশুর সনে এই দাঁড়াইনু রণে
নাহি দেখি গতি ইহা বই॥"

এদিকে লবকুশ দেখিল রাম তাহাদের এড়াইয়া চলিয়া গেলেন। সুতরাং দুইজনেই রামকে পুনরায় আক্রমণের সংকল্প করিল। লবের বাণে শ্রীরামের বাণ ব্যর্থ হইল—ইহা সকল অন্ধকার দূর করিয়া ফেলিল। বাণটির নাম 'চিকুরবাণ'। তারপর দুই ভাই একই সময়ে রামের দিকে বাণের সন্ধান করিল—যুদ্ধ চলিল। কোন সময় লব-কুশ অগ্রসর হয়—রাম পিছনে হটিয়া যান, আবার রাম অগ্রসর হইলে কখন কখন দুই শিশু পিছনে হটেন।

"একেবারে দুই ভাই পূরিল সন্ধান।
বাণের প্রতাপ দেখি পাছু লন রাম॥
ক্ষণে রাম আগু হন ক্ষণে দুই ভাই।
বাণের ঠনঠান শুনি লেখা জোখা নাই॥"

রামের অস্ত্র লবকুশের গলায় ফুলের মালার মতো হইয়া থাকে—আর লব-কুশের অস্ত্র রামের চরণ বন্দনা করিয়া পাতালে প্রবেশ করে। দেবতারা পিতাপুত্রের যুদ্ধের কৌতুক স্বর্গলোক হইতে দেখিতে লাগিলেন। কেহ কাহাকেও পরাস্ত করিতে পারেন না—উভয় পক্ষই সমান বলী।

"এইরূপে পিতাপুত্রে বাজিল সমর।
স্বর্গেতে কৌতুক দেখে যতেক অমর॥
কেহ কারে নাহি পারে সমান উভয়।
পিতার সদৃশপুত্র কেহ ছোট নয়॥"

রামচন্দ্র একা একদিকে—অপর দুই দিকে দুই ভাই। দুই দিক হইতে দুই ভাইয়ের অস্ত্র আসিয়া রামের উপর পড়িতে লাগিল। একা রামচন্দ্র কোন দিক রক্ষা করিবেন! কুশের দিকে চাহিতে লবের অস্ত্র রামের উপর পড়ে—আর লবের দিকে লক্ষ্য করিলে কুশের অস্ত্র পড়িতে থাকে। অবশেষে দুই ভাই একসঙ্গে বাণ সন্ধান করিল—এ সন্ধান অব্যর্থ। রাম মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। লবের 'অস্ত্রকলা' নামক বাণে ধনুর্বাণ সহ রামের গলা বাঁধা পড়িল। কুশের 'অক্ষয়জিত' বাণ শ্রীরামের বুকে লাগায় তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন। তখনও তাঁহার প্রাণমাত্র আছে—সমস্ত শক্তি বিলুপ্ত। লব কুশ দুইজনে তখন রামের অলংকার কাড়িয়া লইল। তাহারা তাঁহার মুকুট, কাণের কুণ্ডল, বাহুর কেয়ূর ও ধনুর্বাণ অধিকার করিল। যুদ্ধজয়ের সামগ্রী লইয়া যখন লবকুশ সানন্দে মায়ের নিকট ফিরিতেছিল তখন পথে অস্ত্রের আঘাতে অচেতন অদ্ভুত দুইটি জীবকে বাঁধিয়া লইল—ইহারা হনুমান ও জাম্বুবাণ—

"যাইতে দেখিল পথে বনের ভল্লুক।
মুখ দেখি উভয়ের বাড়িল কৌতুক॥
সাঙ্গি বাঁধি উভয়কে লইলেক স্কন্ধে।
রণজয়ী দুই ভাই চলিল আনন্দে॥"

[সাঙ্গি—প্রাদেশিক উচ্চারণে সাইঙ্গ-দণ্ড—কোন ভারি জিনিসকে দুইদিকে দড়িতে বাঁধিয়া কাঁধে লইবার দণ্ড।]

সতর দিন পর দুই ভাই কুটীরে ফিরিল; বিরাট দেহ হনুমান জাম্বুবানকে তপোবনে প্রবেশ করাইতে না পারিয়া দরজার সামনে তাহাদিগকে রাখিয়া মায়ের নিকট দুই ভাই ছুটিয়া গেল। নানা দুশ্চিন্তায় এই সতরদিন সীতাদেবীর কাটিয়াছে। লবকুশ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যুদ্ধের বিচিত্র কাহিনী শুনাইতে লাগিল। রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন—কেহ জীবিত নাই—তাঁহাদের অগণিত সেনাও আজ মৃত্যুমুখে পতিত। সীতাদেবী রামের অস্ত্র মুকুট অলংকার প্রভৃতি দেখিয়া চিনিতে পারিলেন। তিনি শিরে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন—

"হায় হায় কি করিলি ওরে লব কুশ।
পিতৃহত্যা করিয়া কি রাখিলি পৌরুষ॥
কোনখানে মারিলি সে কমললোচনে।
চল ঝাট পড়ি গিয়া প্রভুর চরণে॥"

লবকুশ পিতা আর পিতৃব্যগণকে মারিয়াছে। আলুলায়িত কুন্তলা সীতা রণক্ষেত্রের দিকে ছুটিয়া চলিলেন, পিছনে লব কুশ দুই ভাই মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিল।

শবেরর পাশে হাত-পা বাধা হনুমান ও জাম্ববানকে দেখিয়া সীতার ক্ষোভের অবধি রহিল না। তিনি দুই ছেলেকে নানাভাবে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। সীতা বলিলেন—'এই হনুমান আমার বড় ছেলে। সাগরপারে গিয়া সেই আমাকে উদ্ধার করিয়াছে'। চিরজীবী হনুমান ও জাম্ববানের বাঁধন খুলিবামাত্র তাঁহারা উঠিয়া বসিলেন। সীতাদেবী লব কুশের পরিচয় দিয়া রামেব নিকট উহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন। বাল্মীকির মায়ায় হনুমান সব ভুলিয়া গেলেন।

সীতাদেবী সংগ্রামের স্থানে আসিয়া স্বামী ও দেবরগণকে মৃত দেখিতে পাইলেন। চারিদিকে কাতারে কাতারে হস্তী অশ্ব পদাতি পড়িয়া আছে। সীতা রামের চরণতলে ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন এবং অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগের সংকল্প করিলেন; লব কুশও সেইভাবে পিতৃহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিতে মনস্থ করিল। তিনটি অগ্নিকুণ্ড জ্বালান হইল—অগ্নি জ্বলিয়া আকাশে উঠিল, তাঁহারা স্নান করিয়া পবিত্র বসন পরিধান করিলেন, তাঁহারা অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন, একটু পরেই উহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িবেন। ঠিক এই সংকটপূর্ণ মুহূর্তে বাল্মীকি মুনি আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন, সীতার কাছে সব কথা শুনিলেন। বাল্মীকি বলিলেন—

"বাল্মীকি বলেন সীতা প্রাণ ত্যাজ নাই।
বাঁচিবেন এখনি রাঘব চারি ভাই॥"

লব কুশ না জানিয়া পিতৃবধ করিয়াছে তাহাদের কোন অপরাধ হয় নাই।

বাল্মীকির তপোবনে মন্ত্রপূত মৃতসঞ্জীবনী বারি ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত সকলের উপর ঐ জল শিষ্যগণ ছড়াইয়া দিলেন। ঐ জলের প্রভাবে সকলে বাঁচিয়া উঠিল। দূর হইতে রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্নকে দেখিয়া সীতা যেন আপনার জীবন ফিরিয়া পাইলেন, সৈন্য-সামন্ত সকলে অক্ষত শরীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। বাল্মীকির আদেশে সীতা পুত্র দুইটিকে লইয়া পূর্বেই নিজের কুটীরে ফিরিয়া গিয়াছেন। বাল্মীকির নিকট রাম ইহাদের পরিচয় চাহিলেন; কিন্তু মুনি যথাসময়ে তাঁহার সহিত ইহাদের মিলন ঘটাইবেন বলিলেন। রামচন্দ্র যজ্ঞের অশ্ব ফিরিয়া পাইলেন এবং মুনির আদেশে স্বদেশে চলিয়া গেলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের ক্রিয়া চলিতে থাকিল। বারশত শিষ্যসহ বাল্মীকি মুনিও নিমন্ত্রিত হইয়া যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া পরম সমাদরে বাস করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইল। বাল্মীকি লবকুশকে বলিলেন, "তোমাদের অস্ত্র শিক্ষার পরীক্ষা খুব ভাল হইয়াছে। এখন রামচন্দ্রের সভায় সংগীত শিক্ষার পরীক্ষা দিতে হইবে। তোমরা ব্রহ্মচারীর বেশে রামের সভায় যাইবে—কখনও সামরিক বেশে যাইও না, রাম ভয় পাইবেন। রামচন্দ্রের কাছে তোমাদের সত্যকার পরিচয় দিও না—তোমরা মুনির শিষ্য এই কথা বলিও। সভায় রামায়ণ গাহিতে হইবে। 'সীতার বর্জন' গাহিবার সময় রামচন্দ্রকে কোন কুবাক্য বলিও না। জগৎপতি রামচন্দ্র অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি—এইরূপ লোককে কখনও কুবাক্য বলা উচিত নহে।"

পরদিন সকালে লব কুশ দুই ভাই জটা বাকল ধারণ করিয়া বীণা হাতে সভার দিকে চলিল। তাহারা বেদ গান ও রামায়ণ গান করিল—

"শিরে জটা বাঁধিলেন দেখিতে সুঠাম।
পূর্ণচন্দ্র মুখবর্ণ দূর্বাদল শ্যাম॥

হাতে বীণা করি দোহে করেন গমন।
মধুর ধ্বনিতে গান বেদ রামায়ণ ॥”

রামচন্দ্র বিভিন্ন দেশের নৃপতি, পন্ডিতগণ, মুনিঋষি ও সাধারণ লোক লইয়া সভায় বসিয়া রামায়ণ গান শুনিতে লাগিলেন।

“দুইভাই গীত গায় বাজাইয়া বীণা।
সর্বলোকে গীত শুনে অমৃতের কণা ॥
“বীণা যন্ত্র বাজে আর গীত গায় স্বরে।
শুনিয়া সকল লোক আপনা পাসবে ॥”

লোকে কানাকানি করিতে লাগিল—এই দুই বালক রামচন্দ্রের পুত্র। রামচন্দ্রও ইহাদিগকে নিজপুত্র বলিয়া অনুমান করিলেন। লবকুশ ছলনা করিয়া পরিচয় দিল,

“না জানি পিতার নাম মাতৃ নাম সীতা।
বাল্মীকির শিষ্য মোরা নাহি চিনি পিতা ॥”

রামচন্দ্র, বাল্মীকি মুনির নিকট সীতাকে সভায় আনিবাব প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু সর্বলোকসমক্ষে তাঁহাকে আরো একবার বিশুদ্ধতার পরীক্ষা দিতে হইবে। কৌশল্যা, কৈকেয়ী আর সুমিত্রা—এই তিন রাজমাতা ইহাতে আপত্তি জানাইলেন।

বাল্মীকির নিকট সীতা রাজসভায় তাঁহার পুত্রদের পরিচয়েব কাহিনী শুনিলেন এবং রামচন্দ্রের প্রস্তাবও জানিলেন। কিন্তু বারবার কয়বার সীতা এরূপ পরীক্ষাব অপমান সহ্য কবিবেন। রামের সভায আসিয়া তিনি প্রার্থনা করিলেন ‘জন্মে জন্মে প্রভু মোর তুমি হও পতি।’ দুঃখে লজ্জায় জর্জরিতা সীতা আপন মাতা ধরাদেবীকে নিজবক্ষে স্থান দিতে বলিলেন। তিনি পাতাল প্রবেশ করিয়া এই দারুণ অপমানেব হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। সীতার অন্তর্ধানে সমস্ত অযোধ্যা কাঁদিযা উঠিল। লবকুশ পিতাকে পাইল বটে কিন্তু তাহাবা মাতৃহাবা হইল। তাহাদেব শোকের অবধি রহিল না।

রামচন্দ্র বাঁচিয়া থাকিতেই দুই পুত্র আব তিন ভাইযের ছয পুত্রেব মধ্যে সমস্ত রাজ্য ভাগ করিয়া দিলেন। লবকুশ অযোধ্যা ও নন্দীগ্রামের বাজত্ব পাইলেন।

“লবকুশ পাইলেন অযোধ্যা নন্দীগ্রাম।
অষ্টজনে অষ্টবাজ্য দিলেন শ্রীরাম ॥”

অনুশীলনী

১। লব ও কুশ কে? তাহাদের এরূপ নাম হইবার কারণ কি?
২। লবকুশের অস্ত্রশিক্ষা ও বিদ্যাশিক্ষার পরিচয় দাও।
৩। বাল্মীকিমুনি লবকুশের পরিচয কেন গোপন রাখিয়াছিলেন? এই পরিচয় গোপনেব পরিণাম কি হইয়াছিল?
৪। কে অশ্বমেধ যজ্ঞ কবিযাছিলেন?—যজ্ঞের ঘোড়া কাহাদের কাছে বাঁধা পড়িল?
৫। লবকুশের যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত পরিচয দাও।
৬। লবকুশ পিতৃপরিচয় পাইয়াছিলেন কি? যদি পাইযা থাকেন তবে কখন কিভাবে পাইলেন?

৪। শ্যেন কপোতের উপাখ্যান

[এই অংশটি কাশীরাম দাসের মহাভারতের বনপর্ব হইতে গৃহীত হইয়াছে। বনবাসকালে লোমশ মুনি যুধিষ্ঠিরকে এই গল্পটি বলিয়াছিলেন। ব্যাসদেবের মূল সংস্কৃত মহাভারতে শ্যেন কপোতের কাহিনীটির দুইটি রূপ পাওয়া যায়। উহার একটিতে উশীনরের পুত্র শিবি রাজার

(অর্থাৎ ঔশীনরের) ধর্মপরীক্ষার কথাই বলা হইয়াছে। বাঙ্‌লা মহাভারতে কাশীরাম দাস উশীনর রাজার ধর্মপরীক্ষার কথা লিখিয়াছেন। তবে এই দুইটি উপাখ্যানে কোন পার্থক্য নাই।]

শিবিরাজ্য পরম রমণীয় দেশ। এই দেশের মধ্য দিয়া বিতস্তা নদী প্রবাহিত; বিতস্তার জলে সারস-সারসী আনন্দে ক্রীড়া করে। সেই দেশে উশীনর নামে নৃপতি বাস করিতেন। সেই রাজা এত যজ্ঞ করিতেন যে ধর্মের অনুশীলনে তিনি ইন্দ্রকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন। ত্রিদশপতি ইন্দ্রের ভয় হইল, এই পরম ধার্মিক রাজা একদিন হয়তো পুণ্যের বলে স্বর্গের সিংহাসন অধিকার করিবেন। এমন সময় অগ্নিদেব ইন্দ্রের সভায় উপনীত হইয়া উশীনরের যজ্ঞের কথা নিবেদন করিলেন।

"সুরপতি চিন্তাকুল কণক আসনে।
ইন্দ্রত্ব বা লয় বুঝি ভাবে মনে মনে॥
হেনকালে হুতাশন হন উপনীত।
উশীনর যজ্ঞ কথা করিল বিদিত॥"

ইন্দ্র ও অগ্নি পাখির রূপ ধরিয়া উশীনরকে পরীক্ষা করিতে গেলেন।

ইন্দ্রদেব শ্যেন (=বাজপক্ষী) পাখির রূপ ধারণ করিলেন আর অগ্নিদেব কপোতের (=কবুতর, পায়রা, ঘুঘু) রূপ ধরিলেন। কপোতের শত্রু শ্যেন। সে কপোত ধরিয়া খাইয়া জীবনধারণ করে। এই দুইয়ের মধ্যে খাদ্য খাদক সম্বন্ধ। প্রাকৃতিক নিয়মে একে অন্যের খাদ্য। উশীনর রাজা (যজ্ঞে ব্রতী হইয়া) যজ্ঞশালায় অবস্থান করিতেছেন এমন সময় পিছন হইতে কপোতকে শ্যেন আক্রমণ করিল। কপোত প্রাণভয়ে উশীনর রাজার উরুর নীচে পালাইল। কপোত তাঁহার শরণাগত—কপোত কাতরভাবে প্রার্থনা করিল—'মহারাজ! আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি; আমি আপনার শরণাগত। আমাকে রক্ষা করুন।' রাজা উত্তর দিলেন 'তোমাকে যে কোন উপায়ে রক্ষার জন্য শরীর এবং প্রাণ উভয়ই আমি ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। ইহাই আমার পণ। ইহার কখনও অন্যথা হইবে না।'

"কপোত ব্যাকুল হেরি কহে উশীনর।
তোমারে রক্ষিতে প্রাণ দিব কলেবর॥
আশ্রিতে রক্ষিতে যদি যায় মোর প্রাণ।
তথাপি এ পণ কভু নাহি হবে আন॥"

কিন্তু রাজার প্রতিজ্ঞায় বিস্মিত হইয়া শ্যেন বলিল, 'মহাবাজ আপনার আচরণ ভাল নহে—আপনি কেন আমার ভক্ষ্য বস্তুকে রক্ষা করিয়া (আমার) মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছেন? সকলেই আপনাকে ধার্মিক বলে। আপনি ক্ষুধার সময় অপরের খাদ্যে বাধা উপস্থিত করিতেছেন? ইহা অধর্মের কাজ। আমার স্বাভাবিক খাদ্য আমাকে খাইতে দিন। আপনি কপোতকে আমার হাতে ছাড়িয়া দিন।'

"শ্যেন কহে মহারাজ এ কি আচরণ।
মোর ভক্ষ্যে রক্ষ তুমি কিসের কারণ॥
সবে কহে ধর্মনিষ্ঠ রাজা উশীনর।
ধর্ম হীন কর্ম কেন কর নৃপবর॥
মহাপাপ খাদ্যে বাধা ক্ষুধার সময়।
ভক্ষ্য ছাড়ি দেহ মোরে হয়ে সদাশয়॥"

রাজা বলিলেন 'তুমি আমাকে অনর্থক দোষ দিতেছ। এই কপোত প্রাণভয়ে আমার শরণ লইয়াছে—ইহাকে আমি (তোমার মতো) যমের হাতে ছাড়িয়া দিতে পারি না।'

...লা দিয়া
...ারে না।

"পরিত্যাগ করে যেবা শরণ আগতে।
গোব্রাহ্মণ বধসম ভুঞ্জিবে পাপেতে॥"

তখন শ্যেন বলিল মহারাজ! আপনার যুক্তিতে দোষ আছে। সকল প্রাণীর বাঁচিবার অধিকার আছে; কিন্তু না খাইয়া কেহ বাঁচে না। আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর, কথা বলিতে পারিতেছিনা। আহার পাইতে দেরী হইলে আমি মরিয়া যাইব। আমার মৃত্যুতে শুধু আমার ক্ষতি হইবে না, আমার স্ত্রী পুত্র সকলে অনাহারে মরিবে। একটিমাত্র প্রাণীকে বধ করিয়া যদি বহু প্রাণীর মঙ্গল করা যায় তবে তাহা করা ধর্ম।'

"এক প্রাণী দিলে যদি বাচে বহু প্রাণী।
অধর্ম না হয় তাহে সত্যধম গনি॥
সামান্য লাভেরে ত্যাজি বহু লাভ যাহে।
লইবে আশ্রয় তার শাস্ত্রমতে কহে॥"

তখন রাজা বলিলেন 'বেশ! তোমার খাবার দরকার—মেষ বৃষ বরহ মহিষ যে কোন প্রাণীর মাংস খাইতে চাও এখনি আনিয়া দিব।' শ্যেন বলিল, আমরা কপোতের মাংস ছাড়া অন্য প্রাণীর মাংস খাই না--সুতরাং কপোতকে আমার হাতে দিন।' ইহার উত্তরে রাজা অত্যন্ত অনুনয়ের সুরে বলিলেন, "তোমার তৃপ্তির জন্য তুমি অন্য যাহা চাও তাহাই দিব। ইহার জন্য পরে অনুতাপ করিব না। আমার যাহা আছে তোমাকে সব দিব—এমন কি শিবিরাজ্য পর্যন্ত তোমাকে ছাড়িতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আশ্রিত কপোতকে কোন প্রকারেই তোমার হাতে দিব না।"

শ্যেন রাজাকে বলিল, "মহারাজ! কপোত আপনার প্রীতির পাত্র, ইহাকে ছাড়িবেন না বুঝিতেছি। এক কাজ করুন, নিজের শরীর হইতে এই কপোতের সমান ওজনের মাংস কাটিয়া আমাকে দিন। মাংস যদি কপোতের সমপরিমাণ হয় তবে আমার তৃপ্তি হইবে।" ছদ্মবেশী ইন্দ্র ও অগ্নির এইরূপ ভীষণ ছলনায় উশীনর কিন্তু আনন্দিতই হইলেন কেননা তিনি শরণাগতকে রক্ষা করিবার সুযোগ চাহেন। 'আশ্রিতে রক্ষিনু জানি, আপনারে ধন্য মানি।'

"এত শুনি কহে শ্যেন শুনহ রাজন।
কপোত যদ্যপি তব স্নেহের ভাজন॥
নিজ মাংস খণ্ড করি কপোত সমান।
দেহ মোরে তুলাদ্বারা করি পরিমাণ॥
তব মাংস কপোতের তুল্য যদি হয়।
সেই মাংসে তৃপ্ত হব শুন মহাশয়॥
ছদ্মবেশে বহ্নি ইন্দ্র ছলেন রাজনে।
উশীনর মুগ্ধ হল দোহার ছলনে॥"

রাজা উশীনর অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া সত্বর তুলাযন্ত্র (দাঁড়িপাল্লা) আনাইলেন। তিনি নিজেই নিজ শরীরের মাংস কাটিয়া তুলায় (পাল্লায়) চড়াইতে লাগিলেন এবং নিজেই দাঁড়ি ধরিয়া মাপিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজা পাল্লায় যতই মাংস দিতে থাকেন, অগ্নিরূপী কপোত ততই বেশি ভারি হইতে থাকে। এরূপ অদ্ভুত ঘটনা ঘটিতে দেখা যায় না। একটি পাল্লার উপর রাখা সামান্য একটি কপোত; রাজার শরীরের কাটা মাংস অপর পাল্লায় বারবার দেওয়াতেও এই কপোত হইতে ভারি হইতে থাকে।

রাজা অল্পক্ষণ ব্যাপারটি ভাবিলেন। অবশেষে যজ্ঞপুরুষ শ্রীহরিকে ভক্তিভাবে কপো. করিয়া নিজেই পাল্লার উপর চাড়লেন।

"নিজ মাংস যত দেয়,
তবু নাহি তুল্য হয়
হুতাশন কপোতের ভারে॥"
* * *
"ক্ষণকাল চিন্তা করি,
ভক্তিভাবে স্মরি হরি
তুলে বসে নিজে বসে উশীনর॥"

ঠিক এই সময়ে ছদ্মবেশী দেবপতি ইন্দ্র স্বমূর্তি ধারণ করিয়া নিজের ও কপোত-রূপী অগ্নির পরিচয় রাজা উশীনরের নিকট ব্যক্ত করিলেন। তাঁহারা ছল করিয়া উশীনরের ধর্মনিষ্ঠা পরীক্ষা করিবার জন্য ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছেন বলিলেন। ইন্দ্র রাজাকে বলিলেন 'আপনাকে ধর্মনিষ্ঠ দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। আপনার ধর্মফলে আমরা বাধ্য পড়িলাম। যতকাল পর্যন্ত পৃথিবী ধ্বংস না হইবে ততদিন আপনার মহিমা অক্ষুণ্ণ থাকিবে—এ জগৎ আপনাকে ধন্য ধন্য কহিবে। এই অপূর্ব আত্মদানের ফলে রাজার সশরীরে স্বর্গবাস হইল। দেবলোক হইতে রথ নামিয়া আসিল। দেবশরীর প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্র ও অগ্নির সহিত এক রথে আসীন হইয়া রাজা উশীনর স্বর্গলোকে যাত্রা করিলেন। অপ্সরা কিন্নরী যোগিনী ও দেব দেবীগণ তাহার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

অনুশীলনী

১। শ্যেন কপোতের উপাখ্যানে উশীনর রাজার আত্মত্যাগের কাহিনী লিখ।
২। শ্যেন আর কপোত কিভাবে স্বস্বকার্য সমর্থন করে?
৩। রাজা উশীনর কেন ভীষণ আত্মত্যাগের সম্মুখীন হইলেন?
৪। দেবরাজ ইন্দ্র ও অগ্নি কি ভাবে রাজা উশীনরকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন?

৫। ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন

[এই অংশটিও কাশীরাম দাসের মহাভারতের বনপর্ব হইতে গৃহীত হইয়াছে।]

সূর্যবংশে সগর নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট্ ছিলেন। তিনি কৈলাস পর্বতে বহু তপস্যা করিয়া ভগবান শিবের বরে ষাট হাজার পুত্রসন্তান লাভ করেন। কিন্তু বর দিবার সময় মহেশ্বর বলিয়া দিয়াছিলেন এই পুত্রগণ সকলেই একদিনে একসঙ্গে ধ্বংস হইবে। রাজার পাটরানী শৈব্যার একমাত্র পুত্রদ্বারা বংশের উন্নতি হইবে। এই ষাট হাজার সগর সন্তান তেজে বীরত্বে পিতার মতো হইল; কিন্তু ইহারা এত গর্বিত যে দেবতা, গন্ধর্ব মানুষ কাহাকেও গ্রাহ্য করিত না। ইহাদের অত্যাচারে পৃথিবী সন্ত্রস্ত হইল, ব্রহ্মার সৃষ্ট জগৎ নষ্ট হইতে বসিল। ব্রহ্মা দেবতাদিগকে বলিলেন—'তোমরা কোন চিন্তা করিও না ইহারা নিজ কর্মদোষে মরিবে।'

কালক্রমে সগররাজা অশ্বমেধ যজ্ঞের দীক্ষা লইলেন।

একবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে স্বর্গলাভ হয়; আর একশত বার করিলে স্বর্গে গিয়া ইন্দ্র হওয়া যায়। সগর রাজার এইবারের যজ্ঞ শততম যজ্ঞ। যজ্ঞীয় অশ্বের রক্ষার ভার পড়িল সগর সন্তানদের উপর। তাহারা ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে বন নদী গিরি মরুপ্রান্তর এবং শুষ্ক সাগরের উপর দিয়া চলিল। এদিকে ইন্দ্রদেব স্বপদ নাশের ভয়ে ষাট হাজার সগর সন্তান এবং তাহাদের বিপুল সৈন্যের চোখে ধুলা দিয়া যজ্ঞের অশ্ব চুরি করিলেন। দেবতার সঙ্গে বাদ সাধিয়া মানুষ কখনও পারে না।

পাতালে মহর্ষি কপিল যোগস্থ হইয়া বাহ্যজ্ঞান শূন্য। ইন্দ্র যজ্ঞের ঘোড়া চুরি করিয়া উক্ত মুনির পাশে উহাকে বাখিয়া দিলেন। মুনি জানিতেন না তাঁহার নিকটে যজ্ঞের ঘোড়া রহিয়াছে।

"চুরি করি নিয়া ঘোড়া রাখে পাতালেতে।
যেখানে কপিল মুনি ছিলেন যোগেতে॥
সেখানে বাখিয়া ঘোড়া শত্রু পলাইল।
প্রাতঃকালে সেনাগণ জাগিয়া উঠিল॥"

পুত্রগণসহ সগব সৈন্যের কেহই জানিতে পাবিল না ঘোড়া কোথায় আছে। এই সংবাদ পাইবামাত্র সগব সৈন্যগণকে সারা পৃথিবী খুঁজিতে বলিলেন- যদি পৃথিবীতে ঘোড়া না থাকে তবে নিশ্চযই শুষ্ক সাগবেব মধ্যে কোন স্থান দিয়া উহা পাতালে প্রবেশ করিযাছে। ঘোড়া না লইয়া কেহ যেন ঘরে না ফিরে।

সগর-সন্তানগণ সসৈন্যে সমুদ্র খনন কবিতে করিতে পূর্বদিকে গেল এবং সেই স্থান দিয়া পাতালে প্রবেশ করিযা কপিল মুনিব আশ্রমে উপস্থিত হইল। তাহারা ঘোড়া পাইযা আনন্দিত হইল এবং নানাপ্রকার অসম্মানজনক কথায গালি দিয়া কপিল মুনিকে ক্রুদ্ধ কবিল। ক্রোধে (কপিল মুনির) তাঁহার দুই চক্ষু দিযা আগুন বাহির হইল। সগর-সন্তানগণ উহাতে ভস্মীভূত হইল। অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়াও গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে সগবপুত্ররাও ধ্বংস হইল। নারদের মুখে রাজা সগর এই নিদারুণ সংবাদ শুনিলেন।

অসমঞ্জ সগরের পাটবানীর পুত্র। অন্যায় অত্যাচারের জন্য প্রজাগণ তাঁহাকে রাজ্য হইতে বাহির কবিযা দিয়াছে। তাঁহাকে কাজে লাগাইবার উপায় নাই। অসমঞ্জেব পুত্র অংশুমান। পিতামহ সগব নাতিকে (অংশুমান) অশ্বমেধ যজ্ঞেব বিঘ্নে যে ঘোরতর পাপ হইতে বসিয়াছে উহা হইতে উদ্ধারের ব্যবস্থা কবিতে বলিলেন। পিতামহেব আদেশে অংশুমান বহু কষ্টে পাতালে কপিল মুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন। তিনি মুনিকে বহু স্তব স্তুতি দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন। মুনি তাঁহাকে বব চাহিতে বলিলেন। অংশুমান প্রথম বরে অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া প্রার্থনা করিলেন—দ্বিতীয় ববে তাঁহাব যাট হাজাব পিতৃব্যের সদ্গতি লাভেব ইচ্ছা প্রকাশ কবিলেন।

"এত শুনি অংশুমান্ বলে যোড করে।
কৃপা করি কর প্রভু দেহ অশ্ববরে॥
দ্বিতীয়ে মাগিল পিতৃগণের সদ্গতি।
বাঞ্ছা পূর্ণ হোক বলি বলে মহামতি॥"

অংশুমান যজ্ঞের অশ্ব তখনই ফিরিয়া পাইলেন এবং পিতামহকে প্রত্যর্পণ করিলেন। সগর রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইল। অংশুমানকে রাজ্য দিযা সগর তপোবনে প্রবেশ করিলেন। এখন পিতৃপুরুষগণের সদ্গতির কথা। ইহারও উপায় কপিল মুনি বলিলেন। অংশুমানদ্বারা একার্য হইবে না—তাঁহার পুত্রদ্বারাও হইবে না—তাঁহার নাতি ভগীরথ দ্বারা হইবে।

"মম ক্রোধে দগ্ধ যত সগর কুমার।
তব পৌত্র করিবেন সবার উদ্ধার॥
শিবে তুষ্ট করিবে আনিবে সুরধুনী।
যজ্ঞ সাঙ্গ কর অশ্ব লইয়া এখনি॥"

ভগীরথ ভগবান শিবকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করিয়া গঙ্গাকে মর্ত্যলোকে আনিবেন

এবং তথা হইতে পাতালে লইয়া গিয়া গঙ্গাজল সেচন করিয়া পিতৃপুরুষদিগকে উদ্ধার করিবেন।

পিতা অংশুমানের নিকট হইতে দিলীপ রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর কপিলের কোপে দগ্ধ পিতৃগণের কথা শুনিলেন। তিনি গঙ্গাকে আনিবার জন্য বহুকাল ধরিয়া তপস্যা করিলেন কিন্তু তাঁহাকে আনিতে পারিলেন না—

"দিলীপ পাইল নিজ পিতৃসিংহাসন।
শুনিল কপিলকোপে দগ্ধ পিতৃগণ॥
গঙ্গা হেতু তপস্যা করিল বহুকাল।
তথাপি আনিতে গঙ্গা নারিল ভূপাল॥"

সগরের পর তৃতীয় চতুর্থ পুরুষের চেষ্টা চলিল—কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। এই বংশের কৃতী পুরুষ সগর হইতে পঞ্চম হইতেছেন মহারাজ ভগীরথ। ভগীরথ দিলীপের পুত্র। সুদীর্ঘ চার পুরুষ ধরিয়া সগর-সন্তানগণ ছাই হইয়া কপিলের আশ্রমে পড়িয়া আছেন। তাঁহাদের কোন সদ্গতি হয় নাই। অবশেষে ভগীরথ কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি রাজ্যের চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া পিতৃপুরুষের উদ্ধারের চেষ্টায় ব্রতী হইলেন।

"তাঁহার নন্দন ভগীরথ মহারথ।
যাঁর যশকর্পূরে পূরিল ত্রিজগৎ॥
কপিলের কোপানলে দগ্ধ পিতৃগণ।
লোকমুখে শুনি কথা চিন্তিত রাজন॥
মন্ত্রীবে করিয়া রাজা রাজ্য সমর্পণ।
গঙ্গার উদ্দেশে গেল দিলীপ নন্দন॥"

যুগ যুগ ধরিয়া ভারতের তপোভূমি হিমালয়। সেইখানে তিনি মহাতপস্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অতি কঠোর তপস্যায় অন্যান্য তপস্বীরা হার মানিলেন। তিনি কোন সময়ে ফলমাত্র আহার করেন, কোন সময় বা গাছের পাতা খাইয়া থাকেন, আবার কোন সময় বা শুধু বায়ুমাত্র ভক্ষণ করেন। তিনি কোন দিন বা অনাহারে যাপন করেন। এইরূপে তপস্যা করিতে করিতে তাঁহার শরীরে শুধু হাড়কয়খানা আর চামড়া অবশিষ্ট রহিল। এইভাবে তিনি দু-এক দিন বা দু-চার বৎসর তপস্যা করেন নাই—তিনি তপস্যা করিলেন দিব্য হাজার বছর।

"হিমালয়ে গিয়া মহাতপ আরম্ভিল।
কঠোর তপেতে সব তপস্বী তাপিল॥
ফলাহার পত্রাহার কৈল বাতাহার।
অনাহারে কৈল তনু অস্থি চর্ম্ম সার॥"

ইহার পর গঙ্গা সন্তুষ্ট হইয়া সশরীরে আবির্ভূত হইলেন। তিনি ভগীরথের নিকট তপস্যার কারণ জানিতে চাহিলেন এবং তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন।

ভগীরথ বলিলেন—

"কপিলের কোপানলে পোড়ে পিতৃগণ।
তা সবার মুক্তি হেতু করি আরাধন॥
যাবৎ তোমার জলে না হয় সেচন।
তাবৎ সদ্গতি নাকি পাবে পিতৃগণ॥"

কপিলের কোপে আমার পিতৃগণ ভস্মীভূত হইয়াছেন। যে পর্যন্ত তোমার জল তাঁহাদের ভস্মের উপর ছড়ান না হইবে ততদিন তাঁহারা উদ্ধার পাইবেন না। মা

তুমি যদি কৃপা করিয়া থাক, তবে কপিল আশ্রমে গিয়া নিজে তাঁহাদের উদ্ধার সাধন কর। ইহার উত্তরে গঙ্গাদেবী বলিলেন 'তোমার ভক্তির জন্যই আমি সেখানে যাইব। কিন্তু আমার বেগধারণের ব্যবস্থা কর। আমি যখন আকাশ হইতে অবতরণ করিব তখন একমাত্র শিবছাড়া আমার বেগ ধারণ করিতে পারে এরূপ কেহ নাই। তুমি ভগবান শিবকে তপস্যায় তুষ্ট করিয়া লইয়া আস।'

তখন ভগীরথ কৈলাস শিখরে যাইয়া শিবকে প্রীত করিবার জন্য তপস্যায় রত হইলেন। এই তপস্যায় তিনি সফলকাম হইলেন। গঙ্গাকে ধারণের জন্য ভগীরথ শিবের নিকট বর চাহিলেন। ভগবান শিবও ইহাই চাহিতেছিলেন। তিনি তাহার সহিত যাইতে স্বীকৃত হইলেন।

হিমালয় পর্বতের উপর দাঁড়াইয়া শিব গিরিরাজকে তাঁহার কন্যা হৈমবতী (=গঙ্গা) যেখানেই থাকুন সেখান হইতে আনিতে বলিলেন। তখন ভগীরথ মহাদেবের কথা শুনিয়া গঙ্গার ধ্যান আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মলোকস্থিতা গঙ্গা ভগীরথের মনোভাব জানিতে পারিলেন। তিনি আকাশ হইতে শিবকে দণ্ডায়মান দেখিয়া তাঁহার মাথার উপর ভীষণ শব্দ করিয়া পতিত হইলেন। মহাদেবের মস্তকে পতিতা শুভ্রদেহা গঙ্গা যেন ভগবানের গলায় একছড়া মুক্তার মালা।

"তপস্যায় তুষ্ট হইলেন দিগম্বর।
গঙ্গা ধরিবারে ভগীরথ মাগে বর॥
নিজ ইষ্ট জানি তুষ্ট হয়ে মহেশ্বর।
প্রীতিতে বলেন চল যাব নৃপবর॥
হিমালয় পর্বতে কহেন উমাপতি।
আনহ কোথায় আছে তব হৈমবতী॥
ভব-বাক্যে ভগীরথ গঙ্গা চিন্তা করে।
ব্রহ্মলোকে গঙ্গা তাহা জানিল অন্তরে॥
আকাশ হইতে গঙ্গা দেখি শূলপাণি।
পড়িলেন হরশিরে করি ঘোর ধ্বনি॥
সকল কুম্ভীর মীন পূর্ণ মহাজলে।
মুক্তামালে শোভে যেন চন্দ্রচূড় গলে॥"

শিব শির হইতে গঙ্গা ত্রিধারা হইলেন। স্বর্গের ধারার নাম মন্দাকিনী।—তিনি মর্ত্যলোকে অলকনন্দা হইলেন। পাতালে যে ধারা প্রবেশ করিল তাহা ভোগবতী নাম ধারণ করিল। গঙ্গাদেবী বলিলেন ভগীরথের ভক্তির জন্য তিনি পৃথিবীতে আসিয়াছেন।

ভস্মীভূত সগর সন্তানগণ কোন্ দিকে আছে তাহা দেবী জানিতে চাহিলেন। ভগীরথকে আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিতে বলিলেন। গঙ্গার আজ্ঞা পাইয়া দিলীপনন্দন তাঁহাকে পথ দেখাইয়া আগে আগে চলিলেন—গঙ্গাদেবী কলকল শব্দে তাঁহার যাত্রাপথের অনুসরণ করিলেন। এইভাবে চলিতে চলিতে গঙ্গা হিমালয়ের এক দুর্গম স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেখানে গমনের পথ না পাইয়া তিনি (গঙ্গা) চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি মহারাজ ভগীরথকে ঐরাবতের ধ্যান করিতে বলিলেন। ঐরাবত রাজার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া কার্যস্থলে উপস্থিত হইলে ভগীরথ তাহাকে হিমালয়ের কঠিন শিলাস্তূপ বিদীর্ণ করিয়া গঙ্গার গমনের পথ করিয়া দিবার অনুরোধ জানাইলেন। ঐরাবত মহাশক্তিশালী হইলে কি হইবে —সে পশু ছাড়া আর কিছুই নহে। তাহার মাথায় দুষ্টবুদ্ধি চাপিল। সে

ভগীরথকে বলিল একটি সর্তে সে এই কঠিন কার্য করিতে পারে—তাহা হইতেছে মা গঙ্গা যদি তাহাকে ভজনা করেন তবেই সে পথ করিয়া দিতে পারে। মায়ের প্রতি এইরূপ জঘন্য উক্তি করায় ভগীরথ তাহার কথায় কানে আঙুল দিলেন। এই কথা গঙ্গা মায়ের কাছে পৌঁছিল। তিনি ঐরাবতকে ছল ও কৌশল অবলম্বনপূর্বক আনিবার জন্য ভগীরথকে উপদেশ দিলেন। গঙ্গাদেবী বলিলেন 'আমার প্রচণ্ড বেগের সম্মুখে যদি ঐ হস্তী (ঐরাবত) দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে তবে আমি তাহাকে ভজনা করিব। তাহার কিরূপ দুর্গতি হয় তাহা দেখিতে পাওয়া যাইবে।'

"যাহ বাছা ভগীরথ কহিবে করীবে।
বেগে দণ্ডাইলে আমি ভজিব তাহারে॥
দেখিব দুর্গতি তার কিবা দশা ঘটে।
শীঘ্রগতি আন তারে জিনিয়া কপটে॥"

ভগীরথের কথা শুনিয়া হস্তী হিমালয় পর্বতের মধ্য দিয়া পথ করিয়া দিতে সম্মত হইল। সে তখন পর্বত বিদীর্ণ করিয়া পথ করিয়া দিল। মহামায়া সেই পথে চলিতে লাগিলেন। ইহার পর ঐরাবতের বিষম দুর্গতি উপস্থিত হইল। বলশালী ঐরাবত গঙ্গার বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া বারবার এদিক সেদিকে পড়িয়া যাইতে লাগিল। গঙ্গার স্রোতের প্রচণ্ড আঘাতে তাহার শরীরে প্রাণ ছাড়া আর কিছু রহিল না—সে ভাসিয়া চলিল। এইরূপ বিষম সংকটে পড়িয়া হস্তী মা গঙ্গার নিকট কাতরভাবে প্রাণ ভিক্ষা চাহিল।

"স্তব করে গজবর ত্রাহি ত্রাহি ডাকে।
বলে মাগো পশু আমি না চিনি তোমাকে॥
দয়াময়ি দয়া করি রাখিলা জীবন।
প্রাণ লয়ে ঐরাবত পালায় তখন॥"

গঙ্গা আবার আনন্দিতমনে চলিতে লাগিলেন। কিন্তু সম্মুখে আর একটি সংকট উপস্থিত হইল। গঙ্গা চলিতে চলিতে জহ্নু মুনির আশ্রমে আসিয়া উহা ভাসাইয়া লইয়া চলিলেন। মুনি তখন গঙ্গাকে পান করিয়া ফেলিলেন। ভগীরথ পিছনে চাহিয়া দেখেন গঙ্গা নাই। তিনি তখন জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। তাঁহার এত সাধ্যসাধনার ধন এত দূর আসিয়া নাগালের বাহিরে গিয়াছেন। ভগীরথ কাতর অন্তরে জহ্নু মুনির স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। মুনি গঙ্গাকে ছাড়িয়া দিলেন।

ইহার পর কলকল শব্দে গঙ্গা ক্রমশঃ পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গঙ্গার জলস্পর্শে শত শত লোক উদ্ধার পাইল। পথে এই দৃশ্য দেখিয়া ভগীরথের আনন্দ আর ধরে না।

"কলকল শব্দে হয় গঙ্গার পয়ান।
কতশত লোক তরে নাহি পরিমাণ॥
তাহা দেখি হর্ষান্বিত দিলীপনন্দন।
বেগেতে আইলা গঙ্গা কপিল আশ্রম॥"

প্রবল বেগে চলিতে চলিতে গঙ্গা তাঁহার গন্তব্য স্থান কপিল মুনির আশ্রমে আসিয়া উপনীত হইলেন। এই কপিলাশ্রমে সগরসন্তানগণের ভস্ম ছিল। গঙ্গার পবিত্র জলস্পর্শে তাঁহাদের (সগর সন্তানগণের) বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তি হইল।

"যথায় আছিল ভস্ম সগর সন্তান।
পরশে পরম জল বৈকুণ্ঠে পয়ান॥"

জাহ্নবীর জলের স্পর্শ লাগা মাত্র ষাট হাজার সগর সন্তান দিব্য চতুর্ভুজ মূর্তি

ধারণ করিলেন। বৈকুণ্ঠ হইতে প্রেরিত সোনার রথ নামিয়া আসিল। তাঁহারা সেই রথে আরোহণ করিয়া হাত উঠাইয়া ভগীরথ মহারাজকে আশীর্বাদ করিলেন। পিতৃগণ মুক্ত হইলেন। ইহা দেখিয়া ভগীরথেব আনন্দের অবধি রহিল না। ভগীরথ আজ সত্য সত্যই তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করিযাছেন। তিনি মুক্ত পিতৃগণকে প্রণাম করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন—

"চতুর্ভুজ হয়ে স্বর্ণরথে আরোহিল।
ঊর্ধ্ববাহু করি সবে আশীর্বাদ কৈল॥
পিতৃগণ মুক্ত দেখি আনন্দ অপার।
প্রণাম করিয়া নাচে দিলীপকুমার॥"

ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের ফলেই শুষ্ক সমুদ্র জলে ভরিয়া গেল।

অনুশীলনী

১। সংক্ষেপে ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন বৃত্তান্ত লিখ।

২। সগর সন্তানগণের সহিত ভগীরথের কি সম্পর্ক? তাঁহারা কেন ভস্মীভূত হইলেন? তাঁহাদের উদ্ধারের উপায় কে কিভাবে কাঁহাকে জানাইলেন?

৩। হিমালয় হইতে সাগর পর্যন্ত গঙ্গার যাত্রাপথের কাহিনী বর্ণনা কর।

৪। সগররাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ কখন সুসম্পন্ন হইল?

৫। গঙ্গার তিনটি প্রসিদ্ধ নাম কি? কিরূপে তিনি আকাশলোক হইতে মর্ত্যলোকে অবতরণ করেন।

৬। ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গার আনয়নে ভগবান শিব কিভাবে সাহায্য করিযাছিলেন?

৭। রাজার ধর্ম রাজ্যশাসন। তবে ভগীরথ তাহা ছাড়িয়া তপস্যা করিতে কেন গেলেন?

৬। একলব্যের উপাখ্যান

[এই গল্পটি কাশীরাম দাসের মহাভারতের আদিপর্বে আছে। একলব্যের কঠোর তপস্যা ও গুরু ভক্তির যে চিত্র এখানে অঙ্কিত হইযাছে তাহা বিরল।]

আচার্য দ্রোণ পিতামহ ভীষ্মদেবের অভিপ্রায় অনুসারে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চ পাণ্ডব এবং দুর্যোধনাদি শত কৌরবের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন।

"পৌত্রগণে সমর্পি তোমার বিদ্যমান।
কৃপা করি সবাকারে দেহ দিব্যজ্ঞান॥"

তাঁহার শিক্ষার প্রধান বিষয় হইল অস্ত্রবিদ্যা—

অস্ত্রবিদ্যা সবারে করাব অধ্যয়ন।
শিক্ষা করি মম বাক্য করিবা পালন॥

আচার্যের ইচ্ছা শিক্ষান্তে শিষ্যেরা যেন গুরুর আদেশ পালন করেন। শিষ্যগণের মধ্যে কেবল অর্জুন গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। এই কারণে আচার্য অর্জুনের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শিষ্যগণের মধ্যে বিদ্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং তাঁহাকে বহুবিদ্যা শিক্ষা দিলেন।

"একান্তে বলেন দ্রোণ করি অঙ্গীকার।
শিষ্য না করিব কারে সদৃশ তোমার॥"

দ্রোণ রাজপুত্রগণকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার শিক্ষার খ্যাতি অল্পকাল মধ্যে সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়িল। নানা দেশ হইতে রাজপুত্রগণ দলে দলে হস্তিনাপুরে দ্রোণ গুরুর নিকট শিক্ষা লাভের আশায় উপস্থিত হইলেন।

ইতিমধ্যে আচার্যের নিকট শিক্ষার জন্য একটি বালক আসিয়া উপস্থিত হইল। বালকের নাম একলব্য। সে হিরণ্যধনু নামক নিষাদের পুত্র।

একলব্য দ্রোণাচার্যের নিকট উপস্থিত হইয়া সবিনয়ে তাঁহাকে প্রাণাম করিয়া তাঁহার নিকট শিক্ষালাভের অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। দ্রোণ নিষ্ঠুর বচনে বালকটির প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিলেন—

"দ্রোণ বলিলেন তুই হোস নীচজাতি।
তোরে শিক্ষা করাইলে হইবে অখ্যাতি॥"

পুনরায় বালক তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য অনুনয় করিতে লাগিল। গুরু তাহাকে কিছুতেই শিক্ষা দিতে সম্মত হইলেন না। সে আচার্যের এই নিষ্ঠুর বাক্য শুনিবার পর তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বনে প্রবেশ করিল। সে নিষাদের বেশ ছাড়িয়া ব্রহ্মচারীর বেশ পরিধান করিল। তাহার মাথায় জটা পরিধানে বল্কল। সে ফলমূল মাত্র আহার করিয়া তপস্যায় রত হইল। সে মাটি দ্বারা দ্রোণগুরুর মূর্তি রচনা করিল। সেই বালক নানা ফুলে এই মূর্তির নিত্য পূজা করে। সে কখনও হাতের ধনুকবাণ ত্যাগ করে না। এইরূপে অক্লান্ত মনে তপস্যা করিতে করিতে অবশেষে সে সকল প্রকার অস্ত্রের রহস্য ও মন্ত্র জ্ঞাত হইল।

"মৃত্তিকায় দ্রোণ এক করিয়া রচন।
নানাপুষ্প দিয়া তা'রে করয়ে পূজন॥
নিরন্তর একলব্য হাতে ধনুঃশর।
সর্বমন্ত্র অস্ত্রজ্ঞাত হৈল ধনুর্ধর॥"

ইতিমধ্যে একদিন কুরুবংশের রাজপুত্রগণ পাণ্ডবদের সহিত লোকজন সৈন্যসামন্ত লইয়া মৃগয়া করিতে সেই বনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। শিকারীদের মধ্যে পাণ্ডবদের একজন অনুচর একটি কুকুর লইয়া দলের পিছনে পিছনে চলিতে চলিতে নিষাদ পুত্র একলব্য যেখানে দ্রোণাচার্যের মাটির মূর্তির সম্মুখে করযোড়ে ধনুকবাণ হাতে ধ্যানে মগ্ন, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। কুকুরটি ব্রহ্মচারীর চারিদিকে ঘুরিয়া বিকট শব্দ করিতে লাগিল। তাহার শব্দে একলব্যের ধ্যান ভাঙ্গায় সে অত্যন্ত রাগিয়া গিয়া কুকুরের মুখে সাতটি বাণ মারিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কুকুরের মুখে কোন ঘা হইল না বা সে মারাও গেল না; শুধু তার শব্দ বন্ধ হইয়া গেল—

"মৃত্তিকা পুত্তলি আগে করি যোড়কর।
বসিয়াছে ব্রহ্মচারী হাতে ধনুঃশর॥
শব্দ করে কুক্কুর দেখিয়া ব্রহ্মচারী।
চারিভিতে ভ্রমে তার প্রদক্ষিণ করি॥
কুক্কুরের শব্দে তার ভাঙ্গিলেক ধ্যান।
ক্রোধে কুক্কুরের মুখে মারে সপ্তবাণ॥
না মরিল কুক্কুর না হৈল মুখে ঘা।
অলক্ষিতে সে কুক্কুরে রুধিলেক রা॥"

কুকুর সেই সাতবাণ মুখে করিয়া নিঃশব্দে ছুটিতে ছুটিতে রাজপুত্রদের একজনের কাছে আসিল। তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া অনুচরকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'কে সেই ব্যক্তি যে কুকুরের মুখে এইরূপ বাণ বিদ্ধ করিয়াছে? এইরূপ অদ্ভুত বিদ্যা আমরাও জানি না। চল আমরা সকলে সেই লোকের কাছে যাই।' রাজপুত্রগণের বিদ্যার অহংকার চূর্ণ হইল—তাঁহারা বহু বিদ্যা শিখিয়াছেন; কিন্তু কেহ এই অদ্ভুত বিদ্যার কোন খবর রাখেন না। সেই অনুচরের সহিত রাজপুত্রেরা যাইয়া দেখেন এক ব্রহ্মচারী

ধনুর্বাণ লইয়া বসিয়া আছে। তাঁহারা নিষাদপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কে, কাহার নিকট এই বিদ্যা শিখিয়াছেন এবং নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ হইবেন ব্রহ্মচারী নিজ পরিচয় দিল। তাহার নাম একলব্য—দ্রোণ গুরুর নিকট সে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে জানাইল। এই কথা শুনিয়া রাজপুত্রগণের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তাঁহাদের মধ্যে অর্জুনের চিন্তা হইল সবচেয়ে বেশি, কারণ দ্রোণ তাঁহাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য করিবার অংগীকার করিয়াছিলেন। রাজপুত্রগণ দ্রোণাচার্যকে সকল কথা জানাইলেন। ক্ষোভে দুঃখে অর্জুন কাতর হইয়া গুরুকে বিনয়পূর্বক কহিলেন তাঁহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য করিবার অংগীকার করিয়াও কেন তিনি নিষাদপুত্রকে মনুষ্যের নিকট যে বিদ্যা গুপ্ত এইরূপ বিদ্যা শিক্ষা দিলেন। গুরুর এইরূপ ছলন করিয়া তাঁহাকে শাস্তি দিবার কারণ তিনি বুঝিতে পারিলেন না—

"বিনয়ে কহেন পার্থ বিরস বদন।
আমারে নিগ্রহ কেন কৈলা ভগবান॥
পূর্বেতে আমার কাছে কৈলা অংগীকার।
তব সম প্রিয়শিষ্য নাহিক আমার॥
তোমার সদৃশ বিদ্যা নাহি দিব কারে।
এখন ছলনা প্রভু করিলা আমারে॥
পৃথিবীতে যেই বিদ্যা অগোচর নরে।
হেন বিদ্যা শিখাইলে নিষাদ কুমারে॥"

অর্জুনের কথা শুনিয়া দ্রোণের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। আচার্য এ বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কোন নিষাদকুমারকে বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছেন বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। অতঃপর তাঁহারা (দ্রোণ ও অর্জুন) দুইজনে একলব্য যে স্থানে ছিল, সেই স্থানে গেলেন। দূর হইতে গুরুকে দেখিয়া নিষাদপুত্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া হাত জোড় করিয়া তাঁহার আজ্ঞার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া কহিল—

"নিষাদ নন্দন বলে মধুর বচন।
আজ্ঞা কর গুরু হেথা কোন্ প্রয়োজন॥"

আচার্য দ্রোণ ইহার উত্তরে বলিলেন, "যদি সত্যই তুমি আমার শিষ্য হইয়া থাক তবে আমাকে আজ গুরুদক্ষিণা দাও।"

একলব্য বলিল, তাহার পরম সৌভাগ্য যে গুরু কৃপা করিয়া ঐ স্থানে আসিয়াছেন। সর্ববস্তুতে গুরুর অধিকার। তিনি কৃপা করিয়া যাহা চাহিবেন একলব্য গুরুকে তাহাই দিবে বলিয়া অংগীকার করিল।

"দ্রোণ বলিলেন যদি তুমি শিষ্য হও।
তবে গুরু দক্ষিণা আজি আমারে দেও॥
একলব্য বলে প্রভু মম ভাগ্যবশে।
কৃপাকরি আপনি আইলা এই দেশে॥
এ দ্রব্য সে দ্রব্য নাহি করহ বিচার।
সকল দ্রব্যেতে হয় গুরু অধিকার॥
যে কিছু মাগবা প্রভু সকল তোমার।
আজ্ঞা কর গুরু করিলাম অংগীকার॥"

আচার্য দ্রোণ এই শিষ্যের কাছে অতি ভীষণ গুরুদক্ষিণা চাহিয়া বসিলেন। গুরু-

দক্ষিণা একলব্যের ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ (বুড়ো আঙ্গুল)। নিষাদনন্দন আর দেরী করিল না। সে তৎক্ষণাৎ নিজের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া গুরুকে সমর্পণ করিল।

"দ্রোণ বলিলেন যদি আমারে তুষিবা।
দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুলিটা দিবা॥
ততক্ষণে কাটিয়া অঙ্গুলি গোটা দিলা।
গুরুর আজ্ঞায় সে বিলম্ব না করিলা॥"

একলব্যের তপস্যাও কঠোর, গুরুদক্ষিণাও ভীষণ। সে গুরুদক্ষিণা দ্বারা ধনুর্ধর জীবনের অবসান ঘটাইল। গুরুর নিকট লব্ধ বিদ্যা ত্যাগ করিয়া তাঁহার তৃপ্তি সাধন করিল। একলব্যের ত্যাগে অর্জুনের নিকট দ্রোণাচার্যের অঙ্গীকার রক্ষা হইল। জগতে অর্জুনের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রহিল না। তিনি বুঝিলেন গুরু সত্যই তাঁহার প্রতি সদয়--

"তুষ্ট হইলেন দ্রোণ আর ধনঞ্জয়।
মনে জানিলেন গুরু আমারে সদয়॥"

অনুশীলনী

১। একলব্যের উপাখ্যানটি বর্ণনা কর।

২। 'একান্তে বলেন দ্রোণ করি অঙ্গীকার।
শিষ্য না করিব কারে সদৃশ তোমার॥'--এই কথা দ্রোণ কাহাকে কি প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন? দ্রোণের এই প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হইয়াছিল কি?

৩। একলব্যের অস্ত্রশিক্ষায় নিপুণতার কারণ কি? কে তাঁহার গুরু? সেই গুরুকে তিনি কিভাবে লাভ করিলেন?

৪। একলব্যের গুরুদক্ষিণার বৈশিষ্ট্য কি? কিরূপে তিনি গুরুর হিতসাধন করেন?

৭। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা

[সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পুরাণাদিতে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের জন্মের পূর্বে বর্ধমান জেলার মালাধর বসু বাংলা ভাষায় ভাগবতের অনুবাদ করেন। তিনি মহাকবি কৃত্তিবাসের সমসাময়িক। তাঁহার গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণবিজয়। বৈষ্ণব পদকর্তারাও শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক পদ রচনা করিয়াছেন। চৈতন্যপূর্ব ও পরবর্তী কালের বৈষ্ণব সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার যে বর্ণনা আছে তাহারই সংক্ষিপ্তরূপ এখানে দেওয়া হইল।]

সুদূর অতীতের এক ভাদ্র মাসের দুর্যোগের রজনী। সেদিন ছিল কৃষ্ণাষ্টমী তিথি। ঘনকৃষ্ণ মেঘে আকাশ সমাচ্ছন্ন। ঝড়ঝঞ্ঝা আর মুষলধারে বৃষ্টি। শুধু সেদিনকার রাত্রি নয়, বহুদিন হইতে মথুরার রাজা কংসের অত্যাচারে সারা পৃথিবীতে চলিয়াছে অন্যায়ের প্লাবন। বৈকুণ্ঠে ভগবানের আসন টলিল। পৃথিবীকে অত্যাচারীর হাত হইতে উদ্ধার করিতে হইবে; তাই তিনি নামিয়া আসিলেন মর্তলোকে মানুষের ঘরে।

কংস জানিতেন তাঁহার ধ্বংসের দিন ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। এই ধ্বংস ভগিনী দৈবকীর অষ্টমগর্ভের সন্তানের নিকট হইতে তাঁহাকে লাভ করিতে হইবে। তাই আজ অনেকদিন হইতে দৈবকী আর তাঁহার পতি বসুদেব মথুরার কারাগারে শৃঙ্খলিত অবস্থায় বন্দিজীবন যাপন করিতেছেন। একে একে কংস তাঁহাদের সব কয়টি সন্তান মারিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহারা রাত্রিদিন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন প্রভুকে সন্তানরূপে পাইবার আশায়।

"তোমরা তপকৈলে সুন মহাসএ।
না মাগিলে মুক্তিপদ আমার মায়াযে॥
মুক্তি ভাব এড়ি কিবা পুত্রভাব করি।
আমার প্রসাদে যাবে বৈকুণ্ঠপুরি॥" (শ্রীকৃষ্ণবিজয়)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই ঘোর রজনীতে কংসের কারাগারে দৈবকীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। হরি দেবরূপে প্রথমে বসুদেব ও দৈবকীকে দর্শন দিলেন—

"সঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজ কলা।
মকর কুণ্ডল কর্ন্নে হৃদে বনমালা॥
হিরামন মানিক মুকুট সোভে সিরে।
নানারত্ন অঙ্গজ বলয়া দুই করে॥
পাএতে নুপুর বাজে শ্রীবৎসাদি পতি।
দক্ষিণে লক্ষ্মি সোভে বামে সরস্বতী॥"
পারিসদগণ স্তুতি করন্তি বিস্তর।
দেখিযাত বসুদেব পড়িলা ফাঁপর॥" (শ্রীকৃষ্ণবিজয়)

পরে হরি দেবরূপ ছাড়িয়া দ্বিভুজকুমাররূপে মায়ের কোল আলো করিলেন বসুদেবের হস্তপদের শৃঙ্খল খুলিয়া গেল। কারাগারের সকল দ্বার মুক্ত হইল প্রহরীরা সকলে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। এই শিশুকে কংসের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য তাঁহাকে লইয়া বসুদেব গোকুল গ্রামের দিকে চলিলেন। মথুরা আর গোকুলের মধ্যে তরঙ্গভীষণা যমুনা। শৃগালীরূপে মহামায়া আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিলেন— বাসুকি নাগ পিছনে পিছনে মাথার উপর ফণার ছত্র ধরিয়া চলিলেন। কিন্তু ভীষণ যমুনা কিভাবে বসুদেব পার হইবেন এই চিন্তায় তিনি ব্যাকুল হইলেন। শৃগালী যমুনা পার হইতে লাগিল—দেখা গেল নদীতে জল মাত্র এক হাঁটু। বসুদেব শিশুকে কোলে করিয়া অনায়াসে যমুনা পার হইয়া গোকুল গ্রামে গোপপতি নন্দের গৃহে উপনীত হইলেন। নন্দ গোপ বসুদেবের পরম বন্ধু। সেইখানে শিশুকে রাখা নিরাপদ। নন্দের গৃহে তাঁহার পত্নী যশোদা সেই রাত্রিতে এক কন্যা প্রসব করিয়া গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। সমগ্র নন্দপুরীতে আর কেহ জাগিয়া নাই। বসুদেব আপন নবজাত পুত্রকে যশোদার পাশে রাখিয়া সেই কন্যাকে কোলে লইয়া আবার যমুনার সেই পথ ধরিয়া মথুরার দুর্গে ফিরিয়া আসিলেন এবং দৈবকীকে সব কথা বলিলেন। আবার বন্দিশালার দরজা বন্ধ হইল—বসুদেব ও দৈবকী লৌহশৃঙ্খলে বাঁধা পড়িলেন।

পরদিন সকালবেলায় কংসের প্রহরীরা নবজাত শিশুর ক্রন্দন শুনিয়া বুঝিল রাত্রিতেই দৈবকীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। তাহা শুনিয়া তাহারা কংসকে এই সংবাদ তখনই জানাইল। সংবাদ পাইবামাত্র দুরাত্মা তখনই ছুটিয়া আসিয়া ভগিনীর নানা কাতর অনুনয় সত্ত্বেও তাঁহার কোল হইতে শিশুটিকে কাড়িয়া লইয়া পাথরের উপর আছড়াইয়া মারিবার চেষ্টা করিতেই শিশুকন্যা অষ্টভূজা মূর্তি ধরিয়া আকাশে উঠিয়া কংসকে বলিলেন—

"হাসিয়া হাসিয়া তারে বলেন ভগবতি।
আমারে অনেক দুঃখ দিল পাপমতি॥
তোমারে মারিতে হৈল পুরুষ রতন।
গোকুলেতে আছে সেই জন্মিল এখন॥" (শ্রীকৃষ্ণবিজয়)

ভাবী শত্রুকে মারিবার চেষ্টা বিফল হওয়ায় কংসের ক্ষোভ আর প্রতিহিংসার উগ্র

নিঃশ্বাসে মথুরার আকাশ বাতাস বিষাক্ত হইল। সেই দিন হইতেই কংস গোকুলে অবস্থিত দৈবকীর শিশু পুত্রকে মারিবার জন্য রাক্ষস, রাক্ষসী, দানব, মল্ল প্রভৃতিকে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের উপর এই দুষ্কার্যের ভার দিলেন।

এদিকে গোকুলে আনন্দের মহোৎসব আরম্ভ হইল। নিদ্রাভঙ্গের পর যশোদা দেখিলেন তাঁহার পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে; ছেলে যেন পূর্ণিমার চন্দ্র। নন্দ যশোদার হৃদয়ে আনন্দ ধরে না:—

"নিশি অবশেষে জাগি বরজেশ্বরি
হেরই বালকমুখ চান্দে।
কতহু উল্লাস কহই ন পারিয়ে
উথলই হিয়া নাহি বান্ধে॥
আনন্দকো করু ওর।
শুনি ধনি নন্দ গোপেশ্বর আয়ল
শিশুমুখ হেরিয়া বিভোর॥
চলতহি খলত উঠত খেনে গীরত
কহি সব গোকুল লোকে।
আয়ল বন্দিগণ ব্রাহ্মণ সজ্জন
করতহি জাত বৈদিকে।
দধি ঘৃত নবনি হরিদ্রা হৈয়ঙ্গব
ঢালত অঙ্গন মাঝে।
কহে শিবরাম দাস আনন্দে নাচত
গাওয়ত ব্রজবর রাজে॥"—পদকর্তা শিবরামদাস

গোকুলের সকল লোক এই দেব শিশুকে দর্শন করিবার জন্য নন্দের আলয়ে ছুটিয়া আসিলেন। গোকুলের পথে গোপ গোপীরা ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছেন নন্দপুত্রকে দর্শনের প্রবল আকাঙ্ক্ষায়। যশোমতী আর গোকুলবাসী সকলের আজ জন্ম সফল। নন্দালয়ে পুত্রোৎসবের জন্য ভারে ভারে দধি ঘৃত নবনীত আসিতে লাগিল।

কংস রাজার জন্য দধি দুগ্ধ ঘৃতাদি রাজকর লইয়া নন্দ ঘোষ মথুরায় গেলেন। সেখানে তিনি বসুদেবের সহিতও মিলিত হইলেন। দুই বন্ধু আলিঙ্গনাবদ্ধ হইলেন। বসুদেব নন্দ ঘোষকে সতর্ক করিয়া দিলেন—পুত্র গোকুলে যেখানে আছে সেখানে ভীষণ গোলমাল হইতে পারে।

নন্দ ঘোষ মথুরায় গিয়াছেন—এই অবসরে কংসের আজ্ঞায় পূতনা রাক্ষসী মোহিনী মূর্তি ধারণ করিয়া নানা ছলে গোকুলের ঘরে ঘরে ঘুরিতে লাগিল—কার ঘরে দশ দিনের শিশু আছে খোঁজ লইতে হইবে। অবশেষে হঠাৎ নন্দ ঘোষের বাড়িতে পূতনা আসিয়া ছেলেটির প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে কোলে লইয়া বিষমাখান স্তন তাহার মুখে দিল। কিন্তু ঐ দশদিনের বালক এতজোড়ে উহা চুষিতে আরম্ভ করিল যে ইহাতে পূতনার প্রাণ যায় যায়। রাক্ষসী চীৎকার করিতে করিতে স্বমূর্তি ধারণ করিল—কিন্তু তখন তাহার প্রাণ দেহ হইতে চলিয়া গিয়াছে। গোকুলবাসী সকলে অত্যন্ত ভীত হইল এবং বিস্ময়ের সহিত দেখিল সেই মোহিনী নারীমূর্তি এক বিকটাকার রাক্ষসী হইয়া ছয় ক্রোশ যায়গা জুড়িয়া আছে। তাহার দেহের চাপে গোকুলের গাছপালা বাড়িঘর ভাঙিগয়া পড়িয়াছে। বাড়ি ফিরিয়া নন্দ ঘোষের চিনিতে বিলম্ব হইল না এ মূর্তি পূতনা রাক্ষসীর। যশোদা রোহিণী ছুটিয়া আসিলেন—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ভাবী অনিষ্ট নিবারণের জন্য শরীরে রক্ষা কবচ বাঁধিয়া দিলেন। ইহার

পর তাঁহাকে শকটের উপর শোয়ান হইল। কিন্তু এই দেবশিশু পায়ের লাথিতে উহা ভাঙিয়া ফেলিলেন। পুত্রবৎসলা জননীর শঙ্কা কাটিয়া গেল। পুতনাকে যিনি বধ করিতে পারেন আর লাথি মারিয়া শকট ভাঙিতে পারেন, তাঁহার জীবন সম্বন্ধে চিন্তিত হইবার কোন কারণ নাই। তাই মা যশোদা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

কিন্তু ইহাতে যমুনার পরপারে কংসের মনে হর্ষের পরিবর্তে বিষাদ ঘনীভূত হইল—শিশু বয়সে যে এইরূপ অলৌকিক কর্ম করিতে পারে তাহাকে কোনক্রমেই মারা যাইবে না। তবু শত্রুকে মারিবার চেষ্টা ত্যাগ করা যায় না—কংস এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকে মারিবার জন্য তিনি তৃণাবর্ত নামক মহাসুরকে গোকুলে পাঠাইলেন। সে অতি প্রচণ্ড বায়ুরূপ ধারণ করিয়া সমগ্র গোকুলনগরকে ধূলায় ঢাকিয়া ফেলিল। ধূলার অন্ধকারে কেহ কিছু দেখিতে পায় না। তৃণাবর্ত মায়ের কোল হইতে শিশুকে কাড়িয়া লইয়া আকাশে উঠাইল। সেইখানে শ্রীহরি তাহার গলা চাপিয়া ধরিয়া প্রাণ সংহার করিলেন। ভীষণাকার অসুর তৃণাবর্ত আকাশ হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল। যশোদা প্রাণপ্রিয় পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন। একটু দূরে চাহিয়া দেখেন শ্রীকৃষ্ণ অসুরের বুকে চাপিয়া তাহাকে বধ করিতেছেন।

"ধর্ম হিংসা যেই করে অকালে সে মরে।
মোর পুত্র রক্ষা পাইল মরিল অসুরে॥"

যাহাই হউক মায়ের অস্বস্তিকর অবস্থা তখনকার মতো কাটিয়া গেল। ইহার পর গর্গমুনিকে আমন্ত্রণ করা হইল। তিনি এই অলৌকিক শিশুর নামকরণ করিবেন এবং তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনকথা পিতামাতাকে শুনাইবেন। বসুদেবপত্নী রোহিণীর গর্ভে দৈবকীর এক সন্তানকে কংসের ভয়ে পূর্বেই আকর্ষণ করিয়া রক্ষা করা হইয়াছিল। তিনি পূর্বেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার নাম হইল 'সংকর্ষণ'—অধিক বলের জন্য তিনি বলরাম। যশোদানন্দনের নাম হইল কৃষ্ণ। বলদেব বড় ভাই—কৃষ্ণ ছোট ভাই।

"হের যে তোমার পুত্র বড় সুলক্ষণ।
অভিনব অবতার জেন নারায়ণ॥
তেকারণে কৃষ্ণ নাম থুইল ইহাঁর।
আর অনেক নাম ঘুসিব সংসার॥
ইহাঁ হৈতে অনেক সংকট এড়াইবে গোঙাল।
বড় বড় কর্ম করিব এইত ছাওয়াল॥"

শিশুকালে কৃষ্ণ নানা লীলায় মত্ত। একদিন তিনি অনবরত মাটি খাইতে লাগিলেন। মা যশোদা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ছেলেকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ছেলে মাটি খাইবার কথা অস্বীকার করিলেন। তাঁহার কথায় বিশ্বাস না হইলে তিনি মুখ খুলিয়া দেখাইতে পারেন। মা যশোদা পুত্রের হাঁ করা মুখে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখিলেন। ইহা দর্শনের পর যশোদার সকল মোহ দূর হইল। শ্রীহরি গোকুলে মনুষ্যরূপে নানা ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

একদিন যশোদা দধিমন্থন করিতেছেন আর উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণের লীলা গান করিতেছেন। গোপাল নিকটেই খেলিতেছিলেন। হঠাৎ উঠিয়া গোয়াল হইতে বাছুরগুলিকে ছাড়িয়া দিলেন—কিন্তু দোহনের গোরু নাই আর ঘরে দধি দুগ্ধের পাত্র ভাঙিয়া গুড়াগুড়া করিলেন। মায়ের পিছন হইতে চুপিচুপি আসিয়া দধির মন্থনদণ্ড চাপিয়া ধরিয়া সবটুকু ননী খাইয়া ফেলিলেন। মা রাগিয়া গিয়া গোপালকে চড় মারিলেন—সব দুধ, দই শিকায় উঠাইলেন। কৃষ্ণও দমিবার পাত্র নহেন। পিঁড়ির

উপর উদূখল বসাইয়া উহাতে চড়িয়া দাঁড় দিয়া শিকাতে টান দিলেন। দইয়ের ভাঁড়-গুলি মাটিতে পড়িয়া ভাঙিয়া চুরমার হইল। মা কৃষ্ণকে ধরিবার চেষ্টা করিতে তিনি বার বার পালাইতে লাগিলেন। তাঁহাকে ধরিতে গিয়া মায়ের বড় কষ্ট হইল—গা দিয়া ঘাম পড়িতে লাগিল। কৃষ্ণ মায়ের দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া নিজেই তাঁহার কাছে ধরা দিলেন। মা গোপালকে বাঁধিয়া রাখিয়া ঘরের কাজে চলিয়া গেলেন। এদিকে গোপাল সেখান হইতে যমজ অর্জুন গাছ দেখিলেন। ইহাঁরা শাপগ্রস্ত গন্ধর্ব। কোন অত্যন্ত অন্যায় কার্যের জন্য নারদমুনি ইহাদিগকে বৃক্ষ হইয়া থাকিবার অভিশাপ দেন। একশ বছর পরে হরি গোকুলে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইবার পর তাঁহার স্পর্শে ইহারা শাপমুক্ত হইয়া পূর্বের শরীর প্রাপ্ত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ উদূখলে বাঁধা পড়িয়া উহাকে টানিতে টানিতে জোড়া অর্জুন গাছের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। উদূখল আড়াআড়িভাবে ঐ দুই গাছে আটকাইয়া গেল। হরির টানে গাছ দুইটি উপড়াইয়া মাটিতে পড়িল—দুই গন্ধর্বকুমার শাপমুক্ত হইলেন। কোন ঝড়বাতাস নাই—অথচ উঠানের বড় অর্জুন গাছ দুইটি মাটিতে পড়িয়া আছে দেখিয়া মা যশোদা ভয় পাইয়া গোপালের শরীরে রক্ষা কবচ বাঁধিলেন। হরির কপট-লীলা তিনি জানিতে পারেন নাই। নন্দ ঘোষ ছেলের শক্তি জানিতেন। পিতা পুত্রকে কোলে লইয়া মায়ের নিকট হইতে চলিয়া আসিলেন। তিনি ফল হাতে লইয়া 'কে ফল খাইবে, কে ফল খাইবে' বলিয়া ছেলেকে ডাকিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ধান হাতে করিয়া দৌড়াইয়া পিতার নিকট গিয়া ধানের বদলে উহা লইলেন। শ্রীনন্দের গৃহ ধনধান্যরত্নে ভরিয়া উঠিল।

বলরাম আর কৃষ্ণ দুইভাই একদিন রাখাল ছেলেদের সহিত খেলায় এত মাতিয়া-ছেন যে, বেলা দুপুর হইল তবু তাঁহাদের ঘরে ফিরিবার নাম নাই। নন্দ যশোদা দুই ছেলেকে না খাওয়াইতে পারিয়া এত বেলা পর্যন্ত উপবাসী আছেন। মা ছেলে দুইটিকে ঘরে ডাকিয়া আনিলেন। তাহাদের আগে খাওয়াইয়া নন্দ ও যশোদা অন্ন গ্রহণ করিলেন।

গোকুল গ্রামে প্রায়ই দানব রাক্ষসের অত্যাচার চলিতেছে দেখিয়া নন্দ ঘোষ বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন—একদিকে গোকুল গ্রামকে রক্ষা অপরদিকে রাম আর কানুকে বাঁচান—এই সমস্যা দাঁড়াইল। প্রধান প্রধান গোয়ালাদের লইয়া নন্দ ঘোষ স্থির করিলেন গোকুল যখন নিরাপদ নয় তখন যমুনার কূলে বৃন্দাবনে গিয়া বাড়িঘর করিয়া বাস করাই ভাল। বৃন্দাবন বাড়ি ঘরে ভরিয়া গেল– সেখানে মহানন্দে সকলে বাস করিতে লাগিলেন।

বলরাম আর কৃষ্ণ দুইভাই এখন বড় হইয়াছেন। তাঁহারা অন্য গোপবালকদের লইয়া বৃন্দবনে যমুনাকূলে ধেনু চরান। বৃন্দবনে আসিয়াও কাহারও শান্তি নাই। কংস পূর্বে কৃষ্ণের কোন ক্ষতি করিতে পারেন নাই। এবার কৃষ্ণকে মারিবার জন্য 'বৎসক' অসুরকে বৃন্দাবনে পাঠাইলেন। এই অসুর বাছুরের রূপ ধরিয়া কৃষ্ণের গোরু চরাইবার জায়গায় প্রবেশ করিল।

বলরাম আর কৃষ্ণ এই বাছুরকে অসুর বলিয়া জানিলেন। তখন কৃষ্ণ ইহার পিছনের পা দুইটি এবং ল্যাজ ধরিয়া পাক দিয়া উহাকে উল্টাইয়া ফেলিলেন। বাছুরটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা খাইয়া প্রাণ হারাইল। সকলে বৎসাসুরের পর্বতের মতো শরীর দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইল।

ইহার পর বকাসুরের পালা। কংস অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া কৃষ্ণকে মারিবার জন্য বকাসুরকে নিযুক্ত করিলেন। কৃষ্ণ গোরু চরাইয়া পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া

যমুনায় জল পান করিতে গিয়াছেন এমন সময়ে বকের রূপ ধারণ করিয়া বকাসুর কৃষ্ণকে গিলিয়া ফেলিবার জন্য মুখে পুরিল। কিন্তু গোপাল বকাসুরের গলায় আড় হইয়া থাকিলেন—অসুর তাঁহাকে গিলিতে পারিল না—শ্রীকৃষ্ণের হাতে তাহাকে মরিতে হইল।

ইহার পর কংসের আদেশে অঘাসুর এক ভীষণ অজগরের রূপ ধরিয়া বৃন্দাবনে বাস করিতে লাগিল। তাহার মুখে একে একে সকল গোরু, রাখাল বালক আর কৃষ্ণ এবং বলরাম প্রবেশ করিলেন। তখন সেই বিরাট সাপ মুখ বন্ধ করিল। কিন্তু মুখে বায়ু প্রবেশের পথ নাই। গোবিন্দ উহার মাথায় ছিদ্র করিয়া গোরু, বাছুর ও সাথী বালকদের লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। সেই বিরাট ছিদ্রপথে অঘাসুরের প্রাণবায়ুও বহির্গত হইল।

তখন গোপবালকেরা ঘর হইতে যেসব খাবার আনিয়াছিলেন—সকলে মিলিয়া বলরাম এবং কৃষ্ণের সহিত তাহা ভাগ করিয়া খাইতে লাগিলেন।

এমন সময়ে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য যমুনার কূলে সেই স্থানে আসিলেন। ব্রহ্মা সকল গোরু চুরি করিয়া লইয়া গেলেন। গোপ বালকেরা গোরু না দেখিয়া খাবার ছাড়িয়া উহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। গোপাল খাওয়া ছাড়িয়া রাখাল ছেলেদের গোরুর খোঁজে যাইতে নিষেধ করিয়া ঐ কাজে নিজেই গেলেন। এদিকে ব্রহ্মা আসিয়া গোপবালকদের সেখান হইতে সরাইয়া ফেলিলেন। কৃষ্ণ ধ্যানে জানিতে পারিলেন এই কাজ ব্রহ্মার। তাঁহার এই কাজ দেখিয়া গোবিন্দের হাসি পাইল, তিনি—

"বাছুর নাহি ছাওয়াল নাহি কৃষ্ণ মনে গুনে।
ধ্যানে জানিল ব্রহ্মা হরিল আপনে॥
আমা পরীক্ষিতে ব্রহ্মায় হাস্য উপজিল।
জত বৎস জত সিসু তখনি স্রিজিল॥
জেমত আকৃতি যার জেমন বএসে।
জেন মত জাব অংগ জার জেন কেসে॥"

এইরূপ অনেকবার হইল। ব্রহ্মা যতবার গোপবালক আর বাছুর চুরি করেন কৃষ্ণ ততবার উহাদিগকে সৃষ্টি করেন। অবশেষে ব্রহ্মা কৃষ্ণের কাছে হার মানিলেন।

ব্রহ্মা চাহিয়া দেখেন বৃন্দাবনের গোষ্ঠে গোরুও নাই রাখালবালকগণও নাই। ইহার পরিবর্তে তিনি সেখানে দেখেন চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী শ্রীহরি। তাঁহার দুই দিকে লক্ষ্মী-সরস্বতী বিরাজ করিতেছেন। শ্রীহরি পারিষদগণ দ্বারা বেষ্টিত হইয়া আছেন। এইরূপ তিনি বহু মূর্তি দেখিলেন। এই বহু শ্রীহরির মূর্তির সম্মুখে তাঁহার মতোই অনেক ব্রহ্মা হরির স্তব করিতেছেন। শুধু এক সৃষ্টি নয়, শ্রীহরি অনন্ত কোটি ব্রহ্মার সহিত যুক্ত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতেছেন। ব্রহ্মা বড়ই ভীত হইয়া পড়িলেন—পাছে নারায়ণ তাঁহার কৃতকর্মে অসন্তুষ্ট হন। তিনি নারায়ণকে স্তব স্তুতি দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন।

তখন আবার দুই ভাই কৃষ্ণ বলরাম বালকের রূপধারণ করিলেন। রাখাল ছেলেরা আবার খাইতে বসিলেন। ইহার পর খাওয়া শেষ হইলে তাঁহারা সিঙ্গা বাজাইয়া ঘরে গোরু বাছুর লইয়া ফিরিলেন। এই সকল অসুর বধ গোপবালকেরা স্বচক্ষে দেখিবার পর বৃন্দাবনের ঘরে ঘরে এই খবর জানাইয়া দিলেন। সকল বৃন্দাবনবাসী কৃষ্ণের এই সকল কার্যকে মানুষের কর্ম বলিয়া মনে করিল না।

পরদিন প্রভাতে কৃষ্ণ বলরাম শৃঙ্গ বাজাইয়া গোরুবাছুর লইয়া গোপবালকদের

সঙ্গে যমুনার তীরে ধেনু চরাইতে গেলেন। সেখানে তাঁহারা বনে ময়ূরের নৃত্যের তালে তালে নাচিতে লাগিলেন—বনফুলের মালা পরিতে লাগিলেন। বনের মধ্যে ছুটাছুটি করিতে করিতে বালকদের ক্ষুধা পাইল। তাঁহারা তালগাছ হইতে তাল পাড়িয়া খাইতে গেলেন—কিন্তু তালবনের মালিক কংস রাজা। তিনি কৃষ্ণকে মারিয়া ফেলিবার জন্য সেখানে ধেনুকাসুরকে পূর্বেই বসাইয়া রাখিয়াছেন। গাছ হইতে তাল পাড়িতেই কে তাল পাড়িয়াছে জানিবার জন্য ধেনুকাসুর দৌড়াইয়া আসিল। বলরামের লাথি খাইয়া সেই অসুর পড়িয়া গেল। দুইজনে ধস্তাধস্তি আরাম্ভ হইল। তাহার দুই পা ধরিয়া বলদেব ধেনুককে ছুড়িয়া ফেলিলেন—তাহার মুখ দিয়া রক্ত উঠিল—সে মরিয়া গেল। ইহা দেখিয়া রাখাল ছেলেরা হাসিতে লাগিল, কেননা দুষ্টের সাজা হইলে সকলেই খুসী হয়।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ বলদেবকে ফেলিয়া অন্য গোপবালকদের লইয়া গোরু চরাইতে গেলেন। তিনি ছেলেদের সঙ্গে নানা কৌতুক করিয়া চলিলেন। গোপবালকদের অত্যন্ত পিপাসা উপস্থিত হইল। যমুনার যে স্থানে কালিয়নাগ বাস করিত তাঁহারা সেইখানে গিয়া জল পান করিতেই প্রাণ হারাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের উপর অমৃত দৃষ্টিতে চাহিতেই সকলে প্রাণ ফিরিয়া পাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করিলেন কালিয়নাগকে এখানে বাস করিতে দেওয়া উচিত নহে কারণ এইখানে গোপবালকগণ লইয়া গোবিন্দ খেলা করেন। কালিয়দহের বিষাক্ত জল যে-কেহ পান করুক না কেন সে তৎক্ষণাৎ মরিয়া যাইবে। যমুনার তীরে একটি কদম গাছ দেখিয়া কৃষ্ণ তাহাতে চড়িয়া এক লাফে কালিয়নাগের উপর পড়িলেন। সকল নাগ আসিয়া কৃষ্ণকে চারিদিক হইতে কামড়াইতে লাগিল কিন্তু তাঁহার গায়ে লাগিতে তাহাদের বিষদাঁতগুলি ভাঙ্গিয়া গেল। নাগদিগের দংশনে কৃষ্ণের সংকটাপন্ন অবস্থার কথা সেখানকার বালকেরা নন্দ যশোদাকে জানাইলেন। তাঁহারা সেখানে গিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মায়ের কাতর ক্রন্দনে শ্রীহরি কালিয়দহের মধ্য হইতে উঠিয়া কালিয়নাগের মাথায় পা রাখিয়া দাঁড়াইলেন। ইহাতে নাগের মোহ দূর হইল। তাহার স্ত্রী আসিয়া করযোড়ে কৃষ্ণের স্তব করিল—তিনি স্বয়ং নারায়ণ এবং তিনিই ছল করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন সুতরাং ভালমন্দ না জানিয়া তাহারা অন্যায় কাজ করে। তাঁহার মায়া বুঝা কঠিন। কালিয়ের অত্যন্ত সৌভাগ্য যে সে নারায়ণের দুর্লভ পদ পাইয়াছে। কালিয়নাগও ভগবানের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বলিলেন সে যেন কালিদহ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। কালিয় তাঁহার আদেশ পালন করিল। শ্রীহরি গড়ুর হইতে কালিয়ের ভয় নিবারণ করিলেন।

জ্যৈষ্ঠ মাসের দারুণ গরমের সময় এক রাত্রিতে যমুনার পারে গোপগণ ঘুমাইয়া আছেন, এমন সময়ে দাবাগ্নি তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। ভীত গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের শরণ লইলেন। গোবিন্দ তখন বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া সেই ভীষণ আগুনকে খাইয়া ফেলিলেন।

কংস দিন দিন কৃষ্ণের অসীম শক্তির পরিচয় পাইতে লাগিলেন। তখন তিনি প্রলম্ব নামক অসুরকে বলরাম ও কৃষ্ণকে মারিবার জন্য মায়াজাল বিস্তার করিবার কথা বলিলেন। প্রলম্বাসুর শিশুরূপে গোপ বালকদের মধ্যে প্রবেশ করিল—কেহ তাহাকে চিনিতে পারিল না। গোপবালকেরা গোরু বাছুর লইয়া দুপুর বেলায় যমুনার পারে ঐ সময় গিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ বট গাছের ছায়ায় বসিয়াছিলেন—গোপবালকগণও সেইখানে বসিলেন—অসুরও তাঁহাদের মধ্যে বসিয়া রহিল। শ্রীকৃষ্ণ বালকরূপী প্রলম্বকে চিনিলেন। রাখাল ছেলেরা কৃষ্ণ আর বলরামের সঙ্গে খেলা করেন—

কেহ হারেন কেহ বা জিতেন। খেলায় বলদেবের নিকট কপটতা করিয়া অসুর হারিলে বলরাম তার কাঁধে চাঁড়লেন। অসুর বলদেবকে কাঁধে লইয়া মথুরার দিকে রওনা হইল। একটু পরে অসুর স্বমূর্তি ধারণ করিল।

"কানাঞি বলেন বলাই ভাই হেলা কেন কর।
আপনার মূর্তি ধরি অসুরে সংহার ॥"

বলদেব তাহাকে মারিয়া ফেলিলেন। প্রলম্বের বধের সংবাদে কংস—

"প্রলম্ব মরণ শুনি কংস নৃপবরে।
সিংহাসন হইতে পড়ে ভূমের উপরে ॥"

একদিন যমুনার তীরে নানা খেলা খেলিয়া গোপবালকেরা অত্যন্ত শ্রান্ত এবং ক্ষুধায় কাতর হইয়াছেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কাছে কিছু খাইতে চাহিলেন। তিনি তখন অদূরে যজ্ঞকারী এক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে নন্দ ঘোষের পুত্র কৃষ্ণ আর বলরামের নাম করিয়া গোপবালকগণকে অন্ন আনিতে বলিলেন। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ বালকদের কথা গ্রাহ্য করিলেন না। পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ বালকদিগকে যজ্ঞস্থানের যেখানে ব্রাহ্মণ-পত্নীরা যজ্ঞের ভোগ রাঁধিতেছেন সেইখানে পাঠাইয়া অন্ন চাহিতে বলিলেন। প্রবল বাধা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণপত্নীগণ নারায়ণকে চিনিতে পারিয়া অন্নব্যঞ্জন লইয়া শ্রীকৃষ্ণের কাছে গেলেন। ছেলেরা সকলেই সেই অন্নব্যঞ্জন আনন্দের সহিত খাইলেন।

যমুনার কূলে বর্ষে বর্ষে ইন্দ্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। বৃন্দাবনের সকল গোপ এই যজ্ঞে ব্রতী হইয়া থাকেন। অন্য বছরের মতো এবারও যজ্ঞের বিরাট আয়োজন হইয়াছে। ভাল ঘাস না হইলে গোরু বাঁচান যায় না। ঘাস গোরুর খাদ্য। আবার জল ছাড়া ঘাস জন্মে না। সুতরাং জলবর্ষণের দেবতা ইন্দ্রের পূজা করা দরকার। শ্রীকৃষ্ণ বলেন ইন্দ্র বর্ষণের দেবতা নহেন—বিধাতা যে কর্ম যাহার ভাগ্যে লিখিয়াছেন সে তাহারই ফলভোগ করে। কর্মফলহেতু জল বর্ষিত হয়। তিনি তখন বলিলেন গোবর্ধন গিরিকে ছাড়িয়া ইন্দ্রপূজা করা উচিত নয়। গোধন রক্ষা পায় গোবর্ধন গিরির শৃঙ্গের অনুকূলতায়। পর্বত ইচ্ছা করিলে শৃঙ্গ হেলাইয়া গোধন মারিতে পারে। পর্বত যদি কাহাকেও মারে তবে ইন্দ্র কিছু করিতে পারেন না। গোপগণ কৃষ্ণের কথা মানিয়া লইলেন। মহাসমারোহে সে বছর ইন্দ্র পূজার পরিবর্তে গোবর্ধন পূজা চলিল। শ্রীকৃষ্ণ নিজে পর্বতের রূপ ধারণ করিয়া সকল নিবেদিত দ্রব্য ভোগ করিলেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপগণের বিশ্বাস জন্মিল। কিন্তু ইন্দ্রদেব রাগিয়া সাত দিন সাত রাত্রি অনবরত বর্ষণ করিয়া বৃন্দাবন জলে ভাসাইলেন। সকল গোপ গৃহ হারা হইলেন। সকলে কৃষ্ণকে স্মরণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বতকে হাতে উঠাইয়া ধরিলেন—উহার নীচে বৃন্দাবনবাসী সকলে আশ্রয় লইলেন। ইন্দ্র আসিয়া ভগবান গোবিন্দের নিকট কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন।

এইরূপে বিভিন্ন লীলা করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের বয়স হইল বার বছর। তাঁহার সর্বাঙ্গে অপরূপ সৌন্দর্যের বিকাশ হইল। ইহার পর তাঁহার রাসলীলা হইল। এদিকে কংসের মনে অশান্তি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। কংস কৃষ্ণকে মারিবার বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে মারিতে পারিতেছেন না। অবশেষে কংস কেশী নামক দৈত্যকে কৃষ্ণ বলরামকে বধ করিবার জন্য গোকুলে পাঠাইলেন। যদি সে ইহা-দিগকে মারিতে না পারে তবে অক্রূরকে পাঠাইয়া মথুরায় আনিয়া ধনুর্যজ্ঞে ইহা-দিগকে মারিতে হইবে।

মহাবীর কেশী দৈত্য, কংসের আদেশে গোকুল নগরে গমন করিল। তাহার পদ-

ভরে পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। কেশী অশ্বরূপ ধরিয়া বিকট দাঁত দিয়া কৃষ্ণকে খাইতে আসিল। গোবিন্দ তাহাকে ল্যাজ ধরিয়া ঘুরাইয়া ফেলিয়া দিলেন। সে দূরে ছিটকাইয়া পড়িল। আবার সে কৃষ্ণকে মারিতে আসিল। তখন ভগবান গোবিন্দ তাহাকে হাত দিয়া ঘুরাইয়া মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। সে মরিয়া গেল। কেশীকে মারিয়াছিলেন বলিয়া কৃষ্ণের এক নাম কেশব।

কংস ধনুর্যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছেন। সেখানে মল্লক্রীড়া হইবে--কৃষ্ণ ও বলরামকে আমন্ত্রণ করিয়া অক্রূর মথুরায় লইয়া যাইতে গোকুলে আসিলেন। কৃষ্ণের মথুরা যাত্রার কথা শুনিয়া তাঁহার আসন্ন বিরহে ব্রজগোপীগণ কাঁদিতে লাগিলেন—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের আর বলরামের গমনপথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইলেন। গোপীগণকে কাঁদাইয়া দুই ভাই মথুরায় উপস্থিত হইলেন। পথে রাজবাড়ির রজকের সহিত তাঁহাদের দেখা হইল। কৃষ্ণ রজকের নিকট পরিবার জন্য ভাল কাপড় চাহিলেন। রজক তাঁহাকে তো কাপড় দিলই না বরং উল্টা ব্যঙ্গ করিতে লাগিল—

"শুনিয়া কৃষ্ণের বাক্য হাসিতে লাগিল।
কেনরে পাপিষ্ঠ গোপ হেন বোল বৈল ॥
খরতর কংস রাজা বড় নৃপবর।
তাহার বস্ত্র পাখালি আমি তাহার অনুচর ॥
বনে থাক গরু রাখ নাহি বুঝ কথা।
এ বোল বলিলে তোর মৃত্যু হব এথা ॥"

রজকের কথায় কৃষ্ণ অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার ঘাড় মটকাইয়া তাহার মাথা নিলেন। রজকের নিকট হইতে ভাল ভাল কাপড় লইয়া দুই ভাই উহা পরিয়া মথুরার পথে অগ্রসর হইলেন। ইহার পর পথে মালাকারের সঙ্গে দেখা। সে ছেলে দুইটির গলায় সুন্দর মালা দিল। পথে শরীরের তিন স্থানে বাঁকা কুব্জার সহিত শ্রীগোবিন্দের দেখা হইল। কুব্জা কংস রাজার বেশভূষাকারিণী, চন্দন কুঙ্কুম দিয়া কংসকে তিনি সাজান। কুব্জা গোবিন্দকে চন্দনদ্বারা সাজাইলেন। বলরামের দেহে কস্তুরী লাগাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ কুব্জার কুব্জত্ব ও শরীরের ত্রিভঙ্গ দূর করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন। শ্রীহরি তখনি কুব্জার বাঁকা শরীর সোজা করিয়া দিলেন। কুব্জা তখন বিদ্যাধরীর মতো সুন্দরী হইলেন।

কংস মথুরাকে ধনুর্যজ্ঞ উপলক্ষে বিবিধ সজ্জায় সাজাইয়াছেন। বলরাম ও কৃষ্ণ যজ্ঞস্থলে একদিন পূর্বে উপস্থিত হইয়াছেন—দেখেন সেখানে এক বিরাট ধনুক পড়িয়া রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ সেই ধনুকে গুণ দিলেন। ধনুকের টংকার ধ্বনিতে যজ্ঞস্থলের লোকদের কানে তালি লাগিল। ইহাতে কংসের মানসিক অবস্থা অতি শোচনীয় হইল– কৃষ্ণের হাতে মৃত্যুর ভয়ে তাঁহার রাত্রিতে ভাল ঘুম হয় না। নানারূপ দুঃস্বপ্ন তিনি দেখিতে লাগিলেন। পরদিন প্রভাতে দুই ভাই রাম আর কৃষ্ণ যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন।

ইতিমধ্যে কংস যজ্ঞশালার দ্বারে কুবলয় নামক হস্তীকে রাখিয়াছেন যাহাতে সে কৃষ্ণ বলরামকে পায়ে চাপিয়া মারিতে পাবে। কিন্তু কুবলয় হস্তীকে শ্রীকৃষ্ণ প্রবল যুদ্ধে বধ করিলেন। তারপর মল্লক্রীড়ার স্থলে দুই ভাই উপস্থিত হইলেন।

চানুর নামক দৈত্য কৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন, আর মুষ্টিক বলরামের সহিত মল্লক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইল। উভয় দৈত্য দুই ভাইয়ের সহিত দারুণ যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়া প্রাণ হারাইল। এখন কংসের দিকে কৃষ্ণ অগ্রসর

হইলেন। কৃষ্ণ যেন কংসের কাছে সাক্ষাৎ যম। শ্রীকৃষ্ণ আর কংসের মধ্যে খড়্গযুদ্ধ ও বাহুযুদ্ধ চলিল।

"মঞ্চ হইতে পড়িল রাজা ভূমের উপরে।
বুকের উপরতার বসি গদাধরে॥
সংসারের ভর হৈল সকল সরিরে।
সেই ভরে মারিল রাজা দুষ্ট 'কংসাসুরে'॥
হাহাকার হৈল সব অসুর সমাজে।
হরষিত পুষ্প বৃষ্টি কৈল দেবরাজে॥"—শ্রীকৃষ্ণবিজয়

কংসের বধে বসুদেব দৈবকী ও নন্দযশোদা প্রভৃতি সকলের ভয় দূর হইল। পৃথিবী বহুকাল পরে আবার আনন্দে মাতিয়া উঠিলেন।

অনুশীলনী

১। শ্রীকৃষ্ণের জন্মবিবরণ লিখ।

২। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যে তিনটি অসুরবধের কাহিনী লিখ।

৩। সংক্ষেপে কংসের শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অপচেষ্টাগুলির বিবরণ ও তাহার ফল লিখ।

৪। নন্দোৎসবের বিবরণ দাও। শ্রীকৃষ্ণকে বাল্যে রক্ষা করিবার জন্য নন্দযশোদা কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন?

৮। শ্রীচৈতন্যের চরিতকাহিনী

বর্তমান সময় হইতে প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে ৮৯২ সালের ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়। তাঁহার আবির্ভাব বাঙ্গলা সাহিত্যের দিক দিয়া এক যুগান্তকারী ঘটনা। ভগবান যীশু খৃষ্টের মাতৃভাষা 'সিরিয়াক'- গৌতম বুদ্ধের মাতৃভাষা ছিল অর্ধমাগধী। তাঁহাদের অমূল্য বাণী রক্ষিত হইয়াছে তাঁহাদের মাতৃভাষায় নহে—প্রাচীনতম বাইবেল, হিব্রুভাষায় আর ভগবান্ বুদ্ধের উপদেশাবলী পালি ভাষায়। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমভক্তির বন্যা বাঙ্গলা ভাষার মাধ্যমে প্রচারিত হইয়া হরিনাম সংকীর্তনে শুধু বাঙ্গালা নহে বাঙ্গালার ভৌগোলিক সীমার বাহিরের ভারতকেও প্লাবিত করিয়াছিল। বঙ্গভাষা তাঁহারই মহিমায় সংস্কৃত ভাষার মতো ধর্মের ভাষার গৌরব অর্জন করে এবং এই সময় হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যের বহুমুখী বিকাশ হইতে থাকে।

মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়া পূর্বরাগ, মান, প্রবাস, বিরহ প্রভৃতি শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার বিভিন্ন ভাব নিজ জীবনে বিকশিত করিয়া যে আদর্শ স্থাপন করিয়া গেলেন তাহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই পরবর্তী বৈষ্ণব-গীতি সাহিত্য তাহার নবীন জীবন্ত রূপ লইয়া উপস্থিত হইল। ক্রমে ক্রমে আমরা পাইলাম জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, প্রভৃতি শ্রেষ্ঠপদকর্তাদিগের পদাবলী। ইহা বাঙালির অমূল্য সম্পদ। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত, মানুষ দেবতাকে পূজা করিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু নররূপী দেবতার পূজার আয়োজন তাহারা করে নাই। তাঁহার লোকত্তর জীবন-কথাকে অবলম্বন করিয়াই বাঙ্‌লা সাহিত্যে সর্বপ্রথম জীবনী রচনার সূত্রপাত হয়। এ যুগে পদ্যের প্রাধান্যের জন্যই শ্রীচৈতন্য পদ্যেই রচিত হয়।

অনেকের মতে বাঙ্‌লা ভাষায় শ্রীচৈতন্য জীবনী বিষয়ক সর্বপ্রথম গ্রন্থ হইতেছে "চৈতন্যভাগবত"। চৈতন্যভাগবত, ও চৈতন্যচরিতামৃত, এই দুইখানি গ্রন্থ চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলির মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ। চৈতন্যভাগবত ১৫৩৮-১৫৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়। নিত্যানন্দের অনুচর বৃন্দাবন দাস এই গ্রন্থ রচনা করেন। বৈষ্ণবরা এই গ্রন্থকে ভাগবতের সমপর্যায়ে দেখেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বা কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অপর গ্রন্থরাজির জ্যোতিকে ম্লান করিয়াছে। অপূর্ব ভক্তিদর্শনাত্মক এই গ্রন্থকে প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের মধ্যমণি বলা হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী বর্ণনা প্রসঙ্গে এই সাধক কবি ভারতীয়

দর্শনের মতবাদের আলোচনাপূর্বক গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মতবাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতেই বাঙ্গালা ভাষা দার্শনিক চিন্তার ধারা প্রকাশের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছিল।

এই দুইখানি গ্রন্থ ছাড়া জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, চূড়ামণিদাসের চৈতন্যচরিত প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য।]

বর্তমান সময় হইতে প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে (১৪৮৬ খৃঃ ১৮ই ফেব্রুয়ারী) ফাল্গুন মাসের দোলপূর্ণিমা তিথিতে প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেব গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে আবির্ভূত হন। সেদিন চন্দ্রগ্রহণ ছিল।

"শচীর মন্দিরে আসি অকলঙ্কপূর্ণ শশী
উদয় করিল মহীমাঝে।
গ্রহণ করিয়া ছলা সকলঙ্ক ষোলকলা
চান্দ লুকাইল বড় লাজে॥"
—পদকর্তা দীনবন্ধু দাস

গঙ্গায় স্নানার্থীর ভিড়—সকলের মুখে হরিধ্বনি। তাঁহার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে লোকে তাঁহার নাম রাখিল 'গৌরহরি'। শ্রীচৈতন্যদেবের পিতা শ্রীহট্টনিবাসী উপেন্দ্র মিশ্রের পুত্র জগন্নাথ মিশ্র। জগন্নাথ মিশ্র বিদ্যাচর্চার জন্য শ্রীহট্ট ছাড়িয়া নবদ্বীপের অধিবাসী হইয়াছিলেন। মাতা শচীদেবী নবদ্বীপের নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা। মিশ্রদম্পতির একে একে আটটি কন্যা মারা যায়। ইহার পর নবম সন্তান বিশ্বরূপ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সন্ন্যাসী হইয়া সংসার ত্যাগ করেন।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব মাতাপিতার দশম সন্তান। এই পুত্রের নাম পণ্ডিতগণের মতানুসারে রাখা হইল "বিশ্বম্ভর"।

সর্বলোকের ইঁহ করিব ধারণ পোষণ।
বিশ্বম্ভর নাম ইঁহার এই ত কারণ॥" —চৈতন্যচরিতামৃত

ইনি বিশ্বকে ধারণ এবং পোষণ করিবেন বলিয়া ইঁহার নাম বিশ্বম্ভর। শান্তিপুরের অদ্বৈত আচার্যের গৃহিণী সীতাদেবী বালকের নাম 'নিমাই' রাখেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁহার নাম হইল "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।" কাঁচা সোনার মতো গায়ের রঙের জন্য তাঁহার নাম 'শ্রীগৌরাঙ্গ'—সংক্ষেপে গোরা হইল।

জগন্নাথ মিশ্র সংস্কৃতে সুপণ্ডিত। তাঁহার দুই পুত্র শাস্ত্রচর্চা করিয়া সুপণ্ডিত হউন এইরূপ ইচ্ছা হওয়া পিতামাতার পক্ষে স্বাভাবিক। প্রথম পুত্র বিশ্বরূপ নানাশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করিলেন। কিন্তু সংসারের প্রতি তাঁহার বিরাগ জন্মিল। পিতামাতাকে দুঃখের সাগরে ভাসাইয়া ষোল বৎসর বয়সে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। পিতামাতা এই সময়ে তাহাকে বিবাহ দিয়া সংসারী করিবার চেষ্টা করেন। বড়ভাই চলিয়া গেলে বিশ্বম্ভরের বড়ই কষ্ট হইল—তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

শাস্ত্র চর্চা করিয়া বিশ্বরূপ সংসারের অনিত্যতা জানিয়া অনন্তপথের যাত্রী হইয়াছিলেন। নিমাইকে শাস্ত্রচর্চা করিতে দিলে সেও জ্যেষ্ঠভ্রাতার অনুসরণ করিবে এই আশংকা করিয়া পিতা তাঁহার পড়াশুনা বন্ধ করিয়া দিলেন।

নবদ্বীপবাসীরা নিমাইর বালক বয়সের নানারূপ দুরন্তপনায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। নানাদিক হইতে জগন্নাথ মিশ্রের নিকট নিমাইর বিরুদ্ধে নালিশ আসিতে লাগিল। গঙ্গার ঘাটে যখন সকলে স্নান আহ্নিক করে, তখন নিমাই সঙ্গীদের লইয়া গঙ্গায় সাঁতার কাটে, লোকের গায়ে পায়ের জল ছিটায়, কাহারও ধ্যান ভাঙ্গে।

কাহারও স্নান নষ্ট করে—পূজা করিবার সময় কাহারও বা শিবলিঙ্গ চুরি করে, কাহারও গায়ের চাদর লইয়া পালায়, কেহ বা বলেন বিষ্ণুপূজার নৈবেদ্য ফুল চন্দন সব নিজে ব্যবহার করে—স্নানার্থীকে ডুব দিয়া পায়ে ধরিয়া জলের মধ্যে টানিয়া লইয়া যায়, কোন ছোটছেলের কানে জল দিয়া তাহাকে কাঁদায়—এমনকি ঘাটে স্ত্রীলোকদের কাপড় পুরুষদের কাপড়ের মধ্যে রাখে আর পুরুষদের কাপড় স্ত্রীলোকের কাপড়ের মধ্যে রাখে—ইত্যাদি। পাড়ার যত ডানপিটে ছেলে তার সঙ্গী।

মিশ্র পুত্রের উদ্দেশে তর্জন গর্জন করেন; পলাতক নিমাইকে তিনি ধরিতে পারেন না। পিতা তাঁহাকে শাসন করিতে গেলেন। নিমাই চাতুরী করিয়া পিতার হাত হইতে রক্ষা পাইলেন। নিমাইর অত্যাচার এবং অনাচারের মাত্রা দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

অবশেষে একদিন নিমাই মাতাকে বলিলেন শাস্ত্র না পড়িলে লোকে ভাল মন্দ কিছুই বুঝিতে পারে না। তাঁহাকে পড়িতে দিলে তিনি কোন অন্যায় কাজ করিবেন না।

নিমাই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পড়িতে লাগিলেন। তিনি পড়াশুনা লইয়া একেবারে মাতিয়া উঠিলেন। একাগ্রতার ফলে ব্যাকরণশাস্ত্রে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিলেন।

"দেখিয়া অদ্ভুত বুদ্ধি গুরু হরষিত।
সর্বগোষ্ঠী শ্রেষ্ঠ করি করিলা পূজিত॥" চৈতন্যভাগবত

গুরু তাঁহাকে শিষ্যগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিলেন। তাঁহার সহপাঠিগণের মধ্যে মুরারি গুপ্ত, কমলাকান্ত, মুকুন্দ, গদাধর পণ্ডিত প্রভৃতি প্রধান। তিনি সহপাঠীদের প্রায়ই তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিয়া পরাজিত করিতেন। সে সময় নবদ্বীপে বহু বিদ্যার্থী লেখপড়া শিখিত। প্রতিদিন টোলের পড়া শেষ হইলে গঙ্গার ঘাটে নিমাই সঙ্গীদের লইয়া স্নানে যাইতেন। তিনি সেখানে বিভিন্ন টোলের ছাত্রদের নানারূপ প্রশ্ন করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন।

"প্রতিঘাটে পড়ুয়ার অন্ত নাহি পাই।
ঠাকুর কলহ করে প্রতি ঠাঁঞি ঠাঁঞি॥"

পুত্রের লেখাপড়ার চর্চায় মিশ্রের হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না—

"ভোজন করিয়ামাত্র প্রভু সেই ক্ষণে।
পুস্তক লইয়া গিয়া বসেন নির্জনে॥
আপনে করেন প্রভু সূত্রের টিপ্পনী।
ভুলিলা পুস্তকরসে সর্বদেবমণি॥
দেখিয়া আনন্দে ভাসে মিশ্র মহাশয়।
রাত্রি দিনে হরিষে কিছুই না জানয়॥"—চৈতন্যভাগবত

নিমাইর শাস্ত্রচর্চায় মিশ্র ভাবিলেন তিনি বিশ্বরূপের মতো পিতামাতাকে ছাড়িয়া যাইবেন না। কালক্রমে মিশ্র দেহরক্ষা করিলেন। গৃহে শোকের ছায়া পড়িল। পিতার বিয়োগে নিমাই শচীমাতার একমাত্র নয়নমণি হইয়া রহিলেন। নিমাই মাতাকে প্রবোধ দিলেন 'যতক্ষণ আমি আছি তোমার কোন চিন্তা নাই'। নিমাইর পিতার দেহান্তের পরও তাঁহার অবিরাম শাস্ত্র চর্চা চলিতে থাকিল।

"কি বা স্নানে কি ভোজনে কি বা পর্যটনে।
নাহিক প্রভুর আর চেষ্টা শাস্ত্রবিনে॥" —চৈতন্যভাগবত

পুত্রের যৌবনকাল উপস্থিত হইয়াছে, তাহার বৈবাহিক সংস্কার করা দরকার—শচীমাতা এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন। পুত্রের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থির করিতে শচীমাতাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। নবদ্বীপে বল্লভাচার্য নামে এক সুব্রাহ্মণ

ছিলেন। তাঁহার কন্যা লক্ষ্মী—নামেও লক্ষ্মী রূপগুণেও লক্ষ্মী। আচার্য তাঁহার কন্যার জন্য উপযুক্ত পাত্রের সন্ধানে ছিলেন। বাল্যকালে একদিন গঙ্গার ঘাটে লক্ষ্মীর সহিত গৌরাঙ্গদেবের সাক্ষাৎ হইল। উভয়ের দর্শনে উভয়েই প্রীত হইলেন। গৌরচন্দ্র তাঁহাকে নিজ লক্ষ্মী জানিয়া হাসিলেন। লক্ষ্মীও গৌরের পাদবন্দনা করিলেন।

যথাসময়ে ঘটক বনমালী আচার্য শচীদেবীর নিকট আসিয়া বল্লভাচার্যের কন্যার সহিত গৌরচন্দ্রের শুভপরিণয়ের প্রস্তাব করিলেন। এই প্রস্তাবে শচীমাতা কোন উৎসাহ দেখাইলেন না। ছেলের বাপ নাই—সে বাঁচিয়া থাকুক এবং লেখাপড়া করিতে থাকুক—তারপর অন্য কথা বিবেচনা করা যাইবে। ক্ষুণ্ণ মনে ঘটক ফিরিয়া যাইতেছিলেন—পথে গৌরচন্দ্রের সহিত তাঁহার দেখা হইতেই তিনি সব শুনিলেন; মায়ের নিকট তাঁহাকে অনাদর করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মাতা ইঙ্গিতে পুত্রের অভিপ্রায় বুঝিয়া এইখানেই বিবাহ দেওয়া স্থির করিলেন। লক্ষ্মীদেবীর সহিত যথারীতি গৌরচন্দ্রের বিবাহ হইয়া গেল। গৌরাঙ্গের বিদ্যাচর্চা চলিতে লাগিল। নিমাই পণ্ডিত এখন নবদ্বীপের অধ্যাপক। নানা দেশ হইতে ছাত্রগণ আসিয়া তাঁহার নিকট পড়িতে লাগিল।

একদিন নবদ্বীপে এক দাম্ভিক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি সারা পৃথিবীর পণ্ডিতগণকে পরাজিত করিবার জন্য বঙ্গদেশ ঘুরিয়াছেন ইনি সর্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ। এই পণ্ডিত ভাবিলেন "নবদ্বীপ যদি জয় করিতে পারি তবে আমার শ্রেষ্ঠত্বে কেহ বাধা দিবে না।" সেখানকার বড় বড় পণ্ডিত ভয় পাইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট এই সংবাদ আসিল। তিনি শিষ্যগণকে বলিলেন "ঈশ্বর লোকের অহংকার কখনও সহ্য করেন না।" গঙ্গার তীরে এক জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে বিচারসভা বসিল। পণ্ডিতের অগাধ পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ অতি বিনীত ভাবে তাঁহাকে গঙ্গার মহিমা বর্ণনা করিতে বলিলেন। পণ্ডিত তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ শ্লোকরাশি অনবরত পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। এখন তিনি নিজে ব্যাখ্যা না করিলে তাঁহার রচনা কেহ বুঝিতে পারে না। পণ্ডিতের শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ উহার পাঁচটি ত্রুটি ধরিলেন। এই সকল দোষের উত্তর পণ্ডিত দিতে পারিলেন না। কিন্তু গৌরাঙ্গদেবের ব্যবহার বড় মধুর। তিনি যাঁহাকে জয় করেন সে ব্যক্তি কখনও দুঃখ পায় না—তাঁহার সহিত তর্কে হারিয়াও সুখ। পণ্ডিত অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। পরদিন তাঁহার সহিত আবার বিচার চলিবে এইরূপ স্থির হইল. কিন্তু তর্কের আর প্রয়োজন হইল না। পণ্ডিত শ্রীচৈতন্যদেবের অসাধারণত্ব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। অপরকে বিদ্যাদ্বারা পরাজয় অপেক্ষা ঈশ্বরের সেবায় বিদ্যার প্রয়োগ করা ভাল এই কথা তিনি পণ্ডিতকে বলিলেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের পরাজয়ের পর নবদ্বীপে 'নিমাই 'পণ্ডিতে'র প্রতি লোকের শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল।

"সর্বনবদ্বীপে সর্বলোকে হৈল ধ্বনি।
নিমাঞি পণ্ডিত অধ্যাপক শিরোমণি॥" —চৈতন্যভাগবত

নবদ্বীপে সে সময় যে সব ধর্মকর্ম হইত তাহার প্রত্যেকটিকে উপলক্ষ্য করিয়া লোকে প্রচুর অন্নবস্ত্র তাঁহার ঘরে পাঠাইতে লাগিল। দীন দুঃখীর দুঃখ দেখিলে গৌরাঙ্গদেব স্থির থাকিতে পারিতেন না—তাহাদিগের দুঃখ নিবারণের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন- ঘরে প্রতিদিন অতিথিসেবা চলিত।

নিরবধি অতিথি আইসে প্রভু ঘরে।
যার যেন যোগ্য প্রভু দেন সভাকারে॥ —চৈতন্যভাগবত

পত্নী লক্ষ্মীদেবী একাই সকল গার্হস্থ্যধর্ম সন্তুষ্টচিত্তে পালন করেন। শাশুড়ী

ও পতি, অতিথি অভ্যাগত দীন দুঃখীর, সেবায় তাহার দিন কাটে। ইহার উপর দেবসেবার সকল ভার তাঁহার উপর। এই ভাবে প্রভুর গার্হস্থ্য ধর্মপালন চলিল।

কিছুদিন পরে মহাপ্রভুর পূর্ববঙ্গ দর্শনের ইচ্ছা হইল। তিনি শচীমাতাকে অল্প সময়ের জন্য প্রবাসের অভিপ্রায় জানাইলেন। লক্ষ্মীদেবীকে মায়ের সেবার ভার দিয়া অন্তরঙ্গ শিষ্যবর্গ লইয়া তিনি সানন্দে পূর্ব বাঙলায় যাত্রা করিলেন।

"তবে প্রভু কথো আপ্ত শিষ্যবর্গ লৈয়্যা।
চলিলেন বঙ্গদেশে হরষিত হইয়া॥" —চৈতন্যভাগবত

নিমাই নবদ্বীপ ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিজজনেরা বিলাপ করিতে লাগিলেন —তবে তাঁহাদের আশা আছে তিনি ফিরিয়া আসিলে তাঁহাদের দুঃখ দূর হইবে। শ্রীগৌরসুন্দর ধীরে ধীরে পদ্মানদীর তীরে আসিয়া উপনীত হইলেন।

পদ্মা বিস্তীর্ণা। তাহাতে অতি গভীর জল। পদ্মার তটের শোভা বিস্তীর্ণ বালুকাময়তট, আর তাহার তীরবন দেখিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন। প্রভু সেখানে স্নান করিয়া পদ্মাকে পবিত্র করিলেন।

"ভাগ্যবতী পদ্মাবতী সেই দিন হৈতে।
যোগ্য হৈলা সর্বলোক পবিত্র করিতে॥
পদ্মাবতী নদী অতি দেখিতে সুন্দর।
তরঙ্গ পুলিন স্রোত অতি মনোহর॥" —চৈতন্যভাগবত

মহাপ্রভু পূর্ববঙ্গে প্রবেশ করিলেন—তাঁহার প্রবেশে উহা ধন্য হইল।

"বঙ্গদেশে মহাপ্রভুর হইল প্রবেশ।
অদ্যাপিহ সেই ভাগ্যে ধন্য বঙ্গদেশ॥" —চৈতন্যভাগবত

তাঁহার আগমনে বঙ্গদেশে এক উদ্দীপনার সাড়া পড়িয়া গেল। দলে দলে লোক দেশ ছাড়িয়া অর্থবিত্তসহ নবদ্বীপবাসী হইবার সংকল্প করিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা নবদ্বীপে এইরূপ অধ্যাপকের নিকট শিক্ষালাভ করেন। দলে দলে বিদ্যার্থিগণ গৌরাঙ্গসুন্দরের নিকট পড়িবার জন্য আসিতে লাগিলিন। তিনি পূর্ববঙ্গে পদার্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া এত অধিকসংখ্যক লোক সেখানে হরিসংকীর্তনে মত্ত হয়।

"সেই ভাগ্যে অদ্যাপিহ সর্ববঙ্গদেশে।
শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তন করে স্ত্রীপুরুষে॥"—চৈতন্যভাগবত

বিদ্যার চর্চায় মত্ত হইয়া প্রভু হাজার হাজার শিষ্য করিলেন। কিছুদিন পূর্ব বাঙলায় বাস করিবার পর মহাপ্রভু নবদ্বীপে ফিরিতে মনস্থ করিলেন। সোনা রূপা জলপাত্র আসন কম্বল প্রভৃতি দ্রব্য দিয়া পূর্ব বাংলার লোক তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। যিনি যাহা দিলেন সকলি তিনি কৃপা দৃষ্টি করিয়া গ্রহণ করিলেন। অনেক বিদ্যার্থী তাঁহার সহিত নবদ্বীপ চললেন। শ্রীগৌর ঘরে ফিরিয়াছেন। মাতা পত্নী তাঁহার ঘরে এতদিন বিচ্ছেদ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন। তিনি মায়ের বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া বুঝিলেন কোন অঘটন ঘটিয়াছে। লক্ষ্মীদেবীর দেহত্যাগের নিদারুণ সংবাদ গৌর শুনিলেন। নিজের মনের দুঃখ তিনি মনেই চাপিয়া রাখিলেন। শচীদেবীকে তিনি বলিলেন—

"প্রভু বলে মাতা দুঃখ ভাব কি কারণে।
ভবিতব্য যে আছে ঘুচিবে কেমনে॥
এই মত কালগতি কেহ কারো নহে।
অতএব সংসার অনিত্য বেদে কহে॥"—চৈতন্যভাগবত

শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যকর্ম সন্ধ্যাবন্দনাদি যথারীতি চলিল। টোলে পড়ানও চলিতে লাগিল। নিজের কার্য লইয়া প্রভু ব্যাপৃত। এদিকে শচীমাতা গৌরের পুনরায়

বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। উপযুক্ত পাত্রীও মিলিল। ইনি রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের সর্বগুণান্বিতা কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী। মহা সমারোহের সহিত এই বিবাহ সম্পন্ন হইল। নবদ্বীপের জমিদার বুদ্ধিমন্ত খান শ্রীগৌরাঙ্গের আজন্ম সেবক। তিনি এই বিবাহের সমগ্র ব্যয়ভার গ্রহণ করিলেন। গৌরচন্দ্র নবদ্বীপে অধ্যাপনা কার্য চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। নবদ্বীপ তখন সাধুসজ্জনগণের বাস হইলেও সাধারণ লোক ভাক্তহীন হইয়া অনেক অনাচার করিত। আপাত মধুর বিষয় লইয়া নবদ্বীপবাসী মত্ত। সেখানে সর্বদাই বৈষ্ণবের নিন্দা চলিতেছে। ঈশ্বরভক্ত লোকেরা সাধারণের অনাচার দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে কালযাপন করিতেছেন। গৌরাঙ্গদেব পড়াশুনায় ব্যস্ত— অন্যদিকে তাহার মন দিবার অবকাশ নাই। মহাপ্রভু গয়া হইতে ফিরিবার পর ইহার প্রতিকার করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি গয়াধাম যাত্রা করিবার পূর্বে শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া তথায় যাইবার জন্য মাতার অনুমতি গ্রহণ করিলেন। তাহার সঙ্গে বহু শিষ্য চলিলেন। প্রভু গয়াতে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধপিণ্ডদানাদিকার্য করিলেন। গদাধর পাদপদ্ম দর্শন করিয়া এবং ইহার মাহাত্ম্য শুনিয়া মহাপ্রভুর ভাবাবেশ হইল। তাঁহার দেহে প্রেমানন্দ হেতু লোমহর্ষ ও কম্প উপস্থিত হইল—

"চরণ প্রভাব শুনি বিপ্রগণ মুখে।
আবিষ্ট হইলা প্রভু প্রেমানন্দ সুখে॥
অশ্রুধারা বহে দুই শ্রীপদ্ম নয়নে।
লোমহর্ষ কম্প হৈল চরণ দর্শনে॥"

গৌরচন্দ্রের গয়াতে গদাধর পাদপদ্ম দর্শন জগদ্‌বাসীর পক্ষে একটি পরম সৌভাগ্যের দিন। এই দিন হইতে প্রকৃতপক্ষে মহাপ্রভু জগতের সর্বসাধারণের মধ্যে প্রেমভক্তি প্রকাশ আরম্ভ করিলেন। প্রেমভক্তি যাহা গৌরচন্দ্রের অন্তরে ছিল যাহার আস্বাদ সকলে পায় নাই—সেই প্রেমভক্তির বহিঃপ্রকাশ এই স্মরণীয় দিন হইতে প্রারম্ভ হইল।

"সর্ব জগতের ভাগ্যে প্রভু গৌরচন্দ্র।
প্রেমভক্তি প্রকাশের করিলা আরম্ভ॥"—চৈতন্যভাগবত

এই শুভক্ষণে আরো একটি ঘটনা ঘটিল—যাহার ফলে শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনধারা সংসারের গতানুগতিক পথ হইতে ভিন্ন পথে প্রবাহিত হইল। দৈবযোগে সেই স্থানে কুমারহট্টনিবাসী ঈশ্বরপুরীও উপস্থিত হইয়া গৌরচন্দ্রের সহিত মিলিত হইলেন। গৌরাঙ্গসুন্দর তাঁহাকে বলিলেন—

"প্রভু বলে গয়াযাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাঙ্ চরণ তোমার॥

* * *

সংসার সমুদ্র হইতে উদ্ধারো আমারে।
আমি দেহ সমর্পিলাঙ্ তোমারে॥
কৃষ্ণ পাদপদ্মের অমৃত রসপান।
আমারে করাও তুমি এই চাহি দান॥—চৈতন্যভাগবত

ঈশ্বরপুরীও গৌরচন্দ্রকে বলিলেন—

"সত্য কহি পণ্ডিত তোমার দরশনে।
পরমানন্দ সুখ যেন পাই অনুক্ষণে॥"—চৈতন্যভাগবত

গৌরচন্দ্র নিভৃতে ঈশ্বরপুরীর নিকট হইতে দশাক্ষর মন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। ইহার পর মহাপ্রভু শিষ্যদিগকে বলিলেন 'তোমরা ঘরে ফিরিয়া যাও, আমার সংসার

প্রবেশের ইচ্ছা নাই। তিনি মথুরার জন্য ব্যাকুল হইলেন। পরে মথুরা গমন হইতে নিবৃত্ত হইয়া নবদ্বীপে শিষ্যগণ সহ ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার অভিলাষ হইল নবদ্বীপে প্রেমভক্তির প্রচার করা। এই সময়ে নিমাই কৃষ্ণপ্রেমে পাগল। অতি কষ্টে তিনি নবদ্বীপধামে ফিরিয়া আসিলেন। মহাপ্রভু সর্বদাই কৃষ্ণের নামগানে মত্ত।

"কথোক্ষণে বাহ্য প্রকাশিয়া বিশ্বম্ভর।
কৃষ্ণ বলি কান্দিতে লাগিলা বহুতর॥
কি ভোজনে কি শয়ানে কিবা জাগরণে।
কৃষ্ণ বিনে প্রভু আর কিছু না বা জানে॥"—চৈতন্যভাগবত

গৌরসুন্দরের ছাত্রগণ তাঁহার টোলে আগের মত পড়িতে আসেন। তিনি ব্যাকরণ-শাস্ত্র পড়াইতে গিয়া তাঁহার মধ্যে ভগবানকে দেখেন এবং সেইরূপ ব্যাখ্যা করেন। প্রভুর কৃষ্ণচিন্তা ছাড়া অন্য কোন চিন্তা নাই। দিন দিন তাঁহার ভক্তসংখ্যা বাড়িতে লাগিল। সকলের মনে সাহস হইল এখন পাষণ্ডদিগকে দলন করা যাইবে। ভক্তগণ হরিনাম সংকীর্তনে মত্ত হইলেন। এদিকে প্রভু স্বগৃহে ভাবাবিষ্ট হইয়া থাকেন। টোলের ছাত্রগণ পড়িতে আসেন—প্রভু পড়াইতে বসেন বটে কৃষ্ণ কথা ছাড়া আর কোন কিছু তিনি বলেন না।

তাঁহার উপদেশ হইল—

'চণ্ডাল চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বোলে।
বিপ্র নহে বিপ্র যদি অসৎ পথে চলে॥"—চৈতন্যভাগবত

প্রভু এই সময় শিষ্যগণকে কিরূপে কীর্তন করিতে হইবে তাহা নিজে শিখাইলেন এবং স্বয়ং তাহাদের সহিত নাম-কীর্তনে যোগ দিলেন।

"দিশা দেখাইয়া প্রভু হাথে তালি দিয়া।
আপনে কীর্তন করে শিষ্যগণ লৈয়া॥"—চৈতন্যভাগবত

নিমাই ভাবের আবেশে কখনও হাসেন কখনও কাঁদেন কখনও বা মূর্ছিত হইয়া পড়েন। শচীমাতা পুত্রের জন্য বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীনিবাস (=শ্রীবাস) পণ্ডিত শচীদেবীকে বুঝাইলেন নিমাইর কোন অসুখ হয় নাই ভগবৎপ্রেমে মত্ত ব্যক্তিরই এই-রূপ অবস্থা হইয়া থাকে। শান্তিপুরের অদ্বৈতাচার্যের সহিত তাঁহার মিলন হইল।

নবদ্বীপে তাহার অন্তরঙ্গ শ্রীবাসের গৃহে দিবারাত্র কীর্তন চলিতে থাকিল। নিত্যানন্দ প্রভুও রাঢ়দেশ হইতে আসিয়া গৌরচন্দ্রের সহিত মিলিত হইলেন।

নবদ্বীপের পথে পথে কীর্তন চলিতে থাকে। প্রভু একদিন নিত্যানন্দ ও হরিদাসের প্রতি আজ্ঞা দিলেন ঘরে ঘরে গিয়া কৃষ্ণনাম ভিক্ষা চাহিতে হইবে—যাহাতে সকল লোক এই নাম গ্রহণ করে। সজ্জনের ইহাতে আনন্দ হয়। দুর্জনেরা ইহার বিরুদ্ধে নানা কথা বলিতে থাকে। একদিন নবদ্বীপের পথে নিত্যানন্দ ও হরিদাসের জগাই মাধাই নামক দুই মহাপাষণ্ডের সহিত দেখা হইল। ইহারা দুইজন ব্রাহ্মণ-কুলে উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু সঙ্গদোষে চুরি, ডাকাতি, অখাদ্য ভক্ষণ, অপানীয় পান করিত। নিত্যানন্দ ইহাদের উদ্ধারের জন্য চিন্তান্বিত হইলেন। তিনি ও হরিদাস ইহাদিগকে কৃষ্ণ নাম নিতে বলিলেন। ইহারা নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে আক্রমণ করিল।

"অবধূত নাম শুনি মাধাই কুপিয়া।
মারিল প্রভুর শিরে মুটকী তুলিয়া॥
ফুটিল মুটকী শিরে রক্ত পড়ে ধারে।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু গোবিন্দ সোঙরে॥"

মাধাইর কলসীর কানা মারা এবং তাহার ফলে নিত্যানন্দের মাথা হইতে রক্তপাত হইতেছে দেখিয়া জগাইর দয়া হইল। জগাই দেখে মাধাই রক্তপাত করিয়াও শান্ত না হইয়া দুই হাতে নিত্যানন্দকে মারিতে আরম্ভ করিল। জগাই বাধা দিল—

"এত বড় অবধূত না মারিহ আর।
সন্ন্যাসী মারিয়া কোন্ লাভ বা তোমার॥" —চৈতন্যভাগবত

এই খবর পাইয়া মহাপ্রভু সেখানে আসিয়া পড়িয়াছেন—নিত্যানন্দ প্রভুর শরীর হইতে রক্ত পড়িতেছে- তিনি হাসি মুখে সব সহ্য করিতেছেন। মহাপ্রভু জগাইকে আলিঙ্গন করিয়া কৃষ্ণ-নাম দিলেন। জগাইর প্রতি অনুগ্রহ দেখিয়া মাধাইর মনের পরিবর্তন হইল। সে তখন প্রভুর নিকট আত্মসমর্পণ করিল। মহাপ্রভু তাহার অপরাধ ক্ষমা করিলেন।

"দুই দস্যু মহাভাগত করি।
গণসঙ্গে নাচে প্রভু গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥"

শ্রীবাস অঙ্গনে অন্তরঙ্গ সঙ্গে গূঢ় কীর্তন চলিল। নদীয়া নগরের পথে পথে চলিল নাম সংকীর্তন। দৈবক্রমে একদিন কাজী সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন—মৃদঙ্গ, মন্দিরা শঙ্খের ধ্বনি তিনি শুনিলেন। নিজের শাস্ত্রানুমোদিত ধর্মকার্য না হওয়ায় তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া কীর্তন ভাঙ্গিয়া দিলেন। এইরূপ কীর্তন ভাঙ্গিয়া দেওয়া অনেক দিন ধরিয়া চলিল। এখানে যখন কীর্তন চলিবে না,- তখন নদীয়াবাসী স্বস্থান ছাড়িতে মনস্থ করিলেন। মহাপ্রভুর নিকট এই সংবাদ পেঁৗছিল। এই কথা শুনিয়া তিনি নিত্যানন্দকে সকল বৈষ্ণবের নিকট পাঠাইয়া কীর্তনের আয়োজন করিতে বলিলেন। নিমাই পণ্ডিত ঐদিন নৃত্য করিবেন বলিয়া প্রচার করা হইল। সর্ব-নবদ্বীপের ঘরে ঘরে বিশেষভাবে আলো জ্বলিল, সঙ্কীর্তনের দল বাহির হইল। দলগুলি নানামণ্ডলীতে বিভক্ত হইল—সকল নদীয়াবাসী ভক্ত, বাদ্যভাণ্ডসহকারে কীর্তন করিতে করিতে চলিলেন- মহাপ্রভু ইহাদের মধ্যে নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। কাজীর বাসস্থানের নিকট ইঁহারা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাজী প্রথমে ভয়ে লুকাইয়া থাকেন, পরে বাহির হইয়া আসেন। মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা হইলে গ্রাম সম্পর্কে তিনি কাজীর ভাগিনেয় বলিয়া সম্বোধন করেন। নানা আলোচনার পর কাজী এই নগরসঙ্কীর্তন মানিয়া লন এবং মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার মিত্রতা হয়।

মহাপ্রভুর মন এখন ঘর হইতে বাহির হইবার জন্য ব্যাকুল হইল। তিনি বিশ্ব-জগতের কল্যাণের জন্য আসিয়াছেন, সুতরাং ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর তিনি বাস করিতে পারেন না। সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হইয়া ধুলায় লুটাইলে সকল লোক প্রভুর কথা শুনিবে এইরূপ ভাবিয়া তিনি গার্হস্থ্য ধর্মের অবসান করিতে মনস্থ করিলেন। মহাপ্রভুর গৃহে একবার কাটোয়া নিবাসী কেশবভারতী আসিয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে আবার আসিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর তাঁহার নিকট সন্ন্যাস গ্রহণের প্রার্থনা জানাইলেন। তখন তাঁহাকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে না দিয়া কেশবভারতী কাটোয়ায় প্রস্থান করেন। বাড়িতে এক উৎসবের অন্তে অল্প রাত্রি থাকিতে গৌরচন্দ্র ঘর ছাড়িয়া বাহির হইতেছিলেন। দ্বারে শচীমাতাকে দেখিয়া তাঁহার নিকট সন্ন্যাসের অনুমতি চাহিলেন। মাতা কাঁদিতে থাকিলেন, তাঁহার মুখে কোন কথা সরিল না।

মায়ের মৌখিক অনুমতি মহাপ্রভু পাইলেন না—হয়তো নীরব অনুমতি তাঁহার মিলিয়াছিল। মহাপ্রভু চলিলেন অনন্ত পথের যাত্রী হইয়া—পিছনে পড়িয়া রহিলেন স্নেহময়ী মাতা, পতিপ্রাণা পত্নী আর অগণিত ভক্তমণ্ডলী।

গৌরাঙ্গসুন্দর কাটোয়ায় কেশবভারতীর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লৌকিক

আচার রক্ষা করিবার জন্যই কেশবভারতী গৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাস দীক্ষার গুরু হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস আশ্রমের নাম হইল '**শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য**'।

মহাপ্রভু ঘুরিতে ঘুরিতে শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর গৃহে উপস্থিত হইলেন। নবদ্বীপে নিত্যানন্দ শচীমাতাকে এই সংবাদ দিলেন। শচীমাতাসহ সমগ্র নবদ্বীপ-বাসী শান্তিপুরে উপস্থিত হইল শ্রীগৌরাঙ্গকে একবার মাত্র দর্শনের আশায়। সকলকে কাঁদাইয়া গৌর চলিলেন পুরী অভিমুখে জগন্নাথ দর্শনে। ক্রমে ক্রমে তিনি যাজপুর হইয়া কটকে উপনীত হইলেন। কটক হইতে ভুবনেশ্বর সাক্ষীগোপাল দর্শন করিয়া পুরীতে উপস্থিত হইলেন।

জগন্নাথদেবের মূর্তি দেখিয়া শ্রীচৈতন্যদেব আনন্দে তাহাকে কোলে তুলিতে যান। পাণ্ডারা তাহাকে নিরস্ত করিবার জন্য অগ্রসর হয়। তিনি সমাধিস্থ হইয়া মাটিতে পড়িয়া যান। তখন উড়িষ্যার রাজার সভাপণ্ডিত নবদ্বীপবাসী বাসুদেব সার্বভৌম সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মহাপ্রভুকে নিজের বাড়িতে নিয়া গেলেন। ভক্তগণ সকলে সার্বভৌম মহাশয়ের বাড়িতে উঠিলেন। তিনি তখন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক। মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার বেদান্তের বিচার হইল। সার্বভৌম তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে শ্রীচৈতন্যের আরও একটি পণ্ডিত ভক্ত লাভ হইল। তিনি হইতেছেন উড়িষ্যার রাজার গুরু কাশী মিশ্র।

কিছুকাল জগন্নাথ ক্ষেত্রে বাস করিবার পর প্রভু দক্ষিণ ভারতে যাত্রার সংকল্প করিলেন। তিনি সেতুবন্ধ পর্যন্ত গমন স্থির করিলেন এবং দক্ষিণ হইতে না ফেরা পর্যন্ত ভক্তগণকে জগন্নাথক্ষেত্রে অবস্থান করিতে বলিলেন। তিনি দক্ষিণ যাত্রায় কাহাকেও সঙ্গে নিতে চাহিলেন না, শেষ পর্যন্ত প্রভুর কৌপীন বহির্বাস জলপাত্র বহনের জন্য কৃষ্ণদাস নামক ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইতে রাজি হইলেন।

"কৌপীন বহির্বাস আর জলপাত্র।
আর কিছু সঙ্গে নাহি যাবে এইমাত্র॥
তোমার দুই হস্ত বন্ধ নাম গণনে।
জলপাত্র বহির্বাস বহিবে কেমনে॥
প্রেমাবেশে পথে তুমি হবে অচেতন।
জলপাত্রবস্ত্রের কেবা করিবে রক্ষণ॥
কৃষ্ণদাস নামে এই সরল ব্রাহ্মণ।
ইহা সঙ্গে করি লহ এই নিবেদন॥" —চৈতন্যচরিতামৃত

বাসুদেব সার্বভৌম গোদাবরী তীরে বিদ্যানগরে প্রভুকে রামানন্দ রায়ের সহিত মিলিত হইতে বলিলেন। রামানন্দ সেখানকার শাসনকর্তা—পরম বৈষ্ণব, বিষয়ীলোক বলিয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করা চলে না।

"শূদ্র বিষয়ী-জ্ঞানে তারে উপেক্ষা না করিবে।
আমার বচনে তারে অবশ্য মিলিবে॥" —চৈতন্যচরিতামৃত

তিনি একাধারে পণ্ডিত ও ভক্ত। গোদাবরী তীরের বন প্রভুর বৃন্দাবন বলিয়া ভ্রম হইল। সেখানে গোদাবরীর ঘাটে রামানন্দ রায়ের সহিত তাঁহার ভাব বিনিময় হইল। তিনি যেখানেই যান সেইখানেই কৃষ্ণনাম প্রদান করিতে লাগিলেন। এইভাবে চলিতে চলিতে কাবেরী তীরে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন—শ্রীরঙ্গ দর্শনে প্রেমে বিহ্বল হইলেন। কূর্মস্থানে গিয়া কূর্ম বিগ্রহ দর্শন করিয়া প্রভু কুষ্ঠরোগী বাসুদেব নামক এক ব্রাহ্মণকে কৃপা করেন। প্রভু যেখানেই যান সেখানকার লোক তাহার ভক্ত হইতে লাগিল।

যাত্রাপথে বহু তীর্থ দর্শন করিবার পর প্রভু সেতুবন্ধে গিয়া রামেশ্বর দর্শন করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের অন্যতম অভিপ্রায় ছিল বড়ভাই বিশ্বরূপকে খুঁজিয়া বাহির করা। কিন্তু তিনি মাধবেন্দ্র পুরীর এক শিষ্যের নিকট শুনিলেন বিশ্বরূপ দেহরক্ষা করিয়াছেন (মাধবেন্দ্রপুরী গৌরচন্দের গার্হস্থ্যাশ্রমের গুরু ঈশ্বরপুরীর গুরু)। ক্রমে ক্রমে প্রভু নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন। প্রতিবৎসর রথযাত্রার সময়ে গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইতেন।

পুরীতে ফিরিলে রাজা প্রতাপরুদ্র দীন বৈষ্ণবের বেশে প্রভুর দর্শন লাভ করিয়া তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত হন। পুরীতে রথযাত্রার সময় প্রভু কীর্তনসহ রথের আগে আগে চলিতেন। রথযাত্রার উৎসবের পর নবদ্বীপের ভক্তগণ দেশে ফিরিতেন।

মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাত্রার সঙ্কল্প করিলেন। বাঙলা দেশে জননীকে দর্শন ও ভাগীরথীর বন্দনা করিয়া পরে বৃন্দাবন রওনা হইবেন স্থির করিলেন। নানা স্থান হইয়া তিনি শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে উপস্থিত হইলেন। শচীদেবীর সহিত সেইখানেই প্রভুর সাক্ষাৎ হয়। ইহার পর গৌড়ের রামকেলিতে তিনি শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের সঙ্গে মিলিত হইলেন। দ্বিতীয়বার শান্তিপুর আসিলে রঘুনাথ দাস সেখানে প্রভুর দর্শন লাভ করেন। রঘুনাথকে প্রভু সেখান হইতে ঘরে ফিরিতে বলিলেন।

মাতা এবং ভক্তগণের নিকট বিদায় লইয়া প্রভু নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন। প্রভু নীলাচল হইতে ঝাড়খণ্ডের পথে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন, বৃন্দাবন হইতে তিনি প্রয়াগে গিয়া সেখানে দশ দিন বাস করিলেন। প্রয়াগ হইতে মহাপ্রভু কাশীতে পদার্পণ করিলেন। তিনি এইখানে পূর্ব বাঙলার তপন মিশ্রের সহিত মিলিত হইলেন। প্রভু কাশী হইতে প্রথমে বাঙলার দিকে যাত্রা করিলেন। তিনি প্রথমে নবদ্বীপে উপনীত হইয়া পরে শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর গৃহে বাস করিলেন। তারপর তিনি জগন্নাথ ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করেন। জীবনের শেষ আঠার বৎসর তিনি পুরীতে বাস করেন। এই সময়ে রঘুনাথ দাস প্রভুর যে সেবা করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ—

"নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার॥
দীনের অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥" —চৈতন্যচরিতামৃত

অপবিত্র বলিয়া অপরকে ঘৃণা করিলে নিজের ধর্ম নষ্ট হয়। অপরকে ঘৃণা করিয়া নিজের অধঃপতন ডাকিয়া আনা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত নহে—

"আমি সন্ন্যাসী আমার সমদৃষ্টি ধর্ম।
চন্দনে পঙ্কে আমার জ্ঞান হয় সম॥
এই লাগি তোমা ত্যাগ করিতে না জুয়ায়।
ঘৃণাবুদ্ধি করি যদি নিজধর্ম যায়॥" —চৈতন্যচরিতামৃত

মহাপ্রভু আঠার বৎসর নীলাচলে বাস করেন। সেখানে নিজে ভক্তিমার্গের আচরণ করিয়া জীবকে ভক্তি শিক্ষা দেন।

"অষ্টাদশবর্ষ কৈল নীলাচলে স্থিতি।
আপনি আচরি জীবে শিখাইলা ভক্তি॥" —চৈতন্যচরিতামৃত

পুরীধামে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের শেষে শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধান ঘটে।

অনুশীলনী

১। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম ও বাল্য জীবনের কাহিনী লিখ।
২। অধ্যাপকরূপে, গৃহস্থরূপে নিমাই পণ্ডিতের জীবনের বিবরণ দাও।
৩। নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম প্রচারের কাহিনী বিবৃত কর।
৪। শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের পর হইতে তাঁহার অবশিষ্ট জীবন কাহিনীর সারসংক্ষেপ লিখ।
৫। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রধান প্রধান উপদেশগুলি বিবৃত কর।
৬। শ্রীচৈতন্যদেব জগতের কল্যাণের জন্য কি কি কার্য করিয়াছেন?
৭। শ্রীচৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের বিবরণ দাও।

৯। রঘুনাথদাসের চরিতকাহিনী

[শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তগণের মধ্যে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী সর্বপ্রধান।

"শিবানন্দ কহে তিঁহো হয় প্রভুস্থানে।
পরম বিখ্যাত তিঁহো কেবা নাহি জানে॥"

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের কৃপালাভে তিনি পরম সৌভাগ্যবান্। এই ধনীর দুলালকে মহাপ্রভু ঐশ্বর্য-বিলাসের অন্ধকূপ হইতে কৌশলে উদ্ধার করিয়া শ্রীস্বরূপের হস্তে সমর্পণ করেন। চৈতন্যদেবের অলৌকিক আকর্ষণে যাঁহারা ঘর ছাড়িয়া তাঁহারই পথের পথিক হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ব্যাকুলতা ও কঠোর সাধনায় রঘুনাথের সমকক্ষ সম্ভবতঃ কেহ নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার 'চৈতন্য চরিতামৃতের অন্ত্যলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে রঘুনাথের জীবনী বর্ণনা করিয়াছেন।]

হুগলী জেলার সপ্তগ্রামে হিরণ্য দাস আর গোবর্ধন দাস—এই দুই সহোদর অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী ছিলেন। জ্যেষ্ঠ হিরণ্যের কোন সন্তান ছিল না—কনিষ্ঠ গোবর্ধনের পুত্র রঘুনাথ দাস। তাঁহার জেষ্ঠতাত ও পিতা সদাচারী, স্বধর্মনিষ্ঠ, সজ্জন প্রতিপালক ও সজ্জনসেবী। রঘুনাথের মধ্যে অতি অল্প বয়সেই সংসারের প্রতি অনাসক্তি দেখা গিয়াছিল। রঘুনাথ কুলপুরোহিত যদুনন্দন আচার্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। অদ্বৈত আচার্যের শিষ্য হইতেছেন এই যদুনন্দন, শ্রীচৈতন্যদেবেরও ইনি ভক্ত। চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি শান্তিপুরে পদার্পণ করিয়াছেন। প্রাণের ব্যাকুলতায় রঘুনাথ অদ্বৈত গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করিলেন। তিনি রঘুনাথকে ঘরে ফিরিতে উপদেশ দিলেন—

"পূর্বে শান্তিপুরে রঘুনাথ যবে আইলা।
মহাপ্রভু কৃপা করি তাঁরে শিখাইলা॥
প্রভুর শিক্ষাতে তিঁহ নিজ ঘরে যায়।
মর্কট বৈরাগ্য ছাড়ি হইলা বিষয়ীর প্রায়॥
ভিতরে বৈরাগ্য বাহিরে করে সর্বকর্ম।
দেখি তার মাতাপিতার আনন্দিত মন॥"

রঘুনাথ মাতাপিতার নিকট ফিরিলেন বটে, কিন্তু যে বৈরাগ্য তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে তাহাকে কোনমতেই ছাড়িতে পারিলেন না। বাহিরে বিষয়ীর মতো সকল কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন, কিন্তু অন্তরে তাঁহার তীব্র বৈরাগ্য বদ্ধমূল হইল। বাহিরে সংসারী লোকের মতো তাঁহার আচরণ দেখিয়া মাতাপিতার খুব আনন্দ হইল। তাঁহারা ভাবিলেন পুত্র তাঁহাদের ছাড়িয়া ঘরের বাহির হইবে না। কিন্তু ঘরে

রঘুনাথের মন টি'কে না—বাহির হইবার জন্য মন সর্বদাই ব্যাকুল। তাঁহার লক্ষ্যস্থল নীলাচল (পুরুষোত্তম ক্ষেত্র পুরী)—সেইখানে মহাপ্রভুর সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষা ক্রমে ক্রমে প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে লাগিল।

তিনি বার বার গৃহ ছাড়িবার চেষ্টা করেন—আর পিতা তাঁহাকে লোক দিয়া ধরিয়া আনেন। এইরূপ অবস্থায় রঘুনাথের মাতা তাঁহার পিতাকে বলিলেন—

"এই মত বারে বারে পালায় ধরি আনে।
তবে তাঁর মাতা কহে তাঁর পিতা স্থানে॥
পুত্র বাতুল হইল রাখহ বান্ধিয়া।
পিতা উত্তর দিলেন—
তাঁর পিতা কহে তাঁরে নির্বিণ্ন হইয়া॥
ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য- স্ত্রী অপসরা সম।
এ সব বাঁধিতে যার নারিলেক মন॥
দড়ির বন্ধন তারে রাখিব কেমতে।
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ ঘুচাইতে॥"

যে লোক ইন্দ্রের ঐশ্বর্যের মতো বিপুল ঐশ্বর্য আর অপসরার মত সুন্দরী পত্নীকে ত্যাগ করিতে পারে তাহাকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া ঘরে রাখা যায় না। পূর্বজন্মার্জিত কর্মফলকে পিতা বন্ধ করিতে পারেন না। বিশেষতঃ—

"চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হইয়াছে ইহার।
চৈতন্যচন্দ্রের বাতুল কে রাখিতে পারে॥"

যাহার প্রতি শ্রীচৈতন্যের কৃপা হয় এবং তাঁহার জন্য যে ব্যক্তি পাগল হয় তাহাকে কোন বন্ধনই বাঁধিতে পারে না। শ্রীচৈতন্যদেব মথুরা হইতে পুরুষোত্তম ক্ষেত্র নীলাচলে ফিরিয়াছেন—এই সংবাদ রঘুনাথের নিকট যখন পেঁৗছিল তখন তিনি নীলাচল যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার একটি পারিবারিক দুর্ঘটনা ঘটিল।

রঘুনাথের জ্যেঠা হিরণ্যদাস সপ্তগ্রাম অঞ্চলের চৌধুরী (প্রধান) হইয়াছিলেন। বিশ লক্ষ টাকার জমিদারী বন্দোবস্ত লইয়া বাদশাহকে বার লক্ষ টাকা রাজস্ব দিবার পর তাঁহার লাভ থাকিত আট লক্ষ টাকা।

এই অঞ্চলের মুসলমান শাসনকর্তা জমিদারী হাতছাড়া হওয়ায় এবং লাভের কোন অংশ হিরণ্যদাসের নিকট হইতে না পাওয়ায় হিংসায় জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি বাদশাহের নিকট হিরণ্যের বিরুদ্ধে নালিশ করিলেন। বাদশাহের প্রধানমন্ত্রী এই ব্যাপারে তদন্ত করিতে আসিলেন। হিরণ্য ও গোবর্ধন দুইজনেই পলাইয়াছেন। রঘুনাথকে উজিরের লোক গ্রেপ্তার করিল। কারাগারে প্রতিদিনই রঘুনাথকে ভীতি-প্রদর্শন চলিতে লাগিল। রঘুনাথকে মারিতে গেলেও উজিরের অনুচরগণ ভয় পায়—সেখান হইতে ফিরিয়া আসে। তাহারা বাপ জ্যেঠাকে হাজির করিবার জন্য রঘুনাথকে প্রতিদিনই মুখে তর্জন গর্জন করে।

"মারিতে আনয়ে যদি, দেখে রঘুনাথে।
মন ফিরি যায়, তাতে না পারে মারিতে॥
বিশেষে কায়স্থবুদ্ধি অন্তরে করে ডর।
মুখে তর্জে গর্জে করে সভয় অন্তর॥"

বুদ্ধিমান লোকের জয় সর্বত্র—বুদ্ধিমানকে দেখিয়া সকলেই ভয় পায়।

রঘুনাথ কোন প্রতিবাদ না করিয়া সেই মুসলমান শাসনকর্তাকে অনুনয় বিনয়

করিয়া কহিলেন—'আমার জ্যেঠা ও পিতা আপনার ভাই। ভাইয়ে ভাইয়ে কখন কখন ঝগড়া হয় আবার কখন কখন মিলনও হইয়া থাকে। ঝগড়া স্থায়ী নহে। পিতার আমি যেমন পুত্র—তেমনি আপনারও পুত্রকল্প। আমি আপনার দ্বারা পালনীয়। এরূপ অবস্থায় পুত্রের মতো পালনীয় ব্যক্তির উপর উৎপীড়ন করা সঙ্গত নয়। আমি প্রতিশ্রুতি দিতেছি কালই আপনাদেব তিন ভাইয়ের মিলন সংঘটন করিব।' এই সকল কথায় সেই শাসনকর্তার মন ভিজিল। তিনি রঘুনাথকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করিলেন। তিনি কোন এক উপায়ে রঘুনাথকে মুক্ত করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন—'আজি ছাড়াইমু তোমা করি এক সূত্র।' অতঃপর তিনি উজিরকে বলিয়া কহিয়া রঘুনাথকে মুক্ত করিলেন। তিনি বলিলেন 'তোমার জ্যেঠার কোন বুদ্ধিশুদ্ধি নাই—তিনি নিজে আট লক্ষ টাকা ভোগ করেন—উহার অংশ আমাকে এক পয়সাও দেন না। তোমার জ্যেঠাকে এখানে লইয়া আইস তিনি যাহা ভাল বোঝেন করুন—তাঁহার উপর সব ভার দিলাম।'

"উজিরে কহিয়া রঘুনাথে ছোড়াইল।
প্রীতি করি রঘুনাথে কহিতে লাগিল॥
তোমার জ্যেঠা নির্বুদ্ধি অষ্ট লক্ষ খায়।
আমি ভাগী আমারে কিছু দিবারে জুয়ায়॥"
যাহ তুমি জ্যেঠা মিলাহ আমারে।
যে মত ভাল হয় করুন ভার দিল তারে॥"—চৈতন্যচরিতামৃত

রঘুনাথ তাঁহার জ্যেঠা হিরণ্যদাস চৌধুরীকে সেই শাসনকর্তার নিকট উপস্থিত করিল এবং এই গুরুতর ব্যাপারটি মিটমাট হইয়া গেল।

শ্রীচৈতন্য দর্শনের জন্য রঘুনাথের মন সর্বদাই অস্থির। নিত্যানন্দ প্রভু পাণি-হাটীতে উপনীত হইয়াছেন জানিয়া রঘুনাথ প্রভুর দর্শনের জন্য সেইখানে উপস্থিত হইলেন। যাইয়া দেখেন প্রভু বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট—তাঁহার দেহ হইতে কোটি সূর্যের প্রভা নির্গত হইতেছে। অগণিত ভক্তদ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত। রঘুনাথ তাঁহাকে দূর হইতে প্রণাম করিতেই নিত্যানন্দ প্রভু কহিলেন—

"শুনি প্রভু কহে চোরা! দিলি দরশন।
আয় আয় আজ তোর করিমু দণ্ডন॥"

রঘুনাথ তবু দূরে দূরে থাকে। নিত্যানন্দ প্রভু নিজে তাঁহাকে টানিয়া লইয়া তাঁহার মাথায় আপনার পা রাখিলেন। রহস্য করিয়া তাঁহাকে শাস্তি দিবার কথা বলিলেন। শাস্তি আর কিছুই নহে। উহা সেখানে ভক্তগণের জন্য দধি চিড়ার মহোৎসবের ব্যবস্থা করা। গ্রামে লোক পাঠাইয়া প্রচুর দধি দুগ্ধ সন্দেশ চিনি কলা আনা হইল। বড় বড় মাটির গামলায় চিড়া ভিজান হইল। এই মহোৎসবে অগণিত লোক সমাগম হইল। ব্রাহ্মণ সজ্জন, বৈষ্ণব ভক্তগণ মণ্ডলী করিয়া আহারে বসিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু বেদীর উপর বসিলেন—আর সকলে বসিলেন বেদীর নীচে। এই মহোৎসবের অনুষ্ঠান পানিহাটীর গঙ্গাতীরে হইতেছিল। গঙ্গাতীরে যাঁহারা বসিবার যায়গা পাইলেন না তাঁহারা গঙ্গার জলে দাঁড়াইয়া দধিচিড়া ভোজন করিলেন। এই বিরাট মহোৎসব রঘুনাথের সৌভাগ্যের জন্যই হইয়াছিল। ইহার পর সকলকে মাল চন্দন প্রদান করা হইল। ইহাই পানিহাটির বিখ্যাত মহোৎসব। দিবাশেষে প্রভুর বিশ্রামের পর রাঘব মন্দিরে কীর্তন আরম্ভ হইল—

"ভক্ত সব নাচাইয়া নিত্যানন্দ রায়।
শেষ নৃত্য করে প্রেমে জগৎ ভাসায়॥"

পরদিন প্রভাতে নিত্যানন্দ প্রভু গঙ্গাস্নানশেষে পূর্বোক্তস্থানে বসিয়া আছেন। রঘুনাথ সেখানে ভক্তগণের সহিত উপবিষ্ট প্রভুর দর্শন লাভ করিলেন। রঘুনাথ এতই সপ্রতিভ যে নিজের মনের কথা নিজে বলিতে পারেন না—তাই রাঘব পণ্ডিতকে দিয়া নিজের ইচ্ছা জানাইলেন—

"রঘুনাথ আসি কৈলা চরণবন্দন।
রাঘব পণ্ডিত দ্বারা কৈল নিবেদন॥
অধম পামর মুই হীন জীবাধম।
মোর ইচ্ছা হয়ে পাঙ চৈতন্যচরণ॥"
"বামন হইয়া যেন চাঁদ ধরিবারে পায়।
অনেক যত্ন কেনু যাইতে কভু সিদ্ধ নয়॥"

রঘুনাথ বার বার চেষ্টা করিয়াও চৈতন্যদেবের চরণ দর্শন করিতে পারিতেছেন না শুধু নিত্যানন্দ দেবের কৃপা হইলে তাহার সংকল্প সিদ্ধ হইতে পারে।

"যতবার পলাঙ আমি গৃহাদি ছাড়িয়া।
পিতামাতা দুইজনে রাখেন বাঁধিয়া॥
তোমার কৃপা বিনা কেহ চৈতন্য না পায়।
তুমি কৃপা কৈলে তাঁরে অধমেহ পায়॥
অযোগ্য মুই নিবেদন করিতে করো ভয়।
মোরে চৈতন্য দেহ গোসাঞি হইয়া সদয়॥"

এই কথা শুনিয়া নিত্যানন্দপ্রভু হাসি ভক্তগণকে বলিলেন 'তোমরা সকলে মিলিয় রঘুনাথকে আশীর্বাদ কর যাহাতে সে চৈতন্যের চরণপ্রাপ্ত হইতে পারে। ভক্তগণের আশীর্বাদের পর নিত্যানন্দ প্রভু রঘুনাথকে নিকটে ডাকাইয়া কহিলেন—

"তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইলা আপনি।
ছুটিল তোমার যত বিঘ্নাদি বন্ধনে॥
নিশ্চিন্ত হইয়া যাহ আপন ভবন।
অচিরে নির্বিঘ্নে পাবে চৈতনচরণ॥"

ইহার পর পানিহাটির রাঘব পণ্ডিতের গৃহে রঘুনাথ নিত্যানন্দ প্রভুর আশ্রিত সকলব্যক্তিকে সেবা করিলেন। তাহাদের সকলকে দুই টাকা হইতে বিশ টাকা পর্যন্ত দক্ষিণা দিলেন। ইহার পর রঘুনাথ রাঘব পণ্ডিতকে প্রণাম করিয়া স্বগৃহে ফিরিলেন। বাড়ি ফিরিবার পর রঘুনাথ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন না। বহির্বাটিতে দুর্গা-মণ্ডপে তিনি শয়ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি যাহাতে পলাইতে না পারেন তাহার জন্য কড়া পাহারার বন্দোবস্ত হইল।

এই সময়ে গৌড় দেশের সকল ভক্ত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য নীলাচল যাত্রা করিলেন। রঘুনাথ তাঁহাদের সঙ্গী হইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইলেন। তিনি নজরবন্দী অবস্থায় থাকিয়া পলাইবার নানা উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। গৌড়ীয় ভক্তগণের সংগী হওয়া তাহার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন, কারণ ইঁহারা প্রকাশ্যে যাইতেছেন। রঘুনাথ প্রকাশ্যে গেলে ধরা পড়িবেন। অবশেষে দৈবক্রমে একদিন তাঁহার পলায়ন করিবার সুযোগ উপস্থিত হইল। একদিন রাত্রি শেষে রঘুনাথের দীক্ষাগুরু ও কুলপুরোহিত যদুনন্দন আচার্য হঠাৎ পূর্বোক্ত চণ্ডীমণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। আচার্যের এক ব্রাহ্মণ শিষ্য তাঁহার বাড়ির ঠাকুর সেবা করেন। তিনি সেবা ছাড়িয়া দিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে খুঁজিয়া আনিতে হইবে। তিনি রঘুনাথকে সঙ্গে লইয়া শিষ্যের খোঁজে বাহির হইলেন। রঘুনাথের রক্ষকগণের চোখে শেষ

রাত্রির ঘুম। তাহারা কিছুই টের পাইল না। রঘুনাথ কিছুদূর অগ্রসর হইয়া অর্ধপথে গুরুকে কহিলেন সেই ঠাকুরকে তিনি বলিয়া কহিয়া ঠাকুর পূজার জন্য পাঠাইয়া দিবেন। গুরু ঘরে ফিরিয়া যান ইহাই রঘুনাথের অভিপ্রায়। গুরুর আদেশ লইয়া ঠাকুরের পূজক খুঁজিবার ছলে রঘুনাথ পলায়ন করিলেন। রঘুনাথ চলিতে চলিতে পিছনে চাহিয়া দেখেন কেহ তাহাকে ধরিবার জন্য আসিতেছে কিনা। ধরা পড়িবার ভয়ে তিনি গ্রাম্য পথ ছাড়িয়া বনের পথ ধরিলেন। অশেষ কষ্ট বরণ করিয়া তিনি অবিরাম বার দিন চলিয়া অবশেষে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। তিনি পথে কোনদিন উপবাসী থাকিয়া, কোনদিন কোন কিছু চর্বণ করিয়া, কোনদিন বা রন্ধন করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছেন। তিনি পথযাত্রার বার দিনের মধ্যে মাত্র তিন দিন আহার করিয়াছিলেন।

রঘুনাথের পলায়ন বৃত্তান্ত পিতা জানিতে পারিলেন। তাঁহাকে ধরিবার জন্য রক্ষকগণ গৌড়ীয় ভক্তগণের নেতা শিবানন্দ সেনের নিকট গেল। সেখানে তিনি কোন খবর দিতে পারিলেন না—শুধু বলিলেন তাঁহাদের সঙ্গে রঘুনাথ আসেন নাই।

পুরুষোত্তমে যাইয়া দূর হইতে শ্রীচৈতন্যদেবকে রঘুনাথ প্রণাম করিলেন—

"প্রভু কহ আইস তিঁহো ধরিলা চরণ।
উঠি প্রভু কৃপায় তারে কৈলা আলিঙ্গন॥
স্বরূপাদি সব ভক্তের চরণ বন্দিল।
প্রভু কৃপা দেখি সবে আলিঙ্গন কৈল॥"

শ্রীগৌরাঙ্গদেব রঘুনাথকে কহিলেন—

"প্রভু কহে কৃষ্ণ কৃপা বলিষ্ঠ সব হৈতে।
তোমাকে কাড়িল বিষয়বিষ্ঠা গর্ত হৈতে॥"

রঘুনাথ মনে মনে ভাবিলেন—

"রঘুনাথ মনে কহে কৃষ্ণ নাহি জানি।
তোমার কৃপায় কাড়িল আমা এই আমি মানি॥"

গৌরাঙ্গের কৃপাই তাঁহার সাংসারিক বন্ধন মুক্তির কারণ। শ্রীচৈতন্যদেব রঘুনাথের দীনতা ও মলিনতা দেখিয়া স্বরূপের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন—

"রঘুনাথের ক্ষীণতা মালিন্য দেখিয়া।
স্বরূপেরে কহে কৃপা আর্দ্রচিত্ত হঞা॥
এই রঘুনাথে আমি সঁপিনু তোমারে।
পুত্র ভৃত্যরূপে তুমি কর অঙ্গীকারে॥"

পথে রঘুনাথ নয়দিন উপবাসী ছিলেন। মহাপ্রভু ইঁহাকে আহারাদি দিয়া তৃপ্ত করিতে ভৃত্য গোবিন্দকে আদেশ দিলেন। ইহার পর তাঁহার বৈষ্ণবের কঠোর নিয়ম পালন আরম্ভ হইল। প্রথমদিন স্নানশেষে রঘুনাথ মহাপ্রভুর প্রসাদ গ্রহণ করেন। পরে সেখানকার প্রসাদ গ্রহণ ছাড়িয়া দিলেন। পরে তিনি জগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিতেন ভিক্ষালাভের আশায়। তিনি কাহারো নিকট কিছু চাহিতেন না। ইচ্ছা করিয়া ভক্তগণ যে যাহা দিতেন তিনি তাহাই গ্রহণ করিতেন। এইরূপ ভিক্ষা করিবার ব্যবহার বৈষ্ণব সমাজে রহিয়াছে—

"এই মত সর্বকাল আছে ব্যবহারে।
নিষ্কিঞ্চন ভক্ত খাড়া হয় সিংহদ্বারে॥"

এই সংবাদ চৈতন্যদেবের নিকট পৌঁছিলে তিনি রঘুনাথের বৈরাগ্যে সন্তোষ লাভ করিলেন—

"শুনি তুষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা।
ভালকৈলা বৈরাগীর ধর্ম আচরিলা॥
বৈরাগী করিব সদা নাম সঙ্কীর্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন রক্ষণ॥
* * *
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায় তার হয় রসের বশ॥"

রঘুনাথ মহাপ্রভুর নিকট নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দানের প্রার্থনা করিলেন। ইহার উত্তরে মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদরকে দেখাইয়া বলিলেন—

"হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল।
তোমার উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে দিল॥"

তবে আমার সাক্ষাৎ উপদেশে যদি তোমার শ্রদ্ধা হয় তবে শোন—

"তথাপি আমার আজ্ঞায় যদি শ্রদ্ধা হয়।
আমার এই বাক্য তুমি করিহ নিশ্চয়॥
গ্রাম্য কথা না শুনিবে গ্রাম্য বার্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা মানসে করিবে॥"

রঘুনাথের বৈরাগ্যের সাধনা দিন দিন কঠোর হইতে কঠোরতর হইতে লাগিল। বর্ষান্তে গৌড়ীয়ভক্তগণ যেমন নীলাচলে আসেন সেইরূপ আসিলেন। রঘুনাথের নীলাচলে বাস ও কঠোর সাধনার কথা তাঁহার পিতামাতা গৌড়ীয় ভক্তগণের নিকট শুনিলেন। পিতা মাতা চারি শত টাকা, এক ব্রাহ্মণ ও দুই ভৃত্যকে জগন্নাথক্ষেত্রে পাঠাইলেন। কিন্তু রঘুনাথ উহা প্রত্যাখান করিলেন। তবে শেষে উহা মহাপ্রভুর দুই বৎসর সেবার জন্য ব্যবহার করিলেন।

কিন্তু পরে রঘুনাথ বুঝিলেন তাঁহার মনে ব্যথা না দিবার জনাই শ্রীচৈতন্য নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। সুতরাং ইহাও তিনি বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহাতে মহাপ্রভু তাহার উপর সন্তুষ্ট হইলেন। ইহার কারণ—

"বিষয়ীর দ্রব্য লঞা করি নিমন্ত্রণ।
প্রসন্ন না হয় ইহায় প্রভুর মন॥
মোর চিত্ত দ্রব্য লৈতে না হয় নির্মল।
এই নিমন্ত্রণে দেখি প্রতিষ্ঠার ফল॥
উপরোধে প্রভু মোর মানে নিমন্ত্রণ।
না মানিলে দুঃখী হবে এই মূঢ়জন॥
* * *
বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥"

বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করিলে মনে মলিনতা আসে। এই ময়লা মনে লোকে ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে পারে না। আর ঘটা করিয়া নিমন্ত্রণ দিলে উহার ফল হয় যশপ্রতিষ্ঠা। উহা লাভ করিতে যাওয়া বৈষ্ণবের পক্ষে নিতান্ত গর্হিত কার্য।

কিছুদিন পরে রঘুনাথ জগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া অযাচিত ভিক্ষা

গ্রহণ করাও ছাড়িয়া দিলেন। এখন তিনি অন্নসত্রে গিয়া অন্ন মাগিয়া খাইতে লাগিলেন।

মহাপ্রভু বলিলেন সিংহদ্বারে ভিক্ষার আশায় দাঁড়াইয়া থাকা অতি ঘৃণ্যবৃত্তি। সত্রে যাহা আহার্য পাইতেন তাহ দ্বারা উদর পূর্ণ করিয়া রঘুনাথ কৃষ্ণ সংকীর্তন ছাড়া অন্য কথা মুখে আনিতেন না।

"ছত্রে যাই যথালাভ উদরভরণ।
আনকথা নাহি সুখে কৃষ্ণ সংকীর্তন॥"

মহাপ্রভু প্রসন্ন হইয়া রঘুনাথকে পুনরায় কৃপা করিলেন। তিনি গোবর্ধন শিলা আর গুঞ্জামালা দিয়া রঘুনাথকে চরম অনুগৃহীত করিলেন। এই গোবর্ধন শিলা ও গুঞ্জামালা শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবনের শংকরানন্দ সরস্বতীর নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি তিন বৎসর এই শিলার সেবা করেন—

"নেত্রজলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর।
শিলাকে কহেন প্রভু 'কৃষ্ণ কলেবর॥'
এই মত তিন বৎসর মালা ধরিলা।
তুষ্টহঞা শিলামালা রঘুনাথে দিলা॥"

রঘুনাথকে শিলামালা দিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে কহিলেন—

"প্রভু কহে এই শিলা কৃষ্ণে বিগ্রহ।
ইহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ॥"
এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক পূজন।
অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণপ্রেমধন॥
শ্রীহস্তে শিলা দিয়া এই আজ্ঞাদিলা।
আনন্দে রঘুনাথ সেবা করিতে লাগিলা॥

রঘুনাথের সাধনার কঠোরতা কেহ পরিমাণ করিতে পারে না—তাঁহার নিয়ম পালন যেন পাথরের দাগের মত কঠিন। তাহার নিদ্রা বসন ভূষণ সর্বত্রই তাঁহার কঠোর বৈরাগ্যের ছাপ রহিয়াছে।

"বৈরাগ্যের কথা তার অদ্ভুত কথন।
আজন্ম না দিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন॥
ছিঁড়াকানি কাঁথা বিনা না পরে বসন।
সাবধানে কৈল প্রভুর আজ্ঞার পালন॥"

রঘুনাথ পূর্বে ছত্রের অন্ন ভিক্ষা করিয়া খাইতেন—তাহাও কিছুদিন পরে ছাড়িয়া দিলেন। এখন তিনি জীবনরক্ষা কিভাবে করিলেন? তাঁহার কঠোরতা কল্পনার অতীত হইলেও উহা বাস্তব। জগন্নাথ দেবের মন্দিরের অন্নপ্রসাদ যাহা অবিক্রীত থাকে তাহা প্রতিদিন গাভীর সম্মুখে ঢালিয়া দেওয়া হয়। ভাতের পচা গন্ধে দক্ষিণ-দেশের গাভী উহা খাইতে পারে না। রাত্রিকালে রঘুনাথ সেই ভাত আনিয়া জল দিয়া পরিষ্কার করে এবং নুন মাখিয়া উহা খায়। একদিন স্বরূপ তাহা দেখিতে পাইয়া ঐ ভাতের কতটা তাঁহার নিকট চাহিয়া খাইলেন। মহাপ্রভু এই সংবাদ জানিতে পারিয়া সেই ভাতের এক গ্রাস খাইয়া দ্বিতীয় গ্রাস তুলিয়া লইলেন—তখন স্বরূপ তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন—

"আর গ্রাস লৈতে স্বরূপ হাতেতে ধরিলা।
তোমার যোগ্য নহে বলি কাড়ি নিলা॥"

মহাপ্রভু উত্তর করিলেন—

"প্রভু কহে নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই।
ঐছে স্বাদু আর কোন প্রসাদে না পাই॥"

শ্রীচৈতন্যদেব এইরূপে রঘুনাথকে বার বার কৃপা করিতে লাগিলেন—

"এই মত রঘুনাথে বার বার কৃপা করে।
রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখি সন্তোষ অন্তরে॥"

চৈতন্যদেবের শেষ ষোল বছরের লীলা রঘুনাথের চোখের সামনে ঘটিয়াছে। এই সময়কার চৈতন্যদেবের জীবনের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে রঘুনাথের চৈতন্যচরিতের বর্ণনা অত্যন্ত মূল্যবান। রঘুনাথ সংস্কৃত ভাষায় অনেক স্তবরচনা করিয়া গিয়াছেন।

মহাপ্রভুর এবং স্বরূপ দামোদরের তিরোধানের পর রঘুনাথ বৃন্দাবনে শ্রীচৈতন্যদেবের অপূর্ব চরিতকথা ভক্তগণকে শুনাইয়া নিজের জীবন যাপন করিয়াছেন।

অনুশীলনী

১। রঘুনাথ দাস কে? তিনি কেন সংসার ছাড়িয়াছিলেন? তিনি কিভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করেন?

২। রঘুনাথ দাসের জীবন কাহিনীর সংক্ষেপ লিখ।

৩। রঘুনাথ দাসের গৃহত্যাগ কাহিনী লিখ—তাহার জগন্নাথক্ষেত্রে (পুরীতে) জীবন যাত্রার বিবরণ দাও।

বেহুলার কাহিনী

[শিবভক্ত চন্দ্রধরকে দিয়া দেবী মনসা কিভাবে মর্ত্যে তাঁহার পূজার প্রবর্তন করান তাহার কাহিনীই মনসামঙ্গল কাব্যের উপজীব্য বিষয়। চন্দ্রধরের পুত্রবধূ বেহুলা এই কাব্যের নায়িকা বেহুলা চরম কৃচ্ছ্রসাধন ও সতীত্ববলে সর্পদষ্ট স্বামী লক্ষ্মীন্দরের প্রাণ স্বর্গ হইতে ফিরাইয়া আনেন। তাঁহার সাধনা আমাদিগকে অভিভূত করিয়াই কেবল ক্ষান্ত হয় নাই, বরং শতাব্দীর পর শতাব্দী সীতা সাবিত্রীর তপস্যাকে দূরে রাখিয়া বাঙলার নারীর হৃদয়ে স্থায়ী আসন পাতিয়াছে। বাঙলার পল্লী সীতাসাবিত্রীকে ভুলিতে পারে, কিন্তু বেহুলাকে আজও ভোলে নাই। সীতা সাবিত্রী বহু দূরের বস্তু, কিন্তু বেহুলার জন্ম বাঙলার পল্লীতে—বেহুলা বাঙালি ঘরের মেয়ে।

হরি দত্ত, নারায়ণদেব, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপলাই, দ্বিজ বংশীদাস, ক্ষেমানন্দ, কেতকা দাস, জগজ্জীবন ঘোষাল, রামবিনোদ, দ্বিজ রসিক প্রভৃতি কবিগণ মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।]

সর্প জগতের রানী মনসা শিবকন্যা। মনসার বিবাহ হয় জরৎকারু মুনির সঙ্গে। পার্বতীর সহিত বিরোধে তাহার পিতৃকুলে স্থান হয় নাই—স্বামীর কুলেও তিনি স্থান পাইলেন না। পরম শিবভক্ত চাঁদ সওদাগরকে দিয়া যদি কোনরূপে মনসার পূজা মর্তলোকে প্রচার করান যায় তবে তাঁহার দেবকুলের মধ্যে একটা স্থান হয়, কিন্তু চাঁদ কিছুতেই মনসাকে মানিতে চাহেন না। যে হাত দিয়া তিনি শূলপাণি মহাদেবের পূজা করিয়াছেন সেই হাত দিয়া তিনি কখনও কানী মনসার পূজা করিবেন না ইহাই তাঁহার পণ।

দেবতায় মানুষে সংগ্রাম চলিল। ধনে মানে সর্বদিক দিয়া চন্দ্রধর গন্ধবণিক্ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁহার পত্নী সনকা কিন্তু গোপনে মনসার পূজা করেন। মনসার কোপে একে একে চন্দ্রধরের ছয়পুত্র প্রাণ হারাইলেন। শঙ্কর গাড়ুরীর চেষ্টায় তাঁহার মহামন্ত্র বলে একে একে চন্দ্রধরের ছয় ছেলে বাঁচিয়া উঠিল—কিন্তু মনসা শঙ্করের স্ত্রীর নিকট হইতে ছলে তাঁহার মৃত্যুর উপায় জানিয়া লইলেন। শঙ্কর গাড়ুরীও মরিয়া গেলেন। চন্দ্রধরের একটি বড় সহায় তাঁহার হস্তচ্যুত হইল। আবার মনসার কোপে ছয় পুত্রের একে একে জীবনাবসান ঘটিল। তবু চাঁদ অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করিয়া জীবনযাপন করিতে লাগিলেন—মনসার কোপে তাঁহার বাণিজ্যতরী

ডুবিল। নানা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়িয়া তিনি গৃহে ফিরিলেন। চাঁদের ছয় পুত্র পূর্বেই মারা গিয়াছেন—ছয় পুত্রের ছয় বিধবা বধূ তাঁহার ঘরে। চৌদ্দডিঙ্গা মধুকর ডুবিয়া যাওয়ায় এখন তিনি সর্বস্বান্ত।

এই দারুণ দুঃখের ভিতর চাঁদ সওদাগর গৃহে পদার্পণ করিয়াই কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীন্দরের (লক্ষ্মীন্দ্র) মুখ দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন—

"ধনজন হারাইলু পাইলা বহু দুঃখ।
সকল পাসরি মুঞি দেখিয়া পুত্র মুখ॥"—মনসামঙ্গল

সাধু চন্দ্রধর যখন তাঁহার বাণিজ্যতরী লইয়া বিদেশ যাত্রা করেন তখন লক্ষ্মীন্দ্র মাতৃগর্ভে। বহুকাল পরে আবার যখন তিনি ঘরে ফিরিলেন, তখন লক্ষ্মীন্দ্র যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি রূপে গুণে সকল দিক দিয়া উপযুক্ত হইয়াছেন। এখন তাহার বিবাহের জন্য যোগ্য কন্যার সন্ধান করিতে হয়—

নানা স্থানে পুত্রের বিবাহের জন্য চন্দ্রধর ঘটক পাঠাইলেন, অবশেষে উজানি নগরের বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী বণিক সায়বেণের কন্যা বেহুলাকে পছন্দ করিলেন।

"সাহু নামে বেণে আছে নগরে উজানী।
যার ঘরে দ্বাদশ বৎসরের কন্যাখানি॥
সুন্দর শ্যামল বর্ণ সুরুচি যে কাম।
ভুবনে নাহিক হেন গুণ অনুপাম॥"—মনসামঙ্গল

বেহুলা পিতৃগৃহে নৃত্য গীত প্রভৃতি নানা কলায় পারদর্শিতা লাভ করেন। তিনি শাপভ্রষ্টা উষা। মনসাদেবীর পরম ভক্ত। তাঁর রূপ গুণ—

"চাঁদমুখী খঞ্জন নয়নী কলাবতী।
অধর প্রবালরঙ্গ বিদ্যুতের জ্যোতি॥
শিশুকাল হৈতে কন্যা শিখে নৃত্যগীত।
মৃতপতি জীয়াইব ললাটে লিখিত॥"
"ললাটে ফলকে তার বিধি লিখে দুরাচার
বাসরে মরিবে সর্পাঘাতে।
তোমার বেহুলা নারী মৃতদেহ কোলে করি
ভাস্যা যাবে ছয় মাসের পথে॥"—কেতকাদাস

বেহুলা বহু দেবকার্য করিয়া থাকেন, বাল্যকাল হইতেই বারমাসের বারব্রত পালন করিয়া নিষ্ঠা সংযম অভ্যাস করিয়াছেন। তিনি রন্ধন বিদ্যায় অতি নিপুণা, এমন কি লোহার কড়াই (কলাই) পর্যন্ত রাঁধিতে পারেন। মেয়ে দেখার সময় এরূপ চাঁদ সওদাগর চাহিয়াছিলেন। বেহুলা মনসার বরে লোহার কলাই রাঁধার পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। বিবাহের পূর্বেই তাঁহার ভাগ্য বিড়ম্বনার কথা বেহুলা জানিতেন। একদিন পুকুরে স্নানের সময় ইচ্ছা করিয়া ঝগড়া বাঁধাইয়া ছদ্মবেশে মনসা তাঁহাকে নিদারুণ অভিশাপ দিলেন—

"বাসরে খাইবে পতি পাবে মনস্তাপ" —কেতকাদাস

কন্যা পছন্দ হইল বিবাহও স্থির হইল। কিন্তু বিবাহের রাত্রিতে বাসরঘরে লক্ষ্মীন্দ্রের সর্পাঘাতে মৃত্যু কিভাবে ঠেকান যায়, ইহা লইয়া সনকা আর চাঁদের মধ্যে কথা হইল। মনসার ভক্ত সনকা হইতেছেন মানবী। আর মনসা দেবতা। তাঁহার সঙ্গে মানুষ কখনও বিবাদে জয়ী হইতে পারে না—

"সনকা কাঁদিয়ে বলে, "শুন সদাগর।
মনসা সহিত বাদ কর নিরন্তর॥"

কিন্তু পুরুষকারের প্রতিমূর্তি চাঁদ উত্তর দিলেন—

"সনকারে বোলে বলে চাঁদ সদাগর।
হেঁতালের ঠেংগায় কানীর ভাঙিগব পাঁজর॥

সনকা পুনরায় বলিলেন—

"সনকা বলেন 'বাণ্যা গেলে ছারখারে।
দেবতা সহিত বাদ কোন মুখে করে॥"

চান্দের সেই এক উত্তর--

"এতেক বুঝায় রামা সনকা বেণ্যানী।
সাধু বলে "কি করিবে চেংগ মুড়ি কানী॥
যেই দিন বিবাহ করিবে লখীন্দর।
তাহা লাগি গড়াইব লোহার বাসর॥"

লক্ষ্মীন্দ্রকে রক্ষা করার জন্য চাঁদ লোহার বাসর নির্মাণ করিবার সংকল্প করিয়া বিশ্বকর্মাকে এই কার্যের জন্য সংবাদ দিলেন। তিনি এই দেবশিল্পীর নিকট সাঁতালি পর্বতের উপর (সপ্ততাল পর্বত) লোহার বাসর তৈয়ারি করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। এই লোহার বাসরে কোন ছিদ্র থাকিবে না, এমন কি একটি পিঁপড়া যাইবার পথ ইহাতে রাখা চলিবে না। এইরূপ ঘর তৈয়ারি হইল। মনসা ইহার কথা জানিতে পারিয়া বিশ্বকর্মাকে ইহার মধ্যে ছিদ্র করিয়া দিতে বলিলেন। তিনি সেখানে ছিদ্র করিয়া উহা কয়লা দিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন--কেবল ঐ স্থান দিয়া একটি সূত্র প্রবেশ করাইয়া রাখিলেন, যাহাতে উহা খুঁজিয়া বাহির করিতে মনসাদেবীর অনুচরদের কোন অসুবিধা না হয়। খুব ঘটা করিয়া লক্ষ্মীন্দ্র ও বেহুলার বিবাহের আয়োজন হইল। সায়বেণে লক্ষ্মীন্দ্রের হাতে কন্যা বেহুলাকে সম্প্রদান করিলেন। মনসা এই বিবাহের সংগে সংগেই শত্রুতা আরম্ভ করিয়া দিলেন। দেবীর মোহবাণের আঘাতে বিবাহসভাতেই লক্ষ্মীন্দ্র মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। বরযাত্রিগণ হায়! হায়! করিতে লাগিলেন। কিন্তু বেহুলা ইহাতে দমিলেন না। তিনি অতি দ্রুত মনসার পূজা করিয়া তাঁহাকে তুষ্ট করিলেন। লক্ষ্মীন্দ্রের চেতনা ফিরিয়া আসিল। ইহা দেখিয়া চাঁদ সওদাগর অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন--পুত্রকে বুঝি মনসার হাত হইতে আর রক্ষা করা গেল না। তিনি তখনই ব্যস্তসমস্ত হইয়া বিবাহস্থল হইতে পুত্র ও পুত্রবধূকে লইয়া দেশের দিকে যাত্রা করিলেন। বিবাহের পর গৃহে পৌঁছিলে বর আর বধূকে বরণ করিয়া ঘরে তোলাই রীতি। কিন্তু চাঁদ সওদাগর বেহুলা ও লক্ষ্মীন্দ্রকে লইয়া সরাসরি সাঁতালির পাহাড়ে গিয়া উঠিলেন এবং লোহার বাসরে তাঁহাদের রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করিলেন। লোহার বাসরে সেই রাত্রির জন্য সর্পের আক্রমণের সব রকম প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল। সেখানে খুব উজ্জ্বল আলো জ্বালিয়া রাখা হইল; সাপের শত্রু কংক, কুরর পাখি, বেজি ও ময়ূর ঘর পাহারা দিতে লাগিল। আর ধন্বন্তরি ওঝাও সেখানে রাত্রিবাস করিতে লাগিলেন।

বেহুলা আর লক্ষ্মীন্দ্র দুইজনে পাশা খেলিয়া রাত্রি জাগরণ করিয়া রহিলেন।

"উজ্জ্বল প্রদীপ জ্বলে জাগে ধন্বন্তরি। কংক কুরল শিখী নেউল প্রহরী॥"

অনেকক্ষণ দুইজনে পাশা খেলিবার পর ঘুমাইয়া পড়িলেন। তবে মনসাকে সেবা করায়

বেহুলা একটি বিশেষ শক্তি অর্জন করিয়াছিলেন—তাহা হইল প্রয়োজনমত যখন তখন তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া যাইত। লক্ষ্মীন্দ্রের ঘুমের সুযোগে মনসা সর্পগণকে ডাকিলা তাহাদের মধ্যে একে একে তিনটিকে লক্ষ্মীন্দ্রকে দংশন করিতে সেখানে পাঠাইলেন। বেহুলা সকলকেই পূজা বা মিষ্টিবাক্যদ্বারা বশীভূত করিয়া ফেলিলেন। এদিকে এই কালরাত্রি প্রভাত হয় হয়। মনসা দেখিলেন মহা মুস্কিল। প্রভাত হইয়া গেলে অভিসম্পাত ফলিবে না। শেষপ্রহরে কালনাগিনীকে মনসা লক্ষ্মীন্দ্রের জীবন নাশের ভার দিলেন। বাসর ঘরে যাহারা সাপ তাড়াইতে আসিয়াছিল তাহারা সকলেই দেবীর মায়ায় ঘুমে অচেতন—

"ধন্বন্তরি বেজি শিখী কঙ্ক কুরল। দেবীর কৃপায় হইল নিদ্রায় বিহ্বল॥"

কালনাগিনীর প্রবল নিশ্বাসে বাসরঘরের ছিদ্রপথের কয়লা উড়িয়া গেল—সেই পথে সে বাসর ঘরে প্রবেশ করিল। সেই ঘরে চাঁদের মত সুন্দর লক্ষ্মীন্দ্র ও বেহুলা নিদ্রায় অচেতন। কালনাগিনী চল্লিশটি সন্তানের জননী—তাহারও এমন সুন্দর পরের ছেলের কোমল শরীরে দাঁত বসাইতে মায়া হইল—সুখদুঃখ বোধ তাহারও আছে।

"আপনি তিতিল কালী নয়নের জলে।
হেরিলে বিদরে প্রাণ গেল পদতলে॥"

এই সুন্দর ছেলেকে চোখে দেখিয়া—তাহার গায়ে দাঁত বসান যাতনা—তাই মুখ ঢাকিবার জন্য সে লক্ষ্মীন্দ্রের পায়ের নীচে গেল। এমন সময়ে লক্ষ্মীন্দ্র পাশ ফিরিতেই নাগিনীর দাঁতে তাঁহার পায়ের আঘাত লাগিল। সুতরাং লক্ষ্মীন্দ্রের দোষ পাওয়া গেল—অধিকন্তু ইহাকে দংশন করিবার জন্য মনসার আদেশ রহিয়াছে। সুতরাং কালনাগিনী-

"বিষদন্ত দিয়া কালী দংশে তার পায়।—দুর্লভ লখাই জাগে বিষের জ্বালায়॥"

আর লক্ষ্মীন্দ্র কিসে যেন কামড়াইয়াছে মনে করিয়া তখন বেহুলাকে ডাকিলেন-

"জাগ জাগ বেহুলা, সায়বাণ্যার ঝি।
তোরে পাইল কালনিদ্রা মোরে খাইল কি॥"

বেহুলা জাগিয়া কালনাগিনীর দিকে অতি ক্ষিপ্রতার সহিত জাঁতি ছুঁড়িয়া মারিলেন—নাগিনী পালাইবার সময় আড়াই আঙুল পরিমাণ ল্যাজের আগা সেখানে ফেলিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে দারুণ বিষে লক্ষ্মীন্দ্রের মুখখানা একেবারে কাল হইয়া গেল। বেহুলা জাগিয়া থাকিলেই বা তিনি কি করিতে পারিতেন? যেখানে তাঁহার শ্বশুরের সঙ্গে দেবতার বিরোধ সেখানে সব প্রতিকার নিষ্ফল—

"শ্বশুর করিল বাদ তোমার লাগিয়া।
অভাগিনী কি করিব রজনী জাগিয়া॥"

বিবাহের মঙ্গলরাত্রিতেই বেহুলা পতিহারা হইলেন। পতির দেহ কোলে করিয়া তিনি বিলাপ করিতে লাগিলেন। সেই করুণ বিলাপে সনকা ছুটিয়া আসিলেন—চাঁদ বেণেও ছুটিয়া আসিলেন। অতিশোকে মানুষ হয় নির্মম। সনকা সকল দোষ পুত্রবধূর দুর্ভাগ্যের উপর চাপাইলেন। আর চন্দ্রধর নির্মম পাষাণের মত হইয়া বলিলেন 'বেশ!' ভাল হইল। চেঙ্গ মুড়ি কানীর সঙ্গে বিবাদ চিরদিনের মতো শেষ হইল।' জীবনের শেষ অবলম্বন একপুত্র তাহাকে মনসা মারিয়াছেন—আর ইহার চেয়ে চাঁদ সওদাগরের বেশী কি অনিষ্ট করিবেন তিনি!

দারুণ শোকের মধ্যে চারিদিক হইতে বেহুলার উপর গালি গঞ্জনা ছাড়া তাঁহার আর কোন সহানুভূতি বা সহায়তা আসিল না।

কিন্তু বেহুলার সংকল্প দৃঢ়। তিনি মৃত পতিকে লইয়া ছয় মাসের পথ সুদূর দেবলোকে যাইবেন—সেখান হইতে পতিকে বাঁচাইয়া তবে ফিরিবেন। তাহার চাই কলাগাছের একটি ভেলা—ভেলায় তিনি অজানা পথে একাকিনী ভাসিয়া চলিবেন। কলাগাছের ভেলা বাঁশের গজাল দিয়া তৈয়ারি হইয়া আসিল। লক্ষ্মীন্দ্রের মৃতদেহ কোলে করিয়া কলার মান্দাসে বসিয়া বেহুলা গাঙ্গুড়ের জলে ভাসিলেন। শাশুড়ী বেহুলাকে তাঁহার দুঃসাহসিক কার্য হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন।

মরা মানুষকে বাঁচাইবার কথা যদি কেহ বলে তবে কোন লোকই উহা বিশ্বাস করে না। কিন্তু বেহুলা শাশুড়ীকে দৃঢ়তার সহিত বলিলেন -

"বেহুলা বিনয়ে বলে শাশুড়ীর তরে।
মরা পুত্র জীয়ন্ত পাইবে তুমি ঘরে॥"

বেহুলা তাঁহার (শাশুড়ীর) নিকট লক্ষ্মীন্দ্রের জীবন লাভের নানা নিদর্শন রাখিয়া গেলেন - কড়ার তেলে যদি দীপ ছয়মাস জ্বলে, সিদ্ধকরা ধান হইতে যদি অংকুর বাহির হয় তাহা হইলে মৃত লক্ষ্মীন্দ্র অবশ্যই জীবন লাভ করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিবেন। বেহুলা সনকাকে ঘরে ফিরিতে বলিলেন। গাঙ্গুড়ের জলে কলার ভেলা ভাসিল, বেহুলাও নিজের ভাগ্য লইয়া অকূলে ভাসিলেন—

"বেহুলা ভাসিয়া যায় কলার মান্দাসে।
মনসা আইলা তথা শ্বেতকাক বেশে॥

শ্বেতকাকবেশী মনসাকে মাণিক্যখচিত অংগুরীয়রূপ স্মরণচিহ্ন দিয়া বেহুলা দূতরূপে মায়ের নিকট তাহাকে পাঠাইলেন। পতির মৃত্যু ও তাঁহার নিজের জলে ভাসিয়া যাইবার খবর যেন কাক বেহুলার জননীকে জানায়। এ-জীবনে আর হয়তো মাতা ও কন্যার সাক্ষাৎ হইবে না।

জামাতার বিবাহের বরণ অংগুরীয় দেখিয়া বেহুলার মাতা অমলা চমকিত হইয়া উঠিলেন। তিনি কাকের নিকট সমস্ত দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার তিন ছেলে ভগিনী বেহুলাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিতে চলিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। বেহুলা পিতামাতার নিকট ভাইদের বলিয়া পাঠাইলেন—

"প্রাণনাথ লৈয়া কোলে জলে ভাস্যা যাই।
কহিও আমার মায়ে আর দেখা নাই॥
জলে ভাস্যা যাই আমি জীয়াবার আশে।
ব্যথিজন শুনি কান্দে রিপুগণ হাসে॥"

ভাইদের তিনি বাড়ি ফিরিতে বলিলেন। গ্রামের অন্যান্য বহু লোক বেহুলাকে তাঁহার যাত্রাপথের নানা ভয় ও বিপদের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন—নদীর পারের অরণ্যে ব্যাঘ্র গণ্ডার প্রভৃতি হিংস্র প্রাণী, জলেতে কুম্ভীর, হাঙ্গর প্রভৃতি জলচর জন্তু—ইহাদের হিংসার হাত হইতে একাকিনী বেহুলা আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন না।

নদীর দুই পারের লোক তাহাকে ফিরাইবার জন্য নানাভাবে বুঝাইতে লাগিল। কিন্তু

বেহ্লা কাহারও কোন কথা শ্নিলেন না। বেহ্লার ভেলা চলিতে লাগিল। নদীর পারের কতক লোক ইতিমধ্যেই বেহ্লার মনসাভক্তি, পতিভক্তি, সাহস ও একাগ্রতার প্রশংসায় মুখর হইল।

দেবী মনসার কৃপায় বেহ্লার কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং তিনি দেবীর নিকট হইতে নিশ্চয়ই স্বকার্য উদ্ধার করিবেন। বেহ্লার কলার ভেলা গ্রামের পর গ্রাম অতিক্রম করিয়া চলিল। পথে বেহ্লাকে নানা কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইল। পাশের বন হইতে মনসার সখী নেতা বাঘের রূপ ধরিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার (বাঘের) ইচ্ছা লক্ষ্মীন্দ্রের মৃতদেহ খায়। বাঘ মানুষের ভাষায় কখনও কথা বলে না—আর বাঘ কোন জীবের মৃতদেহের মাংসও খায় না। বেহ্লার সন্দেহ হইল। নিশ্চয়ই মনসা দেবী আসিয়াছেন তাঁহাকে ছলনা করিতে। তিনি বাঘকে উত্তর দিলেন—

এই দেহে প্রাণ থাকিতে প্রভুরে না দিমু খাইতে
প্রাণ থাকিতে না দিমু প্রভুরে রে॥
সুবর্ণের কাটারি দিয়া মাংস যে কাটিয়
আমি দিমু তোমারে ভুঞ্জিতে।" —ষষ্ঠীবর

বেহ্লা প্রাণ থাকিতে স্বামীর দেহ ব্যাঘ্রকে খাইতে দিবেন না। ব্যাঘ্রের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য তিনি নিজের দেহের তাজা মাংস কাটিয়া তাহাকে দিতেও প্রস্তুত। ব্যাঘ্র ইহা শুনিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। বনের বাঘ চলিয়া গেলে বেহ্লা মানুষ ব্যাঘ্রের কবলে পড়িলেন।

যাত্রাপথে ধনপতি সওদাগর নামক এক বণিক বেহ্লাকে নানা প্রলোভন দেখাইয়া লক্ষ্মীন্দ্রের মৃতদেহ ফেলিয়া দিতে বলিল। পরিচয়ে জানা গেল এই ব্যক্তি লক্ষ্মীন্দ্রের মামা তখন সে লজ্জায় অধোমুখ হইয়া চলিয়া গেল।

ইহার পর এক যায়গায় গোদা বড়শী দিয়া মাছ ধরিতে ছিল—সে বেহ্লাকে বিবাহ করিয়া ঘরে লইয়া যাইতে চায়। কিন্তু বেহ্লার অভিশাপে সে ছয় মাস নিজের বড়শীতে নিজেই আটকাইয়া রহিল।

তার পর ধনা মনা দুই ভাই—তাহারা খেয়া নৌকা পারাপার করে।

বেহ্লাকে দেখিয়া তাঁহার ভেলা ধরিবার জন্য দুইজনে নৌকা ভাসাইল। জলে ডুবিয়া ধনামনার প্রাণ যায় যায়। তাহারা বেহ্লার নিকট প্রাণ ভিক্ষা করিল।

কৃপার যোগ্য এই দুই নরাধমকে শাস্তি দেওয়া চলে না। বেহ্লার আকুল প্রার্থনায় মনসা দেবী ইহাদিগকে রক্ষা করিলেন।

ভেলা ভাসিয়া চলিল। লক্ষ্মীন্দ্রের দেহের মাংস পচিতে লাগিল জোঁক ক্রিমি তাহার ভিতর বাসা বাঁধিল।—মাংস খসিয়া পড়িতে লাগিল। সকল অঙ্গ একে একে গলিয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল। মৃতদেহের উপরে গৃধিনী শকুনি উড়িতে লাগিল—নীচে শৃগালের আক্রমণ। বেহ্লা কি করিবেন। তিনি সেই পচা গলা দেহকে ধুইতে লাগিলেন। বেহ্লা একা। তাঁহার দুঃখের বোঝা তিনি একাই বহন করিয়া চলিয়াছেন।

এইরূপে চলিতে চলিতে ভেলা নেতার ঘাটের বাঁকে আসিয়া পৌঁছিল। নেতা মনসার সখী—তিনি মহাদেবের নেত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনিও মনসার মতো দেবকুলে

স্থান পান নাই। তাঁহার কার্য দেবতাদের কাপড় কাচা। বেহুলা দেখেন নেতা নিজের পুত্রটিকে মারিয়া রাখিয়া কাজে যাইতেছেন--আর কাজ শেষ হইলে তাহাকে আবার বাঁচাইতেছেন। বেহুলা স্থির করিলেন ইঁহাকে ধরিতে পারিলেই জীবনমৃত্যুর সমস্যার সমাধান হয়।

বেহুলা তখন মনে করিলেন নিজের ছেলেকে যখন ইনি মারিয়া পরে বাঁচাইতে পারেন তখন নিশ্চয়ই ইনি তাঁহার মৃতস্বামীকে বাঁচাইতে পারিবেন।

নেতার পা ধরিয়া বেহুলা অত্যন্ত কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন যাহাতে তাঁহার স্বামী বাঁচিতে পারেন। বেহুলা নেতার কাপড় কাচার সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। সকল দেবতার বসন ধৌত করিয়া সর্বশেষে মনসার বসন অত্যন্ত যত্নের সহিত বেহুলা ধৌত করিলেন। নেতা তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া গেলেন। দেবতারা নেতার ধোওয়া কাপড়ের চেয়ে বেহুলার ধোওয়া কাপড় দেখিয়া বেশি খুসী হইলেন। কিন্তু সেদিন বিশেষ কিছু কাজ হইল না। পরদিন নেতা বেহুলাকে নর্তকীর বেশ সাজাইলেন। প্রথমে শিবলোকে যাইয়া মহাদেবকে নৃত্য প্রদর্শন করিয়া সন্তুষ্ট করিতে হইবে। বেহুলা সর্বদেব সহিত মহেশ্বরকে নৃত্যে তুষ্ট করিলেন--তাঁহাকে দেবতারা বর দিতে চাহিলেন। তখন শিব আপন কন্যা মনসাকে ডাকিলেন। তাঁহার প্রতি চাঁদ সওদাগরের অপমানের কথা মনসা শিবকে বলিলেন। সুতরাং মনসার তুষ্টি হইলেই স্বামীকে বেহুলা ফিরিয়া পাইবেন।

স্বামীকে ফিরিয়া পাইবার পূর্বে মনসার নিকট বেহুলাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে যে তাঁহার শ্বশুর চাঁদসওদাগর মনসার পূজা করিবেন। বেহুলা সর্বদেব সমক্ষে সেইরূপ সত্য করিলেন। তারপর তাঁহার কাতর প্রার্থনা -

কৃপা কর, দেবি মোরে হইয়া সদয়।
স্বামি দান দেও মোরে ছাড়িয়া নির্দয়॥
ছয় মাস উপবাসে মুখে নাই রাও।
বিপুলের দুঃখ দেখি মাথা তুলি চাও॥" -ষষ্ঠীবর

তারপর মনসাদেবী স্বর্গের গঙ্গার জল মন্ত্রপূত করিয়া উহাদ্বারা লক্ষ্মীন্দ্রের শরীর হইতে বিষ ঝাড়িয়া ফেলিলেন। তাঁহার দেহে নবজীবনের সঞ্চার হইল--তিনি যেন নিদ্রা হইতে জাগরিত হইলেন। লক্ষ্মীন্দ্র পদ্মার (মনসার) পায়ে পড়িলেন এবং সকল বৃত্তান্ত বেহুলার নিকট জানিলেন। বেহুলার প্রার্থনায় মনসাদেবীর বরে একে একে চাঁদসওদাগরের ছয় ছেলে জীবন লাভ করিলেন। সওদাগর তাহার নষ্ট সম্পত্তি ফিরিয়া পাইলেন। বেহুলা তাঁহার ছয় ভাসুর ও পতি লক্ষ্মীন্দ্রকে লইয়া চৌদ্দখানি ডিঙ্গায় স্বদেশ যাত্রা করিলেন। ফিরিবার সময় বেহুলার স্বর্গ যাত্রার পথের দুষ্টদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিতে লক্ষ্মীন্দ্র ভুলিলেন না।

বেহুলা ডোমনীর ছদ্মবেশে চাঁদসওদাগরের গৃহে উপস্থিত হইলেন। কৌশলে নিজের পরিচয় দিলেন--কিন্তু চাঁদ কিছুতেই মনসার পূজা করিতে চাহিলেন না। বেহুলা তখন বলিলেন পূজা না করিলে তাঁহারা যেখান হইতে আসিয়াছেন সেই স্বর্গলোকে ফিরিয়া যাইবেন। ইহার অর্থ এই লক্ষ্মীন্দ্রসহ চাঁদসওদাগরের সাত পুত্র আবার যমের আলয়ে চলিয়া

যাইবেন। ইহার উপর চাঁদসওদাগরের আত্মীয়স্বজন এবং সমস্ত প্রজা মনসার পূজা করিবার জন্য তাঁহার উপর চাপ দিলেন।

শেষ পর্যন্ত চাঁদসওদাগর বেহুলার সত্য রক্ষা করিবার জন্য খুব ঘটা করিয়া মনসার পূজা করিলেন।

কিন্তু এইখানেই বেহুলার দুঃখের অবসান হইল না। চাঁদসওদাগর পুত্র ধন ঐশ্বর্য সব ফিরিয়া পাইলেন তাঁহার পুত্রবধূ বেহুলার তপস্যার গুণে।

কিন্তু যে পুত্রবধূ শ্বশুরকুলের জন্য এত ত্যাগ স্বীকার করিলেন তাঁহার বুঝি শ্বশুরের গৃহে স্থান হয় না। সমাজ এমনি কুটিল এমনি নির্মম।

ছয় মাস ঘরের বাহিরে থাকার জন্য বেহুলাকে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হইবে। বেহুলা মনসার নিকট আকুলভাবে নিবেদন করিলেন—

"বেউলা বোলে, শুন মাও অনন্তের আই।
তোমার চরণ বিনে অন্য গতি নাই॥
আমাকে পরীক্ষা দেয় শ্বশুর সদাগর।
দোষ গুণ যত সব মাও তোমার গোচর॥" নারায়ণদেব

এত পরীক্ষার পরও বেহুলার আরো পরীক্ষা দরকার তিনি একেবারে মর্মে মরিয়া গেলেন। এই অপমান সহ্য করার চেয়ে লক্ষ্মীন্দ্রকে লইয়া স্বর্গলোকে ফিরিয়া যাওয়াই ভাল মনসাদেবী তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন—পরীক্ষা দেওয়াই ভাল—যখন দেবী মাথার উপর আছেন তখন কোন ভয় নাই—পরীক্ষা দিলেই বেহুলার কীর্তি জগতে অমর হইয়া থাকিবে।

"পরীক্ষা লও তুমি সানন্দিত।
যুগে যুগে কীর্তি রহোক পৃথিবীতে॥" নারায়ণদেব

আটটি অতি কঠোর পরীক্ষা তাঁহাকে দিতে হইয়াছিল—সকলটিতেই বেহুলা বিজয়িনী হইয়াছিলেন। পরীক্ষা দিবার পূর্বেই শাশুড়ীর নিকট তিনি চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন—

"বেউলা বোলে শুনগো শাশুড়ী গোসাঞিনী।
তোমার চরণে মাগো মাগুম মেলানি॥
পরীক্ষা লইয়া যদি মরম পুড়িয়া।
খেয়াতি রহিব মাও সংসার ভরিয়া॥
যদি পরীক্ষা লইতে ধর্মে করে রক্ষা।
তথাপি তোমার আর নাহি হবে দেখা॥" —নারায়ণদেব

বেহুলা লক্ষ্মীন্দ্রসহ স্বর্গলোকে প্রস্থান করিলেন। বেহুলার কীর্তি জগতে অক্ষয় হইয়া রহিল।

অনুশীলনী

১। বেহুলা লক্ষ্মীন্দ্রের কাহিনীর সারসংক্ষেপ লিখ।

২। চাঁদসওদাগর কে? তাঁহার সহিত মনসার বিবাদ এবং তাহার ফল বর্ণনা কর।

৩। স্বামীকে মৃত্যুলোক হইতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বেহুলার প্রচেষ্টা ও তাহার ফলের বিবরণ দাও।

৪। চাঁদসওদাগরের জীবনে মনসার সহিত বিবাদে তাঁহার জয়পরাজয়ের বিচার কর।

১১। মুকুন্দরামের জীবনকাহিনী

[মধ্যযুগের বাঙ্‌লা সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ মানুষের বাস্তব জীবনকে অবলম্বন করিয়া সমাজের ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম, অতি নগণ্য ব্যক্তির সূক্ষ্মতম অনুভূতির যে সমীক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা এই যুগে অন্যত্র দুর্লভ। এখানে কবিগণ সমাজের উচ্চস্তর হইতে নিম্নস্তর পর্যন্ত কাহারও জীবন-কাহিনীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই। মনসামঙ্গল কাব্যের ভিত্তি কেবল বেহুলা-লক্ষ্মীন্দ্রের কাহিনীর উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু চণ্ডীমঙ্গলের দুইটি মূল কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া কাব্যের পুষ্টি সাধিত হইয়াছে। (১) কালকেতু ব্যাধের কাহিনী ও (২) ধনপতি সওদাগরের উপাখ্যান চণ্ডীকাব্যের এই দুইটি মূল উপাদান।

মাণিক দত্তকেই চংডীমঙ্গল কাব্যের প্রবর্তক বলিয়া স্বীকার করা হয়। মাণিক দত্তের পর দ্বিজ মাধব, মুকুন্দরাম, দ্বিজ হরিরাম, মুক্তারাম সেন, রামানন্দ যতি, জয়নারায়ণ দেব প্রভৃতি চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। ইঁহাদের মধ্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী শুধু চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেরই নহে সকল মঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি। মধ্যযুগের বাঙ্‌লা সাহিত্যে তাঁহার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি এই কাব্য রচনা করেন।

মুকুন্দরাম নিজ গ্রন্থে, বিভিন্ন চরিত্র বিশ্লেষণ, ঘটনার নাটকীয় সংস্থান, নির্মম দারিদ্র্যের বর্ণনা, ভাঁড়ু দত্তের শঠতা, ফুল্লরার চরিত্রের আশানৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব প্রভৃতি চিত্রিত করিয়া সে যুগে আধুনিক উপন্যাস না থাকিলেও শ্রেষ্ঠ উপন্যাস রচয়িতার ভাব ও রস সৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। বাঙালির সংসার ও সমাজের চিত্র মুকুন্দরাম অতি নিপুণভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। কবির ফুল্লরার বারমাসীতে দরিদ্র রিক্ত অসহায়ের সংসার-চিত্র, লহনা-খুল্লনা কাহিনীতে সপত্নী দ্বন্দ্বে, শ্রীমন্তের সাহস সন্ধানপ্রিয়তা, দূরদেশের সুখদুঃখের অভিজ্ঞতার জন্য গৃহত্যাগ করিয়া বাঙালির ঘর ছাড়ার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেখানেই দুঃখী সেখানেই মুকুন্দরাম তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কবি হৃদয়ের সমবেদনা দিয়া সকল দুঃখকে দেখিয়াছেন। দুঃখের পাত্রের কথাই কবিকঙ্কণের গানে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। তিনি যথার্থই বলিয়াছেন 'শ্রীকবিকঙ্কণ গান দুঃখের ভাজন।'

মহাকবি কৃত্তিবাসের মতো মুকুন্দরামও তাঁহার গ্রন্থে একটি বিস্তৃত আত্মবিবরণী দিয়াছেন। ইহা হইতে তাঁহার স্বগ্রাম, বংশ ও কাব্য রচনার কাহিনী জানিতে পারা যায়।]

বর্ধমান জেলার রত্নান্ নদের তীরে দামুন্যা (দামিন্যা) গ্রামে ছয় সাত পুরুষ ধরিয়া কবির পূর্বপুরুষের বাস। এই গ্রামে শংকর, চক্রাদিত্য নাম ধরিয়া বাস করিতেন। দেবতার মাহাত্ম্য বুঝিয়া ধুসদত্ত এখানে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কালক্রমে অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে দেবতার স্থান হয়। হরি নন্দী পুনরায় ভূমিদান করিয়া দেবসেবার ব্যবস্থা করেন। দামিন্যার সকলেই শিবভক্ত এবং ঐ গ্রাম শিবের রাজ্য কৈলাশের মতো মনে করা হইত। এই শিবরাজ্যেই কবির জন্ম হয়। এখানেই তাঁহার বাল্যকাল কাটে। কবি রত্নানুনদকে গঙ্গার মত পবিত্র মনে করিতেন। এই নদের জল পান করিবার ফলেই বাল্যকালে কবিত্বলাভ করিয়া কবি শিবসংগীত রচনা করেন।

দামিন্যার লোক যত শিবের চরণে রত
সেই পুরী হরের ধরণী॥
গঙ্গাসম সুনির্মল তোমার চরণজল
পান কৈলা শিশুকাল হৈতে।
সেইত পুণ্যের ফলে কবি হই শিশুকালে
রচিলাঙ্ তোমার সঙ্গীতে॥"

কবি এই গ্রামকে দক্ষিণ রাঢ়ের অগ্রগণ্য গ্রাম বলিয়াছেন, কারণ এখানে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থের বাস ছিল এবং সকলেই নিজ নিজ বৃত্তির অনুশীলন করিতেন। কবির নাম মুকুন্দ রাম, তাঁহাদের কৌলিক উপাধি মিশ্র বা চক্রবর্তী। তাঁহার পিতামহের নাম জগন্নাথ মিশ্র, পিতার নাম হৃদয় মিশ্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম বা উপাধি ছিল কবিচন্দ্র, এবং রামানন্দ ছিলেন কনিষ্ঠ ভ্রাতা। কবির পিতামহ বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কবির রচনার বিভিন্ন অংশ হইতে জানিতে পারা যায় যে তাঁহার মাতার নাম দৈবকী, পুত্রের নাম শিবরাম, পুত্রবধূর নাম চিত্রলেখা, কন্যার নাম যশোধা এবং জামাতার নাম মহেশ। কবি ছিলেন সেলিমবাজ শহরের গোপীনাথ নন্দীর প্রজা। কোন এক ভিন্নধর্মাবলম্বী রাজার আমলে মামুদ সরিফ ডিহিদার নিযুক্ত হইলেন। প্রজাদের দুর্দশার আর সীমা রহিল না। রায়জাদা তাহার মন্ত্রী হইল। ব্যবসায়ীরা ভীত। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের প্রতি তাহাদের বিরূপ মনোভাব। দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ বিপর্যস্ত। কাঠার (জমির মাপ বিশেষ) মাপ কম। রাজকর্মচারী পতিত জমিকে আবাদী জমি লিখিয়া লয়। তাহারা কাহারও কোন উপকার না করিয়া উৎকোচ আদায় করে। প্রজার আবেদন নিবেদন শুনিবার লোক নাই।

"উজীর হল্য রায়জাদা বেপারি ক্ষত্রিয় খেদা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব জনে অরি।
মাপে কোণে দিয়া দড়া পোনর কাঠায় কুড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারি॥
সরকার হইল কাল খীল ভূমি লিখে লাল
বিনি উপকারে খায় ধুতি।
পোতদার হৈল যম টাকা আড়াই আনা কম
পাইলভ্য খায় দিন প্রতি॥"

বাকী খাজনার দায়ে কবির পৃষ্ঠপোষক ও জমিদার গোপীনাথ নন্দী বন্দী হইলেন। তাঁহার তালুক বাজেয়াপ্ত হইল। প্রজাদের উপর জুলুম আরো বাড়িতে লাগিল। লোকে ঘর, জমি, গোরু সবই বেচিতে চায়, কিন্তু কিনিবার লোক নাই. সকলেই বিক্রেতা। টাকার দাম দশ আনার সমান হইল। প্রজারা যাহাতে পলায়ন করিতে না পারে সেইজন্য প্রত্যেকের বাড়িতে পেয়াদা মোতায়েন করা হইল—

পেযাদা সবার কাছে, প্রজারা পালায় পাছে
দুয়ার চাপিয়া দেয় থানা।

কবি গ্রামত্যাগ করিবার কথা ভাবিতেছেন কিন্তু গদাই খাঁ তাঁহাকে গ্রাম ত্যাগ করিতে নিষেধ করেন এবং কবির বাকি খাজনা তিনি দিয়া দিতে চাহিলেন—

শুন হে পণ্ডিতবর যতলাগে দিব কর
বিদেশে না যাইতে কর মতি।

কিন্তু কবি চণ্ডীবাটীর শ্রীমন্ত খাঁ ও গ্রামের মোড়লের সঙ্গে (গম্ভারির সনে) পরামর্শ করিয়া পিতৃপুরুষের ভিটা ত্যাগ করা স্থির করিলেন। যথাসম্ভব টাকাকড়ি সম্বল করিয়া কবি স্ত্রী, পুত্রসহ দামুন্যা ত্যাগ করিলেন। পথে ভাই কবির সঙ্গে মিলিত হইলেন। কিছুদিন পরে তাঁহারা ভেলিয়া গ্রামে উপনীত হইলেন। এখানে রাজপুত দস্যু রূপরায়

কবির যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করে। কিন্তু পুণ্যাত্মা যদু কুণ্ডু কবিকে তিন দিনের জন্য আশ্রয় দান করেন। কবি আবার চলিতে লাগিলেন। গোড়াই, দারুকেশ্বর, নারায়ণ, পরাশর, দামোদর প্রভৃতি নদনদী পার হইয়া অবশেষে গুছিতা গ্রামে (বর্তমান গোথরা গ্রাম) রিক্ত এবং শ্রান্ত ক্লান্ত অবস্থায় উপস্থিত হন। এইখানেই কবির ভাগ্য পরিবর্তন ঘটে। প্রাচীন বঙ্গলার মহাকবি স্ত্রীপুত্র লইয়া নিঃসম্বল অবস্থায় এক পুকুরের পাড়ে বাসা বাঁধিলেন। তাঁহারা বিনা তেলে স্নান করিলেন, শিশুপুত্র খাদ্যের জন্য কাঁদিতে লাগিল। এইখানেই কবি শালুক-নাড়া দ্বারা নৈবেদ্য রচনা করিয়া কুমুদ ফুলে দেবতার পূজা শেষ করিলেন। পুকুরের জল ছাড়া ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করিবার জন্য কবির ভাগ্যে আর কিছুই জুটিল না। শ্রান্ত-ক্লান্ত কবি এখানে নিদ্রিত হইয়া পড়েন। মহামায়া চণ্ডিকা কবির শিয়রদেশে নিজ মূর্তি ধারণ করিয়া আবির্ভূতা হইলেন। কবি নতুন মন্ত্র পাইলেন। মহামায় তাঁহাকে কাব্য রচনা করিতে আদেশ দিলেন।

"ক্ষুধা শ্রম পরিশ্রমে নিদ্রা যাই সেই ধামে
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে॥
করিলা অনেক দয়া দিলা চরণের ছায়া
আজ্ঞা দিলা রচিতে সঙ্গীত।"

দেবানুগৃহীত কবি আবার চলিতে লাগিলেন। সিলাই নদী পার হইয়া তিনি (বর্তমান মেদিনীপুর জেলায়) ব্রাহ্মণভূমে আরড়া গ্রামে উপস্থিত হইলেন। এখানকার ব্রাহ্মণ রাজা বাঁকুড়া রায় ব্যাসের তুল্য। কবি তাঁহাকে কবিতা পাঠে সম্ভাষণ করিলেন। সন্তুষ্ট হইয়া রাজা তাঁহাকে আশ্রয় দান করিলেন। কবি রাজপুত্র রঘুনাথ রায়ের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। রঘুনাথও তাঁহাকে গুরুর যথোচিত সম্মান দিতে লাগিলেন।

"আরড়া ব্রাহ্মণভূমি ব্রাহ্মণ রাজার স্বামী
নরপতি ব্যাসের সমান।
পড়িয়া কবিত্ববাণী সম্ভাষিনু নৃপমণি
রাজা দিল দশ আড়া ধান॥
সুধন্য বাঁকুড়া রায় ভাঙ্গিল সকল দায়
সুতপাঠে কৈল নিয়োজিত।
তাঁর সুত রঘুনাথ রাজগুণে অবদাত
গুরু করা্যা করিল পূজিত॥"

ইহার পর অনেক দিন অতীত হইয়াছে। বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথ রায় সিংহাসনে বসিয়াছেন। কবি সপরিবারে বেশ আনন্দেই কাল কাটাইতেছেন। স্বপ্নাদেশের কথা তিনি একরকম প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতা রামানন্দ প্রায়ই স্বপ্নের কথা দাদাকে স্মরণ করাইয়া দেন। কিন্তু কবি দেবীর সংগীতরচনায় বিশেষ উৎসাহ দেখান না। এই সময় কবির এক পুত্রের মৃত্যু হইল। কবি মনে করিলেন দেবীর স্বপ্নাদেশ পালন না করিবার জন্যই তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। অতঃপর কবি কাব্য রচনা করিতে বসিলেন কাব্য শেষ হইল এবং উহা সভায় গাওয়া হইল। রাজা কবিকে ও গায়েনদের পুরস্কৃত করিলেন। কবি পাইলেন কানের কুণ্ডল, হাতের কেয়ূর, গলার মালা, রত্নের অঙ্গুরীয়। তাছাড়া, কবি

মাথার পাগড়ি পরিবার বসন ও উত্তরীয় ও চড়িবার জন্য ঘোড়াও উপহার পাইয়াছিলেন আর গায়েনকে দেওয়া হইল অলংকার।

অনুশীলনী

১। মুকুন্দরাম কে ছিলেন? তাঁহার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। মুকুন্দরাম তাঁহার আত্মকাহিনীতে নিজের গ্রাম ও তাঁহার পূর্বপুরুষের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা বিবৃত কর।

৩। মুকুন্দরাম কেন স্বগ্রাম ত্যাগ করিলেন? তিনি কোথায় কিভাবে আশ্রয় পাইলেন?

৪। মুকুন্দরামের স্বগ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র যাত্রার পথের বিবরণ দাও।

৫। বাঁকুড়া রায় এবং রঘুনাথ রায় কে ছিলেন? তাঁহাদের সহিত মুকুন্দরামের সম্পর্কের বিবরণ দাও।

৬। মুকুন্দরামের দেশ ছাড়িবার সময়ে তথাকার অরাজক পরিস্থিতি বর্ণনা কর।

৭। চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিবার পূর্বে মুকুন্দরামকে যে সকল প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল তাহার বিবরণ লিখ।

৮। চণ্ডীর মাহাত্ম্যাখ্যাপনের আদেশ মুকুন্দরাম কোথায় কি অবস্থায় পাইলেন? কবি তাহার পর কি করিলেন?

১২। কালকেতুর উপাখ্যান

মর্ত্যলোকে চণ্ডীর পূজার প্রচার দরকার। কিন্তু তাঁহার পূজা কিভাবে জগতে প্রবর্তন করা যায় ইহাই হইল সমস্যা। এই কাজের উপযুক্ত ব্যক্তি হইতেছেন দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র নীলাম্বর। তাঁহাকে মর্ত্যলোকে পাঠান আবশ্যক। স্বর্গের দেবতা বিনা অপরাধে কেন মানুষ হইবেন! সুতরাং তাঁহার কোনও অপরাধ পাইলে মানুষ করিয়া তাহাকে পৃথিবীতে পাঠান চলে। অপরাধ না থাকিলেও অপরাধ সৃষ্টি করিতে পারা যায়। নীলাম্বর শিব ভক্ত। প্রত্যহ তিনি নানা পুষ্প দিয়া শিবপূজা করেন। একদিন স্বর্গের দেবতাদের উদ্যানে ফুল না পাইয়া তিনি পৃথিবীতে আসিলেন পুষ্প সংগ্রহের জন্য। তিনি যে ফুল তুলিলেন তাহার মধ্যে চণ্ডিকা কীট হইয়া প্রবেশ করিলেন।

নীলাম্বর সেই কীটযুক্ত পুষ্প যখন শিবের মাথায় দিলেন তখন শিব কীটের দংশনে অস্থির হইয়া পড়িলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া নীলাম্বরকে ব্যাধরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবার অভিশাপ দিলেন। নীলাম্বর পৃথিবীতে ধর্মকেতু নামক ব্যাধের ঘরে কালকেতু নামক ব্যাধ হইয়া জন্ম নিলেন। নীলাম্বরপত্নী ছায়াদেবীও পতির সঙ্গে মর্ত্যলোকে ব্যাধিনী হইয়া জন্ম নিলেন। তাঁহার নাম হইল ফুল্লরা। ফুল্লরা সঞ্জয়কেতু নামক ব্যাধের কন্যা। কালকেতু দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ব্যাধপুত্র তিনবৎসর বয়স হইতেই অত্যন্ত নির্ভীক--তাহার খেলার সামগ্রী পুতুল নয়—ধুলা মাটি নয় -জীবন্ত ভল্লুক আর শরভ। কালকেতুর চেহারা বড় সুন্দর। উহা দেখিলে সকলেরই আনন্দ হয়। তাহার নাক মুখ চোখ কান এত সুন্দর যে দেখিলে মনে হয় কেহ যেন কুঁদে ফেলিয়া উহাদিগকে গড়িয়াছে। তাহার হাত দুইখানি লোহার শাবলের মতো শক্ত এবং কালো, মাথার চুল মেঘের মতো শ্যামবর্ণ, জালের কাঠির মালা তাহার গলায়, দুইহাতে দুই জোড়া লোহার শিকল পরা, গায়ে সে রাঙা ধুলো মাখে। এই ছেলেটি—

"রাঙ্গা ধূলা মাখি গায় পবন গমনে জায়।
শিশু মধ্যে যেমন মণ্ডল॥"—মুকুন্দরাম

তাহার ভয়ে সাথীরা কাছে কেহ ঘেঁসিতে পারে না, কেননা যাহার সহিত সে খেলা করে তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরে—সাথীর জীবন সঙ্কট উপস্থিত হয়। শুভদিনে কালকেতুর পিতা ধর্মকেতু পুত্রের হাতে ধনুক দিলেন। সে ধীরে ধীরে লক্ষ্যভেদ ও বর্শা চালনা শিখিল। কালকেতু ইচ্ছামত কোন কোন দিন পিতার সঙ্গে শিকার করিতে যায়। অনেক সময় ধনুক ফেলিয়া দিয়া সে দ্রুতবেগে দৌড়াইয়া হাত দিয়া হরিণ ধরে। পুত্রের একাদশ বর্ষে ধর্মকেতু কালকেতুর বিবাহের উদ্যোগ করিলেন। সাতপুরুষের কুলপুরোহিত সোমাই ওঝা বিবাহের কন্যা বাছিয়া বাহির করিলেন- কন্যা ফুল্লরা সঞ্জয়কেতু নামক ব্যাধের তনয়া। ফুল্লরার নানা গুণ—

"বলে ব্যাধ এই কন্যা নামেতে ফুল্লরা।
কিনিতে বেচিতে ভাল জানয়ে পশরা॥
রন্ধন করিতে ভাল যেই কন্যা জানে।
বন্ধু মিলি রূপ গুণ ইহার বাখানে॥" মুকুন্দরাম

এই কন্যা কালকেতুর সম্পূর্ণ যোগ্য। কালকেতু হইতেছেন –

"ধর্মকেতু সুত সেই সুকেতুর নাতি।
অর্জুন শমান ধনুক খেয়াতি॥
হৃদে পরিতোস পাবে দেখি সেই বরে।
নিত্য মৃগবধ করে অন্ন আছে ঘরে॥
শেই ত বরের যোগ্য তোমার দুহিতা।
দুঁহে শাম রূপগুণ শুজীলা বিধাতা॥" মুকুন্দরাম

সুতরাং কালকেতুর ফুল্লরার সহিত বিবাহ হইল। এখন কালকেতু রীতিমত সংসারী। তাঁহার মাতা নিদয়া বধূ ফুল্লরার গৃহকর্ম দেখিয়া অত্যন্ত সুখী। কালকেতু খাটিয়া খাইবার লোক। দিনে মাংস ছাল প্রভৃতি বেচিয়া যাহা রোজগার করেন তাহা দ্বারা দিনের প্রয়োজন মিটিয়া যায়- সঞ্চয় কিছুই থাকে না। তবু ছেলের নিত্য মৃগয়া দেখিয়া মায়ের মনে সুখের সঞ্চার হয়—ছেলে সংসার চালাইতে পারিবে। পশুমাংস ও পশুর ছাল, লোম দাঁত প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া তাঁহাদের দিন চলে। বৃদ্ধ ধর্মকেতু পুত্র কালকেতুর হাতে সংসারের ভার দিয়া সস্ত্রীক কাশীবাস করিতে চলিলেন। কালকেতু তাঁহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন সকালে উঠিয়া তিনি শিকারে বাহির হন যে কোন পশু সম্মুখে পান তাহাকেই আক্রমণ করেন। বনের সকল পশু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

দিন শেষে গৃহে ফিরিয়া কালকেতু বীরের মতো ভোজন করেন। তিনি ঘাড়ের দিকে গোঁফজোড়া একত্র করিয়া বাঁধিয়া আহারে বসেন—

"সাঁজুড়িয়া(১) দুটা গোঁফ বান্ধে লৈয়া ঘাড়ে।
একশ্বাসে সাত হাড়া আমানী(২) উজারে।"—মুকুন্দরাম

(১) সাঁজুড়িয়া—একত্র করিয়া। (২) আমানী—পান্তা ভাতের জল।

পশুগণের উপর কালকেতুর অত্যাচারের মাত্রা যখন শেষ সীমায় পৌঁছিল তখন

তাহারা দেবীর কাছে কালকেতুর নামে অভিযোগ করিল। দেবী চণ্ডিকা তাহাদিগকে অভয় দিলেন।

কালকেতু ব্যাধ। তাঁহার বৃত্তি মৃগয়া। তিনি পশুমারণ ছাড়িতে পারেন না। কি করিলে তাঁহার ব্যাধের বৃত্তি দূর হয় আর চণ্ডিকার পূজারও প্রচার হয় তাহার উপায় মহামায়া চিন্তা করিয়া সুবর্ণ গোধিকার রূপ ধারণ করিয়া কালকেতুর শিকারে যাইবার পথে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ভোর বেলায় কালকেতু বাহির হইয়াছেন। যাত্রাকালে চারিদিকে মঙ্গলসূচক লক্ষণসমূহ দেখিয়া তাঁহার মনে আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু পরমুহূর্তেই তাঁহার সে আনন্দ আর রহিল না। তিনি সম্মুখে সুবর্ণ গোধিকা দেখিলেন। ইহা অযাত্রা সূচনা করে। ইহাকে মারিলেও কোন লাভ নাই—ভোরের বেলা ইহাকে ছোঁয়া যায় না। শিকারে যদি হরিণ পাওয়া যায় তবে কালকেতু এই অমঙ্গল গোধিকাকে দেবতা বলিয়া মনে করিবেন। আর যদি তাহা না হয় তবে ইহাকে আগুনে পোড়াইয়া খাইবেন। বহু চেষ্টা করিয়াও সেই দিন তিনি কোন শিকার পাইলেন না।

কালকেতুর বড় চিন্তা হইল,—খালি হাতে কি করিয়া তিনি ফুল্লরার সম্মুখে উপস্থিত হইবেন। ইহা ছাড়া দোকানের এবং শ্বশুর বাড়ির ধার আছে। আবার ধার করিয়া একদিনও সংসার চালাইবার উপায় নাই- ব্যাধদের পাড়ায়—কাহারও কাছে ধার পাওয়া যায় না। সেখানে সকলেই গরিব। কালকেতু ভাবিলেন পৃথিবীর বাহিরে কোথাও স্বর্গ নরক নাই। উহারা এইখানেই আছে। সৌভাগ্য থাকিলে লোকে স্বর্গে থাকে· দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত মানুষ পৃথিবীতেই নরকযন্ত্রণা ভোগ করে।

মনের খেদে কালকেতু অগত্যা সেই গোধিকাকে ধনুকের ছিলায় বাঁধিয়া লইয়া ঘরে ফিরিলেন। কালকেতুকে কোন পশু না লইয়া আসিতে দেখিয়া ফুল্লরার মাথায় যেন বাজ পড়িল। স্বামীস্ত্রীতে ঠিক হইল ফুল্লরার সই বিমলার মা'র নিকট হইতে দুই কাঠা ক্ষুদ ধার চাহিবেন এবং গোধিকা দিয়া শিক-কাবাব তৈয়ার করিবেন। আর কালকেতু বাসি মাংসের পসরা লইয়া বাহিরে যাইবেন। ঘরে কেহই রহিলেন না-- এক সুবর্ণ গোধিকা ছাড়া। এই অবসরে গোধিকারূপিণী চণ্ডিকা আপন অপরূপ মূর্তি ধারণ করিলেন। তাঁহার রূপে ব্যাধের কুটির আলো করিয়া তিনি বসিলেন। ঘরে ফিরিবার পর, এই মনোহরমূর্তি নারীকে দেখিয়া ফুল্লরার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তিনি ইঁহার পরিচয় ও আগমন কারণ জানিতে চাহিলেন। চণ্ডী কৌশলে আপান পরিচয় দিলেন। স্বামীর দ্বিতীয়বার বিবাহে সতীনের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি ঘর ছাড়িয়াছেন। অন্যায়ভাবে সতীনের ঘরে বিবাহ দেওয়ার জন্য পিতামাতার সহিত তিনি কোন সম্বন্ধ রাখেন না। এই কুটির ছাড়া তাঁহার কোন আশ্রয় নাই। এইখানে থাকিয়া তিনি বীর কালকেতুর মঙ্গল সাধন করিবেন বলিলেন। ফুল্লরা অপরিচিতা নারীর নিজগৃহ বাসের সংকল্প জানিয়া তাঁহাকে নানাভাবে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। প্রথমতঃ গৃহস্থ বধূর একাকিনী গৃহত্যাগ অত্যন্ত নিন্দনীয় ব্যাপার—তাহার উপর তীব্র দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত ব্যাধের গৃহ কেন বাসোপযোগী সুখকর স্থান নহে। দুঃখকষ্টের সংসারে তবু পতির প্রেমপ্রীতি ছিল। কিন্তু ইহার মধ্যে আর একজন আসিয়া দাঁড়াইবে একথা ফুল্লরা কিছুতেই সহ্য

করিতে পারিতেছিলেন না—তাই বার বার ছদ্মবেশিনী চণ্ডিকাকে তিনি নিবৃত্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহার বারমাসের দুঃখের জীবন্ত চিত্র তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। তাঁহার তালপাতার ছাউনীতে কুঁড়ে ঘর—তাহাতে ভেরেণ্ডার খাম, সচ্ছলতার সময়েও তাহার ভাগ্যে কষ্ট ছাড়া আর কিছুই মিলে নাই। কিন্তু চণ্ডিকা তাহার কথা শুনিলেন না। তিনি বলেন ফুল্লরার স্বামী দেবীকে 'নিজগুণে' বাঁধিয়া আনিয়াছেন—তিনি অন্য কোথাও যাইবেন না। অবশেষে কালকেতু ফিরিয়া আসিয়া এই অপূর্ব লাবণ্যময়ী নারীকে দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন। তিনিও দেবীকে নানাভাবে পরগৃহ ছাড়িতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু দেবী নিরুত্তর। ব্যাধের ঘর যখন তিনি ছাড়িতে চাহেন না কালকেতু তখন নিরুপায়। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া দেবীর প্রতি—"শরাসনে আকর্ণপূরিত কৈলাবাণ। হাথে শর রহে কালু চিত্রনিরমান॥" কিন্তু তাঁহার হাতের বাণ হাতেই রহিল—হাত নিশ্চল—বাণও নিশ্চল। তাহার শরীরে রোমাঞ্চ চক্ষে আনন্দের অশ্রু। সম্মুখে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখেন করুণাময়ী মাতা তাঁহাকে বর দিতেছেন—"লহ বর কালকেতু ত্যজ ধনুশর।" তিনি তাঁহাকে সাতরাজার ধন ও একটি মাণিক্যের অঙ্গুরীয় দিলেন। দেবী কালকেতুকে ইহা ভাঙ্গাইয়া সেই অর্থে ঐ অঞ্চলের বন কাটাইয়া রাজ্য বসাইয়া পুত্রের মতো প্রজা প্রতিপালন করিতে বলিলেন। কালকেতুর কিছুতেই বিশ্বাস হয় না যে দেবী তাঁহার সামনে উপস্থিত হইয়াছেন। কারণ তিনি মনে করেন তাঁহার তো কোন পুণ্য নাই—আর তিনি নীচ জাতি ব্যাধ। সুতরাং দেবীকে দশভূজা সিংহবাহিনী মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিতে হইল।

কালকেতু আর ফুল্লরার আনন্দ ধরে না। সাত ঘড়া ধন আর অঙ্গুরীয় তাঁহারা ঘরে তুলিলেন। কালকেতু দেবীর আদেশমত নগর নির্মাণ করিয়া নানা শ্রেণীর লোক সেখানে বসাইলেন। তিনি সেই নগরের নাম রাখিলেন গুজরাট নগর। ধনে জনে ও নানা সমৃদ্ধিতে সেই নগর পূর্ণ হইল। কালকেতু রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার মন্ত্রিত্ব পদ লাভের আশায় ভাঁড়ুদত্ত নামক এক ব্যক্তি অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িল। লোকটি গুজরাটের নিকটে বাস করে। নিজের অর্থসম্পদ কিছুই নাই—একমাত্র সম্বল প্রবঞ্চনা। প্রবঞ্চনায় সকল দিন পেট ভরে না—অনেক দিন সপরিবারে উপবাসী থাকিতে হয়। কালকেতু এরূপ প্রবঞ্চককে মন্ত্রিপদ দিলেন না। তখন ভাঁড়ুদত্ত তাঁহাকে গালাগালি দিতে লাগিল। তাঁহার লোকেরা ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া ভাঁড়ুকে প্রহার করিল। তখন ভাঁড়ু কালকেতুর উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। গুজরাটের নিকট কলিঙ্গরাজ্য। ভাঁড়ু সেখানকার রাজাকে কালকেতুর বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা কথা বলিয়া উত্তেজিত করিল। কলিঙ্গরাজ গুজরাট রাজ্য আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে কালকেতু পরাজিত হইয়া কলিঙ্গরাজের কারাগারে বন্দী হইলেন। চণ্ডিকা উক্ত রাজাকে স্বপ্নে আদেশ দিলেন দেবীর ভক্ত কালকেতুকে যেন তিনি মুক্তি প্রদান করেন। কালকেতু মুক্তিলাভ করিলেন। কলিঙ্গ রাজ্যের সহায়তায় কালকেতু গুজরাট রাজ্যের সিংহাসনে পুনরায় অধিষ্ঠিত হইলেন। এবার তাঁহার রাজপদ সুদৃঢ় হইল। রাজার রাজ্যাভিষেকে গুজরাট নগরে আনন্দের মহোৎসব চলিল। এখন ভাঁড়ুদত্ত রাজা কালকেতুকে কপট অভিনন্দন জানাইতে আসিল। সে কালকেতুর বন্দী অবস্থায় তাঁহার জন্য সস্ত্রীক কতই না কাঁদিয়াছে! এখন তিনি সিংহাসনে

নিশ্চিন্ত মনে বসিতে পারেন—কেননা ভাড়ু দত্তই রাজকার্যের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে। ভাড়ুর বিশ্বাসঘাতকতা আর কপটতা সকলই কালকেতুর জানা ছিল। এখন তার পাপ পূর্ণ হইয়াছে—শাস্তি হওয়া দরকার। তাহার মুখে চূণকালি দিয়া মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া নগর হইতে কালকেতু তাহাকে বাহির করিয়া দিলেন। তাহার পরিবার-পরিজনের দুঃখ দেখিয়া কালকেতুর হৃদয় নরম হইল। তাহারা তাহাদের বাড়িঘর ফিরিয়া পাইল। কালক্রমে শাপের অবসানে নীলাম্বর ও ছায়া ব্যাধ ব্যাধিনীর দেহ ছাড়িয়া দেবলোকে চলিয়া গেলেন।

১৩। ধনপতির উপাখ্যান

উজানি নগরে সাধু (বণিক) ধনপতি দত্ত বাস করেন। বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী এই ধনপতি। তাঁহার নবীন বয়স এবং তিনি অত্যন্ত সৌখীন লোক। সেকালে পায়রা উড়াইবার খেলা যুবকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। যে পায়রাগুলিকে উড়ান হইত তাহাদের মধ্যে কোনটি সর্বপ্রথম ফিরিয়া আসে তাহা লক্ষ্য করা হইত। একদিন জনার্দন ওঝার সহিত ধনপতি পায়রা লইয়া খেলিতেছিলেন। ধনপতির পায়রা আকাশপথে নিছানি নগরের দিকে উড়িয়া চলিল। (ধনপতি) তিনিও পায়রার পিছনে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিলেন। নিছানি নগরে বণিক্ লক্ষপতির বাস। তাঁহার কন্যার নাম খুল্লনা। তিনি শাপভ্রষ্টা স্বর্গের অপ্সরা রত্নমালা। চণ্ডীর পূজা মর্ত্যলোকে প্রচার করা তাঁহার কার্য। খুল্লনা সখীদের সঙ্গে খেলিতেছিলেন, এমন সময়ে ধনপতির পায়রা তাঁহার শাড়ির আঁচলে পড়িল। তিনি পায়রাটিকে আঁচলে ঢাকিয়া বাড়ির দিকে ছুটিলেন। কিন্তু ধনপতি ইতিমধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন। তিনি খুল্লনার নিকট পায়রা চাহিলেন। এ পায়রাটি যেমন তেমন পায়রা নয়—

"অমূল্য পায়রা মোর জানে সর্বজনে।
লুকায়ে রাখিলে তাহা ঝাঁপিয়া বসনে॥"

খুল্লনা ধনপতির পরিচয় জানিলেন; তিনি তাহার জেঠতুত ভগিনী লহনার স্বামী। ধনপতির সহিত এই সম্পর্ক জানিবার পর খুল্লনা কিছুতেই সওদাগরকে পায়রা ফিরাইয়া দিলেন না। পায়রা ফিরাইয়া না দিলে ধনপতি খুল্লনার নামে রাজদরবারে নালিশ করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন। কার কথা কে শোনে! তখন সাধু বুঝিলেন—

"পরিহাসে ধনপতি বুঝে কার্যগতি।
এ কন্যার পিতা বুঝি সাধু লক্ষপতি॥"

ধনপতিকে আর রাজার কাছে যাইতে হইল না। সাধু রাজদরবারে নালিশের পরিবর্তে লক্ষপতির নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়া ঘটক পাঠাইলেন। খুল্লনার মা দোজবরে কন্যা সম্প্রদান করিতে আপত্তি করিলেন। কিন্তু মায়ের কথা পিতা শুনিলেন না। এদিকে ধনপতির নিজের ঘরেও গোলমাল উপস্থিত হইল। তাহার প্রথমা পত্নী লহনার দিক হইতেও এই বিবাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আসিল। সওদাগর তাঁহার পত্নীকে সন্তুষ্ট করিয়া বিবাহের সম্মতি পাইলেন।

খুল্লনাকে বিবাহ করিয়া ধনপতি স্বগ্রামে ফিরিলেন। সাধু স্বদেশের রাজা বিক্রম-

কেশরীকে দর্শন করিতে গেলেন। কিন্তু সুবর্ণ পিঞ্জর আনিবার জন্য তাঁহাকে গৌড় রাজ-সভায় যাইতে হইল। সাধু সেখানকার আমোদ প্রমোদে মত্ত হইয়া নিজের ঘরের কথা ভুলিয়া সেখানেই রহিলেন। নবপরিণীতা পত্নী খুল্লনার রক্ষণাবেক্ষণের ভার পড়িল লহনার উপর। খুল্লনা লহনার সুমধুর ব্যবহারে সপত্নীকে সপত্নী বলিয়া বুঝিলেন না। নানা-ভাবে জ্যেষ্ঠা সপত্নী কনিষ্ঠা সপত্নীকে আদর যত্ন করিতে লাগিলেন—

অন্ন খায় লজ্জা করি যদি বা খুল্লনা নারী
লহনা মাথার দেয় কিরা।
দু সতীনে প্রেমবন্ধ দেখিয়া লাগয়ে ধন্ধ
সুবর্ণে জড়িত যেন হীরা॥"—মুকুন্দরাম

তাঁহারা খাইতে শুইতে উঠিতে বসিতে সকল কাজে এক সঙ্গে থাকেন। কিন্তু এ-সুখ খুল্লনার ভাগ্যে বেশি দিন স্থায়ী হইল না। লহনা সরলা। কিন্তু তিনি দুর্বলা নামক দাসীদ্বারা চালিত হইলেন। সে তাঁহাকে কুবুদ্ধি দিয়া এই সুখের নীড়কে ভাঙিগয়া দিল—

"ঋজুমতি ঠাকুরাণী নাহি জান পাপ।
দুগ্ধ দিয়া কি কারণে পোষ কালসাপ॥
সাপিনী বাঘিনী সতা পোষ নাহি মানে।
অবশেষে এই তোমায় বধিবে পরাণে॥"—মুকুন্দরাম

দুর্বলা এই কথা শুনাইয়া লহনার নিকট পুরস্কার পাইল। ইহাতে সে খুল্লনার আরো ক্ষতি সাধন করিতে উৎসাহিত হইল। সে লীলাবতী নামে একজন দুষ্টা নারীর সাহায্যে ধনপতি সওদাগরের নাম দিয়া লহনার প্রতি এক জাল চিঠি লেখাইয়া লইয়া তাঁহার হাতে দিল। এই চিঠিতে লেখা ছিল—'খুল্লনার সকল অলঙ্কার কাড়িয়া লইবে, তাহাকে দিয়া ছাগল চরাইবে, তাহার খাদ্যের পরিমাণ হইবে আধসের, সে 'খুঞা' কাপড় পরিবে আর ঢেঁকিশালে রাত্রিতে শুইয়া থাকিবে।' খুল্লনা স্বামীর হস্তাক্ষর চিনিতেন। তিনি বলিলেন এরূপ চিঠি লিখিয়া কেহ তাঁহার সহিত তামাশা করিয়াছে—ইহা কখনই ধনপতি সওদাগর লিখিতে পারেন না। খুল্লনার প্রতি সওদাগর বিনাদোষে এমন অবিচার করিতে পারেন ইহা তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। দুই সতীনে তুমুল ঝগড়া বাঁধিয়া গেল। অবশেষে দুইজনে হাতাহাতি চলিল। লহনা খুল্লনার সব কাপড় গয়না কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে ছাগল চরাইতে দিলেন। খুল্লনা সারাদিন ছাগল চরান, সন্ধ্যায় ঘরে ফিরেন, আহার করেন ক্ষুদের জাউ কলমি শাক দিয়া, তাহাতে লবণ থাকে না। একদিন বনে ছাগল চরাইতে গিয়া খুল্লনা ঘুমাইয়া পড়িলেন। তিনি ঘুম হইতে উঠিয়া দেখেন ছাগল নাই। অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া তিনি ছাগল খুঁজিতে গিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের কন্যার দেখা পাইলেন। খুল্লনার পরিচয়ে ইন্দ্রকন্যা তাঁহার সপত্নীহস্তে সকল লাঞ্ছনা আর দুঃখের কাহিনী শুনিলেন। ছাগল হারাইলে লহনার হাতে খুল্লনার আর রক্ষা থাকিবে না। সেইদিন ইন্দ্রের তনয়া ও তাহার ভগিনীগণ ঐ বনে চণ্ডীর পূজা করিতে ধরাতলে আসিয়াছেন। তাঁহারা বলিলেন, চণ্ডিকার পূজায় খুল্লনার সকল দুঃখ দূর হইবে। খুল্লনা দেবীর পূজা করিলেন। চণ্ডিকা দেবী তাঁহাকে দর্শন দিলেন ও বরদান করিলেন। রাত্রিতে দেবী স্বপ্নে লহনাকে সপত্নীর

উপর তাহার কৃত অন্যায়ের জন্য ভর্ৎসনা করিলেন। চণ্ডীর কৃপায় লহনা ও খুল্লনার মিলন হইল।

এদিকে ধনপতি সেই যে গৌড়নগরে গিয়াছেন তাঁহার আর ঘরে ফিরিবার নাম নাই। সেখানে নানা অনুচিত বিলাস ব্যসনে তিনি লিপ্ত। তিনি রাত্রিতে দুই পত্নীকে স্বপ্নে দেখিলেন। নানাভাবে ইঁহারা তাঁহার দোষের উল্লেখ করিয়া অনুযোগ করিতেছেন। দেবী চণ্ডিকা ও পদ্মাবতী দুইজনে মিলিয়া লহনা খুল্লনার বেশে সদাগরকে এই স্বপ্ন দেখাইলেন। রাত্রিশেষে ধনপতি এই স্বপ্ন দেখিয়া অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত হইয়া দেশে ফিরিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু গৌড়রাজ তাঁহাকে ছাড়িতে চাহেন না, কিন্তু সাধু তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। একলক্ষ টাকা বানী দিয়া তিনি সেই সোনার খাঁচা লইলেন। তিনি গৌড়ের রাজার নিকট হইতে প্রচুর ধনরত্ন উপহার পাইলেন।

তিনি প্রথমে স্বদেশের রাজা বিক্রমকেশরীকে পিঞ্জরটি দিলেন। কিন্তু রাজার শুক সারী পাখি দুইটি সওদাগর আসিবার পূর্বেই উড়িয়া গিয়াছে। যাহাই হউক রাজা তাঁহাকে পুরস্কৃত করিলেন। ধনপতি উজানিতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তিনি সেদিন আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধব লইয়া একত্র ভোজনের ব্যবস্থা করিলেন। রন্ধনের ভার পড়িল খুল্লনার উপর। ইহা লহনার ভাল লাগিল না। খুল্লনা গঙ্গাস্নানপূর্বক চণ্ডিকার পূজা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বরলাভ করিলেন—"শিরে হাত দিয়া চণ্ডী করিল আশ্বাস। উজানি মোহিতে তোর রন্ধনের বাস॥" ধনপতি জ্ঞাতি বন্ধুদের লইয়া পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ভাত পরম তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলেন। খুল্লনা ধনপতির নিকট সপত্নীর অমানুষিক অত্যাচারের কথা বলিলেন। লহনাও স্বামীর নিকট তাঁহার সম্বন্ধে নানারকম নিন্দা করিতে লাগিলেন। নানা উপদেশ দিয়া সওদাগর দুই স্ত্রীর ঝগড়া মিটাইলেন। ইহার পর ধনপতির পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপস্থিত। খুব ঘটা করিয়া শ্রাদ্ধ হইল; বহু নিমন্ত্রিত জ্ঞাতি কুটুম্ব উপস্থিত হইলেন। কে আগে সামাজিক সম্মান পাইবেন—ইহা লইয়া জ্ঞাতিগণ দুইদলে বিভক্ত হইলেন। যাঁহারা সম্মান লাভের অগ্রাধিকার পাইলেন না তাঁহারা ধনপতির উপর খুব চটিয়া গেলেন। প্রচুর টাকা থাকিলে রাজদ্বারে অপরাধী অর্থদণ্ড দিয়া মুক্তি পায়; যম প্রাণ লইয়া লোককে ছাড়ে আর জ্ঞাতিরা লোকের জাতি নাশ করে। তাঁহারা বলিলেন—

> "শ্রীরাম হইতে কিবা বড় ধনপতি। বনে ছাগ লয়ে যার ভ্রমিল যুবতী॥
> সদা ভ্রমে সেই বনে শতেক মাতাল। সেই বনে তার জায়া ছাগল রাখাল॥
> দোষগুণ তার না করিল বিচারণ। খুল্লনা রাঁধিলে দেখি কে করে ভোজন॥"

খুল্লনার অপরাধের জন্য তাঁহাকে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হইবে নতুবা ধনপতির জ্ঞাতি-গণকে লক্ষ টাকা সামাজিক দণ্ড দিতে হইবে। ইহার অন্যথায় জ্ঞাতিরা কেহই খুল্লনার হাতের অন্ন খাইবেন না। ধনপতি লহনাকে তিরস্কার করিলেন; তাঁহার দোষেই খুল্লনাকে লোকে দোষী করিতেছে। লহনাই খুল্লনাকে ছাগল চরাইতে বনে পাঠাইয়া যত অনর্থ ডাকিয়া আনিয়াছেন। ধনপতি বলিলেন খুল্লনার সতীত্বের পরীক্ষায় কাজ নাই লক্ষ টাকা যায় যাক।

খুল্লনা বলিলেন একবার টাকা পাইলে জ্ঞাতিরা এইরূপ টাকা প্রতিবছর আদায় করিবে। সুতরাং পরীক্ষা দেওয়াই ভাল। তপ্ত লৌহশলাকার পরীক্ষা, মন্ত্র পরীক্ষা, সর্প পরীক্ষা, জতুগৃহের পরীক্ষা প্রভৃতিতে খুল্লনা বণিক ব্রাহ্মণ, সর্বজনসমক্ষে বিজয়িনী হইলেন। ইহার পর খুল্লনা রন্ধন করিয়া জ্ঞাতিগণকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করাইলেন। তাঁহারা স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন। তারপর একদিন ধনপতি নানা উপহার লইয়া রাজদর্শনে গেলেন। রাজার ভাণ্ডারে শঙ্খচন্দনাদি দ্রব্য ফুরাইয়াছে—উহা আনা দরকার। সুদূর সিংহলে না গেলে উহা পাইবার উপায় নাই। ধনপতির অনুপস্থিতিতে গৃহে দুই সতীনের মধ্যে গোলমাল হইতে পারে আর যানবাহনের অসুবিধা। সমুদ্র পার হইয়া দীর্ঘদিনের জন্য রাখিতে হইবে। তাহাকে ভাল লেখাপড়া শিখাইতে হইবে। বার বছরের মধ্যে দেশে না ফেলিতে পারিলেন না। সিংহল যাত্রার জন্য ধনপতি প্রস্তুত হইলেন।

খুল্লনা পূর্ব হইতেই আশঙ্কা করিলেন সওদাগরের দেশে ফিরিতে বহুকাল হয়তো দেরী হইবে। পুত্র শ্রীমন্ত তখন ছয়মাস মাতৃগর্ভে। ধনপতি খুল্লনার নিকট জয়পত্র লিখিয়া রাখিয়া গেলেন। যদি পুত্র জন্মগ্রহণ করে তবে তাহার নাম শ্রীপতি (শ্রীমন্ত) রাখিতে হইবে। তাহাকে ভাল লেখাপড়া শিখাইতে হইবে। বার বছরের মধ্যে দেশে না ফিরিলে পুত্র পিতার খোঁজে যেন দক্ষিণ দেশে যায়।

"দ্বাদশ বৎসর যদি না হয় আগমন। আমার উদ্দেশে যাবে দক্ষিণ পাটন॥
তিন নিদর্শন দিল বেণিয়ার বালা। মাণিকা অঙ্গুরী আর গায়ের আঁচলা॥"

কিন্তু বাণিজ্য যাত্রার শুভদিন পাওয়া গেল না। যেদিন ধনপতি বাণিজ্যযাত্রা করিতে চাহেন উহা জ্যোতিষশাস্ত্রানুসারে অত্যন্ত খারাপ। ইহাতে অনেক কষ্ট পাইতে হইবে। এমন কি ধনপতির জীবনসংশয় হইতে পারে। যাত্রাকারী নিঃসংশয়ে কারাগারে বন্দী হইবেন। ধনপতি ইহা শুনিয়া ধাক্কা দিয়া দৈবজ্ঞকে বাড়ি হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

"সাধু করে যাত্রা দিন না করে বিচার। খুল্লনার দশ দিক হৈল অন্ধকার॥"

খুল্লনা স্বামীর মঙ্গলকামনায় চণ্ডীর পূজা আরম্ভ করিলেন। ধনপতি সওদাগর শিবভক্ত—তাঁহার প্রথমা পত্নী লহনাদেবী চণ্ডিকাকে 'ডাকিনী দেবতা' বলিয়া মনে করেন। সুতরাং সওদাগর দেবীর পূজার ঘটে লাথি মারিয়া উহার মঙ্গলজল পায়ে ঠেলিলেন। দেবী ধনপতির প্রতি ভীষণ ক্রুদ্ধ হইলেন এবং এই অন্যায়ের জন্য তাঁহাকে সমুচিত শিক্ষা দিতে উদ্যত হইলেন। বাণিজ্যে বিনিময়ের দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করিয়া উহাদ্বারা সমুদ্রগামী ডিঙ্গাগুলি বোঝাই করা হইল। নানা গ্রাম তীর্থ অতিক্রম করিয়া উহারা চলিল। পথে নানা জিনিসপত্রের ক্রয়-বিক্রয় চলিল। দেবী চণ্ডিকা ধনপতির উপর রাগিয়া আছেন—তিনি এখন তাঁহাকে সমুচিত শিক্ষা দিলেন। মগরাদহে প্রবল ঝড়বৃষ্টি শিলাপাত চলিল। তাঁহার ছয়টি বাণিজ্যতরী ডুবিয়া গেল। একমাত্র মধুকর ডিঙ্গা লইয়া সাধু উত্তাল সমুদ্র পার হইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে ধনপতি কালীদহে উপস্থিত হইলেন। দেবীর ছলনায় তিনি সেখানে যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁর বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

অপরূপ হের আর দেখ ভাই কর্ণধার
কামিনী-কমলে অবতার।
ধরি বামা বাম করে উগরয়ে করিবরে
পুনরপি করয়ে সংহার॥"

সমুদ্রের অথৈ জলে পদ্মের উপর অপরূপ নারীমূর্তি কিরূপে দাঁড়াইয়া বাঁ হাত দিয়া একটি হাতিকে একবার গিলিতেছে আরবার তাহাকে বাহির করিয়া ফেলিতেছে। এই নারীর স্বভাব বুঝা ভার। সাধু এই অতি আশ্চর্য ঘটনার বিবরণ লিখিয়া রাখিলেন এবং হালের মাঝিকে ইহার সাক্ষী করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা এই বিচিত্র ঘটনা তিনি সিংহল-রাজকে জানাইবেন। যথা সময়ে সিংহলরাজ্যে রত্নমালার ঘাটে সাধুর তরণী ভিড়িল। ধনপতি সিংহলরাজের দরবারে উপস্থিত হইয়া তাঁহার আগমন পথের বিবরণ দিলেন। কিন্তু 'কমলে-কামিনী'র কথা রাজা বিশ্বাস করিলেন না। সাধুকে রাজা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইলেন যদি 'কমলে-কামিনী' না দেখাইতে পারেন তবে তাঁহার দ্বাদশবৎসর কারাবাস হইবে। ধনপতির কথা শুনিয়া সিংহলরাজ শালিবান তাঁহার পাঁচজন অমাত্যের সহিত কালীদহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কমলে-কামিনী দেখা দূরে থাকুক সাধুর তরীর কর্ণ-ধারও মহামায়ার মায়ায় বিমোহিত হইয়া রাজার কাছে সেখানকার অলৌকিক ঘটনার বিষয়ে কিছু বলিতে পারিল না। ধনপতি সওদাগর সিংহলেশ্বরের নিকট মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন। মিথ্যা সংবাদ জানাইবার অপরাধে সাধুকে কারাগারে বন্দী করিয়া অশেষ যন্ত্রণায় জর্জরিত করা হইল। কারাগারে ধনপতি অনাহারে অনিদ্রায় জীর্ণ শীর্ণ হইলেন, তাঁহার দেহের বিবর্ণতা উপস্থিত হইল।

এদিকে উজানি নগরে খুল্লনার পুত্র শ্রীপতি (=শ্রীমন্ত) জন্মগ্রহণ করিলেন। মাতা পুত্রকে অতিযত্নে লালনপালন করিতে লাগিলেন। গৃহে ভাগবত পাঠ শুনিয়া বালক শ্রীমন্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার খেলা খেলিতেন। পিতার অভিপ্রায় অনুসারে মাতা তাঁহার শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিলেন। শ্রীমন্ত অল্পবয়সে সে-যুগের প্রাচীন শিক্ষা আয়ত্ত করিলেন। তিনি সদাচারী ও বিনয়পরায়ণ হইলেন।

একদিন বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাসকালে গুরু তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে অসঙ্গত উক্তি করেন। ইহাতে বালক নিরুদিষ্ট পিতাকে সন্ধান করিয়া বাহির করিবার জন্য অত্যন্ত অশান্ত এবং অধীর হইলেন। বণিকতনয় সাতখানি বাণিজ্যতরী নানা পণ্যসম্ভারে সাজাইয়া এক শুভদিনে সিংহল যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মাতার সুকোমল স্নেহ তাঁহাকে ক্ষুদ্র গৃহের কোণে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না। যেরূপেই হউক শ্রীমন্ত পিতাকে খুঁজিয়া বাহির করিবেন। প্রবাস যাত্রার পূর্বে তিনি মাতাকে বলিলেন—

"যদি পিতা পুত্রে মোর হয় দরশন। আসিয়া করিব পুনঃ চরণ বন্দন॥
যদি পিতা পুত্রে মোর নাহি দরশন। কামনা করিয়ো মোরে সাগরে মরণ॥
আমার বচনে মাতা স্থির কর মতি। তব আশীর্বাদে যেন আসি শীঘ্রগতি॥"

শ্রীমন্তের সাতখানি ডিঙ্গা সিংহলের দিকে চলিল। পথে তিনি বহু গ্রাম, নগর ও তীর্থক্ষেত্র অতিক্রম করিলেন। অবশেষে সেই মগরাদহের ভৈরব জলশব্দ শ্রীমন্তের কানে পৌঁছিল।

"দূরে শুনি মগরার জলের নিস্বন। আষাঢ়ের যেন নব মেঘের গর্জন॥"
দেবী চণ্ডিকা তাঁহার ভক্তি পরীক্ষার জন্য পূর্বের ঝড় ঝঞ্ঝা শিলাবৃষ্টির সৃষ্টি করিয়া তাঁহার সাতখানি ডিঙ্গাকে একেবারে বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিলেন। মায়ের মতোই শ্রীমন্ত দেবীর ভক্ত। তিনি তখন দেবীর স্তব আরম্ভ করিলেন।
দেবীর কৃপায় ঝড় বৃষ্টি থামিল—

"ঝড়বৃষ্টি দূর হইল চণ্ডীর কৃপায়।
ডিঙ্গা লৈয়া সদাগর দ্রুতগতি যায়॥"

শ্রীমন্ত সমুদ্র পথে চলিতে চলিতে কালীদহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আবার তাঁহার পিতা যেমনটি দেখিয়াছিলেন সেই 'কমলে-কামিনী' মূর্তি আবির্ভূত হইল।

শ্রীমন্ত এই দৃশ্য দেখিয়া ভাবিলেন ইহা হয়তো কোন দেবতার ছলনা। যাহাই হউক রাজসভার লোকেরা হয়তো এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে পারেন। কেননা এই ঘটনা ঘটিতেছে সিংহল দেশের অতি নিকটে। সুতরাং রাজসভায় গিয়া এই সংবাদ দিতে হইবে। তিনি ব্যাপারটির বিবরণ লিখিয়া লইলেন। সিংহলে রত্নমালার ঘাটে শ্রীমন্তের ডিঙ্গা ভিড়িল। এই বিদেশী সওদাগরের সহিত সহর কোতোয়ালের ঝগড়া বাঁধিল। নিজমাথার লক্ষটাকা মূল্যের টোপর কোতোয়ালকে দিয়া শ্রীমন্ত গোলমাল মিটাইলেন। কিন্তু চণ্ডিকাদেবী কোটালকে ছাড়িলেন না। তিনি তাঁহার একান্ত ভক্ত খুল্লনার পুত্রের এই অপমান সহ্য করিতে পারিলেন না—বিশেষতঃ এই টোপর শ্রীমন্তের মাতা খুল্লনা দেবীকে সন্তুষ্ট করিয়া পাইয়াছিলেন। মঙ্গলময়ী দেবী চণ্ডিকা এই টোপব কোটালের মাথা হইতে তুলিয়া লইযা উজানিতে গিয়া শ্রীমন্তের মাতাকে ফিরাইয়া দিলেন। সিংহল রাজসভায় শ্রীমন্ত সাদরে অভ্যর্থিত হইলেন। রাজা তাঁহার প্রয়োজনীয় বাণিজ্যদ্রব্য শ্রীমন্তের নিকট হইতে লইলেন, আর শ্রীমন্তও রাজার নিকট হইতে শঙ্খ চন্দনাদি বিনিময়ে গ্রহণ করিলেন। রাজসভায় সমুদ্রযাত্রার বর্ণনাপ্রসঙ্গে শ্রীমন্ত 'কমলে কামিনী' দর্শনের বিবরণ দিলেন। এই অলীক কাহিনী কেহ বিশ্বাস করিতে চাহিল না। শ্রীমন্তকে পিতার মতোই প্রতিজ্ঞা করিতে হইল যদি তিনি রাজাকে কমলে-কামিনী দেখাইতে পারেন তবে অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা পাইবেন, আর তাহা না পারিলে দক্ষিণ মশানে তাঁহার শিরশ্ছেদ করা হইবে। কিন্তু শ্রীমন্তও এই রহস্যময়ী মূর্তি সিংহলের রাজাকে দেখাইতে পারিলেন না। তিনি বন্দী হইয়া দক্ষিণ মশানে প্রাণদণ্ড গ্রহণের জন্য নীত হইলেন। শ্রীমন্ত সেখানে বহু অনুনয় করিয়া কোটালের কাছে পূজা আহ্নিকের জন্য অল্প সময় চাহিয়া লইলেন। তিনি কাতরভাবে চণ্ডিকাদেবীর স্তুতি করিতে লাগিলেন।

"ক্ষমা কর মহামায়া অকাল মরণ। ক্ষমিয়া সকল দোষ রাখহ জীবন॥"

ভক্তের এই কাতর প্রার্থনায় দেবীর আসন টলিল।

"আমার সেবকে লয়ে কাটে শালবান। কাটিব তাহার মাথা করিনু বিধান॥"—কবিকঙ্কণ চণ্ডী

দেবী প্রথমে যুদ্ধ করিবার পরিবর্তে জরতী বেশে শ্রীমন্তকে কোলে লইয়া মশানে বসিয়া তাঁহার প্রাণভিক্ষা চাহিলেন—ইহাতে কোন ফল হইল না। তখন রাজার সিপাহী সান্ত্রী পাইক প্রভৃতিরা শ্রীমন্তের দিকে নানা অস্ত্র নিক্ষেপ করিল, কিন্তু সকল অস্ত্র অর্ধপথে ব্যর্থ

হইল। কিন্তু দেবীকে তাহারা তাঁহার বসিবার স্থান হইতে ফেলিয়া দিল। এখন চণ্ডী স্বমূর্তি ধারণ করিলেন।

দেবী আর সিংহলরাজের লক্ষ লক্ষ সৈন্যের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলিল। অগণিত যোদ্ধা রণাঙ্গনে হত হইল।

এ দিকে খবর পাইয়া সিংহলরাজও রণাঙ্গনের দিকে অগ্রসর হইলেন, এবার তাঁহার সঙ্গে বিপুল সৈন্যবাহিনী। স্বর্গের দেবীগণ ও দানাগণ দেবীর পক্ষ লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাজা ভীত হইলেন। তিনি দেখিলেন দানাগণ শ্রীমন্তকে হস্তিপৃষ্ঠে বসাইয়া তাঁহার উপর শ্বেতছত্র ধরিয়াছে এবং চামর ব্যজন করিতেছে। রাজসেনা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। রাজা দেবীর স্তুতি করিতে লাগিলেন। তিনি নিজেই দেবীপূজার বলি হইতে সঙ্কল্প করিলেন। দেবী সিংহলরাজকে নিজপরিচয় দিলেন, আর তিনি শ্রীমন্তের জন্য রাজকন্যা চাহিলেন। কিন্তু কমলে-কামিনী না দেখাইলে শ্রীমন্তের প্রতিজ্ঞা পালন হয় না। সুতরাং দেবীকে ভক্তের প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য সেই মূর্তি ধারণ করিতে হইল। সিংহলরাজ শালবান আপন কন্যা সুশীলাকে শ্রীমন্তের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। দেবীর কৃপায় মৃত সৈন্যবাহিনী বাঁচিয়া উঠিল। নগরে বিবাহের উৎসব চলিল। কারাগারের বন্দীরা সকলে মুক্তিলাভ করিলেন। অন্যান্য বন্দীদের সহিত দীর্ঘদিন কারাযন্ত্রণা ভোগ করিবার পর ধনপতি সওদাগরও মুক্তি পাইলেন। শ্রীমন্ত পিতার খোঁজে সিংহলে আসিযাছেন—কিন্তু মুক্ত বন্দীদের মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া দেশে কি ভাবে ফিরিবেন। যে সংকল্প লইয়া তিনি দীর্ঘ প্রবাস স্বীকার করিয়াছেন—তাহা তো অপূর্ণ থাকিয়া যায়। শ্রীমন্ত পিতাকে না দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শ্রীমন্তের বিফল জীবনে প্রাণত্যাগই শ্রেয়ঃ। একে একে সাতঘরের বন্দী মুক্ত হইয়া চলিয়া গেল। এক অতি অন্ধকার কারাকক্ষে ধনপতি তাঁহাব বিড়ম্বিত বন্দী-জীবন যাপন করিতেছেন। তাঁহাব মাথায় লম্বা জটা, মুখে লম্বা দাড়ি গজাইয়াছে, নখগুলি অত্যন্ত বড়, মাথায় তেল নাই। অনাহাবে আব কারাগারের কষ্টে শরীর হইয়াছে জীর্ণ শীর্ণ। বারো বছর ধবিয়া এই অবস্থা চলিতেছে। তিন-চাবু বার ডাকিলে তিনি একবার উত্তর দেন। বন্দী অন্ধকার কাবাগৃহে বসিয়া ভাবিতেছিলেন সকলেই মুক্ত হইয়াছে তাঁহাকে চণ্ডিকার নিকট বলি দিবার জন্য রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। বন্দিশালার অষ্টম প্রকোষ্ঠ হইতে নৌকার দাঁড়ি মাঝিরা অতিকষ্টে ধনপতিকে বাহির করিল। শ্রীমন্ত একে একে সকল বন্দীকে দেখিতে লাগিলেন। তারপর উক্ত বন্দীর শরীরের গঠন ও চিহ্নাদি দেখিয়া তাঁহাকে পিতা বলিয়া চিনিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। শ্রীমন্ত তবু ধনপতির সমগ্র পরিচয় লইয়া পিতা বলিয়াই তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। পুত্র পিতাকে জাতপত্র দেখাইলেন, মাতার দেওয়া অঙ্গুরী প্রভৃতি নিদর্শন তাঁহার নিকট উপস্থিত করিলেন। পিতা পুত্রের মিলনের পর ধনপতি ও শ্রীমন্ত স্বদেশে রওনা হইলেন। চণ্ডীর কৃপায় তাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত নষ্ট দ্রব্য ফিরিয়া পাইলেন। স্বদেশে উপস্থিত হইলে বধূসহ পুত্রকে মাতা খুল্লনা বরণ করিয়া লইলেন। স্বদেশের রাজাকেও শ্রীমন্ত দেবীর কৃপায় কমলে-কামিনী দেখাইলেন। রাজা বিক্রমকেশরী আপন কন্যা জয়াবতীকে শ্রীমন্তের হাতে সম্প্রদান করিলেন।

ধনপতি সদাগর ভগবান শিবকে পূজা করিতে ধ্যানে বসিলেন। ধ্যানে তিনি দেখিতে পাইলেন শিবের অর্ধদেহ হইতেছেন পার্বতী। একই দেহের বামাংশ পার্বতী, আর দক্ষিণাংশ হইতেছেন মহেশ্বর। এখন চণ্ডিকা আর মহেশ্বরের ভেদজ্ঞান ধনপতির আর রহিল না। শিব-শিবার ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইবার পর তাঁহার দেহের বর্ণ আবার কাঁচা সোনার মতো হইল, পায়ের গোদ চলিয়া গেল, তিনি চক্ষে সুদৃষ্টি ফিরিয়া পাইলেন। খুল্লনা শ্রীমন্ত সুশীলা জয়বতী সকলে স্বর্গে ফিরিয়া গেলেন।

চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী দুইটির আলোচনা

কালকেতুর কাহিনী ছোট ঘরের কথা—আর ধনপতি সওদাগরের কাহিনী বড় ঘরের চির পুরাতন কথা। চণ্ডী কাব্য ছাড়া প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের অন্যত্র কোথাও নির্মম দারিদ্র্যের চিত্র এত বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে নাই। দারিদ্র্যের মধ্য হইতেই কালকেতু তাহার সততা, সরলতা, শৌর্য-বীর্যের সাহায্যে বড় হইয়াছিলেন। ইহাতে অবশ্য পুরুষকারের সহিত দৈবকৃপারও দরকার হইয়াছিল। ধনপতির কাহিনী চিরপুরাতন বড় ঘরের কথা। ইহার ঘাত প্রতিঘাতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সাহিত্যপাঠকের চিরপরিচিত। দুইটি কাহিনীর মধ্যে কালকেতুর কাহিনীই অধিকতর হৃদয়গ্রাহী বলিয়া মনে হয়। দারিদ্র্য ও সাংসারিক নানা বিপর্যয়ের বাধাবিঘ্নকে জয় করা এবং তাহার ঊর্ধ্বে উঠা অতি কঠিন কার্য সন্দেহ নাই।

অনুশীলনী

১। কালকেতুর কাহিনীর সারসংক্ষেপ লিখ।

২। কালকেতুর ভাগ্যপরিবর্তনের কাহিনীর সারসংক্ষেপ লিখ।

৩। কালকেতুর বাল্যজীবন বর্ণনা কর।

৪। ফুল্লরা কে? কালকেতুর জীবনযাত্রায় তাহার স্থান নির্ণয় কর।

৫। ধনপতি সওদাগরের কাহিনীর সারসংক্ষেপ লিখ।

৬। শ্রীমন্ত কে? তাঁহার সিংহলযাত্রার কারণ কি? সমুদ্রপথে বিপদ ও সিংহলে দশা-বিপর্যয়ের কাহিনী বর্ণনা কর।

৭। টিপ্পনী লিখঃ— ভাঁড়ুদত্ত, চণ্ডী, খুল্লনা, 'কমলে-কামিনী', 'বিক্রম কেশরী'।

৮। কালকেতুর কাহিনী এবং ধনপতি সওদাগরের কাহিনী—এই দুই কাহিনীর তুলনাত্মক আলোচনা কর।

১৪। লাউসেনের উপাখ্যান

[ধর্ম-ঠাকুরের পূজার কাহিনী লইয়া আর এক প্রকারের মঙ্গলকাব্য রচিত হয়। ইহার নাম ধর্মমঙ্গল। ধর্ম-ঠাকুরের পূজা গঙ্গার পশ্চিম পারে রাঢ় এবং তৎসংলগ্ন স্থানে প্রচলিত। পূর্ববঙ্গে এ-পূজা এবং এ-কাব্যের পুঁথি অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ—এই বৌদ্ধ ত্রিশরণের অন্তর্গত ধর্ম প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ দেবতা। কাহারও কাহারও মতে তিনি যমের সহিত অভিন্ন—কেহ বলেন তিনি বিষ্ণু বা সূর্য। তিনি সাকার ও নিরাকার, তাঁহার পূজায় হিন্দু, বৌদ্ধ এই উভয় আচারই মিশ্রিত। ধর্মমঙ্গল কাব্যে রাঢ় দেশের জাতীয় জীবন প্রতিফলিত হইয়াছে। সমগ্র বাঙ্‌লা এ-পূজাকে গ্রহণ করিতে পারে নাই। এই কাব্যকে রাঢ়ের জাতীয় কাব্য বলিয়া মনে করা হয়। খেলারাম, রূপরাম চক্রবর্তী, শ্যাম-পণ্ডিত, সীতারাম দাস, ঘনরাম চক্রবর্তী রামদাস আদক প্রভৃতি ধর্মমঙ্গল লেখেন। ধর্ম-মঙ্গলের প্রধান কাহিনীর নায়ক লাউসেন।]

গৌড়ের সম্রাট্ ধর্মপালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র গৌড়েশ্বর হন। এই গৌড়েশ্বরের মন্ত্রী ছিলেন তাঁহারই শ্যালক মহামদ (মাহুদ্যা)। মহামদ অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী ছিলেন।

ই'হারই চক্রান্তে গোড়েশ্বরের অনুগত প্রজা সোম ঘোষ (সোমাই ঘোষ) কারাগারে বন্দী হইয়া বাস করিতে থাকেন। গোড়রাজ এই অন্যায় কার্যের জন্য মন্ত্রীর উপর অসন্তুষ্ট হন এবং সোম ঘোষকে কারাবাস হইতে মুক্ত করেন। সোম ঘোষের প্রতি রাজার অনুগ্রহ দেখিয়া মহামদ বড়ই অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। রাজা ইহা বুঝিতে পারিয়া সোম ঘোষকে গোড় দরবার হইতে সরাইয়া তাঁহাকে অজয়গড়ের সামন্ত নৃপতি কর্ণ সেনের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। কর্ণ সেনের সহিত সোম ঘোষের বেশ সদ্ভাব চলিল। কিন্তু সোম ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ পিতার সদ্ভাব ভুলিয়া গিয়া কর্ণসেনের প্রাসাদ আক্রমণ করেন। ইছাই ঘোষ দুর্গাদেবীর রক্ষিত। একান্ত আকুল অন্তরে তিনি দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। কর্ণসেন সপরিবারে নিজ প্রাসাদ ছাড়িতে বাধ্য হইলেন। তিনি সকলকে লইয়া গোড়েশ্বরের নিকট উপস্থিত হইলেন। ইছাই ঘোষ ঢেকুরে নূতন দুর্গ নির্মাণ করিয়া গোড়শ্বরের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিলেন এবং পিতার প্রতিশ্রুত রাজকর দেওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন।

গোড়রাজ বিদ্রোহী সামন্তকে সমুচিত শিক্ষাদানের জন্য নয় লক্ষ সৈন্য লইয়া ঢেকুর দুর্গ আক্রমণ করিলেন। গোড়রাজের বিপুল সৈন্য ক্ষয় এবং শোচনীয় পরাজয় ঘটিল। কর্ণসেনের ছয় পুত্র যুদ্ধে প্রাণ হারাইলেন—পুত্রগণের সহিত ছয় পুত্রবধূ সহমরণ গেলেন। নিদারুণ পুত্রশোকের প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া রানী আত্মহত্যা করিলেন। রাজা কর্ণসেন সংসারের প্রতি বীতরাগ হইয়া যোগীর বেশ ধারণ করিলেন। একবার গোড়েশ্বরের সহিত দেখা করিয়া যাওয়া উচিত মনে করিয়া তিনি গোড়ে গেলেন। গোড়রাজ কর্ণসেনকে গৃহী করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। বৃদ্ধ কর্ণসেনের মনে বিবাহ করিয়া সংসারী হইবার কোন আশাই ছিল না। গোড়েশ্বরের আগ্রহে শেষে তিনি রাজার প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। রাজার অনূঢ়া শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সহিত কর্ণসেনের বিবাহ স্থির হইল। কিন্তু এ-বিবাহের প্রধান অন্তরায় রাজার শ্যালক মন্ত্রী মহামদ। অতিস্নেহের কনিষ্ঠা ভগ্নীকে তিনি এক অত্যন্ত বৃদ্ধ পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দিতে কিছুতেই সম্মত হইবেন না—ইহা গোড়েশ্বর জানিতেন। তাই তিনি মহামদকে কামরূপে রাজস্ব আদায়ের জন্য সসৈন্যে প্রেরণ করিলেন। রঞ্জার পিতা এই বিবাহের অনুমতি দিলেন. কর্ণসেনের সহিত রঞ্জাবতীর শুভবিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। বিবাহের পর গোড়রাজ কর্ণসেনকে ময়নানগরের রাজা করিয়া রঞ্জাবতীসহ সেখানে পাঠাইয়া দিলেন। মহামদ এ-বিবাহের বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারেন নাই। কামরূপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাজা ও রানীর কৌশলে এই বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে জানিতে পারিয়া মহামদ প্রতিহিংসায় জ্বলিয়া উঠিলেন। তাঁহার সমস্ত রাগ গিয়া পড়িল ভগিনী রঞ্জাবতী ও রাজা কর্ণসেনের উপর। এদিকে রঞ্জাবতী অনেকদিন পিতৃকুলের কোন খবর না পাইয়া স্বামী কর্ণসেনকে গোড়ে পাঠাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। রাজা বিনা নিমন্ত্রণে গোড়ে যাইতে অস্বীকৃত হইলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পত্নীর বারবার অনুরোধে সেখানে গেলেন। মহামদ ইতিমধ্যে কামরূপ হইতে ফিরিয়াছেন—রাজাকে (কর্ণসেনকে) দেখিয়া ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইলেন। নানাভাবে কর্ণসেন ও নিজ ভগ্নীকে গোড়পতির সমক্ষে অপমানিত করিলেন। তিনি মহামদের দ্বারা কর্ণসেনের প্রতি কৃত

অপমানের কোন প্রতিবাদ করিলেন না। কর্ণসেন ক্ষোভে দুঃখে ময়নানগরে ফিরিলেন। তিনি পত্নী রঞ্জাবতীকে বলিলেন—

"বন্ধ্যা বলে তোমাকে আমাকে আঁটকুড়া।
কিল মেরে পামর পাঁজর কৈল গুঁড়া॥
বিধিমত বিস্তর করিল অপমান।
পাপ বাড়ে বলে মোর হেরিলে বয়ান॥"
(রাজা বলেন)—'আজি হতে ওদিকে ফিরিয়া নাঞি চাব।
রানী বলে জীবনে তথায় নাঞি যাব॥"—(অনাদিমঙ্গল, রামদাস আদক)

রানী সন্তানহীনতার অপবাদ দূর করিবার জন্য নানারূপ ঔষধ-পত্রের প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু উহাতে কোন ফল হইল না। রানী রঞ্জার দারুণ মানসিক কষ্টে কাল কাটিতেছে। এমন সময়ে ধর্মঠাকুরের পূজার পুরোহিত রামাই পণ্ডিত উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উপদেশে পুত্রলাভের আশায় রঞ্জাবতী ধর্মঠাকুরের সন্তুষ্টি বিধানের ব্যবস্থা করিলেন। নিজনগরে তিনি ধর্মের মন্দির নির্মাণ করিলেন এবং একান্ত নিষ্ঠার সহিত ঠাকুরের পূজা করিলেন। কিন্তু তিনি ইহাতে পুত্রলাভে ব্যর্থ হইয়া পুনরায় রামাই পণ্ডিতের শরণাপন্ন হইলেন। পণ্ডিত বলিলেন আরো কঠিন তপস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। রানীকে লৌহ-শলাকার উপর ঝাঁপ দিয়া পড়িতে হইবে। এই প্রাণান্তকারী ব্রত অবলম্বন করা কর্ণসেনের অভিপ্রেত হইল না। কিন্তু রঞ্জা শুনিলেন না। তিনি লৌহশলাকার উপর ঝাঁপ দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। রঞ্জাবতীর মৃত্যুতে ধর্মঠাকুরের আসন টলিল। ঠাকুর স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া রঞ্জার প্রাণদান করিলেন এবং তাঁহার বরে রঞ্জাবতীর পুত্র লাউসেন জন্মগ্রহণ করিল। মহম্মদ পূর্ব হইতেই রাগিয়া আছেন—তাঁহার চরেরা রঞ্জাবতীর পুত্রলাভের সংবাদ তাঁহাকে জানাইল। তিনি নিজের গুপ্তচর দ্বারা এই শিশুকে অপহরণ করাইলেন। রঞ্জাবতী পুত্রশোকে অত্যন্ত কাতর হইলেন। ধর্মরাজ তাঁহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া হনুমানকে দিয়া শিশুকে উদ্ধার করাইয়া মাতার হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন। ইহার পূর্বেই পুত্রের অপহরণের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মঠাকুর কর্পূর হইতে এক পুত্র সৃষ্টি করিয়া রঞ্জার হাতে দিয়াছিলেন। আগে একপুত্র ছিল—রঞ্জার এখন দুই পুত্র হইল—তাহাদের যথাক্রমে নাম হইল কর্পূর (সেন) ও লাউসেন। লাউসেন ও কর্পূর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মল্লক্রীড়ায় বিশেষ পারদর্শী হইলেন। এক রাত্রিতে দেবী লাউসেনকে পরীক্ষা করিয়া বিশ্বকর্মার নির্মিত জয়খড়্গ তাঁহাকে দিলেন। গৌড়রাজের সভায় গিয়া লাউসেনকে নিজ বীরত্বের পরিচয় দিতে ইচ্ছা হইল। লাউসেনের গৌড় যাত্রার খবর পাইয়া মহামদ আটজন মল্লকে ময়নায় পাঠাইলেন, যাহাতে তাহারা লাউসেনের হাত পা ভাঙিয়া তাঁহাকে সকল কাজের বাহির করিয়া দিতে পারে। লাউসেন এই মল্লগণকে পরাজিত করিয়া ভাই কর্পূরকে সঙ্গে লইয়া গৌড়ে রওনা হইলেন। পথে তাঁহাদিগকে নানা বিপদের সম্মুখীন হইতে হইল। পিতামাতা পুত্রদ্বয়কে গৌড়ে যাইবার অনুমতি দেন নাই। লাউসেন পরে পিতামাতার অনুমতি আদায় করিলেন। তিনি পথে নরখাদক ব্যাঘ্র ও কুম্ভীর বধ করিলেন। জামতী নামক স্থানে এক কুচরিত্রা নারী লাউসেনকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু লাউসেন তাহার হাত হইতে উদ্ধার পাইলেন। ইহার পর লাউসেন ও কর্পূর এক নারী

রাজ্যে প্রবেশ করিয়া কারাগারে বন্দী হইলেন। ইহার পর লাউসেন সেখানে কতকগুলি হেঁয়ালির উত্তর দিয়া কারাযন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। অনেক কষ্টের পর তাঁহারা অবশেষে গৌড়ে গিয়া উপনীত হইলেন। রাজমন্ত্রী মহামদ তাঁহার ভাগিনেয় লাউসেনকে হাতের মুঠার ভিতর পাইয়া নিজের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য তাঁহাকে নানাভাবে বিপন্ন করিবার চেষ্টায় লাগিয়া গেলেন। লাউসেন ও কর্পূর গৌড় রাজপ্রাসাদে পৌঁছিবার পূর্বে এক তাম্বুলীর গৃহে প্রবাসীরূপে বাস করিতেছিলেন।

এই সময়ে মহমাদ ঘোষণা করিলেন কাহারো ঘরে কোন প্রবাসী লোক থাকিলে গৃহস্থকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। লাউসেন গৃহস্থকে বাঁচাইবার জন্য তাঁহার ঘব ছাড়িয়া এক গাছের নীচে রাত্রি যাপন করিতেছিলেন। সেইখানে রাত্রিতে তাঁহার মাথার কাছে মহামদের লোকেরা রাজহস্তী বাঁধিয়া রাখিল। —ইহার উদ্দেশ্য লাউসেনকে চোর প্রতিপন্ন করা। হাতি চুরির অপরাধে লাউসেনের কারাবাস হইল। তিনি রাজার সমক্ষে নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করিলেন।

গৌড়রাজ তাঁহার পরিচয় জানিতে পারিযা বীরত্বের জন্য তাঁহাকে সর্বোত্তম অশ্ব-উপহার দিয়া সম্মানিত করিলেন। লাউসেন ও কর্পূর স্বদেশ যাত্রা করিলেন' পথে তেবজন ডোম-জাতীয় লোককে সঙ্গে লইলেন। ইহাদের মধ্যে প্রধান কালু ডোম। কালুকে লাউসেন সেনাপতিপদে বরণ করিলেন। এই ডোমেবা সাহসী এবং লাউসেনেব নিতান্ত অনুগত। ইঁহারা রাজ-পরিবারের সেবায় আত্মসমর্পণ করিলেন।

রাজমন্ত্রী মহামদের মনে শান্তি নাই—তিনি সকল সময় ভাগিনেযের (লাউসেনের) উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার আরো চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে কামরূপে আবার গোলমাল বাঁধিল। এবার রাজস্ব বাকি নয়, সেখানকার রাজা গৌড়ের অধীনতা শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছেন।

কামরূপের রাজাকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া দরকার। মহামদ এই সুযোগকে লাউসেনের উপর নিজের প্রতিহিংসা সাধনের উপায়স্বরূপে ব্যবহার করিলেন। গৌডরাজকে প্ররোচনা দিয়া তিনি লাউসেনকে কামরূপের যুদ্ধে প্রেরণ করিলন। লাউসেন সেনাপতি কালুডোমের সাহায্যে কামরূপের রাজাকে পরাজিত করিলেন। ইহার পর লাউসেন কামরূপের রাজকন্যা কলিঙ্গার পাণিগ্রহণ করিলেন। বিজয়ী বীর লাউসেন গৌড হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবার পথে মঙ্গলকোটের রাজকন্যা অমলাকে বিবাহ করিলেন এবং বর্ধমানের রাজকন্যা বিমলাকেও পত্নীরূপে লাভ করিলেন। স্বগৃহে পৌঁছিলে কর্ণসেন ও রঞ্জাবতী পুত্রবধূসহ লাউসেনকে বরণ করিয়া লইলেন। কিছুদিন সুখে বাস করিবার পর লাউসেনের সম্মুখে আবার অন্য বিপদ উপস্থিত হইল। দুর্বলমতি গৌড়েশ্বর মন্ত্রী মহামদের প্ররোচনায় সিমুলের রাজা হরিপালের কন্যা কাণাড়াকে বিবাহ করিবার জন্য উৎসুক হইলেন। কিন্তু রাজা হরিপাল বৃদ্ধ রাজার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। গৌড়েশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা হরিপালের বিরুদ্ধে সৈন্য-সামন্ত লইয়া যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। রাজকন্যা কাণাড়া এক লৌহ-গণ্ডার নির্মাণ করিয়া ঘোষণা করিলেন—যে ব্যক্তি এই গণ্ডারের মস্তক ছিন্ন করিতে পারিবে সেই রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। গৌড়েশ্বর

অথবা তাঁহার মন্ত্রী কেহই এ-কার্য সম্পাদন করিতে পারিলেন না। মহামদ এখানেও বেশ একটু কুবুদ্ধি খাটাইলেন। লাউসেনকে ডাকা হউক। যদি লোহার গণ্ডারের মাথা কাটিতে তিনি পারেন তবে গৌড়রাজ এই কন্যাকে বিবাহ করিবেন; আর ইহা না পারিলে লাউসেন অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইবেন। মহামদের উভয় দিক দিয়া লাভ। লাউসেন অবলীলাক্রমে লোহা-গণ্ডারকে দ্বিখণ্ডিত করিলেন। কাণাড়া নিজ প্রতিজ্ঞানুসারে লাউসেনকে বরণ করিতে উদ্যত হইলেন। গৌড়েশ্বর ইহাতে অসন্তুষ্ট হইলেন। কাণাড়া তখন এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যদি তাঁহার সহিত যুদ্ধে লাউসেন পরাজিত হন তবে তিনি রাজকন্যাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইবেন! কাণাড়া লাউসেনকে যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। কাণাড়াকে বিবাহ করিয়া তাঁহাকে লইয়া লাউসেন স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিলেন।

মহামদ লাউসেনের কোন অনিষ্ট করিতে না পারিয়া নূতন দুরভিসন্ধি করিলেন। ইছাই ঘোষ বহুদিন হইতে গৌড়েশ্বরকে রাজকর প্রদান বন্ধ করিয়াছে। তাঁহাকে দমন করা এখন অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই কার্যে লাউসেনকে সৈন্যসহ পাঠাইলে ভাল হয়। মন্ত্রীর এই প্রস্তাব গৌড়রাজ গ্রহণ করিলেন। লাউসেনের পিতামাতা এই সংবাদে বড় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এই ইছাই ঘোষের হাতে কর্ণসেন ছয়পুত্র হারাইয়া সর্বরিক্ত ভিক্ষুকে পরিণত হইয়াছিলেন—এখন কোন্ প্রাণে প্রিয় পুত্র লাউসেনকে ইহারই বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে দিবেন! কিন্তু লাউসেন কোন কথা শুনিলেন না। তিনি গৌড়েশ্বরের আদেশে নয় লক্ষ সৈন্য লইয়া সেনাপতি কালু ডোমের সহিত অজয়ের তটে উপস্থিত হইলেন। ইছাই ঘোষের সেনাপতি লোহাটার সহিত তাঁহার তুমুল যুদ্ধ হইল। লোহাটার ছিন্ন মুণ্ড লাউসেন গৌড়দরবারে পাঠাইলেন। মন্ত্রী মহামদ এই মুণ্ডদ্বারা লাউসেনের একটি কৃত্রিম ছিন্ন মুণ্ড প্রস্তুত করিয়া ময়নাগড়ে পাঠাইলেন। এই মুণ্ড দেখিয়া বৃদ্ধ কর্ণসেনও রঞ্জাবতী নিদারুণ শোকে মৃতকল্প হইলেন। লাউসেনের চার রানী স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় আরোহণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। এমন সময় ধর্মঠাকুর আপনার ভক্তের প্রতি কৃপালু হইয়া প্রকৃত ব্যাপার জানাইয়া দিলে কর্ণসেনের পরিবার পরিজন আশ্বস্ত হইলেন।

ইছাই ঘোষের সেনাপতি লোহটা পূর্বেই নিহত হইয়াছেন। এখন লাউসেন আর ইছাই ঘোষে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইছাই ঘোষ দেবীর ভক্ত, আর লাউসেন ধর্মঠাকুরের অনুগৃহীত। দুই ভক্তের যুদ্ধচ্ছলে দেবী আর ধর্মঠাকুরের যুদ্ধ বাধিল। দেবীর ভক্ত ইছাই ঘোষ ধর্মঠাকুরের ভক্ত লাউসেনের হস্তে প্রাণ হারাইলেন।

দেবী লাউসেনকে শাস্তি দিতে আসিলেন। তখন লাউসেন তাঁহার স্তুতি করিয়া বলিলেন আমি ধর্মের সেবক। কিন্তু জগতের পিতামাতা তুমি—তোমাতেই ধর্মের অধিষ্ঠান—

"সেন বলে তুমি ধর্ম আর ধর্ম কোথা। তুমি ধর্ম তুমি ব্রহ্ম তুমি মাতা পিতা॥
জননী হইলে পুত্র ধরয়ে জঠরে। মায়ে যদি বেটা খায় কে রাখিতে পারে॥"

এই কথা শুনিয়া দেবী লজ্জিত হইয়া লাউসেনকে ক্ষমা করিলেন। লাউসেন ইছাই ঘোষের পিতা সোম ঘোষকে বন্দী করিয়া গৌড় দরবারে হাজির করিলেন। সোম ঘোষ গৌড়-

রাজের কৃপা ভিক্ষা করিয়া পুনরায় ঢেকুরগড়ের নৃপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। লাউসেন রাজার নিকট হইতে ঘোড়া পুরস্কার লইয়া ময়নাতে ফিরিলেন।

লাউসেনকে কোনরূপে বিনাশ করিতে না পারিয়া রাজমন্ত্রী মহামদ বড়ই ক্ষুব্ধ হইলেন। ধর্মঠাকুরের কৃপায় লাউসেন সর্বজয়ী হইয়াছেন। অতএব মহামদ ধর্মঠাকুরের পূজা করিতে চাহিলেন। খুব ঘটা করিয়া পূজা চলিল। দেশের কোন লোক বাকি থাকিল না—সকলেই ধর্মপূজার স্থানে আসিল; নৃত্যগীতাদি সর্বপ্রকার আমোদের ব্যবস্থা হইল।

এই দুরভিসন্ধিমূলক পূজা ধর্মঠাকুর গ্রহণ করিলেন না। গৌড়ের উপর দিয়া প্রলয়ঙ্কর ঝড়বৃষ্টি বহিয়া গেল। পূজাস্থান ভাসিয়া গেল। শীতের দিনের এই দারুণ দুর্যোগে কৃষকের ক্ষেতের শস্য ভাসিয়া গেল। রাজ্যে দারুণ সংকট উপস্থিত হইল। বিপদে পড়িয়া গৌড়রাজ মন্ত্রী মহামদ লাউসেনকে খবর দিলেন। ধর্মপূজার বিধি লাউসেনই ভাল জানেন; সুতরাং তিনি আসিলে সকল দুঃখের অবসান হইবে।

গৌড় নগরে সেন রাজা আসিলেন। তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে গৌড়ে শান্তি ফিরিয়া আসিল। ধর্মরাজের ক্রোধ প্রশমিত হইল। লাউসেনের প্রতিষ্ঠা বাড়িয়া গেল। আর মহামদের মাথায় যেন বাজ পড়িল। তখন লউসেনকে কঠোরতম পরীক্ষার সম্মুখে তিনি উপস্থিত করিলেন। 'পশ্চিমে তুমি যদি সূর্যের উদয় দেখাইতে পার তবেই বুঝিব তুমি সর্বপ্রকার সম্মানের যোগ্য'—

"তবে জানি লাউসেন ধর্মের ভকিতা। পশ্চিমে উদয় দিকু দেখিব যোগ্যতা॥"

—অনাদিমঙ্গল

সুতরাং তাঁহার প্রতি রাজার আদেশ হইল—

"রাজার কথা অন্যথা করিবে কোন্ জন। পশ্চিমে উদয় দিতে করহ গমন॥"

লাউসেন বুঝিলেন এইরূপ কার্য ব্রহ্মারও অসাধ্য। তবে হাকন্দ (হাকণ্ড) নামক স্থানে ছিন্ন করিলেন। লাউসেনের পিতামাতা কারাগারে বন্দী হইলেন।

ধর্মপূজার বিধি রঞ্জাবতী ভাল জানেন। লাউসেন দেশে গিয়া তাঁহার নিকট পূজার বিধান জানিতে চাহিলেন। কিন্তু কেন? রঞ্জাবতী ও কর্ণসেন তো গৌড়নগরে আসিতে পারেন। লাউসেন সন্দেহ করিলেন তাঁহার পিতামাতাকে মহামদ বন্দী করিবেন। লাউসেনের এই মনোভাব জানিতে পারিয়া মহামদ প্রকাশ্যে তাঁহার ভাগিনেয়ের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন। লাউসেনের পিতামাতা কারাগারে বন্দী হইলেন।

লাউসেন হাকন্দে কঠোর তপস্যার জন্য রওনা হইলেন। সেনাপতি কালু ডোমের উপর নগর আর রাজারক্ষার ভার দিয়া পত্নীপুত্রের নিকট বিদায় লইয়া তিনি অজানা দেশের দিকে অগ্রসর হইলেন। এখন ময়নারাজ্যের দিনের রাজা আর রাত্রির কোতওয়াল হইলেন বীর কালু ডোম।

এদিকে মামার মহাসুযোগ উপস্থিত হইল। ভাগিনেয়ের অনুপস্থিতিতে মহামদ বুদ্ধি করিলেন।

"পশ্চিমে উদয় দিতে গিয়াছে ভাগিনা। আমি আজ লুটে নিব দক্ষিণ ময়না॥

লুট করা আনিব সেনের মালমাতা। রামমণি মুকুতা পরেশ হীরা গাঁথা॥
ভাঙ্গিব সেনের বাড়ী না রাখিব দেশে। সেনের ভিটার মাঝে বুনিব সরিষে॥"
মহামদ বহু সৈন্য লইয়া ময়নাগড় অবরোধ করিলেন। তিনি কৌশলে সেনাপতি কালুর পুত্র শাকা ও শুকার ও তাহার বিশ্বস্ত অনুচর তের জন ডোমের প্রাণ সংহার করিলেন। সমগ্র ময়নাগড় মন্ত্রবলে নিদ্রিত।

কালুর চোখেও ঘুম। কালুর স্ত্রী বীরাঙ্গনা লক্ষ্মী (লখ্যা ডোমিনী) ধর্মের বরে একমাত্র জাগ্রত। কালুকে দেখিয়া মহামদ ভয় পাইয়াছেন। কালুর যুদ্ধের সকল প্রেরণা যোগায় লক্ষ্মী—

"গড়েতে উঠিয়া লক্ষ্মী চতুর্দিকে চায়। ম্যাঁহদা বেড়্যাছে গড় দেখিবারে পায়॥"
তখন নিদ্রিত স্বামীকে তিনি জাগাইতে গেলেন—

"নয়নে বিশ্রাম তার নহে এক তিল। শোকের উপরি শোক বুকে বসে শীল॥"
কান্দিয়া পড়িল লখা কালুর চরণে।
কি লয়ে সংসার আর কার মুখ চাও। সকলি মজিল নাথ রণে সেজে যাও॥"

কালুর ভাই কাম্বা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ভাইয়ের (কালুর) মস্তক ছিন্ন করিল। বীর বিক্রমে স্বামীপুত্রহারা লক্ষ্মী সৈন্য চালনা করিয়া মহামদকে ময়না হইতে সসৈন্যে বিতাড়িত করিলেন—লক্ষ্মীর সহিত লাউসেনের রানীরা যুদ্ধ করিয়া গড় রক্ষা করিলেন। লাউসেনের পুত্র চিত্রসেন এই ভয়ংকর যুদ্ধে নিহত হইলেন।

এদিকে হাকন্দে লাউসেনের কঠোর তপস্যা চলিতেছে। তপস্যা দিন দিন কঠোর হইতে কঠোরতর হইতে লাগিল। অবশেষে ইষ্টসিদ্ধির জন্য নিজদেহ নয় খণ্ডে কাটিয়া উহা দিয়া ধর্মঠাকুরকে আহুতি দিলেন। অবশেষে ধর্মঠাকুর সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি অমাবস্যার রাত্রিতে পশ্চিমদিকে সূর্যোদয়ের আদেশ দিলেন।

সাধনায় সিদ্ধ হইয়া লাউসেন গৌড়রাজের সভায় ফিরিয়া আসিলেন। মহামদ যখন দেখিলেন কিছুতেই লাউসেনের সঙ্গে পারা যাইতেছে না—তখন তিনি এই ব্যাপারকে মিথ্যা প্রতিপাদন করিবার অপচেষ্টা করিলেন। হরিহর বাইতি ধর্মঠাকুরের পূজার ছিল বাদ্যকর। সে লাউসেনের সকল সাধনাই লক্ষ্য করিয়াছে।

অমাবস্যার রাত্রির সূর্যোদয় সে স্বচক্ষে দেখিয়াছে। তাহার চেয়ে বড় সাক্ষী আর কেহ নাই। মহামদ তাহাকে দিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করাইবার জন্য প্রথমে তাহাকে বশীভূত করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হরিহর বাইতি সত্যকথা প্রকাশ করিয়া দিল, কারণ হরিহর ধর্মভীরু লোক। মহামদ চরম লজ্জার সম্মুখীন হইলেন। তাঁহার পাপের মাত্রা এখন পূর্ণ হইল। ধর্মঠাকুরের কঠিনতম শাস্তি মহামদের উপর নামিয়া আসিল মহামদ কুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেন। অবশেষে লাউসেনের কাতর প্রার্থনায় ধর্মঠাকুর মহামদকে রোগমুক্ত করিলেন। ময়নাগড় অবরোধের সময়ে যাঁহারা প্রাণ হারাইয়াছিলেন, তাঁহারা বাঁচিয়া উঠিলেন। সবই ধর্মঠাকুরের কৃপায় সুসম্পন্ন হইল। লাউসেন চিত্রসেনকে রাজ্য দিয়া স্বর্গে গমন করিলেন।

অনুশীলনী

১। লাউসেন কে? তাঁহার জন্মের কাহিনী বর্ণনা কর।

২। লাউসেনের সহিত মহামদের শত্রুতার কারণ কি? এই শত্রুতা চরিতার্থ করিবার জন্য মহামদের অপচেষ্টাগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৩। লাউসেন ও মহামদের শত্রুতায় গৌড়রাজের ভূমিকা বর্ণনা কর।

৪। লাউসেনের অতি কঠিন বিপদের মধ্যেও কিরূপে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন?

৫। লাউসেনের সহিত শত্রুতায় রাজমন্ত্রী মহামদের কি পরিণাম হইয়াছিল?

৬। রঞ্জাবতী, কাণাড়া এবং লক্ষ্মী ডোমনী—ই'হাদের পরিচয় দাও, লাউসেনের জীবনের ও কার্যের সহিত ই'হাদের সম্পর্ক কি?

৭। হাকন্দে লাউসেনের তপস্যার কাহিনী এবং উহার পরিণাম বর্ণনা কর।

৮। ইছাই ঘোষের সহিত লাউসেনের সংঘর্ষের বিবরণ লিখ।

১৫। শিবের কৃষিকার্যের উপাখ্যান

[শিব অতি প্রাচীন দেবতা। তাঁহার পূজা হয়তো জগতের আদি পূজা। শিবপূজা প্রাগার্য যুগ হইতে ভারতে এবং ভারতের বাহিরে চলিয়াছে। প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতায় শিব-পূজার নিদর্শন পাওয়া যায়। বেদে তিনি রুদ্ররূপে পূজিত, তিনি মঙ্গলময় শিবও বটেন। বৈদিক সাহিত্যে তিনি 'দরিদ্র', 'নীললোহিত", 'গিরিশ' প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত। পুরাণে তিনি শিব নামেই বিশেষভাবে পরিচিত। আর্য-অনার্য, শক, দ্রাবিড় সকলেরই দেবতা তিনি। তিনি কোন বিশেষ সমাজ বা শ্রেণীর দেবতা নহেন। তাঁহার পূজা সর্ব-লোকে করে। শিবঠাকুরের কাহিনী লইয়া বাঙ্‌লা ভাষায় শিবায়ন কাব্য রচিত। এ-শিব সম্পূর্ণরূপে বৈদিক বা পৌরাণিক শিব নহেন। তিনি গৃহস্থ ও কৃষক—কোনস্থানে বা শিব সওদাগর। ইনি লৌকিক ও পৌরাণিক দেবতার সংমিশ্রণে গঠিত। শিবায়ন কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন রামেশ্বর চক্রবর্তী। ১৭১০-১১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কাব্য সমাপ্ত হয়। কবির পৈত্রিক নিবাস ছিল মেদিনীপুর জেলার যদুপুর গ্রামে।]

শিবের বৃহৎ সংসার--পত্নী পার্বতী পুত্রদ্বয় কার্তিক গণেশ, ভীম নামক এক ভৃত্য পদ্মা, জয়া, বিজয়া তিন দাসী—সকলে মিলিয়া মোট আট জনের পরিবার। লোকেব সংখ্যার অনুপাতে এই পরিবারেব আয় বড় কম। শিব একা রোজগার কবেন, সে রোজগারও ভিক্ষা-বৃত্তির দ্বারা যৎসামান্য উপার্জন। ভিক্ষা করিয়া যে সামান্য বিত্ত শিব উপার্জন করিয়াছিলেন তাহাও নিঃশেষিত হইল। সংসার যে এতদিন অচল হয় নাই তাহার কারণ শিবগৃহিণীর গৃহস্থালিতে অসামান্য দক্ষতা। ঘরে সামগ্রী না থাকিলে কেবল গৃহিণীর দক্ষতায় কোন পরিবার চিবকাল চলিতে পারে না। আর গৃহিণীর যদি টাকা উড়াইবার স্বভাব থাকে তবে চক্ষের নিমেষে সে অগাধ ঐশ্বর্যও নষ্ট করিতে পারে। ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়িয়া শিব কৃষকের বৃত্তি অবলম্বন করুন পার্বতী তাঁহাকে এইরূপ সনির্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। দেবী শিবকে বলিলেন—

"চষ ত্রিলোচন চাষ চষ ত্রিলোচন। নহে দাসদাসী আদি ছাড় পরিজন॥
চরণে ধরিয়া চণ্ডী চন্দ্রচূড় সাধে। নরমে গরমে কয় ভয় নাই বাধে॥"

শিব প্রত্যহ দেবীর নিকট হইতে নিজ অভ্যস্ত চালচলনের বিপরীত কথা শুনেন। সুতরাং তিনি এবার বেশ অনেকক্ষণ ভাবিয়া উত্তর দিলেন কিন্তু উহা কৃষিবৃত্তির বিরুদ্ধে।

"বলি বিলক্ষণ কিছু শুন শৈলসুতা। দেবতার পোতবৃত্তি বড়ই লঘুতা॥
ভিক্ষে দুঃখে আছি ভাল অকিঞ্চন পণে। চাষ চষ্যো বিস্তর উদ্বেগ পাব মনে॥"

দেবতার পক্ষে নিম্নবৃত্তি অবলম্বন করায় হীনতা আসে। ভিক্ষার দুঃখও বরং ভাল কারণ ইহাতে আছে সর্বরিক্ততার পণ। দ্বিতীয় কথা কৃষিকার্য করিলে তাঁহার মনে বিশেষ কষ্ট হইবে। চাষের নাম শুনিতেই ভাল—চাষ চালাইবার উপযুক্ত সামগ্রী যাহার আছে তাহার অবশ্য কোন ভয় ভাবনা নাই। চাষের ফল ফলিবার আগেই উহার ব্যবস্থা করিতে চাষীর হয় প্রাণান্ত পরিশ্রম—ফল ফলিলে অবশ্য সে উহা খাইবে। অনেক চেষ্টা করিয়া শস্য উৎপাদন করিতে হয়। আর যদি দেশে অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি হওয়ায় শস্যের ক্ষতি হয় তবে চাষীর দুঃখের অবধি থাকে না। যদিবা গরিবের ভাগ্যে তাজা শস্য জুটিল উহা ঘরে রাখিবার উপায় নাই—রাজা রাজকর হিসাবে উহা আদায় করিয়া লন। কৃষি করাও অত্যন্ত কঠিন কাজ- জল বৃষ্টিতে ভিজিয়া দারুণ রৌদ্রের তাপ সহ্য করিয়া কৃষকগিরি করিতে হয়। শিব পার্বতীর নিকট ক্ষমা চাহিলেন—কৃষিবৃত্তি তিনি গ্রহণ করিতে পারিবেন না। অন্য কোন ব্যবসায়ের কথা বলিলে তিনি তাহা করিতে পারেন। পার্বতী বলিলেন বাণিজ্যে লক্ষ্মী বাস করেন কিন্তু শিবের পক্ষে উহা করা সম্ভবপর নহে—কারণ বাণিজ্যের মূল হইতেছে পুঁজি (মূলধন) আর প্রবঞ্চনা। শিব ভিখারী তাঁহার কোন মূলধন নাই আর তিনি অপরকে ঠকাইতেও জানেন না।

পুঞ্জি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল। মহেশের সেত নাই কিসে সুপ্রতুল॥"

আর একটি ব্যবসা আছে তাহা হইতেছে চাকুরি। সারা জগৎ মহেশের সেবা করিয়া থাকে। তিনি তাঁহার সেবকদের কাহারও ভৃত্য হইতে পারেন না।

"আর এক ব্যবসায় রাজসেবা আছে। সেব্য হয়্যা যাবে কেন সেবকের কাছে॥"

ভিক্ষায় দুঃখ দূর হয় না—ইহা পার্বতী বেশ ভালভাবেই জানেন। তবে এক কৃষি ছাড়া শিবের আর কোন যোগ্য ব্যবসা নাই। পার্বতীর এই কথা শুনিয়া ত্রিলোচন তখন চাষ করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু হাল চালাইতে হইলে যে সকল যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম দরকার তাহা কোথায় পাওয়া যাইবে—ইহাই হইল প্রধান সমস্যা। মহাশক্তিস্বরূপিণী দেবী সহায় থাকিলে হাল, হালিয়া সবই পাওয়া যাইতে পারে। কৃষিকার্য করিতে যাহা যাহা লাগিবে শিব সবই পাইবেন—দেবী এইরূপ আশ্বাস তাঁহাকে দিলেন। চাষ করিতে গেলে আবাদের জন্য জমি চাই। সকল দেবতার রাজা ইন্দ্র। রাজাই সকল জমির মালিক। তাঁহার নিকট যাইবামাত্রই শিব জমি পাইবেন—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কুবের হইতেছেন দেবগণের ভাণ্ডারী। বীজের ধান তাঁহার ভাণ্ডার হইতে ধার পাওয়া যাইবে। শিবের নিজের ঘরে একটি বলিষ্ঠ ষাঁড় আছে। ইহার সহিত যমের মহিষকেও কাজে লাগান যাইতে পারিবে। তারপর লাঙ্গল। হলধর বলরাম রহিয়াছেন। তাঁহার নিকট চাহিলে তিনি তাঁহার লাঙ্গলটি দিয়া দিবেন। একজন হালিয়া (হাল্যা=হালচালক) দরকার। ঘরের চাকর ভীম হালিয়ার কাজ করিবে। মহাদেব পার্বতীর সকল প্রস্তাব হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। বলরামের লাঙ্গল ঘরে রাখিয়া কাজ করা চলিবে না। দেবতাদের মধ্যে তাঁহার মেজাজ অত্যন্ত খারাপ- কখন কি করিয়া বসেন তাহার ঠিক নাই। বলরাম চাষের হিতের পরিবর্তে অনিষ্টই করিবেন। বলরামের রাগ পার্বতীর অজানা নাই। এই বলরাম একবার ক্রোধে

যমুনাকে আকর্ষণ করেন—আর একবার হস্তিনাপুর ছারখার করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পার্বতীর আশ্বাসের উপর শিব ভরসা করিতে পারিলেন না। পার্বতী উত্তর করিলেন, বলরামের লাঙ্গল দেখিয়া শিব যখন ভয় পাইয়াছেন তখন তাহা না নিলেও চলিবে। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাকে দিয়া বিনা মজুরিতে গাছ কাটাইয়া লাঙ্গল জোয়াল তৈয়ারি করা যাইবে। শিবের ত্রিশূলে ভাঙ্গিয়া লাঙ্গলের সাজসজ্জা করা হইবে। বাসনাকে বড় করিলে লোকের উন্নতি অবশ্যই হয়—মনে কর ঘরে ভাত আসিয়া গিয়াছে। শূল ভাঙ্গার কথা মহাদেবের ভাল লাগে নাই—তিনি রাগিয়া উঠিলেন। পার্বতী বলিলেন শূল ভাঙ্গিলে শিবের 'শূলপাণি' উপাধি নষ্ট হইবে। নামযশ উপাধির জন্য লোক কত পরিশ্রম করে।

কিন্তু শিবের মতে শূলদ্বারা লোকের কত উপকার হয় বলা যায় না। শিবভক্ত বিপদের সময় শূলের প্রভাবে রক্ষা পায়—ইহাদ্বারা অসিদ্ধ কার্য সিদ্ধ হয়—শূলের সাহায্যেই শিব ব্রহ্মাণ্ডকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছেন। যমের কাছে মহিষ চাহিয়া কোন লাভ নাই কারণ ঘরের ষাঁড় আর বাঘ বেশ ভাল বহনকার্য করিতেছে। বাঘে আর ষাঁড়ে ঝগড়া—তাই পার্বতী যমের মহিষ চাহিতেছেন।

শিব আর কি করেন—অবশেষে দেবীর কথা তাঁহাকে শুনিতে হইল। পার্বতীর প্রেরণায় শিব তাঁহার প্রধান অনুচর নন্দীকে বৃষ সাজাইয়া আনিতে আদেশ দিলেন। মহাদেব উহাতে চড়িয়া ইন্দ্রপুরীতে গমন করিলেন। ইন্দ্রদেব ও স্বর্গের দেবীগণ শিবকে পূজা করিলেন। ইন্দ্রদেব ভূমি দিলেই মহাদেব চাষ করিতে পারেন ইহাই পার্বতীর ইচ্ছা। ইহা ইন্দ্রদেবকে তিনি জানাইলেন। সুতরাং পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিয়া জমি লইতে হয়। কার্তিক গণেশ অতিথি দাসদাসী—হরপার্বতীর আর কৃষিকার্যের জন্য যতটা স্থান দরকার শিব তাহা চাহিলেন। কৃষির ভূমি হইবে কোচ পাড়ার নিকটে। এই জমির মধ্য হইতে দেববৃত্তি গোবৃত্তি (গোচারণের মাঠ) এবং ব্রাহ্মণবৃত্তি বাদ দিতে হইবে। শিব যাহা লইবেন তাহার খাজনা লাগিবে না—ইহা হইবে দেবোত্তর সম্পত্তি। কশ্যপপুত্র ইন্দ্র শিবকে এই দেবোত্তর (দেবত্র) সম্পত্তির পাট্টা পত্র সম্পাদন করিয়া জমির স্বত্ব পাকা করিয়া লিখিয়া দিলেন।

বর্ষণের দেবতা ইন্দ্র। সুতরাং অতিবৃষ্টি আর অনাবৃষ্টি তাঁহাকে বন্ধ করিতে হইবে —তাহা না করা হইলে শিবের মতো দুঃখী চাষী জমি লইতে পারেন না। ইন্দ্র এ-বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিলেন। যমের মহিষও শিব পাইলেন। ভগবান্ শিবের অভিপ্রায়ানুসারে বিশ্বকর্মা লাঙ্গল, জোয়াল মই তৈয়ার করিয়া দিলেন। শূলের মূল ঠিকই থাকিল। উহা হইতেই লাঙ্গলের ফাল, দা, কুড়াল, উখা, কোদাল প্রভৃতি দুইশত দশ মণ ওজনের কৃষি যন্ত্র প্রস্তুত করা হইল। বিশ্বকর্মা কাজের পুরস্কার লইয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। কৃষির যন্ত্রপাতি পাওয়া গেল বটে কিন্তু ধানের বীজ ধার লইবার বেলায় যত মুস্কিল বাঁধিল। শিব বীজধান্য কর্জ করিয়া আনিতে রাজি হইলেন না কেন না জীবনে তিনি কখনও কাহারো কাছে কিছু ধার করেন নাই। পার্বতীকে শিব বীজ ধার করিতে বলিলেন। কিন্তু তিনিও রাজি নহেন। স্বামী থাকিতে স্ত্রী অন্য কাহারও নিকট ধারের জন্য বাড়ির বাহিরে যাইতে পারেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মহাদেবকেই কুবেরের নিকট বীজধানের

জন্য যাইতে হইল, কারণ পার্বতীর সেখানে যাইতে আরো অনেক অসুবিধা আছে—

"কুবেরের কাছে পূর্বে লেঠা আছে মোর। কত ক্রোধিয়া বল্যাছে ঋণ চোর॥
তোঞি পাকে বলি প্রভু তুমি গেলে ভাল। ভোলানাথ ভোলায়ে ভার্যারে যাত্যে বল॥"

চাকর ভীমের সহিত শিব কুবেরের পুরীতে উপনীত হইলেন। যক্ষরাজ মহাদেবকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার করুণা ভিক্ষা করিলেন। 'তোমার কৃপায় দুষ্ট রাবণ বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াছিল। কিন্তু দুষ্ট লোকের ঐশ্বর্য বেশি দিন থাকে না।

"দুষ্টের ঐশ্বর্য দিন দশ বই নয়। উত্তমের উন্নতি অনেক কালে হয়॥"

শিব বলিলেন 'দুষ্টের অন্যায় বেশিদিন সহ্য করা চলে না। তুমি আমাকে ধান ধার দিয়া পুণ্য সঞ্চয় কর। তোমার অবশ্য ভয়ের কোন কারণ নাই। ইহার পর অবশ্যই ধার শোধ করা যাইবে।

কুবের উত্তর দিলেন—"যত ধান দরকার নিয়া যাও। ধার চাহিতেছ কেন?"

কুবেরের ভাণ্ডারদ্বার উন্মুক্ত হইল। মহাদেব সেখান হইতে পর্বতপ্রমাণ ধান ভীমের সাহায্যে লইয়া চলিলেন। শিব কৈলাস ছাড়িয়া মর্ত্যলোকে চাষের জন্য যাত্রা করিতে উদ্যত হইলেন। সেখানে নিজের যাইবার দরকার নাই। শিবলোকে বসিয়া তিনি সবই করিতেছেন। পার্বতী ছলছল চোখে প্রতিবাদ জানাইলেন। ভীম চাকরকে দিয়া যত চাষ করান যায়—নিজে ঘরে বসিয়া থাকিলে কোন ক্ষতি নাই—একান্ত যদি যাইতেই হয় তবে পার্বতীকে সঙ্গে লইতে হইবে। অধিকন্তু বাপের স্নেহের দুলাল পুত্রকে সামলান মায়ের পক্ষে মুস্কিল—কার্তিককে শিবশূন্য ঘরে কিছুতেই রক্ষা করা যাইবে না। শিব বুঝিলেন বাড়িঘর ছাড়িয়া গৃহিণী স্বামীর সহিত তাঁহার কার্যস্থলে যাইবার বুদ্ধি করিতেছেন। কিন্তু ইহা অত্যন্ত অনুচিত কার্য। অধিকন্তু চাষী গৃহস্থ ঘরে বসিয়া থাকিবে আর অন্যলোক দিয়া কৃষিকার্য করান হইবে—এরূপ করিলে চাষ বৃথা—গৃহস্থের ভাত জুটিবে না। পিতাপুত্রে চাষ করিবে—পুত্র না থাকিলে সহোদর ভাইয়ের সাহায্য লইতে হইবে। ইহা না করিলে চাষীর খাওয়া জোটে না—তাহাকে ঘটীবাটী বেচিতে হয়। শিব পার্বতীকে উপহাস করিয়া বলিলেন 'শিবকে বাড়িতে আটকাইয়া রাখ—চাকর ভীমকে দিয়া চাষ করাও তবেই দশ হাতে বেশ ভাল করিয়া খাইতে পাইবে।

অন্নপূর্ণা কৃষিকার্য না করাইয়াও সামান্য চোখের ইসারায় অন্ন দিয়া দেশ ভরিয়া দিতে পারেন। ইহাই যদি হয় তবে কেন তিনি শিবকে উৎপাত আরম্ভ করিয়াছেন।

ভগবানের লীলায় মানুষ সংসার হইতে ত্রাণ পাইবে। এই জন্যই পার্বতী আর শিবের মধ্যে কথা কাটাকাটি চলিতেছে। ভবানী শঙ্করকে দূরবর্তী স্থানে থাকিয়াও মাঝে মাঝে ছেলেদুটির খবর লইতে অনুরোধ করিলেন। শিবের আসন্ন বিচ্ছেদে পার্বতী বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দুই চক্ষে জলের ধারা বহিতে লাগিল—শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন ছাড়িবার সময় গোপিকাদের যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল এখানেও ঠিক সেইরূপ অবস্থা। শিব বৃষে আরোহণ করিয়া কৃষিকার্যের জন্য মর্ত্যলোকে চলিলেন—পিছনে ভীম চাকর কৃষির যন্ত্রপাতি বীজ প্রভৃতি লইয়া চলিল। পার্বতী শিবের যাত্রাপথের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। শিবানীকে পদ্মাবতী দাসী প্রবোধ দিয়া ঘরে ফিরাইয়া আনিল। শিব

পৃথিবীতে উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্রদেব জানিলেন ভগবান লীলার জন্য মর্ত্যলোকে আসিয়াছেন। তিনি এই লীলার সহায়রূপে মাঘের শেষে মেঘ হইতে জল বর্ষণ করিলেন। সাত দিনের বৃষ্টির পর শুভক্ষণে হালবাওয়া (হলপ্রবাহ) শুরু হইল। জমির চাষ চলিল। চারিদিকে আল বাঁধা হইল। জমি হইতে জল চলিবার নালাও কাটিয়া দেওয়া হইল। ক্ষেতের আলের উপর বাঘছাল পাতিয়া শিব বসিয়া কাজের তদারক করিতে লাগিলেন। ভীম দারুণ পরিশ্রম করিয়া চাষের কাজ করিতে লাগিল। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাহার ক্ষুধাও বড় প্রবল হইল। তাহাকে সেদিনের মতো খাওয়া বন্ধ করিতে শিব বলেন। ইহা শুনিয়া ক্ষুধায় কাতর ভীম একেবারে রাগে জ্বলিয়া উঠিল। সর্বকাল ধরিয়া সারাদিন সে শিবের বাড়ি খাটে কিন্তু ঠাকুর তাহাকে কোন দিন পেট ভরিয়া খাইতে দেন নাই। তাহার মনে হইল শিব পার্বতীর সহিত যুক্তি করিয়াই ভীমকে মারিবার জন্য ঐ মাঠে তাহাকে দিয়া জমি চাষ করাইতে লইয়া আসিয়াছেন। ভীম একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল--সে শিবকে বলিল ক্ষুধার আগুনে পুড়িয়া যেমন তাহার প্রাণ যাইতেছে তেমনিই যেন শিবের ক্ষেতের তৈয়ারি শস্য পুড়িযা যায়।

চাকর ভীমের কড়া কথায় গৃহস্থ শিব কিছুটা নরম হইলেন। তিনি তাহাকে কৈলাসের বাড়ি হইতে খাইয়া আসিতে বলিলেন। চাষের কাজ পরদিন সকাল বেলায় করিলেই চলিবে। ভীম প্রভুর কথায় উত্তর দিল 'সারাদিন মর্ত্যলোকে খাটিবার পর কৈলাসে যাইয়া—তোমার বাড়ি হইতে ভাত খাইয়া এখানে চলিয়া আসিব—বেশ ভাল ব্যবস্থা তুমি করিতেছ!' যাহা হউক শিব তাহাকে কার্যস্থলেই থাকিতে বলিলেন এবং সেখানেই তাহাকে খাওয়াইবার ভার লইলেন। তিনি ভৃত্যকে বীজ দুইভাগে ভাগ করিতে বলিলেন—ইহার অর্ধেক বুনিতে হইবে—অর্ধেক ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত থাকিবে। চাকরকে প্রভু ভাল করিয়া খাইতে দেন না—কোন দিন বা উপবাসে থাকিতে বলেন অথবা কৈলাস হইতে খাইয়া মর্ত্যলোকে কাজ করিতে বলেন। এরূপ চাকর ভীমের কাজের গরজ মোটেই নাই। কৃষিকর্ম যাহা হইতেছে তাহা কেবল ভগবান শিবের নিজের ইচ্ছায়। সন্ধ্যাকালে ভীমের ভাগ্যে ভাল খাবারই জুটিল। ভূত প্রেত পিশাচ দৈত্য দানব—সকল শিবের অনুচর আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবরাজ ইন্দ্র ও স্বর্গের অপ্সরারা, কিন্নরী, বিদ্যাধরীরা মহেশের খামরাবাড়িতে উপস্থিত হইলেন। ইঁহারা অন্ন ব্যঞ্জন দ্বারা ঘর ভরিয়া ফেলিলেন। নারদাদি মুনিরা আসিলেন। সেখানে উৎসবের আনন্দের হাট বসিয়া গেল। ভীমের জন্য পর্বতপ্রমাণ অন্ন স্তূপীকৃত হইল। ভীম অতি পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজনপর্ব সমাধা করিল। সে পূর্বে ক্ষুধার জ্বালায় শিবের শস্য পুড়িয়া যাইবার অভিশাপ দিয়াছিল—এখন পরমতৃপ্তির সহিত আহার করিয়া শিবকে বিপরীত আশীর্বাদ করিল—'শিবের ক্ষেতে যেন ভাল শস্য হয।' এইরূপ প্রতিদিন রাত্রিতে ভীম ভোজন করে এরং প্রভাতে হাল চাষ আরম্ভ করে। চার দণ্ড পর্যন্ত সে কাজ করে—শিব সেখানে বসিয়া কাজের তদারক করেন। এই কাজের পর চাকরের জলপানের সময় শিব হালের গোরু (গোরু ও মহিষ) চরান।

দিনদশেক চাষ করিবার পর গোরুর কাঁধের মাংস বসিয়া পড়িল—ক্ষতস্থানে শিব ধুতুরার রসের প্রলেপ দিলেন। শেষ পর্যন্ত গোরুর অসুস্থতার জন্য চাষের কাজ কামাই

করিবার অবস্থা হইয়া দাঁড়াইল। চাষের গোরুর দুঃখ দেখিয়া শিবের দয়া হইল। তাই তিনি নিজে যে যে দিনে চাষ বন্ধ করিয়াছিলেন—সেই সেই দিন চাষ-বন্ধের দিনে পরিণত হইল। ঐ সকল নিষিদ্ধ দিনে চাষ করিলে শস্য নষ্ট হয়।

মাঘ মাসে বর্ষণের পর শিবের জমিতে চাষ আরম্ভ হইয়াছিল। চৈত্র মাসের মধ্যে উহা সম্পূর্ণ হইল। চাষের পর চষা যায়গায় মই লাগাইয়া জমি সমান করা হইল। উত্তর দিকে জমিকে উঁচু রাখিয়া দক্ষিণে ঢালু করা হইল। বৈশাখ মাসে সার দিয়া জমিতে বীজ বপন করা হইল (বিছাতি=বীজ ছড়ান)। বীজ বপন সার্থক হইল। ধানের বীজ হইতে চারা জন্মিল। ক্রমে ক্রমে শস্যে ক্ষেত ভরিয়া উঠিল। মহাদেব অতি আনন্দের সহিত নবীন শস্যের দিকে চাহিয়া আছেন। অপুত্রক ব্যক্তির পুত্র হইলে যে আনন্দ হয়, অনাহারী লোক আহার পাইলে সে যেরূপ আনন্দ লাভ করে শিবেরও সেইরূপ হইল। শিব ধান্য দেখিয়া নিজ পরিজনকে পর্যন্ত ভুলিয়া গেলেন।

শিবের জমিতে প্রচুর শস্য হইল। নারদের ঢেঁকি দিয়া ভূতগণ ধান ভানিল। প্রচুর চাউলে পার্বতীর সাংসারিক অনটন দূর হইল।

অনুশীলনী

১। শিবের কৃষিকার্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দাও।

২। কৃষি আর পরের চাকুরি—এ দুটির মধ্যে কোন্‌টি ভাল—কৃষিকার্য করার স্বপক্ষে কি যুক্তি আছে? ব্যবসায়ের দোষ বর্ণনা কর।

৩। শিব দেবতা হইয়া কৃষিবৃত্তি কেন অবলম্বন করিলেন?

৪। শিবের কৃষিকার্যের কাহিনী অবলম্বন করিয়া মধ্যযুগের বাঙ্‌লার কৃষকজীবন সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ লিখ।

১৬। ব্যাসকাশীর উপাখ্যান

বাঙ্গালা সাহিত্যে চণ্ডীকাব্যের ধারা পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। এই সময়ে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর তাঁহার অন্নদামঙ্গল রচনা করেন। অন্নদামঙ্গলের কাহিনী চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী হইতে পৃথক্‌। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের গৃহদেবতা অন্নপূর্ণার অশেষ অনুগ্রহের বিবরণ প্রকাশই এই কাব্যের উদ্দেশ্য। পরস্পর-সম্পর্করহিত তিনটি কাহিনী লইয়া অন্নদামঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছে। কাব্যের প্রথম অংশে অন্নপূর্ণার কাহিনী রহিয়াছে। পার্বতী সর্বরিক্ত শিবকে কাশীতে অন্নপূর্ণারূপে ভিক্ষাপ্রদান করেন। ইহার পর কাব্যের দ্বিতীয় অংশ হইতেছে সংস্কৃত কবি বিল্‌হনকে অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী। তৃতীয় খণ্ডে মোগল সেনাপতি মানসিংহ কর্তৃক প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে অভিযানে ভবানন্দ মজুমদারের (রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ) বাদসাহী সৈন্যকে সাহায্যদানের কাহিনী কাব্যের উপজীব্য বিষয়রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

ভারতচন্দ্র নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় তাঁহার খুব ভাল দখল ছিল। নানা প্রকার ছন্দের ব্যবহারে তিনি তাঁহার কাব্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। বাঙ্‌লায় ধ্বন্যাত্মক শব্দের এবং শব্দদ্বৈতের প্রয়োগ তাঁহার মত অপর কেহ করিতে পারেন নাই। তিনি ছিলেন পরম পণ্ডিত শব্দশিল্পী কবি—ছন্দ ও অলংকারের প্রয়োগে মধ্যযুগে

তিনি অদ্বিতীয়। তিনি আধুনিক যুগের অগ্রদূত—তাঁহার প্রভাবকে আধুনিক বাঙালা সাহিত্যের গোড়ার দিককার অনেক কবি অতিক্রম করিতে পারেন নাই। ব্যাসকাশীর উপাখ্যান অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ড হইতে গৃহীত হইল।]

মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস—সমগ্র বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। অষ্টাদশ পুরাণ তাঁহার রচনা। তিনি চিরজীবী। কোন স্থানে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হইলেই সেখানে তিনি সশিষ্য উপস্থিত হইয়া থাকেন। ব্যাস একদিন নৈমিষারণ্যে যাইয়া দেখেন সেখানকার ঋষিগণ বিল্বপত্র দিয়া শিবের পূজা করিতেছেন। তিনি মুনিদের বলিলেন যিনি মুক্তি দান করিয়া থাকেন সেই হরির ভজনা করা কর্তব্য—শিবের পূজা নিষ্ফল কার্য। মুনিগণ এই কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন ব্যাসদেব অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করিয়াও অজ্ঞান ব্যক্তির মতো কথা বলিতেছেন। কিন্তু সকলেই তাঁহার বাক্য বিশ্বাস করিয়া থাকে। শিবপুরী কাশীতে গিয়া তিনি যদি এই কথা বলিতে পারেন. তবে মুনিরা শিবকে ছাড়িয়া হরির আরাধনা করিবেন। সুতরাং শিবভক্ত শৌনক প্রভৃতি নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ বাঘের ছাল পরিয়া রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ করিয়া কাশীযাত্রা করিলেন। ব্যাসদেবও বৈষ্ণবগণসহ বারাণসী পুরীর উদ্দেশে গমন করেন।

শিব এবং হরিকে লইয়া শৈব এবং বৈষ্ণবের বিবাদ বাধিয়াছে—দেবগণ লুকাইয়া এই কথা শুনেন।

শিব আর হরির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন ভেদ নাই। যিনি হরি তিনিই শিব—যিনি শিব তিনিই হরি। তবে অভেদ বস্তুতে ভেদ সৃষ্টি করিয়া যে ঝগড়া বাঁধিয়াছে ইহার জন্য কোন্ দেবতার ক্রোধ কাহার উপর পড়িবে বুঝা যাইতেছে না।

ব্যাসদেবের কাশী যাত্রা করিবার উদ্দেশ্য হইতেছে তিনি ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত—ইহা নির্ণয় করা। কাশীতে উপস্থিত হইয়া মহামুনি ব্যাস "আদিকেশবের" পূজা করিয়া হরিলীলা কীর্তনে মাতিলেন। কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে সেখানে শিবনিন্দা প্রচার করিতে লাগিলেন—'হরি ছাড়া আর কোন দেবতা মুক্তি দান করিতে পারেন না—শিব প্রভৃতি দেবতারা মানুষকে কেবল ঐহিক সুখভোগের সুবিধা করিয়া দিতে পারেন।'—এই কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া ব্যাস যখন শঙ্করের নিন্দা করিলেন তখন ভগবান্ শিব ভীষণ ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহার প্রধান অনুচর নন্দী ব্যাসের দিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহার (মুনির) দিকে ক্রোধপূর্ণ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। শিব-নিন্দা করিবার সময় ব্যাস হাত তুলিয়া উহা প্রচার করিতেছিলেন। নন্দীর তীব্র দৃষ্টিতে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল—হাত দুইটিও নিশ্চল হইয়া ক্রিয়াশক্তি হারাইল। বেদব্যাসের এই বিপদ জানিতে পারিয়া হরি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া শিবনিন্দার জন্য মুনিকে নানাভাবে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। হরি বলিলেন "যে অন্যায় তুমি করিয়াছ তাহা করা হইয়া গিয়াছে। ইহার পর তুমি সাবধান হও। শিবকে তুমি মান্য কর। শিবের স্তব করিলে তুমি এই পাপ হইতে উদ্ধার পাইবে।" ব্যাসদেব শংকরের বিস্তর স্তুতি করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন।

তদবধি ব্যাসদেব শৈব হইলেন—তুলসীর কণ্ঠী ফেলিয়া রুদ্রাক্ষের মালা পরিলেন। সেই

দিন হইতে হরিনাম আর মুখে আনিলেন না। এইভাবে ব্যাস কাশীতে বাস করিতে লাগিলেন। মুনিবরের এইরূপ সুবিধাবাদীর মতো আচরণ দেখিয়া শিব অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করিলেন– তিনি নন্দীকে বলিলেন—

"এইরূপে বেদব্যাস রহিলা কাশীতে। নন্দীরে কহেন শিব হাসিতে হাসিতে॥
দেখ দেখ অহে নন্দি ব্যাসির দুর্দৈব। ছিল গোঁড়া বৈষ্ণব হইল গোঁড়া শৈব॥
যবে ছিল বিষ্ণু ভক্ত মোরে না মানিল। যদি হৈল মোর ভক্ত বিষ্ণুরে ছাড়িল॥
মোর ভক্ত হয়ে যেবা নাহি মানে হরি। আমি ত তাহার পূজা গ্রহণ না করি॥
অভেদ দুজনে মোরা ভেদ করে ব্যাস। উচিত না হয় যে কাশীতে করে বাস॥"
চঞ্চল ব্যাসের মন শেষে যাবে জানা। কাশীতে ব্যাসের অন্ন শিব কৈল মানা॥"

ব্যাস চঞ্চলমতি। যখন যেখানে সুবিধা ব্যাস সেই দিকে চলেন। তাঁহার কাশীতে বাস করা উচিত নহে। তাই এখানে তাহার ভিক্ষান্ন তিনি পাইবেন না।

ব্যাস ভিক্ষা করিতে বাহির হ'ন–, গৃহস্থও ভিক্ষা দিতে অগ্রসর হয়। কিন্তু শিবের মায়ায় সব উধাও হয়। ভিক্ষা না পাইয়া ব্যাসদেব গৃহস্থকে কটু কথা বলেন। সকলে বলে এই মুনিই লক্ষ্মীছাড়া—তাই ইনি গৃহস্থের দ্বারে আসিলে ভিক্ষার অন্ন উধাও হয়।

শিষ্যগণও কোন স্থানে ভিক্ষা পান না। তিনি শিষ্যদের সহিত একদিন উপবাস করিলেন। পরদিনও তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কোন ভিক্ষা পাইলেন না। ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হইয়া তিনি কাশীকে শাপ দিতে মনস্থ করিলেন। ধনবিদ্যা মোক্ষের অহংকারে কাশীবাসীরা ভিক্ষা না দেওয়ায় ব্যাস এইরূপ শাপ দিলেন--

"তবে আমি বেদব্যাস এই দিনু শাপ। কাশীবাসী লোকের অক্ষয় হবে পাপ॥
অনত্র যে পাপ হয় তাহা খণ্ডে কাশী। কাশীতে যে পাপ হবে হবে অবিনাশী॥"

শাপ দিয়া আবার মুনিবর ভিক্ষায় বাহির হইলেন—কিন্তু পূর্বের মতই ভিক্ষা পাইলেন না। ঐ সময় ব্যাসদেব মাতা অন্নপূর্ণার দর্শন পাইলেন। কাশীতে মাতা অন্নপূর্ণার কাছে সকলেই সমান। ব্যাস তিনদিন উপবাসী। মাতা তাঁহাকে খাওয়াইবার জন্য ব্যস্ত। শিবের ইহা ভাল লাগিল না। কিন্তু অন্নপূর্ণার ধমক খাইয়া শিব চুপ করিলেন। অন্নপূর্ণা মোহিনীরূপ ধরিয়া এক বৃদ্ধ গৃহস্থের পত্নী সাজিলেন। পতি অতিথিবৎসল। অতিথিকে খাওয়াইয়া এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আহার করেন। ক্ষুধায় কাতর ব্যাস এই গৃহস্থের ঘরে সশিষ্য নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া পরম তৃপ্তি সহকারে ভোজন করিলেন। ভোজনান্তে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ব্যাসের সহিত শাস্ত্রালাপ আরম্ভ করিলেন। তিনি জানিতেন না যে এই ব্রাহ্মণ স্বয়ং শিব। পূর্বে জানিলে ভাল হইত; কারণ সতর্কতার সহিত তিনি শাস্ত্রীয় আলাপ চালাইতে পারিতেন। কিন্তু বিধি যেখানে বাম সেখানে মানুষ শত চেষ্টা করিয়াও অনিষ্টের প্রতি-বিধান করিতে পারে না। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন—তপস্বী কাহাকে বলে? কি কাজ করিয়া মনুষ্য পরলোকে উদ্ধার পায়? ইত্যাদি। ব্যাস অনেক উত্তর দিলেন—তপস্যার মধ্যে প্রধান সন্ন্যাস। সর্বজীবে সমভাব, জয়াজয় তুল্য—মাটি আর মাণিক্যের মূল্য সমান জ্ঞানে করা, বিষ্ণু হইতে মুক্তিলাভ ইত্যাদি বহু মত তিনি বলিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপী শিব বলিলেন 'ইহার মধ্যে কোন্ ধর্ম লইয়া তুমি আছ? কাশীর লোককে নির্বিচারে অভিশাপ

দিয়া তুমি দয়া, ধর্ম, ক্ষমাদি মানসিক তপস্যাকে নষ্ট করিয়াছ।' এই বলিয়া শিব নিজের প্রলয়ংকর মূর্তি ধরিয়া ব্যাসকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু মা অন্নপূর্ণার দয়ার জন্য কিছু করিতে পারিলেন না। শিব তখন ব্যাসকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন—

"বেদব্যাস নাম পেয়ে নাহি মান বেদ। কি মর্ম বুঝিয়া হরিহরে কর ভেদ॥
সেই পাপে তোর বাস না হবে কাশীতে। আমি মানা করিলাম তোরে ভিক্ষা দিতে॥"

বিষয়টি চিন্তা করিলে ব্যাস অবশ্যই ভিক্ষা না পাইবার কারণ বুঝিতে পারিতেন। কিন্তু কোন বিচার বিবেচনা না করিয়া তিনি কাশীবাসিগণকে অনর্থক শাপ দিয়াছেন। শিবের আদেশে ব্যাসদেব কাশী হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। তিনি অন্নপূর্ণার শরণাপন্ন হইয়া কাশীবাসের জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইলেন। অন্নপূর্ণা ব্যাসের উপর সদয়া হইলেন। শিবের আজ্ঞা অলঙ্ঘ্য--তাঁহার আদেশ অবশ্যই ফলিবে—তবে প্রতি মাসে চারবার কাশীতে আসিয়া মনিকর্ণিকা তীর্থে ব্যাসদেব স্নান করিতে পারিবেন। দেবী এইটুকু সুবিধা তাঁহাকে দিলেন।

মুনি তাঁহার শিষ্যগণ লইয়া কাশী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু নিজ কৃতিত্বের অভিমান আর মনের চঞ্চলতা ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

এখন শিবের বিনা অনুগ্রহে দ্বিতীয় কাশী নির্মাণ করিবার প্রচেষ্টায় ব্যাসদেব উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। তাঁহার মনে গভীর দুঃখ উপস্থিত হইল। তাঁহার মতো অত বড় জ্ঞানী তপস্বীর কাশীতে স্থান হইল না—কিন্তু অতি তুচ্ছ লোকেরা সুখে কাশীবাস করে। ব্যাস কাশী হইতে বহিষ্কৃত হইলেন—এই কলঙ্ক চিরস্থায়ী হইবে। পৃথিবীতে তাঁহার যথেষ্ট যশ প্রতিষ্ঠা ছিল। কিন্তু এই ভাঙ্‌খোর শিব তাঁহার সকল অহংকার চূর্ণ করিয়াছেন। মানুষের শক্তি নষ্ট হওয়ার চেয়ে প্রাণ নষ্ট হওয়া অনেক ভাল। সকলেই ব্যাসকে দেখাইয়া উপহাস করে 'ইনি সেই বেদব্যাস যাঁর কাশীতে স্থান হয় নাই'। এইরূপ অপমানের চেয়ে মৃত্যুও ভাল, কিন্তু তাঁহার মরিবারও উপায় নাই। কারণ ভগবান্ তাঁহাকে চিরজীবী করিয়াছেন। যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, দুঃখের কথা ভাবিয়া লাভ নাই!

কাশীর নিকটে বেদব্যাস এক কাশীর পরিবর্তে দ্বিতীয় কাশী নির্মাণের সংকল্প করিলেন। এই নূতন কাশীতে জীবের মুক্তি পাইতে কোন কষ্ট হইবে না—

"কাশীতে মরিলে জীব
রাম নাম দিয়া শিব
কতকষ্টে মোক্ষ দেন শেষে।
এখানে মরিবে যেই, সদ্যমুক্ত হবে সেই
না ঠেকিবে আর কোন ক্লেশে॥"

তপস্যা দ্বারা অসম্ভব সম্ভব হয়। এই কাশী নির্মাণে, ব্যাসদেব তাঁহার সারা জীবনের তপস্যা পণ করিলেন। পূর্বেও রাজর্ষি বিশ্বামিত্র সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার সহিত বিরোধ করিয়া অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছিলেন। একমাত্র শিব ছাড়া ব্যাসদেবের কোন দেবতার সহিত বিরোধ নাই। তাঁহার বিরুদ্ধ দেবতা শিবের সেবা না করাই ভাল। বিষ্ণুরও অনেক

গুণের প্রমাণ ব্যাসদেব পাইয়াছেন। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা সকলের বড়। তিনি সকলের পিতামহ—সৃষ্ট সকলেই তাঁহার সন্তান। তিনি সন্তানের প্রতি কৃপাশীল। তাঁহার আরাধনা করিয়া এখনেই সব পাওয়া যাইবে। এখন ব্যাসের সম্মুখে বড় কার্য হইল মোক্ষপুরী নির্মাণ করিয়া নিজের যশের প্রচার করা। নূতন এই পুরীর নাম হইবে "ব্যাস বারাণসী" (ব্যাস-কাশী)।

"পুরী করি মোক্ষধাম জাগাইব নিজ নাম
নাম থুব ব্যাস বারাণসী॥"

দ্বিতীয় বারাণসী করিতে হইলে মহাতীর্থ গঙ্গাকে চাই। গঙ্গা ছাড়া তো কাশী হইতে পাবে না। মোক্ষকপাটের চাবি হইতেছেন মা গঙ্গা। আর গঙ্গাই বা এখানে না আসিবেন কেন! ব্যাসদেব মনে করেন তিনিই পুরাণে (গঙ্গার) তাঁহার মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন, তাহা না করিলে গঙ্গাকে কে জানিতে পারিত! সর্বপ্রথমে ব্যাসদেব গঙ্গাকে তাঁহার সঙ্গে আসিতে প্রর্থনা জানাইলেন।

"ব্যাস কন গঙ্গে চল মোর সঙ্গে
আমি এই অভিলাষী।
কাশীমাঝে ঠাঁই শিব দিল নাই
করিব দ্বিতীয় কাশী॥"

ইহার পর ব্যাস তীব্র ভাষায় শিবের সর্বপ্রকার নিন্দনীয় কার্যের উল্লেখ করিলেন। তাঁহার সকল অমঙ্গল সত্ত্বেও যে শিবকে লোকে মানে তাহার কারণ পরমমঙ্গলময়ী গঙ্গা তাঁহার মস্তকে অবস্থান করেন। গঙ্গা জলমাত্র নহেন তিনি হইতেছেন কারণ সলিল—ব্রহ্মের দ্রবীভূত রূপ।

যেখানে গঙ্গার জল থাকে সেখানে লোকের পাপের প্রায়শ্চিত্তের ভয় থাকে না। দ্বিতীয় কাশীকে প্রকাশ করিবার জন্য ব্যাস গঙ্গাদেবীকে এইরূপ কাতরভাবে অনুনয় করিলেন। গঙ্গা দেবী যে উত্তর ব্যাসকে দিলেন তাহা তাঁহার মোটেই প্রীতিকর হইল না। একমাত্র শিব কাশী নির্মাণ করিতে পারেন। ব্যাসের এই কার্যে কোন শক্তি নাই।

অন্য সৃষ্টির পূর্বে শিব কাশী সৃষ্টি করিয়াছেন। পৃথিবীর দোষগুণ হইতে এই পুরীকে সম্পূর্ণ মুক্ত করিবার জন্য ইঁহাকে তাঁহার শূলের অগ্রভাগে স্থাপন করিয়াছেন। মহাপ্রলয়ে বিশ্বধ্বংস হইলেও কাশীর বিনাশ নাই।

"না ছিল সৃষ্টির আছি যখন। কাশীপতি কাশী কৈলা তখন॥
থুইলা আপন শূলের আগে। পৃথিবীর দোষগুণ না লাগে॥
করিবেন যবে প্রলয় হর। রাখিবেন কাশী শূলে উপর॥"

তিনি যে তারকব্রহ্ম নাম (হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি) কাশীবাসীর কানে দেন—উহাও তাঁহার নিজের নাম।

"তুমি কি বুঝিবা তাঁর চলনি। আপনার নাম দেন আপনি॥"

সুতরাং মুক্তিদাতা হইতেছেন শিব নিজেই। ব্যাসদেব এই কথা শুনিয়া অবাচ্য কটু

ভাষায় গঙ্গাদেবীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। ব্যাসদেবের মনোমত কথা যিনি বলিবেন না, তিনি তাঁহার উপরেই ক্রুদ্ধ হইয়া থাকেন। গঙ্গাদেবীও ব্যাসকে কুকথার যথোচিত উত্তর দিয়াছিলেন।

জগতের যত পুরুষ সকলেই শিব—যত নারী সকলেই গঙ্গার অংশ। শিব পরম-পুরুষ। গঙ্গা পরাপ্রকৃতি তিনি ব্যাসদেবের ব্রহ্মশাপের ভয় রাখেন না, কারণ—

"ব্রহ্মশাপ কিবা দিবি কে তোরে ডরায়। ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ মোর নামে যায়॥"

ব্যাস গঙ্গাকে বড় করেন নাই। বেদে গঙ্গার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত, বেদব্যাস, পুরাণে তাহার প্রকাশক মাত্র। এই সকল কথা বলিয়া ব্যাসের নিকট হইতে গঙ্গা অন্তর্হিত হইলেন।

মুনি গঙ্গার গালি খাইয়া বিশ্বকর্মার আশ্রয় লইলেন, যদি তাঁহার দ্বারা কার্যসিদ্ধি হয়। ব্যাসের অভীষ্ট ন্যায্যই হউক আর অন্যায়ই হউক যে দেবতা উহা সিদ্ধ করিবেন তাঁহাকে তিনি ইচ্ছা মত বড় করেন, আর বিপরীত কিছু বলিলে সেই দেবতার উপর চটিয়া যান। বিশ্বকর্মা দেবশিল্পী। তাঁহাকে ডাকিলে ব্যাস কাশী তো তিনিই নির্মাণ করিয়া দিতে পারেন। সুতরাং ব্যাস আকুলভাবে তাঁহার ধ্যান ও স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বরের উপরে তাঁহাকে স্থান দিলেন।

কাশীতে শিব ব্যাসকে থাকিতে দেন নাই। সেই অভিমানে দ্বিতীয় কাশী নির্মাণ করিতে তিনি ইচ্ছা করেন। সুতরাং বিশ্বকর্মা এই ঘোর সংকটে তাহাকে উদ্ধার করুন। যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে ত্রিদেব (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব) ছাড়িয়া বিশ্বকর্মাকেই ব্রহ্মপদ ব্যাসদেব দিবেন আর পুরাণেও তাঁহারই মহিমা কীর্তন করিবেন। এত লোভ দেখাইয়াও ব্যাসদেব, বিশ্বকর্মা দ্বারা পুরী নির্মাণ করাইবার স্বীকৃতি আদায় করিতে পারিলেন না। অধিকন্তু বিশ্বকর্মা ব্যাসের প্রার্থনা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিলেন।

তখন কাজের কথা বিশ্বকর্মা বলিলেন। তিনি আগে কাশীর ঈশ্বর বিশ্বনাথের (বিশ্বেশ্বরের) পুরী নির্মাণ করিবেন, তারপর অন্য কথা। এই কথা শুনিয়া ব্যাস রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন। তাঁহার হিতাহিত জ্ঞান রহিল না। শিবের সঙ্গে মুনির বিবাদ। সেই শিবকে বিশ্বকর্মা আনিতে চাহেন। ব্যাস ক্ষিপ্ত হইয়া দর্পভরে বলিলেন—তিনি তপস্যার বলেই দ্বিতীয় কাশী নির্মাণ করিবেন, কোন দেবতার সাহায্য বা কৃপা তিনি চাহেন না। বিশ্বকর্মার যত কারিগর (মিস্ত্রী) তাহারা চিরকাল দুঃখ ভোগ করিবে—তাহারা সব দিন কাজ পাইবে না—এইরূপ অভিসম্পাত দিয়া বিশ্বকর্মাকে ব্যাস সেখান হইতে দূর করিলেন।

শিবকে লঙ্ঘন করিয়া কাশীকে প্রকাশ যে করিতে চাহে সে ভ্রান্ত। শিবের প্রকৃত তত্ত্ব জানিলে এ সকল কথা ব্যাসের মুখ দিয়া বাহির হইত না।

ব্যাস নিজের কার্য উদ্ধারের জন্যই বিশ্বকর্মাকে ব্রহ্ম বানাইতেও দ্বিধা করেন নাই, কিন্তু বিশ্বকর্মা ব্রহ্ম হইতে পারেন না। তাঁহার ব্রহ্ম হইবার যোগ্যতা নাই। ব্যাসদেব যে দেবতাকে যখন দুর্দান্ত দেখেন তখনই তাঁহাকে ইচ্ছামত ব্রহ্ম বানান। তিনি এইরূপে তাঁহার রচিত শাস্ত্রসমূহে দেবতায় দেবতায় বা এক দেবতার ভক্তের সহিত অপর দেবতার

ভক্তের কলহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিশ্বকর্মা স্বস্থানে ফিরিলেন। কিন্তু ব্যাসের মনে শান্তি নাই। তিনি নিজ অভীষ্ট পূরণের জন্য ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহাকে দর্শন দিলেন। তখন ব্যাস নিজের অশেষ দুঃখের কথা বলিলেন এবং সেই সঙ্গে শিবের নিন্দা করিতে বাকি রাখিলেন না। ব্রহ্মা বলিলেন 'দেখিতেছি তুমি নিতান্ত শিশু। শিবের সঙ্গে তুমি বিবাদ কর, এতো বড় গোলমেলে ব্যাপার! কাশীতে শিব তোমাকে থাকিতে না দিলে তুমি সেখানে থাকিবে না। যেখানে সেখানে বসিয়া শিব নাম জপ কর—যেখানে শিব নাম জপ হয়, সেখানেই কাশী। কাশীপতি শিবছাড়া, কাশী-নির্মাণ করিবার ক্ষমতা দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির নাই। শিবকে লঙ্ঘন করিয়া আমি তোমাকে অভীষ্ট বর দিতে পারিব না। আমি জগতের বিধাতা (সৃষ্টিকর্তা) হইলেও শিব আমার সৃষ্টিকর্তা। প্রজাপতি ব্রহ্ম-লোকে চলিয়া গেলেন। ব্যাস যাঁহারই শরণ ল'ন না কেন তাহার নিকট হইতেই নিজ প্রার্থনা প্রত্যাখ্যাত হয়। কিন্তু তাহার এখন ভাবনা হইল। শেষ পর্যন্ত কি হয় বলা যায় না। তবে চেষ্টার অসাধ্য জগতে কিছুই নাই। ব্যাস তখন স্থির করিলেন—

যে হোক সে হোক আরো করিব যতন। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন॥

শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে কাশীর অধিষ্ঠাত্রী মাতা অন্নপূর্ণা দেবী। নিখিল বিশ্ব তাহার মায়া। হরি হর ব্রহ্ম কেহই তাঁহার সীমা জানেন না। তাঁহার দয়াও অসীম। তিনি সকলের বড়। শিব অন্ন দিতে নিষেধ করা সত্ত্বেও অন্নপূর্ণা আমাকে অতর্ক্য বস্তুদান করিয়া বাঁচাইয়াছেন। 'শিবে না মানিয়া তিনি মোরে অন্ন দিল।' অতএব তাঁহার দৃঢ় উপাসনায় আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে অন্নপূর্ণা এইখানে বসিয়া মুক্তিদান করিবেন। ধীর স্থির হইয়া ব্যাসদেব মাতা অন্নপূর্ণার ধ্যানে বসিলেন এবং বিস্তর কঠোর তপস্যা করিলেন।

এদিকে ব্যাসের কঠোর তপস্যায় মাতা অন্নপূর্ণা স্থির থাকিতে পারিলেন না। মাতা কৈলাসপুরীতে স্বস্থানে বাস করিতেছিলেন। কৈলাসে পরিবার পরিজনের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। পতিপুত্র লইয়া শিবগৃহিণীর বারটি মুখের অন্নের ব্যবস্থা করিতে হয়—গণেশের একমুখ, কার্তিকের ছয়মুখ—শিবের পাঁচ মুখ—এই গেল বারমুখ। ইহার উপর ভূত বেতাল ভৈরবগণের সংখ্যাও বেশ ভারী মাতা অন্নপূর্ণা স্বয়ং এবং সহচরী জয়া বিজয়া আছেন। ইঁহাদের জন্য পর্বত প্রমাণ অন্নব্যঞ্জন ও বহুবিধ সুস্বাদ খাদ্য স্তূপীকৃত হইয়াছে। মাতা অন্নপূর্ণা স্বয়ং পরিবেশন করিতেছেন। নারীরূপে পতিপুত্র পরিজন লইয়া জগন্মাতা তাঁহার লীলারসে মত্ত। ব্যাসের কঠোর তপস্যায় মায়ের টনক নড়িল বটে, কিন্তু হিত করিতে গিয়া বিপরীত ফল ফলিল। যখন মানুষের দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয় তখন ভাল কাজেরও ফল অত্যন্ত খারাপ হয়। অন্নপূর্ণা যখন পরিবার পরিজনকে অন্ন পরিবেশন করিতেছিলেন তখন হঠাৎ তাঁহার হাত হইতে হাতা পড়িয়া গেল। মায়ের পায়ে উছট লাগিয়া পা টলিয়া যাওয়ায় তাঁহার মাটিতে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। ইহাতে অন্নদা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। তাঁহার ভাবান্তর দেখিয়া শিব ইহার কারণ জিজ্ঞাসা

করিলেন। অন্নপূর্ণা বলিলেন—

"অন্নদা কহেন হরে ব্যাস মুনি তপ করে
অনশন কৈল বহুতর।
তুমি ঠাঁই নাহি দিলে কাশী হইতে খেদাইলে
তাহাতে হয়েছে অপমান।
করিতে দ্বিতীয় কাশী হইয়াছে অভিলাষী
সেই হেতু করে মোর ধ্যান॥"

শিব বলিলেন—

"হাসিয়া কহেন হর বুঝি তারে দিবা বর
মোরে মেনে দয়া না ছাড়িও।
আমি বৃদ্ধ তাই কই জানি নাই তোমাবে
এক মুটা অন্ন মেনে দিও॥"

ব্যাসকে 'তুমি বর দিতে চাহিতেছ। কিন্তু এই বৃদ্ধেব সম্মানও রক্ষা কবিও।'

শিব অন্নপূর্ণার নিকট হইতে এই কৌতুকের কঠোর উত্তর পাইলেন।

বর দিলেও ব্যাসের কি হয় তাহা এখানে বসিযাই দেখিতে পাইবে। তাহার সাধ বড উৎকট! তোমার সঙ্গে বিবাদ করিয়া সে ব্যাসকাশী নির্মাণ করিতে চায়!

"সক্রোধে কহেন শিবা কৌতুক করহ কিবা
কি হয় তাহার দেখ বসি।
এত বড় তার সাঙ্গ তোমা সনে করি বাদ
করিবেক ব্যাস বারাণসী॥"

সে আমার অসময় সুসময় বিচার না করিয়া আমাকে যথেষ্ট বিরক্ত করিয়াছে। তপস্যা যখন সে করিয়াছে তখন বর তাহাকে একটা দিতে হইবে। কিন্তু তাহার অপরাধেরও শাস্তি হওয়া চাই। বলি-রাজার কথা তোমার মনে আছে। ত্রিপাদ ভূমি হরিকে দান করিযাও বিষ্ণুর ছলনায় তাঁহাকে পাতালে যাইতে হইয়াছিল। সেইরূপ ব্যাসকে প্রথমে বর দিয়া পরে মায়া সৃষ্টি করিয়া শাপ দিব।

অন্নপূর্ণা মহামায়া জরতীবেশে (বুড়ীর বেশ ধরিয়া) ব্যাসদেবকে ছলনা করিতে চলিলেন। ইহার পূর্বেই ব্যাসদেব দেবীর বরে ব্যাসকাশী নির্মাণ করিয়াছেন। বুড়ী (জরতী) সেই দিকে চলিল। বুড়ীর ডানহাতে ভাঙ্গা লাঠি—বাঁ কাঁকে ঝুড়ি, মাথায় উস্কা খুস্কা (অসম্বধ) চুল—ধূলায় ভরা, তাহাতে নানারকম উকুন বাসা বাঁধিয়াছে, চক্ষু দুইটি কোটরাগত। নাক মুখ কান দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিতেছে—বাতে তার সকল শরীব বাঁকা, পিঠে মস্ত একটা কুঁজ, খাদ্যের অভাবে শরীরে হাড় কয়খানা মাত্র আছে,—মাংস নাই, উপরে উহা চামড়া দিয়া কেবল ঢাকা। বহু যায়গায় ছেঁড়া একখানি ন্যাকড়া সেই বুড়ী পরিয়াছে, ইহার উপর সে ভাল করিয়া কানে শুনিতে পায় না। এই মুহূর্তে অন্নপূর্ণা ব্যাসের নিকটে আবির্ভূতা হইলেন। বুড়ী হাতের ঝুড়ি ফেলিয়া দিয়া দুই হাঁটু ধরিয়া বসিয়া পড়িল। মুখখানা তার মলিন। মাটিতে ঠেকিয়া বুড়ীর হাঁটু তাহার কান ও চিবুক

ঢাকিয়া ফেলিল; আর কুঁজের ভারে পিঠের ভার মাটিতে লুটাইল। উকুনের কামড়ে অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়া বুড়ী নিজের দুই হাত দিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। তখন সে ব্যাসকে বলিল, 'আমার তিনকাল গিয়া এককাল ঠেকিয়াছে—বাঁচিবার ইচ্ছা নাই। কোথায় মরিলে মুক্তি পাইব ভাবিয়া পাইতেছি না। কাশীতে যদি মরি, তবে তারকব্রহ্ম নামে শিব অত্যন্ত দেরীতে মুক্তি দিবেন। এরূপ যায়গায় মরিতে মন সরে না। আমি মরিবমাত্রই মুক্তি চাই। হে ব্যাস! তুমি নাকি শিবের কাশী ছাড়া আর একটি কাশী তৈয়ারি করিয়াছ—বল তো এখানে মরিলে কি হয়?'

"কাশীতে মরিলে তাহে কত ভোগ আছে। তারক মন্ত্রেতে শিব মোক্ষ দেন পাছে॥
তুমি নাকি কাশী করিয়াছ মহাশয়। সত্য করি কহ এথা মরিলে কি হয়॥"

ইহার উত্তরে ব্যাস কহিলেন, 'আমি দৃঢ়তার সহিত কহিতেছি এখানে মরিবামাত্র জীবের মুক্তি হয়। তোমার যদি বুদ্ধি থাকে এখানে বাস কর।'

"ব্যাস কন এই পুরী কাশী হৈতে বড়। মৃত্যুমাত্র মোক্ষ হয় এই কথা দড়॥"

দেবী অন্নপূর্ণা ছল করিয়া ব্যাসকে বাহিরে রাগ দেখাইয়া বলিলেন "অনাথা দেখিয়া তুই আমার মরণ কামনা করিলি। কিন্তু জানিয়া রাখ, সকলের মৃত্যু আমি এখানে বসিয়া দেখিব। আমার বয়স বেশি হয় নাই—নানা রোগভোগের জন্য আমাকে যতটা বুড়া দেখায় আমি তত বুড়া নই। কেহই বুঝে না আমার বয়স কত হইয়াছে। আর আমার বড় ভাবনা যে লোকে আমাকে বুড়ী বলে।" এই বলিয়া মাতা অন্নপূর্ণা ঐস্থান ছাড়িয়া চলিলেন। ব্যাসদেব আবার অন্নদার ধ্যান আরম্ভ করিলেন। শাস্ত্রানুসারে দেবতারা মন্ত্রের অধীন। সুতরাং জরতীরূপিণী অন্নদা ফিরিয়া আসিয়া ব্যাসকে বলিলেন—অল্পেতেই বৃদ্ধবয়সে লোকে রাগিয়া যায়—আর অল্প সময়ের মধ্যেই তাহারা সব ভুলিয়া থাকে, বাছা! এখানে মরিলে লোকে কি হয়, আর একবার বল না!"

ব্যাসদেব তাঁহার সেই পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি করিলেন।

"ব্যাসদেব কন বুড়ী বুঝিতে নারিলে। সদা মোক্ষ হইবেক এখানে মরিলে॥"

এই কথা শুনিয়া বুড়ী বলিল 'বিধি বাম—তাই আমি কালা হইয়াছি—তুমি কি বলিলে আমি শুনিতে পাই নাই'—এই কথা বলিয়া বুড়ী সেখান হইতে অন্যত্র চলিল। আবার ব্যাসদেব (অন্নদার) তাঁহার ধ্যান করেন। আবার বুড়ী আসে আর একই কথা বলিয়া চলিয়া যায়। এইরূপ একবার দুইবার নয়, পাঁচ ছয় সাতবার ব্যাসের নিকট বুড়ী যাতায়াত করিল। বারে বারে ব্যাসের ধ্যান ভঙ্গ হওয়ায় বুড়ীর উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মুনি তাহার কর্ণ-কুহরে কহিলেন—

"ডাকিয়া কহিলা ক্রোধে কানের কুহরে। গর্দভ হইবে বুড়ী এখানে যে মরে॥"

ব্যাসের এই কথা বুড়ী এবার বুঝিবার ছল করিল—

"বুঝিনু বুঝিনু বলি করে ঢাকে কান। তথাস্তু বলিয়া দেবী হৈলা অন্তর্ধান॥"

মহামুনি বেদব্যাস নিজের কথাতে নিজেই বাঁধা পড়িলেন। দেবী তথাস্তু বলিয়া সেখান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। পরে ব্যাসের দারুণ অনুতাপ উপস্থিত হইল।

ব্যাস বহুকাল জগন্মাতা অন্নপূর্ণার ধ্যান জপ করিয়া শরীর ক্ষয় করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে কেনই বা জগন্মাতা মহামায়া ছলনা করিলেন, ইহাতে তাঁহার কি লাভ হইল! তিনি ইহা বুঝিতে পারিলেন না।

"ব্যাস বারাণসী হবে ভাবিলাম বসি। বাক্য দোষে হইল গর্দভ বারাণসী॥"

ব্যাসের নিজের কথার দোষে ব্যাসকাশী গর্দভ কাশীতে পরিণত হইল। দেবীর বাক্য অব্যর্থ—ইহার অন্যথা কখনই হয় না। জগন্মাতা অন্নপূর্ণা আকাশবাণীদ্বারা ব্যাসের অপরাধের একটা বিবরণ দিলেন—

"শুন শুন ব্যাসদেব কেন ভাব তাপ। এ দুঃখ তোমারে দিল শিবনিন্দা পাপ॥
জ্ঞান অহঙ্কারে বারাণসী মাঝে গিয়া। শিব হৈতে মোক্ষ নহে কহিলা ডাকিয়া॥"

এই অজ্ঞানতার ফলে ব্যাসদেবের বাহু ও কণ্ঠ পূর্বে স্তব্ধ হইয়াছিল। শিবের স্তুতি গান করিয়া মুনি এই সংকট হইতে উদ্ধার লাভ করেন। শিবের শক্তি দেখিয়া তিনি বিষ্ণুর ভজনা ছাড়িয়া দিলেন। ইহাও পাপ। এই পাপে কাশীতে ব্যাস ভিক্ষা পাইলেন না। ভিক্ষা না পাইয়া নিজের দোষ চিন্তা না করিয়া, তিনি অকারণে কাশীবাসিগণকে শাপ দিলেন; কিন্তু ব্যাসের নিজের দুঃখ ঘুচিল না। শিষ্যগণের সহিত তাঁহাকে অভুক্ত থাকিতে হইল। মাতা অন্নপূর্ণা সশিষ্য ব্যাসকে অন্ন দিয়া বাঁচাইলেন। ব্যাসের প্রাণই যাইত, কেবল জগন্মাতার অনুগ্রহে তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইল বটে, কিন্তু তিনি শিবকর্তৃক কাশীপুরী হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। চতুর্দশী ও অষ্টমীতে মনিকর্ণিকা তীর্থে কাশীতে স্নান করিবার বর দিয়া মহামায়াই তাঁহাকে রুদ্রের ক্রোধ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

এতৎ সত্ত্বেও ব্যাস শিবের সহিত বিবাদ করেন, ইহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। মহামায়া অন্নপূর্ণা একা এবং অদ্বিতীয়া, শিবও এক এবং অদ্বিতীয়। যদি কোন দ্বিতীয়া অন্নপূর্ণা ও দ্বিতীয় শিব পাওয়া যাইত তবে দ্বিতীয় কাশী নির্মাণও সম্ভবপর হইত। সুতরাং দ্বিতীয় কাশীর আশা ব্যাসদেবকে ছাড়িতে হইবে। মুনি কেবল অষ্টমী ও চতুর্দশীতে মনিকর্ণিকার স্নানে কাশীতে আসিতে পারিবেন। আর এই নূতন কাশীতে যে মরিবে সে গর্দভ হইবে। ইহার অন্যথা হইবার নহে।

"বিরস বদনে দেখি ব্যাস তপোধনে। কহিলেন অন্নপূর্ণা আকাশ বচনে॥
* * *
জ্ঞান অহঙ্কারে বারাণসী মাঝে গিয়া। শিব হৈতে মোক্ষ নহে কহিলে ডাকিয়া॥
ভুজস্তম্ভ কণ্ঠ রোধ হয়েছিল বটে। শিবস্তুতি করি পার পাইলা সংকটে॥
তারপর শৈব হয়ে বিষ্ণুরে ছাড়িলে। সেই দোষে কাশী মাঝে ভিক্ষা না পাইলে॥
এক পাপে দুঃখ পেয়ে আরো কৈলা পাপ। না বুঝিয়া কাশীবাসিগণে দিলা শাপ॥
অন্নবিনা শিষ্যসহ উপবাসী ছিলে। আমি গিয়া অন্ন দিনু তেঁইসে বাঁচিলে॥
এইরূপে আমি তোরে বরদান দিয়া। সেদিন রুদ্রের ক্রোধে দিনু বাঁচাইয়া॥
ইতঃপর ভেদ দ্বন্দ্ব ছাড়হ সকল। জ্ঞানের সন্ধান কর অজ্ঞানে কি ফল॥
হরি হর বিধি তিনি আমার শরীর। অভেদ যেজন ভজে সেই ভক্ত ধীর॥
করিবে দ্বিতীয় কাশী না করও আশ। অভিমান দূর করি চল নিজবাস॥
এখানে মরিবে যেই গর্দভ হইবে। এই হইল গর্দভ কাশী অন্যথা নহিবে॥"

ব্যাসমুনি ব্যাসকাশী নির্মাণ করিবার জন্য নিজের সমগ্র তপস্যা পণ করিয়াও অভিমান ও অজ্ঞানতার বশে অবশেষে গর্দভ কাশী নির্মাণ করিলেন।

অন্নপূর্ণার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া ব্যাস স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনুশীলনী

১। ব্যাসদেব কে? তিনি কোথায় বাস করিতেন? তাঁহার কাশীতে আসিবার কারণ কি?

২। কাশীতে ব্যাসদেবের জীবনের বর্ণনা কর। কাশীবাসীর উপর তাঁহার বিরূপ হইবার কারণ কি?

৩। ব্যাসদেব দ্বিতীয় কাশী কেন নির্মাণ করিতে গেলেন? তিনি উহা নির্মাণ করিবার জন্য কি কি চেষ্টা করেন? ঐ সকল চেষ্টায় তিনি সফল হইয়াছিলেন কি?

৪। অন্নদার জরতীবেশে ব্যাসদেবকে ছলনার বিবরণ লিখ।

দ্বিতীয় কাশী নির্মাণে ব্যাসদেব অসফল হইয়া থাকিলে—ইহার কারণগুলি সংক্ষেপে লিখ।

৫। অন্নদামঙ্গলে রাজমিস্ত্রি ও মজুরদের বহুকাল পূর্ব হইতেই বেকারীর কোন খবর পাওয়া যায় কি?

৬। ব্যাসদেবের উপর শিবের ক্রোধের কারণ কি? অন্নপূর্ণা কিভাবে ব্যাসদেবের উপর কৃপা ও তাঁহার অন্যায়ের শাস্তি বিধান করেন?

৭। 'সদ্যোমোক্ষ হইবেক এখানে মরিলে', 'গর্দভ হইবে এখানে যে মরে'। কে, কাহাকে, কি প্রসঙ্গে এই উক্তি দুইটি করিয়াছিলেন?

১৭। উমার আগমনী ও বিজয়া

[উমার আগমনী ও বিজয়ার কাহিনী বাঙ্লায় শাক্তসঙ্গীতের মাধ্যমে প্রচারিত হইয়াছে। এই কাহিনী সন্তানের জন্য মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুল আগ্রহে, তাহার সহিত মিলনের হর্ষে আর বিচ্ছেদের বিষাদে ভরপুর।

পুরাণের হরপার্বতীর কাহিনীকে বাঙালী বাৎসল্যরসে পরিষিক্ত করিয়া আপনার পারিবারিক কাহিনীতে রূপান্তরিত করিয়াছে—উমা আর শিব যেন নিজেরই কন্যা আর জামাতা। বাঙালীর সংসার পিতামাতা পুত্র কন্যা পরিবার পরিজনে গঠিত। পারিবারিক সুখ দুঃখের সহিত পাড়া প্রতিবেশীরও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক—একের ভালোমন্দেতে অপরেরও সুখ দুঃখের অনুভূতি আসে। এইরূপে আপন আপন কন্যার সুখ দুঃখের আলোচনায়, পিতৃহৃদয় আর মাতৃহৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠে।

এই চঞ্চলতাই আগমনীর আর বিজয়ার গানের প্রাণকেন্দ্র]

রাজা দক্ষ এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। দরিদ্র বলিয়া শিবগৃহিণী সতী পিতৃগৃহে নিমন্ত্রণ পান নাই। বিনা নিমন্ত্রণে সতী সেখানে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু শিবনিন্দা শুনিয়া যোগ অবলম্বন করিয়া দেহত্যাগ করিলেন। শিব আসিয়া এই (শিবহীন) যজ্ঞকে নষ্ট করিলেন। নির্বোধ দক্ষ এইরূপে হাতে পাওয়া রত্নকে হেলায় হারাইলেন।

কিন্তু সকলেই তো আর দক্ষরাজার মতো নির্বোধ নহে। এদিকে দেবতাত্মা গিরিরাজ হিমালয় আর তাঁর পত্নী মুনিগণেরও মাননীয়া মেনকাদেবী, জগজ্জননী ভগবতী দুর্গাকে

(পূর্বজন্মের সতী) কন্যারূপে পাইবার জন্য অতি কঠোর তপস্যা করিলেন। দেবী ভক্তের ব্যাকুল প্রার্থনায়, আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। হিমালয় আর মেনকার কন্যারূপে তিনি জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি পর্বতরাজের কন্যা, তাই আত্মীয়স্বজনেরা তাঁহাকে 'পার্বতী' বলিয়া ডাকিতেন। যখন তিনি বড় হইয়া দেবাদিদেব মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য কঠোর তপস্যা করিতে স্থির সঙ্কল্প করিলেন, তখন মাতা মেনকা তাঁহাকে 'উ'-পদদ্বারা ডাকিয়া এবং নিষেধার্থক 'মা' পদদ্বারা তপস্যা করিতে নিষেধ করিলেন। তাই তাহার নাম হইল 'উমা'। আর তিনি শিবের (উ শব্দের অর্থ শিব) মা (শ্রী বা শক্তি)—এই কারণে তাহাকে উমা বলা হয়।

"উশব্দে বুঝহ শিব, মাশব্দে শ্রী তাঁর।
বুঝিয়া মেনকা উমা নাম কৈল সার॥"—ভারতচন্দ্র

পিতা গিরিরাজ আর মাতা মেনকার এত সাধ্যসাধনার ধন উমা তাঁহাদের নয়নমণি।

"ত্রিনয়নের নয়ন তারা তারা পেয়ে ঘরে।
যেন অন্ধপেয়ে নয়ন তারা অন্ধকার হরে॥"—দাশরথি রায়

কন্যার প্রতি পিতামাতার স্নেহের অন্ত নাই। তিনি বাল্যকালের পুতুল খেলা হইতে আরম্ভ করিয়া নানা খেলার মধ্যে ক্রমে ক্রমে বড় হইতে লাগিলেন। অনন্তর উমা অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিলেন। এখন গৌরীর বিবাহ দেওয়া দরকার। পিতামাতা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে দেবর্ষি নারদ গৌরীর বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। বর কৈলাসবাসী শিব, তিনি শ্মশানে বিচরণ করেন, তাহার কণ্ঠে বিষ, বিভূতি তাঁহার ভূষণ, তিনি বাঘছাল পরেন, তিনি অষ্টসিদ্ধিতে নিপুণ, তাহার পিতা মাতা নাই। এ সব শুনিয়া শাশুড়ী মেনকা মনে করিলেন ভাবী জামাই দরিদ্র, তাঁহার মাতাপিতা নাই, পরিবার কাপড় নাই, ঘরে অন্ন নাই। আর এক পত্নী (গঙ্গা) তাঁর মাথায় আছেন। অবশেষে এই শিবের সঙ্গেই উমার বিবাহ হইল।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের জন্য মায়ের নানা রকম দুশ্চিন্তা চলিতে থাকিল—উমা কত না কষ্টে দরিদ্র শিবের ঘরে কাল কাটাইতেছেন। দেখিতে দেখিতে বছর কাটিয়া গেল—শরৎ ঋতু শিউলি ফুল লইয়া উপস্থিত হইল, মায়ের মন মেয়েকে দেখার জন্য উতলা হইল। গিরিরানী উমার কথা ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। রাত্রিশেষে তিনি স্বপ্নে দেখেন তাঁর কন্যা শিয়রে বসিয়া কৈলাশের সুসমাচার জানাইয়া মায়ের দুশ্চিন্তা দূর করিতেছেন। স্বপ্নে কন্যাকে পাইয়া মায়ের মনের ব্যথা তখনকার মত দূর হয়, তিনি মেয়েকে নানা মিষ্টান্ন খাওয়াইয়া তাঁহার অতৃপ্ত সাধ পূর্ণ করেন।

কিন্তু রাত্রির অবসানে মাতা আনন্দভরা ছল ছল চোখে উঠিয়া দেখেন কন্যা কাছে নাই—আবার তাঁর হৃদয় বিয়োগ ব্যথায় কাতর হয়। তিনি গিরিরাজকে বলেন—

"গিরি! গৌরী! আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে,
চৈতন্যরূপিণী কোথা লুকালো।

মায়ের প্রতি মায়া নাই মহামায়ার,
আবার ভাবি গিরি! কি দোষ অভয়ার
পিতৃদোষে মেয়ে পাষাণী হলো॥"—দাশরথি রায়

মা মেনকা এই কথা বলিতে বলিতে মূর্ছিত হইয়া পড়েন—এ সকল তাঁহার কন্যারাই মায়া। মূর্ছান্তে কন্যাকেও স্বামিগৃহ হইতে লইয়া আসিবার জন্য, তিনি গিরিরাজকে কাতর অনুনয় করিলেন--যেমন করিয়া হউক, তাঁহার উমাকে আনিয়া কোলে দিতে হইবে। তিনি কোন কথাই শুনিবেন না।

গিরিরাজের দ্রুত কৈলাসে যাইবার নানা অসুবিধা, তিনি নিজে অচল (পর্বত=চলাচল রহিত) আর কৈলাসও একেবারে নিকটে নয়। তবু মেনকা তাঁহার দুঃখ বোঝেন না। কিন্তু হিমালয়ই বা কি করিবেন। অবশেষে তাঁহাদের পতি পত্নীর মধ্যে বহু কথা কাটাকাটির পর, গিরিরাজ কৈলাসে শিবের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া দেখেন শিবের অনুচর নন্দী আর ভৃঙ্গী কড়া পাহারা দিতেছেন। ঠাকুরের বিনা অনুমতিতে ভিতরে যাইবার উপায় নাই। অগত্যা গিরিরাজকে নিজপরিচয় দিতে হইল। তিনি বলিলেন শিবের গৃহিণী গৌরী তাঁহারই কন্যা। তিনি বৎসরান্তে তিন দিনের জন্য বাপের ঘরে একবার যান। তাই পিতা তাহাকে নিতে জামাতার ঘরে আসেন। নন্দী গিরিরাজের এসব কথা একেবারে হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন —হরগৃহিণী নিজে জগতের মাতা তিনি কেন হিমালয়ের কন্যা হইতে যাইবেন?

তবে ভৃঙ্গী গিরিরাজের কথা বিশ্বাস করিলেন, কারণ তিনি পার্বতীরূপে জগন্মাতার জন্মের কথা পূর্বে শুনিয়াছেন। নন্দী বলেন—শুক্লপক্ষে জগন্মাতা পিতার ঘরে যান। তখনও শুক্লপক্ষ উপস্থিত হইতে দেরী আছে। তবে কেন মায়ের পিতা এত আগে আসিয়াছেন? গিরিরাজ উত্তর দিলেন—তিনি উমাকে আপনার ঘরে নিতে আসেন নাই, শুধু তাঁহার খবর লইতে আসিয়াছেন, আর কন্যার স্বামিগৃহে অর্থকষ্ট, তাই জামাতার হাতে কিছু টাকা দিয়া সেবারকার মত দেশে ফিরিয়া যাইবেন। যাহাই হউক, পিতা কন্যার দেখা পাইলেন। গৌরী তখনই পিতার সঙ্গে হিমালয়ে যাইতে চাহেন। শিব পার্বতীকে বাপের বাড়ি যাইতে দিতে চাহেন না—কারণ গৃহিণী না থাকিলে গৃহ একেবারে অচল। ঘর-সংসার চালান যাইবে না বলিয়া শিবের দিক হইতে ঘোরতর আপত্তি উঠিল। তখন গৌরী পিতাকে ডাকিয়া গোপনে শিবপূজা করার পরামর্শ দিলেন। শিব আশুতোষ, তাঁহাকে ভক্তিভরে ডাকিলে নিশ্চয়ই তিনি গৌরীকে গমনের অনুমতি দিবেন। গিরিরাজ তখন পার্থিব মূর্তি গড়িয়া নানা উপাচারে চোখের জলে ভিজিয়া শিবপূজা করিয়া সফলকাম হইলেন। শিব উমাকে পিতৃগৃহে যাইবার অনুমতি দিলেন। জগন্মাতা পিতৃগৃহে যাইবেন, কিন্তু কার্তিক গণেশকে লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইল। মায়ের ইচ্ছা এঁরা দুজনে কৈলাসে বাপের কাছে থাকুক—মা একাকী তাঁহার বাপের বাড়ি যান। মা তাঁহার দুই ছেলেকে কৈলাসে রাখিয়া বাপের বাড়ি রওনা হইলেন। কিন্তু কে কার কথা শুনে। ছেলে দুইটি মায়ের পিছন পিছন ধাওয়া করিতে মাকে আবার কৈলাসে ফিরিয়া ইঁহাদের লইয়া যাত্রা বদল করিতে হইল।

এদিকে গিরিরাজের দেশে ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া রানী ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন কন্যাও আসেন না; পিতা সেই যে গিয়াছেন আর ঘরে ফিরিতেছেন না। মাতা মেনকা কন্যার অমঙ্গল আশঙ্কা করিলেন; সকল প্রকার অমঙ্গল শান্তির জন্য পুরোহিত ডাকিয়া চন্ডীপাঠ ও স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করিলেন। মেনকা আশায় বুক বাঁধিয়া উমার আগমন প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠায় ভূমিশয্যায়, দিন প্রহর দণ্ড গণিতে লাগিলেন। তারপর শরতের এক শিশির-ধোয়া প্রাতে মা মেনকা ঘুমের ঘোরে শুনিতে পাইলেন—

"গা তোল গা তোল, বাঁধ মা কুন্তল,
ঐ এলো পাষাণী তোব ঈশানী॥"—দাশরথি রায়

তিনি আরো শুনিলেন,—

"আজ শুভনিশি পোহাল তোমার।
এই যে নন্দিনী আইল বরণ করিয়া আন ঘরে॥
মুখশশী দেখ আসি, দূরে যাবে দুঃখ রাশি,
ও চাঁদ মুখের হাসি সুধারাশি ক্ষরে॥
ভাসে মহা আনন্দ সাগরে।
জননীর আগমনে, উল্লসিত জগজ্জনে,
দিবানিশি নাহি জানে, আনন্দে পাসরে॥"—রামপ্রসাদ

জগন্মাতার আগমনে শুধু মেনকা আর গিরিরাজের আনন্দ নয়, জগতের সকলের আনন্দ তাই সকলে মায়ের আগমনী গান গায়। মা মেনকা এলোথেলো পাগলিনীর বেশে ভূমিশয্যা ত্যাগ করিয়া কন্যাকে বরণ করিতে ছুটিয়া গেলেন, আদর করিয়া সুখ-দুঃখের কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। একটু পরেই রানীর তন্দ্রা কাটিয়া গেল। তিনি কার্তিক গণেশ সহ দশভুজা সিংহবাহিনী, লক্ষ্মী সরস্বতী যুক্তা অসুর মর্দিণী—এ কার মেয়েকে সম্মুখে দেখিতেছেন! এ তো তাঁহার দ্বিভুজা গৌরী নয়! নিজের অভিলষিত মূর্তি দেখিতে না পাইয়া মেনকা আবার ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন—

"কৈ হে গিরি! কৈ সে আমার প্রাণের উমানন্দিনী।
সঙ্গে তব অঙ্গনে কে এল রণরঙ্গিণী।
দ্বিভুজা বালিকা আমার উমা ইন্দুবদনী,
কক্ষে লয়ে গজানন, গমন গজগামিনী,
মা ব'লে মা! ডাকে মুখে আধো আধো বাণী॥"—দাশরথি রায়

তারপর জগন্মাতা আর কি করেন! মেনকার অভিলষ পূর্ণ করিবার জন্য আপনার দশভুজা মূর্তি ত্যাগ করিয়া তিনি 'দ্বিভুজা গিরিজা গৌরী গণেশ জননী' হইলেন। মেনকার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিল। প্রাণ খুলিয়া মেয়ের সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন। শুভ মহা সপ্তমী তিথি। মায়ের পূজার আয়োজন হইল। গিরিরাজ জগন্মাতাকে ব্রহ্মজ্ঞানে পূজা করিলেন। তাঁহার নিকটে চন্ডীপাঠ হইল। ব্রতী গিরিরাজ অন্তর্দৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন উমার উদরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিরাজিত। তিনি ধ্যান ছাড়িয়া মায়ের নিকট কাতরভাবে জানাইলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরী যেখানে উমা সেখানে গিরির নিজের পূজা করিবার

মত কোন দ্রব্য নাই। তবু গৃহস্থ সব জিনিসের উপর আমার আমার করিয়া প্রভুত্ব প্রকাশ করে। ইহা মহামায়ার মায়া। গিরিরাজকে মাতা যাহা দিয়াছেন তাহা দিয়াই তিনি তাঁহার পূজা করিবেন।

চণ্ডীর কৃপাতে তাহারই প্রদত্ত বস্তুদ্বারা গিরিরাজ দেবীর পূজা করিলেন। সপ্তমী তিথিতে সারা ত্রিভুবনেও উৎসবের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। কিন্তু সপ্তমী তিথির রাত্রি উপস্থিত হইতেই গিরিরাজের মনে আবার দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হইল। দুঃখের কারণ—মধ্যে আর দুটি দিন বাকি, তার পরেই তো উমা পরের ঘরে চলিয়া যাইবেন। উমা পিতার দুঃখ দেখিয়া বলিলেন তাঁহার দুঃখ হওয়া উচিত নহে কেননা—তাঁহার মনস্কামনা তো তিনি পূর্ণ করিয়াছেন। পিতার চোখের ধারা বাধা মানিল না—

"তুমি এসেছ বেসেছ ভাল, তায় সুখ হল না।
যাবে যে মা জগদম্বা! তাই মনে ভাবনা॥"—দাশরথি রায়

সপ্তমীর পরে নবমীর কালরাত্রি আসিতে তো বেশি দেরী নাই। তাই গিরিরাজের কামনা শতযুগ ধরিয়া যেন এই সপ্তমীর রজনী এমনিভাবে থাকে—তিনি ইচ্ছামত প্রতিদিন যেন জগন্মাতার পূজা করিতে পারেন। এইরূপে অষ্টমী তিথি মায়ের সেবায় বিগত হইল। অষ্টমীতে মায়ের সৌম্যমূর্তি দর্শন করিয়া ভক্তের হৃদয়ে আনন্দের জোয়ার বহিল—

"পূর্ণেন্দু সদৃশ বদন তোমার।
হৃদয় সরিতে আনন্দ জোয়ার॥"—ভবানীপ্রসাদ

নবমী পূজাও সমাপ্ত হইল। নবমীর রাত্রিতে জননী মেনকার প্রাণ কন্যার আসন্ন বিচ্ছেদের ব্যথায় অত্যধিক কাতর হইয়া পড়িল। উমা সবে দুই দিন আগে আসিয়া আবার চলিয়া যাইতে চাহিতেছেন, মায়ের মন তাঁহাকে কিছুতেই বিদায় দিতে চাহে না। উমাকে ছাড়া শিবের গৃহের কাজকর্ম একেবারে অচল হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহাকে যাইতেই হইবে। গিরিরানী নবমীর রাত্রিকে প্রভাত হইতে দিতে চান না, কারণ কাল (পর দিন) কাল (=মহাকাল) রূপে শিব উপস্থিত হইবেন। নবমীতেই সেই কালরজনী বুঝি উপস্থিত হইল। কিন্তু রজনী যেন প্রভাত না হয—ইহাই মেনকার মিনতি। নবমীর রজনী মা মেনকার কথা শুনিল না, নির্মম দশমীর প্রভাত আসিয়া উপস্থিত হইল।

"যেয়ো না, রজনি আজি লয়ে তারা দলে!"
দ্বিগুণে আঁধার ঘর হবে, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি ' কহিলা কাতরে
নবমীর নিশা শেষে গিরীশের রাণী॥ 'বিজয়া দশমী' (মধুসূদন দত্ত)

শিব বাঘছাল পাতিয়া দরজায় বসিয়া আছেন আর গণেশের মাতাকে (উমাকে) ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিবার জন্য ঘন ঘন ডাকিতেছেন। গিরিরানী এই ডাক শুনিয়া দিনের বেলাই চোখে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। মায়ের পাষাণ প্রাণ ইহাতেও বাহির হইল না—ইহাই মেনকার আক্ষেপ। তিনি গিরিরাজকে মনের দুঃখ জানাইতেছেন—

"ওহে প্রাণনাথ গিরিবরহে, ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার।
কি শুনি দারুণ কথা দিবসে আঁধার॥

বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল,
বেরোও গণেশমাতা ডাকে বারেবার।
তব দেহ হে পাষাণ, এ দেহে পাষাণ প্রাণ,
এই হেতু এতক্ষণ না হল বিদায়॥
তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না মানে মন,
হায় হায় একি বিড়ম্বনা বিধাতার।" 'বিজয়া'—রামপ্রসাদ

বিজয়া দশমীতে শিবের ডাকে উমা তাঁর দুই পুত্র লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি মায়ের নিকট বিদায় চাহিলেন। কিছুদিন মায়ের কাছে তাহার থাকিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু—

"দেখি নিশা অবসান, ব্যস্ত হয়েছেন ঈশান,
সুখে রাখেন দুঃখে রাখেন তিনিই আমার গতি।"

শিবের অনুমতি লইয়া এমনি করিয়া তিন দিনের জন্য পিতার ঘরে তিনি প্রতিবছর আসিবেন। এখন মা মেনকার কাছে দুর্গা বিদায় চাহিলেন। গিরিরানী মূর্ছিতা হইয়া ভূমিতে পড়িলেন। জগন্মাতা তাঁহাকে উঠাইয়া কতভাবে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। কন্যা মাতাকে যত প্রবোধ দেন মায়ের চোখের জল তত বেশি পড়ে। কিছুতেই মায়ের মন প্রবোধ মানে না। শিব দুর্গাকে আর দেরী করিতে নিষেধ করিলেন। মা মেনকা কন্যাকে ফিরাইতে না পারিয়া গিরিরাজকে দিয়া শেষ চেষ্টা করাইলেন, শিবের হাতে পায়ে ধরিয়া যদি যাত্রা ফিরান যায়। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। হিমালয়পুরী আঁধার করিয়া উমা কৈলাসে চলিলেন।

অনুশীলনী

১। 'আগমনী' ও বিজয় বলিতে কি বুঝ?

২। আগমনী ও বিজয়ার কাহিনী সংক্ষেপে লিখ।

৩। গিরিরাজ, উমা, মেনকা, গৌরী, নন্দী, কৈলাস—ইহাদের উপর টিপ্পনী লিখ গিরিরাজ হিমালয় পাহাড় হইলে তিনি উমার পিতা হইলেন কিরূপে?

৪। মা মেনকার কন্যার জন্য ব্যাকুলতার বর্ণনা কর।

ভূমিকা

প্রবন্ধ-রচনা

লেখক নিজের সুচিন্তিত ভাবধারাকে প্রবন্ধরূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন এখানে তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে নিজের ভাবধারার সহিত অপরের পরিচয় সাধন। এরূপ করিতে গেলে শিক্ষার্থীর পক্ষে শুদ্ধ এবং আড়ম্বরহীন ভাষা প্রয়োগ করা দরকার।

প্রবন্ধ লেখা আরম্ভ করিবার পূর্বে লেখক আলোচ্য বিষয়টির সম্বন্ধে চিন্তা করিবেন। তাহার পর চিন্তিত ভাবধারাগুলি সাজাইবার পরিকল্পনা রচনা করিবেন। তাহার পর লেখা আরম্ভ করিবেন। এই কাজ করিতে কিছু সময় লাগিবে। ইহাকে কেহ যেন সময়ের অপব্যয় বলিয়া মনে না করেন। রচনার বিষয়টি পূর্বে চিন্তা না করিয়া লেখা আরম্ভ করিলেই অযথা অনেক সময় নষ্ট হইবে এবং প্রবন্ধ লেখার কাজ বিশেষ অগ্রসর হইবে না। লেখায় যাহাতে পূর্বে আলোচিত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি না থাকে সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কোন অজ্ঞাত বিষয়ের বা তথ্যের জ্ঞানলাভ যেখানে প্রয়োজনীয় সেখানে সমাচার-পত্র বা সহায়ক পুস্তক পাঠ করা দরকার।

প্রবন্ধের আকার কত বড় হইবে সে বিষয়ে কোন নির্দেশ দেওয়া চলে না। প্রবন্ধের দৈর্ঘ্যের উপর কাহারো সাফল্য নির্ভর করে না। লেখকের বক্তব্য সারবান্ হওয়া চাই। ভাষার পারিপাট্যের উপর প্রবন্ধ রচনার সাফল্য নির্ভর করিবে। পরীক্ষাক্ষেত্রে বহু প্রশ্নের সহিত বিদ্যার্থীকে যেখানে প্রবন্ধ রচনা করিতে হয় সেখানে অনেক সময় প্রবন্ধ রচনার জন্য হাতে আধ ঘণ্টার বেশি সময় থাকে না। এরূপ অবস্থায় প্রবন্ধের আকার বড় করা উচিত নহে। গৃহে প্রবন্ধ রচনার অভ্যাসকালে সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। বিদ্যার্থী অল্প সময়ের মধ্যে শৃঙ্খলার সহিত প্রয়োজনীয় সকল তথ্যের আলোচনা করিতে যত্নবান হইলে সুফল লাভের আশা করা যায়।

এই পুস্তকে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করিবার জন্য ছোট বড় মাঝারি নানা আকারের প্রবন্ধের আদর্শ পরিবেশিত হইল। এই সকল রচনায় প্রবন্ধরচনারীতির বিভিন্ন ভঙ্গি পরিলক্ষিত হইবে। বিদ্যার্থী নিজের সময় ও সামর্থ্য অনুসারে আদর্শকে গ্রহণ করিবেন।

মনুষ্যের জ্ঞানভাণ্ডারের বৃদ্ধি এবং তাহার বহুমুখী কর্মবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানযুগে প্রবন্ধ রচনার বিষয়েরও বৈচিত্র্য বাড়িতেছে। এই ক্রমবর্ধমান বিষয়-বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বর্তমান গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি রচিত হইয়াছে। বিদ্যার্থী তাঁহার প্রয়োজন-অনুসারে প্রবন্ধ নির্বাচিত করিয়া লইয়া লেখা অভ্যাস করিলে উপকৃত হইবেন।

ভারতভূমির বিচিত্রতা

আমাদের জন্মভূমি ভারত এক বিচিত্র দেশ। পৃথিবীর আর কোন দেশ ভারতের মতো এত বিচিত্র নহে। দেশের আকৃতি, তাহার জলবায়ু, তাহার অধিবাসী, তাহার ধর্ম, তাহার ভাষা, তাহার ইতিহাস সবকিছু মিলিয়া ইহাকে করিয়াছে অনন্যসাধারণ। এদেশ এক ছোটখাটো পৃথিবী-বিশেষ। এদেশের তিন দিকে সমুদ্র আর একদিকে উঁচু পাহাড—ইহার কোথাও যোজনের পর যোজন সমতল ভূমি চলিয়াছে—কোথাও বা মালভূমি, কোথাও বা উষর ধূসর মরুভূমি, কোথাও অনন্ত বিস্তার বনভূমি—কোথাও বা শস্যশ্যামল উপত্যকা।

এ দেশের এক প্রান্তে পরপর ছয়টি ঋতু দেখা না গেলেও বিভিন্ন প্রান্তে উহার ঋতুর প্রাদুর্ভাব উপলব্ধি করা যায়। ভারত ভীষণও বটে মধুরও বটে।—গ্রীষ্মের ভীষণতা আর বসন্তের মাধুর্য, বর্ষার আর্দ্রতা আর শরতের কমনীয়তায় ভারত হইয়াছে অপরূপ।

ভারতে আর্য, অনার্য, শক, হূণ, মোগল, পাঠান প্রভৃতি কত জাতি যুগে যুগে বসতি স্থাপন করিয়া একই সঙ্গে প্রীতির সহিত বসবাস করিয়া আসিতেছে।

শতাধিক ভাষা বা উপভাষা ভারতবর্ষের দৈনন্দিন জীবনে ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হইতেছে।

ধর্মের দিক দিয়াও পৃথিবীর কোন দেশে এত বিচিত্রতা নাই। এখানে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান, ইসলাম প্রভৃতি জগতের প্রধান প্রধান ধর্মগুলি পরস্পর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতেছে। আচার-ব্যবহারে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা পৃথক হইলেও জগতের মূল যে সত্য তাহা সকলের কাছেই এক—সকলের লক্ষ্য একের দিকে।

আধুনিক অন্য কোন সুসভ্য দেশে ভারতের মতো ধনী-দরিদ্রের সহাবস্থানের আদর্শ দেখা যায় না। ভারতের আদর্শ হইতেছে ধন হইতে মন বড। অন্য দেশে ধনগত মর্যাদাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ভারতে দরিদ্র মনস্বীর সম্মান সকলের উপরে। আর সাধারণ দরিদ্রও উপেক্ষার পাত্র নহে। ভারতের বিচিত্রতার মধ্যেও বহুবার এখানে একরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

ভারত যখনই তাহার আদর্শকে ভুলিয়াছে তখনই তাহার পরাজয়ের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে। বিচিত্রতার মধ্যে একত্বের অনুভূতি হইতেছে, ভারতের লক্ষ্য। এই অনুভবের নামই ধর্ম—ইহাই পরম বা চরম সত্য। ধর্মের রক্ষায় কখনও কোন জাতির পরাজয় আসিতে পারে না—যদি উহা সত্যধর্ম হয়।

ভারত নিজের এই ধর্মকে ভুলিয়া বার বার পরাজিত হইয়াছে। একত্বের ও অখণ্ডত্বের পরিবর্তে সে যখন নিজকে খণ্ড ক্ষুদ্ররূপে বিভক্ত করিয়াছে—তখনই তাহার চরম দুর্গতি আসিয়াছে।

ভারতের ইতিহাস—তাহার আত্মিক সাধনার উত্থানপতনের ইতিহাস।

উহারই মধ্যে তাহার কল্যাণ নিহিত আছে। ভারতকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে এই একের ডাক সকলকে শুনিতে হইবে।

বাংলার ঋতুপর্যায়

এক বঙ্গদেশ ব্যতীত পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও ছয় ঋতু তার নিজ নিজ বিচিত্র রূপসম্ভার লইয়া আবির্ভূত হয় না।

চৈত্রের শেষে গরম আরম্ভ হইলেও বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস উত্তাপের প্রখরতার জন্য গ্রীষ্ম ঋতু বলিয়া পরিগণিত হয়। এই সময় আকাশ হইতে সূর্যের অনল বর্ষণ চলে—নিম্নের পৃথিবীর নদ-নদী, খাল-বিল, পুষ্করিণীর কোনটি শুষ্ক বা অর্ধশুষ্ক—কোনটি বা কর্দমাক্ত। বিস্তীর্ণ মাঠ শস্যশূন্য হইয়া রৌদ্রে খাঁ খাঁ করিতে থাকে। গ্রীষ্মের হাত হইতে মানুষ, পশুপক্ষী কাহারও নিস্তার নাই। সকলেই কোন না কোন উপায়ে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। গ্রামের গৃহস্থ তাহার চালার নীচে গ্রীষ্মের দুপুর কাটায়—শ্রান্ত পথিকের আশ্রয়স্থল গাছের তলা। স্তব্ধ কপোত গাছের শাখায় বসিয়া থাকে। আহারের খোঁজে বাহির হইবার তাহার শক্তি নাই। গোরু, ঘোড়া, মহিষ গাছের তলায় গা এলাইয়া দিয়া জাবর কাটে। বড় বড় শহরে, চারিদিকে পাকা বাড়ি—গাছপালা একেবারে নাই বলিলেও চলে। রাস্তা পিচের বা কংক্রিটের। সে সব স্থানে উপরে গরম আর পায়ের নীচেও গরম। পায়ে হাঁটিয়া রাস্তায় চলিবার উপায় থাকে না। গ্রীষ্মের দুপুরে গ্রামে, শহরে কোথাও শান্তি নাই। সূর্যাস্তের পর হইতে, শীতল বাতাস যখন বহিতে থাকে তখন শারীরিক গ্লানি দূর হয়।

গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপের পর চাই শান্তির বারিধারা—তাই আসে বর্ষা। আকাশে যখন নূতন মেঘের সঞ্চার হয়, তখন সকলের মধ্যে জাগ্রত হয় একটা আশার বাণী। গ্রীষ্মে যে রস শুষ্ক হইয়া বাষ্পাকারে উপরে উঠিয়াছিল বর্ষণরূপে তাহার পরিণতি হইল। মাঠ-ঘাট, নদী-নালা সব জলে ভরিয়া গেল। দেশের সুখসমৃদ্ধি বর্ষার উপর নির্ভর করে। কারণ আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান। জলের মধ্যে ধানের চারা মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়ায়—শস্যের আগা বাতাসে দুলিতে থাকে।

বর্ষার ভিজা পৃথিবী আবার তাহার রূপ পরিবর্তন করে—শরৎ আসে। শরতের নীল আকাশে সাদা জলশূন্য মেঘ, নিম্নে কাশগুচ্ছ, শেফালি পুষ্প, শ্বেতপদ্ম, নদীর শ্বেত পুলিন, সাদা ছাতিম ফুল—সব মিলিয়া ধরণীর শ্বেতমূর্তি ভাসিয়া উঠে। রাত্রিতে নির্মল চন্দ্রের কিরণ, আকাশে ছায়াপথের প্রকাশ। মাঠে মাঠে ধান। পথঘাট আবার চলাচলের উপযুক্ত হয়। বর্ষার জড়তার পর শরতে সর্বত্র নূতন জাগ্রত চেতনার সাড়া পাওয়া যায়। মানুষ আনন্দে আশান্বিত হয়।

হেমন্তের শিশিরপাতে পৃথিবীতে একটা স্তব্ধতার ভাব আসে। কৃষকেরা পাকা ধান কাটা লইয়া ব্যস্ত। নূতন ধান্যে নবান্ন এই সময় হয়। তারপর ধীরে ধীরে শীত আসে।

শীতে মাঝে মাঝে চারিদিক কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়, গাছের পাতা একে একে ঝরিতে থাকে—শালিধান পাকিয়া উঠে, ধানকাটা চলিতে থাকে। ক্ষেতে অন্যান্য রবিশস্য দেখা দেয়। রাত্রি বড হয় দিন তদনুপাতে ছোট। শীতে আত্মরক্ষার উপায় যাহাদের আছে—তাহাদের নিকট এ ঋতু আরামপ্রদ। আশ্রয় ও আচ্ছাদন যাহাদের অপ্রচুর এই সময় তাহাদের কষ্টের পরিসীমা থাকে না। ধীরে ধীরে শীত চলিয়া যায়।

বসন্তের আবির্ভাবে পৃথিবীতে সমাগত হয় নবীন জীবন। শীতের জীর্ণ পত্রের পরিবর্তে আসে বৃক্ষলতায় নবীন পুষ্পপল্লব। নবীন যবের মঞ্জরী দেখা যায়। আম্রমুকুল, আর তার সঙ্গে সঙ্গে আসে কোকিলের কুহুরব। রক্তিম পলাশ ও শিমূল ফুলে দিগন্ত লালে লাল হইয়া যায়। এই সময় গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপ নাই—রাত্রিতে ঠাণ্ডাও নহে—গরমও নহে। এ অবস্থা অত্যন্ত সুখকর সন্দেহ নাই।

বড বড নগর হইতে বহুদূরে গ্রামে যাহারা বাস করে—তাহারাই বাংলার এই প্রাকৃতিক পরিবর্তন বিশেষভাবে অনুভব করে। কৃত্রিম নাগরিক জীবনে ঋতু পরিবর্তন বিশেষভাবে কাহারও নিকট উপলব্ধ হয় না—তাহার সুখদুঃখের বিচিত্র অনুভূতি দ্বারাও মানুষ তেমন অনুভূত হয় না।

নগরীর পাষাণ প্রাচীরে আবদ্ধ মানুষের কাছে প্রকৃতির নব নব রূপসজ্জা ধরা দেয় না। দরিদ্র তাহার কর্মের চাপে রৌদ্র ও বৃষ্টি মাথায় করিয়া বাহির হয়। ধনী কৃত্রিম উপায়ে তাহার শীত ও গ্রীষ্মকে নিয়ন্ত্রিত করে।

বাংলায় বর্ষাকাল

গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপে চৈত্র ও বৈশাখ এই দুই মাসে বাংলার পথ, ঘাট, মাঠ, নদী, নালা, খাল, বিল শুষ্ক হইয়া যায়। ধরিত্রী রুক্ষ, শুষ্ক, কঠোরা, বৈরাগিণী মূর্তি ধারণ করে। পশুপক্ষী, মানুষ সকলেই পিপাসাপীড়িত। বৃক্ষলতা, তৃণগুল্ম বারিবিন্দুর আশায় ব্যাকুল প্রতীক্ষায় থাকে। এমন সময়ে বৈশাখের শেষে সাধারণতঃ আসে কালবৈশাখীর ঝড, ঝঞ্ঝা, বিদ্যুৎ, আকাশের ক্ষণিক ঘনঘটা—পৃথিবী ক্ষণেকের জন্য শান্তি লাভ করে। তারপর মেঘে মেঘে আকাশ ভরে এবং সর্বশান্তিকরী শ্রান্তিক্লান্তিহরা বর্ষার আবির্ভাব হয়। বৃক্ষলতায় সজীবতা আসে—কদমকেতকী বিকশিত হয়। কৃষকদের মধ্যে বীজ বপনের সাড়া পড়িয়া যায়। বর্ষার পূর্ণরূপ দেখা যায় আষাঢ ও শ্রাবণ মাসে।

ধীরে ধীরে নদীগুলি ভরিয়া উঠে—পুকুরে জল, খালে বিলে সব জায়গায় জল। গ্রামে গৃহস্থের বাড়িগুলি অনেক জায়গায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের মত জাগিয়া থাকে। এ বাড়ি হইতে ও বাড়ি যাইতে দরকার হয় ছোট নৌকার। পথঘাট বলিয়া কিছু থাকে না, সব জলে একাকার হইয়া যায়। তবু এরূপ বর্ষা বাঙালীর নিকট অনাদরের বস্তু নয়। এই বর্ষার জলে নদীস্ফীতির ফলে যথেষ্ট পলিমাটি পড়িয়া বাংলার জমি উর্বর হয়—ম্যালেরিয়ার বিষ নিষ্কাশিত হয়।

বর্ষায় বড় শহরের অবস্থা দাঁড়ায় অন্যরূপ। সেখানে কর্মের ব্যস্ততাই প্রধান বৈশিষ্ট্য, সেখানে দলে দলে লোক বাধ্য হইয়া পথে বাহির হয়। ছাতা বর্ষাতির সমারোহ চলে রাজপথে।

ট্রামে বাসে অতিরিক্ত ভিড়—রাস্তা জলে ভরিয়া যায়। পথচারীরা ভিজিয়া কায়ক্লেশে কর্মস্থলে গিয়া পৌঁছে। সেখানে গিয়া সারাদিনের মধ্যে তাহাদের কেবলই এই কথা মনে হইতে থাকে কখন ভালয় ভালয় আবার নিজ নিজ আশ্রয়স্থলে পৌঁছিতে পারিবে।

রাস্তার পাশে কাপড়জামা, নানা সৌখীন জিনিসের দোকানে ভিড় মোটে থাকে না বলিলেই চলে—বাহির হইয়া যেটুকু বাজারের জিনিস না কিনিলেই নয় তাহার জন্যই লোকে বাহিরে আসিতে বাধ্য হয়। মাছ, মাংস, তরি-তরকারির দাম এই সময় বেশি চড়িয়া যায়—সাধারণ গৃহস্থ কায়ক্লেশে জীবনধারণ করে।

ধনীর কথা স্বতন্ত্র। তাহাদের জীবনযাত্রার রথ বাঁধাধরা পথে চলে। অভ্যস্ত জীবনে বড় একটা পরিবর্তন দেখা যায় না। ফুটবলের মাঠে ক্রীড়ামোদাদের ভিড় এই সময়ে বাড়ে—জলক্রীড়ার পুষ্করিণীর পারে খেলোয়াড় আর দর্শকদের উৎসাহের কোন অভাব ঘটে না। ঘরে শিশুদের সারাদিন লাফালাফি দাপাদাপির বিরাম থাকে না, কারণ তাহারা ঘরের বাহির হইতে পারে না।

প্রত্যেক ঋতুর সঙ্গেই এক বা একাধিক উৎসব বাংলাদেশে লাগিয়া আছে। বর্ষায় রথযাত্রা—তার মেলা। রথযাত্রার পর মনসা পূজা। পূর্ববাঙলায় বিশেষ করিয়া মনসা ভাসানের উৎসবে সকল পল্লী মাতিয়া উঠে। ধনীদরিদ্র সমভাবে মনসার ভাসানে যোগদান করে। সারা শ্রাবণ মাস ধরিয়া মনসামঙ্গলের পাঠ চলে। বেহুলা লক্ষীন্দরের এবং চাঁদ সওদাগরের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে জনসাধারণের হৃদয় অভিভূত হয়। রাঢ়দেশে ধর্মমঙ্গল জাতীয় কাব্যের পর্যায়ে পড়ে, আর পূর্ববাঙলায় তেমনি বেহুলা-লক্ষীন্দ্র ও চাঁদের কাহিনীর কাব্য মনসামঙ্গলকে জনসাধারণ হৃদয়ের বস্তু বলিয়া গ্রহণ করে।

শরতের বাংলা

বর্ষার অবসানে আকাশ হয় নীল—শুধু সেখানে সাদা মেঘের আসা যাওয়া চলে। শরতের প্রভাতে সোনার রৌদ্রে পৃথিবী হয় আলোকিত। রাত্রিতে শুভ্র চন্দ্র কিরণে পৃথিবী প্লাবিত হয়, অগণিত নক্ষত্রযুক্ত আকাশকে ছায়াপথ দুই ভাগে বিভক্ত করে।

শরতে নদনদীর তীব্র বেগ কমিয়া যায়,—দুই পারের জল নামিয়া সেখানে বালির চড়া পড়ে। শরতের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নদীর ঘোলা জল পরিষ্কার হইতে থাকে। বর্ষায় নৌকাপথে চলার যে আশঙ্কা থাকে তাহা শরতে কমিয়া যায়—নদীর বক্ষে বাণিজ্যতরণীর যাতায়াত বৃদ্ধি পায়।

পাট আবাদের কৃষিক্ষেত্রগুলি এই সময় শস্য কাটার ফলে ফাঁকা দেখা যায়।

অন্য দিকে দিগন্তজোড়া মাঠে হরিৎ ধানের বিরাট সমারোহ দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। মাঝে মাঝে কোন জায়গায় বা ইক্ষুর ক্ষেত বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে। পল্লীর কুটিরের পাশে শেফালি ফুল ফুটিয়া গ্রামের পথকে সুরভিত করে। স্থলে স্থলপদ্ম, জলে জলপদ্ম আর সাপলার ফুল শরৎকে শ্রীমণ্ডিত করে। শরতের আরম্ভ হইতেই বড় নদীর ধারের গাছে—কুরর পক্ষীর রব শোনা যায়, বিলে কলমিলতার বনে ডাহুকের নৃত্য চোখে পড়ে।

বনে বনে ঘুঘু পাখির ডাক,—গাছে গাছে দোয়েলের গান কানে আসে। কৃষকের কুটিরে, গ্রামের ঘাটে, পথে, মাঠে সর্বত্র আশা ও আনন্দের সঞ্চার সকলেই উপলব্ধি করে।

আনন্দময়ীর আগমনের প্রতীক্ষায় সমস্ত প্রকৃতি হয় উৎকণ্ঠিত। দুর্গাপূজা বাংলার জাতীয় উৎসব। বাঙালী প্রাণ ভরিয়া মায়ের পূজার আয়োজনে রত হইয়া থাকে।—সারা দেশে উৎসবের সাড়া পড়িয়া যায়।

মায়ের পূজার উদ্দেশ্য পশুত্ব বা অসুরত্বকে বিনাশ করিয়া মানুষের অন্তরে দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত করা। বিজয়ার সর্বজনীন আলিঙ্গনে ইহার সার্থকতা।

বর্ষা চলিয়া যাইবার পর শরতে পথঘাট শুষ্ক হয়। এই সময়েই প্রাচীন কালের রাজারা দিগ্‌বিজয়যাত্রায় বহির্গত হইতেন। রাজাদের বিজয় ছিল ধর্মের বিজয়। তাঁহারা বিজিত নৃপতিকে রাজ্য ফিরাইয়া দিতেন। রবীন্দ্রনাথের মতে—দিগ্‌বিজয়ের অর্থ মানবহৃদয় জয়। বিজয়ার দিনে রামচন্দ্রের লঙ্কা বিজয়ের উৎসবের মধ্য দিয়াই আর্য-অনার্যের মিলন প্রকাশিত হইয়াছিল।

দুর্গা পূজায় সার্বজনীন প্রেমে হৃদয়ে দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পরই আসেন সর্বকল্যাণরূপিণী কোজাগরী লক্ষ্মী সর্বসমৃদ্ধিপ্রদানকারিণী।

লক্ষ্মী দেবীকে আলপনা আর ধানের শীষ দিয়া ভক্ত আবাহন করে। জ্যোৎস্নাপুলকিত রাত্রিতে ঘরে ঘরে চলে উৎসব। পূজার প্রসাদ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন সম্পন্ন হয়। শরতের স্নিগ্ধতা ও কমনীয়তার মধ্যে স্বভাবতই যেন হৃদয়ে আনন্দগান বাজিয়া উঠে।

বাংলার পল্লী

ভারতের বেশির ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। গ্রামের তুলনায় নগরের সংখ্যা অনেক কম। মানুষ নিজের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য অরণ্য হইতে গ্রামের পত্তন করে—গ্রাম হইতে তারপর গড়িয়া উঠে ধীরে ধীরে নগর। এই যে ক্রমোন্নতির চেষ্টা ইহার ভিতরই সভ্যতা, সংস্কৃতি, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বীজ নিহিত রহিয়াছে। গত দেড়শত বৎসরের মধ্যে ধীরে ধীরে মানুষ গ্রাম ছাড়িয়া নগরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে।

বহির্জগতের সহিত প্রাচীন বাঙ্‌লার পল্লীর সম্পর্ক ছিলনা বলিয়াই বাঙালী জীবনসংগ্রামে জয়ী হইতে পারে নাই। প্রাচীনকালে যেসকল গ্রামে ধনী জমিদার

বা ব্যবসায়ীদের বাস ছিল সেখানে মঠমন্দির, আরোগ্যশালা, পথঘাট, বাজার গড়িয়া উঠিয়াছিল। পাঠশালা বা টোলে শিক্ষাব্যবস্থা চলিত। গ্রামের কৃষক অন্ন যোগাইত, তাঁতি, কামার, কুমার, তাহাদের পণ্যদ্রব্য দ্বারা সমাজের চাহিদা পূরণ করিত। শিক্ষা, আনন্দ ও আমোদের জন্য যাত্রা কীর্তন, কথকতা প্রচলিত ছিল। অন্যায় অবিচারের প্রতিকার গ্রাম্য পঞ্চায়েতের হাতে ছিল। গ্রামবাসীরা দূরবর্তী স্থানের সহিত সম্পর্ক খুব কমই রাখিত। এক কথায় তখনকার দিনে গ্রাম ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। আশাআকাঙ্ক্ষা ছিল না বলিয়া অসন্তোষও বিশেষ একটা ছিল না। প্রত্যেকে যে যার নির্দিষ্ট স্থানটিকে, নির্দিষ্ট চাল চলতিকে বজায় রাখিতে পারিলেই নিজেকে ধন্য মনে করিত। কিন্তু সকল গ্রামের অবস্থা একরূপ ছিল না। অনুন্নত গ্রামে লোকের জীবনযাত্রার মান ধনাঢ্য গ্রামের উক্ত অবস্থার অনেক নীচে ছিল। এমন অনেক গ্রাম বাঙলা দেশে ছিল—যেখানে শিক্ষা চিকিৎসা, সুখস্বাচ্ছন্দ্য দূরে থাকুক—পল্লীর সারা বছরের ক্ষুধার অন্নটুকুও জুটিত না।

এ যুগে বাঙলার পল্লীর অবস্থা হইয়াছে অধিকতর শোচনীয়। বিদেশী শাসন এদেশে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের জমিদার ও সম্পন্ন ব্যক্তি, ব্যবসায়ী, গ্রাম্যশিল্পী অধিকতর উন্নতি বা সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আশায় স্বগ্রাম ত্যাগ করিয়াছে। জনসংখ্যার বৃদ্ধিতে গ্রাম্য কৃষকদের হাতে যথেষ্ট পরিমাণ জমি নাই অথবা ভূমি বণ্টনের অসমতার ফলে কৃষক হইয়াছে কর্মহীন—তাই তাহারাও দলে দলে বিদেশী কল মালিকের উৎপাদন কেন্দ্রে দিনমজুরী করিতেছে। গ্রাম এখন একরূপ পরিত্যক্ত। সেখানে পথঘাটের অভাব, কর্মসংস্থানের উপায় নাই, শিক্ষার প্রসার নাই—চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই, পানীয় জল দুর্লভ, মোটকথা গ্রাম হইয়াছে এখন বাসের পক্ষে অনুপযুক্ত।

অতি প্রাচীনকালের লোকেরা জানিতেন ধনী, বিদ্বান্‌, রাজা, চিকিৎসক এবং পানীয় জল যেখানে নাই সেখানে বাস করিতে নাই। ইহার তাৎপর্য এই—কোন স্থানে বাস করিতে গেলে লোকের জীবিকার জন্য কোন না কোন বৃত্তি বা ব্যবসায় অবলম্বন করা দরকার। ব্যবসা চালাইতে বা শিল্প উৎপাদন করিতে গেলে অর্থের (মূলধনের) প্রয়োজন। এই মূলধন ধনীর নিকট সংগ্রহ করিতে হয়, তাই চাই ধনী বা ব্যাঙ্ক। শিক্ষা ছাড়া মানুষের চলিতে পারে না—অন্ততঃ সভ্য মানুষের চলে না। বিদ্বান্‌ দ্বারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইতেছে; রাজা শব্দ দ্বারা শাসনব্যবস্থা বা আইনশৃঙ্খলার প্রযোজনীয়তা সূচিত হইতেছে। আইনব্যবস্থাবিহীন সমাজ ধ্বংসের পথে যায়। বাসস্থানে রোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকা চাই। সর্বোপরি দরকার পানীয় জলের। এই সকল ব্যবস্থা জীবনরক্ষার জন্য অতি প্রয়োজনীয়। অতীতে আমাদের দেশে ভাল মন্দ যাহা কিছু ছিল তাহা এখনকার দিনে ফিরিয়া আসিবে না। তাহা ফিরিয়া আসিলেও আমরা সন্তুষ্ট হইব কিনা বলা কঠিন।

প্রাচীন গ্রাম গিয়াছে। প্রাচীনের উপর নূতনের ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে।

জগতে যাহার প্রয়োজন থাকে না, সে চলিয়া যায়। যাহার প্রয়োজন আছে সমাজ স্বেচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক তাহাকে যাত্রাপথের পাথেয়রূপে সঞ্চিত করে। ইহাই জগতের নিয়ম। আমরা বড় শহরকে ত্যাগ করিতে পারিব না, গ্রামকেও ছাড়িব না। গ্রামকে সংগঠিত করিতে হইবে। প্রাচীন যুগের সততা, সরলতা, আত্মবিশ্বাসকে ত্যাগ করিয়া আমরা মনুষ্যত্ববিহীন পশু হইতে পারিব না,—তাই বলিয়া আধুনিক যুগের কর্মোদ্যমকে দূরে সরাইয়া রাখাও আমাদের পক্ষে অনুচিত হইবে। সুতরাং চাই দুইয়ের সামঞ্জস্য। যাহার অতীত আছে তাহার ভবিষ্যৎ থাকিবে। শূন্য হইতে ভবিষ্যৎ গঠিত হয় না।

এখনকার পল্লী হইবে আদর্শ পল্লী। বড় শহরের অতিরিক্ত কর্ম কোলাহল হইতে দূরে আদর্শ পল্লী স্থাপন করিতে হইবে। সেখানে আধুনিক জীবনের সুখসুবিধা থাকিবে, আর জগতের কোথায় কি হইতেছে তাহা পল্লীবাসী লক্ষ্য করিয়া আত্মোন্নতি ও সমাজের উন্নতি সাধন করিবে।

বড় শহরকেও রাখিতে হইবে। বৃহত্তর আদর্শের পরিকল্পনা সেখান হইতে উদ্ভূত হইবে। জ্ঞানী, গুণী, ধনী, শিল্পী, শিল্পপতি সেখানে আসিয়া নিজেদের বুদ্ধি, বিবেচনার প্রয়োগে দেশের সামগ্রিক কল্যাণের পরিকল্পনা রচনা করিবেন। বহির্জগতের সহিত বড় শহরের সম্পর্ক বেশি। তাই বহির্বাণিজ্য ও বৈদেশিক নীতির যোগাযোগের জন্য বড় শহরের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। কেবল শ্রমিক, কৃষক, শিল্পী লইয়া একটি সমাজের সামগ্রিক উন্নতি হয় না বা হইতে পারে না। দেশের উন্নতির জন্য ধনী ও বুদ্ধিজীবীর প্রয়োজনও পৃথিবীর সবযুগে এবং সবদেশে স্বীকৃত হইয়াছে।

যে কোন লোক সমাজের যে কোন কর্মক্ষেত্রেই থাকুক না কেন তাহার সেখানে প্রয়োজন আছে বুঝিতে হইবে। তাহাকে বাদ দিলে সমাজ চলিবে না। সমাজ হইতেছে 'সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীর'। কেহ কাহাকে বাদ দিতে পারিবে না—কেহ কাহাকেও অপ্রয়োজনীয় মনে করিবে না।

পুস্তকাগার

লেখাপড়া করিতে হইলে পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা আছে। সে পুস্তক নিজের থাকে ভাল, নতুবা অপরের কাছে ধার করিয়া সংগ্রহ করিতে হয়। লেখাপড়ার জন্য যখন বই সংগ্রহই করিতে হইবে, তখন নিজের স্কুল, কলেজ বা অন্য সাধারণ গ্রন্থাগার হইতে পুস্তক যোগাড় করিতে হইবে। ফলকথা জ্ঞান বিস্তারের জন্য গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা আছে। অবশ্য জ্ঞান বিস্তার একমাত্র গ্রন্থাগার দ্বারাই করা যায় না—আরো উপায় আছে। বিদ্যার্থী ছাড়াও জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের জন্য পুস্তকাগার আবশ্যক। সুতরাং লোকের প্রয়োজন অনুসারে নানা শ্রেণীর পুস্তকাগার সৃষ্টি হইয়াছে। কোন কোন পুস্তকাগার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত—যাহাকে মালিক বা তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব ছাড়া অপরের প্রবেশ প্রতিরুদ্ধ।

ব্যক্তিগত পুস্তকাগারে মালিক তাঁহার রুচি বা প্রয়োজন অনুযায়ী পুস্তক সংগ্রহ করিয়া থাকেন—তাহাতে সর্বশ্রেণীর পুস্তক থাকে না। দেশের মনীষিগণের ব্যক্তিগত পুস্তকরাশি দেখিলে তাহাদের জ্ঞানানুশীলনের ধারা লক্ষ্য করা যায়। আগেকার দিনের বড়লোকের বাড়িতে পুস্তক সংগ্রহ করা হইত। ইঁহাদের অনেকের জ্ঞানার্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। নিজেরা লেখাপড়ায় তাদৃশ অগ্রসর না হইলেও বেতনভোগী লোক দ্বারা পুস্তক পড়াইয়া তাহাদের বিষয়বস্তু জানিয়া লইতেন। দ্বিতীয় প্রকারের পুস্তকাগার হইতেছে স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থশালা। এই সকল পুস্তকালয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়া গ্রন্থ সংগ্রহ করা হয়। সর্বপ্রকার পুস্তক ইহাতে পাওয়া যায় না। বিজ্ঞানের জন্য যেমন 'প্রয়োগশালা' দরকার, তেমনি সাহিত্য, দর্শন, অর্থনীতি প্রভৃতি শাস্ত্রের জ্ঞানের জন্য পুস্তকালয় প্রয়োজনীয়। পুস্তকালয় ব্যবহার না করিলে কোন বিষয়ে জ্ঞান পরিস্ফুট হয় না বা তাহার পরিধিও বাড়ে না। এই সকল পুস্তকালয়ে সংশ্লিষ্ট বিদ্যার্থী, গবেষক এবং শিক্ষকগণ প্রবেশ লাভ করেন, সর্বসাধারণ অনেকক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া এখানে গবেষণা কার্য চালাইতে পারেন।

ইহার পর সাধারণ গ্রন্থাগারের কথা বলিতে হয়। সাধারণ গ্রন্থাগার অনেক প্রকারের। কোন কোন গ্রন্থাগারে নিয়মিত চাদা দিয়া সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইতে হয় এবং টাকা জমা রাখিয়া বা না রাখিয়া গৃহে পুস্তক লইয়া পাঠ করা যায়।

ইহাছাড়া আর এক শ্রেণীর গ্রন্থাগার আছে। সেখানে কোন চাঁদা লাগে না। অনেক ক্ষেত্রে এই সব গ্রন্থাগারের পুস্তক লোকে গৃহে লইয়া গিয়া পড়িতে পারে না —সংশ্লিষ্ট পাঠাগারে পাঠ করিতে হয়। আবার কোনো স্থানে বা টাকা জমা রাখিয়া পুস্তক গৃহে লইয়া পাঠ করিবার সুযোগ লাভ করা যায়।

সাধারণ পাঠাগারে সর্বপ্রকারের পুস্তক রক্ষিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্তমান কালে উপন্যাসের পাঠক অধিক হওয়াতে উপন্যাস বেশি না রাখিলে সাধারণ পাঠাগার চলে না। সাধারণ সাহিত্য, জ্ঞানবিজ্ঞান শিল্পের পুস্তক আসে খুবই কমই, কারণ গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষকে পাঠক সাধারণের চাহিদা মিটাইতে হয়। সব দিক দিয়া বিবেচনা করিলে কলিকাতায় অবস্থিত ভারতের "জাতীয় পাঠাগার" লাইব্রেরীর উচ্চ আদর্শ রক্ষা করে। এখানে মানুষের জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের পুস্তক সংরক্ষিত আছে। টাকা জমা দিয়া বাহিরে পুস্তক ধার লওয়া চলে—ভারতের যে কোন স্থানের লোক এখান হইতে পুস্তক লইয়া নিজের ঘরে বসিয়া পড়িতে পারে —অথবা স্থানীয় বিশেষ পুস্তকাগারের সহায়তায়ও এখান হইতে পুস্তক ধার লইতে পারে। পাঠাগারে বসিয়া পুস্তক পড়িতে কোনরূপ চাঁদা লাগে না। পাঠাগারটি বিরাট—পাঠের ব্যবস্থাও ভাল। খোলা সেল্ফে বিভিন্ন বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক সমূহ রক্ষিত আছে। পাঠকের প্রয়োজনীয় পুস্তক কোথায় কোথায় আছে পূর্বে দেখিয়া লইলেই পুস্তক বাহির করিতে কোন কষ্ট হয় না অথবা সময়ও নষ্ট হয় না।

ইচ্ছামত বই বাহির করিয়া পড়া যায়; দরকার হইলে পর পর বহু দিন সেই সব বই পড়ার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে রাখা চলে। পাঠাগারে খোলা পাঠের ব্যবস্থা প্রচলিত। এই গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত স্থান হইতে পুস্তক বাহির করিতে হইলে অবশ্য সময় অনেকটা নষ্ট হয়, অনেক সময় পুস্তক না থাকিলে সময় নষ্ট ও যাতায়াতের শ্রমই সার হয়। অপ্রাপ্য পুস্তক ছাড়া প্রাপ্য পুস্তকের সংখ্যাবৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করিলে এই অসুবিধা বহুলাংশে দূরীভূত হইতে পারে।

প্রত্যেক পুস্তকালয়ে নানা বিষয়ের নূতন নূতন পুস্তক আনা চাই—তাহা না হইলে পুস্তকালয় জনপ্রিয় হইতে পারে না। লোকের মন নূতন জ্ঞানভাণ্ডারের দিকে আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক।

শিক্ষা ও সংস্কৃতিসম্পন্ন লোকের পক্ষে পুস্তকালয় ব্যবহার অত্যাবশ্যক। প্রয়োজনীয় সকল পুস্তক ক্রয় একজন সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভবপর নহে। তাই লাইব্রেরীর জন্য লোকে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। লাইব্রেরীর সহিত যোগ রক্ষা করিলে জগতের জ্ঞানভাণ্ডার কোন্ দিক দিয়া সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল তাহার খবর পাওয়া যায় এবং নিজের ইচ্ছামত বিষয়ের পুস্তক পড়িয়া জ্ঞান্‌বান্ হওয়া যায়।

লাইব্রেরীর প্রধান কর্মকর্তার উপর উহার জনপ্রিয়তা এবং ব্যবহারের সাফল্য নির্ভর করে। গ্রন্থাগারিক স্বয়ং পুস্তকপ্রেমী হইবেন। গবেষকদিগের বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তক পাঠের উপদেশ দিয়া তিনি সহায়তা করিতে পারেন। লাইব্রেরীর কাজের উপর তাঁহার সদাজাগ্রত দৃষ্টি থাকা চাই। পাঠকদের অসুবিধা অনতিবিলম্বে দূর করার জন্য তিনি চেষ্টিত হইলে লোকের অযথা সময় নষ্ট হইবে না, জ্ঞানলাভেরও বাধা হইবে না।

জ্ঞানবিস্তারের সহায়তার জন্য সর্বসাধারণের ব্যবহারের উপযোগী গ্রন্থাগার সর্বপ্রথম খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রোম নগরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউরোপ ও আমেরিকা উন্নতিশীল দেশ সমূহে প্রাচীন কাল হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়া আসিতেছে। প্রাচীন ভারতবর্ষও জ্ঞান বিস্তারের ব্যবস্থা করিয়াছিল—তবে সর্বসাধারণের জন্য পাঠাগার স্থাপন করার আমরা কোন প্রমাণ পাই না। বিদ্যার আর এক নাম 'শ্রুত'—যাহা গুরু মুখে শুনিয়া শিখিতে হয়। বিশেষ বিশেষ বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিগণ বিদ্যা অপরকে শুনাইতেন। বিদ্যার্থী তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিত। ইহার সুবিধা এই পুস্তকস্থ বিদ্যা জল, অগ্নি বা অত্যাচারীর আক্রমণে নষ্ট হইতে পারে। কিন্তু গুরুর মুখে শোনা বিদ্যা পরম্পরা রক্ষিত হইলে কোন দিন নষ্ট হইবে না। আজিকার দিনেও যদি ভারতের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত প্রধান প্রধান বিদ্যার পুস্তক নষ্ট হইয়া যায় তথাপি বিদ্যা নষ্ট হইবে না। বেদের পুঁথি সব নষ্ট হইয়া গেলে আবার বেদকে উদ্ধার করা সম্ভবপর। লোকশিক্ষার জন্য রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণের কথকতার ব্যাপক প্রচারের ফলে সর্বসাধারণের জ্ঞানভাণ্ডার কখনও শূন্য হয় না। পরবর্তী কালে বারাণসী প্রভৃতি

স্থানের গ্রন্থাগার যখন অত্যাচারীর অত্যাচারে ধ্বংস হইয়াছিল, তখনও দেশে জ্ঞানের বর্তিকা সমভাবেই জ্বলিয়াছে।

প্রাচীন ভারতবর্ষে, মঠ, বিদ্যামন্দিরে, পণ্ডিতগৃহে সযত্নে পুস্তক রক্ষিত হইত, ধনী নাগরিকের গৃহেও পুস্তক-সংগ্রহ থাকিত—কিন্তু সর্বসাধারণ ইহা ব্যবহার করিতে পারিত না।

আধুনিক যুগের ভারতবর্ষ ইউরোপের আদর্শে সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়া আসিয়াছে এবং এদেশে গত পঁচিশ ত্রিশ বৎসর যাবৎ সাধারণ গ্রন্থাগার পরিচালনা, পুস্তক সংরক্ষণ প্রভৃতি কার্য শিক্ষা এবং গ্রন্থাগার প্রসারের আন্দোলন ফলপ্রসূ হইতেছে। এযুগে সর্বসাধারণের মধ্যে গ্রন্থাগারের সহায়তায় বিদ্যা বিস্তারের প্রযাস আরম্ভ হইয়াছে। এবিষয়ে বড়োদা অগ্রণী। বড়োদার সচল গ্রন্থাগার গ্রামে গ্রামে পুস্তকসম্ভার লইয়া উপস্থিত হইয়া সেখানকার জ্ঞান পিপাসুদিগের জ্ঞানের স্পৃহা তৃপ্ত করিতেছে আর অজ্ঞানের হৃদয়ে জ্ঞানক্ষুধার সৃষ্টি করিতেছে। পশ্চিম বাঙ্গালা সরকারও লাইব্রেরীর প্রসার ব্যাপারে সক্রিয় কার্যক্রম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা জেলায়, মহকুমায় এবং থানায় থানায় পুস্তকাগার স্থাপন করিয়া সকলের কাছে আধুনিক যুগের জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত কারবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সফল করিতে হইলে সর্বাগ্রে চাই নিরক্ষরতা দূরাকরণ। যাহারা লিখিতে পড়িতে জানে না তাহারা পুস্তকের আস্বাদ স্বয়ং গ্রহণ করিতে পারে না। লেখাপড়ার বিস্তার হইলেই গ্রন্থাগারের বিস্তার ফলপ্রসূ হইবে।

সংবাদপত্র

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সে যেমন নিজের স্বার্থ দিয়া তাহার ক্ষুদ্র পারিবারিক গণ্ডী গড়ে তেমনি অপরের খবর জানিবার জন্য তাহার কৌতূহলেরও অন্ত নাই। সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার কর্ম ও চিন্তা দেশের গণ্ডী ছাড়িয়া বহির্বিশ্বে ছড়াইয়া পড়ে। তাই সকলের খবর জানা তাহার দরকার। এই প্রয়োজনের চাহিদার জন্যই সর্বপ্রথম সংবাদপত্রের সৃষ্টি হয়। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সমাচারপত্রও তাহার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে থাকে; চীনদেশের লোকেরা মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কার করে। তাহারাই সর্বপ্রথম সংবাদপত্রও খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে প্রকাশ করে। ইংলণ্ড দেশে সমাচারপত্র ষোড়শ শতাব্দীতে উদ্ভূত হইয়াছিল। বাঙ্গালার 'সমাচার দর্পণ' ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্মলাভ করে।

সংবাদপত্রের প্রধান কাজ স্বদেশ ও বিদেশের সংবাদ সর্বসাধারণের নিকট পরিবেশন করা। এসব সংবাদ নানা রকমের হইয়া থাকে।—সামাজিক, পারিবারিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সাংস্কৃতিক, দৈনিক বাজারদর, বিভিন্ন ব্যবসায়ের গতি, জন্মমৃত্যুর হিসাব, খেলাধূলা, সরকারের আদেশ, আইন প্রবর্তন—প্রভৃতির বিবরণ সংবাদপত্রে বাহির হয়। ইহা ছাড়া সাহিত্যিক, বাণিজ্যিক, বৈজ্ঞানিক আলোচনা ক্রোড়পত্রও সংবাদপত্রে যুক্ত থাকে। প্রকাশের কাল অনুসারে দৈনিক, সাপ্তাহিক,

অর্ধসাপ্তাহিক, পাক্ষিক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীতে সংবাদপত্রকে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া সাময়িকপত্রও রহিয়াছে। সাময়িকপত্রের কার্য প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, খেলাধূলার বিবরণ প্রকাশ। সম্পাদকীয় মন্তব্য সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র এই উভয় প্রকার পত্রেই থাকে। এতদ্ব্যতীত বিশেষ সভা, সমিতি, সংসদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মুখপত্রও রহিয়াছে।

আধুনিক সংবাদপত্র সম্পাদিত হয় সম্পাদক এবং তাঁহার সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় সহকারী সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক, বাণিজ্য সম্পাদক এবং তাঁহাদের সহকারী দ্বারা। সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ বা মতের দায়িত্ব সম্পাদকের উপর ন্যস্ত আছে। সম্পাদক নিরপেক্ষভাবে নির্যাতিত দুর্বলের পক্ষ সমর্থন করেন। তিনিই সম্পাদকীয় স্তম্ভে বিশেষ বিশেষ ব্যাপারের বা ঘটনার উপর জনমত প্রকাশ করিয়া থাকেন।

সংবাদপত্রের গুরুত্ব আমাদের জীবনে ক্রমশঃ বাড়িতেছে। শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধ প্রভৃতির খবর জানিবার জন্য সমাজের সর্ব শ্রেণীর লোক সর্বদা উৎসুক। লেখাপড়া যাহারা জানে না তাহারাও শিক্ষিত লোকের নিকট হইতে সংবাদপত্রের সমাচার শুনিয়া লয়। সর্বদেশেই দিন দিন সংবাদপত্রের গ্রাহক সংখ্যা বাড়িতেছে। ইহাই ইহার জনপ্রিয়তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এ যুগের শিক্ষিত লোক প্রতিদিন সকালে উঠিয়া সংবাদপত্র পড়িতে না পারিলে নিজেকে পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন মনে করেন। যে সব দেশে জনগণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার বেশি হইয়াছে সেই সব দেশে সংবাদপত্রের প্রচলনও অন্যদেশ অপেক্ষা বেশি। ভারত জনশিক্ষা বিষয়ে পৃথিবীর উন্নতিশীল দেশসমূহ অপেক্ষা অনেক পশ্চাৎপদ, তাই সংবাদপত্রের চাহিদা পৃথিবীর অন্য উন্নত দেশ হইতে এখানে অনেক কম।

সংবাদপত্র দেশের শিক্ষাদাতার স্থান অধিকার করে। পৃথিবীর নানা গণতান্ত্রিক দেশে লোকে কিভাবে রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনা করে তাহার সমসাময়িক সংবাদ আমরা সংবাদপত্রের সাহায্যে জানিতে পারি এবং সেইসব বিষয়ে চিন্তা এবং আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারি। সংবাদপত্রে সাহিত্য, নাটক, শিল্পবাণিজ্য লইয়া আলোচনা হয়। ইহার ফলে এই সব দিকে লোকের দৃষ্টি প্রসারিত হয়। অবসর সময়ে আমাদের সংবাদপত্রের মতো আর বন্ধু নাই।

সংবাদের বিচিত্রতায়, বিষয়ের অভিনবত্বে খবরের কাগজ আমাদের কর্মজনিত অবসাদকে দূর করিয়া দেয়। সবচেয়ে বড় কথা সংবাদপত্র আদর্শ নাগরিক সৃষ্টির সহায়তা করে। সংবাদপত্র দেশের জনমতের প্রতিনিধির কাজ করে, সরকারের ভুলত্রুটি প্রদর্শন করিয়া তাহাকে সুপথে চালিত করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকে।

কোন কোন দেশে সরকার তাহার নিজের বিধিনিষেধ, বিজ্ঞাপন, আদেশ, বিশেষ অভিমত, বিরুদ্ধ সমালোচনার উত্তরদান প্রভৃতি প্রচারকার্যে সংবাদপত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে।

অধিকাংশ সংবাদপত্রই কোন না কোন রাজনীতিক দলের সমর্থক বা মুখপত্র। সম্পাদকের কাজ হইতেছে নিরপেক্ষভাবে জনমত প্রকাশ করা। ইহার উপরই তাহার সততা নির্ভর করে। কিন্তু দলগত রাজনীতির প্রভাবে সম্পাদক নিরপেক্ষ থাকিতে পারেন না। এইরূপ স্বাধীনচেতা সম্পাদককে কর্তৃপক্ষের সহিত বিরোধের ফলে পদত্যাগ করিতে হয়। সত্য খবর প্রকাশ করাই সংবাদপত্রের কর্তব্য। অনেক ক্ষেত্রে ভুল সংবাদ প্রকাশ করিয়া প্রচারকার্যের জন্য লোকের বিভ্রান্তি উৎপাদন করা হইয়া থাকে। অন্য কাগজে তাহার বিপরীত সংবাদ প্রকাশিত হয়, ফলে জনসাধারণ সত্য নির্ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। সততার সহিত সংবাদপত্র পরিচালনা করিলে ইহা দ্বারা জনসাধারণের প্রভূত উপকার সাধিত হইতে পারে। প্রচারমূলক ভুল সংবাদের সত্যরূপ যদি কোন প্রকারে জনসাধারণ জানিতে পারে তবে অপপ্রচারের বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে। কিন্তু দলগত কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যখন অনবরত বিভ্রান্তিকর সংবাদ প্রচারিত হইতে থাকে তখন স্থিরচিত্ত ব্যক্তিও ভ্রমে পতিত হয়—সাধারণ লোকের তো কথাই নাই। এইভাবে সংবাদপত্র জনসাধারণের উপকার অপকার দুই করিতে পারে।

কিন্তু দলনিরপেক্ষ নির্ভীক সংবাদপত্র বিরল। দলের পৃষ্ঠপোষকতা না থাকিলে কাগজ চলে না। নিরপেক্ষ কাগজ অনেক সময়ে অকালে বিলুপ্ত হইয়া থাকে। লোকের রাষ্ট্রীয় চেতনা যতই জাগ্রত হইতে থাকে ততই সে কোন না কোন রাজনীতিক দলের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। নিজের মতের সহিত দলগত মতের অনেকটা মিল থাকিলে লোক দলবিশেষের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে—ইহা মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দলবিশেষকে সমর্থন না করিলে কোন রাষ্ট্রীয় সংস্কার সম্ভবপর হয় না।

সময়ের মূল্য

কাল বা সময় অনাদি অনন্ত। নিমেষ মুহূর্ত তুচ্ছ অল্পসময় হইলেও যুগ যুগান্তর ইহারাই গড়ে। জগতের যাহা কিছু বস্তু সবই নশ্বর—কালক্রমে সবই ধ্বংস হইয়া যাইবে। বস্তুর উৎপত্তি, অবস্থান ও ধ্বংস কালের অধীন। কোন বস্তুর জন্ম একটা কালে হয়, তাহার অবস্থিতি হয় কিছুকাল ব্যাপিয়া, তাহার ধ্বংসও কাল-সাপেক্ষ। কার্য করিতে গেলেই তাহার সহিত সময়ের প্রশ্ন জড়িত হইয়া পড়ে। মানুষের জীবন কর্মময়। এই কর্মময় জীবনকে অবহেলা করিলে চলিবে না।

নদীর স্রোত যেমন সর্বদা প্রবাহিত, তাহার বিরাম বা বিশ্রাম নাই, কালও তেমনি বিরাম বিশ্রামহীন। সে অনন্তের পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। সে একবার চলিয়া গেলে আর ফিরিয়া আসে না। সুতরাং সময় থাকিতে থাকিতে কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে। সময়ের মূল্য যে ব্যক্তি বোঝে না তাহার জীবনের প্রথমভাগে বিদ্যা অর্জিত হয় না, বিদ্যা না হইলে দ্বিতীয়ভাগে ধন উপার্জন হয় না। আর জীবনের প্রথম আর দ্বিতীয়ভাগ যাহার নিষ্ফল তাহার তৃতীয়ভাগে

আধ্যাত্মিক চিন্তাও আসে না চতুর্থভাগে বা বার্ধক্যে হা-হুতাশ করা ছাড়া আর কিছু এরূপ লোকের কাছে প্রত্যাশা করা যায় না। প্রাচীনকালের লোকেরা এইরূপ ভাবিতেন—"আয়ুর (জীবনের) একটি মাত্র মুহূর্ত যাহা অতীত হয় তাহা কোটি স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা ফিরিয়া পাওয়া যায় না। তাহা যদি বৃথা নষ্ট হয়, তবে ইহা অপেক্ষা জগতে আর বেশি ক্ষতি কিসে হইতে পারে।" তাঁহারা বলিতেন 'আগামী কল্যকার কাজ আজই কর, বিকাল বেলার কাজ যদি পার, সকাল বেলায় করিয়া রাখ।' আদান-প্রদান আর কর্তব্য কাজ যদি সময়মত তাড়াতাড়ি শেষ না কর, তবে কাল তাহা নষ্ট করিয়া ফেলিবে। সময় অতীত হইলে কোন কাজই সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই।

যে ব্যক্তি কর্মী তাহারই জীবনে সময়ের মূল্য আছে, যে অলস তাহার কাছে ইহার কোন মূল্য নাই। কৃষক অনলসভাবে ভোরে উঠিয়া মাঠে কাজ করিতে যায়, কাজের অবসরে খাবার জন্য মাঠের কাজের জায়গায় পাশের গাছতলায় বসিয়া সে প্রাতরাশ খায়। জেলে নদীতে মাছ ধরে। তাহার খাবার যায় বাড়ি হইতে। কামার কুমার নানা শিল্পকার্যে রত কর্মীরাও সময় বাঁচাইবার জন্য এইরূপ করে এ সব দৃশ্য আমরা সব সময়েই দেখিতে পাই। গ্রামে যাহাদের হাতে কোন কাজ নাই অথচ ঘরে খাবার আছে বা রোজগার করিবার লোক আছে তাহারা তাস-পাশা খেলিয়া বা পরনিন্দা, পরচর্চা করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করে।

শহরের কথা আলাদা, সেখানে সকল লোক কর্মব্যস্ত। নির্দিষ্ট সময়ে ঘুম হইতে লোকের উঠিতে হয়, সকাল বেলায় ঘড়ি ধরিয়া নিয়মিত কাজ করিতে হয় সময়কে গ্রাহ্য না করিয়া চলিবার উপায় নাই। ট্রাম, বাস, অফিস, আদালত সব নির্দিষ্ট সময়ে না চলিলে সকলেরই ক্ষতি হইয়া থাকে। সময়মত দোকান না খুলিলে ক্রেতা অন্যত্র চলিয়া যায়।

ব্যাঙ্ক সময়মত না খুলিলে এবং কাজ করিতে প্রয়োজনীয় সময়ের অতিরিক্ত সময় লইলে লোকে সে ব্যাঙ্ক ছাড়িয়া অন্যত্র লেনদেনের কাজ করে। ডাকঘর সময়মত না খুলিলে বা প্রয়োজনীয় সময়ের মধ্যে কাজ না করিতে পারিলে সর্বসাধারণের অশেষ দুর্গতি হয়। অবশ্য লোকে নূতন ডাকঘর সৃষ্টি করিতে পারে না, কারণ উহা সম্পূর্ণ সরকারের আয়ত্তে—অপর কেহ আইনতঃ ঐ ব্যবসা করিবার অধিকারী নহে। লোক ফিরিয়া যায়, অনেক সময়ে টাকা-পয়সা নিজের লোকের দ্বারা অন্যত্র প্রেরিত হয় বা হয় না—জাতীয় সরকার বা দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

লোকের বাড়ি মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ থাকিলে নিমন্ত্রণকারী বা নিমন্ত্রিত ইহাদের মধ্যে একের বা উভয়ের শৈথিল্যে বা অব্যবস্থায় যখন মধ্যাহ্ন ভোজন অপরাহ্ণভোজন বা নৈশ ভোজনে পরিণত হয় তখন উভয়পক্ষই বিড়ম্বনা ভোগ করিতে থাকে। লোকে সময়ের মূল্য বোঝে না বলিয়াই অপরের ক্ষতি করে। সভায় বা অন্য কোন অনুষ্ঠানে দেখা যায় যিনি সভাপতি তিনি অনেক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠানের স্থানে উপস্থিত হন না—সভায় যোগদানকারী

লোকেরা তাঁহার জন্য আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে করিতে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া যায়। অথবা উদ্যোক্তারা অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত হন নাই—অথচ সভাপতি সময়মত আসিয়া অনুষ্ঠান আরম্ভের বিলম্ব দেখিয়া সভাস্থল ত্যাগ করেন। এই উভয় প্রকার কার্যেই লোকে বিড়ম্বিত হয়। লোকে স্টেশনে সময়মত উপস্থিত হইতে না পারিয়া গাড়ি ধরিতে পারে না, ছাত্র ক্লাশে দেরিতে উপস্থিত হইয়া ক্লাশের পূর্ণ কার্যে যোগদান করিতে পারে না, সভায় সময়মত লোক উপস্থিত না হইলে স্থানাভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়।

সময়ের মর্যাদা রক্ষা করা একটা জাতিগত বা সমাজগত অভ্যাস। পরস্পরের সহযোগিতা ছাড়া সময়ানুবর্তিতা পালন করা চলে না। অপরে আমার সময়ের মূল্য বুঝিলে আমার সময়মত কাজ করিতে অসুবিধা হয় না। মানুষকে বাল্য-বয়সেই সময়ানুবর্তিতা অভ্যাস করিতে হয়। দিনের মধ্যে সময় নির্দিষ্ট করিয়া কাজ না করিলে কোন কার্যই সম্পন্ন হইবে না। ঘুম হইতে উঠা, পড়াশুনা, স্কুলে যাওয়া, বিশ্রাম, আমোদ-প্রমোদ, খেলাধূলা সব কিছুই নিয়মিত সময়ে করা দরকার। পুনঃ পুনঃ অভ্যাসে অস্বাভাবিক কাজ স্বাভাবিক রূপ ধারণ করে।

কর্ম এবং ধর্মচর্চা যাঁহারা একসঙ্গে করেন, তাঁহারা দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য সময়কে বিভিন্ন কাযের জন্য বিভক্ত করিয়া থাকেন। এই সকল মহান ব্যক্তি যখন অপরের বৈষয়িক কার্যের ভার গ্রহণ করেন তখন এই কার্যের জন্য যতটা সময় দরকার তাহার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন এবং ধর্মচর্চার জন্য নির্দিষ্ট সময়েরও কোন ব্যতিক্রম ইঁহাদের হয় না। ইঁহারা আধ্যাত্মিক চিন্তার ফলে মনের যে নির্মলতা এবং একাগ্রতা লাভ করেন তাহার সহায়তায় অল্প সময়ের মধ্যে কঠিন বিষয়-সমূহকে আয়ত্ত করিয়া ফেলেন। সুতরাং বৈষয়িক কর্ম ইঁহাদের কাছে খুব সরল হইয়া থাকে। যখন কর্ম প্রবল হয় তখন ধর্মকে ত্যাগ করিতে হয়, আর ধর্ম প্রবল হইলে বৈষয়িক কর্ম ত্যাগ করিতে হয়। সময়ানুবর্তিতা দ্বারাই দুইয়ের সামঞ্জস্য বিধান চলিতে পারে—অন্যরূপে নহে।

কিরূপ বই পড়িব ?

(পুস্তক নির্বাচন)

মানুষের জ্ঞানের পরিধি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকের সংখ্যাও দিন দিন বাড়িতেছে। এই অনন্ত পুস্তকরাশির মধ্যে আমরা কি পড়িব তাহা বিবেচনা করিবার প্রশ্ন উঠে। সব পুস্তক পড়িতেও পারা যাইবে না—পারাও সম্ভব নহে, প্রয়োজনও নাই। প্রয়োজনের তাগিদে লোক কাজ করে। যেখানে নিছক আনন্দের জন্য লোকে কিছু করে সেখানে বুঝিতে হইবে জীবনে আনন্দ লাভেরও প্রয়োজন আছে। পুস্তক পাঠে আনন্দ আছে এবং ইহাতে জ্ঞানও আহরণ করা যায়।—জ্ঞানে আনন্দ, অজ্ঞতায় কাহারও কোন গৌরব নাই। বই অসংখ্য বাহির হইতেছে সত্য, তাহার মধ্যে কোনটি আমার কি প্রয়োজন সাধন করিবে তাহা

আগে জানা দরকার। তাহা হইলে পুস্তক নির্বাচন করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে। প্রাচীন ভারতবর্ষে কোন শাস্ত্র পড়িতে গেলে প্রথমেই তাহার প্রয়োজন বিচার করা হইত। ইহার আলোচনাদ্বারা কি ফল লাভ হইবে তাহা নির্ণয় করা প্রয়োজনীয় ছিল। ইহাতে পুস্তক নির্বাচনের কোন অসুবিধা হইত না। আধুনিক যুগে যাঁহারা পড়িতে পড়িতে নিজেদের রুচি সৃষ্টি করিয়াছেন বা প্রয়োজন নির্ণয় করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে পুস্তক নির্বাচনের কোন কথা উঠে না। কিন্তু জগতের সহিত পরিচয় যাহাদের কম—সেই তরুণদের পক্ষে পুস্তক নির্বাচন করা কঠিন হইয়া পড়ে। ভাল মন্দ নানা রকমের পুস্তকের মধ্য হইতে তাহাদের উপযুক্ত বই বাছিয়া লইতে গিয়া সমস্যায় পড়িতে হয়। ফলে তাহারা যাহা পায় তাহাই পড়ে। লক্ষ্যহীন পাঠের যে কুফল তাহা তাহারা ভোগ করিয়া থাকে। এসব ক্ষেত্রে গ্রন্থনির্বাচন উপযুক্ত উপদেষ্টার সাহায্যে সুফল হইতে পারে। অনেক স্থলে যোগ্য শিক্ষকের উপর এই ভার ন্যস্ত থাকে। তিনি তরুণদিগকে সুপথে পরিচালিত করেন। অনেক স্থলে যেখানে ভাল পুস্তকাগার আছে—সেখানে বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তক নির্বাচন করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীতে উহার তালিকা সংরক্ষিত হয়। ছাত্রগণ উহা হইতে পুস্তক বাছিয়া লইয়া পড়ে। স্কুল কলেজের লাইব্রেরী বা সাধারণ লাইব্রেরীতে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক বিশেষ সাহায্য করিতে পারেন।

তরুণ ছাড়াও প্রবীন লোকদের গ্রন্থাগারিক সাহায্য করিতে পারেন। কোনও ব্যক্তি কোনও একটি বিশেষ বিষয়ে পড়াশুনা করিতেছেন বা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন গ্রন্থাগারিক তাঁহার প্রয়োজনীয় পুস্তকগুলির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিয়া দিতে পারেন। পুস্তক নির্বাচন বিষয়ে সাময়িক বা দৈনিকপত্র বা অনেক গ্রন্থ বিক্রয়প্রতিষ্ঠান পাঠকগণকে সাহায্য করিয়া থাকে। সাময়িক বা দৈনিকপত্রে সদ্যঃ প্রকাশিত পুস্তকের সমালোচনা বাহির হয়। পুস্তক-বিক্রয়-প্রতিষ্ঠান হইতে অনেক সময় গ্রন্থের পূর্ণ বিবরণ জানা যায়। উহা হইতে পাঠকগণ প্রয়োজন অনুযায়ী পুস্তকের খবর পাইয়া তাহা সংগ্রহ করিতে পারেন।

এ তো গেল পুস্তক নির্বাচনের উপায়ের কথা। কোন জাতীয় পুস্তক পড়িতে হইবে তাহারও একটা আলোচনা এই প্রসঙ্গে হওয়া উচিত। রসসৃষ্টি করিয়া সাহিত্য আমাদিগকে আনন্দের দিকে চালিত করে, বিশ্বসংসারের সহিত আমাদের সংযোগ স্থাপন করে। গ্রন্থের মধ্যে সাহিত্য পাঠের দিকে লোকের অধিক প্রবণতা দেখা যায়।

সাহিত্যের মধ্যে প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংস্কৃত সাহিত্য। কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন আধুনিক যুগে সংস্কৃত সাহিত্যের আবার আলোচনা কেন? রসপিপাসু মন সংস্কৃত সাহিত্যকে ত্যাগ করিতে পারে না। ভারতের অন্তরাত্মার সহিত আমাদের পরিচয় ঘটে সংস্কৃত সাহিত্যের মাধ্যমে। এ সাহিত্যে পাই আমরা সত্য শিব সুন্দরের পূজা—এ পূজা উত্তরাধিকার সূত্রে আমাদের

আধুনিক সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পাইয়াছি। সুন্দরের পূজারী কালিদাসের 'শকুন্তলা', স্বর্গ ও মর্তকে এক সূত্রে গাঁথিয়াছে, 'রঘুবংশ' শৌর্যবীর্য, ত্যাগতপস্যা প্রেমবিরহে সমুজ্জ্বল হইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। 'মেঘদূত' যুগ যুগ ধরিয়া চিরন্তন বিরহের বাণী বহন করিতেছে।

ইংরাজী ভাষায় জ্ঞান-লাভে যিনি পরিশ্রম করিয়াছেন এক শেকস্পীয়রের গ্রন্থরাজির রসগ্রহণ তাঁহার পরিশ্রম সার্থক হইবে।

বাঙ্‌লা সাহিত্যের কথা উঠিলে বলিতে হয় প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' আর ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গল' পাঠ করিয়া কাহারও ঠকিবার সম্ভাবনা নাই। 'চণ্ডীমঙ্গলে' ঐশ্বর্য আর দারিদ্র্য, তাহাদের উত্থানপতনের কাহিনী শুনাইয়াছে। 'ধর্মমঙ্গল'—শৌর্যবীর্য, ঐশ্বর্য, রিক্ততার মধ্যে মানুষের উত্থানপতনের চিত্র আমাদের সম্মুখে প্রসারিত করিয়াছে। প্রাচীন বাঙ্‌লা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর গ্রন্থ হইতেছে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'। এরূপ ভক্তি দর্শনাত্মক গ্রন্থ আজ পর্যন্ত বাঙ্‌লা সাহিত্যে রচিত হয় নাই। কৃত্তিবাস আর কাশীরাম দাস তো বাঙ্‌লার সকলের নিকট আদরণীয়। ঘরে ঘরে তাঁহাদের পূজা চলিতেছে। আধুনিক বাঙ্‌লা উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'—সর্বজনগ্রাহ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে। মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের কাব্য জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

সাহিত্য হৃদয়কে সরস করে, একের সহিত অন্যকে যুক্ত করিয়া দেয়। বর্তমান মানুষের কর্মও চিন্তার ধারা বহুমুখী হইয়া প্রবাহিত হইয়াছে। জগতের চারিদিকে দিন দিন যে পরিবর্তন হইতেছে তাহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার নামই তো জীবন। সুতরাং সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ লইয়া থাকিলেই আমাদের জীবন চলিবে না। সাধারণ বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতিও আমাদের পাঠের বিষয় হইবে।

আমরা জাতীয় সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করিতে পারিব না। এই সংস্কৃতি কি করিয়া যুগ যুগ ধরিয়া আপনার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া ও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তকে লইয়া এক মহাভারত রচনা করিয়া আসিয়াছে—তাহা আমাদের জানা দরকার।

আধুনিক যুগের নিত্যনূতন সমস্যাসকল আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে, তাহার সমাধানের উপায় যে সব গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে তাহাদের নিকট হইতেও আমাদের দূরে থাকিলে চলিবে না।

একথা সর্বজনবিদিত যে আমাদের প্রয়োজন অনুসারে পুস্তক নির্বাচন করিতে হয়। নিজেদের জীবিকা অর্জনের জন্য যে সব পুস্তক পাঠের দরকার তাহা লোকে অবশ্যই পাঠ করিবে—ইহাই আশা করা যায়।

পুস্তকের সঙ্গে পরিচয় যতই ঘনিষ্ঠ হইবে—ততই আমাদের পুস্তক পাঠের স্পৃহা বাড়িয়া যাইবে এবং অলক্ষ্যে নিজেদের মধ্যে পুস্তক নির্বাচনের শক্তিও সৃষ্ট হইবে।

বাঙালীর সংস্কৃতি

'সংস্কৃতি' কথাটির অর্থ অনুশীলনদ্বারা লব্ধ বিদ্যা, বুদ্ধি, শিক্ষা, জ্ঞান ইত্যাদির উৎকর্ষ। ('সংসদ অভিধান')। কোন জাতির সংস্কৃতির আলোচনার কথা উঠিলে বুঝিতে হইবে সেই জাতির চিন্তা, তাহার ভাবনা, তাহার কর্ম কখন কিভাবে বাস্তবরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহারই একটা হিসাবনিকাশ করা। বাঙালীর সংস্কৃতি মধ্যযুগের ভারতীয় সংস্কৃতিরই রূপবিশেষ, তথাপি তাহার মধ্যে বাঙলার জলবায়ু এবং তাহার বিশিষ্ট পরিবেশের প্রভাব বর্তমান।

গুপ্তযুগের অবসানে পালযুগের অভ্যুদয়ে বাঙলার সংস্কৃতির উদ্ভব হইয়াছে বলিতে পারা যায়।

ভাষা মানুষের অন্তর্নিহিত ভাবধারা প্রকাশের বাহন। পালযুগের শিলালেখ, ও কাব্য রচনাতে সংস্কৃত ভাষারই প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু দেশভাষা এ যুগে অবজ্ঞাত হয় নাই; দেশভাষার দুইটি ধারার প্রাধান্য এই সময় হইতে দেখা যায়। একটি পশ্চিমা অপভ্রংশ ভাষা—আর একটি বাঙলা ভাষা। পশ্চিমা অপভ্রংশ ভাষা সারা ভারতের ভাবের আদান-প্রদানের ভাষা ছিল। আর বাঙালী এই যুগেই চর্যাগীতির মধ্য দিয়া বাঙলা ভাষার মাধ্যমে আপনার এক বিশিষ্ট সাধনার ধারাকে রূপদান করিয়াছে। বাঙলার সংস্কৃতি মূলতঃ ভারতীয় সংস্কৃতি হইলেও, তুর্কি বিজয়ের পর মুসলমান সংস্কৃতি, এবং সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে ইউরোপীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে পরিপুষ্ট হইয়াছে।

আধ্যাত্মিক সাধনার দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়, সহজিয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ভাবধারা বাঙলায় বিস্তার লাভ করে। বাঙলার শৈবপন্থা ও নাথপন্থারা ভারতের অন্য প্রদেশে এবং বহির্ভারতে আপনাদের ভাবধারা সম্প্রসারিত করে। তার পরে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে নব্য বৈষ্ণবধর্মের ভাবধারা সুফী মতদ্বারা প্রভাবিত হইয়া প্রেমভক্তির বন্যায় শুধু বাঙলা নহে বাঙলার বাহিরকেও প্লাবিত করিয়াছিল।

মধ্যযুগের সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বিষয় বাঙলার দার্শনিক চিন্তার মৌলিকতা ও সর্বভারতব্যাপী তাহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি। বাঙলায় নব্যন্যায়ের চর্চা এই সময় হইতে সমগ্রভারতের শাস্ত্রচর্চার বিচারপদ্ধতিকে নিজের পথে চালিত করে। সমগ্র ভারত এই দিক দিয়া বাঙালীকে গুরু বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল। বাঙালী শুধু কাঁদিতে জানে না। প্রেমভক্তির সাধনা দিয়া সে যেমন অপরকে নিজের করিয়া লইতে পারিয়াছিল, তেমনই সে তাহার বিচারধারা দ্বারা অপরকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। ভাবপ্রবণতার সঙ্গে উচ্চদার্শনিক চিন্তাও যে একই সময়ে চলিতে পারে তাহা বাঙালাই প্রথম জগৎকে দেখাইয়াছিল—বাঙালী তাহার "মস্তিষ্কের অপব্যবহার" করে নাই।

বাঙলার বৈষ্ণব গীতিকবিতা, বাঙলার মঙ্গলকাব্য তাহার সংস্কৃতি ও সাধনার ইতিহাস বহন করিতেছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর পর হইতে বাঙলার সহজিয়া বৈষ্ণব, আউলবাউল, দরবেশ, কর্তাভজা সম্প্রদায় আমাদের ভাবধারাকে জাতি, বর্ণ, সমাজ, ধর্মনির্বিশেষে সকলের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়।

বাঙ্‌লার শাক্ত সাধকগণ উমা-সংগীত ও শ্যামাসংগীতের মাধ্যমে বাঙালীর মাতৃসাধনার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল।

বাঙালী তাহার আহারবিহার, বাসস্থান, পরিধান, শয্যা, শিল্পে ভারতের অন্য প্রদেশ হইতে তাহার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিতেছে। এই স্বাতন্ত্র্যের মূলে রহিয়াছে তাহার ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুর বিশিষ্ট প্রভাব।

অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে ইউরোপীয় জাতির সংস্পর্শে বাঙালীর জীবন ও চিন্তা-ধারায় বিপ্লব উপস্থিত হয়। এ বিপ্লব সুদূর পল্লীগ্রামকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিতে পারে নাই। ইংরেজের আগমনে আমাদের গ্রামকেন্দ্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি নগরকেন্দ্রিক হইতে থাকে। ইংরেজ জাতির প্রভাবে আমরা পাইয়াছি অনেক এবং হারাইয়াছিও অনেক।

মধ্যযুগের গ্রামকেন্দ্রিক সভ্যতায় আমাদের সংস্কৃতিকে সকলেই গঠন করে আর উহার ব্যবহার এবং ভোগের অধিকার সকলেরই ছিল। নগরকেন্দ্রিক সভ্যতায় সংস্কৃতির রচয়িতা হইলেন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নাগরিকগণ—ইহার উপভোক্তাও হইলেন সেই শিক্ষিত সম্প্রদায়।

পল্লীর জনগণের নিকট সে সংস্কৃতি গ্রহণযোগ্য হয় নাই। যাঁহারা গ্রাম ছাড়িয়া শহরে আসিলেন তাঁহারাই কেবল উহার রচনা ও আস্বাদ গ্রহণ করিলেন। ফলে দাঁড়াইল দুইটি শ্রেণীর মধ্যে বিরাট ব্যবধান। নাগরিক জনগণ গ্রামবাসীকে প্রাণ দিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। আর শহরবাসীকেও গ্রামের জনগণ বিশ্বাস করিতে পারে না।

• ইউরোপীয় সংস্কৃতি ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্‌লায় প্রবেশ করিয়া যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠায় শিক্ষিত জনগণের মনকে সংস্কারমুক্ত করিয়া জাতির জীবনে নবচেতনার সঞ্চার করে। ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন, ধর্মীয় চিন্তার ধারা ও সামাজিক সংস্কার কার্যে আধুনিক যুগের সূচনা করে।

'যত মত তত পথ'—মতবাদের প্রচার দ্বারা যুগগুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব দেশকে 'আপন ঘরে' ফিরিবার পথ প্রদর্শন করিলেন। নব্য ভারতের অন্যতম স্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ পরমহংসদেবের প্রেরণায় ভারতের কোটি কোটি নরনারীর প্রাণে জাগৃতি আনিবার সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করিলেন।

সাহিত্যে বঙ্কিম, মধুসূদন, রঙ্গলালকে আমরা ক্রমে ক্রমে পাইলাম। নাট্যে, শিল্পে, কলায়, বাঙ্‌লায় নূতন যুগ উপস্থিত হইল। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ও সংগীতে এ যুগ গৌরবের উচ্চশিখরে উঠিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তরের নিষ্পেষণে বাঙ্‌লার সংস্কৃতি বিপন্ন হয়। দেশের লোকসংস্কৃতি মানুষের অভাবের তাড়নায় একরূপ নিশ্চিহ্ন হইতে বসিল। তাহার যাত্রা, কথকতা, বাউল, ভাটিয়ালী গান ম্রিয়মাণ হইল।

স্বাধীনতা লাভের পর দেশ বিভাগে গৃহহারা হইয়া মানুষ এখানে-সেখানে বাসস্থান খুঁজিতে লাগিল। সে তাহার প্রাণকেন্দ্রের সহিত যোগ হারাইল। মানুষের আহার-বাসস্থানের নিশ্চয়তা না থাকিলে, তাহার পরিবেশ নষ্ট হইলে, তাহার এতকালের গড়া স্বাভাবিক সংস্কৃতির লোপ হওয়া স্বাভাবিক।

যুদ্ধোত্তর যুগে নাগরিক সংস্কৃতিরও একটা নির্দিষ্ট ধারা খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভবপর হইতেছে না। তাহার কারণ হয়তো নিয়মের রাজত্ব ছাঁড়িয়া দিয়া সে সংস্কৃতি অনিশ্চিত পথে চলিয়া বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিতেছে। কল্যাণের পথে সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে অভিনন্দিত করা যায়, কিন্তু উহার বিকৃতিকে গ্রহণ করা চলে না।

বাংলার নদনদী

বাঙ্‌লা নদীমাতৃক দেশ। বাঙ্‌লার সংস্কৃতি ও তাহার ইতিহাস গঠন করিয়াছে নদনদী। বাঙ্‌লার নদী কবির কাছে 'ঘুমপাড়াবার গান গাহে নিরবধি'—দার্শনিকের কাছে ভবনদী উত্তরণের চিন্তার উপাদান যোগাইয়াছে, রাজার রাজ্যসীমা রক্ষণ করিয়াছে। নদী পলিমাটি দ্বারা শস্য উৎপাদন করিয়াছে, বণিকের বাণিজ্যতরী বহন করিয়াছে, নৌসেনাকে জলযুদ্ধের সুযোগ দিয়াছে, মানুষের তৃষ্ণার জল যোগাইয়াছে, বাঙালীর ক্ষুধার অন্ন আর মৎস্য সরবরাহ করিয়াছে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে যাতায়াতের বিনাব্যয়ে পথ রচনা করিয়া দিয়াছে, পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণকে একসূত্রে বাঁধিয়াছে। নদীর উপকূলে গ্রাম, নগর, রাজধানীর পত্তন হইয়াছে।

নদী যেমন বাঙ্‌লার সভ্যতা, সংস্কৃতি গড়িয়াছে, তেমনই উহাকে ভাঙ্গিয়াছে। নদীর ভাঙ্গনে কত কীর্তিমানের কীর্তি বিলুপ্ত হইয়াছে, গৃহস্থ গৃহহারা হইয়াছে, প্রবল জলপ্লাবনে মনুষ্য, পশুপক্ষী ধ্বংস হইয়াছে। আবার ধ্বংসের স্থান শস্যশ্যামল হইয়া উঠিয়াছে। নদী যেখানে মজিয়া গিয়াছে বা যেস্থান হইতে তাহার গতিপথ অন্যত্র সরিয়া গিয়াছে সে স্থানের দুর্দশার অন্ত নাই। গ্রাম ম্যালেরিয়ার আবাসস্থল হইয়া সে অঞ্চলটিকে ক্রমে ক্রমে শ্মশানে পরিণত করিয়াছে। তাহার শিল্পবাণিজ্য নষ্ট হইয়াছে। তাহার তৃষ্ণার জলটুকু পর্যন্ত মিলে নাই।

বাঙ্‌লার সবচেয়ে প্রাচীন নদী গঙ্গা, ভাগীরথী ও পদ্মা। ব্রহ্মপুত্রও সুপ্রাচীন। উত্তর বঙ্গে করতোয়ার কথাও প্রাচীন শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। ঐ অঞ্চলে ত্রিস্রোতা (তিস্তা), মহানন্দা, আত্রেয়ী প্রসিদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গের কাসাই (কপিশা), অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ, যমুনা, সরস্বতীর উল্লেখ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে পাওয়া যায়।

রামায়ণকার কৃত্তিবাসের সময়ে গঙ্গার প্রধান দুই প্রবাহ ভাগীরথী ও পদ্মা ছোট গঙ্গা ও বড় গঙ্গা নামে অভিহিত হইত। পদ্মার প্রবাহ অধিকতর প্রশস্ত হওয়ায় উহার নাম ছিল 'বড়গঙ্গা' আর—বর্তমান ভাগীরথী বা গঙ্গার নাম ছোটগঙ্গা। কৃত্তিবাসেরও বহু পূর্বে সেনরাজগণের সময়ে পদ্মাকে 'পদ্মাবতী' বলা হইত।

ভাগীরথী বা গঙ্গারই তীর্থমাহাত্ম্য রহিয়াছে পদ্মার সে মাহাত্ম্য নাই। তবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন পূর্ববাঙ্‌লায় যান তখন পদ্মাতে তিনি তীর্থস্নান করেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে সাগরসঙ্গম হইতে ভাগলপুর পর্যন্ত ভাগীরথী পথের বাণিজ্যের নৌকা চলাচল করিত। এই সময়কার গঙ্গার প্রবাহ আর বর্তমান কালের কলিকাতা পর্যন্ত প্রবাহ একই প্রবাহ ছিল। কলিকাতার দক্ষিণে যাহাকে আদিগঙ্গা বলা হয়, সেই পথে ভাগীরথী সাগরে গিয়া মিশিত।

সেনরাজগণের সময়ে পদ্মার নাম ছিল পদ্মাবতী। তাহারও পূর্বে পদ্মার নাম 'চর্যাপদে' 'পঁউআ খাল' বা পদ্মাখাল পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয় পদ্মা সে সময়ে এতবড় নদী ছিল না।

পশ্চিমবঙ্গের কাসাই বা কপিশা অতি প্রাচীন নদী। কালিদাসের কাব্যে কপিশার উল্লেখ পাওয়া যায়। ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ, প্রভৃতি নদীগুলি ভাগীরথীর উপনদরূপে তাহাদের জলধারা গঙ্গায় ঢালিয়া দেয়। তাহাদের গঙ্গার সহিত প্রাচীন মিলনস্থল পরিবর্তিত হইয়াছে।

বহুযুগ ধরিয়া ভাগীরথী ও পদ্মা বহু শাখাপথে প্রবাহিত হইয়া বাঙ্‌লার দক্ষিণাংশে অবস্থিত বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডকে বার বার ভাঙ্গিয়াছে আর গড়িযাছে।

চব্বিশ পরগণা, খুলনা, বাখরগঞ্জ জেলার দক্ষিণাংশে এই দুই নদীর ভাঙ্গাগড়ায় বহু সম্পন্ন জনপদ গঠিত হইয়াছে। আবার তাহা নদীর গতি পরিবর্তনে ঘন অরণ্যে হিংস্র জন্তুর আবাসস্থল সুন্দরবনে রূপায়িত হইয়াছে। চব্বিশ পরগণা জেলার পশ্চিম অংশে গুপ্তযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া সেনরাজগণের রাজত্বকাল দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ সমৃদ্ধ জনপদের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে।

উত্তরবঙ্গের করতোয়া অতি প্রাচীন নদী। তীর্থ হিসাবে পূর্ব ভারতে করতোয়ার মাহাত্ম্য রহিয়াছে। পুণ্ড্রবর্ধনের রাজধানী বর্তমান মহাস্থান গড় (প্রাচীন পুণ্ড্রনগর) বগুড়া জেলায় করতোয়া তটে অবস্থিত ছিল। গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যবর্তী দেশকে 'বরেন্দ্রী' নামে অভিহিত করা হইত। তাহা হইলে দেখা যায় করতোয়া নদী বরেন্দ্রভূমির পূর্বসীমা নির্দেশ করিত।

উত্তরবঙ্গের প্রাচীন নদীগুলির মধ্যে কোশী বা কৌশিকী অন্যতম। এই নদী পূর্ণিয়া জেলা দিয়া দক্ষিণে গঙ্গায় পতিত হইয়া থাকে। কোন কালে ইহা ব্রহ্মপুত্রে প্রবাহিত হইত। কোশী বহুবার তাহার গতিপথ পরিবর্তিত করিয়াছে। এই পরিবর্তনের ফলে কোশী ও মহানন্দা গৌড় অঞ্চলে (মালদহ জেলায়) বহু মরা নদী ও জলাভূমির সৃষ্টি করিয়াছে। গৌড় অঞ্চলে নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে ক্রমশঃ অস্বাস্থ্যকর হয় এবং সেখানকার প্রাচীন রাজধানী পরিত্যক্ত হয়।

বাঙ্‌লার সম্পদ, সমৃদ্ধি, স্বাস্থ্য তাহার নদীর উপর নির্ভর করে। বহু নদী মজিয়া যাওয়ায় বা উহাদের ধারা পরিবর্তনে দেশের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে এবং হইতেছে। নদীর গতি ও জলপ্রবাহের নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিলে দেশের পূর্ব সমৃদ্ধি আবার ফিরিয়া আসিবে। দামোদর, ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি পরিকল্পনাদ্বারা সরকার

নদীনিয়ন্ত্রণ করিবার কাজে হাত দিয়াছেন। এই প্রচেষ্টা চলিতে থাকিলে দেশের আর্থিক দুর্দশা ও বেকার সমস্যার সমাধান হইবে সন্দেহ নাই।

বিত্ত হতে চিত্ত বড়

(ধনসম্পত্তি বিষয়-ঐশ্বর্য যাহা কিছু জাগতিক সুখসুবিধার জন্য মানুষ অর্জন করে, তাহার নাম বিত্ত। জগতে বাস করিতে হইলে বিত্তের প্রয়োজন।) কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য এবং সেবা বা শ্রমদানদ্বারা বিত্ত উপার্জিত হয়। (লোকে বলে পৃথিবী টাকার বশ। টাকা খরচ করিতে পারিলে জগতে সাধারণ উপায়ে যাহা সম্ভবপর নহে তাহা অর্থ দ্বারা সম্ভবপর হইয়া থাকে। নিতান্ত মূর্খও টাকার জোরে সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করে।)—প্রাচীন যুগের কবি বলিতেন 'যাহার টাকা আছে সেই ব্যক্তি নীচ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও কুলীন, সে বক্তা, সে প্রিয়দর্শন। অর্থকে আশ্রয় করিয়া সকল গুণ অবস্থান করে।' অর্থ না থাকিলে গুণের কোন মূল্য নাই। সুতরাং যে কোন প্রকারেই হউক অর্থ উপার্জন করিতে হইবে। অর্থ ছাড়া পৃথিবী অচল, পৃথিবী সুখশূন্য। যে দিকেই দৃষ্টিপাত কর, যাও না কেন সর্বত্রই অর্থের অপ্রতিহত প্রভাব। শিক্ষা সভ্যতা অর্থছাড়া হয় না, আত্মরক্ষা চলে না, দেশরক্ষা সম্ভব হয় না, চিকিৎসা, ভ্রমণ, আনন্দ সর্বত্রই অর্থের একনায়কত্ব উপলব্ধ হয়। (অর্থ না থাকিলে মানুষকে কেহ গ্রাহ্য করে না। অর্থশূন্য জাতি পৃথিবীর অপর সম্পন্ন জাতির কৃপার পাত্র, শোষণের কবলে নিপতিত। কোন জাতির সভ্যতা সে জাতির সম্পদের উপরেই নির্ভর করে। অনেক সম্পৎশূন্য জাতি তাহাদের কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারাই জগতে সম্পদ আহরণ করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠালাভের জন্য নব নব সম্পদ্ আহরণের চেষ্টায় আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জাতি সমূহ বহুকাল ধরিয়া সারা পৃথিবীর উপর সুযোগ-সুবিধামত নিজেদের কূটজাল বিস্তার করে।)

(এই বিত্তৈষণার যেন আর বিরাম নাই। যাহার যত অর্থই থাকুক না কেন সে তাহা অপেক্ষা ক্রমাগতই অধিক চাহিতেছে। এই যে অপরকে রিক্ত করিয়া বিত্ত অপহরণের প্রবল স্পৃহা ইহা জগতের শান্তি বিধানে অক্ষম। বিত্ত লাভে যদি জগতের শান্তিই না আসিল তবে এ বিত্তে প্রয়োজন কি।)

(তাই অপর মত হইল বিত্ত অপেক্ষা চিত্ত বড়।) চিত্তের মহত্ত্ব ও ক্রিয়া উপলব্ধি করিলে এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। জগতের যাহা কিছু কর্ম দেখা যায় তাহার প্রেরণা আসে চিত্ত হইতে। (বিত্তের অপ্রতিহত প্রভাব থাকিতে পারে তখনই যখনই চিত্ত উহাকে চালিত করে, চিত্ত উহাকে অর্জন করে।) যে জীবের চিত্ত বা মনের কোন ক্রিয়া নাই সে জীব কখনও বিত্ত অর্জন করিতে পারে না বা তাহার ব্যবহার জানে না। উন্নতচিত্ত ব্যক্তি বিত্তকে অর্জন করিয়া থাকে এবং তাহার যথাযথ ব্যবহারও সেই করিতে জানে। আবার ইচ্ছা করিলে এইরূপ ব্যক্তি বিত্তকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া আত্মোন্নতি-দ্বারা জগৎকে বশীভূত করিতে পারে।

গৌতমবুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া যীশুখ্রীষ্ট শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পর্যন্ত মহামানবেরা বিত্তকে বর্জন করিয়া চিত্তবলে জগতকে শান্তি ও কল্যাণের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অপব্যবহারের ফলেই বিত্তবল পশুবলের সমান হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে চিত্তবল জগতে পশুবলের সহিত সংগ্রাম করিয়া বার বার তাহাকে পরাজিত করিয়াছে।

বিত্তবল বা পশুবলই যদি বড় হইত তবে ভারতে চিত্তবলের কাছে বিদেশী রাষ্ট্রশক্তির শোচনীয় পরাজয় ঘটিত না। মহাত্মা গান্ধী চিত্তবলকে পশুবলের বা বিত্তবলের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়া জগতের ইতিহাসে আধুনিক যুগে চিত্তবলের প্রাধান্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

আর ভারতের স্বাধীনতা যজ্ঞে যে সকল বিপ্লবী সাধক আত্মাহুতি দিয়াছেন, তাঁহাদের হাতের হাতিয়ারের সহিত অপূর্ব চিত্তবল তাঁহাদিগকে জয়ী করিয়াছে। সুতরাং "বিত্ত হতে চিত্ত বড়"।

যে সহে সে রহে

এ সংসারে যে ব্যক্তির সহ্য করিবার শক্তি আছে, সেই বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারী। মানুষ সৃষ্ট হওয়ার পর হইতেই তাহাকে জলবায়ু, ঝড়ঝঞ্ঝা, শীত-গ্রীষ্মের সহিত অনবরত যুদ্ধ করিয়া বাঁচিতে হইয়াছে—কষ্ট করিয়া ক্ষুধার অন্ন যোগাড় করিতে হইয়াছে, অন্য হিংস্র প্রাণী হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছে। এই দীর্ঘকালের জীবনসংগ্রামে মনুষ্য জাতির কত বিভিন্ন শাখা পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। আজ যে সুসভ্য মনুষ্য সম্প্রদায় বাঁচিয়া আছে ইহা একমাত্র সহনশীলতার ফলেই সম্ভব হইয়াছে।

সংসার সুখের স্থানও বটে, দুঃখের স্থানও বটে। দুঃখকে জয় না করিতে পারিলে সুখের মুখ কেহ দেখিতে পায় না। আঘাত-সংঘাতের মধ্যে কেবল অধ্যবসায়দ্বারাই লোক সুখশান্তি অর্জন করিতে পারে।

দুঃখ দারিদ্র্য, অভাব-অভিযোগের নিকট যে ব্যক্তি মাথা নোয়ায়, তাহার কাছেই ইহারা অভিশাপ। সহনশীল লোক ইহাদের সহিত অনবরত যুদ্ধ করিয়া ক্ষণিক পরাজয়ের মধ্যেও শক্তি সঞ্চার করিয়া ক্রমশঃ জয়ের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। সে কখনও ইহাদের সহিত কোন আপোষ-মীমাংসা করে না। কাপুরুষেরাই দৈবের উপর নির্ভর করে। শক্তিমান সকল সময়েই সহনশীল—ঝড় উঠিলে বড় গাছও মাটিতে পড়িয়া যায়, কিন্তু পাহাড়ের কোন ক্ষতি হয় না। সুদৃঢ় পাহাড় মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে - কিন্তু বড় গাছ চারিদিকে ডালপালা ছড়াইয়াও ঝড়ের মধ্যে নিজেকে বাঁচাইতে পারে না।

জগতে দুর্বলের কোন স্থান নাই। দুর্বল নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে—অন্য প্রবল শক্তি আসিয়া তাহাকে ধ্বংস করে। সুখশান্তি প্রবলের জন্য, দুর্বল বাঁচিয়া থাকিলেও মৃতের মত বাস করে। তাহার কাজ শুধু দুঃখের বোঝা বহন করা।

পৃথিবীতে যে সব জাতি বড হইয়াছে তাহারা দুঃখের আঘাতের মধ্যেই কখনও উঠিয়াছে কখনও বা পডিয়াছে। কিন্তু শেষ জয় এই সংগ্রামকারীদের হাতেই উপস্থিত হইয়াছে।

জগতের জয় দুই প্রকার। পার্থিব সম্পদ লাভ যেমন জয়, আধ্যাত্মিক সম্পদ লাভও তেমনই জয়। পার্থিব সম্পদ লাভে, দেশের শিল্প-বাণিজ্য, কলা, ভাস্কর্য, আহার-বাসস্থান এবং সর্বপ্রকার প্রাচুর্যের উদ্ভব হওয়ায় যেমন কোন জাতির অভ্যুদয় সূচিত হয়, তেমনি আধ্যাত্মিক সম্পদও জগতের সুখশান্তি প্রতিষ্ঠার সহায়ক। এই দুই প্রকার উন্নতিই মানুষের চাই। জগতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে এই দুইয়ের সামঞ্জস্যবিধান করা আবশ্যক। ইহা করিতে গেলেই সহনশীলতা দরকার।

পার্থিব সম্পদলাভে যেমন মানুষের অবিরাম চেষ্টার প্রয়োজন—তেমনি আধ্যাত্মিক সম্পদও চেষ্টা করিয়া অর্জন করিতে হয়। মোটকথা, দুই দিকেই সংগ্রামে সহনশীলতার দরকার। লোকের মানসিক সম্পদ না বাডিলে, পার্থিব সম্পদকে কোন জাতি শেষ পর্যন্ত রক্ষা করিতে পারে না—আর পার্থিব সম্পদের দিকে দৃষ্টি না দিয়া কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতি দ্বারাও জগতে বাস করা চলে না।

বহু শতাব্দীর চেষ্টা ও সহনশীলতার ফলে যখন কোন জাতি বড হয়, তখন অনেক সময়ই এই জাতি অপরের উপর সর্বপ্রকার অত্যাচার চালায়।

ফলে নিপীডিত জাতির মধ্যে আঘাতের ফলে শক্তি ও সংঘবদ্ধতার ভাব উপস্থিত হয়, তখন প্রবলকে পূর্বের দুর্বলের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। তাই সম্পদলাভের সঙ্গে সঙ্গে চাই আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ। জাতি বড হইবার পর যখন ধীরে তাহার পতন ঘটে তখন বুঝিতে হইবে যে তাহার মধ্যে ক্রমশঃ সহনশীলতার অভাব ঘটিতেছে। পক্ষান্তরে কোন জাতির উত্থান হইলে বুঝিতে হইবে তাহার মধ্যে সহনশীলতাগুণ প্রবল হইয়াছে। আধ্যাত্মিক উন্নতিই এই দুইয়ের সামঞ্জস্যবিধান করিবে—আধ্যাত্মিক উন্নতিই এই সহনশীলতাকে শিক্ষা দিবে।

"এ জগতে হায় সেই বেশি চায় আছে যার ভুরি ভুরি।"

অথবা

"স্বার্থ যত পূর্ণ হয়, লোভ ক্ষুধানল তত বেড়ে উঠে।"

চাওয়া আর পাওয়া লইয়া জগৎ। মানুষের আদিম প্রকৃতির মধ্যে চাহিবার ইচ্ছা রহিয়াছে। চাহিবার ইচ্ছার মূলে রহিয়াছে অভাব বোধ। যেখানে অভাব বোধ নাই—সেখানে কোন চাহিবার ইচ্ছাও নাই। সুতরাং পাওয়ার প্রশ্ন সেখানে অবান্তর।

মানুষের শীতবোধ হওয়ায় তাহার গা ঢাকিবার বস্ত্র প্রয়োজন হইল। গা ঢাকিবার বস্ত্র পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই অভাবের পরিসমাপ্তি হইল না। যেটুকু অভাব

পূর্ণ হইল, তাহা অল্পকালের জন্য। সে গা ঢাকিবার জন্য প্রথমে যে জিনিস পাইল ক্রমশঃ তাহা হইতে উন্নততর জিনিস পাইবার জন্য লালায়িত হইল। এইরূপে বাড়ি-ঘর, কল-কারখানা, রাস্তা-ঘাট, রাজ্য-সাম্রাজ্য মানুষ ক্রমে ক্রমে গড়িয়া তুলিল। এই ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই মানুষের উন্নতি নিহিত। আজও এ আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় নাই।

সমগ্র মানবসমাজের উন্নতির জন্য যে আকাঙ্ক্ষা তাহা কখনও দোষের হইতে পারে না। যাহা অপরের ধ্বংসের কারণ তাহা কখনও কাম্য নহে। স্বার্থপর মানুষ আপনার বিদ্যা, বুদ্ধি, বা পুরুষপরম্পরাগত সুখসুবিধাগুলির সাহায্যে অবিরাম সুখসুবিধা জগতের নিকট হইতে আদায় করিয়া লয়। এই সব লোকের আকাঙ্ক্ষার কোন বিরাম হয় না। যাহার একশত টাকা আছে সে চায় তাহার হাজার টাকা হউক। হাজার টাকার মালিক লক্ষ টাকা পাইতে চাহে, লক্ষপতির কামনা কোটিপতি হওয়া। কোটিপতি রাজ্য চায়। এক দেশের রাজ্য পাইলে লোকের সর্বজগতের উপর প্রভুত্ব করিবার আকাঙ্ক্ষা জন্মে। তাই কামনার উপভোগদ্বারা রাজ্য, ধন, প্রভুত্ব, ভোগের বাসনা কোন সময়েই শান্ত হইবার নহে।

যাহা ব্যক্তির পক্ষে সত্য তাহা জাতির পক্ষেও সত্য। কোন জাতি জগতে অপরের উপর অধিকার বিস্তার করিবার সুবিধা পাইলে, ক্রমশঃ সে সর্বজগৎকে নিজের কুক্ষিগত করিতে চাহে। পৃথিবীর ইতিহাসে এইসব পররাজ্যলোভীদের কামনা চরিতার্থ করিবার কাহিনীতে পরিপূর্ণ।

ব্যক্তি বা জাতি যে ঐশ্বর্য আহরণ করে, তাহা অপরকে তাহার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াই করে। দরিদ্রের মুখের গ্রাস কাড়িয়া না লইলে জগতে কখনও ধনীর সৃষ্টি হইত না। পররাজ্য না কাড়িয়া লইলে কোনদিন সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিতে পারিত না। ধনী তাহার প্রয়োজন মিটাইবার পরও রাশিরাশি ধন সঞ্চয় করে।—এই যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহরণ বা সঞ্চয় ইহা তাহার একরূপ নেশার মতো। এখানে পরের নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে পারিলেই যেন আনন্দ। প্রয়োজন থাকুক আর নাই থাকুক কাড়িয়া লইবার জন্যই যেন কাড়িয়া লওয়া।

বর্তমান জগতে ধনসম্পদে বলীয়ান্ জাতি ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির চাপ দিয়া অপর জাতির সর্বস্ব অনেক ক্ষেত্রে কাড়িয়া লইতেছে বা লইবার চেষ্টা করিতেছে। ইহা রাজ্য দখল করার চেয়েও বেশি মারাত্মক। কোন দেশের সম্পদ বিদেশী গ্রাস করিলে সে দেশের স্বাধীনতা থাকিলেও সে স্বাধীনতার কোন মূল্য থাকে না। এখানেও সেই একই মনোবৃত্তি কাজ করিতেছে 'আমার যাহা আছে—তাহা অপেক্ষা আরো বেশি চাই।' ধনে প্রয়োজন থাকুক আর নাই থাকুক, অপর দেশের উপর প্রভুত্ব করিবার স্পৃহাও কেহ ত্যাগ করিতে পারে না।

"জন্ম হউক যথা তথা কর্ম হউক ভাল"

এ সংসারে জন্ম বড না কর্ম বড? এ দুইয়ের তুলনা করিলে কর্মের উপরই মনীষীরা গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন। জন্ম দৈবাধীন। কেহ উচ্চ কুলে জন্মগ্রহণ করে, কেহ বা অনুন্নত বা নীচ কুলে জন্মিয়া থাকে। কোন্ ব্যক্তি কাহার কুলে কেন জন্মগ্রহণ করিয়াছে—তাহা অসাধারণ লোকের জানা থাকিলেও থাকিতে পারে—কিন্তু সাধারণ লোকে উহা জানে না এবং জন্মের উপর কাহারও হাত নাই।

সৎকর্ম না করিলে কোন ব্যক্তি উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও সে নিজেকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। পৃথিবী কর্মভূমি। এখানে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে প্রত্যেক মানুষকেই কোন না কোন কার্য সম্পাদন করিতে হইবে। আর মানুষের স্বভাবের ভিতর কর্ম করিবার প্রবৃত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং কাজ না করিয়া যে লোক চুপ করিয়া বসিয়া থাকে তাহার জীবন অস্বাভাবিক। এই অস্বাভাবিকতা তখনই গুরুতরভাবে আত্মপ্রকাশ করে যখন উচ্চ কুলে জাত কোন ব্যক্তি—কেবল নিজের বংশের দোহাই দিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া জীবন যাপন করে বা অসৎকার্যে রত হইয়া নিজের কুলকে কলঙ্কিত করে।

উচ্চ কুলে যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে তাহার উন্নত হইবার সুযোগ-সুবিধা অনুন্নত কুলে জাত ব্যক্তির লব্ধ সুযোগ-সুবিধা হইতে অনেক বেশি। এই অনুকূল পরিস্থিতির মধ্যে যে ব্যক্তি কুসংসর্গে মিশিয়া বা আলস্যের আশ্রয় লইয়া নিজেকে অধঃপতিত করে তাহার মত হতভাগ্য লোক আর নাই।

যে ব্যক্তি অপরের নিকট সুযোগ-সুবিধা না লইয়া সৎকর্ম দ্বারা নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইয়াছে তাহার সহিত অপরের তুলনা হয় না। লোকের সম্মুখে বিস্তীর্ণ বিরাট জগৎ পড়িয়া আছে—ইহাই মানুষের কর্মক্ষেত্র। এখানে কেহ কাহারও উন্নতির পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে না। যে ব্যক্তি সৎকর্মদ্বারা নিজেকে উন্নত করিতে চাহে তাহার সকল দরজাই খোলা। এখানে শুধু চাই একাগ্রতা ও অধ্যবসায়। গৌতম বুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য—ইহারা উচ্চ কুলে জন্মিয়াছিলেন এবং জগতের কল্যাণের জন্য আত্মদান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কর্মে তাঁহাদের কুল এবং পৃথিবী উভয়ই ধন্য হইয়াছে।

সন্ত কবীর, রবিদাস, বিদুর প্রভৃতি মহাত্মগণ উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ না করিয়াও তাঁহাদের কর্মের আদর্শদ্বারা জগতকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং জন্মই কেবল বড় নহে, তাহার সহিত উচ্চকর্ম থাকা চাই। যদি দৈববশতঃ কাহারও উচ্চকুলে জন্ম লাভ নাও হয়—সে ব্যক্তি চেষ্টা করিলে সৎকর্মদ্বারা জগতে আদর্শ স্থানীয় হইতে পারে।

"অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী"

বিদ্যা শব্দের অর্থ জ্ঞান। জ্ঞানই শক্তি। কিন্তু অল্প জ্ঞানে বিপদ আসে। তাই অল্প জ্ঞান ভয়ের কারণ। মানুষ যতদিন বাঁচিয়া থাকে ততদিনই তাহাকে

জ্ঞান আহরণ করিতে হয়। জগতে চলিবার পক্ষে জ্ঞানের মতো বড় সহায় আর কিছুই নাই। কিন্তু যাহা জানিতে হইবে তাহা পূর্ণভাবে জানিতে হইবে। আংশিক জ্ঞান অজ্ঞানতারই নামান্তর। অজ্ঞানতার ফলে নানা প্রকারের দুঃখ ও বিপদ উৎপন্ন হয়।

জ্ঞান অনন্ত—তাই মানুষের শিখিবার ও জানিবার বিষয়ও বহু। এক জীবনে অনন্ত বিশ্বের অনেক কিছুই অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে জ্ঞানের সীমা নাই—তাই তাহার মনে কখনও অহঙ্কার আসে না। জ্ঞানের বিশালতা উপলব্ধি করিয়া জ্ঞানী মৌন অবলম্বন করেন। কিন্তু অল্প কিছু শিখিবার পর অজ্ঞান ব্যক্তির অহঙ্কারের পরিসীমা থাকে না। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি যাহা করিতে বা যাহা বলিতে ভয় পান—জ্ঞানহীন বা স্বল্পজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তি সেইরূপ গুরুতর বিষয়ের উপর নিজের মতামত প্রকাশ করে বা কঠিন কায করিতে অগ্রসর হয়।

অজ্ঞান ব্যক্তি পরের উপকার করিতে গিয়া—উপকার করা দূরে থাকুক অনেক সময় অপকারই বেশি করিয়া থাকে। পূর্ণজ্ঞানে সত্যের দ্বার খুলিয়া যায়, অল্পজ্ঞানে লোক যেখানে ছিল সেইখানেই থাকে।

অল্পজ্ঞান অপেক্ষা অজ্ঞানতা এক দিক দিয়া ভাল, কারণ স্বল্পজ্ঞান ব্যক্তির যে অনুচিত সাহস উপস্থিত হয় অজ্ঞানের সে সাহস সাধারণতঃ উপস্থিত হয় না। সুতরাং স্বল্পজ্ঞান ব্যক্তি অপরের যতটা ক্ষতি করিতে পারে, অজ্ঞান ব্যক্তি ততটা করিতে পারে না। স্বল্পজ্ঞান ব্যক্তির অপরকে প্রতারিত করিবার সুযোগ বেশি, অজ্ঞানের সে সুযোগ মিলে না। স্বল্পজ্ঞান ব্যক্তি অজ্ঞকে সহজে ঠকাইতে পারে, কারণ অজ্ঞ তাহার চাতুরী সহজে ধরিতে পারে না। আর যে লোক নিজে অজ্ঞ, অপরকে ঠকাইবার মত বুদ্ধি তাহার থাকে না।

তবে একটা কথা আছে—স্বল্পজ্ঞানে মানুষের কুপ্রবৃত্তি যাহাতে জাগ্রত না হইতে পারে তাহার দিকে সতর্কতা অবলম্বন না করিলে অপকার নাও হইতে পারে। জ্ঞান যখন অসীম তখন কোন বিষয়ে পূর্ণজ্ঞান লাভ করা মানুষের পক্ষে এক জীবনে সম্ভবপর নহে।

সংসারে চলিতে গেলে যে সকল জ্ঞান আবশ্যক স্বল্প হইলেও সাধ্যানুসারে উহাদিগকে আয়ত্ত করিতে হইবে—এবং জ্ঞান-আহরণকারীকে সতর্ক থাকিতে হইবে যে ইহাই শেষ নহে—আরো জানিবার বিষয় আছে। মানুষকে জ্ঞানানুসারে কার্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে—সে যেন তাহার শক্তির সীমা লঙ্ঘন না করে।

অনেক সময় দেখা যায় লোকে বহু বিষয় জানিয়াও উহাদের ব্যবহারে নিতান্ত অনভিজ্ঞ থাকিয়া যায়। এরূপ জ্ঞানের কোন মূল্য নাই। জ্ঞানের সঙ্গে কার্যের সামঞ্জস্য থাকা দরকার। অল্প শিক্ষিত চিকিৎসক রোগীর প্রাণ নাশ করে, অল্প-বিদ্যাযুক্ত শিক্ষক ছাত্রের চিরজীবনের জন্য অকল্যাণ করিয়া থাকেন। স্বল্পবিদ্য আইনজীবী লোকের সম্পত্তি নাশ করে, স্বল্পজ্ঞানী ভৃত্য প্রভুর সর্বনাশ করে—এ সকলের দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

লোকে যতটা জানে তদনুসারে নিজের জ্ঞানকে কাজে লাগাইলে কাহারও কোন ক্ষতি হয় না। নিজের কোন বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলে অভিজ্ঞ-ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণদ্বারা সুফল লাভ করা যাইতে পারে।

"পায়ের তলার ধূলা—সেও যদি কেউ পদাঘাত করে, নিমেষে তাহার প্রতিশোধ লয় চড়ি' তার শিরোপরে॥"

পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর লোক আছে যাহাদের কাছে মান বা অপমানের কোন মূল্য নাই। যাঁহারা লোকোত্তর পুরুষ তাঁহাদের কাছে অপরের দেওয়া মান বা অপর ব্যক্তিদ্বারা কৃত অপমানের কোন স্থান নাই। এই সকল লোকেরা এত উচ্চে উঠিয়াছেন যে মানুষের দেওয়া সম্মান বা অপমানে তাঁহারা কখনও বিচলিত হন না। মানুষ অপরকে বিচার করে তাহাদের নিজের বিচারের মাপকাঠি দিয়া। সাধারণ মানুষ কোন সময় কাহাকেও বড় করিয়া তোলে আবার পর মুহূর্তে সেই ব্যক্তিকেই নীচে নামায়। সাধারণ মানুষকে যে ব্যক্তি খুসী করিবে, তাহাদের মত অনুসারে যে চলিবে, সত্য হউক মিথ্যা হউক, ন্যায় হউক আর অন্যায় হউক—সাধারণের সব কিছু বিনা প্রতিবাদে মানিয়া লইবে তাহাকেই লোকে বড় বলিয়া মানে—তাহাকেই সম্মান দিয়া থাকে। পক্ষান্তরে সত্যের জন্য সর্বসাধারণের বিরুদ্ধতা করিলে এমন কি সাধু ব্যক্তিও অপমানিত হইয়া থাকেন। কিন্তু এই সব লোকোত্তর পুরুষ নির্বোধ সাধারণ লোককে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখেন। তাঁহারা কাহারও উপর অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করা উচিত মনে করেন না।

আর এক শ্রেণীর লোক আছে যাহাদের বুদ্ধি এত স্থূল যে ইহাদের অপরের দ্বারা কৃত অপমান বা অসম্মান বোধের ক্ষমতাই নাই। আর যাহাদের বুঝিবার শক্তি আছে তাহারা অপমানকারীর উপর কোন প্রতিশোধ লয় না। ইহারা নিতান্ত দুর্বল এবং কাপুরুষ। ইহারা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যাহার তাহার কাছে নতশির হয়।

তৃতীয় প্রকারের লোক হইতেছে যাহারা নিজের মান বা অপমানে অত্যন্ত সজাগ। বুঝিতে হইবে এই সকল লোক সাধারণ বা স্বাভাবিক লোক—কারণ মান-অপমান বোধ যাহার নাই সে নিতান্ত কাপুরুষ। মানী ব্যক্তি নিজের মান রক্ষায় যেমন ব্যস্ত, তেমনি সে অপরকে বিনা কারণে অপদস্থ করিতে চাহে না। তাহার কথা হইতেছে সে অপরের নিকট তাহার প্রাপ্য সম্মান পাইবার দাবি রাখে—অপরে তাহাকে অপমানিত করিলে তখনই সে তাহার উপযুক্ত উত্তর দিবে। অপমানকারীকে কোন অবস্থায় সে ক্ষমা করিবে না।

পৃথিবীর সকল লোকই সাধু বা মহাত্মা নহে। দুষ্টকে দমন না করিলে তাহার সাহস বাড়িয়া যাইবে। জগতে চলিতে হইলে নিজে চিরকাল মাথা উঁচু করিয়া চলিতে হইবে। আত্মরক্ষার অধিকার সকলেরই আছে। মানী ব্যক্তিকে যে লোক বিনা কারণে অপদস্থ করে তাহাকে মানী সত্ত্ব শাস্তি দিবেন। অন্যায়

অযৌক্তিক ব্যবহার যাহা সম্মানের হানিকর তাহার প্রতিকার না করিলে সমাজের দৃষ্টিতে মানী ব্যক্তি নিরর্থক হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন। এই হীনতা কাপুরুষ ছাড়া আর কাহারও গ্রহণীয় হইতে পারে না। সম্মানিত ব্যক্তির অখ্যাতি মৃত্যু অপেক্ষাও কষ্টকর। তাই অপমানকারীকে সমুচিত শাস্তি না দেওয়া পর্যন্ত মানী ব্যক্তি স্থির থাকিতে পারেন না। পায়ের নীচের ধূলায় পদাঘাত করিলে ধূলাও লোকের মাথার উপর চড়িয়া অপমানের প্রতিশোধ লয়। যে মানুষ অপমানের প্রতিকার করিতে জানে না সে ধূলির চেয়েও অধম।

জীবনের মূল্য আয়ুতে নহে কল্যাণপূত কর্মে

মানুষ পৃথিবীতে আসে। অন্য প্রাণীও আসে। অন্য প্রাণীর বাঁচিবার চেষ্টার যেমন বিরাম নাই—মানুষেরও তেমনই ইহার বিরাম নাই। এই বিরামহীন চেষ্টার নাম জীবন।—এখানেও অন্য প্রাণীর মতই মানুষ আত্মরক্ষা আর আত্মবিস্তার করে। ইহার উপর রহিয়াছে মানুষের আত্মকল্যাণ সাধন আর বিশ্বকল্যাণের অনুষ্ঠান। এতদ্দ্বারা তাহার জীবনের মূল্য বিচার করা হইয়া থাকে।

আগেকার দিনে মানুষের আয়ু ধরা হইত শত বৎসর (শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ)। এ যুগে শতবৎসর আয়ু সকল লোকে পায় না—শত বৎসর পর্যন্ত সকলে কর্মক্ষমও থাকে না। মানুষকে কাজ করিতে হইবে। অনন্তকালের তুলনায় শতবর্ষ কিছুই নহে। লোক সাধারণতঃ জীবনের ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর ধরিয়া কাজ করিতে পারে। এ কার্য কল্যাণপূত কার্য হওয়া চাই। আহার, নিদ্রা, পরনিন্দা, পরচর্চা করিয়া আলস্যে সময় কাটাইয়া আয়ু বৃদ্ধির কল্পনায় কোন লাভ নাই। যাহার কোন সৎকর্ম করিবার নাই তাহার বাঁচিয়া থাকিবারও কোন অধিকার নাই।

যে ব্যক্তি অন্যায় কার্যে লিপ্ত থাকে তাহার জীবন দীর্ঘ হইলে অনিষ্টের অবধি থাকে না। তাহার অত্যাচারের হাত হইতে সমাজ সব সময়ে মুক্তিলাভের কামনা করিয়া থাকে। প্রাচীনকালের জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বলেন, "গ্রীষ্মকালে দিন দীর্ঘ হয়, আর দারুণ শীতের রাত্রি হয় দীর্ঘ"—এইরূপ অপরকে যাহারা কষ্ট দেয় তাহারা দীর্ঘজীবী হয়। পক্ষান্তরে জগতের বিবিধ কল্যাণ সাধন যাঁহারা করেন, প্রায়ই তাঁহারা দীর্ঘদিন জীবিত থাকেন না। যাঁহাকে পৃথিবীর লোক ভালবাসে তাঁহাকে তাড়াতাড়ি পৃথিবী ছাড়িতে হয়—

> "জীবন-সিন্ধু মথিয়া যে-কেহ আনিবে অমৃত-বারি
> অমৃত-অধিপ দেবতার রোষ পড়িবে কি শিরে তারি?"
>
> —(চিত্তনামা—নজরুল ইস্‌লাম)

দীর্ঘ জীবনই যদি মানুষের জীবনের মূল্য নির্ধারণ করিত তাহা হইলে আচার্য শঙ্কর হইতে আরম্ভ করিয়া গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু—স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত লোকোত্তর পুরুষগণ জগতের চক্ষে মহনীয় বলিয়া প্রতিভাত হইতেন না।

যাঁহারা জগৎকে, জাতিকে, দেশকে অগ্রসর হইবার পথ প্রদর্শন করিয়া যান আর দিয়া যান অনাগত যুগের পাথেয় তাঁহাদের স্বল্পকালস্থায়ী জীবনই সর্বাপেক্ষা

মূল্যবান্। তাঁহারা অল্পকাল মধ্যে জগৎ ছাড়িয়া চলিয়া যান সত্য কিন্তু তাঁহাদের ভাবধারা জগতে জাবিত থাকিয়া তাঁহাদিগকে অমর করিয়া রাখে। সাধারণ লোকের হিসাবে আয়ুবৃদ্ধিতে জীবনের মূল্য ধরা হয়, কেননা সকলেই বাঁচিয়া থাকিতে চাহে।—মানুষের কাছে জীবন সর্বাপেক্ষা প্রিয়।

স্ত্রী, পুত্র, পরিবার-পরিজন লইয়া সাধারণ মানুষ ছোট গণ্ডী গড়ে এবং এই গণ্ডীর বাহিরের জগৎকে স্বীকার করে না। এরূপ লোকেরা যত বেশি বাঁচিবে—জগতে স্বার্থপরতার মাত্রা ততই বাড়িতে থাকে। 'যিনি বাঁচিলে অনেক লোক বাঁচে তাঁহার বাঁচাই সার্থক' তাহা ক্ষণকালের জন্যই হউক, আর দীর্ঘকালের জন্যই হউক। জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত মূল্যবান। এই মুহূর্তগুলিকে যে ব্যক্তি কাজে লাগায় সে মরিয়াও বাঁচিয়া থাকে। যে পরের জন্য স্বার্থত্যাগ করে তাহার বাঁচিয়া থাকাই প্রকৃত বাঁচা আর অন্য সকলে বাঁচিয়া থাকিয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাস চালনা করে মাত্র।

জীবনে যে ব্যক্তি যে অবস্থায় আছে—সকল অবস্থায় সকল ক্ষেত্রেই জগৎকে তাহার কিছু না কিছু দিবার আছে। নিজের জীবনকে কল্যাণপূর্ণ করিয়া সকলেই সার্থক করিতে পারে। সামান্য গৃহস্থ হইতে মহাপুরুষ পর্যন্ত সকলেরই কল্যাণ কার্য করিবার অধিকার আছে। শরীর, মন, বাক্যদ্বারা কল্যাণকর কাজ করা যাইতে পারে। অসমর্থকে শরীর দ্বারা সেবা, দেশরক্ষা, মনের উচ্চ চিন্তার ফলদ্বারা জগৎকে সমৃদ্ধ করা, মিষ্টবাক্য দ্বারা অপরকে শান্তিপ্রদান করা—নিজে মুক্ত হইয়া অপরের মুক্তির জন্য লোকে চেষ্টা করিতে পারে। নিরন্নকে আহারদান, বিদ্যার্থীকে বিদ্যাদান, প্রতিবেশীকে সহায়তা, জাতিকে সেবাদান—এইরূপ অনেক কল্যাণপূত কর্মদ্বারা মনুষ্য জীবনকে সার্থক করা যায়।

স্বল্প আয়ুর জন্য জীবনের কাজ অসমাপ্ত থাকিয়া যাইতে পারে। ভাল কাজ অল্প হইলেও ভাল হয়—কারণ কোন সৎকার্যের বিনাশ নাই। কাজকে যে ব্যক্তি পূজা বলিয়া গ্রহণ করে সে স্বল্লায়ু হইলেও পৃথিবী হইতে হাসিতে হাসিতে চলিয়া যাইতে পারে। সৎকার্য মানুষকে বৃহতের সহিত যুক্ত করিয়া দেয়—সেই বৃহৎ বা ভূমাই সুখ। মহাকাল দিন দিন আয়ুকে ক্ষয় করে—কিন্তু কালের সদ্ব্যবহার করিলে স্বল্পকালের সৎকার্য অনন্তকাল স্থায়ী হইতে পারে।

"জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে সে জাতির নাম মানুষজাতি"

যুগে যুগে মানুষের সহিত মানুষের মিলন, সহযোগিতা, সমবেদনা, প্রেমের ভাব চলিয়া আসিতেছে—একথা যেমন সত্য তেমন জাতিতে জাতিতে অনবরত হিংসা, বিদ্বেষ, যুদ্ধ লাগিয়াই আছে—এ কথাও সত্য।

প্রত্যেক মানুষই বাঁচিতে চাহে। পূর্বেও লোকে বাঁচিতে চাহিত, এখনও চাহিতেছে। আদিম যুগের মানুষ নিজে বাঁচিবার জন্য প্রথমে তাহার স্বজাতীয় মানুষের খাদ্য কাড়িয়া খাইয়াছে, তাহাকে স্বস্থান হইতে দূর করিয়া তাহার সম্পত্তি অধিকার করিয়া নিজে বাঁচিয়াছে—তাহার প্রতিবেশী মরিয়াছে। পরে মানুষ

নিজে বাঁচিবার জন্য ক্রমে ক্রমে দল, সমাজ ও জাতি গঠন করিল। এইভাবে সমগ্র মনুষ্যসমাজ গঠিত হইয়াছে। এখন যেমন এক দলের মনুষ্যের সহিত অপর দলের ঝগড়া লাগে তেমনই এক জাতির সহিত অপর জাতিরও ঝগড়া বাধে।

মানুষ দল গঠন, জাতি গঠন—যাহা কিছুই করুক না কেন, শান্তি ও কল্যাণের জন্যই তাহা করিয়াছে। কিন্তু জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ বাধায় জগতের শান্তি বহুবার বিপন্ন হইয়াছে। এই অশান্তির কারণ এক জাতি অপর জাতি হইতে, আপনাকে পৃথক ভাবিয়াছে। জগতে শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ বহু প্রকার মনুষ্য আছে। শ্বেত অশ্বেতকে ঘৃণা করিতেছে। অশ্বেত শ্বেত জাতিকে ক্ষমার চক্ষে দেখিতে পারে না।

শক্তিমান জাতি দুর্বলকে পদদলিত করিতেছে। আবার দুর্বল সবল হইয়া পূর্বের অত্যাচারী জাতির উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেছে। কিন্তু এই ঘৃণা ও অত্যাচার কখনই সমর্থনযোগ্য নহে। প্রকৃতপক্ষে মানুষে মানুষে কোন ভেদ নাই।

সৃষ্টির প্রথমে মানুষ যখন জন্মিয়াছিল তখন সে সকল দেশেই মানুষ হইয়াই জন্মিয়াছিল। কোন জাতি শ্বেত, পীত, বা কৃষ্ণ যে হইয়াছিল তাহা নিজের ইচ্ছায় হয় নাই। সৃষ্টির উপর মানুষের কোন হাত নাই।

সুখ-দুঃখ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা সকল মানুষেরই সমান। জল, বাতাস, আলো সকল মানুষের কাছেই সমানভাবে প্রয়োজনীয়। এই বিরাট পৃথিবীর অধিবাসী সকল মানুষ। ভাষা ভিন্ন হইলেও সকল মানুষই কথা বলে এবং কথা বলিয়া ভাবের আদান-প্রদান করিয়া থাকে। ভাষা এক না হইলেও মানুষ মনুষ্যভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। সুসভ্য মানুষ নিজের কল্যাণ ও সকলের কল্যাণ চাহিবে—ইহাই তাহার ধর্ম। অপরের কল্যাণ না হইলে কোন জাতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হইতে পারে না। একজনকে পশ্চাতে ফেলিলে সেও অপরকে পশ্চাৎ হইতে টানিতে থাকিবে। কাহাকেও পিছনে ফেলিয়া নিজে অগ্রসর হওয়া যায় না। যাহারা মনে করে আমরা অগ্রসর হইয়াছি তাহারা ভ্রান্ত, কেননা জগৎ জুড়িয়া এক জাতিই শুধু আছে তাহার নাম মানুষ জাতি। বিভিন্ন দেশের সাদা, কালা, পীত মানুষ সেই বিরাট মনুষ্য জাতির বিভিন্ন অঙ্গ। পৃথিবী নানাপ্রকার গাছপালা, পাহাড়পর্বত, সাগর, মরুভূমি, বনভূমি লইয়া যেমন বর্ণময়ী, তেমনই তাহার উপরকার মানুষও নানা বর্ণের সম্মেলনদ্বারা পৃথিবীকে করিয়াছে বর্ণময়ী। কে কাহাকে বাদ দিবে? বাদ দিলে পৃথিবী হইবে খণ্ডিত। মানুষকে মানুষ বলিয়া না ভাবার জন্যই পৃথিবী হইয়াছে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত। মানুষ হিসাবে সমগ্র পৃথিবীই মানুষের বাসস্থান—সমগ্র মানুষই এক জাতি। যাহা কিছু ভেদ তাহা তাহাদের রঙের জন্য।

সমগ্র পৃথিবী যখন এক, মানুষের ভাষা যখন মনুষ্য ভাষা, মানুষের কল্যাণ যখন সকল মানুষের কল্যাণ, সুখ-দুঃখ যখন সকলের সমান, মান-অপমানবোধ

যখন এক, তখন জগৎ জুড়িয়া এক অখণ্ড মনুষ্য জাতি ছাড়া আর কোন জাতি থাকিতে পারে না।

আধুনিক যুগে যন্ত্রই শক্তি

যন্ত্র শব্দের অর্থ অস্ত্র, হাতিয়ার, সাজসরঞ্জাম যাহার সাহায্যে মানুষ জাগতিক কার্য সাধন করে। যন্ত্র মানুষের কার্যের সহায়ক। যন্ত্রের মধ্যে তাহার নিজের কোন শক্তি নাই—মানুষের শক্তিতে যন্ত্র শক্তিমান্। যন্ত্র মানুষের আবিষ্কার। সুতরাং মানুষ যন্ত্রী—মানুষ যন্ত্রকে চালায়। শক্তির উৎস মানুষ—যন্ত্র তাহার হাতের হাতিয়ার—মানুষের কার্যের সহায়ক বলিয়াই যন্ত্রকে শক্তি বলা হয়।

আদিম যুগের মানুষের বিশেষ কোন যন্ত্র ছিল না। ক্রমে ক্রমে বুদ্ধিবৃত্তি চালনা করিয়া সে যন্ত্র আবিষ্কার করিতে লাগল। কেবল হাত-পা, চোখ, নাক, কান দিয়া জমি চাষ চলে না, জিনিসপত্র কাটা যায় না, কাপড় তৈয়ারি চলে না, গৃহ নির্মাণও করা সম্ভব নহে, বাসনপত্রও গড়া যায় না। সুতরাং হাত-পা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে সাহায্য করার জন্য যন্ত্রের আবশ্যক। তাই ক্রমে ক্রমে চাষের লাঙল, কাপড় বোনার তাঁত, মাটি কাটিবার কোদাল, কুমারের চাক, ইত্যাদি তৈয়ারি হইতে লাগিল। মানুষের চেষ্টার বিরাম নাই—ক্রমশঃ উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করিতে করিতে সে বর্তমান যুগের যান্ত্রিক মানুষ হইয়াছে। লোকে আগে পায়ে হাঁটিয়া ঘুরিত এখন জলে, স্থলে, আকাশে, মাটির নীচে যন্ত্রের সাহায্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে দূর দূরান্তর স্থান অতিক্রম করিতেছে। ইহাতে হাত-পা-শরীর বিশ্রাম লাভ করিতেছে, সময় বাঁচিতেছে। বাড়তি সময়ে সে জগতের জন্য বেশি কাজ করিবার সুযোগ পাইতেছে, যে লোক দূরে ছিল সে নিকট হইতেছে—বিশ্বজগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হইতেছে—জাতিতে জাতিতে পরস্পর মিলনের পথ প্রশস্ত হইতেছে।

জগতের শিক্ষাবিস্তারে মুদ্রাযন্ত্র কত সাহায্য করিতেছে। আগেকার দিনে লোকে পুঁথি নকল করিয়া লেখাপড়া করিত, সকলে সকল প্রকার বিদ্যালাভ করিতে পারিত না। কোথায় কি জ্ঞানের পুস্তক আছে তাহা অনেক কষ্টে বহুকাল পরে জগতের অল্পসংখ্যক লোক জানিতে পারিত। আর এখন মুদ্রাযন্ত্রে অতি অল্প সময়ে সহস্র সহস্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া জগতের সর্বত্র প্রচারিত হইতেছে—সকলেই জ্ঞানভাণ্ডারের অংশীদার হইতেছে।

চিকিৎসা জগতে যন্ত্র অসম্ভবকে সম্ভব করিতেছে। চোখে কম দেখিলে চশমার সাহায্য লোক পাইতেছে—কানে কম শুনিলে—যন্ত্রের সাহায্যে শোনার কাজ চলিতেছে। মনুষ্যদেহের অভ্যন্তরে কোন যন্ত্র বিকল হইলে রঞ্জনরশ্মির সহায়তায় শরীরের অভ্যন্তরের চিত্র পাওয়া যাইতেছে। যন্ত্রদ্বারা হৃদযন্ত্র, ফুসফুস্ পরীক্ষা করা সম্ভবপর হইতেছে। যন্ত্রের সাহায্যে আধুনিক ঔষধপত্র প্রস্তুত হইতেছে। অক্সিজেন যন্ত্রের সাহায্যে শ্বাসকষ্টের রোগীকে বাঁচান হইতেছে।

যন্ত্রের সাহায্যে লোকে আনন্দ আহরণ করিতেছে। রেডিও যন্ত্রযোগে সারা জগতের সংগীত, নাটক, খেলাধূলার খবর ঘরে বসিয়া লোকে উপভোগ করিতেছে। সিনেমা শিক্ষা ও আনন্দ দুইই লোকের কাছে পরিবেশন করিতেছে।

টাইপরাইটিং যন্ত্র অল্প সময়ে সুন্দর লেখার কাজ করিয়া দিতেছে—আর সেলাইয়ের কল নিখুঁত সেলাইয়ের কাজ সমাধা করিতেছে। এমনকি বই বাঁধানোর কাজে যন্ত্রের সাহায্য লওয়া হইতেছে। ডাকঘরে অল্পসময়ের মধ্যে হাজার হাজার চিঠিতে সীল দেওয়া হইতেছে। বড় বড় অফিসের টাকার হিসাব যন্ত্রের সাহায্যে করা হইতেছে।

যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যায় না কেন সর্বত্রই যন্ত্রের শক্তি লক্ষ্য করা যায়।

যন্ত্র মানুষের শ্রম লাঘব করিতেছে। এই শ্রম লাঘবের ফলে মানুষ দিন দিন শ্রমবিমুখ হইয়া যাইবে—লোকের এইরূপ মনে করা অস্বাভাবিক নহে। যন্ত্র মানুষের শক্তি হইলেও যন্ত্রের চালনা ব্যাপারে মানুষকে শ্রম করিতে হইতেছে—সুতরাং মানুষ যান্ত্রিক যুগে চুপ করিয়া বসিয়া নাই। যন্ত্র থাকার জন্য দূরবর্তী স্থানের জন্য লোকে যানবাহন ব্যবহার করে বটে—নিকটে সকলেই হাঁটিয়া যায়। ইহাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হয়। যন্ত্র শক্তি হইলেও ইহা মানুষের হাতের শক্তি। সুতরাং মানুষ চিরকালই শক্তিমান্ থাকিবে।

"হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস"

মানুষ শক্তি সামর্থ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। নিশ্চেষ্ট কাপুরুষতা তাহার ধর্ম বা স্বভাব নহে। তাহার কর্মশক্তি লইয়া যে জয়যাত্রার পথে চলিয়াছে—এই শক্তি হেতু বিশ্বজগৎ তাহার করতলগত। অদৃষ্টের উপর নির্ভরশীলতা তাহার স্বভাব হওয়া উচিত নহে। যাহারা সর্বপ্রকার কর্মশক্তি হারাইয়াছে তাহাদের মনে দুর্বলতা আশ্রয় লইয়াছে।

কর্মী পুরুষ কখনও মানসিক দুর্বলতা বা নিরাশায় অভিভূত হয় না। কর্মী জানে তাহার কর্ম কখনও বিফল হয় না। কর্মে অ-সফল হইলেও কোন ক্ষতি নাই, কেননা বিফলতা শক্তি সঞ্চয়ের সহায়ক। সুতরাং কর্মীর নিকট অদৃষ্ট বলিয়া কিছু নাই। সৃষ্ট জগতে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। তাহার যে ক্ষমতা আছে—অন্য প্রাণীর তাহা নাই। পুনঃ পুনঃ অভ্যাসে মানুষের শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে—উহা হ্রাস পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। যেখানে কর্মদ্বারা শক্তি লোপ দূরে থাকুক শক্তি বৃদ্ধি সুনিশ্চিত, সেখানে দৈবের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকা শক্তিহীনতার লক্ষণ। অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে ফলপ্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা কাহারও নাই। যাহা হইতে কোন প্রকার ফলপ্রাপ্তি সম্পূর্ণ অনিশ্চিত তাহার দিকে চাহিয়া থাকা নির্বোধের লক্ষণ। অদৃষ্টবাদিগণ এই নির্বুদ্ধিতা দেখাইয়া থাকে। কর্মবাদিগণ লাভালাভ জয়াজয়কে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া কার্য করিতে থাকে। প্রতিমুহূর্তে অদৃষ্টের কথা ভাবিলে কাজ করিতে কাহারও

হাত-পা সরিবে না। এরূপ অবস্থায় মানুষ আর জড় পদার্থে কোন ভেদ থাকিবে না।

মানুষের যেখানে প্রভূত শক্তি রহিয়াছে—সে সেখানে অদৃষ্টকে মোটেই গ্রাহ্য করিবে না। কর্মই অদৃষ্টকে গঠন করিয়া থাকে—কর্ম না করিলে কোনরূপ অদৃষ্ট সৃষ্ট হয় না। যে ব্যক্তি কর্মা সে অদৃষ্টকে হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। কর্মীর নিকট কর্মই অদৃষ্ট, সৎকর্ম করিলে তাহা অবশ্যই একদিন না একদিন ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। শূন্য হইতে অদৃষ্টের উৎপত্তি হয় না। অদৃষ্ট কর্মী মানুষের হাতের মুঠার মধ্যেই রহিয়াছে। আর অলস লোকের নিকট যে অদৃষ্ট রহিয়াছে তাহা কল্পনার বস্তু ছাড়া আর কিছুই নহে। কর্মী তাই হাস্যমুখে অদৃষ্টকে পরিহাস করে। অলীক বস্তুকে ধরিয়া থাকা হাস্যকর সন্দেহ নাই।

"তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি"

কোন জাতির বা দেশের পতাকা সেই দেশ বা জাতির আশাআকাঙ্ক্ষা আদর্শ ও উদ্দেশ্যের প্রতীক। পতাকা বহনের তাৎপর্য হইতেছে সেই জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সঞ্জীবিত রাখিয়া তাহাদিগকে রূপ দেওয়া।

শক্তিমান্ পুরুষেরা দেশের পক্ষে জাতির পক্ষে এই পতাকে ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরেন। এই পতাকা বহন অতি কঠিন কার্য। সমগ্র জাতির সুখদুঃখ এই পতাকার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। কোন জাতির যেমন পতাকা আছে বিশ্বমানব জাতিরও তেমনি পতাকা আছে। বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বনিয়ন্তা পৃথিবীর মহামানবগণকে এই পতাকার বাহকরূপে জগতে পাঠাইয়াছেন। এই মহামানবগণের কর্মভূমি হইতেছে সমগ্র জগৎ। বিশ্বজগতের আদর্শ ইঁহারাই যুগে যুগে প্রদর্শন করেন।

এই কঠিন কার্য সাধারণ লোকে করিতে পারে না। জগতে যাঁহার মধ্যেই অসাধারণ শক্তির বিকাশ দেখা যাইবে—বুঝিতে হইবে বিশ্বস্রষ্টার নিকট হইতেই তিনি এই শক্তি অর্জন করিয়াছেন।

যাঁহাদিগকে জনকল্যাণের জন্য গুরুতর দায়িত্ব বহন করিতে হয় ঈশ্বর তাঁহাদিগকে এই দায়িত্ব পালনের শক্তিও দিয়া থাকেন।

দুর্বল লোকের পক্ষে এই শক্তির সম্বন্ধে কোনরূপ ধারণা করা সম্ভবপর নহে। যে ব্যক্তি এই শক্তিকে ধারণ করিবার অধিকারী নহে সে ইহার প্রভাব উপলব্ধি করিতে পারে না—সে জানেও না এ শক্তির উৎস কোথায়।

শুধু সমাজের বৃহত্তম কল্যাণের ক্ষেত্রে মহামানবগণের কর্মপ্রচেষ্টা ঈশ্বরদত্ত শক্তির বলে সম্পন্ন হয়—অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিশ্বের সর্বত্র সেই অনন্তশক্তি ঈশ্বরের প্রেরণা দ্বারাই জগৎ চলিতেছে। সূর্যের আলো আসিতেছে কোটিসূর্য সমপ্রভ জ্যোতির্ময় পুরুষের নিকট হইতে। তাঁহারই আলোতে বিশ্বলোকে উদ্ভাসিত।

বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে শিল্প, বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের বিকাশে যে শক্তির ক্রিয়া দৃষ্ট হয় উহা সেই পরমশক্তিরই প্রভাব।

শক্তি অর্জন করিতে সাধনা দরকার। অনন্তশক্তি ঈশ্বরের নিকট হইতে আপন আপন সাধনবলে শিল্পী, বিজ্ঞানী ও ধর্মসাধক তাঁহাদের প্রাপ্য সাধন-ফল আদায় করেন।

মানুষকে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে হইবে। শক্তি ব্যতীত এ সংগ্রামে সে জয়ী হইতে পারে না। বিজয়ী বীরের যে শক্তি তাহা ঈশ্বরদত্ত শক্তি। জীবনে সহস্র প্রলোভন হইতে নিজকে মুক্ত করিবার যে শক্তি—সে শক্তির প্রেরণা আসিতেছে পরমপুরুষের নিকট হইতে।

এই সকল শক্তিমান্ পুরুষেরা সর্বশক্তি ঈশ্বরের উপরই সকল কার্যের গৌরব অর্পণ করেন এবং আপনাদিগকে ঈশ্বরের পতাকাবাহক বলিয়া জ্ঞান করেন।

"রইল যারা পিছুর টানে কাঁদবে তারা কাঁদবে"

জগৎ নিয়ত পরিবর্তনশীল। জগৎ চলিয়াছে সম্মুখের দিকে। এ চলার পথ ক্রমোন্নতির পথ। কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে জগতেরও অগ্রগতি চলিয়াছে।

পুরাতনকে ত্যাগ করিয়া জগৎ চলিয়াছে নূতনের সন্ধানে। কেহ কেহ বলিবেন নূতন অতীত সুন্দরকে ধ্বংস করিতেছে। নূতন সুন্দর অতীতের পরিবর্তে সুন্দরতরকে সৃষ্টি করিতে পারিতেছে না।

অপর পক্ষ বলিতেছেন অতীত অকর্মণ্য ও নিরর্থক হইয়া পড়িতেছে। তাহার স্থানে নূতনকে চাই। জগৎ অবনতির পথে চলিতেছে না—জগতের সর্বদা অগ্রগতি অব্যাহতই আছে। তাহা না হইলে জগতের চলার কোন অর্থ হয় না। কাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অতীতেরও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী—ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। বিশ্বজগৎ যখন প্রকৃতির অধীন তখন নূতনকে মানিয়া লইতে হইবে।

সুন্দর হউক আর অসুন্দর হউক নূতন যখন আসিতেছে তখন তাহাকে বরণ করিয়া লওয়া উচিত। সুন্দর আর অসুন্দরের বিচার যুগে যুগে বদলায়। যে নূতনকে গ্রহণ করিতে অক্ষম সে কালের কবলে পড়িয়া পিছনেই পড়িয়া থাকিবে।

অতীতের টান যাহাদের নিকট বড়, অনাগত তাহাদিগকে পিছনে ফেলিবে। মনুষ্য-সমাজের আচার-বিচার, রীতি-নীতি সর্বকালে সর্বযুগে এক থাকিতে পারে না। প্রয়োজনহীন আচারকে কাল ধ্বংস করিবে। কোন বিশেষ সামাজিক প্রয়োজনে কোন বিশেষ কালে কোন আচারের উৎপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু সে প্রয়োজন এখন নাই—সে কালও এখন চলিয়া গিয়াছে।

মানুষের স্বভাব হইতেছে চির অভ্যস্ত পুরাতনকে না ছাড়া। বহু যুগের পুরুষ-পরম্পরাগত আচার এবং চিন্তার ধারা ত্যাগ করার কথা বলা যত সহজ তাহা কাজে পরিণত করা তত সহজ নহে। যাহারা পুরাতনকে দ্রুত ত্যাগ করিয়া নূতনের সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে পারে—তাহারা জগতে অগ্রসর হইয়া বাঁচিয়া থাকে।

যাহারা পিছনের টানে পড়িয়া থাকে তাহাদের কোন দিক দিয়াই উন্নতি নাই।

লোকের আচার-বিচার, রীতি-নীতি যেমন পরিবর্তন হইতেছে তেমনি শিক্ষা ও সংস্কৃতিরও পরিবর্তন সাধিত হইতেছে।

জগতে জ্ঞানের পরিধিও প্রসারিত হইতেছে। পূর্বের ভুল-ত্রুটি পরবর্তীকালে সংশোধিত হইতেছে। সুতরাং পুরাতনকে সংস্কার না করিয়া যে ধরিয়া থাকে সে কূপমণ্ডুক। তাহার জগৎ বড় ক্ষুদ্র জগৎ—সেখানে জ্ঞানের আলো শিক্ষা সংস্কৃতির আলো বা যুক্তি প্রবেশ করিতে পারে না। ফলে সেই ব্যক্তি যেখানে ছিল সেইখানেই থাকিয়া যায়। কিন্তু এইরূপ কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেরা বহুকাল পরে নিজেদের অবনতির কারণ বুঝিতে পারিয়া অনুশোচনা করে। পিছনের টানের জন্য লোকের যে ক্ষতি হয় পরে তাহা পূরণ করা সম্ভবপর হইয়া উঠে না। এইরূপ লোকের অনুশোচনা সুনিশ্চিত। লোকের এই অনুশোচনা একদিন না একদিন উপস্থিত হইবেই।

"দশে মিলি করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ"

সংঘবদ্ধতা ছাড়া কোন বৃহৎ কার্য সুসম্পন্ন করা চলে না। বিচ্ছিন্ন মানুষ যখন সমাজবদ্ধ হয় তখন তাহার শক্তি বহুগুণে বাড়িয়া যায়। কোন লোকের একা যে কাজ করা অসম্ভব, দশের সাহায্যে তাহা অনায়াসে করা যায়। বহু ছোটর সমবায়ে এক বৃহতের উৎপত্তি হয়। বিন্দু বিন্দু জলে মহাসাগর গড়িয়া উঠে। ক্ষুদ্র বালুকণার সমবায়ে বিরাট পৃথিবী সৃষ্টি হইয়াছে।

সংসারে দুঃখকষ্ট বা কাজের ভার বহুর মধ্যে বিভক্ত হইলে কষ্টেরও অনেক লাঘব হইয়া থাকে। দশের মধ্যে কাজের দায়িত্ব বিভিন্ন ব্যক্তির উপর স্থাপন করাকে একপ্রকার বিভাগ হইলেও মিলন বলা চলে, কারণ বিভিন্ন বহু মিলিয়া এক হইয়াছে। প্রত্যেক কাজেই জয়-পরাজয় আছে—লাভালাভ সর্বত্রই থাকিবে। কার্যের সাফল্যে লোকের বিজয়ের উল্লাস হওয়া স্বাভাবিক। কাজ নষ্ট হইলে পরাজিতের মনোভাব লোকের মধ্যে উপস্থিত হয়। কিন্তু কাজ করিতে গেলে কোন কোন সময়ে পরাজয় আসিবেই। এই পরাজয়ে লোক অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়ে।

কীর্তিমান্ লোকের নিকট পরাজয়ের গ্লানি বিশেষরূপে অসহ্য হইয়া থাকে।

এই সকল অকীর্তি ও লজ্জার গ্লানি দূর করিবার একমাত্র উপায়—একতা বা সংঘবদ্ধতা। একা কাজ করিয়া অসাফল্যের সম্মুখীন হইলে কেহ দ্বিতীয়বার সেইরূপ কাজে অগ্রসর হইতে চাহে না। ফলে সংসারের বহুকাজ প্রাথমিক অসাফল্যের জন্য কোন দিনই সম্পন্ন হয় না। কিন্তু বহু লোক মিলিয়া কার্য করিলে সাফল্যের সম্মান লাভ যেমন কোন এক ব্যক্তির একার হয় না তেমনি পরাজয়ের গ্লানিও একার ভাগে পড়ে না। সংঘবদ্ধ কাজের সুখদুঃখ ফলাফল সকলের মধ্যে সমভাবে বিভক্ত হয়। কোন লোকের পক্ষে একাকী অসাফল্যের দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতির পরম বা চরম উপায় হইতেছে একতা।

সংঘবদ্ধতায় কোন কার্যে পরাজয়ের দুঃখ থাকে না; আর বিজয়ের আনন্দ

সমভাবে সকলেই ভোগ করিয়া থাকে। এই সকলে মিলিয়া বিভেদ ভুলিয়া কার্য করিলে পরাজয় হইলেও লজ্জার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। সমবেতভাবে কাজ সকলের কাজ। বহুজন মিলিয়া যেখানে কাজ করা হয়—সেখানে কেহ কাজটিকে একার বলিয়া মনে করিতে পারে না। একা কাজ করিয়া লোকে পরাজয়ে দুঃখ পায় বেশি। সেখানে পরাজিত ব্যক্তি একা আর তাহার বিরুদ্ধে বিশ্বসংসার। সম্মানী ব্যক্তির পক্ষে পরাজয় মৃত্যুতুল্য।

যে শুইয়া থাকে তাহার ভাগ্যও শুইয়া থাকে

জগতে কর্ম প্রচেষ্টা দ্বারা মানুষ তাহার নিজের ভাগ্য নিজেই গঠন করে। ইহা ছাড়া ভাগ্য বলিয়া আর কোন কিছু নাই। যে ব্যক্তি সর্বদা কোন না কোন কর্ম করে তাহার সৌভাগ্যের উদয় অবশ্যম্ভাবী: পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সর্বপ্রকার কর্মে বিমুখ তাহার মধ্যে অলসতা ও জড়তা বাসা বাঁধে। সে নিজের শরীর রক্ষার জন্য যেটুকু সামান্য কর্ম দরকার তাহাও করিতে পারে না। এরূপ লোকের পক্ষে দেশের জন্য, সমাজের জন্য কাজ করিবার কোন প্রশ্ন উঠে না। যে লোক কাজ করে সে সদা জাগ্রত বা অতন্দ্রিত—সে সর্বপ্রকার সম্পদের অধিকারী হয়।

যে ব্যক্তি সুপ্ত তাহার ভাগ্যও সুপ্ত। কর্ম না করিলে কাহারও ভাগ্যোদয় হয় না। লোকের নিষ্ক্রিয়তা সুপ্তির নামান্তর মাত্র। নিদ্রায় কোন শারীরিক ক্রিয়া থাকে না। শরীরের ক্রিয়ার অভাব হইলে মানুষ নিদ্রিত অবস্থায় থাকে বলা যাইতে পারে। মানুষের কর্ম আরম্ভ হইলে জাগ্রদবস্থা আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত যে ব্যক্তি কোন না কোন ভাল কাজে ব্যয় করে সে সকল দিক দিয়া উন্নতিলাভ করে।

এ জগৎ কর্মভূমি; তাই এখানে কর্মের মূল্য সর্বাপেক্ষা বেশি। কর্মকে অবহেলা করা ঘোরতর অন্যায়। কর্মকে অবহেলা করার অর্থ হইতেছে মানুষের স্বাভাবিক অবস্থাকে অস্বীকার করা। যে কাজ প্রকৃতির বিরুদ্ধে করা হয়—প্রকৃতি তাহার প্রতিশোধ লইয়া থাকে। নিশ্চেষ্টতার জন্য প্রকৃতি মানুষের সকল শক্তি অপহরণ করিয়া তাহাকে একেবারে পঙ্গু করিয়া ফেলে। যেখানে কোন কর্ম নাই সেখানে তাহার কোন ফলও নাই। নিষ্কর্মতার ফলে নিষ্ফলতা বা ব্যর্থতা হওয়াই স্বভাবসিদ্ধ।

ভাগ্য গঠনের মূলে যে কর্মপ্রবণতা রহিয়াছে তাহাকে নষ্ট করা ভাগ্যের মূলোচ্ছেদ করা ছাড়া আর কিছুই নহে। কর্ম না থাকিলে ভাগ্যের উপর নির্ভর করিবার যায়গা থাকিবে না। তাই অলস লোকের দুর্গতির পরিসীমা থাকে না। জীবনে কোন অবস্থাতেই সে চলিতে পারে না। অর্থ, সম্পদ, স্বাস্থ্য থাকিলেও কোন বিষয়ে এইরূপ লোক অগ্রসর হইতে পারে না। এইরূপ ব্যক্তির কর্মময় সংসারে বাঁচিয়া থাকা মৃত্যুতুল্য।

অলস ব্যক্তি কি ছাত্র-জীবন, কি কর্মময় জীবন, কি ধর্মময় জীবন,—কোন

জীবনেরই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে না। এইরূপ লোকের বিদ্যা শিক্ষা হয় না—কর্মের অভাব হেতু অর্থোপার্জন হয় না—আর ধর্মের জীবনে অলসতার কোন স্থানই নাই। এইরূপ লোক ঘোরতর তমসাচ্ছন্ন।

মানুষ ভাগ্যকে নিজের কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা গঠন করিয়া থাকে। পূর্বজন্মে হউক, ইহজন্মে হউক কিছু কাজ করা চাই। তাহা না করিলে ভাগ্য গঠিত হইতে পারে না।

জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর

(ঈশ্বর পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ হইতে মানুষ পর্যন্ত সকল জীবকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এ সৃষ্টিতে তিনি স্রষ্টা হইয়া আপনাকে সৃষ্টিরূপে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং মনুষ্য হইতে ক্ষুদ্র তৃণ পর্যন্ত সবই তিনি। জল স্থল অনিল অনলে তিনি—জলের শৈত্য তিনি, অগ্নির দাহিকা শক্তিও তিনি। নিখিল-বিশ্বের একমাত্র অধিষ্ঠান তিনি। মানুষ তাঁহাকে খোঁজে কিন্তু তিনি নিকটেই আছেন—আবার তিনি সকল বস্তুর ভিতরেও রহিয়াছেন। তিনি সর্বব্যাপী সর্বত্রগ সর্বতশ্চক্ষু।) কেহ কেহ বলেন মানুষের তাঁহাকে খোঁজা নিরর্থক। তাঁহার সৃষ্ট জীবকে ভালবাসিলে তাঁহার সেবা করা হইবে। তিনি অনন্তকোটি জীবরূপে শিব। জীবের সেবাই শিবের সেবা। যাঁহাদের সর্বচক্ষু খুলিয়াছে তাঁহারা ঈশ্বরকে সর্বজীবের ভিতরে দেখেন।

(প্রেমের বন্ধন ছাড়া জগৎ আপন গতিপথে চলিতে পারে না। ঈশ্বর সকল জীবকে পরস্পর সংযুক্ত করিয়া বাধিয়াছেন—একে অন্যকে না পাইলে অন্যের সাহায্য গ্রহণ না করিলে চলিতে পারে না। প্রেমের মিলন এখানকার রীতি। প্রেম না থাকিলে পৃথিবী এক বিরাট স্বেচ্ছাচারের রাজত্বে পরিণত হইত—ঈশ্বরের রাজত্বের যে সুশৃঙ্খলা দেখা যায় তাহা হইতে পৃথিবী বঞ্চিত হইত। এ পৃথিবীর লতায় পাতায়, পুষ্পে ফলে মানুষে মানুষে সর্বত্র প্রেমের বন্ধন আছে।)

জীবের প্রতি প্রেমের ভিতর দিয়াই ভগবৎপ্রেমের অভিব্যক্তি হয়। তাঁহার সৃষ্ট জীব এবং তিনি এক। ঈশ্বরের সেবা পরমধর্ম। তাঁহার সেবা করিতে হইলে সেবার আধার চাই। এই বিশ্বের জীবমণ্ডলী সেই সেবার আধার।

জীবের দুঃখে কষ্টে মানুষ তাহার সেবার হস্ত প্রসারিত করিতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকিবে। জীবের ক্ষুধার অন্ন মনুষ্য যোগাইবে। ক্ষুধার তাড়না যেমন একজনকে সহ্য করিতে হয় সেইরূপ সকলকেই করিতে হয়, তৃষ্ণার জল সকলের পক্ষেই সমভাবে প্রয়োজনীয়। ঈশ্বর একের ভোগের জন্য এই পৃথিবী সৃষ্টি করেন নাই। পৃথিবীতে সকলেই ন্যায্য প্রাপ্য পাইবার অধিকারী। এই অধিকার হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করিবার অধিকার কোন মনুষ্যের নাই। (প্রেমের দৃষ্টির অভাবে ন্যায়দৃষ্টি কার্যকরী হয় না। যেখানে প্রেম নাই সেখানে ন্যায়ানুসারে কেহ কাজ করে না। তাই প্রেমের দৃষ্টি সর্বপ্রথম দরকার। ইহাতেই সকল দুঃখের অবসান হইবে। এই জীবসেবা বা জীবের প্রতি প্রেমই যথার্থ ঈশ্বর সেবা।)

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব

আদিম মানুষের অভাব বোধ ছিল অত্যন্ত অল্প, তাই এ জগতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহার উপর বেশি কিছু পাইবার আগ্রহ তাহার মনে জাগ্রত হইত না। আহার সংগ্রহ এবং শীতবর্ষা ও রৌদ্র হইতে কোনরকমে আত্মরক্ষা করিতে পারিলেই সে নিজেকে ধন্য মনে করিত। জ্ঞানের পরিধি উত্তরোত্তর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অভাব বোধও বাড়িতে থাকে। সে বহিঃপ্রকৃতিকে জয় করিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবনের কাজে লাগিয়া গেল। এই প্রচেষ্টার ফলে বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়। প্রকৃতিকে বশীভূত করিবার চেষ্টার নাম জীবনসংগ্রাম। অনাদি অনন্তকাল হইতে এই বিরামহীন চেষ্টা চলিতেছে—ইহার আদি আছে, কিন্তু শেষ নাই। যতদিন পর্যন্ত মানবজাতির শেষ চিহ্নটুকু ভূপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া না যায় ততদিনই বিজ্ঞানের জয়যাত্রা চলিতে থাকিবে। এখন বিজ্ঞানের প্রভাবে পঞ্চভূত বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। বাষ্প বিদ্যুৎ বহু পূর্বেই মানুষের করতলগত হইয়াছে। এখন চলিতেছে গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে যাত্রার যুগ বা স্পুটনিকের যুগ।

বর্তমানকালের মনুষ্যসমাজকে যে আমরা এত সুসভ্য বলি তাহার কারণ বিজ্ঞানের সহিত আজ এই সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। আহার নিদ্রা, ভ্রমণ, কর্ম, দ্রুত যোগাযোগ, ব্যায়াম, ক্রীড়া, আরোগ্য, শিক্ষা, আনন্দ, সুখ, সমৃদ্ধি, বিলাসিতা যেদিকেই আমরা দৃষ্টিপাত করি না কেন সবএই বিজ্ঞানের অপ্রতিহত প্রভাব দৃষ্ট হয়। এখন আর বিজ্ঞান না হইলে আমাদের জীবনযাত্রা অচল, জীবনের অগ্রগতি ব্যাহত। প্রাচীন সভ্যযুগে ভারতবর্ষে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের যে গবেষণা হইয়াছে, তাহার ফলে আমরা জানিতে পারি কোন্ খাদ্যদ্রব্যে কি গুণাগুণ আছে এবং কোন্‌টি আমাদের পক্ষে হিতকারী এবং গ্রহণযোগ্য।

মানব দেহের উপর কিরূপ খাদ্যের কি কি প্রতিক্রিয়া হয় তাহার আলোচনা আয়ুর্বেদশাস্ত্রে রহিয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান তাহার বিশ্লেষণী পদ্ধতি অবলম্বনপূর্বক এ বিষয়ের গবেষণায় বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় কি কি বস্তু কতখানি করিয়া গ্রহণ করা উচিত তাহা বিজ্ঞানই আমাদিগকে নির্দেশ করিয়া দিয়াছে। খাদ্য কি ভাবে গ্রহণ করিলে দেহের পক্ষে, উহার আত্তীকরণ (assimilation) সম্ভবপর হইতে পারে তাহার ব্যবস্থাও বিজ্ঞানের সাহায্যেই জানিতে পারা যায়। আহার্য দ্রব্যের নির্মাণপ্রণালীর ভিতরেও বৈজ্ঞানিক প্রভাব বিদ্যমান। ঘরের পাকা গৃহিণীরা জানেন কোন্ জিনিস কতটা যোগ করিয়া স্বাস্থ্যানুকূল সুখাদ্য প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

শয়ন বিধিতে বা নিদ্রায় বিজ্ঞান আমাদের পথপ্রদর্শক। একজন শিশুর যতটা নিদ্রা প্রয়োজন—একজন পরিণতবয়স্ক লোকের ততটা দরকার হয় না। এ খবর বিজ্ঞানই আমাদিগকে সরবরাহ করিয়াছে।

জল, স্থল, আকাশ এবং পাতালে ভ্রমণ বিজ্ঞানবলে সম্ভবপর হইয়াছে। জলে দ্রুতগামী জাহাজ, স্থলে মোটরগাড়ি ও রেলগাড়ি, আকাশে এরোপ্লেন এবং

আধুনিককালে রকেটের সাহায্যে গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে যাইবার উপায় বিজ্ঞানেরই আবিষ্কার। বিজ্ঞানবলেই মাটির নীচে সুড়ঙ্গপথে রেলগাড়ি চলাচল, দুর্গম পর্বত ভেদ করিয়া পথ নির্মাণ এবং ভূগর্ভে ছোটখাট শহর তৈয়ারি সম্ভবপর হইয়াছে।—এই সব বিজ্ঞানের জয়যাত্রার লক্ষণ। গভীর সমুদ্রের নীচে ডুবুরি বিজ্ঞানবলে কাজ করে। বিজ্ঞান মানুষের কর্মক্লান্তিকে লঘু করিয়াছে—তাহার অনেক সময় বাঁচাইয়া অল্প-পরিসর জীবনকে বেশি কাজ করিবার সুযোগ দিয়াছে।

কলকারখানায় ব্যবহৃত বিদ্যুচ্চালিত যন্ত্র মানুষের বহুদিনের শ্রমের কাজ মুহূর্তমধ্যে সম্পন্ন করিতেছে। আফিসে টাইপরাইটার, যোগ করিবার যন্ত্র আমাদের কত পরিশ্রম বাঁচাইতেছে। রেডিও, টেলিভিসন, টেলিপ্রিণ্টার, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন সারাজগৎকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত করিয়াছে।

ব্যায়ামক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের ব্যবহার, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও তাহার উন্নতি-অবনতির মান বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সম্পন্ন হইতেছে। খেলার মাঠে না গিয়াও ঘরে বসিয়া রেডিওর সাহায্যে খেলার আনন্দ উপভোগ করা সম্ভবপর হইয়াছে।

আধুনিক চিকিৎসা জগতে বিজ্ঞান যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। শুধু পেনিসিলিন, স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন প্রভৃতি ঔষধ আবিষ্কার করিয়াই এই বিজ্ঞান ক্ষান্ত হয় নাই, কৃত্রিম হৃদযন্ত্রের সাহায্যে সম্প্রতি একটি শিশুকে প্রায় একঘণ্টাকাল বাঁচাইয়া রাখিয়া তাহার উপর অস্ত্র-চিকিৎসা চালাইয়াছে। কলেরা, বসন্ত মহামারী রোধ করিবার শক্তি বহুকাল পূর্বেই মানুষের আয়ত্তে আসিয়াছে।

বিজ্ঞান চর্চার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রেও বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। লোকে রেডিও টেলিভিসনে জগতের বড় বড় মনীষীর বাণী শুনিতে পাইতেছে, লিঙ্গোয়াফোনের সাহায্যে বিদেশী ভাষা শিক্ষার সুবিধা লাভ করিতেছে। বেতারবার্তা ও সিনেমার সাহায্যে লোকে জ্ঞান ও আনন্দ আহরণের সুযোগ লাভ করিতেছে। বৈদ্যুতিক পাখায় লোকে বাতাস পাইতেছে, বিজ্ঞানের সাহায্যে শীততাপনিয়ন্ত্রিত গৃহে বাস করিবার সুবিধা মানুষের কাছে উপস্থিত হইয়াছে। বৈদ্যুতিক চুল্লীদ্বারা ধোঁয়ার হাত হইতে মানুষ উদ্ধার পাইয়াছে এবং ইহার সাহায্যে অনায়াসে রন্ধনক্রিয়া চলিতেছে।

বিজ্ঞানের সাহায্যে দেশের অনাবিষ্কৃত সম্পদ আবিষ্কৃত হইয়া কাজে লাগিয়া দেশের সমৃদ্ধি আনয়ন করিতেছে। বিলাসিতার উপকরণ মানুষকে বিজ্ঞানই যোগাইতেছে। বর্তমান যুগের পূর্বে কেহ জানিত না কি করিয়া আলকাতরা লোকের প্রসাধন সামগ্রীতে পরিণত হইতে পারে। আর উহা হইতে যে বিবিধ প্রকারের প্রয়োজনীয় ঔষধ প্রস্তুত হইতে পারে তাহাও কল্পনার অতীত ছিল।

বর্তমান যুগের সভ্যতায় আলকাতরার গুরুত্ব খুব বেশি। এই জন্য এই সভ্যতাকে কেহ কেহ 'আলকাতরার সভ্যতা' বলিয়া থাকেন। সারা পৃথিবী জুড়িয়া বর্তমানে স্বার্থের হানাহানি চলিয়াছে। ইহা দেখিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন আধুনিক সভ্যতা আলকাতরার মতো কাল। দোষ আলকাতরার বা

বৈজ্ঞানিকের নহে। অতিরিক্ত শক্তিমত্তার ফলে বর্তমান মনুষ্য সমাজে দম্ভ-দর্পের আবির্ভাব হইয়াছে। আত্মিক শিক্ষার অভাব এই অশান্তির কারণ। বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চারিত্রিক শিক্ষাও দরকার। বিজ্ঞানবলে বলীয়ান মনুষ্যসমাজ চারিত্রিক বলে বলীয়ান হইলেই বিশ্ববাসীর কল্যাণ হইবে।

বাঙলায় নববর্ষের উৎসব

বাঙালীর জীবনে প্রাচীনকাল হইতে উৎসব লাগিয়াই আছে। কালের পরিবর্তনে উৎসবের বাহির ও ভিতর উভয় দিকেই রূপ পরিবর্তিত হইয়াছে। আমাদের হৃদয়ে এই উৎসবের প্রাণ ছিল প্রতিষ্ঠিত। আমার যে আনন্দ তাহা অপর সকলের সহিত ভাগ করিয়া লইয়া আমি সুখী হইব—এইখানেই উৎসবের তাৎপর্য। তাই দোল-দুর্গোৎসব, বারব্রত, বিবাহ-অন্নপ্রাশন এবং ঋতু পরিবর্তনকে আশ্রয় করিয়া উৎসব চলিত। আধুনিক যুগে প্রাচীন উৎসবও গণনার মধ্যে আসিয়াছে। বৎসরের প্রথম হইতে পরবর্তী নূতন বৎসরের পূর্ব মুহূর্তে পৌঁছিতে যে সময় আমরা পাই তাহার মধ্যে দিয়া চলিয়া যায় একটা বিরাট পরিবর্তন। তাই এই পরিবর্তনের পর যে দিন উপস্থিত হয় তাহাকে দ্রুত অভিনন্দিত করিয়া লইবার জন্য আমাদের হৃদয়ে জাগ্রত হয় একটা আবেগ, একটা ঔৎসুক্য। বৎসরের প্রথম দিনটি হয় উৎসবের দিন। বাংলাদেশে বৎসরের প্রথম পয়লা বৈশাখকে ধরা হয়। প্রাচীন কালে ভারতের বিভিন্ন সময় হইতে বর্ষ গণনা করা হইত। বছরের নাম 'বর্ষ' হইতে বুঝা যায়, এক বৎসরের বর্ষণকাল হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী বর্ষণারম্ভের সময় পর্যন্ত এক বৎসর ধরা হইত। কখনও বা এক শীত হইতে অপর শীতকাল পর্যন্ত এক বৎসরের পরিমাণ গণ্য করা হয়। আবার এক শরৎ হইতে অপর শরৎ পর্যন্ত এক বৎসর গণনা করিবার দৃষ্টান্তও প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়।

চৈত্র সংক্রান্তিতে পুরাতন জীর্ণ বৎসর শেষ হয়, গাজন উৎসবের শেষ দিনে পুরাতন নবীনে সংক্রমণ করে। পর দিন রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে নববর্ষের সমাগম হয়। তাই নবীনকে নানাভাবে বরণ করিয়া লইবার জন্য মানুষ হইয়া উঠে চঞ্চল। সারা বছরের আমাদের খণ্ডিত পৃথক্ জীবন এই দিন আমরা করি সংহত। অতীত দুঃখদৈন্যকে অন্ততঃ একটি দিনের জন্য সকলে উৎসবের মধ্যে ভুলিবার চেষ্টা করি।

জীবনকে সার্থক করা যায় সকলের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করিয়া। সঙ্কোচে হয় জীবন খণ্ডিত। নববর্ষের উৎসবে এই খণ্ডতাকে পূর্ণ করিবার সমারোহ চলে বর্ষে বর্ষে। এই দিনে আবার নূতন করিয়া জীবনকে প্রসারিত করিবার শুভারম্ভ হয়। তাই আমরা সকল উৎসবের আরম্ভে বলি (আমাদের) এই আরম্ভ শুভ হউক ('অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু')।

বৎসরের প্রথম দিনটি আমাদের আশা ও আশীর্বাদ লাভের দিন। আশাই

মানুষকে শত বিপর্যয়ের মধ্যে বাঁচাইয়া রাখে আর আশীর্বাদ হৃদয়ে নববলের সঞ্চার করে। তাই আশায় ও আশীর্বাদে বছরের প্রথম দিনটি নবীন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। আমাদের কর্ম দ্বারা আবদ্ধ জীবন হইতে আমরা চাই ছুটি—নববর্ষের দিনে আসে সেই কর্মবন্ধন হইতে মুক্তির আস্বাদ। বড় শহরে রাত্রি প্রভাতের পরই তরুণতরুণী, কিশোরকিশোরীদের হাতে বাজিয়া উঠে শুভ শঙ্খ। অনেক স্থানে নববর্ষে প্রভাতফেরী বাহির হইয়া জনগণের মনে নব চেতনার সঞ্চার করে। স্বাধীনতা লাভের পর হইতে বিশেষ করিয়া সামরিক বাদ্য সহকারে অনেক পল্লীতে চলে যুবকদের কুচকাওয়াজ। সন্ধ্যায় বিভিন্ন স্থানে বসে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আসর।

বাঙলার সর্বত্র বাঙালী ব্যবসায়ীদের মধ্যে এই দিনে চলে হালখাতার মহরত (আরম্ভ)। সারা বছর বিক্রেতার সঙ্গে ক্রেতার দেনা-পাওনার সূক্ষ্ম হিসাবটাই প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু এই একটি দিন বেহিসাবী দিন। দেনা-পাওনার সারা বছরের সম্পর্কের মধ্যেও যে পরস্পরের শুভেচ্ছা, সহযোগিতা ও প্রীতির সম্পর্ক রহিয়াছে এই দিনে তাহার বিশেষ অনুভূতি আসে।

গোটা সংসারটাই তো দেনা-পাওনার স্থান। অপরকে না দিলে তাহার নিকট হইতে পাইবার আমার অধিকার নাই। আমার প্রয়োজনীয় জিনিস ব্যবসায়ী সারা বছর সংগ্রহ করিয়া দেয়—আমাকে তার মূল্য দিতে হয়। বছরে একটি দিন সে চায়, আমার প্রীতি, সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা। ইহাও তাহাকে ফিরাইয়া দিতে হয়—তাই হালখাতার মহরতের উৎসব হয় সার্থক।

প্রতিটি উৎসবে আমরা আমাদের বিচ্ছিন্ন জীবনকে সংহত করি। নববর্ষের দিনে এই কথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না। এই উৎসবের দিনে প্রাণ খুলিয়া অপরের সহিত না মিশিতে পারিলে জাতি তাহার জীবনীশক্তি হারাইবে—কেননা উৎসবই জাতির জীবনশক্তির পরিচায়ক।

কাব্য ও বিজ্ঞান

কাব্যের কাজ সুন্দরকে আমাদের সম্মুখে ধরিয়া তাহা হইতে আমরা যাহাতে আনন্দ আহরণ করিতে পারি তাহারই ব্যবস্থা করা। কাব্য তাহার সুর-ছন্দ-অলংকার রীতির সাহায্যে ভাবকে পরিস্ফুট করিয়া আমাদের আনন্দ বিধান করে। আমাদের সরল সাদা-চোখে চারিদিকের সুন্দর জগৎ ধরা পড়ে না—কবি আমাদিগকে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া সব কিছুকে দেখান। আষাঢ়ের কালোমেঘ মায়ালোক সৃষ্টি করিয়া নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করে, নব বারিবিন্দুপাতে পৃথিবীতে সবুজের সমারোহ হয়, নদীতে কলরোদন শুনা যায়, কদম্বকেতকীতে শিহরণ জাগে।

বৈজ্ঞানিক আষাঢ় মাসের কালো মেঘের উৎপত্তি ও পরিণতির কথা ব্যাখ্যা করেন, পৃথিবীতে গাছপালা সবুজ হইবার কারণ নির্দেশ করেন, নদীর যে জলের শব্দ উহা কোন প্রকারে ক্রন্দন হইতে পারে না—জড়পদার্থ কাঁদিতে পারে না। তাহা হইলে দেখা যায় কবি যাহা গড়েন বিজ্ঞানী তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলেন।

কবির কার্য কল্পনাকে লইয়া চলে বৈজ্ঞানিক চলেন সত্যকে লইয়া, তথ্যকে লইয়া।

বৈজ্ঞানিক ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুকে বাহিরে আর যে কোন জগৎ আছে তাহা স্বীকার করেন না। কবির দৃষ্টি ইন্দ্রিয়াতীত জগৎ পর্যন্ত প্রসারিত। কবি অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন। এই জন্য কবিকে বলা হয় 'মনীষী'—কবি অতিক্রান্তকে দেখেন—অনাগতকেও দেখেন। কবি বিশ্বসত্তার মধ্যে এক আনন্দ সত্তাকে উপলব্ধি করেন—তাঁহার দৃষ্টিতে সর্বত্র লয় এবং সুষমা বর্তমান। বৈজ্ঞানিক বস্তুর তত্ত্ব অন্বেষণ করেন, তাহার প্রয়োজনীয়তা মানুষের কাছে ব্যাখ্যা করেন। মানুষ তাহার প্রয়োজনের জগতে বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কারকে কাজে লাগায়।

বৈজ্ঞানিক সত্য পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারেন। কবি চলিয়া যান তাহারও উপরে। তাঁহার কাজ হইতেছে 'সত্যস্য সত্যম্' (সত্যের উপরের সত্য)-কে বা চরম সত্যকে লইয়া।

বৈজ্ঞানিক সূর্যের স্বরূপ আবিষ্কার করিয়া কবির কল্পনাকে বাধা দেন। সূর্যদেব সপ্ত ঘোড়ার রথে অরুণ সারথিকে সম্মুখে রাখিয়া নীলাকাশ পার হন অথবা দিনের 'আলোক তরী' (রবীন্দ্রনাথ) রূপে সন্ধ্যায় সোনার পাল গুটাইয়া লন—এ কথা কবি বলেন সত্য, কিন্তু সূর্যের প্রকৃত তত্ত্ব কবি ছাড়া আর কেহ জানেন না। বেদের ঋষিকবি বলেন 'সূর্য স্থাবর ও জঙ্গম বিশ্বের আত্মস্বরূপ (সূর্য আত্মা জগত স্তস্থুসশ্চ' ঋগ্‌বেদ)-এ কোন্ সূর্য? আমাদের চোখের সামনে যে সূর্য তাহার পিছনে রহিয়াছেন কোটি সূর্যের প্রভাববিশিষ্ট আত্মরূপী সূর্য। ইঁহারই আলোতে নিখিলবিশ্ব আলোকিত হয় "তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি"। 'তিনি জ্যোতির জ্যোতি' ('জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ')। এ সূর্যের খবর বিজ্ঞানী রাখেন না। ইহা ঋষিকবির অনুভূতির বিষয়।

বৈজ্ঞানিক বিশ্বের খণ্ড সত্য আবিষ্কার করেন, আর কবি সব কিছুর মূলে এক সত্যের সন্ধান করেন। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে তাঁহার আবিষ্কারকে সর্বসাধারণের সমক্ষে প্রমাণিত করেন, আর কবি তাঁহার হৃদয় দিয়া সত্যকে অনুভব করেন, তাঁহার ভাষায় তাহাকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারেন না।

বিজ্ঞানীর কাজ বিশ্লেষণমূলক। বিজ্ঞানী সব কিছুকে পৃথক্ করিয়া তাহার মধ্যে সত্যকে খুঁজিয়া বাহির করেন। আর কবি খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডের সংযোগ আবিষ্কার করেন।

পূর্ণ সত্যকে জানিবার জন্য কবি ও বিজ্ঞানী দুইজনেরই দরকার। একে অপরকে পূর্ণ সত্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। কবি আনন্দ পরিবেশন করিতে করিতে অবশেষে 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' পর্যন্ত গিয়া পৌঁছান—বিজ্ঞানী নীরস শুষ্ক সত্যকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া আনন্দিত হন, আর কবি কেবল আনন্দ নিজে ভোগ করেন না অপরকেও তাহার অংশভাগী করেন। বিজ্ঞানী অজানার স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া আমাদিগকে অনেক সময়ে দুঃখ দিয়া থাকেন; আর কবি অজানাকে জানাইয়া আনন্দের সহিত আমাদিগকে যুক্ত করেন।

বৃত্তি নির্বাচন

এ সংসারে মানুষকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে আহার, পোষাক, বাসস্থান তাহার চাই। কিন্তু এ সব কোন না কোন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে হইবে। বিরাট বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে আমাদের ব্যবহারের উপযোগী অনেক কিছু আছে—তাহাদিগকে কাজে লাগাইতে পারিলে আমরা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিব। কোন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আমরা যদি আমাদের প্রয়োজন নিবাহ না করি, তবে অপরে আসিয়া আমাদের হাতে সব কিছু তুলিয়া দিবে না। যাহাদের পূর্বপুরুষের সঞ্চিত অর্থ আছে তাহাদের পক্ষে বৃত্তি অবলম্বনের কোন প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু সংসারের বাকি লোক কোন না কোন ব্যবসায় বা বৃত্তি অবলম্বন না করিলে তাহাদের চলিবে কি করিয়া।

পূর্বকালে জাতি হিসাবে লোকের বৃত্তি নির্দিষ্ট ছিল—সুতরাং যে ব্যক্তি যে জাতি বা সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তদনুরূপ বৃত্তি সে অবলম্বন করিত। এটা একটা সাধারণ ব্যবস্থা। জীবন-সমস্যা ক্রমশঃ জটিলতর হইতে থাকায় এ ব্যবস্থা টিঁকিতেও পারে না। মোট কথা যাহার যে দিকে প্রবণতা আছে সে সেইরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিলে সুফল হইতে পারে। কোন নির্দিষ্ট ধরাবাঁধা নিয়মে জগতের সব লোক চলিতে পাবে না, সকলের শক্তি ও সামর্থ্য এক প্রকারের নহে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকার কাজের জন্য বিভিন্ন প্রকারের কর্মী চাই। সুতরাং সকলের শিক্ষাপদ্ধতি এক প্রকারের হইতে পারে না। বিগত দেড়শ বছর ধরিয়া বিদেশী সরকারের আওতায় যে শিক্ষা আমাদের দেশে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা প্রধানতঃ কেরানী তৈয়ারি করিবার শিক্ষায় পর্যবসিত হইয়াছে। জীবন-সংগ্রামে লোকের প্রস্তুতির শিক্ষা ইহা হইতে কেহ বড একটা পায় নাই। ওকালতি, ডাক্তা'র, ইঞ্জিনীয়ারিং বা অন্যপ্রকার বৃত্তিমূলক শিক্ষায় যে মুষ্টিমেয় লোক তৈয়ারি হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে জীবনযুদ্ধে কয়জনই বা জয়ী হইয়াছেন ?

আর বৃত্তিমূলক যে শিক্ষা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে তাহা শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিতে বা শিক্ষিতের অলসতা ঔদাসীন্য বা নিজের মনোমত না হওয়ায় ফলপ্রসূ হইতেছে না। বারে উকিলের সংখ্যা বাড়িয়াছে, উপার্জন অনেকের নাই। ইহার প্রধান কারণ নিজ ব্যবসায়ে আবশ্যক জ্ঞানের অভাব। কলেজ ছাড়িবার পর আইন পড়ার বা নিজ ব্যবসায়ে পটুতার জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার তাহা তাহার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। ডাক্তার ডাক্তারি পাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে বিষয়ে ব্যাবহারিক জ্ঞান, বা চিকিৎসা-শাস্ত্রের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যে দ্রুত পরিবর্তন হইতেছে তাহার সহিত তিনি সম্পর্কহীন। ফলে যে চিকিৎসকের নিকট রোগীর সুফল পাইবার সম্ভাবনা তাহারই নিকট সে যায়। এইভাবে শিক্ষার অপচয়ের ফলে বৃত্তি নির্বাচন ঠিক হইতেছে না।

অল্প বয়স হইতে বালকের স্বাভাবিক প্রবণতা বা প্রবৃত্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। গৃহ হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যালয় পর্যন্ত তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের গঠনে

যাঁহারা তাহাকে সক্রিয় সাহায্য করিবার জন্য দায়ী তাঁহারা তাহার কোন বিশেষ দিকে আগ্রহ ও প্রবণতার প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন এবং সেই দিকে তাহাকে সুপরিচালিত করিবেন। সুপরিচালনার ফলে তাহার ভবিষ্যৎ বৃত্তি গ্রহণের সুবিধা হইবে। যে ছেলে সাধারণ লেখাপড়া করিতে চাহে না অথচ হাতের কাজ করিতে বেশি ভালবাসে তাহাকে সেই দিকে চালিত করিতে হইবে। সমাজে সর্বপ্রকার কর্মীর আবশ্যক—কোন কর্মই নিন্দনীয় নহে। সুতরাং বৃত্তি নির্বাচন হইবে লোকের বিশেষ দিকে প্রবণতা বা সামর্থ্য অনুযায়ী। অবিবেচনার সহিত লোকের ভবিষ্যৎ বৃত্তির প্রস্তুতি চলিলে সুফল হইবার কোন আশা নাই।

শোনা যায় অনেক পাশ্চাত্ত্য দেশের স্কুলের বিশেষজ্ঞগণ যাহারা ছাত্রের মনোবৃত্তি সম্বন্ধে বিশেষ চর্চা করিয়াছেন তাঁহারা এ বিষয়ে সাহায্য করিয়া থাকেন। বালকের ভবিষ্যৎ বৃত্তি নির্বাচনে অভিভাবক, শিক্ষক, বালক এবং জাতীয় সরকারের পরস্পর সক্রিয় সহযোগিতা দরকার। যতদিন পর্যন্ত ইহা ঠিকভাবে না হইবে ততদিন পর্যন্ত এদিকে অবস্থার উন্নতির কোন আশা-ভরসা নাই। যে কোন কার্যে আমরা লিপ্ত হই না কেন, চেষ্টা ও একাগ্রতা ব্যতীত কোন দিকে কিছু হইতে পারে না। একজন যুবকের জন্য বৃত্তি সুনির্বাচিত হইতে পারে—কিন্তু তাহাকে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কাজটির ভিতরের কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিয়া লইতে হইবে। পরাজয়সুলভ মনোবৃত্তি তাহাকে ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে—তবেই সাফল্য আসিবে। কিছুদিন একাজ কিছুদিন সেকাজ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলে জীবন ব্যর্থ হইবে।

মানুষ নিজেই তাহার নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা। অপর কেহ তাহার ভাগ্য গড়িয়া দেয় না। "আত্মৈব আত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ"—(গীতা)—মানুষ নিজেই নিজের বন্ধু আবার সে নিজেই নিজের শত্রু—এই কথা স্মরণ করিয়া কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। বর্তমান ধনতান্ত্রিক যুগে বৃত্তি সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করিয়াও অনেকে কর্মক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিতে পারে না। যেখানে প্রভুর ব্যবহার শঠতাপূর্ণ সেখানে আত্মনিয়ন্ত্রণে বঞ্চিত ভৃত্যের কাজ বিফল হইয়া থাকে—যোগ্য তার উপযুক্ত সমাদর লাভ করে না।

কর্মীকে বঞ্চিত করিয়া যে দেশে মালিক লাভবান্ হয় সেখানে বৃত্তি নির্বাচন করিয়াও কর্মীকে দুর্ভোগ ও অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হইতে হয়। তবু সুপরিকল্পনার সহিত বৃত্তি নির্বাচন করিতে হইবে। কর্মী যে কোন প্রকার প্রতিকূল অবস্থারই চাপে পড়ুক না কেন তাহাকে ধীর, স্থির ও সংযত হইয়া জীবনযুদ্ধে জয়ী হইতে হইবে।

সংগ্রামই জীবন

এ সংসারে জীব যেমন জন্মে তেমনই সে বাঁচিয়া থাকিতে চাহে। এই বাঁচিয়া থাকিবার আগ্রহ তাহাকে কর্ম চেষ্টায় প্রবৃত্ত করে। যেখানে এই প্রকার আগ্রহ নাই সেখানে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ প্রাণী পূর্বে ধ্বংস হইয়াছে এখনও হইতেছে।

জীবনসংগ্রামে টিঁকিতে না পারিয়া জগতে কত অতিকায় প্রাণীও নির্মূল হইয়া গিয়াছে। জীবজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী বর্তমান মানবগোষ্ঠী যে আজ বাঁচিয়া আছে তাহার কারণ বাঁচিয়া থাকিবার জন্য তাহার অবিরাম চেষ্টা চলিয়াছে। এই বাঁচিয়া থাকিবার চেষ্টার নাম জীবনসংগ্রাম। পৃথিবীর জন্মের পর হইতেই মানুষ তাহার পারিপার্শ্বিক প্রকৃতিকে বশীভূত করিবার চেষ্টায় রত আছে।

শীতাতপের সঙ্গে সে যুগ যুগ ধরিয়া যুদ্ধ করিয়াছে, আহার সংগ্রহ করিয়াছে, ক্রমে ক্রমে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ করিয়াছে—এ সব হইয়াছে তাহার অবিরাম চেষ্টা বা সংগ্রামের ফলে। এই চেষ্টা না থাকিলে মানুষ আর পশুতে কোন ভেদ থাকিত না।

মনুষ্যের জয়যাত্রার পথে পৃথিবী হইয়াছে তাহার সংগ্রামস্থল। প্রকৃতির উপর জয়লাভের চেষ্টার আজও তাহার বিরাম হয় নাই। এখন সে গ্রহনক্ষত্রলোকে যাত্রার চেষ্টা পূর্ণভাবে চালাইতেছে।

মনুষ্য জাতির মানসিক জয়যাত্রারও সংগ্রাম চলিতেছে। যেখানে অন্যায়ভাবে প্রতিবেশী মানুষ আপনার স্বজাতিকে বিড়ম্বিত করিতেছে—সেখানে অত্যাচারিত মানুষ জগতে তাহারা ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যও মাথা তুলিতেছে। "তোমার গালে এক চপেটাঘাত করিলে তুমি অপরকে তোমার অন্য গাল বাড়াইয়া দিবে দ্বিতীয় চপেটাঘাতের জন্য'—এরূপ নীতি যাঁহারা জগতে প্রচার করিয়াছেন—তাঁহারা কেহই দুর্বল ছিলেন না। এ সাধনা সবল মানুষ করিতে পারে দুর্বল লোক পারে না।

আত্মবলে বলীয়ান্ মানুষই প্রেম দ্বারা অপরকে জয় করিতে পারে। দুর্বলকে সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে। সে চুপচাপ বসিয়া থাকিলে কোন ক্রমেই জীবনযুদ্ধে জগতে টিঁকিয়া থাকিতে পারিবে না।

প্রবল প্রতিকূল শক্তি তাহা প্রাকৃতিকই হউক বা অন্য জীবের নিকট হইতে আসুক না কেন, মানুষকে অবশ্যই উহা জয় করিতে হইবে। তাহা না করিলে তাহার অস্তিত্বই বিপন্ন হইবে। প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে গিয়া যদি কাহারও মৃত্যু আসে তাহাতেও দুঃখের কোন কারণ নাই—কেন না—সৎ কার্যে বা নিজের বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যে সংগ্রাম সে সংগ্রামে মৃত্যু হইলে জগতের উপর প্রভুত্বলাভ হইবে—"হতো বা প্রাপ স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্" (হত হইলে স্বর্গে যাইবে—জয়লাভ করিলে পৃথিবী ভোগ করিবে—ইহাই ভারতের সনাতন বাণী)। জীবনসংগ্রাম চালাইয়া গেলে কাহারও ঠকিবার আশঙ্কা নাই। আমাদের কর্মক্ষেত্র প্রকৃত পক্ষে যুদ্ধক্ষেত্র। 'সংসারসমরাঙ্গণে, যুদ্ধ কর প্রাণপণে'—কবির উক্তি প্রণিধানযোগ্য। লাভালাভ জয়পরাজয়কে তুল্যরূপে জ্ঞান করিয়া জীবনসংগ্রামে অগ্রসর হইতে হইবে। আলস্য ত্যাগ করিতে হইবে—জড়তাকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে 'তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব' (অতএব উঠিয়া দাঁড়াও। বিজয়ের যশ লাভ কর—(গীতা)। আমাদের সম্মুখে বিশাল

কর্মক্ষেত্রে পড়িয়া রহিয়াছে। যে চেষ্টা করিবে সেই সর্বপ্রকার সমৃদ্ধির অধিকারী হইবে। কাপুরুষেরাই দৈবের দোহাই দিয়া থাকে। ভারত কর্মভূমি। এখানে লোক জন্মে আত্মকল্যাণের কর্ম করিতে আর জগতের কল্যাণ করিতে। তাই যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবদ্গীতার বাণী শোনা আর অস্ত্রচালনা করা এদেশেই সম্ভব। জগতের অন্যত্র কোথাও উহা সম্ভব নহে।

গ্রামের হাট

অতি প্রাচীন কালে মানুষ নিজের প্রয়োজন মতো দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করিত। সে ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ—তাহার অভাববোধও ছিল অল্প। কালক্রমে তাহার অভাববোধ বাড়িতে লাগিল, সে উৎপাদনও বাড়াইতে লাগিল। কিন্তু একা মানুষ কত প্রকার জিনিস উৎপাদন করিবে? সে তাহার প্রতিবেশীর সহিত প্রয়োজন মতো দ্রব্য বিনিময় করিতে লাগিল। কিন্তু একা গ্রামের প্রতিবেশীর বাড়ি বাড়ি ঘোরা চলে না—তাই লোকে নির্দিষ্ট একটা জায়গায় বসিয়া প্রয়োজন মতো জিনিস বদলাইবার ব্যবস্থা করিল। জিনিস বদলাইবার যায়গার নাম হইল হাট। অভাব আরো বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন গ্রাম এবং দেশবিদেশ হইতে হাটে জিনিসপত্র আসিতে লাগিল এবং হাট হইতে উহা বাহিরে যাইতে লাগিল।

হাট জিনিস ক্রয়বিক্রয়ের স্থান। হাট বসিবার স্থান সাধারণতঃ কোন নদীর পাড়ে, বড় রাস্তার ধারে, রেল স্টেসন বা স্টীমার ঘাটের নিকটে হইয়া থাকে। রাস্তায় গোরুর গাড়ি, মোটর গাড়ি প্রভৃতিদ্বারা দূর হইতে জিনিসপত্র আসে। রেল স্টেশন বা স্টীমার স্টেশনের নিকটে গ্রামের বাজারে বা হাটে জিনিসপত্রও রেলগাড়ি বা স্টীমারদ্বারা আসে এবং সেখান হইতে দূর দূরান্তরে চলিয়া যায়। গ্রামের গৃহস্থ সাধারণতঃ তাহার উৎপন্ন দ্রব্য মাথায় করিয়া বা গোরুর গাড়িতে বোঝাই করিয়া হাটে যায়। হাট প্রতিদিন বসে না এবং সকল গ্রামে হাট নাই। কোন গ্রামে হাট সপ্তাহে একদিন বসে, কোন হাট বা সপ্তাহে দুই দিন বা তিন দিন বসে। দশ বারখানি গ্রামে একটি মাত্র হাট। হাটের দিন গ্রামবাসীদের অত্যন্ত ব্যস্ত দিন। এক দিনে নিজের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইবে এবং সপ্তাহের প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে—তাহা না হইলে সারা সপ্তাহ ধরিয়া কষ্ট পাইতে হইবে। তাই গ্রামের কৃষক হাটের দিন দুপুর পর্যন্ত কাজ করে। তার পর হাটে চলিয়া যায়।—কামার, কুমার, ময়রা, মুদি—সকলেই সাধারণতঃ দৈনিক কাজ ফেলিয়া বেচাকেনার জন্য হাটের দিকে রওনা হয়। হাট আরম্ভ হইবার অনেক আগেই বিক্রেতারা যে যাহার জিনিসের পসরা মাথায় করিয়া হাটে উপস্থিত হয়, কেহ কেহ গাড়িতে বা নৌকায় মাল লইয়া আসে।

হাটে সাধারণতঃ ছোট ছোট সারি সারি দোচালা ঘরে দোকান বসে। যাহারা চালা ঘর সংগ্রহ করিতে পারে না, তাহারা বাহিরের খোলা যায়গায় বেচাকেনা করে।

হাটের কোন অংশে কুমার শত শত হাড়ি কলসী সাজাইয়া বসিয়া আছে ; আজকাল এ্যালুমিনিয়মের বাসন পাওয়া গেলেও সস্তা দামের হাড়ি কলসীর চাহিদা গ্রামে বেশি—কারণ সেখানে পয়সাওয়ালা লোকের সংখ্যা কম। কোনও স্থানে হয়তো ছাতা, বেড়ি, কাস্তে, কোদাল, দা, লাঙ্গলের ফাল সাজাইয়া কামার দোকান করিয়া বসিয়া আছে। ক্রেতার নিকট ঐ সব বিক্রয় করিতেছে আর অনেকের নিকট হইতে ভাল জিনিসের ফরমাইস লইতেছে। তরিতরকারির দোকানে, পটোল, কুমড়া, শশা, ঝিঙ্গা, কচু, কাচকলা, বেগুন, আলু ও শাক উঠিয়াছে

সবচেয়ে বেশি ভিড় মাছের দোকানগুলিতে। সেখানে গোলমাল আর দরকষাকষির অন্ত নাই। বাঙালী মাছ ভাত খাইতে ভালবাসে। ধানচালের দর বাঁধা—সেখানে দরকষাকষির বিশেষ কোন কারণ নাই। অনেক যায়গায় মাছ ওজনদরে বিক্রয় হয় না—তাই দরাদরি মাছের বাজারের বৈশিষ্ট্য।

ইহার পর ধান চালের বাজার। কৃষকেরা যে যার ঘরের উদ্বৃত্ত ধান চাল, কলাই, ডাল লইয়া হাটে আসে। উহা বিক্রয় করিয়া তাহারা তাহাদের সপ্তাহের দরকারী জিনিস কেনে। ইহা ছাড়া স্থানীয় বা শহরের আড়তদারেরা আসে। তাহারা ধান চাল বেশি পরিমাণে বিক্রয় করে এবং অল্পদরে শস্য খরিদ করিয়া মজুদ করে। শস্যের আড়তে গেলেই লোকের কেনাবেচার ভিড় দেখা যায় আর শস্য মাপার 'রামে রাম'—শব্দ শুনা যায়। দোচালা ঘরগুলিতে সাধারণতঃ ছোট বড় মাঝারি মণিহারী দোকান, কাপড়ের দোকান বসে। কাপড়ের দোকানে স্থানীয় তন্তুবায়দের নিজের তাঁতের গামছা, কাপড়, আর বাহিরের ব্যাপারীদের মিলের ও তাঁতের কাপড় বিক্রয় হয়। কোন কোন চালাঘরে মুদি দোকান, গুড়বাতাসার দোকান বসে। খৈ, মুড়ি, চিড়ার দোকান সাধারণতঃ বাহিরের খোলা যায়গায় দেখা যায়।

হাটে বহু গ্রামের লোক একত্র হয় বলিয়া সেখানে ঢোল পিটাইয়া সভাসমিতির খবর দেওয়া, দেশের সাধারণ নির্বাচনের সময়ে বিজ্ঞাপন বিলি করা হয়। কোন কোন হাটে প্রার্থীরা সভা করিয়া নিজেদের ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি নির্বাচকগণকে জানায়। ইহা ছাড়া গ্রামের হাটে ম্যাজিকওয়ালা, গ্রাম্য বাজীকর প্রভৃতিরা আসিয়া খেলা দেখাইয়া পয়সা রোজগার করে। ঔষধের প্রচারকরা নানা রকম সঙ্ সাজিয়া খেলা দেখাইয়া ঔষধের প্রচার করে।

বাউল, বৈষ্ণব, ফকির প্রভৃতিকে হাটে মেলায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা গান শোনায় ও ভিক্ষা করে। হাট যেমন রোজগারের যায়গা, বিকিকিনির যায়গা, প্রচারের যায়গা—তেমনি দুষ্ট লোকের হাতে সাধু ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্ত হইবার যায়গা। লোকজনের ভিড়ের মধ্যে ইহারা সাধারণ গৃহস্থের বেশে ঘুরিয়া অপরের টাকাকড়ি আত্মসাৎ করে।

সন্ধ্যার পূর্বেই ক্রেতারা হাট হইতে বাড়ি ফিরিবার চেষ্টা করে—বেলাবেলি যাহাতে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছিতে পারে তাহারই জন্য এই চেষ্টা। কিন্তু বড় মহাজন বা আড়তদারগণের ফিরিতে অনেক বিলম্ব হয়। লোকজন চলিয়া গেলে হাটে অসীম শূন্যতা বিরাজ করে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা

মানুষকে জগতে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। এখানে কেহ মরিবার জন্য আসে নাই। জীবনধারণ করিতে হইলে সকলের আহারের সংস্থান করা চাই। সুতরাং এরূপ কোন বৃত্তি অবলম্বন করা প্রয়োজন যাহা দ্বারা অন্ন সংস্থান সহজলভ্য হয়। আমাদের শিক্ষাও তদনুরূপ হওয়া চাই। জগতে যাহাদের পূর্বপুরুষের সঞ্চিত সম্পত্তি আছে—তাহাদের পক্ষে অবশ্য বৃত্তি শিক্ষার কোন প্রশ্ন উঠে না।

অতি প্রাচীন কালে প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট বৃত্তি ছিল। পুরুষানুক্রমে সেই সেই বৃত্তি বিষয়ে লোকে নিজ পরিবারে শিক্ষালাভ করিয়া বা অন্য লোকের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব জাতিগত ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিত। বৃত্তির সংখ্যাও বৈদিক যুগে নিতান্ত কম ছিল না। সে সময়কার জ্ঞানী, যোদ্ধা, বণিক্ ও শ্রমিক ছাড়াও অসংখ্য বিশেষ বিশেষ বৃত্তি গ্রহণকারী লোকের খবর আমরা পাই। বর্তমান যুগে লোক-সংখ্যার বৃদ্ধির ফলে মানুষের কর্মক্ষেত্রের প্রসার হইয়াছে। সভ্যতার অগ্রগতির জন্য লোকের বৃত্তির সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ক্রমবর্ধমান বৃত্তির সংখ্যা ও বেকারের সংখ্যার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য না থাকায় বেকারের সংখ্যা ক্রমাগতই বাড়িতেছে। এ বেকারের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রধান উপায় বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা এবং উহার প্রসার।

আমাদের দেশে ইংরেজ শাসনের আমল হইতে পুঁথিগত বিদ্যার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ইংরেজ তাহার রাজকার্য পরিচালনার জন্য কিছু শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিল। তাই তাহার শিক্ষাবিধিতে বৃত্তি সংস্থানের কোন ব্যবস্থা ছিল না। আগেকার দিনে ইংরেজী বিদ্যালয়ে অল্প লেখা-পড়ায় লোকে জীবিকা অর্জন করিতে পারিত। বেশি লেখাপড়া শিখিলে ইংরেজ সরকারের অধীনে বড় চাকুরি জুটিত। ফলে বড় চাকুরির লোভে লোকে উচ্চ শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে লাগিল। এ শিক্ষায় চাকুরি ছাড়া অন্য কোন বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা প্রথম যুগে বিশেষ কিছু ছিল না। ক্রমে আইন, চিকিৎসা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা শিক্ষারও ব্যবস্থা হইল। এক আইন ব্যতীত চিকিৎসা ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা শিক্ষিতে যে অর্থ ব্যয় হইত তাহার জন্য ইহার সুযোগ গ্রহণ করা মুষ্টিমেয় লোক ব্যতীত অপর কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হইত না।

ক্রমে ক্রমে আইন ও ডাক্তারি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রও সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। তাহার ফলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও ক্রমাগত বাড়িতে লাগিল। একদিকে লোক উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া বেকারের সংখ্যা বাড়াইতে লাগিল, অপর

দিকে দেশের অধিকাংশ লোক বৃত্তি শিক্ষার অভাবে পাশ্চাত্ত্য উন্নত জাতির সহিত শিল্পে প্রতিযোগিতা করিতে পারিল না। দেশের শিল্পবাণিজ্য ধ্বংস হইতে বসিল।

সমাজের সকল স্তরের মানুষের জন্য উচ্চ শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। যাঁহারা শিক্ষা বিস্তার, গবেষণা, জ্ঞানের সীমা বাড়াইতে রত থাকিবেন বা উচ্চতর কর্মে লিপ্ত হইবেন তাঁহাদের জন্য উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন আছে। যোগ্যতা, প্রয়োজন অপ্রয়োজনের কথা না ভাবিয়া নির্বিচারে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের যে কুফল অবশ্যম্ভাবী তাহা আমাদের সমাজে দেখা দিয়াছে। তাই চাই শিক্ষা ব্যবস্থার সুপরিকল্পনা।

পাশ্চাত্ত্য দেশে যেরূপ নিম্নতর বৃত্তিমূলক শিক্ষালয় আছে আমাদের দেশে সেরূপ নিম্নতর বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাই। একজন শিক্ষিত শিল্পী বা শ্রমিকের সঙ্গে একজন অশিক্ষিত শিল্পী বা শ্রমিক প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে না। সর্ব বিষয়ে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষার একটা মূল্য আছে। কর্মকৌশল ও কর্মদক্ষতা কর্মীর পক্ষে তখনই আয়ত্তের মধ্যে আসে যখন সে সুশৃঙ্খলভাবে নিজ কার্য শিখিয়া লয়। যে দেশে নিম্নতর বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব সেখানে দক্ষ শিল্পী বা শ্রমিক আশা করা বৃথা।

এ দেশে অধিকাংশ লোক কৃষিব্যবসায়ী। সকল লোকের চাষ করিবার মত জমি নাই। কৃষিকার্য করিয়া বছরে কৃষককে অনেক সময় বিনা কাজে কাটাইতে হয়। বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলে উদ্বৃত্ত সময় কৃষক শিল্প নির্মাণে ব্যয় করিতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে তাহা ঘটিয়া উঠিতেছে না। ফলে দেশ ক্রমশঃ দারিদ্র্যের সম্মুখীন হইতেছে।

দেশে লোকবল আছে, কিন্তু সে লোকবলকে বৃত্তিমূলক শিক্ষার অভাবে ব্যবহার করা যাইতেছে না। সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ দূরে চলিয়া যাইতেছে।

যাহাদের আর্থিক, শারীরিক এবং মানসিক সামর্থ্য আছে তাহারা ইঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি উচ্চতর বৃত্তিশিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করিবে। শিক্ষার্থীর অনুপাতে আমাদের দেশে এরূপ প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা রহিয়াছে। ইহাকে বাড়াইতে হইবে।

নিম্নতর বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিলে দেশের বৃহত্তর জনসংখ্যা ইহার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে। ক্ষুদ্র শিল্প শিক্ষা এবং কারিগরী শিক্ষার প্রসার বাঞ্ছনীয়। বৃহত্তর শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ার পক্ষে যতটা অন্তরায় আছে ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ার পক্ষে ততটা অন্তরায় নাই—বিশেষতঃ ইহাতে অল্প মূলধনে কাজ চলিতে পারে। ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। চিত্রবিদ্যা, খেলনা তৈয়ারি, ফাউনটেন পেন তৈয়ারি, বোতাম তৈয়ারি, গেঞ্জী তৈয়ারি, আসন তৈয়ারি, কম্বল তৈয়ারি প্রভৃতি অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প রহিয়াছে। এই সবের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা থাকা চাই।

শিক্ষা বিষয়ক কেন্দ্রীয় পরামর্শ সমিতি বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের প্রস্তাব

করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় ব্যাবহারিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। সর্বার্থসাধক বা বহুমুখী বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার সহিত বৃত্তিমূলক শিক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহার সুবিধা এই ভবিষ্যতে যাঁহারা বৃত্তিমূলক শিক্ষায় পারদর্শী হইতে চাহেন সেই সকল বিদ্যার্থীর পক্ষে এই শিক্ষা তাঁহাদের সহায়ক হইবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার সহিত মিলাইতে না পারিলে সাধারণ শিক্ষা চিরকালের জন্যই পঙ্গু থাকিয়া যাইবে। সুখের বিষয় দেশবাসী এ বিষয়ে সচেতন হইয়াছেন।

বাংলার লোকসাহিত্য

গত দেড়শত বৎসরে আমাদের বাংলা দেশে যে সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে তাহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কলাকৌশল প্রভাবিত সাহিত্য। ইহাতে সাধারণ জনগণের কোন দান নাই। এ সাহিত্যের স্রষ্টা এবং পাঠক দেশের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায়।

পৃথিবীর অন্য দেশের মতো আমাদের দেশেও জনসাধারণ প্রাচীন কাল হইতেই তাহাদের অকৃত্রিম ভাষায় যে সাহিত্য রচনা করে তাহাকে 'লোকসাহিত্য' বলে। বাংলা ভাষার আদি যুগ হইতেই ডাকখনার বচন, শিশুসাহিত্য, ব্রতকথা, পল্লীর সুখদুঃখের কাহিনী, নানা দেবদেবীর মাহাত্ম্যমূলক কাব্য-কাহিনী, ধর্মতত্ত্ব প্রকাশ, কথকতা, যাত্রা প্রভৃতি বিভিন্নরূপে এই লোকসাহিত্য রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ইহার স্রষ্টা ও ভোক্তা জনসাধারণ—ইহার মধ্যে তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার চিরন্তন কাহিনী বর্তমান রহিয়াছে।

ডাকখনার বচনে বহুকালের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের ফল আমরা পাই। কখন কি অবস্থায় বৃষ্টি আসিবে, সময় অনুযায়ী বৃষ্টির সুফল বা কুফল, ডাকখনার বচন দেশের লোককে জানাইয়া দিয়া থাকে। শিশুদিগের মনোরঞ্জনের জন্য অন্য দেশের মত আমাদের দেশেও আয়োজনের অভাব নাই। ছেলেদের 'ঘুমপাড়ানী গান'—'ছেলেভুলান ছড়া'—অসংখ্য রূপকথা শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া কিশোর-কিশোরী পর্যন্ত পল্লীর অধিবাসীকে তৃপ্ত করিয়া আসিতেছে।

লোকসাহিত্য হিসাবে ব্রতকথার গুরুত্বও কম নহে। বাঙালীর জীবনধারায় নারীর ব্রত উদ্‌যাপন একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। বছরে এমন দিন খুব কম আছে যে দিন কোন না কোন ব্রত অনুষ্ঠিত হয় না। মঙ্গলচণ্ডী, লক্ষ্মী, শুভচনী, পুণ্যিপুকুর, গোকুলব্রত, বারমাসে তের ষষ্ঠীব্রত, পূর্ববঙ্গে উদ্ধার চণ্ডী, সঙ্কটা, বনদুর্গা, বঙ্গের সর্বত্র কার্তিকব্রত, সাবিত্রীব্রত, সীতানবমীব্রত প্রভৃতি অসংখ্য ব্রতের সহিত সংশ্লিষ্ট কথাধারা লোকসাহিত্যের একটা দিক পূর্ণ রহিয়াছে। এই সব গল্পের মধ্যে লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখদুঃখ, ত্যাগতপস্যা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই সব গল্প ব্রতের পর শুনাইয়া থাকেন কোন বর্ষীয়সী

মহিলা—আর নির্বাক্ বিস্ময়ে শোনে পল্লীর নারীরা। ইহার মধ্যে তাহারা খুঁজিয়া পায় যার যার ঘরের কথা—যার যার জীবনের আদর্শ।

পল্লীর সাধারণ ঘর ও বড ঘরের কথা লইয়া বহুসংখ্যক গীতিকবিতার পালা রচিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ময়মনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। সাধারণ লোকের নিত্য ব্যবহৃত সরল অনাড়ম্বর ভাষায় লোকের সুখদুঃখ প্রেমবিরহের কাহিনী এই সব গীতিকবিতাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি মূল লোকসাহিত্য হিসাবে বহুকাল ধরিয়া চলিয়াছে—তাহার পর উহারা কাব্যাকার পরিগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

বাংলার উমাসংগীত, শ্যামাসংগীত, বাউল সংগীত, জারিগান, মুর্শিদাগান, গাজীর গীত, ঘাটুগান, তর্জাগান, সারি গান, ভাসান গান, 'শিবের গাজন গান' প্রভৃতি অলিখিত অসংখ্য গান বহুকাল হইতে একদিকে লোকের মনোরঞ্জন অপর-দিকে তাহাদের ধর্ম জিজ্ঞাসাকে তৃপ্ত করিয়া আসিতেছে।

ইহা ছাড়া সর্বসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য যাত্রা, কবির লড়াই বা কবিগান, পাঁচালী গান, হাফআখড়াই উৎসবাদিতে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। বাংলার লোকসাহিত্য বাঙালীর অন্তরের বস্তু। ইহার মধ্যে আমরা খাঁটি বাঙালীর হৃদয় খুঁজিয়া পাই। উচ্চস্তরের কবি-কল্পনার ঐশ্বর্য এই সাহিত্যে না থাকিলেও স্থানে স্থানে সাধারণ গ্রাম্য কবি ও তাঁহার চিন্তাধারার উৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছেন।

রোগীর সেবা

মানুষের শরীরে নানা রোগের বাস। এমন মানুষ সম্ভবতঃ জগতে নাই যাহার কোনদিন অসুখ হয় নাই। অসুখ কাহারও কম হয়, কাহারও হয় বেশি। অসুস্থ অবস্থায় যে ব্যক্তি নিজের কাজ চালাইয়া যাইতে পারে, তাহাকে আমরা সাধারণতঃ রোগীর পর্যায়ে ফেলি না। তাহার কোনও সেবারও প্রয়োজন নাই। মানুষ অসুস্থ অবস্থায় যখন শক্তিহীন হইয়া পড়ে তখনও তাহাকে অপরের উপর নির্ভর করিতে হয়। তাহার অসুবিধাগুলি দূর না করিতে পারিলে তাহাকে রোগের প্রকোপে পৃথিবী ছাড়িতে হইবে। তাই চাই তাহার সেবা। এ সেবা করিবে তাহার দরদী লোকেরা। শুধু হাতে সেবা হয় না—সেবা করিতে হয় প্রাণ দিয়া। রোগীর সেবার ঔষধপথ্য খাওয়ান হইতে আরম্ভ করিয়া তাহাকে সর্বপ্রকারে আরামে রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। রোগীকে আরামে রাখিতে হইলে তাহার সেবার পদ্ধতি জানা দরকার। অসুস্থ অবস্থায় রোগী অনেক ক্ষেত্রে শিশুর মত ব্যবহার করে, তাহার আচারব্যবহারে কোন সঙ্গতি বা যুক্তি থাকে না। সে অপথ্য কুপথ্য করিতে চায়, চিকিৎসকের নিষেধ অমান্য করে, শয়নস্থান ত্যাগ করে, ক্রমাগত ঔষধ খাইতে খাইতে বিরক্ত হইয়া অবশেষে ঔষধ গ্রহণে অস্বীকার করে। এরূপ অবস্থায় সেবক বা সেবিকাকে রোগীর

মনোবৃত্তি বুঝিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে বশে আনিতে হইবে। তাহাকে অত্যাচার বা উৎপীড়ন করিলে কুফল হইবে। রোগীর মনস্তত্ত্ব যাহারা বোঝে না, তাহারা এইরূপ সেবাকার্য করিবার যোগ্য নহে।

মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান ছাড়া সেবকের চাই ধৈর্য এবং আত্মসংযম। সেবকের মনোবল দৃঢ় না হইলে দিনের পর দিন কেহ রোগীব শয্যার পাশে থাকিয়া সেবা করিতে পারে না। রোগীর আসন্ন মৃত্যুর মুখে তাহাকে সেবা করা যে কি কঠিন ব্যাপার তাহা ভুক্তভোগীমাত্রেই জানে।

রোগীর সেবায় সেবকেব শুধু ধৈর্য সংযম থাকিলেই চলিবে না। এখানে চাই গুরুতর দায়িত্ববোধ। রোগীর সেবককে মানুষের জীবনমৃত্যুর দায়িত্ব লইয়া কাজ করিতে হইবে। উপযুক্ত সময়ে চিকিৎসকের নিকট রোগীর অবস্থার খবর না জানাইবার ফলে রোগী অনেক সময়ে তাহার শেষ চিকিৎসার সুযোগটুকু লাভে বঞ্চিত হয়। তাই রোগীর অবস্থার উন্নতি বা অবনতি সদা জাগ্রত দৃষ্টি দিয়া সেবককে পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে।

রোগী নিজ গৃহে চিকিৎসিত হইবার সময়ে তাহার আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব তাহার সেবা করিতে পারে। সেখানে প্রাণের স্পর্শ তো আছেই, তবে সেবককে রোগ পরিচর্যার প্রণালী সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে।

গৃহের রোগীকে সেবা করিবার ভার অনেক সময়ে স্থানীয় সেবা প্রতিষ্ঠানের কর্মীরাও গ্রহণ করিতে পারে। তাহারা অবশ্য রোগীর পরিচর্যা বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। এই সেবাকার্য যে কেহ গ্রহণ করুক না কেন, রোগী পরিচর্যায় সকল প্রকার বিধিনিষেধ সেবককে অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে পালন করিতে হইবে। ঔষধ সেবন অপেক্ষা পরিচর্যার গুরুত্ব কোন দিক দিয়াই কম নহে। অনেকক্ষেত্রে ভাল পরিচর্যার ফলে ঔষধের গুরুত্ব কমিয়া যায়, আর ত্রুটিযুক্ত সেবায় ঔষধে ভাল ফল পাওয়া যায় না।

ইহা ছাড়া সর্বসাধারণের চিকিৎসালয়ে রোগীর চিকিৎসা ও পরিচর্যার ভার লওয়া হইয়া থাকে। যে সব প্রতিষ্ঠান সর্বসাধারণের সেবায় নিযুক্ত থাকে উহারা সরকারীই হউক আর বেসরকারীই হউক, সেখানকার কাজ কতকটা যন্ত্রের কাজের মতন চলিবে। এই কারণে আমাদের দেশে সর্বসাধারণের মধ্যে এক প্রকারের ভীতি আছে। উহা হইতেছে হাসপাতালে গেলে লোকে নাকি সশরীরে গৃহে ফিরিয়া আসিতে পারে না। ইহার কারণ হয়তো এইসব প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের নির্লিপ্ততা। শুনা যায় বিদেশের কোন হাসপাতালে একবার চিকিৎসিত হইবার জন্য গেলে রোগমুক্তির পর সেখান হইতে গৃহে ফিরিতে ইচ্ছা হয় না। আমাদের দেশ সকল বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশের মত উন্নত হয় নাই। কিন্তু তাহা না হইলেও আমরা আমাদের মনোবৃত্তির পরিবর্তন করিতে পারি। যে কাজই আমরা করি না কেন সেই কাজকে নিজের কাজ মনে করিলে আর কোন অসুবিধা থাকে না। সর্বক্ষেত্রে আমাদের মনোবৃত্তির পরিবর্তন আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

আমাদের অর্থের অভাবই একমাত্র অভাব নহে। ইহা অপেক্ষা গুরুতর অভাব হইতেছে মনের দীনতা: মনের দুর্বলতাকে সর্বাগ্রে দূর করা দরকার। তাহা না করিলে নিজের কাছেই আমাদের নিজের গ্লানি উপস্থিত হইবে।

সেবাধর্ম

সেবাধর্ম হইতেছে সেবারূপ কর্তব্য করা। ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক জীবনে সেবার মতো আর কোন ধর্ম নাই।

সংসারে সকলেই প্রভুত্ব করিতে চায়—কেহই সেবক হইতে চাহে না। সেবাকার্যে সেব্য ও সেবক দুইজনেই উপকৃত হয়, অতএব সেবা হেয় কার্য নহে। ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পরের উপকারক। ব্যক্তি সমাজের কাছে নানা ভাবে ঋণী—তাহার অভাবঅভিযোগ, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অনেকটা সমাজ গড়িয়া থাকে। আহার্য উৎপাদন, সামাজিক নিরাপত্তাবিধান প্রভৃতি সর্বপ্রকার সহযোগিতা মানুষ তাহার সমশ্রেণীর মানুষের নিকট পাইয়া থাকে। প্রতিদানে মানুষকে সেবা করিয়া নিজ নিজ ঋণের বোঝা হালকা করিতে হয়। সেবায় প্রকৃতপক্ষে লোকের নিজের গৌরবই বৃদ্ধি হয়। অধিকন্তু ইহাদ্বারা সেব্য ব্যক্তির বা সমাজের তুষ্টিসাধনও হইয়া থাকে। এখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে শুধু উপদেশে সেবা হয় না—সেবায় প্রাণের স্পর্শ থাকা চাই।

দরদভরা হৃদয় লইয়া যেখানে সেবা করা হয়—সেইখানেই সেবা হয় জীবন্ত। প্রাণের দরদ না থাকিলে সেবা ছলনামাত্র।

পূজ্য ব্যক্তির প্রীতি উৎপাদন সেবার অন্যতম উদ্দেশ্য। সেবক এখানে সেবা-দ্বারা আত্মোন্নতি বিধান করেন। পূজ্য ব্যক্তির সেবায় চাই ভক্তি, বিশ্বাস এবং একাগ্রতা। এই কয়টি গুণ থাকিলে মানুষ জীবনের উচ্চস্তরে আরোহণ করিতে পারে। পূজ্যের সেবায় সেবক নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে বিলোপ করিয়া থাকেন। সকল সময়েই তৃপ্তি ছাড়া পূজকের আর কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে না।

সেবার তুল্য আত্মত্যাগ সংসারে আর নাই। নিজে দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়া অপর ব্যক্তিকে, দেশকে, সমাজকে সেবা করা অত্যন্ত কঠিন কার্য। এই কঠিন কার্যে ব্রতী ব্যক্তি সাধারণ মানুষ অপেক্ষা অনেক উঁচুদরের লোক। প্রকৃত সেবক সংসারে মেলা ভার।

সেবায় জাতি, বর্ণ ও ধর্মের কোন ভেদ থাকিবে না। সকল মানুষের সেবাই দেবতার সেবা। দেবতা শুধু মানুষ নহে সর্বভূতেই বিরাজমান। মানুষকে দেবতা জ্ঞানে সেবা করিলে ছোটবড়র ভেদ দূর হইয়া থাকে। 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' জীবে প্রেম ঈশ্বর সেবা ছাড়া আর কিছুই নহে। এইরূপ ভাবনাদ্বারা সেবা সর্বজনের হিতকর বলিয়া মনে হয়।

সেবাদ্বারা মানুষকে সম্মানিত করিলে নির্যাতিত ও অধঃপতিতের সহিত একাত্মবোধ সম্ভবপর হইতে পারে। সেবাতে শ্রদ্ধা চাই, মমতা চাই। তাহা না

হইলে সেবা অনুকম্পার দানে পর্যবসিত হয়। সেব্যব্যক্তি ইহাতে ছোট হইয়া পড়ে। অনুকম্পার দানে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই ক্ষতি হয়। ইহাতে দাতার মধ্যে অযথা অহংকার উৎপন্ন হয়, আর গ্রহীতা নিজেকে অপরের কৃপার পাত্র মনে করে। কিন্তু সেবা কাহাকেও ছোট করে না বরং প্রেমের স্পর্শে গ্রহীতাকে বড় করিয়া থাকে।

সংসারে সকলেরই বড় হওয়া উচিত। সেবাদ্বারাই এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা যাইতে পারে।

স্বাবলম্বন

সকল কাজে নিজের উপর নির্ভর করার নাম স্বাবলম্বন। নিজের কাজ নিজে যতটুকু করিতে পারা যায় তাহা সকলেরই করা উচিত। সংসারে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে স্বাবলম্বন নিতান্ত দরকার। ভূ-পৃষ্ঠে মানুষের যেদিন প্রথম আবির্ভাব সেই দিন হইতে আজ পর্যন্ত মানুষ যে সকল উন্নতি করিয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে মনুষ্যজাতির আত্মনির্ভরশীলতা। আত্মনির্ভরশীলতা ছাড়া পৃথিবীতে মানুষ টি কিয়া থাকিতে পারে না। নিজের বাঁচিবার জন্য যে প্রচেষ্টা তাহাতেও রহিয়াছে আত্মনির্ভরশীলতা।

বিশ্বপ্রকৃতিতে মানুষের প্রয়োজনীয় সব কিছু আছে। মানুষ উহা হইতে নিজের চেষ্টায় আপনার প্রয়োজনমত বস্তু আহরণ করিবে। অপর কোন প্রাণী তাহাকে বাঁচাইতে পারে না। মনুষ্যজাতির যে অংশ ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে তাহার নাশের কারণ আত্মপ্রচেষ্টার অভাব।

মানুষের আত্মবিশ্বাস এবং আত্মশক্তি ছাড়া বড় হইবার অন্য কোন উপায় নাই।

যে ব্যক্তি স্বাবলম্বী নহে সে নিজের অন্তর্নিহিত শক্তি হারাইয়া দুর্বল হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে শক্তির অনুশীলনদ্বারাই শক্তি বর্ধিত হয়।

গৃহই মনুষ্যের শিক্ষার প্রধান স্থান। মনুষ্যচরিত্রও এইখানেই গঠিত হয়। যে বাড়ির ছেলেমেয়েরা নিজের হাতে কিছু করিতে শেখে না তাহাদের জীবনে দুঃখের অবধি থাকে না। সকল কাজেই যেখানে ছোটদের জন্য বড়দের সাহায্য আসে সেখানে ছেলেমেয়েরা অলস এবং অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। এই সকল স্থলে অভিভাবকের দায়িত্বহীনতাই ছেলেদের অধঃপতনের কারণ। অতিরিক্ত স্নেহ বা আদরের ফলে ছেলেরা অকর্মণ্য হইয়া থাকে। বহির্বিশ্বে নূতন কিছু করিবার কথা দূরে থাকুক ইহারা নিজেদের জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য সামান্য কাজেও অক্ষম হইয়া পড়ে। যদি জগতে আত্মোন্নতি সাধন করিতে হয় তবে আয়াসপ্রিয়তা ত্যাগ করিয়া স্বাবলম্বী হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নাই। বাল্যকাল হইতেই নিজের শক্তির উপর সকলেরই বিশ্বাস রাখা দরকার।

সর্বপ্রকার কর্মক্ষেত্রের নায়ক যাঁহারা তাঁহাদের উচিত অনুগামিগণকে স্বাবলম্বন শিক্ষা দেওয়া। শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রের স্বাবলম্বনের জন্য যতটুকু সাহায্য প্রয়োজন শিক্ষকগণ তাহার অধিক সাহায্য ছাত্রগণকে দিবেন না। যদি তাঁহারা অধিক

সাহায্য দেন তবে ছাত্রের স্বাধীন চিন্তাশক্তি ব্যাহত হইবে। এই জন্যই কোন চিন্তাশীল শিক্ষাবিৎ বলিয়াছেন 'অলস শিক্ষক হইতেছেন সর্বোত্তম শিক্ষক'। ইহার তাৎপর্য ছাত্রগণের নিকট হইতে যিনি বেশি কাজ বা সব কাজ আদায় করিয়া লইতে পারেন তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। তিনিই শ্রেষ্ঠ সেনাপতি যিনি তাঁহার স্থান অধিকার করিবার উপযুক্ত অনুগামী তৈয়ারি করিয়াছেন। পিতার জীবদ্দশাতেই পুত্রকে সংসার পরিচালনার দায়িত্ব দিলে সুফল ফলিবে।

যাহারা উদ্যমহীন হইয়া শুধু দৈবের উপর নির্ভর করে তাহারা কাপুরুষ। জগতে এরূপ লোকের কোন স্থান নাই।

ধনীর গৃহে মানুষ জন্মগ্রহণ করুক আর দরিদ্রের গৃহেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন—সকলকেই আত্মনির্ভরশীল হইতে হইবে।—কাহারও পূর্বপুরুষের সঞ্চিত অর্থ থাকিলেও অলসতা ও অকর্মণ্যতার ফলে উহা নষ্ট হইবে। দরিদ্রের ঘরে যে জন্মিয়াছে তাহার আত্মনির্ভরশীলতা ব্যতীত সংসারে টিঁকিয়া থাকাই অসম্ভব।

দেশের সমাজনেতা, ধর্মনেতা, রাষ্ট্রনেতা, জ্ঞাননায়ক, অর্থপতি—সকলেই স্বাবলম্বন দ্বারাই উন্নতি লাভ করিয়াছেন।

মিতব্যয়িতা

প্রয়োজন বা সামর্থ্যের অনুরূপ ব্যয়কে মিতব্যয়িতা বলা হয়। জীবনযাত্রা নির্বাহে মিতব্যয়িতার মত উপকারক আর কোন গুণ নাই। আয়ের অনুরূপ লোকের ব্যয় করা উচিত।

মানুষ তাহার অতীতের হিসাব করে না, কারণ—অতীত চলিয়া গিয়াছে, সে কখনও ফিরিবে না বা অতীত অনেকের জীবনে শুধু দুঃখেরই স্মৃতি বহন করে। কিন্তু বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে কাহারও উপেক্ষা করা চলে না। বর্তমানে লোকের জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে অর্থের সদা প্রয়োজন—সে অর্থ সংগ্রহের জন্য মানুষের উদ্যমেরও বিরাম নাই। অর্থাগম হইতেছে উহার ব্যয়ও হইতেছে। কিন্তু সঞ্চয় কিছু হইতেছে না। আজ অর্থাগম হইতেছে সত্য, ভবিষ্যতে এরূপ নাও হইতে পারে—তখনকার জন্য অর্থের ব্যবস্থা পূর্বেই করিতে হইবে।

কিন্তু উপার্জনের সবই যদি ব্যয়িত হয় তবে লোককে ভবিষ্যদ্‌জীবনে কষ্টে পড়িতে হয়। লোকে বার্ধক্যে কর্মশক্তি হারায়। বার্ধক্যের জন্য সঞ্চয় আবশ্যক। আর আকস্মিক বিপদের জন্য সঞ্চয়ের প্রয়োজন কেহই অস্বীকার করে না। অর্থ সঞ্চয় করিতে হইলে হিসাব করিয়া খরচ করিতে হয়। মিতব্যয়িতা ছাড়া সঞ্চয় সম্ভবপর নহে।

অনেক লোকের হাতে টাকা পড়িলে তাহারা মনে করিয়া থাকে—হাতে টাকা আসিয়াছে—খরচ করিতে হইবে—নিজে কষ্ট করিয়া থাকিয়া কেন টাকা জমাইব। যতদিন বাঁচিয়া আছি আত্মসুখের জন্য অর্থ ব্যয় করিব। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যখন সব শেষ হয় তখন কোন প্রকার সুখ বাদ দেওয়া উচিত নহে।

নিজের ভবিষ্যতের জন্য যেমন মিতব্যয়িতা দরকার তেমনই নিজের সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষা এবং ভরণপোষণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা চাই। ইহা করিতে হইলে মিতব্যয়িতা দরকার। নিজের স্ত্রীপুত্র পরিবারের ভরণপোষণ যেমন দরকার সামাজিক কাজেও তেমনি মানুষের কিছু অর্থ ব্যয় করা উচিত।

মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিক সুখদুঃখের সহিত তাহারা ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত। মনুষ্য-সমাজের নিকট উপকার গ্রহণ সকল মানুষকেই করিতে হয়। প্রত্যুপকারস্বরূপ সকলেরই কিছু না কিছু সামাজিক কাজ করা কর্তব্য। সমাজের কল্যাণের জন্য কাজ করিতে গেলে উদ্বৃত্ত অর্থদ্বারা করিতে হইবে। মিতব্যয়িতা অভ্যাস না করিলে অর্থ বাঁচান সম্ভবপর নহে।

অনেকে মিতব্যয়িতাকে কার্পণ্যের পর্যায়ে ফেলেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মিতব্যয়িতা কার্পণ্য নহে। কৃপণের সঞ্চয়েই আনন্দ। সঞ্চিত অর্থের সামান্য অংশ ব্যয় করিতেও তাহার অত্যন্ত দুঃখ বোধ হয়। ঘরে প্রচুর অর্থ থাকিতেও কৃপণ বিনা খাদ্যে বিনা চিকিৎসায় মরে। কৃপণের হৃদয় হয় অত্যন্ত সংকীর্ণ। সেখানে উদারতার কোন স্থান নাই।

মিতব্যয়ীর হৃদয় সংকীর্ণ নহে—সে হিসাব করিয়া বুঝিয়া সুঝিয়া প্রয়োজনীয় ব্যয় করে। সে প্রত্যেক কাজে অত্যন্ত সতর্ক। এই সতর্কতার ফলে সে নিজের পরিবার প্রতিপালন করিতে পারে এবং সমাজের কল্যাণের জন্য অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয় না। মিতব্যয়ীর হৃদয়ে সংকোচের কোন স্থান নাই। তাহার ব্যয় চিন্তাপূর্বক ব্যয়। সংযম, শৃঙ্খলা, সক্রিয় উদারতা মিতব্যয়ীর নিকট শিখিতে হইবে।

যাহারা টাকা পাইলেই তৎক্ষণাৎ খরচ করে তাহারা কখনও মিতব্যয়ী হইতে পারে না। মিতব্যয়িতা যেমন একটি অভ্যাস বিশেষ, তেমনি উহা কাহারও স্বভাবের মধ্যে পূর্ব হইতে নিহিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক ব্যক্তিকে অল্প বয়স হইতেই জিনিসপত্র অপচয় করিতে দেখা যায় না। একবার খরচ করিতে অভ্যস্ত হইয়া গেলে এই স্বভাব মানুষ কখনই ছাড়িতে পারে না। সুতরাং বাল্যজীবন হইতে মিতব্যয়িতার অনুশীলন দরকার।

অপব্যয় নিবারণ করিবার উপায় সম্ভাব্য উপার্জনের ব্যয়ের বরাদ্দ পূর্ব হইতেই প্রস্তুত করা। বরাদ্দ অনুসারে ব্যয় করিলে লোকের কখনই কোন কষ্ট হয় না। ব্যয়ের বরাদ্দ যাহারা ভালভাবে প্রস্তুত করিতে পারে এবং তদনুসারে খরচ করিতে পারে তাহারা কখনও দুর্দশাগ্রস্ত হয় না।

বাঙালীর সামরিক শিক্ষা

শিক্ষা বলিতে কেবল মানসিক শিক্ষা বুঝায় না। নৈতিক এবং শারীরিক শিক্ষাও উহার অঙ্গ। মনের দিকে বেশি জোর দিলে শরীর ক্ষীণ হইয়া পড়ে। সংযম ও শৃঙ্খলা শুধু মানসিক শিক্ষায় লাভ হয় না, শারীরিক শিক্ষাও উহার জন্য দরকার। সামরিক শিক্ষা, শারীরিক উন্নতির সহিত শৃঙ্খলার শিক্ষাও মানুষকে দিয়া

থাকে। সামরিক শিক্ষার গুরুত্ব সর্বযুগে সর্বদেশে লোকে স্বীকার করিয়া আসিয়াছে।

সামরিক শিক্ষা ছাড়া দুর্বলকে সবলের হাত হইতে দ্রুত রক্ষা করিবার আর কোন উপায় নাই। প্রাচীন ভারতে যাঁহারা সামরিক শিক্ষা গ্রহণ কবিতেন, তাঁহাদিগকে 'ক্ষত্র' বলা হইত। 'ক্ষত হইতে ত্রাণ করে বলিয়া ক্ষত্র শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে'।

আত্মরক্ষা বা নিজের জন্মভূমি রক্ষা ইহা ব্যক্তি বা জাতির জন্মগত অধিকার। এই অধিকার হইতে কোন জাতি বা ব্যক্তিকে বঞ্চিত করিয়া অপরকে দিয়া যদি তাহাকে রক্ষা করাইতে হয়, তবে সে জাতি বা ব্যক্তি ক্রমশঃ ভীরু ও কাপুরুষে পরিণত হয়। ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে প্রাচীন যুগ হইতেই বাঙালীর শৌর্যবীর্যের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বাঙালা নৌযুদ্ধে প্রবল ছিল। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সম্রাট্ ধর্মপালের বিজয়বাহিনী বিন্ধ্যাগিরির পাদমূল পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। মোগল আমলে রায়বেঁশে ও ঢালী সৈন্যগণ বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিল। প্রতাপাদিত্য, চাঁদ রায়, কেদার রায প্রভৃতি বীরগণ অপূর্ব বিক্রম প্রকাশ করিয়াছেন। পলাশীর যুদ্ধে মোহনলাল দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় আত্মদান করিয়াছেন।

ইংরেজ এ দেশে আসিয়া সমগ্র জাতিকে নিবীর্য করিয়া ছাড়িয়াছে। ভারতের মধ্যযুগে বাংলার জমিদারগণ আত্মরক্ষার ভার নিজেদের হাতে রাখিয়াছিলেন। তখনকার দিনে মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা লাঠি, বর্শা, তরোয়াল চালাইতে পারিত।

কিন্তু ইংরেজ এ দেশে আসিয়া লাঠি, ঢাল, তরোয়াল, বর্শা সব কিছু অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইল—ডন কুস্তির আখড়ার উপরও কড়া নজর রাখিল—এক কলম ছাড়া আর কিছু বাঙালীকে ধরিতে দিল না। ইংরেজের সব সময়ে ভয়—বুদ্ধিজীবী বাঙালী হাতে অস্ত্র পাইলে তাহাদিগকে এ দেশ হইতে তাড়াইবে।

ইংরেজ এত কড়াকড়ি করিয়াও অস্ত্রশস্ত্রের পরিচালনা বন্ধ করিতে পারিল না। বিপ্লবী দলের কর্মীরা গোপনে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার শিক্ষা করিতে লাগিলেন। স্বদেশের স্বাধীনতা যজ্ঞে কত কর্মী প্রাণ বিসর্জন দিলেন। বুড়িবালামের রণে ব্রিটিশ সৈন্যের সহিত বাঘা যতীন প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ চালাইলেন।

প্রথম মহাসমরে বাঙালীর যুদ্ধে যোগদানের সুযোগ আসিল। অনেকে এ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কৃতিত্ব হইতেছে অল্প সময়ে তাঁহারা সমরবিদ্যা শিখিয়াছিলেন। ইংরেজ সেনাপতিগণ বাঙালীকে অল্প সময়ে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভের জন্য প্রশংসা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার অধিকারের সময় যেভাবে বিপ্লবী নেতৃগণ সামরিক শৃঙ্খলা প্রদর্শন করেন, তাহাতে যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ সৈন্যচালকগণও বিস্মিত হন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ বাহিনী সৈন্য সংগঠন ও পরিচালনায় ইতিহাস রচনা করিয়াছে। উপযুক্ত সুযোগ পাইলে বাঙালী কেন সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করিবে না তাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া

যায় না। যাহাদের পূর্বজগণ অল্প সুযোগে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারে, তাহারা বেশি সুযোগ লাভ করিয়া নানাভাবে তাহাদের কৃতিত্ব দেখাইবে ইহাই লোকে আশা করে। বাঙালী ভারতের পূর্ব প্রান্তের অধিবাসী। বিদেশী শত্রুর আক্রমণের ধাক্কা কোন দেশের উপর যখন পড়ে, তখন প্রান্তের লোকের উপরই প্রথম চাপ পড়ে। সুতরাং প্রান্তবাসী বাঙালীকে স্বদেশ রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। স্থানীয় লোকের কাছে দেশের জন্য মমত্ববোধ হয় সর্বাপেক্ষা বেশি। তাই যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করা থাকিলে দেশের সংকটের সময় উহা কাজে লাগিবে।

আধুনিক যুগের যুদ্ধবিদ্যায় শারীরিক সামর্থ্য অপেক্ষা মানসিক শক্তির গুরুত্ব অনেকটা বেশি। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুদ্ধবিদ্যার কলাকৌশল বাঙালী অতি অল্প সময়ে আয়ত্ত করিবার ক্ষমতা রাখে। অনেকে বলেন বাঙালী সমরবিভাগের অতি সাধারণ কর্মে অত্যন্ত বিমুখ এবং অন্য প্রান্তের লোকদের সহিত সমভাবে মিলিয়া-মিশিয়া কাজ করিতেও পারে না। বাঙালী চিন্তা, আহারবিহার প্রভৃতি অনেক দিক দিয়া অন্য প্রান্তের লোক হইতে নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে। এই জন্য অপরের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া চলিতে অনেক সময় তাহার অসুবিধা হয়। সমরবিভাগে কার্যবিভাগেরও অন্ত নাই। যে সকল বিভাগে বাঙালী দক্ষতার ও মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত কাজ করিতে পারিবে সেইখানেই সে যাইবে। অন্যত্র যাইবার তাহার দরকার নাই। অন্যত্র সে কেন তাহার পরিশ্রমের বা শক্তির অপচয় করিবে?

ভারতের জাতীয় সরকার স্কুল-কলেজে সামরিক শিক্ষা প্রবর্তন করিয়াছেন। ইহা আরো অধিকতর ব্যাপক হওয়া বাঞ্ছনীয়। জাতীয় সরকার কিরকী, দেরাদুন প্রভৃতি স্থানে সামরিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া উহাদের দ্বার সকলের কাছে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এত বড় বিরাট দেশের রক্ষাকল্পে প্রত্যেক ভারতবাসীর প্রস্তুত থাকা উচিত। বাঙালীও এই কার্যে তাহার উপযুক্ত অংশ গ্রহণ করুক।

অনেকে মনে করেন ভারত যখন অহিংস নীতির পূজারী, গান্ধীজীর অহিংসা-বাদ এবং পণ্ডিত জবহরলাল নেহরুর পঞ্চশীল যখন ভারত নিজের ও জগতের কল্যাণের জন্য গ্রহণ করিয়াছে, তখন সামরিক শিক্ষা এবং জাতীয় সৈন্যবাহিনীর প্রসারের কোন অর্থ হয় না। গৌতম বুদ্ধ, যীশু খ্রীষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া চৈতন্য মহাপ্রভু পর্যন্ত মহাপুরুষ বা অবতার পুরুষেরা জগতে অহিংসার বাণী প্রচার করিয়াছেন। নিজেদের কার্যেও অহিংসার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিয়াছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও জগতে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ হয় নাই। যুদ্ধ বন্ধ না হইলেও ইঁহাদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া জগতের কল্যাণকামীরা শান্তির বাণী প্রচার করিয়াছেন। এ শান্তির বাণীতে মানবসমাজের মনোবৃত্তির পূর্ণ পরিবর্তন না হইলেও আংশিক পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু অশান্ত পররাষ্ট্রলোভী জাতি হইতে আত্মরক্ষার উপায় হইতেছে অস্ত্রপ্রয়োগ। ইহার জন্য প্রস্তুতির দরকার। তাই সামরিক শিক্ষাও প্রয়োজন। ভারতবর্ষ জগতের শান্তি চায়, নিজের নিরাপত্তাও চায়—অকারণে বা বিনা

কারণে কাহারও উপর অস্ত্রের প্রয়োগ তাহার কাম্য নহে। আধ্যাত্মিক বলের সহিত ক্ষাত্রশক্তির সামঞ্জস্য রক্ষা করাই ছিল প্রাচীন ভারতের চরম আদর্শ। এই আদর্শ ভুলিয়া যুগে যুগে ভারতকে চরম সংকটের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

বর্তমান ভারতের অহিংসা নীতি অস্ত্রত্যাগ নহে। উহা অস্ত্রের সমুচিত প্রয়োগের শিক্ষা। অস্ত্রের প্রকৃত প্রয়োগের যে অধিকারী তাহারই হস্তে অস্ত্র শোভা পায়।

ভারতের আদর্শ রক্ষায় বাঙালীও তাহাব উপযুক্ত সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবে। জাতির বৃহত্তর প্রয়োজনের জন্য যদি আবশ্যিক সামরিক শিক্ষাব প্রয়োজন হয়, তবে সুস্থদেহ, কর্মঠ সকল ব্যক্তির জন্যই উহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

খেলাধূলা

মানুষ কাজ করিতে কবিতে যখন অস্থিব হইয়া উঠে তখন সে চায় ছুটি। সে চুপচাপ বসিয়া থাকিতে চাহে না, বাঁধাধরা কাজ ছাড়িয়া অন্য রকম কাজে নিজেকে ঢালিয়া দিতে চায়।—ইহাতে সে আরাম পায়, আনন্দ পায়। বালক, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ সকলেবই এইরকম কিছু না কিছু অবসর বিনোদনের জন্য আনন্দজনক কাজ চাই। এই সব কাজ বা প্রচেষ্টা খেলাধূলার মধ্যে পড়ে।

জীবনের প্রাচুর্য ও তাহার শক্তি অনুভব করিতে হইলে খেলাধূলাতে যোগ না দিলে কেহ উহা অনুভব করিতে পারে না। যে শিশু খেলাধূলা হইতে দূরে থাকে, সে হয় রুগ্ন না হয় শারীরিক স্বাচ্ছন্দে বঞ্চিত। এরূপ শিশু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অকর্মণ্য হইয়া থাকে।—যে সকল ছেলে অকর্মণ্য, তাহাদের বয়স ও উচ্চতাব অনুপাতে দৈহিক ওজন বেশি হইয়া থাকে। এরূপ সুশীল শান্ত সুবোধ বালক মনুষ্য জীবনের কোন সুখ লাভ করিতে পারে না।

মানুষ সামাজিক জীব। নিজের গৃহের বাহিরে বালক খেলার মাঠে আপনাকে বিকাশ করিবার সুবিধা পায়। তাহার দেওয়া ও অপরের নিকট হইতে পাওয়া এই খেলাধূলার সাহায্যেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। লোক নেতৃত্বের অভ্যাসও খেলার মধ্য দিয়া হইতে পারে। সুনিয়ন্ত্রিত খেলাধূলার মধ্য দিয়া সংযম ও শৃঙ্খলার ভাব বালকের ভিতরে জাগ্রত হয়। খেলা জয় অপেক্ষা যখন ভাল খেলার উপর জোর দেওয়া হয় তখন হারিয়া গেলেও তাহার দুঃখ বোধ হয় না। বালকের মনে এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হইলে বুঝিতে হইবে, বালক জয়-পরাজয়কে সমান আনন্দের সহিত গ্রহণ করিবার অধিকারী হইয়াছে। এইরূপ মনোবৃত্তি গঠন সময় ও অভ্যাসের উপর নির্ভর করে।

খেলার জয়ের উল্লাসেরও একটা তাৎপর্য আছে। জয়েতে উল্লাস বা আনন্দ বলিয়া কিছু না থাকিলে কেহ কখনও প্রাণপণে কোন প্রকার জয়লাভের জন্য চেষ্টা করিত না। মানুষের জীবনও সংগ্রাম বিশেষ। এখানে প্রতি পদেই লোকেব নানাপ্রকার বাধার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া চলিতে হয়। খেলাধূলায় জয়ের প্রবৃত্তি জীবনযুদ্ধে জয়ের প্রবৃত্তি জাগাইয়া থাকে। আর কোন কোন ক্ষেত্রে যখন পরাজয় আসে তখন সে পরাজয়কে হাসিমুখে গ্রহণ করিতে পারে।

দুর্বলচিত্ত লোক নিশ্চেষ্ট, সে তাহার ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকে। প্রত্যেক কাজে অগ্রসর হইতে সব সময় তাহার ভয় এবং আশঙ্কা আসিয়া উপস্থিত হয়। ছেলেবেলা হইতে যাহারা খেলাধূলায় যোগদান করিয়াছে সেই সকল লোক সাহসের সঙ্গে সর্বত্র অগ্রসর হয়।

খেলাধূলায় অভ্যস্ত লোকেরাই সম্মিলিতভাবে বৃহত্তর কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারে। ইহাদের সকল কার্যে শৃঙ্খলা ও সুষমা বিরাজ করে।

খেলাধূলায় শুধু শরীরের উপকার হয় না, মানুষ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সহজ সরলভাবে সরলতার সহিত চলিতে সমর্থ হয়।

এ দেশের স্কুল-কলেজে সর্বত্রই খেলাধূলার অল্পবিস্তর ব্যবস্থা আছে। বড় বড় শহরে অনেক স্কুলের নিজের মাঠ নাই। সেই জন্য সেই সকল স্থানে ব্যাপকভাবে খেলাধূলার ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয় না।

বড় ছোট যে রকমেরই স্কুল হউক না কেন প্রত্যেকটি ছাত্রের জন্য খেলাধূলার ব্যবস্থা করা কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠে না, ছাত্রেরাও খেলার সুযোগ সবসময়ে গ্রহণ করিতে পারে না। এই দুই কারণে বিদ্যালয় হইতে উৎসাহ পাইলেও সকল ছাত্র খেলায় যোগদান করে না বা করিয়া উঠিতে পারে না। ভারতের বাহিরে শীতপ্রধান দেশের লোকেরা বালক-যুবা-প্রৌঢ় নির্বিশেষে খেলা করিয়া থাকে। খেলাধূলা তাহাদের জীবনযাত্রার স্বাভাবিক অঙ্গ। দিনে কয়বার খাইতে হইবে ইহা যেমন কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না সেইরূপ খেলার উৎসাহ দিবার কোন প্রয়োজন সেখানে নাই।

কোন না কোন প্রকার খেলা বা অন্য প্রকার ব্যায়ামাদি শরীরচর্চায় প্রত্যেক ছেলেকে লাগাইয়া দেওয়া জাতীয় কর্তব্য। দেশের বালক যুবক যদি শরীরচর্চার অভাবে দুর্বল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে শারীরিক মানসিক কোন কাজই জাতি ইহাদের নিকট হইতে পাইবে না। সুতরাং জাতির ভবিষ্যৎ ভাবিয়া, তাহারই কল্যাণের জন্য খেলাধূলার সর্বপ্রকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

ধর্মঘট

ভারতবর্ষের কোন না কোন প্রান্তে একটা না একটা ধর্মঘট লাগিয়াই আছে। সংবাদপত্রে দেখা যায় শুধু ভারতবর্ষে নহে পৃথিবীর সর্বত্রই ধর্মঘট চলে। সুতরাং ধর্মঘট বলিলে কি বুঝা যায় এখানকার সকলেই আজকাল তাহা বুঝে। ধর্মঘটের আভিধানিক অর্থ হইতেছে কোন ন্যায্য দাবিপূরণের সাপেক্ষে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া দলবদ্ধভাবে কাজ বন্ধ করা (সংসদ অভিধান)। ধর্মঘট দ্বারা কাজ বন্ধ করার কথা উঠে। আর কাজের প্রশ্ন উঠিলে মালিক ও শ্রমিক জড়িত হইয়া পড়ে। মালিকের নিকট শ্রমিকের ন্যায্য দাবি পূরণ না হইলে শ্রমিককে নিরুপায় হইয়া কাজ বন্ধ করিতে হয়।

মালিকের হাতের টাকা ও ব্যবসায় চালাইবার ব্যবস্থা আর শ্রমিকের পরিশ্রম

এই দুইয়ের সমবায়ে দ্রব্য উৎপাদিত হয়। মালিকের লক্ষ্য ব্যবসায় হইতে যত বেশি লাভ করা যায় ততই ভাল। কে বাঁচে কে মরে তাহা মালিকের মতে লক্ষ্য করিবার কথা নহে। বেকার সমস্যা দিন দিন তীব্র আকার ধারণ করিতেছে। এরূপ অবস্থায় চাহিদার অনুপাতে মালিকের নিকট কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা বেশি বলিয়া বোধ হয়। মালিক যত সস্তায় কর্মী পায়, তত সস্তায় লোক রাখে। যখন শ্রমিকের জীবনযাত্রা অচল হয়, যখন তাহার পরিবার-পরিজন লইয়া রোজগারের অর্থ দিয়া অর্ধাহারে বা কোন সময়ে অনাহারে কাটাইতে হয় তখন মালিকের নিকট বর্ধিত হারে মজুরি না চাহিয়া তাহার উপায় নাই। কিন্তু উপযুক্ত মজুরির জন্য আবেদন-নিবেদন করিয়া যখন কোন ফল হয় না, তখন কর্মিগণ সমবেত শক্তি লইয়া মালিকের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়—কাজ বন্ধ করিয়া দেয়। অনেক ক্ষেত্রে ধর্মঘটীদের সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মালিক কারখানা বন্ধ করিয়া দেয়। মালিকের পক্ষ হইতে কারখানা চালাইবার যদি কোন উৎসাহ না থাকে, তবে ধর্মঘটীরা কর্মহীন হইবে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে সকল প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা চলে না। যেখানে সর্বসাধারণের নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত হয়, সেখানে কারখানার মালিক বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে না।

এতো গেল অল্প মজুরীর জন্য ধর্মঘট করা। ধর্মঘটের আরো কারণ রহিয়াছে। যে মজুরিতে একস্থানে শ্রমিক যত সময় পর্যন্ত কাজ করে, অন্য স্থানে ঐ মজুরিতে বেশিক্ষণ ধরিয়া কাজ করাইলে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ উপস্থিত হয়। তাহার ফলে ধর্মঘট হয়। কর্মে অস্থায়িত্ব বা উর্ধ্বতন কর্মচারীদের দুর্ব্যবহার ধর্মঘটের অন্যতম কারণ।

যেখানে কারখানায় মালিক বা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের সুখসুবিধা ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন, সেখানে ধর্মঘট ছাড়া অভিযোগ প্রতিকারের অন্য কোন উপায় নাই। ধর্মঘটে জনমত সুদৃঢ় হয় এবং দেশের সর্বসাধারণ মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে আপোষ মীমাংসার পথ প্রশস্ত করিয়া থাকে।

কোন কাজ করিতে গেলে সুবিধার সঙ্গে অসুবিধা বা বিপদও আছে অনেক। ধর্মঘটকালে দরিদ্র শ্রমিকদের পরিবারের লোকের দুঃখদুর্দশার অন্ত থাকে না। আর ধর্মঘট সফল না হইলে কর্মিগণ সম্পূর্ণভাবে মালিকের হাতের মুঠোর মধ্যে পড়িয়া যায়। ধর্মঘট প্রভৃতির সময় উৎপাদন অনেক কমিয়া যায়, উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের আয় কমার ফলে মালিক শ্রমিকের কোনও সুবিধা করিতে পারে না। শ্রমিকগণের পক্ষে যখন সর্বপ্রকার আপোস-মীমাংসায় ফল হয় না, তখন ধর্মঘট অবলম্বনই একমাত্র প্রতিকারের উপায়। এইরূপে ধীরে ধীরে জনমত সুদৃঢ় হয় এবং পরিণামে শ্রমিকের দুঃখদুর্দশার অবসান হয়।

স্কুল-কলেজ প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বহুদিন হইতেই ছাত্রদের দাবি পূরণের জন্য ধর্মঘট হইয়া আসিতেছে। অনেকে বলিয়া থাকেন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান শ্রমিকদের

কারখানা নহে, যে সেখানে ধর্মঘটের সাহায্যে অসুবিধার প্রতিকার করিতে হইবে। বিদ্যালয়ে ধর্মঘটের ফলে ছাত্রদের মধ্যে পাঠের প্রতি অবহেলা, অন্যায় এবং সংযম-হীনতা দিন দিন বাড়িতেছে। দ্বিতীয়তঃ, ধর্মঘটের সময় ছাত্রগণ কোন না কোন রাজনৈতিক দলের ক্রীড়নকরূপে কাজ করে। ইহার ফলে তাহারা সুশৃঙ্খলার সহিত কোন কাজ করিতে পারে না—রাজনৈতিক দলের প্ররোচনায় যখন তখন বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করিয়া অপরের কাজের অসুবিধা করে এবং নিজেরা অধঃপতিত হয়।

ইহার উত্তরে বলা যায়, দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সুস্থ, সবল, চরিত্রবান্, মানুষ তৈয়ারি করিবার স্থান। সুস্থ সবল চরিত্রবান্ মানুষ হইবার জন্য ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে গমন করে। দেশের ভবিষ্যৎ ছাত্রগণের উপর নির্ভর করে। সুস্থ সবল মানুষ হইতে হইলে সর্বপ্রকার দুর্বলতা ছাত্রগণকে পরিহার করিতে হইবে।

বিদ্যালয়ে কোন সংস্কার আনয়ন করিতে হইলে ছাত্রগণ যদি কোন বৈধ আন্দোলন করে তবে তাহাতে বলিবার কিছু নাই। কিন্তু অপরকে বিচার করিবার পূর্বে আন্দোলনকারীকে নিজের সম্বন্ধে বিচার করিতে হইবে। যে ব্যক্তি নিজে নিয়ম শৃঙ্খলার কোন ধার ধারে না তাহার পক্ষে অপর পক্ষকে সংশোধনের চেষ্টা করা বৃথা। এরূপ চেষ্টায় আন্দোলনকারী নৈতিক বলের অভাবহেতু দুর্বল হইয়া পড়ে। পরিণামে মানবনীতির দিক দিয়া তাহার পরাজয় হইয়া থাকে। ছাত্রগণ বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট যে কোন দাবি উপস্থিত করিলে সকল দাবি পূর্ণ করা তাহাদের সামর্থ্যে অনেক সময় কুলায় না—এরূপ অবস্থায় দাবি না করাই ভাল। যখন তখন ধর্মঘট করা বা মীমাংসার পথে প্রথমে না গিয়া ধর্মঘটে লিপ্ত হওয়া সমুচিত পথ নহে। বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা চাহে নিজের উন্নতি। কিন্তু সে উন্নতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকার জন্যই অনেক সময় ছাত্রসমাজ ভুল পথে চলে। সুতরাং ছাত্রসমাজ ধর্মঘটে লিপ্ত হইবে কিনা তাহা বিবেচনার বিষয়।

শ্রমিক ধর্মঘট সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনার বিষয় রহিয়াছে। অসুবিধাগ্রস্ত হইলে কর্মী যখন তখন মালিকের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করিবে কি না? যখন তখন ধর্মঘট করিলে মালিকের উহা গাসহা হইয়া যাইবে—উহার কোনও ফলও হইবে না। যখন তখন ধর্মঘটে জনমতও ধর্মঘটীদের পক্ষে যাইবে না। সুতরাং উপযুক্ত কারণে এবং যেখানে প্রতিকারের ব্যবস্থা মালিকের আয়ত্তের মধ্যে আছে, সেইরূপ স্থলেই আপোষমীমাংসা না হইলে ধর্মঘট করিলে কেহ কিছু ত্রুটি ধরিতে পারিবে না।

মালিক কর্মীদের সুখসুবিধার দিকে না দেখিলে তিনি ভাল কাজ পাইবেন না। আর কর্মীরও মনে রাখিতে হইবে—কাজ ভাল হইলে লাভের পয়সা বেশি আসিবে—কর্মীর সুখসুবিধা বাড়াইবার দাবি তখনই উপস্থিত করিবার উপযুক্ত সময়।

ভারতের জনসমস্যা

ভারতবর্ষ একটি বিরাট জনবহুল অনুন্নত গরিব দেশ। এখানে জনসংখ্যা খুব দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৫১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী আমাদের জনসংখ্যা ছিল ৩৫.৬ কোটি। ইহার পূর্বেকার দশ বৎসরে জনসংখ্যা শতকরা তের ভাগেরও বেশি বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার পূর্বেকার দশ বৎসরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ১৫ ভাগ। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে এই বৃদ্ধির হার প্রায় শতকরা সাত ভাগ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে দেশে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে না। ইহাতে অনেকেই শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন। ইউরোপের উন্নত দেশগুলিতে শিল্পের প্রসার ঘটাতে ম্যালথসের জনসংখ্যাতত্ত্ব ভুল প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে যখন কোন দেশে উৎপাদিত খাদ্যের দ্বারা ঐ দেশের লোকের খাদ্যের সংস্থান হয় না তখন ঐ দেশকে অতিজনাকীর্ণ বলিতে হইবে। অর্থাৎ ঐ দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াটাই একটা সমস্যা। আমাদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের অনুপাতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হার অনেক কম। এই দিক হইতে বিচার করিলে আমাদের দেশকে নিশ্চয়ই অতি জনাকীর্ণ বলিতে হইবে।

খাদ্যের উৎপাদনের কথা বাদ দিলে দেখা যায় যে, আমাদের দেশে জনসমস্যা আছে। এখানে জন্মহার এবং মৃত্যুহার দুইই খুব বেশি। শিশু-মৃত্যুর হারও অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি। জন্মহার এখানে অবাধে বাড়িয়াই চলিয়াছে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি ঘন ঘন দেখা দেয়। সুতরাং বোঝা যাইতেছে যে, দেশ যত লোকের ভরণপোষণ করিতে পারে, দেশে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি লোক আছে।

আজকাল অনেকেই বলেন যে, কেবলমাত্র খাদ্যের ঘাটতি থাকিলে সেই দেশকে অতিজনাকীর্ণ বলা চলে না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত দেশের মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধির তুলনা করা উচিত। আয়ের অনুপাতে দেশে যে জনসংখ্যা থাকা উচিত (অর্থাৎ কাম্য জনসংখ্যা) তাহা হইতে যদি জনসংখ্যা বেশি হয় তবে মাথাপিছু আয় কমিয়া যাইবে এবং ঐ দেশকে তখন অতিজনাকীর্ণ বলা যায়। ইঁহারা বলেন যে, শিল্পোৎপাদনের বিনিময়ে যদি বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি করা যায় তবে ঐ দেশে জনসমস্যা থাকে না। সম্প্রতি আমাদের দেশে খাদ্যের উৎপাদন বাড়িয়াছে সন্দেহ নাই। তবে এই তত্ত্ব প্রমাণের পক্ষে এই বৃদ্ধি পর্যাপ্ত নহে। ভারতে এখনও অপর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদ পড়িয়া আছে। বৈদেশিক শাসন ও শোষণের ফলে এইগুলির উপযুক্ত ব্যবহার সম্ভব হয় নাই। এইগুলির পূর্ণ ব্যবহার করিতে পারিলে আর জনসমস্যা থাকিবে না। কারণ তখন মাথাপিছু আয় অনেক বৃদ্ধি পাইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে জনসমস্যা রহিয়াছে। এখানে অতিজনাকীর্ণ দেশের সবগুলি লক্ষণই বর্তমান রহিয়াছে। তবে ভবিষ্যতে

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে এই সমস্যা হয়ত আর থাকিবে না। তবে একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম অবস্থায় এই সমস্যা আয়ত্তের মধ্যে না আনিতে পারিলে দ্রুত জীবনধারণের মান উন্নত করিবার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয় না।

অস্পৃশ্যতা নিবারণ

ভারতীয় সমাজে কবে কোন যুগে এবং কিভাবে অস্পৃশ্যতা প্রবেশ করিয়াছে তাহা আজ ঠিক করিয়া বলিবার উপায় নাই। আধুনিক যুগে ইহার কুফল এত তীব্র হইয়াছে যে, সকল সংস্কারকেরই দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। আর্যগণ ভারতে প্রবেশ করিবার পর এদেশের আদি অধিবাসীদের প্রথমে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। কিন্তু কালক্রমে আর্যসভ্যতা এদেশের আদিসভ্যতার সহিত মিশ্রিত হইয়া এক বিরাট সভ্যতায় পরিণত হয়—এক নূতন ধরনের হিন্দু ধর্মের উদ্ভব হয়। এই যুগেই জাতিভেদ প্রথারও প্রচলন হয়। তবে ইহা ছিল মূলতঃ সমাজের বৃত্তিবিভাগ। ইহা অস্পৃশ্যতা নহে। সম্ভবতঃ প্রাচীনযুগের এই ব্যবস্থা হইতেই কালক্রমে অস্পৃশ্যতা সমাজে প্রবেশ করে। মুসলমান আক্রমণের যুগ হইতেই ইহা তীব্র আকার ধারণ করে এবং ইংরেজ আমলে বৈদেশিক শাসকবর্গের চক্রান্তে উহা তীব্রতর হইতে থাকে। এই যুগে অবস্থার এত অবনতি ঘটে যে, হিন্দুরা চণ্ডালদের ছায়া পর্যন্ত মাড়াইত না, ইহাদের দেবমন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না। ফলে হিন্দুসমাজ ক্রমশঃ বহুধাবিভক্ত হইতে থাকে, দলে দলে তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা (যাহাদের অস্পৃশ্য করিয়া রাখা হইয়াছিল) অন্য ধর্ম গ্রহণ করিতে থাকে।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মধ্যযুগের সমস্যাটি আত্মপ্রকাশ করে যে সময়ে ঠিক সেই সময়ে আমাদের দেশে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু, নানক, কবীর প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা প্রচার করিলেন সব মানুষই এক, জাতিভেদে তাহাদের মানবধর্ম নষ্ট হয় না। শ্রীচৈতন্যদেব কেবলমাত্র অস্পৃশ্যদেরই বক্ষে স্থান দিয়া ক্ষান্ত হন নাই, অন্য ধর্মাবলম্বীদেরও তিনি সাদরে আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা সাময়িকভাবে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করিলেও দেশ হইতে অস্পৃশ্যতা দূর করিতে পারে নাই। পরে দলে দলে হিন্দুরা অন্য ধর্ম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে।

হিন্দুধর্মকে আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য উনবিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইলেন দুই মহামানব—রাজা রামমোহন ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরের কাছে সকল মানুষই সমান, উহাদের মধ্যে কোন ভেদ নাই—এই মহাবাণীই তাঁহারা পুনরায় প্রচার করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ উদ্দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—"হে ভারত! ভুলিও না, নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর! সদর্পে বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।" তিনি

শুধু আমাদের এই মহাবাণী শুনাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বহু অস্পৃশ্যকে তিনি বুকে স্থান দিয়া অস্পৃশ্যতা নিবারণের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। এই সময়ে ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একাধিক কাব্য, নাটক, গল্পের ভিতর দিয়া অস্পৃশ্যদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন। 'কালের যাত্রা' নাটকে অথবা 'চণ্ডালিকা' নাটকে তিনি চিরউপেক্ষিত, চিরলাঞ্ছিত অস্পৃশ্যদের হইয়া সংগ্রাম করিয়াছেন।

কিন্তু ইহাদের হইয়া প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হ'ন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও মহাত্মা গান্ধী। গান্ধীজী জীবনের বহু সময় হরিজনদের সহিত একত্রে বাস করিয়াছেন, এমন কি একজন হরিজনকে তিনি স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করিবার বাসনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। অস্পৃশ্যদের লইয়া লড়াই করিবার জন্য সমাজের তথাকথিত উচ্চ বর্ণের অনেক লোকের নিকট হইতে তাঁহাকে অশেষ গঞ্জনা ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোক মহাত্মাজীর এই অন্দোলনে সমর্থন জানায়। ইহার অবশ্য একটা বিশেষ কারণ ছিল। দেশের নেতৃবর্গ ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে যদি রাজনৈতিক স্বাধীনতা আনিতে হয় তাহা হইলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন প্রত্যেক ভারতবাসী একই ভারতমাতার সন্তান, তাহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই এই চেতনা জাগ্রত করা। বলা বাহুল্য, এই অস্পৃশ্যতার কুফলের জন্য ভারতবাসীর মধ্যে পূর্ণ রাজনৈতিক ঐক্য আসে নাই। মহাত্মাজীর নেতৃত্বে দেশ হইতে অস্পৃশ্যতা দূর করিবার আন্দোলন এত তীব্র হইবার ইহাই একটি প্রধান কারণ।

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হইল। অস্পৃশ্যতার প্রকোপ কিছুটা প্রশমিত হইলেও দেশ হইতে উহা গেল না। তাই ১৯৫০ সালে রচিত ভারতের সংবিধানে অস্পৃশ্যতাকে বেআইনী ঘোষণা করা হইল। মন্দির, স্কুল-কলেজ বা সরকারী প্রতিষ্ঠানে অন্যান্য হিন্দুদের মত তথাকথিত অস্পৃশ্যদেরও প্রবেশের অধিকার দেওয়া হইল। যাহারা ইহাতে বাধা দিবে তাহারা আইনের চক্ষে অপরাধী। ১৯৫৫ সালে ভারত সরকার অস্পৃশ্যতা নিরোধকল্পে সংবিধানের ধারাগুলি সম্বলিত করিয়া একটি আইন প্রণয়ন করেন। ইহার এক বৎসর পুর্বে অর্থাৎ ১৯৫৪ সাল হইতে ভারত সরকার অস্পৃশ্যতা নিবারণ আন্দোলনকে আর্থিক সাহায্য করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে বহু সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাহায্য লওয়া হইতেছে।

আজকাল অস্পৃশ্যতা কিছুটা কমিয়াছে সন্দেহ নাই। তবে ইহা দেশের নানা অংশে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করিতেছে। ইহার কারণ বর্ণহিন্দুদের অন্তর স্পর্শ না করিলে আইনের দ্বারা এই সমস্যা দূর করা সম্ভব নহে।

স্বাধীন ভারতে জন্মগত অস্পৃশ্যতার প্রকোপ হ্রাস পাইলেও নূতন এক ধরনের অস্পৃশ্যতা অংকুরিত হইতেছে। ইহা অর্থ ও ধনের অস্পৃশ্যতা। দেশের মুষ্টিমেয় ধনীরা দরিদ্রদের সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় করিয়া রাখিয়াছেন। বলা বাহুল্য এই ধরনের অস্পৃশ্যতা গণতন্ত্রের ভিত ভাঙিয়া দেয়, দেশে আসে বিপ্লব। তাই এক

বিষের পরিবর্তে নূতন ধরনের যে বিষ আমাদের সমাজদেহকে কলুষিত করিতেছে, অংকুরেই তাহা বিনষ্ট করিবার জন্য আমাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে।

ভারতের উৎসব ও পূজাপার্বণ

বিরাট দেশ এই ভারতবর্ষ। ইহার এক অঞ্চলে লোকের সংস্কার ও বিশ্বাস অনুযায়ী নানা প্রকার উৎসব ও পূজাপার্বণের উদ্ভব হইয়াছে। ইহাদের সংখ্যা এক দিকে যেমন গণনাতীত অন্যদিকে ইহারা তেমনি বিচিত্র। জগতে কোন দেশে উৎসব ও পূজাপার্বণের এত বৈচিত্র্য দেখা যায় না। এখানে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, পারশিক বাস করিতেছে। ইহাদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টানই প্রধান।

হিন্দু পূজা-পার্বণ সাধারণতঃ চার প্রকারের—দেবতার পূজা, ব্রত, জয়ন্তী ও মেলা। এই সকল উৎসব বা পূজা-পার্বণে দেবতার, ধর্মপ্রচারকদের অথবা পৌরাণিক বীরগণের কার্যকলাপ স্মরণ করা হয় ও তাঁহাদের মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়। ইহা ছাড়া গ্রহনক্ষত্রের স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে যে পুণ্যতিথি উপস্থিত হয় সেই দিনটিও উৎসবের দিন।

হিন্দুদের প্রধান পাঁচটি উৎসব হইল দেওয়ালী, বসন্ত পঞ্চমী, রক্ষাবন্ধন, দশেরা ও হোলী। দেওয়ালী বা আলোক উৎসব ভারতের প্রায় সর্বত্রই বেশ জনপ্রিয়। রাবণ বধের পর রামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের দিনটির স্মরণে এই উৎসব হইয়া থাকে। সারা দেশ আনন্দে মুখরিত হয়, সৌধমালা আলোকোদ্ভাসিত হয়। দোকানে পসারে কেনাকাটার ধুম পড়ে। এই উৎসব সাধারণতঃ শরৎকালের শেষ দিকে হয়। বাঙলার বাহিরে ইহা নববর্ষের উৎসব। নবান্নও এই সময়। বাঙালীদের এই দিনটিতে দীপান্বিতা উৎসব। এই দিন কালীপূজা হয়। আলোক উৎসবও চলে ভারতের অন্যান্য প্রান্তেরই মত। বসন্ত সমাগমের প্রথম দিনটিতে বসন্ত পঞ্চমী উৎসব হয়। বসন্তের আগমনে সারা প্রকৃতি যেন নূতন রূপ পরিগ্রহ করে। প্রকৃতির এই পরিবর্তনকে সাদরসম্ভাষণ জানান হয় যথোচিতভাবে। চারিদিকে বাসন্তী রঙের বস্ত্র পরিধানের যেন ধুম পড়িয়া যায়। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র অনুযায়ী এই দিনটিতে শিব মদনকে ভস্ম করিয়াছিলেন। বাঙালীদের নিকট এই দিনটি শ্রীপঞ্চমী নামে পরিচিত। বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতীদেবীর আরাধনা চলে বাঙালীর ঘরে ঘরে এই দিনটিতে। রক্ষাবন্ধন উত্তর ও পশ্চিম ভারতের হিন্দুদের আর একটি উল্লেখযোগ্য উৎসব। দেবরাজ ইন্দ্র অসুরদের নিকট পরাজিত হইলে শচীদেবী তাঁহার হাতে পবিত্র সূতা বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। ইহার ফলে, ইন্দ্রের শরীরে নববলের সঞ্চার হয় এবং পরিশেষে তিনি দৈত্যদের সম্পূর্ণ পরাজিত করেন। এই রক্ষাবন্ধনের দিনে বোনেরা ভাইদের হাতে রঙীন সূতা বাঁধিয়া দিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করে। ভাইরা বোনেদের রক্ষা করেন। ইহাই এই উৎসবের তাৎপর্য। বাঙালীদের রক্ষাবন্ধন উৎসব নাই। তবে তাহাদের অনুরূপ

উৎসব হইল ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বা ভাইফোঁটা। বাংলার বোনেরা তাহাদের ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিয়া তাহাদের দীর্ঘজীবন কামনা করে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় বাংলাদেশে রাখীবন্ধন নামে এক নূতন ধরনের রাজনৈতিক উৎসব আরম্ভ হয়। প্রতি বৎসর বাঙালীরা ৩০শে আশ্বিন রাখী পরিতেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল বাঙালীদের মধ্যে একতা আনয়ন করা, সব বাঙালীই ভাই ভাই। দশেরা আর একটি উল্লেখযোগ্য উৎসব। উত্তর ভারতে ঐ দিন সন্ধ্যায় রাবণের প্রতিকৃতিতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। দক্ষিণ ভারতে এই উৎসব চলে নয় দিন ধরিয়া। নবম দিবসে সরস্বতীদেবীর আরাধনা হয়। অস্ত্রশস্ত্রের পূজাও হয় এই দিন। ইহার পরদিনই প্রাচীন কালের রাজারা দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন। বাংলাদেশে এই সময়ে দুর্গোৎসব হয়। সাধারণতঃ ফাল্গুন চৈত্র মাসে হোলি উৎসব হয়। বাংলাদেশে ইহা দোলযাত্রা। দোলের সময় বাঙালীরা কৃষ্ণ ও বলরামের পূজা করে।

হিন্দুমেলার মধ্যে কুম্ভমেলা বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহা হরিদ্বার, প্রয়াগ, উজ্জয়িনী নাসিকে প্রত্যেক বারো বৎসর অন্তর অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় ভক্তেরা পবিত্র নদীর জলে পুণ্য সঞ্চয়ের আশায় স্নান করে। দেবতা ও দানবের মধ্যে অমৃতকুম্ভ দখল করিবার জন্য যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে কুম্ভটি ভাঙিয়া ধরায় পূর্বোক্ত চারিটি স্থানে পড়ে। এইজন্য কেবলমাত্র ঐ চারিটি স্থানেই কুম্ভমেলা হইয়া থাকে। দক্ষিণ ভারতের মহামশান উৎসবও কুম্ভমেলার মতই প্রসিদ্ধ। কথিত আছে মহাপ্রলয়ের শেষে অমৃতকুম্ভ দক্ষিণ ভারতের কুম্ভকোনামে আটকাইয়া গিয়া অমৃতবাপী নামক পবিত্র জলাশয়ের সৃষ্টি করে। সহস্র সহস্র পুণ্যকামী হিন্দু এই তীর্থের জলে স্নান করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করে। এই স্নান উপলক্ষে এখানে একটি বড় মেলাও বসে।

মুসলমান পর্বের মধ্যে ঈদ-ই মিলাদ, ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-জুহা এবং মহরম প্রধান। হজরত মহম্মদের জন্মদিবসে এবং মৃত্যুদিবসে ঈদ-ই মিলাদ, রমজানের শেষে ঈদ-উল-ফিতর অনুষ্ঠিত হয়। হজরত ইব্রাহিম ঈশ্বরের আদেশে নিজ পুত্রকে বলিদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ঐ দিনটির স্মরণে ঈদ-উল-জুহা অনুষ্ঠিত হয়। মহরম কেবলমাত্র সিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানদের পর্ব। হজরতের দৌহিত্র হজরত হোসেনের হত্যার দিবসটির স্মরণে এই পর্ব। সিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানেরা দশদিন শোক প্রকাশ করিয়া একটি কাল্পনিক শবযাত্রা বাহির করে। খ্রীষ্টানদের প্রায় সবগুলি উৎসবই ভারতে প্রতিপালিত হয়। ইহাদের মধ্যে নববর্ষ, গুড্ ফ্রাইডে, ইষ্টার মনডে, বড়দিন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। খ্রীষ্টান নয় এমন অনেক লোকও এই উৎসবে যোগদান করে।

বৌদ্ধ ও জৈনদেরও নিজস্ব উৎসব আছে। বুদ্ধপূর্ণিমা বৌদ্ধদের প্রধান উৎসব। ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের দিনটিতেও বৌদ্ধদের উৎসব হয়।

জৈনদের উৎসব তীর্থঙ্করদের জন্মদিবস, তিরোধান দিবস প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া হয়। শিখদের প্রধান উৎসব গুরু নানকের জন্মোৎসব।

স্থষ্টিকর্তা পুরুষ ও নারীকে সমান শক্তির অধিকারী করেন নাই। পুরুষ প্রধানতঃ শৌর্যবীর্যের অধিকারী, নারীতে আছে স্নেহ, মায়া, মমতা। দুইয়ে মিলিয়া সংসার চালায়। পুরুষের মন সাধারণতঃ বহির্মুখী,—নারীর টান ঘরের দিকে। পুরুষ গৃহে যাহা কিছু বিশৃঙ্খলার স্বষ্টি করে, নারী তাহাকে সুশৃঙ্খলতার মধ্যে লইয়া আসে। এককে ছাড়া অপরের চলে না।

জগতে যখন দুইয়েরই দরকার আছে, তখন শিক্ষার ব্যাপারে একজন শিক্ষালাভ করিবে, আর অপরের নিকট জ্ঞানের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে—এরূপ মনোবৃত্তির কোন অর্থ হয় না। অবশ্য আধুনিক যুগে এরূপ মনোবৃত্তি একরূপ দূর হইয়াছে। যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষা চাহেন না, তাঁহারা বলেন লেখাপড়া শিখিতে গিয়া মেয়েরা সমাজব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিবে। তাহারা স্বামীকে সম্মানের চক্ষে দেখিবে না, গৃহকর্মের ব্যাঘাত হইবে। সন্তানসন্ততি অবহেলিত হইবে। শিক্ষাদ্বারা লোকের উন্নতি হইয়া থাকে। যাহাতে অবনতি বা মানুষের অধোগতি হয় তাহা শিক্ষা নহে। সুশিক্ষিতা নারী নিজের গৃহের কল্যাণ কিসে হয়, তাহা ভালভাবেই বুঝিবেন। সর্বদিকের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সুবিবেচনার সহিত সব কিছু করিবেন। উন্নততররূপে জীবনযাপন করিবার জন্যই তো শিক্ষার আবশ্যক।

প্রাচীন ভারতবর্ষও মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কন্যা, ভগিনী, বধূ, পত্নী, মাতা সকলেরই তো সমাজে নির্দিষ্ট স্থান ও মর্যাদা ছিল। ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদেরও গুরুগৃহে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল। নারীদের অনেকে শিক্ষা সমাপ্তির পর গৃহস্থাশ্রমে বধূরূপে প্রবেশ করিতেন, অনেকে সংসারে না ফিরিয়া ব্রহ্মবাদিনীরূপে জীবন কাটাইতেন। গৃহস্থ বধূদের ভিতরেও অনেকে 'ব্রহ্ম বিদুষী' ছিলেন। কুন্তি ও গান্ধারী ইঁহাদের উদাহরণ। ব্রহ্মবাদিনী গার্গীর কথা সকলেরই নিকট পরিজ্ঞাত। কালক্রমে সুদূর গুরুগৃহে গমনাগমনের অসুবিধা হওয়ায় বা বিদেশী আক্রমণে দেশের নানা বিপর্যয় বা অন্য যে কোন কারণেই হউক নারী গৃহের গণ্ডী ছাড়িয়া বাহির হইতে পারে নাই।

প্রাচীন শিক্ষার সুযোগ হইতে নারী বঞ্চিত হইল। এই সব অসুবিধার মধ্যেও যুগে যুগে আমরা জ্ঞান বিষয়ে নারীর কৃতিত্বের খবর পাইয়া থাকি। নারী প্রাচীন যুগ হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত উচ্চ চিন্তার ক্ষেত্র হইতে একেবারে বঞ্চিত হয় নাই। কিন্তু নারী শিক্ষার ব্যাপক সুযোগ লাভ করে নাই। লোকশিক্ষার ভিতর দিয়া নারী শিক্ষা লাভ করিয়াছিল, তাহাই হইয়াছিল তাহার জীবনযাত্রাপথের সম্বল।

বিদেশী ইংরেজ-শাসকগোষ্ঠী যেমন ভারতের উপর এক অদ্ভুত শিক্ষা ব্যবস্থা

চাপাইয়া দিয়া দেশের পুরুষগণকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিল, তেমনি ভারতের কন্যাগণ যাহারা এ শিক্ষা লাভ করিল পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা না হইল এদেশের না-বিদেশের। ইংরেজ ভারতকে যে শিক্ষা দিয়াছে তাহাতে ভারতবাসী নিজের প্রাচীনকে হারাইয়াছে, আর নূতন হইতে জীবনসংগ্রামে জয়ী হইবার শক্তি সঞ্চয় করিতে পারে নাই। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার যতই গুণগান লোকে করুক না কেন এই সত্যকে কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না।

আমাদের দেশ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ভারতকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। তাহার শিক্ষাব্যবস্থারও প্রয়োজনমত পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে—ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাপদ্ধতি ত্যাগ করিতে হইবে। জীবনসংগ্রামে যাহাতে জয়ী হওয়া যায় এইরূপ শিক্ষা এদেশের চাই।

বিশুদ্ধ জ্ঞানের চর্চায় স্ত্রীপুরুষের কোন ভেদ থাকিতে পারে না, সুতরাং জ্ঞানের ব্যাপারে স্ত্রীশিক্ষা আর পুরুষের ভেদ রহিয়াছে। নারীকে সন্তান প্রতিপালন ও গৃহস্থালি রক্ষার ব্যাপারে বিশেষ শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন গৃহস্থালির কাজ মেয়েরা গৃহেই তো শিক্ষা করিতেছে—তবে তাহার জন্য ব্যবস্থার কোন দরকার আছে বলিয়া মনে হয় না। সকল লোকেরই উন্নততর জীবন যাপন কাম্য। তবে মেয়েরা যাহা শিখে—তাহাই পরম ও চরম শিক্ষা নহে, তাহাকে বর্তমান যুগের জীবনযাত্রার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া পরিবর্তিত করিতে হইবে।

লোকের জীবনযাত্রার প্রণালী ক্রমশঃ জটিলতর হইয়া উঠিতেছে—জীবন-সংগ্রামও তীব্র আকার ধারণ করিতেছে। নারীর গৃহকার্য ছাড়াও সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহে পুরুষকে উপার্জনের দিক দিয়া সহায়তা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। একজনের আয়ে সংসার যেন অচল হইয়া পড়িয়াছে। আগেকার দিনে একান্নবর্তী পরিবার বা যৌথ পরিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। এখন তাহার অভাব হইয়া পড়ায় নারীর উপার্জনের প্রশ্ন উঠিয়াছে। নারী এ উপার্জন গৃহে বা গৃহের বাহিরে করিতে পারে। গৃহে কুটির শিল্প অবলম্বনে ইহা করা যাইতে পারে। সুতরাং মেয়েদের বৃত্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব এই দিক দিয়া দিন দিন বাড়িতেছে। গৃহকর্মকে সহজ এবং সরল না করিতে পারিলে, শিল্প নির্মাণ বা বাহিরের কাজ করিবার সময় কাহারও মিলিবেনা। প্রয়োজনের অনুরূপ জীবনযাত্রার সকল দিক দিয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

যে দেশে পুরুষের বেকার সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে সেখানে নারীর উপার্জনের ক্ষেত্র স্বভাবতই সংকীর্ণ। অফিস বা বিদ্যালয়ের কাজ পুরুষের সঙ্গে ভাগ করিয়া লইয়া নারীর জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া কঠিন। যেখানে কার্যে বা বৃত্তিতে নারীর স্বাভাবিক প্রবণতা আছে—সেই সব দিকে নারীকে চালিত করিতে হইবে। সূচীশিক্ষা, রন্ধন, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, শিশুমনস্তত্ত্ব, চিত্রবিদ্যা, গৃহসজ্জাবিদ্যা র অভ্যাসে সুফল ফলিবে। সমাজে নারী—মাতা, পত্নী ও কন্যা। নারীর শিক্ষা

অবহেলিত হইলে সমাজযন্ত্র বিকল হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—"এক পক্ষ পক্ষী কখনও উড়িতে পারে না।" নারীর সাহায্য ছাড়া জগৎ বিকল হইয়া পড়িবে। নারা হইবে পুরুষের সর্বকর্মে সহায়। ইহা বিবেচনা করিয়া নারীর শিক্ষা-পদ্ধতির পরিকল্পনা করিতে হইবে।

গৃহশিক্ষা

প্রকৃত শিক্ষা বলিতে কতকগুলি শব্দ শিক্ষা বুঝায় না। বই পড়িয়া নানা জ্ঞান আহরণ করাকেও শিক্ষা বলা চলে না। প্রকৃত শিক্ষাদ্বারা মানুষ এমনভাবে গঠিত হইবে যে তাহার ইচ্ছাশক্তি সদ্‌বিষয়ে ধাবিত হইবে। লোকের নিজের বা জগতের কল্যাণকর কাজের জন্য যখন মন স্বতঃই ধাবিত হইবে—তখনই শিক্ষার ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে বুঝিতে হইবে।

গৃহেই আমাদের শিক্ষার সূত্রপাত হয়। শিক্ষা নির্ভর করে সংযম ও শৃঙ্খলার উপর। প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় "গৃহ" শব্দের অন্যতম প্রতিশব্দ হইতেছে 'দম'। দম্ ধাতুর অর্থ 'নিয়ন্ত্রণ করা', 'সংযত করা'। যেখানে সর্বপ্রকার অনিয়ম বা উচ্ছৃঙ্খলতাকে সংযত করা হয় তাহার নাম দম বা গৃহ। নিজেকে মানুষ করিতে গেলে পারিবারিক প্রভাব বিশেষ করিয়া লোকের উপর কাজ করে, আর যে অমানুষ হয় অনেকক্ষেত্রে পারিবারিক প্রভাবই তাহাকে অমানুষ বা অকর্মণ্য হইবার কু-প্রেরণা দিয়া থাকে।

গৃহ বলিতে মাতা, পিতা, ভাই, ভগ্নী, অন্যান্য আত্মীয়স্বজনকে লইয়া যে গৃহ তাহাই বুঝায়। লোকের স্নেহ, প্রেম, মায়া, মমতা, সমবেদনা গৃহেই বিকশিত হয়। যে শিশু গৃহে মাতাপিতা পরিজনের নিকট হইতে প্রেমপূর্ণ ব্যবহার পায়, তাহার আচরণও পরবর্তী জীবনে প্রেমপূর্ণ হয়। চরিত্রগত দৃঢ়তা ও শক্তি বালক অল্প বয়স হইতে ধীরে ধীরে তাহার মাতাপিতার নিকট হইতে অর্জন করে। ত্যাগবুদ্ধিও পিতামাতার নিকট হইতে বালকেরা পাইয়া থাকে। বালককে সত্যভাষণ শিক্ষা দিতে গেলে পিতামাতাকে সত্যভাষী হইতে হয়, অন্যায় কাজ করিলেও বালককে শাস্তিদানের পরিবর্তে ভুল বুঝাইয়া দিয়া সত্যভাষণে উৎসাহিত করা দরকার। বালকের স্বাবলম্বী হইতে হইলে পিতামাতার প্রভাব দ্বারাই তাহা সম্ভবপর হইবে। যে গৃহে পিতা বা মাতা স্বাবলম্বী সেখানে বালকেরা স্বাবলম্বী হইয়া থাকে। অল্প বয়সে বালকদের অনুকরণপ্রিয়তা অত্যন্ত প্রবল হইয়া থাকে। তাহারা যাহা দেখে তাহাই শিখে।

যে বাড়ির লোকেরা নিজেদের চালচলনে কোন নীতির ধার ধারে না সেখানে বাড়ির প্রত্যেকটি বালকের নিকট নিয়ম ও শৃঙ্খলার কোন মূল্য নাই। অনেক বাড়ির বালক ও যুবক বাহিরের লোকের সহিত মিশিতে পারে না, অপরিচিত লোকের নিকট কাজ আদায় করিতে পারে না—জীবনসংগ্রামের মধ্য হইতে

অপরের নিকট হইতে কোন সুখসুবিধা আহরণ করিতে অক্ষম। এই সকল স্থলে বুঝিতে হইবে এইরূপ বালক ও যুবকের গৃহশিক্ষা ক্রটিপূর্ণ।

বালক বা যুবক স্কুল বা কলেজে দিনের যতটা সময় কাটায় তাহার চেয়ে বেশি সময় কাটায় গৃহে। সুতরাং লোকের চরিত্রগত উন্নতি বা অবনতি বিশেষ-ভাবে নির্ভর করে তাহার গৃহের প্রভাবের উপর। বিদ্যালয়ে কয়টি ছাত্রের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিক্ষকের সহিত মেলামেশা করিবার সুযোগ হয়? আর সাক্ষাৎলাভ হইলেই কতটুকু সময়ের জন্য তিনি ছাত্রের সহিত মিশিতে পারেন?

মানুষের চরিত্র গঠন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গৃহের পরিবেশের উপর নির্ভর করে। যে বাড়ির লোকেরা চিরকাল ভাল কাজ করিয়া আসিয়াছে—সেই বাড়ির ছেলেদের মধ্যে সর্বদাই একটা আত্মাভিমান থাকে। এই কারণে ভাল বংশের ছেলেরা কখনও অন্যায়ের সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে পারে না। এইরূপ আত্মাভিমানের ফলে তাহারা কখনও কোন অন্যায়ের পথে চলে না। এই প্রকার অভিমানকে সাত্ত্বিক অভিমান বলে। বংশ-পরম্পরায় সৎকার্যদ্বারা এই সাত্ত্বিক অভিমান গঠিত হইয়া থাকে।

যে বাড়ির লোকেরা নিজেদের চালচলনে কোন নীতির ধার ধারে না, বাড়ির প্রত্যেকটি কাজ বিশৃঙ্খলভাবে চলে, প্রতারণা-প্রবঞ্চনা যেখানকার দৈনন্দিন আচরণের অংশ, সে বাড়ির ছেলেরা গৃহ হইতেই উচ্ছৃঙ্খলতায় অভ্যস্ত হয়। ইহার হাত হইতে এই সকল দুর্নীতিপরায়ণ বালক বা যুবকদিগকে কেহ রক্ষা করিতে পারে না। মানুষ তাহার অভ্যাসের দাস। একবার কদাচার অভ্যাসে পরিণত হইলে উহা পুরুষানুক্রমে চলিতে থাকে।

গৃহের শিক্ষা সকল শিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ। বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিপূরক মাত্র। গৃহের অভিভাবকদের সক্রিয় সাহায্য ব্যতীত বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা শিক্ষার উন্নতি হইতে পারে না। প্রাচীন যুগে ছাত্রের উপর গুরুর প্রভাব বেশি ছিল। তাহার কারণ ছাত্রগণ গুরুর সহিত একপরিবারভুক্ত হইয়া বাস করিত। গুরুর পরিবারের সুখদুঃখের সহিত ছাত্র নিজের সুখদুঃখকে জড়িত করিয়া রাখিয়াছিল। যে যুগে গৃহের প্রভাব বলিতে ছাত্রের উপর গুরু-গৃহের প্রভাবকে বুঝাইত। গুরুগৃহই ছিল ছাত্রের পক্ষে নিজ নিকেতন। অপরকে নিজের করিয়া লইবার শিক্ষা প্রাচীনকালে গুরুগৃহে যেরূপভাবে হইত এখন তাহার সম্ভাবনা নাই।

এখন প্রাচীন গুরুগৃহের অবসান হইয়াছে। সম্মিলিত পরিবারের গৃহ যেখানে সেখানে সকলে ছিল এক। সম্মিলিতভাবে নিয়মশৃঙ্খলার সহিত একত্র বাস করিবার শিক্ষা এখানে যেরূপ হইত অন্যত্র সেরূপ হইতে পারে না। পরকে আপন করা বড় কঠিন কাজ। ইহার পর সম্মিলিত পরিবারের প্রভাব কাজ করিত নিজ গৃহে।

এখন প্রাচীন গুরুগৃহের অবসান হইয়াছে। সম্মিলিত পরিবারের গৃহ যেখানে সকলে সকলের জন্য ভাবে তাহারও অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়াছে।

বর্তমানে যে ক্ষুদ্র গৃহটুকু তাহার ছোট গণ্ডী গড়িয়া বাঁচিয়া আছে, তাহাতে যতটা সম্ভব ততটা সংযম, সমবেদনা, শৃঙ্খলা যদি বজায় রাখা যায়, ভবিষ্যৎ বংশধরদের পক্ষে তদ্দ্বারা মঙ্গল হইবে। গৃহে সংযম অভ্যাস ও চরিত্র গঠন না হইলেই বালকের ভবিষ্যৎ সর্বদিক দিয়াই অন্ধকার।

ছাত্রজীবন

ছাত্র কথার ব্যাপক অর্থ জ্ঞান আহরণকারী ব্যক্তি। জ্ঞান আহরণ করিবার আগ্রহ অনেক লোকের সারাজীবন ধরিয়া থাকে। সুতরাং যে কোন জিজ্ঞাসু লোকই ছাত্র। কিন্তু সাধারণতঃ ছাত্র বলিতে লোকে বোঝে স্কুল বা কলেজে যাহারা পড়ে, তাহারাই ছাত্র। শিশু, কিশোর, যুবক এই তিন অবস্থার লোকই ছাত্র। ছাত্রজীবন বা বিদ্যা অর্জনের জীবনকে জীবনের চারিটি ভাগের মধ্যে প্রথম ভাগ বলিয়া মনে করা হয়। ইহার পর লোকে হয় গৃহস্থ। বিবাহ করিয়া তখন লোকে সংসারী হয়—সঙ্গে সঙ্গে অর্থ উপার্জন করিতে হয়। ইহার পর কর্মক্ষমতা যখন কমিয়া আসে তখন সংসারে থাকিয়াও কেহ সংসারের কোন কাজে লিপ্ত হয় না। প্রাচীন যুগে এই সময়কে লোকে বলিত বানপ্রস্থ। এ যুগে উহাকে বলা হয় কর্ম হইতে অবসর গ্রহণকাল। ইহার পরের অবস্থায় সারা জীবনের ভালমন্দ কাজের হিসাব-নিকাশ লোকে প্রস্তুত করে। তাহাকে জগৎ ছাড়িবার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়।

জীবনের প্রথম ভাগ বা ছাত্রজীবন যাহারা অবহেলায় কাটায় তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন প্রস্তুতির অভাবে নষ্ট হইয়া থাকে। লোকের ভবিষ্যৎ জীবনের গোড়াপত্তন হয় এই ছাত্রজীবনে। সুতরাং প্রথম বয়সে বিদ্যা অর্জন না করিলে, ছাত্রজীবনের পর লোকে ধনার্জন করিতে পারে না। লাভক্ষতির বিবেচনা করিয়া লোকে সাধারণ বা বিশেষ বিদ্যার অভ্যাস করে। জগতে বিদ্যারও অন্ত নাই—জ্ঞানেরও পরিসীমা নাই। যাহাদ্বারা অর্থ-সম্পদ ও কল্যাণ লাভ হইবে এইরূপ বিদ্যার অর্জন ছাত্রজীবনেই আরম্ভ করিতে হইবে।

বিদ্যাভ্যাস সাধনাবিশেষ। যে সাধনা করিবে তাহারই সিদ্ধি হইবে। 'শ্রমানুসারিণী বিদ্যা'—যে ব্যক্তি যেরূপ পরিশ্রম করিবে সে তদনুরূপ বিদ্যালাভে সমর্থ হইবে। অল্প বয়সেই হউক বা বেশি বয়সেই হউক বিদ্যাভ্যাসকে সাধনা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

অল্প বয়সে বালকের মন খেলার দিকে বেশি ঝুঁকিতে আরম্ভ করে—খেলা হইতে পাঠের দিকে তাহার মনের গতি ফিরাইতে হইলে আনন্দের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে জ্ঞান চর্চার দিকে তাহাকে প্রবর্তিত করিতে হইবে।

বিদ্যার্থীরা দেশের ভবিষ্যৎ আশাভরসার স্থল। আজ যে ছেলে ছাত্র, কাল সে হইবে দেশনেতা, দেশের নাগরিক। সুতরাং তাহার উপর নির্ভর করিবে একটা জাতির ভবিষ্যৎ। সুতরাং ছাত্রজীবনেই বিদ্যার্থীর দায়িত্ববোধ জাগ্রত

হওয়া দরকার। ছাত্রগণকে প্রথমে ছোটখাটো কাজের দায়িত্ব হাতে লইতে হইবে। তাহাদিগকে ক্রমশঃ বড় বড় দায়িত্ব পালন করিবার শক্তি অর্জন করিতে হইবে। বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রকে রোগীর সেবা বা অন্য প্রকারের সমাজ কল্যাণমূলক কার্যে নামিতে হইবে। প্রভু সকলেই হইতে চায়, কিন্তু অপরের সেবাব্রত গ্রহণ করা কঠিন কাজ। অপরের সেবা না করিলে অপরের উপর প্রভুত্ব করিবার কাহারও অধিকার থাকে না। পুস্তকে নানা ভাল কাজের উপদেশ সকলেই পড়িতে পারে, কিন্তু কাজ করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

ভারতের প্রাচীন শিক্ষায় ছাত্রগণকে অনেক সময়ে পুঁথিগত বিদ্যা না শিখাইয়া উদার উন্মুক্ত প্রকৃতিতে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। শিক্ষার্থী উদার প্রকৃতির মধ্যে নিমগ্ন থাকিয়া তাহার মধ্য হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিত। গুরু ছাত্রের উপর অনেক সময় কঠিন কাজের দায়িত্ব আরোপ করিয়া তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিতেন। যে শিক্ষার সহিত দেশ, গ্রাম, সমাজের সহিত কোন সম্পর্ক নাই, সে শিক্ষা শিক্ষা নহে। এখনকার দিনেও অনেক দেশে বিদ্যার্থীকে নিজের গ্রাম, দেশের জনগণের সহিত সম্পর্ক রাখিবার শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

কোন কোন দেশের শিক্ষার্থী নিজের দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র ভ্রমণ করিতে যায়। দেশ ভ্রমণে যে জ্ঞান সঞ্চয় হয় তাহা পুস্তক পাঠে সম্ভবপর নহে।

একজাতীয় শিক্ষার চাপ এ দেশের ছাত্রগণের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। এ শিক্ষা ভারতেরও নহে, বিদেশেরও নহে। যদি ভারতের বাহিরের পাশ্চাত্ত্য কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের এই শিক্ষা হইত তবে সেই সব দেশের ছাত্রদের মতই এদেশের ছাত্রগণও জীবন যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিত। আর যদি এ শিক্ষা ভারতের হইত তবে ও শিক্ষায় শিক্ষিত লোক দেশের সেবা ও সমস্যা হইতে কোন ক্রমেই দূরে সরিয়া থাকিত না। এ শিক্ষায় পরীক্ষার সাফল্যের উপর যত জোর দেওয়া হয়, জীবনের বিপুল কর্মক্ষেত্রে মানুষের মত চলিবার সামর্থ্য অর্জনের দিকে ততটা জোর দেওয়া হয় না। ফলে ছাত্রগণের শক্তির অপচয়ে প্রাণপণে ইহাকে কেহ গ্রহণ করে না। লেখাপড়া শিখিলেও অধিকাংশ লোকের উপযুক্ত কাজ জোটে না, না শিখিলেও লোকে প্রায় একই অবস্থার সম্মুখীন হয়।

ছাত্রসমাজ ও রাজনীতি

রাজনীতি প্রাচীন ভারতবর্ষে শিক্ষার অঙ্গরূপে পরিগণিত হইত। রাজপুত্রগণকে পড়িতেই হইত, আর অন্য ছাত্রদিগেরও ইহা পাঠ্য ছিল

এ যুগে স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিকের ইহা শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। রাষ্ট্রনীতিক জ্ঞানের অভাবে কোন স্বাধীন দেশের নাগরিক রাষ্ট্রের প্রতি তাহার কর্তব্য সমাধা করিতে পারে না। ব্যবহারিক রাষ্ট্রনীতির সহিত ছাত্রসমাজের সম্পর্ক কিছু থাকা উচিত কিনা তাহার আলোচনা করা দরকার।

প্রাচীন যুগের দেশের পরিস্থিতির সহিত বর্তমান অবস্থার তুলনা চলে না।

প্রাচীন কালের ছাত্রগণ তাহাদের সময়ে কোন রাজনীতিক আন্দোলনে যোগ দিত কিনা তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। হয়তো সে যুগের ছাত্রেরা আবশ্যিক অন্য শাস্ত্রের মত রাজনীতিরও চর্চা করিত।

বর্তমান যুগেও পৃথিবীর বহু দেশে শিক্ষার নিম্নস্তর হইতে উচ্চ শিক্ষায় রাজনীতিশাস্ত্রের অনুশীলনের ব্যবস্থা আছে। উচ্চ শিক্ষায় ছাত্রগণদ্বারা কৃত্রিম রাষ্ট্রপরিষদ্ গঠন করাইয়া উহার পরিচালনার ব্যবস্থা আছে, কারণ এইরূপ শিক্ষা পূর্ব হইতে গ্রহণ না করিলে ভবিষ্যতে রাষ্ট্র পরিচালনায় বড় অসুবিধা হইয়া থাকে। পৃথিবীর যে সকল দেশ আত্মনিয়ন্ত্রণ দ্বারা বিদেশীর শাসন-শৃঙ্খল হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিয়াছে, সে সকল স্থানের ছাত্রগণ মুক্তি আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে। প্রবীণরা আদর্শ স্থাপন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের আদর্শ অনুযায়ী কার্য করিতে অগ্রসর হয় নবীনেরা। নূতন ভাবধারা গ্রহণ করিবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা যোগ্য হইতেছে উদীয়মান ছাত্র-সমাজ। জাতির জীবনে এমন সংকটাপন্ন সময় আসে, যখন ক্ষিপ্রতার সহিত কাজে না নামিলে বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় না বা সম্পদও আহরণ করা চলে না। ছাত্রসমাজকে সংকট নিবারণের জন্য অগ্রসর হইতে হয়। ভারতের স্বাধীনতা যজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়াছে কত ছাত্র—তাহার হিসাব কে রাখে! প্রয়োজনের লঘুত্ব গুরুত্বের উপর সব কিছুর ঔচিত্য অনৌচিত্য নির্ভর করে। জাতির বৃহত্তর প্রয়োজনে সকলেরই সব কাজ করিতে হয়।

অনেকে বলিয়া থাকেন ছাত্রসমাজ শুধু পড়াশুনা লইয়া থাকিবে—'ছাত্রাণামধ্যয়নং তপঃ'। রাজনীতির চর্চা তাহাদের কাজ নহে। রাজনীতির চর্চায় মনোনিবেশ করিলে পড়াশুনা নষ্ট হয়, ছাত্রদের বৃহত্তর জীবনের প্রস্তুতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। পড়াশুনার দিকে মন না দিয়া কেবল রাজনীতির চর্চা করিলে ছাত্রসমাজ পরিণামে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

কিন্তু দিন দিন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি পরিবর্তিত হইতেছে। এরূপ অবস্থায় সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ভালমন্দ বিচার ছাত্রসমাজ যদি না করে তবে ভবিষ্যৎ জগতের সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া তাহারা চলিতে পারিবে না। দেশকে জাতিকে বাঁচাইতে হইলে ছাত্রসমাজ দেশের জাতির ও সমাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবে।

অতীতে ভারতের ছাত্রসমাজ দেশের মুক্তির জন্য রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া চিরকালই তাহারা সেইরূপ করিতে থাকিবে এরূপ যুক্তিও অচল। দেশের অস্বাভাবিক অবস্থা অতীত হইয়াছে। এখন ছাত্রগণকে সুনির্দিষ্ট কর্মপথে চলিতে হইবে। জ্ঞানলাভ এবং সৎকর্মদ্বারা ছাত্রসমাজের চরিত্রগঠন নিতান্ত দরকার।

ছাত্রগণ দেশের অবস্থানুযায়ী রাজনীতির চর্চা করিবে যাহাতে দেশ কল্যাণের দিকে অগ্রসর হয়। রাষ্ট্রিক চেতনা ছাড়া নাগরিক অধিকার লাভ করা যায় না।

এই চেতনাকে জাগাইবার জন্য ছাত্রসমাজের রাজনীতি চর্চা আবশ্যক। ছাত্রেরা নিজেরা রাজনীতিতে পারদর্শী হইবে—এবং যাহারা এ বিষয়ে অজ্ঞ তাহাদিগকে জ্ঞানবান্ করিয়া তুলিবে। মুক্তির অর্থ শুধু নিজের মুক্তি নহে—"মুক্তশ্চান্যান্ বিমোচয়েৎ" (মানুষ নিজে মুক্তি লাভ করিয়া অপরকে মুক্ত করিবে)।

রাজনীতির চর্চায় ছাত্রসমাজের বিপদ অনেক আছে—বিশেষ করিয়া এই জন্যই দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা রাজনীতির চর্চা হইতে ছাত্রগণকে দূরে থাকিতে বলেন। ছাত্রগণের শিক্ষা, হৃদয়ের কোমলবৃত্তি, ভাবপ্রবণতা এবং অতি দ্রুত কোন মত গ্রহণের সুযোগ লইয়া কোন না কোন রাজনীতিক দল তাহাদিগকে নিজের আয়ত্তের মধ্যে লইয়া আসিবার চেষ্টা করে এবং ছাত্রগণ পথভ্রষ্ট হয়। এই সব দলের হাতে পড়িয়া ছাত্রগণ ন্যায়-অন্যায় উপেক্ষা করিয়া দেশের সেবার পরিবর্তে দলগত স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগিয়া যায়। ইহাতে যেমন একদিকে পড়াশুনা নষ্ট হয় তেমনই অপরদিকে দেশের শান্তিভঙ্গ হয় এবং উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পায়। ছাত্রগণ কারণে অকারণে সময়ে অসময়ে একমাত্র ধর্মঘটকে কার্যসিদ্ধির উপায় বলিয়া গ্রহণ করেন। ছাত্রসমাজের শক্তি, সামর্থ্যের অপচয় কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে।

শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, আত্মিক শক্তি মনুষ্যত্বলাভের সাধনায় ব্যয়িত হওয়া উচিত। যে সব ছাত্র এইরূপ চিন্তা করে এবং নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে যাহারা সর্বক্ষণ জাগ্রত সেইসব ছাত্রেরাই রাজনীতি চর্চার অধিকারী। অসংযত শৃঙ্খলা-বিহীন রাজনীতি-চর্চার মধ্যে উত্তেজনাই হয় প্রবল—লোকসেবার কাজ সেখানে কেহ আশা করিতে পারে না।

চিত্রবিদ্যা

চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যার অন্যতম বিদ্যা হইতেছে চিত্রবিদ্যা। সাহিত্য ও সংগীতের যেমন অপরিসীম আনন্দ সৃষ্টি করাই মুখ্য উদ্দেশ্য চিত্রবিদ্যারও ঠিক তাহাই উদ্দেশ্য। সাহিত্য যেমন প্রকৃতির অনুকরণ চিত্রবিদ্যাও ঠিক তাই। রেখার সাহায্যে তুলির ব্যবহারে প্রকৃতিকে আমাদের সম্মুখে চিত্রকর উপস্থিত করেন। চিত্রকর হইতেছেন কবির মতোই শিল্পী। কবি শব্দ দ্বারা আপাততঃ যাহা প্রকাশ করেন, তাহার অর্থ আরো গূঢ়—শব্দে শুধু তাহার আভাসমাত্র আছে। চিত্রকর রেখায় বা তুলিতে তাহার রূপ দিয়া থাকেন তাহারও লক্ষ্য এক অনির্বচনীয় বস্তু।

জগতে অনেক বস্তুর আনন্দ সৃষ্টি করা ছাড়া ব্যাবহারিক চাহিদা মিটানও একটা কাজ আছে। নদীর জলে তৃষ্ণা নিবারণ একটা প্রয়োজনীয় ব্যাপার—তাহার কলধ্বনি ভাবুকের মনে আনন্দ প্রবাহের সৃষ্টি করে।

ব্যবহারিক জীবনে চিত্রের প্রয়োজনীয়তা বড় কম নহে। যে কোন শিল্প নির্মাণে চিত্রবিদ্যার জ্ঞান দরকার। মৃৎশিল্পী চিত্রবিদ্যার জ্ঞানদ্বারা ছাঁচ নির্মাণ করিয়া থাকে, কাষ্ঠশিল্পী প্রথমে বস্তুটির চিত্র অঙ্কিত করিয়া তারপর তাহা দেখিয়া

বাটালি দিয়া খোদাইর কাজ করে। ইঞ্জিনীয়ার বাড়ির চিত্র প্রথমে অঙ্কন করেন, তারপর তদনুসারে রাজমিস্ত্রী ও মজুরগণই বাড়ি তৈয়ারি করে, কারখানার সমস্ত উৎপাদ্য দ্রব্যের চিত্র পূর্বে অঙ্কিত করেন, কলকব্জা বসাইবার পূর্বে উহাদের চিত্রাঙ্কণ দরকার।

পাঠপ্রদান কালে শিক্ষককে চিত্রের সাহায্য অনেক সময়ে লইতে হয়। মুখে কিছু বলার চেয়ে চিত্রে দেখাইলে ছাত্রের জ্ঞান পরিস্ফুট হয়। আদালতে মামলা চালিবার সময় ঘটনাস্থলে নক্সা বিচারক দেখিতে চাহেন যাহাতে তিনি বিষয়টির ভালভাবে ধারণা করিতে পারেন।

চিত্রবিদ্যার চর্চায় লোকের মানসিক উৎকর্ষও সাধিত হইয়া থাকে। লোকে তাহাদের কল্পনাকে চিত্রে রূপায়িত করিতে পারে। চিত্র ছাডা অরূপকে রূপ দেওয়া যায় না। চিত্রবিদ্যার রেখায় ও বর্ণের প্রভাব গুণকে রূপ দেওয়া যাইতে পারে। সূর্যের আলোকে কমল-কোরকের বিকাশের ছবি জ্ঞানের উদয়ে হৃদয়ের প্রসারের সূচনা করিয়া থাকে। সাদা রঙ্ জ্ঞানের প্রতীক, নীল বা কালো রঙ অসীম অনাদি অনন্তের আভাস দিয়া থাকে, রক্ত সৃষ্টিকে বুঝায় (সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার রঙ্ লাল) সবুজ রঙ্ নবীনতার প্রতীক।

চিত্রবিদ্যা অতি প্রাচীন বিদ্যা। মানুষের মধ্যে শিক্ষা সংস্কৃতির যখন বিশেষভাবে বিকাশ হয় নাই তখনও আদিম মানুষ গৈরিকাদি ধাতু দিয়া শিলায় চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে—পশুচর্মের উপর চিত্রকার্য সম্পন্ন করিয়াছে।

প্রাচীন ভারতবর্ষে হাজার হাজার বছর পূর্বে চিত্রবিদ্যার সমুন্নতি হইয়াছিল। রাজা, রাজকন্যা, গৃহস্থ কন্যারা ছবি আঁকিতেন। তখন চিত্রবিদ্যা শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ ছিল, চিত্রাঙ্কন না করিলেও শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই ছবির তাৎপর্য বুঝিতেন। কালিদাসের সময়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বুঝিবার সুবিধার জন্য মহাকবি অনেক স্থানে চিত্র সংক্রান্ত উপমা ব্যবহার করিয়াছেন। কালিদাসের বহু পূর্বে অজন্তার গুহায় চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল। মোগল ও রাজপুত চিত্রের দুইটি ধারা বহুকাল ভারতবর্ষে চলিয়াছে।

আধুনিক যুগে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁহার শিষ্যগণ প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের ধারাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতীয় চিত্রশিল্পে ভাবেরই প্রাধান্য। শরীরাবয়ব সংস্থান শরীর বিদ্যানুমোদিত না হইলেও তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। জগতের প্রত্যেক জাতিরই একটা জীবনদর্শন বা বিশিষ্ট চিন্তার ধারা আছে। শিল্প তাহার প্রকাশক। যদি কোন চিত্রকর কোনো মূর্তি অঙ্কিত করে, এবং যদি চিত্রকর উক্ত মূর্তির দেহের বিভিন্ন অংশের বিজ্ঞানসম্মত মাপের সামঞ্জস্য না রাখিয়া মূর্তিতে কোন বিশেষ ভাব ফুটাইয়া তুলিতে পারে তবেই চিত্রকরের সাফল্য প্রাচীন ভারতবর্ষ স্বীকার করিয়া লইত। আধুনিক ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থানে সরকার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের এবং কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় চিত্রবিদ্যা

শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া সর্বসাধারণের চেষ্টায় বা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ভারতে বহু চিত্রাঙ্কন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে।

পাশ্চাত্ত্য চিত্রবিদ্যা, বাণিজ্যিক চিত্রবিদ্যা, ভারতীয় চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি নানা বিভাগে বিভক্ত। এই বিদ্যা বহুলোকে এ যুগে অর্জন করিতেছে।

ভারতীয় সংগীত

সুপ্রাচীন কাল হইতেই ভারতে সংগীত বিদ্যা প্রচলিত আছে। ভারত, মিশর ও চীন দেশ ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন দেশের অতি প্রাচীনকালে সংগীতের চর্চার খবর পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপোবনে।"

সামমন্ত্রের গানের বিভিন্ন সুর আজও ভারতে গীত হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞে উত্তরমন্দ্রা সুরে রাজস্তুতি গীত হইত। গুপ্ত যুগে ভারতীয় সংগীতের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। মহাকবি কালিদাসের বিভিন্ন কাব্যনাট্য বৈতালিকের রাজস্তুতি গানে রাজপ্রাসাদ ধ্বনিত হইত, সংগীতশালায় রাজকন্যা আর রাজরানীদের সংগীত চর্চা চলিত. কৃষকবধূরা শস্যক্ষেত্র রক্ষার সময়ে গান গাহিত। মন্দিরে মন্দিরে দেবতার স্তুতিসংগীত চলিত। প্রাচীন ভারতের গুরু পরম্পরায় অন্য বিদ্যা শিক্ষার মতোই সংগীতবিদ্যার ধারা অব্যাহতভাবে চলিয়া আসিয়াছে। ভারতের ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় পুরুষানুক্রমে সংগীতব্যবসাকারী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইঁহাদের কায ছিল পৃষ্ঠপোষকদের তৃপ্তি বিধান।

ভারতে বর্তমানকালে প্রাচীন ভারতীয় রীতির উপর নির্ভরশীল প্রধানতঃ দুইটি সম্প্রদায় রহিয়াছে।—একটি উত্তর ভারতের হিন্দুস্থানী সম্প্রদায় অপরটি দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটী সম্প্রদায়। উত্তর ভারতীয় সম্প্রদার পারস্যপ্রভাবে প্রভাবিত— আর দক্ষিণ ভারতীয় সম্প্রদায় ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য রক্ষা করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। ভারতে সমাগত পারসিকগণ সূক্ষ্ম কাজের উপযুক্ত বাদ্যযন্ত্র এদেশে প্রচলিত করিয়াছিলেন, সংগীতও ইহাদ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। ইহা ছাড়া উত্তরের ও দক্ষিণী সম্প্রদায়ের সংগীতের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। তবে রীতিবিষয়ে দুইয়ের পার্থক্য অনুভূত হয়। কাব্য, সংগীত এবং অন্য শিল্পকলায় জাতির ধ্যানধারণার প্রকাশ হইয়া থাকে। যে জাতি যেমন করিয়া ভাবে যেদিকে তাহার জীবনের লক্ষ্য তাহা তাহার শিল্পে বিকশিত হইয়া উঠে।

ভারতের সংগীত শুধু কণ্ঠসংগীত নহে। যন্ত্রসংগীত এ দেশে অত্যন্ত উন্নত ধরনের। সংগীত কার্যে ব্যবহৃত হইতে পারে এরূপ বহু যন্ত্র এ দেশে উদ্ভাবিত হইয়াছিল। ভারত এ বিষয়ে পৃথিবীর অন্য কোন দেশ হইতে পশ্চাৎপদ নহে। ভারতের অতি প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র হইতেছে বীণা। বহু প্রকারের বীণাযন্ত্র প্রচলিত ছিল। বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতীর হাতে বীণা, দেবর্ষি নারদের হাতে 'মহতী বীণা'

বিরাজিত ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীতে আলাউদ্দীন খিলজীর দরবারে সেতারের প্রচলন হয়। উত্তর ভারতবর্ষে সেতারের বাজনাই প্রধান স্থান লাভ করে। বাঙ্‌লা, পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে সংগীতশাস্ত্রে প্রবীণরা সরোদ বাজাইয়া থাকেন।

মৃদঙ্গও অতি প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র। উত্তর ভারতের মৃদঙ্গ ও দক্ষিণ ভারতের পাখোয়াজ প্রায় একই প্রকারের যন্ত্র।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকার সংগীতবিদ্যার উন্নতি ও প্রসারের জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। গত ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা "সংগীত-নাটক আকাদমি" নামক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। প্রতি বৎসর এই প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্ণাটী ও হিন্দুস্থানী সংগীত বিদ্যায় নিপুণ ব্যক্তিগণকে পুরস্কার দিয়া থাকেন। এখানকার পুস্তকালয়ে সর্বসম্প্রদায়ের গায়কের সংগীত রেকর্ডে সংগৃহীত হইয়া থাকে।

"অল-ইণ্ডিয়া-রেডিও" সাহায্যে শ্রোতৃগণকে সংগীত শুনান হয় এবং সংগীতের প্রতি লোকের যাহাতে রুচি জন্মে—এই প্রতিষ্ঠান তাহার ব্যবস্থা করে।

বেতারবার্তা

এ যুগে অতি দূরে থাকিয়া মুহূর্তমধ্যে দূরকে নিকটে পাইবার জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করিয়াছে বেতারবার্তা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বেতার আবিষ্কার সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার।

বেতারের কথা উঠিলেই বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর কথা মনে হয়। বেতার লইয়া যাঁহারা গবেষণা করিয়াছেন সেই সকল বিজ্ঞানীদের মধ্যে তিনি অন্যতম অগ্রণী পুরুষ। তারের সাহায্য ব্যতীত যখন তিনি এক প্রকোষ্ঠ হইতে অন্য প্রকোষ্ঠে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ প্রেরণ করেন তখন সকলে বিস্ময়াভিভূত হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজ বিজ্ঞানাগার হইতে তিনি নিজ গৃহে বেতার সংবাদ প্রেরণ করিয়া বিজ্ঞানীদের অধিকতর বিস্ময় উৎপাদন করেন।

কিন্তু ইটালীদেশীয় বৈজ্ঞানিক মার্কনি ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বেতার আবিষ্কারকে ব্যবহারে লাগাইবার ব্যবস্থা করেন। মার্কনি অবশ্য ফ্যারাডে, স্যার অলিভার লজ, ম্যাক্সওয়েল এবং আচার্য জগদীশের আবিষ্কারের সহায়তা গ্রহণ করেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মার্কনি বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন।

লোক দূর হইতে কথা বলিলে অপরে শোনে। দুইজন লোকের মধ্যে ব্যবধান থাকিলেও একজন দ্বিতীয়ব্যক্তির কথা শুনিতে পারে। ইহা যদি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে বহু দূরে সংবাদ শুনাইবার উপায় উদ্ভাবন করা যাইতে পারে। এই সম্ভাবিত সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া বেতার সম্বন্ধে গবেষণা চলে। লোকে কথা বলিলে আকাশের ইথারের স্রোতে বিদ্যুৎ এবং চুম্বকের সমন্বয়ে একপ্রকার তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া উহা বহুদূরে [illegible]ত হয়। কথা বলিলে নিকটের তরঙ্গ কান ধরিতে পারে। বোধশক্তির বলে ঐ শব্দকে নাড়ী মাথায় বহিয়া লইয়া গেলে মানুষ

উহার অর্থ বোঝে। এইরূপ প্রেরকযন্ত্রের সাহায্যে যখন শব্দকে আকাশে চালিত করা যায় তখন ইথারে কম্পন উপস্থিত হয় এবং উহা অতি দূর দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়ে। গ্রাহকযন্ত্র ঐ শব্দ তরঙ্গকে সংলগ্ন তারের মাধ্যমে গ্রহণ করিলে সংগীত, বক্তৃতা প্রভৃতি শব্দাকারে আত্মপ্রকাশ করে।

বেতারের সাহায্যে মুহূর্ত মধ্যে হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী স্থান হইতে দৈনিক সংবাদ পাওয়া যায়। তাহার ফলে দূর অতি নিকট হয়। এত দূরে যাহারা রহিয়াছে তাহাদের সংবাদ দিনের পর দিন অতি অল্প সময়ের মধ্যে জানিবার জন্য আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ হয়। ইহা দ্বারা খেলাধূলা, বক্তৃতা প্রভৃতির বিবরণ পাইয়া আনন্দ লাভ হয়। পৃথিবীর কোন্ প্রান্তে কি পরিবর্তন হইল কোথায় কোন বিপদ হইল তাহার সংবাদ মুহূর্ত মধ্যে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে।

বেতার পৃথিবীতে আনন্দ পরিবেশন করে। নাটকের অভিনয়ে প্রকাশ, সংগীত পরিবেশন, খেলার বিবরণ, কোন দেশের কোন মহান ব্যক্তির ভাষণ ও কার্যাবলী হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থানকারী ব্যক্তিরা উপভোগ করিতে পারে।

শিক্ষাবিস্তারে বেতার বিশেষ সহায়তা করে। গ্রামে গ্রামে বেতারের ব্যবস্থা থাকিলে, সাধারণ গ্রামীণ জনতাকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নাগরিক অধিকার সম্বন্ধে অবহিত করা যায়। বেতারের মাধ্যমে বিদেশী ভাষা ও স্বদেশের ভিন্নপ্রান্তের ভাষা শিক্ষা দেওয়া যায়। স্কুল-কলেজে বেতারে দৈনন্দিন খবর প্রকাশ করা যায়। শিক্ষার বিশেষ বিষয়ে অভিজ্ঞগণকে দিয়া ভাষণের ব্যবস্থা করা যায়। কীর্তন, কথকতা, যাত্রাগান বেতারের মাধ্যমে সকলের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া যায়, গীতা ও চণ্ডীর আবৃত্তি বহুদূরের লোককে শোনান যায়।

বেতার ভাষণ দ্বারা জনমত গঠন করা যায়। বেতার ছাড়া সর্বাধিক লোকের মধ্যে এত দ্রুত কোন দেশনেতা বা লোক-প্রতিনিধি নিজের মতবাদ প্রচার বা রাজনীতিক চেতনা উদ্বুদ্ধ করিতে পারে না।

দূরবর্তী সমুদ্রে জাহাজ বিপন্ন হইলে বেতারের সাহায্যে সহায়তা লাভের জন্য দূরে খবর পাঠান হয়। বিমান অবতরণের খবর পূর্বেই নির্দিষ্ট বিমানবন্দরে পৌঁছান সম্ভবপর হয়, সেখানে স্থানাভাব হইলে অন্যত্র অবতরণের সংবাদও বেতারের সাহায্যে দেওয়া হইয়া থাকে। বেতারযোগেই পুলিসবাহিনী দুর্বৃত্তদিগকে অনুসরণ করিবার জন্য অপর পুলিসবাহিনীর সাহায্য লইতে পারে। যুদ্ধক্ষেত্রে বেতার ছাড়া তো কোন সংবাদ সরবরাহ করাই চলে না।

ভারতবর্ষে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে হইতে বেতারের ব্যবহার চলিতেছে। ঐ বৎসর ভারতীয় বেতার প্রতিষ্ঠান (Indian Broadcasting Company) কলিকাতা এবং বোম্বাইতে দুইটি বেতার কেন্দ্র স্থাপন করে। তারপর ১৯৩০ হইতে তদানীন্তন ভারত সরকার বেতার ব্যবস্থা নিজহাতে গ্রহণ করিয়াছেন।

এখন আঠাইশটি বেতার কেন্দ্রে বেতারবার্তার কার্য চলিতেছে। ভারতের উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্রই বেতারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উত্তরে দিল্লী,

লক্ষ্মৌ, পাটনা প্রভৃতি স্থানে, দক্ষিণে মাদ্রাজ, তিরুচিরপল্লী, হায়দরাবাদ, বাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থানে, পশ্চিমে বোম্বাই, নাগপুর, আহাম্মদাবাদ প্রভৃতি শহরে, পূর্বে কলিকাতা, কটক, গৌহাটী-শিলং-এ বেতারকেন্দ্র কার্য করিতেছে।

কাশ্মীরের শ্রীনগর ও জম্মুতে দুইটি বেতারকেন্দ্র আছে। বিভিন্ন কেন্দ্রে ছয় হইতে আট ঘণ্টার কার্যক্রম চলে। সংগীত, নাট্যাভিনয়, দৈনিক খবর প্রভৃতি এই সব স্থান হইতে প্রচারিত করা হয়। ইংরেজী, হিন্দী এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় সংবাদ পরিবেশন করা হয় দিনে চারবার।

বহির্ভারতে 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও' আঠারটি বিভিন্ন ভাষার কার্যক্রম চালাইয়া থাকে। আফগান, ব্রহ্মীয়, আরবী, ফারসী, যবদ্বীপ ভাষা এই আঠারটি ভাষার অন্যতম।

এই প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী পরিবর্ধিত করিবার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। সুপরিচালিত হইলে এই বেতার প্রতিষ্ঠান দ্বারা দেশের বহু কল্যাণ সাধিত হইবে।

শ্রমের গৌরব

শ্রমের মধ্যে প্রচেষ্টা নিহিত রহিয়াছে। বিশ্বসৃষ্টির মূলে রহিয়াছে শ্রম বা পরিশ্রম। সৃষ্টিকর্তা যখন নিষ্ক্রিয় থাকেন তখন কোন সৃষ্টি নাই, তিনি কাজে নামিলেই জগৎ উৎপন্ন হইতে থাকে। চলিতেছে বলিয়াই জগতের নাম 'জগৎ' হইয়াছে। এখানে কাহারও চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার অধিকার নাই। সকলেই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে জগৎ মোটেই চলিবে না। বিশ্বসৃষ্টি ধ্বংস হইয়া যাইবে। পশুপক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রত্যেক প্রাণীই আহার অন্বেষণে বাহির হয় এবং পৃথিবী হইতেই প্রতিদিন প্রয়োজনীয় আহার সংগ্রহ করে।

মানুষকেও এই পৃথিবী হইতে তাহার বাঁচিয়া থাকিবার সামগ্রী পরিশ্রম দ্বারা আহরণ করিতে হয়। কৃষক জমি চাষ না করিলে আমাদের ক্ষুধার অন্ন জোটে না, তাঁতি কাজ না করিলে পরিবার জন্য বস্ত্র পাই না, মজুর ঘর তৈয়ারি না করিলে বাসস্থান নির্মিত হয় না। এইরূপে গ্রাম বা নগর স্থাপন হইতে আরম্ভ করিয়া সভ্যতার বিকাশ সব কিছু শ্রম ছাড়া সম্ভবপর হইতে পারে না। আজ পর্যন্ত জগতের যাহা কিছু উন্নতি, সুখসুবিধা হইয়াছে সকলেরই মূলে রহিয়াছে মানুষের পরিশ্রম। মানুষের পরিশ্রমেই পৃথিবী সৌন্দর্যে শ্রীতে মণ্ডিত হইয়া উঠে।

যে শ্রম ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব বজায় রাখাই অসম্ভব তাহা দ্বারা মানুষের মর্যাদা বাড়ে না কমে? শ্রম করা কি হীনতা বা অবমাননার কার্য? যাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহা হীন হওয়া তো উচিত নহে। মনুষ্যত্ব অর্জনে মানুষের গৌরব বাড়ে। কুকার্য করিলে হীনতা আসিতে পারে। নিজে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যে শ্রম, সে শ্রম আমাদিগকে করিতেই হইবে। অপরকে বাঁচাইবার জন্য যে শ্রম—তাহাও হীন হইতে পারে না, কেন না, তাহা অসৎকার্য নহে। তবে আমরা জগতের কতকগুলি কার্যকে নীচ কার্য, কতকগুলি কার্যকে উচ্চ কার্য মনে করি কেন?

ইহা মনে করিবার কারণ আছে। কোন কালে কোন বিশেষ শ্রেণীর লোক বিদ্যা, ব্যবসায় প্রভৃতি দ্বারা সমাজে বড হইয়াছিলেন। তাঁহারা অপর সকলের বৃত্তিকে ছোট কাজ মনে করিতেন। কালক্রমে তাঁহাদের সন্তানসন্ততিরাও বিদ্যা বা ব্যবসায় বড় হইলে অন্য শ্রেণীর লোকের কাজকে নিম্ন কার্য বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছেন, কারণ ভারতবর্ষে বৃত্তি বা ব্যবসায় জাতিগত। সুতরাং এখানে কায়িকশ্রমবিমুখ 'ভদ্রলোক' শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে। ভূমি কর্ষণ বা অনুরূপ কায়িক শ্রমের কার্য ইঁহারা করিতে প্রস্তুত নহেন। অলসতা বা আত্মাভিমান এতদূর পর্যন্ত উপস্থিত হইয়াছে যে নিজের সামান্য জিনিসপত্রও ইঁহারা নিজে বহন করিতে পারেন না। ইহার জন্য অন্য শ্রমিকের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। তবে একটা কথা আছে। যাঁহারা পুরুষানুক্রমে সূক্ষ্ম কাজ করিতে অভ্যস্ত তাঁহাদের পক্ষে রৌদ্র-বৃষ্টি-জল-কাদার মধ্যে কায়িক শ্রম করা অসুবিধাজনক—এ কারণে তাঁহাদের মধ্যে ভীতি, অক্ষমতা এবং তাহার ফলে শ্রমের প্রতি অবজ্ঞা আসিতে পারে। হয়তো হইয়াছে তাহাই। প্রাচীন ভারতবর্ষ সকলের বৃত্তি নির্দেশ করিয়া দিয়া প্রত্যেকেরই সমাজ পরিচালনায় প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। কার্যকে পূজারূপে জ্ঞান করিবার কথা প্রাচীন ভারত আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছিল—"যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তৎপূজনম্" (হে জগন্মাতঃ। আমি যাহা করি তাহাই তোমার পূজা)—সুতরাং কোন কাজ নিন্দনীয় নয়। কাজের অপর নামই পূজা। এই দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া কাজকে বিচার করিলে কাজ নিন্দনীয় হইতে পারে না। যে যেরূপ কাজ করিবার সুযোগ লাভ করিবে সে সেইরূপ কাজেই লাগিয়া যাইবে, তাহা ছোটও নহে বডও নহে। তাহার যখন সমাজে প্রয়োজন আছে তখন ছোট কাজই বড কাজ।

শ্রমে শারীরিক অলসতা দূর হয়, নিজের কাজ নিজে করায় পরের মুখের দিকে কাহারও চাহিয়া থাকিতে হয় না, ভাল-মন্দ উন্নতি-অবনতির জন্য অপরকে দায়ী করিবার দরকার হয় না। সবই নিজের অধীনে আসিয়া যায়।

পূর্বে ভারতবর্ষে প্রত্যেকের জাতিগত ব্যবসায় নির্দিষ্ট ছিল। বৃত্তি হিসাবে কাহারও সহিত কাহারও সংঘর্ষ ছিল না। দেশ, কাল এবং বিশ্বের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকের জীবিকার জন্য বৃত্তি বহুমুখী হইয়াছে। এখন নূতন করিয়া আবার বৃত্তি বিষয়ে ভাবিবার সময় আসিয়াছে। বর্তমান যুগ কর্মপ্রধান যুগ। পরিকল্পনাপূর্বক কর্ম করিলে সুফল লাভ অবশ্যম্ভাবী। যাহার নিকট হইতে দেশ বা সমাজ যেরূপ কার্য পাইতে পারে—তাহার নিকট হইতে সেইরূপ কার্য আদায় করিতে হইবে। পরিকল্পনার মূলে থাকিবে কর্মশক্তির অপচয় নিরোধ করিয়া তাহাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার প্রতি লক্ষ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে জুতা সেলাইয়ের জন্য প্রশংসা করিয়া লাভ নাই—ইহাতে তাহার শক্তির অপচয়ই হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তাহার নিকট হইতে সমাজ এইরূপ কার্য আদায় করিবে যাহা সাধারণ লোকের নিকট সহজলভ্য নহে। তবে কোন কাজই ছোট নহে।

সাধ্যানুসারে সব কাজ করিবার জন্য সব লোক প্রস্তুত থাকিবে ইহারই নাম শ্রমের মর্যাদা। শ্রম হীন নহে। শ্রম মানুষের জীবনের পরিচায়ক। উহা সুখসমৃদ্ধির পরিবর্ধক।

শৃঙ্খলা ও তাহার প্রয়োজনীয়তা

শৃঙ্খলা বা নিয়মানুবর্তিতা মনের এক প্রকার বিশেষ শিক্ষা। এ শিক্ষার ফলে ব্যক্তি সমাজ, দেশ বা জাতির কল্যাণে জনগণকৃত পরম্পরাগত অনুশাসন প্রতিপালন করিবার জন্য মানব হৃদয়ে স্বতঃই প্রবৃত্তি জাগে। আত্মসংযম ছাড়া শৃঙ্খলার কল্পনা করা যায় না। যে ব্যক্তি নিজেকে সকল প্রলোভনের উর্ধ্বে রাখিতে পারিয়াছে প্রকৃত শৃঙ্খলা লাভ তাহারই হইয়াছে। সংযত অভ্যাসের উপর শৃঙ্খলা নির্ভর করে। বিশ্বপ্রকৃতিতে দেখিতে পাই গ্রহনক্ষত্র তাহাদের নির্দিষ্ট পথে চলিতেছে, উদ্ভিদ্ জগৎ বা প্রাণী জগতের উৎপত্তি, প্রসার, ধ্বংস প্রভৃতি ব্যাপারে নির্দিষ্ট নিয়ম কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না। শৃঙ্খলা ছাড়া জাগতিক বা আধ্যাত্মিক কোন কার্যই সুসম্পন্ন হইতে পারে না। পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আধ্যাত্মিক সকল ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য মানুষকে শৃঙ্খলার অধীন হইতে হইবে। পিতাপুত্র, স্ত্রী-কন্যা সকলের জীবনযাত্রার একটা নির্দিষ্ট প্রণালী ছাড়া পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত হইবে।

আগেকার দিনে বালক গুরুগৃহে বাস করিয়া গুরুর পরিবারের দশজনের মধ্যে একজন হইয়া, ভিক্ষাচর্যায় জগতের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া বহু কষ্টের মধ্যে চলিয়া সংযম অভ্যাস করিয়া মানুষ হইত। এই শিক্ষালাভে রাজপুত্র আর সাধারণ লোকের মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না। বাল্যে সংযত না হইলে—শৃঙ্খলাকে অবহেলা করিলে ভবিষ্যত কাহারও ফলপ্রসূ হয় না। এখনকার দিনে বিদ্যালয়, বা ছাত্রাবাস, খেলার মাঠ, বালক, কিশোর বা যুবকদের সংযম অভ্যাসের স্থান। শৃঙ্খলাকে না মানিলে কোন প্রতিষ্ঠান কেহ চালাইতে পারে না। যদি বিদ্যার্থিগণ সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠে তবে বিদ্যালয় অচল হইবে। যে নিজে কাহারও আদেশ মানে না সে কখনও অপরকে চালাইতে পারে না।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। জগতে এক গিরিগুহাবাসী যোগী ছাড়া একা কেহ চলিতে পারে না। সমাজবদ্ধ জীবের প্রতিপদে শৃঙ্খলাকে মানিতে হয়। সমাজের নিয়ম শৃঙ্খলা যে ব্যক্তি মানে না সে সমাজে বাস করিবার উপযুক্ত নহে। তাহাদ্বারা সমাজ উপকৃত হওয়া দূরে থাকুক সামাজিক বিশৃঙ্খলা সেই ব্যক্তিই সৃষ্টি করিয়া থাকে।

রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতি পদক্ষেপে শৃঙ্খলার দরকার। যাঁহারা রাষ্ট্রনায়ক, সর্বপ্রথমে তাঁহাদিগকে শৃঙ্খলামূলক কর্মপদ্ধতি রচনা করিতে হয়। দেশব্যাপী বিরাট শাসন-যন্ত্রের প্রত্যেকটি অঙ্গ যথাযথভাবে শৃঙ্খলার সহিত স্ব স্ব কর্তব্য পালন না করিলে সমগ্র শাসনব্যবস্থা বিকল হইয়া পড়িবে। পারিবারিক বিশৃঙ্খলায় অল্প কয়েকজন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়—রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলায় একটা জাতি, একটা দেশ ধ্বংস হইয়া যায়।

কর্মী শুধু চালকের অনুশাসন পূর্ণরূপে প্রতিপালন করিবে। কর্মী অবশ্য কর্ম পরিচালনার দোষত্রুটি লক্ষ্য করিয়া যাইবে ঃ আবশ্যকমত চালককে তাহার কর্ম সংশোধন বিষয়ে এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা াণে সাহায্য করিবে। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যেকটি কর্ম শৃঙ্খলা দ্বারা নিয়মিত। সেখানে প্রশ্ন করিবার কাহারও অধিকার নাই—বিচার করিবার অবকাশও নাই। কর্মীকে বিচার করিবার অবকাশও নাই। কর্মীকে বিচার বা প্রশ্ন করিতে হইলে সব কর্মই পণ্ড হইবে। একটা জাতি বা দেশের সমূহবিপদ উপস্থিত হইবে।

মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের সবটাই তো সংযম ও শৃঙ্খলা। আহার, চিন্তা, কার্য সবই তাহার বিধিনিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বিধিনিষেধ অবহেলা করিলে তাহার লক্ষ্য বস্তুতে পৌঁছান দূরের কথা জীবনপথে অগ্রসর হওয়াই অসম্ভব। খাইবারও নিয়ম আছে—অনেক লোকে খাইতে জানে না। একথা বলিবারও নিয়ম আছে, অনেক লোকে তাহা জানে না।

জিহ্বার সংযম অনেক লোকের নাই। আত্ম গৌরব দেখাইবার জন্য লোকে অসত্য ভাষণকে আশ্রয় করিয়া নিজের নৈতিক অধঃপতন ডাকিয়া আনে। সমস্ত দিনের কাজের শেষে মানুষ বিচার করিবে 'আমি সারাদিন ভাল মানুষের মতো চলিয়াছি না পশুর মতো চলিয়াছি।'—নিজের কাজের বিচার নিজেই করিলে উচ্ছৃঙ্খলতা ধরা পড়ে। অতএব দেখা যাইতেছে জগতের সর্বত্রই নিয়মশৃঙ্খলার রাজত্ব। নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষায় ন্যায় হউক, অন্যায় হউক, সত্য হউক, অসত্য হউক, সুখকর হউক বা দুঃখকর হউক, উপরে যিনি আছেন বা যাঁহাকে নেতৃত্বে বরণ করা হইয়াছে তাঁহার নেতৃত্ব মানিয়া চলিতে হইবে। আর না চলিলে সবই বিপর্যস্ত হইয়া পড়িবে।

কেহ কেহ হয়তো বলিতে পারেন শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে গিয়া মানুষের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট হইবে। যে লোকের আত্ম-স্বাতন্ত্র্য বলিয়া কিছু নাই সে আবার মানুষ কিসের। এ শৃঙ্খলার মূল্য কি? শৃঙ্খলা ও নিয়মের প্রয়োগ মানুষ তৈয়ারি করিবার জন্য—মানুষকে অবনত করার জন্য নহে। স্বাধীনতার অর্থ উচ্ছৃঙ্খলতা নহে। ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে যে উচ্ছৃঙ্খলতা আত্মপ্রকাশ করে বা করিতে পারে তাহাকে দমন করিতে হইলে নিয়ম-শৃঙ্খলাকে অবহেলা করিলে চলিবে না। সংযমহীন স্বাতন্ত্র্যের নামান্তর হইতেছে স্বেচ্ছাচারিতা।

নিয়ম বা সংযম মানুষকে অসৎপথ হইতে সৎপথে চালিত করে। পুনঃ পুনঃ সংযম অভ্যাসের ফলে মানুষের কাজগুলিও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইবে—তখন নিয়ম বা শৃঙ্খলার প্রভুত্ব কাহারও মনে হইবে না।

উপন্যাস পাঠ

মানুষ গল্প শুনিতে চিরকালই ভালবাসে। প্রাচীনকালে গ্রামবৃদ্ধেরা লোককে নীতিমূলক গল্প শুনাইতেন। লোকে এ জগতে যে উপায়ে ভাল হইয়া চলিতে পারে

তাহারই নাম নীতি বা জাগতিক সুবুদ্ধি। এইরূপ নীতিমূলক গল্প ভারতবর্ষে বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে। গল্পের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। উপন্যাসের সৃষ্টি হইয়াছে আধুনিক যুগে। এ যুগে বিভিন্ন প্রকার সাহিত্যের মধ্যে উপন্যাস পাঠের প্রতি পাঠক সাধারণের আগ্রহ অত্যন্ত বেশি। যে বাড়িতে ছেলেরা উপন্যাস পড়িবার জন্য অভিভাবকের অনুমতি পায় না সেখানে তাহারা উহা লুকাইয়া পড়ে, অফিসের কেরানী বাবুরা টেবিলের ড্রয়ারে উপন্যাস রাখিয়া দেন কর্তৃপক্ষের অগোচরে সুবিধামত তাঁহারা উহা পড়েন, রেলগাড়িতে, দূরগামী ট্রামবাসেও লোককে উপন্যাস পড়িতে দেখা যায়।

একালের উপন্যাস পাঠে লোকের আগ্রহের নানারূপ কারণ আছে। মানুষ তাহার দৈনন্দিন জীবনকাহিনী তাহার ঘাতপ্রতিঘাতের ওঠাপড়ার বাস্তবরূপ সাহিত্যে গল্পের আকারে দেখিতে চাহে। সমস্যাবহুল বর্তমান যুগের অনুযায়ী উপন্যাস রচিত হইবার কোন অবকাশ প্রাচীনকালে ছিল না।

এ যুগের লোকে উপন্যাস বেশি পড়ে এবং তাহাতে আনন্দও লাভ করে বেশি। কিন্তু নিছক আনন্দ ছাড়া উপন্যাস পাঠে উপকার বা অপকার কিছু হয় কি না তাহা বিচার করা দরকার। উপন্যাস যখন সাহিত্য, তাহাদ্বারা কি কল্যাণ হইতে পারে তাহার আলোচনা প্রথমতঃ করা হইতেছে।

উপন্যাসে নানাপ্রকার নরনারীর চরিত্র চিত্রিত হয়। জীবনে মানুষের চরিত্রের যে সব বৈচিত্র্য আমাদের পক্ষে লক্ষ্য করা সম্ভবপর হয় না বা যেরূপ চরিত্রের লোকের সহিত কদাচিৎ সমাজে আমাদের সাক্ষাৎ হয়, ঔপন্যাসিক তাহাদের সকলের সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিয়া আমাদের জ্ঞানের পরিধি বর্ধিত করিয়া থাকেন।

উপন্যাস পাঠে আমাদের জগতের সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞানলাভের সহায়তা হয়। জীবনের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ঔপন্যাসিক আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করেন এবং আমাদিগকে উহা সমাধানের জন্য বিচারে প্রবৃত্ত করেন।

উপন্যাসের মত অন্য কোন গ্রন্থ এমন আনন্দের সহিত আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিচালনা করিবার সুযোগ দেয় না। দার্শনিক ও সমাজনীতিবিদের প্রবন্ধ সাধারণ লোকের পক্ষে মোটেই মনোরম নহে।

বাস্তবধর্মী উপন্যাসে বর্তমান যুগের আচারব্যবহার, রীতিনীতি, আশাআকাঙ্ক্ষা আমাদের মনের কাছে জীবন্তভাবে ধরা দেয় এবং অপরের সুখদুঃখে আমাদের চিত্তকে আলোড়িত করে।

সমাজে লোকচক্ষুর অন্তরালে যাহারা ভাষাহীন, তাহাদের তিলে তিলে নিষ্পেষণের কাহিনী দরদী লেখক আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেন। সমাজের ছোট বড় সকল লোকই দরদী লেখকের আলোচনার পাত্র হইয়া দাঁড়ায়। সমাজে যাহারা অনাদৃত অধঃপতিত শরৎচন্দ্র তাহাদের সুখদুঃখের কাহিনীতে সেখানকার মহত্ত্বের খবর আমাদের কাছে পরিবেশন করিয়াছেন। উপন্যাস পাঠে লোকের

একদেশদর্শিতা দূর হয়। ছোট বড় সকলের দিকে মানুষের দৃষ্টি সমভাবে প্রসারিত হয়।

আদর্শমূলক উপন্যাস ঘুমন্ত জাতিকে তার মুক্তির পথ প্রদর্শন করে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠের বন্দেমাতরম্' গানে ভারত তাহাব মুক্তির মন্ত্র খুঁজিয়া পাইয়াছিল। 'দেবীচৌধুরাণীতে বঙ্কিম নিষ্কাম কর্মযোগসাধনার চিত্র অঙ্কিত করিয়া শুভ সংসার রচনার আদর্শ আমাদিগকে দিয়াছে।

যে জাতির সম্মুখে কল্যাণের কোন আদর্শ নাই সে জাতির অপঘাতে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ঔপন্যাসিক জাতিকে দেশের কল্যাণব্রতে অনাগত যুগের পাথেয় দিতে পারেন। বঙ্কিমও আমাদিগকে তাহাই দিয়াছিলেন, তাই তিনি 'ঋষি বঙ্কিম'।

একশ্রেণীর উপন্যাসলেখক নরনারীর আকর্ষণের নির্লজ্জ কাহিনী পরিবেশন করিয়া বাস্তবধর্মী উপন্যাসে রসসৃষ্টিব প্রয়াস পান। কিন্তু নগ্ন বাস্তবকে উপন্যাসে রূপায়িত করিলে রসসৃষ্টির পরিবর্তে সেখানে হয় বীভৎসতার সৃষ্টি। এই শ্রেণীর সাহিত্য সমাজেব অনিষ্ট করিতেছে।

কোন কিছুর উপকার অথবা অপকার নির্ভর করে তাহার ব্যবহারের উপর। অপপ্রয়োগে ভাল বস্তুও খারাপ হয়। অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি বলেন, উপন্যাস কাব্য-কাহিনী প্রভৃতি সাহিত্য দ্বারা লোকের মধ্যে অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতার সৃষ্টি হয়। অতএব এ জাতীয় সাহিত্য মানসিক দুর্বলতার কারণ। এই জন্য ইহাদের অতিরিক্ত সেবা করা উচিত নয়। বিবেচক ব্যক্তির হাতে পড়িলে উপন্যাস হইতে যেটুকু আহরণীয় বস্তু থাকে তাহা তিনি আহরণ কবেন। কিন্তু অপরিণত-বুদ্ধি বালকের হাতে উপন্যাস পড়িলে তাহার লাভের অপেক্ষা ক্ষতিই অনেক ক্ষেত্রে বেশি হইয়া থাকে।

কোন বিষয়ে বাড়াবাড়ি ভাল নয়। বালকেরা ভাল উপন্যাস পড়িয়া আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান অর্জন করিবে—ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। কোন কোন লোকের বেশি উপন্যাস পড়ায় স্বেচ্ছাচারিতা উপস্থিত হয়। এইরূপ স্বেচ্ছাচারিতা কাহারও পক্ষে কল্যাণকর নহে। জগতের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস সকলেই পাঠ করিবে। নির্দোষ উপন্যাস পাঠের যে আনন্দ তাহা হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করা উচিত নহে। সৎ-সাহিত্য পাঠের অধিকার সকলেরই আছে।

নাগরিকতা

এ সংসারে যাহারা কেবল অপরের নিকট হইতে পাইতে ইচ্ছা করে, অপরকে প্রতিদানে কিছু দিতে চাহে না তাহারা মানবসমাজে বাস করিবার যোগ্য নহে। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, একে অপরের উপর নির্ভরশীল—অপরের নিকট হইতে কিছু নিলে তাহা যে ভাবেই হউক অপরকে ফেরত দিতে হইবে। এই দান-

প্রতিদান লইয়াই আমাদের সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবন সচল থাকে। সমাজের সেবা পাইতে হইলে যেমন মানুষকে প্রতিদানে অপরের সেবায় ব্রতী হইতে হয়, তেমনি বৃহত্তর সমাজ বা রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার নিজের জন্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে চাই সেবাদ্বারা রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধন। ইহাই নাগরিকতার মূলনীতি। নাগরিকতা বা পৌরবৃত্তি রাষ্ট্রপ্রদত্ত অধিকার ভোগ এবং রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিক হিসাবে মানবের দায়িত্ব পালনের উপর নির্ভর করে।

প্রাচীনকালে ইউরোপের কতকগুলি দেশে, নগরে বাসকারী লোকেরা গ্রামের লোকেদের চেয়ে বেশি সুখসুবিধা ভোগ করিত। গ্রামের লোকের অবস্থা মানুষ হিসাবে অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। ধনী বা আভিজাত সম্প্রদায়ের নিকট হইতে মানুষের পক্ষে স্বাভাবিকভাবে যাহা প্রাপ্য সাধারণলোক তাহাও পাইত না। শিক্ষা, স্বাধীনতা প্রভৃতি হইতে গ্রাম্য লোক বঞ্চিত ছিল। সাধারণ মানুষ অনেক ক্ষেত্রে দাসসুলভ জীবনযাপন করিত।

কালক্রমে ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসারে বড় বড় নগর সৃষ্ট হইতে থাকে। সেই সব স্থানে অধিকসংখ্যক কর্মীরও দরকার হইতে লাগিল। কর্মী না হইলে ব্যবসা-বাণিজ্য চলে না। নগরে কর্মীকে বিশেষ সুবিধা বা অধিকার না দিলে গ্রাম ছাড়িয়া শহরে আসিবার তাহার কোন কারণ থাকিতে পারে না। অধিকসংখ্যক লোক স্বাধীনতা বা সুখসুবিধার প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া শহরবাসী হইতে লাগিল। এই সুখসুবিধাকে অবলম্বন করিয়াই প্রাচীন যুগে নাগরিকতা বা পৌরবৃত্তির প্রতিষ্ঠা হয়। প্রাচীন গ্রীস এবং রোম দেশের বহু নগরে এইরূপ স্বাধীন সুযোগসুবিধা বা অধিকার তথাকার অধিবাসীদিগকে দেওয়া হইয়াছিল। লোকে এই নাগরিক-অধিকার লাভকে অত্যন্ত গৌরবের মনে করিত।

অতি প্রাচীনকালেও অনেক স্বাধীন দেশের নাগরিক সুদূর পররাষ্ট্রে অবস্থান-কালে মনে করিত তাহার স্বদেশীয় রাষ্ট্র তাহার কল্যাণ বা নিরাপত্তার জন্য সদাজাগ্রত দৃষ্টি তাহার উপর নিবদ্ধ করিয়া আছে। বর্তমান যুগে বহু স্বাধীন দেশের নাগরিক বিশ্বাস করে, পররাষ্ট্রে অন্যায়ভাবে নির্যাতিত বা লাঞ্ছিত হইলে তাহার নিজের রাষ্ট্র উপযুক্ত প্রতিকার করিতে শৈথিল্য দেখাইবে না।

আধুনিক জগতে প্রত্যেক নাগরিক স্বরাষ্ট্রে ধনপ্রাণ রক্ষা এবং স্বাধীনতা লাভে অধিকারী। ধর্মাচরণ বিষয়ে নাগরিক স্বাধীন। স্বদেশের সর্বত্র যে কোন নাগরিক গমনাগমন করিতে পারে, আইনসঙ্গতভাবে ব্যবসায় বা বাণিজ্যে লিপ্ত হইবার তাহার কোন বাধা নাই। নাগরিক নিজের স্বাধীন চিন্তা বা উহার প্রকাশে অধিকারী। নিজের সম্পত্তির অধিকারী নাগরিক নিজে। রাষ্ট্রনীতি পরিচালনা ও ধর্ম বা সংস্কৃতি রক্ষার জন্য, যে কোন স্বাধীন দেশের নাগরিক অপরের সহযোগে সভা-সমিতি, সংসদ, সমবায় গঠন করিতে পারে। নাগরিকের সাধারণ অধিকার উল্লিখিত হইল। কিন্তু বিশেষ বিশেষ অবস্থায় অনেক দেশে এইরূপ নাগরিক অধিকারের উপর বিধিনিষেধ আরোপিত হইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়াতে কেহ

কমিউনিস্টনীতির বিরুদ্ধে আলোচনা বা ঐ নীতির বিপরীত কার্য করিতে পারে না।

কোন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হইবার আশঙ্কা যে সব কার্যে আছে—সে সকল কার্য হইতে নাগরিক দূরে থাকিবে। তবে সুখ-সুবিধার তুলনায় নাগরিকবৃত্তির উপর স্থলবিশেষে যে সব বিধিনিষেধ আরোপিত হয় তাহা অতীব তুচ্ছ। যে সব দেশে গণতন্ত্র প্রবল সেই সকল দেশেই নাগরিক অধিকার প্রসার লাভ করিয়া থাকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনের চক্ষে সব নাগরিকই সমান। ভোটাধিকার সকলেরই থাকে বা থাকা উচিত। তবে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অনেক ক্ষেত্রে ধনবৈষম্যের জন্য ভোটাধিকার সংকুচিত হইয়া থাকে।

বর্তমান যুগে উন্নতিশীল অনেক রাষ্ট্রে নাগরিক রোগে চিকিৎসার সুবিধা, সন্তান-সন্ততির অবৈতনিক শিক্ষা, কর্মে অসমর্থতা বা অসুস্থতার সময় ভাতা বা পেন্সন ভোগ করিয়া থাকে। তবে একটা কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে প্রকৃতপক্ষে বিনা বেতনে শিক্ষা বা বিনা পয়সায় চিকিৎসা পৃথিবীর কোন দেশে কোন কালে ছিল না। রাষ্ট্রের নাগরিকগণ যদি সরকারকে উপযুক্ত কর প্রদান করেন তবেই এমন ব্যবস্থা সম্ভবপর হইয়া থাকে। সুতরাং এই সকল ব্যবস্থার জন্য সকল নাগরিককেই স্বার্থ ত্যাগ করিতে হয়। জগতে অবাধ অধিকার বা অবাধ সুখ-সুবিধা ভোগ বলিয়া কিছু নাই। নাগরিক যেমন রাষ্ট্রের কাছে সুখ-সুবিধা পায় আবার নাগরিকের তেমনি কতকগুলি কর্তব্য পালন করিতে হয়।

রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রত্যেক নাগরিকেরই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে—ইহার অন্যথাচরণ করিবার উপায় নাই। যদি কোন নাগরিক ইহার বিপরীত কার্য করে বা অন্য রাষ্ট্রের প্রতি তাহার আনুগত্য প্রদর্শন করে তাহা হইলে সে নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হয় বা দণ্ডনীয় হইয়া থাকে।

নাগরিক স্বরাষ্ট্র পরিচালনার জন্য উপযুক্ত রাজকর দিতে বাধ্য। অবশ্য নাগরিকের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের সমর্থন না পাইলে সরকার কোনরূপ কর ধার্য করিতে পারিবেন না।

বৈদেশিক আক্রমণ প্রভৃতি কারণে যখন কোন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপদাপন্ন হয় তখন নাগরিককে সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করিয়া স্বরাষ্ট্রকে রক্ষা করিতে হইবে—দরকার হইলে যুদ্ধে নামিয়া প্রাণ বিসর্জন পর্যন্ত করিতে হইবে। কোন রাষ্ট্র আত্মরক্ষা ব্যাপারে নাগরিকগণকে সামরিক কার্যে যোগদানে বাধ্য করিতে পারে।

অতএব নাগরিক অধিকার দান-প্রতিদানের উপর প্রতিষ্ঠিত। যেখানে প্রতিদান নাই সেখানে দানও কেহ যেন কল্পনা না করে।

পৃথিবীর যে সকল দেশে শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে—সেই সব দেশে নাগরিকত্ব সম্যগ্‌ভাবে পালিত হইয়া থাকে। রাষ্ট্রের নিকট হইতে মানুষ কি কি পাইতে পারে এবং তাহার বৃহত্তর কল্যাণের জন্য দেশের অধিবাসীর কিরূপ আচরণ করিতে হইবে এ বিষয়ে জগতের বহু দেশের লোকের এখনও অজ্ঞতা আছে। যেখানে

ভোটাধিকার আছে—অশিক্ষা, অজ্ঞতা বা অলসতার জন্য সেখানে অনেক নাগরিক প্রতিনিধি নির্বাচন ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে না বা করিলে দলবিশেষের প্রচার বা অপপ্রচারের ফলে অযোগ্য প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া থাকে। অযোগ্য লোককে প্রতিনিধি নির্বাচিত করিলে সর্বসাধারণের পরিবর্তে দলগত লোক বেশি সুযোগ-সুবিধা লাভ করে—করদাতাদের অর্থের অপচয় ঘটিয়া থাকে। পৃথিবীতে বুদ্ধিমান্ লোকেরা অপর লোকের অজ্ঞতার সুযোগ চিরকালই গ্রহণ করিবে। যে বা যাহারা তাহা করে না, তাহারা উচ্চতর মানবনীতি অনুসারে উচ্চস্তরের লোক। কিন্তু ব্যাবহারিক জগতের দৃষ্টিতে এই সব লোক বুদ্ধি থাকিতেও নির্বোধ বলিয়া বিবেচিত হয়।

দেশের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা সৃষ্টি করিতে হইলে, রাষ্ট্রের মূল যে নাগরিক তাহাকে স্বীয় কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ থাকিতে হইবে। ইহার জন্য পৌরবৃত্তির অনুশীলন করিতে হইবে। কেবল পুস্তকপাঠে যথার্থ নাগরিক সৃষ্ট হইবে না। নিজের কর্তব্য সাধনে নাগরিক পুনঃ পুনঃ অভ্যাস এবং দেশপ্রেম থাকিলেই আদর্শ নাগরিক হইতে পারা যায়।

দেশভ্রমণ

অনাদি কাল হইতে হয়তো মানুষের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে অজানার জন্য একটা টান আছে। যদি এরূপ টান না থাকে তবে কেন মানুষ সুপ্রাচীন যুগ হইতে আজ পর্যন্ত ঘরের বাহিরে যাইবার জন্য এত ব্যাকুল হয়। আদিম মানুষের যাযাবর বৃত্তির মধ্যেও হয়তো এই অজানার টান সজাগ থাকিয়া তাহাকে দেশ হইতে দেশান্তরে লইয়া গিয়াছে। মানুষ ঘর বাঁধে এবং ঘর ছাড়েও। ঘর বাঁধিয়া সে নিজের পরিবারপরিজনকে লইয়া ছোট গণ্ডী তৈয়ারি করে। আবার ঘর ছাড়িয়া অপরিচিত পৃথিবীর উদ্দেশে বাহির হয়।—অজানাকে জানিবার আগ্রহ তাহার হৃদয়ে জাগে, কেননা যাহারা নিত্য পরিচিত তাহারা হইল 'জ্ঞাতি' (যাহাকে জানা যায় সে 'জ্ঞাতি')—তাহাদের সম্বন্ধে কোন কৌতূহল কাহারও হৃদয়ে জাগ্রত হয় না: লোকের যত কৌতূহল অজানাকে লইয়া। সে 'দূরকে নিকটবন্ধু করিতে চায় আর পরকে করিতে চায় ভাই।'

বর্তমান যুগে অর্থ বা সামর্থ্য যাহার আছে সেই দেশভ্রমণে বাহির হয়। যাহার সামর্থ্য নাই সে নূতন নূতন দেশের বিচিত্র ভ্রমণ কাহিনী পড়িয়া সেই সকল দেশের একটা চিত্র মনে মনে অঙ্কিত করে এবং তাহাতেই আনন্দ লাভ করে।

দেশভ্রমণ মানুষের জীবনের লক্ষণ। যে চুপ করিয়া নিজের গৃহের কোণে বসিয়া থাকে সে জীবনের কোন আস্বাদ পায় না। তাহার জীবনীশক্তি থাকিলেও উহা সুপ্ত রহিয়াছে মনে করিতে হইবে। সুতরাং মানুষকে চলিতে হইবে। যে ব্যক্তি চলে তাহার জীবন সত্যযুগের জীবনের মত সুখকর। 'যে ব্যক্তি দেশভ্রমণ করিয়া শ্রান্ত হইয়াছে সেই নানা সম্পদের অধিকারী হয়।'

প্রাচীনকালে পথঘাট দুর্গম ছিল, যানবাহনের বিশেষ কোন সুবিধা ছিল না—মানুষকে ভ্রমণের জন্য পায়ে হাঁটিতে হইত বেশি। সেযুগে ভারতের অধিবাসী বা অনেক ক্ষেত্রে বিদেশীও এক কপর্দক সম্বল না করিয়া সারা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিতে পারিত। ইহার মূলে ছিল ভারতবাসীর অতিথি সেবা। পায়ে হাঁটায় কষ্ট খুবই হইত, কিন্তু এই কষ্টদ্বারা যে সম্পদ লাভ হইত তাহা ব্যক্তির পক্ষে, জাতির পক্ষে ছিল অমূল্য। লোকের রীতি-নীতি, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত পরিচয়ে ভ্রমণকারীর জ্ঞানের পরিধি পরিবর্ধিত হইত। পর্যটক জ্ঞান আহরণ করিত আর নিজের হৃদয়ের সম্পদ নিজ প্রান্তের ধর্ম, সাধনা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সহিত অপরের পরিচয় করাইয়া দিত। এইভাবে রেল, স্টিমার, বায়ুযানের অভাবেও এক অঞ্চলের ভাবধারা অন্য অঞ্চলে তাহার আসন স্থাপন করিয়াছে। রাজচক্রবর্তী অশোকের সময়ে ভারতের ভাবধারা পর্যটকগণ বহির্বিশ্বে প্রচার করিয়াছেন। গুপ্তযুগে বাঙলা হইতে সুদূর দ্বীপময় ভারতে—যবদ্বীপে বালিদ্বীপে ভারতের ধর্মসংস্কৃতি প্রচারিত হইয়াছে।

বাঙ্‌লা তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধকগণ দুর্গম হিমালয় লঙ্ঘন করিয়া তিব্বতে 'জ্ঞানের প্রদীপ' জ্বালিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সুদূর দাক্ষিণাত্যে এবং পশ্চিমে বৃন্দাবন পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া প্রেমভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। আধুনিক যুগে রাজা রামমোহন রায় তিব্বত পর্যটন করেন—অবশেষে বিলাত পর্যন্ত গিয়া সেইখানেই দেহরক্ষা করেন। নবীন ভারতের অন্যতম স্রষ্টা মহাকর্মযোগী স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজক বেশে সারা ভারত পরিক্রমা করেন—দেশের অন্তরাত্মার সহিত প্রাণের যোগসাধন তিনি করিয়াছিলেন তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শনের ফলে। পরে তিনি সমগ্র পৃথিবীও পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ শুধু ভারত নয় তাঁহার বিশ্বপরিভ্রমণ দ্বারা বহুবার ভারতের অন্তরের কথার সহিত বিশ্বকে মিলাইয়াছেন।

আধুনিক কালে স্থল, জল আর আকাশ পথে লোক অতি অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবী পরিক্রমা করিয়া আসিতেছে। পায়ে হাঁটিয়া যে ভাবে মানুষের জীবন-ধারার সহিত নিবিড় পরিচয় ঘটে—দ্রুতগামী যানে যাতায়াত করিলে তাহা হইতে পারে না। সমুদ্রে আর আকাশপথে কোন বৈচিত্র্য নাই—কেবল অসীম অনাদি অনন্ত। স্থলপথে রেলভ্রমণে পথের দুই পাশের দৃশ্য কেবল চোখে পড়ে—দৃশ্যের পর দৃশ্যের পরিবর্তন হয়। কোথাও বা সবুজ শস্যক্ষেত্র, কোথাও বা পাহাড়, টিলা, নদনদী, সেতু মুহূর্তের মধ্যে নিকটে আসে, আবার দূরে চলিয়া যায়। গাড়িতে বিভিন্ন স্থানের যাত্রীর ওঠা-নামায় তাহাদের বিচিত্র ভাষা কানে আসে, সুখ-দুঃখের কথারও কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

ভ্রমণে প্রকৃত আনন্দ সঞ্চয় করিতে হইলে পর্যটককে পদচারী হইতে হইবে। ঘর ছাড়িয়া মানুষ যখন পথে বাহির হয়—তখন তাহার মন হইতে সর্বপ্রকার দীনতা, হীনতা, অশান্তি দূর হয়। ঘরের মুষ্টিমেয় লোকের পরিবর্তে সে পায়

বিশ্বজগৎকে, নিজের ছোট গ্রাম বা শহরের পরিবর্তে সে পায় উদার উন্মুক্ত পৃথিবীকে। তাই ভ্রমণে আসে তার আনন্দ আর উদারতা।

দেশভ্রমণে যে শিক্ষালাভ হয় পুস্তক পাঠে সেরূপ শিক্ষা হয় না। পুঁথিগত বিদ্যা দেশ ভ্রমণের অভাবে হয় অসম্পূর্ণ। তাই প্রাচীন যুগ ও বর্তমান যুগ দেশভ্রমণকে শিক্ষার অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য-দেশে শিক্ষাশেষে বা শিক্ষার মধ্যে শিক্ষার্থিগণ কিছুকালের জন্য দেশভ্রমণে বাহির হয়। কোন বিষয় পুস্তকে পাঠ করা আর তাহার বিষয়বস্তুকে প্রত্যক্ষ করার মধ্যে প্রভেদ অনেকখানি।

দেশভ্রমণ না করিলে মানুষ তাহার সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করিতে পারে না। বিভিন্ন দেশের আচারব্যবহার, জীবনযাত্রা, তাহাদের চিন্তাধারা, যতক্ষণ পর্যন্ত না জানা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের ভালমন্দ যাহা কিছু থাকুক না কেন তাহার প্রতি আত্মদর বাড়িয়া যায়,—এইরূপ মানুষ হয় 'কূপমণ্ডুক'। জীবনপথে অগ্রসর হওয়া তাহার পক্ষে সুদূরপরাহত। অপরকে দেখিয়া যে জাতি বা ব্যক্তি নিজের ত্রুটি সংশোধন করে না, তাহার সর্বপ্রকার উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া থাকে।

প্রাচীনকালে যুগ যুগ ধরিয়া লোকে তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়াছে। সুসভ্য দেশের অধিবাসী তীর্থ ভ্রমণের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। এখনকার দিনেও লোকে তীর্থযাত্রা করে। সকল দেশের তীর্থস্থানগুলি প্রকৃতির উদার ও উন্মুক্ত স্থানে অবস্থিত।

এই সব স্থানে দেবতার চরণে আত্মনিবেদন করিতে আসিলে বিভিন্ন প্রান্তের লোকের মধ্যে একত্বের অনুভূতি উপস্থিত হয়, কেননা সকলে একই দেবতার চরণে মিলিত হইয়া থাকে। এই বোধ জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের মধ্যে ভেদবুদ্ধি মাথা তুলিবার অবকাশ পায় না। তীর্থস্থানের লক্ষ লক্ষ নরনারী যখন একই নদীর জলে বা জলাশয়ে অবতীর্ণ হয়—তখন জাতিভেদ, বর্ণভেদ দূরে চলিয়া যায়, তীর্থ সলিল স্পর্শে সকলেই পবিত্র হয় আর সকলের স্পর্শে তীর্থও যথার্থ তীর্থ হইয়া উঠে।

ভ্রমণে কোন দেশের প্রাচীন ইতিহাসের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইয়া থাকে। প্রাচীন সভ্যতার চিহ্ন যে সকল স্থানে এখনও বর্তমান রহিয়াছে, সে সকল স্থানে অতীত আমাদের সম্মুখে জাগ্রত হইয়া উঠে। অতীতের সুখদুঃখ আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিবে না সত্য, বর্তমানকে অতীতের সহিত তুলনা করিলে, অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে ভবিষ্যৎকে গড়া যায়। জ্ঞান জীবনযাত্রার পাথেয়। ইহা কেবল বর্তমানে সীমাবদ্ধ নহে। অতীত ইহাকে বিশুদ্ধ করে এবং ভবিষ্যতের দিকে ইহাকে চালিত করে।

প্রাচীন যুগের অল্পসংখ্যক মানুষ জ্ঞান সঞ্চয়, বা দূর দেশে বাণিজ্য করিবার জন্য বা নিজের দেশের সংস্কৃতিকে অন্যত্র বিস্তারের জন্য ভ্রমণ করিয়াছে। বর্তমান যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, বিদ্যা, বিজ্ঞান, রাজনীতি নানাদিক দিয়া আমরা বিশ্বের সহিত যুক্ত হইয়া পড়িয়াছি। সুতরাং এক দেশ অপরকে উপেক্ষা করিয়া বাঁচিতে

পারে না। প্রাচীন যুগে মানুষের জীবনের সব কিছুরই চাহিদা কম ছিল। যেখানে আকাঙ্ক্ষা থাকে না সেখানে আত্মবিস্তারও নাই। আকাঙ্ক্ষাতে আত্মবিস্তার হয়, আত্মবিস্তারের অপর নাম জীবন। আধুনিক যুগে সেই জীবনের সূত্রপাত হইয়াছে —দূরের মানুষ নিকটে আসিয়াছে। শিক্ষার জন্য, রাষ্ট্র পরিচালনার এবং সাংস্কৃতিক প্রচারের জন্য ভ্রমণও চলিতেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমাদের লক্ষ্য হইবে "দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে।" এ লক্ষ্যে আমাদের পৌঁছাইবার অন্যতম সাধনা হইতেছে দেশভ্রমণ।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে দেশভ্রমণে আনন্দ, শিক্ষা, জ্ঞান, সম্পদ্, উদারতা, প্রাণের সহিত প্রাণের মিলন লাভ হয়। সেইজন্যই সম্ভবতঃ সমাজে যাঁহারা জ্ঞানী, গুণী ও উদার তাঁহাদিগকে বলা হয় 'সম্ভ্রান্ত'। ইঁহারা সম্যগ্‌রূপে ভুল করেন নাই ('ভ্রান্ত'), বরং সম্যগ্‌রূপে ভ্রমণ করিয়া (ভ্রান্ত—ভ্রমণ করিয়াছেন যিনি) শিক্ষা ও সংস্কৃতি দ্বারা উন্নত হইয়াছেন। ভ্রমণ না করিলে 'সম্ভ্রান্ত' হওয়া যায় না।

কুটিরশিল্প

শ্রম করা মানুষের স্বভাব, শ্রম ছাড়া সে বাঁচিতে পারে না। তাহাকে শ্রম করিতেই হইবে, কিন্তু শ্রম লাঘব দরকার। শ্রমকে লঘু করিতে হইলে চাই যন্ত্রের সাহায্য। তাই মানুষ প্রাচীন যুগে যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছে। যন্ত্র ছাড়া মানুষের জীবন ধারণ করা পশুর জীবন ধারণের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকিত না। লাঙ্গলরূপ যন্ত্রের উদ্ভাবন না করিলে মানুষকে প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া কাঁচা শস্যে বা বন্য ফলে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে হইত। চরকা প্রস্তুত করিবার উপায় বাহির না করিলে কাপড় কেহ পরিতে পারিত না। কুমার চাকা উদ্ভাবন না করিতে পারিলে হাঁড়ি কলসী তৈয়ারি করিতে পারিত না।

সমাজের প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা বিভিন্ন প্রকারের সামগ্রী তৈয়ারি করিয়া আসিতেছে। এই প্রকার সামাজিক প্রয়োজনে গৃহশিল্প বা কুটির শিল্প ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে। তাঁত বোনা, দা-ছুরি, কাঁচি তৈয়ারি করা, বাঁশ বেতের কাজ, হাঁড়ি-কলসী তৈয়ারি, নৌকা গড়া, গরুর গাড়ি তৈয়ারি করা প্রভৃতি অসংখ্য রকমের কুটির শিল্পের বিকাশ হইয়াছে। পুরুষানুক্রমে লোকে এইরূপ বিভিন্ন গৃহশিল্প নির্মাণে নিযুক্ত থাকায় এই সকল শিল্প ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে এবং অতি প্রাচীনকালেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাজেও শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাচীন যুগেও শ্রম লাঘবের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র আবিষ্কার করিলেও মানুষ যন্ত্রের চালনা করিত নিজে। সে যন্ত্রের অধীন হয় নাই। যন্ত্রই তাহার ইচ্ছার অধীনে কাজ করিত। সুতরাং প্রত্যেকটি শিল্পীর হস্তকৌশলের প্রাধান্যই ছিল শিল্পের প্রাণ। শিল্পী ছিল স্বাধীন, শিল্পের পরিকল্পনা শিল্পী স্বয়ং রচনা করিত, মূলধন তাঁহার নিজের, লাভ-লোকসানের দায়িত্বও তাহারই।

আধুনিক যুগ যন্ত্রপ্রাধান্যের যুগ বা যান্ত্রিক যুগ। বাষ্প বা বিদ্যুৎশক্তির আবিষ্কারের ফলে মানুষ আপনাকে যন্ত্রের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। বড বড় মিল ফ্যাক্টরী বা কারখানায় লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কাজ করে। হাতের কলাকৌশল যন্ত্রে প্রবেশ করিয়া মানুষকেও করিয়া তুলিয়াছে কৃত্রিম বা যান্ত্রিক।

বড বড কারখানার মালিক শিল্পীরা নহে। উহাদের মালিক হইতেছে পুঁজিপতিগণ। শিল্প নির্মাণে শিল্পীর কোন মতামত প্রকাশের অধিকার নাই। তাহার কাজ হইতেছে—যতদিন কাজে বহাল থাকিবে নিজের ষোল আনা কাজ বুঝাইয়া দিতে হইবে। লাভ বেশি হইলেও শ্রমিক তাহার অংশ হইতে অনেক ক্ষেত্রেই বঞ্চিত হয়। অল্প মাল তৈয়ারি করিলে যেখানে বেশি পয়সা পাইবার সম্ভাবনা সেখানে লোক ছাঁটাই করিতে বা কারখানা বন্ধ করিতে মালিক দ্বিধা বোধ করে না। এইভাবে কারখানায় সাধারণতঃ শিল্পনির্মাণ চলে। একদিকে যেমন লোক ছাঁটাই দ্বারা বহু লোক কর্মহীন হয়, অপরদিকে তেমনই সাধারণ মানুষকে তাঁহার অত্যাবশ্যক ব্যবহার্য বস্তু হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। বড কারখানা বন্ধ করিলে মালিক উপবাসী থাকে না—উপবাস করিয়া মৃত্যু হয় শ্রমিকের। ইহারই ফলস্বরূপ মালিক আর শ্রমিকের মধ্যে সংঘর্ষেরও বিরাম নাই। বড কারখানাগুলি কুটির শিল্পগুলিকে দ্রুত উৎখাত করিয়া ফেলিতেছে। কুটিরশিল্প বড কারখানার শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হারিয়া যাইতেছে। কলকব্জা ও বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাবে জিনিসপত্র অনেক ক্ষেত্রে অল্প খরচে এবং অল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুত হওয়ায় কুটিরশিল্প তাহার সহিত প্রতিযোগিতায় পশ্চাৎপদ হইতেছে। ইহার উপর বিদেশী সরকারের স্বার্থে দেশীয় শিল্পের অবনতি ঘটিয়াছিল। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে, বিদেশী শাসকগোষ্ঠী বিলাতের কাপড়ের কলের স্বার্থে আমাদের দেশীয় তন্তুবায়গণের উপর অত্যাচার চালাইয়া বস্ত্র-শিল্পকে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছিল। অথচ বস্ত্রশিল্পের অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছিল এই ভারতবর্ষে। ঢাকার মসলিন এককালে গ্রীসের রানীদের অঙ্গ পরিশোভিত করিত। কিন্তু সেই হস্তশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আজ চিরঅন্তর্হিত। এখনও ফরাসডাঙ্গা, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে যে উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হয় তাহার তুলনায় মিলের কাপড কত নিম্নস্তরের!

সুতরাং আমাদের কর্তব্য কি? ছোট শিল্পগুলিকেই কেবল বাঁচাইয়া রাখিয়া বৃহত্তর শিল্পকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া, না প্রতিযোগিতায় যখন বড বড শিল্প কুটির-শিল্পকে পিছনে ফেলিয়া জয়ী হইতেছে কেবল তাহাকেই বাঁচিতে দেওয়া,—যে নির্বাণের মুখে চলিয়াছে তাঁহাকে বাঁচাইয়া তো লাভ নাই।

শুধু কুটিরশিল্প থাকিলে দেশের বৃহত্তর কায ও বিকাশের পথে বাধা আসিবে—মানুষ ফিরিয়া যাইবে সেই প্রাচীন যুগে। তাহা উচিত হইবে না। তবে সব কিছু কলকারখানার হাতে ছাড়িয়া দিয়া মানুষ তাহার নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য পরের মুখের দিকেও চাহিয়া থাকিবে না। গ্রাম হইবে স্বয়ংসম্পূর্ণ—তাহার

নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু সেখানেই উৎপন্ন হইবে। কারখানায় দ্রব্য প্রস্তুত হয় হউক কিন্তু তাহাকে অযথা প্রতিযোগিতা করিতে দেওয়া হইবে না—মানুষকে তাহার স্বাভাবিক শক্তি হইতে বঞ্চিত করা উচিত নহে।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিতেও যে কুটিরশিল্পের গুরুত্ব রহিয়াছে—ইহা প্রণিধানযোগ্য। বৃহত্তর শিল্প যখন দেশে সৃষ্ট হইয়াছে তখন ক্ষুদ্র কুটিরশিল্পের ধ্বংস অনিবার্য। উৎপাদনের ব্যয় বৃহৎ শিল্পে কম পড়ে। কিন্তু একথা যুক্তিযুক্ত নহে। কুটিরশিল্পেব উৎপাদনব্যয় বেশি পড়িলেও পরিবেশন-ব্যয় অত্যন্ত কম। শিল্পী নিকটবর্তী বাজারে অল্প ব্যয়ে নিজের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে। ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়নের ফলে অনেক ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্প অপেক্ষা উচ্চ ধরনের হইয়াছে। বড কলকারখানার গৃহ সাজসজ্জা নির্মাণ করিতে যে ব্যয পড়ে পল্লী অঞ্চলের কুটিরশিল্পের সে সমস্যা নাই।

অল্পব্যয়ে ক্ষুদ্র কুটিরশিল্পে যেরূপ কারিগর সংগ্রহ করা যায়—বৃহৎ শিল্পে তাহা করা যায় না। কুটিরশিল্পের মূলধন এবং উহাতে উৎসাহ পাইলে অধিকাংশ লোকের বেকার সমস্যার সহজ সমাধান হইতে পারে। দেশের বেকার সমস্যা দূব করিবার পক্ষে কলকারখানার সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। গত এক শতাব্দী ধরিয়া কলকারখানার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায কলকারখানা দেশের বেকার সমস্যার খুব অল্পই সমাধান করিতে পারিয়াছে।

কুটিরশিল্পের উন্নতির উপর জোর দিলে শিল্পোৎপাদন সারাদেশে ছড়াইয়া পড়িবে। যুদ্ধের সময় শত্রুর আক্রমণ দেশের উৎপাদন ব্যবস্থাকে নষ্ট করিতে পারিবে না। বড বড় শিল্পাঞ্চলকে দেশের শত্রু অতি অল্প সময়ে ধ্বংস করিতে পারে। কুটিরশিল্পকে ধ্বংস করিতে হইলে সারাদেশকেই ধ্বংস করিতে হয়।

অল্পসংখ্যক স্থানে বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান গঠিত হইলে অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই জাতীয় আয় সীমাবদ্ধ হয। কুটিরশিল্পের প্রসারে জাতীয় আয় সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। কুটিরশিল্প বাঁচিয়া থাকিলে বংশপরম্পরায় ক্রমে ক্রমে শিল্পের নিপুণতা বাড়িতে থাকে।

আমাদের জাতীয় সরকার কুটিরশিল্প ও অন্য ক্ষুদ্র শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিয়া তাহাদের ক্রমোন্নতির জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। National Small Industries Corporation Handloom Board প্রভৃতি স্থাপন করিয়া কুটিরশিল্পের সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্য জাতীয় সরকার কর্তৃক অবলম্বিত ব্যবস্থা এইরূপ উপায়ের অন্যতম নিদর্শন।

উৎপন্ন দ্রব্যের প্রদর্শনী খুলিয়া কুটিরশিল্পকে উৎসাহ দেওয়া যাইতে পারে। আজকাল সরকারের চেষ্টায় এবং জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষকতায় এইরূপ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা দেশের বহুস্থানে হইতেছে। কুটিরশিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে তাহার জন্য উপযুক্ত মূলধন প্রয়োজন। উন্নত উপায়ে বা শ্রম লাঘবে তাহার উৎপাদনও একান্ত আবশ্যক। ইহার জন্য শিল্প-শিক্ষণ ব্যবস্থা থাকা উচিত। আমরা এ যাবৎ

যাহা করিয়া আসিয়াছি তাহাই হস্তশিল্পের সর্বশেষ নিদর্শন নহে। অন্য দেশের শিল্প প্রচেষ্টা দেখিয়া আমাদের অনেক শিখিবার আছে। উন্নত ধরনের শিল্পকৌশল আয়ত্ত করিবার জন্য বিদেশে শিক্ষার্থী পাঠান দরকার। এই সব শিক্ষার্থীরা ভিন্ন দেশ হইতে শিল্পজ্ঞান ও কৌশল অর্জন করিয়া স্বদেশে তাহার প্রচার করিতে পারিবে।

পল্লীজীবন ও নাগরিকজীবন

কবি ও ভাবুক লোক জনবহুল নগর হইতে হঠাৎ একদিন যখন গ্রামে গিয়া উপস্থিত হয় তখন তিনি মনে করেন এখানে আর কিছু না থাকুক, অন্ততঃ নিশ্বাস ফেলিবার যায়গাটুকু আছে। শহরে দিবারাত্র গাড়ির ঘড়ঘড, ট্রাম বাসের শব্দ, ফেরিওয়ালার বিচিত্র ধ্বনি, লোকের কর্ম-কোলাহল, ধবাবাঁধা নিয়মে জীবন চালান, ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায শুইতে হয়, ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় বিছানা ছাড়িতে হয়, ওজন দরে খাবাব কিনিতে হয়, পয়সা না দিলে মাটিও পাওয়া যায় না, পয়সা দিয়া জল বাতাস সবই কিনিয়া লইতে হয়।

শহরে কেহ প্রকৃতিদেবীকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না—সবই এখানে কৃত্রিম। সভ্যতা ভদ্রতা সবই কৃত্রিম। শহরেব লোক ভাবে এক রকম, বলে অন্য প্রকারে; আর কাজেব বেলায় সে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত আচবণ করে। এরূপ যেখানকার অবস্থা সেখানে প্রাণ খুলিয়া বাস করা চলে না। শহরে অন্য দশজনে একজনকে কিরূপে ভাবে তাহাও চিন্তার বিষয়। সব সময়ে শহরের লোককে ভয়ে ভযে সংকোচে থাকিতে হয়—পাছে কেহ কিছু মনে করিল। কোথায় বা কোন সময়ে আচার-ব্যবহারে ত্রুটি হইয়া যায়।

গ্রামে এ সকল উৎপাত নাই। প্রকৃতিব অফুরন্ত দান জলবাতাস রহিয়াছে, যাহার ইচ্ছা গ্রহণ করুক। সবুজ ক্ষেত দেখিয়া চোখের সুখ হউক। শহরের পাকা বাড়ি দিনেব পর দিন মাইলের পব মাইল দেখিয়া দেখিয়া লোকের চক্ষু খারাপ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। গ্রামে ঘুম হইতে উঠিবার কাহারও কোন তাড়াহুড়া নাই, গাড়ির শব্দ নাই, ফেরিওয়ালার প্রবেশ নিষিদ্ধ। খাবার জিনিস অনেক যায়গায় নিক্তির ওজনে বিক্রয় করা হয় না।

শহরে রাস্তায় বাহির হইতে হইলে কাপডজামা ধোপদুরস্ত হওয়া চাই—ঘুরিতে হইলে পকেট হইতে দক্ষিণা বাহির করিতে হইবে—তাহা না হইলে কেহ গাড়িতে উঠিতে দিবে না। অনেক লোক যেখানে গাড়িতে চড়ে, সেখানে নিকটবর্তী স্থানে যাইতেও পয়সা খরচ করিতে লোকের ইচ্ছা জাগে। গ্রামে পায়ে হাঁটিয়া লোক পথে চলে। পায়ে চলিতে পারিলে কেহ বড একটা যানবাহন ব্যবহার করে না।

পয়সা হাতে থাকিলেও গ্রামের লোক জীবনধারণের জন্য বেশি পয়সা খরচ করে না। যেখানে অধিকাংশ লোক দরিদ্র সেখানে বেশি আড়ম্বর অশোভন। শহরে পয়সা না থাকিলেও লোকের খাওয়া খরচ কমাইয়া বাহিরের ঠাঁট বজায় রাখিতে হয়। তাহা না রাখিতে পারিলে সমাজে চলা যায় না।

গ্রামের লোক দেশবিদেশের খবর লইয়া মাথা ঘামায় না। শহরের লোক কারণে-অকারণে পৃথিবীর কোথায় কি হইল তাহা ভাবিয়া আকুল হয়। গ্রামের লোক অল্পেতে সন্তুষ্ট, কারণ তাহার অভাব বোধ কম। শহরের লোক যত পায় তত চায়—তাহার বড় হইবার আকাঙ্ক্ষা বেশি।

গ্রামের লোকের কাজ কম, তাহারা কথা বলে বেশি। কাজ না থাকিলে প্রচুর সময় পাইলে দশজনে জটলা করিতে পারে—পরের মুণ্ডপাত করিবার সুবিধা গ্রামে বেশি। শহরে নিজের কথা ভাবিবার পর আর সময় অবশিষ্ট থাকে না—সুতরাং পরচিন্তা, পরচর্চা গ্রামের মত লোকে শহরে বসিয়া করিতে পারে না।

ভারতবর্ষে পূর্বে গ্রামে লোক বেশি বাস করিত, এখন গ্রামের লোকসংখ্যা দ্রুত কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। শহরের দিকে লোক অবিরত যাইতেছে। যাহার সুবিধা হইতেছে সেই শহরে যাইতেছে। কাহারও ব্যবসার সুবিধা শহরে, কাহারও শিক্ষাদীক্ষা শহরে ভাল হইবে বলিয়া সে গ্রাম ছাড়িতেছে। গ্রামগুলির আর পূর্বের শ্রী নাই। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে দিনের পর দিন গ্রাম উজাড় হইতেছে। পানীয় জল পাওয়া যায় না—অনেক পুরাতন নদনদী মজিয়া গিয়াছে। শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। চিকিৎসার অভাবে দরিদ্র গ্রামবাসী মৃতকল্প। পথঘাটের অবস্থা অতি শোচনীয়। কৃষকের হাতে কাজ নাই, অল্প জমির চাষবাস অল্প সময়েই হয়। বাকি সময় সে কি করিবে তাহার কোন পরিকল্পনা কেহ রচনা করে না। কর্মের অভাবে লোক দলে দলে মিলে মজুরি করে।

বড়লোকের বাস বহুদিনই গ্রাম হইতে উঠিয়া গিয়াছে। যাঁহাদের জমিদারি ছিল, তাঁহারা মাঝে মাঝে গ্রামে আসিতেন, প্রজার নিকট হইতে খাজনার টাকা আদায় হইলেই শহরে চলিয়া যাইতেন। জমিদারি প্রথা রহিত হওয়ায় গ্রামের বাস তাঁহাদের অনেকেরই উঠাইয়া ফেলিতে হইয়াছে। এই সকল বিবিধ কারণে গ্রামের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

এখন কথা উঠিয়াছে 'গ্রামে ফিরিয়া যাও'। 'গ্রামের উন্নয়ন সাধন কর'। কথা বলা যত সহজ, কাজ করা ততোধিক কঠিন। হতশ্রী গ্রামগুলিকে উন্নত করিতে হইবে, শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বায়ত্তশাসন সব কিছুর পুনর্গঠন করিতে হইবে। গ্রামবাসীর আয়ের উপায় বাড়াইতে হইবে—যাহাতে সে গ্রামে থাকিয়াই তাহার জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে। কাজও কিছু কিছু আরম্ভ হইয়াছে। আদর্শ পল্লীও কিছু কিছু গঠিত হইতেছে।

শহরের লোক যাহারা একবার নাগরিক জীবনের সুখসুবিধা পাইয়াছে তাহারা গ্রামে ফিরিয়া যাইবে কিনা সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। তবে এখনও যাহারা গ্রামে বাস করিতেছে পল্লী সংগঠিত হইলে তাহারা সুখসুবিধা ভোগ করিতে পারিবে। কেহ অপর কাহারও হাতে সুখসুবিধা তুলিয়া দিতে পারে না। পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দ্বারা উহা স্বয়ং অর্জন করিতে হয়।

আমার প্রিয় পুস্তক

(রাজর্ষি'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

বই নেহাৎ কম পড়ি নাই। তবে সব বই যে ভাল লাগিয়াছে—একথা বলিতে পারি না—কতকগুলি ভাল লাগিয়াছে। আর কতকগুলি বই হইতে বিশেষ কোন আনন্দ আহরণ করিতে পারি নাই। সবচেয়ে আনন্দ পাইয়াছি রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' পড়িয়া। আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি 'রাজর্ষি' আমার প্রিয় পুস্তক। রাজর্ষি পড়িয়া খুব ভাল লাগে, কিন্তু ভাল লাগার কারণ দেখান বড় কঠিন কাজ।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যে পুস্তক রচনা করিয়াছেন সে সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে উহা ভয়ে ভয়ে বলিতে হয়। "রাজর্ষি" (বাং ১২৯৩) রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাহিত্যিক জীবনে লেখনী-প্রসূত পুস্তক। একটি স্বপ্নলব্ধ ঘটনা ইহার মূলে রহিয়াছে। সেই ঘটনার সহিত ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের জীবনকাহিনী সংযোগ সাধন করিয়াছেন কবি তাঁহার কল্পনার ঐশ্বর্য দিয়া। এই উপন্যাসখানিকে কেহ কেহ ঐতিহাসিক উপন্যাস শ্রেণীতে ফেলেন। মানুষের জীবন অত্যন্ত জটিল। সামগ্রিকভাবে এই জটিল জীবনের মধ্য দিয়া ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করিয়া ইতিহাসের নায়ক যেভাবে চলেন তাহার চিত্র এখানে নাই সত্য কথা। গোবিন্দমাণিক্য ঐতিহাসিক ব্যক্তি না হইলেও কোন ক্ষতি ছিল না বা ইতিহাসকে আশ্রয় না করিলেও লেখকের কোন অসুবিধার কারণ ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ ট্রেণে চলিতে চলিতে এক রাত্রিতে স্বপ্ন দেখেন কোন এক মন্দিরের সিঁড়িতে রক্তের দাগ রহিয়াছে। রক্ত দেখিয়া একটি ছোট মেয়ে তাহার বাবাকে প্রশ্ন করিতেছে 'এ কি, এ যে রক্ত'। মন্দিরসোপানে পতিত রক্তে বিস্মিত বালিকার প্রশ্ন ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের সহিত কবি যুক্ত করিয়া এই উপন্যাস লিখিলেন।

এই উপন্যাসের উদ্দেশ্য হইতেছে হিংসার উপর অহিংসার জয়ঘোষণা। রাজপুরোহিত রঘুপতি বিশ্বাস করেন পশুর রক্তদ্বারাই দেবীর তৃপ্তিসাধন হইবে। আর রাজা গোবিন্দমাণিক্য মনে করেন রাজপুরোহিত ভ্রান্ত। দেবী বিশ্বমাতা। তিনি জীবের রক্ত চাহিতে পারেন না। মাতা সন্তানের রক্ত কখনই চাহিতে পারেন না। হিংসায় মানুষকে পশু করে। প্রকৃত মানুষ তৈয়ারি করাই জগতের বড় কাজ।

রাজপুরোহিত রঘুপতি বিশ্বাসী, রাজা গোবিন্দমাণিক্যও বিশ্বাসী। অপুত্রক রাজার ছোট ভাইয়ের সহিত চক্রান্ত করিয়া দেবীমন্দিরে নরবলি দিবার ব্যবস্থায় রঘুপতি ও রাজভ্রাতা নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হন। ইঁহারা দুইজনে শত্রুর সাহায্যে গোবিন্দমাণিক্যকে রাজ্য হইতে বহিষ্কার এবং নক্ষত্র রায়কে সিংহাসনদানের চেষ্টায় লিপ্ত হন। রাজা গোবিন্দমাণিক্য দেশের শান্তির জন্য সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং মানুষ তৈয়ারি করিবার কাজে লাগিয়া যান। নিজের নিত্য অভ্যাস পরিবর্তনের

সাধনাও করিতে থাকেন। অবশেষে প্রজাগণের আহ্বানে গোবিন্দমাণিক্য আবার সিংহাসন গ্রহণ করেন।

রবীন্দ্র-মানসের একটি বিশেষ স্বভাব হইতেছে সংসারের কর্মকোলাহল হইতে নিজেকে দূরে টানিয়া লইয়া যাওয়া এবং সেইখানেই প্রেম স্নেহপ্রীতির মধ্যে অখণ্ড শান্তিলাভ করা। কবি অপরিণত জীবনেও উপন্যাসের মধ্য দিয়া এই ভাবটিকে রূপ দিয়াছেন ইহাই সর্বাপেক্ষা আনন্দের কারণ। কবির পরিণত জীবনে যেমন কার্য করিয়াছে তাহার মূল রহিয়াছে তাঁহার প্রথম জীবনের লেখায়। গোবিন্দ-মাণিক্যের মতে 'হিংসার নিকটে বলিদান দেওয়া শাস্ত্রের বিধি নহে, হিংসাকেই বলি দেওয়া শাস্ত্রের বিধি'। এই হিংসাকে বলি দিতে গিয়া তাঁহাকে রাজ্য ছাড়িতে হইল। তবু তিনি হিংসার পথে প্রবৃত্ত হইলেন না। তাঁহার নিকট রাজার আদর্শ হইতেছে "পৃথিবীকে বশ করিয়া রাজা হইতে হয়।" এ বশীকরণ প্রেমদ্বারা—অস্ত্রদ্বারা নহে। রাজা কাহারও আত্মীয় বা অনাত্মীয় নহেন। যেখানে তিনি বিচারক বা কর্তব্য করিতে উদ্যত তিনি কাহারও মুখের দিকে চাহিয়া কাজ করিবেন না। কর্তব্যের অনুরোধে নিজের আত্মীয়কে বিসর্জন দিতে হইবে।

গোবিন্দমাণিক্যের জীবন-সাধনা হইতেছে আত্মজয়। যিনি নিজেকে জয় করিতে পারেন—তিনিই কেবল সকলকে জয় করিতে পারেন। গোবিন্দমাণিক্যের জীবনের সাধনা ছিল সকল প্রকার দীনতা, হীনতা, দুর্বলতার উর্ধ্বে উঠা। এ সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

রঘুপতির চরিত্র হইতেছে রাজার বিপরীতমুখী চরিত্র। রঘুপতি হিংসার আশ্রয় লইয়াছেন। হিংসাবাদকে তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন। তাঁহার মতে দেবতার মন্দিরে হিংসা হিংসা নহে। এ হিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য যে কোন হিংসায় লিপ্ত হইলে দোষ হয় না। এ চরিত্র বলিষ্ঠ এবং প্রাণবন্ত। রঘুপতির উদ্দেশ্য সফল করিতে গিয়া জয়সিংহ প্রাণ বিসর্জন করে। জয়সিংহ মন্দিরের সেবক। রাজ-পুরোহিত পুত্রনির্বিশেষে তাঁহাকে পালন করিয়াছেন। জয়সিংহের আত্মবিসর্জন রঘুপতির মনের মধ্যে প্রথম আঘাত হানিয়াছিল। হয়তো রাজার সাহায্যে তাঁহার শেষ পরিবর্তনে ইহাই ভিতরে ভিতরে প্রতিক্রিয়া উপস্থিত করিয়াছে।

নক্ষত্র রায় দুর্বলচিত্ত লোক। এই দুর্বলতার জন্য তাঁহাকে পরের হস্তের ক্রীড়নক হইতে হইয়াছে। প্রকৃত হিতকারী তাঁহার বড়ভাই গোবিন্দমাণিক্য ইহা তিনি ভুলিয়াছেন, ভাইকে রাজ্য হইতে সরাইয়াছেন, দেশের বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছেন। সাধারণ মানুষ যেরূপ দুর্বলতায় অভিভূত হয় নক্ষত্র রায়ও তাহাই হইয়াছিলেন। এ চরিত্র স্বাভাবিক।

চারিদিকের প্রতিকূলতার মধ্যে গোবিন্দমাণিক্যের দ্বারা অন্তর ও বাহিরের জয় এই উপন্যাসকে গৌরব প্রদান করিতেছে। ভাষার দিক দিয়া বিচার করিলে এই পুস্তকের প্রাণবান প্রসাদগুণযুক্ত গদ্য রচনা আমাদের আনন্দ বিধান করে।

রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ কবি। উপন্যাস লিখিতে গেলেও তাহার পটভূমিকায় কবিমানসের ছাপ পাওয়া যায়

একটি ভ্রমণ কাহিনী

বারাণসী (কাশী)

ঘর হইতে লোকে বাহির হয়। কেহ বাহির হয় প্রয়োজনের তাগিদে—কেহবা শুধু অজানার টানে। আমার প্রয়োজনের তাগিদ নাই—আছে অজানার টান। তাই ঘর ছাড়িয়া আমাকে বাহির হইতে হইল।

পূজার ছুটি। কিন্তু যাই কোথায়? শুনিয়াছি যে লোকের অন্য গতি নাই তাহার নাকি বারাণসীই একমাত্র গতি। তাই বারাণসী যাওয়া সাব্যস্ত করিয়া হাওড়া স্টেশনে আসিলাম। স্টেশন লোকে লোকারণ্য। আমি রেলের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। প্রথম, দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীর চালচলতি সবই বাঁধাধরা নিয়মের অধীন। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর সব কাজই বেপরোয়া রকমের। তাই তাহাদের যায়গা লইয়া কাড়াকাড়ি, একজনের সঙ্গে আর একজনে ধস্তাধ্বস্তি চলিল। তাহারা কেহ শুইয়া, কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ অপরের মালের উপর বসিয়া, কেহবা গাড়ির পা দানে ভর করিয়া যে যাহার গন্তব্যস্থলে চলিয়াছে। পথের শেষে পৌঁছিলে সকল কষ্টের সকল দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিবে।

আশ্বিনের শুক্ল দ্বিতীয়ার রাত্রি। গাড়ি দ্রুতগতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। বাহিরের সবকিছু অস্পষ্ট—ক্ষীণ চন্দ্রের আলোতে সব আবছা-আবছা দেখা যায়। মাঝে মাঝে স্টেশনের বা কল-কারখানার আলো চোখে পড়িতেছে। গাড়ির মেঝেতে এক ব্যক্তির বাক্সের উপর বসিয়া ঝিমাইতে লাগিলাম। কখন ঐ অবস্থায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছি জানি না। উঠিয়া দেখি গাড়ির কিছু যাত্রী নামিয়া গিয়াছে। ভোর হইয়াছে। অদূরে মোগলসরাই স্টেশন। কাশী আর বেশি দূরে নহে—যে দূর ছিল সে অতি নিকট হইয়াছে।

মোগলসরাই স্টেশনে কাশীর খেলনা, রেশমী চুড়ি, গরম চা, পুরী-মিঠাইর ফেরিওয়ালাদের হাঁকডাক আক্রমণের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল গাড়ি ছাড়িবার পর।

গাড়ি ক্রমশঃ গঙ্গানদীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। গঙ্গার উপরে সেতু। ওপারে অর্ধচন্দ্রাকৃতি উত্তর বাহিনী গঙ্গার তীরে কাশী। অগণিত মন্দির, মঠ, গৃহ আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বাড়িগুলি সব আপাতদৃষ্টিতে গায়ে গায়ে লাগা মনে হয়, আর মনে হয় সমগ্র বারাণসী যেন শূন্যে বিরাজ করিতেছে। 'ঐ দেখ বারাণসী বিরাজিছে গগনে'—নীচের মাটি চোখে পড়ে না। ভোরের প্রথম আলোতে এখান হইতে মন্দিরের ত্রিশূল চূড়াগুলি দেখিলে মনে হয় 'প্রথম উষার করে বিদ্যুৎ বরণ, মন্দির ত্রিশূলচূড়া জাহ্নবীর পারে।'' (রবীন্দ্রনাথ)

ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে গাড়ি হইতে নামিয়া বাসার দিকে রওনা হইলাম।

ভারতমাতার মন্দির, থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি, সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ, জলের কল, এ্যাংলো-বেঙ্গলী কলেজ ছাড়াইয়া গঙ্গার পারে বাসায় পৌঁছিলাম।

এই সেই বারাণসী—বেদ ও পুরাণ-বর্ণিত হিন্দুর হৃদয়ের রাজধানী। বরুণা ও অসির মধ্যবর্তী পঞ্চক্রোশ ভূমি ব্যাপিয়া বিস্তৃত বারাণসীপুরী ভগবান্ শিবের রাজধানী। কাশী পৃথিবীর বাহিরে এক নূতন স্থান। সাধারণত পৃথিবীর নিয়ম এখানে অচল। ইহা মুক্তিক্ষেত্র। এখানকার মৃত্যু অমৃত আনিয়া দেয়, জীব হয় শিব। ভারতের সর্বপ্রান্তের হিন্দুর মহামিলনক্ষেত্র সর্বতীর্থের সমন্বয় এই বারাণসীপুরীতে।

নগরীর পূর্বদিকে গঙ্গা বহিতেছে। অসি নদীর সঙ্গমস্থল হইতে গঙ্গার সেতু পর্যন্ত সোপানশ্রেণীমণ্ডিত ঘাটের পর ঘাট চলিয়াছে। অগণিত নরনারী প্রাতে প্রত্যেক ঘাটে স্নান করিতেছে, স্তব-পাঠ করিতেছে—সন্ধ্যাবন্দনা করিতেছে। বিস্তীর্ণ নীলাকাশের নীচে একই গঙ্গার জলে সকলের একত্র স্নানের দৃশ্যে স্নানার্থীদের হৃদয়ে একত্বের আর অখণ্ডত্বের অনুভূতি আসে। অপরাহ্ণে বড় বড় ঘাটে পুরাণ পাঠ, কথকতা, কীর্তন চলে। ধূনিজ্বালা সাধু-সন্ন্যাসী ঘাটে দেখা যায়। অনেক ঘাটের সহিত কোন না কোন ঐতিহ্য জড়াইয়া আছে। শহরের দক্ষিণ দিকের তুলসীঘাটের রামমন্দির ভক্তকবি তুলসীদাসের রামচরিত রচনার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। মহারাজা চেতসিংহের ঘাটে আসিলে দম্ভী, দর্পী ব্রিটিশ সৈনিকদের সহিত কাশীরাজের সৈন্যদের সংঘর্ষ স্মরণপথে উদিত হয়।

হরিশ্চন্দ্রঘাট রাজা হরিশ্চন্দ্রের সত্যপালনের এবং অপূর্ব আত্মত্যাগের স্মৃতি আজও বহন করিতেছে। জনাকীর্ণ ঘাটগুলির মধ্যে দশাশ্বমেধ ঘাটই প্রধান। কাশীর উত্তর ও দক্ষিণের দুই মহাশ্মশান হইতেছে মণিকর্ণিকা ঘাট এবং হরিশ্চন্দ্র ঘাট।

শহরের দক্ষিণে রানী ভবানীর কীর্তি কাশীর দুর্গাবাড়ি। কেদারজীর মন্দিরে প্রত্যহ অগণিত দর্শনার্থী লোকের সমাগম নয়। কাশীর মধ্যস্থলে ভগবান বিশ্বেশ্বরের মন্দির; ইহার চূড়া সুবর্ণে মণ্ডিত। ইহা লক্ষ লক্ষ ভক্তের পূজা, অঞ্জলি, অভিষেক এবং স্তবপাঠে মহনীয়। বহুজন একসঙ্গে ভগবানের পায়ে অঞ্জলি দিতে গিয়া পরস্পরের মধ্যে বিভেদ ভুলিয়া থাকে। ভক্তেরা বিশ্বেশ্বর মন্দিরের পর অন্নপূর্ণার মন্দির দর্শন করিয়া থাকেন। ভগবান বিশ্বনাথ সর্বত্যাগের প্রতীক। তিনি জগৎকে ভাঙেন, আর দেবী অন্নপূর্ণা জগৎকে গড়েন আর তাহাকে অন্নদ্বারা প্রতিপালন করেন। সংসারের ভাঙাগড়ার এই দুই দিক এখানে আসিলে বুঝা যায়।

কাশীর অন্যতম প্রধান দর্শনীয় স্থান হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়—দক্ষিণ দিকে অবস্থিত একটি পৃথক্ নগর বিশেষ। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে এই সর্বভারতীয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনার সূত্রপাত হয়। সামান্য ভিক্ষুক হইতে রাজাধিরাজ পর্যন্ত সকলেরই দানদ্বারা ইহার ধনভাণ্ডার গড়িয়া উঠিয়াছে। কাহারও সামান্য দান

অবহেলিত হয় নাই। এই বিশ্ববিদ্যালয় মহামান্য মদনমোহন মালব্যের অক্ষয় কীর্তি। তাঁহার এই বিরাট কীর্তি ক্রমশঃ বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে প্রবেশ করিলেই দেখা যায় একদিকে একটির পর একটি ছাত্রাবাসের সারি চলিয়াছে—অপর দিকে চলিয়াছে মহিলা বিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, আর্টস কলেজ, ভারতী মহাবিদ্যালয়, বিজ্ঞান কলেজ, কৃষি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রভৃতির পর পর সারি। বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যস্থলে বিশ্বনাথজীর মন্দির—প্রাচীন ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যের এক অপূর্ব নিদর্শন। এই মন্দিরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তরাত্মা বলা যাইতে পারে। ভগবান্ মহেশ্বরের পরমাত্মরূপী লিঙ্গমূর্তি শ্বেতপ্রস্তর বেদীর উপর স্থাপিত। উপরে দ্বিতলে সিংহবাহিনী শক্তি মূর্তি। অন্যান্য দেবমূর্তিও চারিদিকে রহিয়াছে। মন্দিরের মধ্যে শ্বেতপাথরের প্রাচারগাত্রে বৈদিক যুগ হইতে আবম্ভ করিয়া ভারতেব সভ্যতা ও সংস্কৃতির চিত্র খোদিত ও মর্মকথা লিখিত রহিয়াছে। এই মন্দিরে আসিলে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা অনুভূত হয়। সমগ্র আর্যসভ্যতার কেন্দ্ররূপী মহেশ্বরের মূর্তির চারিদিকে ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি যুগে যুগে বিকাশ লাভ করিয়াছে। শ্বেত পাথরের দেওয়ালে পার্থসারথি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতার বাণীদ্বারা তাঁহার কর্তব্যে অবহিত করিতেছেন, প্রাচীর গাত্রে সমগ্র ভগবদ্গীতা লিখিত আছে। এই রকম আরও কত চিত্র খোদিত রহিয়াছে।

ইহার পর সারনাথ দেখিতে গেলাম। ইহা কাশী হইতে প্রায় সাত মাইল দূরে ভগবান্ বুদ্ধের প্রথম ধর্মপ্রচারেব স্থান। এইখানে বহু শতাব্দী পরে রাজচক্রবর্তী অশোক গৌতম বুদ্ধ যেখানে বসিয়া তাঁহাব বাণী প্রথম প্রচাব করিয়াছেন সেইখানে এক স্তূপ নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মূলগন্ধকুটী বিহার, বোধিবৃক্ষ, চৈনিক বৌদ্ধবিহার, ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধবিহার, প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের যাদুঘর প্রভৃতি দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিলাম।

কাশীতে বাস করিতে হইলে নিজেকে তদনুরূপভাবে গঠিত করিতে হয়। শোনা যায়, কাশীর বাহিরে লোক যে অন্যায় আচবণ করে, কাশীবাসে তাহা ধুইয়া মুছিয়া যায়, কিন্তু কাশীতে বসিয়া অন্যায় আচরণ করিলে তাহার কোন প্রকারেই নিষ্কৃতি নাই।

কাশীর ওপারে রামনগর। ইহাই ব্যাসকাশী। এইখানেই ব্যাসদেবের মন্দির ও দুর্গাবাড়ি অবস্থিত। গঙ্গার গায়ে কাশী নরেশের দুর্গ ও প্রাসাদ। মহারাজার প্রাসাদ দেখিতে ভ্রমণার্থী বহু লোক প্রতিদিন সেখানে যায়। আশ্বিন মাসে এখানকার রামলীলা উৎসব বিশেষভাবে লোককে আকৃষ্ট করে।

শ্রাবণ মাসের কাজরি গানে এখানকার বর্ষার উৎসব যাপিত হয়। দেওয়ালীর সময় অন্নকূট ও শিবচতুর্দশীতে লক্ষ লক্ষ লোক সমাগম, গ্রহণের গঙ্গাস্নান, আশ্বিন-কার্তিকের রামলীলা উৎসব কাশীকে জীবন্ত করিয়া তোলে।

এখানকার তৈয়ারি পুতুল, রেশমি শাড়ি, রূপা ও পিতলের কাজ শিল্পজগতে বিশেষ প্রসিদ্ধ।

এই কাশী নগরীতে শুধু ভারতের সর্বপ্রান্তের লোক নহে, সারা জগতের লোকের বাস দেখা যায়। এখানকার সাধারণ লোক ভদ্র ও বিনয়ী। পৃথিবীর সর্বস্থানের লোক এখানে বাস করে বলিয়া বিভিন্ন জাতীয় লোকের রীতিনীতির সহিত অধিবাসীরা পরিচিত।

অপরের সহিত না মিশিলে লোকে নিজেকে ঠিক ঠিক ভাবে বিচার করিতে পারে না। আর অপরের যাহা সুন্দর তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে না।

ভিন্ন স্থানে না গেলে, অপরের সহিত না মিশিলে কখনও মানুষের মন উদার হয় না। দেশ ভ্রমণের প্রধান সার্থকতা এইখানে।

রাজপথের আত্মকথা

আমি রাজধানীর রাজপথ। 'রাজপথ' কথার অর্থ তোমরা জান কি? ইহা রাজার পথ না পথের রাজা? যদি রাজার পথ হইত তবে কেবল রাজাই আমাকে ব্যবহার করিতেন, সর্বসাধারণের ব্যবহারে আমি লাগিতাম না। সুতরাং আমি রাজার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নই।—তবে আমাকে বলা হয় পথের রাজা।—আমি ছোট গলি নহি, লোকের দুই পায়ে হাঁটিবার পথও নহি—সর্বসাধারণের সর্বপ্রকার যানবাহন জীবজন্তু চলিবার প্রশস্ত পথ।

আমি তোমাদের মত কথা বলিতে না পারিলেও—যদি হৃদয় বলিয়া তোমাদের কিছু থাকে তবে অবশ্যই আমার কথা তোমরা শুনিতে পাইবে। কান দিয়া কিছু শোনা মোটেই শোনা নহে যতক্ষণ হৃদয় উহা গ্রহণ না করে। তোমরা অনেক কিছু শোন—আর পরমুহূর্তেই ভুলিয়া যাও। যাহাদের কোন বিচারবুদ্ধি নাই তাহারাই পরের কথা আর কান-কথা শোনে।

পৃথিবীর বিভাগ দুইটি—এক ঘর আর বাহির। ঘরের বাহির হইলেই যেখানে দাঁড়াও উহা পথ—স্থলপথ, জলপথ বা আকাশপথ। আর পাতালপথও পথ। কিন্তু আমি রাজধানীর রাজপথ। ঘর হইতে বাহির হইলেই তোমাদিগকে আমার আশ্রয় লইতে হইবে। ঘরের বিধিব্যবস্থা সব ঘরোয়া রকমের—উহার মধ্যে অন্ততঃ নিজের কাছে কোন কৃত্রিমতা নাই—কিন্তু রাজপথে বাহির হইতে হইলে পোষাক-পরিচ্ছদের ঠাট বজায় রাখিতে হইবে। মানুষ যখন সর্বস্বান্ত হয় তখন সে 'পথে বসে'—অর্থাৎ পথই তাহার একমাত্র আশ্রয়। তাহার পক্ষে অবশ্য কোন ঠাট বজায় রাখার প্রশ্ন উঠে না। আর যে বাল্যজীবন হইতে কখনও সুখের মুখ দেখে নাই সেও পথে পথেই ঘুরিতেছে, পথে পথে ভিক্ষা করিতেছে। তোমরা রাত্রিদিন যে কোন সময়ে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলে দেখিবে কত লোক রাজপথে বাস করিতেছে, রাত্রিবেলায় দেখিবে বিরাট রাজধানীর শতকরা কত লোকের আশ্রয়দাতা আমি। যাহার ঘর বা চাল-চুলা

বলিয়া কিছু নাই—সে পথের উপর চাল চুলা করিয়া লয়। সুতরাং নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাতা আমার মত কে আছে।

আমি ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, রাজনীতিবিদ্, সমাজনীতিবিদ্, ধর্মবীর, কর্মবীর সকলের কথাই নির্বিকারচিত্তে শুনি। ধর্মবীর পথে পথে তাঁহার কথা সকলকে শুনান, দ্বার হইতে দ্বারে পথের উপর দিয়াই তিনি নিজের কথা কহিতে কহিতে যান। তাঁহার ঘর নাই।—পথই তাঁহার ঘর। পার্লামেণ্টে যে প্রশ্নের সমাধান হয় না রাজনীতিক তাহার সমাধান রাজপথে করিবার ভয় দেখান, কিন্তু আমি এ বিষয়ে নির্বিকার, কেননা আমরা (পথের) উপরের কষ্ট ও আনন্দ আমি দুইই সমভাবে গ্রহণ করিয়া থাকি—আমি দুঃখে বিচলিত হই না—সুখেও আমার স্পৃহা নাই'। সকলের সুখদুঃখের বোঝা যাহাকে বহিতে হয় তাহাকে 'সুখদুঃখের অতীত না হইলে চলে না।'

যদিও আমি মহাকালের মত অনাদি অনন্ত নই—তথাপি আমি জগতের অনেক পরিবর্তনের কথা শুনিয়াছি আর আমার নিজের ও চারিপাশের পরিবর্তনের সম্মুখীন হইয়াছি। আমি মানুষের হাতে-গড়া রাজপথ। আমার উৎপত্তি আছে—ধ্বংসেরও কোন বাধা নাই। কোনদিন প্রয়োজনের অভাবে আমাকে ক্ষমতাপন্ন লোকেরা ধ্বংস করিয়া ফেলিতে পারে বা সর্বসাধারণের চলাচল একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে পারে। মানুষের প্রয়োজনে যখন আমার উৎপত্তি ও পরিণতি, প্রয়োজন না থাকিলে ধ্বংস হয়তো একদিন আমারও হইবে।

আমি প্রথমে লোক ও পশু চলাচলের সরু পথ ছিলাম। ক্রমে বড় হইতে হইতে আমি বর্তমান অবস্থায় পৌঁছাইযাছি। প্রথমে আমি কাঁচা রাস্তা ছিলাম। তাহার পর আমার বুকের উপর দিয়া রোলার চালাইয়া আমাকে পাকা রাস্তা করা হইল। তারপর পাথরের টুকরা ও পিচগলা দিয়া আমাকে দগ্ধ করিয়া উন্নত ধরনের পথরূপে পরিণত করা হইল। এখন আমি কংক্রিটের মসৃণ রাস্তা।

আমার উপর দিয়া গোরুর গাড়ি, মহিষের গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মোটর গাড়ি, এক চাকার গাড়ি, দুই চাকার গাড়ি, তিন চাকার গাড়ি, চার চাকার গাড়ি, আট চাকার গাড়ি পর্যন্ত চলিতেছে। মোটরগাড়ির জন্মের পর সনাতন গোরুর গাড়ির আদর মোটেই কমে নাই। রেল রাস্তার অনুকরণ করিয়া উন্নত মানুষ তোমরা আমার বুকের উপর ট্রামগাড়ির লাইন বসাইয়াছ। আমার উপর দিয়া আগে ঘোড়ার ট্রাম চলিত, এখন ঘোড়ার স্থান বিদ্যুৎ গ্রহণ করিয়াছে। দিনে দিনে আরও কত কি দেখা আমার ভাগ্যে লেখা আছে কে জানে।

আমার সামনে রাষ্ট্রের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মানুষের জীবন যৌবন ধন মানের গর্ব অনন্ত কালের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। আমার বক্ষের উপর মাতৃক্রোড়ে শিশু চলিয়াছে। সেই শিশু বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢত্ব অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধ হইয়াছে। তাহার শবও আমারই বুকের উপর দিয়া লোকে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে। বিদেশী সরকারের দম্ভ-দর্পের প্রতিমূর্তি গোরা সৈন্য আমার বক্ষ

পদদলিত করিয়া চলিয়া গিয়াছে। আবার জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীও আমারই উপর দিয়া দেশের আসন্ন মুক্তির সংগীত গাহিতে গাহিতে অগ্রসর হইয়াছে এবং বাধাপ্রাপ্ত হইয়া কারাবরণ করিয়াছে। ভারতের মুক্তিমন্ত্রের সাধক দেশপূজ্য নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের পদধূলি দিয়া আমাকে পবিত্র করিয়াছেন। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-বিরহ, হাসি-অশ্রুর অবারিত প্রবাহ আমার উপর দিয়া রূপে, কার্যে, কথায় অবিরাম চলিয়াছে।

আমি একা রাজপথ। কিন্তু আমি একা হইলেও আমার কাজ সকলকে লইয়া। ধনী-নির্ধন, সাধু-অসাধু, পণ্ডিত-মূর্খ, স্ত্রী-পুরুষ, বালক বৃদ্ধ, স্বদেশবাসী, বিদেশী—পৃথিবীর যে-কোন স্থানের অধিবাসী সকলেই আমার কাছে সমান—সকলের জন্যই আমার বক্ষে স্থান খালি রাখিয়াছি। আমার উদারতায় কাহারও বঞ্চিত হইবার কারণ নাই। 'আমার কাছে কেহ প্রিয়ও নহে বা বিদ্বেষের পাত্রও নহে'। তাই তোমরা আমাকে সাম্য-সংস্থাপকও বলিতে পার।

দেশের মাটি সনাতন। এই সনাতন বস্তুর উপর তোমরা রাজপথ গড়িয়াছে। সুতরাং ইহার উপর দিয়া কে কখন কিভাবে চলিবে তাহার বিশেষ বিশেষ নিয়ম তোমরাই তৈয়ারি কর—করিবার অধিকারও তোমাদের আছে। শুনা যায়, প্রাচীন ভারতে রাজা, বিবাহের বর ও বিদ্যাস্নাতককে পথ ছাড়িয়া দিবার ব্যবস্থা ছিল। আজকালও রাষ্ট্রপ্রধানকে পথ ছাড়িয়া দেওয়া হয়, কারণ তিনি সকল দেশবাসীর সম্মানের প্রতীক, বিবাহের বর—এক দিনের জন্য রাজা হইলেও রাজা—তাহাকেও তোমরা পথ ছাড়িয়া দাও। কিন্তু বিদ্যাস্নাতক (কৃতবিদ্য ব্যক্তি) সম্বন্ধে তোমরা কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে তাহা তোমাদের ভাবিবার বিষয়।

জগতের নিত্য নূতন কাহিনী সৃষ্ট হইতেছে—রাজপথের কাহিনীরও শেষ নাই—অবশ্য যতদিন রাজপথ রাজপথ থাকিবে।

বাংলার পূজাপার্বণ

বৈদিক যুগে গৃহস্থ যজ্ঞ করিত। দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগে যজ্ঞ সম্পন্ন হইত। কতকগুলি যজ্ঞ গৃহস্থের নিত্যকর্তব্য ছিল—কতকগুলি পর্বে পর্বে সম্পন্ন হইত। 'পর্ব' কথার অর্থ অংশ। মাসের প্রধান অংশ প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা আর অমাবস্যা। সুতরাং এই দুই পর্বে অমাবস্যার সহিত 'দর্শযাগ' যুক্ত রহিয়াছে, পূর্ণিমার সহিত 'পৌর্ণমাস যাগ' সম্বন্ধ আছে। পার্বণ শব্দের ব্যাপক অর্থ সাময়িক পূজা ও তাহার অঙ্গীয় উৎসব। যেমন বৈদিক যাগযজ্ঞে বিশেষ করিয়া "অশ্বমেধ যজ্ঞে", মহাব্রতে, অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে লৌকিক উৎসবকে যজ্ঞের একটা অঙ্গ ধরা হইত, সেইরূপ পূজার আজিকার দিন পর্যন্ত উৎসবকে পূজার অঙ্গরূপে ধরা হয়।

বৈদিক যাগযজ্ঞ পরিবর্তিত হইয়া লৌকিক ক্রিয়ায় পরিপুষ্টি লাভ করিয়া বাংলায় বারো মাসে তের পার্বণে পরিণত হইল। পার্বণের সংখ্যা মোট তের না তিনশত বলা কঠিন, কেন না এক পূর্ববাংলায়ই 'বার মাসে তের ষষ্ঠী'-ব্রতের অনুষ্ঠান হয়।

প্রতিটি ব্রতে বা পূজায় একদিকে যেমন সংযম ও একাগ্রতার অভ্যাস হয়, তেমনি অপর দিকে পরস্পরের ব্রতে যোগদানে প্রীতি এবং আনন্দ বর্ধিত হয়।

বাংলা দেশের ব্রত ও পূজা সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচলিত। যাহার আর্থিক সামর্থ্য সামান্য সে অল্প খরচের ব্রতই করিয়া থাকে। আর যাহাদের পয়সা বেশি তাহাদের ঘরে পূজা বা ব্রতের উপবাস লাগিয়াই আছে। পূজা বা ব্রতে একদিক দিয়া যেমন আহার ও মানসিক সংযমের অভ্যাস ও অপরের প্রতি প্রেমের বিস্তার হয়, তেমনি অপর দিক দিয়া দেশের সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে এই সব পূজা ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া। প্রত্যেক পূজা বা ব্রতের সহিত যে সকল কাহিনী জড়িত আছে—সে সকল কাহিনী আবৃত্তি করায় জনগণের চিত্তে ভাবভক্তির উদয় হয়। সুখদুঃখ, আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্বে সাধারণ মানুষকে ব্রতের বা পূজার কাহিনী অভিভূত করিয়া থাকে।

ব্রত ও পূজার সহিত গৃহসজ্জা, আলপনা প্রভৃতির অনুশীলন চলে। চিত্রশিল্পের দিক দিয়া বাংলার বৈশিষ্ট্য আলপনার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। আলপনা দিয়া প্রাণের দেবতাকে আমরা আবাহন করি—তাঁহার চরণচিহ্ন আলপনার উপর যেন পড়ে।

পূর্ব বাংলায় প্রত্যেক মাসে মা ষষ্ঠীর পূজা হয়। প্রত্যেকটি ষষ্ঠীব্রতের বিশেষ বিশেষ নাম আছে—চৈত্রে (বসন্তে) অশোকষষ্ঠী, জ্যৈষ্ঠে অরণ্যষষ্ঠী, শরৎকালে দুর্গাষষ্ঠী। ষষ্ঠীব্রত অতি প্রাচীন ব্রত। রাজাধিরাজ হর্ষবর্ধন শিলাদিত্যের সময়ে লিখিত বাণভট্টের "কাদম্বরী"তে সূতিকাগৃহে ষষ্ঠী পূজার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। ষষ্ঠীর এক নাম 'দেবসেনা'—দেবসেনানী কার্তিকের শক্তি। পুত্র কার্তিকের মত শক্তিমান্ হইবে। ইহার জন্যই সম্ভবতঃ ষষ্ঠীব্রতের প্রবর্তন। মা ষষ্ঠী সন্তান রক্ষাকারিণী। শক্তিমান্' বা শক্তিমতী পুত্রকন্যা নিজেরাই আত্মরক্ষা করিতে পারিবে।

যে যে দেবতার পূজা করে সে ব্যক্তি তাহারই গুণলাভ করিতে চায়। দুর্গাপূজায় শক্তি ও সর্বৈশ্বর্য লাভ, লক্ষ্মীপূজায় ঐশ্বর্য, মাধুর্য, শ্রীলাভ, শিবপূজায় সর্বত্যাগী ও জ্ঞানী হইবার বাসনা। রামপূজায় ত্যাগ ও প্রেমলাভের বাসনা, বিষ্ণুপূজায় জগৎ পালন ও রক্ষণরূপ ক্ষাত্রশক্তি লাভ এই সকল বিভিন্ন গুণ বা শক্তির সাধনা লোকে করে পূজা দ্বারা।

বৈশাখে প্রতি মঙ্গলবারে বাংলার অনেক স্থানে মঙ্গলচণ্ডী ব্রতের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠে বিশেষ করিয়া গঙ্গার পারের স্থানসমূহে গঙ্গা দশহরাপূজা হয়। আষাঢ়ে অম্বুবাচী ব্রত। যতিব্রতী বিধবা কেহই তিনদিন পক্কান্ন গ্রহণ করেন না। এই সময় নববর্ষা সমাগম পর্ব। অম্বুবাচীর কয়েকদিন কৃষিকার্য বন্ধ থাকে, পৃথিবীকে জলধারায় সিক্ত হইতে দেওয়া হয়।

আষাঢ়ে রথযাত্রা। বাংলার সর্বত্র রথযাত্রার উৎসব চলে। রথের মেলা বসে। নানারূপ উৎপন্ন দ্রব্য, তরিতরকারী, ফল, বাঁশি, খেলনা রথের মেলায়

বিক্রয় হয়। দেশপ্রসিদ্ধ রথ যেসব স্থানে আছে—সে সব স্থানে বহু দূর হইতে এমন কি ৫০।৬০ মাইল দূর হইতে লোক রথ দেখিতে আসে। শ্রীরামপুরের মাহেশের রথযাত্রা বাংলায় এমনি একটি প্রসিদ্ধ রথোৎসব। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'রাধারাণী' উপন্যাসে এই রথের উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রাবণে মনসাপূজা। সমগ্র শ্রাবণ মাসে ঘটে মনসাদেবীর পূজা হয়, কেবল শ্রাবণ সংক্রান্তি দিনে প্রতিমা গড়িয়া মনসাপূজা হয়। সারা শ্রাবণ মাস মনসামঙ্গল সুরসংযোগে পাঠ করা হয়। মাঝের কতক অংশ ঢোল, করতাল, মৃদঙ্গের সহিত গীত হয়। পূর্ব বাংলার সর্বশ্রেণীর লোক ভক্তিভরে মনসামঙ্গল শোনে। যাহার সামর্থ্য আছে সে ব্যক্তিই, পূর্ব বাংলায় মনসাপূজা করে। রাঢ় দেশে নাগপঞ্চমী তিথিতে বহু স্থানে মনসাপূজা হয়। বাংলার বাহিরে নাগপঞ্চমীই মনসাপূজার প্রকৃষ্ট তিথি।

ভাদ্রে জন্মাষ্টমী। এইদিন ভূভার হরণ করিবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব তিথিরূপে প্রসিদ্ধ। তিনি বাল্যকালে প্রেমে ব্রজের রাখাল, যৌবনে দ্বারকায় রাজা, শান্তিসংস্থাপনে রাজদূত, কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে পার্থ সারথি, আর গীতার ধর্মসমন্বয় বাণীর প্রচারক। জন্মাষ্টমী শুধু বাংলার ব্রত বা উৎসব নয়, সারা ভারতের ব্রত ও উৎসব।

আশ্বিনে দুর্গাপূজা, বাংলার জাতীয় উৎসব। দুর্গাব্রতে মহাশক্তির সাধনা—বিজয়াতে সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের আদর্শ প্রদর্শন। সারা বাংলা এই উৎসবে মুখরিত। বিজয়ার দিনে ক্রীড়া, কৌতুক, মাঙ্গলিক গান-বাজনার সহিত নদীতে প্রতিমা বিসর্জন (ক্রীড়াকৌতুক মাঙ্গল্যৈঃ—রঘুনন্দন) হইয়া থাকে।

দুর্গাপূজার পর লক্ষ্মীপূজা। সাধনার দ্বারা অসুরের বিনাশ—হৃদয় হইতে আসুরিক ভাবকে বাহির করিয়া দেওয়া। তারপর কোজাগরী লক্ষ্মীপূজায় শ্রীসম্পদ্ লাভ। ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর পূজা প্রসাদ গ্রহণ, সারারাত্রি আনন্দ উৎসব।

লক্ষ্মীপূজার পর কালীপূজার উৎসব। দেওয়ালিও এই দিন হয়। বাংলার বাহিরে দেওয়ালিতে নববর্ষের উৎসব উদযাপিত হয়। সে সব স্থানে লক্ষ্মীপূজাও হয় এই দিন। কালীপূজা মহাশক্তির উপাসনা। অমাবস্যার মধ্যরাত্রে মহাকালীর পূজা হয়, তিনি ভক্তকে বরাভয় দান করেন, ভক্তের অন্তরের শক্তির উদ্বোধন হয়।

কার্তিকের শেষে বা অগ্রহায়ণে নবান্ন। নূতন ধান ঘরে আসে। বৈদিক যুগে শরৎকালের অন্তেই নবান্ন হইত। কাহারও মতে নবান্নই বৈদিক শারদোৎসব। রবীন্দ্রনাথও বৈদিক শারদোৎসবকে স্মরণ করিয়া 'বঙ্গে শরৎ' কবিতাতে লিখিয়াছেন—'নূতন ধান্যে হবে নবান্ন তোমার ভবনে ভবনে'। নবান্নে নূতন বস্ত্র পরিধান ও নূতন অন্ন গ্রহণ করা হয়।

পৌষ মাসের পৌষ পার্বণ—পিঠা খাইবার উৎসব। পৌষসংক্রান্তি বা মকরসংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরে গঙ্গার প্রবেশ। ভগীরথ গঙ্গাকে মর্ত্যলোকে শুধু পূর্বপুরুষকে উদ্ধারের জন্য আনেন নাই, সারা উত্তর ভারতের সুখসমৃদ্ধির জন্য

আনিয়াছেন। ঐ দিন গঙ্গাসাগরের মেলা আর গঙ্গাপূজা—কপিল মুনির পূজা হইয়া থাকে।

মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমীর উৎসব। পশ্চিমে এই দিন হইতে বসন্তোৎসব আরম্ভ হয়। লোকে বাসন্তী বসন পরিয়া উৎসবে মত্ত হয়। বাঙালী করে সরস্বতীপূজা। সরস্বতীপূজায় ছাত্রগণ যেভাবে মাতিয়া উঠে সেরূপ অন্য কোন পূজায় দেখা যায় না। এ যে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজা। সরস্বতীপূজা ঘরের পূজা, বিদ্যালয়ের পূজা। উৎসবের আনন্দে মুখরিত হইয়া উঠে সারা বাংলা।

ফাল্গুনে হয় দোল বা হোলির উৎসব। ইহাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা বা ফল্গু উৎসব। ভারতবাসীর কাছে দোল ধর্মীয় উৎসব, পশ্চিমে বসন্তোৎসব হয় দোল পূর্ণিমায়। বাঙালীর জীবনে দোলের আরও গুরুত্ব রহিয়াছে। এই দোলপূর্ণিমা তিথিতে প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন নদীয়া নগরে। এইদিন সারা ভারতবর্ষ ধরিয়া রঙ্ খেলার আর আবির খেলার মাতামাতি চলে।

চৈত্র সংক্রান্তি তিথিতে চড়কপূজা। তাহার পূর্ব হইতেই নানাভাবে শিবের পূজা হইয়া থাকে। সমাজের তথাকথিত ছোটবড় সকলে একত্র মিলিত হয় শিবের গাজনে। পূর্ববাংলায় কাঠের পাটের উপর শিবের পূজা হয়। চড়কের পূর্বরাত্রিতে হরগৌরীর মূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করা হয়। শিবের পূজায় নানাবিধ গান সন্ন্যাসীরা গায়। চড়কপূজার মেলা বসে সারা বাংলা দেশে। মহারুদ্রকে অভিনন্দিত করিয়া বর্ষ শেষ হয়। তারপর বৃষ্টি-ঝড়-ঝঞ্ঝা লইয়া মহারুদ্রের আবির্ভাব হয়।

সংস্কৃতি ও সভ্যতা

অনুশীলনদ্বারা লব্ধ বিদ্যা, বুদ্ধি, শিল্পজ্ঞান ইত্যাদির উৎকর্ষকে সংস্কৃতি বলা হয়। অর্থাৎ যাহা কিছু সত্য, সুন্দর ও ভাল তাহা উপলব্ধি করিবার মত মানসিক শিক্ষাকেই সংস্কৃতি বলে। এই গুণ যাঁহার আছে তাঁহাকেই কৃষ্টিসম্পন্ন বলা হয়। তিনিই ভদ্রলোক। তাঁহার আচরণ শিষ্ট। শিল্পকলা ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। সুতরাং আমাদের কাজ করিবার পদ্ধতি, আশা, আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চ চিন্তার নামান্তরই সংস্কৃতি।

অনেকে মনে করেন যে সংস্কৃতি ও সভ্যতা একই জিনিস। সংস্কৃতিসম্পন্ন লোক সভ্য। যাঁহারা উচ্চসংস্কৃতির অধিকারী নহেন তাঁহাদের সভ্যতা নিম্নস্তরের। সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে এরূপ ধারণা ভ্রান্ত। অবশ্য একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে এই দুইটির সহিত সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ, অনেক বিষয়েই ইহাদের মিল আছে। বহু যুগের মানুষের পার্থিব প্রগতিই সভ্যতা। সুতরাং সংস্কৃতির উপর ইহা প্রভাব বিস্তার করিতে বাধ্য। কোন মানুষের সংস্কৃতি নির্ভর করে সে যে সমাজে বাস করে তাহার সভ্যতার স্তরের উপর। সভ্যতার অগ্রগতির ফলে মানুষ

ক্রমাগত জীবন ধারণের সংগ্রাম হইতে মুক্ত হইয়াছে। ইহার ফলে সে পাইয়াছে অবকাশ এবং সংগীত, কলা, কাব্য প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের কলার আলোচনা ও ভোগ করিবার সুযোগ। অন্যদিকে আবার কৃষ্টিবান লোকের পক্ষে পার্থিব প্রগতি ও সভ্যতার অগ্রগতির সাহায্য করা সম্ভব। এইভাবে সভ্যতা ও সংস্কৃতি একে অপরের উপরে প্রভাব বিস্তার করে। ইহাদের সম্পর্ক খুবই নিকট। উভয়েই সমাজ, ধর্ম ও মানবজীবনের অন্যান্য বিষয়ের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক এত নিবিড় হইলেও ইহাদের মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে। কোন সমাজ হয়ত সভ্যতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে পারে। এই সমাজের সকল লোকই যে সংস্কৃতিসম্পন্ন হইবে এমন কোন কথা নাই। মানুষের অনুভূতি ও মনের সহিত সংস্কৃতির সম্পর্ক বেশি। পক্ষান্তরে জাগতিক প্রগতির সহিত সভ্যতার সম্পর্ক বেশি। মার্জিতরুচি ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিকেই সংস্কৃতিসম্পন্ন বলা হয়। আর পার্থিব সমৃদ্ধি যিনি লাভ করিয়াছেন তাঁহাকেই বলা হয় সভ্য লোক।

মনুষ্যের বাহিরের দিকের সহিত সভ্যতার সম্পর্ক রহিয়াছে আর সংস্কৃতির সহিত আছে অন্তরের সম্পর্ক। যে সমাজের প্রভূত পার্থিব প্রগতি হইয়াছে তাহাকেই আমরা সভ্য সমাজ বলিয়া থাকি। ইহা প্রকৃতিকে বশে আনিয়াছে, কাজে লাগাইতেছে ; মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ইহা মোটর গাড়ি, উড়ো জাহাজ প্রভৃতি তৈয়ারি করিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য দেশ সভ্যতার উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছে। এই সকল দেশের লোকেরা প্রভূত সম্পদের অধিকারী এবং তাহাদের জীবনধারণের মানও উচ্চ। ইহাদের তুলনায় আধুনিক যুগের ভারতবর্ষের সভ্যতার মান নীচু, এখানকার অধিবাসীদের জীবনধারণের মান খুব নীচু। ইহা সত্ত্বেও এই ভারতে রবীন্দ্রনাথ বা মহাত্মা গান্ধীর মত সংস্কৃতিসম্পন্ন পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য দেশেও ইঁহাদের মত সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি বিরল। ইহা হইতে বুঝা যায়, দেশের পার্থিব উন্নতি না হইলেও সাংস্কৃতিক উন্নতি ঘটিতে পারে। কারণ সংস্কৃতি মানব মনের বিকাশ ছাড়া আর কিছুই নহে।

সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে আর একটি পার্থক্য আছে। সভ্যতার ফল দেশের সকলেই ভোগ করিতে পারে। এমন কি অন্য দেশেও তাহা বপন করা যাইতে পারে। কিন্তু কোন সমাজ বা দেশের সংস্কৃতির অতি সহজে অন্য দেশের মাটিতে ফলান যায় না। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা গ্রহণ করা খুব শক্ত নহে, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি লাভ করা বিশেষ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সংস্কৃতি সামাজিক মনীষার ফল। আর সভ্যতা জাগতিক অগ্রগতির ফল, তাই উহা সকলেই ভোগ করিতে পারে। কোন সমাজ অপর কোন দেশের সমাজের বা জাতির সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিতে পারে, কিন্তু এক জাতি যখন অপরের সংস্কৃতি গ্রহণের চেষ্টা করে তখন ঐ জাতির মানসিক বিকাশের স্তর অনুযায়ী উহা পরিবর্তিত হইতে বাধ্য।

সভ্যতা মানুষের পার্থিব চাহিদা পূরণের প্রচেষ্টার ফল, আর সংস্কৃতি তাহার মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রগতিলাভের প্রচেষ্টার ফল।

অবকাশ ও আমোদপ্রমোদ

জীবনধারণের জন্য আমাদের কাজ করিতে হয়, কাজ না করিলে উপবাস থাকিতে হয়। তাই বলিয়া মানুষ সারাদিন খাটিবে তাহা আশা করা যায় না। সারাদিন পরিশ্রম করিলে তাহার মানসিক ও দৈহিক অবনতি ঘটিতে বাধ্য। এমন কি যন্ত্রপাতি ও কলকব্জারও বিশ্রাম আছে। তাহা না হইলে উহারা বিকল হইয়া যায়। মানুষেরও ঠিক তাই। শরীরের ক্ষয়ক্ষতি রোধ করিবার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর তাহারও বিশ্রাম চাই। এমন কি জগৎ সৃষ্টির সময় স্বয়ং ঈশ্বরকে ক্রমাগত ছয়দিন পরিশ্রম করিবার পর সপ্তম দিবসে বিশ্রাম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল (বাইবেল অনুসারে)।

অলসতা বা কর্মহীনতার ও অবকাশের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। অলস লোকের হাতে অনেক সময় থাকে। কিন্তু তাহার অবকাশ নাই, কারণ সে খাটে না। বেকারের অবস্থাও ঠিক তাই। তাহা স্বেচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত অলসতা, অবকাশ নহে। পরিশ্রমের পর বিশ্রামের নামই অবকাশ। পূর্বে অবকাশ বলিতে অনেকেই কাজের একঘেঁয়েমি হইতে পরিত্রাণকে বুঝিতেন, কারণ তখনকার দিনে কাজের একঘেঁয়েমি খুব বেশি ছিল। লোককে খাটিতেও হইত খুব বেশি। কিন্তু আজকাল কাজের সময় কমিয়া গিয়াছে এবং একঘেঁয়েমিও পূর্বের তুলনায় অনেক কম। তাই বলিয়া অবকাশের গুরুত্ব কিছু কমে নাই।

প্রাচীনকালে অবকাশ ভোগ অল্পসংখ্যক বড়লোকের একচেটিয়া অধিকার ছিল। অধিকাংশ লোকেরই কোন অবকাশ ছিল না বলিলেই চলে। সাধারণ মানুষকে দিনে বার হইতে চৌদ্দ ঘণ্টা কাজ করিতে হইত, তাই তাহার অবকাশ গ্রহণের সুযোগ ছিল না। কিন্তু আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে উৎপাদনের পরিমাণ না কমাইয়াও অবকাশ ভোগ করা সম্ভব হইয়াছে। দেখা গিয়াছে পূর্বে লোকে ১২ ১৪ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া যে পরিমাণ উৎপাদন করিত এখন তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি উৎপাদন করা যায় চার বা ছয় ঘণ্টার পরিশ্রমে। তাই আজকাল অবকাশের সুযোগ অনেক বেশি। আধুনিক গণতন্ত্রের যুগে ইহার উপর পূর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। নাগরিকের সর্বপ্রকার বিকাশের সুযোগ দিবার জন্যই তাহাকে অবকাশ দেওয়া হয়। বহু শতাব্দী পূর্বে গ্রীক দার্শনিক আরিস্টটল যথার্থই বলিয়াছিলেন যে, একমাত্র যাহাদের জীবনে অবকাশ আছে তাহারাই গণতন্ত্র সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে পারে। কারণ যাহাদের অবকাশ আছে একমাত্র তাহারাই অন্যের কথা চিন্তা করিতে পারে।

মানুষের দৈহিক ও মানসিক বিকাশের জন্য অবকাশের প্রয়োজন। কিন্তু কিভাবে এই অবকাশ সময় অতিবাহিত করা হইতেছে তাহার উপরই সবকিছু

নির্ভর করে। সারাদিন খাটুনির পর ক্ষতিকর আমোদপ্রমোদে নিজেকে ডুবাইয়া রাখার স্পৃহা খুবই স্বাভাবিক। তাই কঠোর পরিশ্রমের পর লোকে যাহাতে অবকাশ সময় ঠিকভাবে উপভোগ করিতে পারে তাহার জন্য নানা প্রকার উন্নতি-বর্ধক আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এই ধরনের একটি উপায় হইল 'হবি'। যাহাদের 'হবি' থাকে, তাহারা উহাতে সময় কাটাইয়া আনন্দ লাভ করে। সারাদিনের কাজের পর কেহ হয়ত প্রাকৃতিক দৃশ্য বা বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের ফটো তুলিয়া সময় কাটায়। বার্ধক্যে ঐ ফটোগুলি তাহার আনন্দবর্ধন করে। আজকাল খবরের কাগজ বা সাময়িকীগুলিতে ভাল ভাল ফটো ছাপিবার ঝোঁক বাড়িয়াছে। ফটো ভাল হইলে ইহাদ্বারা কিছু আয়ও হইতে পারে। এই ধরনের আর একটি 'হবি' হইল ডাকটিকিট সংগ্রহ করা। ইহা যে শুধু সংগ্রহকারীর চিত্তবিনোদন করে তাহাই নহে, জগতের বিভিন্নদেশ সম্বন্ধে তাহার জ্ঞানও বৃদ্ধি করে।

অবসর সময়েব সদ্ব্যবহার করিবার আর একটি উপায় খেলাধূলা। সারাদিনের ক্লান্তির পর এই খেলাধূলার মধ্যে লোকে বিমল আনন্দ পায়। আনন্দবর্ধন ছাড়াও খেলাধূলা ভ্রাতৃভাব ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করে। পাশ্চাত্ত্য দেশের যুবক ও তরুণেরা শহর হইতে পল্লী অঞ্চলে গিয়া উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে বাতাসে ও রৌদ্রে পায়ে হাঁটিয়া বেড়ায়। ইহাতে একদিকে যেমন অবসর সময় কাটান যায় অন্যদিকে তেমন স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে এইরূপ ভ্রমণের এখনও প্রচলন হয় নাই।

অবসর সময় কাটাইবার আর একটি উপায় কাব্য, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি পাঠ ও কিছু কিছু লেখার অভ্যাস করা। ইহার ফলে পাঠকের জ্ঞানবৃদ্ধি ও চিত্তবিনোদন দুইই হইয়া থাকে। যাহাদের দেশভ্রমণের সামর্থ্য নাই তাহারা গ্রন্থপাঠ করিয়া পৃথিবীর নানা দেশের খবর পাইতে পারে।

অতিপ্রাচীন কাল হইতেই লোকে যাত্রা, থিয়েটার ইত্যাদিতে আনন্দলাভ করিতেছে। আধুনিক যুগে সিনেমা ও রেডিও ক্রমশঃ প্রাচীন কালের-যাত্রা-থিয়েটারের স্থান গ্রহণ করিতেছে। শ্রোতা বা দর্শককে আনন্দদান করা ছাড়াও সিনেমা তাহাদের জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করিতে পারে।

চলচ্চিত্র

বর্তমান যুগে চলচ্চিত্র নাগরিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতের ছোট বড় সকল শহরেই চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাগৃহ রহিয়াছে। ইহা দ্বারা ইহার জনপ্রিয়তা উপলব্ধি করা যায়। আগেকার দিনে সর্বসাধারণের নিকট আনন্দ পরিবেশনের উপায় ছিল কীর্তন, যাত্রা, কথকতা এবং বিশেষতঃ শহর অঞ্চলে ছিল নাটক। কিন্তু আধুনিক যুগে এই সকল আনন্দ পরিবেশনের উপায়ের স্থান অধিকার করিয়াছে চলচ্চিত্র।

চলচ্চিত্র আধুনিক বিজ্ঞানের একটি আশ্চর্য দান। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আমেরিকার প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক টমাস এডিসন সচল বস্তুর ছবি উঠাইয়াছিলেন। ইংলণ্ড দেশে সাদা পর্দার উপর ছবি প্রতিফলিত করিবার যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়। এই দুইয়ে মিলিয়া চলচ্চিত্রের অগ্রগতি হইতে থাকে। তারপর ক্রমশঃ গল্প উপন্যাসের অভিনীত নাট্যরূপ ছবিতে তোলা হয়। প্রথমে অ-বাক্ চিত্রই বহুদিন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। তারপর সবাক্ চিত্রই অ-বাক্ চিত্রের স্থান গ্রহণ করে।

এ যুগের সভ্য দেশমাত্রেই চলচ্চিত্রকে শিক্ষাবিস্তারের উপায় স্বরূপে ব্যবহার করিতেছে। নিজ নিজ দেশের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির উপর যেমন চিত্র নির্মাণ হইতেছে, তেমনি অপরাপর দেশ সম্বন্ধে জানিবার আগ্রহও লোকের অনেক বাড়িয়াছে। তাই ভাল বিদেশী চিত্র অনেকে স্বদেশে দেখিয়া আনন্দ ও জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া থাকেন।

চলচ্চিত্র অতীতকে বাঁচাইয়া রাখে। যেখানে দেশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের কার্য ও প্রধান প্রধান ঘটনা চিত্রে তুলিয়া রাখা হয়, সে দেশের এবং বিদেশের লোকের কাছে উহা হয় জীবন্ত। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর বিদেশভ্রমণের চিত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের শবানুগমনের চিত্র জীবন্ত হইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়।

লোকশিক্ষার দিক দিয়া চলচ্চিত্রের বিশেষ উপযোগিতা রহিয়াছে। অনেক সুসভ্য দেশে, কৃষি, শিল্প, বৈজ্ঞানিক উন্নতির শিক্ষা জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করা হয় চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। চলচ্চিত্র বর্তমানে স্বদেশের বিদেশের ছবি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে। অতীতের ছবিও তোলে। সুতরাং ইহা বর্তমান ও অতীতের ইতিহাসের চাক্ষুষ প্রমাণ দ্বারা লোকের তৃপ্তি বিধান করে।

চলচ্চিত্র জ্ঞান ও আনন্দ বিতরণ করিয়া যেমন লোকের উপকার করিয়া থাকে তেমনি ইহার অপকারিতাও আছে। দুর্নীতিপূর্ণ ছবির দ্বারা চলচ্চিত্র অপরাধ প্রবণতা এবং নৈতিক অধোগতির সৃষ্টি করিয়া থাকে। দেশের আইনে এবং জাতীয় চিত্র প্রকাশযোগ্য নহে। কিন্তু আইনদ্বারা কোন জাতির মনোবৃত্তিকে ঠিক ঠিক শোধন করা যায় না। চিত্র ব্যবসায়ী চাহে অর্থ। যে ছবি বেশি চলিবে তাহাই বাহির করিতে চাহিবে—অর্থের নিকট সুনীতি ও দুর্নীতির কোন মূল্য নাই। এরূপ চিত্রদর্শনে ভাবপ্রবণ বিচারশক্তি রহিত অল্প বয়স্ক লোকদিগের সৎপথ হইতে ভ্রষ্ট করে। কাজেই জনমত প্রবল না হইলে আইনদ্বারা বিশেষ কোন সুফল লাভের আশা নাই। এ যুগে বীরত্ব, আত্মত্যাগ, স্বদেশ-প্রেমের চিত্র যাহা বাহির হইয়াছে তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট ধরনের প্রেমের কাহিনীর চিত্রের সংখ্যাই বেশি।

এ দেশে শিশুমনের খোরাক যোগাইবার চিত্র নাই বলিলেই চলে। এ দিকটা একেবারে উপেক্ষিত। হয়তো ব্যবসায়ীরা মনে করে ইহা দ্বারা অর্থাগম মোটেই হইবে না। মানুষমাত্রেই আনন্দের জন্য লালায়িত। শিশু ও কিশোরকে আনন্দ হইতে বঞ্চিত রাখিলে বড়রা যেসব ছবি দেখেন তাহার জন্য ছোটরা লালায়িত

হইবে—ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবার কিছু নাই। এই আগ্রহের ফলে শিশু ও কিশোর অভিভাবককে না বলিয়া পয়সা লইয়া চলচ্চিত্র দেখে। তরুণ মনের উপর ছায়াচিত্রের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। সুতরাং তাহাদের জন্য কল্যাণকামী লোকের চিন্তা করা দরকার।

বিগত ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এদেশে চিত্র নির্মাণ ব্যবসায় চলিতেছে। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম সবাক্ চিত্র ভারতবর্ষে নির্মিত হয়।

বর্তমানে প্রায় ষাটটি স্টুডিও বোম্বাই, মান্দ্রাজ, পুনা, কোল্হাপুর, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে কার্যে লিপ্ত আছে।

বোম্বাইতে চব্বিশটি স্টুডিও কাজ করিতেছে এবং কলিকাতায় কাজ করিতেছে চৌদ্দটি। বোম্বাইতে প্রধানতঃ মারাঠী এবং হিন্দি চিত্র প্রস্তুত হয়।

ভারত সরকার ভারতীয় জীবনযাত্রা এবং প্রধান প্রধান ঘটনার উপর চিত্র নির্মাণ করিয়া প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিতেছেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিবর্ধনের জন্য সরকার এই কার্যে হাত দিয়াছেন।

শিষ্টাচার ও সৌজন্য

শিষ্টাচার ও সৌজন্য—এই শব্দ দুইটির অর্থ প্রায় একরূপ হইলেও ইহাদের মধ্যে অর্থের মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। কেহ কেহ হয়তো বলিবেন, শিষ্টাচার ও সৌজন্যের অর্থ 'ভদ্রতা'। কিন্তু ভদ্রতা কৃত্রিম হইতে পারে, তাহার সহিত প্রাণের যোগ নাও থাকিতে পারে—কেবল সামাজিক সামঞ্জস্য ও শান্তি রক্ষার জন্য ভদ্রতা আবশ্যক। কিন্তু সৌজন্য প্রাণের বস্তু। উহা মানুষের হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে স্বভাবতই বাহির হইয়া আসে—উহাতে পাত্রাপাত্রের বিচার থাকে না। অপরকে সুখী করিতে পারিলেই যেন সৌজন্য প্রদর্শনকারীর শান্তি হয়।

শিষ্টব্যক্তির আচারের অনুরূপ যে আচার তাহার নাম শিষ্টাচার। এক কথায় যাহাকে বলা হয় সদাচার। ভদ্র, সংস্কৃতিসম্পন্ন লোকেরা অপরের প্রতি যে ব্যবহার করেন তাহারই নাম শিষ্টাচার। সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির চলিবার জন্য শিষ্টাচার নির্দিষ্ট আছে। যুগে যুগে অবস্থা বিশেষে শিষ্টাচারের আদর্শও বদলায়। অপর লোকের প্রতি শিষ্টাচার বা সৌজন্য প্রদর্শন করিতে কোন অর্থ ব্যয় হয় না অথচ সমাজে লোকের যাহাদের সহিত চলিতে হয় তাহাদিগকে অতি সহজে ইহাদ্বারা স্ববশে আনিতে পারা যায়।

রাজা, প্রজা, ছাত্র, শিক্ষক, ক্রেতা, বিক্রেতা অফিসআদালতের কর্মকর্তা তা[illegible] কাজের জন্য যাহারা আসে, রেল-স্টীমারের কর্মচারী এবং যাত্রী যে কেহ অশি[illegible] আচরণ করিলে লোকে মনঃক্ষুণ্ণ হয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা শ্রেণীর উপর তাহাদে[illegible] ক্রমশঃ বিরূপ মনোবৃত্তি গঠিত হইয়া থাকে এবং সময় সময় অত্যন্ত অপ্রীতিক[illegible] অবস্থাও সৃষ্টি হয়।

অশিষ্ট আচরণ নানা প্রকারেরই আছে—ইহা ব্যক্তিগত হইতে পারে বা প্রতিষ্ঠানগতও হইতে পারে। অনেক উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত লোক ভাবেন তাঁহারা

রাস্তা দিয়া চলিবার সময় তাঁহাদিগকে অপরের আগে পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে, দূর হইতে নমস্কার করিতে হইবে, বাড়ি গেলে তাঁহাদের সামনে দাঁড়াইয়া কাজ করিতে হইবে। এই সকল লোক অপরের নিকট যে শিষ্টাচার দাবি করেন তাহা নিজেরা পূরণ করেন না। ভদ্রতা বা শিষ্টাচার পারস্পরিক। উহা কেবল প্রাপ্য নহে, দেয়ও বটে। যেখানে দুইজনকে লইয়া কাজ সেখানে একের উদ্বেগ আর অপরের "প্রভুসুলভ মনোবৃত্তি" থাকা উচিত নহে। এখানে অপরের প্রতি উপযুক্ত সদাচার দেখাইতে হইবে। তাহা না দেখাইলে অপরের আনুগত্য প্রভুরা লাভ করিতে পারিবেন না।

প্রতিষ্ঠানগত অশিষ্টতা ভারতবর্ষে তীব্র। অন্য সভ্য দেশে ইহার কোন অস্তিত্ব নাই। শিষ্টাচার সভ্যতার অঙ্গবিশেষ। কিন্তু এ দেশে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে শিষ্টাচারের কেহ ধার ধারে না। কাজের জন্য তথায় লোক উপস্থিত হইলে নানাবিধ বিড়ম্বনা ভোগ করিবার দৃষ্টান্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়।

কিন্তু সৌজন্য হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে স্বতঃই উৎসারিত হয়। শিষ্টাচার অভ্যাসদ্বারা লাভ হইতে পারে—অশিষ্ট ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ নিজেকে সংশোধন করিতে পারে। সুতরাং আমাদের দেশে লোকেরা যে অশিষ্ট আচরণের জন্য ক্ষুব্ধ হয় তাহার প্রতিকার হইতে পারে—শুধু একটু চেষ্টা দরকার।

সৌজন্য প্রদর্শনকারী লোকের সংখ্যা পৃথিবীতে অল্প। একজন লোক তাহার কাজের জন্য কোন প্রতিষ্ঠানে দিনের পর দিন ঘুরিতেছে কিন্তু কাজ হয় না। অশিষ্ট ব্যবহার অনবরত তাহার ভাগ্যে জুটিতেছে। এরূপ অবস্থায় কোন সহৃদয়-ব্যক্তি অবিলম্বে এই ব্যাপার জানিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যদি বিড়ম্বিত ব্যক্তির কাজ করিয়া দেন—তবে ইহাকে বলা যায় সৌজন্য। কোন লোক পথ হারাইয়াছে, পথচারীরা কেহ জানিয়াও উক্ত ব্যক্তিকে পথের সন্ধান দিতেছে না। এইরূপ অবস্থায় কোন পথিক যদি ঐ ব্যক্তিকে তাঁহার বাড়িতে পৌঁছাইয়া দেয় এবং এই কাজের জন্য সে যদি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে না করে, তবে বলা যায় এখানে সৌজন্য দেখান হইয়াছে।

জগতের সকল লোকে সৌজন্য দেখাইতে পারে না—কারণ সৌজন্য লোকের প্রকৃতিগত বৃত্তি। যখনই কোন সুযোগ উপস্থিত হইবে সুজন ব্যক্তি কোন দ্বিধা না করিয়া তাহার স্বভাব অনুযায়ী ভদ্রতা দেখাইবে।

শিষ্টাচার অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। সৌজন্য মানুষের প্রকৃতিসিদ্ধ।

ভারতের আঞ্চলিক ভাষার বৈচিত্র্য

বিশাল দেশ এই ভারতবর্ষ। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এরূপ ভাষার বৈচিত্র্য নাই। যুগে যুগে ভারত সকলের কথা শুনিয়াছে। বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান চলিয়াছে। উৎপত্তি ও পরিণতির হিসাবে সকল ভারতীয় আর্যভাষা চারিটি ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। (১) ভারতীয় আর্যভাষা (২) দ্রাবিড়

(৩) অস্ট্রিক (৪) চীন-তিব্বতায়। ভারতের আর্যভাষাসমূহ ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির প্রাচান ভাষা হইতে উদ্ভূত। বৈদিক ভাষা (বা ছন্দস্) ভারতের প্রাচীনতম আর্য-ভাষার নিদর্শন বৈদিক মন্ত্রে এই ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা অবশ্য সাহিত্যিক ভাষা। ইহারই কাছাকাছি ভাষায় প্রাচীন আর্যরা কথা কহিতেন। বৈদিক যুগের কথ্যভাষা হইতে খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর নিকটবর্তী সময়ে প্রাকৃত ভাষাগুলির উদ্ভব হয়। ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রাচীন হইতেছে পালিভাষা। পূর্ব উত্তর পশ্চিম দক্ষিণ ভেদে চারি অঞ্চলের প্রধানতঃ চারি প্রকারের প্রাকৃত দেখা যায়। প্রাকৃত হইতে ধ্বনি পরিবর্তনে অপভ্রংশ ভাষার সৃষ্টি হয়। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর কাছা-কাছি সময়ে এই অপভ্রংশ ভাষাগুলি হইতে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা যথা আসামী, বাংলা, উড়িয়া, মৈথিলী, হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী প্রভৃতির উদ্ভব হয়। পারশ্য ভাষাভাষী সৈনিকগণ দিল্লীর প্রথম সুলতানের অনেক পূর্বেই পাঞ্জাবে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। তাহারা পারশ্য ভাষা মিশ্রিত পাঞ্জাবের ভাষায় কথা বলিত। সুলতান মামুদ ও মহম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণের ফলে পূর্বোক্ত ভাষার (পারশীক সৈনিকদের ভাষা) কিছু উন্নতি হইল এবং দিল্লীতে এই ভাষা চলিতে থাকে। ইহার নাম হইল 'উর্দু' ভাষা। 'উর্দু' শব্দের অর্থ সৈনিকদের ছাউনি। হিন্দীর উপর পারশ্যভাষার প্রভাবে প্রকৃতপক্ষে এই ভাষার উৎপত্তি হয়।

ভারতে লোকসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ হইতেছে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাভাষী। দক্ষিণ ভারতবর্ষ দ্রাবিড়গণের বাসস্থান। তামিল, তেলেগু, মালয়ালী, কন্নাড ভাষা এই গোষ্ঠীর ভাষাসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে তামিল ভাষা হইতেছে প্রাচীনতম ভাষা। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। দ্রাবিড় ভাষার প্রাচীনতম শব্দসম্ভার ইহাতে রক্ষিত আছে। তামিলের সহিত মালয়ালী ভাষা বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। ইহার উপর সংস্কৃত ভাষার প্রভাব খুব বেশি।

বাংলা দেশের প্রান্তীয় অরণ্যভূমি অঞ্চলে এবং বিহারে যে সকল আদিবাসী বাস করে তাহাদের ভাষা অস্ট্রিক গোষ্ঠীর অন্তর্গত। হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে চীন-তিব্বতীয় ভাষাভাষী ছোট ছোট উপজাতীয় লোকেরা বাস করে। ইহারা এই অঞ্চল ছাড়া উত্তরবঙ্গ এবং আসামেও বাস করিয়া থাকে।

ভাষার এই বিভিন্নতা সত্ত্বেও এই বৈচিত্র্যের মধ্যে সকলের মধ্যে ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সব বিচিত্র জাতীয় লোকের সংস্কৃতি অনেক দিক দিয়া এক।

বৈদিক ভাষা ক্রমশঃ সরল হইয়া সংস্কৃত ভাষায় পরিণত হয়। আর কথ্য ভাষা হয় প্রাকৃত। সংস্কৃত ভাষায় মহাভারত ও রামায়ণ বিরচিত হইয়াছিল। এই দুই গ্রন্থ যুগ যুগ ধরিয়া ভারতের সাধনার বাণী বহন করিয়া আসিতেছে। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে পালি ভাষার প্রসার হইতে থাকে। গৌতমবুদ্ধের সকল উপদেশ পালি ভাষায় লিখিত আছে।

এইখানে তামিল ভাষার কথা বলিতে হয়। খ্রীষ্টের জন্মের সমসাময়িক

তামিল সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। তামিল ভাষায় অতি মনোরম কাব্য রচিত হইয়াছে।

খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে তেলেগু, কন্নাড় এবং মালয়ালী ভাষায় সাহিত্যিক অভ্যুদয় হইতে থাকে।

হিন্দী সাহিত্য হিন্দু রাজাদের বীরগাথা লইয়া আপনার যাত্রা শুরু করে। কবি চাঁদবরদাই পৃথ্বীরাজের বীরত্বকাহিনী অবলম্বন করিয়া "পৃথ্বীরাজ রসৌ" নামক কাব্য প্রণয়ন করেন। সুরদাস, কবীর, মীরাবাঈ, তুলসীদাস ইঁহারা ভক্তিযুগের কবি। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ভক্তকবি তুলসীদাস তাঁহার বিখ্যাত "রামায়ণ" (রামচরিত মানস) রচনা করেন। মীরার 'ভজন' লক্ষ লক্ষ নরনারীকে অভিভূত করে। মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দী গদ্য রচনা চলিতে থাকে। আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে মৈথিলীশরণ গুপ্ত কাব্য ও নাটক রচনায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। জয়শঙ্কর প্রসাদের "কামায়নী" কাব্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। আধুনিক কবিদের মধ্যে সুমিত্রানন্দন পন্থ খুব জনপ্রিয়।

মধ্যযুগের বৈষ্ণব গীতিকবিতায় বাংলা সাহিত্য ভারতীয় মধ্য যুগের সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অপূর্ব ভক্তি দর্শনাত্মক জীবনী গ্রন্থ। উনবিংশ শতাব্দীতে মধুসূদনের কাব্যপ্রচেষ্টা বাংলা সাহিত্যকে আন্তর্জাতিক আলোচনার যোগ্য করিয়াছে। রবীন্দ্রসাহিত্য সারা বিশ্বে বাঙালীর মনীষা, বাঙালীর কল্পনাকে প্রভাবিত করিয়া মহামিলনের পথ প্রশস্ত করিয়াছে।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে শঙ্করদেব ও অন্যান্য বৈষ্ণব সাধক লেখকগণ আসামী সাহিত্যের গৌরব বর্ধন করিয়াছেন। আসামী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হইতেছে তাহার "বুরঞ্জী" সাহিত্য। ভারতের অন্যান্য প্রান্তিক সাহিত্যে এইভাবে স্থানীয় ভাষায় দেশের ঐতিহাসিক বিবরণ সংরক্ষিত হয় নাই।

পশ্চিম ও মধ্যভারতে (মহারাষ্ট্রী) মারাঠী কথ্য ভাষা। প্রাচীন মারাঠী সাহিত্যে ভগবদ্গীতার টীকা, তুকারামের ভক্তিমূলক রচনা ও মহারাষ্ট্র-বীরগাথা মারাঠী সাহিত্যকে উজ্জ্বল করিয়াছে। চিপলুনকর, আগরকর, মহামতি রাণাডে ও লোকমান্য তিলকের রচনা মারাঠী সাহিত্যকে বিশিষ্টতা প্রদান করিয়াছে।

আধুনিক গুজরাটী সাহিত্যে মহাত্মা গান্ধী ও কনহৈয়ালাল মানিকলাল মুন্সীর রচনা দ্বারা গৌরবান্বিত হইয়াছে।

বিজয়নগরের রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় তেলুগু ভাষায় বিশিষ্ট কাব্য বিরচিত হইয়াছে। এই রাজাদের রাজত্বকালে গাথা, কবিতা, ঐতিহাসিক কাহিনী, নীতি-কবিতা লইয়া তেলুগু ভাষায় বেশির ভাগ রচনা দেখা যায়। আধুনিক তেলুগু ভাষায় "সৌন্দরানন্দম" অতি উপাদেয় কাব্য।

সংস্কৃত সাহিত্য ও ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে বিশেষ প্রেরণা লাভ করিয়া আধুনিক মালয়ালী সাহিত্য উন্নত হইয়াছে।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে কম্বন কর্তৃক তামিল ভাষায় রামায়ণের অনুবাদ হয়। এই গ্রন্থের স্থান তামিল ভাষায় অতি উচ্চে। ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব তামিলের উপর পড়িয়াছে সত্য, কিন্তু উহা স্থায়ী প্রতিক্রিয়া সাধনে সমর্থ হয় নাই। ভারতী কবি আবার তামিল ভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। ঐ সময় হইতে তামিল সাহিত্য ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

সমসাময়িক কন্নাড সাহিত্যে ব্রেণ্ড, পুট্টপা সবিশেষ প্রসিদ্ধ লেখক। আধুনিক কন্নাড সাহিত্যে উপন্যাস প্রধানতঃ সামাজিক সমস্যামূলক।

দিল্লীর মুসলমান সম্রাটের আমলে পাঞ্জাব ও দিল্লী অঞ্চলের ভাষার আধারের উপর ফারসী রীতি প্রয়োগে উর্দু বা হিন্দুস্থানী ভাষার উদ্ভব হয়। এই ভাষা যুদ্ধকে উপলক্ষ করিয়া ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে প্রবেশ করে। গোলকুণ্ডার সুলতান মুহাম্মদ কুলি কতুবশাহ্ ষোড়শ শতাব্দীতে উর্দু কাব্য রচনায় খ্যাতি অর্জন করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রতননাথ সরশার 'ফসন-ই-আজাদ' নামক উপন্যাস রচনা করেন। আধুনিক উর্দু লেখকদের মধ্যে হালি, মহম্মদ হুসেন, আজাদ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইতেছেন মুহম্মদ ইকবাল। ছোটগল্প লেখকদের মধ্যে প্রেমচাঁদ প্রসিদ্ধ।

স্বাধীন ভারতে সংস্কৃত ভাষার স্থান

সংস্কৃত ভাষা ভারতের যুগ-যুগান্তরের শিক্ষা, সাধনা, জ্ঞান ও সংস্কৃতির ধারক। এই ভাষাতেই রামায়ণ, মহাভারত, তন্ত্র, পুরাণ, দর্শন, কাব্য, ব্যাকরণ, নাটক, অর্থশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, জ্যোতিষ, কথা ও কাহিনী রচিত হইয়াছিল। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের কথ্যভাষা প্রাকৃতের জন্ম হয়। এই প্রাকৃত ভাষা পুনঃপরিবর্তনের ফলে খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে অপভ্রংশ ভাষা এবং অপভ্রংশ ভাষা হইতে আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির জন্ম হয়। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার গৌরব বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। প্রাদেশিক ভাষাগুলির বিবর্তনের যুগেও শাস্ত্র ও দার্শনিক চিন্তার ভাষা ছিল এই সংস্কৃত। ইহা তখনও ছিল ভারতের সর্ব অঞ্চলের শিক্ষিত লোকের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের ভাষা। মুসলমান রাজত্বকালের সর্বপ্রথম একটি বিদেশীভাষা (ফারসী) রাজদরবারের ভাষারূপে গৃহীত হয়। রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও, ফারসী ভাষা সংস্কৃতকে তাহার অত্যুচ্চ আসন হইতে নামাইতে পারিল না। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এমন শিক্ষা ও রাজ্যশাসন পদ্ধতির প্রবর্তন হইল যে, তাহার ফলে সংস্কৃত ভাষা দ্রুত ধ্বংসের পথে চলিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের সাহায্যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য ইউরোপে প্রচারিত হইল। বিশ্ববাসী এই সুপ্রাচীন ভারতীয় ভাষার শক্তিতে বিস্মিত হইল। শিক্ষিত ভারতবাসী ইহার চর্চায় পুনরায় মনোনিবেশ করিলেন। এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়। এই সময়ে

জাতীয়তাবোধ জাগ্রত ও সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে ঋষি বঙ্কিম রচনা করিলেন রাষ্ট্রগায়ত্রী 'বন্দেমাতরম্' এই পরম গৌরবময়ী সংস্কৃত ভাষায়। পরাধীন যুগে দেশনেতৃগণ ইংরেজী ভাষার পরিবর্তে একটি ভারতীয় ভাষাকে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা করিবার সংকল্প গ্রহণ করেন। বলাবাহুল্য এখানেও সংস্কৃত ভাষার দাবিই স্বীকৃত হয়। তবে উহা প্রকাশিত হইবে আধুনিক ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে।

স্বাধীন ভারতে সংস্কৃতের মর্যাদা একেবারে উপেক্ষিত হয় নাই। সরকারীভাবে দেশের নাম 'ভারত' গ্রহণ করা হইয়াছে; উপনিষদের বাণী "সত্যমেব জয়তে" রাষ্ট্রের প্রতীকের সহিত গ্রহণ করা হইয়াছে। জাতীয় সংগীত জনগণমন এর ভাষা শতকরা ৯০ ভাগ সংস্কৃত এবং অবশিষ্ট দশভাগ সংস্কৃত ঘেঁষা শব্দে পূর্ণ। তাই সারাভারতের লোক ইহা বোঝে। বহু রাষ্ট্রীয় উৎসব বা কোন কিছুর প্রতিষ্ঠাদিবসে এই ভাষাই ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে জগৎসভায় আমাদের আসন সুদৃঢ় করিবার জন্য এবং আত্মমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য এই ভাষা সরকারীভাবে ব্যবহার করিতে হইতেছে।

সংস্কৃত ভাষা শুধু ভারতেই নয় এশিয়ার এক সুমহান ভাষা। সভ্যতার বাহক হিসাবে ইহার স্থান গ্রীক, ল্যাটিন, আরবী ও চৈনিক অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে বরং উচ্চে। উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা প্রাচীন ভারতের নিকট হইতে যাহা পাইয়াছি তাহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ এই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য। এই ভাষারই ক্রোড়ে ভারতীয় সভ্যতার জন্ম ও বিকাশ ঘটিয়াছে। প্রাচীন ভারতীয়দের চিন্তাধারার যাহা কিছু আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছি সবই এই ভাষার মাধ্যমে। তাই ইহাকে একটি সাধারণ প্রাচীন ভাষা বলিয়া মনে করিলে ভুল করা হইবে, ইহা অপেক্ষা এই ভাষার গুরুত্ব অনেক বেশি। সাহিত্য, দর্শন, অর্থশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, আইন, বিজ্ঞান, গণিত, ব্যাকরণ প্রভৃতি সব কিছুই এই ভাষারই সাহায্যে লিখিত হইয়াছে। পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপের আর্যভাষাভাষী অঞ্চলের ভাষার সহিত সংস্কৃতের বিশেষ যোগ রহিয়াছে। প্রাচীন গ্রীক, গথিক, আইরিশ, স্লাভ, প্রভৃতি ভাষার জ্যেষ্ঠ ভগ্নী এই সংস্কৃত ভাষা। অন্য দিকে ইংরেজী, ফরাসী, রুশ প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষার সহিত আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষাগুলির বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধির জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন এই ভাষা ও সাহিত্যে তাহার সবই পাওয়া যায়। তৃতীয়তঃ, অনেকের ধারণা সংস্কৃত ভাষায় হিন্দুধর্মের সকল মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে এবং ইহা গোঁড়ামির প্রশ্রয় দেয়। ইহা সত্য নহে। মানব মনের পূর্ণ বিকাশের সহায়ক অর্থনীতি, কলা, স্থাপত্য প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় এই ভাষার মাধ্যমে আলোচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। 'সংস্কৃত সাহিত্যের সব কিছুই ব্রাহ্মণ এবং হিন্দুদের সাহায্যে গড়িয়া উঠিয়াছে ইহা মনে করা ভুল হইবে। এই ভাষা বহু অব্রাহ্মণ ও অহিন্দুর দানে সুসমৃদ্ধ। বাংলা ও গুজরাটের মুসলমান শাসকগণ এই ভাষা রাজকার্যেও ব্যবহার করিয়াছেন, বাগদাদ নগরীতে সংস্কৃত বিজ্ঞানের পুস্তকগুলি আলোচিত হইয়াছে;

এমন কি বাংলা দেশের হেকিমগণ সংস্কৃত আয়ুর্বেদ গ্রন্থগুলির চর্চা করিয়াছেন। চতুর্থতঃ, ভারতের জাতীয় ঐক্য রক্ষা করিবার প্রধান সহায়ক এই ভাষা। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদের বৈচিত্র্য থাকিলেও এই সংস্কৃত ভাষা সকলকে এক সূত্রে গাঁথিয়াছে। এই ভাষার জন্যই ভারতের ৪৩ কোটি নরনারীর মধ্যে এক জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হইয়াছে। পঞ্চমতঃ, চরিত্র গঠনের জন্য যাহা কিছুর প্রয়োজন তাহারও সবকিছুই এই ভাষায় আছে। পরিশেষে বর্তমান সময়ে ভারতের সংস্কৃতি ও জাতীয় ঐক্য রক্ষা ও জ্ঞানসাধনার উচ্চমান রক্ষা করিবার জন্য এই ভাষার গুরুত্ব খুব বেশি। বর্তমান ভারতে বিজ্ঞান চর্চা, ভাষাতত্ত্ব চর্চা, দর্শন চর্চা প্রভৃতি আমরা যাহা কিছুই গবেষণামূলক কাজ করিতে যাই না কেন ভারতের প্রাচীন সম্পদ আহরণের জন্য এই ভাষার সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। আজও আমাদের জাতীয় জীবনে বহুক্ষেত্রে প্রাচীন ভাবধারা প্রচলিত আছে, এইগুলিকে সঞ্জীবিত রাখিতে হইলেও এই ভাষার সাহায্য চাই।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সংস্কৃতকে আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করিবার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। তবে এই ভাষাকে আজ সর্বসাধারণের ভাষা বা সরকারী কাজকর্মের ভাষা বা শিক্ষার বাহন হিসাবে ব্যবহার করিবার সুযোগ খুবই কম। রাষ্ট্রীয় উৎসব বা অনুষ্ঠানে যেখানে কোন প্রকার মর্যাদা বা গাম্ভীর্যের প্রয়োজন সেইখানেই এই ভাষা ব্যবহার করা চলিতে পারে। সংবিধানে যে ৪টি ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে সংস্কৃত তাহাদের অন্যতম। তাই যে কোন ভারতীয় নাগরিক এই ভাষাতেই তাহার অভাব-অভিযোগ সরকারের নিকট পেশ করিতে পারে। অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি বিতরণের সময়ে অথবা রাষ্ট্রীয় খেতাব বিতরণের সময় এই ভাষা ব্যবহার করা উচিত। বিদেশেও আধুনিক ভারতীয় ভাষার পরিবর্তে সংস্কৃতে অভিনন্দন পাঠান বা সংবাদ আদানপ্রদান করা উচিত। কারণ আধুনিক ভারতীয় ভাষা অপেক্ষা বিদেশে সংস্কৃত ভাষার গৌরব অনেক বেশি, চর্চাও হয় অনেক বেশি। ইংলণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স, ইরাণ প্রভৃতি দেশে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য চর্চার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। পাশ্চাত্ত্য দেশ 'সংস্কৃত ভারতকেই' চেনে, অন্য কোন আঞ্চলিক ভাষার কোন মর্যাদা তাহাদের নিকট নাই।

পূর্বের আলোচনা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, স্বাধীন ভারতের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় যদি সংস্কৃত ভাষা ও সহিত্যের কোন স্থান না থাকে তবে আমরা এক বিরাট সম্পদ হারাইব। আমরা নিজ জাতিকে ভুলিয়া যাইব, ভুলিয়া যাইব আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে। এক কথায় বলিতে গেলে ভারতীয় তরুণের মনের উপর যদি সংস্কৃতের কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব না থাকে তবে সে আর ভারতীয় থাকিবে না। তাই স্বাধীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে এই ভাষাকে রাখিতে হইবে।

স্বাধীন ভারতে ইংরেজী ভাষার ভবিষ্যৎ

যখন কোন দেশ বিদেশী শাসনের অধিকারে আসে তখন সেই দেশ শুধু তাহার রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা হারায় না। তাহার শিক্ষা, তাহার সংস্কৃতি, তাহার সর্বপ্রকার আত্মনিয়ন্ত্রণের পথ বিপন্ন হয়। ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী ভাষাও ভারতের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। ভারতের প্রাচীন ভাষা ও আধুনিক ভাষার উপর ইংরেজী ভাষার প্রভূত প্রসার লাভ করে। ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের মূলে ছিল দেশের অগণিত নরনারীর মধ্যে কিছু সংখ্যক লোককে বিদেশী সরকারের শাসনকার্য চালাইবার পক্ষে উপযুক্ত করিয়া তোলার পরিকল্পনা। যেখানে এই নীতি বর্তমান সেখানে সার্বজনীন জ্ঞান বিস্তারের কোন কথা উঠে না।

বহু বাদ-প্রতিবাদ সত্ত্বেও ইংরেজী ভাষার মর্যাদা ভারতে স্বীকৃত হইল। ইংরেজী ভারতের রাষ্ট্রভাষায় পরিণত হয় এবং শিক্ষার বাহনরূপে কার্য করিতে থাকে। জ্ঞান বিস্তারের মাধ্যমরূপে ইংরেজী ভাষাকে গ্রহণ করিবার ফলে আমাদের দেশে বহু জ্ঞানী-গুণী পাশ্চাত্য শিক্ষায় প্রতিষ্ঠা অর্জন করিলেন বটে, কিন্তু দেশের জনসাধারণের সঙ্গে এ শিক্ষার কোন সম্পর্ক রহিল না। ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুষ্টিমেয় লোক আর অগণিত জনসাধারণ যাহাদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার কোন আলোকপাত হয় নাই—এই দুইটি শ্রেণী দেখা দিল।

ইংরেজ শাসনে সভ্যতা ক্রমশঃ নগর-কেন্দ্রিক হইতে থাকিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা আর নগর-কেন্দ্রিক সভ্যতা এই দুইয়ে মিলিয়া গ্রামবাসী আর আধুনিক শহরবাসীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিল। গ্রামের লোক শহরের লোককে ভীতির চক্ষে দেখে। আর শহরের শিক্ষিত লোক গ্রাম্য জনতাকে তাহাদের অন্তরে স্থান দিতে চাহে না।

স্বামী বিবেকানন্দ একস্থানে বলিয়াছেন—ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করায় দেশের অগ্রগতি দেড়শত বৎসর পিছাইয়া গিয়াছে।

ইংরেজী শিক্ষা এবং সভ্যতার প্রভাবে গ্রামের সঙ্গতিপন্ন লোক শহরে বসতি স্থাপন করিল। ফলে দেশের ধনী, গুণী, জ্ঞানী সম্প্রদায় দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত লোক-শিক্ষাও বিপন্ন হইল। প্রাচীন শিক্ষার অবস্থাও শোচনীয় হইতে থাকিল। গ্রামীণ জনতা নূতনকে বরণ করিতে পারে নাই এবং পুরাতনকে হারাইতে বসিল। বর্তমান স্বাধীন ভারতবর্ষে এখন নূতন করিয়া ভাবিবার সময় আসিয়াছে, ইংরেজী ভাষার ভবিষ্যৎ কি হইবে। স্বাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজী রাষ্ট্রভাষারূপে থাকিতে পারে না। কোন মর্যাদাসম্পন্ন দেশ কোন বিদেশী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার সম্মান চিরকালের জন্য দিতে পারে না। নিজের দেশের ভাষা অসম্পন্ন হইলেও অপর দেশের ভাষাকে নিজের দেশের উপর চাপাইয়া দেওয়া কোন প্রকারেই যুক্তিযুক্ত নহে। ইংরেজী বিশেষ সম্পন্ন ভাষা এবং আন্তর্জাতিক গৌরবসম্পন্ন। ইংরেজী ভাষা শিখিয়া আমরা বহির্জগতের সহিত যুক্ত হইয়াছি—ইহারই মাধ্যমে আমরা আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান আহরণ করিতে পারিয়াছি, আর বৃহত্তর জগতের সহিত

সংযোগে আমাদের দেশের প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও সাহিত্যের মূল্য নির্ধারণ করিতে পারিয়াছি। সিপাহীযুদ্ধের পর হইতে আমাদের দেশের আধুনিক সাহিত্যের যে বিভিন্নমুখী বিকাশ হইয়াছে তাহা প্রধানতঃ ইংরেজী শিক্ষারই ফল।

রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, তিলক, গোখেল, সুরেন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র—ইঁহারা সকলেই ইংরেজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত—কিন্তু ইঁহাদের প্রাণ খাঁটি স্বদেশের। স্বদেশীয় ভাষায় শিক্ষিত জনগণের সহায়তা পাইলে ভারতের মুক্তিপথে ইঁহাদিগের জয়যাত্রা আরও দ্রুত আরও বাধাহীন হইত সন্দেহ নাই। ইংরেজীতে শিক্ষা বিস্তারেব ফলে জনগণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় চেতনা জাগ্রত হয় নাই, যদি তাহা সম্ভবপর হইত তাহা হইলে ভারতের মুক্তি বহু পূর্বেই উপস্থিত হইত। যে মুষ্টিমেয় ভারতবাসী ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছে তাহারা ভাবিয়াছে নিজের ভাষায়, কিন্তু তাহাদিগের প্রাণের কথা প্রকাশ করিতে হইয়াছে বিদেশী ভাষায়—যাহার সহিত কোন কালেই তাহাদের অন্তরের যোগ নাই।

স্কুল-কলেজে ইংরেজী ভাষার প্রাধান্যের জন্য শুধু মাতৃভাষা উপেক্ষিত হয় নাই জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস সবকিছুই শিক্ষাক্ষেত্রে তাহাদের উপযুক্ত স্থান লাভ করিতে পারে নাই। এরূপ অবস্থায় শিক্ষা এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি তাহা বিচার করিতে হইবে।

ইংরেজী ভারতের রাষ্ট্রভাষারূপে আরো কিছুকাল পর্যন্ত চলিতে থাকিবে—এ সম্বন্ধে ভারতের রাষ্ট্রনায়কগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। সরকারী কার্য এতকাল একভাবে চলিয়াছে—তাহার স্থানে দেশীয় ভাষাকে বসাইতে হইলে সেই ভাষায় শিক্ষালাভ করা সময়সাপেক্ষ এবং সেই ভাষারও সর্বকার্যে ব্যবহৃত হইবার যোগ্যতা অর্জন করা চাই। এরূপ যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে দু-চার বছরে সম্ভবপর নহে। এতো গেল ভারত সরকারের নিকট রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ইংরেজী ভাষায় যে মর্যাদা থাকিবে তাহার কথা।

শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরেজীর কিরূপ ব্যবহার হইবে তাহার আলোচনা করা দরকার। ভারতকে নিজের প্রয়োজন অনুসারে ইংরেজীভাষার চর্চা করিতে হইবে। উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশেষতঃ বিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রভৃতি অধ্যয়ন করার উপযুক্ত পুস্তক এখনও দেশীয় ভাষায় রচিত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজীতে যেমন হইয়াছে তেমন ব্যাপকভাবে নানা বিষয়ক গ্রন্থ রচনার অর্থ, পরিশ্রম, একাগ্রতা এবং সময় দরকার—যতদিন ইহা না হইবে ততদিন ইংরেজীকে বাদ দেওয়া চলিবে না। আর আমাদের জাতির উন্নতির দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে যাহার আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও প্রসার আছে এইরূপ একটি ইউরোপীয় ভাষা শিক্ষা করা দরকার। ভারতে ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত বহু লোক আছেন, সুতরাং ফ্রেঞ্চ, জার্মান ও রাশিয়ান ভাষা শিক্ষা অপেক্ষা ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করা এদেশে অধিকতর সুবিধাজনক।

ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক হইতে বিচার করিলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষাদ্বারা আমাদের বিশেষ উপকার হইতে পারে।

সাধারণ কার্য চালাইবার জন্য ইংরেজী ভাষায় মনোভাব প্রকাশ করিতে যতটুকু জ্ঞান দরকার তাহা অর্জন করিতে পারিলেই জনসাধারণের কাজ চলিবে। ইংরেজী সাহিত্যের উচ্চতর পঠন-পাঠন ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীর নিকট মাতৃভাষায় ব্যাখ্যা করিলে সাহিত্যের রসগ্রহণে সুবিধা হইতে পারে। ভারতের বাহিরে যে সব স্থানে বিদেশী ভাষার চর্চা হয়, সেখানে বিদ্যার্থীর মাতৃভাষায় বিদেশী ভাষার সাহিত্য ব্যাখ্যাত হয়।

বড় বড় শহর ও সার্বজনীন পূজা

ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হইতেছে—তাহার গ্রামগুলি। গ্রামগুলি পূর্বে ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। আজিকার দিনেও গ্রামে শহর অপেক্ষা বেশি লোক বাস করে—কিন্তু গ্রাম এখন হতশ্রী। জ্ঞানী-গুণী লোক, সম্পন্ন গৃহস্থ ক্রমশঃ শহরবাসী হওয়ায় গ্রাম এখন অবজ্ঞাত, পরিত্যক্ত।

পূর্বে বাঙলার গ্রামে গ্রামে সম্পন্ন গৃহস্থের প্রায় সকলের বাড়িতেই দোল, দুর্গোৎসব, কালীপূজা, সরস্বতীপূজা প্রভৃতি উৎসব চলিতে থাকিত। গ্রামবাসী যাহাদের পূজা করিবার সঙ্গতি ছিল না তাহারা সকলেই এইসব উৎসবকে নিজের উৎসব জ্ঞান করিয়া উহাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিত। পূজাকারী গৃহস্থও সকলকে নিজের সহিত যুক্ত দেখিয়া পরম আনন্দ লাভ করিত। পূর্বে গ্রামে বারোয়ারী পূজা খুব কমই হইত। সম্পন্ন গৃহস্থেরা গ্রাম ছাড়িয়া শহরে চলিয়া আসায় নগরের বারোয়ারী পূজা বা সার্বজনীন পূজার সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। ইহার উপর দেশ বিভাগের ফলে বাঙলাদেশের একটা বিশেষ অংশের লোক উৎখাত হইয়া সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই সব মিলিয়া ভারতের সর্বত্র, যেখানে বাঙালী আছে সেইখানেই সার্বজনীন পূজার ব্যবস্থা ক্রমশঃ সংখ্যায় বাড়িতেছে। শহরবাসী সম্পন্নগৃহস্থ এখন নিজবাড়িতে পূজার উৎসবের গোলমালের মধ্যে ভিড়িতে চাহে না—কর্মব্যস্ত জীবনে বড় শহরে তাঁহার সময় ও সুযোগ গ্রাম অপেক্ষা অনেক কম। আর সকলকে নিজের বাড়িতে ডাকিয়া শহরে গ্রামের মত উৎসবের আয়োজন করা তাঁহাদের পক্ষে এখন আর সম্ভবপর নহে। তাই সার্বজনীন পূজায় গৃহস্থ বেশি টাকা চাঁদা দিয়া পূজার উৎসব সমাধা করেন।

সারা ভারতবর্ষে বাঙালী সার্বজনীন পূজার উৎসবে মোট কত টাকা খরচ করে তাহার কোন হিসাব পাওয়া যায় না। তবে এক কলিকাতা শহরে সার্বজনীন দুর্গাপূজায় প্রায় পঁচিশ লক্ষ টাকার মত চাঁদা সংগৃহীত হইবার খবর পাওয়া গিয়াছে। এক কলিকাতা শহরেই যদি এত টাকা ব্যয়িত হইয়া থাকে তবে সারা ভারতে কি বিপুল পরিমাণ অর্থ এইরূপে বাজে খরচ হয় তাহা অনুমান করা কঠিন।

নহে। প্রতি পূজা উৎসবের বহু পূর্বে পাড়ায় পাড়ায় পূজা পরিচালনা কমিটি গঠিত হয় এবং চাঁদা সংগ্রহ হইতে আরম্ভ করিয়া খুঁটিনাটি সকল কার্য সুসম্পন্ন করিবার ভার কর্মিবৃন্দ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহার ফলে পরস্পর সহযোগিতা এবং সমবেতভাবে কার্য করিবার শক্তি গড়িয়া উঠে। সার্বজনীন পূজা সকলের পূজা। ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের বা শ্রেণী বিশেষের পূজা নহে। সুতরাং সকলেই ইহাতে সমভাবে যোগদান করিতে পারে। ইহাতে একের সহিত অপরের সামাজিক বিভেদ দূর হইবার পথ হয় প্রশস্ত। সমালোচকগণ অনেক সময় বলিয়া থাকেন, দলাদলির ফলে এক পূজার উৎসবের ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া বহু উৎসবের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহাতেও কোন ক্ষতির কারণ নাই।—কেননা যখন কোন এক বৃহত্তর সংঘ-দ্বারা কার্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে কাজ করা যাইতে পারে। মোট কথা কার্যের সুপরিচালনা যাহাতে সম্ভবপর হয় সেইরূপ ব্যবস্থাই সঙ্গত। যেখানে বহুলোকের ব্যাপার সেখানে ত্রুটি খুঁজিয়া সমালোচনা করা অপেক্ষা নিজ নিজ কর্মশক্তির সদ্ব্যবহার করিয়া আদর্শ দেখান সঙ্গত।

পূজার উৎসবে যে সব লোক যোগদান করেন, তাঁহাদের সকলকেই পূজায় বিশ্বাস না করিলেও উৎসব ও আমোদ-প্রমোদের জন্য চাঁদা দিয়া থাকেন। বিশ্বাসী লোকের সংখ্যাও খুব বেশি।

যে বিপুল অর্থ চাঁদা হিসাবে সংগৃহীত হয় অনেক ক্ষেত্রেই ইহার অধিকাংশ পূজামণ্ডপের সাজসজ্জা, আলো এবং শিল্প নিপুণতা প্রদর্শনে ব্যয়িত হয়। শিল্পচর্চারও মূল্য আছে—ভাব-প্রধান ভারতীয় শিল্প প্রাচীনকালে জাতির ধ্যান-ধারণাকে দেব পূজায় মূর্ত করিয়া তুলিত। ইহার সহিত লোকসংগীত, ধর্মসংগীত, যাত্রা, কবিগান, পাঁচালি গান, কথকতারও ব্যবস্থা পূজার উৎসবের অঙ্গ ছিল।

কিন্তু আমরা যেন ভারতের লোকশিক্ষা ও সংস্কৃতির অঙ্গগুলিকে না ভুলি। এই সকল পূজার উৎসবে লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, কবিগান, যাত্রা, পাঁচালি, কথকতার ব্যাপক প্রচলন করিতে হইবে—তবেই বিপুল অর্থব্যয় সার্থক হইবে। হালকা আমোদ-প্রমোদ, বাজে হিন্দী গান পরিবেশন, আলোক সজ্জা, বিসর্জনের অবাঞ্ছিত হৈ-হল্লা ও প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হইয়া বিপুল আর্থিক শক্তি ও কর্মশক্তির অপচয় হইতে আমরা যেন আত্মরক্ষা করি। কোন জাতি তাহার অন্তরাত্মা হইতে দূরে সরিয়া গেলে তাহার ধ্বংস অনিবার্য।

পূজার উৎসবের ভিতর দিয়াই আমাদের জাতির প্রাণশক্তি অভিব্যক্ত হয়। উৎসবে ইহাকেই অনুভব করিতে হইবে। অসুরত্ব ও পশুত্বকে বিনাশ করিয়া সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বকে প্রতিষ্ঠাই মহাশক্তির পূজার উদ্দেশ্য—নিছক শিল্পচর্চায় সে উদ্দেশ্য সফল হইবে না। জগতের বৈচিত্র্যের ভিতরে একের ডাক শুনিতে হইবে। একের ডাকে সর্বপ্রকার বিভেদ দূর হইবে।

মানুষের আকাশ বিজয়

প্রাচীন যুগ হইতে আজ পর্যন্ত আকাশের রহস্য উদ্‌ঘাটনে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টার বিরাম নাই। তাঁহাদের অবিরাম অদম্য চেষ্টায় অসম্ভব ও সম্ভব হইতে চলিয়াছে। মাটির পৃথিবীর নব নব দেশের আবিষ্কার যেমন প্রায় শেষ হইয়া আসিল, তেমনি আকাশপথের জয়যাত্রা নব নব সম্ভাবনা লইয়া আমাদের দ্বারে সমুপস্থিত হইয়াছে। মাটির উপরের-মানুষের আকাশে উড়িবার বহুকালের স্পৃহা সফল হইল বিমান নির্মাণের পর। কিন্তু বিমানের পক্ষে শেষ পর্যন্ত দশ বারো মাইলের বেশি উপরে উঠা সম্ভবপর হইল না। দশ বারো মাইল উপরে উঠিলে তো আর গ্রহনক্ষত্রে পৌঁছান যায় না; সুতরাং ইহাতে অনন্ত ঊর্ধ্বে উঠিবার কামনা পূর্ণ হইল না—অসীম শূন্যের তুলনায় এই সামান্য দশ বারো মাইল শূন্যস্থান নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বলে পৃথিবী নিজের দিকে সব কিছুকে টানিতেছে। এ শক্তিকে প্রতিহত করিয়াই তো উপরে উঠিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। তাই বিজ্ঞানীদের মধ্যে চলিতে থাকিল 'রকেট' তৈয়ারি করিবার অক্লান্ত সাধনা। প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে চীনদেশে রকেট তৈয়ারি হইয়াছিল, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা নহে। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে র‍্যাডার দ্বারা পথভ্রষ্ট জাহাজকে সংকেত দেওয়া হইত। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে রকেট বিষয়ে গবেষণা কার্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে বিশেষভাবে অগ্রগতি লাভ করে। এইভাবে রকেটকে ক্রমশঃ উন্নততর করিয়া গঠন করা হইতে থাকে। সাম্প্রতিক কালে উহার গতিনিয়ন্ত্রিত হয় এবং বৈজ্ঞানিকের আয়ত্তের মধ্যে আসে। অতীব বিস্ময়ের বিষয় এই যে বৈজ্ঞানিকগণ উহাকে ত্রুটিলেশশূন্যভাবে নির্দিষ্ট গতিপথে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যখন রকেট নির্মাণ এতদূর সাফল্য লাভ করিল তখন বিজ্ঞানীদের মনে অসীম শূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণের সঙ্কল্প রূপায়িত হইল। ১৯৫৭ সালের ১লা জুলাই যখন আন্তর্জাতিক ভূপদার্থবিজ্ঞান বর্ষের আরম্ভ হয়, তখন প্রায় সত্তরটি দেশের বৈজ্ঞানিকগণ সম্মিলিত হইয়া মহাশূন্যের বিবিধ তথ্য সংগ্রহের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। বিশ্বের রহস্য উদ্‌ঘাটনে ইঁহারা আত্ম-নিয়োগ করিলেন। ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ইঁহারা পৃথিবীর সহিত সূর্যের সম্পর্ক, পৃথিবীর চৌম্বকশক্তি, মহাজাগতিক রশ্মি, প্রাকৃতিক পরিবর্তনের গতি প্রভৃতি অনেক বিষয়ে জিজ্ঞাসার উত্তর পাইতে লাগিলেন।

এই সমস্ত পরিকল্পনার মধ্যে মহাশূন্য জয়ই মানবজাতির ভবিষ্যতের দিক দিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। আমাদের উপরে মহাশূন্যে অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের পূর্ণ রহস্য উদ্‌ঘাটনের পূর্বেই, আমরা এখান হইতেই মহাশূন্যের কথা অনেক বেশি জানিতে পারিব—এইরূপ সম্ভাবনা এখন উপস্থিত হইয়াছে বলিতে পারা যায়।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সর্বাগ্রে মহাশূন্যে রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণের সঙ্কল্প

প্রকাশ্যে ঘোষণা করে। এই রাষ্ট্র ভূপৃষ্ঠ হইতে বড় রকেট প্রেরণ, বেলুন হইতে রকেট প্রেরণ এবং রকেটের সহায়তায় কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণের পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে সঙ্কল্প করে।

কিন্তু আমেরিকার মহাশূন্য জয়ের প্রকাশ্য ঘোষণা ফলপ্রসূ হইবার পূর্বেই সোভিয়েট রাশিয়ার বিজ্ঞানিগণ ১৯৫৭ সালের অক্টোবরে মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ (প্রথম স্পুটনিক) পাঠাইয়া বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করিলেন। এই কৃত্রিম উপগ্রহটিকে রকেটের মাথায় স্থাপন করা হয়। নির্ধারিত উচ্চতায় উঠিবার পর ইহা স্থানচ্যুত হইয়া ঘণ্টায় আঠার হাজার মাইল বেগে পৃথিবীর চারিদিকে অবিরত দুই মাস ধরিয়া ঘুরিতে থাকে।

রাশিয়া এইরূপে মহাকাশে যাত্রার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়। ইহার মাস খানেক পরেই অধিকতর উন্নত ধরনের আর একটি কৃত্রিম উপগ্রহ (দ্বিতীয় স্পুটনিক) রাশিয়ার আকাশপথে জয়যাত্রার গৌরব ঘোষণা করে। এবারকার বিশ্ববাসীর বিস্ময় আরো বেশি হইল। ইহা ৯৪০ মাইল ঊর্ধ্বে উঠিল। একটি জীবন্ত কুকুরও (নাম লাইকা) ইহার মধ্যে আকাশ ভ্রমণের সুবিধা পাইল। প্রায় চার মাস ধরিয়া কৃত্রিম উপগ্রহ নিজের গতিবেগ স্থির রাখিয়া পৃথিবীতে ফিরিবার মধ্যপথে বায়ুস্তরের সহিত সংঘর্ষের ফলে ইহা ভস্মীভূত হইয়া যায়।

রাশিয়ার প্রেরিত দ্বিতীয় স্পুটনিক আকাশপথে চলিতে আরম্ভ করিবার পর ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮ সালে 'আলফা' নামক কৃত্রিম উপগ্রহ আমেরিকা কর্তৃক মহাকাশে চালিত হয়। ইহা অবশ্য রুশ স্পুটনিকের চেয়ে আকারে ছোট। রাশিয়া ১৯৫৮ সালের মে মাসে তৃতীয় স্পুটনিক ঊর্ধ্বপথে ছাড়িয়াছে। ইহা বারো ফি দীর্ঘ এবং ১১৭৫ মাইল উপরে উঠিয়া পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়াছে। ইহার পরেও সোভিয়েট রাশিয়া এবং আমেরিকা মহাশূন্যে ছোট বড় অনেকগুলি কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ করিয়াছে। ১৯৬০ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে রাশিয়া যে উপগ্রহটি প্রেরণ করিয়াছে তাহাতে দুইটি কুকুর, অন্যান্য জীবজন্তু, পোকামাকড় ও গাছপালা ছিল।

১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখে 'ভোস্টক' নামক যানে গ্যাগারিন ভূ পৃষ্ঠ হইতে ২০০ শত মাইল ঊর্ধ্বে পরিভ্রমণ করেন। এই যানের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ১৭, ০০ মাইল। ইহার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শেফার্ড মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করেন। কিন্তু গ্যাগারিনের মতো পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবার সৌভাগ্য তাহার হয় নাই। ইহার পর রুশ মার্শাল টিটভ গত ৩রা আগস্ট ভূ-পৃষ্ঠ হইতে ২০০ শত মাইল ঊর্ধ্বে থাকিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। মহাকাশে তিনি প্রায় ২৫ ঘণ্টা কাল অবস্থান করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন।

রাশিয়ার পক্ষে এই সব কৃত্রিম উপগ্রহ তৈয়ারি করা সম্ভব হইবার কারণ সেখানকার বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি আর যন্ত্রবিদ্যা কারিগরী বিদ্যার পরস্পর সমন্বয়। এই সকল উপগ্রহ বৈজ্ঞানিকের সংজ্ঞার বাহিরে সাধারণ ভাষায় শিশুচন্দ্র

নামে পরিচিত। প্রকৃত উপগ্রহ চন্দ্র অনন্ত কাল ধরিয়া পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে, কিন্তু এই সকল কৃত্রিম উপগ্রহ একটা নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত পৃথিবীর চারিদিকে আবর্তন করিবে।

১৯৫৯ সালের জানুয়ারীর প্রথমে রাশিয়া বহুস্তর বিশিষ্ট একটি রকেট চন্দ্রের দিকে পাঠাইয়াছে। ইহা মানুষের মহাশূন্যে অভিযানের সাফল্য সূচিত করে। পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত বেতারযন্ত্র সমূহের সাহায্যে বহুসংখ্যক বিজ্ঞানী এই রকেটের লক্ষ্যপথ, ইহার কক্ষ, ইহার গতিমান নির্ণয় করিয়াছেন।

এই রকেটটির সহিত এমন সব যান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল যাহার ফলে বহিরাকাশে একটি কৃত্রিম গ্রহ সৃষ্ট হয়। ইহার ফলে জ্যোতির্বিদদের সর্বপ্রথম মহাশূন্যে বিচরণকারী বায়ুযানের চাক্ষুষ বীক্ষণ সম্ভবপর হয়। এই জাতীয় রকেটের সাহায্যে পার্থিব চৌম্বকশক্তির বাইরের ক্ষেত্রের মহাজাগতিক রশ্মির রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইবে এবং যেখানে রশ্মিসমূহ উৎপন্ন হয় এবং যে স্থান হইতে উহারা বিস্তৃত হইয়া পড়ে সে সব স্থানের সঠিক বিবরণ পাওয়া যাইবে। চন্দ্র ও পৃথিবীর বিরাট দূরত্বের জন্য চন্দ্রের চৌম্বক শক্তির প্রকৃতি ও তাহার ক্ষেত্র নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা এতকাল সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। এই রকেটের সাহায্যে আজ সেই অসম্ভবও সম্ভবপর হইয়াছে।

রাশিয়ার এই মহাশূন্য অতিক্রমকারী রকেট চন্দ্রলোক অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহাকে সূর্যের সর্বপ্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ বলা যাইতে পারে।

মানুষ আজ মহাশূন্য অধিরোহণের যুগে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। তাহার সম্মুখে রহিয়াছে বড় বড় রকেট নির্মাণ করিয়া চন্দ্রলোকে, মঙ্গল এবং শুক্রগ্রহে এবং জয়যাত্রার কার্য। টেলিভিসন যন্ত্রসহ এখন আমাদের বৃহদাকার রকেট যাহাতে চন্দ্রের চারিদিকে ঘুরিতে পারে তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা হইলে আমরা চন্দ্রের স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিব। যুগ যুগ ধরিয়া সুন্দর মুখের বর্ণনা দিতে গিয়া কবিগণ চন্দ্রের সাহায্য লইয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন মুখখানা চাঁদের মত। কিন্তু সে মুখে সূর্যের আলোকে আলোকিত চন্দ্রের শোভা তাঁহারা দেখিয়াছেন। কিন্তু চন্দ্রের শোভার মধ্যেও কলঙ্ক বা কালো চিহ্ন রহিয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বিখ্যাত পাশ্চাত্ত্য জ্যোতির্বিদ গ্যালিলিও প্রমাণ করিয়াছেন, যে এ সব কলঙ্ক-রেখা উচ্চ পর্বতের সানুদেশ ও সমুদ্র-ছাড়া আর কিছুই নহে। আমরা এখন জানিতে পারিয়াছি চন্দ্রলোকে চৌদ্দটি সমুদ্র আছে। এই সমুদ্রগুলির ক্ষেত্রফল চন্দ্রের ক্ষেত্রফলের অর্ধেক। কিন্তু এই সব সমুদ্রে কোন জল নাই—ইহাদিগকে নিম্ন সমতলভূমি বলা যাইতে পারে।

চন্দ্র নিজের চারিদিকে ঘোরে এবং পৃথিবীর চারিদিকেও ঘোরে। এই কারণে সব সময়েই চন্দ্রের একই গোলার্ধ পৃথিবী হইতে দেখা যায়। কিন্তু তাহার অপর পৃষ্ঠের স্বরূপ আমাদের নিকট একেবারে অজ্ঞাত। কোনও উপায়ে চন্দ্রের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিলেই উহার অপর দিকের রহস্য আমাদের নিকট উদ্‌ঘাটিত

হইবে। চন্দ্রের সমুদ্র, জল, আর্দ্রতা বায়ু কিছুই নাই। সেখানে বায়ু না থাকার দরুণ সূর্যরশ্মি বিচ্ছুরিত হইয়া পড়ে না; অতএব সূর্যালোকের গঠনের স্বরূপ নির্ণয়ে চন্দ্রের সহায়তা বিশেষভাবে কার্যকর হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কেন না রবিমণ্ডল পূর্ণভাবে এবং স্বরূপতঃ চন্দ্র হইতেই দেখা যাইতে পারিবে।

'থার্মোলেমেণ্ট যন্ত্রের সাহায্যে আমাদের পক্ষে এখন জানা সম্ভব হইয়াছে চন্দ্রের উত্তাপ কোথায় কখন কি পরিমাণে হইয়া থাকে। দিনের বেলার চন্দ্রের উত্তাপ ১০০ হইতে ১২০ ডিগ্রি পর্যন্ত থাকে, আবার রাত্রিতে উহার শীতলতা গিয়া দাঁড়ায় ১২০ এবং অনেক সময় শৈত্য ১০০/১৬০ ডিগ্রি পর্যন্ত নামে।

এ পর্যন্ত চাঁদ সম্বন্ধে অনেক কিছু জ্ঞান আমাদের লাভ হইয়াছে—তাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। চন্দ্রে যন্ত্র পাঠাইয়া বা রকেটে টেলিভিসন যন্ত্রের সাহায্যে ভবিষ্যতে আরো অনেক রহস্য জানিবার সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে। এ পর্যন্ত যাহা জানিয়াছি তাহার মধ্যে আধুনিকতম খবর এই—পূর্বে চন্দ্রকে যে মৃত মনে করা হইত তাহা ঠিক নহে। চন্দ্রে জীবন্ত আগ্নেয়গিরি রহিয়াছে।

সোভিয়েট রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকগণই গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে যাত্রার উপায় নির্ধারিত করিয়া মানুষের অতীত কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করিতেছেন। সোভিয়েট রাশিয়ার এই সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে জগতে একটা ভীতির সঞ্চার হইয়াছে। অনেকে মনে করেন যাঁহারা এতদূরে রকেট প্রেরণ করিতেছেন তাঁহারা নিজেদের দেশে বসিয়া অন্য দেশের উপর হাইড্রোজেন বোমা ফেলিয়া যে কোন মুহূর্তে ঐ দেশকে ধ্বংস করিতে পারেন।

এ ভীতি তাঁহাদেরই হয়তো বেশি যাঁহারা গতযুদ্ধে জাপানের হিরোসিমোকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়াছিলেন। জগতে স্বার্থে স্বার্থে দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, কাজেই এক জাতি অপর জাতির শক্তির আধিক্য দেখিলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। সে মনে করে বুঝি জগৎ হইতে তাহার প্রভুত্ব চলিয়া যাইতেছে। রাষ্ট্রীক সাম্রাজ্যবাদ অপেক্ষা ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ এ যুগে অতি প্রবল আকার ধারণ করিতেছে। তাই এক জাতি অপর জাতিকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না, সুতরাং এইরূপ সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। কিন্তু বর্তমান যুগে আমাদের লক্ষ্য কি? আমরা ভদ্রতার মুখোস পরিয়া বর্তমানে প্রাচীন বর্বরতার যুগে ফিরিয়া যাইব, না বিশ্বের নব নব আবিষ্কারকে মানব কল্যাণে নিযুক্ত করিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানে শিক্ষা বা সংস্কৃতিতে উন্নত আধুনিক মানুষের যোগ্য পরিচয় জগতের কাছে প্রদান করিব? মানুষ যদি এতই উন্নত হইয়া থাকে তবে সে জগতের কাছে সত্যকার মনুষ্যত্বের পরিচয় দিবে।

ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতীক

প্রত্যেক দেশেই একটা রাষ্ট্রীয় প্রতীক থাকে। ১৯৪৭ সালের পূর্বে ভারত পরাধীন ছিল। এই সময়ে ভারতকে রাষ্ট্র বলা হইত না। পলাশী যুদ্ধের পর 'বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে' দেখা দিল। ধীরে ধীরে পূর্ব ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া

কোম্পানীর পতাকা ও বণিক স্বার্থের প্রতীক কোম্পানী-অধিকৃত এলাকার রাষ্ট্রীয় প্রতীক হইল। সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংলণ্ডেশ্বরী ভারতের শাসনভার নিজহস্তে গ্রহণ করেন এবং ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় প্রতীক ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতীকে পরিণত হইল। এই প্রতীকে দুই পার্শ্বে দুইটি দণ্ডায়মান সিংহ রাজমুকুট ধরিয়া রহিয়াছে। সিংহ দুইটি ইংরেজের বিক্রম ও মুকুটটি সাম্রাজ্যকে বুঝাইত। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত এমন কি তাহাব পরেও কিছুকাল সরকারী দলিল, সরকারী গৃহ ইত্যাদিতে উহা ব্যবহার করা হয়।

আমরা ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী আমাদের নিজস্ব রাষ্ট্রীয় প্রতীক গ্রহণ করিয়াছি। ইহাই ভারত প্রজাতন্ত্রের প্রতীক। এই প্রতীকটি মহারাজ অশোকের সারনাথ স্তম্ভের শীর্ষ হইতে গৃহীত হইয়াছে। ভগবান বুদ্ধ বোধিলাভের পর সর্বপ্রথম সারনাথে পঞ্চশিষ্যের নিকট তাঁহার ধর্মপ্রচার করেন। এইখানেই তিনি 'মধ্যপন্থা' প্রচার করিয়া ধর্মচক্রের প্রবর্তন করেন।

যে স্থানে ভগবান বসিয়া ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন অশোকের সময়ে তাহার অদূরে একটি বৌদ্ধ সংঘ ছিল। এই সংঘের সামনে অশোক একটি স্তম্ভ স্থাপন করেন। এই স্তম্ভের শীর্ষে যে প্রতীক ছিল তাহাকে অল্প পরিবর্তিত করিয়া আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। অশোকের জীবদ্দশাতেই বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে নানা বিষয়ে মতভেদ দেখা দেয় এবং সংঘের নানা বিশৃঙ্খলা প্রকাশ পায়। স্তম্ভের গায়ে যে লিপি উৎকীর্ণ ছিল তাহাতে সংঘের শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের কঠোর শাস্তিদানের কথা বলা ছিল। ইহাদের সাদা কাপড পরাইয়া সংঘ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে অশোকের এইরূপ আদেশ ছিল। ভিক্ষুদের ইহা অপেক্ষা বড কোন শাস্তি হইতে পারে না। স্তম্ভের প্রতীকটির দ্বারা অশোক ভগবান্ বুদ্ধের বাণীও ভিক্ষুদের স্মরণ করাইয়া দিবার চেষ্টা করেন। প্রতীকটির বিভিন্ন অংশ বিশ্লেষণ করিলে বিষয়টি বুঝা যাইবে।

স্তম্ভের শীর্ষে একটি বেদির উপরে পিঠাপিঠি চারিটি সিংহ দণ্ডায়মান ছিল। সিংহের পিঠের উপরকার একটি দণ্ডের উপরিভাগে বিরাট আকাবে একটি চক্র ছিল। এই চক্রের বত্রিশটি পাখি (spoke) ছিল। চতুর্থ সিংহটি পাওয়া যায় নাই। বড় চক্রটির ভগ্নাবশেষ পাওযা গিয়াছে। এই বড চক্রটি ছত্রাকার এবং ইহাই ভগবান বুদ্ধের ধর্মচক্রের প্রতীক। কাহারও মতে এই বত্রিশটি পাখি মহাপুরুষের দেহের বত্রিশটি বিশেষ চিহ্নের ইঙ্গিত করে। সিংহ চাবিটির পায়ের নীচে একটি বেদির মত অংশ আছে। সিংহ ও বেদিটি একই পাথর খোদাই করিয়া তৈয়ারি করা হইয়াছে। বেদিতে ঘোডা, ষাঁড, হাতি ও সিংহ এই চারিটি জন্তুর প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ করা আছে এবং ছোট ধরনের চারিটি চক্রদ্বারা উহাদের পৃথক করা হইয়াছে। এই চক্রগুলির চব্বিশটি করিয়া পাখি আছে। এই চারিটি জন্তুর প্রতিকৃতি ও চারিটি চক্রের তাৎপর্য আজও ঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভবপর হয় নাই। কেহ কেহ জন্তু চারিটিকে ভগবান বুদ্ধের জীবনের চারিটি দশার নিদর্শক বলিয়া মনে

করিয়াছেন। চাকাগুলির চব্বিশটি পাখি আছে বলিয়া তাঁহারা উহাকে বৌদ্ধ ধর্মের চব্বিশটি প্রধান সত্যের প্রতীক বলিয়া মনে করেন। আবার কেহ কেহ, এইগুলিকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভগবান বুদ্ধের চরণে আত্মসমর্পণ করিবার পর মহারাজ অশোক যুদ্ধের বাজনাকে ধর্মের বাজনা বলিয়া মনে করিতেন এবং পুণ্য কর্মে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য তিনি প্রজাদের নানা প্রকার স্বর্গীয় বস্তু (হাতি, আগুন প্রভৃতি) দেখাইতেন। যাঁহারা সৎকর্ম করিবে তাহারা হস্তী, অশ্ব, দিব্যরথ প্রভৃতিতে চড়িয়া স্বর্গলোকে গমন করিবে। এই চক্র ও জন্তুগুলির প্রতিকৃতি বিমান বস্তুগুলির নিদর্শন।

সে যাহাই হউক, আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রের প্রতীকে সারনাথ স্তম্ভের প্রতীকটি পুরাপুরি গ্রহণ করা হয় নাই। ইহাতে চারিটি সিংহের পিছনেরটি অস্পষ্ট দেখা যায়, মাথায় ধর্মচক্র নাই; বেদিতে সামনে একটি ও দুই পার্শ্বে দুইটি ছোট চক্র এবং ঘোড়া ও ষাঁড়ের প্রতিকৃতি আছে। বেদির নীচে দেবনাগরী হরফে 'সত্যমেব জয়তে'—উপনিষদের এই কথাটি উৎকীর্ণ করা হইয়াছে। ইহার অর্থ একমাত্র সত্যেরই জয়। এই প্রতীকের সহিত ভগবান বুদ্ধ ও জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি মহারাজ অশোকের নাম জড়িত। এই প্রতীক গ্রহণ করিবার তাৎপর্য এই যে রাজ্যপরিচালনার ব্যাপারে ভগবান বুদ্ধ ও মহারাজ অশোকই আমাদের আদর্শ। প্রতি পদে এই প্রতীক সমগ্র জাতিকে সেই মহান আদর্শের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে। সুতরাং আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রতীকের তাৎপর্য বুঝিতে হইলে মহারাজ অশোকের আদর্শ আলোচনা করা প্রয়োজন।

অশোক তাঁহার বিরাট সাম্রাজ্য শাসনের ব্যাপারে প্রেম, প্রীতি, সহিষ্ণুতা ও ভ্রাতৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ভগবান বুদ্ধের ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অশোক বলিতেন, "বিশ্বের কল্যাণ সাধন করা অপেক্ষা বড় কোন কাজ আমার নাই, মানব কল্যাণের কাজে আমি কখনই পরিশ্রান্ত হই না।" অশোক বিশ্ব বলিতে কেবলমাত্র মনুষ্য জগতকেই বুঝিতেন না, সমগ্র প্রাণিজগতই ছিল তাঁহার কল্যাণ সাধনের ক্ষেত্র। ইহা হইতে পশুপক্ষী, জীবজন্তু এমন কি গাছপালা পর্যন্ত বাদ পড়ে নাই। তিনি কল্যাণ বলিতে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক—দুই ধরনের কল্যাণই বুঝিতেন। প্রজা বলিতে তিনি কেবলমাত্র নিজ রাজ্যের অধিবাসীদেরই বুঝিতেন না, সমগ্র মানবজাতিই ছিল তাঁহার লক্ষ্য। ইহাদের মঙ্গল সাধনই ছিল তাঁহার জীবনের পবিত্র কর্তব্য। আধুনিক যুগের সর্বপ্রকার কল্যাণ এবং শান্তি স্থাপনের উৎস হইলেন অশোক। তিনি নিজের রাজ্যকে একটি আদর্শ কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রে পরিণত করিয়াছিলেন। প্রজার মঙ্গলের জন্য সেই যুগে অশোক যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। বর্তমান যুগের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শও সর্বপ্রথম মহারাজ অশোক প্রবর্তন করেন। যাহার কোন শক্তি বা সম্পদ নাই তাহার পক্ষে অহিংসা ও শান্তির বাণী প্রচার করা খুবই সহজ। কিন্তু অশোক তৎকালীন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া এবং একাধিক যুদ্ধে

কৃতিত্ব প্রদর্শন করিবার পর অহিংসা ও শান্তির বাণী সর্বজগতে প্রচার করিয়াছিলেন। এইখানেই তাঁহার গৌরব, এখানেই তাঁহার মহত্ত্ব।

অশোকের সারনাথ স্তম্ভের সিংহপ্রতীক গ্রহণ করিবার তাৎপর্য অশোকের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা। এই প্রতীকই সমগ্র জাতিকে প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করাইয়া দেয় তাঁহার আদর্শের কথা ও জাতির বিরাট দায়িত্বের কথা। প্রায় চৌদ্দ বৎসর হইল আমরা এই প্রতীক গ্রহণ করিয়াছি। এই অল্প সময়ের মধ্যে আমরা দেশকে একটি আদর্শ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করিতে পারিয়াছি। জনকল্যাণ ও বিশ্বমানবের কল্যাণ সাধনে ভারতের রাষ্ট্র তরণী ইতিমধ্যেই যাত্রা শুরু করিয়াছে। তবে আমাদের এখনও অনেক কিছু করিবার আছে। এই প্রতীক গ্রহণ করিয়া যদি আমরা অশোকের আদর্শ কার্যে রূপান্তরিত করিতে না পারি তবে, ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করিবে না। তাই নবীন ভারতকে ভগবান বুদ্ধ ও মহারাজ অশোকের আশীর্বাণী মস্তকে ধারণ করিয়া সেই সুমহান আদর্শ রূপায়িত করিবার কাজে অগ্রসর হইতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে মধ্যবিত্তের বেকার সমস্যা

আমাদের দেশে বেকার সমস্যা অনেক দিনের পুরাতন ও তীব্র হইলেও মধ্যবিত্তের বেকার সমস্যা সম্প্রতি দেখা দিয়াছে। কিছুকাল পূর্বেও স্কুলকলেজ ছাড়িবার পর যুবকেরা কোন না কোন কাজ সংগ্রহ করিতে পারিত। কিন্তু বর্তমানে কর্মহীনতার অবস্থা এত তীব্র হইয়াছে যে ছাত্রজীবন শেষ হইবার পর তাহাদের বৎসরের পর বৎসর কাজের জন্য ছুটাছুটি করিয়াও বিফল মনোরথ হইতে হয়। যাহার কোন কাজ জুটিল, সে নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করে। যাহার কপালে কিছুই জুটিল না নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দেওয়া ছাড়া তাহার আর কিছুই করিবার থাকে না।

শিক্ষিত কর্মহীন লোক খুবই বিপজ্জনক, কারণ দেশে আজকাল যে সকল উন্নয়নমূলক কাজ হইতেছে তাহাতে ইহাদের কোন স্থান নাই। নিজেদের অসহনীয় অবস্থা চিন্তা করিয়া যে কোন সময়ে তাহারা বিপ্লব ঘটাইতে পারে। পৃথিবীর অনেক দেশেই এইরূপ ঘটিয়াছে, আমাদের দেশেও এইরূপ ঘটনা ঘটা খুব আশ্চর্যজনক নহে। তাই সরকার আজকাল এই সমস্যাটির দিকে একটু দৃষ্টি দিয়াছেন। তবে দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কত তাহার সঠিক কোন হিসাব পাওয়া যায় না। ১৯৫৫ সালে ভারত সরকার এই ধরনের হিসাব সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাতে দেখা যায় যে দেশে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ বেকার আছে। ইহা ছাড়া ১৯৫৬-৬১ সালের মধ্যে কলেজের শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রায় সাড়ে চৌদ্দ লক্ষ নূতন কর্মপ্রার্থী জুটিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কলেজসংক্রান্ত অনুসন্ধান কমিটি বলিয়াছেন যে ২৩ বৎসর বয়স পর্যন্ত যুবকদের শতকরা ৬৩ ভাগ বেকার। একমাত্র কলিকাতা শহরেরই শতকরা

১০ ভাগ লোক বেকার। ইহারা প্রায় সকলেই শিক্ষিত। পশ্চিমবঙ্গের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই—যে কাজকর্ম খালি হয় তাহার অধিকাংশই বাহির হইতে আগত লোকেরাই পায়। মধ্যবিত্তের বেকার সমস্যার অনেকগুলি কারণ দেখান হয়। প্রথমতঃ, দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে ত্রুটিপূর্ণ বলা হয়। এই শিক্ষাপদ্ধতি এরূপ যে যুবকেরা স্কুলকলেজ হইতে বাহির হইয়াই 'বাবুয়ানা' অর্থাৎ কেরাণী-গিরির কাজ খোঁজে। কিন্তু শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়াতে এই ধরনের 'বাবুয়ানা কাজের' সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। পশ্চিমবাংলা মধ্যবিত্তের দেশ। যে লোক এখানে দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না সেও তাহার ছেলেমেয়েদের স্কুল কলেজে পাঠাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। ভারতের অন্য কোন রাজ্যে শিক্ষা গ্রহণের এত আগ্রহ নাই। তাই সেখানে শিক্ষিত বা মধ্য-বিত্তের বেকার সমস্যা এত প্রবল আকার ধারণ করে নাই। সুতরাং আজকাল অনেকেই বলিয়া থাকেন যে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের এই বাসনাই বেকার সমস্যার মূল কারণ। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের মানসিক পরিবর্তন না আনিতে পারিলে সমস্যার সমাধান হইবে না। কিন্তু ইহাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না, কারণ যুবকেরা যে ধরনের শিক্ষা পাইবে, তাহার উপযোগী কার্জ তাহারা খুঁজিবে। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কি আছে? আসল ত্রুটি আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহিত শিক্ষাব্যবস্থার কোন সামঞ্জস্য নাই। ইহা ছাড়া, আজকাল বাঙ্গালাদের একটা ধারণা হইয়াছে যে উচ্চশিক্ষার পিছনে বেশি অর্থ ব্যয় করিলে বেশি বেতনের কাজ জুটিবে। ফলে তাহারা ভবিষ্যতে বেশি বেতনের চাকুরি করিয়া উন্নত জীবনধারণ করিতে পারিবে। শিক্ষা সম্বন্ধে এই ধরনের মনোভাব বর্তমান শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধির একটি বড় কারণ।

পশ্চিমবঙ্গে মধ্যবিত্তের বেকার সমস্যা এত তীব্র হইবার দ্বিতীয় কারণ দেশ-বিভাগ। দেশ বিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ হইতে লক্ষ লক্ষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহাদের অধিকাংশই উচ্চশিক্ষিত এবং উচ্চশিক্ষাগ্রহণের প্রবল বাসনা ইঁহাদের আছে। কর্মক্ষেত্রে ইঁহারাও প্রতিযোগিতা করিতেছেন। ফলে কর্মখালি অপেক্ষা আবেদনকারীর সংখ্যা শত শত গুণ বেশি হইয়া যাইতেছে।

তৃতীয়তঃ, মধ্যবিত্ত বাঙ্গালাদের কাজের সুযোগও বর্তমানে হ্রাস পাইতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুসন্ধান বিবরণী হইতে দেখা যায় যে, পূর্বের তুলনায় কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে কর্মসংস্থান অনেক হ্রাস পাইয়াছে। এক সময়ে শিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাংলাদেশে কাজ না পাইলে প্রদেশের বাহিরে কাজের সন্ধানে যাইত। কিন্তু বর্তমানে এ সুযোগ একেবারেই নাই। কারণ আজকাল অন্যান্য রাজ্যেও শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাড়িতেছে। তা' ছাডা, এই সকল রাজ্যে আজকাল উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী অপেক্ষা কম শিক্ষিত নিজ রাজ্যের অধিবাসীদের অধিক পছন্দ করা হয়। এইভাবে বিহার, আসাম, উড়িষ্যা, দিল্লী ও উত্তরপ্রদেশে মধ্যবি

বাঙ্গালীর কর্মসংস্থানের সুযোগ আজকাল নাই বলিলেই চলে। তাই বাধ্য হইয়া বাঙ্গালীদের বাংলাদেশেই চাকুরীর জন্য ভাড় করিতে হয়। ইহার উপর সম্প্রতি আর একটি নূতন বিষয় বাঙ্গালীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের কলকারখানা ও সওদাগরী অফিসগুলির মালিকেরা আজকাল আর শিক্ষিত বাঙ্গালীদের কাজে নিযুক্ত করিতে চাহেন না। বাঙ্গালীদের রাজনৈতিক চেতনা বেশি, তাহারা নির্দিষ্ট সময়ের বেশি সময় কাজ করে না এবং অনেক সময়ে ধর্মঘট ইত্যাদিতেও যোগদান করে। অথচ ইংরেজ আমলে এই সকল অফিসে ও কলকারখানাতে শত শত শিক্ষিত বাঙ্গালীর কর্মসংস্থান হইত।

পরিশেষে, দেশের পশ্চাৎপদ অর্থনৈতিক অবস্থাও ইহার জন্য অনেকাংশে দায়ী। শিক্ষিতের সংখ্যা যে পরিমাণে বাড়িতেছে সেই অনুপাতে অর্থনৈতিক উন্নতি হইতেছে না। তাই সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ না করিয়া কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করিলেই যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা হ্রাস পাইবে এইরূপ মনে করা ঠিক হইবে না। ইহার ফলে এক শ্রেণীর বেকারের সংখ্যা হ্রাস পাইয়া অন্য শ্রেণীর বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে।

সুতরাং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন না ঘটিলে এই সমস্যার সমাধান সহজ হইবে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনেকগুলি উন্নয়নমূলক কাজে ইতিমধ্যেই হাত দিয়াছেন। এইগুলিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ হইতে অনেক সময় লাগিবে। সুতরাং স্বল্পমেয়াদী কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। ইতিমধ্যেই কর্মবিনিময় সংস্থানগুলির মাধ্যমে ভবিষ্যতে সকল প্রকার সরকারী ও বেসরকারী অফিসগুলিতে নিয়োগের প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা কতদূর কার্যকরী হইবে বলা শক্ত।

দ্বিতীয়তঃ, বেসরকারী অফিসগুলির খাতাপত্র বাংলা ভাষায় রাখিবার আদেশ দিবার দাবি করা হইয়াছে। ইহা হইলে কিছুসংখ্যক মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী এখনই কাজ পাইতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রস্তাব এখনও গ্রহণ করেন নাই। তৃতীয়তঃ, ভবিষ্যতে যে সকল নূতন কাজ খালি হইবে তাহাতে বাঙ্গালীদের অগ্রাধিকার দান বাধ্যতামূলক করা যাইতে পারে। অন্যান্য রাজ্যে এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ধরনের কোন নীতি গ্রহণ করিতে রাজী নহে। চতুর্থতঃ, বড় বড় কারখানাগুলি প্রায় সবই অবাঙ্গালীদের হাতে। ক্ষুদ্র কারখানায় তাহারা বিশেষ ঝুঁকিতে চাহে না। এইজন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানার ব্যাপক সম্প্রসারণ করিলে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়িতে পারে। পঞ্চমতঃ, বাঙ্গালীদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃসুলভ মনোভাব আছে। ঐ সরকার বর্তমানে বাংলাদেশ হইতে সরকারী অফিসগুলি অন্যত্র সরাইবার জন্য ব্যস্ত। তা'ছাড়া, পশ্চিমবঙ্গে নূতন কলকারখানা বা অফিস স্থাপন করিতে ইহার বিশেষ অনিচ্ছা রহিয়াছে। সরকারের এই মনোভাব ত্যাগ করিতে হইবে।

অন্যান্য রাজ্যের অধিবাসীরা যে সকল সুযোগ-সুবিধা পাইতেছে, পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদেরও সেই সকল সুযোগ-সুবিধা দিতে হইবে। পরিশেষে, কেন্দ্রীয় সরকার তাহার দায়িত্ব প্রতিপালন করিতেছেন না বলিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিলে চলিবে না। এই ক্রমবর্ধমান বেকারের সমস্যা হ্রাস করিবার জন্য রাজ্যের শক্তি ও সম্পদ্ নিয়োগ করিতে হইবে।

ভারতের জাতীয় পতাকা

প্রত্যেক দেশের জাতীয় পতাকা ঐ দেশের প্রতীক। এই পতাকার সম্মান সর্বোচ্চ এবং উহা রক্ষা করিবার জন্য দেশবাসী প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়া থাকে। যে সকল জাতির এই পতাকা বহন করিবার শক্তি থাকে না, তাহাদের পরাধীনতার গ্লানি সহ্য করিতে হয়। আবার এই পতাকা বহু ঘুমন্ত দেশকে জাগ্রত করিয়াছে। স্বাধীনতা রক্ষার স্পৃহা যে সকল জাতির মধ্যে যত বেশি সেই সকল দেশে জাতীয় পতাকার মর্যাদাও তত বেশি।

ভারত আজ স্বাধীন হইয়াছে। ইহার সরকারী গৃহগুলিতে তেরঙ্গা পতাকা উড়িতেছে। পূর্বে এই স্থানে ইংরাজের ইউনিয়ন জ্যাক উড়িত। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট মধ্যরাত্রে এই বিদেশী শাসন ও শোষণের প্রতীকটি ভারতের আকাশ হইতে নামিয়া আসে, তাহার স্থান গ্রহণ করে আমাদের বর্তমান পতাকা। এই পতাকার একটি পুরাতন ইতিহাস আছে। পরাধীন ভারতে সর্বপ্রথম কলিকাতার পার্শিবাগান স্কোয়ারে ১৯০৬ সালের ৭ই আগস্ট তারিখে সর্বপ্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। ইহাতে লাল, হলদে ও সবুজ রঙের ডোরা কাটা ছিল। ইহার পরবর্তী পতাকা ১৯০৭ সালে পলাতক বিপ্লবিগণ প্যারী শহরে উত্তোলন করেন। ইহাও অনেকটা প্রথম পতাকার মতনই ছিল। অ্যানী বেসাণ্ট ও লোকমান্য তিলক ১৯১৭ সালে হোমরুল আন্দোলনের সময় তৃতীয় পতাকা তোলেন। ইহা একটু অন্য ধরনের ছিল। ইহাতে পাঁচটি লাল এবং চারিটি সবুজ ডোরা কাটা ছিল, বাম প্রান্তে ইউনিয়ন জ্যাক এবং মাঝখানে সাতটি তারকা চিহ্ন ছিল। আর কোণে চন্দ্রকলা ও একটি তারকা ছিল।

গান্ধীজীর নেতৃত্বে সারা ভারতে যখন আন্দোলন শুরু হয় তখন কংগ্রেসের একটি পতাকার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করা হয়। ১৯২১ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে অন্ধ্রের এক যুবক লাল ও সবুজ রং-এর একটি পতাকা গান্ধীজীকে দেন। এই পতাকার দুইটি রং ছিল—হিন্দু ও মুসলমান অধ্যুসিত ভারতের এই দুইটি প্রধান সম্প্রদায়কে বুঝাইবার জন্য। গান্ধীজী ইহার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করেন। ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়গুলিকে বুঝাইবার জন্য তিনি একটি সাদা ডোরা কাটা এবং জাতির প্রগতি বুঝাইবার জন্য চরকা ইহার সহিত যোগ করেন। কংগ্রেস এই পতাকা সরকারীভাবে গ্রহণ না করিলেও কংগ্রেসের সকল উৎসব বা বৈঠকে উহা উত্তোলিত হইত।

১৯৩১ সালে করাচী কংগ্রেসের অধিবেশনে সর্বপ্রথম জাতীয় পতাকা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং তেরঙ্গাকে জাতির প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা হয়। তখন প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করা হয় যে ইহাতে সাম্প্রদায়িক কোন ব্যাপার নাই। পতাকার নূতন ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়। ইহার তিনটি রং ছিল। গেরুয়া রঙের তাৎপর্য সাহস ও ত্যাগ, সাদার অর্থ সত্য ও শান্তি এবং সবুজের অর্থ বিশ্বাস ও বীর্য। চরকাটি সাদা ডোরার উপর একদিকে ছিল। জাতীয় আন্দোলন যতই তীব্র হইতে লাগিল দেশবাসীর নিকট এই পতাকা ততই প্রিয় হইয়া উঠিতে লাগিল। যে কোন উৎসব বা সভা আরম্ভ হইবার পূর্বে এই পতাকা উত্তোলিত হইত এবং সমবেত জনগণ তিনবার 'বন্দে-মাতরম্' ধ্বনি করিত। ভারতের বাহিরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র যে প্রথম আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার প্রতীক ছিল এই পতাকা। আজাদ হিন্দ ফৌজের নায়কেরা ও সিপাহীরা এই পতাকা বক্ষে ও মস্তকে ধারণ করিয়া 'জয়হিন্দ' রব উচ্চারণ করিতে করিতে ভারত সীমান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। এই পতাকা আসাম সীমান্তে কোহিমায় আজাদ হিন্দ সরকারের পক্ষ হইতে উত্তোলন করা হইয়াছিল।

ইহার কিছুকাল পরে ইংরেজ ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যায়। ১৯৪৭ সালের ২২শে জুলাই গণপরিষদে এই তেরঙ্গা পতাকাই স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা হিসাবে গৃহীত হয়। তবে ইহার কিছু পরিবর্তন সাধন করা হয়। পূর্বেকার পতাকার চরকার পরিবর্তে এখন মহারাজ অশোকের সারনাথ স্তম্ভের শীর্ষে সিংহ প্রতীকের বেদিতে যে চক্র আছে তাহাই গ্রহণ করা হইল। ইহাকে ধর্মচক্র বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ইহার ২৪টি পাখি আছে। আসলে কিন্তু ইহা ধর্মচক্র নহে, ধর্মচক্রের ২৩টি পাখি ছিল। সে যাহাই হউক, এই পরিবর্তন কেন হইল তাহা আলোচনা করা প্রয়োজন। এই পরিবর্তনের স্বপক্ষে শ্রীজবাহরলাল নেহেরু গণপরিষদে এক দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। চরকা ভারতের সাধারণ মানুষ বা জনতাকে বুঝাইত, তাহাদের শিল্পকে বুঝাইত। এ শিল্প মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষা। ইহা সত্ত্বেও এই পরিবর্তন করিতে হইয়াছে। সাধারণতঃ পতাকার দুই পাশে একই প্রতীক থাকা উচিত। কিন্তু আমাদের পতাকার একদিকে ছিল চরকা, আর একদিকে ছিল টাকু। এই সামঞ্জস্য বিধান করিবার জন্য কেবলমাত্র চক্রটি রাখিবার সিদ্ধান্ত করা হইযাছে—তবে ইহা চরকার চাকা নহে, অশোক স্তম্ভে খোদিত চক্র। এই চক্র প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যের ও কৃষ্টির প্রতীক।

এই পতাকার তাৎপর্য পূর্বের মতই আছে। রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ ইহার তিনটি রং-এর দার্শনিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গেরুয়া (কমলা) রং তাঁহার মতে 'ত্যাগ' কে বুঝায়। আর সত্যিই তাই, আমাদের দেশের সাধু সন্ন্যাসী বা সংসার বিরাগীদের এই রং-এর বস্ত্রই পরিধেয়। মাঝখানের সাদা রং আলোর ইঙ্গিত করে, যে আলো আমাদের সত্যের পথ দেখাইবে। সবুজ আমাদের সঙ্গে

মাটির অর্থাৎ তরুজগতের সম্বন্ধ বুঝাইতেছে। এই তরুজগতের উপরই অন্যান্য প্রাণীর জীবন নির্ভর করে। মাঝখানের চক্রটিকে তিনি ধর্মের চক্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই পতাকাতলে যাঁহারা কাজ করিবেন, সত্য বা ধর্ম তাঁহাদের কাজের পরিচালক হইবে। আবার চক্র প্রগতিকে বুঝায়, ইহা আমাদের শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনকেই বুঝাইতেছে।

জাতীয় পতাকার ব্যবহার সম্বন্ধে ভারত সরকার কতকগুলি নিয়ম করিয়াছেন। এই নিয়মগুলি আমাদের সকলের পালন করা কর্তব্য। কোন বস্তু ও মানুষের শরীরে এই পতাকা লাগান চলিবে না। এই সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজন হইলে নিজ নিজ বা প্রতিষ্ঠানের পতাকা ব্যবহার করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, কোন প্রতীক বা পতাকা জাতীয় পতাকার উর্ধ্বে বা উহার দক্ষিণ পার্শ্বে বসানো চলিবে না। যদি একই সারিতে অন্য কোন পতাকা ঝুলাইতে হয়, তবে তাহা জাতীয় পতাকার বাম পার্শ্বে কবিতে হইবে। আবার যদি পতাকা উত্তোলন করিতে হয়, তবে জাতীয় পতাকাই সর্বোচ্চ হইবে। তৃতীয়তঃ, জাহাজের মাস্তলে অন্যান্য পতাকা উড়াইতে হইলে জাতীয় পতাকা সর্বোচ্চে থাকিবে। ইহা লম্বালম্বিভাবে বহন করা চলিবে না। কোন মিছিলে জাতীয় পতাকা সর্বাগ্রে থাকিবে এবং বাহককে দক্ষিণ স্কন্ধে উহা উঁচু করিয়া বহন করিতে হইবে। চতুর্থতঃ, ঘরের ভিতর অথবা বারন্দায় উহা উড়াইতে হইলে সব সময়ে গেরুয়া দিকটি উপরে থাকিবে। সাধারণতঃ সরকারী ভবনে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির অফিস গৃহে এই পতাকা উডান হয়। সীমান্ত অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ স্থানেও রাষ্ট্রীয় পতাকা তোলা হয়। ইহাই দূর হইতে রাষ্ট্রের সীমানা নির্দেশ করে। রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রপালগণ রাষ্ট্রীয় পতাকা ব্যবহার করেন না, তাঁহাদের নিজ নিজ পতাকা আছে। তবে রাষ্ট্রীয় উৎসবের দিনে যেমন স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, মহাত্মাজীর জন্মদিবস, এই পতাকা ব্যবহারের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। সকলেই নিজ নিজ গৃহে ঐ দিন এই পতাকা তুলিতে পারেন এবং ইহার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সভাসমিতি, ময়দান, পার্ক যে কোন স্থানে বা যানবাহনে উত্তোলন করিতে পারা যায়।

জাতীয় পতাকা ব্যবহারের এত বিধিনিষেধ আমাদের পক্ষে মানা সব সময় সম্ভবপর হয় না। কারণ দেশ স্বাধীন হইবার পূর্বে আমরা জাতীয় পতাকা সভা-সমিতি ছাড়াও অন্যত্র ব্যবহার করিতাম। এক কথায় বলিতে গেলে, এই পতাকা আমাদের এত প্রিয় ছিল যে, যে কোন শুভ কাজ করিতে গেলেই আমরা ইহা ব্যবহার করিতাম। সভাসমিতি শুরু হইবার পূর্বে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি সহকারে আমরা এই পতাকা উত্তোলন করিতাম। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া ইহাকে প্রণাম জানাইত। এই অভ্যাস আমরা এখনও পুরাপুরি ত্যাগ করিতে পারি নাই। তাই এখনও ব্যক্তিগত উৎসবে বা পূজামণ্ডপে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিতে দেখা যায়। জাতীয় পতাকার এই ধরনের যথেচ্ছ ব্যবহার না করাই ভাল।

দীর্ঘদিন সংগ্রামের পর আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। এই স্বাধীনতার প্রতীক আমাদের জাতীয় পতাকা। যাঁহারা এই সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহাদের অনেকেরই জীবনদীপ নির্বাপিত হইয়াছে এবং হইতেছে। তাঁহাদের বংশধরেরা অর্থাৎ আজকার দিনের তরুণেরাই জাতির ভবিষ্যৎ। এই পতাকার মান ও মর্যাদা রক্ষার ভার তাহাদেরই উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। এই পতাকা প্রতিনিয়তই আমাদের এই কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তাই দেশকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য, এই পতাকা তাহাদিগকেই প্রত্যহ আহ্বান করিতেছে।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র

আজকাল ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার তাৎপর্য কি? প্রাচীনকালে রাষ্ট্রের সহিত ধর্মের একটা নিবিড় সম্পর্ক ছিল। রাষ্ট্রের নায়ক অর্থাৎ রাজার ধর্মই ছিল রাষ্ট্রের ধর্ম। এই ধর্ম প্রচারের জন্যই রাষ্ট্র সর্বপ্রকার চেষ্টা করিত এবং রাজ্যের মধ্যে যাঁহারা ঐ ধর্ম পালন করিতেন তাঁহাদেরই নাগরিকের সর্বপ্রকার অধিকার দেওয়া হইত। রাষ্ট্র কোন একটি বিশিষ্ট ধর্মাবলম্বীদেব স্বার্থ রক্ষা কবিত, অপরের স্বার্থ অবহেলিত হইত। কিন্তু আধুনিক কালে ধর্মের সহিত রাষ্ট্রের এই সম্পর্ক পরিবর্তিত হইতেছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি ক্রমশঃ ধর্মনিরপেক্ষ হইতেছে।

ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হইতেছে রাজনৈতিক জীবনে ধর্মেব কোন স্থান নাই। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করে না এবং কোন বিশেষ ধর্মের সহিত ইহার সম্পর্ক থাকে না। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সকল ধর্মাবলম্বীই রাষ্ট্রের সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। সকল ধর্মাবলম্বীই আইনের চক্ষে সমান এবং রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে ধর্মের কোন স্থান নাই। যে কোন লোক তাহার ইচ্ছামত ধর্ম আচরণ করিতে পারে এবং যদি কেহ ইহাতে বাধা দেয় তবে রাষ্ট্র তাহাকে শাস্তি দিবে।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের উদ্ভব মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্তনের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রাচীনকালে রাষ্ট্রের সহিত ধর্মের অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ ছিল। রাষ্ট্র পরিচালনায় ঈশ্বরই ছিলেন সর্বশক্তিমান এবং রাজা ছিলেন তাহার প্রতিনিধি। ধর্মসংক্রান্ত পুস্তকগুলি ছিল আইনের প্রধান উৎস এবং এগুলিকে ঈশ্বরের নির্দেশ বলিয়া ধরা হইত। ধর্মযাজকেরা যে ভাবে ঐ সকল আইন ব্যাখ্যা করিতেন, রাষ্ট্র ঠিক সেইভাবে শাসিত হইত। এরূপ অবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কল্পনা করা যায় না। এইরূপ রাষ্ট্রে অত্যাচার ও নৃশংস ব্যবহারের কাহিনী ইতিহাসের পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ আছে। ক্রমে ক্রমে মানবের চিন্তাশক্তি প্রসারিত হইল। বিজ্ঞানের উদ্ভবের ফলে মানুষের চোখ খুলিয়া গেল। মানুষ তখন স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে রাজধর্মের অনুশাসন অবহেলা করিলে রাষ্ট্রকে অবজ্ঞা করা হয় না। ক্রমে ক্রমে যাজকদের প্রতিপত্তি হ্রাস পাইল এবং ধর্ম রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল।

আধুনিক গণতন্ত্র সকলের জন্য। এখানে কোন একটি ধর্মের প্রাধান্য থাকিলে গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। তাই গণতন্ত্র কার্যকর করিতে হইলে রাষ্ট্রকে একান্ত-ভাবে ধর্মনিরপেক্ষ হইতে হইবে। কারণ তাহা না হইলে সকলে গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগের সমান সুযোগ পাইবে না। সুতরাং ধর্ম নিরপেক্ষতা গণতন্ত্রেব প্রধান ভিত্তি—রাজনৈতিক সাম্য রক্ষার প্রাথমিক অস্ত্রস্বরূপ। গণতন্ত্রে জনসাধারণই সার্বভৌম ক্ষমতাব অধিকারী। ইহারাই রাষ্ট্রের নীতি নির্ধাবণ করে। জনসাধারণই নিজেদেব স্বাথ বক্ষার উদ্দেশ্যেই আইন প্রণ৲ন করে। ঈশ্বর বা অদৃশ্য কোন শক্তির এখানে কোন স্থান নাই। জনগণই এখানে যাজক।

ধর্মনিবপেক্ষ রাষ্ট্র সম্বন্ধে লোকেব ভ্রান্ত ধাবণা আছে। অনেকেই মনে করেন যে, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্মেব কোন ব্যাপারেই রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ কবিবে না। আবার একদল লোক আছেন যাঁহারা মনে কবেন যে ধর্মেব দুর্দিন আসিয়াছে, এইরূপ রাষ্ট্রে ধর্মের কোন স্থানই নাই। এই দুই ধবনেব মতই পুরাপুবি সত্য নহে। কারণ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে, বাষ্ট্র ধর্ম আচরণের স্বাধীনতা দিলেও, ইহা বাধা বহিত নহে। ইহার একটা সীমা আছে। কোন ধর্মকেই এই সীমা অতিক্রম কবিতে দেওয়া হয় না। ইহা অধার্মিক বাষ্ট্রও নহে। তবে বাষ্ট্রেব কোন ধর্ম নাই। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্মের দুর্দিন আসিযাছে মনে করা ঠিক হইবে না, কারণ যে অবস্থা বিদ্যমান থাকিলে ধর্ম বাঁচিয়া থাকিতে পাবে একমাত্র ধমনিরপেক্ষ রাষ্ট্রেই সেই অবস্থা থাকে। ইহার কারণ রাষ্ট্র কোন ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ কবে না, সকল ধর্মকেই সমান সুযোগ দেয়।

স্বাধীনতা লাভেব পর ভারতকে ধর্মনিবপেক্ষ বাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। প্রাচীন ভারতেও আমরা দেখিতে পাই বাষ্ট্র ধর্মসহিষ্ণু ছিল। রাষ্ট্র কোন বিশেষ ধর্মের প্রচার করিত এইরূপ দৃষ্টান্ত যথেষ্ট পাওয়া যায়। তাই বলিয়া প্রাচীন ভারতেব রাজারা অন্য ধর্মকে অবহেলা কবেন নাই। মহাবাজ অশোকেব অনুশাসন ইহার শ্রেষ্ঠ উদাহবণ। জাতিধর্মনির্বিশেষে তিনি প্রজাব মঙ্গল সাধন করিতেন। বৌদ্ধধর্ম প্রচারে তাঁহাব উদ্দেশ্য ছিল শুধু নিজ রাজ্যেব নহে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ সাধন করা। মুসলমান রাজত্বকালে ভারতে সর্বপ্রথম ধর্মের শাসন দেখা দেয়। নবাব বাদশাহগণ ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছাড়া অপব কোন প্রজাকে কোন সুযোগ-সুবিধা দিতেন না। মুসলমান প্রজারাই ছিল বাজ্যের সব কিছু। এই যুগে বলপ্রয়োগে ধর্মান্তরীকরণও বিরল নহে। ইংরেজ সরকার ধর্মনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করিতেন। কিন্তু খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের জন্য চাকুরী সংরক্ষণ, সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রভৃতি ব্যবস্থার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিলে এই নিরপেক্ষ নীতির কোন সার্থকতা থাকে না। সাম্রাজ্যের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্যই তৎকালীন ভারত সরকার এই ধরনের ভুয়া ধর্মনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার ফল হইল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা এবং পরিশেষে দেশ বিভাগ করিয়া দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন।

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে স্বাধীন ভারতের সংবিধান প্রবর্তন

করা হয়। এই সংবিধানে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলকে সমান অধিকার দান করা হইয়াছে। ভারতের রাষ্ট্রনায়ক জবাহরলাল নেহেরু উদীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—"আমরা যে ধর্মাবলম্বীই হইনা কেন, আমরা সমান অধিকারসম্পন্ন একই ভারতমাতার সন্তান।" ভারতের রাষ্ট্র পরিচালনার দিকে দৃষ্টি দিলেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। দেশ গঠনের বহু কাজে, সরকারী চাকুরীতে, রাষ্ট্রশাসনে এমন কি দেশরক্ষা বিভাগে বহু মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রই সত্যিকারের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। আধুনিক যুগে জগতের সকল ধর্মের আলোচনার সুযোগ বাড়িয়াছে। এই ধরনের তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখা যায় যে কোন ধর্মই পৃথক নহে। এইগুলি মানুষের ধর্মবুদ্ধির বিভিন্ন রূপ ছাড়া আর কিছুই নহে। এইরূপ অবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব মধ্যযুগের ব্যবস্থা গ্রহণের নামান্তর মাত্র। তাই আজকাল আর কোন উন্নতিশীল গণতন্ত্রের ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।

গ্রাম-পঞ্চায়েৎ

স্মরণাতীত কাল হইতে আমাদের দেশে গ্রামই রাজ্য শাসনের ভিত্তি হিসাবে চলিয়া আসিতেছে। ভারতীয় সভ্যতার উষাকালে সেই বৈদিক যুগেও আমাদের দেশে গ্রামসভা ছিল। প্রথম অবস্থায় এই সভাগুলি গ্রামবাসীদের সামাজিক মিলনের কেন্দ্রের কাজ করিলেও পরবর্তী যুগে উহারা তাহাদের সর্বপ্রকার পৌর-সমস্যা সমাধান ও বিবাদ মীমাংসার কেন্দ্রে পরিণত হয়। মৌর্য যুগে এই সভাগুলি উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে এবং ইংরেজ আগমনের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত অক্ষত অবস্থায় ছিল। এই সভাগুলির নাম গ্রাম-পঞ্চায়েৎ। আমাদের বাংলাদেশেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এই পঞ্চায়েৎ ছিল প্রাচীন ভারতের শাসনের ভিত্তি। ইংরেজ আমলে উহা একেবারে উঠিয়া গিয়াছে বলিলে ভুল হইবে। তবে উহাদের কোন বৈধানিক স্বীকৃতি ছিল না। গ্রামের বড় লোক বা উচ্চবর্ণের লোকেরা পঞ্চায়েতের শাসন মানিতেন না। তবে সমাজের তথাকথিত অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের নিকট পঞ্চায়েতের গুরুত্ব ছিল অনেকটা সেই প্রাচীন কালেরই মত।

দেশ স্বাধীন হইবার পর আমাদের নিজস্ব স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় ফিরিয়া যাইবার সুযোগ ঘটে। প্রজাতন্ত্রী ভারতের সংবিধানে পঞ্চায়েৎ গঠনের স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ১৯৫১ সালের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচনার সময়ে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। পরিকল্পনা কমিসন গ্রাম্যসমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্গঠনের মূল যন্ত্র হিসাবে পঞ্চায়েতগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। এই সময় হইতেই বিভিন্ন রাজ্যে পঞ্চায়েত-গুলিকে পুনর্গঠন করিবার জন্য অনেকগুলি আইন পাস করা হয়। দেশের সর্বত্র পঞ্চায়েতের সংখ্যাও বাড়িয়া চলিয়াছে।

বর্তমান ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের পঞ্চায়েতগুলির সংগঠন, শাসনতন্ত্র ও কার্যকলাপের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রামের প্রয়োজন, অর্থের অভাব এবং শাসনের সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতি সর্বত্র এক নয়, তাই পঞ্চায়েতগুলিও এক ধরনের হইতে পারে নাই। সাধারণতঃ একটি পঞ্চায়েৎ পাঁচ হইতে পনের জন সদস্য লইয়া গঠিত হয়। কোন কোন রাজ্যে অনুন্নত সম্প্রদায় ও মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকে। অন্য সকল সদস্য প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত হন। সদস্যেরা সাধারণতঃ তিন হইতে পাঁচ বৎসর স্বপদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। কোন কোন রাজ্যে একটি গ্রামের জন্য একটি, আবার কোথাও বা অনেকগুলি গ্রামের জন্য একটি পঞ্চায়েৎ গঠিত হয়। প্রথম ধরনের পঞ্চায়েতগুলিই অধিক কার্যকর হয়। কারণ তাহাতে গ্রামবাসীদের সহযোগিতা পাওয়া খুবই সহজ হয়।

পঞ্চায়েতগুলির কাজ সাধারণতঃ দুই প্রকারের—বাধ্যতামূলক ও ঐচ্ছিক। পৌরশাসনতান্ত্রিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও উন্নয়নমূলক—সব রকমেরই কাজ ইহার অন্তর্ভুক্ত। কোন কোন রাজ্যে ইহাদের চৌকিদারের কাজও দেখাশুনা করিতে হয়। ইহা ছাড়া, কতকগুলি রাজ্যে এমন নিয়ম আছে যে, পঞ্চায়েতকে নূতন কোন কাজ দিলে তাহা করিতে হইবে। তবে সাধারণভাবে গ্রামের রাস্তাঘাট ও সেতু নির্মাণ এবং সংরক্ষণ, পুষ্করিণী, নলকূপ প্রভৃতি খনন করিয়া পানীয় জলের বন্দোবস্ত, রাস্তায় আলোদান, মল পরিষ্কারের ব্যবস্থা প্রভৃতির কাজ পঞ্চায়েতগুলি করিয়া থাকে। এই সাধারণ কাজগুলিও ইহারা দক্ষতার সহিত করিতে পারে না। তবে সমাজ উন্নয়নের ব্লক অঞ্চলের নিকটবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত পঞ্চায়েতগুলি একটু উন্নত ধরনের। পঞ্চায়েতগুলির আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নহে। চৌকিদারী ট্যাক্সই ইহাদের প্রধান আয়ের উৎস। এই কর গ্রামবাসীদের গৃহ ও জমির উপর ধার্য করা হয়। গ্রামের খোয়াড় ও খেয়া হইতেও কিছু আয় হয়। রাজ্য সরকারও ইহাদের কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য দান করিয়া থাকেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পল্লীজীবনের পুনর্গঠনের যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহাতে গ্রামবাসীরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে নাই। ফলে অগ্রগতি বিশেষ হয় নাই। সরকার বর্তমানে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বাহির হইতে সরকারী কর্মচারী প্রেরণ করিয়া গ্রামে-ঘেরা এই বিরাট দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা সার্থক করিয়া তোলা কখনই সম্ভব নহে। তাই সরকার বর্তমানে সমবায় সমিতি ও পঞ্চায়েতগুলিকে পুনর্গঠিত করিয়া ইহাদের পরিকল্পনা রূপান্তরের মূল ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করিতে চান। গ্রামের উৎপাদন বৃদ্ধির কর্মসূচী রচনা, গ্রামবাসীদের শ্রমদানে প্রবুদ্ধ করা, ক্ষুদ্র সঞ্চয় পরিকল্পনার প্রচার, ভূমি সংস্কার রূপান্তরণে সাহায্য করা, প্রভৃতি বিষয়ে পঞ্চায়েতগুলিকে বাহনরূপে ব্যবহার করিবার সুপারিশ ছিল এই রিপোর্টে।

সম্প্রতি সমাজ উন্নয়নের পুনর্গঠনের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাতে

পঞ্চায়েতকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হইয়াছে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই সর্বপ্রথম ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ নীতি গ্রহণ করা হইল। স্থির হইয়াছে যে পঞ্চায়েতগুলি যাহাতে তাহাদের নিজ নিজ কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে পারে তাহার জন্য ইহাদের আয়তন যথাসম্ভব ছোট হইবে। অর্থাভাবই ইহাদের কাজ করিবার প্রধান অন্তরায়। এই অর্থাভাব দূর করিবার জন্য ভবিষ্যতে ভূমিরাজস্বের একটা নির্দিষ্ট অংশ দানের প্রস্তাব করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, দেখা যাইতেছে যে নির্বাচিত সদস্যদের শাসন সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা কম আছে বলিয়া পঞ্চায়েতের কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে না। তাই পঞ্চ, সরপঞ্চ, পঞ্চায়েত-সচিব প্রভৃতি পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কর্মকর্তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার ফলে পঞ্চায়েতের কাজ আরো ভাল চলিবে মনে হয়। তৃতীয়তঃ, সরকার বিকেন্দ্রীকরণের নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। এইজন্য পঞ্চায়েত-সমিতি গঠন করিয়া নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা বণ্টন করা হইবে। এই সমিতিগুলির হাতে পশুপালন, কুটিরশিল্প, জনস্বাস্থ্য, প্রাথমিক শিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন উন্নতির দায়িত্ব দেওয়া হইবে। পরিশেষে বিভিন্ন ধরনের গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা ও কার্যে রূপান্তরিত করিবার বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য অনেকগুলি সাব-কমিটি গঠিত হইবে। এই সাব-কমিটিগুলি পঞ্চায়েতের উন্নয়ন-মূলক কাজের দৈনন্দিন তদারক করিবে।

এইভাবে আমাদের দেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তি দৃঢ় করিয়া তোলা হইতেছে। পুনর্গঠন পরিকল্পনা যদি সত্যই সার্থক করিয়া তোলা যায়, তবে এমন একদিন আসিবে যেদিন গ্রামবাসীরা আর নিজেদের সমস্যা সমাধানের জন্য রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষী হইবে না। তাছাড়া গ্রামবাসীদের পঞ্চায়েতের পরিচালনা করিয়া যে অভিজ্ঞতা হইবে ভবিষ্যতে তাহারা সেই অভিজ্ঞতা আইনসভায় কাজে লাগাইবে পারিবে। তবে আমাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে পঞ্চায়েতের ভিতরে রাজনৈতিক দলাদলি প্রবেশ না করে।

কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র

(ভারত)

আধুনিক যুগে গণতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র সম্বন্ধে জনসাধারণের ধারণা বদলাইয়া যাইতেছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ইহা হইল রাষ্ট্র ও ব্যক্তির সম্পর্ক। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী (Individualist) নামে এক শ্রেণীর লোক আছেন। ইঁহারা বলেন যে রাষ্ট্রের ক্ষমতা যতদূর সম্ভব সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তাহার ইচ্ছামত ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দেওয়া উচিত। রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতা বেশি দিলে, ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের পথে বাধা পড়িবে। কারণ রাষ্ট্র যদি সব কাজ করিয়া দেয় তবে লোক

রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষা হইয়া পড়িবে। এই কারণে তাঁহারা বলেন যে, রাষ্ট্র কেবল মানুষের জীবন ও ধনসম্পত্তি রক্ষা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করিবে। রাষ্ট্রের পক্ষে ইহার বেশি আর কিছু করা উচিত হইবে না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে অনেকেই এই মত সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু আজকাল ইহার সমর্থকের সংখ্যা অতি নগণ্য। সমাজতন্ত্রবাদীরা বলেন যে, জনসাধারণের মঙ্গল বিধান করিবার জন্য যাহা কিছু দরকার, তাহার সবই রাষ্ট্র করিতে পারিবে। ইঁহাদের মতে কেবলমাত্র পুলিসের কাজে আবদ্ধ না থাকিয়া জীবনের সর্বক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের কার্য প্রসারিত হওয়া উচিত। ইঁহারা রাষ্ট্রের হাতে উৎপাদনের সকল উৎসই ছাড়িয়া দিতে চান এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের সবচেয়ে বড় ত্রুটি ধন ও আয়বণ্টনের বৈষম্য দূর করিতে বদ্ধপরিকর।

আধুনিক কালে আর এক ধরনের মতবাদ দেখা দিয়াছে। ইহা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদীদের মতবাদের মিশ্রণে গঠিত হইয়াছে। ইঁহারা এই দুই মতবাদের শ্রেষ্ঠ বিষয়গুলি গ্রহণ করিতে চাহেন। উৎপাদনের সকল উৎসই ইঁহারা রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে চাহেন না। বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ছাড়া বাকি সবগুলি বেসরকারী পরিচালনা ও মালিকানায় থাকিবে। তবে ইহাদের কার্যকলাপ সমাজের কল্যাণের জন্য প্রয়োজনমত নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। যে রাষ্ট্রে এই ধরনের নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাকে কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র বলে। এই ধরনের রাষ্ট্র ধন ও আয়বণ্টনের বৈষম্য হ্রাস করিবার ব্যবস্থা করে, কেহ যাহাতে বেকার না থাকে তাহার চেষ্টা করে, সকলেই যাহাতে উপযুক্ত বেতন ও ছুটি পায়, লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ পায় ইত্যাদি নানাদিকে দৃষ্টি দেয়। ইহা ছাড়া, কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র অসুস্থের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে, পঙ্গু বা অসমর্থকে সাহায্য করে, বৃদ্ধ ও অসহায়দের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে।

ব্যক্তির ও সমাজের কল্যাণ সাধন করা ছাড়াও কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের আর একটি কাজ আছে। বিশ্বরাষ্ট্রের সদস্য হিসাবে বিশ্বমানবের কল্যাণসাধন করাও তাহার একটি কর্তব্য। মানুষ অপর মানুষের উপর নির্ভরশীল। কোন রাষ্ট্র আজকাল আর বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না। অপর রাষ্ট্রের উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হয়। এই কারণে কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রকে অপর রাষ্ট্রের মঙ্গলের কথা চিন্তা না করিয়া উপায় নাই।

ভারতকে একটি কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র বলা হয়। দেশ স্বাধীন হইবার পর হইতে ভারত সরকার জনসাধারণের কল্যাণবৃদ্ধির জন্য যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার আলোচনা হইতেই এই নামের সার্থকতা বুঝিতে পারা যাইবে। ভারতের সংবিধানের "রাষ্ট্রীয় কর্মপরিচালনার নীতি" শীর্ষক অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্র সকল বিষয়ে জনসাধারণের মঙ্গল বিধানের কার্য করিবে। সকল শ্রমিক, স্ত্রী, পুরুষ নির্বিশেষে, সমান কাজের জন্য যাহাতে সমান মজুরী পায় রাষ্ট্র তাহার ব্যবস্থা

করিবে। দেশের লোকের মধ্যে অত্যধিক আয়ের বৈষম্য যাহাতে না থাকে, তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। সকল নাগরিক যাহাতে উপযুক্ত শিক্ষা ও কর্মলাভের সুযোগ পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিকেরা যাহাতে জীবনধারণের উপযোগী বেতন পায় অসুস্থ হইলে চিকিৎসা ও ভরণপোষণের জন্য ভাতা পায়, বৃদ্ধ বয়সে অবসর পায় ও স্ত্রী শ্রমিকেরা গর্ভাবস্থায় কাজ হইতে ছুটি ও উপযুক্ত ভাতা পায় তাহার ব্যবস্থাও রাষ্ট্রকে করিতে হইবে। অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও তাহাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্যও রাষ্ট্রকে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ভারত সরকার জনগণের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্য ঘোষণা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। গত দশ বৎসরে কাজও অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা ও অবস্থার উন্নতি সাধন করিবার জন্য রাষ্ট্র অনেকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। প্রথমতঃ, ১৯৪৮ সালের কারখানা আইনে শ্রমিকদের কাজের সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের সপ্তাহে দেড় দিন ও বৎসরে ১৪ দিন ছুটি দিতে হইবে। আইন করিয়া শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরির হার নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। এই আইন অনুযায়ী তাহারা অসুস্থ অবস্থা, কর্মহীনতা বা গর্ভাবস্থাতে আর্থিক সাহায্য ও ছুটি পায়। শ্রমিকদের অপরিণত বয়সে মৃত্যু ঘটিলে তাহার পোষ্যবর্গ আর্থিক সাহায্য পায়। কারখানায় কাজ করিতে করিতে কর্মক্ষমতা হারাইলে অথবা আহত হইলে সাহায্য পায়। ধর্মঘট ও লকআউট নিবারণের জন্য ট্রাইবুন্যাল গঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শ্রমিকসংঘ আইন পাস করিয়া রাষ্ট্র শ্রমিকসংঘ গঠনের পথ সুগম করিয়াছে। ইহা ছাড়া, শ্রমিকদের মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক উন্নতির দিকেও রাষ্ট্রের দৃষ্টি আছে।

শিল্পক্ষেত্রে দেখা যায় যে গুরুত্বপূর্ণ অনেক শিল্পের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। বেসরকারী শিল্পপতি ও ব্যবসায়িগণ যাহাতে জনসাধারণের স্বার্থের হানি করিতে না পারে সেদিকেও সরকারের সজাগ দৃষ্টি আছে। বহু সরকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সাহায্য দান করিয়া, রাষ্ট্র শিক্ষা লাভের পথ প্রশস্ত করিয়াছেন।

জনগণের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণবৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্র পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার কাজ শেষ হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনারও কাজ শেষ হইতে চলিয়াছে। এই পরিকল্পনার ফলে ব্যক্তির ও জাতির আয় বেশ কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আয় ও ধনবৈষম্য হ্রাস করিবার জন্য বড় লোকেদের উপরে বেশি হারে কর বসাইয়া ঐ টাকার সাহায্যে জনসাধারণের কল্যাণ বৃদ্ধির সহায়তা কল্পে এই ধরনের অনেক কাজ করা হইতেছে। বেকার সমস্যা হ্রাসের প্রতিও সরকার সবিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন। পরিকল্পনায় যে সকল কাজে হাত দেওয়া হইয়াছে সেগুলি কার্যকর হইলে বেকার সমস্যা হ্রাসের পথ সুগম হইবে এবং ধীরে

ধীরে দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থানের অবস্থা আসিবে। এইভাবে নানাদিক দিয়া ভারতরাষ্ট্র জনসাধারণের কল্যাণ বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছে।

পূর্বে বলা হইয়াছে বিশ্বের মানবজাতির কল্যাণ সাধন করা কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের একটি প্রধান কাজ। ভারতও এ বিষয়ে পশ্চাদপদ নহে। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও নিপীড়িত মানবের মুক্তির ক্ষেত্রে ভারতের দান পৃথিবীর কোন রাষ্ট্র অপেক্ষা কম নহে, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে বেশি। বিশ্বের যে প্রান্ত হইতেই ডাক আসুক না কেন, ভারত সর্বদাই তাহার পাশে আছে। এই কারণে বিশ্বের নিপীড়িত মানবজাতি আজ ভারতের মুখের দিকে চাহিয়া আছে।

ভূদান যজ্ঞ

ভূমি সংস্কার বর্তমান ভারতবর্ষের একটি জটিল সমস্যা। ভারতের অধিক সংখ্যক লোক হইতেছে গ্রামবাসী এবং গ্রামবাসীদিগের মধ্যে আবার কৃষি-জীবিগণের সংখ্যা সর্বাধিক। কৃষি আমাদের প্রাণস্বরূপ ক্ষুধার অন্নকে উৎপাদন করে। কৃষিকার্যদ্বারা কৃষক অন্ন উৎপাদন করে বটে, কিন্তু আধুনিক ভারতে সে কৃষিক্ষেত্রের মালিক নহে। প্রাচীন যুগে 'লাঙ্গল যার জমি তার'—একথার সার্থকতা ছিল। কালক্রমে মধ্যযুগের একশ্রেণীর ভূম্যধিকারী সৃষ্টি হয়, যাহারা রাষ্ট্রশক্তি এবং কৃষকদের মধ্যে অবস্থান করিয়া ভূমির মালিক হইলেন এবং ভূমি বিলি বা হস্তান্তরের হর্তাকর্তা বিধাতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইহার ফল দাঁড়াইল ভূমি বণ্টনের ব্যবস্থায় গুরুতর ত্রুটি। যে কৃষকের চাষ আবাদের জন্য যে পরিমাণ জমি আবশ্যক সে তাহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হইল। অনেক কৃষক একদিকে উপযুক্ত পরিমাণ জমির অভাবে বৎসরের অধিকাংশ সময়ে বেকার হইল, অপরদিকে মালিকানা স্বত্বের অনিশ্চয়তায় জমির উৎপাদনশক্তি বর্ধনে কৃষকের ঔদাসীন্য দেখা দিল। মধ্যস্বত্বাধিকারী জমিদার, তালুকদার, পত্তনীদার প্রভৃতি কৃষকের নিকট তাঁহাদের প্রাপ্য কর আদায় করিয়া নিজের লভ্যাংশবাদে রাজ-সরকারকে নির্ধারিত রাজস্ব দিয়াই তাঁহাদের কর্তব্য সমাধা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কর অনাদায়ে কৃষককে আইনবলে তাহার ভূমি হইতে উচ্ছেদ করিয়া বেশি লাভে সেই সব জমি পত্তন করিতেন বা নিজেরা উহা বেনামিতে খাস করিয়া লইতেন। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বর্ধন করিয়া উহার উন্নতি বিধান তাঁহারা স্বীয় কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন না।

এইরূপে কর্ষণযোগ্য ভূমির অবনতি ঘটিল এবং সেই সঙ্গে কৃষক সম্প্রদায়েরও দুর্দশার অন্ত রহিল না। ইহা ছাড়া অনুর্বর অনেক জমি অনাবাদী পড়িয়া থাকিতে লাগিল। যেখানে স্বল্প ব্যয়ে ভূমি সংস্কার সম্ভবপর সেখানেও জমির একই দশা ঘটিল। বিদেশী গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের চাপে মাঝে মাঝে প্রজাস্বত্ব আইনের পরিবর্তন সাধন করিয়া প্রজা উচ্ছেদের পথে আংশিক নিয়ন্ত্রণ চালাইলেন। কিন্তু কোন দিক দিয়া যে কৃষক বিশেষ লাভবান্ হইল তাহা মনে হয় না।

দেশের সমাজতন্ত্রবাদিগণ এই অন্যায় ভূমিবণ্টন প্রথার উচ্ছেদ সাধনকল্পে বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহাদের মতে মধ্যস্বত্বাধিকারীদিগের নিকট হইতে রাশিয়া এবং চীন দেশের দৃষ্টান্তানুসারে জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়া জাতীয় সরকার কর্তৃক উহা ভূমিহীন কৃষকদিগের মধ্যে ন্যায্যভাবে বণ্টন ও প্রাচীন যুগের মত কৃষককে উহার মালিকানা-স্বত্ব প্রত্যর্পণ অবশ্য কর্তব্য কর্ম বলিয়া বিবেচিত হইল।

কিন্তু এইরূপে রাষ্ট্রশক্তি প্রভাবে মধ্যস্বত্বাধিকারিগণের নিকট হইতে জমি বাজেয়াপ্ত করিতে গেলে জাতিকে এক সামূহিক বিপ্লবের সম্মুখীন করা হইবে। ইহা মনে করিয়া দেশের অপর চিন্তাশীল লোকেরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে এই সমস্যা সমাধানের পক্ষপাতী হইলেন। সুখের বিষয় মহাত্মা গান্ধীর জীবনপথের পথিক আত্মত্যাগী পুরুষ আচার্য বিনোবা ভাবে ত্যাগ ও শান্তির পথে এই সুমহৎ কার্য সম্পাদনের জন্য কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার কর্মপন্থা হইল বিত্তশালী লোকের নিকট হইতে ভূমিহীনের জন্য সশ্রদ্ধ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, ভূমিদানের গ্রহণ। ইহারই নাম 'ভূদান যজ্ঞ'। দেশের কল্যাণের জন্য শ্রদ্ধার সহিত ভূমিদানরূপ ত্যাগের নাম 'ভূদান যজ্ঞ'। অশ্রদ্ধার দান গ্রহণ করিতে নাই। ইহাতে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই নীতির দিক দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যাহার যেরূপ বিত্ত আছে সে তদনুরূপ দান করিবে। কিন্তু সে বিত্তশাঠ্য করিয়া কোনক্রমেই নৈতিক অধঃপতন বরণ করিবে না। দানের অবস্থার অনুরূপ দান না করার নাম বিত্তবিষয়ে শঠতা। ইহা এক প্রকারের আত্মপ্রতারণা। ইহাই হইল ভূদান যজ্ঞের নৈতিক তাৎপর্য। শোনা যায় অশ্রদ্ধার বা বিত্তশাঠ্যের দান বিনোবাজী গ্রহণ করেন নাই। তাহার কারণ প্রভূত ভূসম্পত্তিশালী ব্যক্তি যদি নিজ নিজ বিত্তের অনুরূপ দান না করেন তবে তাঁহার নিন্দা দেশে রটিবে। তাই তিনি এরূপ দাতার দান গ্রহণ না করিয়া তাঁহাকে দুর্নামের হাত হইতে বাঁচাইয়াছেন। এই ভূমিদান গ্রহণ ভিক্ষা গ্রহণ নহে। ভিক্ষায় দাতা ও গ্রহীতা দুইজনেই অধঃপতিত হয়, কারণ তাহা অশ্রদ্ধার দান এবং অসন্তুষ্টের গ্রহণ।

শ্রদ্ধার দান গ্রহণে যে জমি লাভ হইল উহা ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়া জমির মালিকরূপে কৃষককে প্রতিষ্ঠিত করাই এ দান গ্রহণের উদ্দেশ্য। কৃষককে জমির সঙ্গে কৃষিকার্য চালাইবার সরঞ্জাম প্রদান করাও এই বণ্টনের অঙ্গ।

১৯৫১ সালে এই ভূদান আন্দোলন আরম্ভ হয়। ঐ সময় হইতে বিনোবাজী ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সর্বত্র পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া ভূমি সংগ্রহ করিতেছেন। তাঁহার লক্ষ্য ছিল ১৯৫৭ সালের মধ্যে পাঁচ কোটি একর ভূমি সংগ্রহ করা। ইহাকে সফল করিবার জন্য বিভিন্ন রাজ্যে সরকার নানাভাবে এ বিষয়ে তাঁহার সহযোগিতা করিয়াছেন। কোন কোন রাজ্যে এই সম্বন্ধে আইনও পাস করা হইয়াছে।

অর্থনীতির দিক পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় স্বেচ্ছাপ্রদত্ত জমি পাইলে বিভিন্ন

রাজ্যসরকার জমিদারগণকে দেয় ক্ষতিপূরণদানের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবেন। তাহা না হইলে করভারপ্রপীড়িত প্রজার উপর ক্ষতিপূরণের অর্থ সংগ্রহের জন্য নূতন কর স্থাপন করিতে বাধ্য হইবেন। ইহাতে কৃষক অতিরিক্ত করের চাপে পড়িবে—তাহাদের হিতে বিপরীত হইবে। আর সমাজনীতির দিক হইতে বিচার করিলে, অপরকে শ্রদ্ধার সহিত সাহায্য করিতে যাওয়ার প্রবৃত্তি সৃষ্টিদ্বারা দাতার অন্তরে অপরকে ভালবাসিবার স্বাভাবিক ইচ্ছা জাগ্রত হইবে। আর ভূমিদান স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইলে উচ্চ-নীচের মধ্যে সংঘর্ষের হাত হইতে গ্রামবাসীও রক্ষা পাইবে।

কেহ কেহ বলেন লেনদেনের ব্যাপারে আলোচনা করিলে দেখা যায় লোকে সুবিধা নিতেই চাহিবে, কাহাকেও কিছু দিতে চাহিবে না। আদর্শ যাহাই লোকের সম্মুখে ধরা হউক না কেন ভূদানযজ্ঞে প্রদত্ত ভূমি হইবে আবাদের অযোগ্য অনুর্বর ভূমি। উহা কৃষকের কোন কাজে লাগিবে না।

কোন মহৎ কার্যে ব্রতী হইলে সব সময়ে কোন আদর্শকে সম্মুখে না রাখিয়া সাফল্যের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। কাহারও সম্মুখে আদর্শ রাখিলে বিত্তশাঠ্য-রূপ কুপ্রবৃত্তি কমিতে থাকে। কোনও আদর্শ কুপ্রবৃত্তি বর্ধনের জন্য নহে বরং উহাকে নির্মূল করিবার জন্য।

ভূদান যজ্ঞের কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া শান্তির পথে অগ্রসর হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নাই। তাছাড়া এই আন্দোলনের নৈতিক দিকটাও একেবারে উপেক্ষা করা যায না। সদিচ্ছা লইয়া কার্য আরম্ভ করিযা চলিতে থাকিলে সাফল্য একদিন না একদিন আসিবেই।

পঞ্চশীল

বিগত বিশ্বমহাযুদ্ধের পর হইতে জগতের সম্পৎশালী জাতিগণের কার্যকলাপে মনে হইতেছে যেন বিশ্বশান্তির পরিবর্তে জগৎ অগ্রসর হইতেছে—এক বিশ্বধ্বংসী তৃতীয় মহাযুদ্ধের দিকে। জগতের শান্তিকামিগণ বিশ্বের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আতঙ্কিত এবং চিন্তাকুল হইয়াছেন।

আণবিক অস্ত্রের নব নব আবিষ্কারের ফলে এক শক্তিশালী জাতি অপর অনুরূপ জাতির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হইতেছে, অন্য একাধিক শক্তিকে স্বদলে টানিয়া লইয়া তাহারা পরস্পর অনাক্রমণ চুক্তি ও সামরিক জোট পাকাইতেছে। আটলান্টিক সামরিক চুক্তিতে ইংলণ্ড, ফ্রান্স অন্য জাতিসহ আমেরিকার সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য রাশিয়ার আক্রমণভীতি দূর করিবার জন্য সামরিক সংঘবদ্ধতা। পাশ্চাত্ত্য রাজনীতিকগণ চাহেন এশিয়ার শান্তির জন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহে অনাক্রমণ চুক্তিমূলক অনুরূপ সামরিক গোষ্ঠী গঠিত হউক। এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য ভারত, ব্রহ্মদেশ, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, ফিলিপাইন প্রভৃতি এশিয়ার দেশসমূহ যাহাতে মিলিত হইয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সন্ধি প্রতিষ্ঠান

স্থাপিত করে তাহার জন্য এই সব দেশকে পশ্চিম সামরিক গোষ্ঠী আমন্ত্রণ করে। কিন্তু ভারত এরূপ বিশ্বশান্তির নামে এশিয়ার জন্য সামরিক জোটবন্দীর প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে। ভারতের নিকট ইহা স্পষ্টই প্রতিভাত হইল যে শান্তির মুখোস পরিয়া পৃথিবী কার্যতঃ দুইটি বিরোধী এবং বিরাট শক্তিশালী সামরিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইতেছে। ভারতের মত হইতেছে—জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার কর্মপদ্ধতি এশিয়া নিজ নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখিবে। ভারত জগতে শান্তির জন্যই শান্তি চাহে এবং অপরকে উৎপীড়ন, ভীতিপ্রদর্শন, বা আক্রমণ দ্বারা বলপূর্বক তথাকথিত শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী নহে।

কেবল পাকিস্তান, ইন্দোচীন, ফিলিপাইন দেশ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া গোষ্ঠী গঠনে যোগদান করিল। এশিয়ার অপর স্বাধীন দেশসমূহ এই পশ্চিমী সামরিক গোষ্ঠীর আমন্ত্রণে সাড়া দিল না।

ভারতকল্পিত বিশ্বশান্তি স্থাপন-পদ্ধতি দৃঢ়মূল সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার উপরে রহিয়াছে মহাত্মা গান্ধীপ্রবর্তিত নৈতিক অহিংসাবাদের আদর্শ। এই দুইয়ের মিলনে শান্তির জন্য গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করার মধ্যে যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী আছে তাহা অস্বীকার করা চলে না। ইহা নিছক কল্পনা বা স্বপ্ন নহে। বিশ্বশান্তির এই পাঁচটি মূল সূত্রের নাম 'পঞ্চশীল।' 'শীল' শব্দের অর্থ আচরণ। ভগবান্ গৌতমবুদ্ধদ্বারা উপদিষ্ট 'পঞ্চশীল' হইতেছে, অহিংসা, পরদ্রব্য অপহরণ না করা, অপবিত্রতা ত্যাগ, মিথ্যাভাষণ এবং মাদকদ্রব্য সেবন হইতে বিরতি। গৃহস্থ ইহা পালন করিলে তাহার শান্তি আসিবে। এই "পঞ্চশীলে"র উপর মূলতঃ নির্ভর করিয়া বিশ্বশান্তির পঞ্চসূত্র বিরচিত হইয়াছে বলিয়া উহাদের নামও 'পঞ্চশীল'। যাহা ব্যক্তির পক্ষে সত্য তাহা জাতির পক্ষেও সত্য। পররাজ্য আক্রমণ, পরকে শোষণ, ধনমদে ও শক্তিমদে মত্ততাই জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ এবং বিশ্বের অশান্তির কারণ। বিশ্বশান্তির পঞ্চশীল হইতেছে :—(১) প্রত্যেক জাতি অপর জাতির (স্বাধীন সত্তা) স্বাতন্ত্র্যকে মানিয়া লইবে। (২) কোন জাতি অপর জাতিকে আক্রমণ বা পীড়ন করিবে না। (৩) এক জাতির ব্যাপারে অপর জাতি কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিবে না। (৪) জাতিসমূহ একে অন্যের প্রতি সহনশীল হইবে। (৫) জাতিতে জাতিতে আদর্শগত প্রভেদ থাকিলেও পরস্পর সৌহার্দ্যপূর্ণ (বা শান্তি পূর্ণ) সহাবস্থান স্বীকার করিতে হইবে।

বলা বাহুল্য উক্ত পঞ্চশীলই শান্তির মূল। শক্তিমদে মত্ত জাতি অপরের স্বাধীন সত্তা মানে না। সে অপরের ছিদ্রসন্ধান করিয়া তাহার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে। শক্তিমত্ত জাতি অপরের আদর্শের প্রতি বিরূপ হওয়ার ফলে তাহাকে আক্রমণ অথবা শোষণদ্বারা স্ববশে আনিবার জন্য সচেষ্ট হয়। আর যখন অপরের সহিত সহাবস্থান করা তাহার আদর্শের দিক দিয়া অসহনীয় হয় তখনই নিজ শক্তি প্রয়োগে পররাষ্ট্রকে সে পৃথিবী হইতে নিশ্চিহ্ন করিবার চেষ্টা করিয়া

থাকে। পক্ষান্তরে যখনই কোন জাতি অপর জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিয়া লয় এবং অপর জাতির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা অন্যায় বলিয়া গণ্য করে তখনই চারিদিকে ক্রমশঃ শান্তির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্ট হয়। তারপর ধীরে ধীরে অপরের প্রতি সহিষ্ণুতা আসে এবং জাতিতে জাতিতে সহাবস্থান সম্ভবপর হয়। এই পঞ্চশীল গ্রহণ করিবার পর হইতে জগতের শান্তির পথে ইহার জয়যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। বিশ্বে শান্তি সংস্থাপক হিসাবে ভারতের মর্যাদা পঞ্চশীলের প্রভাবে দিন দিন বাড়িতেছে। ইহারই ফলে ভারতের সহিত রাশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া এবং পোলাণ্ড মৈত্রীবন্ধনে বদ্ধ হইয়াছে। বিশ্বশান্তির জন্য পৃথিবীর প্রধান শক্তিচতুষ্টয়ের মধ্যে নূতন ধরনের আলাপ-আলোচনায় আন্তরিকতার আভাস পাওয়া যাইতেছে।

পঞ্চশীল পালনে কোন জাতিকে কিছুমাত্র স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে না। ইহা দ্বারা কাহারও স্বদেশের সর্বাঙ্গীন উন্নযন কোন প্রকারে ব্যাহত হইতে পারে না। ইহাতে শুধু এক জাতিকে অপর জাতির আদর্শের প্রতি সহনশীল হইতে হইবে, পরকে আক্রমণ অথবা তাহাকে শোষণ হইতে বিরত হইতে হইবে। চীন কর্তৃক ভারতের সীমান্ত অন্যায় পূর্বক আক্রমণের পরেও ভারত তাহার শান্তির নীতি ত্যাগ করে নাই। সে পঞ্চশীলে সম্পূর্ণভাবে আস্থাবান। আত্মরক্ষা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান পরস্পর বিরোধী নীতি নহে।

এই পঞ্চশীলের আচরণে ভারত ভবিষ্যৎ শান্তিসংস্থাপকরূপে জগতে শ্রেষ্ঠ আসন পাইবে—আর জগতে বিরাজ করিবে চির আকাঙ্ক্ষিত অবাধ শান্তি।

বিশ্বমানবতা

আধুনিক কল্যাণ-ব্রতী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য মানবের সর্ববিধ কল্যাণ সাধন করা। এই কল্যাণ তিন প্রকারের—ব্যক্তির কল্যাণ, জাতির কল্যাণ ও বিশ্বমানবের কল্যাণ। ব্যক্তি বা জাতির কল্যাণ রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে আবদ্ধ, বিশ্বমানবের কল্যাণসাধনের ক্ষেত্র এই ভৌগোলিক সীমার বাহিরে। দেশের বা জাতির কল্যাণ সাধন আজকাল আর বিশ্বমানবের কল্যাণ ছাড়া সম্ভব নহে। এরূপ দেখা গিয়াছে যে, রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে নাগরিকের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধন করা সম্ভবপর নহে। মানুষ যেমন নিজের প্রয়োজনে অন্যের উপর নির্ভরশীল, এক রাষ্ট্র তেমনি অন্য রাষ্ট্রের উপরও নির্ভরশীল। মানুষ যেমন সমাজ গঠন করে, অনেকগুলি রাষ্ট্রও তেমনি বিশ্বরাষ্ট্র গঠন করে। বর্তমানে এমন কতকগুলি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আইনগত সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে যাহার ফলে নাগরিকের কর্তব্য আর নিজ রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখা চলে না। অর্থনৈতিক দিক হইতে বিচার করিলে সমগ্র বিশ্বকে একটি দেশ হিসাবে ধরিতে হয়। যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি সমগ্র বিশ্বকে একসূত্রে গাঁথিয়াছে। জগতের বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা পরস্পরের সহিত এমনভাবে জড়িত যে এক দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা নীতির উপর অন্য দেশের লোকের মঙ্গল নির্ভর করে।

রাজনৈতিক দিক হইতেও আন্তর্জাতিকতার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিতে হইলে কোন একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। এই শতাব্দীতে প্রমাণিত হইয়াছে যে তথাকথিত সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্র বর্তমান থাকিলে মাঝে মাঝে যুদ্ধবিগ্রহ ও ধ্বংস অনিবার্য। তাই মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষা করিতে হইলে আধুনিক নাগরিকের কার্যকলাপ কেবল তাহার নিজ রাষ্ট্রের মধ্যে সীমিত রাখিলেই চলিবে না।

এই কারণে কোন একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নাগরিকের আনুগত্য পরিবার হইতে গোষ্ঠী, গোষ্ঠী হইতে উপজাতি এবং রাষ্ট্রে উপনীত হইয়াছে এবং রাষ্ট্র হইতে সমগ্র বিশ্বে যাত্রা শুরু করিয়াছে। তাই, আদর্শ নাগরিককে মনে-প্রাণে আন্তর্জাতিক হইতে হইবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত যুগ জাতীয়তার যুগ। এই যুগের আদর্শ ছিল এক একটি জাতি লইয়া একটি রাষ্ট্র গঠন করা। কেহ বহুজাতির মিলনে একটি রাষ্ট্র গঠন করিবার কথা বলিলে সকলেই বিস্মিত হইতেন। তাই এই যুগে নিপীড়িত জাতিগুলি স্বাধীনতা লাভের আপ্রাণ চেষ্টা করিতে থাকে এবং একে একে বহু নূতন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। তুর্কী সাম্রাজ্য হইতে গ্রীস ও বল্কান রাজ্যগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজ নিজ স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে বিশেষ করিয়া আমেরিকার রাষ্ট্রপতি উইলসনের প্রচেষ্টায় জাতীয়তার ভিত্তিতে রাষ্ট্রগঠনের গতি ত্বরান্বিত হইল। একে একে পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্র গঠিত হইল।

উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবোধের ফলে সাম্রাজ্য গঠনের ঝোঁক বৃদ্ধি পাইল। শক্তিশালী জাতিগুলি দেশের উদ্বৃত্ত পণ্য বিক্রয়ের জন্য উপনিবেশ স্থাপন করিতে আরম্ভ করিল। এইভাবে জাতীয়তাবোধের ফলে সাম্রাজ্যের উদ্ভব হইল। বড় বড় জাতিগুলি পৃথিবী জয়ের আশায় উন্মত্ত হইয়া পড়িল। কবির ভাষায়,

“...............বিশ্ব ধরাতলে
আপনার খাদ্য বলি, না করি বিচার,
জঠরে পুরিতে চায়।”

ইহার ফলে বিশ্বের শান্তি একাধিকবার বিঘ্নিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে এই ধরনের জাতিপ্রেম একদিন বিশ্বকে ধ্বংস করিবে।

আজ সকলেই উগ্র জাতীয়তার কুফল উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। সংকীর্ণ ও আক্রমণাত্মক জাতীয়তা জগতের বহু অশান্তির মূল কারণ। ইহার ফলেই বিংশ শতাব্দীতে দুই দুইবার বিশ্বযুদ্ধ হইয়াছে। এই কারণেই আজ প্রগতিশীল জাতিগুলি বিশ্বশান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে। বিশ্বমানবতার আদর্শ বৃদ্ধি করিতে পারিলে যুদ্ধ রোধ ও নৃশংস নরবলি বন্ধ করা যাইবে। তাই আজ আমাদের সকলের কর্তব্য বিশ্বরাষ্ট্র গঠন করা, যেখানে সকলেই অমৃতের পুত্র, সকলেই সকলের ভাই।

এই ধরনের বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টা আজ নূতন নহে। আজ হইতে আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে ভগবান্ বুদ্ধ শান্তি, প্রীতি ও মৈত্রীর বাণী ছড়াইয়া সমগ্র প্রাচ্যকে এক রাষ্ট্রে পরিণত করিয়াছিলেন। তাঁহার পাঁচ শত বৎসর পরে মহামতি অশোক বুদ্ধের অহিংসার বাণী সম্বল করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যকে এক সূত্রে গাঁথিবার চেষ্টায় রত হইয়াছিলেন। মধ্যযুগের ইতালীর কবি ও দার্শনিক দান্তে বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর শোচনীয় ভবিষ্যৎ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে পারিয়াই শুনাইলেন বিশ্বপ্রেমের মহাবাণী—"আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে
কোথায় আমার ঘর।"

পরবর্তী যুগে ভারতের এই বাণী বহন করিলেন মহাত্মা গান্ধী ও বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রনায়ক জবাহরলাল।

প্রাচীনকালের বা মধ্যযুগের যুদ্ধের মত বর্তমানকালের যুদ্ধ ছোট কোন স্থানে বা অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। আধুনিক যুদ্ধ আণবিক। পুনরায় আর একটি যুদ্ধ বাধিলে সমগ্র বিশ্বের ধ্বংস অনিবার্য। তাই সকলের কর্তব্য এই যুদ্ধ রোধ করা। ইহা ছাড়া, নিজ রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে মানুষ পূর্ণাঙ্গ বিকাশ লাভ করিতে পারে না। তাহার জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহযোগিতা। বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতার জন্য একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রথম প্রচেষ্টা হয় ১৯১৯ সালে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ১৯১৯ সালে শান্তি সম্মেলনে "লীগ অব নেশনস্-এর" গঠনতন্ত্র গঠিত হয় ও ১৯২০ সালে উহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার দুইটি উদ্দেশ্য ছিল—আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং বিশ্বের নিরাপত্তা ও শান্তি বজায় রাখা। যুদ্ধ প্রতিরোধ করিবার জন্য লীগ দুই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিত। প্রথমতঃ অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ হ্রাসের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ইহাতে বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় নাই। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক সভ্যরাষ্ট্রকে যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিবার অনুরোধ জানান হয়। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা হয়। কোন সভ্য রাষ্ট্র লীগের নিয়ম না মানিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, সে অন্য রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে বলিয়া ধরা হইত। ইতালী আবিসিনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে তাহার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বয়কট ঘোষণা করা হইয়াছিল। লীগের প্রভাবে ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলির যুদ্ধস্পৃহা হ্রাস পায় সন্দেহ নাই। কিন্তু বড় রাষ্ট্রের ব্যাপারে লীগ কিছুই করিতে পারে নাই। তাহারা আন্তরিক ভাবে লীগের যুদ্ধ বিরোধিতার আদর্শ সমর্থন করে নাই। লীগের ব্যর্থতার ইহাই কারণ। লীগ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। ইহার ব্যর্থতার ইহাই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভস্মরাশির মধ্যে য়ুনো (U N O) বা রাষ্ট্রসংঘ গঠিত হয়। ইহা লীগ অপেক্ষা আরো কার্যকর প্রতিষ্ঠান। ইহার উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নাই। তবে সিদ্ধান্ত নাকচ করিবার ক্ষমতা ও বড় বড় শক্তিগুলির জোটবন্দীর ফলে ইহা

বিশ্বে শান্তি স্থাপন করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। ছোট শক্তিগুলির কাহারও যুদ্ধ করিবার বাসনা নাই। তবে বড বড যে শক্তিগুলি বিশ্বে শান্তি শান্তি করিয়া চীৎকার করিতেছে, তাহারাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে এবং পরস্পর পরস্পরকে হুমকি দিতেছে। ইহার ফলে বিশ্বে পারস্পরিক শান্তি প্রতিষ্ঠার আশা সুদূরপরাহত।

তবে এই গভীর অন্ধকারের মধ্যেও ক্ষীণ আশার আলোক দেখা যায়। সে হইল বিশ্বশান্তি স্থাপনে ভারতের আন্তরিক প্রচেষ্টা। শান্তিকামী ভারতের দূত জবাহরলাল বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শান্তির বাণী ছড়াইযাছেন। তাঁহার নীতি অনেক বড বড দেশ সমর্থনও করিয়াছে। আমরা কামনা করি ভারতের এই প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক।

বিশ্বের শান্তি ও ভারতবর্ষ

যুগ যুগ ধরিয়া ভারত বিশ্বে শান্তির বাণী প্রচাব করিয়া আসিতেছে। আডাই হাজার বৎসর পূর্বে গৌতম বুদ্ধ প্রেম ও মৈত্রীর বাণী জগৎকে শুনাইয়াছিলেন। মহারাজ অশোক তাঁহার অহিংসার বাণীদ্বারা জগতের পূর্বপ্রান্তকে একসূত্রে গাঁথিয়াছিলেন। পরবর্তী যুগে চৈতন্য মহাপ্রভু বিশ্বপ্রেমেব বাণা প্রচার করিয়াছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজগতে আবার প্রচার করিলেন বিশ্বমানবতা ও শান্তির আদর্শ।

> "এসো শান্তি, বিধাতার কন্যা ললাটিকা
> নিশাচর পিশাচের রক্তদীপশিখা করিয়া লজ্জিত।"

মহাত্মা গান্ধী শুনাইলেন যুগ যুগ সঞ্চিত ভাবতের সেই একই বাণী। দীর্ঘকাল পরাধীন থাকায় আধুনিক জগতে ভারতের এই বাণা প্রচারে বিশেষ বিঘ্ন ঘটে। বিশ্বকবি এই আশাই পোষণ করিয়াছিলেন যে ভারতই সর্বপ্রথম বিশ্বকে শান্তির বাণী শুনাইবে। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হইবার ফলে কবিব বাণী কার্যকর করিবার পথ হইতে সকল বাধা অপসারিত হয়।

বিশ্বশান্তি প্রচেষ্টায় স্বাধীন ভারতের দান উপলব্ধি করিতে হইলে এই যুগের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে দুই একটি কথা আলোচনা করা প্রয়োজন। ভারত যখন স্বাধীন হইল, জগৎ তখন দুইটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়াছে। এক দলের পুরোভাগে রহিল ধনতান্ত্রিক আমেরিকা আর অপর দলের অগ্রে দাঁড়াইল ধনতন্ত্রের চিরশত্রু সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া। রাশিয়া ঠিক দল গঠন করিল বলিলে ভুল হইবে। তখন রাশিয়া একাই একশ ছিল। এই দুই পক্ষের উভয় উভয়কে সন্দেহের চক্ষে দেখিত এবং অদূর ভবিষ্যতে সংঘর্ষের স্ফুলিঙ্গ যেন দেখা যাইতে লাগিল। এরূপ অবস্থায় সবেমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভারতের পক্ষে যথার্থ নীতি স্থির করা খুবই কঠিন ছিল। এই সংকটাপন্ন অবস্থায় ভারত দৃপ্তকণ্ঠে তাহার নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক নীতি ঘোষণা করিল। ইহাতে বিশ্বের বহু দেশ এমন কি ভারতেরও কেহ কেহ বিস্মিত হইলেন।

ভারতের বৈদেশিক নীতি অনেকেই বুঝিতে পারেন নাই, কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন ভারত ধনতান্ত্রিক দেশ, তাই কমিউনিজিমের অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য সে মার্কিন জোটে যোগ দিবে। আবার অনেকেই মনে করিয়াছিলেন ভারতের মত শিশু ও দুর্বল রাষ্ট্র একা চলিতে পারিবে না, অপরের সাহায্য তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু সকলেরই জল্পনা-কল্পনা ব্যর্থ হইল।

কালের চাকা ঘুরিতে লাগিল এবং ক্রমে ক্রমে বিশ্বের দেশগুলি ভারতের বৈদেশিক নীতির তাৎপর্য ও কার্যকারিতা বুঝিতে পারিল। সমগ্র বিশ্ব এক বাক্যে ভারতের নীতিকে সুচিন্তিত বলিয়া স্বীকার করিল। ইন্দোচীনে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভারতের দান অসামান্য। কোরিয়ার ক্ষেত্রেও ভারত শান্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ভারতে যে ভাবে এই কোরিয়া যুদ্ধ-বিরতি বিষয়টি পরিচালনা করিয়াছিল তাহা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। চীনকে রাষ্ট্রপুঞ্জেব সদস্য হিসাবে গ্রহণ করিবার জন্য ভারত আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে।

পাকিস্তানের সহিত বিরোধেব ব্যাপারেও ভারত পরম সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছে। পাকিস্তানের মত রাষ্ট্রকে ভারত যে কোন সময়ই গ্রাস করিতে পারে। ভারত অহিংসা ও শান্তির দেশ, তাই আক্রমণ না করিয়া কাশ্মীর সমস্যা শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জেব হাতে ছাড়িয়া দিযাছে। গোয়ার ব্যাপারেও ভারত শান্তিপূর্ণ নীতি গ্রহণ করিয়াছে। প্রধানমন্ত্রীব এই শান্তির নীতি অবশেষে বিদেশী শাসন কবলিত গোয়ার মুক্তিসাধনে জয়লাভ করিয়াছে। ভারতের সহনশীলতা ও আপোষ মীমাংসাব জন্য দীর্ঘ চতুর্দশ বৎসর প্রতীক্ষার সাধনার জন্য জগতের শান্তিপ্রিয় ও স্বাধীনতাকামী জাতিসমূহ শ্রীজবাহরলাল নেহরুকে অকুণ্ঠিত অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছেন। মিশর ও হাঙ্গেরীব ব্যাপারে ভারত শক্তিশালী ইংলণ্ড, ফরাসী দেশ এবং রাশিয়ার কার্যের তীব্র সমালোচনা করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভারতেব দান হিসাবে বান্দুং সম্মেলন চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই সম্মেলনে অত্যাচবিত দেশগুলিকে মুক্ত করিবার সংকল্প গ্রহণ করা হয়। ভাবত ছিল এই সম্মেলনের পুরোভাগে। আফ্রিকা ও এশিয়ার মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে ভাবতের দান চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

ভারতের শান্তির দূত হিসাবে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল পৃথিবীর বহুদেশ পরিভ্রমণ কবিয়াছেন। প্রধানমন্ত্রীর শান্তি সফর যুদ্ধের জন্য সাজসাজ ভাবকে অনেকটা প্রশমিত করিয়াছে। আজিকার বিশ্বে অশান্তি দুইটি মতবাদ নিয়া—এ লড়াই গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের। ভারত বিশ্বকে জানাইয়াছে যে উভয়ে যদি উভয়কে বুঝিতে চেষ্টা করে এবং উভয়ে উভয়ের প্রতি সহনশীল হয় তবে দুইয়ের সহ-অবস্থান কখনই অসম্ভব হইতে পারে না। এই সহ অবস্থানের উপরই বিশ্বশান্তি নির্ভর করিতেছে।

যুদ্ধের জন্য একবার প্রস্তুত হইলে কোন দেশকে উহা হইতে নিবৃত্ত করা

যায় না—একথা ভারত জানে ; কিন্তু আত্মরক্ষার প্রস্তুতি শান্তির নীতি কোনক্রমেই বাধা জন্মায় না। ভারত বিশ্বাস করে যে দুইটি মতবাদের মধ্যে সংঘর্ষ বা যুদ্ধকে প্রশ্রয় না দিয়া বরং উহা বন্ধ করা যাইতে পারে। বর্তমান জগতে সংঘর্ষের মূল কারণ বর্ণবৈষম্য ও ঔপনিবেশিকতা। এই দুইটি বিশ্বশান্তির পরম শত্রু। তাই ভারতকে ইহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইতেছে। এই জন্যই এশিয়া ও আফ্রিকা হইতে একদিকে যেমন সাম্রাজ্যবাদ তাড়াইবার জন্য ভারত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে, তেমনই অন্যদিকে আবার স্বীয় লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য ভারত হিংসাত্মক নীতি সমর্থন না করিয়া শান্তির পথ অবলম্বন করিয়াছে। আজ সমগ্র বিশ্ব একবাক্যে ভারতকে বিশ্বশান্তির পরম বন্ধুরূপে স্বীকার করে। ভারতের এই নিরপেক্ষ ও উদার নীতির পশ্চাতে কোন প্রকার রাজনৈতিক চাল নাই তাহাও সকলে বুঝিতে পারিয়াছে। তাই আজ যাহারা যুদ্ধের হুংকারে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে তাহারা ভারতকে নেতৃত্বপদে বরণ করিয়া লইয়াছে। আশা করা যায়, ভারত প্রাচীন কালে যেরূপ বিশ্বকে পরিচালিত করিয়াছিল তেমনই জগৎকে শান্তি ও কল্যাণের পথে আবার চালিত করিবে।

জনমত গঠন ও প্রকাশের উপায়

আধুনিক যুগ গণতন্ত্রের যুগ। গণতন্ত্র জনমতের দ্বারা পরিচালিত হয় ; কারণ গণতন্ত্রে জনসাধারণই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তাই গণতন্ত্রে জনসাধারণকে সুবিবেচক ও দূরদর্শী হইতে হইবে। দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি বিচার করিবার মত ক্ষমতা তাহাদের থাকা প্রয়োজন ; কারণ তাহাদের এই বিচারের উপরই শাসনব্যবস্থার সাফল্য অনেকটা নির্ভর করিতেছে। যে দেশে জনমত খুব দুর্বল সেই দেশে দলাদলি, মারামারি, বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি দেখা দেয় এবং পরিশেষে একনায়কত্বের উদ্ভব হওয়া বিচিত্র নহে। পাকিস্তানে সামরিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবার মূল কারণ ঐ দেশের দুর্বল জনমত। ইহা হইতেই জনমতের গুরুত্ব বেশ বোঝা যাইতেছে।

জনমত নানাভাবে গঠিত ও প্রকাশিত হইতে পারে। ইহার মধ্যে সংবাদপত্র, সভাসমিতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল, বেতার ও চলচ্চিত্র এবং আইনসভাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জনমত গঠন ও প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন সংবাদপত্র। সংবাদপত্রে দেশ-বিদেশের সংবাদ প্রকাশিত হয় এবং তাহা আলোচিত হয়। তাই সংবাদপত্র পাঠে লোকেরা একদিকে যেমন সংবাদ জানিতে পারে অন্যদিকে তেমনি প্রয়োজনীয় বিষয়ে মতামত স্থির করিতে পারে। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও বড় বড় নেতাদের মতামত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, এইগুলি পাঠ করিয়া লোকে নিজের মতামত গঠন করে। তবে দেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বেশি হইলে ইহার সাহায্যে জনমত গঠন ও প্রকাশের বিশেষ সুবিধা হয়। এতকাল আমাদের দেশের নিরক্ষর লোকের সংখ্যা খুব

বেশি ছিল। তবে বর্তমান শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের প্রচারও বৃদ্ধি পাইতেছে। সংবাদপত্র অনেক সময় জনসাধারণকে ভুল পথে চালিত করে। সংবাদপত্রের মালিকরা প্রায় ধনিক শ্রেণীভুক্ত। নিজ নিজ অথবা গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করিবার সময় তাহারা অনেক সময়ে সংবাদ গোপন করে, অথবা বিকৃতভাবে উহা পরিবেশন করে। এই ধরনের সংবাদপত্র জনসাধারণকে ভুলপথে চালিত করে, তাহারা ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। ইহা গণতন্ত্রবিরোধী, কারণ ইহাতে জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা হয় না। তাই সংবাদপত্রকে সব সময়ে গভর্ণমেণ্ট দলগত স্বার্থ অথবা মালিকের প্রভাবের উর্ধ্বে রাখিতে হইবে। নির্ভীক এবং পক্ষপাতশূন্য সংবাদ পরিবেশিত হইলেই প্রকৃত জনমত গঠিত হইতে পারে।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে জনমত গঠন করিবার প্রকৃষ্ট উপায় সভাসমিতিতে বক্তৃতা করা। বক্তারা অপর দলের কাযের সমালোচনা করিয়া নিজ পক্ষের মতামত প্রকাশ করেন। এইভাবে জনসাধারণ বিষয়টি উপলব্ধি করিতে পারে এবং ইহা জনমত গঠনের সহায়তা করে। তবে এই ব্যবস্থার একটি প্রধান দোষ এই যে দলের প্রভাবে পড়িয়া জনগণ অনেক সময় ভ্রান্ত পথে চালিত হয়। তবে বিপ্লব বা কোন আশু সমাধানযোগ্য গুরুতর সমস্যা সম্বন্ধে জনমত গঠন করিতে হইলে এই ব্যবস্থা কার্যকর হয়। আমাদের দেশে স্বামী বিবেকানন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ ও এই যুগে শ্যামাপ্রসাদ যেরূপ ওজস্বিনী ভাষায় সভাসমিতিতে দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে বক্তৃতা করিতেন, জনমত গঠনে তাহা বিশেষ ফলপ্রসূ হইয়াছিল। ইহার মূল কারণ ছিল তাঁহাদের অসাধারণ চরিত্রবল এবং সমস্যাটির একটি নিখুঁত চিত্র জনসাধারণের নিকট পেশ করিবার ক্ষমতা এবং তীক্ষ্ণ বাগ্মিতা। তাই সভাসমিতির দ্বারা জনমত কতটা গঠিত হইবে তাহা নির্ভর করে বক্তার এই সকল গুণের উপর।

জনমত গঠনে স্কুল ও কলেজের শিক্ষার প্রভাব খুব বেশি। স্কুল বা কলেজে ছাত্রগণ শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে নিরপেক্ষ ধারণা লাভ করে। পরবর্তী জীবনে এই ধারণা তাহাদের জনমত গঠনের বিশেষ সহায়তা করে।

জনমত গঠন ও প্রকাশের আরো একটা প্রকৃষ্ট উপায় বেতার ও চলচ্চিত্র। বেতারের সাহায্যে বক্তা মুহূর্ত মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোকের ভিতর তাঁহার বক্তব্য ও মতামত ছড়াইয়া দিতে পারেন। বেতারব্যবস্থা সাধারণতঃ সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়। তাই (দেশের) রাজনৈতিক জনমত গঠনের ইহা বিশেষ সাহায্য করে না। তবে অন্যান্য বিষয়ে ইহার সাহায্য প্রায়ই পাওয়া যায়। আজকাল আন্তর্জাতিক জনমত গঠনে ইহা বিশেষ সাহায্য করিতেছে। পৃথিবীর বড় বড় লোকের বক্তব্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র বিশ্বের লোকের কাছে ছড়াইয়া পড়ে। তাই আন্তর্জাতিক জনমত গঠনের ইহা শ্রেষ্ঠ উপায়। আজকাল টেলিভিসন যন্ত্রের প্রচলন হইয়াছে। ইহাতে ভাষণের সঙ্গে বক্তার ছবিও দেখা

যায়। তাই ইহা বেতার অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ হইয়াছে। তবে ব্যয়সাধ্য বলিয়া অনেক দরিদ্র দেশ ইহা ব্যবহার করিতে পারে না।

চলচ্চিত্র বা যাত্রা-থিয়েটারের মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে জনমত গঠন করা খুবই সহজ হয়। আমাদের দেশে যখন সংবাদপত্রের বিশেষ প্রচলন হয় নাই তখন যাত্রা, থিয়েটার, কথকতা, গম্ভীরা, বক্তৃতা প্রভৃতি জনমত গঠনের বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। দীনবন্ধু মিত্রের নাট্যগ্রন্থ পাঠে নীলকরদের বিরুদ্ধে যতটা জনমত গঠিত হইয়াছিল তার চেয়ে শতগুণ বেশি জনমত গঠিত হইয়াছে এই নাটকের সার্থক অভিনয়ে। ইহার ফলেই একদিন নীলকরের অত্যাচার বন্ধ হইয়াছিল। গম্ভীরা বা কথকতা লোকের গোপন তথ্য গান বা ছড়ার মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়া দেয়। ইহার প্রকাশ ভঙ্গিমা এত চমৎকার যে নিরক্ষর লোকেরা সহজেই উদ্বুদ্ধ হয়। পরাধীন বাংলায় জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মহাশয়ের ম্যাজিক লণ্ঠনযোগে ভাষণ পল্লী অঞ্চলে জনমত গঠনের বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। ঠিক এইভাবে চলচ্চিত্র রচিত ও পরিচালিত হইলে বিশেষ কার্যকর হয়। সম্প্রতি ভারত ও রাজ্য সরকারগুলি কর্তৃক পরিচালিত ছায়াচিত্রগুলি জনসাধারণকে নানা বিষয়ে জ্ঞান দান করিতেছে। ইহার সাহায্যে লোকেরা দেশবিদেশের নানা খবর জানিতে পারিয়া নিজ নিজ মত গঠন করিতেছে।

জনমত গঠন ও প্রকাশের আর একটি প্রশস্ত উপায় হইল দলপ্রথা ও আইনসভা। রাজনৈতিক দলগুলি বিভিন্ন সমস্যা বাছিয়া লইয়া তাহা জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য নানা পন্থা গ্রহণ করে। প্রত্যেক দল তাহার নীতি ব্যাখ্যা করে, কারণ আইনসভায় যাইবার জন্য তাহাদের ভোট সংগ্রহ করিতে হয়। তাই তাহাদের অবলম্বিত নীতি জনসাধারণকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হয়। এই রাজনৈতিক দলের মারফতে সাধারণ লোক দেশের অনেক খবর পায় এবং মোটামুটি একটা মতও গ্রহণ করিতে পারে।

আইনসভার সভ্যেরা যে মত প্রকাশ করেন তাহাও দেশের সাধারণ মত। কারণ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি সভ্যেরা থাকেন এই আইনসভায়। তাঁহারা যে তর্কবিতর্ক বা যে আলোচনা করেন তাহা হইতে এই দেশের সাধারণ লোক সমস্যাগুলির বিভিন্ন দিক উপলব্ধি করিতে পারেন। তাই আইনসভাও জনমত গঠনের একটি উপায়।

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা

প্রাচীন ভারতের সভ্যতার মেরুদণ্ড ছিল গ্রামগুলি। এগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সত্যকার শান্তির নীড়। গ্রামবাসীর প্রয়োজন গ্রামের উৎপন্নদ্রব্যের দ্বারাই মিটান যাইত। ধনী-দরিদ্র সকলেই গ্রামে বাস করিতেন। কিন্তু এদেশে ইংরাজগণ আগমন করিবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামগুলি ধ্বংস পাইতে আরম্ভ করে। ইহার কারণ ইংরাজেরা শহর গড়িতে আরম্ভ করেন এবং শহরগুলি ক্রমে ক্রমে বেশ জমিয়া

উঠিতে আরম্ভ করিল। ইউরোপের যাবতীয় বিলাস সামগ্রী ভোগের ব্যবস্থা ছিল এই শহরগুলিতে। ধীরে ধীরে দেশের ধনিক শ্রেণী গ্রাম ছাড়িয়া শহরে চলিয়া আসিতে আরম্ভ করিল। শহরের যান্ত্রিক শিল্পের প্রতিযোগিতায় দেশের কুটিরশিল্পগুলি ধ্বংস পাইতে আরম্ভ করিল। গ্রামবাসীর আয় কমিতে আরম্ভ করে এবং কালক্রমে গ্রামগুলিতে অশিক্ষা, কুসংস্কার, দুর্ভিক্ষ, মহামারী এবং চরম দৈন্য দেখা দিল। এইভাবে ইংরাজগণ এদেশে আসিবার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পল্লীর শান্তির নীড়গুলি শ্মশানে পরিণত হইল।

ইহা সত্ত্বেও জাতির জীবনে গ্রামের গুরুত্ব হ্রাস পাইল না। আজিও শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি লোক এই গ্রামে বাস করে। জীবনধারণের জন্য ইহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ইহারা এত দৈন্যের মধ্যে বাস করে যে তাহা কোন সভ্য সমাজ কল্পনাও করিতে পারে না। ইহাদের মাথাপিছু মাসিক আয় ১৯৩৯ সালের অনুপাতে নয় টাকার বেশি হইবে না। এই সামান্য আয়ে অন্য সব খরচ করা ত দূরের কথা, দুই বেলা কোন লোকের পেট ভরিয়া খাওয়াও সম্ভব নহে। কোনমতে ইহারা প্রাণধারণ করিয়া থাকে। কবির ভাষায়,

> "শুধু দুটি অন্ন খুঁটি
> কোনমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
> রেখে দেয় বাঁচাইয়া"—(রবীন্দ্রনাথ)

ইহারা অর্ধবস্ত্র এমন কি বিবস্ত্র –মৃত্যু ইহাদের গৃহের নিত্য অতিথি। দিনের পর দিন অসুখে ভুগিবার ফলে ইহাদের দেহে অস্থিচর্ম ছাড়া আর কিছুই থাকে না। দেশের অধিকাংশ লোকেরই এই অবস্থা হইলে সে দেশ কখনই উন্নতি লাভ করিতে পারে না। এই ধরনের মুমূর্ষু জনতা দেশের দায়স্বরূপ।

এই অবস্থা হইতে দেশকে মুক্ত করিবার প্রয়োজনীয়তা রবীন্দ্রনাথের ন্যায় কয়েকজন দেশপ্রেমিক উপলব্ধি করিতে পারিলেও রাষ্ট্রনৈতিক বাধাই ছিল আমাদের চরম অন্তরায়। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট জাতির এক স্মরণীয় দিন। ঐ দিন এই বাধা অপসারিত হয়। দেশে রাষ্ট্রনৈতিক শৃঙ্খলা আনিবার পর নবীন ভারতের কর্ণধারগণ সর্বপ্রথম দৃষ্টি দেন জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির দিকে। তাঁহারা রচনা করিলেন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিশেষ। এই ধরনের পরিকল্পনা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অর্ধশতাব্দী পূর্বে শ্রীনিকেতনে কার্যকরী করিবার চেষ্টা করেন।

এই পরিকল্পনার চরম উদ্দেশ্য ভারতের পাঁচ লক্ষ ষাট হাজার গ্রামের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন। ইহার প্রধান সহায়ক 'পল্লী বা জাতীয় সম্প্রসারণ', গ্রামের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ইহার কাম্য, তাই ইহার কার্যব্যবস্থা সর্বার্থসাধনমূলক। তাছাড়া, গ্রাম্য

জীবনের সমস্যা এমনই যে একটি অপরটির সহিত বিশেষভাবে জড়িত। গ্রামের মৌলিক প্রয়োজনের ভিত্তিতেই সমাজে উন্নয়নের কার্যধারা রচনা করা হইয়াছে।

গ্রামবাসীর জীবিকার প্রধান অবলম্বন কৃষি। তাই উন্নত প্রণালীতে চাষ করিয়া ফসলের উৎপাদন বাড়াইবার দিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, গ্রামের রাস্তাঘাট সংস্কার করাও এই কর্মধারার লক্ষ্য। তৃতীয়তঃ গ্রামবাসীদের অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা। ইহা ছাড়া, গ্রামের লোকের স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থানের ব্যবস্থাও এই কর্মধারার অন্তর্গত। গ্রামের অর্থনৈতিক রূপান্তর ঘটাইবার জন্য প্রয়োজন, ধ্বংসের হাত হইতে কুটিরশিল্পগুলিকে বাঁচান। এই উদ্দেশ্যে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি সরবরাহ, কারিগরের দক্ষতা বাড়াইবার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা, কারিগরদের ঋণ দেওয়া, তৈয়ারি মাল বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা প্রভৃতিও করা হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, পল্লী জীবনের কোন বিষয়ই ইহাতে উপেক্ষিত হয় নাই।

গ্রামবাসীদের জন্য এই ধরনের কোন পরিকল্পনা সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে তাহাদের প্রেরণা ও প্রচেষ্টা একান্ত প্রয়োজন। গ্রামের বাহির হইতে রাজনীতিবিদ্ বা সরকারী কর্মচারীদের যাহাতে বিশেষ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। গ্রামে গ্রামে এই পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে সমাজ শিক্ষা নামে নূতন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইয়াছে। এই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য গ্রামবাসীদের সমাজসচেতন করিয়া তোলা। এই শিক্ষার ফলেই তাহারা উদাসীনতা ত্যাগ করিয়া সমাজ উন্নয়নের কাজে অগ্রসর হইবে। সুতরাং এই বহুমুখী পরিকল্পনা সার্থক করিতে আমাদের চিরাচরিত শাসনব্যবস্থা অপেক্ষা একটু নূতন ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রয়োজন। ফলতঃ করাও হইয়াছে তাহাই। এই পরিকল্পনার সর্বনিম্ন স্তর গ্রাম। পাঁচ হইতে দশটি গ্রামের জন্য গ্রামসেবক নামে একজন করিয়া কর্মী আছেন। গ্রামের সাধারণ সকল সমস্যা সম্বন্ধেই তাহাকে শিক্ষা দেওয়া হয়। সাধারণতঃ, একশটি গ্রাম লইয়া একটি উন্নয়ন ব্লক গঠন করা হয়। একটি ব্লকে ৬০ হইতে ৭০ হাজার অধিবাসী থাকে। একজন স্থায়ী সরকারী কর্মচারীর উপর এই ব্লকের তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী আছে। এই গোষ্ঠী গ্রাম-সেবকদের নানা বিষয়ে পরামর্শ দিয়া সাহায্য করিয়া থাকেন। নূতন ধরনের শিক্ষা অধিকর্তার নাম সমাজশিক্ষা প্রবর্তক। গ্রামবাসীদের অনুপ্রাণিত করিবার দায়িত্ব তাঁহারই। খেলাধূলা, নৃত্য, নাটক, প্রদর্শনী প্রভৃতি ক্রিয়াকর্মের দেখাশুনা তিনিই করেন। প্রায় তিন শত গ্রাম লইয়া একটি প্রজেক্ট গঠিত হয়। প্রজেক্ট দুই ধরনের—মূল ও মিশ্র। মূল প্রজেক্ট কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। মিশ্র প্রজেক্ট কৃষির উন্নতির সহিত কুটির শিল্প ও ছোট শহর গঠনের লক্ষ্যও আছে।

১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবর এই পরিকল্পনার উদ্বোধন করা হয়। ঠিক ইহার এক বৎসর পরে জাতীয় সম্প্রসারণ সার্ভিসের কাজ আরম্ভ হয়। গত ছয় সাত বৎসরে এই দুই পরিকল্পনার বিশেষ অগ্রগতি পরিলক্ষিত হইতেছে। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় এই বাবদ ৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল, ইহার মধ্যে মাত্র ৪৬ কোটি টাকা ব্যয় করা সম্ভব হইয়াছে। আর গ্রামবাসীরা বিনামূল্যে যে শ্রমদান করিয়াছেন তাহার মূল্য হইবে প্রায় ২৬ কোটি টাকা। উন্নয়ন এলাকায় উন্নত ধরনের বীজ, রাসায়নিক সার সরবরাহ করা হইয়াছে, বহু একর পতিত জমি চাষের উপযোগী করা হইয়াছে, ফল ও তরিতরকারির ফলনও অনেকাংশে বাড়িয়াছে। স্থানীয় রাস্তাঘাট ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের কাজে গ্রামবাসীদের বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়। শিক্ষা ব্যবস্থার বিশেষ প্রসার ঘটিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমাজ উন্নয়ন খাতে প্রায় ২০০০ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। স্থির হইয়াছিল যে ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে সমগ্র দেশকে এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। এই কয় বৎসর খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, গ্রাম-সেবকদের শিক্ষা প্রভৃতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল।

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার উপর সরকার এত গুরুত্ব আরোপ ও সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও ইহার কার্যকলাপ সংক্রান্ত অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি ক্রমশঃ ধরা পড়িতেছে। প্রথমতঃ কতকগুলি বিশেষ বিষয়ে উন্নতি দেখা গেলেও পতিত জমি উদ্ধার, কুটির শিল্পের উন্নয়ন, প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই। দ্বিতীয়তঃ, অনেকগুলি এলাকাতে লোকসংখ্যা এত বেশি যে উপযুক্ত কর্মচারীর অভাবে কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে না। তৃতীয়তঃ, অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ দেখা যাইতেছে যে গ্রামবাসীদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়া কাজে উদ্বুদ্ধ করা হয় পরে আর তাহা পূর্ণ করা হয় না। ফলে তাহাদের মধ্যে হতাশার ভাব দেখা দেয়। তাছাড়া, এখন দেখা যাইতেছে গ্রামবাসিগণ ক্রমশঃ আত্ম নির্ভরশীল না হইয়া সরকারের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িতেছে। ফলে পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হইতেছে।

এই সকল ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করিবার জন্য কিছুদিন পূর্বে সমাজ উন্নয়নের পুন-র্গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাতে সমবায় ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহায্যে উন্নয়নের কাজগুলি করাইবার চেষ্টা চলিতেছে। ইহা করিতে পারিলে হয়ত গ্রামবাসীরা পুনরায় উৎসাহিত হইতে পারে। এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমাদের সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে গ্রামের অধিবাসীরা যদি উৎসাহিত না হয় এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করিবার সংকল্প গ্রহণ না করে তবে পল্লীজীবনের কোন স্থায়ী উন্নতি সাধন করা সম্ভব নহে। সুতরাং বর্তমানে আমাদের এই দিকেই সমস্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হইলে ভারতের অধিকাংশ নরনারীর কাছেই স্বাধীনতার কোনই মূল্য থাকিবে না ইহা যেন আমরা সর্বদা স্মরণ রাখি।

ভারতের জাতীয় সংগীত

যে দেশের জাতীয় সংগীত নাই সে দেশ বড় দুর্ভাগা, প্রাণ থাকিতেও সে অসাড, সে সুপ্তিমগ্ন। জাতীয় সংগীত, এক মন্ত্রে, এক পুণ্যনামে দেশের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে, দেশবাসীকে একই লক্ষ্যে পৌঁছাইবার প্রেরণা দিয়া থাকে ; তাহার মুক্তি তাহার জাগৃতি আনে এই জাতীয় সংগীত। বৈদিক যুগের ঋষি যে দেশমাতৃকার বন্দনা গাহিয়াছিলেন, ইন্দ্রদেবের স্তুতিতে যে জাতীয় ঐক্যের উদ্বোধন করিয়াছিলেন ভারত তাহা বহুকাল ভুলিয়া গিয়াছে। ভারত শুধু তাহার জাতীয়-সংগীত ভুলে নাই. সে ভুলিয়াছিল তাহার অন্তরাত্মাকে। তাই মাঝে মাঝে সে পরাধীনতার গ্লানি সহ্য করিয়াছে। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পুর্ব পর্যন্ত প্রায় পৌনে দুই শত বৎসর ধরিয়া ভারত বৃটিশ শাসন ও শোষণের প্রভাবে জর্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রাম রূপ পরিগ্রহ করে।

জাতির জাগৃতি আনিতে হইলে চাই একই মন্ত্র, একই ভাবনা, একই মিলন-ক্ষেত্র, একই বাণী ('সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী'—ঋগ্‌বেদসংহিতা ১০।১৯২)। তাই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার ধ্যানে স্বদেশের দেবীমূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহারই বন্দনাগীতি "বন্দেমাতরম্" মন্ত্র সাহিত্যের মাধ্যমে প্রচার করিলেন। ইহা ১৮৮২ সালের কথা। বঙ্কিমচন্দ্র সরকারী চাকুরি করিতেন। তাঁহার পক্ষে বৃটিশ শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভবপর ছিল না, তাই স্বদেশের রাষ্ট্রীয় চেতনা জাগ্রত করিবার কার্যে 'আনন্দমঠ' গ্রন্থে তাঁহাকে এই গান প্রকাশ করিতে হইয়াছিল। ১৮৯৬ সালের কংগ্রেসের অধিবেশনে এই সংগীত সর্বপ্রথম প্রকাশ্য-ভাবে গীত হয় এবং ইহার দ্বারাই জাতীয় সংগীতরূপে এই গানের স্বীকৃতি লাভ হয়। এই গানের প্রারম্ভিক কয়েকটি পঙ্‌ক্তির যৎসামান্য আলোচনা করা যাইতেছে :—

"বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্
শুভ্র জ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্ ॥"

এই পঙ্‌ক্তি কয়টিতে দেশমাতৃকার সুখদ এবং বরদ রূপ কল্পিত হইয়াছে। ভারত আমাদের জন্মভূমি, তাই ভারত আমাদের মাতৃরূপা। ফল, জল এবং শস্য দ্বারা শত শত সন্তানকে তিনি পালন করেন। সূর্যের উত্তাপে ভারত তাপিত হইলেও দক্ষিণ হইতে প্রবাহিত মলয়পবনে দেশমাতা শান্ত ও স্নিগ্ধ। বৃক্ষে বৃক্ষে

তাঁর ফুলের শোভা, রাত্রিতে দেশজননী জ্যোস্নার প্লাবনে আনন্দময়ী। তাঁহার ভাষা সুমধুর। মাতৃভাষার মত সুন্দর ভাষা জগতে আর কোথাও মিলে না। এই ফলে জলে শস্যে পরিপূর্ণ দেশে বাস করাও দেবতার বরেই সম্ভবপর হয়। এ দেবতা এখানে দেশমাতৃকা। সুখসমৃদ্ধি, ভোগযুক্ত দেবতার কাছে বরস্বরূপ চাহিতে হয়। আমাদের দেশমাতৃকা না চাহিতেই এ সব বর দিয়া থাকেন। তাই তিনি যথার্থ বরদা।

কংগ্রেসের অধিবেশনে এই গান গাহিবার পর ইহা বাঙলার সীমায় আবদ্ধ রহিল না। যদিও বঙ্কিম এই গান 'বঙ্গমাতাকে' উদ্দেশ্য করিয়া রচনা করিয়াছিলেন তথাপি ইহা ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জাতীয় সংগীতরূপে গীত হইতে থাকিল। এই মাতৃমন্ত্রের উচ্চারণ করিয়া শহীদ ক্ষুদিরাম হইতে আরম্ভ করিয়া অগণিত স্বদেশ-সেবী দেশের স্বাধীনতা-যজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়াছেন, কত স্নেহবতী পুত্রহারা মাতা সন্তানের বিয়োগবেদনা নীরবে সহ্য করিয়াছেন, কত পত্নী স্বামীহারা হইয়াছেন, কত পরিবার বিদেশী শাসকের অমানুষিক অত্যাচারে লাঞ্ছনায় প্রপীড়িত হইয়াছে কে তাহার হিসাব রাখে।

এই 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রই একদিন আমাদের এই ঘুমন্ত জাতির হৃদয়ে প্রাণের জাগরণ আনিয়াছিল। হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের প্রায় চল্লিশ কোটি নরনারীর শিরায় উপশিরায় এই সংগীত রক্তচাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছিল। এই 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রই প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিশ সিংহের দন্তদর্প চূর্ণ করিয়া পরিণামে তাহার ভারত ত্যাগের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল। এ মন্ত্র ভারতবাসী, বিশেষতঃ বাঙালী কিছুতেই ভুলিতে পারে না। বাঙ্‌লার বুকে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের সময়েই এই মন্ত্রের দ্বারাই বৃটিশ রাজশক্তিকে জানান হইয়াছিল এখানে তাহাদের রাজত্ব চিরস্থায়ী হইবে না। 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে। এ ঐতিহ্যকে ভোলা যায় না।

সুরসংযোগে অসুবিধা হয় বলিয়া "বন্দেমাতরমের" পরিবর্তে ১৯৫০ সালের ২৪শে জানুয়ারী তারিখে রবীন্দ্রনাথের "ভারতবিধাতা" গানটি ভারত প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সংগীত হিসাবে গৃহীত হইল—"বন্দেমাতরম্" রহিল না। এই গানটি ১৯১১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে সর্বপ্রথম গীত হয়। ইহা ১৩১৮ সালের 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল (১৯১২ জানুয়ারী)। ঐ বৎসর মাঘোৎসবেও উহা গীত হয়। ইংরাজী ১৯১৯ সালে কবি স্বয়ং ইহার ইংরাজী অনুবাদ করেন ভারতের প্রভাত সংগীত Morning Song of India নাম দিয়া। মূল গানটির পাঁচটি স্তবক আছে। ইহার প্রথম স্তবকটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধিতরঙ্গ

তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥"

এই স্তবকটি সৈন্যবিভাগ গ্রহণ করিয়াছে এবং সভাসমিতিতে সাধারণতঃ ইহা গীত হয়।

'জনগণমন' গানটি জাতীয় সংগীত হিসাবে গৃহীত হইলেও 'বন্দেমাতরম্' সংগীতকে জাতীয় সংগীতের সমমর্যাদা দান করা হইয়াছে। সভাসমিতিতে বা রাষ্ট্রীয় উৎসবের শুরুতে 'জনগণমন' গীত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সভার শেষে 'বন্দেমাতরম্' গীত হয়।

মেট্রিক পদ্ধতি

১৯৫৮ সালের ১লা অক্টোবর হইতে আমাদের দেশে দশমিক ওজন পদ্ধতি প্রবর্তন করা হইয়াছে। এই পদ্ধতির আন্তর্জাতিক নাম মেট্রিক পদ্ধতি। ইহার দেড় বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাস হইতে দশমিক মুদ্রা প্রবর্তন করা হইয়াছে এবং আগামী দশ বৎসরের মধ্যে দেশের সর্বত্র দশমিক মুদ্রা, ওজন ও পরিমাপ পদ্ধতি প্রবর্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে।

আপাতদৃষ্টিতে মেট্রিক পদ্ধতিকে বিদেশী বলিয়া মনে হইলেও ইহা সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়। আজ হইতে প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে একজন অজ্ঞাতনামা ভারতীয় মনীষী 'শূন্য' আবিষ্কার করেন। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের কয়েক শতাব্দী পরে আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীধর প্রমুখ ভারতীয় বিজ্ঞানিগণ দশমিক পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। পাশ্চাত্ত্য দেশের বড় বড় মনীষী শ্রদ্ধাভরে স্বীকার করিয়াছেন যে, এই ভারতীয় দশমিক পদ্ধতিই গণিতশাস্ত্রকে একটা প্রথম শ্রেণীর শাস্ত্রের মর্যাদা দান করিয়াছে। এই পদ্ধতিতে কোন পূর্ণসংখ্যা অংকের মূল্য সংখ্যার মধ্যে উহার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। ডানদিকের শেষ সংখ্যা একক, তারপরে বাঁয়ে দশক, এইভাবে যতই বাঁয়ের দিকে চলা যাইবে মূল্য ততই বাড়িবে। ইহার পর ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে দশমিক বিন্দু আবিষ্কৃত হওয়াতে অংক কষা আরো সহজ হইয়া গেল। এখন এই দশমিক বিন্দুটি স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অংকের মূল্য পরিবর্তিত হয়। বিন্দুটি বাঁয়ে সরাইলে মূল্য কমিবে আর ডাইনে সরাইলে মূল্য বাড়িবে। সুতরাং ইহার সাহায্যে গুণ ও ভাগ দুইই করা যায়। অথচ ইহাতে কোন ভগ্নাংশ থাকে না। ইহার আদৌ প্রয়োজন হয় না।

এই প্রথায় ওজন ও পরিমাপের পদ্ধতির আন্তর্জাতিক নাম মেট্রিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ওজন ও পরিমাপের প্রাথমিক ইউনিট-এর নাম মিটার। প্যারিস শহরের নিকট অবস্থিত আন্তর্জাতিক মেট্রিক কমিসনের মহাফেজখানায় রক্ষিত প্লাটিনাম-ইরিডিয়াম খাদের একটি দণ্ডের উপর দুইটি রেখা খোদিত আছে। এই

দুইটির দূরত্বের পরিমাপই মিটার। এই মিটারকে প্রাথমিক একক ধরিয়া উহাকে পর্যাযক্রমে দশগুণ করিয়া অথবা দশমিক ভাগ করিয়া দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা হয়। এই পদ্ধতিকেই মেট্রিক পদ্ধতি বলা হয়। দশগুণ বুঝাইতে 'ডেকা', শতগুণ বুঝাইতে 'হেকটা', সহস্রগুণ বুঝাইতে 'কিলো', এই গ্রীক শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়। আবার ভাগ করিবার সময় 'ডেসি' (এক-দশমাংশ), 'সেন্টি' (এক-শতাংশ) ও 'মিলি' (এক-সহস্রাংশ) এই ল্যাটিন শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়। এক মিটারের একশত ভাগের ঘন পরিমাপের সমান জলকে এক গ্রাম জল বলা হয়। ওজনের পক্ষে গ্রাম এত ছোট ইউনিট যে ইহা সাধারণতঃ ব্যবহার না করিয়া 'কিলোগ্রামকেই ওজনের ইউনিট ধরা হয়। এক কিলোগ্রাম জল যে স্থানকে অধিকার করিয়া থাকে তাহাকে 'লিটার' বলা হয়। এই পদ্ধতিতে হিসাবের খুব সুবিধা হয়। ইহাতে কোন ভগ্নাংশ থাকে না। এবং মুখে মুখেই হিসাব করা যায়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ফরাসাদেশ এই পদ্ধতি গ্রহণ করে। ইহার পর একে একে পৃথিবীর ৫৭টি দেশ উহা গ্রহণ করিয়াছে।

আমাদের দেশে ১৯৫৮ সালে মেট্রিক পদ্ধতির প্রবর্তন করা হইলেও ইহার প্রায় একশত বৎসর পূর্বে ওজন ও পরিমাপ ব্যবস্থার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। এতকাল এখানে ওজন ও পরিমাপের সর্বভারতীয় সুনির্দিষ্ট কোন মান ছিল না। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইহার মান ছিল বিভিন্ন প্রকারের। শুধু কি তাই, একই স্থানের নানাপ্রকার দ্রব্যের জন্য নানা ধরনের মান ব্যবহৃত হয়। আবার একই নামেব মাপ বিভিন্ন পরিমাণ বুঝায়। অনুসন্ধানে প্রকাশ যে, এগার শত গ্রামে ১৪৩ রকমেব ওজন ও পরিমাপ পদ্ধতি চালু আছে। আয়তন ও জমির ক্ষেত্রফল পরিমাপের পদ্ধতির সংখ্যা ইহা অপেক্ষাও বেশি। আবার কোন একটি বিশেষ মাপ বা ওজনের পদ্ধতি কোন একটি বিশেষ অঞ্চলে প্রচলিত থাকিলেও ঐ অঞ্চলের বিভিন্ন জেলায়, মহকুমায় এমন কি বিভিন্ন অঞ্চলে একশতেরও বেশি রকমের মণ প্রচলিত আছে। এই মণ স্থান বিশেষে ২৮০ তোলা হইতে ৮৩২০ তোলা বুঝায়। আর ঠিক এইভাবে সের বলিতে ৮ তোলা হইতে ১৬০ তোলা বুঝায়। জমি মাপের ক্ষেত্রেও ঠিক এই ধরনের সমস্যা। বিঘা এবং কাঠা বলিতে দেশের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন পরিমাপ বুঝায়।

ওজন ও পরিমাপের এই বৈষম্যহেতু ভীষণ গোলমাল ও অসুবিধার সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন স্থানে ওজনের তারতম্য হেতু দরিদ্র কৃষকেরা নিজ নিজ রাজ্যের ও অন্যান্য রাজ্যের হাটে বা বাজারে উৎপন্ন দ্রব্যের ন্যায্য মূল্য পায় না। স্থানীয় ওজনের উপর ভিত্তি করিয়া পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বাটখারার সহিত যাহারা বিশেষভাবে পরিচিত একমাত্র তাহাদের পক্ষেই এ দর বুঝা বিশেষ সহজসাধ্য ব্যাপার। এই সুযোগ লইয়া পাইকার, ফড়িয়া বা ব্যবসায়ীরা দরিদ্র কৃষকদের প্রতিনিয়ত ঠকায়। আর কৃষকেরাই বা কেন, খুব শিক্ষিত লোকেও এই হিসাব চট করিয়া ধরিতে পারে না। কেবলমাত্র যে

ক্রেতাকেরাই ঠকে তাহা তবে, ইহার ফলে ক্রেতা সব সময় বিক্রেতাকে সন্দেহের চক্ষে দেখে। তাই নানাপ্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা প্রত্যেক দিনই ঘটিতে দেখা যায়। এই গোলযোগের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে দেশের সর্বত্র সহজ, সরল ও এক ধরনের ওজন ও মাপের প্রবর্তন করা দরকার।

১৮৭১ সালে সর্বপ্রথম ভারত সরকার এই সমস্যা দূর করিবার জন্য একটি আইন প্রণয়ন করেন।। ইহা নানা কারণে কার্যকরী করা সম্ভব হয় নাই। ঐ বৎসর হইতে ১৯৫৮ সাল—এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বহু কমিটি ও প্রতিষ্ঠান এই সংস্কারের কথা বলেন। পরিকল্পনা কমিশন দ্বিতীয় পরিকল্পনার রিপোর্টে সমস্যাটির গুরুত্বের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইহার ফলেই ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাস হইতে মেট্রিক পদ্ধতি চালু করা সম্ভব হয়। ইহার পূর্বেই ব্যাপক সংস্কারের পরিকল্পনার প্রথম ধাপ হিসাবে মুদ্রাব্যবস্থার সংস্কার করা হইয়াছিল।

ওজন ও পরিমাপ ব্যবস্থার সংস্কারে কাহারও আপত্তি নাই। তবে অনেকেই মেট্রিক পদ্ধতি গ্রহণে আপত্তি তুলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, সর্বভারতের জন্য মণ, সের, ছটাক, তোলা প্রভৃতির মান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেই চলিত, অপরিচিত মেট্রিক পদ্ধতির কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এই যুক্তির কোন সারবত্তা নাই। কারণ ভারত একটি বিরাট দেশ, ইহার এক এক অঞ্চলে এক একটি প্রথা প্রচলিত। উত্তর ভারতে সকলেই মণ, সের প্রভৃতি বুঝে, কিন্তু দক্ষিণ ভারতে ইহা অচল। তাই উহা গ্রহণ করিলে দক্ষিণ ভারতের লোকদের অসন্তুষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাছাড়া, মণ, সের দেশের হাটবাজারে চলিলেও শিক্ষা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উহা অচল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। তাছাড়া, ইংরেজী পদ্ধতিগুলির অসুবিধা ইহাতে থাকিয়াই যাইবে, নূতন কোন সুবিধা পাওয়া যাইবে না।

সুতরাং মেট্রিক পদ্ধতি গ্রহণে আমাদের কি সুবিধা হইবে তাহা আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, মিটার, লিটার এবং গ্রাম প্রভৃতি ইউনিটগুলির সম্বন্ধ খুবই সরল। এই প্রথায় ভাগ ও গুণ করা খুবই সহজ হয়। ইংরেজী প্রথা অনেক জটিল। কিন্তু নূতন পদ্ধতিতে কোন ভগ্নাংশ থাকে না। অর্থাৎ এই প্রথায় হিসাব করা খুবই সহজ। ইহাতে প্রায় শতকরা ১৫ ভাগ সময় কম লাগিবে। দ্বিতীয়তঃ, বিজ্ঞান বা ইঞ্জিনীয়ারিং ক্ষেত্রে মেট্রিক পদ্ধতি বিশেষ সাফল্যের সহিত ব্যবহৃত হইতেছে এবং ইংরেজী পদ্ধতি একেবারেই অচল। বিজ্ঞানের সহিত কৃষি, পরিবহন, খনিজ, শিল্প প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় ঐ সকল ক্ষেত্রেও মেট্রিক পদ্ধতির গুরুত্ব খুব বেশি। তৃতীয়তঃ, ইহাতে দেশী ও আন্তর্জাতিক ব্যাণিজ্যের ক্ষেত্রে হিসাবের সুবিধা হইবে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই এ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকা এই ব্যবস্থা গ্রহণ না করাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমাদের অসুবিধা হইবে এইরূপ মনে করা ঠিক নহে। কারণ ঐ দুই দেশের বেশির ভাগ বাণিজ্য ঘটিয়া থাকে মেট্রিক পদ্ধতির দেশগুলির সহিত, উহাদের যদি কোন অসুবিধা না হয় তবে আমাদেরই বা হইবে কেন?

ইংলণ্ডে এই পদ্ধতি গ্রহণের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু রক্ষণশীল লোকেরা ইহার বিরুদ্ধে রায় দেয়। আজ ইংলণ্ড বা আমেরিকা এত বেশি শিল্পোন্নত হইয়াছে যে উহা গ্রহণ করিতে গেলে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। তা ছাড়া যুগ যুগ ধরিয়া দেশের সর্বত্র একই ধরনের মাপ ও ওজন প্রচলিত থাকায় উহাদের কোন অসুবিধা হয় নাই। অধিকাংশ দেশেই শিল্পোন্নতির মুখে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। ভারত শিল্পোন্নতির পথে কেবল যাত্রা শুরু করিয়াছে। তাই আমাদের ব্যবস্থাও সময়োচিত হইয়াছে। পরিশেষে, বর্তমানের বিভিন্ন প্রকারের ওজন ও পরিমাপের ফলে আমাদের দেশে ছাত্রসমাজের কর্মশক্তির যে অপচয় ঘটিতেছে তাহা বন্ধ হইবে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে এখন অঙ্ক কষিতে ছাত্রদের যে সময় লাগে, মেট্রিক পদ্ধতি চালু হইলে তাহাদের শতকরা ২০ ভাগ সময় বাঁচিবে।

এই পদ্ধতির অনেক সুবিধা আছে সত্য, কিন্তু দেশের সর্বত্র উহা চালু করিতে গেলে কয়েক কোটি টাকা ব্যয় হইবে। সেইজন্য অনেকেই বলিয়াছেন এই টাকা এখন ব্যয় না করিয়া যে ব্যবস্থা চালু আছে তাহা রাখিলে চলিত। দেশ ক্রমশ শিল্পোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, তাই আমরা যত দেরিতে ইহা গ্রহণ করিব ততই আমাদের খরচ বাড়িবে এবং ঝঞ্ঝাট বেশি দেখা যাইবে। উহা দ্রুত গ্রহণ করিলে গোলযোগ হইতে পারে। সেজন্য ও খরচ হ্রাস করিবার জন্য এই ব্যবস্থা ধীরে ধীরে দেশের সর্বত্র প্রবর্তন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। হাটে বাজারে উহা এখনও পূর্ণভাবে প্রচলিত হয় নাই, ক্রমশঃ হইবে।

ভারতের কৃষিব্যবস্থা

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। এখানকার জনসংখ্যার শতকরা সত্তর ভাগেরও বেশি কৃষিজীবী। আমাদের মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৪৫ ভাগের বেশি আসে কৃষি হইতে। সুতরাং এই কৃষির সাফল্যের সহিত আমাদের জাতীয় জীবন বিশেষভাবে জড়িত।

আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান হইলে কি হইবে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের উৎপাদনের পরিমাণ অনেক কম। জমিচাষের ব্যবস্থা এখানে বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ। অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশের জমিও উর্বর। তবে অনবরত কর্ষণের ফলে এই উর্বরাশক্তি ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। এখানকার জোতগুলি খণ্ডিত ও অসংবদ্ধ। কৃষকেরা কৃষিকার্যের অতি প্রাচীন সরঞ্জাম ব্যবহার করে। তাহারা হাতে বীজ ছড়ায় ও কাঠের লাঙ্গল কঠিন জমিকে কোন মতে আলোড়িত করে। সেই প্রাচীন কালের কাস্তের দ্বারা শস্য কাটে, আর বলদ দিয়া উহা মাড়ায়। ভারতের অধিকাংশ জমিই শুষ্ক—পর্যাপ্ত পরিমাণে সেচের জল পায় না। অনিশ্চিত বর্ষার উপর জলের জন্য নির্ভর করিতে হয়। এই সকল কারণে

ভারতবর্ষে বিঘা প্রতি ফসলের উৎপাদন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। আমাদের দেশে এক একর জমিতে যত ধান হয়, জাপানে তাহার চার গুণ ধান হয়; আবার এখানে এক একর জমিতে যে পরিমাণ গম উৎপন্ন হয়, ক্যানাডাতে সেই জমিতে দ্বিগুণ গম উৎপন্ন হয়।

ভারতের ফসলের স্বল্প উৎপাদনের জন্য মূলতঃ আমাদের জমিকে দায়ী করা যায় না। কারণ এদেশে এমন জমি আছে যেখানে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ফসল অনেক বেশি হয়। ইহার জন্য আমাদের চাষের ব্যবস্থা বা কৃষি সংগঠনই দায়ী। জমির ক্ষুদ্রাকৃতি, অসংবদ্ধতা, চাষের প্রাচীনপন্থা, জল ও সারের অভাব, নিম্নস্তরের বীজ ও ত্রুটিপূর্ণ ভূমিব্যবস্থা ইহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইগুলি ছাড়া কৃষিব্যবস্থার আরো অনেকগুলি ত্রুটি আছে। কৃষির উন্নতি করিতে গেলে মূলধনের প্রয়োজন। কৃষকেরা অত্যন্ত গরিব। তাই অতি চড়া সুদে গ্রামের মহাজনদের নিকট হইতে তাহারা ধার করে। ফলে কৃষকেরা ঋণে জর্জরিত হইয়া পড়িয়াছে। কৃষির কোন উন্নতি করিবার মত তাহাদের সঙ্গতি নাই। তাছাড়া এই ঋণগ্রস্ত কৃষকেরা টাকা শোধ করিতে পারে না বলিয়া শস্য ঘরে উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে নামমাত্র দরে বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হয়। শস্য বিক্রয়-ব্যবস্থারও অনেক ত্রুটি আছে। পাইকার বা ফড়িয়ারা সুযোগ বুঝিয়া কৃষকদের নানা ভাবে ঠকাইয়া থাকে।

ইহা ছাড়া, পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির কৃষকদের মত আমাদের কৃষকদের কোন সহকারী পেশা নাই। ফলে তাহারা সারা বৎসরই জমির উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। বৎসরের মধ্যে প্রায় সাত মাস তাহাদের কোন কাজ থাকে না।

আমাদের কৃষিব্যবস্থার উন্নতি করিতে হইলে ছোট ছোট জোতগুলিকে বড় বড় জোতে পরিণত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ঐকত্রিক চাষ অথবা আইন দ্বারা এইগুলিকে পুনর্গঠিত করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, কৃষকেরা যাহাতে জমির উন্নতি করিতে উৎসাহিত হয় এজন্য ভূমিস্বত্বের স্থায়িত্ব বিধান করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, জমির ক্ষয়রোধ করিবার জন্য বনসংরক্ষণ ও অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। জমি যাহাতে নিয়মিত জল পায় সেইজন্য সেচব্যবস্থার ব্যাপক সম্প্রসারণ ও উন্নতি করিতে হইবে। কৃষকদের মধ্যে বীজ ও সার বণ্টনের দায়িত্ব সরকারকে নিজহস্তে গ্রহণ করিতে হইবে এবং মাঝে মাঝে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা তাহাদের বুঝাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। চতুর্থতঃ, কৃষি মূলধন সরবরাহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতিগুলির ব্যাপক সম্প্রসারণ প্রয়োজন। শুধু তাহাই নহে, পাইকার ও ফড়িয়াদের হাত হইতে তাহাদের রক্ষা করিবার জন্য সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতির সাহায্য লইতে হইবে। পল্লী অঞ্চলে সমবায় ব্যবস্থার ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটাইতে পারিলে আমাদের কৃষিব্যবস্থার অনেক ত্রুটিরই সমাধান করা সম্ভব।

সর্বোপরি প্রযোজন কৃষকদের শিক্ষিত করিয়া তোলা। তাহাদের কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা শিখাইলেই চলিবে না। কৃষিবিদ্যা, বিশেষ করিয়া নূতন ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া কিভাবে কৃষির উন্নতি করা যায়, সে শিক্ষাও তাহাদের দিতে হইবে।

অর্থাভাব এবং অজ্ঞতার জন্য কৃষকেরা অদৃষ্টবাদী হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেক কুসংস্কার প্রবেশ করিয়াছে। পূর্বে বর্ণিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করিলে তাহারা ধীরে ধীরে কৃষির উন্নতি সাধন করিতে উৎসাহী হইবে। আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, আমাদের দেশে কৃষির বর্তমান দুরবস্থার প্রধান কারণ কৃষকের নৈপুণ্যের অভাব নহে, তাহারা যে আবহাওয়া ও অবস্থার মধ্যে বাস করে উহাই মূলতঃ দায়ী।

ভারতীয় শিল্পের ক্রমোন্নতি

(ভারতের শিল্পোন্নতি)

পাশ্চাত্য দেশে শিল্প-বিপ্লব ঘটিবার বহু শতাব্দী পূর্বে ভারত তাহার শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল, বাণিজ্যেও সে তখন জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিত। বিদেশের বাজারে ভারতের শিল্পজাত দ্রব্যের তখন বিশেষ চাহিদা ছিল। কিন্তু ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই ভারতের শিল্পগুলি দ্রুত ধ্বংস পাইতে থাকে। ইংরেজ শাসকগণ ইংলণ্ডের বাজারে ভারতের সূতিবস্ত্র বিক্রয় আইন করিয়া বন্ধ করিয়া দিল। শুধু তাহাই নহে, ইংরেজগণ ভারতীয় শিল্পীদের উপর নির্মম অত্যাচার চালাইতে আরম্ভ করিয়া দিল, বিলাতী শিল্পজাত দ্রব্য দিয়া ভারতের বাজার ভরিয়া ফেলিল। ভারতের শিল্পীগণ ক্রমশঃ কর্মহীন হইয়া পড়িল, শিল্পসমৃদ্ধ ভারত ক্রমে ক্রমে কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত হইল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে দুই-একটি যান্ত্রিক শিল্পের উদ্ভব হইলেও ভারতের শিল্পোন্নতির প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ হয় ১৮৫০ সালের পর হইতে। এই সময়ে ভারতীয় মূলধনে কয়েকটি সূতিকল, চটকল ও কয়লাখনি স্থাপিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের উন্নত শিল্প বলিতে এই তিনটিকেই বুঝাইত। এই সময়ের মধ্যে অবশ্য দেশে কাগজ, চামড়া প্রভৃতির কারখানাও স্থাপিত হয়। ১৯০৮ সালে ভারতে সর্বপ্রথম ভারতীয় মূলধনে আধুনিক লোহ ও ইস্পাতের কারখানা স্থাপিত হয়। বলা বাহুল্য, দেশে উন্নত ধরনের লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা না থাকিলে শিল্পোন্নতি ঘটিতে পারে না। প্রথম মহাযুদ্ধ এবং ১৯২২ সালে গৃহীত বিচারমূলক সংরক্ষণ দানের নীতি ভারতের শিল্পোন্নয়নের বিশেষ সাহায্য করে। ১৯২২ এবং ১৯৩২ সালের মধ্যে সূতিবস্ত্রের উৎপাদন দ্বিগুণেরও বেশি, ইস্পাত ৮ গুণ এবং কাগজের উৎপাদন আড়াই গুণ বাড়িয়া ছিল। চিনি এবং সিমেন্ট শিল্প, ভারতের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইতে সমর্থ হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতীয় শিল্পগুলি তাহাদের উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ

সদ্ব্যবহারের সুযোগ পায় এবং দেশে সেলাইকল, কস্টিক সোডা, বাইসাইকেল, ঔষধ, মেসিনটুল, ডিজেল এঞ্জিন প্রভৃতি নানা প্রকার নূতন কারখানা স্থাপিত হয়। এরোপ্লেন ও জাহাজ মেরামতের কারখানাও এই সময়ে স্থাপিত হয়। ইহার ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে ভারত পৃথিবীর প্রধান আটটি শিল্পোন্নত দেশের একটি বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু ভারতের আয়তন, জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদের বিচার করিলে আজও ভারতকে একটি অনুন্নত দেশ বলা হয়। শান্তি স্থাপনের পরবর্তী কয়েক বৎসর ভারতীয় শিল্প এক চরম সংকটের সম্মুখীন হয়।

১৯৪৮ সালের শিল্পনীতিতে ভারত সরকার শিল্পের পরিকল্পিত উন্নয়নের দায়িত্ব ঘোষণা করে এবং ১৯৫১ সাল হইতে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আরম্ভ হয়। এই পরিকল্পনার যুগ হইতেই ভারতীয় শিল্পগুলি পুনরায় উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির উন্নতির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়, মোট ধন-বিনিয়োগের মাত্র শতকরা ৮ ভাগ শিল্প ও খনিজের উন্নতির জন্য বরাদ্দ করা হয়। শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহারের প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হয়। তবে এই যুগে পেনিসিলিন, ডি-ডি-টি, নিউস্‌প্রিণ্ট প্রভৃতি নানা প্রকার নূতন জিনিস সর্বপ্রথম ভারতে উৎপন্ন হয়। সিন্ত্রি কারখানা, চিত্তরঞ্জনের ইঞ্জিন কারখানা, রেল বগি তৈয়ারি কারখানা, টেলিফোন তৈয়ারির কারখানা স্থাপনের কাজও এই সময়ের মধ্যে শেষ হয়। পাঁচ বৎসরে মোট পণ্যের উৎপাদন প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় দ্রুত শিল্পোন্নয়নের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছিল। এই পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের জন্য এগার শত কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হইয়াছে। দ্রুত শিল্পোন্নয়ন করিতে হইলে দেশে কতকগুলি মূল ও ভারী শিল্প থাকা প্রয়োজন। লৌহ ও ইস্পাত, এলুমিনিয়ম, রাসায়নিক প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ভারতে এই শিল্পগুলি গড়িয়া উঠিলে দ্রুত শিল্পোন্নয়নের পথ প্রশস্ত হইবে। কারণ এই যন্ত্রপাতি নির্মাণ-শিল্পগুলিকে কেন্দ্র করিয়া দেশে অসংখ্য ছোট ও মাঝারি ধরনের শিল্প গড়িয়া উঠিবার সুযোগ পাইবে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিল্পোন্নতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় শিল্পখাতে প্রায় ১৫২০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। আগামী পাঁচ বৎসরে প্রধানতঃ মূলধন ও যন্ত্রপাতি উৎপাদন শিল্পগুলির উন্নতি করা হইবে। এই সকল শিল্প দেশে প্রতিষ্ঠিত হইলে ভবিষ্যতে বাহিরের সাহায্য গ্রহণ না করিয়াও দ্রুত শিল্পোন্নতি করা সম্ভব হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইবার সময় হইতেই পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। যুদ্ধের সময় বাংলাদেশের এই অংশের বিশেষ ক্ষতি হয়। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় কৃষি ও যোগাযোগ

ব্যবস্থার উন্নতির কথা বিশেষভাবে চিন্তা করা হয়। ১৯৪৭ সালে বঙ্গদেশ বিভক্ত হইল। পশ্চিমবঙ্গের ভাগে পড়িল মাত্র ৩০,৭৭৫ বর্গমাইল (রাজ্য পুনর্গঠনের পর ইহার আয়তন ৩৪,৯৪৪ বর্গমাইল)। ইহার জনসংখ্যা ছিল মাত্র দুই কোটি। চটকলগুলি সবই পশ্চিমবঙ্গে রহিয়া গেল, আর এই শিল্পের কাঁচামাল পাট উৎপাদনের ক্ষেত্রগুলি অধিকাংশই পূর্ববঙ্গে চলিয়া গেল।

দেশ বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের এক বিসদৃশ রূপ দেখা দিল। উত্তরবঙ্গ দুই খণ্ডে বিভক্ত—ইহাদের মধ্যে কোন যোগাযোগের ব্যবস্থা নাই। আবার দক্ষিণবঙ্গের দশটি জেলা উত্তরবঙ্গ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। ইহার উপর দলে দলে লোক পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া এখানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল (প্রায় ৪০ লক্ষ লোক)। এইরূপ এক সংকটের সময় পশ্চিমবঙ্গের পুনর্গঠনের কাজ আরম্ভ হয়। রাজকোষ তখন শূন্যপ্রায়। একদিকে শরণার্থী সমস্যা, অন্যদিকে ব্যবসাবাণিজ্য ও শাসনকার্য পরিচালনার জন্য রাস্তাঘাটের অভাব। এরূপ অবস্থায় সরকারের পক্ষে বিচলিত হওয়াই খুব স্বাভাবিক। রাজ্যের যাহা কিছু সঙ্গতি আছে তাহাই সম্বল করিয়া পুনর্গঠনের কাজে নামিতে হইবে এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া পশ্চিমবঙ্গ পরিকল্পনার কাজে অগ্রসর হয়। যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনার কতকগুলি পরিকল্পনা তখনও অসমাপ্ত ছিল, পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কতকগুলি রদবদল করা প্রয়োজন এবং কতকগুলি নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। নূতন পরিকল্পনার মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনর্গঠন বিশেষ করিয়া উত্তর ও দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে স্থলপথে যোগাযোগ এবং খাদ্যের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য সেচব্যবস্থার সম্প্রসারণ বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। সমস্যা ছিল প্রচুর, কিন্তু সবগুলিতে একসঙ্গে হাত দিবার মত তখন অবস্থা বা সঙ্গতি কিছুই ছিল না। পরিকল্পনা কমিসনের সহিত পরামর্শ করিয়া ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ের একটি পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করে। ইহা অবশ্য সর্বভারতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অঙ্গবিশেষ। শেষ পর্যন্ত ইহার ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া ৭৭ কোটি টাকা দাঁড়ায়। ১৯৬১ সালের মার্চ মাসে দ্বিতীয় পরিকল্পনার কাজ শেষ হইয়াছে এবং এপ্রিল হইতে তৃতীয় পরিকল্পনার কাজ শুরু হইয়াছে।

এইবার প্রথম দুইটি পরিকল্পনার ফলে পুনর্গঠনের কাজ কতটা অগ্রসর হইয়াছে তাহা আলোচনা করা যাক। প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি ও সেচব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রায় ২০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। ইহার ফলে প্রায় ২৫ লক্ষ টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন করা সম্ভব হইয়াছে। ৩০ হাজার একক পতিত জমিও চাষের উপযোগী করিয়া তোলা হইয়াছে। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার ফলে অতিরিক্ত ৪·৬৭ লক্ষ একর জমি সেচের জল পাইয়াছে এবং সোনারপুর আরাপাঁচ পরিকল্পনার ফলে ৩৬ বর্গমাইল ধানের জমি রক্ষা করা হইয়াছে। খাদ্যের উৎপাদন জটিল হইয়া পড়িতেছে। এইজন্য

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই খাতে ব্যয় আরো বাড়ান হইয়াছে। এই পরিকল্পনার শেষে এই রাজ্যের মোট সিঞ্চিত জমির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৭ লক্ষ একরেরও বেশি। ইহার ফলে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য ফসলের উৎপাদন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কৃষি ও সেচ উন্নয়ন পরিকল্পনার ফলে অতিরিক্ত ৬'৫৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য, ১'৪০ লক্ষ টন আখ, ৮'৫১ লক্ষ টন পাট উৎপন্ন হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে কৃষির অবনতির একটি প্রধান কারণ ভূমিক্ষয়। এই ভূমিক্ষয় রোধ করিতে হইলে বনসংরক্ষণের প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে এই দুই পরিকল্পনায় প্রায় আড়াই কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। বনসংরক্ষণ ও নূতন বন তৈয়ারি এবং ভূমি সংরক্ষণের কাজ বেশ কিছুটা অগ্রসর হইয়াছে।

ইহার পর সমাজ-উন্নয়নের কথা বলিতে হয়। এখানকার সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য এই যে গ্রামদেশের কতকগুলি অঞ্চলের সকল অধিবাসীর সকল রকমের বৈষয়িক ব্যাপারে একসঙ্গে উন্নতি করা। প্রথম পরিকল্পনার মোট এইরূপ আটটি এলাকায় কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে। ১৯৬৩ সালের শেষে পশ্চিমবঙ্গের সকল পল্লীর অধিবাসীরাই ইহার সুযোগ পাইবে। ইহাতে পল্লী অঞ্চলের সকল প্রকার সমস্যার প্রতিকারের ব্যবস্থা আছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই খাতে প্রায় ৯'২৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়।

শিল্প ও বিদ্যুতের ক্ষেত্রেও পুনর্গঠনের কাজ কিছুটা অগ্রসর হইয়াছে। এই দুই খাতে প্রথম পরিকল্পনায় প্রায় দুই কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রায় ২১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। প্রথম পরিকল্পনার শেষে উত্তর কলিকাতা গ্রামাঞ্চল বিদ্যুৎ পরিকল্পনার ফলে প্রায় ১০৫৩ মাইল বিদ্যুৎ সরবরাহের লাইন বসান হইয়াছে। ইহার ফলে বহু গ্রামে বিদ্যুৎ পাইবার সুযোগ ঘটিয়াছে। প্রয়োজনমত, এই বিদ্যুৎ কুটিরশিল্প, বড় শিল্প বা অন্যান্য কাজে লাগান যাইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফলে অতিরিক্ত ৮০০ মাইল লাইন বসাইবার ফলে প্রায় ৬২টি গ্রাম এবং ২৭টি শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হইবে। প্রথম পরিকল্পনায় দেশলাই, খাদি, গুড়, কাগজ প্রভৃতি কতকগুলি কুটিরশিল্প সরকারী সাহায্যে উন্নতি লাভ করিয়াছে। বড় ও মাঝারি শিল্পের কিছুটা উন্নতি দ্বিতীয় পরিকল্পনায় হইবে। নিখিল ভারতীয় পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের বড় শিল্পগুলির উন্নতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, দেশবিভাগের সময় আমাদের রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশেষ অভাব ছিল। এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রথম পরিকল্পনায় মোট সাড়ে তের কোটি টাকা (মোট ব্যয়ের শতকরা ১৯ ভাগ) রাস্তাঘাটের উন্নতির জন্য ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। এই পরিকল্পনায় ২২৯২ মাইল পথ নির্মাণের ও উন্নয়নের কর্মসূচি গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য রাজ্যের প্রতিটি গ্রামকে সুসংহত একটি যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্বারা পরস্পর সন্নিকট করিয়া তোলা। ইহার জন্য প্রায় ২০০ কোটি টাকার প্রয়োজন। প্রথম

পরিকল্পনায় ১২০০ মাইল পাকা রাস্তা নির্মাণের কাজ শেষ হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রতিটি থানাকে সুসংহত একটি পথব্যবস্থার সন্নিকট করিয়া তুলিবার কর্মসূচি গ্রহণ করা হইয়াছিল। সমাজসেবা অর্থাৎ জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, শ্রমিক কল্যাণ, অনুন্নত সম্প্রদায়ের কল্যাণ, গৃহ-নির্মাণ প্রভৃতি বিষয়ের পুনর্গঠনের কাজও এই রাজ্যে বেশ কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় এই খাতে মোট ব্যয়ের শতকরা ৪৩ ভাগ অর্থ ব্যয় করা হইয়াছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৫২ কোটি টাকা (অর্থাৎ মোট ব্যয়ের ৩৩ ভাগ) ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছিল।

পরিকল্পনা কমিশনের হিসাবে প্রকাশ যে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গ ১৫৫ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছিল। এই রাজ্যের তৃতীয় পরিকল্পনা আরো ব্যাপক ইহাতে প্রায় ২৫০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। ইহার মধ্যে কৃষি খাতে ৪৬ কোটি টাকা, সমাজ উন্নয়ন খাতে ১৬ কোটি টাকা, সেচ ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন খাতে ৬১ কোটি টাকা, সমাজসেবা খাতে ৭৩ কোটি টাকা এবং পরিবহন খাতে ২০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। শিল্পোন্নয়নের জন্য ২২ কোটি টাকা এবং বিদ্যুৎ উন্নয়নের জন্য ৩৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা সার্থকভাবে রূপায়িত হইলে পশ্চিমবঙ্গ যে এক সমৃদ্ধ রাজ্যে পরিণত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

গঙ্গাবাঁধ পরিকল্পনা

দক্ষিণবঙ্গ ও কলিকাতা অঞ্চলকে আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য রচিত হইয়াছে এই গঙ্গাবাঁধ পরিকল্পনা। পূর্বে গঙ্গা ভাগীরথীর জলধারা দ্বারা পুষ্ট হইত। নানা প্রাকৃতিক বিবর্তনের ফলে ভাগীরথী ও গঙ্গার মধ্যে যোগাযোগ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। বর্ষাকালে ভাগীরথীর জলধারা স্ফীত হইলে মাত্র দুই মাস কাল গঙ্গায় জল থাকে, বৎসরের অন্য সময়ে গঙ্গা একরকম শুষ্ক থাকে। গঙ্গার এই মূল জলধারার গভীরতা ক্রমশঃ কমিয়া আসিবার ফলে কলিকাতা বন্দরের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বহুকাল ধরিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করা হইতেছে। এই নদী বৎসরের অধিকাংশ সময়ই জাহাজ চলাচলের অনুপযুক্ত। গত পঞ্চাশ-ষাট বৎসর ধরিয়া নদীগর্ভ খুঁড়িয়া কোনমতে এই বন্দরকে বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অঞ্চলের অধিবাসীরা আজ এক চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছে। জলাভাবে এখানকার নদীনালাগুলি ক্রমশঃ শুকাইয়া যাইতেছে। ফলে এখানে ম্যালেরিয়ার ব্যাপক প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছে। ক্রমশঃ খাদ্যের উৎপাদন কমিয়া যাইতেছে, আর লোকের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিতেছে। দেশবিভাগের পর জলপথে চলাচলের সুবিধা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় এই অঞ্চলের অধিবাসীদের দুর্গতি যেন আরো বাড়িয়া গিয়াছে। দেশবিভাগের পর আর একটি নূতন সমস্যা দেখা দিয়াছে। আজ পশ্চিমবঙ্গও দ্বিধাবিভক্ত। ইহার উত্তরাংশের সহিত দক্ষিণাংশের দশটি জেলার কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নাই। তাছাড়া আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর

আজও সারা ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গার উপর বাঁধ ও সেতু নির্মাণ করিতে পারিলে এই সংকট হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। গঙ্গাবাঁধ পরিকল্পনা এই উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা রচনার কথা আলোচিত হয় প্রায় একশত বৎসর পূর্বে কর্নেল কটনের সময়।

অনুসন্ধানের পর ফরাক্কাতে এই বাঁধ নির্মাণের প্রকৃষ্ট স্থান হিসাবে স্থির করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে ফরাক্কার নিকট গঙ্গার উপর একটি ব্যারেজ নির্মাণ করা হইবে। প্রয়োজনমত জল এখান হইতে খালের সাহায্যে জঙ্গীপুরের নিকট ভাগীরথীতে ফেলা হইবে। এই বাঁধের উপর দিয়া রেলপথ ও মটর চলাচলের উপযুক্ত রাস্তাও তৈয়ারি হইবে। জঙ্গীপুরের নিকট আর একটি ছোট বাঁধ নির্মাণ করা হইবে। এই বাঁধ জলপ্রবাহের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং ঊর্ধ্বপ্রবাহে যে সব বালি ও পাথর আসিবে তাহা সরাইয়া দিবে। প্রথম পর্যায়ের কাজ এখানেই শেষ হইবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ভাগীরথী হইতে খাল কাটিয়া জলঙ্গী এবং জলঙ্গী হইতে মাথাভাঙ্গা, এবং মাথাভাঙ্গা হইতে চব্বিশ পরগণা জেলার জলপথগুলির সঙ্গে সংযোগ সৃষ্টি করা হইবে। ইহার ফলে এই অঞ্চলে সেচব্যবস্থা উন্নত হইবে এবং এখান হইতে জলনিষ্কাশন আরো সুষ্ঠুভাবে করা হইবে। তাছাড়া, এই অঞ্চলের নদীগুলি আবার বহতা জলধারায় পরিণত হইবে।

এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে হইলে প্রায় ৪০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। এই টাকা ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমানভাবে বহন করিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে পরিকল্পনাটি শেষ হইবার ২০ বৎসরের মধ্যেই রেলের মাশুল হইতে যে টাকা পাওয়া যাইবে তাহার দ্বারাই পরিকল্পনাটির সমস্ত খরচ উঠিয়া আসিবে।

এই পরিকল্পনার ফলে যে সুবিধা হইবে তাহা আলোচনা করা যাক্। এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র আর্যাবর্ত পুনরুজ্জীবিত হইবে। প্রথমতঃ, ভাগীরথী নদী পুনরুজ্জীবিত হইবার ফলে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অঞ্চলের মরা নদীগুলি আবার প্রবাহিত হইবে। ইহার ফলে জলনিকাশের সুবিধা হইবে এবং প্রায় দেড় লক্ষ একর জমি সেচের জল পাইবে। দ্বিতীয়তঃ, পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি হইবে, লোকের স্বাস্থ্যেরও বিশেষ উন্নতি হইবে, ফলে রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামো দৃঢ়তর হইবে। তৃতীয়তঃ, কলিকাতা বন্দর ফিরিয়া পাইবে তাহার স্বাভাবিক অবস্থা। চতুর্থতঃ, রাজ্যের উত্তর ও দক্ষিণাংশের মধ্যে সরাসরি যাতায়াতের পথ নির্মাণ হওয়াতে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শাসনব্যবস্থার অনেক উন্নতি হইবে। শুধু তাহাই নহে, আসাম, মণিপুরী, ত্রিপুরার সমস্যারও কিছুটা সমাধান হইবে। পরিশেষে, ভারতের সীমানার মধ্যে থাকিয়াই পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিহার এবং উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত নদীপথে যাতায়াত করা সম্ভব হইবে। সুতরাং এই পরিকল্পনার ফল যে একা পশ্চিমবঙ্গ

ভোগ করিবে তাহা নহে, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও আসাম রাজ্যও ইহা হইতে বিশেষ উপকৃত হইবে।

এই পরিকল্পনা সম্প্রতি সর্বভারতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহা খুবই আনন্দের বিষয়। গঙ্গাবাঁধ পরিকল্পনা সমগ্র পূর্ব-ভারতের জীবনমরণ সমস্যা। ইহা স্মরণ রাখিয়া যথাসম্ভব এই পরিকল্পনা রূপায়িত কবিবার কাজে হাত দিতে হইবে। যতই দিন যাইবে, সমস্যা ততই জটিল আকার ধারণ করিবে। সুতরাং আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

ভারতের খাদ্যসমস্যা

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, অথচ এখানকাব অধিবাসীরা দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। প্রতি বৎসর এখানে কয়েক লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি পড়ে। ভারতে এ সমস্যা অবশ্য আজ নূতন নহে। পূর্বে আমাদের প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে প্রচুর পবিমাণে খাদ্য আমদানি কবিতে হইত।

আমাদের খাদ্য ঘাট্‌তির অনেকগুলি কারণ আছে। ইহার মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্য উৎপাদনের মন্থর গতি, দেশবিভাগ ও বন্যা প্রভৃতি নানা প্রাকৃতিক দুযোগ প্রধান। গত ৫০ বৎসবে শতকরা পঞ্চাশ হারে আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, অথচ এই সময়ে খাদ্যেব উৎপান বৃদ্ধি পাইযাছে মাত্র শতকরা ২০ ভাগ। ইহাব ফলে জনসংখ্যা ও খাদ্যেব উৎপাদনেব মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্ট হইয়াছে। দেশবিভাগের ফলে, যে সকল অঞ্চলে অধিক খাদ্য উৎপন্ন হইত, এখন তাহা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত, অথচ সেই অনুপাতে পাকিস্তানে লোক যায় নাই। ইহার উপর গত কয়েক বৎসর ধরিয়া দেশে একটির পর একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ লাগিয়াই আছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়ে অনুকূল আবহাওয়ার জন্য খাদ্যশস্যের উৎপাদন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসবে উৎপাদনের এই মান রক্ষা করা যায় নাই। ভবিষ্যতেও উৎপাদন বৃদ্ধির আশা কম। এই পরিকল্পনার শেষে আমাদের বিদেশ হইতে প্রায় ৩০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইবে। সমস্যার এইখানেই শেষ নহে।

আমাদের বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় ৪৩ কোটি, ১৯৬৬ সালের শেষে ইহা ৪৮ কোটি হইবে অনুমান করা যাইতেছে। ইহাদের দৈনিক ১৮ আউন্স করিয়া খাদ্য দিতে গেলে মোট ৮৮০ লক্ষ টন খাদ্যের প্রয়োজন। আর বীজ, অপচয় ইত্যাদি ধরিলে ১৯৬৬ সালে আমাদের মোট ১১০০ লক্ষ টন খাদ্যের প্রয়োজন হইবে। তবে বর্তমানে যে হারে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়িতেছে, তাহাতে ঐ সময়ের মধ্যে মোট ৮২০ লক্ষ টনের বেশি উৎপাদন হইবে বলিয়া মনে হয় না। অর্থাৎ তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে আমাদের খাদ্যের ঘাট্‌তির পরিমাণ দাঁড়াইবে ২৮০ লক্ষ টন। এত খাদ্য বিদেশ হইতে আমদানি করিবার মত আমাদের সঙ্গতি কোথায়?

১৯৫২-৫৮ সালের মধ্যে আমাদের খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে মাত্র শতকরা ৩'২ হারে। আর ২৮০ লক্ষ টন খাদ্যের অতিরিক্ত উৎপাদন করিতে হইলে এই হার শতকরা ৮'২ হওয়া দরকার। ইহা একরকম অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। ইহা হইতেই আমাদের খাদ্যসমস্যা কি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

এই সমস্যার সমাধান করা খুব সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু কাজ যতই কঠিন হউক না কেন আমাদের ইহার সমাধান করিতেই হইবে। সরকার সমস্যাটি সম্বন্ধে চেতন আছেন। তবে ইহার উপর যত বেশি গুরুত্ব আরোপ করা উচিত ছিল তাহা করা হয় নাই। আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে খাদ্যসমস্যার সমাধান করিতে গেলে কৃষি-ব্যবস্থার ত্রুটিগুলির সমাধান প্রয়োজন। এই কৃষিব্যবস্থার ত্রুটিগুলি আবার দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই এক কলমের খোঁচায় এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। পূর্বে সরকারের খাদ্যনীতি ব্যর্থ হইবার মূল কারণ, সরকার সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন নীতি গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং আজ একটি জরুরী খাদ্য উৎপাদনের কর্মসূচি গ্রহণ করিয়া তাহা কার্যকরী করিবার জন্য সর্বপ্রকার শক্তি নিয়োগের সময় আসিয়াছে। এই কর্মসূচিতে জমি উন্নয়ন, খাল কাটা, মাটির বাঁধ প্রভৃতি যে সকল বিষয় কৃষির উৎপাদনী শক্তি বৃদ্ধির সহায়তা করে, সে দিকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। বড় বড় সেচের পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হইতে অনেক সময় লাগিবে, তাই আশু সমস্যা সমাধানে এইগুলির গুরুত্ব খুব বেশি। আমাদের দেশে অসংখ্য কৃষক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতে চাষ করে। উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে ইহাদের কতকগুলি নিরাপত্তা দান করা প্রয়োজন। এইগুলির মধ্যে ভূমিব্যবস্থার স্থায়িত্ব, কৃষিপণ্যের মূল্যের স্থায়িত্ব, ফসল বিক্রয়ের সুবিধা এবং ঋণ পাইবার সুযোগ বৃদ্ধি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইগুলি সম্বন্ধে যদি কৃষক নিশ্চিন্ত হইতে পারে, তবে সে অবশ্যই উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে উৎসাহিত হইবে। বিক্রয়, ঋণ প্রভৃতি বিষয়ের উন্নতিকল্পে সমবায় ব্যবস্থার সাহায্য লইতে হইবে। ফসল বৃদ্ধির ব্যবস্থাগুলি পৃথকভাবে প্রয়োগ করিলে কোন ফল হইবে না। তাই সার, বীজ, সেচ, হালের বলদ প্রভৃতির উন্নতির ব্যবস্থা একযোগে করিতে হইবে।

ভারতের খনিজসম্পদ

খনিজসম্পদ আধুনিক সভ্যতার মেরুদণ্ডস্বরূপ। যে দেশে যত বেশি খনিজ-সম্পদ আছে সেই দেশ ততো শিল্পোন্নতির সুযোগ পায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে খনিজসম্পদের ব্যবহার অজ্ঞাত ছিল না। আধুনিক ভারতে ইহার ব্যবহার অনেক বাড়িয়াছে। আমাদের দেশে প্রয়োজনীয় প্রায় সকল প্রকার খনিজদ্রব্যই পাওয়া যায়। এখানে প্রতি বৎসর যে খনিজসামগ্রী উৎপন্ন হয় তাহার মূল্য প্রায় ১২৫ কোটি টাকা। ইহা হইতে আমাদের নীট জাতীয় আয়ের শতকরা দেড়ভাগ

সৃষ্টি হয়। পূর্বে আমরা দেশের অধিকাংশ খনিজদ্রব্যই বিদেশে রপ্তানি করিতাম। বর্তমানে জাতীয় সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার ফলে ইহাদের কিছুটার সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হইয়াছে।

খনিজসম্পদের কথা আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই জ্বালানি খনিজ অর্থাৎ কয়লা ও তৈলের কথা বলিতে হয়। আমরা প্রতি বৎসর প্রায় ৪৫০ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলন করিয়া থাকি। আমাদের ভূগর্ভে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ হইবে প্রায় ছয় কোটি টন। ভারতের শ্রেষ্ঠ কয়লা খনিগুলি পশ্চিমবাংলা এবং বিহার রাজ্যে অবস্থিত। উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, অন্ধ্র ও মধ্যপ্রদেশেও কয়লা পাওয়া যায়। পূর্ব-ভারতে শতকরা ৮০ ভাগ কয়লা উত্তোলিত হয় বলিয়া ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের শিল্পোন্নয়নের গতি বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদের দেশে খনিজ তৈল বা পেট্রোলিয়ামের বিশেষ অভাব আছে। বর্তমানে আসামের ডিগ্‌বয় ও নাহারকাটিয়া অঞ্চলে সামান্য পরিমাণ তৈল পাওয়া যায়। তবে পশ্চিম ভারতের নূতন যে সকল তৈলের খনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহা কাজে লাগাইতে পারিলে আমাদের তৈলের অভাব অনেকটা মিটিতে পারে।

অন্যান্য খনিজের মধ্যে লৌহ, তামা, ম্যাঙ্গানিজ, টিন, সোনা, অভ্র, রূপা, নিকেল প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আকরিক লৌহ উৎপাদনে ভারত শীর্ষস্থান অধিকার করে। পৃথিবীর সঞ্চিত আকরিক লৌহের শতকরা ২৫ ভাগই নিহিত আছে ভারতের ভূগর্ভে। ইহা প্রায় ২১০০ কোটি টন হইবে। বক্সাইট এলুমিনিয়ম শিল্পের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের সঞ্চিত বক্সাইটের পরিমাণ ২৫০০ লক্ষ টন। ১৯৫৭ সালে প্রায় ৯৬ হাজার টন বক্সাইট উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহা রাঁচি, পালামৌ, কাটনি, জম্মু প্রভৃতি অঞ্চলে পাওয়া যায়। ম্যাঙ্গানিজ আমাদের একটি প্রধান খনিজ সম্পদ। এই খনিজ উৎপাদনে ভারতের স্থান তৃতীয়। মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্যে আমাদের ম্যাঙ্গানিজের খনিগুলি অবস্থিত। আমাদের ভূগর্ভে সঞ্চিত ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ হইবে ১১·২ কোটি টন। ভারী রাসায়নিক দ্রব্য, ইস্পাতদ্রব্য ও কাচদ্রব্য প্রস্তুতের জন্য ইহা অত্যাবশ্যক। ভারতে এই সকল শিল্প এখনও অতি শৈশবে আছে। তাই দেশের অধিকাংশ ম্যাঙ্গানিজই বিদেশে চালান যায়। আমাদের আর একটি উল্লেখযোগ্য খনিজসম্পদ অভ্র। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি অভ্র উৎপন্ন হয় ভারতে। অভ্র খনিগুলি বিহার, অন্ধ্র এবং রাজস্থান রাজ্যে অবস্থিত। ১৯৫৭ সালে মোট ৬০৭ হাজার হন্দর অভ্র খনি হইতে তোলা হয়। প্রতি বৎসর আমরা বিদেশে প্রায় নয় কোটি টাকা মূল্যের অভ্র বিক্রয় করি।

বিহার রাজ্যের সিংভূম অঞ্চলে এবং আসাম, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, মাদ্রাজ রাজ্যে তামা পাওয়া যায়। তবে ইহা আমাদের প্রয়োজনের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ মিটাইতে সক্ষম। মহীশূরের কোলার খনিতে স্বর্ণ পাওয়া যায়। আর বিহার ও মহীশূরে ক্রোমাইট পাওয়া যায়। ভারতে আজ পর্যন্ত নিকেল, রূপা, দস্তা প্রভৃতির

কোন খনি আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা ছাড়া, ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে লবণ, চুণাপাথর, গন্ধক প্রভৃতি পাওয়া যায়। উত্তরপ্রদেশ, আসাম, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, যোধপুর, রেওয়া প্রভৃতি অঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণে চুণাপাথর পাওয়া যায়। গ্রাফাইট পেন্সিল তৈয়ারির কাজে লাগে।

পূর্বের আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে লৌহ, কয়লা, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ এবং বক্সাইট আছে। তবে পেট্রোলিয়ম, তামা, রূপা, নিকেল প্রভৃতির বিশেষ অভাব আছে। বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের এই অতিমূল্যবান সম্পদের সদ্ব্যবহার করা হইতেছে না। প্রথম পরিকল্পনার সময় সরকার সর্বপ্রথম এদিকে দৃষ্টি দেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ইহার ফলে অবশ্য কিছুটা খনিজসামগ্রী ব্যবহারের সুযোগ ঘটিয়াছে।

ভারতের নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। এখানকার জমি অপেক্ষাকৃত শুষ্ক। ফসলের উৎপাদন বাড়াইতে হইলে জমিতে জলের প্রয়োজন। কর্ষিত জমির শতকরা ১৮ ভাগ মাত্র সেচের জল পায়। আর বাকি অংশকে সারা বৎসর অনিশ্চিত বৃষ্টির উপর নির্ভর করিতে হয়। বলা বাহুল্য, এরূপ অনিশ্চিত বৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়া কৃষির কোন স্থায়ী উন্নতিসাধন করা সম্ভব নহে। অন্যদিকে দেশে বহুসংখ্যক বড় বড় নদী আছে। গরমের সময় ইহাদের জল এত কমিয়া যায় যে, তাহা হইতে খালের সাহায্যে সেচের সুবিধা হয় না। বর্ষাকালে এই নদীগুলি জলভারে স্ফীত হইয়া উঠে, দুইকূল ভাসিয়া যায়, মূল্যবান শস্যক্ষেত্রগুলি কয়েক সপ্তাহ বা মাস জলমগ্ন হইয়া থাকে। ইহাদের তাণ্ডবলীলার এইখানেই শেষ নহে। কত গ্রাম ও শহর ইহাদের কবলে পতিত হয়, বহু শস্যের জমি ভাঙ্গিয়া নদীগর্ভে বিলীন হয়। অথচ এই উন্মত্ত নদীগুলিকে শৃঙ্খলিত করিতে পারিলে উহাদের মানুষের কল্যাণের কাজে লাগান যায়। স্ফীতির সময় এই জল বাঁধ দ্বারা আটকাইয়া রাখা হয় এবং পরে প্রয়োজনমত উহা খালের সাহায্যে বহু দূরে শস্যক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হয়। তাছাড়া এই জলশক্তির সদ্ব্যবহার করিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইতেছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, নদীগুলি বাঁধিতে পারিলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচের ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ উৎপাদন এই তিন ধরনেরই সুবিধা পাওয়া যায়। এই ধরনের নদী বাঁধ পরিকল্পনাকে সর্বার্থসাধক নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা বলা হয়। আমাদের দেশে এই ধরনের সর্বার্থসাধক নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের উন্নতির জন্য প্রায় ৬০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রায় ৯০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ২০০টি নূতন সেচ এবং ১৮০টি বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা

গ্রহণ করা হয়। ইহার ফলে ২১০ লক্ষ একর অতিরিক্ত জমি সিঞ্চিত হইতেছে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় দ্বিগুণ করা সম্ভব হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এ পর্যন্ত আমরা মোট জলশক্তির মাত্র শতকরা ১০ ভাগের সদ্ব্যবহার করিতে সমর্থ হইয়াছি।

আমাদের নদী-পরিকল্পনাগুলির মধ্যে দামোদর উপত্যকা, ময়ূরাক্ষী, কংশাবতী, হিরাকুঁদ, ভাকরা-নাঙ্গল, কোশি, তুঙ্গভদ্রা, নাগার্জুনসাগর প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দামোদর পরিকল্পনা আমাদের বৃহত্তম নদী পরিকল্পনাগুলির অন্যতম। পশ্চিমবাংলা ও বিহারের সমৃদ্ধি ও কল্যাণ বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে এই পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। ইহা পশ্চিমবাংলার ১১ লক্ষ একর জমিতে সেচের সাহায্য করিবে এবং দামোদরের উন্মত্ত ধ্বংসলীলার হাত হইতে পশ্চিমবাংলার অধিবাসীদের রক্ষা করিবে। দুর্গাপুরের খালের সাহায্যে জলপথে মাল চলাচলের বিশেষ সুবিধা হইবে। তাছাড়া, ইহার ফলে অতিরিক্ত ১ লক্ষ ২৪ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইবে। এই বিদ্যুতের সাহায্যে ইতিমধ্যে রেলের ইঞ্জিন চালাইবার কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে। প্রায় ১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার কাজ শেষ করা হইয়াছে। ইহার ফলে পশ্চিমবঙ্গের সাত লক্ষ একর এবং বিহারের ২৫ হাজার একর জমি সেচের সুবিধা পাইতেছে। ইহা ছাড়া প্রায় ৪০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টি করা হইয়াছে। 'কংশাবতী' পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর একটি উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার কাজ শেষ হইলে বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণাঞ্চল, মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, হুগলী জেলার কিয়দংশের প্রায় ৯.৫০ লক্ষ একর চাষের জমি নিয়মিত জল পাইবে। ইহা নির্মাণ করিতে ২৫/২৬ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

উড়িষ্যার মহানদীর উপর হিরাকুঁদ বাঁধটি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মাটির বাঁধ। ইহার প্রধান বাঁধটির দৈর্ঘ্য ১৫,৭৪৮ ফুট। ইহা শেষ করিতে প্রায় ৭১ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। ইহার ফলে পুরী, কটক, সম্বলপুর ও জলাঙ্গীর ৬.৭ লক্ষ একর জমি সেচের জল পাইবে এবং অতিরিক্ত দুই লক্ষ বত্রিশ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি সৃষ্টি হইবে। দক্ষিণ ভারতের পরিকল্পনার মধ্যে তুঙ্গভদ্রা ও নাগার্জুনসাগর বাঁধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রিহানদ পরিকল্পনা উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের উনিশ লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করিবে। তিন লক্ষ কিলোওয়াট ক্ষমতাযুক্ত একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করিবার পরিকল্পনাও ইহাতে আছে।

সর্বশেষে, ভাকরা-নাঙ্গলের কথা বলিতে হয়। ইহাই ভারতের সর্ববৃহৎ সর্বার্থসাধক নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা। ইহার কাজ ১৯৪৬ সালে আরম্ভ হয়। নাঙ্গল বাঁধের কাজ শেষ হইয়াছে, ভাকরার কাজ বর্তমান বৎসরে শেষ হইবার কথা। ইহাই পৃথিবীর সর্বোচ্চ বাঁধ। ইহার উচ্চতা প্রায় ৭৪০ ফুট। ইহা সম্পূর্ণ হইলে পাঞ্জাব ও রাজস্থানের অতিরিক্তি ৩৬ লক্ষ একর জমি সেচের জল পাইবে। ইহার ফলে গম, তুলা, ইক্ষু, দাইল ও তৈলবীজের উৎপাদন বিশেষভাবে

বৃদ্ধি পাইবে। ইহার ফলে ৫১৪ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাও বাড়িবে। ইহার কাজ শেষ করিতে প্রায় ১৭৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

ভারতের ভিক্ষুক সমস্যা

বর্তমান ভারতে যে সকল সামাজিক সমস্যা রহিয়াছে ভিক্ষুক সমস্যা তাহাদের অন্যতম। ভারতের যে কোন অঞ্চলের হাটেবাজারে, রাস্তাঘাটে, ট্রামেবাসে, এমনকি অফিসে, আদালতে সর্বত্রই ভিক্ষুকের সাক্ষাৎ মেলে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ দুই ধরনের ভিক্ষুক আছে। অনেকে বৃদ্ধবয়সে সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া ভিক্ষার্জিত অন্নে জীবনধারণ করাকে পরম গৌরববোধ করেন। দিনান্তে কিছু জুটিলে তাঁহারা খাইলেন, না জুটিলে উপবাসী থাকিলেন। সাধুসন্ন্যাসীরাও এই শ্রেণীতে পড়েন। ১৯৫১ সালের আদমসুমারীতে অবশ্য ইহাদের ভিক্ষুক হিসাবে ধরা হয় নাই। সাধারণতঃ ভিক্ষুক বলিতে বৃদ্ধ ও পঙ্গু যাহাদের জীবিকা অর্জনের ক্ষমতা নাই তাহাদের বোঝায়। বাধ্য হইয়াই তাহাদের ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করিতে হয়। এমন দেখা যাইতেছে যে সক্ষম ব্যক্তি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও একটি কাজের সন্ধান করিতে পারিতেছেন না। ফলে তাহাকে বাধ্য হইয়া অন্ততঃ সাময়িকভাবে ভিক্ষা করিতে হয়। ইহা ছাড়া আব এক প্রকারের ভিক্ষুক আছে, যাহাদের ভিক্ষাই পেশা। খাটিয়া খাইবার সামর্থ্য থাকিলেও তাহারা খাটিবে না। এই পেশাদারী ভিক্ষুকেরা সংঘবদ্ধ। ইহাদের সংঘ আছে এবং নূতন লোক পাইলেই এই সংঘ তাহাকে ভিক্ষা করিবাব বিভিন্ন পদ্ধতি শিক্ষা দেয়। সারাদিন যাহা রোজগার হইবে তাহার বেশির ভাগই সংঘে জমা দিতে হয়।

লোকে যে কারণেই ভিক্ষা করুক না কেন, ভিক্ষাবৃত্তি সব সময়েই অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। ভাগ্যের নিকট পরাজয় স্বীকার না করিলে কেহই ভিক্ষা করিতে পারে না। অবশ্য অক্ষম ও পঙ্গুদের কথা স্বতন্ত্র। আমাদের দেশে ভিক্ষা পাওয়া যায় বলিয়াই ভিক্ষুকের সংখ্যা এত বেশি। আমাদের ধর্মের প্রতি অন্ধবিশ্বাস আছে। তাই ধর্মের নামে এদেশে ভিক্ষা চাহিলেই ভিক্ষা পাওয়া যায়। তারপর আমাদের হৃদয় কোমল—কানা, খোঁড়া, বিকলাঙ্গ দেখিলেই আমাদের হৃদয় বিগলিত হয়। আমাদের মনের এই দুর্বলতার সুযোগ লইয়া অকর্মণ্য লোকেরা ভিক্ষায় বাহির হয়, ধর্মের নামে ভিক্ষা না পাওয়া গেলে বিকলাঙ্গ সাজিতে বা সুস্থ ব্যক্তির অঙ্গ বিকল করিতেও ইহাদের বেশি সময় লাগে না।

ইহারা সমাজদেহের ক্ষত বিশেষ। ইহা সংক্রামক ব্যাধি। অবাধ গতিতে বিচরণ করিবার ফলে ইহারা ক্রমশঃ সমাজদেহকে কলুষিত করিয়া তুলিতেছে। এই সমস্যা বহুকাল পূর্বেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেও ইহার কোন সমাধান করা সম্ভব হয় নাই। পূর্বে ইউরোপের দেশগুলিতেও এই সমস্যা ছিল। আজকাল ঐ সকল দেশে কদাচিৎ দুই একটি ভিক্ষুকের সাক্ষাৎ মেলে।

এই সমস্যার সমাধান করিতে গেলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন প্রত্যেক কর্মঠ ব্যক্তির

জন্য উপযুক্ত কাজ এবং বাঁচিবার মত মজুরীর ব্যবস্থা করিতে হইবে। সাধারণতঃ কাজের অভাবে বেকার বসিয়া থাকিতে থাকিতেই লোকে ভিক্ষায় বাহির হয়। কিছুদিন ভিক্ষাবৃত্তি করিবার পর কাজ দিলে সে আর তখন কাজ করিতে চাহে তাহার কর্মক্ষমতাও লোপ পায়। শুধু কাজের ব্যবস্থা করিলেই সমস্যার সমাধান হইবে না। কাজ হইতে অবসর গ্রহণের পর তাহার বাঁচিয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা না হইলে বৃদ্ধ বয়সে সে ক্ষুধার তাডনায় ভিক্ষায় বাহির হইবে। যাহারা পঙ্গু, কাজ করিবার ক্ষমতা নাই তাহাদের ভরণপোষণের ভার রাষ্ট্রকেই গ্রহণ করিতে হইবে। পরিশেষে প্রয়োজন, দেশে ভিক্ষাবৃত্তির বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা। কাহাকেও ভিক্ষা দেওয়া হইবে না, জনসাধারণকে এইরূপ সংকল্প করিতে হইবে। ভিক্ষা না পাওয়া গেলে লোকে ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া অন্নসংস্থানের অন্য উপায় দেখিতে বাধ্য হইবে। ইউরোপের দেশগুলিতে এই সবগুলির একত্র সমাবেশ ঘটিবার পরে তাহারা সমস্যাটির মূলে কুঠারাঘাত করিতে সমর্থ হইয়াছে। আমাদের দেশ দরিদ্র দেশ। ইহা অনুন্নত দেশও বটে। এখানে ব্যাপক বেকার সমস্যা রহিয়াছে, তাই অতি সহজে সমস্যাটির সমাধান করা সম্ভব নহে। তবে যাহারা স্বেচ্ছায় ভিক্ষাবৃত্তি বরণ করে, তাহাদের এবং অক্ষমদের সমস্যা সমাধান করা অপেক্ষাকৃত সহজ। আমাদের দেশে বর্তমানে এই ধরনের প্রচেষ্টাই চলিতেছে।

কতকগুলি রাজ্যে ভিক্ষাবৃত্তি বে-আইনী ঘোষণা করা হইয়াছে, আবার কতকগুলি রাজ্যে প্রকাশ্যস্থানে ভিক্ষা করা চলিবে না এইরূপ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইয়াছে। যাহারা প্রকাশ্যস্থানে ভিক্ষা করে তাহাদের পুলিশ ধরিয়া লইয়া যায় এবং উপযুক্ত শাস্তি বিধান করা হয়। এই আইন পুরাপুরি চালু করিতে পারিলে পেশাদার ভিক্ষুকের সংখ্যা অচিরেই হ্রাস পাইবে। বলাবাহুল্য ইহা করা হইতেছে না। সুতরাং এই দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। ভিক্ষুকদের পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন রাজ্যে অনেকগুলি অনাথ আশ্রম খোলা হইয়াছে। এই সকল প্রতিষ্ঠান ভিক্ষুকদের দেখাশুনা ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত সাহায্য করিয়া থাকে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠান মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে ১ টি আছে। ইহাতে দুই হাজার ভিক্ষুকের স্থান হইতে পারে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের আটটি ভিক্ষুক আশ্রমে ২০৫০ জন ভিক্ষুকের স্থান হইতে পারে। প্রায় প্রত্যেক রাজ্যেই এই ধরনের ব্যবস্থা আছে।

এই ব্যবস্থার ফলে যে, আমাদের দেশে ভিক্ষুকের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে তাহা নহে, বরং দেশে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষুকের সংখ্যাও বাড়িয়াই চলিয়াছে। বলাবাহুল্য, ভিক্ষুকের উৎপত্তিস্থল এই বেকার অবস্থা; ইহার মূলে কুঠারাঘাত করিতে না পারিলে, এই সমস্যার সমাধান কোনদিনই হইতে পারে না।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

জ্ঞানে, কর্মে, দয়ায়, তেজস্বিতায় বিদ্যাসাগরের সমসাময়িককালে তাঁহার সমকক্ষ আর কাহাকেও দেখা যায় না। একাধারে বহুমুখী প্রতিভা বিদ্যাসাগরের বৈশিষ্ট্য।

মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে এক নিষ্ঠাবান উদার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পরিবারে ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তিনি নিজ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। জ্ঞানের প্রতি তাঁহার অদম্য স্পৃহা ছিল। তিনি যাহা কিছু নূতন দেখিতেন তাহাই তিনি জানিতে চাহিতেন। তিনি শুধু ভারতের প্রাচীন বিদ্যার অনুশীলন করেন নাই, পরন্তু ইংরেজি, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া সেই সকল সাহিত্য হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়াছিলেন।

দরিদ্র সংসারে জন্মগ্রহণ করায় অভাব-অনটনের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিপালিত হইয়াছেন। এই অভাব-অনটনের মধ্যেই বিদ্যাসাগর পরের দুঃখকে বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরকে এই দুঃখকষ্টই স্বাবলম্বী এবং সুদৃঢ়চরিত্র করিয়া গঠন করিয়াছিল।

তিনি কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করিবার পর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যাপনা কার্য আরম্ভ করেন। এই কলেজে সিভিলিয়ানদিগকে ভারতীয় ভাষায় শিক্ষিত করা হইত। ইহার পর তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ক্রমে ক্রমে সেখানকার অধ্যক্ষ পদ লাভ করেন। কিছুকাল পরে তিনি বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক নিযুক্ত হন। অবিচলিত কর্মনিষ্ঠা, সততা, কর্তব্য বুদ্ধি ও আত্মবিশ্বাসই তাঁহার সর্বপ্রকার উন্নতির মূল। বিদ্যাসাগর নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে কখনও কোন কাজ করেন নাই। অপরের সহিত মতদ্বৈধ হইলে তিনি তাঁহার সংস্রব ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি জীবনে কখনও অন্যায়ের সহিত সন্ধি করেন নাই।

ঈশ্বরচন্দ্রের মাতৃভক্তি ছিল অনন্যসাধারণ। বিদ্যাসাগরের নিকট তাঁহার মাতা-পিতা সাক্ষাৎ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ছিলেন। দামোদরের প্রবল জলস্রোতের মধ্যে জীবন বিপন্ন করিয়া জননীর নিকট তাঁহার উপস্থিত হইবার কাহিনী সর্বজন-বিদিত। মাতৃ-আজ্ঞায় তিনি বিধবা বিবাহরূপ সমাজ সংস্কারে ব্রতী হন। দীন অনাথ-আতুরদিগের সেবায় আত্মনিয়োগ মাতৃদেবীর প্রভাবেই সম্ভবপর হইয়াছিল।

বিদ্যাসাগর বিপন্ন অনাথ-আতুরদের সেবায় যে দান করিয়াছেন তাহাও অনন্যসাধারণ। এ দানে তাঁহাকে অবশেষে ঋণগ্রস্ত হইতে হয়। পরের দুঃখ দেখিলে তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না। এই দুঃখ নিবারণে তাঁহার আর্থিক সামর্থ্য আছে কি নাই তাহা তিনি বিচার করিতেন না। এখানে হিসাব অপেক্ষা হৃদয়ের প্রাধান্য দেখা যাইত। ইহাই তাঁহার বিশাল-হৃদয়ের পরিচায়ক।

বিদ্যাসাগর শিক্ষা বিস্তার করিয়াছিলেন নানাভাবে। বিদ্যালয় স্থাপন ও উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক রচনাকার্যে তিনি ব্রতী হইয়াছিলেন। বিদ্যালয়-পরিদর্শক পদে নিযুক্ত থাকার সময় তিনি বহু প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। জনশিক্ষার

প্রসার কার্যে তাঁহার দূরদৃষ্টি লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাঁহার রচিত বর্ণপরিচয়, কথামালা, আখ্যানমঞ্জরী, বাল্যশিক্ষা প্রচারকার্যের নিদর্শন।

সংস্কৃত শিক্ষার পথকে সুগম করিবার উদ্দেশ্যে তিনি উপক্রমণিকা, ব্যাকরণ কৌমুদী, ঋজুপাঠ রচনা করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাঙ্‌লা গদ্যের প্রধান সংস্কারক। বিদ্যাসাগর সুললিত ও সুষমামণ্ডিত গদ্য রচনা না করিলে বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া যাইত না। বিদ্যাসাগরের বাঙ্‌লা গদ্য রচনায় শকুন্তলা, সীতার বনবাস, বেতালপঞ্চবিংশতি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। তিনি বাঙ্‌লা গদ্যে মহাভারতের কতক অংশের অনুবাদ করেন। তাঁহার বাঙ্‌লায় সংস্কৃতসাহিত্যের সমালোচনা গ্রন্থ রসগ্রাহী সাহিত্যিক মনের পরিচয় বহন করে।

বিদ্যাসাগরের চরিত্রবল সর্বকালের সর্বযুগের আদর্শ-স্থানীয়। তাঁহার আত্ম-মর্যাদাবোধ ছিল অপরিসীম। দম্ভী দর্পীকে সমুচিত শিক্ষা দিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। অথচ এই বজ্রহৃদয় পুরুষ পরের দুঃখে দয়ায় বিগলিত হইতেন। দেশের সর্বপ্রকার সৎকাজের তিনি ছিলেন উৎসাহদাতা। বাঙালীর জাতীয়তাবোধ, আর মর্যাদাবোধের তিনি ছিলেন উদ্‌বোধক। বিদ্যাসাগরের ন্যায় ক্ষণজন্মা পুরুষ অতীতের মতো অনাগতযুগেও কৃতজ্ঞতার সহিত দেশবাসীর স্মরণের যোগ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ

ভারতের চিরন্তন নিয়ম এই যখনই দেশ ও জাতি নানা সংকটের সম্মুখীন হয় তখনই এদেশে মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। ইঁহারা জাতিকে সত্যের আলোক দেখাইয়া থাকেন। সেই সত্যের আলোকে জাতি জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও ভারতের এক মহাসংকটের সময় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বাশ্রমের নাম গদাধর চট্টোপাধ্যায়। হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রাম এই মহাপুরুষ বা অবতার পুরুষের জন্মভূমি। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ তাঁহার জন্মকাল। তিনি বাল্যকালে গ্রাম্য পাঠশালায় অল্প পড়াশুনা করিয়াছিলেন—অনন্ত বিশ্বপ্রকৃতি তাঁহার শিক্ষাক্ষেত্র ছিল। লোকের আচারব্যবহার, রীতিনীতি তিনি নিপুণভাবে লক্ষ্য করিতেন। লোকচরিত্রের দুর্বলতা বা সবলতা কোথায় তাহাও তাঁহার দৃষ্টিপথ অতিক্রম করে নাই।

লৌকিক বিদ্যা অপেক্ষা আধ্যাত্মিক বিদ্যাই তাঁহাকে বেশি আকৃষ্ট করিয়াছিল। তিনি ছিলেন শ্রুতিধর। শাস্ত্র শুনিয়া শুনিয়া তাহার সারমর্ম হৃদয়ে ধরিয়া রাখিবার অপূর্ব শক্তি তাঁহার মধ্যে ছিল। তিনি নিরক্ষর ছিলেন একথা বলা চলে না। ব্রাহ্মণপণ্ডিত ঢংয়ের তাঁহার হাতের লেখা দেখিলে মনে হয়, তিনি যত্নের সহিত লেখা অভ্যাস করিয়াছিলেন। যাহার নিকট যাহা ভাল পাইতেন তিনি তাহা শিখিয়া লইতেন। সাধুর সাধুত্ব আর দুষ্টের দুষ্টামি তিনি সমভাবে বুঝিতে পারিতেন। তাঁহার কথা হইল সাধু হবি তো বোকা হবি না।

কামারপুকুর হইতে গদাধর রানী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা কর্তৃক নীত হইলেন। দক্ষিণেশ্বর কলিকাতার সন্নিকটে অবস্থিত। দক্ষিণেশ্বরের পথে পুরী প্রভৃতি স্থানে গমনাগমনকারী সাধুসন্তের সংসর্গে তাঁহার জীবন ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইতে থাকে।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে দেবীর অর্চনার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। এইখানেই তাঁহার সাধন জীবনের পরিপূর্তি ঘটে।

ইতিমধ্যে জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা সারদাদেবীর সহিত তাঁহার পরিণয় সম্পন্ন হয়। সারদাদেবীর সহিত মিলনে রামকৃষ্ণের সাধনার পূর্ণতা লাভ হয়। ইঁহারা একে অপরের পরিপূরক বা দুইয়ে এক হইলেন।

গদাধর তোতাপুরী নামক বৈদান্তিক সাধকের নিকট সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহার গুরুদত্ত নাম হয় রামকৃষ্ণ। তিনি জগতের প্রধান প্রধান ধর্মমত অনুসারে সাধন করিয়া জগতের সকল ধর্ম সত্য বলিয়া প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে বিভিন্ন ধর্মমত ঈশ্বর বা চরম সত্যলাভের বিভিন্ন পথ মাত্র— যত মত তত পথ।'

ঈশ্বরেরই নিকট ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায়। মানুষ যেমন মানুষকে দেখে, ঈশ্বরকেও তেমনি সাধন বলে দেখিতে পাওয়া যায়। দেশের প্রাচীন শাস্ত্র ও বিভিন্ন মত সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের আলোচনা করিলে দেশের প্রাচীন শাস্ত্রের সত্যতার উপলব্ধি হয়। সকল মানুষই যে সমান—কেহ উচ্চ কেহ নাচ নহে—একথার যথার্থতা শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাব আচরণদ্বারা প্রকাশ করিতেন।

তিনি নিজহস্তে অপবেব উচ্ছিষ্ট পবিষ্কার করিয়াছেন, এমন কি শৌচস্থানের মল পরিষ্কার করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

তিনি যেখানে যাহা কিছু বড দেখিতেন তাহানই মধ্যে ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ অনুভব করিতেন। সে যুগে দেশের গুণী জ্ঞানীরা যেমন তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেন, তিনিও তেমনি স্বয়ং গুণী জ্ঞানী মানবপ্রেমীদের দেখিতে যাইতেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ও তাঁহার মধ্যে শুধু যাতায়াত ছিল না প্রাণের মিলনও ছিল। কেশবচন্দ্রই শ্রীরামকৃষ্ণকে লোক সমক্ষে প্রচারিত করেন। রামকৃষ্ণ মান সম্মান অর্থ প্রতিপত্তির নিকট হইতে নিজেকে সর্বদা দূরে রাখিতেন।

তিনি নারীজাতিকে জগন্মাতার প্রতিমূর্তিরূপে জ্ঞান করিতেন—স্ত্রীগুরুর নিকট তান্ত্রিকমতে সাধন শিক্ষা করেন—পত্নী সারদাদেবীকে জগন্মাতা জ্ঞানে সেবা করিতেন। রামকৃষ্ণ কাহাকেও কখনও কষ্টদায়ক কথা বলেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আকস্মিকভাবে নরেন্দ্রনাথ দত্ত উপস্থিত হইলেন। নরেন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং কঠোর যুক্তিবাদী। তাঁহার আধ্যাত্মিক জ্ঞানপিপাসা অদম্য। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁহার সকল সংশয় দূর করেন। এই নরেন্দ্রনাথ দত্তই স্বামী বিবেকানন্দ। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য ভক্ত ও শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের কৃপা লাভ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেহাবসানের পূর্বে তাঁহার সমস্ত শক্তি নরেন্দ্রনাথের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়া গেলেন। এই শক্তির বলে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের মুক্তি আর সর্বজগতের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবের একশত বৎসরের মধ্যে ভারতের সর্বতোমুখী অগ্রগতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে, জাতির উপর তাঁহার প্রভাব কতখানি।

স্বামী বিবেকানন্দ

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা এবং সভ্যতার সংঘর্ষে ভারত যখন দ্বিধাগ্রস্ত ও বিভ্রান্ত তখন কলিকাতা নগরীতে নবীন ভারতের অন্যতম স্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ আবির্ভূত হন।

স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে শিমুলিয়ার দত্ত বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত হাইকোর্টের এ্যাটর্নি, উদারহৃদয়, সংগীতানুরাগী ব্যক্তি। মা ভুবনেশ্বরী ধর্মপরায়ণা। পিতামহ দুর্গাচরণ যৌবনে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। নরেন্দ্রনাথ সংসারত্যাগবুদ্ধি পিতামহের নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছিলেন। সচ্ছলতার ও প্রাচুর্যের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ বাল্যকালে পরিবর্ধিত হন। পরবর্তীকালে তাঁহার জীবনধারার অনন্যসাধারণত্ব বাল্যকালেই পরিলক্ষিত হয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া, দলের হইয়া অপরের সহিত লড়াই করা, সত্যের অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি—এসকল বৈশিষ্ট্য অল্প বয়সেই নরেন্দ্রনাথের জীবনে আত্মপ্রকাশ করে। তাঁহার উজ্জ্বল চক্ষু, প্রতিভাদীপ্ত মুখমণ্ডল, ব্যায়ামপটু দেহ, অটলোন্নত শির লোকনেতৃত্বের পরিচায়ক। তাঁহার গতি সিংহের রাজোচিত গতির মতো, মত্ত হস্তীর বিক্রম তাঁহার দেহে এবং তিনি সর্বসৌভাগ্যযুক্ত।

ছাত্রজীবনে তিনি বিদ্যা ও বুদ্ধিমত্তায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য তিনি অবিরাম বিদ্যাচর্চা করিয়াছেন। এই বিদ্যাচর্চার মধ্যে জগতের মূল সত্যকে জানিবার জন্য তাঁহার হৃদয়ে দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা জাগে। তিনি এই আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করিবার জন্য তৎকালীন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মনীষী, ভক্ত ও জ্ঞানীর নিকটে গেলেন। কিন্তু তাঁহার জিজ্ঞাসার উত্তর কেহ দিতে পারিলেন না। সকলেই বলিলেন ঈশ্বর আছেন, কিন্তু ঈশ্বরকে তাঁহাদের মধ্যে কেহ দর্শন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে জানাইতে পারিলেন না।

এদিকে পিতার মৃত্যুতে সংসারের ভার তাঁহার উপরে আসিয়া পড়িল। একদিকে অর্থের অনটন, অপর দিকে নিজের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের প্রবল স্পৃহা—এই দুইয়ের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। নরেন্দ্রনাথের বাল্যাবধি কল্পনা ছিল স্বদেশের কল্যাণ সাধনা করা। তিনি এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় দক্ষিণেশ্বরে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ নিরক্ষর নহেন—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতি ঢঙে তাঁহার হাতের লেখা, অথচ সে যুগের প্রাচীন শিক্ষা দ্বারা

জীবিকা অর্জনে আগ্রহশীল নহেন,—তিনি শ্রুতিধর, আর শাস্ত্র না পড়িয়াও শাস্ত্রের মর্মগ্রাহী এবং তিনি এমন কিছু জানেন যাহা জানিলে সব কিছুই জানা হইয়া যায়। ইনিই ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস। রামকৃষ্ণ পরমহংস জগতের কল্যাণের জন্ম আসিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রনাথেরই জন্য আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথ মিলিত হইলেন। নরেন্দ্রনাথ আজ নিজ নিকেতনে ফিরিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের ওখানে নরেন্দ্রনাথ বহুবার যাতায়াত করিবার পর উভয়ের মধ্যে অতি পুরাতন ঘনিষ্ঠতার স্বরূপ প্রকাশ পাইল। নরেন্দ্রনাথের সকল সংশয় ছিন্ন হইল। ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেহরক্ষা করিবার পূর্বে নরেন্দ্রনাথকে তাঁহার সবকিছু শক্তি দান করিয়া নিজে রিক্ত হইলেন। তিনি নরেন্দ্রনাথের উপর তাঁহার সন্ন্যাসী গুরু ভাইদের ভার অর্পণ করিয়া গেলেন, আর তিনি অর্পণ করিয়া গেলেন আর্ত, পীড়িত, দলিত অগণিত জনগণের সেবার ভার। তাই স্বামী বিবেকানন্দ প্রচার করিলেন 'দরিদ্র পদদলিত, অজ্ঞ ইহারাই তোমার ঈশ্বর হউক'। তিনি পরিব্রাজক বেশে হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সারা ভারত পরিভ্রমণ করিয়া, দেশের দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার, মানুষের প্রতি মানুষের অবমাননা স্বচক্ষে দর্শন করিলেন এবং প্রতিকারের পথ খুঁজিতে লাগিলেন। ভারত আধ্যাত্মিক জগতে যে স্থান অধিকার করিয়াছে, সামাজিক উন্নতির দিক দিয়া ততটা অগ্রসর হইতে পারে নাই। যদি তাহা পারিত তাহা হইলে দলিত, অবনমিত, অত্যাচারিত অজ্ঞ লোক সমাজে এত অধিক থাকিত না। স্বামীজী বলিয়াছেন, "তোমাদের পূর্বপুরুষেরা আত্মার স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, তাই ধর্মের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও বিকাশ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা দেহকে যত প্রকার বন্ধনের মধ্যে ফেলিলেন, কাজে কাজেই সমাজের বিকাশ হইল না।"

বিগত ৫০।৬০ বৎসর ধরিয়া যে সেবামূলক কার্য দেশে চলিতেছে তাহার মূলে রহিয়াছে স্বামী বিবেকানন্দের কর্মের আদর্শ। দেশে দুর্ভিক্ষ, রোগ, ঝড়ঝঞ্ঝা, মহামারীতে আর্তত্রাণের যেখানে দরকার পড়িয়াছে সেইখানেই স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত রামকৃষ্ণ মিশনের অগণিত কর্মিবৃন্দ কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। স্বামীজীর মতে, "আমরা সন্ন্যাসী, ভুক্তি, মুক্তি সব ত্যাগ,—জগতের কল্যাণ করা—এই আমাদের ব্রত, তাতে মুক্তি আসে বা নরক আসে।"

স্বামী বিবেকানন্দ যে মঠ মিশন স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহার হাতে পূর্ব হইতে সঞ্চিত অর্থ ছিল না—সে যুগে দেশের অর্থশালী লোকদের এদিকে অর্থদান করিবার প্রবৃত্তিও বিশেষভাবে জাগ্রত হয় নাই। প্রথম অবস্থায় সংসার ত্যাগী গুরুভাইদের মাথা গুঁজিবার স্থানটুকু পর্যন্ত ছিল না। এই অবস্থা হইতে মঠ মিশনের দ্বারা পৃথিবীব্যাপী প্রসারের কথা ভাবিতে গেলে সত্য সত্যই আমাদের বিস্ময়ের অবধি থাকে না। কিন্তু স্বামীজী কর্মে অগ্রসর হইবার পথ এইভাবে নির্দেশ করিয়াছেন "যারা ভাবে যে, সহায়তা এলে তারপর কার্য করব, তাদের

দ্বারা কোন কার্য হয় না। যারা ভাবে যে কার্যক্ষেত্রে নামলেই সহায় আসবে তারাই কার্য করে।" কার্য করিতে করিতে স্বামীজীর সহায় আসিয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশনের গোড়াপত্তনে আর্থিক সাহায্য ভারত হইতে যাহা আসিয়াছে, তাহার চেয়ে অনেক বেশি আসিয়াছে ভারতের বাহির হইতে।

স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বে রাজা রামমোহন ভারতের ভাবধারা বিদেশে প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা বহির্ভারতে তেমনভাবে প্রসার লাভ করে নাই। ভারতকে বহির্বিশ্বে বিস্তৃত করিবার সুযোগ অপ্রত্যাশিতভাবে স্বামীজীর সম্মুখে একদিন উপস্থিত হইল। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে (সেপ্টেম্বর মাসে) আমেরিকার শিকাগো শহরে, এক আন্তর্জাতিক ধর্ম মহাসভার অধিবেশন হয়। ইহাতে পৃথিবীর বহু দেশের প্রতিনিধি যোগদান করেন। স্বামী বিবেকানন্দ এই সভায় হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার সঙ্কল্প লইয়া তাঁহার মান্দ্রাজী শিষ্যগণের অর্থানুকূল্যে আমেরিকায় উপস্থিত হইলেন। নানা প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইয়া, এক বিরাট ধর্ম সম্মেলনে ভারতের সনাতন বাণী প্রচার করিবার সুযোগ লাভ করিলেন। "আমেরিকাবাসী ভগ্নি ও ভ্রাতৃগণ" বলিয়া স্বামীজী তাঁহার ভাষণ আরম্ভ করিতেই এই অভূতপূর্ব সম্বোধনে সভার লোকেরা চকিত হইয়া উঠিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, হিন্দুধর্ম যুগে যুগে সর্বধর্মের হইয়া সকলের কথা শুনিয়াছে—কাহাকেও পরিত্যাগ করে নাই।

বিদেশ হইতে ফিরিবার পর সারা ভারতে প্রচার এবং গঠনমূলক কার্যে স্বামী বিবেকানন্দ আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া পরবর্তী যুগে শত শত আত্মত্যাগী যুবক দেশমাতৃকার সেবায় আত্মদান করিয়াছেন। ভারতের নব জাগরণের ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দ অমর হইয়া আছেন।

নারীজাতির কল্যাণের জন্য বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও মহামতি বীটনের কর্মপ্রচেষ্টা অবিস্মরণীয় হইয়া আছে। স্বামী বিবেকানন্দও দেশে স্ত্রীজাতির কল্যাণে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, "জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই, এক-পক্ষ পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে। সেইজন্যই রামকৃষ্ণাবতারে স্ত্রীগুরু গ্রহণ—সেইজন্যই নারীভাব সাধন—মাতৃভাব প্রচার—সেইজন্যই আমার স্ত্রীমঠ স্থাপনের জন্য প্রথম উদ্যোগ,—উক্ত মঠ গার্গী, মৈত্রেয়ী এবং তদপেক্ষা আরও উচ্চতর ভাবসম্পন্না নারীকুলের আকরস্বরূপ হইবে।"

'জ্ঞানযোগ', 'কর্মযোগ', 'ভক্তিযোগ', 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'বর্তমান ভারত', 'ভাববার কথা', পত্রাবলী প্রভৃতি রচনায় স্বামীজী তাঁহার চিন্তার ধারা প্রকাশ করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের অসংখ্য প্রাণস্পর্শী বাণীর মধ্যে একটি কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য -"পবিত্র ও নিঃস্বার্থ হইতে চেষ্টা করিও—উহাতেই সমগ্র ধর্ম নিহিত।"

স্বামী বিবেকানন্দের গদ্য রচনা উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলা সাহিত্যে ধর্মসাধনা, স্বদেশপ্রেম, ভক্তি, ভাবুকতা, যুক্তিতে অনন্যসাধারণ স্থান অধিকার

করে। রবীন্দ্রনাথ এবং বীরবলের পূর্বে বাংলা চলতি ভাষায় এমন প্রাণৈশ্বর্য, এমন সুষমা স্বামীজী ছাড়া অপর কেহ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। স্বামীজীর অন্তিম মহাসমাধির পর প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার রচনায় তাঁহার বাঙ্‌ময়ী মূর্তি আজও অম্লান হইয়া আছে—ভারতের বর্তমান এবং অনাগতযুগের জয়যাত্রার পথে উহা অনির্বাণ দীপশিখার কার্য করিতে থাকিবে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

বিদেশী রাষ্ট্রশক্তির হাত হইতে মাতৃভূমিকে উদ্ধার করিবার জন্য, যে সকল দেশসেবকগণ আমরণ সংগ্রাম করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, সব দিক দিয়াই অনন্যসাধারণ। দেশের মুক্তি সংগ্রামক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাব যেমন আকস্মিক তাঁহার অন্তর্ধানও তেমনি আকস্মিক। সুভাষচন্দ্র ভারতের মুক্তিকে জীবনের সাধনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। গঙ্গার পারে পলাশিক্ষেত্রে আমরা একদিন যে স্বাধীনতারত্নকে হারাইয়াছিলাম, সেই গঙ্গার তীরকে কেন্দ্র করিয়া নেতাজী সুভাষচন্দ্র আপনার কর্ম-পরিকল্পনাকে সমগ্র জগতে প্রসারিত করিয়া, সেই লুপ্তরত্নকে সর্বপ্রথম উদ্ধার করেন। আজাদহিন্দ বাহিনীর নেতারূপে কোহিমা-রণাঙ্গনে তিনিই ভারতের জাতীয় পতাকাকে সগৌরবে উত্তোলিত করেন।

সুভাষচন্দ্র দেশের স্বাধীনতার জন্য আজীবন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জ্ঞান, ধর্মভাব, তেজস্বিতা, আত্মমর্যাদাবোধ, লোকনেতৃত্ব শক্তি, অক্লান্ত কর্মপ্রচেষ্টা তাঁহার জীবনের লক্ষ্য পথের সহায় হইয়াছিল।

সুভাষচন্দ্রের পৈত্রিকনিবাস চব্বিশ পরগণার কোদালিয়া গ্রামে। প্রায় ছেষট্টি বৎসর পূর্বে পিতা জানকীনাথ বসুর কর্মস্থল কটকে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যে শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি নিজের অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। স্কুলে পড়ার সময় হইতেই তিনি লোকসেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই সেবাবুদ্ধি পরবর্তীকালের কর্মজীবনে তাঁহার বড় বড় কাজে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছিল। তিনি ছাত্রজীবনে সদ্‌গুরুর সন্ধানে গৃহত্যাগ করেন। কিন্তু তিনি ধর্মের পথ হইতে কর্মের পথে ফিরিয়া আসিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়নকালে ভারতের অন্নে পুষ্ট ইংরেজ অধ্যাপকের ধৃষ্টতার উত্তর দিতে গিয়া যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়, তাহার সমস্ত দায়িত্ব সুভাষচন্দ্র নিজে গ্রহণ করায়, তাঁহাকে ঐ বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে হয়। কোন কোন বিশেষ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন অপেক্ষা জাতীয় মর্যাদাবোধ বড, এই কথাই সুভাষচন্দ্রের আচরণ আমাদিগকে শিক্ষা দেয়।

স্যার আশুতোষের সহায়তায় সুভাষচন্দ্র স্কটিশচার্চ কলেজ হইতে সসম্মানে বি-এ পাশ করিয়া, পিতার আদেশে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত

যাত্রা করেন। উক্ত পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া, তিনি কাজও পাইলেন। এই সময়ে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন ভারতে আরম্ভ হয়। তিনি ব্রিটিশ সরকারের অধীনে কার্য গ্রহণ করিলেন না। দেশে ফিরিয়া মহাত্মা গান্ধীর সহিত আলোচনায় জানিতে পারিলেন, তাঁহার কর্মপদ্ধতি হইতেছে 'অহিংস অসহযোগ' এবং চরকার প্রবর্তন—লক্ষ্য এক বৎসরের মধ্যে রামরাজ্য-স্বরাজ লাভ। এইরূপ কর্মপন্থা সুভাষচন্দ্রের কাছে অবাস্তব বলিয়া মনে হইল। গান্ধীজী তাঁহাকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দেশবন্ধুর কর্মের আদর্শ তাঁহাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। সুভাষচন্দ্র অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সহিত কারাবরণ করেন।

ইহার পূর্বে বিলাত হইতে ফিরিবার পর তিনি উত্তরবঙ্গের বন্যায় সেবাকার্যের ভার গ্রহণ করিয়া দেশবাসীর হৃদয়ে স্থান লাভ করেন। কারামুক্তির পর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের দক্ষিণহস্ত রূপে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনে যোগদান করেন।

সুভাষচন্দ্রের কর্মশক্তি ছিল অদম্য। যে কার্যেই তিনি যোগদান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার কৃতিত্ব পরিলক্ষিত হয়। তিনি ক্রমে ক্রমে জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ, প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক এবং সভাপতি হন।

জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন, তাঁহারই সংগঠন শক্তির পরিচায়ক। ইহারই সর্বাধ্যক্ষরূপে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে তিনি যে সেবকবাহিনীর অভিপ্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন, তাহাতে দেশবাসীর অন্তরে অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সঞ্চার হয়।

সে যুগে বিদেশী শাসকগোষ্ঠী ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে সুভাষচন্দ্রের মত অন্য কাহাকেও এত বেশি ভয় করিতেন না; তাই সুভাষচন্দ্রকে কারণে অকারণে বিচারে বা বিনাবিচারে দীর্ঘকাল কারাবাস দিয়াছেন বা আটকাইয়া রাখিয়াছেন।

সুভাষচন্দ্র সকল দিক দিয়াই বিপ্লবী। জগতের মহাপুরুষেরা সকলেই বিপ্লবী। বিপ্লবী মনের একটা বড় লক্ষণ হইতেছে এই যে বিপ্লবী কখনও অন্যায়ের সহিত আপোষ-মীমাংসা করে না, বিবেকের বিরুদ্ধে কোন কাজ করে না। গান্ধীজীর অহিংসাবাদ সুভাষচন্দ্র কোনদিন মানিয়া লন নাই। তিনি কংগ্রেসের সভাপতি পদে বৃত হন। তাঁহার মতে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভই লক্ষ্যবস্তু। গান্ধীজী এবং তাঁহার অনুগামীদের সহিত সুভাষচন্দ্রের তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। সুভাষচন্দ্র ইহার পর কংগ্রেসের বামপন্থীদিগের সমর্থনে দ্বিতীয়বার সভাপতি পদে নির্বাচিত হইলেন। কিন্তু বিরুদ্ধবাদিগণের সহযোগিতার অভাবে পদত্যাগ করিয়া 'ফরওয়ার্ড ব্লক' নামক স্বতন্ত্র দল গঠন করিলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে ব্রিটিশ সরকার তাঁহাকে স্বগৃহে বন্দী করিয়া রাখিলেন। এখান হইতে সুভাষচন্দ্র রহস্যজনক ভাবে অন্তর্হিত হইলেন। স্বদেশ উদ্ধারে রুশদেশের সাহায্য না পাইয়া তিনি বার্লিনে "চক্রশক্তির" সাহায্য গ্রহণ করিয়া জাতীয় বাহিনী গঠন করেন। সেখান হইতে সিঙ্গাপুরে গিয়া "আজাদ

হিন্দ সরকার” ও আজাদ হিন্দ বাহিনীকে রূপায়িত করিলেন। এই সরকার গঠনে বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসুর সক্রিয় সহায়তা ও পূর্ব এশিয়া প্রবাসী ধনাঢ্য ভারতীয়গণের সর্বস্ব দান ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। “দিল্লী চলো” রবে আজাদ হিন্দ বাহিনী ভারতের দিকে অগ্রসর হয়। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে এই সৈন্যবাহিনী কোহিমা রণাঙ্গনে যুদ্ধ করে। অবশ্য অবস্থা বিপর্যয়ে আসাম সীমান্ত হইতে এই বাহিনা আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। বস্তুতঃ নেতাজীর সাধনা ব্যর্থ হয় নাই, হইতেও পারে না। তাঁহার সংগঠন শক্তিদ্বারা তিনি এই সুপ্ত জাতির আত্মবিশ্বাস ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। চেষ্টা, একাগ্রতা ও সততা এবং আত্মবিশ্বাস থাকিলে, বৃহৎ কর্মের সাফল্যের সুযোগ একদিন না একদিন উপস্থিত হয়ই। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে সিঙ্গাপুর হইতে টোকিও যাইবার পথে নেতাজী রহস্যজনকভাবে অন্তর্হিত হন। আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে যেখানেই থাকুন না কেন তিনি অপরাজেয়, তিনি অমর। ভারতের কোটি কোটি নরনারীর অন্তরে তিনি চিরকাল জীবিত থাকিবেন :

ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তি

(অশোক)

ভারতের ঐতিহাসিক যুগে রাজচক্রবর্তী অশোকের মতো অপর কোন বড় রাজা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবল দেশের পর দেশ জয় করিয়া রাজ্যের পরিধি বিস্তৃত করিলেই বড় রাজা হওয়া যায় না। রাজ্যের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ-বিধান যিনি করেন তিনিই বড় রাজা বলিয়া গণ্য হন। অশোকও প্রজাদের সর্বপ্রকার কল্যাণসাধন করিয়া বড় রাজা হইয়াছিলেন।

গ্রীক রাজশক্তিকে ভারত হইতে উৎখাত করিয়াছিলেন সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত। অশোক এই চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র এবং বিন্দুসারের পুত্র। অশোকের বাল্যজীবনী সম্বন্ধে নানা কিম্বদন্তী রহিয়াছে। পৈতৃক রাজ্যলাভের জন্য, তিনি তাঁহার অন্য ভাইদের সহিত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পূর্বে তাঁহার ক্রূরতার জন্য লোকে তাঁহাকে “চণ্ডাশোক” বলিত। কিম্বদন্তী ইতিহাস নহে। তবে কিম্বদন্তীর সহিত অনেক সময় ইতিহাসও কিছু জড়িত থাকে।

পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর অশোক রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করেন। রাজ্যারোহণের আট বৎসর পর অশোক বহু সৈন্যসামন্ত লইয়া কলিঙ্গ রাজ্য আক্রমণ করেন। কলিঙ্গের বীরত্বের খ্যাতি প্রাচীন ভারতে সুবিদিত ছিল। দেশের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে কলিঙ্গের বীরসন্তানগণ দলে দলে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তপাতের বীভৎস দৃশ্যে অশোকের মানসিক অবস্থার একটা বিরাট পরিবর্তন হইল। তিনি এই যুদ্ধকেই জীবনের শেষ যুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়া অহিংসাবাদী হইলেন।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উপগুপ্তের নিকট তিনি ভগবান্ বুদ্ধের মৈত্রীকরুণার মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন ; জনকল্যাণকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়া স্বদেশে ও বিদেশে সর্বত্র ভগবান্ বুদ্ধের বাণী প্রচার করিলেন। লুম্বিনী, সারনাথ, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শন ও স্তূপ স্থাপন করিতে লাগিলেন ; ভগবান্ গৌতমবুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী (বর্তমান নেপালের রুম্মিন্‌দেই) গ্রামের শিলালেখাতে উক্ত গ্রামকে করমুক্ত করিবার আদেশ লিপিবদ্ধ করিলেন। অনুরূপ ঘটনা ইউরোপের ইতিহাস পাঠে জানা যায়। ফরাসী বারাঙ্গনা জোয়ান অব আর্কের জন্মস্থানও ফরাসী সরকার করমুক্ত করিয়া দেন।

দক্ষিণ ভারতের কৃষ্ণানদী পর্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্যে রাজচক্রবর্তী অশোক বহু স্তম্ভ স্থাপন করিয়া রাজত্বের কাহিনী, লোকের আত্মসংযম, পরস্পরের প্রতি মৈত্রীভাব, এক কথায় প্রকৃত মানুষ হইবার জন্য বহু অনুশাসন উৎকীর্ণ করিলেন। ইহা ছাড়া পশ্চিমে গির্ণার পর্বত হইতে আরম্ভ করিয়া রাজ্যের পর্বতগাত্রে বহু স্থানে চৌদ্দটি গিরিলিপি উৎকীর্ণ করিলেন। সম্রাট্ প্রিয়দর্শীর এই উপদেশগুলি যাহাতে পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং শুধু সম্রাটের সময় নহে, অনন্ত অনাগত কাল ধরিয়া উহা লোকসমাজের গ্রহণীয় হয় তাহার জন্য এই ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসন-ব্যবস্থায় ধর্মোপদেশক কর্মচারী ছিল। ভারতের বাহিরে গ্রীস, মিশর, সিংহল প্রভৃতি দেশে তিনি ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেন। সিংহলে পুত্র 'মহেন্দ্র' ও কন্যা 'সংঘামিত্রা'কে ধর্ম প্রচারের জন্য প্রেরণ করিলেন।

অশোক প্রজাদের ঐহিক কল্যাণের জন্য পথঘাট নির্মাণ, চিকিৎসার জন্য আরোগ্যশালা স্থাপন, পথিপার্শ্বে বৃক্ষরোপণ এবং পানীয় জলের জন্য কূপ খনন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যে সর্বধর্মাবলম্বীর প্রতি রাষ্ট্রের সমদৃষ্টি ছিল।

অশোকের রাজত্বে ভারতের ভাস্কর্যশিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করে। শিল্প ধারায় ভারতের বৈশিষ্ট্য এই সময়ে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করি।

যে জাতি নিজেকে বিস্তার করে সেই বাঁচিয়া থাকে। মহারাজ অশোক ভারতের ভাবধারাকে জগতে বিস্তার করিয়াছিলেন। মনুষ্যত্ব অর্জন না করিলে বা আত্মমত রক্ষার সহিত পর মতে সহিষ্ণু না হইলে কোন জাতি বাঁচিতে পারে না, আর জগতেও শান্তি সংস্থাপিত হইতে পারে না। মহারাজ অশোক ঐহিক সুখ-সম্পদের সহিত মনুষ্যত্ব অর্জনের পথপ্রদর্শক। তিনি একাধারে রাজা এবং ঋষি।

জাতির প্রয়োজনে ভারতে যুগে যুগে মহামানব বা অবতার পুরুষের আবির্ভাব হয়। ভগবান্ গৌতমবুদ্ধকে অবতারই বলি আর মহাপুরুষই বলি তাহাতে কিছু আসে যায় না। অবতার পুরুষেরা মানুষের মধ্যে থাকিয়া মনুষ্যরূপেই কাজ করেন। খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ছয়শত বৎসর পূর্বে ভারতের এক সংকটাপন্ন সময়ে

গৌতমবুদ্ধ আবির্ভূত হন। বৈদিক ভারতের যাগযজ্ঞের আদর্শ মানুষ ভুলিতে বসিয়াছিল। জাতি ক্রমশঃ প্রাণশক্তিহীন হইতেছিল; মানুষের মধ্য হইতে প্রেম ও মৈত্রী দূরে চলিয়া যাইতেছিল। এই সময়ে এমন একজন মহাপুরুষের প্রয়োজন হইয়াছিল, যিনি জগৎকে কল্যাণ এবং শান্তির পথে চালিত করিতে পারেন। তাই গৌতমবুদ্ধ আসিয়াছিলেন জগতের জরা মরণ-ব্যাধি ও অপর সাংসারিক দুঃখের নিবৃত্তি সাধনের জন্য।

গৌতমবুদ্ধের বাল্যজীবনের নাম সিদ্ধার্থ। হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তু শাক্যগণের রাজধানী। তিনি কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র। প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে এক বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে, রাজধানীর অনতিদূরে লুম্বিনী উদ্যানে (বর্তমান নাম নেপালের "রুম্মিন্দেই") রাজপুত্র সিদ্ধার্থ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের অল্পকাল পরেই মাতা মায়াদেবী ইহলোক ত্যাগ করেন। শুদ্ধোদন মহারাজের অপরা মহিষী সিদ্ধার্থের মাতৃষসা মহাপ্রজাবতী গৌতমী শিশুর লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন। মানুষের জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি প্রভৃতির অশেষ দুঃখ দর্শনে, অল্প বয়সেই রাজপুত্র ব্যথিত হইলেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জগতের জন্য তাঁহার দুঃখও বাড়িতে লাগিল। ইতিমধ্যে যশোধরা (বা গোপা) নাম্নী ক্ষত্রিয় কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়; কিন্তু সংসারে সিদ্ধার্থের মন বসিল না। পুত্র রাহুলের জন্ম সংবাদ তাঁহার কাছে পৌঁছিল। সিদ্ধার্থ বলিলেন "রাহুলের জন্ম হইয়াছে—আমার বন্ধনও সৃষ্ট হইল।" এক আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাত্রিতে পত্নীপুত্র, রাজৈশ্বর্য সবকিছু পিছনে ফেলিয়া রাজপুত্র সিদ্ধার্থ পথে বাহির হইলেন। তিনি আনোমা নদীর তীরে রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া সর্বরিক্ত হইয়া মগধের রাজধানী পঞ্চশৈলবেষ্টিত রাজগৃহ নগরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গৃহের ক্ষুদ্র গণ্ডী ছাড়িয়া রাজপুত্র বৃহত্তর জগতের অধিবাসী হইলেন।

● এই গৃহত্যাগকে বৌদ্ধশাস্ত্রে 'মহাভিনিক্খমণ' (মহাভিনিষ্ক্রমণ) বলে। ২৯ বৎসর বয়সে রাজপুত্র সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করেন।

রাজগৃহের নিকটবর্তী গিরিগুহায় বহু সন্ন্যাসী বাস করিতেন। এই স্থানে দুইজন গুরুর নিকট ধর্ম শিক্ষা করিয়াও তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি তপস্যা দ্বারা অভীপ্সিত ফল লাভের আশায় রাজগৃহ ত্যাগ করিয়া গয়ার নিকট 'উরুবেলা' নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। এই স্থান নৈরঞ্জনা নদীর তীরে, শান্ত নির্জন পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত এবং তপস্যার পক্ষে উপযুক্ত। এইখানে সিদ্ধার্থ কঠোর তপস্যায় রত হইলেন। তাঁহার শরীর শুষ্ক হইতে থাকিল। উপযুক্ত আহারও তিনি সব সময় পাইতেন না। আমরণ তপস্যার সংকল্প লইয়া তিনি বোধিবৃক্ষের মূলের আসন ত্যাগ করিলেন না। এই সময়ে নিকটবর্তী "সেনানী গ্রামের" গ্রামণীকন্যা (গ্রামণী—মোড়ল) সুজাতা তাঁহাকে পায়স আহার দিয়া বলযুক্ত করিল। অবশেষে এই অশ্বত্থবৃক্ষের নীচে তপস্যা করিতে করিতে তিনি 'বোধি' বা জ্ঞান লাভ করিয়া বুদ্ধ (বা সংবোধি লাভ করিয়া "সংবুদ্ধ") হইলেন। তিনি

তপস্যা দ্বারা চারিটি 'আর্যসত্য' লাভ করিলেন :—(১) দুঃখের অস্তিত্ব (২) দুঃখোৎপত্তির কারণ (৩) নিরোধ (দুঃখকে দূর করিতে হইবে) (৪) উপায় (দুঃখের নিবৃত্তির উপায়)। মানবের জরা, মরণ প্রভৃতি দুঃখের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। এইসব দুঃখের কারণও রহিয়াছে। এই সব দুঃখকে দূর করিতে হইবে এবং ইহার উপায়ও আছে। আটটি উপায় দ্বারা দুঃখকে দূর করা যাইতে পারে। ইহারা হইতেছে (১) সম্যক্ দৃষ্টি (২) সম্যক্ সংকল্প (সংকল্প দৃঢ়তা) (৩) সম্যক্ বাক্য (সত্য প্রিয় ভাষণ) (৪) সম্যক্ কর্মান্ত (সদাচার) (৫) সম্যক্ আজীব (অহিংসাপূর্ণ জীবিকা অবলম্বন) (৬) সম্যক্ ব্যায়াম (আত্ম-সংযম) (৭) সম্যক্ স্মৃতি (ধারণা ঠিক রাখা) (৮) সম্যক্ সমাধি (গভীর তত্ত্ব সম্বন্ধে ধ্যান বা চিন্তন)।

তিনি 'উরুবেলা' (বর্তমান "বুদ্ধগয়া") হইতে বারাণসীর নিকটে "ইসিপতনে" (বর্তমান 'সারনাথে') গিয়া সর্বপ্রথম "ধর্মচক্রের" প্রবর্তন করেন। দলে দলে উন্নত অনুন্নত সর্বশ্রেণীর লোক ভগবান বুদ্ধের শিষ্য হইতে লাগিল। সম্রাট্ হইতে আরম্ভ করিয়া অতি সাধারণ লোক পর্যন্ত এই নবীন ধর্মে দীক্ষিত হইল। তাঁহার প্রথম পাঁচজন শিষ্য প্রভুর আদেশে ধর্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। পরবর্তীকালে রাজচক্রবর্তী অশোকের সময়ে এই ধর্ম সারা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইল।

বৌদ্ধধর্মে জাতিভেদ স্বীকৃত হয় না, কর্মফল এবং জন্মান্তরবাদের উপর সর্ব তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। ঈশ্বর বা ভগবান্ সম্বন্ধে বৌদ্ধধর্ম নিরুত্তর। সৎকর্মের এবং অহিংসার উপর এই ধর্ম সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব আরোপ করে। সারা পৃথিবীতে বৌদ্ধধর্ম প্রেমপ্রীতির মাধ্যমে প্রচারিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে ভারতের সংস্কৃতি নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই ধর্ম সৎকর্মবাদদ্বারা জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছে। মানবসেবাধর্মের মূলে বৌদ্ধধর্মের দান অপরিসীম।

আশী বৎসর বয়ঃক্রমকালে, হিরণ্যবতী নদীর তীরে কুশীনগরে ভগবান্ গৌতম-বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভ হয়।

মহাত্মা গান্ধী

জগতের নিকট পাওয়ার চেয়ে যিনি জগৎকে বেশি দিয়া যাইতে পারেন, তাঁহাকেই লোকোত্তর পুরুষ বা মহাপুরুষ বলা হয়। যাঁহার মন, মুখ এবং কাজ এক তিনি হইতেছেন "মহাত্মা" (মনস্যেকং বচস্যেকং কর্মণ্যেকং মহাত্মনাম্")।

মহাপুরুষ বা মহাত্মা জগৎকে যাহা দান করেন তাহা হইতেছে সেবা ও প্রেম। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী আজীবন জগৎকে এই সেবা ও প্রেম দান করিয়া গিয়াছেন। প্রতিদানে অপরের কাছে চাহিয়াছিলেন আত্মসংযম ও প্রেমের বিস্তার। তাঁহার এই চাওয়া এবং পাওয়া এক হইয়াছে কিনা তাহা ভাবীকাল বিচার করিবে।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর গুজরাটের পোরবন্দরে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে

মহাত্মা গান্ধীর জন্ম হয়। পোরবন্দরে এবং রাজকোটে তিনি শিক্ষালাভ করিয়াছেন। বিদ্যালয়ে অনন্যসাধারণ প্রতিভার নিদর্শন না পাওয়া গেলেও তাঁহার সত্যনিষ্ঠা ও সংযমের পরিচয় শিক্ষাজীবনেই পরিলক্ষিত হয়। এ দেশে শিক্ষালাভের পর তিনি বিলাতে ব্যারিস্টারি পড়িবার জন্য গমন করেন। বিলাত যাত্রার পূর্বে, সেখানে বাস করার সময় সংযম ও শৃঙ্খলার সহিত চলিবার জন্য তিনি পিতামাতার নিকটে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা তিনি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিয়া গান্ধীজী স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু অত্যন্ত লাজুক হওয়ায়, অপরের পক্ষে তিনি কথা বলিতে পারিতেন না। তাই আইন ব্যবসায়ে তিনি এ দেশে বিশেষ কিছু সুবিধা করিতে পারিলেন না। একটি ভারতীয় ব্যবসায়ী কোম্পানীর মামলা চালাইবার জন্য তাঁহাকে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাইতে হয়। এইখানেই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়। এই স্থানের ভারতীয়দের মান-মর্যাদা বা অধিকার বলিয়া যে কিছু থাকিতে পারে, তাহা তথাকার শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরা স্বীকার করিত না। অধিকন্তু শ্বেতজাতীয় লোকেরা ভারতীয়দিগের উপর সময় সময় অমানুষিক অত্যাচার চালাইত। ভারতীয়দের উপর পাশ্চাত্ত্য জাতির অবমাননার জ্বালা গান্ধীজী প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন। সেখানকার ভারতীয়বিরোধী আইনসমূহ উচ্ছেদ করিতে গান্ধীজী দৃঢ়সংকল্প হইলেন এবং "সত্যাগ্রহ" আন্দোলন শুরু করিয়া দিলেন। অপরের প্রতি হিংসাবুদ্ধি মনে স্থান না দিয়া, নিজে দুঃখ বরণ করিয়া লইয়া, বিরোধীকে প্রেমদ্বারা স্বপক্ষে আনয়নের নাম "সত্যাগ্রহ"।

আত্মশক্তিতে বলীয়ান্ না হইলে কেহ সত্যাগ্রহ পালন করিতে পারে না। "অসাধুত্বকে সাধুত্ব দ্বারা জয় করিবে"—ভগবান বুদ্ধের এই বাণী, (অসাধুং সাধুনা জিনে) এক মহাত্মা গান্ধী ছাড়া আধুনিক যুগে অপর কেহ ব্যাবহারিকভাবে সফল করিতে পারেন নাই। তিনি ব্রিটিশ সরকারের সহিত সহযোগিতা করিয়াই তাঁহাদের মনোভাব পরিবর্তনের চেষ্টা করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বুয়র যুদ্ধে এবং প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধে গান্ধীজী ইংরেজ সরকারের সহিত সক্রিয় সহযোগিতা করিয়াও বিদেশী সরকারের মনোভাব পরিবর্তন করিতে পারেন নাই।

ভারতে ভারতবাসীর স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিয়া "রাওলাট" আইন পাশ হয়। মহাত্মা গান্ধী সারা ভারতে ইহার প্রতিবাদে আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। এই আন্দোলনের ফলে পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরের "জালিয়ানওয়ালাবাগে" ব্রিটিশ শাসনকর্তা ওডায়ারের আদেশে ভারতবাসীর উপর অমানুষিক হত্যাকাণ্ড চলে।

যে বিদেশী রাজসরকার দানবীয় শক্তিকেই ভারত শাসনের মূলমন্ত্র বলিয়া মনে করিল, সেই ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে মহাত্মাজী অহিংসভাবে সর্বপ্রকার সহযোগিতা বর্জনের নীতি গ্রহণ করিলেন। ইহারই নাম "অসহযোগ আন্দোলন"। কত ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের উপর এই আন্দোলন চলিয়াছে। ইংরেজের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনে যে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা উপস্থিত

হইয়াছে, তাহাদিগকে জয় করিয়া গান্ধীজী সকলের উপর প্রেম বিস্তার করিয়া স্বাধীনতা লাভের পথ প্রস্তুত করিয়াছেন ধাপে ধাপে। সমগ্র জাতির পক্ষে এত বড কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইবার আহ্বান ইহার পূর্বে আর কখনও আসে নাই।

গান্ধীজী চাহিয়াছিলেন স্বদেশের শান্তি আর জগতের শান্তি। এই পঁচিশ বৎসর অহিংস সংগ্রামের মধ্যে ভারতে বহুবার এবং বহুকাল ধরিয়া সাম্প্রদায়িক অশান্তি তীব্ররূপে প্রকাশ পাইয়াছে। গান্ধীজীর জীবনসাধনাই হইল সর্বপ্রকার অশান্তি দূর করা। এই সাধনার যজ্ঞেই মহাত্মা গান্ধী অবশেষে আত্মাহুতি দিলেন। ইহার পূর্বেই ভারত স্বাধীন হইয়াছিল বটে, কিন্তু দেশকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া গান্ধীজীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেশ বিভাগ হইয়াছিল। অনেকে মনে করিয়াছিলেন দেশবিভাগদ্বারাই সাম্প্রদায়িক অশান্তি দূব হইবে। কিন্তু এই অশান্তি দূর হওযা দূরে থাকুক আজও ইহাব নিবৃত্তি হয় নাই।

ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম অহিংস-সহিংস দুইভাবেই বিদেশীয় বাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পব গৃহহারা হইয়া এই দুই প্রান্তের লোকের অশান্তিব আর বিরাম নাই। এই গৃহত্যাগ নিবীর্যতা এবং কাপুরুষতাব ফল নহে। পারিপার্শ্বিক অবস্থাই লোককে গৃহত্যাগী কবিয়াছে।

গান্ধীজী দেশকে শুধু আত্মিক বল লাভের শিক্ষা দেন নাই, তিনি দেশকে স্বাবলম্বী করিবার জন্য চরকা ও খদ্দরের প্রবর্তন কবেন। অস্পৃশ্যতা ভারত হইতে দূর করিবার জন্য "হরিজন আন্দোলন" চালান এবং দেশবাসীর সম্মুখে সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সামাজিক সুবিচাবের আদর্শ স্থাপন করেন। ভাবীকাল তাঁহার দেশ সেবার প্রকৃত মূল্য নির্ধাবণ করিবে।

বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

ভাবতে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা অতি প্রাচীন কালেই আবম্ভ হইয়াছিল। পৃথিবীর অনেক জাতি যখন অজ্ঞানতার সুষুপ্তিতে নিমগ্ন ভারত তখনই জগতে জ্ঞানের আলো বিস্তার করিয়াছিল। মাঝে মাঝে বাষ্ট্রীয় পবাধীনতা তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছে সত্য, কিন্তু এই পবাধীনতাব মধ্যেও যে সব মহামনীষী প্রাচীনভারতের ঋষিদের সাধনালব্ধ সত্য এবং আধুনিক বিজ্ঞানেব গবেষণালব্ধ তত্ত্বের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন, বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁহাদের অন্যতম।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নবেম্বব জগদীশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পৈত্রিক নিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত রাড়িখাল গ্রাম। দেশমাতৃকার বহু কৃতী সন্তান প্রাচীন কাল হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বিক্রমপুরকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। জগদীশচন্দ্রের পিতা ভগবানচন্দ্র বসু ফবিদপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। এইখানে জগদীশচন্দ্রের বাল্যজীবন কাটে। পিতার সদা জাগ্রত দৃষ্টি, সাধারণ লোকের সহিত মেলামেশা করিয়া লোকের দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় জ্ঞান, এবং রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ কাহিনীর সহিত পরিচয় লাভ জগদীশচন্দ্রের

ভবিষ্যৎ জীবন গঠনে বিশেষ সহায়তা করে। তাঁহার স্বদেশের প্রতি মমত্ববোধের মূল্যও এইখানে। পিতা ভগবানচন্দ্র স্বদেশের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পের উন্নতিকল্পে নিজের সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিয়া সর্বস্বান্ত হন। জগদীশচন্দ্র তাঁহার পিতৃগৃহে কর্মরত ক্ষুদ্র শিল্পীদের নিকট হইতে শিল্প রচনার কলাকৌশল আয়ত্ত করেন। পরবর্তী জীবনে বৈজ্ঞানিক গবেষণার যন্ত্রপাতি নির্মাণ করার কার্যে এই শিল্পকৌশল বিশেষ ফলপ্রদ হয়। ফরিদপুরে বাংলা স্কুলে শিক্ষা লাভের পর জগদীশচন্দ্র ক্রমে কলিকাতার হেয়ার স্কুল হইতে সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে প্রবেশ করেন।

এখান হইতে ষোল বৎসর বয়সে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। পরে তিনি সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ হইতে বিশ বৎসর বয়সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ উপাধি প্রাপ্ত হন। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে পদার্থবিদ্যার বিখ্যাত পণ্ডিত ফাদার লাঁফোর শিষ্যত্ব লাভ এবং কৃতিত্ব অর্জনের সৌভাগ্য জগদীশচন্দ্রের হইয়াছিল।

নানা প্রতিকূল অবস্থার অনিশ্চয়তার মধ্যে শিক্ষা লাভের জন্য জগদীশচন্দ্র বিলাতে গমন করেন। লণ্ডনে তিনি চিকিৎসাবিদ্যার কলেজে প্রাণিবিদ্যা ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যার পাঠ গ্রহণ করিয়া, শারীরিক অসুস্থতার জন্য লণ্ডন ত্যাগ করিয়া কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। এখানে তিনি পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা এবং উদ্ভিদ্‌বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া ট্রাইপোস পরীক্ষা পাশ করিলেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এস্-সি উপাধিও তিনি অর্জন করেন।

বিলাত হইতে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকরূপে তিনি বহুদিন অতিবাহিত করেন। তখনকার দিনে উচ্চতম চাকুরিতে বিলাতী সাহেব এবং দেশীয় অধ্যাপকদের বেতনের মধ্যে গুরুতর তারতম্য ছিল। জগদীশচন্দ্র এই বৈষম্য দূর করিবার জন্য সরকারের সহিত প্রতিবাদে রত থাকিয়া তিন বৎসর কোন বেতন গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার তেজস্বিতা ও আত্মমর্যাদাবোধ তাঁহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। অবশেষে জগদীশচন্দ্র জয়ী হন এবং বহু পরে তাঁহারই চেষ্টার ফলে এ বৈষম্য চিরকালের জন্য দূরীভূত হয়। তিন বৎসরের বেতন পাইয়া তিনি পিতৃঋণের অধিকাংশ পরিশোধ করেন এবং পিতার মৃত্যুর পূর্বে পুত্র তাঁহাকে সম্পূর্ণ ঋণমুক্ত করেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র শিক্ষাদান এবং গবেষণা কার্য সমভাবে চালাইতে থাকিলেন। তাঁহার অক্লান্ত গবেষণার ফলে পদার্থবিদ্যার নব নব তথ্য আবিষ্কৃত হয়। তাঁহার বিদ্যুৎ তরঙ্গের উপর গবেষণা জগতের প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিককে বিস্মিত করে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি-এস-সি উপাধি দান করে। তাঁহার উদ্ভাবিত যন্ত্রদ্বারা বিনা তারে সংবাদ পাঠাইবার যোগ্যতা স্বীকৃত হয়। এ দেশের তদানীন্তন গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে তাঁহাকে ইংলণ্ডে পাঠাইলেন,—ইউরোপের বিভিন্ন দেশ হইতেও তাঁহার আবিষ্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রণ আসিল। এতদিনে পাশ্চাত্ত্য জাতি বুঝিল

ভারতবর্ষ শুধু কল্পনার জগতে বিচরণ করে না, বৈজ্ঞানিক গবেষণাক্ষেত্রেও তাহার একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে ভারতমাতার পক্ষে আশীর্বাদ পাঠাইলেন ;—'আজি মাতা পাঠাইছে অশ্রুসিক্ত বাণী আশীর্বাদ খানি'।

বিলাত হইতে ফিরিয়া জগদীশচন্দ্র জড় এবং চেতনের সাড়া সম্বন্ধে গবেষণা করিতে লাগিলেন। তিনি এক যন্ত্রের সাহায্যে জগতে প্রচার করিলেন, মনুষ্য ও অন্য জীবজন্তু যেমন প্রাণবান্, তেমনি উদ্ভিদ্ ও ধাতব পদার্থে প্রাণশক্তি ক্রিয়া করিতেছে। বাহিরের উত্তেজনায় প্রত্যেক উদ্ভিদের সাড়া পাওয়া যায়। তিনি শরীর-বিদ্যা-বিশারদ মাইকেল ফস্টর ও সুধীমণ্ডলীর নিকট একখণ্ড টিনেরও সাড়া প্রমাণিত করেন।

জড়, চেতন সর্বত্রই প্রাণশক্তি কার্য করিতেছে আর্য ঋষিদের উপলব্ধ এই সত্য জগদীশচন্দ্র জগৎ সমক্ষে প্রমাণিত করিলেন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে।

ভারত গবর্ণমেণ্ট সারা পৃথিবীতে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার প্রচার করিবার জন্য তাঁহাকে চতুর্থবার ভারতের বাহিরে পাঠাইলেন।

কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর 'ভারতের গৌরব ও 'জগতের কল্যাণ কামনায়' ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নবেম্বর তিনি বসুবিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিলেন। জগদীশচন্দ্র তাঁহার জীবনের সমস্ত অর্থ এই গবেষণা মন্দির প্রতিষ্ঠায় ব্যয়িত করেন।

ভারতের রাষ্ট্রপতি মহামনীষী রাধাকৃষ্ণন্ বলিয়াছেন, 'জগদীশচন্দ্রের মধ্যে বিজ্ঞান, কলা ও ধর্মের সুসঙ্গত সমন্বয় রহিয়াছে।'

জগদীশচন্দ্র কোন প্রকার সংস্কার দ্বারা চালিত হইবার লোক নহেন। সত্যের সহিত যাহার কোন সঙ্গতি নাই এইরূপ কোন কিছু তিনি গ্রহণ করিতেন না। জগদীশচন্দ্রের মতে মানুষ কেবল বিশ্বের ঘটনার নিষ্ক্রিয় দর্শকমাত্র নহে, উন্নততর সৃষ্টির অংশ তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

জগদীশচন্দ্র একাধারে বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক। তাঁহার মতে জ্ঞানের অন্বেষণে বৈজ্ঞানিকের ও সাহিত্যিকের লক্ষ্য হইতেছে এক। উহা হইতেছে সর্বব্যাপী এক সত্তার আবিষ্কার। তাঁহার 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে', 'অব্যক্ত'—বালকগণের জন্য লিখিত সহজ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনাশৈলীর দিক দিয়া অতীব উপাদেয়।

সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১৮৩৮—১৮৯৪)

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতা বাঙ্লার উপর ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। তাই বাঙালি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া বিদেশী সাহিত্যে যে গদ্যের সন্ধান পাইয়াছিল সে গদ্য বাঙ্লা ভাষায় সে পায় না, তাই বাঙ্লা সাহিত্যের অনুশীলনে তাহার তেমন রুচি হয় নাই। এই সময়ে 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের ঋষি সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার অনন্যসাধারণ

প্রতিভা এবং সৃজনীশক্তি লইয়া বাঙলার সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তিনিই মাতৃভাষায় সার্থক উপন্যাস রচনা করিয়া রসপিপাসুদিগের চিত্তবিনোদনে সমর্থ হন। বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট। নৈহাটির নিকটে কাঁঠালপাড়ায় ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। হুগলী কলেজে অধ্যয়নকালে বঙ্কিমের সাহিত্য সাধনা আরম্ভ হইয়াছিল। তিনি ঈশ্বর গুপ্তের আদর্শে কবিতা রচনা করিতেন। তাঁহার কয়েকটি কবিতা গুপ্ত কবির 'সংবাদ প্রভাকর'-এ প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা-সমষ্টির নাম 'ললিতা ও মানস'। কবিতা-রচনা পূর্ণ উদ্যমে চালাইতে থাকিলে কালক্রমে তিনি একজন বড় কবি হইতে পারিতেন। 'ললিত ও মানস' এরূপ সম্ভাবনা সূচিত করে।

বাঙলা সাহিত্যের পক্ষে এক পরম শুভক্ষণে বঙ্কিমচন্দ্র কবিতা রচনা ত্যাগ করিয়া গদ্য রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ, মধুসূদন দত্তের ন্যায় ইংরেজী ভাষাকে আশ্রয় করিয়া তিনি Rajmohans' Wife নামে এক উপন্যাস রচনা করেন। কিন্তু বিদেশী ভাষায় এই উপন্যাস রচনা করিয়া তিনি তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। তাই তিনি মাতভাষার প্রতি অশেষ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া নূতন পথে লেখনী চালনা করিলেন। তাঁহার প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার পাঠকগণের চিত্ত এক অভিনব রসধারার সন্ধান পাইয়া পুলকিত হইল। মোগল-পাঠান সংঘর্ষের পটভূমিকায় রচিত এই উপন্যাসখানিতে নরনারীর চিরন্তন প্রেম-কাহিনী আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তিলোত্তমার সলজ্জ প্রেমে, বিমলার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও মাধুর্যে, বীরেন্দ্রসিংহের তেজস্বিতায়, জগৎসিংহের প্রেম ও ক্ষাত্রতেজে দুর্গেশনন্দিনীর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার বস্তু। এই উপন্যাসের ঘটনা সংস্থাপনে বঙ্কিমচন্দ্র কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে 'কপালকুণ্ডলা' প্রকাশিত হয়। ঔপন্যাসিক হিসাবে বঙ্কিমের পূর্ণ প্রতিভায় ভাস্বর এই কপালকুণ্ডলার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ মৌলিক। নির্জন সমুদ্রসৈকতে পথহারা নবকুমারের সম্মুখে উপস্থিত হইল এক নারীমূর্তি। তাঁহার নিকট হইতে উপন্যাসের নায়ক পাইলেন সমবেদনার বাণী। এ বস্তু বাঙালীর নিকট অপূর্ব। প্রাচীন কাব্যের আলোচনায় ইহার সন্ধান মিলে নাই। কাপালিক-পালিতা কপালকুণ্ডলা তাহার বিবাহ, সামাজিক জীবন ও ভালবাসার মধ্যে পূর্ব-জীবনের সংস্কার ভুলিতে পারে নাই। তাহার মধুরতা আর সমাজের বিধিনিষেধের মধ্যে স্বাধীনতা, এই দুই পরস্পর-বিরুদ্ধতার সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছে বঙ্কিম-প্রতিভা।

'কপালকুণ্ডলা' প্রকাশের পর বঙ্কিমের মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর, রাজসিংহ প্রকাশিত হয়। বাঙলা সাহিত্যে 'রাজসিংহ'র পূর্বে এরূপ পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক উপন্যাস আর রচিত হয় নাই। মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সহিত রাজস্থানের ছোট রাজ্য রূপনগরের রাজার সংঘর্ষ বাধে। রাজপুত ও মোগলের শৌর্যবীর্য

পরীক্ষা এখানে নিপুণভাবে বর্ণিত হইয়াছে। রাজসিংহে চঞ্চলকুমারী, নির্মলকুমারীর সজীব চরিত্র, রাণা রাজসিংহের মহানুভবতা, মাণিকলালের চরিত্রে কূটনীতিজ্ঞতা বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

'আনন্দমঠ' বাংলায় সন্ন্যাসী বিদ্রোহ এবং ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায় বিরচিত। এই উপন্যাসের উদ্দেশ্য স্বাদেশিকতা প্রচার। আত্মত্যাগী এবং সর্বস্বত্যাগী না হইলে কেহ স্বদেশ সেবক হইতে পারে না। আনন্দমঠ এইরূপ সর্বত্যাগী স্বদেশ সেবকের গঠন ক্ষেত্র। 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র এই ত্যাগীদের মুখেই উচ্চারিত হইয়াছিল। আনন্দমঠের সন্ন্যাসীদের মধ্যে প্রবিষ্ট মহেন্দ্র ও কল্যাণীচরিত্র বাস্তবতা ত্যাগ করিয়া আদর্শমাত্রে পর্যবসিত হয় নাই।

'দেবী চৌধুরাণী' ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গীতার নিষ্কাম কর্মযোগ প্রচারের উদ্দেশ্যে ইহা রচিত হয়। এখানে নিষ্কাম কর্মযোগের সাধনে, সন্ন্যাস-ধর্মের উপর সংসারধর্মের জয় ঘোষণা করা হইয়াছে। বালিকা প্রফুল্লকে দেবীরাণীরূপে গড়িয়া তোলা অসামান্য প্রতিভার পরিচয়। ভোগের মধ্যে থাকিয়া, ভোগ্যবস্তু ব্যবহার করিয়াও নির্বিকারচিত্তে ভোগবিরতিকে স্বীকার করিয়া লওয়া, ভারতবর্ষেই সম্ভব হইয়াছিল। বাংলা সাহিত্যে সেই আদর্শের উদাহরণ বঙ্কিমই প্রথম পরিবেশন করেন।

সামাজিক উপন্যাসগুলির মধ্যেও 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বঙ্কিম প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। নরনারীর প্রলোভন ও অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে সুখদুঃখ কিভাবে আসে যায় তাহার নিখুঁত চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন এই দুই উপন্যাসে। পুরুষের রূপজ মোহ কিরূপে সংসারে বিপর্যয় আনে এবং সত্যকার প্রেম-প্রীতিতে কিরূপে গৃহনীড় সুখশান্তির নিলয়ে পরিণত হয় বঙ্কিম তাহারই চিত্র আমাদের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন। বিষবৃক্ষে সূর্যমুখীর পতিপ্রেম, আত্মত্যাগ, দুঃখবরণ আমাদের সম্মুখে উজ্জ্বল আলোকস্বরূপ হইয়া আছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' একান্নবর্তী পরিবারের জটিলতায়, প্রধান পাত্রপাত্রীগণের জটিল মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে বঙ্কিমপ্রতিভা উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়াছে।

তাঁহার গুরুগম্ভীর বিষয়ের উপর রচনা হইতেছে বিজ্ঞানরহস্য, সাম্য, কৃষ্ণচরিত্র, ধর্মতত্ত্ব। গম্ভীর বিষয়কে সরস করিতে বঙ্কিম কোন দিক দিয়াই ত্রুটি করেন নাই। সাম্য নামক প্রবন্ধে মানুষের সমান অধিকার লইয়া তিনি আলোচনা করিয়াছেন। বিবিধ প্রবন্ধে ধর্ম, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজচিত্র, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, দর্শন, ব্যঙ্গ-কৌতুক প্রভৃতি বঙ্কিম অতি সুচারুভাবে আলোচনা করিয়াছেন। সে যুগের বাঙালী জীবনের চিন্তার ধারা, তাহার সমস্যা যদি বুঝিতে হয়, তবে এই প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলেই সে সকল বিষয়ে জ্ঞানলাভ হইবে। কৃষ্ণচরিত্রে-বঙ্কিম শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শপুরুষরূপে প্রমাণিত করিয়াছেন। মহাভারত ও পুরাণাদি শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ও প্রাচীন শাস্ত্রানুশীলনে অধ্যবসায় না থাকিলে কেহ এরূপ গ্রন্থ রচনা করিতে পারে না। ধর্মতত্ত্বে—বঙ্কিম পরিপূর্ণ জীবনের আদর্শ

দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে মানুষের ভিতরে কতকগুলি শক্তি আছে। এই শক্তিগুলির অনুশীলন, বিকাশ এবং সার্থকতা দ্বারাই মনুষ্যত্ব লাভ হয়।

"কমলাকান্তের দপ্তর", "লোকরহস্য", "মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত"—এ তিনটি তাঁহার রসরচনা হইলেও ইহাদের মধ্যে প্রকার ভেদ আছে। কমলাকান্তের দপ্তর বঙ্কিমের প্রবন্ধাবলীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। কমলাকান্তরূপে বঙ্কিম আত্মগোপন করিয়া আছেন। তিনি এখানে মানবজীবনকে হাস্যরসের সহিত তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এখানকার হাস্যরস কাহাকেও আঘাত করে না। জীবনে যাহা সত্য তাহারই দিকে বঙ্কিম অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়াছেন। 'আমার দুর্গোৎসব' প্রবন্ধে বঙ্কিমের স্বদেশপ্রীতি মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণ সামাজিক দোষত্রুটি লইয়া লোকরহস্যে ব্যঙ্গ করিয়াছেন—কোন বিশেষ ব্যক্তি এই সকল ব্যঙ্গের লক্ষ্য নহে।

"মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে" লেখক দেখাইয়াছেন কি করিয়া সে যুগের সরকারের কৃপায় অযোগ্য লোকও উন্নতি লাভ করে। ইহা তীব্র শ্লেষাত্মক রচনা।

বিদ্যাসাগর, বাঙলা গদ্যে যে সুষমা সঞ্চার করিয়াছিলেন, বঙ্কিম তাহাকে আরো লঘু আরো অধিক প্রাণবান্ করিয়া তুলিলেন—

"বঙ্গের কোকিল কণ্ঠে আছে সুধা জানি,
তা' হতে অধিক মধু মঞ্জুবাক্ বঙ্কিমের বাণী।"— (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(১৮৬১—১৯৪১)

মহাকবি কালিদাসের পর ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো এত বড় আর কোন কবি জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি যথার্থই কবিকুল রবি।

কলিকাতার বিখ্যাত জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে রবীন্দ্রনাথ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের পিতা। শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কৃতিতে এই ঠাকুর পরিবার ভারতে সুপ্রসিদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের পারিবারিক ঐতিহ্যে প্রতিপালিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছিলেন। কবিকে বালক বয়সে একটা নির্দিষ্ট নিয়মের ভিতর ভৃত্যদের পরিচালনাধীন হইয়া থাকিতে হইত। তিনি এই গণ্ডীর বাহিরে আসিবার জন্য সর্বদাই ব্যাকুল হইতেন। তাঁহার গৃহশিক্ষা আরম্ভ হইল, তিনি স্কুলে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু স্কুলের বাঁধাধরা নিয়মের ভিতর তিনি থাকিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথ স্কুল ছাড়িলেন বটে, কিন্তু সরস্বতীর নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন না।

গৃহে বিদ্যাচর্চায় তিনি যে সময় ব্যয় করিতেন এবং যেরূপ পরিশ্রম করিতেন তাহা অনেক বালককেই বিস্মিত করিবে। বাল্যে জ্ঞানচর্চায় নিজের শক্তিকে নিয়োজিত না করিলে কেহই উত্তরকালে কোন বিষয়ে বড় হইতে পারে না। তিনি বাল্যে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী শুনিয়া শুনিয়া শিখিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহাকে সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান বিষয়ে গৃহেই শিক্ষা দেওয়া হয়।

রবীন্দ্রনাথের মন বাল্যেই গৃহের গণ্ডীর বাহির হইবার জন্য ক্রমশঃই অধীর হইয়া উঠিতেছিল। অবশেষে একদিন পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত তাঁহার ঘরের বাহির হইবার সুযোগ উপস্থিত হইল। বোলপুরের পথে রবীন্দ্রনাথ হিমালয়ে গেলেন। ইহার পর তিনি বিদ্যাচর্চার জন্য বিলাত গমন করেন। সেখানে কিছুকাল অধ্যয়নের পর তিনি স্বদেশে ফিরিলেন।

রবীন্দ্রনাথ বালক বয়সেই কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। কবিতা রচনা করার উৎসাহ ও অভিনন্দন তিনি পিতা এবং জ্যেষ্ঠ সহোদরগণের নিকট হইতে লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন তের বৎসর তখন তাহার লিখিত কবিতা প্রথম প্রকাশ লাভ করে। ইহার পর বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার লেখা বাহির হইতে থাকে। এক মহাকাব্য রচনা ছাড়া বাঙ্‌লা সাহিত্যের এমন কোন বিভাগ নাই যাহা রবীন্দ্রনাথের লেখনী স্পর্শ লাভ করে নাই। তাঁহার কবিতার সুরে রহিয়াছে ব্যাকুলতা—অসংখ্য বন্ধনের মধ্যে মুক্তির আস্বাদ উপভোগ করা।

রবীন্দ্রনাথ শতাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার 'ভানুসিংহঠাকুরের পদাবলী' ও 'বাল্মীকী প্রতিভা' প্রকাশের অল্পকালমধ্যে সাহিত্যিক সমাজে সমাদর লাভ করে। কবির মতে তাঁহার 'মানসী' রচনার কাল হইতে (১২৯৪-৯৭) আরম্ভ করিয়া যে সকল কবিতা তিনি লিখিয়াছেন তাহারাই প্রকৃত কবিতা বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। ইহার পূর্ববর্তী কবিতাগুলিতে তাঁহার অপরিণত মনের ভাবকে পরিণত ভাষায় প্রকাশ করা হইয়াছে। তাঁহার মতে উহারা ভাব-সম্পদে উচ্চ নহে। তাঁহার এই মত বিনয় ও সত্যদৃষ্টির পরিচায়ক।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ইহা অবশ্য বাঙলা 'গীতাঞ্জলি'র আলোচনায় সম্ভবপর হয় নাই। ঐ পুস্তকের কতক অংশের ইংরেজি অনুবাদের সাহায্যে হইয়াছিল। এ পুরস্কারে রবীন্দ্রনাথ ধন্য হন নাই—ধন্য হইয়াছিলেন পুরস্কার সমিতির ব্যবস্থাপকবৃন্দ। পুরস্কার কোন মহনীয় ব্যক্তিকে মহত্তর করে না—পুরস্কারদাতাই মহতের পূজার সুযোগ লাভে মহত্তর হইয়া থাকেন।

রবীন্দ্রনাথ ভারতের জাতীয় কবি হইলেও বিশ্বকবি। জগৎ কবিসভায় তিনি বিশ্বকবিরূপে স্বীকৃত হইয়াছেন—তাই তিনি কবিসার্বভৌম।

কাব্য, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প রচনা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, বিভিন্ন বিষয়ের উপর গদ্য প্রবন্ধ রচনাও করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পর সমালোচনা সাহিত্যের তিনি আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার নাটক রচনাও সাধারণ নাটক হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে চলিয়াছে। নাটকগুলি অভিনয় সাফল্যের দিক দিয়া বড় না হইলেও ভাব ও তত্ত্বের দিক দিয়া বড়।

রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য গান রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচনা দিয়াই বাঙালী আজ গানের রাজা। সংগীতে কবি নিজেই সুরযোজনা করিয়াছেন। তাঁহার সুরযোজনা সংগীতের এক বিশিষ্ট ধারার সৃষ্টি করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নহেন, তিনি শিক্ষাব্রতীও। শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় তাঁহার শিক্ষা পরিকল্পনার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। আজ উহা ক্রমে ক্রমে বিশ্বভারতীতে পরিণত হইয়াছে। তিনি সেখানকার বিদ্যার্থিগণের জন্য পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং শিক্ষাদান কার্যও করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের ত্যাগ তপস্যার আদর্শ, বিশ্বজগতের কল্যাণের আদর্শই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সরল জীবনযাপন ও উচ্চ চিন্তা দ্বারাই ইহা সম্ভবপর। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের এই আদর্শের প্রতিষ্ঠাই তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার ফল।

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশপ্রেমী। তিনি দেশাত্মবোধক বহু সংগীত রচনা করিয়াছেন। বিদেশী রাজশক্তির অন্যায় অত্যাচারকে তিনি কখনই সমর্থন করেন নাই। তাঁহার একবার 'তোরা মা বলিয়া ডাক'—গান বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় বাঙ্‌লার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জনগণের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে। বিদেশী রাজশক্তির দম্ভ দর্প আর প্রভুত্বকে রবীন্দ্রনাথ কোনদিন স্বীকার করেন নাই। তিনি বিদেশী শাসনের অবসান চাহিয়াছেন, কিন্তু বিদেশীর নিকট হইতে লাভকে প্রত্যাখ্যান করেন নাই। তাঁহার আদর্শ হইল 'দিবে আর নিবে, মিলিবে মিলাবে'। অসহযোগ আন্দোলনকে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিতে পারেন নাই।

দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া বিদেশী রাজশক্তির অবসান ঘটাইতে পারে, কিন্তু বিদেশের সাহিত্য বিজ্ঞানে যে জ্ঞান ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইয়াছে তাহা হইতে এদেশ যেন বঞ্চিত না থাকে।

সত্য শিব সুন্দরের পূজারী রবীন্দ্রনাথ। তিনি তাঁহার গানদ্বারা প্রেমদ্বারা বিশ্বদেবতার পূজা করিয়াছেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে মহাকবি রবীন্দ্রনাথের দেহবসান হয়।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(১৮৭৬—১৯৩৮)

"অপরাজেয় কথাশিল্পী" শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাঙ্‌লা সাহিত্যে আবির্ভাব অতি আকস্মিক ব্যাপার। বর্তমান সময় হইতে প্রায় আশী বৎসর পূর্বে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অল্পবয়স হইতেই তাঁহার মধ্যে একটা ভবঘুরে প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়। এই প্রবৃত্তির ফলে বহুস্থানে তিনি পরিভ্রমণ করেন এবং অকুণ্ঠিতচিত্তে সবকিছুর সত্যের সন্ধান করেন—সে সত্যকে তিনি জীবনে যথাসম্ভব বরণ করিয়া লইয়াছিলেন।

তিনি ভাগলপুরে শিক্ষালাভ করেন। জীবিকা অর্জনের জন্য তাঁহাকে দেশ ছাড়িয়া সুদূর ব্রহ্মদেশে যাইতে হইয়াছিল। সত্যসন্ধানী শরৎচন্দ্র অল্প বয়সেই গল্প ও উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু উহা প্রকাশ করিতে প্রথমে সাহসী হন নাই। ব্রহ্মদেশে অবস্থান কালে তাঁহার কতক রচনা মাসিকপত্রে প্রকাশ

লাভ করে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম রচনা বাহির হয়। তারপর ক্রমে ক্রমে তাঁহার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা দাঁড়ায় চল্লিশের উপর।

তাঁহার আবির্ভাবে বাঙ্‌লা সাহিত্যে উপন্যাস রচনার রীতিতে একটা অপ্রত্যাশিত বিপ্লব উপস্থিত হইল—বাঙালীর চিন্তাধারা সমাজের একটি অনাদৃত, অলক্ষিত দিকে প্রবাহিত হইল। এ পর্যন্ত সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই বড় ঘরের কথাসাহিত্যে রূপ দিয়া আসিযাছেন।

শরৎচন্দ্র আসিয়া সমাজেব নির্যাতিত, অধঃপতিত নরনারীর প্রাণের বেদনা, তাহাদের জীবনের নানা সমস্যা সমাজের সম্মুখে স্থাপন কবিলেন। তিনি কোন সমস্যার সমাধান নিজে করেন নাই—সামাজিকদের বিবেকবুদ্ধির কাছে উহা তুলিয়া ধরিয়াছেন। শরৎচন্দ্র মানবমনের নিবিড় রহস্যের সন্ধান করিয়াছেন।

বাঙালীর জীবনে ছোটখাট সুখদুঃখের কাহিনীব সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন তাঁহার মতো এরূপ দরদী লেখক দৃষ্টিপথে পড়ে না।

শবৎচন্দ্র কোন প্রকার দুর্নীতিব প্রশ্রয়দাতা নহেন, চিত্তসংযমের গৌরবই তিনি ঘোষণা করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের হাস্যরস কাহাকেও আক্রমণ করে না—অনেক স্থানে তিনি হাস্যরসের মাধ্যমে লোকের দুর্বলতায় সহানুভূতি দেখাইয়াছেন মাত্র। শিশু মনস্তত্ত্বের অপূর্ব পবিচয় তাঁহাব বিভিন্ন রচনায় মিলে।

শরৎচন্দ্রের মতো নাবীর বেদনাব বন্ধু বাঙ্‌লা সাহিত্যে খুব কমই আছে। তাঁহাব বচনায় সমাজের অধঃপতিত, নির্যাতিত স্তরে অবস্থিত নারী তাহার চারিত্রিক দৃঢ়তায় সবল। তাহাদেরও যে স্বতন্ত্র সত্তা আছে, শরৎচন্দ্রের লেখাতেই তাহা প্রকটিত হইয়াছে। নিবিড় পর্যবেক্ষণশক্তি শরৎচন্দ্রের বিশিষ্টতার অন্যতম কারণ।

রবীন্দ্রযুগে এই সকল মহাগুণের অধিকারী হইয়াও শরৎচন্দ্র যে সমাদর লাভ করিয়াছেন ইহাই বিস্ময়ের বিষয়।

বঙ্কিম আদর্শবাদী—শরৎচন্দ্র বাস্তববাদী। তবে শরৎচন্দ্র আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু সে আদর্শকে দুর্নীতিদ্বারা ক্ষুণ্ণ করিবার প্রয়াসী তিনি নহেন। তাঁহাব কাছে ক্ষমাহীন ধর্মের কোন স্থান নাই—প্রীতিশূন্য সমাজের ভণ্ডামি তাঁহার অসহ্য। শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' (১৯১৫), 'অরক্ষণীয়া' (১৯১৬) এই দুই উপন্যাসে সমাজের উৎপীড়ন ও স্বেচ্ছাচারিতাব চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে পল্লীসমাজের রমেশ ও বিশ্বেশ্বরীর চরিত্র ভাবপ্রবণতায় বাস্তবের গণ্ডী ছাড়াইয়া উর্ধ্বে উঠিয়াছে। তাঁহার 'দেনা-পাওনা'র নায়িকা অলকা অসহ্য পীড়নের ও প্রতিকূলতার মধ্যে অতি নিম্নস্থান হইতে ধাপে ধাপে উঠিয়া কি করিয়া চরিত্রের দৃঢ়তায় এবং পবিত্রতায় চণ্ডীগড়ের ভৈরবীর স্থান অধিকার করিল এবং জীবানন্দের জীবনকে প্রচলিত গতিপথ হইতে অন্য ধারায় প্রবর্তিত করিল তাহা অত্যন্ত বিস্ময়কর। কিন্তু ইহা বিস্ময়কর হইলেও বাস্তবতার উপর প্রতিষ্ঠিত। শরৎচন্দ্র নিজে যাহার সত্যতা উপলব্ধি করেন নাই—এরূপ কোন চরিত্র তাঁহার

রচনায় স্থান পায় নাই। বঙ্কিম বালিকা প্রফুল্লকে ভবানী পাঠকের হাতে দিয়া দেবীরানী গড়িয়াছিলেন—তারপর তাহাকে শুভসংসার-রচনায় পাঠাইয়াছিলেন। আর শরৎচন্দ্র অধঃপতিত স্থান হইতে বালিকা অলকাকে কুড়াইয়া লইয়া জীবনের পদে পদে অনিশ্চয়তায় এবং প্রতিকূলতার মধ্যে তীব্র দহনে পোড়াইয়া পোড়াইয়া বিশুদ্ধ হেমে পরিণত করিলেন। এখানে ভবানী পাঠকের সহায়তায় নিষ্কাম কর্মযোগের অভ্যাস নাই। এখানে আছে শুধু একজন অসহায় নারীর প্রতিকূলতার মধ্যে জীবনসংগ্রামে লিপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে আপনার বিশিষ্ট জীবনপথে টিঁকিয়া থাকা। শরৎচন্দ্র ষোড়শীকে প্রচলিত সংসারে ফিরাইয়া পাঠাইলেন না, কারণ তাহার উপায় ছিল না। তাই তিনি জীবানন্দকে মানুষ করিবার কাজে তাহাকে লাগাইলেন এবং বৃহত্তর মানবসমাজের কল্যাণে ব্রতী করিয়া তাহার জীবনকে সার্থকতায় পরিপূর্ণ করিলেন।

'চরিত্রহীন' ও শ্রীকান্তে' প্রেমের সনাতন ধারাকে তিনি রক্ষা করেন নাই। এখানে মূলতঃ সমাজ-সমর্থিত প্রেমধারার বিরুদ্ধে সমস্যা উপস্থিত করিয়া পাঠকের উপর তাঁহার স্বাধীন বিচারের ভার ন্যস্ত করিয়াছেন। 'শ্রীকান্তে' লোকচক্ষুর অন্তরালে 'অন্নদাদিদির' পাতিব্রত্য স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

শরৎচন্দ্রের রচনায় হাস্যরস, 'দত্তা'র রাসবিহারী চরিত্রের সংকীর্ণতায়, 'শেষ প্রশ্নের' অক্ষয় চরিত্রের ক্রূরতা, 'রামের সুমতি'র দিগম্বরী চরিত্রের স্বল্পবুদ্ধিতা, বিদ্রূপ-দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছে। টগর বোষ্টমীর (শ্রীকান্ত) অদ্ভুত আচরণ, 'বৈকুণ্ঠের উইলে'র গোকুল চরিত্রের সরলতা হাস্যরসের সহিত মাধুর্যে মণ্ডিত।

শরৎচন্দ্র শিশুচরিত্রের প্রতি বিরাট সহানুভূতিসম্পন্ন লেখক। 'শ্রীকান্তে'র শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথ, 'দত্তা'র পরেশ, 'রামের সুমতি'র রাম সরলতা, সাহসিকতা এবং পরের জন্য আত্মত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত—কিন্তু স্নেহের কাছে ইহারা চিরবন্দী।

ছোট গল্প রচনায়ও শরৎচন্দ্রের লেখনী সার্থক হইয়াছে। 'মহেশ' তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ ছোট গল্প। অতি দরিদ্র এক কৃষক একটি অনাহারে অকর্মণ্য ষাঁড়কে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিয়া সহানুভূতিহীন গ্রামে কি করিয়া তাহাকে নিজ হস্তে হত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছিল তাহারই মর্মন্তুদ কাহিনী এই গল্পের বিষয়। শরৎচন্দ্র তাঁহার অনবদ্য ভাষায় সমাজের নির্মমতা ও ক্রূরতার জীবন্ত চিত্র এখানে অঙ্কিত করিয়াছেন।

শরৎচন্দ্রের রচনায় ভাবের অনুযায়ী ভাষার স্বচ্ছতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাঁহার প্রকাশভঙ্গী বঙ্কিমযুগের পর রবীন্দ্রযুগেও বাঙ্‌লা ভাষাকে বহু দূরে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। বাঙ্‌লা ভাষার জন্য যাঁহারা প্রাণবান্ সরল গদ্য রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে শরৎচন্দ্রের নাম অবিস্মরণীয়।

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী

(১৮৬১ আবির্ভাব—১৯৪১ তিরোভাব) = ৪০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ক্ষণজন্মা পুরুষ। তিনি কবি, ঋষি, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ। ভারতের ইতিহাসে মহাকবি কালিদাসের পর এত উচ্চস্তরের কবিপ্রতিভা লাভ করিবার সৌভাগ্য অন্য কাহারো মধ্যে দেখা যায় নাই।

(বৈদিক ঋষিগণ শতবৎসর জীবিত থাকিয়া কল্যাণ কর্মের অনুষ্ঠান করিতে চাহিতেন। রবীন্দ্রনাথও প্রায় শতবৎসর জীবিত থাকিয়া তাঁহার প্রাণ এবং গানকে ভারতের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন, আর নিখিল বিশ্বে ভারতের অন্তরাত্মাকে প্রসারিত করিয়াছেন। তিনি ভারতের জাতীয় কবি হইয়াও বিশ্বকবি। তিনি যথার্থই "কবি সার্বভৌম"। তাঁহার স্বদেশ হইতেছে তিন ভুবন।

বিগত শত বৎসরে যে আধুনিক ভারতবর্ষ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে রবীন্দ্রনাথের দান অসামান্য। (নবীন ভারতের জয়-যাত্রার পথে তিনি আলোক-বর্তিকা ধরিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অনাদি অতীতকে কথা কহাইয়াছেন, বর্তমানের প্রতি পদক্ষেপ তাঁহার জীবনের গতির সহিত চলিয়াছে, তাঁহার কবিকৃতি ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ তাই তিনি কবি ক্রান্তপ্রজ্ঞ বা ক্রান্তদর্শী।)

তাঁহার সারা জীবনের সাধনা সেই সংস্কৃতির সমন্বয়—'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে'। জগতের একত্বে আর অখণ্ডত্বে তিনি বিশ্বাসী। ('শোনরে একের ডাক' তাঁহার বাণী।) ভারতের জন্য তিনি চাহিয়াছিলেন এইরূপ এক স্বর্গ—

"চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গন তলে দিবস শর্ব্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি"।

রবীন্দ্রনাথ সত্য দ্রষ্টা ঋষি। তিনি সত্যকাম, সত্যসংকল্প। ("মহাবিশ্ব জীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা"।)

মহাকবির জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। (জাতির ঋষিগণ শোধের দীক্ষার দিন সমাগত। মহাকবির জন্মের সপ্ততিতম বর্ষে সপ্তদ্বীপে তাঁহার জন্মজয়ন্তীর জয়শঙ্খ ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সময় হইতে বর্ষে বর্ষে বৈশাখের পুণ্য পঞ্চ বিংশতিতম দিবসে তাঁহার জন্মোৎসব উদযাপিত হইয়া আসিতেছে।

এই সমগ্র দেশব্যাপী জন্মোৎসবগুলিতে আনন্দ, উৎসাহ ও উদ্দীপনার অভাব নাই। ইহা জাতির জীবনের লক্ষণ। স্থায়ী পরিকল্পনা গঠনের পূর্বে এরূপ উৎসাহ উদ্দীপনার মূল্য অস্বীকার করা চলে না।) রবীন্দ্রনাথ সুন্দর ভুবনে মরিতে চাহেন নাই—তিনি মানবের হৃদয়ে স্থান চাহিয়াছেন। ('এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে জীবন্ত হৃদয়মাঝে যদি স্থান পাই'।)

অযুত বর্ষ পূর্বের নবীন বসন্ত বারে বারে পৃথিবীতে আসিয়াছে। তাহাদের সহিত কবি বর্ষে বর্ষে সংযোগ স্থাপন করিয়া আসিয়াছেন—কবির নিকট জীবন

অনন্ত। বত্রিশ বৎসর বয়সে 'শতবর্ষ পরে'র (১৪০০ সালের) অনাগত নবীন কবির উদ্দেশ্যে মহাকবি তাঁহার বাণী রাখিয়া গিয়াছেন।—

"আজি হ'তে শত বর্ষ পরে
এখন করিছে গান সে কোন্ নূতন কবি
তোমাদের ঘরে?
আজিকার বসন্তের আনন্দ-অভিবাদন
পাঠায়ে দিলাম তাঁর করে।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বসন্তের গান নবীন কবির হৃদয়স্পন্দনে ধ্বনিত হইবার আশা পোষণ করেন।

মহাকবি তাঁহার বাঙ্‌ময়ী মূর্তি রাখিয়া লোকান্তরে গমন করিয়াছেন।

জাতির কর্তব্য ঋষিঋণ শোধের ব্যবস্থা করা। ঋষিশাস্ত্র অধ্যয়ন ও জীবনগঠনদ্বারা ঋষিগণ ঋণ শোধ করিয়া আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থের অধ্যয়ন ও জীবনগঠনদ্বারা ঋষিঋণ শোধ করিয়া আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থের আলোচনা ও তাহা হইতে সত্য আহরণ করিয়া জীবনকে গঠন করাই জাতির কর্তব্য হইবে। যেমন করিয়া ব্যাস বাল্মীকির আর কাশীরাম দাস ও কৃত্তিবাসের বাণীকে সমগ্র দেশ গ্রহণ করিয়াছে—রবীন্দ্রনাথের বাণী সে ভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথ পল্লীর জনসাধারণের নিকট অপরিচিত ও অজ্ঞাত। নগরের শিক্ষিত বা শিক্ষা লাভেচ্ছুগণের নিকট তাঁহার সমাদর। তাঁহার কবিতা সর্বত্রগামী হয় নাই।

"আমার কবিতা জানি আমি
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।

যে মানুষ মাটির কাছাকাছি আছে সে মানুষের অন্তরের খবর কবি দিতে পারেন নাই। তাই তিনি, যে অখ্যাত কবি সেই খবর তাঁহাকে দিবেন তাঁহারই জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন—

"যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।"

তাই প্রথম কাজ হইবে জয়ন্তীর দিনে রবীন্দ্র সাহিত্য প্রচারের সংকল্প গ্রহণ। ইহাই হইল ঋষিঋণ পরিশোধের দীক্ষা গ্রহণ। জনসাধারণ যাহাতে সাহিত্য হইতে সার্বজনীন ভাব ও দেশাত্মবোধক সংগীত গ্রহণ করিতে পারে তাহার জন্য পরিকল্পনানুযায়ী কর্ম আরম্ভ করিতে হইবে।

রবীন্দ্র গ্রন্থরাজির সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা ছাড়া প্রচার কার্য অসম্ভব। সহজ ও সরল প্রবন্ধ, গান ও কবিতার সংকলন বাহির করিতে পারিলে কার্যক্রম সুগম হইবে।

রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নহেন, তিনি শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক। তাঁহার শিক্ষা পরিকল্পনা প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। তাঁহার প্রদর্শিত পথে জীবনধারাকে প্রচলিত

করিবার চেষ্টা করিলে সুফল ফলিতে পারে। যে সকল গ্রন্থে তিনি উচ্চ কোটির চিন্তাধারা পরিবেশন করিয়াছেন—তাহাদের ব্যাখ্যা রচনা করা উচিত হইবে। গ্রামে গ্রামে তাঁহার দেশাত্মবোধক গান শুনাইবার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে গ্রামবাসী তাঁহার চিন্তাধারার সহিত আপনাদিগকে মিলাইতে পারিবে।

পরিশেষে বৎসরান্তে প্রতি জন্মজয়ন্তী দিনে গত এক বৎসরের কার্যের গতির হিসাব করিতে হইবে। তাহাতেই কার্যক্রমের ত্রুটি ধরা পড়িবে।

বাঙলাদেশের বাহিরে প্রবাসী বাঙালী এবং বাঙ্‌লা যাহাদের মাতৃভাষা নহে তাহাদের জন্যও এ বিষয়ে বাঙলাদেশের কিছু করণীয় আছে। বাঙ্‌লা হইতে প্রেরণা লাভ না করিলে বাঙ্‌লার বাহিরে কাজ হওয়া কঠিন। বাঙ্‌লার বাহিরের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা পঠন-পাঠনের ও গবেষণার ব্যবস্থা করিতে পারিলে সুফল হইতে পারে। এই পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হইলেই সেইসঙ্গে রবীন্দ্র সাহিত্যের গুরুত্ব উপলব্ধ হইতে পারে।

ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

কোন জাতিকে জগতে মানুষের মতো বাঁচিয়া থাকিতে হইলে ও তাহার স্বাধীনতা বা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করিতে হইলে চাই তাহার সর্বাঙ্গীন অভ্যুদয়।

বিদেশী শাসনের অধীনে থাকিয়া কোন জাতির সর্বাঙ্গীন অভ্যুদয় সম্ভবপর নহে। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী যখন ভারত ছাড়িয়া সাগর পাড়ি দিল, তখন জগতের অন্য উন্নতিশীল জাতির তুলনায় ভারতবর্ষ কত পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। ভারতের লোকবল, স্বাভাবিক সম্পদবল সবই রহিয়াছে, অথচ এই সব সম্পদ ও লোকবলের যথোপযুক্ত ব্যবহারের ব্যবস্থা নাই।

দেশের ব্যাপক কর্মহীনতা, স্বাস্থ্যহীনতা, নিরক্ষরতা, অর্থনৈতিক অবনতি দিন দিন ভয়াবহ আকার ধারণ করিতেছে দেখিয়া ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর প্রেরণায় পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে ডাঃ মেঘনাদ সাহা, ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ প্রভৃতিকে লইয়া একটি "জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি" গঠিত হয়। পরিকল্পনা রচনা ব্যতীত উহার আর কোন কার্য পরিলক্ষিত হয় নাই।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকার পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে সমগ্র ভারতের কল্যাণের জন্য ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে এক 'পরিকল্পনা কমিশন' স্থাপন করিলেন। এই কমিশন "প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা" রচনা করেন। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য আরম্ভ হয়।

জগতে রুশদেশ এইরূপ পাঁচশালা পরিকল্পনার পথ প্রদর্শন করে। কমিউনিস্ট রুশদেশের গবর্ণমেন্টের হাতে জাতির সমস্ত সম্পদ থাকায় সেখানকার কার্য যে ভাবে সাফল্য লাভ করিয়াছে অন্যত্র তাহা আশা করা যায় না। ধনতান্ত্রিক দেশের মধ্যে ভারতবর্ষই সর্বপ্রথম এই প্রকার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার তাৎপর্য এই যে প্রত্যেক পাঁচ পাঁচ বৎসর ধরিয়া পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিতে হইবে।

যে পর্যন্ত পরিকল্পনার লক্ষ্যে না পৌঁছান যায় সে পর্যন্ত এইরূপ পরিকল্পনা অনুসারে কার্য চলিতে থাকিবে। ভারতের কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র (১) কৃষি (২) শিল্প (৩) পরিবহন ও যোগাযোগ (৪) সেচ ও জলবিদ্যুৎ (৫) শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ (৬) পুনর্বাসন (৭) বিবিধ—এই সাতটি বিষয়ে অভ্যুদয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন।

১৯৫১ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৫৬ মার্চ পর্যন্ত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যকাল। এই সময়েব মধ্যে কৃষিজাত উৎপাদন ১৯ ভাগ, শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। রেলওয়েব ব্যাপক উন্নতি হইয়াছে। সেচ পরিকল্পনা কার্যকরী হওয়ার ফলে ৬০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইয়াছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনও এই সময়ের মধ্যে পূর্বের উৎপাদনের প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে।

দামোদর, ময়ূরাক্ষী, শতদ্রু পরিকল্পনা, চিত্তরঞ্জন, সিন্দ্রী প্রভৃতি কারখানা উন্নয়ন, বিশাখাপত্তনে নৌ-নির্মাণ শিল্পের অগ্রগতি, হিন্দুস্থান বিমানকেন্দ্রের উন্নতি, বহির্বাণিজ্যের বিকাশ, প্রভৃতি প্রথম পরিকল্পনার সাফল্যের লক্ষণ।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে এত উন্নতি হইলেও এই পরিকল্পনায় কতকগুলি ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে যত খরচ করিবার কথা ছিল তাহা খরচ করা হয় নাই। এই পাঁচ বৎসরে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ১৭.৫ ভাগ। তবে এই পাঁচ বৎসরে রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভবপর হয় নাই। ২৩০ কোটি টাকা রাজস্ব বৃদ্ধিব পরিবর্তে বৃদ্ধি হইয়াছে মাত্র ৮০ কোটি টাকা; কিন্তু উন্নয়ন-মূলক ব্যয় বৃদ্ধির ফলে ৪২০ কোটি টাকা অতিরিক্ত ঘাটতি ব্যয় হইয়াছে। আন্তর্জাতিক লেনদেনের হিসাব দেশের অনুকূলে ছিল।

এই সময়ে ৪৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হইয়াছে। ইহা বেকারের বিপুল সংখ্যার তুলনায় অতি নগণ্য। দেশব্যাপী বিরাট দারিদ্র্য পূর্বের ন্যায় মাথা তুলিয়া রহিয়াছে।

চারিটি উদ্দেশ্য লইয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল :—(১) প্রতি বৎসর শতকরা ৫ ভাগ জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা (২) ১২০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানে সুযোগ সৃষ্টি করা (৩) বৃহত্তর শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করা (৪) ধনবৈষম্য যথাসম্ভব দূর করিয়া সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ সংগঠন।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। ভবিষ্যতে দ্রুত উন্নয়ন কার্যের মূলে রহিয়াছে বৃহৎ শিল্পের উন্নতি। ইহাতে কর্ম-সংস্থানের সুযোগ অবশ্য কম। এই কারণে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারের জন্য দুইশত কোটি টাকা খরচের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

১৯৬১ সালের মার্চমাসে দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকাল শেষ হইয়াছে এবং

এপ্রিল মাস হইতে তৃতীয় পরিকল্পনার কাজ শুরু হইয়াছে। এই দশ বৎসরের পরিকল্পনার ফলে আমাদের সর্বাঙ্গীন উন্নতি হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। এই দশ বৎসরে দেশের খাদ্যের উৎপাদন শতকরা ৪৬ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কৃষি ও শিল্পোৎপাদন যথাক্রমে শতকরা ৪১ ভাগ ও ৯৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ৪২ ভাগ। মাথাপিছু আয় বাড়িয়াছে শতকরা ১৬ ভাগ।

বিগত দশবৎসরের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়াই তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। পূর্বেকার দুইটি পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলি ছাড়াও ইহার অতিরিক্ত দুইটি উদ্দেশ্য আছে। ইহা হইল খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করা এবং আগামী দশ বৎসরের মধ্যে যন্ত্রশিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করা। দেশের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যদি দেশেই উৎপন্ন করা যায় তবে দ্রুত শিল্পোন্নতি করা যায়। এই পরিকল্পনায় মোট ১১,৬০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। ইহা সার্থক হইলে আগামী ১৯৬৫-৬৬ সনে জাতীয় আয় শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে। আর মাথা-পিছু আয় শতকরা ১৭ ভাগ অর্থাৎ ৩৩০ টাকা হইতে ৩৮৫ টাকা হইবে।

আমাদের পরিকল্পনা যতই ত্রুটিপূর্ণ হউক না কেন উহার দৃষ্টিভঙ্গি উদার এবং বলিষ্ঠ। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ সংগঠিত না হইলে আমাদের দেশের ধনবৈষম্য কোনরূপে দূরীভূত হইবার নহে। বর্তমান পরিকল্পনায় সমাজতান্ত্রিক আদর্শের গুরুত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। যে কোনরূপ পরিকল্পনাই হউক না কেন তাহার গঠনমূলক সমালোচনায় সুফল লাভ হইতে পারে। কোন বৃহত্তর কার্যক্রম চালাইতে গেলে সব সময়ে আশানুরূপ ফল লাভ হয় না। তাই বলিয়া সব কাজকে সমালোচনা করিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। আমাদের বাঁচিয়া থাকিতে হইলে পরিকল্পনা ও তাহার কার্যক্রম অবশ্য প্রয়োজনীয় এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না।

ভারতের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা

পররাষ্ট্র ব্যাপারে ভারত শান্তিপূর্ণ নীতি গ্রহণ করিয়াছে। আক্রান্ত না হইলে সে কখনই অন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে না। তাই বৈদেশিক শত্রুর হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য একটি স্থায়ী সৈন্যবাহিনী রাখা প্রয়োজন। এই সৈন্যবাহিনীর সংগঠন পরিচালনার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পণ করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার প্রতিরক্ষা কমিটি সাধারণতঃ নীতি নির্ধারণ করে। প্রধানমন্ত্রী এই কমিটির সভাপতি।

অন্যান্য দেশের মত আমাদের সৈন্যবাহিনীও তিন ভাগে বিভক্ত—স্থল, নৌ ও বিমান। রাষ্ট্রপতি এই তিন বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। তবে এই তিন বিভাগের তিনজন প্রধান আছেন। নিজ নিজ ক্ষেত্রে ইঁহারা কাহারও অধীন নহেন। কিন্তু ইংরেজ আমলে জঙ্গী লাটের অধীনে এই তিন বিভাগ ছিল। তবে বর্তমানে

এই তিন বিভাগে কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য বিভিন্ন স্তরে অনেকগুলি কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

স্থলবাহিনী দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম এই তিন ভাগে বিভক্ত। এই তিন ভাগ তিনজন সেনাপতির উপর ন্যস্ত। ইঁহারা লেফটানাণ্ট জেনারেল পদমর্যাদাসম্পন্ন। এই তিন বিভাগ আবার কতকগুলি অঞ্চলে বিভক্ত এবং প্রত্যেক অঞ্চল একজন মেজর জেনারেলের উপর ন্যস্ত। প্রত্যেক অঞ্চলকে আবার কতকগুলি উপবিভাগে ভাগ করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক উপবিভাগের কর্তা একজন ব্রিগেডিয়ার।

স্থলবাহিনীর প্রধান কেন্দ্র দিল্লী। প্রধান সেনাপতি ইহার কাজকর্ম দেখাশুনা করেন। ইহার ছয়টি বিভাগ আছে এবং উহা দেখাশুনার ভার এক একজন মেজর জেনারেলের উপর ন্যস্ত। এই ছয়টি বিভাগের নাম সাধারণ বিভাগ, এড্‌জুটাণ্ট জেনারেলের বিভাগ, কোয়ার্টার মাষ্টার জেনারেল বিভাগ, অস্ত্র সংগ্রহ বিভাগ, ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ এবং মিলিটারী সেক্রেটারী বিভাগ। সাধারণ বিভাগ সৈন্যদের শিক্ষা, প্রতিরক্ষাসংক্রান্ত সংবাদ আদান-প্রদান, কর্মচারীদের কাজ, সৈন্যবাহিনীর পরিচালনা প্রভৃতি ব্যবস্থা করিয়া থাকে। এড্‌জুটাণ্ট জেনারেল বিভাগের কাজ সৈন্যবাহিনীর নিয়োগ, চিকিৎসার ব্যবস্থা, বিচার ইত্যাদি। কোয়ার্টার মাষ্টার জেনারেল পরিবহন, যোগাযোগ ও সৈন্যবাহিনীর রসদ সংগ্রহ প্রভৃতি দেখাশুনা করেন। সৈন্যবাহিনীর তিন শাখার যাবতীয় নির্মাণ ও মেরামতের কার্য পরিচালনা করে ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ। মিলিটারী সেক্রেটারীর কাজ অনেকটা বেসামরিক চীফ সেক্রেটারীর মত। তিনি অফিসারদের নিয়োগ, বদলী, উন্নতি ইত্যাদি বিষয় দেখাশুনা করেন।

ভারতের তিনদিক সমুদ্রবেষ্টিত এবং ইহার উপকূল রেখা ৩৫০০ মাইল। দেশবিভাগের পর ভারতের অংশে যে দীর্ঘ উপকূল পড়ে তাহা রক্ষা করিবার পক্ষে নৌবাহিনী একবারেই অকিঞ্চিৎকর ছিল। তাছাড়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি শিক্ষাকেন্দ্র পাকিস্তানের ভাগে পড়ে। তাই প্রথম হইতেই আমাদের নৌ-বাহিনীর উন্নতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়। এখন আমাদের মোটামুটি প্রয়োজনীয় সবকিছুই আছে। এই বিভাগের নিজস্ব একটি বিমান বহরও আছে। দিল্লীতে ইহার প্রধান কর্মকেন্দ্র। প্রধান সেনাপতিকে সাহায্য করিবার জন্য চারজন সহকারী অফিসার আছেন। এই বাহিনীর চারিটি শাখা আছে। ইহার মধ্যে একটি ভাসমান অর্থাৎ সমুদ্রের মধ্যে, বাকি তিনটি সমুদ্রের তীরে।

শান্তি এবং যুদ্ধের সময় বিমানবাহিনীর গুরুত্ব খুব বেশি। ভারতের বর্তমান বিমানবহর স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরবর্তী যুগে গড়িয়া তোলা হইয়াছে বলা যাইতে পারে; কারণ রয়াল এয়ার ফোর্স অপসারিত হইবার পর যাহা রহিল তাহার আবার এক-তৃতীয়াংশ পাকিস্তানের ভাগে পড়িল। তাছাড়া দেশের স্থায়ী বিমান-ঘাঁটির প্রায় সবগুলিই পাকিস্তানে গেল। ফলে আমাদের নূতন করিয়া অনেকগুলি ঘাঁটি স্থাপন করিতে হইয়াছে।

বিমানবাহিনীর দেখাশুনার ভার একজন প্রধান সেনাপতির উপর ন্যস্ত আছে। ইহার প্রধান কেন্দ্র তিনটি শাখায় বিভক্ত এবং তিনজন সেনাপতি ইহাদের দেখাশুনা করেন। এক একটি বিভাগ উপ-প্রধান সেনাপতি নিজে দেখাশুনা করেন। অন্য দুইটি বিভাগ সংগঠন এবং কারিগরি ও যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত কাজ দেখাশুনা করে। প্রধান কেন্দ্রের অধীনে তিনটি বাহিনী আছে। দিল্লীর পালাম ঘাঁটিতে অবস্থিত পরিচালনাবাহিনী, সীমান্ত উপবাহিনীগুলির কাজকর্ম দেখাশুনা করে। শিক্ষাসংক্রান্ত বাহিনীটি বাঙ্গালোরে এবং বিমানঘাঁটি রক্ষণাবেক্ষণের বাহিনীটি কানপুরে অবস্থিত।

এই তিন ধরনের স্থায়ী সৈন্যবাহিনী ছাড়া আমাদের আরো চার প্রকারের সহায়ক সৈন্যবাহিনী আছে। মূল সৈন্যবাহিনীকে সাহায্য করিবার জন্য ১৯৪৯ সালে টেরিটোরিয়াল বাহিনী গঠন করা হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য অবসর সময়ে যুবকদের দেশরক্ষার কাজে শিক্ষা দেওয়া এবং কোন সংকট উপস্থিত হইলে ইহাদের সাহায্য গ্রহণ করা। তবে ইহাদের সাধারণতঃ দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োগ করা হয়। এই বাহিনীতে ১৮ হইতে ৩৫ বৎসর বয়স্ক ভারতের নাগরিকেরা যোগদান করিতে পারে। দেশের সীমান্তে যে সকল অধিবাসীরা বাস করে তাহাদের দেশরক্ষার কাজ শিক্ষা দিবার জন্য লোক সহায়ক সেনা গঠন করা হইয়াছে। এই বাহিনীর সদস্য হইলেই যে বাধ্যতামূলক ভাবে যুদ্ধের কাজে পাঠান হইবে এমন নহে। প্রতিরক্ষাসংক্রান্ত সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করাই এই বাহিনীর প্রধান উদ্দেশ্য। দেশ আক্রান্ত হইলে সীমান্তের লোকদের উপর সর্বপ্রথম চাপ পড়ে। তাই ইহাদের শত্রুদের বাধা দিবার মত সাধারণ জ্ঞান থাকা খুবই প্রয়োজন। জাতীয় দেশরক্ষা বাহিনীর কাজ দেশের তরুণদের মধ্যে নেতৃত্ব ও শৃঙ্খলাবোধ জাগাইয়া তোলা। ইহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—উচ্চতন, নিম্নতন ও ছাত্রী বিভাগ। প্রথমোক্ত দুইটি বিভাগ আবার তিনটি শাখায় বিভক্ত—স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী। যে সকল স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা জাতীয় রক্ষা বাহিনীতে ভর্তি হইতে পারে না তাহাদের জন্য সহায়ক-রক্ষা-বাহিনী খোলা হইয়াছে।

আমাদের সৈন্যবাহিনীর একটি বিশেষত্ব এই যে আজকাল ইহাদের শিক্ষা যথাসম্ভব দেশেই দেওয়া হয়। স্থল, বিমান ও নৌ-বাহিনীর শিক্ষাদানের জন্য পুণা শহরের নিকট জাতীয় দেশরক্ষা একাডেমী স্থাপন করা হইয়াছে। এখানে একসঙ্গে যুদ্ধবিদ্যার তিন বিভাগে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর আর কোন দেশে নাই। এই কলেজ হইতে পাশ করিয়া ক্যাডেটরা দেরাদুন সামরিক কলেজে এক বৎসর শিক্ষালাভ করে। ইহা ছাড়া স্থলবাহিনীর বিভিন্ন শাখায় বিশেষ শিক্ষাদানের জন্য দেশের নানা স্থানে বহুসংখ্যক স্কুল খোলা হইয়াছে। সামরিক উপকরণে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভের উদ্দেশ্যে দেশের নানা স্থানে অনেকগুলি কারখানা খোলা হইয়াছে। তবে এখনও আমাদের

বিদেশ হইতে বহু উপকরণ আমদানি করিতে হয়। যুদ্ধের জাহাজ নির্মাণের জন্য বিশাখাপত্তন বন্দরে নানাপ্রকার ব্যবস্থা হইতেছে। তাছাড়া সামরিক বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে গবেষণার জন্য অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান খোলা হইয়াছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে আমাদের প্রতিরক্ষা খাতে মাত্র চল্লিশ কোটি টাকারও কম খরচ হইত। বর্তমানে ইহা প্রায় ৮০০ কোটি টাকা। ভারতের মত অনুন্নত ও দরিদ্র দেশের পক্ষে ইহা খুবই বেশি। তবে বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশেষ করিয়া কাশ্মীর সমস্যার জন্যই আমাদের এত টাকা নষ্ট হইতেছে। কোন দেশ আক্রমণ করা আমাদের নীতি নহে, কিন্তু আমাদের দেশ আক্রান্ত হইলে তাহা প্রতিরোধ করিবার জন্য আমাদিগকে সবদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। তাছাড়া, যুদ্ধবিগ্রহ না থাকিলেও সৈন্যবাহিনী দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অনেক কাজ করে। দেশবিভাগের পর পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুদের নিরাপদ স্থানে লইয়া আসিবার ব্যাপারে বিমানবাহিনী অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছে। আমাদের দেশে বন্যা তো লাগিয়াই আছে। এই বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে খাদ্যসরবরাহের কাজে বিমানবাহিনীর দান অপরিসীম। কাশ্মীর হইতে হানাদারদের বহিষ্কারের জন্য স্থল ও বিমানবাহিনী অসীম সাহসিকতা দেখাইয়াছে এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছে। ভারতের এই সৈন্যবাহিনী কোরিয়া ও ইন্দোচীনে শান্তি স্থাপন করিয়া বিশ্বসভায় ভারতের মস্তক উন্নত করিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আমাদের সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ ও শান্তির সময়কার কাজে সর্বদাই তাহাদের কর্তব্যপালন করিয়া চলিয়াছে। জাতীয় জীবনে ইহাদের দান অপরিসীম।

আদমসুমারী বা লোকগণনা

(Census)

আদমসুমারী বা 'সেন্সাসে'র আভিধানিক অর্থ সরকারীভাবে নানা পরিসংখ্যান-সহ কোন দেশের লোকগণনা। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জও সেন্সাসের এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। মোটামুটিভাবে, আধুনিক লোকগণনায় দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও জনতত্ত্ব সম্বন্ধে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হয়। তবে এই গণনা কোন একটি বা কয়েকটি বিশেষ সময়ের ভিত্তিতে করা হয়।

পৃথিবীতে কোন্ যুগে এবং কোন্ দেশে সর্বপ্রথম লোকগণনা হয় তাহা সঠিকভাবে বলা যায় না। 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে অতি প্রাচীনকালে ইস্রাইল, পারস্য সাম্রাজ্য, মিশর ও চীন দেশে লোকগণনা ব্যবস্থা চালু ছিল। ঐতিহাসিক হেরোডটাসের লেখা হইতে জানা যায় যে গ্রীসদেশের এথেন্সের শাসনব্যবস্থায় সোলন লোকগণনার প্রবর্তন করেন। তবে পণ্ডিতগণের মতে রোম সাম্রাজ্যে Servius Tillius সর্বপ্রথম নিয়মিতভাবে সেন্সাস ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ঐ দেশে প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর অন্তর লোকগণনা করা হইত। ইহাতে দেশের প্রত্যেক পরিবারের সম্পত্তির

পরিমাণ অর্থাৎ কাহার কত জমি, গবাদি পশু, ক্রীতদাস প্রভৃতি আছে তাহা গণনা করা হইত।

আমাদের দেশেও অতি প্রাচীনকালে লোকগণনা হইত। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজসভায় গ্রীক দূত মেগস্থেনিস বলিয়াছেন যে, একপ্রকার রাজকর্মচারী, "যাহাতে নির্ধারিত কর আদায় হইতে পারে এবং উচ্চনীচ কাহারও জন্মমৃত্যু রাজার অবিদিত না থাকে, সেইজন্য কোন্ সময়ে এবং কি প্রকারে জন্মমৃত্যু ঘটে, তাহার অনুসন্ধান করেন।"

মেগস্থেনিসের এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় কৌটিল্য প্রণীত 'অর্থশাস্ত্র' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে। ইহা হইতে দেখা যায় যে সেন্সাস দপ্তর একটি পাকা রাজকীয় দপ্তর ছিল। আধুনিককালের মত উহা একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর অনুষ্ঠিত হইত না। এই দপ্তরে বহুসংখ্যক লোক কাজ করিতেন এবং বিভাগীয় প্রধানকে বলা হইত 'সমাহর্তা'। তিনি অবশ্য লোকগণনার কাজ ছাড়াও রাজস্ব আদায়, হিসাব পরীক্ষা, ভূমির জরীপ প্রভৃতি অন্যান্য কাজও দেখাশুনা করিতেন। তাঁহার অধীনস্থ অঞ্চলকে (প্রদেশ) চারিটি জেলায় ভাগ করা হইত এবং প্রত্যেক জেলাকে আবার অনেকগুলি গ্রামে ভাগ করা হইত। জেলার প্রধানকে 'স্থানিক' বলা হইত। স্থানিকরা গ্রামের কাজ দেখাশুনার জন্য 'গোপ' নামক কর্মচারী নিযুক্ত করিতেন। গোপেরা পাঁচটি বা দশটি গ্রামের কাজ দেখাশুনা করিতেন। ইঁহাদের সকলের কাজ দেখাশুনার জন্য প্রদেষ্টা (Inspector) থাকিতেন। তাছাড়া গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য একদল চরও থাকিতেন।

গোপেরা চতুর্বর্ণের লোকগণনা করিতেন। তাহারা প্রত্যেক গৃহে কত কৃষক, গোপনিক, বণিক, কারিগর, ক্রীতদাস, বৃদ্ধ বা যুবা আছেন তাহার হিসাব নিতেন। ইহাদের আয়, বৃত্তি, চরিত্র ইত্যাদিও অনুসন্ধান করিতে হইত। ইহা ছাড়া, প্রত্যেক গৃহে কত গৃহপালিত জন্তু আছে, কোন্ গৃহের কত কর, কাহার কত সোনা আছে তাহারও হিসাব নিতে হইত।

চরেরা প্রতি গ্রামে কত লোক বাস করে, কত গৃহ আছে, ইহাতে কত পরিবার বাস করে, প্রত্যেক পরিবারের লোকদের বৃত্তি কি, প্রত্যেক পরিবারের আয়-ব্যয় ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান করা হইত। ইহা ছাড়া, তাহারা কত লোক গ্রামে প্রবেশ করিল এবং কত লোক গ্রাম ছাড়িয়া গেল তাহার হিসাব এবং কারণও তাহাদের অনুসন্ধান করিতে হইত।

শহরের আদমসুমারী অধিকর্তার নাম ছিল নাগরক। প্রত্যেক শহরকে চার ভাগে ভাগ করা হইত, এবং প্রত্যেক অংশই 'স্থানিক' নামক কর্মচারী দেখাশুনা করিতেন। ইহাদের অধীনে আবার 'গোপ' নামে কর্মচারী থাকিতেন। তবে ইহাদের পরিশ্রম লাঘব করিবার জন্য নগরের বিশেষ বিশেষ ধরনের অধিবাসীদের নিজ গৃহ ও পরিবারসংক্রান্ত তথ্য নাগরককে জানান বাধ্যতামূলক ছিল।

প্রাচীন ভারতের এই ধরনের আদমসুমারী ব্যবস্থার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক

গুরুত্ব ছিল খুব বেশি। ইহা নিঃসন্দেহে বড় সাম্রাজ্য পরিচালনায় বিশেষ সহায়তা করিত। কর ধার্য ও আদায়ের বিশেষ সহায়তা করিত এবং সর্বোপরি দেশের জনগণের পার্থিব প্রগতির একটি সূচির কাজ করিত।

আধুনিককালের সেন্সাস আরো ব্যাপক। ইহাতে জনগণের স্বাস্থ্য, আয়, পরিধেয়, শিক্ষা প্রভৃতি নানা বিষয়ে খবর থাকে। কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র এই সকল সংবাদের ভিত্তিতে জনগণের মঙ্গলসাধনের ব্যবস্থা করেন। তাই আধুনিক কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রে সেন্সাসের গুরুত্ব খুব বেশি। সেন্সাসের মাধ্যমে দেশের সঠিক চিত্র পাইতে হইলে জনসাধারণকে সত্য সংবাদ দিতে হইবে। তাহা না হইলে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। এইজন্য আজকাল সঠিক তথ্য নাগরিককে জানান বাধ্যতা-মূলক করা হয়।

বর্তমান যুগে কানাডার নোভোস্কোসিয়া প্রদেশে আধুনিক পদ্ধতিতে সেন্সাস আরম্ভ করা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে আমেরিকায় এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে সেন্সাস শুরু হয়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে সর্বপ্রথম ইহা স্বীকৃত প্রথারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৫১ সালে স্বাধীন ভারতে প্রথম আদমসুমারী হইয়াছে। সংবিধানে আদমসুমারীকে কেন্দ্রীয় বিষয় বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ১৯৪৮ সালে সর্ব-ভারতে প্রযোজ্য সেন্সাস আইন পাশ করা হয়। এই আইন অনুযায়ী সেন্সাস অফিসার কোন লোককে সেন্সাস-সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন করিলে তাহার পক্ষে তাহার সঠিক বা সত্য উত্তর প্রদান করা বাধ্যতামূলক। অবশ্য সরকারও তাহার প্রদত্ত উত্তর গোপন রাখিবেন।

সমগ্র দেশের আদমসুমারীর সর্বময় অধিকর্তা রেজিস্ট্রার জেনারেল অফ ইণ্ডিয়া। প্রত্যেক রাজ্যে একজন করিয়া সুপারিনটেনডেণ্ট আছেন। সেন্সাসের জন্য জেলাগুলিকে মহকুমায়, থানা এবং মৌজায় বিভক্ত করা হয়। ভারতে রাজস্ব আদায়ের সবচেয়ে ছোট ইউনিট হইল মৌজা, সেন্সাসের ক্ষেত্রেও তাই।

আমাদের দেশে প্রতি দশ বৎসর অন্তর লোক গণনা করা হয়। ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে আর একটি আদমসুমারী হইয়াছে। ইহা ভারতের দশম আদমসুমারী। এই আদমসুমারীর গুরুত্ব খুব বেশি। কারণ ১৯৫১ সালের নবম আদমসুমারীর সময় প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হয়, আর এই আদমসুমারীর সময় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ সমাপ্তপ্রায়। সুতরাং এই সেন্সাস হইতে গত দশ বৎসরে পরিকল্পনার ফলে আমাদের কতটা পার্থিব উন্নতি হইয়াছে তাহা জানা যায়। অন্যদিকে ইহা চূড়ান্ত তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচনার বিশেষ সহায়তা করিয়াছে।

১৯৬১ সালের সেন্সাস হইতে আমরা অনেক তথ্য জানিতে পারি। ভারতের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ৪৩'৮ কোটি। ইহার মধ্যে ২২'৪৯ কোটি পুরুষ। ৩৫'৮৫ কোটি গ্রামে বাস করে। গত দশ বৎসরে প্রায় শতকরা ২১'৪৯ ভাগ জনসংখ্যা

বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাতটি রাজ্যে অবশ্য লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার সর্বভারতীয় হার অপেক্ষা কম, আবার পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি ৮টি রাজ্যে বেশি। আসামে বৃদ্ধির হার ৩৪·৩০, আর পশ্চিমবঙ্গে বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ৩২·৯৪ হারে। এই সেন্সাস অনুযায়ী ভারতে জনবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে ৩৮৪ জন। কেরলে ইহা ১১২৫ জন, আর পশ্চিমবঙ্গে ১০৩১ জন। জনসংখ্যার স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত দাঁড়াইয়াছে হাজার পুরুষপ্রতি ৯৪০ জন স্ত্রী। (১৯৬১ সালে) ভারতে এক লক্ষেরও বেশি লোক বাস করে এইরূপ ১১২টি শহর আছে। শিক্ষাক্ষেত্রে দেখা যায় যে দেশে প্রায় দশ কোটি শিক্ষিত লোক আছে। ছেলেদের মধ্যে শতকরা ৩৩·৯ জন এবং মেয়েদের মধ্যে শতকরা ১২·৮ জন সাক্ষর। স্ত্রীপুরুষের সর্বভারতীয় হার শতকরা ২৩·৭ ভাগ। পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরের হার জনসংখ্যার শতকরা ২৯·১। ইহার মধ্যে পুরুষের হার শতকরা ৪০ ভাগ এবং মেয়েদের হার শতকরা ১৬·৮ ভাগ। পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে কেরল, গুজরাট, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র রাজ্যে সাক্ষরের অনুপাত বেশি।

ভারতের সাধারণ নির্বাচন

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পূর্বে ভারত পরাধীন ছিল। ভারতবাসীর খুব সামান্যই নাগরিক অধিকার ছিল। দেশে দায়িত্বশীল গভর্ণমেণ্ট ছিল না। আইন-পরিষদ অবশ্য ছিল, তাহার সভ্যও নির্বাচিত হইত। ইহাতে মাত্র সম্পত্তির মালিক ও শিক্ষিত লোকেরা অংশ গ্রহণ করিতে পারিত; সার্বজনীন ভোটাধিকার ছিল না।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীন হয় এবং ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী হইতে ভারতের সংবিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে। এই সংবিধান অনুযায়ী ভারত একটি গণতান্ত্রিক সার্বভৌম রাষ্ট্র। অর্থাৎ ইহার শাসনকার্য জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত হয়। সংবিধান জাতিধর্ম স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল প্রাপ্তবয়স্ক ভারতীয় নাগরিককে ভোটদানের অধিকার দান করিয়াছেন। তবে বিশেষ কোন অপরাধে অভিযুক্ত অথবা বিকৃত মস্তিষ্কদের নাম ভোটদাতার তালিকাভুক্ত করা হয় না।

ভারতের সংবিধান প্রায় ১৯ কোটি লোকের অর্থাৎ পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার পনের ভাগের এক ভাগকে ভোটাধিকার দান করিয়াছে। ইহার শতকরা ৪৫ ভাগের বেশি স্ত্রীলোক। সংবিধান অনুযায়ী ১৯৫১ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয়। ইহাতে ভোটদাতার সংখ্যা ছিল ১৭৩ লক্ষ। ১৯৫১ সালের ২৫শে অক্টোবর তারিখে সর্বপ্রথম হিমাচল প্রদেশে এবং ইহার পর পর ১৫টি রাজ্যে ভোট গ্রহণ শুরু হয়। ইতিপূর্বে পৃথিবীর অপর কোন গণতান্ত্রিক দেশে এত ব্যাপক ভোটদান হয় নাই। এই নির্বাচনে সারা ভারতে মোট ৪০৬৬টি আসনের নির্বাচন হয়। ইহার জন্য মোট ১,৩২,৫৬০টি ভোটদানকেন্দ্র (১,৯৬,০৮৪টি বুথ) খোলা হইয়াছিল।

ইহাতে মোট ১৮,৬১৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সংসদের ১৮৭৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ৫১ জন মহিলাও ছিলেন। রাজ্যের বিধানসভাগুলিতে ২১৬ জন মহিলা প্রার্থীও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রার্থীদের অধিকাংশই ছিলেন ১৪টি সর্বভারতীয় দলের সদস্য। বাকী সকলে স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপে প্রতিযোগিতা করেন।

এই নির্বাচনে মোট ভোটদাতার শতকরা ৫১'১৫ ভাগ অংশ গ্রহণ করে। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে অবশ্য এই হার শতকরা ৭০'৮ ভাগ। ইহার জন্য মোট ১০'৪০ কোটি টাকা ব্যয় হয়। অর্থাৎ মাথাপিছু ব্যয় এক টাকারও কম। এই প্রথম সাধারণ নির্বাচনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ২৮১ জন মহিলা প্রার্থীর মধ্যে ১১৫ জন নির্বাচিত হইয়াছেন।

ভারতের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন আরম্ভ হয় ১৯৫৭ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে এবং শেষ হয় ঐ বৎসরের ২৮শে মার্চ তারিখে। ইহাতে ভোটদাতার সংখ্যা ছিল ১৯,৩১,২৯,২৪০ জন। ইহার মধ্যে ১২'১৪ কোটি সংসদের এবং ১১'২৩ কোটি রাজ্যের আইনসভায় নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। এবার লোকসভার ৪৯৪টি আসনের জন্য '৪৯৩ জন্য প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। চারিটি রাজনৈতিক দল সর্বভারতীয় দল হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এই নির্বাচনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে সংসদে ২৭ জন এবং রাজ্যের বিধানসভাগুলিতে ১৯৫ জন মহিলা নির্বাচিত হন। ইহার মধ্যে একমাত্র বিহার বিধানসভায় ৩২ জন মহিলা নির্বাচিত হন।

তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত হয়। গত পাঁচ বৎসরে ভারতের জনসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তৃতীয় নির্বাচনে ভোটদাতার সংখ্যা প্রায় ২১ কোটি। ১৯৫৭ সালের নির্বাচন অপেক্ষা ভোটদাতার সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ বেশি। এই সংখ্যা রাশিয়া ও চীন বাদে পৃথিবীর যে কোন দেশের মোট লোকসংখ্যা অপেক্ষা বেশি। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ভোটদাতার সংখ্যা এবার ১৭৯ লক্ষ। ১৯৫৭ সালের তুলনায় ইহা ২৭ লক্ষ এবং ১৯৫২ সালের তুলনায় ৫৫ লক্ষ বেশি। ইহার মধ্যে একমাত্র কলিকাতা মহানগরীতেই মোট ১৫ লক্ষ ভোটদাতা আছেন। বর্তমানে দেশের শিক্ষিতের হারও একটু বাড়িয়াছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং গত তিনটি নির্বাচনের ফলে জনগণের চেতনাও পূর্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে। ফলে অধিকসংখ্যক ভোটদাতা তাহাদের ভোটদানের অধিকারের সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে।

ভারতের জনগণের অধিকাংশই অশিক্ষিত এবং জনসংখ্যা বেশি বলিয়া ইংরেজ আমলে সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তন করা হয় নাই। তাই প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে অনেকেই অনুমান করিয়াছিলেন যে, দেশে একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। কিন্তু ফল হইয়াছে ইহার বিপরীত। প্রথম সাধারণ নির্বাচন জনগণের মধ্যে এক নবচেতনার সঞ্চার করে এবং ভোটদাতাদের শতকরা ৫১'১৫ ভাগ ভোটদান করেন। অন্ধ, পঙ্গু, বৃদ্ধ ভোটদাতারাও বহু কষ্ট স্বীকার করিয়াও ভোট দিয়াছেন।

বহুক্ষেত্রে ভোটদাতারা দীর্ঘপথ পায়ে হাঁটিয়া ভোটদান কেন্দ্রে গিয়াছে। মেয়েরাও অধিকসংখ্যায় ভোটদান কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, অনেক মহিলা প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াও জয়ী হইয়াছেন। যে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা করা হইয়াছিল তাহা ঘটে নাই। মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে ও শৃঙ্খলার সহিত নির্বাচনপর্ব শেষ হইয়াছে।

তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে ভোটদাতাগণের উদ্দীপনা অধিক পরিলক্ষিত হয়। কারণ গত দশ বৎসর তাহাদের রাজনৈতিক চেতনা বাড়িয়াছে, শিক্ষিতের সংখ্যাও বাড়িয়াছে। তাছাড়া দেশে যে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইতেছে তাহার ফলে গ্রামের অনেক লোকই সচেতন হইতেছেন।

তবে আমাদের দেশে এখনও বহুসংখ্যক ভোটদাতা আছেন যাঁহারা ভোট দানের তাৎপর্য সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন না। নানা রাজনৈতিক দলের টানাটানিতে পড়িয়া তাঁহারা বিভ্রান্ত হন। ইহাদের ভোটদান সম্বন্ধে সচেতন করিবার কোন নিরপেক্ষ ব্যবস্থা আমাদের দেশে নাই। আবার আমাদের দেশে একদল শিক্ষিত ভোটদাতা আছেন যাঁহারা নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে মোটেই সচেতন নহেন। ইচ্ছা করিয়াই তাঁহারা ভোটদান হইতে বিরত থাকেন। ভোটদানে অংশ গ্রহণ করা প্রত্যেক নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য। কর্তব্যকর্মে অবহেলা করিলে অধিকার বেশি দিন বজায় রাখা যায় না। অকর্মণ্য লোকের হাতে দেশের শাসনভার যাইবে এবং ফলে দুর্দশার আর সীমা থাকিবে না। তাই প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের কর্তব্য হইল ভোটদাতা হিসাবে নাম লেখান এবং নির্বাচনের দিনে নির্বাচনকেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া উপযুক্ত প্রার্থীকে নির্বাচন করা।

স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী

ইংরাজী ১৯৬৩ সালের জানুয়ারী মাসে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সারা পৃথিবীতে তাঁহার শতবার্ষিকী জন্ম-জয়ন্তী প্রতিপালিত হইয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের অদ্বিতীয় নিষ্কাম কর্মযোগী পুরুষ। তিনি ভারতের যুগযুগের সাধনাকে বহির্বিশ্বে বিস্তৃতির পুরোধা। তিনি শুধু ভারতের নহেন—বিশ্বজগতের পরম কল্যাণপথেরও নির্দেশক। বহুকালের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা এই দেশকে নানাপ্রকার অন্ধ কুসংস্কার দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

মানুষ তাহার প্রকৃত ধর্ম ভুলিয়া পরমাত্মাকে বিস্মৃত হইয়া দেহকে বড় বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিল। ইহার ফলে উচ্চনীচ সামাজিক বিভেদ সৃষ্ট হওয়ায় জাতি বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহার অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্ট হইতেছিল।

এই মোহ হইতে মুক্তির পথনির্দেশ স্বামীজীর জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা ছিল। তিনি ভারতের অগণিত নরনারীর মুক্তি চাহিয়াছিলেন—নিজের মুক্তি তাঁহার নিকট ছিল গৌণ। স্বামী বিবেকানন্দ সত্যসন্ধানী ও সত্য দ্রষ্টা।

স্বামীজী শুধু এ দেশের পুরুষদের সংস্কার, মুক্তি ও স্বাধীনতা কামনা করেন

নাই—নারীজাতির কল্যাণেও স্বামীজী উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। একপক্ষ পক্ষীর উড্ডয়ন যেমন সম্ভবপর নহে তেমনি তাঁহার মতে নারীজাতির কল্যাণ ছাড়া শুধু পুরুষের কল্যাণে সমগ্র ভারতের অগ্রগতি অসম্ভব। তাই স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীমঠ স্থাপন তাঁহার জীবনসাধনায় স্থান পাইয়াছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজকরূপে সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিয়া স্বদেশের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন। অলসতা, জড়তা, অজ্ঞতা এবং সর্বোপরি নিশ্চেষ্ট কাপুরুষতার বিরুদ্ধে তিনি যে অভিযান করেন তাহাতে এক বিরাট প্রাচীন জাতি কর্মের পথে অগ্রসর হয়। ভারত তাঁহার নিকট হইতেই আপনার অন্তরাত্মাকে ফিরাইয়া পাইবার পথের সন্ধান পায়।

শত শত আত্মত্যাগী যুবক যাঁহারা অন্যায়, অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া লোকসেবার মহৎব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দের নিষ্কাম কর্মযোগের আদর্শই তাঁহাদিগকে আত্মত্যাগের অনুপ্রেরণা দিয়াছিল।

ভারতে ধর্মের সাধনপথের নির্দেশ দিবার লোকের কখনও অভাব হয় নাই—অভাব হইয়াছিল অন্নবস্ত্রের, শিক্ষার এবং সামাজিক স্বাধীনতার। আর পাশ্চাত্ত্য জগৎ ঐহিক বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিলেও নিজেদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। তাই পাশ্চাত্ত্য জগতের প্রয়োজন হইয়াছিল আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আর ভারতের দরকার হইয়াছিল সর্বপ্রকার দুর্বলতা পরিহার করিয়া পাশ্চাত্ত্য জাতিসুলভ কর্মপ্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ হওয়া। স্বামীজীর নিষ্কাম কর্মযোগের পথই এ দেশের মুক্তির প্রকৃত পথ। আর আধ্যাত্মিক বলের সহিত ঐহিক ঐশ্বর্যের সমন্বয়মূলক জীবনধারাই পাশ্চাত্ত্য জাতির কল্যাণের পথ।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের হইয়াও সমগ্র বিশ্বের। তাই বিশ্ববাসী তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী সশ্রদ্ধচিত্তে উদ্‌যাপন করিয়াছে। এই জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা হইয়াছে। ইহার আদর্শ শিক্ষার্থিগণকে মহামানবতার অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করা। এখানে জগতের ঐক্যের পথে বিদ্যার্থিগণ আত্মনিয়োগের শিক্ষা লাভ করিবেন এবং প্রকৃত মানুষ হইবেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনা ও সুপরিচালনার দায়িত্ব শুধু ভারতের নহে, উহা বিশ্ববাসীর। এই পরিকল্পনাকে সফল করিতে পারিলে স্বামীজীর স্বপ্ন সফল হইবে এবং জগৎ ঋষিঋণ শোধ করিবার অবকাশ পাইবে।

আণবিক বিস্ফোরণ ও বিশ্বশান্তি

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের জয়যাত্রার যুগ—যাত্রাপথ অভাবনীয় সাফল্যে মণ্ডিত। ইহার শেষ কোথায় কেহ বলিতে পারে না। জগতের সুখ, শান্তি, মৈত্রী সকলে কামনা করিয়া থাকে, কিন্তু অপরকে বঞ্চিত করিয়া কাহারও সুখ ভোগ করা চলে না। পরিণামে এ সুখ নিজেরই অমঙ্গলের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। ইহা জগতের মহামানবগণ যুগে যুগে বলিয়া আসিয়াছেন। তাই বিজ্ঞানের সাফল্যে মানুষ

যেমন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছে, তেমনই অপরপক্ষে বিশ্বধ্বংশের আশঙ্কায় ভীত হইয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় মেক্সিকোতে আণবিক বোমার প্রথম পরীক্ষা হয়। সেইদিন হইতে বিশ্বের মানবজাতির মনে বিস্ময় ও অভূতপূর্ব আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার পর আসে জাপানের হিরোসিমার উপর আণবিক বোমার সর্বধ্বংসী আঘাত। এই আঘাতে হিরোসিমা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। কেবল জাপান নহে, জগতের বাকি অংশও এই বিস্ফোরণের প্রচণ্ড আঘাতের শক্তির কথা বুঝতে পারিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হইল বটে, কিন্তু আণবিক বোমা ও আণবিক শক্তির পরীক্ষা-নিরীক্ষার কার্য পৃথিবীর প্রধান প্রধান রাষ্ট্রে চলিতে থাকিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আণবিক শক্তির গবেষণার কার্য গুপ্ত রাখা হইলেও পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের বহু বৈজ্ঞানিকগণের বহু বর্ষের প্রচেষ্টার ফলেই আণবিক শক্তির আবিষ্কার ও উহা কার্যকর করা সম্ভবপর হইয়াছে।

আইনস্টাইন, বাদারফোর্ড, টমসন, এ্যাণ্ডারসন প্রমুখ বহুসংখ্যক বৈজ্ঞানিকের সমবেত দান হইতেছে এই পরমাণুশক্তির আবিষ্কার ও প্রয়োগ।

বিশ্বের মূলে রহিয়াছে অণুপরমাণুর অবস্থান। এই অণুপরমাণুর শক্তি সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের মনীষীদের জ্ঞানের অভাব ছিল না। তাঁহারা এই শক্তিকে ব্যাবহারিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডালটন সর্বপ্রথম প্রমাণ করিলেন বিশ্বের উপাদান অণুপরমাণু। পরে জানা গেল হাইড্রোজেন বাষ্পের অণুগুলিই সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। এই অণুপরমাণুগুলিই অবিরাম দুরন্ত গতিতে ঘুরিতেছে। ইউরেনিয়াম ধাতুর অণুগুলি কিন্তু অপর সকল অণু হইতে বেশি ভারী। এখন পৃথিবীর সর্বত্র এই ইউরেনিয়াম ধাতুকে গবেষণায় ব্যবহার করা হইতেছে। এই ধাতুর পরমাণুকে ভাঙ্গিয়া প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন কণায় গতি ও তাপ সঞ্চারিত করা হয়। এই গতি ও তাপশক্তি দ্বারাই আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ও ধ্বংস কার্য সম্পন্ন হয়। একটি বোমায় চারি বর্গমাইল যায়গায় প্রায় একলক্ষ লোককে বিনষ্ট করা যায়। পাঁচ-ছয়টি আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটাইয়া লণ্ডন, নিউইয়র্ক প্রভৃতি জনবহুল বিপুল শহরগুলি মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করিতে পারা যায়।

সোভিয়েট রাশিয়া বিগত ৩০শে অক্টোবর (১৯৬১) নবপর্যায়ে পঞ্চাশ মেগাটন শক্তিসম্পন্ন বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ উত্তর মেরু অঞ্চলে ঘটাইয়াছে। এই অমিতশক্তিসম্পন্ন বোমা উত্তর মেরুর আকাশে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া নির্বাপিত হইয়াছে। রাশিয়ার বিস্ফোরণ ঘটাইবার সংবাদ প্রকাশিত হইবার পরই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে নিউট্রন বোমা বিস্ফোরণের সংবাদ প্রচারিত হয়। নিউট্রন বোমা হইতেছে মরণরশ্মি বিকিরণকারী বোমা।

আণবিক বোমায় ইউরেনিয়াম ধাতুর অণু এবং হাইড্রোজেন বোমা বাষ্পে

অণুদ্বারা গঠিত হয়। ধ্বংস কার্যে উভয় প্রকার বোমাই সমান ক্ষমতাশালা। এই দুইটি বোমার তেজষ্ক্রিয়তার ফলে মানুষ বিকলাঙ্গ, বধির এমনকি অন্ধ হইয়া যাইতে পারে। পঞ্চাশ মেগাটনের বোমার শক্তি জাপানের হিরোসিমাতে ব্যবহৃত বোমার শক্তির প্রায় আড়াই হাজার গুণ। রাশিয়াকে বহু রাষ্ট্রপ্রধান এই বোমা না ফাটাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাশিয়া এরূপ অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হয় নাই। শোনা যায় পশ্চিমা শক্তিজোট নাকি রাশিয়াকে নিউক্লিয়ার অস্ত্রদ্বারা আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইতেছে।

পৃথিবী আজ দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ শিবিরে বিভক্ত—আমেরিকার অধিনায়কত্বে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগোষ্ঠী আর রাশিয়ার অধীনে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগোষ্ঠী। ইহারা পরস্পর সমশক্তিশালী হইলে কোন পক্ষই কাহাকে আঘাত করিতে চাহিবে না, কিন্তু শক্তির তারতম্যে বিশ্বধ্বংসী যুদ্ধের সম্ভাবনা প্রবল হইবে।

আণবিক শক্তি প্রয়োগের একটা ভাল দিকও আছে এবং তাহা হইতেছে মানবের কল্যাণ কার্যে এই দানবীয় শক্তির প্রয়োগ। জগতের কল্যাণে ব্যবহৃত হইলে দানবীয়শক্তিও দেবশক্তির পর্যায়ে পড়ে। আণবিক শক্তির বিরাট গতিশক্তিকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখিলে যানবাহন চালনায় উহা কাজে লাগান যায়—চিকিৎসা বিজ্ঞানেও এই শক্তি বিশেষ কাজে ব্যবহৃত হইয়া এই শাস্ত্রে যুগান্তর উপস্থিত করিতে পারে। এই শক্তির সুব্যবহারে পৃথিবীর সভ্যতা বহুভাবে উন্নত হইবে। রাশিয়া মানবের কল্যাণে এই শক্তিকে কিয়দংশে ব্যবহার করিতেছে। এই রাষ্ট্র পাহাড়-পর্বত উড়াইয়া দিয়াও নদীপথের গতি পরিবর্তন সাধন করিয়া অনেক স্থানকে কৃষিকর্মের উপযোগী করিয়াছে। শোনা যায়, সাইবেরিয়ার লক্ষ লক্ষ একর অনুর্বর ভূমিকে আণবিক শক্তির সাহায্যে উর্বর করিয়া শস্যশ্যামল করিবার চেষ্টা চলিয়াছে। পৃথিবীর যত কিছু বড় আবিষ্কার তাহা মানব কল্যাণে প্রযুক্ত হইলে সকলেই সে আনন্দের অংশ গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু বহুযুগের সাধনার ফলকে স্বজাতি মানুষকে মারিবার কাজে লাগাইলে বা তাহার বহুযুগের শিল্পসৃষ্টিকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিলে আণবিক শক্তির প্রতিরোধকল্পে সমগ্র মনুষ্যজাতি দণ্ডায়মান হইবে। কেহবা অধিকতর শক্তিশালী আণবিক শক্তির আবিষ্কারে পূর্ববর্তী আবিষ্কারকে পরাজিত করিবার চেষ্টা করিতেছে—আর অপর সকলে আণবিক শক্তির প্রয়োগ বন্ধ করিবার পক্ষে বদ্ধপরিকর হইয়াছে।

আণবিক শক্তির উন্নততর আবিষ্কার হউক, কিন্তু তাহার সহিত আধ্যাত্মিকতার সংযোগ থাকুক। আধ্যাত্মিকতা ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সামঞ্জস্য বিধান করিলে জগতের শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

বাঙ্‌লার পশুপক্ষী

মানুষ আগে পশুপক্ষীর সহিত অরণ্যে বাস করিত। সে যখন গ্রাম নগর পত্তন করিল এবং রীতিমত গৃহস্থ হইল তখন তাহার প্রয়োজনীয় পশুপক্ষীকেও নিজ

গৃহে পালন করিতে লাগিল। এইভাবে পশুপক্ষী গৃহপালিত হইল। বাকি পশুপক্ষী গৃহের বাহিরে, বনেজঙ্গলে বাস করিতে লাগিল।

বাঙ্‌লা দেশে গৃহপালিত পশুর মধ্যে গোরুই প্রধান। ভারতবর্ষে প্রতি দুইটি লোকের একটি করিয়া গোরু ছিল। বর্তমানে উহার সংখ্যা কমিয়াছে। এই অনুপাতে বাঙ্‌লা দেশে গোরু না থাকিলেও উহার সংখ্যা নেহাৎ নগণ্য নহে। গোরু লাঙ্গল টানে, গাড়ি চালায়, দুধ দেয়। ক্ষীর, সর, ছানা, মাখন গো-জাতির দান। শিশু গোরুর দুধে বাঁচে। জ্বালানি কাঠের পরিবর্তে ঘুঁটে, গোবর ব্যবহার করা চলে।

মহিষ দিয়াও গোরুর মতো কাজ লোকে করায়। মহিষের দুধ শিশুরা হজম করিতে পারে না। মহিষের আদর দুগ্ধব্যবসায়ীর কাছে বেশি—গৃহস্থ গোরুর সেবাযত্নই প্রধানতঃ বেশি করে।

গৃহে বিড়াল প্রত্যেক বাড়িতেই আছে। পোষা বিড়াল ছাড়াও কতকগুলি বিড়াল যেখানে সুবিধা পায় সেইখানেই খাবারের লোভে গিয়া হাজির হয়। বিড়াল ইন্দুর ও অন্য পোকামাকড় মারিয়া গৃহস্থের উপকার করে। কিন্তু উহারা সুযোগ সুবিধামত আবার চুরি করিয়া গৃহস্থের অসুবিধা ঘটায়। দুধ আর মাছের প্রতি ইহাদের লোভ সবচেয়ে বেশি। মাছের কাঁটা খাইয়া ইহারা গৃহস্থের বাড়ি পরিষ্কার রাখে।

গৃহস্থের ঘরে বিড়ালের পর কুকুরের কথা আসে। কুকুর গৃহস্থের দরজায় পড়িয়া থাকে ও প্রভুর সম্পত্তি রক্ষা করে। রাত্রিতে কর্তব্য করিতে গিয়া সে অনেক সময় ঘুমাইতে পারে না। গৃহস্থ দয়া করিয়া তাহাকে পাতের উচ্ছিষ্ট যাহা দেয় তাহা খাইয়া সে সন্তুষ্টচিত্তে জীবন ধারণ করে।

ইহা ছাড়া পোষা কুকুরও গ্রামে দেখা যায়। তাহার যত্ন একটু বেশি। কিন্তু শহরের পথে পথে গৃহস্থের বাড়ির আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়ায় এরূপ কুকুর অনেক দেখা যায়।

এতো গেল দেশী কুকুরের কথা। বড় শহরে সাধারণতঃ সম্পন্ন লোকের গৃহে বিদেশী কুকুর দেখা যায়। শোনা যায় এ সব কুকুরের জন্য ধনী গৃহস্থের অনেক অর্থ ব্যয় হয়। এক একটি কুকুর পালন করিতে প্রায় তিন চারিশত টাকা মাসে খরচ হইয়া থাকে। অবশ্য এরূপ কুকুর পালন করিবার সখ ও সামর্থ্য দুইই চাই।

অনেক গৃহস্থ ছাগল ও ভেড়া পুষিয়া থাকে। গ্রামের ছাগল দুধের জন্য পালিত হয়। আর শহরে অনেক জায়গায় আমদানি করা রামছাগল দেখা যায়। ইহারা বেশি দুধ দিয়া থাকে। বাঙ্‌লার পশ্চিম প্রান্তের কোন কোন জেলায় অনেক লোক অধিক সংখ্যক ভেড়া পালন করিয়া থাকে। ইহারা ভেড়ার লোমের কম্বল তৈয়ারি করিয়া জীবিকা অর্জন করে।

বাঙ্‌লা দেশে গাধার ব্যবহার পশ্চিমের মত ব্যাপক ভাবে চলে না। ধোপার কাপড় বহিবার কাজে অনেক জায়গায় গাধা ব্যবহার করা হয়।

গ্রামে অনেক গৃহস্থ ঘোড়া পালন করে—মাল বহিবার কাজে ঘোড়া ব্যবহৃত হয়। গ্রামে বা ছোট শহরে এখনও ঘোড়ার গাড়ির ব্যবহার আছে। মোটর এবং রিক্সা এ যুগে ঘোড়ার গাড়িকে ক্রমশঃ কোণঠাসা করিতেছে।

বন্য পশুর মধ্যে নিরীহতম হইতেছে খরগোশ। উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলে যথেষ্ট খরগোশ দেখিতে পাওয়া যায়। স্থলচর পশুদের মধ্যে হস্তী সর্বশ্রেষ্ঠ। হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে উত্তরবঙ্গে এখনও হাতির দল ডুয়ার্সের জঙ্গলে লোকের চক্ষে পড়ে। এই জঙ্গলে চিতাবাঘ এবং গণ্ডারও পাওয়া যায়। গণ্ডারের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে বলিয়া সরকারী আইনে গণ্ডার শিকার নিষিদ্ধ। হিংস্র জন্তুর মধ্যে গণ্ডার ও চিতাবাঘের পর সুন্দরবনের বড় বাঘের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই বাঘ শুধু বাংলা কেন সারা পৃথিবীতে সুপ্রসিদ্ধ। বাংলার কথা উঠিলে রয়াল বেঙ্গল টাইগারের কথা বিদেশীর মনে জাগিয়া উঠে।

পাখির কথা আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই কাকের কথা বলিতে হয়। বাংলাদেশের গ্রামে 'কা-কা' শব্দে লোকের ঘুম ভাঙ্গে। গৃহস্থের বাড়িতে ঘরের চালে কাক দেখা যায়। গাছের ডালে বসিয়াও ভাবে কাক ডাকে। খাবারের লোভে কাক দলে দলে জড় হয়।

গৃহস্থের পালিত পাখির মধ্যে পাতিহাঁস আর রাজহাঁস দেখা যায়। যাহাদের বাড়ির নিকটে ছোট নদী, খাল, বিল, ডোবা, পুকুর থাকে তাহারাই পাতিহাঁস পোষে। বড়লোকের পুকুরে অনেক সময় রাজহাঁসকে সাঁতার কাটিতে দেখা যায়। কেহ কেহ সখ করিয়া ময়না ও টিয়া পাখি খাঁচায় করিয়া পুষিয়া থাকে। বাহিরে জলচর পাখি বেলেহাঁস, মাছরাঙ্গা, বক বাঙ্লার নদী, খালে, বিলে দেখা যায়। বেলেহাঁস সাধারণতঃ বিলেই চোখে পড়ে। বসন্তে কোকিল ডাকে, পাপিয়া বছরের অনেক সময়ে 'চোখ গেল' 'চোখ গেল' করিয়া শব্দ করে। জংলা ঝাড়ায় ছাতার পাখি দেখা যায়। দয়েল, ফিঙ্গা বাংলার সর্বত্র বাস করে। বনের গাছে গাছে, পড়ো বাড়ির গাছে ঘুঘুর ডাক শোনা যায়। লোকের বাড়িতে গাছে বনে জঙ্গলে শালিখ বাসা বাঁধিয়া বাস করে। তালগাছে বাবুই পাখির বাসা তৈয়ারির কৌশল দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

বাঙ্লার কাঠঠোক্‌রার গাছে গর্ত করিবার ঠক্ ঠক্ শব্দ নিস্তব্ধ দুপুরে কানে আসে।

বাঙালির জীবনের সঙ্গে এই সকল পশুপক্ষীর নিত্য সম্পর্ক। হিংস্র পশু ছাড়া সকল পশুই কোন না কোন কাজে ব্যবহৃত হয়। পাখি বাঙালীর আনন্দ উৎপাদন করে।

বাংলাদেশের কথা ভাবিতে হইলে মানুষের জীবনের সঙ্গে এই সকল পশুপক্ষীর কথাও আপনা আপনিই আসিয়া পড়ে। ইহারা এ দেশের অধিবাসিগণের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

'বিনা স্বদেশীভাষা মিটে কি আশা'

স্বদেশী ভাষা ছাড়া কাহারও তৃপ্তি হইতে পারে না। এক ভারতবর্ষেই নানা ভাষা রহিয়াছে। জগতের নানা দেশে নানা ভাষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাতৃভাষা ছাড়া জগতে কাহারও কখনও সন্তুষ্টি হয় না।

মাতৃস্তন্যের সহিত মাতৃভাষারও নিবিড় সম্পর্ক। শিশু মাতৃস্তন্যে পরিবর্ধিত হয় আর মায়ের সঙ্গে ভাববিনিময় করে মায়ের কাছে শেখা বুলিতে। মায়ের সহিত মানুষের যেমন নাড়ীর টান, মাতৃভাষার সহিত তেমনি তাহার প্রাণের টান রহিয়াছে।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভাবের ঐশ্বর্য নিজের ভাষায় যে ভাবে প্রকাশিত হয়, অন্য ভাষায় তাহা কিছুতেই হইতে পারে না। মানুষের বিশেষ বিশেষ অনুভূতির সহিত বিশেষ বিশেষ শব্দের নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে। বিদেশী ভাষাদ্বারা সেই অনুভূতিকে যথাযথভাবে অভিব্যক্ত করা চলে না। এই কারণেই বিদেশী ভাষায় যখন নিজের অনুভূতিকে প্রকাশ করা লোকের পক্ষে অসম্ভব হয়, তখন মানুষ অস্বস্তি বোধ করে। অবশ্য যেখানে কেবল বিদেশী ভাষা শিক্ষা করা বাধ্যতামূলক সেখানে অবস্থা হয় আরো সংকটজনক। ফলে বিদেশী ভাষাও শিক্ষা হয় না—মাতৃভাষাও অবহেলিত হয়।

বিদেশী শাসন যখন কোন দেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করে তখন দেশের সুখসুবিধা অপেক্ষা শাসকগোষ্ঠীর সুখসুবিধা প্রাধান্য লাভ করে। এরূপ অবস্থায় রাজকার্যের প্রাধান্যের জন্য বিদেশীর রাজ-ভাষা দেশের জনসাধারণের মাতৃভাষাকে পঙ্গু করিয়া ফেলে। বিদেশী শাসনে রাজকার্যের সুবিধার জন্য শিক্ষার মাধ্যম-হিসাবে বিদেশী ভাষাকেই ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ইহার ফলে দেশের বিরাট জনসাধারণের এক বিশাল অংশ শিক্ষালাভে বঞ্চিত হয়। ফলে দেশের জনগণ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই বিভাগের ফলে শিক্ষিত জনসাধারণ অশিক্ষিত লোকের সহিত মেলামেশা করা অপমানজনক মনে করে। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত জনসাধারণ সমগ্র দেশ নহে। বিদেশী ভাষা শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করিতে না পারায় অশিক্ষিত জনগণের অতৃপ্তি ও স্বদেশীয় শিক্ষিতগণের প্রতি বিদ্বেষভাব জাগ্রত হয়।

স্বদেশী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করিলে জনগণের মধ্যে দ্রুত শিক্ষার প্রসার হইয়া থাকে। এইরূপ শিক্ষাকে লোকে সানন্দে গ্রহণ করিতে পারে।

দৈনন্দিন কার্যে বিদেশীভাষা ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে দেশীয়ভাষা তথা স্বদেশের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব মনে মনে উদিত হয়। স্বদেশীভাষা ব্যবহার না করিলে প্রকৃত স্বদেশপ্রেমের উদয় হয় না। স্বদেশীভাষাকে সর্বপ্রকার কাজের যোগ্য করিয়া তুলিতে পারিলে জাতীয় দুর্বলতা হ্রাস হইতে পারে।

যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের হৃদয়ে দুর্বলতার আধিপত্য থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত শান্তি

তৃপ্তি বহুদূরে বাস করে। বিদেশীভাষার অতিরিক্ত ব্যবহারে অনেক ক্ষেত্রে মানুষ তাহার জাতীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যকে বর্জন করিয়া নিজবাসভূমে বিদেশীতে পরিণত হয়।

স্বদেশে যেখানে মাতৃভাষার অতিরিক্ত অন্যান্য ভাষা থাকে, সেখানে অন্য ভাষার প্রতি শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতে হইবে। পরস্পরের মেলামেশার জন্য পরস্পরের ভাষা শিক্ষা করা দরকার। এখানে তৃপ্তির প্রশ্ন উঠে না—এখানে প্রশ্ন শুধু প্রয়োজনের। প্রয়োজনের অনুরোধে সবকিছুই শিক্ষা করা যাইতে পারে।

নাগরিক জীবনের সুবিধা ও অসুবিধা

ভারতের বেশির ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। গ্রামের অধিবাসীর তুলনায় নগরবাসীর সংখ্যা অনেক কম। যদি এই সংখ্যার অনুপাত লইয়া বিচার করিয়া বলা হয় গ্রামে সুখসুবিধা বেশি, আর শহরে সুখসুবিধা কম তাহা হইলে ভুল ধারণা করা হইবে। বস্তুতঃ সুখসুবিধার মাপকাঠি সর্বত্র সমান নহে, আর উহার আদর্শও সকলের কাছে একপ্রকার হইতে পারে না। দেশ কাল পাত্র ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর উহা নির্ভর করে।

মানুষ ক্রমশঃ অগ্রগতির পথে চলিয়াছে। যাহার শক্তি সামর্থ্য আছে সে কখনও পল্লীর ক্ষুদ্র গৃহের কোণে বসিয়া থাকিবে না, আর যাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে সেও তাহার ভাগ্যান্বেষণে অবশ্যই ঘরের বাহির হইবে। সুতরাং নাগরিক জীবনের সুখসুবিধা আছে। সুখসুবিধা যেখানে আছে সেখানে অসুবিধাও থাকিবে —ইহা নিশ্চিত। সর্বস্থানে সর্বকালে নিরবচ্ছিন্ন সুখসুবিধা কেহ ভোগ করিতে পারে না।

শহরে পথ-ঘাট, যান-বাহন, শিক্ষা, সংস্কৃতি বাসস্থান সবই উন্নত ধরনের। উন্নত পথঘাটের দরুণ যাতায়াতের সুবিধা রহিয়াছে। যানবাহন সেখানকার উন্নত ধরনের বলিয়া দ্রুত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে বিশেষ সময় নষ্ট হয় না। লোকে কাজ করিবার বেশি সময় পায় বলিয়া কাজও অনেক বেশি হইয়া থাকে।

শহরের বাসস্থান উন্নত ধরনের হওয়ায় এবং পানীয় জলের সুব্যবস্থা থাকায় রোগের আক্রমণ সেখানে অনেকটা কম। রোগের আক্রমণ হইলেও লোকে চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির প্রতিষেধক ব্যবস্থায় অতি দ্রুত উহাদের উপশম হইয়া থাকে।

শহরে লেখাপড়া শিখিবার ব্যবস্থা ভাল। স্কুল, কলেজ, পুস্তকাগার, গবেষণাগার, প্রয়োগশালা, সংগ্রহশালা, শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের নানা বক্তৃতা শিক্ষা-লাভের বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। শহরে দেখিয়া শেখা, শুনিয়া শেখা এবং হাতে কাজ করিয়া শিখিবার যে সুযোগ পাওয়া যায় অন্যত্র তাহা দুর্লভ।

শহরে বিভিন্ন প্রকারের ব্যবসায়ের মধ্যে বৃত্তি নির্বাচন করার সুবিধা অনেক বেশি—অন্যত্র বৃত্তির সংখ্যা সীমিত। সুতরাং এখানে শক্তি, সামর্থ্য, বুদ্ধি,

তৎপরতা, সততা যাহার যত বেশি সেই তত সুখসুবিধা লাভ করিতে পারে—অন্যত্র শক্তি সামর্থ্যের অপচয় হইয়া থাকে।

নগরের যেমন সুবিধা আছে অসুবিধাও সেখানে নেহাৎ কম নাই। নাগরিক জীবন অনেক ক্ষেত্রে উন্নত হইলেও উহাতে কৃত্রিমতা নাই এ কথা বলা চলে না। স্বল্পপরিসর বাসস্থানে থাকিয়া ভদ্রতার খাতিরে লোককে বাহিরের ঠাঁট বজায় রাখিতে হয়। ঘরে অর্থ নাই সামর্থ্যও নাই, গৃহস্থকে সামাজিকতা রক্ষা করিতে পয়সা খরচ করিতে হয়।

নগরে বিশুদ্ধ খাদ্যদ্রব্য পাওয়া দুষ্কর—অধিকাংশ খাদ্যদ্রব্যই ভেজালে পরিপূর্ণ। অখাদ্য-কুখাদ্য খাইয়া লোকে এখানে নানা উৎকট রোগে ভুগিয়া থাকে। লোকের হাতের কাছে যাহা সহজলভ্য তাহারা তাহাই খাইয়া থাকে। গৃহে বিশুদ্ধ খাদ্য তৈয়ারি করিবার সময় ও সুযোগ গৃহস্থের অত্যন্ত কম।

অসাধু ব্যবসায়ী জনাকীর্ণ নগরে খাদ্যে ভেজাল মিশাইবার সুযোগ-সুবিধা বেশি পাইয়া থাকে।—গ্রামে দ্রব্যের বিক্রয় কম—লাভও কম। ছোট জায়গায় অসাধু ব্যক্তি সহজে ধরা পড়িতে পারে, আর অল্প লাভের জন্য গুরুতর বিপদেও কেহ প্রবেশ করিতে চাহে না।

নগরের লোকের জীবিকা অর্জনের সুবিধা যেমন বেশি তেমনই বেকারের সংখ্যাও নেহাৎ কম নহে। যেখানে বেকারের সংখ্যা বেশি সেখানে অসামাজিক কার্যকলাপ ঘটিবার সম্ভাবনাও বেশি।

শহরে অর্থের প্রাধান্য। খাইতে, শুইতে, বসিতে, চলিতে—সর্বত্রই অর্থ দরকার। এমন কি জল-বাতাসও পয়সা দিয়া কিনিতে হয়। পয়সা ছাড়া সামান্য মাটিটুকুও অনেক জায়গায় যোগাড় করা যায় না। এখানে অনেক ক্ষেত্রে পাড়ার লোক পাড়ার লোককে চিনে না—কাহারও বিপদ-আপদে কেহ সাড়া দিতে চাহে না।

শহরে নিত্য-নূতন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। নিত্য-নূতন রোগের নাম শুনা যায়। সকলের চিকিৎসাও হয়। তবে গৃহস্থকে ইহার মূল্য দান করিতে তাহার শেষ সম্বলটুকুও হারাইতে হয়। আর অন্যত্র অনেক ব্যাধিই হয়তো হয় না অথবা হইলেও অজ্ঞতা বা অসামর্থ্যের জন্য তাহাদের প্রতিকারও সম্ভবপর হয় না।

নগরে শিক্ষার সুব্যবস্থা থাকিলেও কুসঙ্গ ও ধর্মঘটের প্রভাবে অনেক বালক ও যুবক নিজেদের ভবিষ্যৎকে নষ্ট করে। শহরে সম্পন্ন লোকের দেখাদেখি অপেক্ষাকৃত স্বল্পবিত্ত গৃহস্থও গৃহশিক্ষক রাখিয়া থাকেন। ইহাতে পরীক্ষা পাশের সুবিধা থাকিলেও বালকগণের স্বাবলম্বন বৃত্তি নষ্ট হয়—অভিভাবককে অর্থকষ্ট ভোগ করিতে হয়। বড় শহরে ছাত্রগণ সর্বদা পাকাবাড়ি চোখে দেখে—গাছপালা তাহাদের চোখে কম পড়ে। তাহারা ভেজাল খাদ্য খাইয়া শরীরকে দুর্বল করে—অকালে তাহাদের দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা আসে।

শহরে জীবনযাত্রার মান উন্নত। তাই সেখানে খরচ বেশি। লোকের আয়ও

বেশি হওয়া দরকার। স্বল্পবিত্তের লোকের শহরে বাস করা কঠিন। সুতরাং অর্থোপার্জনের জন্য লোক সর্বদাই ব্যস্ত থাকে। শহরের বাহিরের লোকের এতটা ব্যগ্রতা এ বিষয়ে দেখা যায় না।

বনভোজন

একটা নির্দিষ্ট স্থানে অনবরত কাজ করিতে করিতে মানুষ হাঁফাইয়া উঠে। তাহার আরামের, বিশ্রামের বা শান্তির জন্য দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মাঝে মাঝে পরিবর্তন আবশ্যক। এ পরিবর্তন নানাভাবে করা যায়। বনভোজন, নৌকাভ্রমণ, দেশভ্রমণ প্রভৃতি ইহাদের মধ্যে অন্যতম।

নিজেদের বাসস্থান হইতে দূরে কোন স্থানে বনভোজনে যাইতে পারিলে মন্দ হয় না।

বনভোজনে সকলেই যাইতে পাবে—বালক, যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ সকলের পক্ষেই অপর অনেকের সাহত বাহিরে যাইয়া, এরূপ বনভোজনে আনন্দ উপভোগের সুবিধা হইতে পারে। বৃদ্ধেরা স্বস্থান সহজে ছাড়িতে চাহেন না। কিন্তু বৃদ্ধদেরও বালকের সহিত মিশিবার পক্ষে কোন বাধা নাই। বৃদ্ধেরাও বালকদের খেলার সাথী হইতে পারেন, শিশুদের খেলার ঘর সাজাইতে সাহায্য করিতে পারেন। ইহাতে মনের সরসতা ও শান্তি লাভ তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়।

এখানে বালকদের একদিনের বনভোজনের কথাই লিখিতেছি। আমরা আটজন সমবয়সী ছেলে। এক পাড়ায় থাকি। অষ্টম ও নবম শ্রেণীতে পড়ি। পাঁচজন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র আর তিনজন নবম শ্রেণীর ছাত্র মিলিয়া এক বনভোজনের দল গঠন করি। মফঃস্বলের একটি ছোট শহরে আমাদের বাস। বহুদিন বাহিরে যাইবার সুযোগ পাওয়া যায় নাই। তাই অন্ততঃ একটা দিনের জন্য বাহিরে যাইবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলাম। বার্ষিক পরীক্ষার পর এই সুযোগ উপস্থিত হইল। অভিভাবকদের অনুমতি পাওয়া গেল। তবে কথা হইল যেখানেই যাই না কেন, সকলের বাহির হইয়া ঐদিন রাত্রি নয়টার মধ্যেই বাড়ি ফিরিতে হইবে।

কিন্তু যাই কোথায়? কি ভাবেই বা যাওয়া যায়? আমাদের ছোট শহর হইতে সুন্দরপুর গ্রাম সাত মাইল দূরে। সুন্দরপুরে যাইবার একমাত্র পথ নদীপথ। শহরের পাশ দিয়া নদী বহিতেছে। প্রায় বারো মাসই নদীতে জল। এই পথেই সেখানে যাইবার আয়োজন করিতে হইল। জলপথে যাত্রার নৌকা পূর্ব হইতেই সংগ্রহ করা দরকার, কারণ আমরা সাধারণ যাত্রী নহি.—যাইতেছি বনভোজনে—ফিরিবার সময়ও ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় মিলাইয়া কেহই বলিতে পারে না। নৌকা পাইতে কিছু বেগ পাইতে হইল, কারণ মাঝিরা জানে ছেলেদের হাতে নৌকা পড়িলে, তাহা অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়া পাওয়া যাইবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রহিয়াছে। লেখনী, শয্যা, পুস্তক পরের হাতে পড়িলে নষ্ট হয়। কিন্তু এখানে নৌকার উল্লেখ না থাকিলেও ভুক্তভোগী মাত্রেই জানে বালকদের হাতে নৌকাও

নষ্ট হয়। মাঝির সহিত ঠিক হইল নৌকায় সে বসিয়া থাকিবে, আমরা উহা বাহিয়া লইয়া যাইব। সে ইহাতে রাজী হইল—অবশ্য দক্ষিণা সে পুরাই লইবে। ইহা যাত্রার পূর্বদিনের কথা। ঐ সন্ধ্যায় আমরা আটজনে পরদিনের বনভোজনের দ্রব্য পূর্ব হইতেই যোগাড় করিবার ব্যবস্থা করিলাম। যে যাহার বাড়ি হইতে জলখাবারের জন্য মুড়ি, চিড়া, নাড়ু, মোয়া—যাহার যেরূপ জোটে পুঁটলিতে বাঁধিয়া লইবে এবং প্রত্যেকেরই কিছু চাল, ডাল, লবণ, দুই-একটা আলু যদি সম্ভবপর হয় সঙ্গে লইতে হইবে।

দল লইয়া কোথাও বাহির হইতে হইলে একজন দলপতি চাই। লেখককেই দলপতি হইতে হইল। দলপতির সুনাম অর্জন করা ভাগ্যে থাকুক আর না-ই থাকুক, ব্যবস্থায় কোন ত্রুটি ঘটিলে দুর্নামের বোঝা তাহাকে বহিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। তাহার দায়িত্বও যথেষ্ট আছে,—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

আমরা সাতজনে সাঁতার জানি—নৌকা বাহিবার অভ্যাসও আছে—কিন্তু মুস্কিল হইল পটলাকে লইয়া। সে সাঁতার জানে না—নেহাৎ গোবেচারা, তবে লেখাপড়ায় ভাল। তাহার মার (আমাদের মাসিমার) নিকট অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইতে হইল। তবে সর্ত হইতেছে যে তাহাকে নদীতে নামিয়া স্নান করিতে দেওয়া হইবে না। সে নৌকাও বাহিতে পারিবে না। একালে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র না চালাইয়াও সৈনিক হওয়া যায়। সুতরাং পটলার কাজের অভাব হইবে না। সে আমাদের আশ্রয়-শিবির পাহারা দিবে এবং অন্য দিক দিয়াও সাহায্য করিবে। বলা বাহুল্য, আর সব আমোদপ্রমোদে সে যোগ দিবে। শনিবার সন্ধ্যায় যাত্রার আয়োজন হইল। পরদিন ভোরে আমরা জিনিস-পত্র লইয়া নৌকায় উঠিলাম। নৌকা বাহিবার বৈঠা, বাজাইবার বাঁশি, বসিবার সতরঞ্চি সবই লইলাম। খাদ্যসম্ভারও সঙ্গে চলিল। তবে ব্যবস্থার মধ্যে ভুল থাকিয়া গেল। কিন্তু ভুলকে প্রকৃতি মার্জনা করে না। ভুলের মাশুল সকলকেই দিতে হয়। সে কথা পরে বলিব।

আমাদের নৌকা চলিল। আমাদের সপ্তরথীর চতুর্দশ হস্তের সপ্তবহিত্র (বৈঠা) তালে তালে জল কাটিতে লাগিল—সঙ্গে সঙ্গে হর্ষধ্বনিরও বিরাম নাই।

দুই ঘণ্টা চলিবার পরে সুন্দরপুরের সীমা দেখা গেল। নদীর পারে বটগাছের নীচে আমরা "শিবির" সন্নিবেশ করিলাম। উপরে গাছের ডালপালার চাঁদোয়া আর নীচে সতরঞ্চি পাতা হইল। ইহাই আমাদের শিবির। শিবিরের জায়গাটি বেশ ভাল। একদিকে নদী, অপর দিকে মাঠ। দক্ষিণে দূরে গ্রামের বসতি, উত্তরে বন। নৌকাতেই যথেষ্ট ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল। ডাঙ্গায় নামিয়াই পাঁচমিশালি খাবার অতি আনন্দে সকলে মিলিয়া নিঃশেষ করিলাম। পেট খালি থাকিলে আনন্দ বেশিক্ষণ চলে না। খাবার পেটে পড়িতেই সকলে বেশ চাঙ্গা হইয়া উঠিলাম। বাঁশির বাজনা ও গান চলিল। আমরা একটি কার্যক্রমও ঠিক করিয়া

ফেলিলাম। নদীতে সকলে মিলিয়া স্নান—তাহার পর রন্ধন-ভোজন, তাহার পর গান ও আবৃত্তি—ইহাই সেখানকার সেদিনকার কার্যক্রম। চারিদিক ঘুরিয়া দেখিবার সময় হইবে না—তাই ভ্রমণ কার্যক্রম হইতে বাদ দিলাম। এক পটলা ছাড়া সকলের নদীতে স্নান ও সাঁতার পর্ব শেষ হইল। পটলা দূর হইতে স্নানের আনন্দ হৃদয় দিয়া উপভোগ করিল।

তারপর রন্ধনপর্ব। রাঁধার জন্য প্রথমতঃ উনুন দরকার। মাঝির সাহায্যে মাঠে গর্ত করিয়া তাহার দুই পাড় বাঁধিয়া উনুন তৈয়ারি করা হইল। কিন্তু কাঠ কোথায়? কাঠ সঙ্গে আসে নাই। দোষ সমস্তই দলপতির উপর গিয়া পড়িল। এখন সাত মাইল নদী উজাইয়া শহরে ফিরিয়া যাইবার অবস্থা কাহারও নাই।

কিন্তু দলের মধ্যে নিখিলের শরীর বেশ গাঁট্টাগোট্টা। সে সাহসীও বটে। সে বলে—'কুড়ুল পেলে পাশের জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আনতে পারি।'

মাঝির কাছে কুড়ুল পাওয়া গেল। কিন্তু নিখিলকে বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার নবকুমারের মতো নির্জন বনবাস দিতে কেহ রাজি হইল না। দলের তিন জন তাহার সঙ্গে গেল।

কিছুক্ষণ পরে যে কাঠ আসিল তাহা বহু চেষ্টা করিয়াও জ্বালান গেল না। বনে আমাদের জন্য কে শুকনা কাঠ রাখিয়া দিবে। সব কাঠই কাঁচা। এখন উপায় কি? অগত্যা দলপতিকে তিনজন সঙ্গী লইয়া কাষ্ঠাহরণে লোকালয়ে যাইতে হইল। ভাগ্যক্রমে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হইল। কথাবার্তায় বুঝিলাম তিনি গ্রামের ঠাকুরদাদা। তিনি তাঁহার বাড়িতে আমাদিগকে সদলবলে আসিতে বলিলেন, বনভোজনের সব ব্যবস্থাই তিনি করিয়া দিবেন বলিলেন। কিন্তু আমরা কষ্টের মধ্যেই আনন্দ আহরণ করিতে বেশি আগ্রহান্বিত হইলাম। সুতরাং ঠাকুর-দাদাকে নিরাশ করিয়া শুধু কাঠ লইয়া ফিরিলাম। বলাবাহুল্য গ্রামে কাঠ বন্দরে বিক্রয় হয় না—চাহিলে ছেলেরা পায়।

আমাদের কাঠ লইয়া ফিরিতে দেখিয়া বন্ধুগণের মধ্যে ঘন ঘন হর্ষধ্বনি হইতে লাগিল। যথারীতি উনুন জ্বালিয়া রান্না চাপান হইল। খিচুড়ি চড়িল। কিন্তু সকলেই রাঁধিতে চাহে। 'অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট' হয়—আর ইংরেজী প্রবাদ 'অধিক রাঁধুনি খাবার নষ্ট করে'—এ দুয়ের অর্থ এক হইলেও পরবর্তী প্রবাদের অর্থ আমরা বেশ ভালভাবে অক্ষরে অক্ষরে অনুভব করিলাম। তবে আহারে অরুচি বা অস্বস্তি কাহারও হয় নাই। অষ্ট মহারথীর হস্তস্পর্শে যে অপূর্ব জিনিসটি তৈয়ারি হইল তাহা অন্য যাহাই হউক না কেন খিচুড়ি নহে একথা হলপ করিয়া বলিতে পারা যায়।

এ রান্নায় পটলাও হাত লাগাইয়াছিল। সুতরাং এই সুখাদ্য বস্তুটি 'সবার পরশে পবিত্র করা' বস্তু, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। আর ইহা সকলের আনন্দরসে তৈয়ারি। সুতরাং ইহা খাইয়া কেহই নিরানন্দ হইল না। আহারের পর গান আবৃত্তি বেশ খানিকক্ষণ চলিল। তারপর নদীর পাড়ে মাঠের

ওপারে সূর্যাস্ত হইল। আমরাও শিবির ভাঙ্গিয়া আবার নৌকায় চড়িলাম। রাত্রি নয়টার মধ্যে বাড়ি ফিরিয়াছিলাম।

একটি প্রাচীন বটগাছের আত্মকথা

আমি গাছ হইলেও জড় নহি—চেতন। এ চেতনা আমার ভিতরে আছে। তোমাদের মত আমিও সুখদুঃখ বোধ করিয়া থাকি। তবে তোমাদের ভাষা আছে, আমাদের নাই। নীরব ভাষায় আমরা প্রাণের কথা বলিয়া থাকি। আমি একটি বটগাছ। এখন অতি পুরাতন হইয়াছি। আমার চারিদিকে বা আমাকে লইয়া গত দুইশত বৎসর ধরিয়া যে কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে তাহারই কথা বলিব। সবটা বলা সম্ভবপর নহে। কিছু কিছু বলিব। মানুষের যেমন শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব এবং বার্ধক্য আছে আমিও তাহা হইতে মুক্ত নহি। এখন আমি বৃদ্ধ—সঞ্চয় আমার বেশি। আমি অনেক দেখিয়াছি—অনেক শিখিয়াছি।

বাঙ্‌লার এক ছায়াসুনিবিড় পল্লীতে আমার জন্ম। লোকমুখে শুনিয়াছি গ্রামের এক বৃদ্ধ চৌরাস্তায় আমাকে স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল মানুষ যেন পথ চলবার সময় আমার ছায়ায় ক্লান্ত শরীর জুড়াইতে পারে; পশু-পক্ষী আমার আশ্রয় লইতে পারে। গ্রামের সভা আমার নীচে বসিতে পারে—সর্বসাধারণের জন্য পুরাণ পাঠ ও কীর্তন, গানের আসর আমার তলে যেন স্থান পায়।

আমি আজ পর্যন্ত আমার কর্তব্য সমানভাবে পালন করিয়া আসিতেছি। আমি শাখা-প্রশাখা প্রসারিত করিয়া এতকাল সকলকে ছায়া দান করিয়াছি—অসংখ্য পাখিকে আমার ডালে বাসা বাঁধিতে দিয়াছি। আমার শরীরে ক্ষত করিয়া কোন কোন পাখি আশ্রয়স্থান গড়িয়াছে—তাহাও আমি সহ্য করিয়াছি। সকলের সেবা আমার ধর্ম। তাই এই কাজে আমার ক্ষয়-ক্ষতির কথা অপরের কাছে বলিয়া নিজেকে সকলের চক্ষে হেয় করিতে চাহি না। যে কেহ অপরের সেবা করিতে যায়, তাহাকে ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। স্বার্থের জন্য যে সেবা তাহা সেবাই নহে।

গত দুইশত বৎসরে আমার চারিদিকে কত পরিবর্তন, কত বিপর্যয় ঘটিয়াছে। ইতিহাস তাহার সব কিছু লিখিতে পারে নাই।

ইংরেজ শাসনের আরম্ভের কিছু পরে আমার কাহিনী শুরু হইয়াছে। রাজধানীর সন্নিকটে যে যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হইয়াছিল তাহা পল্লীবাসীর শান্তিকে যদিও নষ্ট করিতে পারে নাই, তবে পরবর্তী কালের দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর হাত হইতে কেহ নিস্তার পায় নাই। তাহার পর বিদেশী শাসনযন্ত্র ধীরে ধীরে কাজ করিতে থাকে। ধীরে ধীরে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ স্বাধীনতার যুগের মানুষকে দেখিলে সে যুগের মানুষের সহিত ইহাঁদের তুলনা করা চলে না। এখনকার মানুষ গ্রাম ছাড়িয়া ক্রমশঃ শহরবাসী হইতেছে। গ্রামের স্বাস্থ্য গিয়াছে; সমৃদ্ধি গিয়াছে। পুরাতন মানুষ গিয়াছে। নূতন মানুষ,

নূতন চিন্তা লইয়া গ্রামে মাঝে মাঝে আসে। তাই পুরাতনচিন্তায় আলোড়ন উপস্থিত হয়।

পূর্বেকার মানুষ তাহার বাঁধাধরা জীবনযাত্রা চালাইয়াছে। আমার চারিদিকের মাঠে, চাষী চাষ করিয়াছে, পরিশ্রান্ত হইয়া আমার তলে শরীর জুড়াইয়াছে। রাখাল ছেলেরা গোরু চরাইবার ফাঁকে ফাঁকে, আমার তলে খেলা করিয়াছে,—বাঁশী বাজাইয়াছে। বৈকালে গ্রামের বৃদ্ধেরা এখানে গল্প-গুজব করিতেন। বারোয়ারী পূজায় যাত্রা কথকতা কীর্তন নিয়মিতরূপে চলিত। এ সব এখনও চলিতেছে। তবে মানুষ বদলাইয়াছে। সেই প্রাচীন সরলতা যেন ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে। হয়তো জীবন-সংগ্রামের জটিলতাই মানুষকে ক্রমশঃ জটিলবুদ্ধি করিয়া তুলিতেছে। আগেকার লোক অল্পেতে সন্তুষ্ট ছিল। তাই তখনকার লোকের জীবনও ছিল সরল, আর শান্তিও ছিল সহজলভ্য। এখনকার প্রাপ্তির তুলনায় লোকের চাহিদাও অনেক বেশি,—তাই দুঃখেরও যেন শেষ নাই।

আগেকার সামাজিক ব্যবস্থার খুঁটিনাটি লইয়া মানুষ মাথা ঘামাইত বেশি, এখন আর্থিক সমস্যার সমাধান করিতেই লোকের হয় প্রাণান্ত। এখন দেশের দুঃখ-দুর্দশার অন্ত নাই। শুনিয়াছি সকল বৃক্ষের মধ্যে বটবৃক্ষেই ভগবানের শক্তির বিকাশ বেশি। ইহার কারণ বোধ হয় বটবৃক্ষ সমদর্শী, তাহার প্রিয় বা বিদ্বেষের পাত্র কেহই নাই, সে সমভাবে শত্রু-মিত্র সকলকে আশ্রয় দিয়া থাকে, আর সেবাও করে।

আমাকে যে যাহাই মনে করুক না কেন আমি নিজেকে ভগবান্ বলিয়া মনে করি না। আমি সকলের সেবক। এই সেবা করিতে করিতে যেন আমার বিলয় হয়। কিন্তু আমার শক্তি পরিমিত। এই শক্তিদ্বারা দেশের সকল দুঃখের অবসান করা আমার আয়ত্তের মধ্যে নাই। তাই আমি সকল দুঃখের নির্বাক্ দ্রষ্টামাত্র, সকলের শান্তি আমার কাম্য, দুঃখতাপিত মনুষ্যকে শীতল করাই আমার ধর্ম।

চৈনিক আক্রমণ ও ভারতের জাতীয় সংহতি

ভারত সুদূর অতীত হইতে শান্তিকামী দেশ। অনাদি কাল হইতে তাহার শিক্ষা একত্ব অখণ্ডত্ব এবং তাহার আভ্যন্তরীণ শান্তি আর বহির্বিশ্বের শান্তি। অনন্ত মহাকাল তাহার সাক্ষী—সেই তাহার ইতিহাস রচনা করিতেছে।

ভারত তাহার পতন-অভ্যুদয়ের মধ্যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। বিদেশী শাসনের কবল হইতে আজ পনর বৎসর সে মুক্তি লাভ করিয়াছে। নবলব্ধ স্বাতন্ত্র্যের পর এতদিন তাহার বৈষয়িক উন্নয়ন চলিয়াছে, দেশের শান্তি ঐক্য বজায় রাখিবার জন্য সে অবিরত চেষ্টায় রত। বৈষয়িক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে—পৃথিবী হইতে উপনিবেশবাদ দূর করিবার চেষ্টায় আর পররাজ্য লোলুপতা বোধ আর জগৎ হইতে যুদ্ধোন্মাদনা বন্ধ করিয়া বিশ্বশান্তির চেষ্টায় ভারতের দান শান্তিকামী পৃথিবীর সর্বত্র অভিনন্দিত হইয়াছে।

ভারত পঞ্চশীলে বিশ্বাসী—তাহার গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতা, তাহার পরস্পর

সহাবস্থানের নীতি ও কার্য সর্বজনবিদিত। বান্দুং সম্মেলনে এসিয়ার শান্তি এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য পঞ্চশীল গৃহীত হইয়াছিল।

ভারতের সহিত চীন একযোগে পঞ্চশীল মানিয়া লইয়াছিল। আঞ্চলিক অখণ্ডতা, আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির কাহারও অপর রাষ্ট্রের উপর হস্তক্ষেপ না করা, পরস্পর অনাক্রমণ ও সহাবস্থানের সর্ত চীনকেও মানিতে হইয়াছিল।

তখন চীন নিজ প্রতিজ্ঞার বাহিরে একটা ভদ্রতার মুখোস আর ভিতরে ভিতরে পররাজ্য লোলুপতার বর্বরতা ক্রমশঃ প্রকাশের সুযোগ খুঁজিতেছিল ইহা ভারত জানিতে পারে নাই। ভারত তাহার সমরসজ্জা বাড়ায় নাই—প্রয়োজনও তাহার ছিল না। কিন্তু সত্য নিয়তিব মতো দুর্বার। যে ভারত চীনকে বিপদের সময় অর্থ দিয়া সেবা দিয়া সাহায্য করিয়াছে, সেই চীন তাহার প্রতিশ্রুতি ও সততা জলাঞ্জলি দিয়া বন্ধুত্বের প্রতিদানে ভারতকে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়াছে। নানা কারণে চীন ভারতকে আক্রমণ কবিযাছে। তাহার আভ্যন্তরীণ অশান্তি—ভীষণ দুর্ভিক্ষ, পরিকল্পনার অভাব, সমর লালসা, পররাজ্যে নৃশংস কমিউনিজমের বিস্তারের পরিকল্পনা তাহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে।

ভারত ও চীনেব সীমানা সুনির্দিষ্ট আছে, কিন্তু চীন ম্যাকমোহন লাইন অতিক্রম করিয়া হিমালয়ের উপর প্রভুত্ব করিতে চায। তিব্বত দখল করিবার পর ক্রমশঃ সে অগ্রসর হইতে হইতে নেফায় বিস্তৃত অঞ্চলের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। ওদিকে কাশ্মীব সীমান্তে লাদাক অঞ্চলে বার হাজাব বর্গ-মাইল স্থান দখল করিবাব পর উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে আড়াই হাজাব-বর্গ-মাইল ভূমি অধিকার করিবার জন্য এক তরফা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করিয়াছে। ইহাতে লালচীনের যে দুরভিসন্ধি আছে, তাহা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হয় না। এই যুদ্ধ বিরতির অবকাশে সে সমরসজ্জা বৃদ্ধি, বিস্তীর্ণ সীমান্ত অঞ্চলে রাস্তাঘাঁটি নির্মাণ, বিমান ঘাঁটি গঠন প্রভৃতি কার্য এবং অধিকতর সৈন্য সংগ্রহ কার্যে মনোনিবেশ করিয়াছে। সময় আসিলেই সে ভারতকে প্রচণ্ড আঘাত করিবে। কিন্তু ভারত ইহার সমুচিত উত্তর দিবার জন্য প্রস্তুতি চালাইতেছে। আজ শুধু ভারতবর্ষ বিপন্ন নহে—পৃথিবীর গণতন্ত্র কমিউনিজমের কাছে বিপন্ন। চৈনিক আক্রমণ শুধু ভারতের সীমানার প্রশ্নের মধ্যে আবদ্ধ নহে।

ভারতে সংকটাপন্ন অবস্থা ঘোষিত হইয়াছে। চীনের বিশ্বাসঘাতকতামূলক আক্রমণে ভারত প্রথম শিক্ষা লাভ করিয়াছে। যে দুর্জন সুজনের মুখোস পরিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে—সুতরাং তাহার জন্য আত্মরক্ষার প্রস্তুতি দরকার। আত্মরক্ষা মানুষের, জাতির জন্মগত অধিকার। ইহা হইতে জগতের কোন শক্তিই তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারে না।

ভারতের আত্মরক্ষার জন্য চাই তাহার সর্বাত্মক প্রস্তুতি আর সংহতি; তাই যে লোক যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় তাহাকে আত্মরক্ষার প্রস্তুতির কাজে

লাগিতে হইবে। দেশের সর্বাত্মক প্রস্তুতি না থাকিলে সৈনিকগণ অগ্রগামী হইয়া যুদ্ধ করিতে পারে না। সুতরাং দেশের প্রত্যেকটি ব্যক্তি এক-একজন যোদ্ধা।

সমগ্র দেশ সকলের স্পর্শে গঠিত—ইহা জল-মাটি নহে। কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, কর্মচারী, ছাত্র, শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, সৈনিক—সকলেই যার যার কাজ দিয়া একলক্ষ্যে সংহত হইবে। সকলের স্বার্থ এক।

চৈনিক আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে দেশের মধ্যে অভূতপূর্ব আত্মচেতনা জাগ্রত হইয়াছে। এত দ্রুত এই চেতনার সঞ্চার বিস্ময়কর হইলেও ইহা সত্য। সকলে একই কর্মে, একই চিন্তায় আজ উদ্বুদ্ধ। মাতৃভূমির জন্য দেশবাসী, স্বর্ণ, অর্থ, রক্ত, শ্রম আর প্রাণদানে প্রস্তুত। চীনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সাফল্যের জন্য চাই আত্মবিশ্বাস আর সংঘবদ্ধতা। দেশের কল্যাণের জন্য ভারত এক, ভারত অখণ্ড, ভারতের নরনারীর সত্তা অখণ্ড ও অবিভাজ্য।

যুদ্ধে নিযুক্ত সৈন্যদের জন্য পোষাক, খাদ্য, রক্তদান চলিতেছে। জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থ সংগ্রহের আশাতীত সাড়া পাওয়া গিয়াছে। যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য, দেশের অসমাপ্ত বৈষয়িক উন্নয়নকে অব্যাহত রাখিতে হইবে। বিদেশী শত্রুর চক্রান্তে আমরা যেন বিভ্রান্ত না হইয়া উন্নয়নমূলক কার্যকে অব্যাহত রাখিয়া দেশের সম্মানকে রক্ষা করি।

সর্বপ্রকারে শত্রুকে বাধা দেওয়াই দেশবাসীর কর্তব্য। দেশে যেমন আত্মরক্ষার সাড়া পড়িয়াছে, সুখের বিষয় জগতের ছোট-বড় গণতান্ত্রিক দেশ ভারতকে সামরিক ও বৈষয়িক সাহায্য দানে অগ্রসর হইয়াছে।

ইতিমধ্যে চীন কলম্বো প্রস্তাবের মীমাংসাকে অগ্রাহ্য করিয়াছে। চীনের অভিসন্ধি বুঝিতে ভারতের দেরি হয় নাই। ভারত তাহার প্রস্তুতি চালাইতেই থাকিবে। এখানে কৃষি, শিল্পের উন্নয়ন, সামরিক দ্রব্যের উৎপাদন, সৈনিক শিক্ষণ ও সংগ্রহের ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

ভারতের জয় সুনিশ্চিত। কারণ ধর্ম ও ন্যায় তাহার পক্ষে, পৃথিবীর নিরপেক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ জাতির মত তাহার স্বপক্ষে।

নমো নমো নম সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি

বাঙলা আমাদের মাতৃভূমি। সন্তানদের নিকট জননীর প্রতি অঙ্গ যেমন আদরের তেমনি বাঙলার কোটি কোটি সন্তানের নিকট দেশের সকল স্থান আদরণীয়। মায়ের মূর্তিতে ঐশ্বর্য আর স্নেহের সমন্বয় হইয়াছে। কোথাও তিনি ভীষণা, কোথাও বা তিনি কোমলা, কখনও হর্ষে উৎফুল্লা কখনও বিষাদে দুঃখিনী।

উত্তরে হিমালয় মায়ের মাথায় তুষারের মুকুট রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, দক্ষিণে অনন্ত নীল সাগর তাহার শততরঙ্গধ্বনি দ্বারা মায়ের বন্দনা গীতি গাহিতেছে। মায়ের বাম হাতে কমলার ফুল, দক্ষিণ হাতে মহুয়ার মালা।

উত্তরের শ্যামল বনভূমি মায়ের মাথার এলো চুল। মায়ের দুইটি চক্ষু কপোতাক্ষী আর ময়ূরাক্ষীর মধ্যে—কপোতাক্ষী চলিয়া গিয়েছে—শুধু ময়ূরাক্ষী আছে। বাঙলার সকল ছোট নদনদী তাঁহার বক্ষের হার, গঙ্গানদী তাঁহার রত্ন মেখলার কিঙ্কিণী বাজাইয়া সাগরের উদ্দেশে ছুটিয়া চলিয়াছে। দক্ষিণে সুন্দরবনে বাঙলা মায়ের ভীষণা ঐশ্বর্যময়ী মূর্তি। সেখানেও বিষধর নাগ তাহার ফণা বিস্তার করিয়া মাথায় ছত্র ধারণ করিয়া আছে, ভীষণ ব্যাঘ্র তাঁহার পদলেহন করিতেছে। উত্তরে হিমালয় তাঁহার সহস্র শৃঙ্গবাহু তুলিয়া বঙ্গজননীকে আশীর্বাদ করিতেছেন, তাঁহার গা বাহিয়া প্রবাহিত হইয়া স্নেহাশ্রুরূপে শত নদনদী বাঙলাকে শস্যশ্যামল করিতেছে।

ক্ষীর সমুদ্র মন্থনে সুধাভাণ্ড হাতে লক্ষ্মী উঠিয়াছিলেন, আর বঙ্গসাগর মন্থনে বঙ্গলক্ষ্মীর জন্ম। হৃদয়ে সন্তানের জন্য তাঁহার অমিত স্নেহসঞ্চিত। তাঁহার কোলভরা কনকধান্য।—ভারতনন্দনবনের পারিজাত বাঙলা, মোগলবাদশাহদের 'ফুলের বাগান' তিনি।

প্রতিটি ঋতুতে মায়ের রূপ পরিবর্তিত হয়। গ্রীষ্মে দেশজননী রুক্ষা শুষ্কা বৈরাগিনী। তখন সূর্যের প্রখর কিরণে হিমালয়ের শুভ্র চূড়া উজ্জ্বল হয়, কাশবন জ্বলিয়া জ্বলিয়া শুষ্ক হইয়া পড়ে, নদীর পাড়ের বালুকণা সোনার মতো চিকচিক্ করিতে থাকে। বর্ষার মেঘ তাঁহার নিবিড়কুন্তল রচনা করে, চারিদিকের নদনদী খালবিল একাকার হইয়া যায়, কাননে নবমালতী, কদম বকুল ফুটিয়া থাকে, সন্ধ্যায় যূথিকা তাহার সুবাস বিলায়, চারিদিকে দেখা যায় শ্যামলতার সমারোহ। বাঙলা মা শরতে বর্ষাস্নানে বিশুদ্ধ গাত্রী, মুকুটে তিনি শ্বেতশতদল পরেন, গলায় শেফালির মালা, নীল আকাশে সাদা মেঘ, নদীর শ্বেত পুলিন, সাদা ছাতিম ফুল। রাত্রিতে আকাশে ছায়াপথের প্রকাশ হয়। মাঠে মাঠে ধান। বর্ষার জড়তার পর শরতে নূতন চেতনা সর্বত্র সঞ্চারিত হয়। হেমন্তে বাঙলা মায়ের শিশির ভেজা ছলছল মূর্তি; শীতে কুহেলিকাচ্ছন্না জড়তাগ্রস্তা হইয়াও শিশিরঝরা কুন্দফুলে হাস্যময়ী, আবার বসন্তে নবজাগ্রতা, অশোক বকুল কমলে নবীন আম্রমঞ্জরীতে শোভাময়ী।

গঙ্গার ভগ্নকূলে তিনি শ্যামাঙ্গী, উপরে কালমেঘ, নীচে মকর কুম্ভীর।

বাঙলার পরিত্যক্ত পল্লীতে প্রাচীন ভগ্নস্তূপে তাঁহার গৌরব—রিক্তা মূর্তি, মনে হয় মাতা সন্তানের অতীত কীর্তি সন্ধানে নিরতা।

শীতের শিশিরসিক্ত মাঠে ধীরে ধীরে সূর্যের আলো পড়িতে থাকে, মাঠে গাভী চরে, রাখালেরা গান গায় আর খেলা করে; বেলা বাড়ার সঙ্গে মনে হয় মাতা মাঠের সোনার ধানের উপর আপনার রৌদ্রের আঁচলখানি ছড়াইয়া দিয়াছেন। বঙ্গমাতা তাঁহার সন্তানের সুখে সুখী। তাহাদের দুঃখে দুঃখিনী মা অপরকে খাওয়াইয়া রিক্ত হইয়াও সুখী। চারিদিকের নদনদী তাঁহার সন্তানদের ঘুম পাড়াইবার গান গাহিতেছে। সন্ধ্যায় মায়ের কোলে তাঁহার কোটি সন্তান

ঘুমাইয়া পড়ে, আবার পাখির ডাকে তাহারা জাগে। প্রতিদিন উষা বঙ্গজননীর আঙ্গিনায় কিরণের ছড়া দেয়, সন্ধ্যা ধূপদীপ আলিয়া শত শত মন্দিরে তাঁহারই আরতি করে। বঙ্গমাতা স্বর্গের পুঞ্জীভূত ধানদূর্বা ভগবানের আশীর্বাদ মায়ের উপর চিরদিন বর্ষিত হইয়াছে।

আশুতোষ জন্মশতবার্ষিকী

(১৮৬৪ জুন—১৯২৪ মে)

কালচক্রের আবর্তনে মহামনীষী বাঙ্‌লার পুরুষব্যাঘ্র আশুতোষের জন্মের শতবর্ষ পূর্তি সমাগত প্রায়। বাঙ্‌লা ইঁহাকে ভুলিলে প্রায় অর্ধশতাব্দীর শিক্ষার প্রসারকে ভুলিবে, বাঙলা ইঁহাকে ভুলিলে এক নির্ভিকহৃদয় মনস্বীকে ভুলিবে, এক ছাত্রদরদীকে ভুলিবে, এক কর্মবীরকে ভুলিবে, এক জ্ঞানবীরকে ভুলিবে, এক আদর্শ বাঙালীকে ভুলিবে। জাতিকে বাঁচিতে হইলে, জাতিকে অগ্রগতির পথে চলিতে হইলে এইরূপ বঙ্গজননীর সুসন্তানগণের চরিত্রকথা, ইঁহাদের অমর কীর্তি স্মরণ করিতে হইবে। সেই স্মরণের দিন সমাগত প্রায়। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন সোমবার বৌবাজার, কলিকাতায় পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মাতা জগত্তারিণী দেবী। ভবানীপুর চক্রবেড়িয়া শিশুবিদ্যালয়ে তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। পুত্রের শিক্ষার প্রতি পিতা গঙ্গাপ্রসাদের শুধু সতর্ক দৃষ্টি ছিল না, তিনি তাঁহার পুত্রের জ্ঞানের যাহাতে সম্যক্ উন্মেষ হয়, তাহার জন্য অক্লান্ত চেষ্টাও করিয়াছেন। বালক আশুতোষের শৈশব হইতেই জ্ঞানার্জনের প্রতি অদম্য উৎসাহ ছিল। এই উৎসাহের এবং একাগ্রতার ফলে পরিণত জীবনে তিনি জগতের জ্ঞানভাণ্ডারের কি জানিতেন আর কি জানিতেন না তাহা পরিমাপ করা যায় না। আশুতোষ খুব ভোরে উঠিয়া পিতার সহিত ভ্রমণ করিতেন। এই ভ্রমণের সময় পিতা পুত্রকে মুখে মুখে নানা জ্ঞানের বিষয় শিখাইতেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আশুতোষ সাউথ সুবারবন স্কুলে ভর্তি হন। তখন প্রধান শিক্ষক ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ শিবনাথ শাস্ত্রী। তিনি এই স্কুল হইতে কৃতিত্বের সহিত এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লাভ করিলেন। তাহার পর এফ-এ পরীক্ষায়ও উত্তম ফল লাভ করিয়া বৃত্তি পাইলেন।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে প্রথম স্থান অধিকার করিলেন, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এম-এ পরীক্ষায় গণিতে সর্বোচ্চ স্থান লাভ করিলেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে গণিত, মিশ্রগণিত ও পদার্থবিদ্যায় এম-এ পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্টুডেন্টসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরবৎসর সংস্কৃত ও ইংরেজীতে উক্ত পরীক্ষার প্রার্থী হ'ন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ একই পরীক্ষা বার বার দানের অনুমতি তাঁহাকে দিলেন না। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিটি কলেজ হইতে আইন পরীক্ষায় পাশ করেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আইনের

সর্বোচ্চ উপাধি ডি-এল উপাধি লাভ করেন। আশুতোষ ইতিমধ্যে এডিনবরা রয়েল সোসাইটি, প্যারিসের গণিত সোসাইটি প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত গাণিতিক গবেষণা সংস্থার সভ্যপদ লাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মানসূচক ডি এস্-সি, ও ভারতসরকার নাইট, সি-এস্-আই উপাধি প্রদান করেন। পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে 'সরস্বতী'—শাস্ত্রবাচস্পতি এবং বৌদ্ধ সংঘ তাঁহাকে 'সম্বুদ্ধাগম চক্রবর্তী' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি বিদ্যায় সরস্বতীর বরপুত্র, তাই সরস্বতী উপাধি বিদ্যাক্ষেত্রে তাঁহার শ্রেষ্ঠ ভূষণ, সর্বত্র বিজয়ের সূচক।

"মাতৃগোত্র প্রীতি অতি
আশুতোষ সরস্বতী,
উপাধিভূষণ তব বিজয় নিশান" —অমৃতলাল বসু

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিনেটের সদস্য হইয়া আজীবন বিশ্ববিদ্যালয়কে সেবা করিয়াছেন। ১৯০৪ হইতে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। স্বাধীন ওকালতি ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া তিনি বিচারপতির পদ গ্রহণ করেন, কারণ ইহাতে বিশ্ববিদ্যালয়কে সেবা করিবার তিনি বেশি সুবিধা পাইবেন ইহাই ছিল তাঁহার অভিপ্রায়। ১৯২০ সালে তিনি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ লাভ করেন। ১৯০৬ হইতে ১৯১৪ পর্যন্ত একাদিক্রমে আট বৎসর কাল তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলারের পদ অলংকৃত করেন। আবার ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের তদানীন্তন বড়লাট ও বাঙ্‌লার গভর্ণরের অনুরোধক্রমে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলর থাকুন আর নাই থাকুন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বলিতে তাঁহাকেই বুঝাইত। ইহার প্রত্যেকটি কাজের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পূর্বে এখানে শিক্ষা ব্যবস্থা কিছু ছিল না—বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন, এবং অনুমোদিত কলেজগুলির শিক্ষা এবং পরীক্ষা ব্যবস্থার উপর কর্তৃত্ব করিতেন। এখানকার স্নাতকোত্তর বিভাগ তাঁহার অক্ষয় কীর্তি। বিভিন্ন বিষয়ে এম্ এ পড়াইবার সুব্যবস্থা তাঁহারই সময়ে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের তিনিই স্রষ্টা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও গবেষণা কার্য চালাইবার জন্য তিনি পৃথিবীর সকল দেশের বিখ্যাত পণ্ডিতগণকে একত্র করিয়াছিলেন —

"ধ্যানে যাঁর ছিল দৃষ্টি
নবীন নালন্দা সৃষ্টি"। (অমৃতলাল বসু)

বিদ্যাপীঠে আশুতোষ ছিলেন 'গোষ্ঠীপতি' (অমৃতলাল বসু), 'অশিষ্ট শাসন পটু', 'শিষ্টের সহায়'; বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য তাঁহাকে বিরূপ মনোভাব বিশিষ্ট সরকারের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। সরকারী সাহায্যের অভাবে এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপকগণের বেতন বন্ধ হইয়া সঙ্কট উপস্থিত হয়। অশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই মহামনীষীর মুখের দিকে চাহিয়া অধিকাংশ অধ্যাপক তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা তিনি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

ছাত্রহিতের জন্য তিনি পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন করেন। পরীক্ষায় পাশের হারও বাড়িতে থাকে। বিদেশী সরকার দেশের প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে দেড়শত বছরে বিশেষ কিছু করেন নাই। আশুতোষের চেষ্টা ছিল যাহাতে নিভৃতপল্লীর ঘরে ঘরে প্রবেশিকা পাশ ব্যক্তি পাওয়া যায়। কোন ছাত্র যে কোনরূপ বিপদে পড়ুক না কেন তাঁহার দ্বারস্থ হইলে সে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিত না। বাহিরের রূপ তাঁহার কিছুটা কঠোর হইলেও তাঁহার অন্তর ছিল অত্যন্ত কোমল। বাহিরের কৃত্রিম ভদ্রতা অপেক্ষা প্রাণের দরদের মূল্য অনেক বেশি। তিনি সরল আড়ম্বরশূন্য জীবন যাপন করিতেন। বিদ্যাসাগরের মতো আশুতোষও সর্বক্ষেত্রে দেখাইয়াছেন মানুষ বড, পোষাক বড নহে। বাঙালীর পোষাকে তিনি খাঁটি বাঙালী ছিলেন। তিনি কঠিন শয্যায় জীবন কাটাইয়াছেন। কখনও ধূমপান করেন নাই। সামাজিক জীবনে তাঁহার উচ্চনীচ ভেদজ্ঞান ছিল না। যেখানে প্রাণের টান পড়িত তিনি সেখানেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন। তিনি সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করিয়াছেন। নিয়মিত সময়ে তিনি সব কাজ করিতেন। সমস্ত জীবন ভরিয়া তিনি খুব ভোরে উঠিতেন—নিয়মিত মুক্ত বায়ুতে বিচরণ করিতেন। নির্দিষ্ট সময়ে সকল কাজ করিতেন বলিয়া তাঁহার সকল কাজ সুসম্পন্ন হইত। হাইকোর্টে গুরুতর কাজের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইতেন। সমস্ত বিভাগের প্রত্যেক কাজ তিনি নিজে দেখিতেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে বহু সভার কাজ তিনি একদিনে করিতেন অথচ আবশ্যক আলোচনা করিবার অবকাশ সকল সভ্যকে দিতেন। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ফিরিতে কোন কোন দিন তাঁহার বেশি রাত্রি হইত। প্রতিদিন তাঁহার গৃহে অগণিত দর্শনার্থী আসিত—তাঁহার গৃহের দ্বার সর্বদা সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। তিনি ছাত্রদের কেবল সাময়িক কষ্ট দূর করিতেন তাহা নহে, তাহাদের জীবনের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের সদুপদেশও দিতেন। স্বাধীনতচিত্ত স্বাবলম্বী লোককে তিনি অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন। অনেকের ধারণা আশুতোষ স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। এ কথা আদৌ সত্য নহে। তিনি যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া অপরের মতের ভ্রান্তি দেখাইতেন। তিনি কখনও বিনা যুক্তিতে কাহাকে দিয়া কোন কাজ করান নাই। অনেকের ধারণা তাঁহার নিকট যাঁহারা ঘন ঘন যাতায়াত করিতেন, দোষ গুণ বিচার না করিয়া তিনি তাঁহাদের সুযোগ-সুবিধা করিয়া দিতেন। একথাও সর্বৈব অসত্য। বস্তুতঃ তিনি লোকের গুণ খুঁজিতেন, ভীরু, কাপুরুষকে ক্ষমা করিতেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের, একজন প্রবীণ কৃতী অধ্যাপক বলিয়াছেন তিনি জীবনে স্যার আশুতোষের সহিত মাত্র একদিন দেখা করিয়াছিলেন, তাহাও এম-এ পাশ করিবার পর কোন কলেজের অধ্যাপক পদ প্রার্থী হইয়া। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ ও চাকুরির স্থায়িত্ব ; গবেষণা প্রভৃতি কাজের জন্য আর কোন দিন তিনি তাঁহার সহিত জীবনে দেখা করেন নাই। আশুতোষ লোকের কাজের খবর রাখিতেন। কাজ দিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা যাইত—শুধু কথা দিয়া নহে। কাজ না করিয়া অপরের [illegible]

সমালোচনা করিতে গিয়া তাঁহার নিকটে অনেকে ধমক খাইয়াছেন। আশুতোষ জীবনে কখনও অন্যায়ের সহিত সন্ধি করেন নাই। পরীক্ষায় ছাত্রগণের উপর অবিচার তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। প্রশ্নপত্রের গুণাগুণ উহা রচনার সময়েই তিনি পরীক্ষা করিতেন। তাঁহার আদেশে পরীক্ষাথিগণের অনুপযুক্ত প্রশ্ন-রচনাকারীকে চিরকালের জন্য পরীক্ষার সংস্রব ত্যাগ করিতে হইয়াছে—এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

আশুতোষের স্মৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল। তিনি কখনও কোন কথা ভোলেন নাই। জীবনে যাহাকে একবার দেখিয়াছেন এরকম লোককেও বহু বছর পরে তাঁহার চিনিতে কষ্ট হইত না।

আশুতোষ ছিলেন কর্মবীর—তাঁহার জীবনে বিশ্রাম বলিয়া কিছু ছিল না। তাঁহার মাতৃভক্তিও ছিল অসাধারণ—মায়ের আদেশে বড়লাটের দেওয়া বিলাতে যাওয়ার সুযোগ তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁহার মন মুখ কার্য একপ্রকার ছিল। 'মনস্যেকং বচস্যেকং কর্মণ্যেকং মহাত্মনাম'—মহনীয় চরিত্রের লোকদের মন বাক্য এবং কার্য একপ্রকার হয়। জীবনে তিনি কাহারও নিকট নতি স্বীকার করেন নাই। তাঁহার নিজের স্বার্থে তো নহেই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থেও নহে। সরকারের অন্যায় প্রস্তাব মানিয়া লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি বিদেশী সরকারের দপ্তরে পরিণত হইতে দেন নাই। আশুতোষ যাহা সত্য যাহা কর্তব্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন তাহাই করিতেন।

দীর্ঘদিন বাঁচিয়া থাকিলে তিনি বহুরূপে দেশের সেবা করিতে পারিতেন। তাঁহার সেই সেবা হইতে বাঙ্‌লা দেশ অকস্মাৎ বঞ্চিত হইল। ১৯২৪ সালের ২৫শে মে পাটনা শহরে আশুতোষের অমর আত্মা তাঁহার নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। বাঙ্‌লার মঙ্গল প্রদীপ নিভিয়া গেল—

'বিনামেঘে বজ্রাঘাত
অকস্মাৎ ইন্দ্রপাত
বিনাবাতে নিভে গেল মঙ্গল প্রদীপ।
শমন পাইত শঙ্কা
শুনাতে মরণ ডঙ্কা
প্রবাসে তস্কর বেশে হইল প্রতীপ।' —অমৃতলাল বসু

কর্মবীর বিধানচন্দ্র রায়

(১৮৮২—১৯৬২)

বিধানচন্দ্র রায় রাজনীতিক নেতা ও কর্মসংগঠক হিসাবে যেরূপ দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন, বাঙ্‌লা দেশে তাঁহার পূর্ববর্তী নেতৃস্থানীয়দের অন্য কাহারও সেরূপ পরমায়ু লাভ হয় নাই। তাঁহার প্রতিভা এবং কর্মশক্তি ছিল অনন্যসাধারণ এবং উহা বিকাশের অনুকূল ক্ষেত্রও তিনি পাইয়াছিলেন।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই পাটনায় বিধানচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম প্রকাশচন্দ্র রায়, মাতা অঘোরকামিনী দেবী। পিতা পাটনায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি নিজের কর্মদক্ষতা, সততা এবং সরল জীবন যাপন দ্বারা লোকের শ্রদ্ধা অর্জন করেন। তাঁহার মাতা ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা; সমাজসেবা আর পরোপকারদ্বারা তিনি সকলের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন।

পিতার কর্মস্থল বিহারেই বিধানচন্দ্রের স্কুল-কলেজের সাধারণ শিক্ষা সমাপ্ত হয়। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বি-এ পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিয়া কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে প্রবিষ্ট হন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এল্-এম্-এস্ ডিগ্রি লাভ করেন। ইহার দুই বছর পরে ২৮ বৎসর বয়সে বিধানচন্দ্র এম্-ডি ডিগ্রি লাভ করেন। এত অল্প বয়সে চিকিৎসা বিজ্ঞানে ভারতের সর্বোচ্চ উপাধি লাভ করা ভবিষ্যতে এবিষয়ে তাঁহার অনন্যসাধারণতার সূচক। তিনি বাংলাদেশে সরকারী চিকিৎসা বিভাগে যোগদান করেন। এই সরকারী কায তাঁহার ভাল লাগে নাই। এই কাজ ছাড়িয়া দিয়া তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বিলাত যাত্রা করিলেন। প্রতিভাশালী বিধানচন্দ্র অতি অল্পকাল মধ্যে সেখানকার এম্-আর-সি-পি. এবং এফ্-আর-সি-এস্ পদবি লাভ করেন। দেশে ফিরিয়া বিধানচন্দ্র স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করিলেন। ১৯১২ হইতে ১৯১৫ সালের মধ্যে তিনি চিকিৎসকরূপে সুনাম অর্জন করেন। এই সময়ের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর সহিত তাঁহার সর্বপ্রথম পরিচয় লাভ ঘটে। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সাহচর্যে রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি প্রবেশ করিলেন। স্বরাজ্যদলের সমর্থনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হইয়া তিনি আইনসভার সদস্য নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করিলেন। স্বতন্ত্র প্রার্থী হইলেও তিনি দেশবন্ধু দাশের নেতৃত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহার [illegible] তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং জীবনের অবশিষ্ট সময় কংগ্রেসের সহিত যুক্ত ছিলেন।

১৯৪৭ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র হইতে আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। এই বৎসর ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিল, কিন্তু বাঙলা দুই ভাগে বিভক্ত হইল। এই বিভক্ত বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হইলেন ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। ডাঃ ঘোষ ১৯৪৮ সালের জানুয়ারীতে পদত্যাগ করেন। ইহার পর ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মুখ্যমন্ত্রী হ'ন এবং মৃত্যুর দিন পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সুদীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য, বোর্ড অব এ্যাকাউণ্টস্-এর সভাপতিরূপে দীর্ঘকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা করেন। ১৯৪২ সালে তিনি ভাইস-চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মানসূচক ডি-এস্সি উপাধিতে ভূষিত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার সময়েই সমাজসেবী কর্মিগণের শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। দেশের জনসেবার ক্ষেত্রেও বিধানচন্দ্রের দান বড় কম নয়। পর পর দুইবার তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন। আর, জি,

কর মেডিক্যাল কলেজের বহুবিধ উন্নতি ও সংস্কার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের দান। যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণতির ইতিহাসে তাঁহার কৃতিত্ব চিরস্মরণীয়, চিত্তরঞ্জন সেবাসদন ক্যানসার ইন্সটিটিউট, যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বিধানচন্দ্রের গঠনমূলক শক্তির পরিচায়ক। ১৯৪৮ সালের এক সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তে সমস্যাসঙ্কুল পশ্চিম বাঙলার তিনি মুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। এই চৌদ্দ বছরে দেশে যে সকল সংগঠনমূলক কায হইয়াছে, দেশের যে বৈষয়িক অগ্রগতি হইয়াছে তাহা ভাবিলে বিস্ময় বোধ হয়। শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য, কর্মসংস্থান সমস্যা দ্রুতগতিতে সমাধানের পথে চলিয়াছে।

বিধানচন্দ্র ভারতের অদ্বিতীয় চিকিৎসক, অনন্যসাধারণ সংগঠক। তাঁহার জীবনের উন্নতির জন্য কখনও কোন দুরাকাঙ্ক্ষা লইয়া তিনি কাজ করেন নাই। কিন্তু যে কাজই তিনি করিতেন তাঁহাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করিয়া ধাপে ধাপে ভুল ত্রুটি কিছু থাকিলে তাহাকে সংশোধনদ্বারা সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার আদর্শ তাঁহার ছিল। ইহারই ফলে না চাহিতেই তাঁহার সকল দিক দিয়া সাফল্যও আসিত। শোনা যায় তাঁহার কাছে কোন রোগী আসিলে ডাঃ রায় তাহার মুখের দিকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়া তাহার জ্বালা-যন্ত্রণা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া তাহার উপশমের ব্যবস্থা করিতেন। কমব্যস্ততার মধ্যে যে কোন ক্ষুদ্র কাজ তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলে তাঁহার গুণাগুণ অতি দ্রুত তাঁহার নিকট ধরা পড়িত। তাঁহার জীবনের আদর্শ ছিল সংগঠন। দেশকে সংগঠিত করিবার সুযোগসুবিধা তাঁহার হাতে আসিয়াছিল এবং তিনি তাহার যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করেন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার দিন পর্যন্ত বিধানচন্দ্র দেশের কল্যাণ চিন্তা করিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল জন্মশতবার্ষিকী

(১৯শে জুলাই ১৮৬৩—১৭ই মে ১৯১৩)

১৯৬৩ সালের ১৯শে জুলাই তারিখ কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্মের শত বর্ষ পূর্তির তারিখ। তিনি রবীন্দ্রনাথ হইতে মাত্র দুই বৎসরের এবং স্বামী বিবেকানন্দ হইতে কয়েক মাসের ছোট ছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা কার্তিকচন্দ্র রায় কৃষ্ণনগরের মহারাজার দেওয়ান ছিলেন এবং মাতা ছিলেন অদ্বৈতাচার্যের বংশের কন্যা। দ্বিজেন্দ্রলালের বাল্যকাল কৃষ্ণনগরেই কাটে। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ইংরেজীতে এম-এ পাশ করিয়া বিলাত যাইবার জন্য সরকারী বৃত্তি লাভ করেন। সেখানে তিনি কৃষিবিদ্যায় শিক্ষালাভ করেন এবং M. R. S. A. এবং M. R. S. E. এই দুইটি ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত হন।

ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তিনি ইংরেজীতে কবিতা লিখিতে শুরু করেন। Lyrics of Ind নামে কবিতাগুলি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু বিলাত যাইবার জন্য তাঁহাকে হিন্দুসমাজ একঘরে করিল। পর বৎসর বিখ্যাত চিকিৎসক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুরবালার সহিত হিন্দুমতে বিবাহ হয়। কিন্তু এই বিবাহে কৃষ্ণনগরের সম্ভ্রান্ত কোন লোক বরানুগমন করিতে সাহসী হন নাই। সমাজের এই গোঁড়ামি সম্বন্ধে তিনি বলেন "চীন গেলে যখন জাত যায় না, গোপনে অখাদ্য খাইলে জাতি যায় না—প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না, তখন বিদ্যাশিক্ষার্থে বিলাত গেলে জাতি যাইবে কেন।" এই সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি কলম ধরিলেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার "এক ঘরে" নামক নক্সাটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ রচনা করিয়া বহু লোকের নিকট তিনি গালাগালি খাইয়াছিলেন।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি সরকারী চাকুরী পান। কৃতিত্বের সহিত রাজকার্য পরিচালনা করা সত্ত্বেও তিনি আশানুরূপ পদোন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। সারাজীবনই তাঁহাকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ করিতে হয়। ইহার দুইটি কারণ ছিল। বিলাত হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবার পর তিনি দেশের প্রধান রাজপুরুষকে উপযুক্ত পরিমাণে খোসামোদ করিতে পারেন নাই—তাঁহার নির্ভীক আচরণে প্রধান রাজপুরুষ মোটেই খুশী হইতে পারেন নাই। অধিকন্তু চাকুরীতে প্রবেশ করিবার পর তিনি স্বদেশী আন্দোলনে বিশেষভাবে ঝুঁকিয়া পড়েন। ইহার ফলে তাঁহাকে ৮।৯ মাস পর পরই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বদলী করা হইয়াছে।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দের শেষে তাঁহার পত্নী বিয়োগ ঘটে। ইহার পর দ্বিজেন্দ্রলাল মাত্র দশ বৎসর জীবিত ছিলেন এবং শেষ কয়েক বৎসর নাটক রচনায় মনোনিবেশ [illegible]। সুরবালা দেবীর মৃত্যুর পর হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভাঙিতে থাকে। এদিকে আবার সরকারী চাকুরীতে উন্নতির আশা নাই। এমন অবস্থায় ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি নির্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্বে সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইহার মাত্র দুই মাস পরে সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল কবি, নাট্যকার ও সুরস্রষ্টা হিসাবেই পরিচিত। উচ্চ সরকারী কাজের অবসরে তিনি সাহিত্যচর্চা দ্বারা বঙ্গবাণীকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত কাব্য ও নাটকের সংখ্যা প্রায় ৩২টি, তাঁহার হাসির গান বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সম্পদ—কবির বলিষ্ঠ মনের পরিচয় এইখানেই দেশবাসী পাইয়াছিল। আর্যগাথা, মন্দ্র, আলেখ্য, ত্রিবেণী, আষাঢে, হাসির গান প্রভৃতি তাঁহার কাব্য রচনার নিদর্শন। তাঁহার পূর্বে বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসাত্মক কবিতা ও গান ছিল না বলিলেই চলে। আবার সে যুগের প্রহসনের 'কুরুচি ও অশ্লীলতা' তাঁহাকে বড়ই ব্যথিত করে। তিনি মার্জিত রুচির প্রহসন রচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার কল্কি অবতার, বিরহ, ত্র্যহস্পর্শ, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি প্রহসন রচনায় হাস্যরস

বেশ উচ্চাঙ্গের—ইহাতে কাহারও প্রতি কোন আঘাত নাই, অথচ তিনি সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মানুষের প্রতি তাঁহার কোন ঘৃণা নাই—তাঁহার ঘৃণা হইতেছে সামাজিক জঞ্জাল আর আবর্জনার উপর।

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের যুগে তিনি নাটক রচনা করিয়া বিশেষ খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করেন। তিনি পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক এই তিন প্রকার নাটকই রচনা করেন। পৌরাণিক নাটকে তিনি সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যপ্রতিভার সমুজ্জ্বল নিদর্শন হইতেছে তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলি। কবিত্বশক্তি নাটকে প্রকাশিত করিবার জন্য তিনি নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার কবিত্বপূর্ণ ভাষাই এই নাটকগুলিকে হৃদয়গ্রাহী করিয়াছে। তারাবাঈ, দুর্গাদাস, চন্দ্রগুপ্ত, প্রতাপসিংহ, মেবার পতন, শাজাহান, সিংহল বিজয় প্রভৃতি তাঁহার ঐতিহাসিক নাটক। এই নাটকগুলির মাধ্যমে দ্বিজেন্দ্রলাল জাতির মধ্যে দেশাত্মবোধ ও আত্মত্যাগ-বুদ্ধি জাগ্রত করিয়াছেন। প্রতাপসিংহ নাটকে স্বদেশপ্রেমের সাধনা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। বাঙলায় এই নাটকের জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রও প্রস্তুত ছিল। নব রাষ্ট্রীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙলা সাদরে দ্বিজেন্দ্রলালকে গ্রহণ করে। মেবার পতন নাটকে তিনি জাতীয় প্রেমের সহিত বিশ্বপ্রেমকে রূপ দিয়াছেন। শাজাহান দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ নাট্যকীর্তি। কবির ভাবাবেগ, নাটকীয় চরিত্রের আঘাত-সংঘাত, তাঁহার কল্পনার ঐশ্বর্য সব মিলিয়া নাটকটিতে দ্বিজেন্দ্রলালের শিল্প-মানসের পূর্ণ পরিচয় প্রদান করে।

ইহা ছাড়া, বিখ্যাত ভারতবর্ষ নামক মাসিক পত্রিকার তিনিই ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পূর্বেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

বাঙলা সংগীত রচনা ও সুর সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁহার দান অসামান্য। সংগীতের এত বিষয়বৈচিত্র্য ও সুরবৈচিত্র্য অন্য কোন কবির মধ্যে দেখা যায় না। রবীন্দ্র সংগীতের ন্যায় দ্বিজেন্দ্রসংগীতও বাংলা সংগীতের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। হাসির গান বা কৌতুক সংগীতে তাঁহার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। তাঁহার সমব সংগীতগুলি বলিষ্ঠ ও আবেগপ্রধান। নাট্যসংগীতের ক্ষেত্রে তাঁহার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী রবীন্দ্রনাথ। সুর সৃষ্টির ক্ষেত্রেও তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া তাঁহার মতো কেহই এত বেশি বিলাতী সুর বাংলা গানে সার্থকভাবে প্রয়োগ করিতে পারেন নাই। সুরসৃষ্টির অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁহার স্বকীয়তা ও মৌলিকতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁহার স্বদেশপ্রেমমূলক কোরাস সংগীতগুলি একমাত্র এই সংগীতগুলির মধ্য দিয়া তিনি যুগ যুগ ধরিয়া জীবিত থাকিতে পারিবেন। এক্ষেত্রে আজ পর্যন্তও তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

তাহার "গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই"—"আবার তোরা মানুষ হ"—এই বাণী সারা

দেশের সুষুপ্তিকে বৈদিক ঋষির মন্ত্রের মতো ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। নারীশক্তির উদ্বোধন হইয়াছিল তাঁহার গানে। ঋষি বঙ্কিম 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে সমগ্র ভারতকে দীক্ষিত করিয়া প্রধানতঃ দেশমাতৃকার অনন্ত শক্তি তাহাকে দিয়া উপলব্ধি করাইয়াছিলেন। আর দ্বিজেন্দ্রলাল 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা' গানে ভারতজননীর মাধুর্যের দিকটাই বিশেষভাবে উদ্ঘাটিত করেন। দেশ বন্দনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল, একে অন্যের পরিপূরক, কারণ মাতৃমূর্তিতে শক্তি ও মাধুর্যের সমন্বয় রহিয়াছে। বঙ্কিম স্বদেশ-জননীর দেবীমূর্তি মন্দিরে মন্দিরে গড়িয়াছিলেন—আর দ্বিজেন্দ্রলাল দেশমাতৃকাকে গৃহের মা-রূপে দেখিয়াছিলেন।

রবীন্দ্র-যুগে কবি ও সংগীতকার হিসাবে একমাত্র দ্বিজেন্দ্রলালেরই কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল, আর সকলেই রবীন্দ্র প্রভায় নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিলেন। একদা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একাধিক কাব্যের অন্তর্নিহিত রসধারা বিশ্লেষণ করিয়া, তাঁহার প্রতি পাঠকদের আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্র-বিরোধিতা করিতে গিয়াই তিনি অনেকের বিরাগভাজন হন। "দলাদলির কুজ্ঝটিকায় দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভা সাময়িকভাবে ঢাকা পড়িয়াছিল। যাহা চিরন্তন এবং শাশ্বত, তাহা পরিণামে মেঘমুক্ত মহিমায় প্রকাশ পাইতে বাধ্য।" সেই দিন আজ আসিয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের রচনা সমাদৃত না হইবার দ্বিতীয় কারণ "দ্বিজেন্দ্রলাল স্বয়ং ; তিনি স্বদেশ ও স্বসমাজ সম্পর্কে যাহা অনুভব করিয়াছেন, অকপটে তাহাই বলিয়া ফেলিয়াছেন। অপ্রিয় সত্য বলিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই, কাহারও সহিত আপোস-মীমাংসায়ও তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। তিনি ঋজু-মেরুদণ্ডের লোক ছিলেন, অত্যধিক নমনীয়তা বা ন্যাকামি মোটেই বরদাস্ত করিতে পারিতেন না ; কঠোর হস্তে ইহার বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রূপ-ব্যঙ্গের চাবুক চালাইয়াছেন, ফলে তাঁহার শত্রুবৃদ্ধি হইয়াছে। লোকে তাঁহাকে দাম্ভিক ও অহঙ্কারী অপবাদ দিয়া প্রায় একঘরে করিয়াছে। আষাঢ়ে, মন্দ্র, আলেখ্য ও হাসির গানের কবি প্রায় অপঠিত থাকিয়াই বিস্মৃত হইতে বসিয়াছেন। বাংলা দেশ ও সাহিত্যের পক্ষে ইহা দুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই।" (দ্বিজেন্দ্রলাল-গ্রন্থাবলীর ভূমিকা, সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ)

আজ রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল দুইজনেই সকল দলাদলির ঊর্ধ্বে। সেদিনের সে দলাদলিতে যাঁহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই আর ইহজগতে নাই। জাতির জীবনে দ্বিজেন্দ্রলালের দান আজ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবার সুযোগ ও সময় আসিয়াছে। তাঁহাকে তাঁহার যোগ্য স্থানে আসন দিবার ব্যবস্থাও হইতেছে। কবির জন্মশতবার্ষিকীর বৎসরে তাঁহার রচনাবলী সুলভ মূল্যে প্রচার করিলে বাঙালী তাঁহার স্মৃতির প্রতি উপযুক্ত সম্মান দেখাইতে সক্ষম হইবে।

নয়া পয়সার আত্মকথা

আমি একটি ক্ষুদ্র নয়া পয়সা। তোমরা ভাবিতেছ যে এত ক্ষুদ্র, এত ছোট তাহার আবার আত্মকথা কি। কিন্তু ভাবিয়া দেখ জগতে ছোট জিনিস অবহেলার বস্তু নহে। ছোট ছোট জলবিন্দুতে সিন্ধুর সৃষ্টি হয়, ছোট ছোট বালুকণায় বিরাট বিস্ময়কর মহাদেশ জন্মে।· ক্ষুদ্রের সমষ্টিতে বৃহতের উদ্ভব, বৃহতের খণ্ডতায় ক্ষুদ্রের উৎপত্তি। কেহ কাহাকেও ছাড়িতে পারে না। ক্ষুদ্র আছে বলিয়াই বৃহৎকে বড় বলিয়া জানি, আর বৃহৎ আছে বলিয়াই ক্ষুদ্রের স্বরূপ বুঝি।

আমার আকৃতি গোলাকার, আমি তামায় নির্মিত। আমি ছোট হইলেও টাকার আকৃতির মতো আকৃতি আমাকে দিয়া আমি যে তুচ্ছ নহি তাহা দেখান হইয়াছে। তবে টাকার সঙ্গে আমার প্রভেদ আছে—প্রধানতঃ, আমি তাম্রমুদ্রা। টাকার মধ্যে কিছুটা রূপা আছে। টাকার কিনারায় খাঁজ-কাটা আছে—আমার কিনারে কোন খাঁজ নাই কারণ আমার কিনারা কেহ কাটিবে না; তাহাতে কাহারও লাভ নাই। আমার এক পিঠে ভারতের জাতীয় প্রতীক অশোকচক্র, উহার দক্ষিণে ইংরাজীতে (রোমক লিপিতে) 'ইণ্ডিয়া' লেখা, বাঁদিকে দেবনাগরী লিপিতে 'ভারত' লেখা আছে। অপর পিঠে রোমক লিপিতে আমার মূল্য জ্ঞাপক এক সংখ্যা মধ্যস্থলে লেখা আছে। উহার নীচে রাষ্ট্রভাষায় দেবনাগরী লিপিতে 'নয়া পৈসা' (উচ্চারণ—নয়া প্যাসা) উৎকীর্ণ আছে। তাহার নীচে রোমক লিপিতে মুদ্রা প্রচলনের বৎসর লেখা আছে। উল্লিখিত এক সংখ্যার উপরে কিনারা ঘেঁসিয়া অর্ধচন্দ্রাকারে দেবনাগরী লিপিতে রাষ্ট্রভাষায় লেখা আছে (৳ মুদ্রা) 'টাকার শতাংশ'। টাকার ভাঙ্গানি নয়া পয়সায় লইতে হইলে এসব লেখা তোমরা দেখিয়া লইবে। আমার কথা শুনিয়া তোমরা হয়তো হাসিতেছ। সামান্য একটা নয়া পয়সা আবার দেখিয়া লইতে হইবে [illegible] অত হাসিও না। বিশেষ করিয়া বড় বড় শহরে অনেক অথবা একশত নয়া পয়সার ভাঙতি লইলে দেখিবে [illegible] আকারে তামা কাটিয়া ঐ সকল পয়সার মধ্যে ঢুকাইয়া দেওয়া আছে। [illegible] দেখিলে নিজেই ঠকিবে। তাড়াতাড়ির সময়ে লোকে ঠকে, টাকার ভাঙতি লইতে বাধ্য হইলেও ঠকিতে হয়। অসাধু ব্যবসায়ী তোমাকে বলিবে ভাঙতি নাই, 'পূরা এক টাকার নয়া পয়সা লইলে দিতে পারি' —তখনই সতর্ক হইবে। উহার মধ্যে তামার চাকতি থাকিতে পারে। বলা বাহুল্য তামার চাকতি নয়া পয়সা নহে।

তোমরা নিশ্চয়ই আমার ইতিহাস জানিতে চাও। আমি পূর্বে ছিলাম না। পূর্বেকার তামার এক পয়সা তোমরা দেখিয়াছ। এই একের সঙ্গে এক পয়সা, দ্বিগুণ আকৃতিবিশিষ্ট ডবল-পয়সা ছিল। তাহাকে তোমরা দেখ নাই। [illegible] আমার আবির্ভাবের কারণই বা কি? ডবল পয়সা চলিয়াছিল, এক পয়সা চলিয়াছিল, কিছুদিন তাহার মধ্যে ফুটাও ছিল। আধ পয়সাও আগে চলিয়াছে।

খুব ছোট পয়সা—আগেকার দিনের 'পাই' ছিল—উহা এক টাকার একশ ছিয়ানব্বই ভাগের এক ভাগ।

আমি এক টাকার একশ ভাগের এক ভাগ। শত শব্দ মঙ্গল বাচক—লোককে আশীর্বাদ করিতে শত বছর পরমায়ুর আশীর্বাদ করা হইত।

শত বীর প্রাচীনকালে অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া পাহারা দিয়া বীরবিক্রমে দেশ-দেশান্তরে ছুটিত। ভাগীরথী মহাসমুদ্রে মিলিতে গিয়া শতমুখী হইয়াছেন কারণ আগে কে অনাদি অনন্ত সমুদ্রে মিলিত হইবেন।

আমাকে অখণ্ডমণ্ডলাকার সর্বশক্তিমান্ রজতখণ্ড টাকার একশ ভাগের এক ভাগে পরিণত করার অর্থ হইল দশমিক মুদ্রা পদ্ধতিতে ভারতীয় মুদ্রার জন্মান্তর গ্রহণ।

স্বাধীনতা লাভ করিয়া ভারত নব জন্ম লাভ করিয়াছে—এই নবীন ভারতের বহু পরিবর্তনের মধ্যে দশমিক মুদ্রার প্রবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর মতে ইহা নির্বাক্ বিপ্লব। বিপ্লব পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া মঙ্গলময় নবীনকে গড়ে।

পূর্বে এদেশে ইংরেজ আমলে মুদ্রা ছিল টাকা, আনা, পাই লইয়া। ইহাকে ইংরেজী পদ্ধতি বলে। তাঁহাদের যেমন পাউণ্ড, শিলিং, পেন্স লইয়া মুদ্রা পদ্ধতিতে তিনের সমবায়—তেমনি ভারতের জন্যও তাঁহারা করিয়াছিলেন টাকা, আনা পাই—এই তিনের সমবায়। ইহা ছাড়া, দেশীয় জমিদারী, মহাজনী পদ্ধতি[illegible] টাকা, আনা, গণ্ডা, কড়া, ক্রান্তি। ইহাতে হিসাবের কত জটিলতা সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার কিছুটা তোমরা জান—সবটা জান না। তোমাদের পিতা বা পিতামহদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় কঠোর বেত্রদণ্ডের মহিমায় কিভাবে তাঁহারা কড়াকিয়া শিখিতেন। এত কষ্ট [illegible] তাঁহারা [illegible] শিখিতেন, বহির্বাণিজ্যে তাহার কিছুই মূল্য ছিল না।

আমি ১৯৫৭ সালের ১লা এপ্রিল জন্মগ্রহণ করিয়াছি—আ[illegible] জন্মদিন [illegible] হউক। আমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে দেশে হুলস্থূল পড়িয়া [illegible]। অনেকে আমাকে সাদরে গ্রহণ করিল—অবশ্য তাহারা বুদ্ধিমান্ লোক। নি[illegible]রা নানা গোলমাল শুরু করিল—তাহার কারণ তখন প্রথম অবস্থায় দুই রকম মুদ্রা চলিত, তখন বিনিময়ের গোলমাল। দুষ্ট লোকেরা সব বুঝিয়া বেকুফ সাজিয়া পরের অনিষ্ট করিত, ভাল লোকেরা স্বার্থহানি হইতে বাঁচিবার জন্য অতি মাত্রায় সজাগ হইতেন। ফলে সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়াছিল। যেখানে বহু কর্তা সেখানে চলা বড় মুশকিল। তাই পুরাতন মুদ্রার স্তাবকগণের সহিত আমাকে লইয়া গোলযোগ হইত। অবশ্য সে গোলযোগ এখন নাই—এখন সকলেই আমার উপকারিতা বুঝিয়াছে। বিষয়টা যখন উঠিল তখন তার ব্যাখ্যা দরকার। দশমিক পদ্ধতি শূন্যের স্থান পরিবর্তন করিয়া মূল্য নিরূপণ করা ছাড়া আর কিছুই নহে। [illegible] ব্যবস্থায় দশ ও তাহার গুণিতক ধরিয়া হিসাব করিতে হয়—যথা টাকাকে একশত

ভাগ করিয়া লেখা হয় '০১। পূর্ণ এক টাকা ১.০০ এক টাকার চারি ভাগের এক ভাগ ২৫। তাই টাকা চার আনা লেখা হয় ১'২৫। দশমিক বিন্দুকে ডাহিনে বা বাঁয়ে সরাইলে ইহার মূল্য পরিবর্তিত হইবে। যথা একশত টাকা আট আনা = ১০০'৫০। বিন্দুটিকে এক ঘর ডাহিনে বসাইলে হইবে ১০০৫'০০ দশমিক পদ্ধতিতে এইভাবে গুণ ও ভাগ করা যায়—সময়ও লাগে অতি কম।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই, দশমিক অঙ্ক পদ্ধতির উৎপত্তি হয় তোমাদের এই ভারতবর্ষে। দুই হাজার বৎসর পূর্বে তোমাদেরই পূর্বপুরুষ শূন্য আবিষ্কার করেন তাহার কয়েকশত বৎসর পরে আর্য ভট্ট, ব্রহ্ম গুপ্ত, শ্রীধর প্রভৃতি মনীষিগণ দশমিক পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। এই ভারতীয় পদ্ধতিই গণিতশাস্ত্রকে একটা প্রথম শ্রেণীর শাস্ত্রের মর্যাদা দান করে। ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে দশমিক বিন্দু আবিষ্কৃত হয়। ইহার ফলে পূর্ণ দশমিক পদ্ধতি প্রবর্তন করা সম্ভবপর হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফরাসী দেশ এই পদ্ধতি গ্রহণ করে। আজ ভারতসহ পৃথিবীর ১০৬টি দেশে দশমিক মুদ্রাব্যবস্থা প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে এই দশমিক পদ্ধতি প্রবর্তনের নানাবিধ চেষ্টা হয়। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে ভারত পার্লামেন্টে নূতন আইন পাশ হওয়ায় এই নূতন মুদ্রা-পদ্ধতি চালু হয়। আমি ইহার মধ্যে পড়িয়াছি।

তোমরা দেখিয়াছ, আমাকে দিয়া কোন কাজ না হইলে আমাকে লইয়া শুধু শুধু ঝগড়া হইত না। সুতরাং আমি কাজের নয়া পয়সা। অঙ্ক কষিতে তোমাদের অত্যন্ত সুবিধা করিয়া দিয়াছি। আগের মুদ্রার পাই দিয়া মণি-অর্ডার চলিত না, আনার নীচে কোন মুদ্রার মণি-অর্ডার গৃহীত হইত না—হয় পুরো আনা দাও না হয় নীচের আনা দাও। উভয় দিক্ দিয়া ক্ষতি। এখন একটি পয়সার নড়চড় হইবার উপায় নাই। এক নয়া পয়সার মূল্য এক [illegible] সঙ্গে ইহা সম্বন্ধে চলিবে। পাওনা [illegible] হইলে সূক্ষ্ম এক পয়সা পর্যন্ত পাইবে—দিতেও। [illegible] পরিপর জিনিসপত্র কিনিবার কত সুবিধা। প্রাচুর্যের সময় আমার কদর [illegible] পারিবে। পুরানো এক পয়সার ছয় আঁটি শাকবিশেষ পাইলে—আমাকে দিয়া তুমি উহার তিন আঁটি কিনিতে পারিবে। এইরকমে তিল তিল [illegible] তাল হয়। তবে তোমরা বলিতে পার, আমার মতো ছোট মুদ্রাকে রক্ষা করা মুশকিল। আগেকার দিনের চাঁদির দু-আনি আমার মতোই ছোট ছিল—তোমরা দেখ নাই। কিন্তু তোমাদের পিতামহেরা উহা সযত্নে রক্ষা করিতেন। ছোট সকলকেই কি তোমরা হারাও? বাড়ির ছোট ছেলেকে কেহ ফেলিয়া দেয় না—সকলের ছোট হইলেও তাহার মূল্য আছে বলিয়াই তো ফেল না। সে একদিন বড় হইয়া তোমাদের মতো হইবে। আমাকেও সযত্নে রাখিলে আমিও তোমাদের ইচ্ছা অনুসারে বাড়িব। তখন আমাকে বড় পয়সায় পরিণত করিতে পারিবে। সুতরাং ছোটকে ছোট বলিয়া ঘৃণা করিও না।